ভারতবর্ষ

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

সূচীপত্র

ষট্‌ত্রিংশ বর্ষ—প্রথম খণ্ড; পৌষ ১৩৫৫—জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৬

লেখ-সূচী—বর্ণানুক্রমিক

অগাধ জলে (বড় গল্প) শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ... ২২১
অলিম্পিক সন্তরণে ভারত (আলোচনা)
শ্রীঅমরেন্দ্র বিশ্বাস ... ৮৩
অদ্বৈতং (প্রবন্ধ) শ্রীসুধাংশুকুমার হালদার ... ২৬৫
অর্থ-নৈতিক দৃষ্টিতে বাংলার সমাজ, সাহিত্য ও ভাষা (প্রবন্ধ)
কৌটিল্য ... ১২০
আকাশ পথের যাত্রী (ভ্রমণকাহিনী)
শ্রীসুষমা মিত্র ১৪৮, ২৩২, ৩১৫, ৪২২, ৪৯৪
আচার্য্য গৌড়পাদ (প্রবন্ধ) শ্রীননীগোপাল গোস্বামী ... ২১৫
আধুনিক ব্যবহারে প্রাচীন সংজ্ঞার উপযোগ (প্রবন্ধ)
অধ্যাপক শ্রীদুর্গামোহন ভট্টাচার্য ... ২৯১
আফ্রিকা ভ্রমণ (ভ্রমণ বৃত্তান্ত) ব্রহ্মচারী রাজকৃষ্ণ ... ৫৩, ৩৬৫
আমরা (কবিতা) শ্রীসুধাংশুকুমার হালদার ... ৪৪৯
আমাদের বাড়ী (প্রবন্ধ) শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক ... ২০১
আমার এ তরুমূলে (কবিতা) শ্রীদেবপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ... ৩৪১
আমেরিকায় কালীপূজা—শ্রীমতী লীলা রায় ৩২৮
আশ্রয়প্রার্থী ও পশ্চিম বাংলা (প্রবন্ধ)
শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৪১৯
কথার কথা—কুল্লুক ভট্ট ... ৩৩৯
কলিকাতা ভারতের রাজধানী (প্রবন্ধ)
শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ... ২৮১
কলির সন্ধ্যা (কবিতা) শ্রীবিষ্ণু সরস্বতী ... ২৭২
কৃষির উন্নতি (প্রবন্ধ) শ্রীসত্যশরণ সিংহ ... ১৯
কৃষি-সংস্কার ও ভূমির পুনর্বণ্টন (প্রবন্ধ)
শ্রীশ্যামাপদ চট্টোপাধ্যায় ... ১৭৭
ক্রন্দন (প্রবন্ধ) শ্রীলতিকা ঘোষ ... ৪০৯
ক্ষেতের মায়া (গল্প) শ্রীসুধীরচন্দ্র রাহা ... ৩৮০
খাতার ক'টি পাতা (গল্প) শ্রীসন্তোষকুমার দে ... ৬
খেলা-ধূলা—শ্রীক্ষেত্রনাথ রায় ৮৫, ১৭৩, ২৬২, ৩৫০, ৪৩৭
গান (কবিতা) শ্রীঅজিতকুমার মুখোপাধ্যায় ... ৪৫
গান (কবিতা (শ্রীমোহিনীমোহন বিশ্বাস ... ৩০৪
গীতায় অহিংসার আদর্শ (প্রবন্ধ)
শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৩৫৩
চলন্তিকা (কবিতা) শ্রীসুধাংশুকুমার হালদার ... ৮৪
চাওয়া ও পাওয়া (কবিতা) কুমারী চন্দ্রা রায় ... ১২৬
চিত্র-কথা ২৬৪, ৩৫২, ৪৪০
চীনে কম্যুনিষ্ট নেতা মাও সি-টাংগ (প্রবন্ধ)
শ্রীপ্রফুল্লরঞ্জন সেনগুপ্ত ... ৩০২
জমিদারী বিলোপ আইনের কার্যকারিতা (প্রবন্ধ)
শ্রীকালীচরণ ঘোষ ... ১০
জাহানারার আত্মকাহিনী (ঐতিহাসিক প্রবন্ধ)
অধ্যাপক শ্রীমাখনলাল রায়চৌধুরী ২৫, ২৩৬, ২৯৮, ৩৮৫, ৪৬০
জাগো (কবিতা) শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায় ... ৩০৪
ঝরিবে না আঁখি নীর (কবিতা)
শ্রীগোবিন্দপদ মুখোপাধ্যায় ... ৩৮৪
টাটকা ভাজা চানাচুর (গল্প) শ্রীদীপক গুপ্ত .. ২২
তারা ও আমরা (কবিতা) শ্রীনীলরতন দাশ ... ৬১৭
তোমার প্রেয়সী (কবিতা) শ্রীমণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ... ৫২
দয়াময়ী (কবিতা) শ্রীরামেন্দু দত্ত ... ১৩
দুখের দিনে (কবিতা) শ্রীনীহাররঞ্জন সিংহ . ৩৬
দুনিয়ার অর্থনীতি (আলোচনা)
অধ্যাপক শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৬, ১১৯
ধরা ও অধরা (কবিতা) শ্রীদেবেশচন্দ্র দাস .. ৩৭১
ধর্মানুষ্ঠানে মহাকাব্যের নারী (প্রবন্ধ) শ্রীসুনীতিকুমার পাঠক ৫০৩
ধ্বংসের মাঝে আছ কংস-অরি (কবিতা)
শ্রীরামেন্দু দত্ত ... ২৩১
নচিকেতার জয় (গল্প) শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বসু ... ১৮৯
নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী ৮৮, ১৭৬, ২৬৪, ৩৫২, ৪৪০, ৫২৬
নায়িকা মেনকা (গল্প) শ্রীফণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ... ১২৭
মুকুর মা (গল্প) শ্রীমণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৩৫৮
পথ (কবিতা) শ্রীসমর সরকার ... ২৪৫
পনেরোই আগষ্ট (নাটক) শচীন সেনগুপ্ত ৩০৫, ৩৯১, ৪৬৬
পরিভাষার পরিকল্পনা (প্রবন্ধ)
অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৬, ১৪৪
পশ্চিম বাংলার বাজেট (প্রবন্ধ)
অধ্যাপক শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৩৩৯
পশ্চিম বাংলার আর্থিক পুনর্গঠন (প্রবন্ধ) শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় ৫১১
পেনিসিলিন ও অন্যান্য অ্যান্টিসেপটিক (প্রবন্ধ)
ডাঃ শ্রীহরগোপাল বিশ্বাস . ১২২
পাষাণ মাতার স্তন্যপায়ী (কবিতা) শ্রীরামেন্দু দত্ত .. ২৭২

প্রমথনাথ রায়চৌধুরী (জীবনী) শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ ... ৩৭৭
প্রাগজ্যোতিষ (প্রবন্ধ) শ্রীবিমলাচরণ লাহা ... ৪৬২
প্রাচীন ভারতে গো-মাংস ভোজন ও পরবর্তীকালে
তাহার প্রতিষেধ (প্রবন্ধ) শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য ৪৮৮
ফাল্গুনী (কবিতা) শ্রীজ্যোৎস্নানাথ চন্দ ১৮০
ফেলারামবাবুর জল ও অগ্নি সমস্যা (গল্প) শ্রীশ্যামাপদ চট্টোপাধ্যায় ৪৪৬
বড়বাবু (গল্প) শ্রীক্ষেত্রগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ... ২৯৩
বজ্র ব্রহ্ম কৃষ্টি দূত (প্রবন্ধ) শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ৮১
বন্দেমাতরম্ (সংগীত)
সুর ও স্বরলিপি ॥ শ্রীদিলীপকুমার রায় ... ৩৬
বর্তমান চীন (প্রবন্ধ) শ্রীঅতুল দত্ত ... ৩২৫
বস্ত্রশিল্প ও ভারতবর্ষ (প্রবন্ধ) শ্রীসন্তোষকুমার রায়চৌধুরী ২৭৮
বাংলার গৌরব (প্রবন্ধ) শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র ... ৩৯১
বাংলার মঞ্চ ও চিত্র কোন পথে (প্রবন্ধ)
শ্রীঅরুণ চক্রবর্তী ১৫০
বাংলা চিত্রের কাহিনী (প্রবন্ধ) শ্রীঅরুণ চক্রবর্তী ... ২৪৩
বাঙ্গালী হিন্দু (প্রবন্ধ) শ্রীগোপেন্দ্রকৃষ্ণ দত্ত ... ২৪২
বাহির বিশ্ব (আলোচনা) শ্রীঅতুল দত্ত ১৫২
বিশ্বরূপ (কবিতা) শ্রীবিভুরঞ্জন গুহ ... ১৪৪
বিশ্ব ও বিশ্বনাথ (কবিতা) শ্রীআশুতোষ সান্যাল ... ১৪৩
বীরাঙ্গনা প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার (জীবনী)
শ্রীগোপালচন্দ্র রায় ... ৪৩
বুদ্ধ পূর্ণিমা (কবিতা) শ্রীরমা অধিকারী ... ৪১৫
বেলওয়ার তাম্রশাসনের দেশে (প্রবন্ধ)
শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত ১৪২, ৪০৬
বৈদিক সংস্কৃতির সার্বজনীনতা (প্রবন্ধ) শ্রীমতিলাল দাশ ... ১২৫
ব্রহ্মপুরের স্মৃতি (ভ্রমণ) শ্রীজনরঞ্জন রায় ... ২০৯
ভগবন্নামানি (প্রবন্ধ) শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য ... ২১
ভবঘুরে ব্যুরো (প্রবন্ধ) শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার ... ২৩৫
ভাস্কর (গল্প) ইন্দ্রধব ... ৪০
ভরসা রাখি (কবিতা) শ্রীবিভুরঞ্জন গুহ ... ৩৪
ভস্মাবশেষ (গল্প) শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ... ১৯৪
ভারতবর্ষে ইস্পাত প্রস্তুতের সম্ভাবনা (প্রবন্ধ)
শ্রীমোহিনীমোহন বিশ্বাস ... ৩৮৩
ভারতের মর্মবাণী ও গান্ধীজী (প্রবন্ধ) শ্রীরবীন্দ্রনাথ রায় ... ৪৫২
ভীমপলশ্রী (উপন্যাস) বনফুল ১৯, ৯৯
ভুজঙ্গ প্রয়াত (গল্প) শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৩৭৩
ভেক্‌চাল (গল্প) শ্রীকানাই বসু ... ১০৩
মন্দাক্রান্তা (গল্প) শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ... ২৮৪
মনুসংহিতা (প্রবন্ধ) শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ... ৪৮০
মহারাজ প্রতাপাদিত্য ইতিকথা বনাম ইতিবৃত্ত (প্রবন্ধ)
অধ্যাপক শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার ... ১
মহারাজ প্রতাপাদিত্য ইতিকথা বনাম ইতিবৃত্ত (আলোচনা)
শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ... ১৮৫
মহারাজ প্রতাপাদিত্য (আলোচনা) শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার ... ৩৮৮
মাটির মায়া (গল্প) শ্রীহরিরঞ্জন দাশগুপ্ত ... ৪৫৬
মাটির পুতুল (গল্প) শ্রীনীরেন্দ্র গুপ্ত ... ২০৭
মা নিষাদ (গল্প) শ্রীকালীপদ চট্টোপাধ্যায় ... ৪৮২
মানভূমের কথা (প্রবন্ধ) শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ... ৬২
মার্কস্ ও কৃষক (প্রবন্ধ) শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ ... ৪৪১
মৃত্যুর পারে (প্রবন্ধ) শ্রীতারকচন্দ্র রায় ... ৫০৫
মেঘ মুক্তি (কবিতা) শ্রীশান্তশীল দাশ ... ৫১৪
মোষ রাখালের বউ (গল্প) শ্রীগুরুদাস সরকার ২১২
মৌন-রাত্রি (কবিতা) শ্রীবটকৃষ্ণ দে ... ১২৬
মৌর্যসাম্রাজ্য ও অশোক (প্রবন্ধ) ডাঃ বিনয়চন্দ্র সেন ... ১০৬
যা বলেছি (কবিতা) শ্রীজ্যোৎস্নানাথ চন্দ ... ৯৩
যুযুৎসু কৌশল (ব্যায়াম) শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বসু ... ৪৯
যে ফুল না ফুটিতে (গল্প) শ্রীনীহাররঞ্জন চক্রবর্তী ... ২৭৩
রবিবার (কথিকা) সমরেশচন্দ্র রুদ্র .. ২৭০
রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা কবিতা (প্রবন্ধ) শ্রীঅখিল বিশ্বাস ৪৮৫
রাতের মেয়ে (কবিতা) শ্রীভোলানাথ ঘোষাল ... ৪৯৩
লালিত লতা (গল্প) শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৪৯৭
শব্দ প্রয়োগে অনবধানতা (প্রবন্ধ)
শ্রীদুর্গামোহন ভট্টাচার্য ... ১১৪
শারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়ন (প্রবন্ধ)
শ্রীসুবোধচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ৩৬৯
শাহিরাজ্যের পতন (প্রবন্ধ) শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার ... ৮৯
শিলালিপি (উপন্যাস)
শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ৫৭, ১৩৮, ১৮১, ৩২০, ৪১০, ৪৯০
শিশু মঙ্গল প্রদর্শনী (প্রবন্ধ) শ্রীসন্তোষকুমার রায়চৌধুরী ... ৪০৪
সংকলন ৬৯, ১৫৫, ২৪৬,
সন ১৩৫৬ সাল (জ্যোতিষ) জ্যোতি বাচস্পতি ... ৩৩১
সর্বহারী ও সবহারা (কবিতা) শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত ... ২৪৫
সাময়িকী ৭৭, ১৫৯, ২৪৮, ৩৪২, ৪২৬, ৫১৫
সুদর্শন (কবিতা) শ্রীবিষ্ণু সরস্বতী ৮০
সোমনাথের কবির প্রতি (কবিতা) শ্রীকালিদাস রায় ... ৫০৭
স্বাধীনতা লাভ ও অন্ন-সমস্যা (প্রবন্ধ) শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত ... ২০৫
স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম (ঐতিহাসিক প্রবন্ধ)
শ্রীগোকুলেশ্বর ভট্টাচার্য ৭১, ১৩৪, ২১৭, ৩১১, ৪১৬, ৫০৮
স্মরিলে তোমার পুরাতন পরিচয়ে (কবিতা)
শ্রীশচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ১৩৩
হে দেবী মানসী (কবিতা) শ্রীরাইহরণ চক্রবর্তী ৪৮৯

চিত্র-সূচী—মাসানুক্রমিক

পৌষ ১৩৫৫—বহুবর্ণ চিত্র—বিরহিনী যক্ষ-পত্নী ও এক রং চিত্র ১৮খানি
মাঘ " " সাওতালী মেয়ে ও এক রং চিত্র ২১খানি
ফাল্গুন " " মহুয়া, বিশেষ চিত্র—নয়া পট-চিত্রে মাতা ও এক রং চিত্র ২৫খানি
চৈত্র " " "কর্মরত অঙ্গে ক্লান্তি পড়ে উছলিয়া
রূপোদক রূপ-রাগে রহে মৌন হিয়া।"
বিশেষ চিত্র—পটচিত্রের নয়া সরমা ও একরং চিত্র ২১খানি
বৈশাখ ১৩৫৬—" গণেশ জননী, বিশেষ চিত্র আর্টের দাম কসাই ও এক রং চিত্র ১৫খানি
জ্যৈষ্ঠ " " 'কুলের নারীরে পথে করি অবরোধ
এ কি খেলা, হে কিশোর, কেন এ বিরোধ?'
বিশেষ চিত্র—মীন মোদক ও এক রং চিত্র ২১খানি

ভারতবর্ষ

পৌষ—১৩৫৫

Public Library
Accn. No ১২৯৪৫ Date ১৮ ২২

দ্বিতীয় খণ্ড | ষটত্রিংশ বর্ষ | প্রথম সংখ্যা

মহারাজ প্রতাপাদিত্য—ইতিকথা—বনাম ইতিবৃত্ত

অধ্যাপক শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার এম-এ, পিএচ্-ডি,

বিগত ২৩শে মে কলিকাতায় মহা সমারোহে মহারাজ প্রতাপাদিত্যের জয়ন্তী উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। এই উপলক্ষে কর্তৃপক্ষ আমাকে ঐ সভায় যোগদান করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। আমি তাহার উত্তরে বলিয়াছিলাম যে, যে মনোভাব লইয়া এই উৎসব হইতেছে তাহার মূলে কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই, কারণ প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে সাধারণের মধ্যে যে ধারণা প্রচলিত তাহা প্রকৃত ইতিহাসের সম্পূর্ণ বিরোধী। বাংলার স্বাধীনতার জন্য বীর প্রতাপাদিত্য মুঘল (মোগল)-দের বিরুদ্ধে কিরূপ সংগ্রাম ও আত্মবলিদান করিয়াছিলেন তাহারই স্তুতিগান পূর্বক এই বীরের প্রতি পূজা ও শ্রদ্ধার অঞ্জলি দেওয়াই উক্ত উৎসবের উদ্দেশ্য। কিন্তু এই পূজা প্রতাপাদিত্যের প্রাপ্য নহে। কারণ বাংলার স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করা তো দূরের কথা প্রতাপাদিত্য মুঘল বাদশাহের পদানত হইয়াছিলেন এবং বাংলার যে সমুদয় বীর হিন্দু ও মুসলমান জমিদারগণ মুঘলের অধীনতা স্বীকার করেন নাই মুঘল রাজকে তাঁহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য সহায়তা করিয়াছিলেন। দেশের স্বাধীনতার জন্য যাঁহারা সংগ্রাম করেন, তাঁহারা চিরদিনই নমস্য এবং এই প্রকার বীরের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করা জাতির পক্ষে কল্যাণকর; কিন্তু যে দেশ বা জাতি সুপরিচিত ঐতিহাসিক তথ্য তুচ্ছ করিয়া প্রকৃত বীরের প্রতি সম্মান না দেখাইয়া অযোগ্যকে বীরের আসনে বসাইয়া পূজা করে তাহার ভবিষ্যৎ খুব আশাপ্রদ নহে। যে সমুদয় বাঙ্গালী এই উৎসবে যোগদান করিবেন, অপ্রিয় সত্য শুনিবার ও বিচার করিবার মত ধৈর্য্য ও সৎসাহস তাঁহাদের নাই। যদি কেহ প্রকৃত তথ্য জানাইতে চায় তবে তাহার অদৃষ্টে অনেক লাঞ্ছনাই (মানসিক তো বটেই দৈহিক হওয়াও অসম্ভব নহে) ঘটিবে। এই সমুদয় আলোচনা করিয়া আমি এই উৎসবে যোগদান করিবার নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে অসম্মত হইলাম। যিনি

আমাকে নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়াছিলেন তিনি কয়েকদিন পরে আসিয়া আমাকে জানাইলেন যে, এই বিষয়টি বিচার করিবার জন্য কয়েকজন ঐতিহাসিককে লইয়া একটি সমিতি গঠিত হইবে এবং আমাকে এই সমিতির সভ্য হইতে অনুরোধ করিলেন। আমি উহাতে সম্মত হইলাম। তাহার পর চারিমাস অতীত হইয়াছে। এই সমিতির বিষয় আর কিছু শুনি নাই। এই জন্যই এ সম্বন্ধে কিছু লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

প্রতাপাদিত্য জয়ন্তী উৎসব সম্বন্ধে অমৃতবাজার পত্রিকায় একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও সুদীর্ঘ সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশিত হয়। ইহা অবলম্বন করিয়া আমরা প্রথমে প্রতাপাদিত্যের ইতিকথা সংকলন করিব। ইতিকথার অর্থ 'যাহা সাধারণে প্রচলিত কিন্তু অলীক ও অনৈতিহাসিক।' ইহার পর প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে সমসাময়িক বিবরণীতে যে ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায় তাহার উল্লেখ করিব।

১। ইতিকথা

উৎসব সভায় শিক্ষা বিভাগের মন্ত্রী শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী বলেন : প্রতাপাদিত্য বাংলাদেশ পরাধীনতার শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিবার জন্য বাংলার হিন্দু, মুসলমান ও অন্যান্য সম্প্রদায়কে তাঁহার পতাকাতলে একত্রিত করেন। মুঘল সেনাপতি মানসিংহ তাঁহাকে পরাজিত করেন—কিন্তু মুঘলের শক্তি অপেক্ষা বিশ্বাসঘাতকতাই এই পরাজয়ের জন্য অধিকতর দায়ী। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু বলেন : মহারাজা ছিলেন একজন বিপ্লবী (revolutionary)। তিনি বাংলার স্বাধীনতার জন্য মুঘল রাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন —যেমন আজাদ হিন্দ ফৌজ ১৯৪২ ও ১৯৪৪ সনে করিয়াছিল। তিনি বাংলায় স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন।

অমৃতবাজার সম্পাদকীয় স্তম্ভে উক্ত হইয়াছে, "অনেকে মনে করেন যে, সিরাজউদ্দৌল্লাই বাংলার স্বাধীন রাজা। কিন্তু ইহা সত্য নহে—কারণ তিনি অন্তত নামে মুঘল বাদসাহের অধীনতা স্বীকার করিতেন। প্রকৃতপক্ষে বাংলার শেষ স্বাধীন রাজা ছিলেন মহারাজ প্রতাপাদিত্য। কারণ তিনি সম্পূর্ণরূপে দিল্লীর বাদশাহের অধীনতা পাশ ছিন্ন করিয়াছিলেন। তিনিই আমাদের দেশে সর্ব্বশেষ স্বাধীনতার পতাকা উড়াইয়াছিলেন। তিনি (রেইনী সাহেবের মতে) এত শক্তিশালী হইয়াছিলেন যে, বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা, এমন কি আসামের সকল রাজাই তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিত। বাল্যকাল হইতেই প্রতাপাদিত্য বাংলা দেশকে মুঘলের অধীনতা হইতে মুক্ত করিবার স্বপ্ন দেখিতেন। মুঘল সম্রাট তাঁহার বিরুদ্ধে অনেকবার সৈন্য পাঠান কিন্তু প্রতিবারই তাঁহারা পরাজিত হয়। এইরূপে মুঘল বাদসাহের ২৫ জন সেনাপতি প্রতাপাদিত্যের হস্তে পরাস্ত হন। অবশেষে মানসিংহ তাঁহাকে যুদ্ধে হারাইয়া বন্দী করেন এবং একটি লোহার খাঁচায় পুরিয়া দিল্লী লইয়া যান। পথে বারাণসীতে তাঁহার মৃত্যু হয়।

২। ইতিবৃত্ত

বাংলার শেষ পাঠান সুলতান দায়ুদ খাঁ ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে আকবরের হস্তে পরাজিত ও নিহত হন। কিন্তু তথাপি বঙ্গদেশ মুঘলের অধীনতা স্বীকার করে নাই। তখন বাংলাদেশে অনেক জমিদার ছিলেন। ইঁহারা সাধারণত বার ভুঁইয়া নামে পরিচিত। ইঁহাদের কেহ কেহ অতুল সাহসে দুর্দ্ধর্ষ মুঘল শক্তির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন। আকবরের জীবিতকালে তিনি বহু চেষ্টা করিয়াও ইঁহাদিগকে দমন করিতে পারেন নাই। জাহাঙ্গীরের রাজত্বের প্রথম ভাগে বাংলার পাঠান ওমরাহ এবং হিন্দু ও মুসলমান জমিদারগণ মুঘলকে বিশেষ বিপর্য্যস্ত করিয়াছিলেন। ১৬০৫ অব্দে মানসিংহ বাংলার শাসনকর্ত্তা ছিলেন। পর বৎসর কুৎবুদ্দিন খাঁ তাঁহার স্থলে নিযুক্ত হন। কিন্তু ১৬০৭ অব্দে সের আফগানের সহিত যুদ্ধে তিনি নিহত হন। তাহার পর জাহাঙ্গীর কুলীখান বাংলার শাসনকর্তা হন। কিন্তু শীঘ্রই তাঁহারও মৃত্যু হয়। তখন বাংলা দেশের বিদ্রোহীদিগকে দমন করিবার জন্য সম্রাট জাহাঙ্গীর ইসলাম খাঁ নামক একজন সুযোগ্য ব্যক্তিকে বাংলার শাসনকর্ত্তা করিয়া পাঠান। এই ইসলাম খাঁই বাংলাদেশে মুঘলের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করেন এবং প্রতাপাদিত্য ও বাংলার অন্যান্য জমিদারদিগকে দমন করেন।

মিরজা নাথান নামে ইসলাম খাঁর এক সেনানায়ক ছিলেন এবং তিনিই যুদ্ধে প্রতাপাদিত্য ও অন্যান্য কয়েকজন জমিদারকে পরাজিত করেন। মিরজা নাথান

'বহারিস্তান-ই-খয়বী' নামক একখানি গ্রন্থে এই সময়কার বাংলাদেশের বিস্তৃত বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। এই সমসাময়িক গ্রন্থই এই যুগের বাংলার ইতিহাসের পক্ষে সব চেয়ে প্রামাণিক ও বিশ্বাস যোগ্য। সুতরাং এই গ্রন্থ হইতে আমরা প্রতাপাদিত্যের ইতিহাস সঙ্কলন করিতেছি। এই গ্রন্থে পর পর যেরূপ ঘটনা বিবৃত হইয়াছে তাহার সারমর্ম্ম নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

ইসলাম খাঁ সম্রাট জাহাঙ্গীরকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, বাংলাদেশ দমন করিতে হইলে দিল্লী হইতে উপযুক্ত সেনাপতির অধীনে বিরাট নৌবাহিনী, সৈন্য ও আগ্নেয়াস্ত্র পাঠান দরকার। তদনুসারে জাহাঙ্গীর ইতিমান খাঁকে বঙ্গদেশে পাঠাইলেন। ইতিমান রাজমহলে আসিয়া ইসলাম খাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। ইসলাম খাঁ তখন মুসা খাঁ ও ভাটির অন্যান্য বিদ্রোহী জমিদারগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ব্যবস্থা করিলেন। যুদ্ধযাত্রার দিন রাজা প্রতাপাদিত্যের পুত্র সংগ্রামাদিত্য বহু উপঢৌকন লইয়া রাজমহলে ইসলাম খাঁর দরবারে উপস্থিত হইলেন। স্থির হইল যে, বাদসাহের অনুগত রাজা প্রতাপাদিত্য আলাইপুরে সসৈন্যে আসিয়া ইসলাম খাঁর সহিত যোগ দিবেন। সংগ্রামাদিত্য ইসলাম খাঁর সৈন্যের সঙ্গে অগ্রসর হইলেন। আত্রেয়ী নদীর তীরে শাহপুর থানার অপর পাড়ে রাজা প্রতাপাদিত্য স্বয়ং আসিয়া ইসলাম খাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। বিদ্রোহী জমিদারেরা যাহাতে প্রতাপাদিত্যের দৃষ্টান্তে মুঘলের বশ্যতা স্বীকার করে তাহার জন্য ইসলাম খাঁ প্রতাপাদিত্যকে সসম্মানে অভ্যর্থনা করিলেন ও বহু উপঢৌকন দিলেন। মুসা খাঁ ও বাংলার অন্য ১২ জন বিদ্রোহী জমিদারের বিরুদ্ধে ইসলাম খাঁ যে যুদ্ধযাত্রা করিবেন রাজা প্রতাপাদিত্য তাহাতে যোগ দিতে সম্মত হইলেন। এই বিষয়ে প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে পাকাপাকি বন্দোবস্ত হইল। স্থির হইল যে প্রতাপাদিত্য নিজ রাজ্যে ফিরিলেই তাঁহার পুত্র সংগ্রামাদিত্য ৪০০ রণতরী সহ মুঘল নৌ সেনাধ্যক্ষের সহিত যোগ দিবেন। তারপর যখন ইসলাম খাঁ ভাটিতে যুদ্ধ যাত্রা করিবেন তখন প্রতাপাদিত্য স্বয়ং আরও একশত রণতরী, বিশ হাজার পদাতিক সৈন্য এবং এক হাজার মণ গোলাগুলি লইয়া আড়িয়াল খাঁ নদী দিয়া শ্রীপুর ও বিক্রমপুরে মুসা খাঁ প্রভৃতি বিদ্রোহী জমিদারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবেন। ইহার পরিবর্ত্তে প্রতাপাদিত্য নিজের জমিদারিতে বহাল থাকিবেন এবং যুদ্ধের ব্যয়ের জন্য শ্রীপুর ও বিক্রমপুর পরগণার রাজস্ব পাইবেন।

যখন ইসলাম খাঁ ভাটিতে যুদ্ধ করিতে গেলেন তখন প্রতাপাদিত্য উপরোক্ত সর্ত্ত অনুযায়ী সাহায্য পাঠাইলেন না। কিন্তু যখন ইসলাম খাঁ ভাটির জমিদারগণকে পরাস্ত করিলেন তখন প্রতাপাদিত্য অত্যন্ত ভীত ও অনুতপ্ত হইয়া স্বীয় পুত্র সংগ্রামাদিত্যকে ৮০খানি রণতরীসহ ইসলাম খাঁর নিকট পাঠাইলেন এবং নিজের অপরাধের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। কিন্তু ইসলাম খাঁ এই স্তোকবাক্যে ভুলিলেন না। প্রতাপাদিত্যকে শাস্তি দিয়া যশোহর অধিকারের জন্য তিনি ঘিয়াস খাঁর অধীনে একদল সৈন্য ও অনেক রণতরী পাঠাইলেন। মুঘল সৈন্য যশোর রাজ্যের নিকট পৌছিলে রাজা প্রতাপাদিত্য তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র উদয়াদিত্যকে শালকা নামক স্থানে পাঠাইলেন। খাজা কমোবাল (কমল) পাঁচ শত রণতরী এবং জামাল খাঁ এক সহস্র অশ্বারোহী ও ৪০টি হাতী লইয়া তাঁহার সঙ্গে গেল। উদয়াদিত্য এখানে এক সুরক্ষিত দুর্গ তৈরী করিলেন। ইহার একদিকে নদী আর দুইদিকে বিস্তৃত জলভূমি ছিল। চতুর্থ দিকে পরিখা খনন করিয়া তিনি ইহাকে দুর্ভেদ্য করিয়া তুলিলেন। মুঘল সৈন্য এই দুর্গ আক্রমণ করিল। 'বহারিস্তান-ই-ঘয়বী' গ্রন্থের প্রণেতা এবং ঘিয়াস খাঁর পুত্র মিরজা নাথান এই যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন এবং ইহার বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন। প্রথমে নৌ-যুদ্ধ হয় উদয়াদিত্য ও খাজা কমল তাহাদের রণতরী লইয়া মুঘলদের ক্ষুদ্র নৌবহর আক্রমণ করেন। মুঘল সৈন্য তীর হইতে কামান বন্দুক ছাড়ে। ফলে খাজা কমলের মৃত্যু হয় এবং উদয়াদিত্য তৎক্ষণাৎ নদীপথে নৌকাযোগে পলায়ন করেন। ৪খানি বাদসাহী কুষা (নৌকা)। তাহার পশ্চাদ্ধাবন করে। উদয়াদিত্যের বৃহৎ মহলগিরি নৌকা শত্রুরা ধরিয়া ফেলে। তখন উদয়াদিত্য দুই হাতে তাঁহার দুই স্ত্রীকে ধরিয়া একখানি ছোট নৌকায় লাফ দিয়া পড়েন—এবং মাঝিরা প্রাণপণে দাঁড় টানিয়া শত্রুর নৌকা পশ্চাতে ফেলিয়া অগ্রসর হয়। উদয়াদিত্যের রণতরীর মধ্যে মাত্র ৪২খানি রক্ষা পায়। অবশিষ্ট রণতরী ও কামান বন্দুক মুঘলের

হাতে পড়ে এবং উদয়াদিত্যের সৈন্য শালকা দুর্গ ত্যাগ করিয়া পলাইয়া যায়।

এই পরাজয়ের পরে প্রতাপাদিত্য মিরজা নাথানের নিকট দূত মুখে বলিয়া পাঠাইলেন; "আপনার পিতা আমাকে পুত্র বলিয়া সম্বোধন করেন—সুতরাং আপনি আমার ভাই। আপনি ঘিয়াস খাঁর সহিত আমার সাক্ষাতের বন্দোবস্ত করিয়া দিন।" তদনুসারে মিরজা নাথান পিতাকে অনুরোধ করায় মুঘল সৈন্য আর অগ্রসর হইল না এবং ঘিয়াস খাঁ প্রতাপাদিত্যকে বলিয়া পাঠাইলেন "যদি তুমি সত্য সত্যই সন্ধি করিতে চাও, তবে কাল আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবে। নচেৎ পরদিনই আমি যশোর যাত্রা করিব।" প্রতাপাদিত্য গোপনে যশোর হইতে দূরে একটি দুর্গ তৈরী করিয়া আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করিতেছিলেন এবং কিছুদিন সময় পাইবার জন্যই মুঘল সেনাপতির সহিত কথাবার্ত্তা চালাইতেছিলেন। সুতরাং তিনি নানা ছলে দেরী করিতে লাগিলেন। অবশেষে তৃতীয় দিনে মুঘল সেনাপতি আবার সৈন্যসহ যশোর অভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

প্রতাপাদিত্য কাগরঘাটা খালের পারে জলবেষ্টিত এক সুদূর দুর্গে আশ্রয় লইলেন। মুঘলেরা এই দুর্গ আক্রমণ করিল। প্রতাপাদিত্য বীর বিক্রমে যুদ্ধ করিয়াও পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিলেন এবং ভগ্ন হৃদয়ে যশোরে পৌঁছিলেন। তারপর উদয়াদিত্যের সহিত পরামর্শ করিয়া আর যুদ্ধে অনর্থক লোকক্ষয় না করিয়া আত্মসমর্পণ করাই স্থির করিলেন। তার পর দুইজন কর্ম্মচারী লইয়া তিনি নৌকাযোগে ঘিয়াস খাঁর শিবিরে উপস্থিত হইলেন। ঘিয়াস খাঁ তাঁহাকে সসম্মানে অভ্যর্থনা করিলেন। স্থির হইল যে উভয় পক্ষের যুদ্ধ স্থগিত থাকিবে এবং ঘিয়াস খাঁ প্রতাপাদিত্যকে জাহাঙ্গীর নগরে (ঢাকা) সুবাদারের নিকট লইয়া যাইবেন। তার পর সুবাদার যেরূপ আদেশ দিবেন সেইরূপ ব্যবস্থা হইবে।

ঘিয়াস খাঁ প্রতাপাদিত্যকে লইয়া ঢাকা পৌঁছিলেন এবং প্রতাপাদিত্য ইসলাম খাঁর বশ্যতা স্বীকার করিলেন। কিন্তু ইসলাম খাঁ তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিলেন এবং যশোরের শাসনভার ঘিয়াস খাঁর উপর দিলেন। তাঁহার পরিণাম সম্বন্ধে বহারিস্তানে আর কোন সংবাদই নাই। কেবল প্রসঙ্গক্রমে অন্যত্র উল্লিখিত হইয়াছে যে ইব্রাহিম খাঁ ফতেজং বাংলার শাসনকর্ত্তারূপে নিযুক্ত হইয়াই বাদশাহের নিকট প্রস্তাব করিলেন যে কুচবিহারের রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ ও পরীক্ষিৎনারায়ণ এবং যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্যের পুত্রগণকে দিল্লী হইতে বাংলায় ফিরাইয়া পাঠাইয়া পুনরায় তাহাদের জমিদারিতে বহাল করা হউক। ইহার ফলে বাদশাহ লক্ষ্মীনারায়ণ ও পরীক্ষিৎ নারায়ণকে বাংলায় পাঠাইলেন ও তাহাদের জমিদারী ফিরাইয়া দিলেন—কিন্তু প্রতাপাদিত্যের পুত্রগণের সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা হইল তাহার কোন উল্লেখ নাই। ইহা হইতে অনুমিত হয় যে প্রতাপাদিত্যের পর তাঁহার পুত্রগণ দিল্লীতে প্রেরিত হইয়াছিলেন—এবং তাঁহারা আর পিতৃরাজ্য ফিরিয়া পান নাই।

৩। উপসংহার

বহারিস্তানের বিবরণ পুরাপুরি সত্য নাও হইতে পারে। গ্রন্থকার মুসলমান সেনানায়ক, সম্ভবত বিদ্রোহী জমিদারগণের যুদ্ধ প্রচেষ্টা ও বীরত্বের সমুচিত মর্য্যাদা দেন নাই। কিন্তু প্রতাপাদিত্যের সহিত মুঘল বাদশাহের কি সম্বন্ধ ছিল এবং কি কারণে ও কিরূপে তাঁহার পতন হয় সে সম্বন্ধে বহারিস্তানের কাহিনী যে সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য ঐতিহাসিক মাত্রেই তাহা স্বীকার করিবেন। এই কাহিনীর সহিত পূর্ব্বোক্ত ইতিকথার সামঞ্জস্য কতটুকু পাঠকমাত্রেই তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন।

প্রথমত প্রতাপাদিত্য বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা আসামের অধিপতি ছিলেন না, বাংলার এক ক্ষুদ্র ভূখণ্ডে তাঁহার রাজ্য সীমাবদ্ধ ছিল। বঙ্গদেশের দক্ষিণ অংশ (অর্থাৎ মোটামুটি পূর্ব্বেকার প্রেসিডেন্সী বিভাগ) ভাটি নামে অভিহিত হইত। এই ভাটিতে যে প্রতাপাদিত্যের ন্যায় আরও অনেক জমিদার ছিলেন বহারিস্তানে তাঁহাদের উল্লেখ আছে। সুতরাং প্রতাপাদিত্যের রাজ্য অবিভক্ত বঙ্গদেশের যশোর, খুলনা ও চব্বিশ পরগণার কতক অংশে সীমাবদ্ধ ছিল।

দ্বিতীয়ত তিনি স্বাধীন রাজা ছিলেন না, প্রকাশ্যে মুঘলের বশ্যতা স্বীকার করিতেন। বাংলা দেশ পরাধীনতার

নাই। তিনি বিপ্লবী ছিলেন না, স্বাধীনতার পতাকাও উড়ান নাই এবং তাঁহার পতাকার তলে বিভিন্ন সম্প্রদায় একত্রিত হন নাই। বরং তিনি বাংলার অন্যান্য স্বাধীন জমিদারগণের বিরুদ্ধে মুঘলকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন।

তৃতীয়তঃ তিনি ২৫ বার তো দূরের কথা একবারও কোন মুঘল সেনাপতিকে পরাস্ত করিয়াছিলেন ইহার কোন প্রমাণ নাই।

চতুর্থত তিনি মানসিংহের হস্তে পরাজিত ও বন্দী হন নাই। বস্তুত তাঁহার পরাজয়ের সময় মানসিংহ বাংলা দেশেও ছিলেন না।

প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে প্রচলিত কাহিনী যে প্রকৃত ইতিহাস হইতে কত বিভিন্ন আশা করি সকলেই তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন। প্রশ্ন হইতে পারে যে এইরূপ অলীক জনশ্রুতি সর্ব্বসাধারণে প্রাধান্য লাভ করিল কেন? ইহার উত্তর দেওয়া শক্ত নহে। ভারতচন্দ্রের "অন্নদামঙ্গল" ও রামরাম বসুর "রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র" এই দুইখানি গ্রন্থে প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে যে অদ্ভুত কাহিনী আছে তাহাই লোকে সত্য ঘটনা বলিয়া বিশ্বাস করায় এই প্রকার অনর্থ ঘটিয়াছে। বস্তুত প্রতাপাদিত্যের সমসাময়িক বাংলার কয়েকজন জমিদার প্রকৃতই মুঘল বাদশাহের অধীনতা অস্বীকার করিয়া বহুদিন পর্য্যন্ত মুঘলের বিরুদ্ধে বীরের ন্যায় যুদ্ধ করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে কেদার রায়, ঈশা খাঁ, ও ওসমান খাঁর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শেষোক্ত দুইজন মুসলমান হইলেও বাঙ্গালী হিসাবে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার জন্য দিল্লীর মুসলমান বাদশাহের সঙ্গে অকুতোভয়ে যুদ্ধ করিয়াছেন। যদিও বাঙ্গালী জাতি বা বাংলা দেশের স্বাধীনতা তাঁহাদের কাহারও লক্ষ্য ছিল না তথাপি আজ স্বাধীন ভারতে ইঁহারা বীরত্ব ও স্বাধীনতা প্রীতির জন্য পূজা পাইবার যোগ্য। কিন্তু ইঁহাদের কথা বিস্মৃত হইয়া উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে চাপাইয়া যাঁহারা প্রতাপাদিত্যের জয়ন্তী উৎসব করিতেছেন তাঁহারা বাংলার মুখে কলঙ্কের কালিমা লেপন করিতেছেন।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে উপরে প্রতাপাদিত্যের যে প্রকৃত ইতিহাস বর্ণিত হইল তাহাতে নূতন কথা কিছুই নাই। বহারিস্তান গ্রন্থের আবিষ্কার করিয়া সার যদুনাথ সরকার প্রবাসী পত্রিকায় এ বিষয়ে আলোচনা করেন—সে প্রায় ৩০ বৎসর আগেকার কথা। তারপর ৺নলিনীকান্ত ভট্টশালী ২০ বৎসর আগে 'Bengal Past and Present' নামক পত্রিকায় প্রতাপাদিত্যের প্রকৃত ইতিহাস বর্ণনা করেন। ১২ বৎসর পূর্ব্বে বহারিস্তানের সম্পূর্ণ ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় বাংলার শিক্ষিত সম্প্রদায় এ সমুদয়ের এবং অন্যান্য নানা গ্রন্থে ও প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে যাহা প্রকাশিত হইয়াছে তাহার কোন সন্ধানই রাখেন না। তাঁহারা পূর্ব্ব সংস্কার ও প্রচলিত কাহিনীতেই বিশ্বাস করেন, ঐতিহাসিক ব্যাপারেও ইতিহাস আলোচনা বা ঐতিহাসিকের পরামর্শ গ্রহণ করা প্রয়োজনীয় মনে করেন না। বাংলা দেশের পরম দুর্ভাগ্য এই যে শিক্ষা বিভাগের মন্ত্রী, প্রসিদ্ধ জননায়ক শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু এবং অমৃতবাজার পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদকের ন্যায় শীর্ষস্থানীয় লোকেরাও এই দলভুক্ত। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, মিথ্যার ভিত্তির উপর কোন জাতির শক্তি ও মহত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। বাংলা দেশের অতীত গৌরব জানিতে হইলে—বাংলা দেশের ইতিহাস জানিতে হইবে—ইতিকথা বা উপকথার আশ্রয় লইলে চলিবে না। বাংলা দেশে সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় এই সমুদয় অযোগ্য বীরের পূজার প্রচলন হইতেছে—এই জন্যই এই সম্বন্ধে একটু কঠোর মন্তব্য করিতে হইল। আশা করি কেহ ইহাকে ব্যক্তিগত আক্রমণ মনে করিয়া ক্ষুব্ধ হইবেন না।

খাতার ক'টি পাতা

শ্রীসন্তোষকুমার দে

ওঃ, ঘুমিয়ে যে কি আরাম, তা বোধ হয় এর আগে এমন করে কোনদিন অনুভব করিনি। বোম্বাই হতে দুর গুর্জরের বেট দ্বীপ, ফের বেট দ্বীপ হতে ওখা, দ্বারকা, জামনগর রাজকোট হয়ে ঝিমুতে ঝিমুতে যেদিন আমেদাবাদে পৌছুলাম তখনই আমার অবস্থা কাহিল। আমেদাবাদে বড়দা ছিলেন, গিয়ে শুনি দাঙ্গার গণ্ডগোলে তিনি ছুটি নিয়ে বৌদিদের দেশে রাখতে গেছেন। দেশে মানে বাংলা দেশে। From frying pan to fire কথাটা বড়দার মনে ছিল কিনা জানি না। যাক সে কথা, কিন্তু আমার যে একটা হিল্লে হওয়া দরকার। ছোড়দা থাকেন অমরাবতী, প্রায় দুই দিনের রাস্তা, সেখানে যাব কি যাব না ইতস্তত করছি, এমন সময় শহরে আবার আগুন লাগল। মহাত্মা গান্ধী রোড দিয়ে যাচ্ছিলাম, সহসা বিষম শব্দ, লোকজনের ছুটাছুটি। প্রথমে আমিও আশ্রয়ের সন্ধানে ছুটেছিলাম, কিন্তু অচিরেই কৌতূহল দমন করতে না পেরে অকুস্থলে গেলাম।

একটি টংগা হ'তে দুজন লোক নামছিল, তাদের কাছে ছিল হাত বোমা, পড়ে গিয়ে ফেটে একজনের ভবলীলা সেখানেই সাঙ্গ হয়ে গেছে, আর একজনের অবস্থাও শঙ্কটজনক। দুটি দেহই নিয়ে গেল পুলিসে। পড়ে রইল রাস্তায় অনেকখানি রক্ত আর তার মধ্যে জড়াজড়ি করে দুটি টুপি—দুরকমের। রক্তের মধ্যে ওই দুটি টুপি গোটা ভারতবর্ষের চেহারার প্রতীকের মতো দেখাতে লাগল। কলকাতা—নোয়াখালি—বিহারের ঘটনা চোখে দেখি নি, এতোখানি নররক্ত জীবনে কোনদিন দেখিনি, এই ঘটনা দেখে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেলাম।

হাওয়ার বেগে ছুটে গেল দুঃসংবাদ নানাভাবে পল্লবিত হয়ে। তারই প্রতিধ্বনি ঘটল দুচারটা—উত্তরে দক্ষিণে। সন্ধ্যা আটটা হতে সান্ধ্য আইন চলছিল সহরে, সেটা বর্দ্ধিত হয়ে মহরম উৎসবের সময়টায় ছত্রিশ ঘণ্টাব্যাপী কারফিউ অর্ডার জারি হয়ে গেল। সুতরাং আমেদাবাদে থাকা দুষ্কর হয়ে উঠল।

গেলাম সবরমতী আশ্রমে, হৃদয়কুঞ্জে প্রণাম জানিয়ে আসবার আকাজ্ক্ষা ছিল। হৃদয়কুঞ্জ সেই কুটির, মহাত্মা গান্ধী যেখানে দশ দশটা বছর বাস করেছিলেন। ভারতের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল একদা এই বালুকাবিস্তৃত বেলাভূমিতে, উন্মুক্ত আকাশের নীচে প্রার্থনা সভায়, এই নদীমুখী কুটিরে। ধূলা তুলে মাথায় দিলাম, অনেকক্ষণ ধরে দেখলাম দাণ্ডীযাত্রার একখানি রঙিন চিত্র—হৃদয়কুঞ্জের দেওয়ালে লাগানো।

পূর্ণ হৃদয়ে আশ্রম ত্যাগ করে চলে এলাম। ছোড়দার কাছেই যাই। কাছের টাকা পয়সা ফুরিয়ে এসেছে, তাছাড়া এই দুর্যোগময় দিনে যত্র তত্র ঘুরে বেড়ানোর দুর্ভোগও চরমে উঠেছে। অমরাবতীর উদ্দেশ্যে গাড়ীতে চাপলাম আমেদাবাদে।

আমেদাবাদ হতে সুরাট, সুরাট হতে ভুষাওয়াল, ভুষাওয়াল হতে বান্দেরা, তারপর আর একটি মাত্র ষ্টেশন, গাড়ী বদলে ভোরবেলায় এলাম অমরাবতী।

বলা যত সহজ হ'ল, ব্যাপারটা তত সহজ হয়নি। সমস্তটা পথ বিষম ভীড়। একটার পর একটা রাত চলে গেল—ঘুম নেই। একটার পর একটা দিন চলে গেল, খাবার নেই। ঘুম ও খাওয়ার অভাবের চেয়ে তীব্র বোধ হ'তে লাগল, কতদিন যে স্নান নেই। সেই যে সপ্তাহের গোড়াতে বেট দ্বীপ পার হয়ে ওখা বন্দরে আরব সমুদ্রের জলের স্বাদ নিতে নেমেছিলাম, সেই লোনা জলের গুড়া আমার প্রতি রোমকূপে লেগে আছে, লেগে আছে চুলের জটায়। ধূলিতে, ধোঁয়ায়, কয়লার গুড়ায়, সিগারেটের ছাইয়ে আর এতদ্দেশের শাখা আরোহী স্বভাবের যাত্রীদের সহজগতি-বাঙ্কে-আরোহণ-সমারোহে কত মহাজনের পদধূলিতে অভিষিক্তা সেই জটাজাল। একমাত্র সান্ত্বনা সবরমতী আশ্রমের ছায়াটুকু; যেখানে তৃপ্তিতে প্রণাম করে মাটি তুলেছিলাম মাথায়। কিন্তু সে তো সাধারণ ধূলি নয়, বালি। ঝরে পড়ে নি কি এতদিনের এই অত্যাচারে?

খুঁজতে খুঁজতে পেলাম ছোড়দার ঘর। বৌদি তো দেখে চিনতেই পারেন না। ওমা, একি চেহারা হয়েছে গো! তারপর চা এনে দিলেন, কুশল প্রশ্ন করতে লাগলেন।

আমি বললাম, চা না দিয়ে যদি এক বালতি জল দিতে, আর এক টুকরা সাবান—তাতে আমি স্নান করে বাঁচতাম। আমার বিষম ঘুম পাচ্ছে, বসতে পারছি না।

বৌদি বললেন—তা আমি চেহারা দেখে বুঝেছি। চাটুকু খাও, আমি স্নানের জন্য গরম জল দিচ্ছি।

আমার চা খাওয়ার মধ্যে বৌদির চাকর 'হাজাম' ডেকে নিয়ে এলো। এদেশি পরামাণিক। বৌদি বল্লেন—শুধু দাড়ি কামানো নয়, বাবুর চুলটাও ভালো করে ছেটে দে দিকি।

বাংলার বধূ, এসেছেই না হয় মধ্যভারতের ধূলিজীর্ণ শহরে। তবু সেই স্নেহটাই উপচে উঠছে—যা নারিকেল ছায়াবীথি দিয়ে জলকুম্ভ কক্ষে নিয়ে আসা পল্লীনারীর পক্ষেই শোভন হয়।

চুল কেটে, দাড়ি কামিয়ে, সাবান মেখে স্নান করে, 'ভাত' খেয়ে যখন বিছানার কাছে এলাম, তখন মনে হল স্বর্গলাভের আনন্দ বোধ হয় এর চেয়ে বেশী নয়। নিদ্রার আকাঙ্ক্ষায় আমার প্রতি অণু পরমাণু তখন ব্যাকুল হয়ে আছে।

ঘুমালাম, পড়ে পড়ে খুব ঘুমালাম। দু ঘণ্টা, চার ঘণ্টা, যতক্ষণ খুশী। শেষের দিকে জেগে জেগে স্বপ্ন দেখেও ঘুমালাম। যখন উঠলাম, তখন বেলা পড়ে গেছে।

কাছেই চেয়ারের হাতলে রেখেছিলাম ধূলিবিমলিন হাফ সার্টটা, তার পকেটে আমার প্রাণপ্রিয় সিগারেট। এ সিপ এণ্ড এ পাফ্"—জীবনের অর্থ জানিয়ে দেয়। 'সিপটা' অভ্যাস করিনি, সামর্থ্যেও কুলায় না। কিন্তু 'পাফ্'! সিগারেটের সূক্ষ্ম ধোঁয়া যখন মোলায়েম রেশমি রুমালের মতো ধীরে ধীরে বায়ুস্তর ভেদ করে কুণ্ডলায়িত হ'তে থাকে তখন আমার মেজাজে, আমার মগজেও যেন পর্দার পর পর্দা খুলে যায়। সাহিত্য চর্চা যদি করতাম—আমার নাকি ভবিষ্যৎ ভালো ছিল, বলেছেন আমার একজন প্রথিতযশা ঔপন্যাসিক বন্ধু। কিন্তু তিনি সিগারেট খান না। তিনি জানেন না, সিগারেট সাহিত্যের চেয়েও মধুর, তার চেয়েও বারবীয়। সিগারেটের সবচেয়ে বড় ইঙ্গিতটা হচ্ছে যে সে নিজে পুড়ে যায়, রেখে যায় না কিছু। আনন্দ দেওয়ার সাথে সাথে সে অনন্তে মিশে যাচ্ছে, ভবিষ্যতকে ভারাক্রান্ত করতে কালো কালো অক্ষরের গ্রন্থি রচনা না করে।

সিগারেট এখন একটা চাই-ই—এই এক নাগাড়ে এতো ঘণ্টা ঘুমিয়ে উঠে। কিন্তু জামাটা? চুরি গেল নাকি? শেষ পর্যন্ত নয় পয়সার সম্বল ঝুল পকেটে গড়াচ্ছিল, একটা দু'আনি আর একটা ফুটা পয়সা। দশটা পয়সা পুরা হলেও এক প্যাকেট সস্তা সিগারেট কিনে ফেলতে পারতাম। তা হ'ল না দেখে ষ্টেশনের ভিখারিণীটিকে দু'আনাটি ভিক্ষা দিয়ে এসেছি। ফুটা পয়সাটা আর গোটা চারেক ডিলাক্স টেনর সিগারেট, আর সবচেয়ে মূল্যবান বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে অমিল একটা দেশলাইয়ের আধাআধি। আরও কিছু ছিল নাকি?

ছিল। বুক পকেটে সুকুল মহারাজের ঠিকানাটা আর ধনী বণিক ওঙ্কারনাথের একখানা কার্ড। শেষোক্ত জিনিষ দুটা পয়সা দিলেও পাব না, কিন্তু ও দুটার প্রয়োজন আছে কি?

সুকুল মহারাজের নামটা পুরা বলব না। সুকুলজি—হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ। কিন্তু ব্রাহ্মণত্বের এমন জাজ্বল্য চেহারা গোটা ভারতবর্ষে আমি দেখিনি। তিনি গৃহী কি সন্ন্যাসী বলা শক্ত, কিন্তু সন্ন্যাসীর মধ্যেও এমন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি ক'জন আছেন কে জানে! জামনগরের খানিকটা এদিকে তিনি ট্রেণে উঠেছিলেন, কোথায় উঠেছিলেন লক্ষ্য করিনি। আমি চলেছি বেট দ্বীপে। ভারত ছাড়িয়ে আরব সাগর—তারই খানিকটা এসেছে দেশের অভ্যন্তরে—নাম কচ্ছ উপসাগর। উপসাগরের বুকে এক মুঠি মাটি বেট দ্বীপ। ওখা বন্দরের সুমুখে মাইল তিনেক জল পার হলেই পাওয়া যাবে। সেখানে দ্বারকানাথ রণছোড়জির মন্দির আছে, সেটা দেখা হবে। সাথে সাথে হবে সমুদ্র দর্শন, সমুদ্র স্নান, বিদেশাগত জাহাজের লোকেদের সাথে আলাপ। সেই সব কথা ভাবছিলাম আর ময়ূর উড়ে যাওয়া- বাজরা ক্ষেত, লম্বা গলা বাড়িয়ে চলা সারস-দম্পতীর গভীর সবুজ তামাকু ক্ষেত। এই সব দেখতে দেখতে চলেছিলাম। অকস্মাৎ যেন আমার সম্মুখে

...হল, সুকুলজি মহারাজ এসে দাঁড়ালেন ...মার সুমুখে।

... উঠে দাঁড়ালাম। ভিতর হতেই যেন কে আমাকে ... করিয়ে দিলে। তিনি মৃদু হেসে বল্লেন—বৈঠিয়ে বৈঠিয়ে বেটা।

ওটা বলা তার পক্ষে যত সহজ, আমার পক্ষে তাঁর ...মান মূর্তির সুমুখে বসে থাকা তত সহজ নয়। কিন্তু ...টা কেবল আমার মধ্যে নয়, আমার আশপাশ সবার ...ই এই সৌম্য মূর্তি শুভ্র শ্মশ্রু সদাহাস্য মানুষটির উপস্থিতি ...টা স্বাভাবিক সম্ভ্রমবোধ জাগিয়ে দিলে। মানুষের ...টা যে এমন চমৎকার স্থিতিস্থাপক তা এর আগে ... জানতো? সরে সরে বসে অনেকখানি যায়গা ...কা হয়ে গেল।

সুকুলজি বসলেন। তখন তাঁর আড়াল হতে বেরিয়ে ...ল আটপৌরে সাদা শাড়ী পরণে একটি সুশ্রী কুমারী ...। হাতে শিবমূর্তি আঁকা ছোট একটি কাপড়ের থলে, ...তে সামান্য জিনিষপত্র। মেয়েটি বৃদ্ধের দক্ষিণে বসলে ...মি বৃদ্ধের বামে স্থান গ্রহণ করলাম।

আলাপ হ'ল, কেননা এমন অকুণ্ঠভাবে কোন মেয়েকে ...মি আলাপ করতে দেখিনি। আমার কুণ্ঠাই আমাকে ...া দিতে লাগল। কিন্তু তার ব্যবহারে মনে হল আমাকে ...ন সে কতকাল চেনে।

নাম মৈত্রেয়ী, সুকুলজি কখনো মৈত্রেয়ী মায়ী বলছিলেন, ...নো মৈত্রী, মৈ বলছেন কখনো-বা। আর মৈত্রী তাঁকে ... হতেই 'বাবা' বলছে। কিন্তু তিনি যে তার জনক ...ন সে কথাটাও অকুণ্ঠে বলে ফেল্লে। এটা আমি আশা ...রিনি। পাতানো সম্পর্কটাও লোকে যাকে তাকে ভেঙ্গে ...লে না, কিন্তু মৈত্রেয়া বল্লে। সবটা খুলে বল্লেন বৃদ্ধ ...জে। মৈত্রেয়ী তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রী। ভ্রাতার সংসার পূর্ণ ...খেই তিনি প্রব্রজ্যা নিয়েছিলেন, ক'বছর পরে যখন ...রে এলেন, তখন যুদ্ধ বেধেছে ইংরাজে জার্মাণে। ...দেশেও তার ঢেউ লেগেছে। তাঁর ভ্রাতার সংসারটিরও ... পরিবর্তন হয়েছে। ভ্রাতৃবধূ অর্থাৎ মৈত্রেয়ীর মা মারা গেছেন, মৈত্রেয়ীর বাবা যুদ্ধের দৌলতে আগের চেয়ে ...নেক গুণ বেশী রোজগার করছেন, সংসারের শ্রী ফিরে ...ছে। এসেছে নতুন একটি সুশ্রী তরুণী স্ত্রী, সে মৈত্রেয়ীকে তত অপছন্দ করত না, কিন্তু আশ্চর্য—তার বাবা, অর্থাৎ সুকুলজির ভাই চাইছিলেন মৈত্রেয়ী তার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর শান্তি নষ্ট না করে। পিতার নির্যাতনের হাত হতে উদ্ধার করলেন পিতৃব্য—মৈত্রেয়ীকে সেই সংসার হতে নিয়ে এলেন।

বলতে বলতে সুকুলজি ব্যথিত হয়ে উঠলেন; একদিন ভাইয়ের ব্যবহার স্বচক্ষে দেখে মৈত্রেয়ীকে নিয়ে এলাম। তখন ও ছোট্ট মেয়ে, বছর দশেক বয়েস। নিজে কোনদিন সংসার করিনি, ওকে নিয়ে জামনগরে এসে বাসা করলাম। আগে এখানে শিক্ষকতা করতাম, সংসার ত্যাগ করে পুনর্বার চাকুরী গ্রহণে ইচ্ছা হ'ল না। মন্দিরে শাস্ত্রপাঠ করি, বাপ-বেটীর চলে যায় কোন রকমে। এখন ওর বয়স ষোল বছর হ'ল, একটা হিল্লে করে দিতে পারলে আমি আবার পথে বেরিয়ে পড়ি। বেটি আমার পায়ে শিকল দিয়ে রেখেছে।

সাধক জীবনের, গভীর পাণ্ডিত্যের অবর্ণনীয় অমল সৌন্দর্য্য ফুটে উঠেছে বৃদ্ধের মুখে, তাঁর শুভ্র শ্মশ্রুতে, প্রশস্ত ললাটে, মুক্তাধবল দন্তপংক্তিতে। সাদা জামাকাপড়, তার মধ্য হতেও তাঁর বিরাট বপু ও গম্ভীর ব্যক্তিত্বের পরিস্ফুট পরিচয় আমাকে অভিভূত করে ফেলেছিল। মৈত্রেয়ীর সঙ্গেই কথা বলছিলাম। কত দেশের কত বড় বড় পণ্ডিত তাদের বাসায় আসা যাওয়া করেন শুনলাম। তাদের সঙ্গে কথা বলে বলেই যে সে এমন অকুণ্ঠ হয়ে উঠেছে বুঝতে পারলাম। বুঝতে পারলাম, সে শিক্ষা পেয়েছে এই পরিবেশের মধ্যে এক উচ্চ আদর্শের, যাতে অহেতুক লজ্জা, অন্যায় কুণ্ঠার ছায়া পড়েনি তার মনে। মৈত্রেয়ীর বাম নাসিকায় জ্বলছে ছোট্ট একখানি হীরার নাকছাবি। বোধহয় দশ বছর বয়সে চলে আসবার সময়ে যে হীরাটা পরা ছিল সেটা আর পালটানো হয়নি। বয়সের পরিমাণে সেটা একটু ছোটই দেখাচ্ছে। কিন্তু এই হীরার মত নির্মল তার বালিকামনও এতোটুকু সংকোচ সন্দেহের ছায়ায়, এতোটুকু লজ্জাকুণ্ঠার বর্ণে প্রতিভাত হয়নি—এটা যেন আমাকে বিস্মিত করে দিলে।

পিতৃ পরিচয় সে গৌরবের সাথেই দিলে, বল্লে, সুকুল মহারাজ বল্লে জামনগরের ছেলে-বুড়ো সবাই চেনে।

ট্রেণ হতে নামবার সময় তার সাদা কাপড়ের থলেটা

ইচ্ছে করেই ফেলে গেল কিনা জানি না। ফিরে এসে ট্রেণের জানালা দিয়ে ব্যাগটা চাইলে। হাত বাড়িয়ে দিলাম ব্যাগটা। চাঁপার কলির মত নরম সুশ্রী প্রসাধনহীন আঙ্গুলগুলি লাগল আমার ধূলি-মলিন সিগারেটজ্বলা নিকোটিন রঙ্গানো আঙ্গুলে। বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ না করে বল্লে; ঠিকানাটা লিখে নিয়েছেন তো? আসবেন কিন্তু অবশ্য অবশ্য ফিরবার পথে যখন জামনগরে আসবেন। ওই সময় কাশীর পণ্ডিত বলভদ্র শর্মার আসবার কথা আছে বাবার কাছে। এলে পরিচয় হবে। আচ্ছা নমস্তে।

চলে গেল তারা। ঠিকানাটা লিখে বুক পকেটে রেখেছিলাম। সেটা খুলে পড়লাম।......নাম সুকুল (সুকুলজি মহারাজ)......মন্দির, জামনগর। খুঁজে বের করা কঠিন নয়, কঠিন নয় সুকুল মহারাজের পায়ের শিকল খুলে দিয়ে তাঁকে মুক্ত করা। ক্ষণিকের জন্য মনে হ'ল—তার চেয়ে পুণ্যকর্ম বুঝি পৃথিবীতে নেই। কিন্তু আমি কেন, তার জন্য তো পণ্ডিত বলভদ্র শর্মারা রয়েছেন, রয়েছেন আরো কতো শিষ্য প্রশিষ্যের দল, যারা সুকুল মহারাজের আশীর্বাদ লাভ করে জীবন ধন্য করতে পারেন। বিশেষ করে আমি বিদেশী, ভিন্ন ভাষাভাষী। কিন্তু তবু ওই যে অকুণ্ঠ আমন্ত্রণ, ওই যে উদার আহ্বান, সহজ নমস্কার—এর কি কিছু অর্থ নেই? এ কি সব বৃথা।

দ্বারকা হতে ফিরবার পথে নেমেছিলাম জামনগরে। নামতেই মাথায় ঢুকলো প্রসিদ্ধ সোলারিয়াম (Solarium)—সূর্য রশ্মি দিয়ে যেখানে নানা রোগের চিকিৎসা হয়। পৃথিবীর খুব কম দেশেই এই ব্যবস্থা আছে। ভারতবর্ষে এই একমাত্র সোলারিয়াম। গেলাম সেখানে, ঘুরে ঘুরে দেখলাম সব বিভাগের কাজ। যন্ত্রের সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম ব্যবহার বুঝিয়ে বল্লেন একজন সদয় ভদ্র চিকিৎসক। বিজ্ঞান প্রণতি জানাচ্ছে সূর্যকে, যার জ্যোতির দিকে বিস্ময়বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে প্রাচীন যুগের ঋষি গায়ত্রী মন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন। মনটা হাজার হাজার বছর পিছনে চলে গেল, দেখতে লাগল বল্কল-পরিহিত দীর্ঘ-জটাজুটধারী সন্ন্যাসী সমুদ্র স্নান করে উঠে পূর্বাস্য হয়ে করযোড়ে স্তোত্রপাঠ করছেন—তার সুমুখে নীলসিন্ধু মন্থন করে উঠছেন জবাকুসুমসঙ্কাশ মূর্তি, প্রকাশিত হচ্ছে জগত জ্যোতির্ময়ের আবির্ভাবের সাথে

বিমনা হয়ে কি ভাবতে ভাবতে ফিরে এলাম। জামনগরে পথে পথে অগণিত মন্দির ও মসজিদ আছে পাশাপাশি। কোন বিরোধ নেই। জৈন মন্দির, হিন্দু মন্দির, গিরিধারী মন্দির দেখতে দেখতে এলাম সেই মন্দিরে। ঠিকানাটা পকেটে ছিল, ভুল করিনি বিন্দুমাত্র। প্রশস্ত মন্দিরতল, শুভ্র শীতল মর্মর প্রস্তরে আবৃত। প্রণাম করে কিছুক্ষণ বসলাম, দেহমন শীতল হয়ে গেল। একপাশে কাঠের বেদী করা, একটি তাকিয়াও আছে। সুমুখে ছোট্ট কাষ্ঠাসনে শাস্ত্রগ্রন্থ রেখে পাঠ করা হয়। এখানেই তবে সুকুল মহারাজ শাস্ত্র পাঠ করেন। মহারাজের বাসভবনও নিকটেই হবে।

উঠে গেলাম সেই দিকে। পাথরের ছোট বাড়ী, পাথরের গাঁথুনীটা বাইরে হতেই চোখে পড়ে। বাড়ীর সুমুখে ফুলবাগান, একটা ছায়াকর বড় গাছ, ছোট পথ গিয়েছে বারান্দার দিকে। কিছুক্ষণ দাঁড়ালাম। কেউ কোথাও নেই। ঝাঁ ঝাঁ করছে দুপুরের রোদ। পথ দিয়ে উটের পিঠে বোঝা চাপিয়ে নিয়ে গেল দেহাতী মানুষ, মন্থরগতি উটের গলায় ঘণ্টা বাজতে লাগল অনেকক্ষণ ধরে। আমি চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছি। কা'কে জিজ্ঞাসা করি এটা মহারাজের বাসভবন কিনা তাই ভাবছি আর ইতস্তত করছি, এমন সময় গৃহমধ্যে সুললিত কণ্ঠে সংস্কৃত শ্লোক উচ্চারিত হ'য়ে উঠল। শকুন্তলার শ্লোক, একটার পর একটা পড়ে যাচ্ছে কোমল মধুর নারীকণ্ঠ। সেই বর্ণনা, কণ্বমুনির আশ্রম হ'তে শকুন্তলা পতিগৃহে যাত্রা করছেন, আশ্রমের তরুলতা হ'তে পশুপক্ষীটি পর্যন্ত অভিভূত হয়ে উঠেছে।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনলাম পরিষ্কার বিশুদ্ধ উচ্চারণে সংস্কৃত পাঠ। তারপর পায়ে পায়ে চলে এলাম। ট্রেণের দেরী নেই, রাজকোটের গাড়ী ধরতে হ'বে। দেখা করতে দ্বিধা হল, মৈত্রেয়ীর এ স্বর্গে আমার হানা দেওয়ার অধিকার নেই, তাকে উদ্ধার করবার তো প্রশ্নই ওঠে না।

* * * *

অলসভাবে বালিসটা কোলের উপর তুলে নিয়ে দেখি, সিগারেট দেশলাই সহ ওঙ্কারনাথের কার্ড আর সুকুল মহারাজের ঠিকানা লেখা কাগজখানা বৌদি আমার বালিসের নিচে রেখে জামাটা কাচতে নিয়ে গেছেন।

জমিদারী বিলোপ আইনের কার্য্যকারিতা

শ্রীকালীচরণ ঘোষ

স্বাধীনতা লাভ করিবার পূর্ব্বে কংগ্রেসের পক্ষ হইতে ভারতবর্ষে যে সকল উন্নত আর্থিক ও সমাজ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল, জমিদারী প্রথা বিলোপ করিয়া সমস্ত জমিতে চাষীর অধিকার স্থাপন করা তন্মধ্যে অন্যতম। জমিদারী প্রথা বিলোপ করিবার পক্ষে নানা যুক্তি আছে বলিয়া কংগ্রেস এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে চাহিয়াছেন; কিন্তু প্রকৃত উপায় কি তাহা লইয়াই সমস্যা।

জমিতে চাষীর স্বত্ব নাই, সুতরাং চাষী জমির উন্নতি সাধন করে না বলিয়া চাষের অবনতি ঘটিতেছে অথচ লোক সংখ্যা বৃদ্ধির সহিত উত্তরোত্তর খাদ্য শস্যের অভাব উপলব্ধি হইতেছে এবং দারুণ অন্ন সমস্যা মাথা তুলিয়া উঠিতেছে। যেখানে কেবলমাত্র ফলনের হার নয়, মোট পরিমাণও বেশী হওয়া প্রয়োজন, সেখানে দুই-ই হ্রাস পাওয়ায় চিন্তার কারণ দাঁড়াইয়াছে। বহুর দাবী অনুযায়ী কংগ্রেস চাষীর হাতে জমির রক্ষণাবেক্ষণ উন্নতি প্রভৃতি ব্যাপারের সম্পূর্ণ ভার দিয়া মালিক করিবার জন্য ঘোষণা করিয়াছে এবং তাহাই কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করিতেছে।

চাষীকে জমির মালিক করিবার আরও কারণ রহিয়াছে। কালের স্বধর্ম্মে যাহারা এতদিন "মূক" ছিল তাহারা "বাচাল" হইয়াছে। যাহারা এতদিন পরের ক্ষেত খামারে কাজ করিয়া কেবলমাত্র মজুরিতে সন্তুষ্ট ছিল, তাহারা এখন আর তাহাতে সন্তুষ্ট নয়। এখন তাহারা ফসলের অংশের দাবী করিতেছে। যাহারা ফসলের অংশ অর্দ্ধেক পাইত, তাহারা সেখানে তিন ভাগের দুই ভাগ চাহিতেছে।

এ পর্য্যায়ের এইখানেই শেষ হয় নাই। এখন কৃষি শ্রমিক বলে যে তাহারা না খাটিলে যখন চাষ হইবার সম্ভাবনা নাই, তখন যাহারা মাত্র জমির মালিক অর্থাৎ খাজনা আদায় করিয়া এবং ঊর্দ্ধতন অর্থাৎ রাজ সরকারে খাজনা দিয়া নিশ্চিন্ত থাকে, তাহাদের জমিতে কোনও স্বত্ব থাকার প্রয়োজন নাই। এই ধারার যুক্তি মতে আরও দাঁড়াইয়াছে, যাহারা জমির সহিত সাক্ষাৎভাবে সংশ্লিষ্ট নহে তাহারা জমির কোনও উপস্বত্ব ভোগে অধিকারী নহে। এই আন্দোলনে বহু "জমিদার" রসদ যোগাইয়াছেন। চাষীর মতে তাহাদের মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া, দেহের রক্ত জল করিয়া, রৌদ্র বৃষ্টি অকাতরে মাথায় সহ্য করিয়া তাহারা ফসল উৎপাদন করে, আর জমিদার সেই শ্রমলব্ধ অর্থে আরামে সগৃহে বসিয়া বিলাস ভোগ করে। সুতরাং জমিদার বা জমিদারী প্রথা থাকার কোনও প্রয়োজন বা সার্থকতা নাই। উপরন্তু এই প্রথায় একদল লোক অলস জীবন যাপন করে এবং শ্রম দ্বারা উপার্জ্জিত নয় বলিয়া অর্থে মমতাহীন হইয়া অপব্যয় করিয়া থাকে।

কায়িক শ্রম দ্বারা উপার্জ্জন না করিলে মানুষের বাঁচার অধিকার নাই কারণ বুদ্ধি প্রয়োগের ক্ষেত্র কায়িক শ্রমের ক্ষেত্র মধ্যে নিবদ্ধ। সকল মানুষের প্রয়োজন এক, সুতরাং কেহ বুদ্ধি প্রয়োগে, ধন সম্পদে সুখ ভোগে একজন অপরজন হইতে কোনও ব্যতিক্রম নয়, ইহাই এখন, অন্ততঃ কমিউনিষ্টদের হিসাবে, প্রচলিত মতবাদ। জমিদারী প্রথা উক্ত নিয়ম সকলের সহিত সামঞ্জস্যহীন বলিয়া তাহার বিলোপ সাধনের যুক্তি বর্ত্তমান রহিয়াছে।

অপরাপর আরও আপত্তি থাকিতে পারে কিন্তু তাহার উল্লেখ এখন প্রয়োজন নাই। যাহারা জমিদারী প্রথা থাকার জন্য অসুবিধা ভোগ করিতেছে, তাহাদের এবং ঐরূপ মতে সহানুভূতিসম্পন্ন লোকের দাবীতে কংগ্রেস সোৎসাহে জমিদারী প্রথার অবসান ঘটাইবার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে অগ্রসর হইয়াছে। বিদেশীয় শাসনের অবসানে কংগ্রেস নিরঙ্কুশভাবে ভারত শাসনের ভার গ্রহণ করিয়াছে এবং পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী প্রায় সকল প্রদেশে, বিশেষতঃ যেখানে জমি সম্বন্ধে চিরস্থায়ী প্রথা বর্ত্তমান আছে, সেই সকল প্রদেশে ব্যবস্থা পরিষদের কংগ্রেসী সভ্যরা তাহা রদ করিবার জন্য আইন প্রণয়নে মনোযোগী হইয়াছেন। বিহার প্রদেশে আইন গৃহীত হইয়াছে, মাদ্রাজে প্রস্তুত হইয়া ব্যবস্থা পরিষদ হইতে ব্যবস্থাপক সভায় আলোচিত হইবার যোগ্য হইয়া রহিয়াছে। অন্যান্য প্রদেশ একটু পিছাইয়া থাকিলেও অনুরূপ আইনের অন্ততঃ খসড়া প্রস্তুত করিয়াছে।

কাগজে আইন তৈয়ারী করা বা ভোটের জোরে উহা পাশ করা এক বস্তু, আর তাহা সকলের অন্ততঃ অধিকাংশের গ্রহণের উপযোগী করিয়া প্রণয়ন করা ভিন্ন কথা। এতাবৎ যে সকল আইন বা আইনের খসড়া জনসমক্ষে প্রচারিত হইয়াছে তাহাতে কতগুলি অসুবিধা দেখা দিয়াছে এবং সকল দিক হইতেই তাহার প্রতিবাদ উত্থাপিত হইয়াছে। যে সকল বিষয় এখন আলোচিত হইতেছে বা বাস্তবক্ষেত্রে তাহা প্রয়োগ করিতে গিয়া যে সকল অসুবিধা দেখা দিতে পারে তাহার কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করা দরকার।

জমিদার পক্ষের কথা,—যদি কোনও কোনও জমিদার অত্যাচারী হন এবং প্রজার সুখ-দুঃখে অনবহিত থাকেন, তাহা হইলে সমস্ত জমিদার সমাজকে দোষী করা যায় না। বহু জমিদার ছিলেন বা আছেন যাঁহারা নিজের জমিদারীতে নানাবিধ জনহিতকর কাজ চিরকাল করিয়াছেন এবং জমিদারীর আয় হইতে শিক্ষায়তন চিকিৎসাশালা, শুশ্রূষাবাস প্রভৃতি পরিচালনা করিয়া থাকেন। জমিদারী লোপ পাইলে এ সকল পরিচালনার ভার গভর্ণমেণ্টকে লইতে হইবে এবং তাহাতে গভর্ণমেণ্টের বহু ব্যয় বৃদ্ধি হইবে।

অনেক কংগ্রেস ও কংগ্রেসভাবাপন্ন লোকের মনোভাব আছে যে জমিদার সম্প্রদায় বরাবর ইংরাজের রাজ্যশাসনে সহায়তা করিয়াছে সুতরাং জমিদারদিগকে আজ "এক হাত" শিক্ষা দিতে হইবে। এ বিষয়ে

একটা কথা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। সুদূর-প্রসারী অর্থ নৈতিক কোনও ব্যবস্থা আক্রোশ অথবা প্রতিহিংসামূলক হওয়া মোটেই বাঞ্ছনীয় নহে। ইহাতে সকল দিক বিচার করিয়া কার্য্যে অগ্রসর হওয়ার প্রবৃত্তি উপেক্ষিত হইয়া থাকে। তাহা ছাড়া, এক সময় যাঁহারা নিজের বিচার-বুদ্ধির উপর যাহা ন্যায্য বলিয়া মনে করিয়া কাজ করিয়াছেন, আজকার পরিপ্রেক্ষিতে সেই কাজের বিচার করিয়া কোনও শাস্তি দিবার মনোভাব কংগ্রেস পোষণ করিতে পারে না। ইহা কমিউনিষ্ট দলের কাজ হইতে পারে। তাহা ছাড়া সকল জমিদারই যে বিপক্ষতা করিয়াছেন তাহা নহে। বহু জমিদার প্রকাশ্যভাবে এবং অনেকে গোপনে কংগ্রেস আন্দোলনে সহায়তা করিয়াছেন। আমরা বাঙ্গলায় রাজা সুবোধ মল্লিক, নাড়াজোল, গৌরীপুরের নাম স্মরণ করিতে পারি। এই সঙ্গে বিহারের ছোট-খাটো বহু সহস্র জমিদার কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষের নিকট যে আবেদন পেশ করিয়াছেন, তাহা উপেক্ষার বিষয় নহে। তাঁহারা বলিয়াছেন যে কেহ কেহ যথাসর্ব্বস্ব পণ করিয়া বিহারে কংগ্রেসকে শক্তিশালী করিয়াছেন, আজ জমিদারীর বিলোপকে কংগ্রেসের পুরস্কার বলিয়া তাঁহারা গ্রহণ করিতে পারেন না।

কংগ্রেস সদস্যরা যে আইন প্রণয়ন করিয়াছেন তাহার মূলসূত্র, জমিদারদের স্বত্ব হিসাব করিয়া খেসারত দিয়া সমস্ত সম্পত্তি প্রথমে গভর্ণমেণ্ট অধিকার করিবে। এই খেসারত যেভাবে হিসাব করা হইয়াছে, তাহাতে ঘোরতর আপত্তি হইয়াছে। যাহার নীট আয় বর্ত্তমানে বার্ষিক ১২,০০০ টাকা তাহাকে তাহার আটগুণ খেসারত দিলে ৯৬,০০০ টাকা দেওয়া হইবে। নগদ দেওয়া হইবে না, শতকরা আড়াই টাকা সুদের বণ্ড বা কোম্পানীর কাগজ দেওয়া হইবে, অর্থাৎ তাহার বার্ষিক আয় ১২,০০০ টাকার স্থলে ২,৪০০ টাকায় দাঁড়াইবে। যাঁহার মাসিক ১০০০ টাকা নীট আয় তিনি অন্ততঃ ইহার বিশ গুণ অর্থাৎ বিশ হাজার টাকার লেন দেন, সহায় সম্পদ, মান প্রতিপত্তি ভোগ করিতেছেন। দায় দফায় জমির অংশ প্রভৃতি বন্ধক দিয়া টাকা লইয়া দায় উদ্ধার হইতেছেন। আজ কংগ্রেস-প্রধানরা নামমাত্র খেসারত দিয়া জমিদারী গ্রহণের প্রস্তাবে প্রাণ খুলিয়া সায় দিতে পারিতেছেন না। ইহাই বর্ত্তমান খসড়া আইনগুলির একটী প্রধান অযৌক্তিক অংশ বলিয়া বিবেচিত হইতেছে।

এই সঙ্গে আরও কথা উঠিয়াছে। কেবলমাত্র জমিদারী প্রথার বিরুদ্ধে অভিযান কেন? গভর্ণমেণ্ট মুখে বলিলেও কার্য্যতঃ আর কাহারও কোনও আয়ের উপর এরূপভাবে হস্তক্ষেপ করে নাই বা করিবার সঙ্কল্প প্রকাশ করে নাই। সুতরাং হঠাৎ একশ্রেণীর আয়ের উপর হস্তক্ষেপ করিলে একদেশদর্শিতা প্রকাশ পায়, অথচ এরূপ করিবার কোনও কারণ উল্লেখ করা হয় নাই। জমির উন্নতি ও ফসল বৃদ্ধির যুক্তিতে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের কথা উঠিতে পারে, কিন্তু এভাবে আয় সুষ্ম করা প্রয়োজন কিনা, তাহা কোথাও প্রকাশ করিয়া বলা হয় নাই।

যাঁহারা শ্রম করে না, অর্জ্জিত ধনের মুনাফা ভোগ করিয়া দিন যাপন করেন, অথচ জমিদার নয়, এরূপ বহু লোক বর্ত্তমান। দেশের রাষ্ট্র-শাসনবিধি এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় এরূপ বহু লোক রহিয়াছে। গভর্ণমেণ্টের কাগজ রাখিলে সুদ পাওয়া যায়, ব্যাঙ্কে জমা রাখিলে টাকা বাড়ে, কোম্পানীর শেয়ার কিনিতে পারিলে লোকে বিনা পরিশ্রমে টাকা পায়, হঠাৎ জমির বা জিনিষপত্রের দাম বাড়িলে লোকের বিনা শ্রমেই আয় বৃদ্ধি হইয়া থাকে। তাহা হইলে অনেকের উপর একই বিধি প্রয়োগ করা প্রয়োজন। কিন্তু তাহা যে একেবারে অসম্ভব তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারেন। যাঁহারা উদ্ভাবনী শক্তিদ্বারা জগৎকে লাভবান করিয়াছেন, তাঁহারা যদি বৃদ্ধ বয়সে যৌবনের শ্রমের ফল ভোগ করেন তাহা হইলে সেই সুযোগ হইতে তাঁহাকে বঞ্চিত করা চলে না। সেইভাবে যদি কেহ কায়িক ও মানসিক শ্রমে অর্থোপার্জ্জন করিয়া ব্যাঙ্কে জমা না দিয়া দোকানপসার না করিয়া, চোটায় না খাটাইয়া টাকা জমিতে "ফেলিয়া" থাকেন এবং তাহাতে বুদ্ধি প্রয়োগে যদি অন্নজলের সংস্থান করিয়া লইয়া থাকেন, তাহাতে আপত্তি করা চলিতে পারে কিন্তু সে কার্য্য যুক্তি বা বিচারসহ নহে। আজ গভর্ণমেণ্টের খসড়া বিলগুলি এ প্রশ্নের কোনও সদুত্তর দেয় নাই; সুতরাং এই সম্পর্কে যে আপত্তি উঠিয়াছে, তাহা নিতান্ত উপেক্ষা করা চলে না।

আরও কথা উঠিয়াছে। জমিদারী স্বত্ব গ্রহণ করিলেই চাষের উন্নতি সম্ভব কিনা, তাহা ভাবিবার কথা। ভূমি রাজস্ব আইনের ধারা সকল বিচার করিলে দেখা যায়, প্রকৃতপক্ষে জমির খাজনা ছাড়া জমিতে উদ্ধতন জমিদারের কোনও স্বত্বই নাই। এরূপ জমির অংশ শতকরা প্রায় ষাট ভাগ। সুতরাং জমিতে প্রজার স্বত্ব স্বামিত্ব জন্মিলেই চাষের উন্নতির সম্ভাবনা নাই। আর গভর্ণমেণ্টের আমলে সমস্ত জমি আসিয়া পড়িলে কি ভাবে চাষের উন্নতি হইবে, তাহাও ভাবিয়া কেহ ঠিক করিতে পারে নাই। কোথাও কোথাও জমিদারী রদ আইনের খসড়া প্রকাশিত হওয়ায় আজ বেশী করিয়া এই মত আলোচিত হইতেছে। প্রতিপক্ষরা বলেন যে খাসমহলে বহু জমি রহিয়াছে বহুকাল! কিন্তু খাসমহলে জমির ফসলের হার বেশী নয়; সুতরাং দেখা যাইতেছে যে কেবল প্রজার স্বত্ব বৃদ্ধি করিলে অথবা গভর্ণমেণ্ট খাসে সমস্ত জমি আনিলে, আর যাহাই হউক, চাষের উন্নতির সম্ভাবনা নাই। যে কারণে আজ এত বিরাট পরিবর্ত্তন প্রবর্ত্তিত হইতে চলিয়াছে, অন্ততঃ তাহার কোনও সম্ভাবনা নাই।

কেবল জমিদার ভয় পাইয়াছেন বলিলে চলে না, প্রজাও সশঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছেন। অধিকাংশ প্রজাই জমির প্রকৃত মালিক। তাঁহাদের মতে প্রয়োজন বুঝিয়া জমিদারকে স্তব, স্তুতি, ভয়প্রদর্শন এবং আইন আমলে ফেলিয়া আয়ত্তে রাখা যায়, অন্ততঃ গুরুতর কোনও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া অথবা খাজনা বৃদ্ধির হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। খাসমহলে সমস্ত জমি গেলে, তখন বাকী খাজনা সঙ্গে সঙ্গে আদায় হইবে, জমি হইতে উচ্ছেদ এবং যথাকালে খাজনা বৃদ্ধির কবল হইতে মুক্তি পাইবার উপায় নাই। সুতরাং দুই পাপের মধ্যে জমিদারকে তাহারা গ্রহণ

করিতে প্রস্তুত। পূর্ব্ববঙ্গে প্রজার পক্ষ হইতে যে প্রচার-পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে কমিউনিষ্ট গন্ধ থাকিলেও বিচার করিয়া দেখিবার বহু বিষয় রহিয়াছে। বিহারের প্রজারা অনেকেই মনে করিয়াছিলেন যে জমি যখন তাঁহাদের আমলে কংগ্রেস আনিয়া দিতেছে, তখন আর কাহাকেও খাজনা-রাজস্ব কিছুই দিতে হইবে না, কেবল হাল থাকিলেই জমি থাকিয়া যাইবে। কিন্তু সত্য সত্যই কখন খসড়া আইনের রূপ প্রকাশিত হইল তখন প্রজারা সভয়ে দেখিলেন যে ভেকেদের নিকট রাজা কাষ্ঠখণ্ড (King Log) এর স্থলে রাজা সারস (King Stork) আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

অর্থনৈতিক দিক দিয়াও আপত্তি উঠিয়াছে। জমির পরিমাণ হিসাবে দেখা যাইতেছে, খাসমহলে যত জমিতে যত টাকা আয় হয়, চিরস্থায়ী ব্যবস্থায় সেই অনুপাতে অধিক আয় হইয়া থাকে। আজ চিরস্থায়ী ব্যবস্থামতে যে টাকা আয় আছে (অবিভক্ত বাঙ্গলার হিসাবে তিন কোটী পঁচিশ লক্ষ টাকা) নূতন আইনে তাহা আদায় করিতে গভর্ণমেণ্টকে ঘরের পয়সা খরচ করিয়া প্রাণ রক্ষা করিতে হইবে; অর্থাৎ যদি চিরস্থায়ী ব্যবস্থায় পশ্চিম বাঙ্গলার বর্ত্তমানে সওয়া এক কোটী টাকা আয় হয়, তাহা খাসমহলে আদায় করিতে দেড় কোটী টাকা খরচ হওয়া স্বাভাবিক। সরকারী তত্ত্বাবধানে যে ব্যয়ের বহর বাড়িয়াছে, তাহাতে আয় করিতে যে অধিক ব্যয় হইয়া যাইবে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহই নাই।

আজ সাধারণ প্রজা মনে করিয়া বসিয়া আছে যে 'হাল যার জমি তার'। এই ধারণা অনেকের মনে বদ্ধমূল হইয়া যাওয়ায়, গভর্ণমেণ্টের পক্ষে টাকা আদায় করা বিশেষ সহজ হইবে না। তাহার প্রচার বিভাগ বহু পুস্তক পত্রিকা প্রচার করিয়া বহু অর্থ ব্যয় করিয়া আবার লোককে আইনের আমলে আনিতে সমর্থ হইবে।

চাষীকে লইয়া আরও সমস্যা দেখা দিয়াছে। এতদিন যাহা বক্তৃতায় বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে, কার্য্যক্ষেত্রে তাহার বিষম ব্যতিক্রম দেখা দিয়েছে। যাহারাই চাষী তাহারাই জমি পাইবে, কিন্তু এত জমি কোথায়? মাথাপিছু দশবিঘা আন্দাজ জমি দিতে হইলে একটী প্রদেশের চাষীকে অন্ততঃ তিনটী প্রদেশের চাষের জমির দখল দিতে হয়, আর সেই দুই প্রদেশের চাষী মনের সুখে বনবাসে চলিয়া যাইবে, এরূপ ধারণা করিয়া আনন্দলাভ করিতে হয়।

যাহারই জমিতে কোনও স্বত্ব আছে, তাহারই স্বত্ব ক্রয় করিয়া লওয়ার যখন প্রস্তাব আছে, তখন অনেকেই সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। বহু লোকের অন্য উপায়ে আয়ের সহিত জমির ফসল বা উপস্বত্ব যোগ করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইয়া থাকে আজ সেই স্বত্ব নাশ হওয়ায় চাষীও ভবিষ্যতের চিন্তায় আকুল হইয়াছে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বহু লোক আজ উপায়ের একাংশ হারাইতে বসিয়াছে; তাহাদের হাতে স্বত্বের মূল্য হিসাবে বিশগুণ টাকা দিলে, অন্য নানা দায়ে তাহা ব্যয় হইয়া যাইবে। আর তাহার নিশ্চিৎ যে আয় ছিল, তাহা নষ্ট হইয়া অন্নকষ্টে পড়িবার সম্ভাবনা উপস্থিত। এ কল্পনা বা সম্ভাবনা অনেকের নিকট প্রিয় নয়। যাঁহার জমি হইতে মাসিক নীট্ আয় ২০৲ তাঁহার হাতে এককালীন ৪৮০০৲ টাকা পড়িলে এই মাসিক ২০৲ আয়ের ক্ষেত্রে তাহা খাটাইবার সম্ভাবনা নাই। দেশের মধ্যে শিল্প প্রতিষ্ঠানের অগ্রগতি অতিমাত্রায় ব্যাহত হইয়াছে। এ ক্ষেত্রে গভর্ণমেণ্ট কতখানি দায়ী তাহা এখানে আলোচনা করার প্রয়োজন নাই। তবে এককথা বলা চলে, কংগ্রেসী গভর্ণমেণ্ট সকল গুরুতর অর্থনৈতিক ব্যাপারে যে অব্যবস্থিতচিত্ততার পরিচয় দিতেছে, তাহাতে সকল ক্ষেত্রেই ঘোরতর জটিলতার সৃষ্টি হইতেছে।

যে হারেই হউক খেসারত দেওয়া মত হইয়াছে। প্রাদেশিক সরকারগুলির ধারণা ছিল, কেন্দ্রীয় সরকার হইতে এই খেসারতের টাকা অন্ততঃ ঋণ হিসাবে পাওয়া যাইবে এবং তাহা হইতে যাহার যাহা প্রাপ্য তাহাকে দেওয়া হইবে। মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণকল্পে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট যে কার্য্যপদ্ধতি প্রকাশ করিয়াছে তাহাতে দেখা যাইতেছে যে জমিদারী রদ এবং মদ্যপান নিরোধ সম্পর্কিত ব্যাপারে প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের যে অর্থের প্রয়োজন হইবে, কেন্দ্রীয় সরকার সে সাহায্য করিতে প্রস্তুত নহে; ইহা সম্পূর্ণরূপে প্রাদেশিক সরকারকে বহন করিতে হইবে। কেন্দ্রীয় সরকার প্রথমে জমিদারী প্রথার উচ্ছেদের জন্য বেশ উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছিল, কিন্তু মনে হইতেছে সকল দিক বিচার করিয়া তাহাদের মনোগত ইচ্ছা যে ইহা এখন স্থগিত থাকে।

কালও ইহার অনুকূল নহে। লোকের দুঃখ দুর্দ্দশার সীমা নাই। কেবল যাহার শস্য উদ্বৃত্ত হয় এরূপ চাষী, বড় বড় কলমালিক, চোরাকারবারী প্রভৃতি কয়েকজনের সুসময় চলিতেছে। শ্রমিকের আয় বাড়িয়াছে, ব্যয়ও বাড়িয়াছে প্রচুর; আর জনসাধারণ ব্যতিব্যস্ত। জমিদারী প্রথা রদ হইলে যে একটা অস্বাভাবিক অবস্থার উদ্ভব হইবে, তাহা অন্য সময় সহ্য করা সম্ভব হইবে, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে গুরুতর অনিশ্চয়তার সৃষ্টি করায় লাভ অপেক্ষা লোকসান অধিক।

এখানেই সমস্যার শেষ নহে। সমস্ত জমিদারী দখল লইবার পর তাহা কি ভাবে নিয়োজিত হইবে, নূতন আইনে তাহার নির্দ্দেশ নাই। যে প্রথায় চাষ চলে, তাহাই যদি থাকিয়া যায়, তাহা হইলে জমিদারকে দেওয়ার পরিবর্ত্তে গভর্ণমেণ্টকে খাজনা দিলে চাষের ফলনের হার বা পরিমাণ বৃদ্ধি কোনটাই হইবার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং সে বিষয়ে একটী প্রশ্ন আছে। জমি পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিয়া বাধ্যতামূলকভাবে একত্রীকরণ দ্বারা চাষ করিতে পারা যায়। ইহাতে মালিকের স্বত্বের কোনও হানি হয় না। গভর্ণমেণ্টের তরফে সমস্ত চাষ আবাদ করায় (State farming) প্রস্তাব থাকিতে পারে। অথবা যৌথ চাষ (collective farming) বা সমবায় প্রথায় চাষ (co-operative farming) লইয়াও আলোচনা চলিতেছে। এ সকলের আজও মীমাংসা হয় নাই। যদি চিরাচরিত প্রথামতে চাষের কোনও উন্নতি না হইয়া থাকে, তাহা হইলে পরীক্ষামূলকভাবে প্রতি জেলায় একবন্দে অন্ততঃ এক হাজার বিঘা জমি লইয়া গবেষণা করা প্রয়োজন। বহু চিন্তাশীল ব্যক্তি আজ এই পরামর্শ

দিতেছেন। অনিশ্চিতের মধ্যে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে সর্ব্বাপেক্ষা কোনটি উপযোগী তাহা নিঃসন্দিগ্ধভাবে জানিয়া লইতে হইবে। এতদিন যাহা কেবলমাত্র কাগজপত্রে সভাসমিতিতে আলোচনার বস্তু ছিল, তাহা কর্ম্মক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে গিয়া যে গুরু সমস্যা উপস্থিত করিয়াছে, তাহার মীমাংসা না হইলে নানা অসুবিধা ঘটিতে পারে।

যাঁহারা সতর্কতা অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইতে বলেন, তাঁহাদের পরামর্শ উপেক্ষা করা হঠকারিতার নামান্তর হইতে পারে। যখন জমিদারী রদ করিবার উপায় সকল চিন্তা করা হইবে বা সেই সম্পর্কে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে, সেই অবসরে জমিদারী রদ হইবার পর তাহা কি রূপে সর্ব্বাপেক্ষা লাভজনক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যাইতে পারে তাহার উপায় নির্দ্ধারণ করার সময় সমুপস্থিত বলিয়া মনে হয়।

দয়াময়ী

ক্যাপ্টেন্ রামেন্দু দত্ত

শিলাময়ী ব'লে ডেকেছি বলিয়া
লইয়ো না অপরাধ
লীলাময়ী নামে গোপনে ডেকেছি
মিটায়ে মনের সাধ।
সে ডাক তুমি ত শুনেছ প্রেয়সী
নিরালা দীপের ক্ষীণালোকে বসি'
আরো কত শত মধুময় নামে
নিয়ত ডেকেছি যা'রে
শিলাময়ী ব'লে ডেকেছি বলিয়া
শিলা ভাবি বুঝি তা'রে?
এত কথা বোঝো চতুরা বালিকা
এইটুকু বোঝো না কি—
নামের আড়ালে রাখিয়া তোমায়
মনটারে দেই ফাঁকি!
সত্য কথা যা বলিলে তোমায়
মম হৃদয়ের সাধ মিটে যায়
সে কথা বলিতে বড় ভয় পায়
অন্যে পাছে তা শোনে!
সে কথা কেবল মনে মনে বলি
নিরজন-গৃহ-কোণে!
তোমার সঙ্গে প্রাণের কথা যা
প্রাণেই রহিয়া যায়
কখন তোমার দেখা পাবো আর?
হিয়া করে হায় হায়!
বিশ্বাস করো লীলাবতী মম
হয়ে গেছ তুমি অন্তর-তম
হৃদয়ের মাঝে ও মুরতি রাজে
আর সব মুছিয়াছে—
কোনো সান্ত্বনা ভুলেও পারে না
যাইতে তাহার কাছে।

অশান্ত হিয়া দীপশিখা
বুঝিবা জ্বলিয়া পড়ে
নিত্য তাহারে আলোড়িছে তব
বিরহ ব্যথার ঝড়ে
চিত্ত মথিয়া উঠিছে কেবল
অবিরাম লোণা নয়নের জল,
দৃষ্টি হয়েছে ঘোলাটে, অশ্রু
বাধা না মানিয়া তায়
ঝর ঝর ঝর অবিরল ধারে
নিয়ত ঝরিয়া যায়!
তুমি ত কাঁদো না সহজে, তবে কি
কাঁদাইতে ভালোবাসো?
পরের আঁখিতে অশ্রু হেরিলে
মনের পুলকে হাসো?
তব তরে যে বা এত ব্যথা পায়
চোখের দেখাটি দেখা দিয়ে তায়
দুঃখের লাঘব করিতে তোমার
এতই কিসের বাধা?
সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ালে বারেক
থামে যদি কা'রো কাঁদা?
আসো না আপনি, নিতেও আসি না,
অভিমান ভরে রই
কল্পনা, দিয়া তোমারে রচিয়া
শান্তি লভি বা কই
তোমার ও প্রাণ বারেকেরও তরে
চঞ্চলতায় কভু নাহি ভরে?
শিলাময়ী যদি ব'লে থাকি তবে
এতই কি অপরাধ?
'দয়াময়ি!' ব'লে ডাকিলে এবার
পূরিবে মনের সাধ?

ভীমপলশ্রী

বনফুল

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

সদারঙ্গবিহারীলাল এগিয়ে গিয়ে নিজের বিরক্তি, অস্বস্তিজনক পরিস্থিতি, মহিলার অপমান, তার অনিবার্য কারণ, ক্ষমা প্রার্থনা প্রভৃতি উপকরণ নিয়ে একটি লম্বা বক্তৃতা সুরু করতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু স্বয়ম্প্রভার এক ধমকে থেমে যেতে হল তাঁকে।

"চুপ কর। বাইকটা ঠিক আছে তো?"

"হাঁ, ওটাকে বাঁচিয়েছি কোনক্রমে। এক আধটা স্পোক সম্ভবত গেছে। ব্রেকটা গোড়া থেকেই খুব ভাল নয়, তবে চলবে আপাতত"

"চল তবে"

"কিন্তু আপনি এখন যেতে পারবেন কি"

"বাজে কথা না বলে বাইকটা আন"

"কিন্তু এই অবস্থায় যাওয়াটা সঙ্গত হবে কি, ভেবে দেখুন"

সদারঙ্গবিহারী নিজের চশমাটা ঠিক করে' নিয়ে বাইকটার দিকে এগিয়ে গেলেন। বাইকটা কাৎ হয়ে পড়েছিল একধারে। সেটা তুলে স্বয়ম্প্রভার দিকে আর একবার চাইলেন তিনি।

"দেখুন এই অ্যাক্সিডেন্টটা হয়তো ভগবানের ইঙ্গিত হ'তে পারে। হয়তো তাঁর ইচ্ছে নয় যে আমরা এভাবে আর অগ্রসর হই"

"ভগবানের দোহাই দিতে লজ্জা করে না তোমার! আমাকে একটা ঝোপের মধ্যে উল্টে ফেলে দিয়ে কতকগুলো অসভ্য লোক জুটিয়ে আমার অপমানের চূড়ান্ত করে' এখন ভগবানের দোহাই দিচ্ছ?"

"না—না—বাঃ—কথাটা ওরকমভাবে নিচ্ছেন কেন"

"বাইকে চড়"

সদারঙ্গবিহারী আর আপত্তি করতে সাহস করলেন না।

পথে উল্লেখযোগ্য কোনও বিপদ হল না আর। ঝড়াং ঝড়াং করতে করতে সদারঙ্গবিহারীলাল নিজের আস্তানায় পৌঁছলেন শেষ পর্যন্ত। বাইকের পিছনে দোদুল্যমানা স্বয়ম্প্রভাকে দেখে গ্রামের দু'চারজন অসভ্য লোক দু'একটা মন্তব্য অবশ্য করেছিল, কিন্তু স্বয়ম্প্রভা তাতে কান দেন নি। মুখ বুজে গুম হয়ে বসেছিলেন তিনি সদারঙ্গবিহারীলালকে আঁকড়ে। নেমেই তিনি সদারঙ্গবিহারীলালকে গাড়ি খুঁজতে পাঠালেন। একটা মোটর চাই-ই যেমন করে' হোক। সদারঙ্গবিহারী গেলেন (প্রতিবাদ করবার সাহস ছিল না তাঁর আর) এবং একটু পরে ফিরে এলেন। এ তল্লাটে কোনও গাড়ি নেই। কোনও রকম গাড়িই না। স্টেচুর একটি গরুর গাড়ি ছিল, কিন্তু তাও একটি গরু দু'দিন আগে মারা যাওয়াতে সে গাড়িটিও অচল হয়েছে।

...অল্পক্ষণের মধ্যেই স্বয়ম্প্রভা সদারঙ্গবিহারীলালের গৃহস্থালিতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে' ফেললেন। ধমকের চোটে পাঁচির মায়ের প্রাচীন পিলে ঘন ঘন চমকাতে লাগল। তাকে শায়েস্তা করে' তারপর তিনি ভাল করে' দেখলেন শাড়িটা কতখানি ছিঁড়েছে। ইস্—কোনও পদার্থ নেই একেবারে! শাড়ির দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে স্বয়ম্প্রভা মতি-স্থির করে' ফেললেন।

"আমি এইখানেই থাকি, বুঝলে সদারঙ্গ। অনীতাকে আমি একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি সেইটে নিয়ে তুমিই চলে যাও। গিয়ে অনীতাকে সঙ্গে করে' নিয়ে এস। মোটর দেবার মতো ভদ্রতা যদি ওদের না-ও হয় বাইকে চড়িয়েই নিয়ে এস। কাগজ কলম দাও"

সদারঙ্গ বিনা বাক্যব্যয়ে কাগজ কলম এনে দিলেন। চশমাটা কপালে তুলে নাক ঝাড়লেন একবার। তারপর লিপি-রচনা-নিরতা স্বয়ম্প্রভার দিকে চেয়ে রইলেন ভ্রূকুঞ্চিত করে'। তাঁর মনে হল কোনও প্রতিবাদ করলে ভয়ঙ্কর কিছু করে বসবেন স্বয়ম্প্রভা। এখানে থাকাটাও নিরাপদ নয়। অস্বস্তিজনক তো বটেই। খুব। সরে' পড়াই ভালো। তাছাড়া তাঁর নিজেরও যাবার ইচ্ছে করছিল ভিতরে ভিতরে। সান্ত্বনা দেবীর ব্যাপারটা বেশ রহস্যময় হয়ে উঠেছে, জানতে কৌতূহল হচ্ছিল বই কি। নিশ্চয়! স্বয়ম্প্রভা দেবী যা সন্দেহ করছেন তা অবশ্য বিশ্বাস করেন নি তিনি—কিন্তু ব্যাপারটা বেশ একটু ই'য়ে গোছের হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।

"নাও। মনে রেখো ভদ্রসন্তান তুমি, আমার কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়ে যাচ্ছ যে এ চিঠি তুমি অনীতাকে দেবে এবং সে যদি তোমার সঙ্গে চলে না আসে তার নিজের হাতের লেখা জবাব নিয়ে আসবে"

"বেশ"—আড়চোখে চিঠিটার দিকে চেয়ে ঘাড় চুলকে উত্তর দিলেন সদারঙ্গবিহারীলাল।

"ইচ্ছে করলে চিঠিটা তুমি পড়তে পার"

সদারঙ্গ পড়তে লাগলেন। পড়তে পড়তে তাঁর মুখভাব গম্ভীর

হয়ে এল ক্রমশ। স্বয়ম্প্রভা সাগ্রহে তাঁর মুখের দিকে চেয়েছিলেন। চিঠি পড়া শেষ হতেই তিনি বললেন,

"ঠিক হয়েছে তো ?"

"হয়েছে, মানে—"

চিঠিটা পকেটে পুরলেন সদারঙ্গবিহারীলাল।

"মানে, আবার কি !"

"একটা জিনিস বুঝতে পারছি না। অনীতার দাম্পত্যজীবনের সুখশান্তি নষ্ট করবার জন্যে এত তোড়জোড় করছেন কেন। মানে, আপনি যা ভাবছেন তা যদি সত্যিও হয়—"

"অনীতার সুখশান্তি নষ্ট করবার জন্যে ? তার সুখশান্তি বাঁচাবার জন্যেই এত করছি। ওর স্বামীটিকে সিধে করতে হলে রীতিমত শিক্ষা দিতে হবে"

"ও"

সদারঙ্গবিহারীলালের তর্ক করবার ইচ্ছে হচ্ছিল, কিন্তু তা না করে' তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে হাত দুটি ওলটালেন একবার।

"যাও আর দেরি কোরো না"

"কাপড় জামা ছেড়ে গেলেই ভাল হয় না ?"

"কাপড় জামা ছেড়ে আর কি করবে। রাস্তায় বেরুলেই তো ধুলোয় কালিতে আবার সব একাকার হয়ে যাবে। কিছু দরকার নেই, যেমন আছ চলে যাও"

"বেশ, তাই যাচ্ছি। কিন্তু দেখুন একটা কথা মনে রাখবেন, আমি সেখানে হয় তো না-ও পৌঁছতে পারি। গাড়ির যা অবস্থা, হয় তো 'ব্রেকড্ আপ্' হয়ে যাব, কিছুই বলা যায় না। আপনি তো পিছনে বসে ছিলেন নিশ্চয়ই শুনেছেন কি রকম 'পপ' করছিলাম, ভালভের ভিতরও অদ্ভুত আওয়াজ দিচ্ছিল একটা—"

স্বয়ম্প্রভা হাত দুটো মুঠো করে' বিস্ফারিত চক্ষে এমনভাবে চাইলেন তাঁর দিকে—যে সদারঙ্গ পালাবার পথ পেলেন না।

সদারঙ্গবিহারী চলে যাবার পর পাঁচির মার সাহায্যে ছুঁচ সুতো জোগাড় করে' স্বয়ম্প্রভা নিজের শাড়িটি সেলাই করতে বসলেন। সায়াটি পরে' নিবিষ্ট চিত্তে সেলাই করে' যেতে লাগলেন। ক্লান্তিতে সমস্ত শরীর ভেঙে পড়ছিল, ঘাড় ঝুঁকে ঝুঁকে পড়ছিল ঘুমে, তবু কিন্তু তিনি থামলেন না। শাড়িটি মেরামত না করা পর্যন্ত থামবেন না। সেলাই চলতে লাগল। ক্রমশ কেমন যেন স্বপ্নাচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন তিনি। নিজেরই বিগত-জীবনের স্বপ্ন সব ভীড় করে' এল মনের মধ্যে—যখন টাকা ছিল না কিন্তু শান্তি ছিল, যখন ফ্যাশান দুরন্ত সমাজের মোহ মরীচিকা তাঁকে প্রলুব্ধ করে' হরণ করে নি। স্বয়ম্প্রভার চিত্ত দ্রব হয়ে এল ক্রমশ। অশ্রু টলমল করতে লাগল চোখের কোণে।

…অপরাহ্ণ ক্রমশ সন্ধ্যায় পরিণত হল। জানালার ফাঁকে অস্তগামী সূর্যের কিরণজাল উঁকি দিয়ে দিয়ে অন্তর্হিত হল অবশেষে। অন্ধকার নামল, অন্ধকার গাঢ়তর হ'ল, সদারঙ্গবিহারীলাল কিন্তু ফিরলেন না।

২৬

মোটরে যাবার সময় সুশোভন অনীতাকে সব কথা খুলে বলবার সুযোগ পায় নি। এ মোটরটিতে গোপন আলাপের কোন সুবিধা ছিল না। অনীতাও এমন একটা উত্তেজিত অবস্থায় ছিল যে আর বেশী কিছু জানবার ইচ্ছে ছিল না তার। তার মনে হচ্ছিল যতটুকু সে শুনেছে তাই যথেষ্ট। সুশোভন দু' একবার একটু চেষ্টা করে' থেমে গেল। ভাবলে দিগ্বিজয়বাবুর ওখানে গিয়ে বললেই হবে।

সুরেশ্বরী যে কোনও দুর্ঘটনার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে রেখেছিলেন ইতিমধ্যে। যুগল স্বামী এবং একটি স্ত্রীর এই যুগপৎ আবির্ভাবে তিনি সুতরাং ঘাবড়ে গেলেন না। স্বামী যুগলের মধ্যে মনোমালিন্যের কোনও লক্ষণ না দেখে আশ্বস্তই হলেন বরং একটু। স্ত্রীর অনুকরণে দিগ্বিজয়ও এগিয়ে এসে অভ্যর্থনা করলেন তাঁদের। সান্ত্বনাকে দেখা গেল না কোথাও। ব্রজেশ্বরবাবু নেমেই সান্ত্বনার খোঁজ করলেন এবং সে পাশের ঘরে আছে শুনে সোজা সেখানে চলে গেলেন। তার পর বিনা বাক্যব্যয়ে তাকে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন বেড়াতে। অনীতা সান্ত্বনাকে দেখবার অবসরই পেলে না।

সুরেশ্বরী দেবীর অকৃত্রিম স্নেহপূর্ণ আতিথেয়তায় অনীতার শঙ্কা অপনোদিত হ'ল। কেতাদুরস্ত বড়লোকী আড়ষ্টতা মোটে নেই। নিতান্তই ঘরোয়া ব্যাপার যেন। সান্ত্বনা কেমন লোক জানা যায় নি যদিও এখনও—খুব সম্ভব ভাল নয়—কিন্তু তাতেও কিছু যায় আসে না অনীতার মনে হল। সুরেশ্বরী দেবীর আন্তরিকতায় এত মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল সে যে তাঁর বাড়িতে কোনও কিছু অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটবার কল্পনাই করতে পারছিল না সে। তারা দু' দু'জন কাপড় বিছানা কিছু আনে নি, কিন্তু সুরেশ্বরী দেবীর তাতে যে শুধু ভ্রূক্ষেপ নেই তা নয় এতে যেন আরও বেশী আনন্দিত তিনি। এইটেই যেন প্রত্যাশিত ব্যাপার তাঁর কাছে।

এক ঘণ্টা পরে।

দ্বিতলের একটি শয়নকক্ষে অনীতা বিছানার উপর বসেছিল দুই হাতের উপর নিজের মুখভার রক্ষা করে' এবং সামনের দিকে ঈষৎ ঝুঁকে। মাথায় ঘোমটা ছিল না। কপালের উপর গালের উপর দুলছিল অবিন্যস্ত কালো কুঞ্চিত অলকদাম। চোখের দৃষ্টি সপ্রশ্ন, ভ্রূযুগল কুঞ্চন। অদ্ভুত একটা বঙ্কশ্রী ফুটে উঠেছিল তার মুখে। সুশোভন সামনের একটা টেবিলে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

"তোমরা শুধু শুধু মিছে কথা বললে কেন বলতো"—অনীতা প্রশ্ন করছিল—"সান্ত্বনা বরাবর এখানেই ছিল, সে কথা তুমি জানতে, অথচ আমাকে এ মিছে কথা বলবার কি দরকার ছিল"

"তোমার কাছে মিছে কথা বলা উদ্দেশ্য ছিল না আমার"

"স্পষ্ট বললে আর বলছ উদ্দেশ্য ছিল না"

"তোমার কাছে বলা উদ্দেশ্য ছিল না। তোমার মায়ের জন্যেই বলতে হ'ল"

"দেখ, তোমাকে অবিশ্বাস করি নি কখনও। তোমাকে বিশ্বাস করতেই চাই। কিন্তু এর পর কি করে' তা করব বল। মা অবশ্য তোমার উপর চটা, তোমাকে সন্দেহ করেন, সবই ঠিক। এজন্যে মায়ের সঙ্গে আমার ঝগড়াও হয়ে গেছে। কিন্তু তুমি মিথ্যে কথা বলবে কেন। মায়ের কাছেই বা বলবে কেন। কি দরকার—"

"ছেড়ে দাও না ওকথা। দরকার ছিল বলছি—"

"কি দরকার"

"কি"

অনীতা উঠে পড়ল। মাথার এক ঝাঁকানিতে মুখের চুলগুলো সরিয়ে উঠে দাঁড়াল। তারপর মেজেতে নেবে জানলার ধারে দাঁড়াল সুশোভনের দিকে পিছন ফিরে। পরমুহূর্ত্তেই বন্ধ দ্বারের সামনে পরেশ এসে বলে' গেল—"চা দেওয়া হয়েছে মা, আপনারা আসুন"

সুশোভন টেবিলের উপর ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল এবং অনীতাকেই দেখতে লাগল ভুরু কুঁচকে। ভাবতে লাগল এই সামান্য ব্যাপারেই অনীতা যদি এমন বেঁকে দাঁড়ায় তাহলে শেষ পর্য্যন্ত তাকে সব কথা সে বলবে কি করে'। সে অকপটে সব কথা বলতেই চায় তাকে। কিন্তু—

"ওই সান্ত্বনা না কি"—হঠাৎ অনীতা জিগ্যেস করলে।

সুশোভন জানলার ধারে গিয়ে তার পাশে দাঁড়াল। দেখলে সান্ত্বনা এবং ব্রজেশ্বরবাবু পাশাপাশি আসছেন মন্থর গতিতে। সান্ত্বনা হাত নেড়ে নেড়ে কি যেন বলছে ব্রজেশ্বর শুনছেন। ডাক্তাররা যে রকম সহানুভূতিপূর্ণ ভদ্র মনোযোগ সহকারে রোগীর মুখ থেকে রোগের বিবরণ শোনেন ব্রজেশ্বরের মুখভাব অনেকটা সেই রকম দেখাচ্ছিল।

"হ্যাঁ, ওই সান্ত্বনা। আলাপ হলে দেখবে চমৎকার মেয়ে"

"বেশ বয়স হয়েছে তো। আমি ভেবেছিলাম বুঝি..."

"হ্যাঁ। কিন্তু আলাপ হলে দেখো লোক খুব ভাল"

"ব্রজেশ্বরবাবুও মিথ্যে কথা বললেন! আচ্ছা, তোমরা দু'জনেই মিথ্যে কথা বলতে গেলে কেন বুঝতে পারছি না"

অনীতা ঘুরে দাঁড়াল এবং চোখের উপর থেকে চুলগুলো সরিয়ে নিলে।

"সত্যি কথা বলতো। আরও কিছু কি লুকোচ্ছ আমার কাছ থেকে?"

ভ্রূযুগল ঈষৎ উত্তোলন করে' ক্ষণকাল নীরব হয়ে রইল সুশোভন। তার পর বললে—"সবটা বলা হয় নি অবশ্য এখনও"

"ও"

কিছুক্ষণ নীরবতা।

"সব বল আমাকে"

"বলব বই কি। বলতেই তো চাই। কোনও অন্যায় কাজ করি নি তো। কিন্তু সবটা বুঝিয়ে বলতে একটু সময় লাগবে। তুমি চুলটা আঁচড়ে নাও। কাপড় ছাড়বে না? চা দিয়েছে যে—"

ঘরের এক কোণে ড্রেসিং টেবিল ছিল একটা। সেইটের দিকে ফিরে অনীতা বললে—"আমি চুলটে আঁচড়ে নি চট্ করে'। তুমি ততক্ষণ যতটুকু পার বল না, আঁচড়াতে আঁচড়াতেই শুনি—"

ঈষৎ বেঁকে অনীতা বেণী-রচনায় মন দিলে। সুশোভন গলা খাঁকাড়ি দিলে একবার সাড়ম্বরে। কোনও দরকার ছিল না। আড়চোখে একবার আয়নায়-প্রতিফলিত অনীতার মুখের দিকে চেয়ে দেখলে। মনে হল সুবিধের নয়। চোখের দৃষ্টি চকমক করছে। যে কোনও মুহূর্ত্তে ফেটে পড়তে পারে। বিপজ্জনক মুখভাব।

"ঠিক কোন জায়গাটা থেকে আরম্ভ করি বুঝতে পারছি না। ট্রেন তো ফেল করলাম, তোমার কাছে তাড়াতাড়ি পৌঁছবার জন্য ট্যাক্সি ভাড়া করলাম একটা, সান্ত্বনাও জুটল সঙ্গে। এ সব তো শুনেইছ—"

"হ্যাঁ। তুমি সান্ত্বনাকে নিয়ে হোটেলে এলে। সেখানে কাল সমস্ত রাত্রি ছিলে। সমস্ত রাত্রি ছিলে কি? সান্ত্বনা কখন এসেছে এখানে? এইটেই আমি জানতে চাই"

"আজ"

"কি করে'?"

"মোটরে করে'। যে মোটরে আমরা এসেছিলাম। সেই ট্যাক্সিটা—"

"মোটর তাহলে খারাপ হয় নি?"

"হয়েছিল। গণেশ সেটাকে ঠিক করলে"

"গণেশ? ব্রজেশ্বরবাবুর ডাক নাম?"

"গণেশ হচ্ছে সেই ট্যাক্সি ড্রাইভার"

"সান্ত্বনার সঙ্গে এখানে এল কে তবে? তুমি এলে না কেন?"

"আমিই এসেছিলাম"

অনীতা ঘাড় ফিরিয়ে চাইলে সুশোভনের দিকে। এক গোছা কোঁকড়ানো চুল এসে পড়ল গালের উপর। সেটা সরিয়ে দিলে অনীতা ক্ষিপ্র হস্তে।

"আবার মিছে কথা বলছ নিশ্চয়। আচ্ছা, তোমরা তখন থেকে এত মিছে কথা বলছ কেন"

"তোমার মায়ের ভয়ে"

"মাকে ভয় কি"

"এমন অমিতবিক্রমে এতদূর পর্য্যন্ত যিনি ধাওয়া করে' আসতে পারেন তাঁর উপর ভরসা করি কি করে' বল"

"যেহেতু তিনি এসেছেন মিছে কথা বললেই সেটা মিথ্যে হয়ে যাবে? তাছাড়া ব্রজেশ্বরবাবু মিছে কথা বলছেন কেন! তাঁর তো মাকে ভয় করার দরকার নেই"

"ওটা বোধহয় ওঁর স্বভাব। রাজনীতি করেন কি না। তাছাড়া সান্ত্বনার—মানে নিজের স্ত্রীর সম্মান রক্ষা [illegible]

বলেছেন বোধহয়। ওঁর স্ত্রীকে কেউ সন্দেহ করে এটা বোধহয় উনি চান না"

"হ্যাঁ, সে বিষয়ে একটু বেশী সজাগ মনে হচ্ছে। আসবামাত্রই স্ত্রীকে নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু এতে সন্দেহ করবারই বা কি আছে। মোটর অ্যাকসিডেন্ট হয় না? মোটর অ্যাকসিডেন্ট হ'য়ে তোমরা একটা হোটেলে এসে ছিলে, এতে মা-ই বা দোষ ধরবেন কেন—সব কথা যদি তাঁকে খুলে বল তোমরা—"

"তিনি দোষ ধরবেন বলে' দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে এসেছেন। তাঁকে নিরস্ত করা সহজ কাজ নয়। বদ্ধপরিকর পুরুষকেই সামলানো শক্ত, উনি তার উপর স্ত্রীলোক—"

"উনি সম্পর্কে তোমার মা হন সে কথাটা মনে রেখ। বিয়ে হয়ে থেকে তুমি ওঁর সঙ্গে বনিয়ে চলতে পারছ না; তুমি যদি ওঁকে শ্রদ্ধা না কর উনি তোমাকে ভালবাসবেন কি করে; বাজার লোক, তুমি ওঁর জামাই—"

অনীতা এমনভাবে খোঁপার কাঁটা গুঁজলে যেন শত্রুর বুকে ছুরি হানছে।

"ও রকম স্ত্রীলোক আমি আর কখনও দেখি নি। পৃথিবীতে আর কোথাও আছে কি না জানি না। প্রতিহিংসা না জিঘাংসা—ওই যে কি একটা কথা আছে—তা যে কোনও নারীর হৃদয়ে এতখানি থাকতে পারে তা আমার কল্পনাতীত ছিল। ওঁর সামনে আমি দাঁড়াতেই পারি না। মোপলা দস্যুদল, মারাঠা বীর বা পাঞ্জাবী গুণ্ডা হয়তো পারে, আমি পারি না। আমি নিরীহ ভদ্রলোক—সাংঘাতিক কিছু করা আমার সাধ্যাতীত। উনি আমার কথা বিশ্বাস করতেন না জানি, তাই মিথ্যের আশ্রয় নিতে হয়েছিল। তুমি করবে, কিন্তু উনি করবেন না, উনি আলাদা জাতের লোক"

"আমার মায়ের সম্বন্ধে খবরদার ওরকম করে' বোলো না বলছি"—কেঁপে উঠল অনীতার ঠোঁট দুটো—"তিনি আমার জন্যেই এত করেছেন, আমাকে ভালবাসেন বলে'"

"এবং আমাকে ঘৃণা করেন বলে'"

অনীতা ক্ষিপ্রহস্তে খোঁপাটা জড়িয়ে ঘুরে দাঁড়াল।

"এর বেশী আর কিছু নেই আশা করি তোমার বলবার"

"এখন এই পর্য্যন্তই থাক না। চা খেয়ে বাকীটা—"

অনীতা এর পর যা করলে তা অপ্রত্যাশিত। দড়াম করে' বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল সে উপুড় হ'য়ে বালিশে মুখ গুঁজে।

"অনীতা, ছি ছি কি করছ তুমি—"

"যাও তুমি, নীচে গিয়ে সান্ত্বনার সঙ্গে চা খাও গিয়ে"

"তুমিও চল"

"আমি যাব না। চা খাব না আমি। মাথা ধরেছে আমার"

মিনিটখানেক হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে সুশোভন নীচে নেমে গেল অবশেষে।

সব শুনে সুরেশ্বরী বললেন, "আহা, মাথা ধরবেই তো। আসামাত্রই ওকে এক কাপ চা খাইয়ে দেওয়া উচিত ছিল আমাদের। সে কথাটা মাথাতেই এল না কারও"

"আমারই আসা উচিত ছিল। সব গুলিয়ে ফেলছি"—দিগ্বিজয় বললেন।

"তোমার দোষ কি। আমি বাড়ির গিন্নি আমারই ভাবা উচিত ছিল"

সমস্যা জটিলতর হবার পূর্ব্বেই সুরেশ্বরী দেবী ভাবলেন আগে অনীতাকে চা-টা খাইয়ে আসা যাক, তারপর ধীরেসুস্থে ঠিক করা যাবে দোষটা আসলে কার।

নিজেই এক কাপ চা নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগলেন। ডিশে খান দুই মাখন-মাখানো টোষ্টও ছিল। কিন্তু চা চলকে পড়ে সেগুলোর এমন জবজবে অবস্থা হল যা প্রায় অনীতারই মনোভাবের অনুরূপ। সুরেশ্বরী এই রকম একটা কিছু আশঙ্কাও করছিলেন। হাত কাঁপছিল তাঁর। যখন তিনি উপরে উঠে অনীতার ঘরের দ্বারপ্রান্তে এসে হাজির হলেন তখন টোষ্ট পুডিং হয়ে গেছে প্রায়।

তাঁর গলা শুনে অনীতা তাড়াতাড়ি উঠে কপাট খুলে দিলে। একটু লজ্জিতও হল। চা খেলে।

"চল না নীচে", সুরেশ্বরী দেবী ইতস্ততঃ করে' বললেন একবার।

"যাচ্ছি একটু পরে"

"সুশোভনকে পাঠিয়ে দেব কি"

"না থাক। মাথাটা বড্ড ধরেছে। একটু ঘুমুই"

"সেই ভালো। ঘুমোও তাহলে

সুরেশ্বরী দেবী নেমে এলেন ভয়ে ভয়ে। সান্ত্বনা চুপি চুপি এসে জিগ্যেস করলে, "আমি গিয়ে কি আলাপ করব একটু?"

"না। একলা থাক খানিকক্ষণ"

সুশোভন চা খেয়ে দিগ্বিজয়বাবুর দিকে চেয়ে বললে, "একটা চক্কোর দিয়ে আসা যাক, কি বলেন"

"হ্যাঁ, বেশ তো। ওই পশ্চিম দিকটায় যাও। বেশ ফাঁকা মাঠ আছে। ঝোপ ঝাড়ও আছে। বেশ নির্জ্জন ওদিকটা। একটা ছড়ি নেবে?"

একটা ছড়ি দিলেন তাকে। ছড়ি হাতে বেরিয়ে পড়ল সুশোভন। কিছুদূর গিয়েই সে ছড়ি চালাতে লাগল পথের দুধারের গাছপালার উপর। অনুপস্থিত শ্বশ্রূমাতার উপরই লাঠি চালাচ্ছে যেন। না, আর সে খাতির করবে না, লড়েই যাবে সে এবার ভদ্রমহিলার সঙ্গে। এস্পার ওস্পার করতেই হবে যাহোক একটা। অনীতাকে নিয়ে সরে' পড়বে সে—বিলেত পালাবে—।

...অনেক দূর হাঁটলে সে। একটা গাছতলায় বসে' পড়ল অবশেষে। হাত পা আর চলছে না যেন। উপরের দিকে চেয়ে দেখলে নির্মেঘ নীলাকাশ। একটু আগেই বৃষ্টি হয়ে গেছে। সোঁদাসোঁদা মাটির গন্ধ উঠছে চারিদিকে। চমৎকার। লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল সুশোভন গাছতলায়। ভাবতে লাগল—ইংরেজ সমাজে শুনেছি

পুরুষদের কাছে শাশুড়ী একটি ভয়ঙ্কর চীজ। আমাদের সমাজে মেয়েরা শাশুড়ীর ভয়ে অস্থির হয়। আমি ইংরেজও নই মেয়েও নই, অথচ আমার কপালেই এরকম খাণ্ডার শাশুড়ী জুটে গেল। উঃ! জ্বালিয়ে মেরেছে! ওহো, গোঁসাইজির হোটেলে সেই দোকানদারের সাইকেলটা পড়ে আছে। কেউ আবার নিয়ে না যায়। কাল যা হয় ব্যবস্থা করতে হবে একটা। অনীতার রাগটা কমলে যে এখন বাঁচা যায়। সব কথা বুঝিয়ে বলার সময়ও দিচ্ছে না যে—এমন অবুঝ আর অভিমানী—কি করা যায়! ভাবতে লাগল। ধীরে ধীরে চোখের পাতা বুজে এল তার।

অনেকক্ষণ পরে সুশোভন যখন ফিরল তখন সুরেশ্বরী দেবী বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলেন! সুশোভনের জামা ভিজেছে, কাপড়ে কাদা লেগেছে—চুল উসকো-খুসকো, চোখের দৃষ্টি উদভ্রান্ত গোছের। সুরেশ্বরী দেবীর আশঙ্কা হ'ল আত্মহত্যা করবার চেষ্টা করছিল না তো।

সুশোভন একটু অপ্রস্তুত ভাবে বললে—"একটা গাছতলায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম"

"ওমা, সে কি!'

"ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম বড্ড"

"তাতো হবেই। বিছানায় শুয়ে ঘুমুলেই হ'ত"

"অনীতা এখনও ঘুমুচ্ছে বোধহয়"

"সে তো চলে গেছে"

"চলে গেছে?"

"হ্যাঁ, সে চলে গেছে"

"কোথায়"

"সদারঙ্গবাবু এসেছিলেন—তিনি এর আগেও বোধহয় এসেছিলেন একবার আজ। তিনি—"

"সেই লোকটা আবার ধাওয়া করেছে এখান পর্যন্ত! সাংঘাতিক তো! ভদ্রলোককে চেনেন আপনারা?"

"হ্যাঁ, একটু আধটু চেনা আছে। ভারী পরোপকারী লোক শুনেছি। তোমার সঙ্গেও তো আত্মীয়তা আছে শুনলুম শ্বশুরবাড়ীর দিক দিয়ে"

"থাকলেই বা! এমনভাবে এসে অনীতাকে নিয়ে যাওয়াটা ভারী অদ্ভুত লাগছে কিন্তু"

সুশোভনের কথার সুরে থতমত খেয়ে গেলেন সুরেশ্বরী একটু। এই রকমই কিছু একটা আশঙ্কা করছিলেন তিনি। সামলে নিয়ে তবু বললেন, "না, না, ভয়ের কিছু নেই। তিনি অনীতার মায়ের কাছ থেকে চিঠি এনেছিলেন একটা। সেই চিঠি পেয়ে অনীতা চলে গেল। আমি অনীতাকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম যে তোমাকে না বলে' এমনভাবে চলে যাওয়াটা কি ঠিক হবে! কিন্তু রাগ হয়েছে মেয়ের, কিছুতে শুনলে না আমার কথা, চলে গেল"

"কতক্ষণ হ'ল গেছে?"

"তা অনেকক্ষণ হবে। আমার মোটরটা করেই গেল। মোটর ফিরছে বোধহয় এতক্ষণ"

"সদারঙ্গবিহারীও গেল সেই মোটরে?"

"না। তাঁর তো নিজের মোটর বাইকই ছিল, তাতেই গেছেন তিনি। আমি তাঁকে বলে দিয়েছি যে তিনি যেন অনীতাকে আর তোমার শাশুড়ীকে বুঝিয়ে বলেন যে এ নিয়ে রাগারাগি করবার কিছু নেই। অনর্থক কেন মাথা খারাপ করছেন তাঁরা। কিছুই তো হয় নি। সান্ত্বনার কাছে সব শুনেছি আমি—"

"কি বললেন শুনে"

"বললেন আমি এসব ব্যাপারে জড়াতে চাই না নিজেকে"

"কিন্তু সমস্তক্ষণই তো এসব ব্যাপারেই জড়িয়ে রেখেছেন নিজেকে দেখছি। উঃ, আচ্ছা এক চিটেগুড়ের পাল্লায় পড়া গেছে কাল থেকে। অনীতা কোথায় গেছেন বলতে পারেন? মানে, তাঁর মা কোথায় আছেন এখন? সেই হোটেলেই, না আর কোথাও"

"তাতো জানি না বাবা। গাড়িটা ফিরলে ড্রাইভার বলতে পারবে। তবে অনীতার মা অনীতাকে যে চিঠিটা লিখেছিলেন সেটা পড়েছিল ওপরের শোবার ঘরে। আমি তুলে রেখে দিয়েছি, পড়ি নি। তুমি যদি পড়তে চাও তো—"

"হ্যাঁ চাই—"

সুরেশ্বরী দেবী চিঠিটা এনে দিলেন।

"ব্রজেশ্বরবাবুরা কোথা?"

"তারাও বেরিয়ে গেছে। ষ্টেশনে গেছে ফেরবার ট্রেনের খবর নিতে। আসবে এখুনি"

সুশোভন ভ্রূকুঞ্চিত করে' চিঠিখানা পড়ছিল।

"উঃ—" হঠাৎ সে বলে' উঠল।

"কি"

"পড়ছি শুনুন। কি ভয়ঙ্কর"

সুশোভন চিঠিখানা পড়তে লাগল।

কল্যাণীয়াসু,

এতক্ষণে তুমি নিশ্চয় আবিষ্কার করিয়াছ যে সুশোভন এবং ব্রজদুলালবাবু আমাদের যাহা বলিয়াছিলেন তাহা সর্ব্বৈব মিথ্যা।

আমি সদারঙ্গের বাসায় বসিয়া এই পত্র লিখিতেছি। ফাৎনা ফিরিঙ্গিপুরের পাশের গ্রাম ছিপচুররামারিতে সে থাকে। তাহার মোটর বাইকের পিছনে চড়িয়া আমি এখানে পৌঁছিয়াছি। পথে অসীম দুর্গতি ভোগ করিতে হইয়াছে। মোটর বাইক উলটাইয়া একটা ঝোপের ভিতর পড়িয়া যাই। পা ছড়িয়া গিয়াছে, কাপড়-চোপড় ছিঁড়িয়া গিয়াছে। এই দুর্ঘটনাটি না ঘটিলে আমি নিজেই তোমাকে আনিতে যাইতাম।

কাল রাত্রে যখন সুশোভন এবং সান্ত্বনা গোঁসাইজির হোটেলে ছিল তখন দৈবক্রমে সদারঙ্গ সেখানে গিয়া পড়ে। সান্ত্বনার সহিত পূর্ব্ব

হইতেই তাহার আলাপ ছিল। সান্ত্বনা নিজে সদারঙ্গের কাছে সুশোভনকে নিজের স্বামী বলিয়া পরিচয় দিয়াছে। তাহারা যে একঘরে এক বিছানায় রাত্রি কাটাইয়াছে একথাও সদারঙ্গ পরে বিশ্বস্তসূত্রে জানিতে পারিয়াছে।

তোমাকে এসব কথা লিখিতে বাধ্য হইলাম—কারণ সত্যকে অস্বীকার করিয়া লাভ নাই। যতই অপ্রিয় এবং কঠোর হউক না কেন, সাহস সংগ্রহ করিয়া তাহার সম্মুখীন হইতে হইবে। সৎসাহস ভিন্ন ব্রহ্মের কৃপালাভ করা যায় না।

অনেক জেরা করিয়া সদারঙ্গের নিকট হইতে একথাও আমি জানিয়াছি যে ওই সান্ত্বনা মেয়েটি একটি নাম-করা মেয়ে। আর একটি ভদ্রলোকের সঙ্গেও উহার নাকি বদনাম রটিয়াছিল। ক্ষীণভাবে মনে পড়িতেছে আমিও যেন সমাজে গুজবটা শুনিয়াছিলাম।

তুমি অবিলম্বে আমার কাছে চলিয়া এস। দিগ্বিজয়বাবুর মোটর আছে শুনিলাম। সম্ভব হইলে সেইটা লইয়া এস। আশা করি এ উপকারটুকু তাঁহারা করিবেন। যদি না করেন তুমি সদারঙ্গের মোটর বাইকের পিছনে চড়িয়াই চলিয়া আসিবে। তাহাকে বলিবে খুব সাবধানে যেন চালায়। বেশী জোরে চালাইবার দরকার নাই।

তুমি আসিলে পরামর্শ করিব কি করা উচিত এখন। সুশোভনের বিলাস-লালসার বহু উপকরণের মধ্যে তুমিও যে একটি তাহার এই ভ্রান্ত ধারণা চূর্ণ করিতে হইবে। সর্ব্বাগ্রে যেমন করিয়া হোক তাহাকে এ বিষয়ে সচেতন করিতে হইবে—আমি করিবই—তাহার পর তুমি যাহা চাও তাহাই হইবে।

আমি গোড়াতেই সন্দেহ করিয়াছিলাম, কিন্তু তোমরা আমার কথায় কর্ণপাত কর নাই। এখন আর চারা নাই। ব্রহ্মের যাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে।

তুমি অবিলম্বে চলিয়া এস। ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষিনী

তোমার মাতা

পুনশ্চ। তোমার বাবা কলিকাতা ফিরিয়া গিয়াছেন।

"এখন আমি সেখানে যাই কি করে'? মানে যেতে হবেই যেমন করে' হোক"—চিঠি পড়া শেষ করে সুশোভন জিগোস করলে।

"এখনই যাবে! সে কি! কাপড় জামা ছাড়, খাওয়াদাওয়া কর বিশ্রাম কর, তারপর ওসব হবে'খন। ওদেরও মনটা একটু খিতুক না"

"না। আমাকে এখনই যেতে হবে। অনীতার সঙ্গে এখনই দেখা করা দরকার—"

"কিন্তু গাড়িটা তো ফেরেনি এখনও"

"আমি হেঁটেই বেরিয়ে পড়ছি। রাস্তায় যদি আপনার গাড়ির সঙ্গে দেখা হয় নিয়ে নেব সেটা। আচ্ছা, চলি, নমস্কার" (ক্রমশঃ)

কৃষির উন্নতি

অধ্যাপক শ্রীসত্যশরণ সিংহ বি-এস্ (ইলিনয়)

ভারতবর্ষ প্রধানতঃ কৃষিপ্রধান দেশ, শতকরা ৯০ জন লোক চাষ আবাদ করিয়া থাকে। বড়ই দুঃখের কথা যে আমাদের দেশের কৃষকরা সারা বৎসর হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের ফলে চাষে যথেষ্ট টাকা করিতে পারে না। তাহারা কোন প্রকারে জীবনটা কাটায়। ভারতবর্ষে ৮২,০০০০০ একর জমিতে ধানের আবাদ হয়। কিন্তু সেই ভারতবর্ষের লোকেদের ক্ষুধা নিবৃত্তি হয় না। পেটভরে না খাইতে পাইয়া রোগে আক্রান্ত হয়। অর্থাভাবে চিকিৎসাও করাইতে পারে না। এক্ষণে আমাদের এমন উপায় অবলম্বন করা উচিত, যাহাতে কৃষকরা ও তাহাদের গাই বলদ পেট ভরিয়া খাইতে পায় এবং তাহাদের স্বাস্থ্য ভাল থাকে।

১৬৯৮ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কোষাধ্যক্ষ Dubois, এ দেশ হইতে যুক্তরাজ্যের South carolina ব্যবসাদারকে এক বস্তা ধানের বীজ উপহার পাঠান। সেই থেকে আমেরিকাতে ধানের আবাদ হইতেছে। এ দেশে একর পেছু গড় পড়তায় ৮৮০ পাউণ্ড ধান উৎপন্ন তাহার কারণ কি? বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার বা বৈজ্ঞানিক উপায়ে ভূমির উর্ব্বরতা শক্তি বৃদ্ধির বিশেষ কোন প্রয়াস পায় নাই। তাহারপর, অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টির দায় হইতে রক্ষার কোন বিধানই আমাদের চাষীরা করিতে পারে নাই। এ দারুণ জীবন সংগ্রামের দিনে বেকার ও অনাহারের সংখ্যা দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে এবং কিরূপে জনসাধারণের অন্ন সংস্থান হয়, তাহার উপায় উদ্ভাবন করিতে সকলেই বিশেষতঃ গভর্ণমেণ্ট ব্যতিব্যস্ত।

কৃষি কলেজে বা কৃষি স্কুলে পড়িলে বৈজ্ঞানিক কৃষি বিষয়ে জ্ঞান হয়। আজ যদি আমাদের কৃষকরা কৃষি স্কুলে পড়া শেষ করিয়া চাষবাস করিত। তা হইলে আমার খুব বিশ্বাস তাহারা চাষে বিশেষ লাভবান হইতে পারিত। ভাল বীজ, হাড়ের গুঁড়া, পাম্প প্রভৃতি কোথায় পাওয়া যায়? দাম কত? মাটী পরীক্ষা করাইয়া লইব বা কাহাকে দিয়া? কার্মের মাটীর উর্ব্বরতা শক্তি কমিয়া যাইতেছে

দেশের কৃষকের মত শিক্ষিত নহে বলিয়া ঐ সারের আবশ্যকতা বোঝে না।

কৃষির উপর ভদ্র সন্তানগণের দৃষ্টি পড়ুক ইহা সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়। বড়ই দুঃখের কথা যে তাহাদের জন্য পশ্চিমবঙ্গে একটী কৃষি কলেজ নাই। আজ ৯১ বৎসর হইল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব বা affiliated কৃষি কলেজ নাই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বহুদিন পরে স্থাপিত হয়, তথায় কৃষি কলেজ আছে। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কৃষিতে ডিগ্রি দেওয়া হয়। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে বাংলা দেশে বহু স্থানে ইণ্টারমিডিয়েট ও ডিগ্রি কলেজ স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু কেহই কৃষি কলেজ স্থাপন করিবার মত টাকাও দেন নাই, চেষ্টাও করেন নাই। মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত কাঁদীতে একটী ইণ্টারমিডিয়েট কলেজ করিবার টাকা মজুত আছে। আমার মতে উক্ত টাকায় কৃষি কলেজ করিলে পশ্চিমবঙ্গে একটী কৃষি কলেজ হয়।

কার্য্যতঃ দুই প্রকারে শিক্ষিত ব্যক্তিগণ কৃষিকার্য্যে সফল হইতে পারেন, যথা—যাহারা অধিক পরিমাণে মূলধন সংগ্রহ করিতে পারেন, তাঁহাদিগের পক্ষে অধিক পরিমাণে জমি লইয়া নির্ব্বাচিত কয়েকটী ফসল উৎপাদন করা এবং যাহাদের মূলধন কম তাঁহাদের পক্ষে ব্যবসায়িক সব্জী (market gardening) উৎপাদন।* আরও এক শ্রেণীর কৃষিকার্য্য আছে যেমন Seed farming। নানা প্রকার ফসলের বীজ উৎপাদন। উৎকৃষ্ট বীজের অভাবে তেমন ফসল হইতেছে না। বাছাই করা গাছ হইতে বীজ উৎপাদন করিয়া বীজ বিক্রির ব্যবসা করিলে লাভজনক হইবে।

ভাল বীজ কোথায় পাওয়া যাইবে? আমি দেশীয় Seed merchant দের নিকট হইতে বীজ কিনিয়া দেখিয়াছি যে তাহাদের সব বীজ অঙ্কুরিত হয় না। Sutton'এর বীজ যদিও দাম বেশী, সমস্ত বীজই অঙ্কুরিত হয়। গভর্ণমেণ্ট যে সব improved seeds বিক্রয় করেন তাহাও সব অঙ্কুরিত হয় না। সে সব বীজ ব্যবহার করিয়া আমাকে কখন কখন ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছে।

"খাদ্যদ্রব্য অধিকতর উৎপাদনে"র জন্য যে প্রচার কার্য্য চালান হইতেছে, তাহা সার্থক করিয়া তোলা কর্ম্মিগণের উপর নির্ভর করে। আমার মতে প্রত্যেক জেলায় প্রচার কার্য্যের জন্য অন্ততঃ পাঁচজন করিয়া কর্ম্মচারী নিযুক্ত করা প্রয়োজন। উক্ত কর্ম্মচারীগণের যতদূর সম্ভব পতিত জমিগুলিতে খাদ্য রোপণের, শাক-সব্জী প্রভৃতির আবাদ যাহাতে হয়, তাহা দেখা দরকার। চাষীদের উন্নততর বীজ এবং সারের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া দরকার। বৃষ্টির উপর অধিকাংশ আবাদী জমিই নির্ভর করে, সুতরাং প্রত্যেক জেলায় এগ্রিকালচারাল ইঞ্জিনিয়ার নিযুক্ত করা প্রয়োজন; ইহাদের কাজ হইবে (১) অনাবৃষ্টি হেতু ফসল যাহাতে নষ্ট না হয়, তজ্জন্য স্থানে স্থানে টিউবওয়েল বসাইয়া পাম্প লাগাইয়া জল সেচনের ব্যবস্থা করা (২) প্লাবনের কবল হইতে আবাদী জমি রক্ষা করিবার জন্য স্থানে স্থানে বাঁধ দেওয়া (৩) স্বাভাবিক অবস্থায় প্রয়োজন হইলে নদী হইতে জল আনাইবার ব্যবস্থা রাখা।

আমাদের দেশের কৃষিজীবীরা, জমিদারগণ, সাধারণ ব্যাপারী ও ব্যবসায়ীগণও কৃষি বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষিত নহেন। সুতরাং এই সকল ব্যক্তিগণকে কৃষি বিষয়ে শিক্ষিত করিয়া তোলা প্রয়োজন। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ও ক্যানেডায় দুই মাস অথবা ছয় সপ্তাহ কালের সর্ট কোর্স ও কৃষি বিজ্ঞানে শিক্ষিত করিয়া তোলার যে ব্যবস্থা আছে, আমাদের দেশেও তাহা অনুসৃত হওয়া উচিত। কৃষি বিষয়ক অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ স্থানীয় আবহাওয়া অনুসারে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিবেন। তাহা হইলে "খাদ্য দ্রব্য অধিকতর উৎপাদন" সফল হইবে।

আকবরের সময় ভারতে প্রতি একরে গড়পড়তা ধান ১৩৩৮ পাউণ্ড, গম ১১৫৫ পাউণ্ড, কার্পাস ২২৩ পাউণ্ড উৎপন্ন হইত। বর্ত্তমানে ক্রমশঃ ফসলের ফলন কমিতেছে। আমাদের কৃষকরা জানেনা যে তাহাদের মাটি কি আহার্য্য পদার্থ চায় এবং তাহাদের ফসল কি কি আহার্য্য পদার্থ ও তাহা কতটা পরিমাণে জমি হইতে লইতেছে। সেই মত সার প্রয়োগের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

পুরাতন গোবর সার ভাল বটে, কিন্তু তাহাও কৃষকরা যথেষ্ট পরিমাণে পায় না। ভাল সার করিতে গেলে গর্ত্ত করিয়া গর্ত্তের উপর একটা ছাউনি বাঁধিয়া সেই গর্ত্তের মধ্যে গোবর রাখা উচিত। গোবরকে রৌদ্র এবং বৃষ্টি হইতে রক্ষা করা একান্ত দরকার। গোবর রাখিবার পূর্ব্বে গর্ত্তটার তলায় এবং চারি পাশে ভাল করিয়া পিটিয়া কাদা দিয়া পুরু করিয়া লেপিয়া লইলে গোবরের রস গর্ত্তে শুষিয়া যাইতে পারে না। গোচনাও মূল্যবান সার। ইহাও গোবরের গর্ত্তে ফেলা উচিত। এই-রূপে গোবর রাখিলে ৪।৫ মাস পরেও জমিতে দেওয়ার উপযুক্ত হয়।

বাগানের বা ক্ষেত্রের ঘাস, জঙ্গল, লতা পাতা, ক্ষেত্রের আগাছা, কচুরিপানা ইত্যাদি কিছুই নষ্ট করিতে নাই। এসব এক স্থানে পাঁকের নীচে গাদা করিয়ে বিশেষ উপায়ে পচিয়ে, compost অর্থাৎ আবর্জ্জনা পচা সার তৈরী হয়। গোবরের বদলে এর ব্যবহারও করা যায়।

অনেকের ফলের বাগান আছে। ফলের বাগানের যত্নও আমরা করি না। বাগানের গাছগুলি বৎসর বৎসর আমাদিগকে খাওয়াইতেছে। কিন্তু আমরা তাহাদিগকে খাওয়াইতেছি কি? গাছের বয়স অনুযায়ী হাড়ের গুঁড়া ও গোবর বা এমোনিয়ম সালফেট প্রয়োগের দরকার। তাহ'লে প্রায় ডবল ফল পাওয়া যেতে পারে। গাছের জন্য ক্ষার, মাছের

* আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাঁহার এক পত্রে আমাকে লিখিয়াছিলেন: "কৃষি বিদ্যা সম্বন্ধে আমার মত অন্য রকম। বারাকপুরের আসে-পাশে পশ্চিমা millhands বসতি করিয়া চাষ-বাস করে অর্থাৎ তরিতরকারী জন্মায়। ইহারা বেশ দু'পয়সা রোজগারও করে। ইহার কারণ বাপে ছেলেতে এবং অপরাপর পরিবারবর্গ স্বহস্তে মেহনৎ করে। আর আমাদের যুবকগণ হাত-পা কোলে করিয়া বসিয়া মজুর খাটাইবে

সমূলে বিনাশ করিতে হইবে। ফলের বাগানকে লাঙ্গল দিয়ে তৃণহীন করিয়া রাখা দরকার। সরকারের লোক কেন এ সব শিক্ষা দেন না ?

পৃথিবীর মধ্যে ভারতের গাই সবচেয়ে কম দুধ দেয়। প্রতি গাই বৎসরে গড়ে মাত্র ৭৫০ পাউণ্ড দুধ দেয়। গাই দুধ যে বেশী বা কম দেয় তাহার মোটামুটি কারণ এইগুলি :—

(১) জাত—ভাল জাতের গাই বেশী দুধ দেয়, ইহা সকলেই জানেন। খারাপ জাতের গাইকে যতই খাওয়ান যাইবে, তার শক্তির বেশী দুধ সে দিতে পারিবে না।

(২) বংশ—এক জাতের মধ্যে কোন গাই বেশী বা কম দুধ দেয় ; ইহার জন্য দায়ী তার বংশ ; অর্থাৎ তাহার মা, ঠাকুরমা, দিদিমা, বেশী দুধ দিয়া থাকিলে সেও বেশী দুধ দিবে। (ইহার ব্যতিক্রমও হইয়া থাকে।)

(৩) খাদ্য—উপযুক্ত খাদ্যের উপর দুধের কম বেশী নির্ভর করে। ক্ষার মিশ্রিত খড় খাওয়ালে দুধ বেশি পাওয়া যায়। উপযুক্ত পরিমাণে কাঁচা ঘাসও গাইকে খেতে দিতে হবে।

(৪) বয়স—সাধারণতঃ ৩,৪ বিয়ানী পর্য্যন্ত গাই সবচেয়ে বেশী দুধ দেয়, তাহার পর দুধ কমিতে থাকে।

যাঁহারা গোপালন (ডেয়ারি ফার্মিং) করিবেন, তাঁহাদিগকে সর্ব্বদা গো-খাদ্যের মূল্যের উপর দৃষ্টি রাখিতে হইবে। সস্তায় উপকারী খাদ্য কিনিতে হইবে এবং অপচয় বা চুরি না হয় সেদিকে নজর রাখিতে হইবে। আর দেখিতে হইবে গাই যেন স্বল্পদুগ্ধা না হয়। অন্ততঃ ৭।৮ সের দুধ দেয় এমন গাভী গোপালনের ব্যবসায় উপযোগী। গোয়ালের পরিচ্ছন্নতার উপর বিশেষ নজর রাখা দরকার। অপরিচ্ছন্নতা হইতে রোগের সৃষ্টি হয়।

বলিষ্ঠ উৎকৃষ্ট জাতীয় ষাঁড়ের সংখ্যা খুব কম। সংখ্যা বৃদ্ধি করার জন্য বলিষ্ঠ উৎকৃষ্ট ষাঁড় দরকার। তাহা কোন কোন ডিষ্ট্রীক্ট ফার্মে বা ডিষ্ট্রীক্ট জেল ফার্মে থাকে। প্রজননের জন্য গাইকে তথায় লইয়া যাওয়া হয়।

চাষের খানিকটা জমি গোচারণ উদ্দেশ্যে ছাড়িতে হইবে। ইউনিয়ন বোর্ডের অধীনে প্রত্যেক গ্রামে বিনা মূল্যে গরু চরাইবার জন্য খানিকটা মাঠ থাকা দরকার। আমাদের চাষীদের পশুখাদ্য যেমন নেপিয়ার ঘাস, এলিফেন্ট, রোডস্, হনি লোকাষ্ট, সেন্টিপিডি গ্রাস, মরিপিয়াস্ বিল প্রভৃতি জমি হইতে উৎপাদন করিতে হইবে। ইংলণ্ড ও আমেরিকাতে দেখিয়াছি যে বাঁধা কপি, শালগম, ম্যাঙ্গেল প্রভৃতির আবাদ করা হয় এবং ঐ সব গাইকে খাওয়ান হয়। আমরা কি আশা করিতে পারি না যে স্বাধীন ভারতের গাইএর অদৃষ্টে ঐ রকম "ডিনার" জুটবে ? দুগ্ধবতী গাভী সুখে চরে যেথায়, সভ্যতা বিরাজে তথায়।

দেশের নিদারুণ অন্ন সমস্যার কথা ভেবে অনেকেই এখন শিক্ষিত দেন। আমার মতে অগ্রে তাহাদের কৃষি সর্ট কোর্স লওয়া উচিত। তাহলে চাষে লাভবান হইবার সম্ভাবনা।

গ্রামে লোকের আজ সুখ নাই। ঘরে ঘরে ম্যালেরিয়া রুগী। এক্ষণে বেকার যুবকদের গ্রামে যাওয়া ও গ্রামের সব রকম উন্নতি করা যেমন মাছের চাষ, মজা পুষ্করিণীর পঙ্ক উদ্ধার, সুতা কাটা ও বয়নের প্রসার। ঔষধ বিতরণ, তসর ও চর্ম্ম শিল্পের উন্নতি, পাঠাগার ও চাষীদের জন্য ক্লাব স্থাপন, গ্রাম্য দেবালয় ও দেবতার ভার ও দেবসেবার সমুদয় কার্য্য স্কন্ধে লইয়া পল্লীকে পুনর্জীবিত করার সময় আসিয়াছে। সহরকে কিয়ৎ পরিমাণে পল্লীতে টানিয়া আনিতে হইবে এবং জীবিকা উপার্জ্জনের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

সরকারের জেলায় জেলায় ডিষ্ট্রীক্ট ফার্ম আছে ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদ, প্রভিনসিয়াল এগ্রিকালচারাল রিসার্চ কমিটি ও আরো কত অসংখ্য কমিটি নয়াদিল্লীতে হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে। এ সকলের নামও ডিষ্ট্রীক্ট ফার্মের নাম আমাদের চাষীরা জীবনে কখনও শুনে নাই। গবেষণার ফলও চাষীদের জানান হয় না। সরকার তাহাদের তাহা জানাবার চেষ্টাও করেন না। চাষীদের বাদ দিয়া সব কাজ করা হয়। চাষবাসের উন্নতি না হওয়ার ইহা একটি মুখ্য কারণ। ক্যানেডা ও আমেরিকার মত স্বাধীন দেশে যিনি কৃষি-মন্ত্রী হন, তাঁহার কৃষিতে ডিগ্রি থাকে বা তিনি একজন চাষী Born and brought up on farm ; কিন্তু আমাদের এই স্বাধীন ভারতে যাঁহার কৃষিতে ডিগ্রি নাই, তাঁহাকে মন্ত্রী করা হয়। I. C. S. manকে ডিরেক্টার অব এগ্রিকালচার করা হয়। যাঁহাদের কৃষিতে ডিগ্রি নাই তাঁহাদিগকে কোন কোন কৃষি কলেজের হেড বা প্রিন্সিপাল বা ডিরেক্টার নিযুক্ত করা হইয়াছে। এই রকম ব্যক্তির নিকট হইতে কৃষির বা কৃষি কলেজের কতখানি উন্নতি হইতে পারে তাহা পাঠকগণ বুঝিতে পারেন। এই সব কারণ বশতঃ ভারতে কৃষির উন্নতি হইতেছে না এবং ভারতীয় চাষীরা অন্যান্য দেশের চাষীদের তুলনায় বহু পশ্চাতে ও এক স্তরে নহে। আমার নিজ অভিজ্ঞতাযুক্ত একটী ঘটনা বলিতে বাধ্য হইতেছি। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমাকে একবার বঙ্গীয় প্রভিনসিয়াল কৃষি রিসার্চ কমিটির বৈঠক উপলক্ষে সরকারের খরচায় দার্জ্জিলিং যাইতে হয়। সেখানে একদিন বাংলার কৃষি মন্ত্রীর সহিত আমার "লাঞ্চ" ভোজের সুযোগ হয়। তিনি তখন অন্যান্য প্রসঙ্গের মধ্যে অত্যন্ত আন্তরিকতার সহিত আমার নিকট প্রকাশ করেন, "আমাদের দেশে যাঁহারা কৃষি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ এবং যাহাদের কৃষি কার্য্যের মধ্যে বহুদর্শিতা আছে, এই প্রকার ব্যক্তিকেই কৃষি-মন্ত্রী করাই দেশের পক্ষে মঙ্গল। আমাদের ন্যায় কৃষি অনভিজ্ঞ (layman) লোক দ্বারা কৃষি বিষয় কতদূর কি কার্য্য হইতে পারে ?" এক্ষণে প্রকৃতপক্ষে আমাদের এই স্বাধীনতার যুগে আমি উক্ত মন্ত্রী মহাশয়ের উক্তি মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিতেছি।

কৃষকরা জাতির মেরুদণ্ড। কৃষককুলের উন্নতির উপর জাতির

* এ সম্বন্ধে মৎ প্রণীত প্রবন্ধ ১৯৪১'র ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় Indian

উন্নতি নির্ভর করিতেছে। পৃথিবীতে কৃষকের মত আবশ্যকীয় লোক আর দ্বিতীয় নাই। ইহাদের না হইলে আমাদের এক মুহূর্ত্তও চলে না। আমরা ইহাদিগকে "চাষা" নামে অভিহিত করিয়া থাকি। তাহাদের ফসল ভালরূপ না হওয়ায় খাজনা দিতে অক্ষম হইলে তাহাদের পীড়ন করিয়া থাকি। কৃষকদের উপর একটু সস্নেহ দৃষ্টি একান্ত প্রার্থনীয়। ইহাদের সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী হওয়া উচিত।

কৃষি সম্বন্ধে কতকগুলি পাশ্চাত্য ও দেশীয় ব্যক্তিদের উক্তি উল্লেখ করিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিতেছি :—

(১) "হল চালনা, কোদালি দ্বারা ভূমি কর্ষণ এবং কৃষকের সহিত একত্র বাসই আমার মনে এত স্ফূর্ত্তি ও শারীরিক বলের কারণ"—Life of William Roscoe.

(২) ভ্রাতঃ, অযোধ্যাপুরীতে ' দুর্ভিক্ষ হয় নাই? তুমি সকল ত শস্যপূর্ণ আছে? কৃষকেরা ত স্বকার্য্য পরিত্যাগ করে নাই? কৃষকেরা কোন দস্যু দ্বারা ত প্রপীড়িত হয় নাই?"—রামায়ণ—অরণ্যকাণ্ড (ভরতের প্রতি রামচন্দ্রের প্রশ্ন)

(৩) "ভারতকে ধনী করিবার প্রধান উপায় একমাত্র কৃষিকার্য্য"—Indian agriculturist (William Riach)

(৪) "কৃষকগণ আমাদের জীবন"—John Stuart Mill.

টাট্‌কা ভাজা চানাচুর

শ্রীদীপক গুপ্ত

অবলা মাসীর পাশে আমাকে বোধ করি তবলার পাশে বাঁয়ার মতোই দেখাইতেছিল। মাসীর দৈর্ঘ্যে প্রস্থে উভয় বিরাট বপু, আর আমার প্রস্থ আছে, দৈর্ঘ্য নাই। আমরা তারপাশা হইতে উঠিয়া গোয়ালন্দ-গামী একটি ষ্টীমারের মধ্যম শ্রেণীতে বসিয়াছিলাম। আসিতেছিলাম কলিকাতায়।

ষ্টীমারের নাম 'অস্ট্রিচ্'। সে-দিন সে চিটাগাং মেল লইয়া চাঁদপুর হইতে গোয়ালন্দ আসিতেছিল। যথা সময়ে ষ্টীমার গন্তব্যস্থান গোয়ালন্দ পৌঁছিল। অসংখ্য যাত্রীর ভিড়। কে কাহার আগে গাড়ীতে গিয়া মাল পত্র নিয়া একটু স্থান সংগ্রহ করিয়া বসিবে, তাহার জন্য একটা তাড়াহুড়া পড়িয়া গেল। ইহা ব্যতীত নবরাষ্ট্রের নিয়মানুসারী পথিমধ্যে যাত্রীদের মালপত্র তল্লাসীর বিড়ম্বনা তো আছেই। কয়েক শত কুলি ইতিমধ্যেই ষ্টীমারের উপর উঠিয়া ইতস্ততঃ ছুটাছুটি, মালপত্র টানাটানি এবং দরকষাকষি করিয়া আরোহিগণের প্রাণ ওষ্ঠাগত করিয়া তুলিল।

আমি স্যুটকেসের উপর হোল্ড-অলটিকে রাখিয়া এক কোনে নির্ব্বিকারের মতো বসিয়া আছি। একটি কুলি জিজ্ঞাসা করিল—"যাবেন না বাবু, আপনারা?" বলিলাম —"তোমাদের দয়া হলেই যেতে পারি।" আমার মালের উপর একবার চোখ বুলাইয়া তিন টাকা দিতে রাজী আছি কিনা জানিতে চাহিল। সম্মতি দিলাম। পূর্ব্ব দরকষাকষি করিলে সে-দিনের গাড়ীতে বা ষ্টীমারে যাওয়াতো হয়ই না, পরের দিনও হয় কিনা সন্দেহ।

অবলা মাসীকে মেয়েদের গাড়ীতে তুলিয়া কোনোমতে বসাইয়া দিলাম। অতঃপর কুলি আমার হোল্ড-অল আর স্যুটকেসটিকে একটি মধ্যম শ্রেণীর কামরায় উঠাইয়া দিল। আমিও লাম। কিন্তু দাঁড়াইয়া থাকিতে হইল। এদিক-ওদিক তাকাইয়া দেখিলাম একজন অবাঙ্গালী ভদ্রলোক—বোধ করি ব্যবসায়ী—দুই-তিন জনের বসিবার স্থান জুড়িয়া একটু কাত হইয়া আছেন। ভাবিলাম, ওখানে ব্যবস্থা করা যাইবে, যদিও প্রথমে দুই-একবার "হামার বেমার আছে, বাবুজী" শুনিতে হইবে। তা হউক এইবার কুলিকে বিদায় করিতে হয়। তাহাকে তিন আনা দিলাম। তিন টাকার পরিবর্ত্তে তিন আনা। কালো কুলিতো চটিয়া একেবারে লাল হইল। কহিল—"তিন আনা দিবেন বাবু, তা আগে বলিলেন না কেন?"

"আগে বলিনি কেন? হা হা হা। তা হ'লে কি বাপু তুমিই আসতে, না আমারই আজ যাওয়া হতো? আগে বললে কাজ হ'তো না, সুতরাং যাতে কাজ হয়েছে, তা-ই করেছি।" বলিয়া আবার একটু হাসিলাম।

সে বুঝিল বিশেষ ভালো লোকের পাল্লায় পড়ে নাই। ঘুম হইতে উঠিয়া আজ কাহার মুখ দেখিয়াছে, কে জানে।

নৈরাশ্য ও বিরক্তি ফুটিয়া উঠিল। ক্রুদ্ধ কণ্ঠে কহিল—"এ বহুত খারাপ কাজ আছে, বাবু।"

"হাঁ, কাজটা খারাপই বটে, কিন্তু এক্ষেত্রে ভালো কাজ করার অসুবিধে অনেক। নাও, এবার কেটে পড়ো।" বলিয়া আর একটি আনি হাতে দিলাম। লোকটি আমাকে বিশেষভাবে নিরীক্ষণ করিয়া চলিয়া গেল। মনে হইল, যদি ভবিষ্যতে গোয়ালন্দে ইহার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়, তো আগে ভাড়া হাতস্থ করিয়া পরে আমার মাল শিরস্থ করিবে।

কুলি চলিয়া যাইতে অর্দ্ধশায়িত সেই অবাঙ্গালী ভদ্রলোককে উঠাইয়া বসাইয়া নিজেও একটু বসিলাম। যাত্রীর ভিড়ে গাড়ীতে তিলধারণের স্থান নাই। সহসা নজর পড়িল, গাড়ীতে কত জন "বসিবেক" রেল-কোম্পানী তাহা এককোনে স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া দিয়াছেন। ইহাতে আমাদের যথেষ্ট উপকার হইয়াছে। নতুবা আমরা—তৃতীয় বা মধ্যম শ্রেণীর যাত্রীরা—কামরায় কত জন "বসিবেক" তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিতাম কি? কিন্তু কত জন দাঁড়াইবেক বা বাঙ্কের উপর উঠিবেক্ এ-সম্পর্কে কোম্পানী নীরব।—উদ্দেশ্য হয়তো এই যে, এ বিষয়টা আরোহীগণের গায়ের এবং গলার জোরের উপরই ছাড়িয়া দেওয়া হোক। সদুদ্দেশ্য সন্দেহ নাই। তবে, সময় সময় অধুনা-মিথ্যা-প্রতিপন্ন "অন্ধকূপ-হত্যার" কথা যাত্রিগণের কল্পনায় জাগ্রত হইয়া ওঠে। যাক্, এসব কুলি-কাহিনী ও গাড়ী-কামরার প্রসঙ্গ এখন থাকুক্। টাট্‌কা ভাজা চানাচুরের জন্য নিশ্চয়ই আপনারা উৎসুক হইয়া আছেন। অতএব এখন তাহাই দেওয়া হইতেছে।

ট্রেণ ছাড়িল এবং কিছুক্ষণ পরেই রাজবাড়ী পৌছিল। এখানে হাল্কা ইঞ্জিন পরিবর্ত্তন করিয়া গাড়ীতে ভারী ইঞ্জিন জোড়া হয়। কাজেই রাজবাড়ীতে লম্বযান, অথবা বাষ্পযান মিনিট পনেরো দাঁড়ায়। আমরা বসিয়া বসিয়া দ্বিপ্রহরের দারুণ গ্রীষ্মে সিদ্ধ হইতেছি। এমন সময় একটি সুদর্শন বলিষ্ঠ বাঙ্গালী যুবক আমাদের কামরায় প্রবেশ করিল। তাহার বাঁ-হাতে চানাচুর ভর্ত্তি একটি রেশন-ব্যাগ্, ডান হাতে চানাচুরের একটি প্যাকেট, পরণে খদ্দরের ধুতি, গায়ে ঐ-পাঞ্জাবীর উপর গলাবন্ধ দেশ-প্রেমিক মার্কা ফতুয়া, পায়ে স্যাণ্ডেল। যুবক জনৈক ভদ্রলোকের দিকে তাকাইয়া বলিতে আরম্ভ করিল—"এই যে টাট্‌কা ভাজা চানাচুর। এক আনা প্যাকেট। কত বড় প্যাকেট দেখুন। প্যাকেট তো নয়, যেন একটি বস্তা।"

যুবকের দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া দেখিলাম, সে কোনো ব্যক্তি-বিশেষকে লক্ষ্য করিয়া কথা কহিতেছে না—তাহার দৃষ্টি নিবদ্ধ একটি জানলার কাঠে। এই বিশেষত্বটুকু উপভোগ করিলাম।

তিন-চারটি প্যাকেট বা বিক্রেতার ভাষায় "বস্তা" এরই মধ্যে বিক্রী হইয়া গিয়াছে।

"টাট্‌কা ভাজা ভেজাল-শূন্য চানাচুর। মাত্র এক আনা প্যাকেট। বাঙ্গালীর মূলধনে, বাঙ্গালীর পরিচালনায়, বাঙ্গালীর শ্রমে এবং এই বাংলাদেশেই তৈরী চানাচুর। এই চানাচুরের বিক্রেতা বাঙ্গালী এবং ক্রেতাও অধিকাংশই বাঙ্গালী। সুতরাং আর যা-ই করিনা কেন, বাঙ্গালী হ'য়ে বাঙ্গালীর খাদ্যে ভেজাল মেশাইনি এ বিষয়ে আপনারা নিশ্চিন্ত হ'তে পারেন। তাছাড়া খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল দেওয়ার কথা আমরা কল্পনাও করতে পারিনে—আমাদের শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং বিবেকে বাঁধে। মানুষের খাদ্যে যা'রা ভেজাল দিতে পারে, তা'দের অসাধ্য কাজ নেই—তা'রা খুনী, তা'রা ডাকাত।"

আরো সাত-আটটি প্যাকেট বিক্রী হইল।

"টাটকা ভাজা চানাচুর। অতি সুস্বাদু চানাচুর। একটি খেলে ইচ্ছে হয় আরো ক'টি খাই। যা'রা আজ আমার কাছ থেকে চানাচুর কিনে খাচ্ছেন, তা'রা আবার যখনই এ-রেলপথে কোথাও যাবেন, তখনই আমার চানাচুরের কথা মনে পড়বে এবং সঙ্গে সঙ্গে আমার সুন্দর মুখখানাও হয়তো তা'দের মানস-নয়নে ভেসে উঠ্‌বে—যদিও সৌন্দর্যটা আসলে দেহের জিনিস নয়, মনের।" (একটি পরমাসুন্দরী বিবাহিতা যুবতী চানাচুরওয়ালার দিকে ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাইল। যুবক তাহা দেখিয়াও দেখিল না।) বলিয়া চলিল—"আপনারা অনেকেই হয়তো বাড়ী হ'তে মা-বাপ-ভাই-বোন কিম্বা স্ত্রী-পুত্র-কন্যার কাছ থেকে আসছেন। খালি-মুখে বা বিনা কাজে ব'সে থাকলে বাড়ীর কথা মনে পড়ে। কেউ কেউ দেখতে পাচ্ছি "আনন্দবাজার", "যুগান্তর", "হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড", "অমৃতবাজার", "শনিবারের চিঠি", "ভারতবর্ষ",

"প্রবাসী" প্রভৃতি পাঠে মনোনিবেশ করে বাড়ির কথা ভুলবার চেষ্টা করছেন। অন্যান্য সবাই আমার চানাচুর চিবিয়ে সময় কাটাতে পারেন।"

আরো পাঁচ-ছয়টি প্যাকেট বিক্রী হইল।

"টাট্‌কা ভাজা চানাচুর। এই চানাচুরই যদি সুদৃশ্য প্যাকিং বক্‌স্-এর কোট গায়ে দিয়ে এবং একটি শ্রুতিমধুর নামধারণ ক'রে বিলেত থেকে এদেশে আসতো, তো দেখতে পেতেন খবরের কাগজে বড় বড় বিজ্ঞাপন—দেখতে পেতেন সাধনা দেবী লিখছেন—"নাচ্‌তে নামবার আগে চানাচুর আমার চাই-ই"—অনিল দে এবং প্রমোদ দাশগুপ্ত লিখছেন—"ফুটবল খেলার আগে ও পরে চানাচুর খাই বলেই খেলোয়াড় হিসেবে নাম করতে পেরেছি"—কাননবালা লিখছেন—"প্রাতরাশে এবং বৈকালিক জলযোগে প্রত্যহ চানাচুর ব্যবহার করেন না এমন কেউ সু-অভিনেতা বা সু-অভিনেত্রীরূপে খ্যাতিলাভ করেছেন এরূপ অসম্ভব বলেই আমার মনে হয়।" আর দেখতে পেতেন বিক্রী চরম সীমায় উঠেছে। বিলেত থেকে না এলেও, কিম্বা কোনো প্রকার ভেক-ভড়ং না করলেও আমার এ চানাচুর খাঁটি, মুখরোচক ও স্বাস্থ্যপ্রদ। মূল্য প্রতি প্যাকেট এক আনা।"

আরো কয়েকটি প্যাকেটের খরিদ্দার জুটিল।

"টাট্‌কা ভাজা চানাচুর। অতি সুস্বাদু চানাচুর। কাছে ব'সে এর প্যাকেট খুললেই খেতে লোভ হবে। কিন্তু খিদে না পেলে লোভে প'ড়ে কক্‌খনো খাবেন না। যে-দেশে লক্ষ লক্ষ লোক খিদের সময় খেতে পায় না, অনাহারে বা অর্দ্ধাহারে থাকে সে-দেশে অখিদেয় খাওয়া শুধু পাপই নয়, খুনের অপরাধ। তাছাড়া আপনারা জানেন, অখিদেয় খেলে হজম হয়না, অম্বল হয়, কিম্বা পেটের অসুখ করে। আমি যদি কামালপাশা, আমানুল্লা, হিটলার কিম্বা মুসোলিনী হতুম, তো এদেশে এমন আইন ক'রে দিতুম যে, কারো পেটের অসুখ কিম্বা অম্বলের ব্যারাম হ'লে, তা'কে আদালতে অ হ'তে হ'তো। কেননা, যা হজম করতে পারেন, লোভে পড়ে তার চেয়ে বেশী খেয়ে, অথবা খিদে নেই তবু খেয়ে, খাদ্যের অপচয় তো করেছেনই, অধিকন্তু একজন দরিদ্রকে খাদ্য থেকে বঞ্চিত করে নিজে অসুস্থ হ'য়ে ওষুধ নষ্ট করেছেন। গুরুতর অপরাধ। পৃথিবীতে যতলোক না খেয়ে মরে তা'র চেয়ে ঢের বেশী লোক মরে খেয়ে—অবশ্য দুর্ভিক্ষে মৃত্যুর কথা আলাদা। খাওয়ার ব্যাপারে আমরা অনেকেই কম-বেশী অসংযমী। এজন্যই মহাপুরুষগণ ধর্ম্মের নামে পূজা-পার্ব্বণ উপলক্ষে উপবাসের নির্দ্দেশ দিয়েছেন। এতে হজমশক্তি বেচারাও একটু বিশ্রাম পায়, আর আমরাও ঠেকে একটু সংযমী হ'তে শিখি। প্রসঙ্গক্রমে একটি কথা বলছি—আমাদের গাঁয়ে মজুর শ্রেণীর একটি লোক আছে, বয়স তার একশো পনেরো। একদিন তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, তা'র এই দীর্ঘ-জীবন লাভের উপায় কি। সে বললে—"জানিনে, বাবু। তবে, আমি খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠি, খিদে পেলে খাই, পিপাসা পেলে জল পান করি, যতক্ষণ জেগে থাকি কাজ করি, আর ঘুম পেলে ঘুমোই।" যাক্। আমি সামনের ষ্টেশনেই নেবে যাবো। যদি আর কোনো ভদ্রলোকের দরকার হয়তো নিয়ে নিন্।"

জনৈক খদ্দর-পরিহিত মধ্যবয়সী ভদ্রলোক একধারে বসিয়া সিগারেট খাইতে-খাইতে চানাচুরওয়ালার বিক্রয়-বার্ত্তা একাগ্রচিত্তে উপভোগ করিতেছিলেন। "দেখি, আমাকে দু' প্যাকেট।" বলিয়া তিনি বাঁ-হাতে সিগারেট ধরিয়া ডান হাতে পয়সা বাড়াইয়া দিলেন। তাঁহার হাতে দুটি প্যাকেট দিতে-দিতে যুবক কহিল—"দাদা, কিছু মনে না করেন তো একটা কথা বলি।"

"হাঁ হাঁ বলো।" বলিয়া ভদ্রলোক যুবকের মুখের দিকে উৎসুক দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিলেন। আমরা অন্যান্য যাত্রীগণও শুনিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইলাম।

যুবক বলিল—"আপনার পরণে খদ্দরের ধুতি, গায়ে খদ্দরের পাঞ্জাবী, তাই সাহস করে বলছি। অন্য কেউ হ'লে হয়তো বলতুম না। আচ্ছা দাদা, এই দামী বিলিতি সিগারেটগুলো খাচ্ছেন কেন বলুন তো? কেনো বিদেশী কোম্পানীর জিনিষ কিনে সাহেবদের ঘরে ভারতের পয়সা পাঠাচ্ছেন?

যুবকের কথা শেষ হইবার সঙ্গে-সঙ্গেই ট্রেন কি-একটা ষ্টেশনে আসিয়া দাঁড়াইল। খদ্দর পরিহিত ভদ্রলোক খুবই অপ্রতিভ হইয়াছেন মনে হইল।

তিনি বলিলেন—"কিন্তু এতে আর দোষ কি? এখন তো দেশ স্বাধীন।"

সঙ্গে সঙ্গে যুবক বলিল—"সেই জন্তই আরো এখন দেশের পয়সা দেশেই খাটানো উচিত। কিছু মনে করবেন না দাদা, স্বাধীনতা পাওয়া আব রক্ষা করা এক জিনিষ নয়। দেশের নেতারা অশেষ ক্লেশ, দুঃখ, মৃত্যু প্রভৃতি বরণ করে স্বাধীনতা অর্জন করেছেন, এখন রক্ষা করাব ভার দেশবাসীর ওপর। শুধু খদ্দব পবলেই দেশেব প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা জানানো হ'ল না।" একটু থামিয়া যুবকটি আবার কহিল—"চানাচুরওয়ালা আমি। ছোট মুখে হযতো দু-একটা বড় কথা ব'লে ফেলেছি। ক্ষমা করবেন ছোট ভাই মনে ক'রে। আচ্ছা, দাদারা, চলি এবার। জয় হিন্দ।" বলিয়া সামরিক কায়দায় ডান হাত কপালে ঠেকাইয়া সকলকে অভিবাদন জানাইয়া নামিয়া গেল।

জাহানারার আত্মকাহিনী

অধ্যাপক শ্রীমাখনলাল রায়চৌধুরী

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

আমার পিতার পদধ্বনি শিলাতলে শুনতে পেলাম। আমার ইচ্ছা হল সম্রাট শাহজাহান সমাধিতে একাকীই থাকুন। তাই আমি দ্রুতপদে উদ্যানের দিকে চলে গেলাম। এই উচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত পুণ্যভূমিণও যে আমার তীর্থস্থান—আমার মনে হল যেন আমি হিন্দুর স্বর্গভূমিতে আরোহণ করেছি। আমার চক্ষুর সম্মুখে রক্তপ্রস্তর নির্মিত প্রাসাদভূমি মেরুশীর্ষে পরিণত হবে, তার বৃক্ষশীর্ষ-চুম্বী মেরুর শুভ্র শিখর হবে দেবমন্দির। সম্রাট আকব.রর সমাধি স্পর্শ করে চলে গেছে চতুষ্কোণ বিসর্পিল পথশ্রেণী। তার মধ্যদেশ অতিক্রম করে ক্ষীণ পয়োধারা বয়ে চলেছে। চারিটী নদীশাখা একটী নিভৃত কূপতল হ'তে নিঃসৃত হয়ে চারিটী নদীতে পরিণত হয়ে চলেছে ; উত্তরে, দক্ষিণে, পূর্বে, পশ্চিমে—জননীবসুন্ধরাকে উর্বর করে দিচ্ছে। আমার মনে হল এইস্থানে সমস্ত বিটপীই পবিত্র। বিটপীচ্ছায়াকীর্ণ পথের মধ্য দিয়ে আমি স্থিরপদে চলেছি ; আমার পথপ্রান্তে দাড়িম্ব বৃক্ষদল জীবনের সন্ধান দিচ্ছিল—আর সাইপ্রাস বৃক্ষ মৃত্যু ও অনন্তের বার্তা দোলাচ্ছিল।

রাজকোষের স্বর্ণ নিঃশেষ হয়ে গেছে—শ্বেতবাস-পরিহিত মোল্লারা সেই সমৃদ্ধ করক্রমের কলরাশি দরিদ্রের নামে তুলে নিচ্ছে। আমার কণ্ঠহার লহরীর পর লহরী আমাকে ভারাক্রান্ত করে তুলেছে।

আগ্রায় পুনঃ প্রবেশ করার পূর্ব্বে আমার বাসনা হল—আর একবার আমার চতুষ্পার্শ্বের বসুন্ধরাকে নিরীক্ষণ করব। আমি বহির্দেশে তোরণের উপর আরোহণ করলাম।

নীলসলিলা যমুনা নীলাকাশের নীলিমার সাথে রঙ মিলিয়ে বয়ে চলেছে প্রান্তর অতিক্রম করে—আগ্রা প্রাসাদের উচ্চ মিনারগুলি মেঘের কোলে প্রাসাদের মত শোভা পাচ্ছে ; সম্রাট আকবরের পরিত্যক্ত নগর ফতেপুরশিক্রীর প্রবেশতোরণ দক্ষিণ আকাশের পটভূমিকায় প্রতিভাত হচ্ছে, আর কতদিন এই সবুজ প্রান্তর সবুজ থাকবে ? রক্তের স্রোত আর রক্ত-পদ-চিহ্ন কতদূর ? আর কতদিন প্রাসাদের নর্মউদ্যান পাখীর নির্ভয় সঙ্গীতে মুখরিত থাকবে—দুর্ব্বৃত্ত দামামাধ্বনি করে তাদের নীরব করে দেবে।

আমি প্রত্যাশা করছি—আমার সহোদর ভ্রাতাভগ্নীদের সঙ্গে ক্রীড়া নিকেতন শৈশবের ফতেপুরের তোরণ অতিক্রম করে যাব। সম্ভবতঃ সেখানে এমন একটী কবচ খুঁজে পাব, যার প্রভাবে রাজ্যের সমস্ত অকল্যাণ দূর হয়ে যাবে।

রক্তপ্রস্তরনির্মিত আকবরাবাদের প্রাসাদের দিকে অগ্রসর হচ্ছি সেখানে আজ আমি বন্দিনী। তার বর্ণ অস্তায়মান সূর্য্যরশ্মি অপেক্ষা আরও গাঢ় রক্তবর্ণ হয়ে উঠেছে। রাজপ্রাসাদের সম্মুখে বিপণীর জনপথ আজ জনহীন। চীৎকার করে একটী কালো পাখী ঐ জলাশয় থেকে উড়ে গেল। আমি এই অশুভ চীৎকারে আতঙ্কিত হয়ে উঠলাম। আমার ইচ্ছা হল, যেন আমি শাহজাহানাবাদের দিকে চীৎকার করে সেই পাখীটার প্রত্যুত্তর দিই।

আমরা সেতুর উপর দিয়ে এগিয়ে চলেছি, পথে দেখলাম দিল্লী তোরণের মধ্য দিয়ে একদল সুসজ্জিত অশ্বারোহী আমাদের পথ অতিক্রম করে গেল। হস্তীযূথবাহিত শিবিকা চলেছে—সেই সম্রাট-তনয়া রোশেনারার অতি সুন্দর সূক্ষ্ম জালের আবরণ বেষ্টিত শিবিকা। একটী কিশোর ক্রীতদাস সুবর্ণখচিত ময়ূরপুচ্ছের ব্যজন দোলাচ্ছিল। সে দৃশ্য আমি জীবনে কখনো বিস্মৃত হব না। আমার মনে হল, হস্তী দুইটী আমাদের মথিত করে চলে যাবে। আমাদের অগ্রগামীদল থামল। তীব্র আতরের গন্ধে সমস্ত বাতাস আমোদিত হয়ে উঠল। আমার ভগ্নী রোশেনারা তার জালের আবরণ তুলে দেখছিল। আমি তার চিত্রিত মুখমণ্ডলের শুভ্রদন্তপংক্তি অবলোকন করলাম। অশ্বারোহী দলকে অগ্রসর হতে অনুমতি দেওয়া হল। রাজকুমারী চলেছেন জুমামসজিদে সন্ধ্যার প্রার্থনায় যোগ দিতে। সে মসজিদ আমিই তৈরী করিয়ে দিয়েছিলাম। সম্রাট শাহজাহান শুককণ্ঠে আপনমনে বলেছিলেন—"আমার রোপিত প্রত্যেক বৃক্ষটী ফলপ্রদ হয়নি।"

রাজপ্রাসাদের তোরণে প্রবেশ না করতেই বুঝলাম যে, রাজদরবারের সব ব্যবস্থাই বিশৃঙ্খল হয়ে পড়েছে। শায়েস্তা খান এবং মীরজুমলার পুত্র আমিল খান ঔরঙ্গজেবের কাছে লিখেছে—"সম্রাটের জীবন শেষ হয়ে এসেছে, যদিও তিনি প্রত্যহ ঝারোই দর্শনে এসে প্রজাদের দর্শন দিচ্ছেন এবং প্রজারা তাঁর দর্শন পাচ্ছে—কিন্তু তাঁর মৃত্যু নিকট।" সেই দুইজন ঔরঙ্গজেব ও মুরাদকে লিখেছে, যেন তাঁরা সসৈন্যে আগ্রা চলে আসেন। সুলেমান শুকো তার সুসজ্জিত সৈন্যবাহিনী নিয়ে সুবা বাঙ্গালায় সুজার বিরুদ্ধে যুদ্ধে গিয়েছে। তার আগ্রাপ্রত্যাবর্ত্তনের পূর্ব্বেই রাজকুমারদ্বয়ের আগ্রায় উপস্থিত হওয়া প্রয়োজন। সেই পত্রখানি দারার হাতে পড়েছে—সেই দুই বিশ্বাসঘাতককে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়েছে। সমস্ত প্রজা তাদের বিচারের সংবাদ শোনবার জন্য সমস্তদিন দারার প্রাসাদের সম্মুখে অপেক্ষা করেছে। কিন্তু দারার মন ছিল কোমল। সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে কারাগারের দ্বার খুলে গেল—আমার ভগ্নী রোশেনারা তাদের মুক্তির ব্যবস্থা করেছিলেন। দেখ্‌তে দেখ্‌তে আমাদের পতনের পথ সুগম হয়ে গেল।

এবার আমার লেখনী স্তব্ধ হয়ে এসেছে; মনে হচ্ছে যেন অতীত দিনের সীমাহীন দুঃখের স্মৃতি আমাকে হতচেতন করে ফেলেছে। পাত্রাধারে মসী আমার রক্তে পরিণত হয়ে আসছে। হে পবনদেব, সমস্ত প্রভঞ্জন বিমুক্ত করে দাও! প্রভঞ্জন, তোমার সঙ্গে সমস্ত মেঘ নিয়ে এসো। দিল্লীর উপর তোমার শোকাশ্রু বর্ষিত হউক! দিল্লী, তুমি আর্ত্তনাদ করে ওঠো।

মাকড়সার জালের মত নীরবে চলেছে গুপ্তচরের দল রাজদরবারের ও শিবিরের সংযোগ রক্ষা করে। মীরজুম্‌লা ঘোষণা করেছে যে, সে সম্রাট শাহ্‌জাহানের পতাকাতলে আশ্রয় নেবে। তার ভাষার শক্তি ছিল, তার ব্যবহারের চাকচিক্য ছিল। দারা ও সম্রাট তার কথায় একান্ত বিশ্বাস করেছেন। কিন্তু সম্রাটের সমস্ত সৈন্যাধ্যক্ষের নিকট সঙ্গে সঙ্গে ঔরঙ্গজেব গোপনে সংবাদ প্রেরণ করেছিলেন—"সম্রাট মৃত, যদি আপনারা ঔরঙ্গজেবের পক্ষ সমর্থন করেন তাহলে আপনাদের বেতন বাড়িয়ে দেওয়া হবে, ধর্ম্মহীন দারা যে হজরত মহম্মদের বাণীর বিরোধিতা করে—সেই দারার পক্ষ আপনারা বীরের দল কি করে সমর্থন করবেন?" সেনাপতিরা কোরাণ স্পর্শ করে প্রতিজ্ঞা করল, যদি সম্রাট সত্যই পরলোকগমন করে থাকেন, তবে তারা ঔরঙ্গজেবের পক্ষ সমর্থন করবেন। কিন্তু তারা দূত প্রেরণ করল, সঠিক খবর জানাবে—সত্যই সম্রাট শাহ্‌জাহান কি মৃত। কিন্তু যারা সংবাদ সংগ্রহ কর্ত্তে এসেছিল—প্রত্যাবর্ত্তনের পথে তাদের প্রত্যেককে নর্ম্মদা অতিক্রম করার পর পরীক্ষা করা হল, যাদের সঙ্গে সঠিক সংবাদ ছিল তাদের মস্তক স্কন্ধ চ্যুত হল।

এই পন্থা অবলম্বন করে ঔরঙ্গজেব পিতার সমস্ত সেনাপতিকে স্বপক্ষে টেনে নিল। একমাত্র মহব্বৎ খান তার সৈন্য নিয়ে স্বদেশে মর্য্যাদা রক্ষা করছিলেন, তাঁর রক্তে রয়েছে রাজপুতের বীজ, তাঁকে একদিন আমি ভ্রাতার মর্য্যাদা দিয়েছিলাম।

দাক্ষিণাত্য থেকে যাত্রা করার পূর্ব্বে ঔরঙ্গজেব তাঁর প্রত্যেক সৈন্যাধ্যক্ষকে নতজানু হয়ে তাঁর বিজয়ের জন্য আল্লাহের কাছে প্রার্থনা জানাতে বল্লেন। প্রার্থনা শেষে ঔরঙ্গজেব আলেকজাণ্ডারের বিরুদ্ধে দরায়ুসের অভিযানের সময়ের উক্তির পুনরাবৃত্তি করলেন—"হয় আমি আমার শত্রুর শিরচ্ছেদ করব, নয় আমার শির ছিন্ন হবে।"

ঔরঙ্গজেব জানতেন, প্রার্থনা কি ভাবে সফল কর্ত্তে হয়, বল্‌খের যুদ্ধে যখন ঔরঙ্গজেব বোখারার সুলতানের অসংখ্য সৈন্যের বিরুদ্ধে সম্রাটের সৈন্য পরিচালনা করছিলেন—তাঁর প্রশংসায় সমস্ত মুসলিম জগৎ মুখরিত হয়ে উঠেছিল। দ্বিপ্রহরের নমাজের সময় ঔরঙ্গজেব হস্তীপৃষ্ঠ থেকে অবতরণ করে যুযুধান সৈন্যদলের মধ্যস্থলে নতজানু হয়ে স্থিরভাবে সম্পূর্ণ নমাজ সম্পন্ন করেছিলেন। আবদুল আজিজ চীৎকার করে বলে উঠল—"এমন মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা মৃত্যুর সমান"—তারপরই দামামার ধ্বনিতে যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করা হল।

উজ্জয়িনীর যুদ্ধ হয়েছিল রজব মাসে, সিংহবিক্রমে মুরাদ আমার পিতার বন্ধু রাজা যশোবন্ত সিংহ ও আমাদের পক্ষ সমর্থনকারী রাজপুত বীরদের পরাজিত করেছিলেন; কারণ আমাদের মুসলমান সেনাধ্যক্ষ ছিল বিশ্বাসঘাতক। সে তার সমস্ত গোলাবারুদ ঔরঙ্গজেবের জন্য মাটিতে পুঁতে রেখেছিল এবং স্বয়ং যুদ্ধের সময় সসৈন্যে অনুপস্থিত রইল। যখন যশোবন্ত সিংহ পরাজিত হয়ে গৃহে ফিরে এলেন, তাঁর মহিষী দুর্গদ্বার বন্ধ করে দিলেন—পরাজিত স্বামীর অভ্যর্থনা করা অপেক্ষা বিধবা হয়ে স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় আরোহণ করাও শ্রেয়। রাজপুত যুদ্ধে জয়লাভ করে, নয়ত মৃত্যুবরণ করে।

উজ্জয়িনীর যুদ্ধের পরে বিজয়ী ভ্রাতৃদ্বয়ের সৈন্য আগ্রার দিকে অগ্রসর হল। নিতান্ত হতাশ হয়ে পিতা স্বর্গের দিকে হস্ত উত্তোলন করে চীৎকার করে উঠলেন—"ইয়া আল্লাহ্, তেরী রেজা হে ঈশ্বর, তোমার ইচ্ছা। আমার পাপের শাস্তি পাচ্ছি, এই শাস্তিই আমার প্রাপ্য" তিনি স্বয়ং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন এবং আদেশ দিলেন—"সৈন্য সমাবেশ কর।"

হিন্দুস্থানের বিরুদ্ধে সৈন্য পরিচালনা করার সময় তিনি সামান্য সৈন্যের মতন স্বয়ং যুদ্ধ করেন নি। তাহলে সমস্ত দেশবাসী জানবে যে সম্রাট জীবিত। যদি সম্রাট শাহ্‌জাহান্ স্বয়ং সৈন্যদলের পুরোভাগে থাকতেন, তবে আজ বাবরের ভারতবর্ষে, আকবরের ভারতবর্ষে কি পরিস্থিতি হতো, কে জানে? "একটীমাত্র মস্তিষ্ক সমস্ত সৈন্য চালনা করে"—আজ যারা সম্রাটের বিরুদ্ধে অগ্রসর হচ্ছিল তারা প্রত্যেকেই ত সম্রাটের সৈন্য, তারা সকলেই সম্রাটের নিকট কৃতজ্ঞতার বন্ধনে আবদ্ধ। তখনও দিল্লীর সিংহাসনের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ ছিল। গৃহের প্রদীপ যেমন দূরের পথিককে আকর্ষণ করে, তেমনি রাজমুকুটের তেজশিখা সমস্ত দেশকে আলোকিত করে।

দেয়নি। সম্রাটের শ্যালক শায়েস্তা খানের হৃদয়ে ছিল—তীব্র ঘৃণা, কণ্ঠে ছিল উপদেশের সুর। খলিলুল্লা খান শায়েস্তা খানের মত তাঁর স্ত্রীর অপমানের গ্লানি বিস্মৃত হননি।(১) তারা দুজনেই জানত, কি করে সম্রাটের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করা যায়।

দুষ্টবুদ্ধি দানব (জিন) একদা স্বর্গের দ্বারের পাশে দাঁড়িয়ে গুপ্ত রহস্য জেনেছিল। এবার তারা সেই নিয়তি পূর্ণ করতে অগ্রসর হল। সম্রাট রাজদরবারে রাজপুত বীর রামসিং এবং বুন্দীরাজ ছত্তরসালকে সমস্ত অমাত্যের উপরে আসনদান করেছিলেন। সম্রাটের আহ্বানে রাজা ছত্তরসাল বিলোচপুর থেকে আগ্রা উপনীত হবার পূর্ব্বে আমরা দিল্লী থেকে আগ্রা চলে এসেছিলাম। বহু বৎসর আমি আমার রাখীবন্ধ ভাইয়ের দর্শন পাইনি—আমি তার সেই মারাত্মক পত্র খুলে দেখবার পর আর তার দেখা পাইনি।

ভোর হয়ে এসেছে, একটা রক্তগ্রীব ধূসর রংয়ের কপোত-দূত প্রেরণ করা হল। সে রাজা ছত্তরসালকে আহ্বান করে রাজ-দরবারে নিয়ে আসবে।

গ্রীষ্মকাল, অসংখ্য ফুল ফুটেছে, ভ্রমর গুঞ্জনে চারিদিক মুখরিত। পুষ্পকোরকের সুগন্ধ আজুরীয়াগ ভারাক্রান্ত করে তুলেছে। পিতা তাঁকে পরামর্শের জন্য খাসমহলে আহ্বান করেছিলেন। আমি তাঁকে হেলেওট্রপের বীথির মধ্য দিয়ে অতিক্রম করবার সময় দেখবার জন্য মেগনোলিয়া বৃক্ষের অন্তরালে লুকিয়ে রইলাম।

শ্বেত মর্ম্মর জালের মধ্য দিয়ে যমুনার জল গোলকুণ্ডার সমস্ত হীরকখণ্ডের মতই বিচ্ছুরিত হয়ে পড়ছিল। মৃদু বাতাসে আমার অবগুণ্ঠন মুক্ত করে দিয়েছিল। আমি পদধ্বনি শুনছিলাম, না আমার বুকের ধ্বনি শুনছিলাম। কতকাল আমার সেই "একমেবাদ্বিতীয়ম" পুরুষ সমাধির মানব অপেক্ষাও আমার নিকট মৃততর ছিল, কিন্তু আমার নিকট যদি কেউ দিল্লীর সিংহাসনের সাহায্যকল্পে দৌলতাবাদ ও গুলবরগার রণক্ষেত্রে সেই রাজপুতের বিজয়কাহিনী শোনাত, আমি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতাম। আমার মনে হত যেন আমি ও বিজয়িনী। সেই বীরের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে আছি। কিংবা কখনো ভীষণ হতাশাক্রান্ত হয়ে যেতাম, মনে হত যেন তাঁর শত্রুর মত আমি নিস্পেষিত হয়ে গেলাম।

মৃদু চন্দ্রালোকে বীণার সুর আমার অতীতের স্মৃতি নিদ্রিত আত্মার মত জেগে উঠল আমার মধ্যে—যেমন তারা শেষ বিচারের দিন জেগে উঠবে, অতীত আমার কাছে জীবন্ত হয়ে উঠল। আজকে আমার সব স্মৃতি কি বাস্তবের সংঘাতে জীবনহীন ছায়াতে পর্য্যবসিত হবে? আমার স্মৃতিও কি আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে যাবে? অনেক দিন তো তিনি আমাদের পরম শত্রুর আদেশ পালন করেছেন; এই ত সেদিন তিনি তাঁর দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেছেন—তাঁর নিজের মহলে প্রত্যাবর্ত্তন করেছেন...।"

আমি মৃতের মত শীতল কঠোর হয়ে গেলাম। তারপর আমি প্রভাতের নীলাকাশের প্রচ্ছদপটে দেখলাম তাঁর শুভ্র উষ্ণীষ। অলৌকিক ঘটনাবলে মৃত ব্যক্তির মধ্যে প্রাণসঞ্চার হলে মানুষ যেমন চঞ্চল হয়ে উঠে, তেমনি আমার রক্তের স্রোত-প্রবাহে আমি চঞ্চল হয়ে উঠলাম। সে রক্তের সাথে ছিল আগুন। তার আকৃতি অতীত দিনের মত সুঠাম, বয়স তার কপালের রেখাগুলি কুঞ্চিত করে দিয়েছিল, কিন্তু তাঁর দৃষ্টিতে ছিল পূর্ব্বের মত দীপ্তি। তাঁর অস্ত্রের ঝনঝনা শুনেছিলাম—তার পদধ্বনি ক্রমশঃ ক্ষীণতর হয়ে গেল, প্রেমের আতিশয্যে ও হতাশার পীড়নে আমি ভূমিতে লুটিয়ে পড়লাম—মুখের উপর অবগুণ্ঠন টেনে দিলাম। অতীত আমার বর্ত্তমানকে আচ্ছন্ন করে দিল। নিশীথ-বহ দূরাগত ঐক্যতানে অবিস্মরণীয় সুরের মত মক্ষিকাকুল আমার কর্ণে ক্রন্দন ধ্বনি তুলেছিল; নিমীলিত চক্ষু দিয়ে আমি সন্ধ্যা তারার উজ্জ্বলতা দেখছিলাম। প্রত্যেকটা ফুল সুবাস-উচ্ছ্বসিত গন্ধ; উৎসধারা চলেছিল অতি মৃদুগতি যেমন সেদিন ছিল আজও..."

ঐ শোন! একি বজ্রের ধ্বনি! ঐ যে দূর থেকে আসছে। এখন আমি তার শেষ পত্রখানি পড়ছি। "চৌহানের চিত্রপট কি মোগল রাজকুমারীর চিত্র সংগ্রহের মধ্যে স্থান পেতে পারে?"

আমি আবেগে গাত্রোত্থান করলাম। আমার শিরায় রক্তস্রোত উচ্ছল হয়েছে—আমার মনে পড়ছে—আমার অন্তরে নৃত্য সুরু হয়েছিল; সে নৃত্য যেন পর্ব্বতের শিখরের অভিমুখে চলেছিল।

আমার মনে পড়ে, আমি ঈশ্বরকে ভুলে বহুদিন জীবনযাপন করতে চেয়েছিলাম; বিষবৃক্ষের রসসিঞ্চন করে আমার ব্যথার প্রলেপ তৈরী করেছিলাম। আমি যাঁকে ভালবেসেছিলাম—তাঁকে আমি কি তীব্র ঘৃণা করেছি। সেই অপরিচিত বীর ছিলেন অবধ্য, ভিন্ন রাজবংশের সন্তান। তিনি আমাকে সাহায্য না করে প্রতারণা করেছিলেন...।

মর্ম্মর তলের উপর দিয়ে আমি দ্রুতপদে সামান বুরুজের দিকে চলে গেলাম। যমুনা সূর্য্য কিরণে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল, কিন্তু যমুনার জলতল ছিল সুশীতল। আমি যমুনার উচ্ছল জলতরঙ্গের দিকে হস্ত প্রসারিত করে দিলাম। আঃ—আমি যদি সেই জলতরঙ্গে মিশে যেতাম!

এক ঘণ্টায় মধ্যে আমরা ফতেপুর শিকরীর দিকে অগ্রসর হলাম—শৈশবের পরে আর আমি শিক্রীর পথে যাইনি, দ্রুতগামী অশ্ব নদুক্তম শকটে সংযোজিত হয়েছিল—সে শকটটা সম্রাজ্ঞী নূরমহল ব্যবহার করতেন। আমার কিংকর 'হাজীর' আর আমার বিশ্বস্ত ক্রীতদাসী 'কোয়েল' ভিন্ন আমার কোন সঙ্গী ছিল না।

সে দিন বাতাস ছিল উষ্ণ, মাঝে মাঝে ভীষণ উদ্দাম প্রভঞ্জন উষ্ণ বায়ুরাশিকে মথিত করে আসন্ন ঝড়ের আভাস দিচ্ছিল, আমরা গ্রাম অতিক্রম করে চলেছি। পথপার্শ্বে জনতা আমাদের দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করছিল, কারণ রাজপরিবারের সন্তান সাধারণতঃ শকট

(১) খলিলুল্লাখানের স্ত্রী ও শাহজাহানের সম্বন্ধে নানা প্রকার কুৎসা প্রচারিত ছিল। ব্যক্তিগত অপমানের প্রতিশোধের জন্যই

শকুনিকুল শবদেহের পার্শ্বে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। বায়সকুল গোময় স্তূপের পাশে কর্কশ চীৎকার তুলেছিল। নির্জন পথে মাঠে ময়ূর ইতস্ততঃ বেড়াচ্ছিল। জলাভূমি ও সরোবরের মাঝে পানকৌড়ী পক্ষ সঙ্কুচিত করে বসেছিল। কিন্তু এ সব দৃশ্য অপ্রত্যাশিত না হলেও একটু আশ্চর্য্য-জনক। শুধু মনে হচ্ছিল জীবন্ত মানব পশু পাখী কেমন করে নির্ব্বিঘ্নে নিশ্বাস গ্রহণ করে। গভীর অস্বস্তিতে আমি কেবল তাই ভাবছিলাম, ধূলির মেঘের মধ্যে আমাদের অগ্রগামী বাহিনীর তরোয়ালের চমক দেখেছিলাম, আমার মনে হচ্ছিল যেন তৈমুরের সৈন্যদল চলেছে—যারা তার বিজয়ের পথ সুগম করেছিল ; তাদের অচ্ছেদ্য কৃষ্ণ বর্ম্মের শক্তিতে তারা বায়াজেদের' (১) বিশ সহস্র কৃষ্ণবর্ম্মধারী সৈনিককে অক্লেশে ধ্বংস করেছিল।

হঠাৎ আমি এক অপূর্ব্ব শক্তি অনুভব করলাম, আপুরীবাসে যে দৃশ্য দেখে এসেছি, তা যেন আমার মধ্যে মূর্ত্ত হয়ে উঠল এক তীব্র দৃঢ় সংকল্পে। আমি রাজপুতের হৃদয় জয় করব—পরিপূর্ণভাবে জয় করব। তিনি আমার কাছে নতজানু হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। আবার শাহ্‌জাহানকে সাহায্য করবার প্রতিশ্রুতি দেবেন। কিন্তু জনশ্রুতি শুনছি, রাজপুত-বীর নাকি বিশ্বাসঘাতকতা করার উপক্রম করেছেন, তিনি কি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবেন ?

কিন্তু আমরা যে জয়লাভ করব—আমরা দুজনে সম্মিলিত হয়ে জয়-লাভ করব। আমি আকবরের প্রতিষ্ঠিত ফতেপুর শিক্রীতে জয়লাভের জন্য প্রার্থনা করব। আমি অনেকদিন ভেবেছি যে, সেখানে আমি তীর্থ যাত্রা করব। আমার মনে হয়েছে যে, সেই বিরাট পুরুষ স্বয়ং বাহু তুলে আশীর্ব্বাদ করবেন। মলিন চিশ্‌তীর সমাধির পাশে ফতেপুর, "বিজয়-নগর"।

আমরা নহবৎখানার প্রস্তর মণ্ডিত অঙ্গনে অশ্ব ক্ষুরধ্বনি শুনছি। এই নহবৎখানায় সম্রাট আকবরের বাদ্যকরগণ ফতেপুর শিক্রীর পথে এই-খানে তাঁকে নানা সুরে অভিনন্দন জানাত। সত্বর আমি জুম্মা মস্‌জিদের পথে বিরাট শিলাতলে উপস্থিত হলাম। বুলন্দ দরওয়াজার মতন বিরাট তোরণ পৃথিবীর মধ্যে কি আর কোথায় খুঁজে পাওয়া যায় ? বিজয়ের পর সম্রাট আকবর এই বিরাট ত্রিতল তোরণ নির্ম্মাণ করেছিলেন—এ শুধু বিজয় স্তম্ভের পরিকল্পনা ছিল না—এই সুবিশাল গম্বুজের ছায়ায় তিনি তাঁর সাম্রাজ্যের আশ্রয়প্রার্থীদের আশ্রয় দেওয়ার সঙ্কল্পও করেছিলেন।

মূল্যবান সুরাধারায় ফতেপুর শিক্রীর শিলাতল পরিধৌত করতে যদি পারতাম ! আমি শুধু নগ্নপদক্ষেপে সেই তোরণের শিলাতল অতিক্রম করে এলাম।

যীশু বলেছিলেন—এই জগৎ একটা সেতু মাত্র, সেই সেতু অতিক্রম কর, এখানে কোন গৃহবাটিকা নির্ম্মাণ করো না। যে একটা মুহূর্ত্তের আশা করে, সে অনন্তের সন্ধান পায়। এই জগৎ ত অনন্তের একটী ক্ষণমাত্র। সেই ক্ষণটী ভক্তিতে পরিপূর্ণ করে দাও। অবশিষ্ট সকলই অদৃশ্য"—

এই শিরোনামটী আরবী অক্ষরে তোরণ দ্বারে খোদিত আছে।

আমি অশ্ব ক্ষুরাকৃতি তোরণের মধ্য দিয়ে মসজিদে পদব্রজে প্রবেশ করলাম। সম্রাট আকবরের নগরে জগতের সমস্ত শব্দ নীরব হয়ে যায়। এই নগরটী চিরতরে পরিত্যক্ত হয়ে গেছে, তবু যেন মনে হয় এই নগরটী মাত্র কালই রচিত হয়েছে। মনে হয়—জীবনের অদৃশ্য প্রস্রবণেপরিধৌত আত্মাকে বরণ করবার জন্য সূর্য্য কিরণে স্নাত হয়ে পৃথিবীর এই বৃহত্তম মন্দির প্রাঙ্গনটী আজিও অপেক্ষা করছে।

এখানে বিরাট সুদীর্ঘ স্তম্ভগুলি সুন্দরভাবে সুবিন্যস্ত। কোথায়ও স্তম্ভ-গুলি প্রাচীরের ছিদ্র সংলগ্ন ছাদের সঙ্গে মিশে গেছে। স্তম্ভগুলির সম্মিলনে মধ্যভাগে একটী চতুষ্কোণ তৈরী হ'য়েছে, একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত যতদূর দৃষ্টি যায়, তাতে স্মরণ করিয়ে দেয়—শুভ্র রেশমবস্ত্রপরিহিত মানবের শোভাযাত্রা চলেছে। স্তম্ভসারির মধ্য দিয়ে তারা দীন-ই-ইলাহি গ্রহণ করে নূতন জীবনের ও দর্শনের স্বপ্ন দেখছে। সেত বহু দিনের কাহিনী নয়, যখন শিক্ষার্থীর চরণক্ষেপে এই প্রস্তরখণ্ডগুলি মুখরিত হয়ে উঠত ! আজ সেখানে একমাত্র আমার চরণধ্বনি। এইখানেই স্তম্ভসংলগ্ন ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে ফতেপুর বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত ছিল। ফতেপুরের ভূমিতেই সম্রাট আকবরের উদার নীতির উন্মেষ হয়েছিল। সেই নীতি অনুসারে গণিত, চিকিৎসাশাস্ত্র, ইতিহাস ও দর্শনের স্থান নির্দ্দেশ হয়েছিল কোরাণের উপর। দিন রাত্রি পণ্ডিতগণ পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় লিখিত পুস্তকগুলি পারসী ভাষায় অনুবাদ কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন।

কিন্তু আজ আর সেখানে রাত্রিতে কোন আলো জ্বলে না, তরুণ জ্ঞানান্বেষী জ্ঞানের সন্ধানে মসজিদের মীনারে দাঁড়িয়ে আকাশের গায়ে নক্ষত্রের গতি লক্ষ্য করে না, তারা আজ জীবন সমস্যার সমাধানে নিভৃত আলোচনা করে না।

আমি সেই সমাধির নিকট এলাম—পূজাবেদীর সম্মুখদেশ অতিক্রম করলাম—তার অভ্যন্তরে ছিল স্তম্ভশীর্ষপ্রকোষ্ঠরাজি। নিখিল বিশ্বে এমন কোন ধর্ম্ম মন্দির আছে—যেখানে একজন মাত্র মানুষের চেষ্টায় অত অল্প সময়ের মধ্যে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য রূপ পরিগ্রহ করেছে ? সেই গম্বুজের নিম্নে বিরাট কক্ষের অভ্যন্তরে প্রাচীর ও ছাদের ব্যবধানের মধ্যে কি অপরূপ সৌন্দর্য্য মানুষের চোখে ধরা পড়ে ? একটু স্থান নেই সেখানে—কারু শিল্প, কারু কার্য্য, চিত্র, মিনাশিল্প প্রভৃতি ভাস্কর্য্যের বিচিত্র সমন্বয়।

কোথাও অসঙ্গতি নাই, একটী বর্ণ অন্য একটী বর্ণের দ্বারা কোথায়ও কোমলতর অথবা সমৃদ্ধতর হয়ে উঠেছে। শিল্প নৈপুণ্য শিল্পীর বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক, প্রার্থনাবেদীর সম্মুখে আজও প্রদীপ জ্বলছে, আমি নতজানু হয়ে প্রার্থনা করতাম, কিন্তু হঠাৎ একটা আনন্দের আবেশ এসে আমাকে অভিভূত করে দিল, আমি [illegible]

কথাই বাদশাহ্ বাবর তাঁর আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেছেন। ইরাণ দেশে আমার পূর্ব্ব পুরুষরা স্বর্গের স্বপ্ন দেখেছিলেন, সে কাহিনী আমার স্মৃতিতে জেগে উঠল—চিত্রিত পুষ্পের মধ্যে প্রাণ সঞ্চার হল, প্রাচীর গাত্রে খোদিত কোরাণের আরবী অক্ষরগুলি জীবন্ত ফুলের মতন ঘুরে বেড়াতে লাগল।

আমার আগমনের বার্ত্তা চারদিকে প্রচারিত হয়ে গেল। সমাধির সম্মুখে নিষেধ সত্ত্বেও বহু ভিক্ষুক এসে জুটেছিল। একজন সুদর্শন যুবক নয়নে উন্মাদ দৃষ্টি, ভীষণ চীৎকার করে বলে উঠ্‌ল—"আল্লাহ-আকবর"—সে ধ্বনি গম্বুজের শূন্যতার মধ্যে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল—"আল্লাহ আকবর!" একটা তীব্র কম্পন আমার মেরুদণ্ডকে মথিত করে দিল—"আল্লাহ্ আকবর"। এই ধ্বনি যেন তৈমুরের বংশকে শেষ করে গেল—সত্যিই আমরা আল্লাহ্‌কে বিস্মৃত হয়েছিলাম। (ক্রমশঃ)

ভগবন্নামানি

শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ, বিএস-সি

বালিগঞ্জের লেকের সমীপবাসী সতীশচন্দ্র ভড় মহাশয় বৈষ্ণব শাস্ত্রানুরাগী ছিলেন। চৈতন্যচরিতামৃত নিয়মিত পাঠ করিতেন। একদিন উহাতে উদ্ধৃত একটি শ্লোক বলিয়া উহার অর্থ জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্লোকটি এই—

যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদি দৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ধ্রুবম্॥

ইহার অনুবাদ—যে দেব নারায়ণকে ব্রহ্মা রুদ্রাদি দেবতার সমান দেখে সে নিশ্চয়ই পাষণ্ডী হয়।

আমার ব্যাখ্যা দিলাম। পরে ভাগবতে পণ্ডিত ননীগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইলে ঐ শ্লোক সম্বন্ধে তাঁহার মত চাহিলাম। তিনি ব্যাখ্যা করার পর আমার ব্যাখ্যা উপস্থিত করিলাম। ননীগোপালবাবু ইহারও অনুমোদন করিলেন।

অনুমোদিত ব্যাখ্যা—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরকে কেহ কাহারও সমান ভাবা অন্যায়—উহাতে দ্বৈত বুদ্ধি থাকে বলিয়া, তাঁহাদিগকে অভেদ ভাবিতে হইবে। ইহাই শাস্ত্রের নির্দ্দেশ।

মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বে শিবসহস্র নাম-স্তোত্রে নীলকণ্ঠ টীকায় সূত-সংহিতা হইতে এই বচনটি উদ্ধৃত হইয়াছে :—

ব্রহ্মাণং কেশবং শিবং ভেদ ভাবেন মোহিতাঃ।
পশ্যন্ত্যেকং ন জানন্তি পাষণ্ডোপহতা জনাঃ॥

পাষণ্ড মতগ্রস্ত মুগ্ধ লোক ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরকে ভেদ

ঐ টীকায় একটু পরেই বিভু শব্দের ব্যাখ্যা এইরূপ দত্ত হইয়াছে। বিভুঃ বিবিধরূপেণ হরিহর দুর্গাগণেশার্কাগ্নি-বায়্বাদিরূপেন ভক্তানামনুগ্রহায় ভবতীতি বিভুঃ। অর্থাৎ ভক্তদিগকে অনুগ্রহ করিবার জন্য হরি, হর, দুর্গা, গণেশ, সূর্য্য, অগ্নি, বায়ু প্রভৃতি বিবিধ রূপ যিনি ধারণ করেন তিনি বিভু।

পুরাণ উপনিষদাদি সর্ব্বশাস্ত্রেই ব্রহ্মের এই সর্ব্বাত্মক ভাব প্রদর্শিত হইয়াছে। এইরূপ ভাবের প্রবন্ধ পাঠে লোকের ধৈর্য্যের অভাব বলিয়া উপনিষদ হইতে সামান্য কিছু উদ্ধার করিব।

নারায়ণ অথর্ব্বশির উপনিষৎ :—অথ নিত্য নারায়ণঃ। ব্রহ্মা নারায়ণঃ। শিবশ্চ নারায়ণঃ। শক্রশ্চ নারায়ণঃ। কালশ্চ নারায়ণঃ। ইত্যাদি। ব্যাখ্যা স্পষ্ট।

নৃসিংহ পূর্ব্বতাপিন্যুপনিষৎ :—ওঁ যোঽবৈ নৃসিংহো-দেবো ভগবান্‌যশ্চ ব্রহ্মাভূর্ভুবঃস্বস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ। যিনিই নৃসিংহ দেব তিনিই ভগবান ব্রহ্মা, তিনি ভূলোক ভুবলোক ও স্বর্গলোক তাঁহাকে পুন পুন নমস্কার। ঐ মন্ত্রের পরের ৩২টি মন্ত্র একইরূপ কেবল "যশ্চ ব্রহ্ম" ইহার পরিবর্ত্তে নিম্নলিখিতরূপ হইয়াছে। "যশ্চ বিষ্ণু। ২। যশ্চ মহেশ্বর। ৩। যশ্চ পুরুষঃ। ৪। যশ্চেশ্বর। ৫। যা সরস্বতী। ৬। যা শ্রী। ৭। যা গৌরী। ৮। যা প্রকৃতি। ৯। যা বিদ্যা। ১০।......যশ্চ সূর্য্যঃ। ২৮। যশ্চ সোমঃ। ২৯। যশ্চ বিরাট পুরুষঃ। ৩০। যশ্চ জীব। ৩১। যশ্চ সর্ব্বম। ৩২।

পরমঃ। স্বরাট। স এব বিষ্ণুঃ স প্রাণঃ স কালোঽগ্নিঃ স চন্দ্রমাঃ। স এব সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যং সনাতনম্। জ্ঞাত্বা তং মৃত্যুমত্যেতি নান্যঃ পন্থা বিমুক্তয়ে। সর্ব্বভূতস্থ-মাত্মানং সর্ব্ব ভূতানি চাত্মনি। সংপশ্যন্ ব্রহ্ম পরমং যাতি নান্যেন হেতুনা। যিনি সর্ব্বভূতে আত্মার (ব্রহ্মের) অবস্থান দেখেন এবং সর্ব্বভূতকে আত্মায় অবস্থিত দেখেন তিনিই ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন। অন্যরূপে তাহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

ভাগবতে :—(১১ স্ক, ২ অ)

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥

যিনি আত্মার (ব্রহ্মের) ভগবদ্ভাব সর্ব্বভূতে দেখেন, এবং আত্মায়—ভগবানে ভূত সকলকে অবস্থিত দেখেন তিনিই ভাগবতোত্তম।

ভাগবত :—(১১ স্ক, ২৯ অ)

বিসৃজ্য স্মরমানান্স্বান দৃশং ব্রীড়াঞ্চ দৈহিকীম্।
প্রণমেদ্দণ্ডবদ্ভূমাবাশ্বচাণ্ডালগোখরম্।১৬।

সাধু হাস্যোন্মুখ নিজ বন্ধুজনের সমক্ষেই আমি উত্তম এ নীচ এরূপ দৈহিক লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া কুকুর, চণ্ডাল, গো ও গর্দ্দভকে ভূমিতে দণ্ডবৎ নমস্কার করিবেন।

এ সকল খুব উচ্চাঙ্গের কথা। গীতায় ভগবান বলিয়াছেন মনুষ্যদিগের সহস্র সহস্রের মধ্যে কেউ আমাকে জানিবার জন্য প্রযত্ন করে। যত্নকারীগণের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যকই আমাকে জানিতে পারে। বাসুদেবই (ভগবানই) সর্ব্ব এরূপ ভাবযুক্ত মহাত্মা সুদুর্লভ। (বাসুদেব সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ)।

কিছুকাল হইল মহাত্মা গান্ধির দিল্লীর উপাসনা সভায় রাম নাম গানের সঙ্গে মুসলমানি ঈশ্বর নাম যোগ করায় হিন্দু ও মুসলমান কেহ কেহ আপত্তি করায় বেশ একটু আন্দোলন হয়।

বহুকাল পূর্ব্বে একটি গল্প শুনিয়াছিলাম। যশোহর অঞ্চলের এক ব্রাহ্মণ অত্যন্ত সাত্বিক প্রকৃতির ছিলেন। ভগবৎ পূজা ও ধ্যানে অধিকাংশ সময় যাপন করিতেন। এক কায়স্থ জমিদারের অধীনে তাহার কিছু জমাজমি ছিল। খাজনা বাকি পড়ায় এক জবরদস্ত গোমস্তা তাগিদের জন্য এক উগ্রপ্রকৃতির মুসলমান পাইক পাঠাইয়া দেয়। সে ব্রাহ্মণের বাটির প্রাঙ্গণে আসিয়া বেশ কড়া কড়া কথা বলিতেছিল। ব্রাহ্মণ পূজা বন্ধ করিয়া তাহার পাওনা মিটাইয়া দিয়া পুনরায় পূজায় বসিলেন। সেদিন তাহার পূজায় মনঃসংযোগ হইল না। ভগবানের মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে পাইকের বিকট মূর্ত্তি মনে জাগিতে লাগিল। এইরূপ কয়েকদিন হওয়ার পর ব্রাহ্মণ জমির পাট্টা লইয়া জমিদারের কাছারীতে উপনীত হইয়া তাহাকে ঐ জমি ফিরাইয়া লইতে বলিলেন। জমিদারটি লোক ভাল ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া তাহার অসুবিধা দূর করিবার ব্যবস্থা করিলেন।

"বাসুদেব সর্ব্বমিতি" এই ভাবযুক্ত সাধক খুব কম। ব্রাহ্মণও খুব উচ্চ সাধক ছিলেন না। তাহা হইলে তিনি দাঁড়ি গোঁফওয়ালা পাইককে ও তাহার তর্জনকে বাসুদেবই ভিন্ন ভিন্ন অভিব্যক্তি ভাবিয়া—"দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নচিত্ত" থাকিতেন।

যোগ সাধনের প্রথমাবস্থায় সাধককে "সদৃশ প্রত্যয় প্রবাহ"—একবিধ ভাব সৃষ্টি করিতে হয়।

এই জন্যই শাস্ত্রে একই দেবতার ও একই মন্ত্র পুনঃ পুনঃ জপ করিয়া সদৃশ প্রত্যয় প্রবাহ সৃষ্টি করিবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। মহাত্মার ভজনসভায় মুসলমান ভাষায় ভগবানের নাম গ্রহণ করিলে যদি কাহারও মনে সম্পর্কিত ভাবের (association of ideas) উদ্রেক হইয়া নোয়াখালি ও পাঞ্জাবের বর্ব্বর মুসলমানের মূর্ত্তি ও কার্য্য-কলাপ উদিত হয় এবং সেই কারণেই হিন্দুর দেবতার নামে মুসলমানেরও মনে বিহারের বর্ব্বর হিন্দু ওতাহার কার্য্যকলাপ মনে হয়, তাহা হইলে ঐ হিন্দু বা মুসলমান ভজন সভায় কিছু লাভ করিতে পারিবে না। তাহাদের পক্ষে দূরে থাকাই শ্রেয়।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

প্রথম মহাযুদ্ধে ভারতবাসীরা অর্থ ও লোকবল দ্বারা বৃটিশের সাহায্য করিয়াছিল এবং আশা করিয়াছিল যে, ইহার বিনিময়ে যুদ্ধশেষে তাহারা স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিবে। ভারতবাসীদিগকে কতটুকু ক্ষমতা হস্তান্তর করা যায়, সে সম্বন্ধে বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করিবার জন্য ১৯১৭ সালের ১০ই নভেম্বর ভারত-সচিব মিঃ মণ্টেগু দলবলসহ ভারতবর্ষে আগমন করিলেন। ভারতীয় অবস্থা পর্য্যালোচনান্তে এই দেশের শাসন-ব্যবস্থায় কতকগুলি আবশ্যক পরিবর্ত্তনাদির বিষয়ে সুপারিশ করিয়া রিপোর্ট দাখিল করিবার ইচ্ছা তাঁহার ছিল। ১৯১৮ সালের ২৩শে এপ্রিল পর্য্যন্ত মিঃ মণ্টেগু ভারতে ছিলেন এবং নূতন শাসন-তন্ত্র সম্পর্কে তিনি যে রিপোর্ট দাখিল করেন—তাহা ১৯১৮ সালের ৮ই জুলাই সাধারণ্যে প্রচারিত হয়। ভারত-সচিব মিঃ মণ্টেগু ও তৎকালীন বড়লাট লর্ড চেমস্‌ফোর্ডের স্বাক্ষরযুক্ত এই রিপোর্ট মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড রিপোর্ট নামে অভিহিত হয়। এই রিপোর্টকে ভিত্তি করিয়াই ১৯১৯ সালের ২৩শে ডিসেম্বর তারিখে ভারতের জন্য এক নূতন শাসন-সংস্কার আইন বিধিবদ্ধ হইল। ভারতীয় জনগণের স্বাধীনতার আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করার ব্যাপারে এই আইনে কিন্তু বিশেষ কিছুই সুবিধা হইল না।

ভারতে যে বিপ্লবান্দোলন বিস্তৃত হইতেছিল—ভারত-সরকার তাহাতে যারপর নাই উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন। যুদ্ধকালে দেশের মধ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখিবার জন্য গভর্ণমেণ্টের হস্তে প্রচুর ক্ষমতা দিয়া ভারতরক্ষা-আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছিল। সকলের বিশ্বাস ছিল যে, যুদ্ধকালীন জরুরী অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য বজায় রাখিবার জন্যই মাত্র আইনটি রচিত হইয়াছে; কিন্তু একবার রক্তের আস্বাদ পাইলে নেকড়ে বাঘ যেমন আরও লোলুপ হইয়া উঠে, তদ্রূপ ভারত-রক্ষা আইনের সুবিধা কয়েক বৎসর ভোগ করিবার পর ভারত-সরকারের দমন-প্রিয়তাও যেন অতিরিক্ত মাত্রায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। ভারতরক্ষা-আইনের কতকগুলি ধারাকে স্থায়ী করিবার জন্য তাঁহারা আর একটি নূতন দমনমূলক আইন বিধিবদ্ধ করিবার বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। বিপ্লবান্দোলনের প্রকৃতি নিরূপণ এবং উহা দমনকল্পে কি কি ক্ষমতা সরকারের হাতে থাকা প্রয়োজন—তাহা নির্ণয় করিবার জন্য ১৯১৭ সালের ১০ই ডিসেম্বর একটি কমিটি গঠিত হইল। উক্ত কমিটির সভাপতি নিযুক্ত হইলেন লণ্ডনের King's Bench Division-এর জজ মিঃ রৌলট এবং তাঁহারই নামানুসারে উক্ত কমিটির নাম হইল রৌলট কমিটি। নভেম্বর মাসে মিঃ মণ্টেগুকে ভারতবর্ষ-এ প্রেরণের পশ্চাতে বৃটিশের যে প্রকৃতপক্ষে কোন আন্তরিকতা বা শুভেচ্ছা নাই, তাহা ডিসেম্বর মাসে রৌলট কমিটি গঠনেই প্রকট হইয়া উঠিল। উপরন্তু ১৯১৮ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী ভারতীয় আইন-সভায় বড়লাট লর্ড চেমস্‌ফোর্ড ঘোষণা করিলেন যে, আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইন প্রণয়ন করা হইবে।

১৯১৮ সালের ১৫ই এপ্রিল রৌলট কমিটি তাঁহাদের রিপোর্ট দাখিল করিলেন এবং তাহাতে ভারতরক্ষা-বিধানের বহু ধারা স্থায়ী করিয়া একটি ব্যাপক আইন প্রণয়নের সুপারিশ করা হইল। সেই সুপারিশ অনুযায়ী ১৯১৯ সালের ১৮ই মার্চ্চ ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে একটি আইন সরকারী সদস্যদের ভোটাধিক্যে পাশ করাইয়া লওয়া

লোহার সিঁড়ির সহিত হাত-পা বাঁধিয়া কাসুর রেল ষ্টেশনে অনেক ব্যক্তিকে কষাঘাত করা হইতেছে

হইল—উহার বিরুদ্ধে দেশব্যাপী প্রতিবাদ গ্রাহ্য করা হইল না। আইনটির নাম হইল রৌলট আইন। কোনও ব্যক্তিকে সন্দেহবশে গ্রেপ্তার করিবার ও তাহাকে নির্ব্বাসন দিবার ক্ষমতা এই আইনে সরকারকে দেওয়া হইল এবং জনসাধারণের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও রাজনৈতিক আন্দোলন করিবার অধিকার ইহার দ্বারা খর্ব্ব করা হইল; কোনও অঞ্চলকে আইন ও শৃঙ্খলাভঙ্গকারী ঘোষণা করিয়া তত্রত্য অধিবাসীদের প্রতি তদনুরূপ আচরণ করিবার অধিকারও গভর্ণমেণ্ট এই আইনের বলে প্রাপ্ত হইলেন। আরও নানাবিধ কঠোর দমন-

ব্যবস্থা আইনটির মধ্যে রহিল। আইনটির মেয়াদ অবশ্য তিন বৎসর হইবে বলিয়া ব্যবস্থা হইল। এইরূপ আইন পাশ হওয়ার প্রতিবাদে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, মিঃ মহম্মদ আলি জিন্না প্রভৃতি নেতৃগণ ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যপদ ত্যাগ করিলেন।

মন্টেগু-চেমস্‌ফোর্ডের রিপোর্টের উপর ভিত্তি করিয়া নূতন শাসন-সংস্কার আইন পাশ হওয়ার পূর্ব্বেই এই আইনটি পাশ হওয়ায় ভারতীয়গণের হস্তে ক্ষমতা-হস্তান্তর সম্পর্কে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের আন্তরিকতা ও সদিচ্ছায় সকলের যৎপরোনাস্তি সন্দেহ উপস্থিত হইল এবং সকলেই পূর্ব্ব হইতেই বুঝিতে পারিল যে, নূতন আইনেও ভারতীয়গণের স্বাধীনতার পথে বিশেষ কোনও অগ্রগতি সাধিত হইবে না। রৌলট আইন ভারতীয়গণের চরম লাঞ্ছনা এবং ইহা তাহাদিগের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ স্বরূপ। তাই এই আইনের বিরুদ্ধে ভারতে শীঘ্রই তীব্র গণ-বিক্ষোভ দেখা দিল। যুদ্ধের পর নিজেদের দেশ-শাসনের

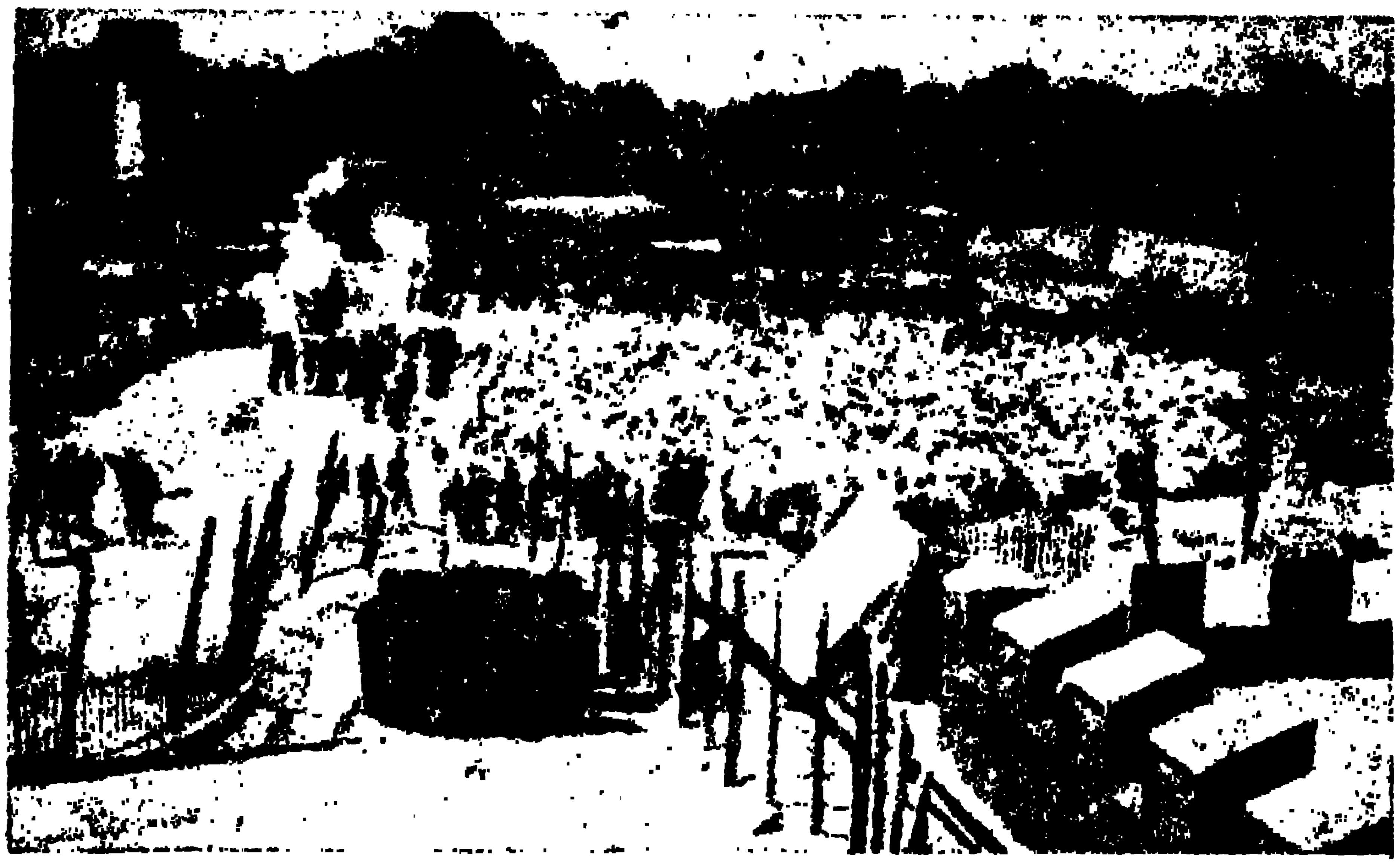

সন্দেহভাজন লোকদিগকে আবদ্ধ করিয়া রাখিবার জন্য কাহুর-এ নির্মিত খোঁয়াড়। ইহার উপরে কোনও আবরণ ছিল না এবং বাহির হইতে জনসাধারণ ভিতরের আবদ্ধ লোকগুলিকে দেখিতে পাইত

জন্মগত অধিকার লাভের সুখময় স্বপ্নে ভারতীয়গণ যখন আনন্দে বিভোর, তখন ইংরাজগণ নিজেদের প্রতিশ্রুতির অসারতা প্রতিপন্ন করিয়া তাহাদিগের অধীনতার নাগপাশ আরও দৃঢ় করিবার ব্যবস্থা করিল। অনাবশ্যক রূঢ় আঘাতে ভারতীয়গণ তাহাদের বাস্তব অবস্থা সম্বন্ধে হইল সচেতন এবং বুঝিল যে, যুদ্ধের সমকার অবস্থা ও তাহার পরবর্ত্তী অবস্থা এক নহে। বৃটিশ গভর্ণমেণ্টও কিন্তু বিস্মৃত হইয়াছিলেন যে, প্রথম মহাযুদ্ধের পর ভারতীয়গণেরও মানসিক অবস্থার যথেষ্ট পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। বিশেষতঃ যে বিপ্লবান্দোলন দমন-কল্পে আইনটি মুখ্যতঃ রচিত, সেই বিপ্লবান্দোলন তৎকালে আপনা হইতেই স্তিমিত হইয়া পড়ায়, উহা দমনের জন্য ঐরূপ কঠোর আইন নূতন করিয়া প্রণয়নেরও কোনও প্রয়োজনীয়তা ছিল না।

বৎসর কারাদণ্ড ভোগ করিয়া ১৯১৪ সালে তিলক মুক্তিলাভ করেন এবং ১৯১৫ সালে কংগ্রেসে যোগ দেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশও এই সময় কংগ্রেসে যোগদান করিয়াছিলেন এবং লালা লাজপত রায়ও আবার ফিরিয়া গেলেন কংগ্রেসে। ১৯১৮ সালের আগষ্ট মাসে বোম্বাই-এ সর্ব্বপ্রথম কংগ্রেসের একটি বিশেষ অধিবেশনের অনুষ্ঠান হইল এবং উহাতে রৌলট কমিটির রিপোর্টের বিরুদ্ধে নিন্দাজ্ঞাপক প্রস্তাব উত্থাপিত হইল।

কিছুদিন ধরিয়াই দেশে পুনরায় প্রকাণ্ড রাজনৈতিক আন্দোলন মাথা তুলিতেছিল। ১৯১৬ সালে মিসেস্ এনি বেসাণ্ট এবং তিলকের প্রচেষ্টায় "হোমরুল লীগ" স্থাপিত হইয়া দেশে প্রচার করিতেছিল স্বরাজের আদর্শ। এই স্বরাজ-আন্দোলন ক্রমশঃ তীব্র আকার ধারণ করায় গভর্ণমেণ্ট সচকিত হইয়া উঠিলেন। তিলক ও বিপিন পালের দিল্লী ও পাঞ্জাব-প্রবেশ এবং মিসেস্ এনি বেসাণ্টের বেরার ও মধ্যপ্রদেশ-প্রবেশ নিষিদ্ধ হইল। শেষ পর্য্যন্ত ১৯১৭ সালের ১৬ই জুন মিসেস্ এনি বেসাণ্ট, বি, পি. ওয়াদিয়া ও জি, এস্, এরাণ্ডেলকে করা হইল অন্তরীণ। জনসাধারণ সভা-সমিতি করিয়া দেশের সর্ব্বত্র এই দমন-নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিতে লাগিল। অবশেষে মিঃ মণ্টেগু ১৯১৭ সালের ২০শে আগষ্ট তারিখে ভারত-শাসনের ভবিষ্যৎ নীতি সংক্রান্ত বিষয়ে যে ঘোষণা করেন, তাহার প্রতি ভারতীয়দিগের অনুকূল মনোভাব পোষণের পথ সুগম করিয়া দিবার জন্য সঙ্গীদ্বয়সহ বেসাণ্টকে সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম দিকেই মুক্তি প্রদান করা হয়।

ভারতের রাজনীতিতে মহাত্মা গান্ধীর প্রবেশ এই সময় ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনে এক নূতন যুগের প্রবর্ত্তন করিল। দক্ষিণ আফ্রিকায় দীর্ঘ বিশ বৎসরকাল সত্যাগ্রহ-আন্দোলন পরিচালিত করিয়া মহাত্মা গান্ধী ১৯১৫ সালে ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। বিহারের চম্পারণ জেলায় যে সামান্য কয়জন নীলকর তখনও অবশিষ্ট ছিল, তাহাদের অত্যাচারে এই সময় কৃষকদের দুঃখ-দুর্দ্দশার অন্ত ছিল না। আবেদনের দ্বারা ফল না হওয়ায় মহাত্মা গান্ধী ১৯১৭ সালে এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ আন্দোলন পরিচালিত করেন। তখন কর্ত্তৃপক্ষ মহাত্মা গান্ধীসহ কয়েকজনকে লইয়া একটি কমিশন গঠন করিতে বাধ্য হইলেন এবং উক্ত কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী আইন

জেলায় দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট প্রজাদের খাজনা মকুব করাইবার জন্য ১৯১৮ সালে গান্ধীজী পুনরায় সত্যাগ্রহ পরিচালিত করিয়া সাফল্যলাভ করিলেন। ভারত-সরকার যখন রৌলট আইন পাশ করাইতে বদ্ধপরিকর, তখন ১৯১৯ সালের ১লা মার্চ্চ মহাত্মাজী ঘোষণা করিলেন যে, উক্ত আইনটি গৃহীত হইলে তিনি উহার বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ আন্দোলন সুরু করিবেন।

যাহা হউক, জনসাধারণের মতের বিরুদ্ধেই সরকারী সদস্যদের ভোটাধিক্যে রৌলট আইন পাশ হইয়া গেল। মহাত্মাজী তখন বোম্বাই-এ সত্যাগ্রহ-সভা গঠন করিয়া বিলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ ৩০শে মার্চ্চ সকল স্থানে হরতাল পালনের জন্য এক আবেদন জানাইলেন। হরতাল পালনের তারিখ পরে পরিবর্ত্তিত করিয়া ৩০শে মার্চ্চের স্থলে ৬ই এপ্রিল নির্দ্দিষ্ট হইল। এই হরতাল পালনের জন্য গান্ধীজীর আহ্বানে সমগ্র ভারতবর্ষ সাড়া দিল আশাতীতভাবে। প্রকৃতপক্ষে বলিতে গেলে সারা ভারতব্যাপী প্রকাণ্ড গণ আন্দোলন এই সময় হইতেই সুরু হইল।

তারিখ পরিবর্ত্তনের সংবাদ কিন্তু সকল স্থানে সময়মত পৌঁছিল না। সেই জন্য দিল্লী ও পাঞ্জাবের কোনও কোনও স্থানে ৩০শে মার্চ্চও হরতাল পালিত হইল। উক্ত দিনে প্রায় পঁচিশ হাজার মুসলমান দিল্লীর জুম্মা-মসজিদে সমবেত হইয়া নমাজ পাঠ করিলেন এবং নমাজ শেষ হইলে তাঁহাদের আহ্বানে স্বামী শ্রদ্ধানন্দ ঐ মসজিদে গিয়া হিন্দু-মুসলমান ঐক্য ও সত্যাগ্রহ সম্পর্কে বক্তৃতা দান করিলেন। হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে এই সময় যে অভূতপূর্ব্ব ভ্রাতৃভাব প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা দেখিয়া বৈদেশিক শাসকবর্গও বিচলিত হইয়া পড়েন। বক্তৃতা শেষে হিন্দু-মুসলমানের মিলিত এক বিরাট্ শোভাযাত্রা দিল্লীর বড় বড় রাজপথগুলি পরিভ্রমণ করিবার জন্য বাহির হয়। শোভাযাত্রা সম্পূর্ণরূপে শান্তই ছিল। পুলিশ কিন্তু সেই শান্ত শোভাযাত্রার উপরই চালাইল গুলি, যাহার ফলে বহু লোক সাংঘাতিকভাবে আহত হইল।

ইহার ফলে সেই বিরাট্ ক্ষুব্ধ জনতা অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে। সেই ক্রুদ্ধ জনতাকে শান্ত করিতে স্বামী শ্রদ্ধানন্দকে অত্যন্ত বেগ পাইতে হয়।

৬ই এপ্রিল ভারতের সর্ব্বত্র ব্যাপকভাবে হরতাল প্রতিপালিত হইল। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় পাঞ্জাব হইতে যে প্রকার উপায়ে অর্থ ও সৈন্য সংগ্রহ করা হইয়াছিল, তাহাতে কর্ত্তৃপক্ষের উপর তথাকার জনমত সাফল্য-মণ্ডিত। এই হরতাল পালনের কয়েকদিন পরেই যে রাম-নবমী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়, তাহাতে ডাঃ কিচলু এবং ডাঃ সত্যপালের চেষ্টায় অমৃতসহরের হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই আনন্দের সহিত যোগদান করেন। সকল ব্যাপার দেখিয়া শুনিয়া পাঞ্জাবের কুখ্যাত গভর্ণর স্যার মাইকেল ও'ডায়ার প্রমাদ গণিলেন। রৌলট আইনের বিরুদ্ধে সর্ব্বপ্রকার আন্দোলনই তিনি কঠোর হস্তে দমন করিতে কৃত-সঙ্কল্প হইলেন।

৯ই এপ্রিল পুলিশ ডাঃ সত্যপাল ও ডাঃ সইফুদ্দীন কিচলুকে গ্রেপ্তার করিয়া পরদিনই অজ্ঞাত স্থানে প্রেরণ করিল। প্রিয় জননেতাদ্বয়ের এই গ্রেপ্তারের সংবাদ যখন দ্রুতগতিতে চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল—তখন জনসাধারণের চিত্ত হইয়া উঠিল অতিশয় চঞ্চল। ১০ই এপ্রিল অমৃতসহরের সর্ব্বত্র ইহার প্রতিবাদে হরতাল পালিত হইল।

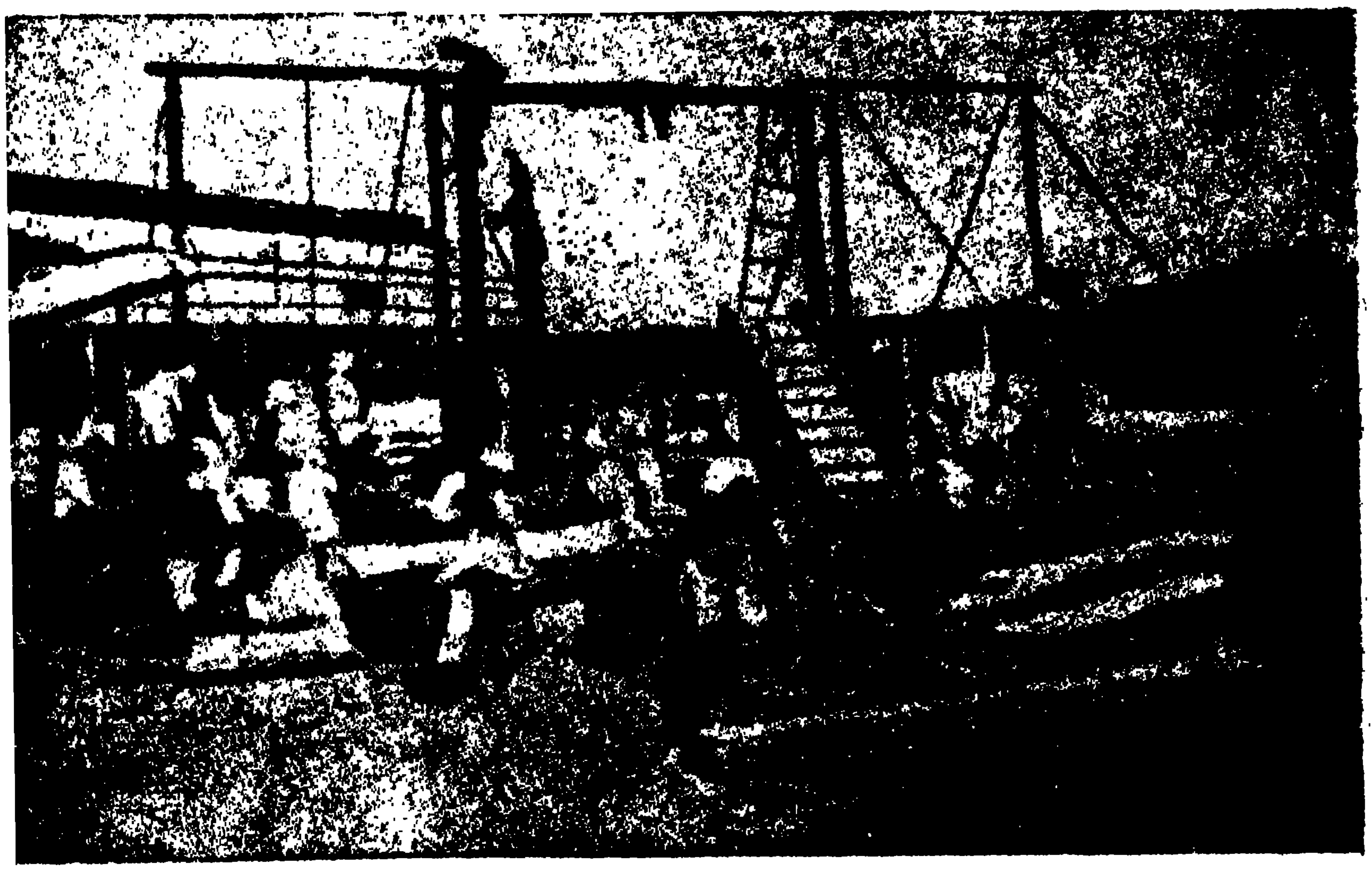

কানপুর-এ নির্ম্মিত ফাঁসি-কাঠ.

হাজার হাজার নর-নারী উক্ত দিবসে শহরের একটি নির্দ্দিষ্ট স্থানে সমবেত হইয়া তথা হইতে এক বৃহৎ শোভাযাত্রা বাহির করিল। হিন্দু, মুসলমান ও শিখ—তিনটি সম্প্রদায়ই যোগদান করিয়াছিল এই শোভাযাত্রায়। নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারে শোকের চিহ্ন-স্বরূপ শোভাযাত্রীদের মস্তক ছিল অনাবৃত এবং পদ নগ্ন। নেতাদ্বয়ের মুক্তির দাবী জানাইবার উদ্দেশ্যে শোভাযাত্রাটি ডেপুটি কমিশনারের আবাসগৃহের দিকে অগ্রসর হইল।

পুলিশ শোভাযাত্রার গতিরোধ করিল মাঝপথেই। জনতা পুলিশের বাধা মানিতে চাহিল না। ইহার ফলে সেই শান্ত জনতাকে ছত্রভঙ্গ করিবার জন্য পুলিশ শোভাযাত্রীদের উপর দুইবার গুলিবর্ষণ করিল। গুলি বর্ষণের পর জনগণ আর শান্ত রহিল না—নিমেষে অন্তর্হিত হইল তাহাদের সকল শৃঙ্খলা ও সকল সংযম। তখন আরম্ভ

উন্মত্ত জনগণ কতকগুলি সরকারী কার্য্যালয় ও ব্যাঙ্কে অগ্নিপ্রদান করিল ও ইংরাজদের উপর চড়াও হইয়া কয়েকজনকে নিহত করিল।

১১ই এপ্রিল শহরে সৈন্য মোতায়েন করিয়া শৃঙ্খলা ফিরাইয়া আনার ভার ছাড়িয়া দেওয়া হইল জেনারল ডায়ারের উপর। সকল প্রকার সভা-সমিতি বন্ধ করিয়া ১২ই তারিখে এক বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হইল বটে, কিন্তু অধিকাংশ লোকই এই ঘোষণার বিষয় কিছুই জানিতে পারিল না। ইতিমধ্যেই ১৩ই তারিখে জালিয়ানওয়ালাবাগে নেতৃদ্বয়ের মুক্তির দাবীতে একটি সভা হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছিল; সুতরাং নির্দ্দিষ্ট তারিখে অপরাহ্নে হিন্দু, মুসলমান ও শিখ লইয়া গঠিত দশ সহস্রাধিক লোকের এক জনতা—যাহারা উক্ত বিজ্ঞপ্তি সম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারে নাই—ঐ সভায় যোগদানের উদ্দেশ্যে জালিয়ানওয়ালাবাগে সমবেত হইল।

জালিয়ানওয়ালাবাগ একটি ক্ষুদ্র বাগান—প্রায় চতুর্দ্দিকেই বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা দ্বারা পরিবেষ্টিত। উহার ভিতরে যাইবার ও বাহিরে আসিবার জন্য একটি মাত্র প্রশস্ত ফটক আছে। উক্ত ফটক দিয়া এক সঙ্গে দুই তিন জনের অধিক লোক ভিতরে যাইতে বা বাহিরে আসিতে পারে না। অপরাহ্ন চারি ঘটিকায় সভারম্ভের সময় নির্দ্দিষ্ট থাকিলেও বহু পূর্ব্ব হইতেই নর-নারীতে সভাস্থল পূর্ণ হইয়া গেল।

সভা আরম্ভের অল্প পূর্ব্বে জেনারল ডায়ার অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত সৈন্যদল লইয়া সহসা আসিয়া আবির্ভূত হইলেন এবং জনতাকে ছত্রভঙ্গ হইয়া যাইবার জন্য সামান্য কয়েক মিনিটমাত্র সময় দিলেন। সকলে তাঁহার আদেশের বিষয় জানিতেও পারিল না এবং ঐ অল্প সময়ের মধ্যে সকলের সেই অপ্রশস্ত পথ দিয়া বাহির হইয়া যাওয়াও সম্ভব ছিল না। ডায়ার কিন্তু সে সকল বিষয় বিবেচনার মধ্যেও আনিলেন না। বাগের অভ্যন্তরস্থ উচ্চ স্থান হইতে তিনি সৈন্যগণকে জনতার প্রতি গুলি বর্ষণের আদেশ দিলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে প্রবল গুলি বর্ষণ আরম্ভ হইয়া গেল। যাতায়াতের যে একটিমাত্র প্রশস্ত ফটক ছিল—উহা লক্ষ্য করিয়াই সৈন্যদল গুলি চালাইতে লাগিল; যেন জনতা ছত্রভঙ্গ করা অপেক্ষা নরহত্যা করাই প্রধান উদ্দেশ্য। নিমেষমধ্যে জালিয়ানওয়ালাবাগে প্রবাহিত হইল রক্তের নদী। ভীত ও সন্ত্রস্ত নিরস্ত্র শান্ত জনতা পলায়নের পথ না পাইয়া ক্ষুদ্র বাগানটির ভিতরেই ধাক্কাধাক্কি করিয়া গুলির আঘাতে অসহায়ের মত প্রাণ দিতে লাগিল। গুলিবর্ষণ তথাপি বন্ধ হইল না।

ডায়ার ক্ষান্ত হইলেন দশ মিনিট অবিশ্রান্ত গুলি বর্ষণের পর। পরে তিনি অবশ্য আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন,—"গুলি ফুরিয়ে না গেলে আমি সব শেষ ক'রে দিতাম; মেসিনগান নিয়ে যেতে পারলে মেসিনগান চালাতাম।"

গুলিবর্ষণ সমাধা করিয়া ডায়ার সদলবলে প্রস্থান করিলেন—পশ্চাতে ফেলিয়া গেলেন মৃতদেহের স্তূপ, আর আহত ও রক্তমোক্ষণকারী মুমূর্ষু নরনারী। মৃতদেহগুলিকে অপসারিত করিবার অথবা আহতদিগের চিকিৎসা ও শুশ্রূষার কোনও ব্যবস্থাই করা হইল না। সারারাত্রি আহত জনগণ অন্ধকারে পড়িয়া গোঙাইতে লাগিল।

এই ঘটনায় আহত ও নিহতের যে সরকারী বিবরণ পরে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতে জানা যায় যে, সেদিনের গুলিবর্ষণে নিহত হইয়াছিল ৩৭৯ জন ও সাংঘাতিকভাবে আহত হইয়াছিল ১২০০ জন। বে-সরকারী মতে নিহতের সংখ্যা ছিল প্রায় ১০০০।

এই ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হইবার পর পাঞ্জাবের তৎকালীন গভর্ণর স্যার মাইকেল ও'ডায়ারের সেক্রেটারী টেলিগ্রাম করিয়া জেনারল ডায়ারকে জানাইলেন,—"আপনার কাজ সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত; গভর্ণর বাহাদুর এর সমর্থন করছেন।"

এই অমানুষিক নির্ম্মম অত্যাচারের পরও পাঞ্জাবের জনগণ রেহাই পাইল না। ১৫ই এপ্রিল তারিখে লাহোর ও অমৃতসহরে এবং কয়েকদিন পরে আরও কয়েকটি অঞ্চলে সামরিক আইন জারি করা হইল। এ সম্বন্ধে সংবাদপত্রে কোনও খবর প্রকাশ করা হইল নিষিদ্ধ এবং বাহিরের কোনও লোককে পাঞ্জাবে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইল না। বহির্জ্জগৎ হইতে পাঞ্জাব রহিল সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া।

পাঞ্জাবের নানাস্থানে গোলমাল চলিতে লাগিল—গ্রেপ্তার করার কাজও চলিল পুরাদমে। লালা হরকিষণলাল ও রামভুজ দত্তচৌধুরীকে লাহোর হইতে নির্ব্বাসিত করা হইল। সি, এফ্, এণ্ডরুজ পাঞ্জাবে প্রবেশ করিয়া ধৃত হইলেন এবং পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য পাঞ্জাবে যাইবার চেষ্টা করিয়াও সফল হইলেন না।

সামরিক আইন জারি করার পর পাঞ্জাবে যে লোমহর্ষক অত্যাচার ইংরাজগণের দ্বারা অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল, তাহা সভ্য জাতির ইতিহাসে সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। পীড়ন-নীতির চরমতম কুৎসিত বীভৎসরূপ আত্মপ্রকাশ করিল। ছাত্র, শিক্ষক ও নেতৃবৃন্দ কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিলেন নির্ব্বিচারে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিশুদিগকে জোর করিয়া বৃটিশ পতাকা অভিবাদন করান হইতে লাগিল—একটি বিশেষ রাস্তায় জনসাধারণকে বাধ্য করা হইল হামাগুড়ি দিয়া যাইতে। উন্মুক্ত স্থানে জনগণকে বেত্রাঘাত করা, হাত-পা কোমর শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা লোককে দণ্ডায়মান অবস্থায় রাখা, একটা খোঁয়াড়ে বহু বন্দীকে একত্র আবদ্ধ করিয়া রাখা—ইত্যাদি জঘন্যতম পীড়ন প্রণালী পাঞ্জাবে নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা হইয়া দাঁড়াইল। মানুষকে জোর করিয়া টানিয়া নামানো হইল ইতর প্রাণীর পর্য্যায়ে।

নিজের দেশবাসীর এই লাঞ্ছনায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজেকেও সমভাবে লাঞ্ছিত ও অপমানিত বোধ করিয়া ইহার প্রতিবাদে নিজের "নাইট" উপাধি ত্যাগ করিয়া বড়লাটকে এক পত্র লিখেন। সেই পত্রখানি একখানি ঐতিহাসিক দলিলের মর্য্যাদা লাভ করিয়াছে। একমাত্র তাঁহার এই তীব্র প্রতিবাদের ফলেই সমগ্র সভ্য জগতের দৃষ্টি সর্ব্বপ্রথম পাঞ্জাবের ঘটনার প্রতি আকৃষ্ট হইল। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের বহু অন্তরঙ্গ ইংরাজ বন্ধু তাঁহার এই আচরণের জন্য তাঁহার প্রতি বিরূপ হইয়া উঠিলেন। পাঞ্জাবে দীর্ঘস্থায়ী সামরিক আইন জারি করায়

প্রতিবাদে বড়লাটের শাসন-পরিষদের তৎকালীন একমাত্র ভারতীয় সদস্য স্যার চিত্তর শঙ্করণ নায়ারও পদত্যাগ করিলেন।

মহাত্মা গান্ধীর দিল্লী ও পাঞ্জাব-প্রবেশ নিষিদ্ধ করিয়া আদেশ জারি হইয়াছিল। দিল্লীর পথে তিনি ধৃত হইলেন এবং তাঁহাকে বোম্বাই-এ লইয়া গিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইল। গান্ধীজীর গ্রেপ্তারের সংবাদ শুনিবামাত্র দিল্লী, আহমেদাবাদ ইত্যাদি স্থানে আরম্ভ হইয়া গেল দাঙ্গা-হাঙ্গামা। গান্ধীজী তখন আহমেদাবাদে গমন করিলেন এবং তাঁহার চেষ্টায় আবার সর্ব্বস্থানে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইল। গান্ধীজী তখনকার মত তাঁহার সত্যাগ্রহ-আন্দোলন বন্ধ রাখিলেন।

পাঞ্জাবের অত্যাচার লইয়া সারা ভারতে যখন বিক্ষোভ উপস্থিত হইল, তখন সরকার পক্ষ অক্টোবর মাসে লর্ড হাণ্টারের সভাপতিত্বে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করিতে বাধ্য হইলেন। এই কমিটির তদন্তের ভরসায় না থাকিয়া কংগ্রেসের তরফ হইতে একটি পৃথক্ তদন্ত কমিটি গঠিত হইল।

কংগ্রেস নিযুক্ত তদন্ত কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হইল ১৯২০ সালের ২৫শে মার্চ্চ। রিপোর্টে বলা হইল যে, পাঞ্জাবে এমন কোনও বিদ্রোহের লক্ষণ দেখা যায় নাই, যাহার জন্ম সামরিক আইন জারি করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছিল। বড়লাট লর্ড চেমস্‌ফোর্ড, পাঞ্জাবের গভর্ণর স্যার মাইকেল ও'ডায়ার, জেনারল ডায়ার এবং আরও বহু ছোট বড় কর্ম্মচারীকে পাঞ্জাবের অত্যাচারের জন্ম প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দায়ী করা হইল।

হাণ্টার কমিটির রিপোর্ট বাহির হইল ১৯২০ সালের ২৮শে মে তারিখে। কমিটির দুইজন ভারতীয় সদস্য স্বতন্ত্র রিপোর্ট প্রদান করিয়া সামরিক আইন জারির যৌক্তিকতা অস্বীকার করিলেন এবং তাঁহাদের সিদ্ধান্তও রচিত হইল উহারই উপর ভিত্তি করিয়া। কমিটির অধিকাংশ সভ্য (ইংরাজ) কিন্তু সামরিক আইন জারির প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিলেন। তাঁহারাও অবশ্য ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন যে, বৃটিশ-রাজের বিরুদ্ধে কোনও বিদ্রোহের ষড়্‌যন্ত্র পাঞ্জাবে হয় নাই এবং আফগান যুদ্ধের সহিতও ইহার কোনও যোগাযোগ ছিল না। অত্যাচারী কর্ম্মচারীদের কার্য্যের মৃদু সমালোচনা তাঁহারা করিলেন এবং অধিকক্ষণ ধরিয়া গুলি বর্ষণ করিয়া যাওয়ার আদেশ দেওয়াটা ডায়ারের পক্ষে উচিত হয় নাই—ইহাও স্বীকার করিলেন। ইংরাজ কর্ম্মচারীদের দুষ্কৃতি যথাসম্ভব লঘু করিয়া দেখাইবার প্রয়াস তাঁহাদের এই রিপোর্টে সুপরিস্ফুট।

হাউস অফ কমন্সে পাঞ্জাব-সংক্রান্ত ব্যাপারের আলোচনায় ভারত-সচিব মণ্টেগু সাহেব কেবলমাত্র বলিলেন যে, ডায়ারের গুরুতর বিচার-বিভ্রম ঘটিয়াছিল। অবশ্য ডায়ারকে ভারত-সরকারের অধীন কোনও নূতন পদে আর নিযুক্ত করা হইবে না বলিয়া তিনি আশ্বাস দিলেন। তাব দেখিয়া মনে হইল, যেন তাঁহার এই ঘোষণার দ্বারাই ভারতবাসীর সকল ক্ষয়-ক্ষতির পুরণ হইয়া গেল এবং সকল ব্যাপারের সুমীমাংসা হইল! হাউস্ অফ কমন্স-এর ঐ সামান্য সহানুভূতিটুকুও কিন্তু অভিজাত হাউস অফ লর্ডস্-সভা বরদাস্ত করিতে পারিলেন না। তাঁহারা হাউস্ অফ কমন্স-এর উক্ত সিদ্ধান্তে দুঃখ প্রকাশ করিয়া প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন এবং ডায়ারের কার্য্যাবলীর জন্ম আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলেন। ইংরাজ-মহিলারাও ডায়ারের বীরত্বকে স্বীকার করিয়া লওয়ার ব্যাপারে পশ্চাতে পড়িয়া রহিলেন না। বিপুল উদ্যমে তাঁহারা তিন লক্ষ টাকা চাঁদা তুলিয়া কৃতজ্ঞতার নিদর্শন-স্বরূপ তাহা ডায়ারকে উপহার দিলেন।

দুখের দিনে

শ্রীনীহাররঞ্জন সিংহ

আমার দুখের দিনে প্রিয়
গোপন রেখো সবার থেকে!
কেবল তুমি, তুমিই এস
শান্তি প্রলেপ দিও এঁকে!
জগত সভার উৎসবেতে
রইবে যখন সবাই মেতে,
রইতে দিও দুখেই তাদের
আমার ব্যথা ভুলিয়ে রেখে!

ফুল বিহীন এই মন বাগিচার,
পাতা ঝরার নগ্ন ক্ষণে,
সঞ্জীবিত করো প্রিয়
কেবল তুমি সংগোপনে।
সবার করো আস্তে মানা,
কারো আঁখে চাইনা টানা,
দুখের কাজল, চাইনা প্রিয়,
দুখ যে পাবে দুঃখ দেখে!

\+ ৩ ০ ১

সা গা -া গা | গা গা গা মা I মা পা পধা মপা | পা পা পা -া I

ন মা মি ক ম লা ম্ অ ম লা ম্ অ তু লা ম্

পা ধা ধা -া | ধা ধা র্সনা ধপা I -া না ধা না | পা -া -া -া I

সু জ লা ম্ সু ফ লা ম্ ০ মা ত রম্

-া র্সা র্গা র্রা | র্রা র্সা র্সা র্রা I নর্সা না -া -া | -া -া -া -া I

০ শ্যা ম লা ম্ স র লা ম্

ধা র্সা না না | পা পা না ধা I ধা পা -া -া | -া -া -া মা |

সু স্ মি তা ম্ ভূ ষি তা ম্

মা ধা পা মা | গা মা ধা পা I মা গা -া -া | -া -া -া -া I

ধ র ণী ম্ ভ র ণী ম্

সা রা গা পা | গা পা ধা না I পা ধা না র্রা | র্সা -া -া -া II

মা ত রম্

“ত্রিংশ···রিপুদলবারিণীম্ মাতরম্”—বিনা তবলা সঙ্গতে গেয়

সা -া সা | মা -া | মা -া I মা -া মা | মা ধা | পা পা I মা মা পা |

ত্রি ং শ কো টি ক ণ্ ঠ ক ল ক ল নি না

মা মা | জ্ঞা মা | মা জ্ঞা I মা ণা ধা ণা | পা ধা ণা র্সা I র্রা র্জ্ঞা র্রা র্সা |

দ ক রা লে দ্বি ত্রিং - শ কো টি ভু জৈ র্ ধৃ ত

পা র্রা র্সা ণা I ধা ণা ধা পা | -া -া -া -া I া মা পা না | র্সা র্রা র্সজ্ঞা র্রা I

খ র ক র বা লে ০ কে ব লে মা তু

র্সা র্রা র্সা না | র্সা -া -া -া I { র্সা র্রা র্সা র্সা | ণা -া ণা ণা র্সা I ধা ধা র্সা না |

মি অ ব লে ব হু ব ল ধা রি ণী ম্ ন মা মি

ধা পা পা পা ধা I মা পা রা মা | পা র্সা ণা ধা পা I মা জ্ঞা রা সা -া II

তা রি ণী ম্ রি পু দ ল বা রি ণী ম্ মা ত র ম্

ত্রিতাল

০ ১ +

সা -া সরা সজ্ঞা | সরা -া সা -া I রসা ণ্ধা ণা সা | সা -া সা -া I

তু মি বি দ্যা তু মি ধ র্ ম

কিম্বা এক সপ্তক ঊর্ধ্বে তারায় :

র্সা -া সরা র্সজ্ঞা | র্সরা -া র্সা -া I র্রসা ণধা ণা র্সা | র্সা -া র্সা -া I

তু মি বি দ্যা তু মি ধ র্ ম

সণ্‌া সা মজ্ঞা মা | ধপা ধা র্সণা র্সণা I পধা মা মধা ণর্সা | র্সা -া র্সা -া I
তু মি হৃ দি তু মি ম র্ম ম

র্সা র্রা র্সা ণা | ণা -া ধা ণা I পা ধা -া র্সা | ণা -া -া -া I
ত্ব ম্‌ হি প্রা ণা ঃ শ রী রে

একতালায়

মগা মা ধা | ণা র্সা সর্রা I নর্সা -া র্সা | -া -া -া I
বা হু তে তু মি মা শ ক্‌ তি

র্সনা র্সা র্রা | র্মজ্ঞা র্রা র্সর্রা I নর্সা র্রা র্সণা | ধপা -া -া I
হৃ দ য়ে তু মি মা ভক্‌ তি

র্রর্সা র্সণা ণধা | পধা ধর্সা র্সণা I ণধা ধপা -া | সা -া -া I
তো মা রি প্র তি মা গ ড়ি

সা রা মরা | মা পা ণমা I পা না র্সর্রা | নর্সা -া -া I
ম ন দি রে মন দি রে

"ত্বং হি দুর্গা···নমামি ত্বাম" অংশে তবলা বাজবে না

র্সা -া না | ধপা -া | গা -া I ধা পা -া | সা রা | গা পা I ধা না র্সা | না -া I
ত্ব ম্‌ হি দু র গা দ শ প্র হ র ণ ধা রি ণী

র্সা র্রা র্মর্রা -া না | র্সা র্গা র্রা র্ঋা র্রা | নর্রা -া র্সা না -া I
ক ম লা ক ম ল দ ল বি হা রি ণী

র্সা -া না -া | পা না ধা -া | স্মা ধা স্মা পা -া | সা রা -া গা -া | সা -া -া -া I
বা ণী বি দ্যা দা য়ি নী ন মা মি ত্বা ম্‌

পরিশেষে বক্তব্য—এ গানটি কোরাসে গাইবার সময়ে পুরুষ ও নারীকণ্ঠ কয়েকটি চরণ আলাদা আলাদা গাইলে বড় সুন্দর শোনায়। যেমন ধরা যাক্‌ ১ম স্তবক—পুরুষ ও নারীকণ্ঠ একত্রে শুভ্র···শোভিনীম্‌—পুরুষ। সুহাসিনী···ভাষিণীম্‌—নারী। সুখদাং···মাতরম্‌—একত্রে। ত্রিংশ···করবালে—একত্রে। কে বলে···অবলে—পুরুষ। বহুবল ধারিণীং···মাতরম্‌—১ম বার নারী ২য় বার পুরুষ। তুমি বিদ্যা···ধর্ম—পুরুষ। তুমি হৃদি···মর্ম—নারী। ত্বং···শরীরে—একত্রে। বাহুতে···শক্তি—পুরুষ। হৃদয়ে···ভক্তি—নারী। তোমারি···মন্দিরে—একত্রে। ত্বং···ধারিণী—পুরুষ। কমলা···বিহারিণী—নারী। বাণী···ত্বাম—একত্রে। নমামি···সুফলাং মাতরম্‌—প্রথমবার পুরুষ, দ্বিতীয়বার নারী। ৮ম স্তবক—নারী পুরুষ একত্রে।

ভয়ঙ্কর

ইন্দ্রযব

"এই যে মিণ্টু! শুনে যা।"

মিণ্টু শুনিল না; পালাইয়া আত্মগোপন করিল। ইহার পরের অধ্যায় তাহার জানা; হাসি ও বিদ্রূপ! এ তাহার প্রায় প্রত্যহের ঘটনা।

কিন্তু সেই বা কি করিবে? রাত্রের স্বপ্নের অনুভূতিতে যা এত সত্য বলিয়া প্রতীয়মান, তাহারই প্রকাশ পায় অবচেতন মনের শব্দে!

ঘুমের ঘোরে চীৎকারে স্বপ্নের গভীর অনুভূতিকে সত্য বলিয়া প্রমাণ করিতে চায়

কিন্তু স্বপ্ন!

তাহার স্বপ্ন সাধারণ নয়, সহজাত কবচকুণ্ডলের মত দিব্য দর্শনের জ্যোতির্ম্ময় দৃষ্টি! তাহা কাহাকেও বুঝাইতে পারে নাই।

এই আজ তাহার মনে অনুভূতির যে মহাবিপ্লব ঘটিয়া গেল, তাহা কাহাকেও বলিবার নয়। তাহার জীবনের ভয়ঙ্কর আজ মহামানবরূপে দাঁড়াইয়াছে! অথচ তাহাই বলিতে চাহিলে সকলে ঠাট্টা করিবে।

ছোটবেলা হইতেই দুটী জিনিষ তাহার কাছে ভয়ঙ্কর! একটী ছোড়দিমণির ভূত! এমন কি এখনও ছোড়দিমণি সন্ধ্যার পর বাড়ীর পিছনের ঝোপটার কাছে যাইতে পারে না। আর অন্যটী বাবার স্বদেশী ডাকাত! তাহার বাবা পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর। তাঁহার কাছে শোনা কাহিনী এদের রূপ দিয়াছে রক্তলোলুপ শ্বাপদের; নিঃশব্দ এদের বিদ্যুৎগতি, নির্ম্মম এদের প্রতিহিংসা!

সেইদিন সন্ধ্যায় দালানের ছাদে বসিয়া ছোড়দিমণির সঙ্গে মিণ্টু একটা টেনিস বল লইয়া খেলিতেছিল, নীচে যাইয়া খেলা বারণ। আগষ্ট মহাবিপ্লবের মন্ত্রে সমস্ত ভারত মুখরিত। তাহাদের ক্ষুদ্র শহরেও আলোড়ন দেখা দিয়াছে; জলধি মুক্তির জন্য মহাবিক্ষুব্ধ!

বৈদেশিক শাসক পুষ্ট পিতার আদেশ—"কেউ বাইরে যাইবে না।"

তাহারা ছাদে দাঁড়াইয়া সেই মহাদৃশ্য দেখে, আর ছোট বুকে মহাতাণ্ডব শুরু হয়। নানারূপ ভয় ও আবেগ মনের মধ্যে তোলাপাড় করিতে থাকে।

"ছোড়দিমণি, আজ কলেজ ষ্ট্রাইক হ'লো, নারে?"

"হুঁ"

"কাল যাবি?"

"না, বাবা যা ক্ষেপে গ্যাছে!"

ছোড়দি বল দিতেছিল, মিণ্টু ধরিতেছিল। ছোড়দি কেমন জানি অন্যমনস্ক হইয়া পড়িতেছিল। এই মহাবিপ্লবের কোন ছন্দে না জানি তাহারও দোলা লাগিয়াছে। মিণ্টু ভাবিতেছিল সেই সকল ভয়ঙ্কর লোকদের কথা, যাহারা সমস্ত দেশটা তোলপাড় করিয়া তুলিয়াছে।

"ঐ যাঃ!"

বলটা ছাদের প্রাকার পার হইয়া নীচে পড়িয়া গেল।

"ছোড়দিমণি!" প্রায় কান্নায় মিণ্টু ভাঙ্গিয়া পড়িল; কা'ল এই বলটা সে কিনিয়াছে।

"চল নীচে গিয়ে খুঁজে আনি।"

নীচে আসিয়া দুই জনে বাড়ীর পিছনে খুঁজিতে লাগিল। পরিষ্কার জায়গায় কোথাও নাই। এইবার বাকী শুধু ঝোপটা! "ঐদিকে আয়"

মিণ্টু কিন্তু আগাইল না। শুধু দুটী চোখ করুণ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

"দাঁড়া একটা আলো নিয়ে আসি—ভয় কি? খালে এখনও নৌকা চলছে।"

একটু পরে ছোড়দি একটী লণ্ঠন লইয়া আসিল। দুই জনে ভয়ে ভয়ে ঝোপটার এ পাশে খুঁজিতে লাগিল। কিন্তু কোথাও পাওয়া গেল না।

"চল মিণ্টু, খালের দিকটা দেখে আসি।"

"খালের ঐ দিকে।" মিণ্টুর কণ্ঠস্বর মিন্ মিন্ করিতেছে। খালের জল ছল্ ছল্ করিয়া বহিয়া চলিয়াছে। শিয়ালের দল ওপারে একটানা চীৎকার শুরু করিয়া দিয়াছে।

'চল্ না, কি ভীতু বাবাঃ!"

ছোড়দি চলিতেছে, তাহারই পিছনে ভয়ে জড়সড়

মিণ্টু। ঝোপটা ঘুরিতেই মিণ্টু বলিয়া উঠিল—"ছোড়দিমণি!"

—"কিরে?"

—"ঐ যে জলের ধারে⋯"

সেই দিকে তাকাইতেই মীরার হৃদকম্প উপস্থিত হইল।

ভাঁটার সময় খালের জল একেবারে নীচে নামিয়া গিয়াছে। ঝোপটার পাশেই খালের ভিজা মাটীর উপর "কাত" হইয়া পড়িয়া আছে একটা মানুষ!

দুই ভাইবোনে আর দাঁড়াইল না। উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে লাগিল। রান্নাঘরে একেবারে মা'র কোলের কাছ ঘেঁসিয়া বসিয়া হাঁপাইতে লাগিল।

মা অবাক্ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি হয়েছে, অমন হাঁপাচ্ছিস্ কেন?"

—"একটা ভয়ঙ্কর ভূত!" কোন রকমে মিণ্টুর গলা দিয়া বাহির হইল।

"ভূত! কোথায়?"

"ঐ যে খালের ধারে।"

"যাঃ, ভীতু কোথাকার"

"না মা সত্যি" মীরা কোন রকমে বলিল "ঐ খালের ধারে একটা মানুষ পড়ে আছে।"

"মানুষ! চলত দেখে আসি" বলিয়া লণ্ঠনটী নিলেন। মীরা অতি সঙ্কোচে মা'র পিছু নিল; মিণ্টুর ভয় অন্তর,—কৌতূহল প্রচুর। চাকর কেষ্টর কোলে চড়িয়া বলিল—"কেষ্ট চল না।"

লোকটী সেই ভাবে কাত হইয়া পড়িয়া আছে। জীবিত না মৃত বোঝা যায় না। মা লণ্ঠনটী কেষ্টর হাতে দিয়া বলিলেন—"দেখত কেষ্ট লোকটী বেঁচে আছে, না ম'রে গ্যাছে?"

কেষ্ট মিণ্টুকে নামাইয়া লণ্ঠনটী লইয়া আগাইয়া দেখিতে লাগিল।

"আরে, এ যে আমাদের প্রতুলবাবু!" কেষ্ট প্রায় চীৎকার করিয়া উঠিল।

"কে বল্লি?" মা উদ্বিগ্নকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন।

"বড়দিমণির দেওর—আমাদের"—

"প্রতুলদা!" ছোড়দির গলা হইতে অদ্ভুত ভাবে বাহির হইল, মনে হইল আর কেহ যেন বলিতেছে।

ছোড়দি মাকে একপাশে ঠেলিয়া ঝড়ের মত আগাইয়া গেল। লোকটার একান্ত কাছে গিয়া দাঁড়াইল। তারপর কেষ্টর হাত হইতে লণ্ঠনটী লইয়া লোকটির বুকে হাত রাখিয়া দেখিবার চেষ্টা করিল। নাকের কাছে হাত রাখিয়া নিশ্বাস বুঝিবার চেষ্টা করিল। মিণ্টু দেখিতেছিল ছোড়দির মুখখানা কান্নায় ফাটিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে। মাও পাশে বসিয়া ঝুঁকিয়া দেখিতেছিলেন। সহসা লোকটার কণ্ঠ হইতে একটু গোঙানির শব্দ বাহির হইল, সঙ্গে সঙ্গে একটু নড়িয়াও উঠিল।

"মা, বেঁচে আছে!" শতধা বিদীর্ণ কণ্ঠে ছোড়দি চীৎকার করিয়া উঠিল।

মা ছোড়দির কণ্ঠস্বরে চমকাইয়া অপলকনেত্রে ছোড়দির দিকে তাকাইলেন। ছোড়দির দুই চোখ বাহিয়া ধারায় জল নামিতেছে। পাতলা ঠোঁট দুইটী থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিতেছে। ছোড়দি মার সে দৃষ্টি সহ্য করিতে পারিতেছিল না।

"সর্ব্বনাশী, এ তুই কি করেছিস্?"

ছোড়দি কোন উত্তর দিল না। সহসা ঝাঁপাইয়া মায়ের বুকের মধ্যে মুখ লুকাইয়া, দু হাতে তাঁহার গলা জড়াইয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। মা'রও দুই চোখে জল: মাঝে মাঝে ছোড়দির মাথায় হাত বুলাইতেছেন।

মিণ্টু অবাক্ হইয়া গেল ছোড়দি ও মা'র ব্যাপারে। আরে প্রতুলদা যে এখনও মাটীতে পড়ে?

"মা!"

"ও, হাঁ, কেষ্ট তুমি প্রতুলকে কাঁধে করে নাও ত! যাও মীরা একটু ধর গিয়ে। মিণ্টু তুই লণ্ঠনটা নে।"

শেষ পর্য্যন্ত মা ছোড়দি ও কেষ্ট তিন জনে মিলিয়া অতিকষ্টে ধরাধরি করিয়া লোকটিকে নিয়া যাইতেছিল; মিণ্টু পিছনে লণ্ঠন লইয়া যাইতেছিল। মিণ্টুর মনে হইতেছিল একটী মিষ্ট মধুর স্বপ্ন!

এর পর ঘরে আসিয়া প্রতুলদার জামা কাপড় বদলান হইল। গরম দুধ খাওয়ান হইল। প্রতুলদা একবার চোখ চাহিয়া কথা বলিবার চেষ্টা করিতেই মা বলিয়া

উঠিলেন, "না বাবা এখন কোনও কথা নয়। একটু ঘুমোও।"

তার পর মিণ্টুকে বলিলেন—"চল এখান থেকে, মারা ওর মাথায় বাতাস কর বসে।"

মিণ্টুর ভয়ঙ্কর রাগ হইল, প্রতুলদাকে সেই প্রথম দেখিল, অথচ এখন সে-ই কিনা থাকিতে পাইবে না!

ধীরে ধীরে যাইয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল।

প্রতুলদাকে মিণ্টুর আবার মনে পড়িতে লাগিল। বড়দিমণির বিয়ের পরের দিন কথায় কথায় বাবা ও আরও কয়েকজন ঠাট্টা করেছিলেন প্রতুলদাকে—কোম্পানীর রাজত্ব এরাই নাকি উচ্ছেদ করবে?

প্রতুলদা কিন্তু বিদ্রূপ বলিয়া নেন্ নাই; নিয়াছিলেন নির্ম্মম আঘাত বলিয়া। ফুঁসিয়া উঠিয়াছিলেন সর্পের মত উদ্যত ফণা!

সকলে চমকাইয়া উঠিয়াছিল। স্ফুরিত নাসা তীক্ষ্ণধী যুবকের কঠিন শ্লেষে সকলের মাথা নত হইতেছিল, এটুকু মিণ্টুর মনে পড়ে; কিন্তু তখন প্রতুলদার অনেক কথার অর্থই সে বোঝে নাই।

সরীসৃপের নিঃশব্দগতি ও চক্ষুর ক্রূরতার সন্ধান পাইয়াছিল ঐ দৃষ্টিতে। তারপর বাবার কাছে শোনা এদের বিচিত্র রোমাঞ্চকর কাহিনী।

কিন্তু প্রতুলদার আর একটা রূপ!

বড়দিমণি হইতে সকলেই ছোড়দিমণিকে দেখিলেই ক্ষেপাইত। তখনকার প্রতুলদা একেবারে অন্যরূপ।

এই দুই প্রতুলদা কিছুতেই তাহার কাছে এক হইতে পারিতেছিল না। কি করিয়া ঐ সুন্দর মুখখানা সমস্ত ভারতব্যাপী মুক্তি সাধনার তাণ্ডব যজ্ঞ সুরু করিয়াছে?...

একটা বিশ্রী অনুভূতি লইয়া মিণ্টুর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। ঘরের দেওয়ালের বড় ঘড়িটা অসম্ভব রকমে জোরে টক্ টক্ শব্দ করিতেছে।

—"না—না তুমি যেতে পাবে না।"

বাবা একেবারে অফিসের পোষাকে দাঁড়াইয়া আছেন, মা তাহার সামনে দাঁড়াইয়া।

—"আমার দিকে না চাইলে কিন্তু মেয়েটার দিকে একবার চেয়ে দেখ!"

বাবা কোন উত্তর দিলেন না। ধীরে ধীরে গিয়া চেয়ারে বসিয়া কপালে হাত রাখিয়া চোখ বুজিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন। চোয়ালের পেশীগুলি বার বার শক্ত হইয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল।

মিণ্টু আস্তে আস্তে নামিয়া যে ঘরে প্রতুলদা ছিল সেই ঘরের দিকে চলিল। ঘরে ঢুকিতে যাইয়া মিণ্টু দাঁড়াইয়া পড়িল।

—"কেঁদ না গীরা, আমরা সৈন্য, দেশের মুক্তিই আমাদের তপস্যা। তোমার প্রেমই আমার প্রেরণা। তাই এ জায়গা ছাড়বার আগে তোমার সঙ্গে দেখা করে গেলাম। আমাকে এগিয়ে চলতেই হবে।"

দরজার ফাঁক দিয়া দেখিল প্রতুলদার বুকের মধ্যে মাথা রাখিয়া দাঁড়াইয়া আছে ছোড়দিমণি। প্রতুলদা তাকাইয়া আছে সামনের উজ্জ্বল ইলেকট্রীক আলোটার দিকে—উজ্জ্বল চোখ দুইটা অসম্ভব রকমে জ্বল্ জ্বল্ করিতেছে। রাত্রির গভীর তমিস্রা যেন পুঞ্জীভূত ঐ দুটা চোখে।

প্রতুলদা ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গভীর অন্ধকারে মিলাইয়া গেলেন।......

রাত্রির গভীর অন্ধকারে মিণ্টু দেখিতেছিল একটা লোক ধীরে ধীরে আগাইয়া চলিয়াছে, পর্ব্বতের ছোট ছোট ফাঁকে, গভীর অরণ্যের মধ্যে ছুটিয়া চলিয়াছে। ধীরে ধীরে অন্ধকার কাটাইয়া উষার আলোকে বনভূমি শ্যামল হইয়া উঠিল। উষার আলোকে দেখিল—আরে এ প্রতুলদা! তারপর পর্ব্বতের ওপাশ হইতে প্রকাণ্ড লাল সূর্য্য উঠিল। তাহার রক্তিম আলোকে দেখিল এ ভয়ঙ্কর নয়—প্রতুলদা কি করিয়া ইতিহাসের প্রতাপসিংহের ছবির সঙ্গে এক হইয়া গিয়াছে। বিস্ময়ে মিণ্টু চীৎকার করিয়া উঠিল—প্রতাপসিংহ—ঐ যে আমার প্রতাপসিংহ।

"মিণ্টু! ও মিণ্টু!"

ছোড়দিমণির ধাক্কায় মিণ্টুর ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল।

বীরাঙ্গনা প্রীতিলতা ওয়াদ্দাদার

শ্রীগোপালচন্দ্র রায়

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হ'তেই বাঙ্গলায় যে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লব আন্দোলনের সুরু হয়েছিল, ভারতের ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট আলিপুর বোমার মামলার দ্বারা সেই বিপ্লব আন্দোলনে একটা যবনিকা টেনে দিতে সর্বপ্রথম চেষ্টা করেছিল। বিপ্লবী নেতৃবৃন্দের ফাঁসি, দ্বীপান্তর ও কারাবাসের ব্যবস্থা ক'রে গবর্ণমেণ্ট তখন সফলকামও হয়েছিল কিছুটা। কিন্তু এই সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনকে একেবারে সমূলে বিনাশ করতে পারেনি কোন দিনই। এই আন্দোলনের একটা স্রোত নিরবচ্ছিন্ন ভাবেই কখন ক্ষীণকায়, কখন বা প্রলয়ঙ্কর রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে বারে বারে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গলার সেদিনকার বিপ্লবীদলসমূহ বাঘা যতীনের নেতৃত্বে এই বিপ্লব আন্দোলনের একটা প্রচণ্ড রূপ দিতে পেরেছিল। তারপর ১৯৩০ সালে বাঙ্গলার পূর্ব দিগন্তে চট্টগ্রামের পর্বতময় ভূমিতে এই সন্ত্রাসবাদীরা ভারতে বৃটিশ শক্তির উপর আর একবার ভয়ঙ্কর আঘাত হেনেছিল। সেদিন চট্টগ্রামের সেই সশস্ত্র বিপ্লব বাহিনীর যিনি সর্বাধিনায়ক ছিলেন, তিনি বীর বিপ্লবী সূর্য সেন—চট্টগ্রামের সবার প্রিয় মাষ্টারদা। বিপ্লবী নেতা সূর্য সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রামের এই বিপ্লব আন্দোলন চলেছিল একটানা সুদীর্ঘ চারটা বছর ধ'রে। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পর থেকে এই বিপ্লবীদের অনেকেই একে একে পুলিশের হাতে ধরা পড়তে থাকলেও, নেতা সূর্য সেন বহুদিন যাবৎ একদিকে যেমন নিজেকে কৌশল ও চতুরতার সহিত পুলিসের চোখ থেকে লুকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন, অপর দিকে তেমনি সেই পলাতক অবস্থাতেই দলের জন্য লোক ও অর্থ সংগ্রহ ক'রে বিপ্লব আন্দোলনকে অব্যাহত রেখেছিলেন। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের প্রায় দুবছর পরে, নেতা সূর্য সেন তাঁর বিপ্লবী দলে সাহসী মেয়েদেরও একটা স্থান ক'রে দিতে মনস্থ করেছিলেন। তারই ফলে কল্পনা দত্ত, প্রীতিলতা ওয়াদ্দাদার, কুন্দপ্রভা সেন, নির্মলা চক্রবর্তী, সুহাসিনী দেবী, নিরুপমা বড়ুয়া, বকুল দত্ত প্রভৃতি মেয়েরা দলে আসেন এবং দলের কাজে অসীম সাহস ও বীরত্ব দেখান। এই মেয়েদের মধ্যেই একজন, যাঁর সাহস, তেজস্বিতা ও আত্মত্যাগের জন্য বাঙ্গালী জাতি, বিশেষ ভাবে বাঙ্গলার নারী সমাজ চিরকাল গৌরব অনুভব করবে, তিনি হলেন—প্রীতিলতা ওয়াদ্দাদার।

চট্টগ্রামের এক দরিদ্র পরিবারে প্রীতির জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম জগবন্ধু ওয়াদ্দাদার। জগবন্ধুবাবু মাত্র ৫০৲ টাকা বেতনে স্থানীয় মিউনিসিপ্যাল অফিসের একজন কেরাণী ছিলেন। এই অল্প বেতনেই তিনি স্ত্রী ও ৫টি পুত্রকন্যা নিয়ে কোনরূপে সংসার নির্বাহ করতেন।

বাল্যকাল থেকেই প্রীতির অসাধারণ স্মৃতিশক্তি ছিল। তাই জগবন্ধুবাবু প্রীতিকে ভালভাবে লেখাপড়া শেখানোর ব্যবস্থা করেছিলেন এবং তাঁকে ঘিরেই তিনি তাঁর ভবিষ্যৎ আশা ভরসা পোষণ করতেন। প্রীতিও বাল্যকাল থেকেই তাঁর বাবাকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। কারও কাছে প্রীতি তাঁর বাবার কথা বলতে গেলেই, তাঁর চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠত।

প্রীতি যখন স্কুলের ক্লাস ফাইভে পড়তেন, তখন থেকেই স্কুলের খেলাধূলায় যোগ দিয়েছিলেন। কারণ তাঁদের স্কুলের নিয়ম ছিল যে, ছাত্রীরা ক্লাস ফাইভে উঠ্‌লেই তাদের খেলাধূলা করতে এবং লাইব্রেরীর বই পড়তে হবে। প্রীতি উঁচু ক্লাসে উঠে স্কুলের "গার্ল-গাইডে"ও যোগ দিয়েছিলেন। গার্ল-গাইডে গাইডদের জন্য কতকগুলো প্রতিজ্ঞা ছিল। এর মধ্যে একটা প্রতিজ্ঞা ছিল—আমরা ভগবান ও সম্রাটের প্রতি আনুগত্য দেখাব। প্রীতি তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে এই প্রতিজ্ঞাকে একটু বদল ক'রে বলতেন—ভগবান ও দেশের প্রতি আমরা আনুগত্য প্রকাশ করব।

প্রীতিলতা ওয়াদ্দাদার

স্কুলে পড়াশুনায় প্রীতি খুবই ভাল মেয়ে ছিলেন। তাঁর পিতার আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না, অথচ উচ্চ শিক্ষা লাভে তাঁর অদম্য ইচ্ছা ছিল। তাই প্রীতি তাঁর বন্ধুবান্ধবদের কাছে বলতেন—ম্যাট্রিকে বৃত্তি না পেলে হয়ত আমার আর পড়াই হবে না।

শেষ পর্যন্ত কিন্তু ম্যাট্রিকে প্রীতির ভাগ্যে বৃত্তিলাভ ঘটে ওঠেনি। কারণ অঙ্কের পরীক্ষা তাঁর বিশেষ ভাল হয় নাই। যাই হোক ম্যাট্রিক পরীক্ষায় বৃত্তি না পেলেও জগবন্ধুবাবু কোনরূপে কন্যার উচ্চ-শিক্ষার ব্যবস্থা করলেন। তিনি প্রীতিকে ঢাকায় আই-এ পড়ানোর ব্যবস্থা করলেন।

ঢাকায় আই-এ পড়ার সময় প্রীতি সেখানকার দীপালী সংঘে যোগ দেন এবং লাঠি খেলা, অসি চালনা প্রভৃতি শিক্ষা করেন। এবার আই-এ পরীক্ষায় বৃত্তি পেয়ে প্রীতি কলকাতায় বেথুন কলেজে বি-এ পড়তে এলেন এবং ১৯৩২ সালে বি-এ পরীক্ষা দিয়ে চট্টগ্রামে ফিরে গেলেন।

প্রীতির বি-এ পরীক্ষার কিছুদিন আগেই তাঁর বাবার চাকরি যায়। তাই প্রীতি দেশে ফিরে গিয়েই নন্দনকানন হাইস্কুলে মাষ্টারী নিলেন। মাষ্টারীর টাকায় বাপ-মা ও চারটি ভাই-বোনকে নিয়ে সংসার চলত না ব'লে, প্রীতি আরও একটা টিউশনী করতেন।

এই ভাবে প্রীতির দিন কাটতে লাগে। কিন্তু এতে তিনি আদৌ তৃপ্তি পেতেন না। তাঁর মন চাইত দেশের জন্য কিছু করতে। কারণ এর দুবছর আগে ১৯৩০ সালে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন হয়ে গেছে। তাঁর একটা প্রবল প্রভাব এসে পড়ে প্রীতির উপর। তা ছাড়া অতি বাল্যকাল থেকেই স্বদেশীর দিকে তাঁর অত্যন্ত ঝোঁকও ছিল। তাঁদের বাড়ীতেও স্বদেশী দ্রব্য ছাড়া কোন বিলাতী দ্রব্যের ব্যবহার হ'ত না।

চাকরি ছেড়ে দেশের কাজ করতে গেলে, বাপ মা ও ভাইবোনদের দুঃখের সীমা থাকবে না, একথা জেনেও প্রীতি দেশের সেবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলেন। এই সময় চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের নেতা সূর্য সেন পলাতক অবস্থায় থেকেই আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছিলেন। প্রীতি ১৯৩২ সালের মে মাসে একদিন গোপনে সূর্য সেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলেন। সূর্য সেন তখন কয়েকজন সঙ্গীকে নিয়ে ধলঘাটে সাবিত্রী দেবী নামে এক বিধবার বাড়ীতে আত্মগোপন করেছিলেন।

প্রীতি সূর্য সেনের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে তাঁদের দলে সেখানে দুএকদিন ছিলেন। এই সময় একদিন রাত্রে ক্যাপ্টেন ক্যামারণের নেতৃত্বে একদল সৈন্য গিয়ে সে বাড়ী ঘেরাও করল। সৈন্যরা গুলি চালাতে লাগল। অপরপক্ষে সূর্য সেনের দলও গুলি চালাতে লাগল। ক্যাপ্টেন ক্যামারণ সঙ্গে সঙ্গেই মারা গেলেন। সূর্য সেনের সহকর্মী নির্মল সেনও এ পক্ষে প্রাণ দিলেন। সৈন্যরা সংখ্যায় অধিক, আর সূর্য সেনের দলে মাত্র ছিলেন, তিনি ছাড়া দুজন। নির্মল সেন মারা যেতেই তিনি বললেন—এদের সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে পারা যাবে না, চল পালান যাক।

প্রীতি চোখের উপর নির্মল সেনকে এইভাবে মরতে দেখে একেবারে শোকে অভিভূত হয়ে পড়লেন। তিনি নির্মলকে ফেলে কিছুতেই যেতে চাইছিলেন না। সূর্য সেন প্রীতিকে একপ্রকার জোর ক'রে টেনে নিয়েই অপর সঙ্গী ভোলাকে (অপূর্ব সেন) নিয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়লেন। বাড়ীর অদূরে শুকনা পাতার খস্ খস্ শব্দ শুনতে পেয়ে সৈন্যরা সেদিকে গুলি চালাল। একটা গুলি এসে লাগল ভোলার বুকে। ভোলা সঙ্গে সঙ্গেই প্রাণ দিলেন। সূর্য সেন কোনরূপে প্রীতিকে নিয়ে নিরাপদে চলে এলেন।

সেই সময় ঐ অঞ্চলে বন্যার ফলে চারিদিক জলময়। পথঘাট অত্যন্ত দুর্গম। রাত্রির অন্ধকারে বন্যার জল ও দুর্গম পথ অতিক্রম ক'রে সূর্য সেন প্রীতিকে নিয়ে ধলঘাটের ৪ মাইল উত্তরে জৈষ্ঠপুরা গ্রামের এক কুটীরে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সেটি ছিল একজন গ্রাম্য ডাক্তারের বাড়ী। ডাক্তার ও ডাক্তার-গৃহিণী সমূহ বিপদ সত্ত্বেও সস্নেহে বিপ্লবীদের নিজের বাড়ীতে দিনের পর দিন আশ্রয় দিতেন।

ধলঘাটে সাবিত্রী দেবীর বাড়ীতে প্রীতির কাপড় চোপড় পড়ে ছিল। পুলিস প্রীতিকেও গ্রেপ্তার করতে পারে, এই ভেবে সূর্য সেন প্রীতিকে আত্মগোপনের নির্দেশ দিয়ে জৈষ্ঠপুরা থেকে বিদায় দিলেন।

এরপর থেকেই আরম্ভ হ'ল প্রীতির পলাতক জীবন। পুলিস প্রীতিকে ধরার জন্য বিশেষ চেষ্টা করতে লাগল, প্রীতিও পুলিসকে ফাঁকি দিয়ে আত্মগোপন ক'রে দিন কাটাতে লাগলেন। প্রীতি শুধু চট্টগ্রামেই পুলিসকে ফাঁকি দেন নি, কলকাতাতেও পুলিসের চোখে ধুলো তিনি বহুবার দিয়েছেন। প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের সঙ্গে তিনি ছদ্মনামে আলিপুর জেলে ৪০ বার দেখা করেছিলেন। রামকৃষ্ণের আত্মীয়া এবং অমিতা দাস এই নামে পরিচয় দিয়ে, তিনি জেলখানার ভিতরে দেখা করতে যেতেন।

এই রামকৃষ্ণ বিশ্বাস ছিলেন, চট্টগ্রাম কলেজের একজন বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র ও চট্টগ্রামের বিপ্লবীদলের অন্যতম প্রধান সংগঠক। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের কয়েকদিন পূর্বে বোমা প্রস্তুতকালে বোমা বিস্ফোরণের ফলে গুরুতরভাবে আহত হওয়ায় অস্ত্রাগার লুণ্ঠনে যোগ দিতে পারেন নি। তাই তাঁর মনে একটা বড় ব্যথা ছিল। তিনি কোনও একটা বড় কাজ করার সুযোগ খুঁজছিলেন। এমন সময় নেতা সূর্য সেন বিশ্বস্তসূত্রে থেকে জানতে পারেন যে, ১৯৩০ সালের ১লা ডিসেম্বর বাঙ্গলার ইনেস্‌পেক্‌টর জেনারেল মিঃ ক্রেক্ চাঁদপুরে আসছেন। অন্যতম প্রধান ইংরাজ কর্মচারীটিকে হত্যা ক'রে চট্টগ্রামে পুলিসী জুলুমের উত্তর দেবার জন্য রামকৃষ্ণ বিশ্বাস ও কালীপদ চক্রবর্তী চাঁদপুরে প্রেরিত হয়েছিলেন।

১লা ডিসেম্বর শেষ রাত্রে চাঁদপুর ষ্টেশনে চট্টগ্রাম মেলের প্রথম শ্রেণীর কামরায় মিঃ ক্রেক ভেবে তাঁরা রেলের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী তারিণী মুখার্জিকে হত্যা করেন। সেই রাত্রেই তাঁরা শহর থেকে অনেকটা দূরে একটা গ্রামের পথে পুলিসের হাতে ধরা পড়েন। এতে বিচারে রামকৃষ্ণের ফাঁসি ও কালীপদর অল্প বয়সের জন্য যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়েছিল।

কিছুদিন পলাতক থাকার পর সূর্য সেন প্রীতিকে কাছে নিয়ে গেলেন এবং তাঁর জন্য অন্য ব্যবস্থা করলেন। সূর্য সেন এই সময় ঠিক করেছিলেন, প্রীতিকে দিয়ে একটা বড় কাজ করাবেন। তাই একদিন

সূর্য সেন প্রীতির নেতৃত্বে আটজন বিপ্লবী যুবককে দিয়ে পাহাড়তলীর ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ করানো স্থির করলেন। প্রীতি রীতিমত মিলিটারী পোষাকে সজ্জিত হয়ে এবং অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আটজন সঙ্গীসহ অভিযানের নায়িকা হয়ে বেরুলেন। সকলেই সূর্যসেনকে প্রণাম ক'রে তাঁর আশীর্বাদ নিয়ে যাত্রা করলেন।

সেদিন ছিল ১৯৩২ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর, শনিবার। রাত্রি তখন প্রায় ৯টা। প্রতি শনিবারের ন্যায় সেদিনও পাহাড়তলী ষ্টেশনের নিকটে পাহাড়তলী রেলওয়ে ক্লাবে সাহেব মেমরা এসেছে ফ‍ুর্তি করতে। খাওয়া-দাওয়া, নাচ গান চলছে, সকলেই আমোদে মশগুল। এমন সময় ভীষণ শব্দ ক'রে ক্লাব ঘরের উপরে বোমা ফাটল এবং সঙ্গে সঙ্গেই ক্লাবের দিকে বাইরে থেকে গুলি আসতে লাগল। সাহেব-মেমরা ভয়ে আর্তনাদ করে উঠল, প্রাণ ভয়ে যে যেখানে পারল আশ্রয় নিতে ছুটল। এই ভাবে বোমা ও গুলি চলল কিছুক্ষণ। ফলে ১৩ জন আহত হ'ল এবং একজন মেম মারা গেল।

বোমা নিক্ষেপের সময় কি ভাবে একটা বোমার টুকরা এসে লাগল প্রীতির বুকে এবং তার ফলে গুরুতররূপে আহত হয়ে পড়লেন। প্রীতি এই সময় দেখলেন—দূরে মিলিটারী আসছে তাঁদের দিকে। এই দেখেই তিনি সঙ্গীদের বললেন—কাজ উদ্ধার হয়েছে, এবার আপনারা চলে যান।

নায়িকার আদেশে সঙ্গীরা চলে যাবার আগে, তাঁরা শুধু প্রীতিকে বললেন—প্রীতিদি আপনি?

প্রীতি বললেন—আমার সময় ঘনিয়ে আসছে। পুলিসের হাতে ধরা পড়ার আগেই আমি যাতে মৃত্যুর কোলে আশ্রয় নিতে পারি, সেই জন্য আমি পটাসিয়াম সাইনেট খেয়েছি। এই নিন আমার হাতের রিভলবার। এটা নিয়ে যান, আর মাষ্টারদাকে আমার প্রণাম জানাবেন।

এই ব'লে প্রীতি ক্লাব ঘরের মাত্র দশগজ দূরে তাঁর কর্তব্য সমাধা ক'রে নিজের জীবন দিলেন।

প্রীতির এই আত্মহত্যা সম্বন্ধে নেতা সূর্য সেন বলেছিলেন—প্রীতির এই আত্মহত্যার পিছনে যে উদ্দেশ্য ছিল, তা হ'ল, সে প্রমাণ করতে চেয়েছিল যে, মেয়েরাও দেশের জন্য লড়তে, এমন কি প্রাণ পর্যন্তও দিতে জানে।

প্রীতির এই সাহস ও বীরত্ব ছাড়াও তাঁর আর একটা বড় গুণ ছিল। প্রীতি একজন ভাল সাহিত্যিকও ছিলেন। ভাল লিখতে পারতেন। প্রীতি পলাতক জীবনে যে সব লিখতেন, দলের সকলেই কথায় কথায় সেই সব লেখা আবৃত্তি করতেন।

অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা ক'রে প্রীতি একজন দুর্দ্ধর্ষ বিপ্লবী হয়ে উঠলেও, তাঁর হৃদয়ের নারীসুলভ কোমলতা কখনও ম্লান হয়নি। প্রীতি কুসুমের ন্যায় কোমল থাকতেন, কিন্তু আবশ্যক হ'লে বজ্রের ন্যায় কঠিন হতেও জানতেন। প্রীতি তাঁর বিপ্লবী জীবনের গুরু সূর্য সেনের ভাষায় ছিলেন—"কোমলে কঠিনে মিলে, অনন্যসাধারণ। একদিকে যেমন ধীর ও স্থির; অপরদিকে তেমনি সাহসী, তেজস্বী ও দৃঢ়সংকল্পের।"

দেশমাতৃকার সেবাকেই প্রীতি তাঁর জীবনে সবচেয়ে বড় কর্তব্য ব'লে গ্রহণ করেছিলেন। তাই বাপ-মা ও ভাইবোনদের দুঃখকষ্টকে উপেক্ষা ক'রেও, তিনি দেশের মুক্তি-সাধনায় বিপ্লব আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন এবং তাতেই জীবন দান করেছিলেন। এই আত্মবলিদানের জন্যই বাঙলায় প্রথম মহিলা শহীদ হিসাবে প্রীতির নাম ইতিহাসের পাতায় চিরকালের জন্য উজ্জ্বল হয়ে থাকবে।

গান

শ্রীঅজিতকুমার মুখোপাধ্যায় সঙ্গীত-সুধাকর

জীবনে যে ফুল পারিনি ফোটাতে
তা'র লাগি নহি অপরাধী
মোর সাধনার আড়ালে সেদিন
দেবতা যে ছিল বাদী॥
সেদিন পারিনি চিনিতে তোমার
ঢেকেছি নয়ন মধু জোছনায়,
অনাদরে যা'রে হারায়েছি হায়—
সে ব্যথায় আজো কাঁদি॥

তোমার সমাধি শিয়রে জাগিয়া
বিরহ বেদনা সহি।
কহিবার যদি কিছু থাকে বাকী
চুপি চুপি যেও কহি,
রাতের বিজনে ঝরিল যে ফুল
জানি কিছু নাই তা'র সমতুল,
অতীত স্মৃতির বেদনার সুরে'
এ জীবন বীণা বাঁধি।

সহিত অন্যান্য শব্দ সন্তানের সম্বন্ধ কেবল প্রয়োজনমূলক নিবিড় ভাব-বিনিময় মূলক নহে। ইহাদের পক্ষে সদাপ্রচলিত শব্দগুলি কেবল এক কারখানায় খাটিবে, রসের নিমন্ত্রণে পংক্তি-ভোজনে বসিবে না। এইরূপ যুক্তি আমাদের সংশয়-নিরসনের পক্ষে যথেষ্ট কিনা সে বিষয়ে সন্দেহের অবসর আছে। একটি সজীব, চলমান ভাষার পক্ষে এরূপ একটি বিশেষ শ্রেণীর শব্দকে আত্মনিষ্ঠ, সংকীর্ণ প্রয়োজনের গণ্ডীতে চিরকাল আবদ্ধ রাখা সম্ভব কিনা তাহা বিতর্কের বিষয়! প্রবল আবেগের প্রেরণায়, আকস্মিক ভাবোচ্ছ্বাস, শাসনব্যবস্থার যান্ত্রিকতার মধ্যে অনিবার্যভাবে উৎসারিত হৃদয়বৃত্তির প্রবাহে এই বাঁধ ভাঙ্গিয়া-চূরিয়া যাইবারই সম্ভাবনা। আতিথেয়তার আগ্রহাতিশয্যে সীতা যেমন লক্ষ্মণ-নির্দিষ্ট নিষেধের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া বিদেশীশত্রুর কুক্ষীগত হইয়াছিলেন, অনুরূপ কারণে অযত্নসংরক্ষিতা এই পারিভাষিক ভারতীয় সীমার বাহিরে পা দিয়া অনার্যশব্দের অশুচি স্পর্শ স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হইবেন। এই পারিভাষিক শব্দগুলি কি চিরকাল সাহিত্যে অপাংক্তেয় থাকিবে? তাহারা কি প্রয়োজনের রূঢ় আবেষ্টন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ভাবদ্যোতনার সৌন্দর্যালোকে স্থান গ্রহণ করিবে না? অন্ততঃ এই সম্ভাবনা সম্বন্ধে সচেতন হইয়া তাহাদের বর্তমান আকৃতি ও প্রকৃতি নির্ণয় করিতে হইবে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার কোনো উপন্যাসে পোষ্টমাষ্টার ও পিয়নের পারস্পরিক পদমর্যাদাবোধের অভিমান লইয়া হাস্যরসের প্রস্রবণ উন্মুক্ত করিয়াছিলেন। আশঙ্কা হয় যে 'মহাপ্রৈষাধিকারিক' কোনো ভবিষ্যৎ বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনালীলা উদ্রেক করিতে পারিবে না। ইহার বিরাটত্বও আয়তন-বাহুল্য সাহিত্যিক প্রেরণাকে অভিভূত করিবে না? যদি বিশুদ্ধভাবে যথাযোগ্য কর্তৃপক্ষের নামোচ্চার অভিযোগ উপস্থাপনের একটা অবশ্য করণীয় অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হয়, তবে এই নামের বিভীষিকাতেই বা ডাকবিভাগের অভিযোগের সংখ্যা অনেক কমিয়া যাইবে তাহা নির্ভয়ে বলা যায়। মোটের উপর পরিভাষার খাল কাটিয়া প্রাগৈতিহাসিকযুগের বিশালকায় সংস্কৃতকুমীর আমদানী করিয়া বাংলার ছোটখাট চুণা পুঁটিমাছগুলিকে তাহার উদরস্থ হইবার আমন্ত্রণ জ্ঞাপন কি ভাষার ভবিষ্যতের পক্ষে মঙ্গলজনক হইবে?

রসবোধ ও পরিমিতি জ্ঞানের দিক দিয়া ভাষার উপর পারিভাষিক প্রভাব কিরূপ দাঁড়াইবে তাহা বিশেষভাবে বিবেচ্য। যদি এই নব প্রণয়নগুলি ভাষার অঙ্গীভূত হইয়া সাহিত্য রচনার উপাদানরূপে ব্যবহৃত হয়, তবে যেমন সৌরজগতে বিশালায়তন বস্তুপিণ্ডের আকর্ষণ ক্ষুদ্রকায় বস্তুপিণ্ডের উপর ক্রিয়াশীল হইয়া উহার কক্ষাবর্তন পথ নির্ধারিত করে, সাহিত্যক্ষেত্রে ঠিক তাহাই ঘটিবে। বাক্যের মধ্যে বড় ও ছোট কথাগুলিকে পারস্পরিক সন্নিবেশ লেখকের শিল্পজ্ঞানের শিরঃপীড়া ঘটিবে এরূপ অনুমান মোটেই অসঙ্গত নয়। সাধারণ হইতে অসাধারণে মুহূর্মুহু স্থান পরিবর্তন এক জগত হইতে আর এক জগতে ঘন ঘন লক্ষপ্রদান শব্দ-পদাতিকগুলির পাদচারণার সমতাকে প্রায়ই বিপর্যস্ত করিবে, একজন অপরাধী চুরি করিয়া যে রাজকর্মচারীর সামনে আসিয়া দাঁড়াইবে তিনি একজন অবর-আরক্ষা-পরিদর্শক, তাঁহাকে আর দারোগাবাবু বলা চলিবে না। তাহার বিচার হইবে একজন উপশাসক ও সমাহর্তার নিকট (Deputy Magistrate and Collector), শেষ পর্যন্ত আপীল হইবে মহাধর্মাধিকরণের ন্যায়াধীশের (High Court Judge) বিচারালয়ে। বেচারি একটা সামান্য অপরাধ করিয়া এমন একটা অপরিচিত, ভীতি-বিধায়ক শব্দব্যূহ বেষ্টিত হইয়া পড়িবে যে বিচারের পূর্বেই তাহার দণ্ডভোগের পালা আরম্ভ হইবে। এই অজানা, অচেনা নাম-সমুদ্রে পড়িয়া সে এমন হাবুডুবু খাইবে যে তাহার আত্মপক্ষসমর্থনের আসল সমস্যাটাই তাহার নিকট গৌণ হইয়া দাঁড়াইবে। অবশ্য বর্তমান ব্যবস্থায় যে এই নাম বিভ্রাটের অসদ্ভাব আছে তাহা নয়; কিন্তু দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফলে পাড়াগেঁয়ে মস্তিষ্ক জটিল অভিধান সমূহের সরলীকরণের দ্বারা এগুলিকে নিজের বোধশক্তির তথা উচ্চারণ-শক্তির, মাপসই করিয়া এই সমস্যার একরূপ সমাধান করিয়া লইয়াছে। দারোগা, জমাদার ডিপ্‌টি, হাকিম প্রভৃতি শব্দগুলি কতক মুসলমানী আমলের জের, কতক বা গুরুভার প্রপীড়িত গণ-বুদ্ধির বোঝা কমানোর স্বতঃস্ফূর্ত কৌশল। প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় উদ্ধারের উপায় যে কতদিনে উদ্ভাবিত হইবে কে জানে। চুরি অপরাধটি চুরিই থাকবে, কিন্তু এই সামান্য অতিপরিচিত ক্রিয়া এমন একটি শব্দ-তরঙ্গের সৃষ্টি করিবে যাহার আকম্পন ব্যোমদেশ পর্যন্ত অনুভূত হইবে। এখন ধরা যাউক যে কোনো সাহিত্যিককে চুরির একটি বর্ণনা দিতে হইল। তিনি চোরের সঙ্গে তাহার আনুষঙ্গিক প্রতিবেশের যথা অবর—আরক্ষা—পরিদর্শক, উপশাসক ও সমাহর্তা প্রভৃতির সমন্বয় ঘটাইতে কি অতিমাত্রায় বিব্রত হইয়া পড়িবেন না? পারিভাষিকের স্ফীতকি একবাক্য-গ্রথিত অন্যান্য শব্দের অনুরূপ স্ফীতি সংঘটনের প্রেরণা দিবে না? যদি তিনি তাঁহার শিল্পবোধকে অসাড় করিতে না পারেন, তবে তাঁহাকে 'আরক্ষা' 'সমাহর্তা' প্রভৃতির সহিত মিল রাখিয়া চোরকে 'তস্করবৃত্তি-পরায়ণ' বা তস্করতা অপরাধে অভিযুক্ত এইরূপ মেদবহুল আভিজাত্য পদবীতে আরোহণ করাইতে হইবে। এইরূপ ভাবে সমস্ত বাংলা ভাষাসহ, আবার পুনরুজ্জীবিত সংস্কৃত প্রভাবে স্ফীতোদর হইয়া উঠিবে এবং বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভার কল্যাণে আমরা অচিরকাল পূর্বে সংস্কৃতের যে অনুচিত প্রভাব হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছি, তাহাই আবার স্বজাত্যভিমানের বর্ম-পরিহিত হইয়া বাংলার উপর চড়াও হইবে। প্রাড়্‌বিবাক্ ধূর্জটির বংশধর সম্প্রদায় আবার বাংলা সাহিত্যে উপনিবেশ স্থাপন করিবে ভাবিলে ইহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে মন ঠিক পুলকোৎফুল্ল হইয়া উঠে না।

(আগামীবারে সমাপ্য)

যুযুৎসু কৌশল

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বসু

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

("যুযুৎসু কৌশল" লেখাটি ধারাবাহিকভাবে ১৩৩৯ সাল হইতে ১৩৪৬ অবধি দিয়া আসিয়াছি। নানা কারণে বিশেষতঃ ছবি তুলিবার অসুবিধা হওয়ায় বন্ধ রাখিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। ১২৪টা প্যাঁচ বাহির হইয়াছিল, এখন ১২৫ নং প্যাঁচ হইতে আরম্ভ করিলাম।)

এইবার যুযুৎসু কৌশলের Ground Look (জমির প্যাঁচ) শ্রেণীভুক্ত অর্থাৎ যে প্যাঁচগুলির দ্বারা অপরকে মাটিতে ফেলিয়া নিজের

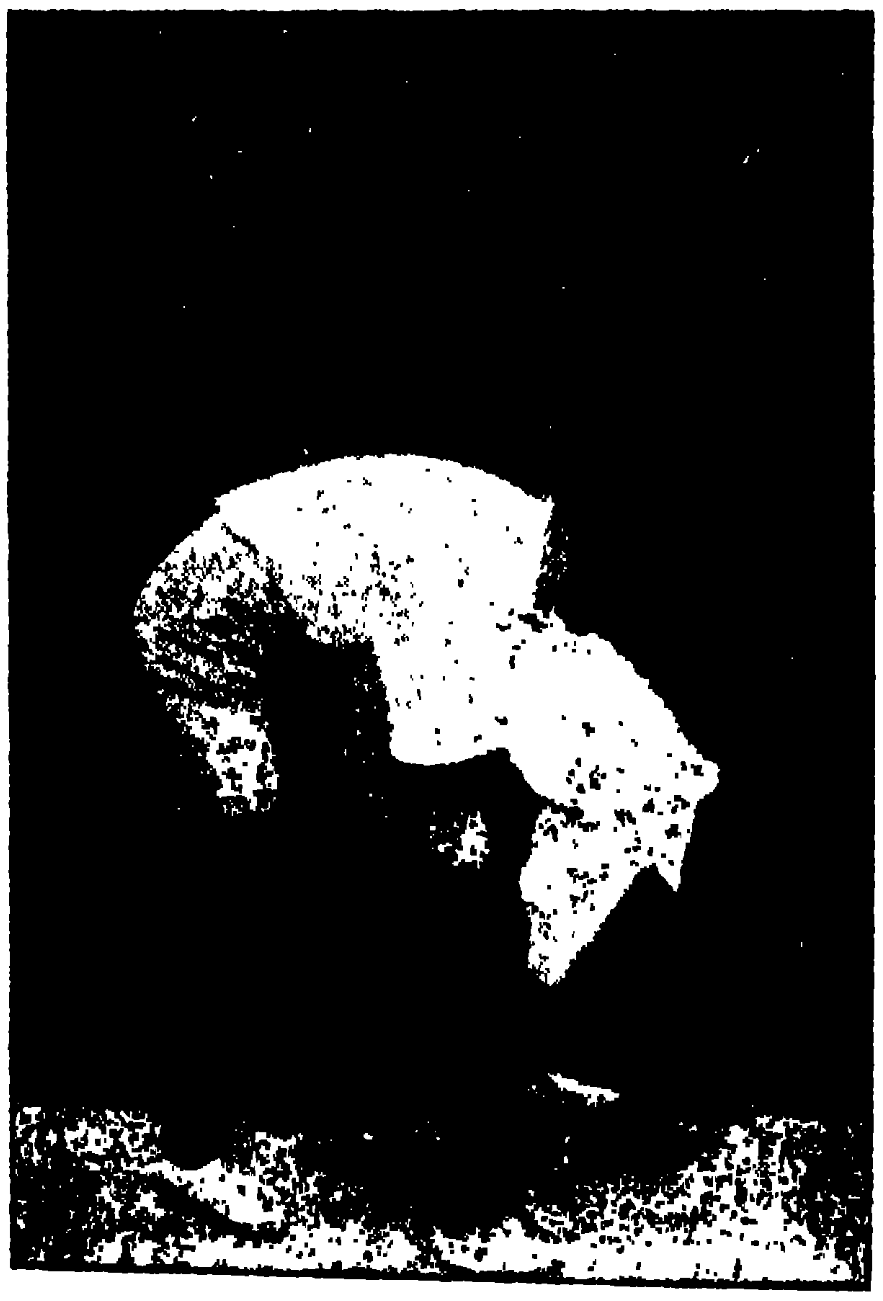

১২৫ নং প্যাঁচের ১ম চিত্র

ইচ্ছামত আয়ত্তে আনিতে পারা যায় সেই প্যাঁচগুলির বিষয় লিখিব। পূর্ব্বে বলিয়াছি প্যাঁচগুলি অভ্যাস করিবার সময় কিম্বা কাহারও উপর আটকাইবার সময় একাগ্রমনে ও ক্ষিপ্রকারিতার সহিত উহা করিতে হইবে, নচেৎ কোন কাজেই আসিবে না। কাহাকেও প্যাঁচ মারিতে যাইবার সময় নিজের ও অপরের ধরার অবস্থা, পায়তারা, উবল ও 'ঝটকা' অনুযায়ী প্যাঁচ মারিতে হইবে। সকল সময়ই মনে রাখিতে হইবে যে এইসব ছাড়াও গায়ের জোর বিনা এই প্যাঁচগুলি অপরের উপর খাটান মোটেই সম্ভবপর হইবে না।

১২৫ নং প্যাঁচ

যদি কেহ পশ্চাৎ হইতে দুই হাত দিয়া কোমরটি জোরে জড়াইয়া ধরে, তবে নিচু হইয়া দুই পায়ের মধ্য দিয়া হাত দুইটি চালাইয়া দিয়া

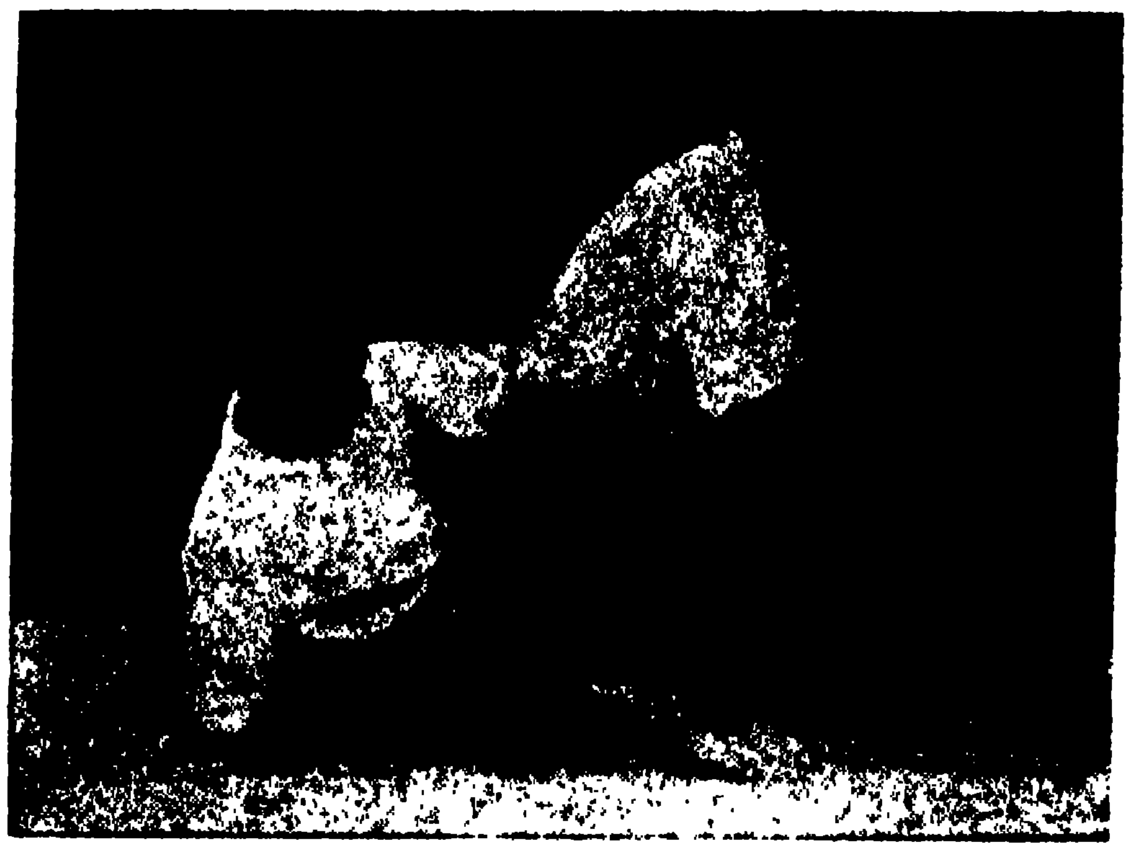

১২৫ নং প্যাঁচের ২য় চিত্র

১২৬ নং প্যাঁচের ১ম চিত্র

তাহার আগান পায়ের গোছটি জোরে ধরিয়া (১২৫ নং প্যাঁচের ১ম চিত্র) সোজাভাবে উপরে তুলিতে তুলিতে সামনে আগাইয়া দিয়া তাহার হাঁটুর উপর জোরে চাপ দিয়া তাহাকে মাটিতে ফেলিয়া (১২৫ নং প্যাঁচের ২য় চিত্র) দিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার ধরা পায়ের গোছটি (যদি বাঁ পা হয় ডান দিকে ও ডান পা হয় বাঁ দিকে) জোরে মোচড় দিয়া তাহাকে মাটিতে আটকাইয়া রাখা যায় বা মোচড় দিতে দিতে নিজের

১২৬ নং প্যাঁচের ২য় চিত্র

ডান পা হইলে ডান দিক, বাঁ পা হইলে বাঁ দিকে ঘুরিয়া একটি পা তাহার হাঁটুর উপর রাখিয়া তাহার পা-টিকে মোচড়াইলে সহজেই তাহাকে মাটিতে আটকাইয়া রাখিতে পারা যায়।

১২৭ নং প্যাঁচের ১ম চিত্র

১২৬ নং প্যাঁচ

যদি কেহ সম্মুখ হইতে নিচু হইয়া দুই হাত দিয়া কোমরটি জড়াইয়া ধরিতে আসে, তৎক্ষণাৎ দুইটি হাত তাহার দুই বগলের নিচু দিয়া চালাইয়া দিয়া ও তাহার মাথাটি নিজের পেটের নিচে রাখিয়া ঘাড়ের উপর চাপ দিতে দিতে তাহার হাত দুইটি পিছন দিকে সোজাভাবে তুলিয়া উহার মোড়াতে চাড় লাগাইয়া (১২৬ নং প্যাঁচের ১ম চিত্র)

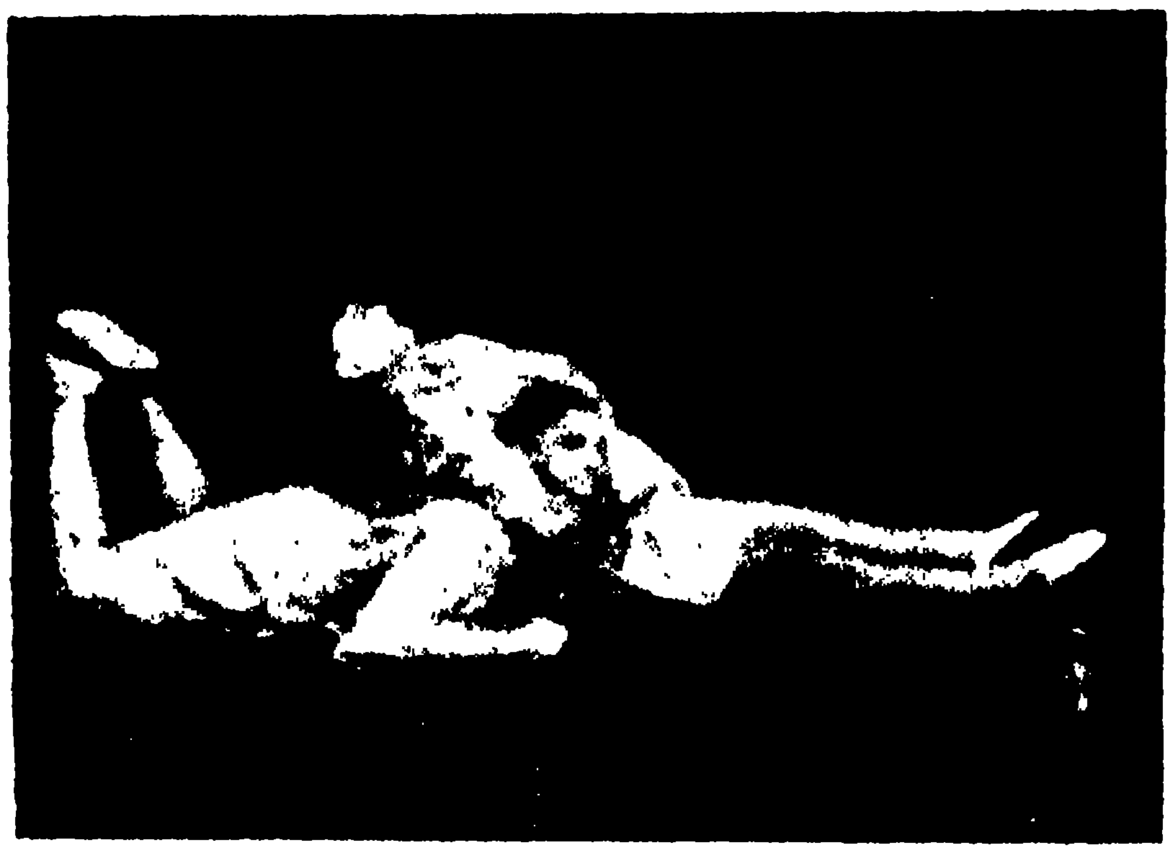

১২৭ নং প্যাঁচের ২য় চিত্র

বাঁ কিম্বা ডান দিকে ঝোঁক দিয়া মাটিতে ফেলিয়া দিয়া তাহাকে আটকাইয়া রাখিতে পারা যায় (১২৬ নং প্যাঁচের ২য় চিত্র)।

১২৭ নং প্যাঁচ

অপরে যদি পিছনে যাইয়া কোমরটি জড়াইয়া ধরে এবং তাহার মাথাটি নিজের ডান ধারে থাকে, তাহা হইলে ডান বাহু দিয়া তাহার

১২৮ নং প্যাঁচের ১ম চিত্র

গলাটি জোরে জড়াইয়া ধরিয়া (১২৭ নং প্যাঁচের ১ম চিত্র) নিজে পা দুইটি আগাইয়া দিয়া চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িলে তাহার গলায় লাগাইয়া তাহাকে মাটিতে আটকাইয়া রাখা যায় (১২৭ নং প্যাঁচের ২য় চিত্র)।

১২৮ নং প্যাঁচ

যদি কেহ ডান হাত দিয়া মুখে ঘুষি মারিতে আসে তৎক্ষণাৎ তাহার ডান কব্জীর ডান ধারে নিজের ডান বাহু দিয়া আটকাইয়া (১২৮ নং প্যাঁচের ১ম চিত্র) সঙ্গে সঙ্গে ঐ হাত দিয়া তাহার ডান মুঠোটি ধরিয়া লইয়া বাঁ পা-টি তাহার ডান পায়ের ডান পাশে আগাইয়া দিবার সঙ্গে সঙ্গে নিজে ডান দিকে ঘুরিয়া ও বাঁ হাতটি তাহার ডান হাতের উপর দিয়া লইয়া গিয়া তাহার কনুইটি চিৎ করিয়া বাঁ হাত দিয়া জড়াইয়া

১২৮ নং প্যাঁচের ২য় চিত্র

ধরিয়া ও বাঁ হাতদিয়া নিজে ডান কব্জিট ধরিয়া তাহার কনুই ও মুঠোটিতে চাড় দিতে দিতে নিচু হইয়া মাটিতে বসিয়া পড়িলে তাহাকে মাটিতে আটকাইয়া রাখা যায় (১২৮ নং প্যাঁচের ২য় চিত্র)।

১২৯ নং প্যাঁচ

যদি কেহ ডান হাত দিয়া ঘুষি মারিতে আসে তৎক্ষণাৎ তাহার ডান কব্জির ডান ধারে নিজের ডান বাহু দিয়া আটকাইয়া সঙ্গে সঙ্গে ডান হাত দিয়া তাহার ডান মুঠোটি ধরিয়া লইবা যদি তাহার হাতটি

১২৯ নং প্যাঁচের চিত্র

কনুই হইতে মোড়া অবস্থায় থাকে তবে বাঁ হাতটি তাহার ধরা হাতের কনুইয়ের নিচে রাখিয়া নিজের বাঁ পা-টি তাহার ডান পায়ের ডান দিকে আগাইয়া ডান দিকে ঘুরিয়া একটু নিচু হইয়া তাহার ধরা হাতটি ডান ধারে পুরাভাবে ঘুরাইয়া নিজের বাঁ হাতের গুলির কাছে আটকাইয়া দিতে তাহাকে মাটিতে ফেলিয়া নিজের আয়ত্বে আনিতে পারা যাইবে (১২৯ নং চিত্রের চিত্র)

১৩০ নং প্যাঁচ

যদি কেহ ডান হাত দিয়া ঘুষি মারিতে আসে তৎক্ষণাৎ তাহার ডান কব্জির ডান ধারে নিজের ডান বাহু দিয়া আটকাইয়া সঙ্গে সঙ্গে ডান হাত দিয়া তাহার ডান মুঠোটি ধরিয়া লইয়া বাঁ হাতটি তাহার ধরা

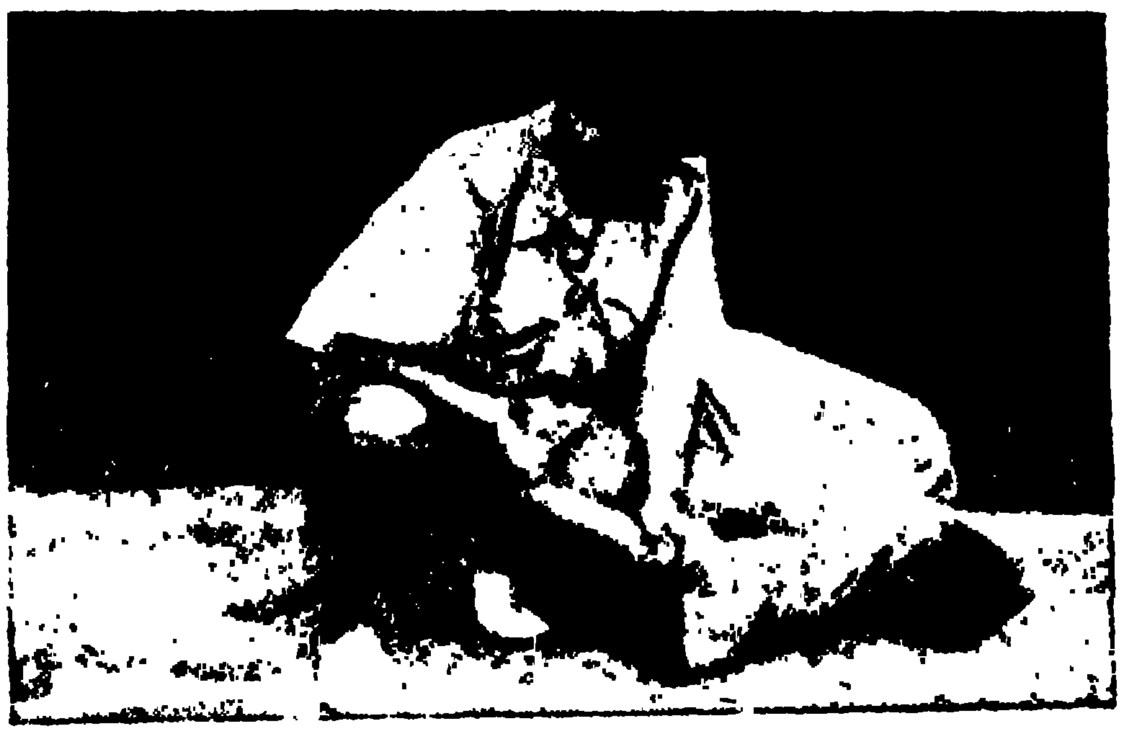

১৩০ নং প্যাঁচের চিত্র

হাতের কনুইয়ের নিচে রাখিয়া নিজের বাঁ পা-টি তাহার ডান পায়ের ডান দিকে আগাইয়া ডান দিকে ঘুরিয়া একটু নিচু হইয়া তাহার ধরা হাতটি ডান ধারে পুরাভাবে ঘুরাইয়া নামাইতে তাহার মোড়া কনুই ও কব্জীতে চাড় দিতে দিতে ঝোঁক দিয়া মাটিতে ফেলিয়া দিয়া তাহাকে আটকাইয়া রাখিতে পারা যাইবে (১৩০ নং প্যাঁচের চিত্র)।

১৩১ নং প্যাঁচের চিত্র

১৩১ নং প্যাঁচ

যদি কেহ ডান হাত দিয়া ঘুসি মারিতে আসে তৎক্ষণাৎ দুই হাত দিয়া তাহার ডান মুঠোটি ধরিয়া ও বাঁ পাটি তাহার ডান পায়ের ডান ধারে আগাইবার সঙ্গে সঙ্গে ডান দিকে পুরাভাগে ঘুরিয়া হাতটি নিচে নামাইতে নামাইতে বাঁ 'গুলি' তাহার ডান কনুইয়ের পিছন দিকে লাগাইয়া (১৩১ নং প্যাঁচের চিত্র) বাঁ দিকে কাৎ হইতে হইতে তাহার মোড়াতে, কনুইয়ে ও কব্জীতে চাড় দিতে দিতে ঝোঁক দিয়া মাটিতে

১৩২ নং প্যাঁচ

অপরের পায়তারা দেখিয়া যদি তাহার বাঁ পায়তারা থাকে, তবে (ক) বাঁ হাত দিয়া তাহার জামার ডান দিকের 'কলার' ও ডান হাত দিয়া তাহার বাঁ হাতের জামাটি জোরে ধরিয়া কিম্বা (খ) বাঁ হাত দিয়া

১৩২ নং প্যাঁচের ১ম চিত্র

তাহার গলাটি জড়াইয়া ধরিয়া বা (গ) বাঁ হাত দিয়া তাহার ডান বগলের নিচু দিয়া লইয়া গিয়া অপর কাঁধটি জোরে ধরিয়া (১৩২ নং প্যাঁচের ১ম চিত্র)· সঙ্গে সঙ্গে নিজে ডান দিকে ঘুরিয়া আসিয়া কোমরের পিছনটি তাহার কোমরে লাগাইয়া (১) জোরে সামনে ঝোঁক দিয়া কোমরটি নিচু করিয়া (২) বাঁ পা টি হাঁটুর কাছ হইতে মুড়িয়া, তুলিয়া তাহার দুই জানুর উপর রাখিয়া (এই রূপ করিবার সময় সমস্ত শরীরের টাল বিশেষ করিয়া রাখিতে হইবে) বাঁ পায়ের জোর দিবার সময় ডান হাত দিয়া তাহার বাঁ কনুইটি টানিয়া তাহাকে চিৎ করিয়া

১৩২ নং প্যাঁচের ২য় চিত্র

মাটিতে ফেলিয়া বাঁ পা টি তাহার বুকে চাপাইয়া ও বাঁ হাত টি তাহার চিবুকে রাখিয়া ও তাহার বাঁ কনুইটি নিজের ডান উরুতের উপর রাখিয়া জোরে চাপ দিলে (১৩২ নং প্যাঁচের ২য় চিত্র) তাহাকে সহজেই মাটিতে আটকাইয়া রাখিতে পারা যাইবে।

"তোমার প্রেয়সী—"

মুখোপাধ্যায়

তোমারে চিনিনা আমি, তবু তোমা তরে
মালঞ্চের মালাকর সম সযতনে
আপন বুকের রক্ত ঢালিয়া গোপনে
ফুলের কসমে ফুল রাখিয়াছি ভরে !
গাঁথিয়াছি মালা শিল্পীর যতন দিয়া—
ভালবেসে তারে কণ্ঠে তবু দিও স্থান,
হানিও না মিথ্যা-মোহে তারে অপমান ;
প্রাণের পরাগে তার সিক্ত কোরো হিয়া !!
সে অধরে পাবে যেই মধু, নয়নে যে আলো,
বুকে যে কবিতা পাবে, রসনার বাণী,
কণ্ঠে যে পাইবে গান, তারো বহুখানি
গড়িয়াছি আমি তার—বাসি তারে ভালো !
সে মোর কবিতা-কণা, আমি তারি কবি ;
তোমার প্রেয়সী মম তুলিকার ছবি।

আফ্রিকা ভ্রমণ (২)

ব্রহ্মচারী রাজকৃষ্ণ

১লা জুনের পরিবর্ত্তে পূর্ব্ব আফ্রিকাগামী জাহাজ "খাণ্ডালা" ৪ঠা বেলা প্রায় ৪টায় ছাড়লো—পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট মত আমরা বেলা প্রায় ১০টার মধ্যেই ভিক্টোরিয়া ডকে পৌছলাম। ষ্টেসনে বোম্বাই প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির জেনারেল সেক্রেটারী শ্রী এস্-এল্-সিলম্, সেক্রেটারী শ্রীযুত ভাডিলাল এবং অন্যান্য নেতা কর্ম্মীসহ আমাদের বিদায় সম্বর্দ্ধনা জানাতে এসেছিলেন। জাহাজ-ঘাটে আমাদের Medical Examination করা হোল, তারপর আমরা জাহাজে উঠ্‌লাম।

আমাদের এই প্রচারক বাহিনী শ্রীমৎ স্বামী অদ্বৈতানন্দজীর নেতৃত্বে ৯জন সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী * লইয়া গঠিত "ভারতীয় সাংস্কৃতিক মিশন"(India Cultural Mission) নামে আফ্রিকা মহাদেশে ভারতীয় সংস্কৃতি, সভ্যতা ও সনাতন ধর্মের উদার আদর্শ প্রচারার্থ ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ কর্ত্তৃক প্রেরিত হচ্ছে। সঙ্ঘের বহু গৃহস্থ ভক্ত ও অনুগত, সঙ্ঘের সন্ন্যাসী, কংগ্রেসের কর্ম্মী বা নেতাগণ যাঁরা আমাদের বিদায় দিতে এসেছিলেন—তাঁরা সকলেই নীচে দাঁড়িয়ে নির্নিমেষ নয়নে আমাদের দিকে তাকিয়ে রইলেন, আমরা জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে—কখনও তাঁদের দিকে, কখনও জননী-জন্মভূমি ভারতমাতার প্রতি অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বিদায় প্রার্থনা করছিলাম।

বেলা ৪টার সময় জাহাজের গগনস্পর্শী হুইসেলের আওয়াজ যেন বিদায়-দানকারী সন্ন্যাসী গৃহী ও কংগ্রেসের কর্ম্মীগণের হৃদয় বিদীর্ণ করল, সকলের চোখে-মুখে একটা গভীর শোকের ছায়া ফুটে উঠলো। অনেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো। সে শোক কী গভীর, কত করুণ ও মর্ম্মস্পর্শী—তা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। প্রবীণ সন্ন্যাসী স্বামী আত্মস্বরূপানন্দজীর স্বভাব-সুলভ গাম্ভীর্য্য, দীপ্ত মুখমণ্ডল, সুখ-দুঃখ, শুভাশুভ, সম্পদ-বিপদময় অবস্থাতেও সতত শান্ত তেজোদীপ্ত ও প্রফুল্ল থাকতে দেখেছি, আজ বিদায়ের প্রাঙ্‌মুহূর্তে জাহাজের নির্দ্দয় বাঁশীর আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে তিনিও যেন গভীর শোকাভিভূত হয়ে পড়লেন।

জাহাজ ছাড়ল। অপেক্ষমান জনতা চঞ্চল হয়ে

ভোডামা সিন্ধু-মণ্ডলের কর্ত্তৃপক্ষের মধ্যে ভারত সেবাশ্রম সংঘ প্রেরিত সাংস্কৃতিক মিশন—ভোডামা, পূর্ব্ব আফ্রিকা

* ১। শ্রীমৎ স্বামী পরমানন্দজী, ২। স্বামী অনামানন্দ, ৩। স্বামী অক্ষয়ানন্দ, ৪। ব্রহ্মচারী রাজকৃষ্ণ, ৫। ব্রহ্মচারী মৃত্যুঞ্জয়, ৬। ব্রহ্মচারী চণ্ডী, ৭। ব্রহ্মচারী রামদাস, ৮। ব্রহ্মচারী পরেশ, ৯। সেবক কেশব।

উঠল। কাপড় নাড়া দিয়ে, হাত তুলিয়ে নানাভাবে বিদায় সম্ভাষণ জানালে। বন্দর ছেড়ে জাহাজ নীল জলরাশি অতিক্রম করে তার মহান দায়িত্ব উদ্‌যাপনের জন্য উর্দ্ধশ্বাসে ছুটল। জাহাজ ছুটে চলেছে—কক্ষচ্যুত উল্কার গতিতে চলেছে। বাতাসের প্রচণ্ডতায় ঢেউ অত্যধিক—সুতরাং জাহাজ অত্যন্ত দুলছে। দোদুল্যমান জাহাজের শরণার্থী প্রায় সকলেই বমন করতে সুরু করল। জাহাজখানিকে কলেরা-হাসপাতালের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল, সন্ধ্যার পূর্ব্বেই জাহাজের হোটেল হতে খাওয়ার জন্য ডেকে গেল—কিন্তু কেহই শয্যা ত্যাগ করল না। প্রায় সকলেই বমি করছে—খাইবে কে?

হিন্দু-শ্মশানভূমি—টাঙ্গা

অনন্ত অসীম নীল জলরাশির বুক চিরে হেলে দুলে আমাদের জাহাজ চলিয়াছে। ৫৩ ঘণ্টা অবিরাম গতিতে চলার পর আমরা ভারতের শেষ বন্দর "বেরি"—বন্দরে' পৌছলাম। বন্দর বা সহর আমাদের জাহাজ হতে প্রায় ৭ মাইল দূরে, তাই অন্য একটি ছোট জাহাজে করে প্রায় ৪শত যাত্রী এবং কয়েক হাজার টন আলু, পিয়াজ প্রভৃতি কাঁচামাল ও কিছু লৌহ-নির্ম্মিত দ্রব্য এনে আমাদের জাহাজে বোঝাই করা হল। মাল বোঝাই হবার পর জাহাজ ভারত-জননীর বক্ষ থেকে বিদায় নিয়ে পূর্ব্ব-আফ্রিকা অভিমুখে ছুটল।

আরব সাগরের নীল জলরাশির বক্ষ বিদীর্ণ করে জাহাজ চলেছে, ভারতীয় সংস্কৃতির ধারক ও বাহক দশজন সন্ন্যাসীর জীবনের সাধনার সমগ্র ফলাফল বহন করে জাহাজ নক্ষত্রের বেগে ছুটেছে। ইতিহাসে পড়েছি—একদিন সাতশত বঙ্গবীরের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও বীর্য্যবত্তা বহন করে মহারাজ সিংহবাহুর নির্বাসিত পুত্র কুমার বিজয়সিংহের যুদ্ধ-জাহাজ লঙ্কাভিমুখে ছুটেছিল—আজ দশজন বঙ্গীয় সাধকের সাধনার জাগ্রত ফল বহন করে "খাণ্ডালা" আফ্রিকা অভিমুখে ছুটেছে—তা চাক্ষুষ দেখে জীবন সার্থক করলাম। তাঁর স্রোতস্বিনী-জলধারাসিক্ত, কোমল পেলব মাটির বুকে কেবলমাত্র ভাবুক কবি বা দার্শনিকই জন্মায় না—যুগে যুগে দুর্জ্জয় বীর,জগজ্জয়ী সাধক, বিশ্ব-বরেণ্য ধর্মনেতা জন্মগ্রহণ করেছেন। আরাম ও বিলাসপ্রিয় বাঙ্গালী তার চিরাভ্যস্ত গৃহ-সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে ভুলে প্রয়োজন বোধে যে কোন মুহূর্তে দুঃসহ মরু অভিযানে যেতে পারে—অথবা সীমাহীন আকাশের নিম্নে—দিগন্ত-প্রসারিত নীল জলরাশির বুকে ভাসতে ভাসতে তার চিরপ্রিয় বস্তুর প্রসার ও প্রচার করতে মৃত্যুপথেরও যাত্রী হতে পারে। এই বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্য। কাঠিন্য ও কোমলতা, ভাবুকতা ও কর্মক্ষমতা, কল্পনা ও বাস্তবের এরূপ সমন্বয় বিশ্বের আর কোন জাতিতে পরিলক্ষিত হয় নাই। বিদেশী শাসকের শত অত্যাচারের প্রতিদানে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ—প্রণবানন্দের ন্যায় সাধক, রামমোহন—কেশবচন্দ্র, দেবেন্দ্রের ন্যায় সংস্কারক, জগদীশ, প্রফুল্লচন্দ্রের ন্যায় বৈজ্ঞানিক, চিত্তরঞ্জন, যতীন্দ্রমোহনের ন্যায় দেশসেবী, সুরেশচন্দ্র সুভাষচন্দ্রের ন্যায় মহান্ বীর, বঙ্কিম-শরৎ-রবীন্দ্রের ন্যায় সাহিত্যিক এ দেশের মাটির বুকে জন্মগ্রহণ করেছে। আমার দেশজননী রত্ন-প্রসবিনী, সমগ্র জগত শ্রদ্ধাবনত শিরে তাঁর চরণ বন্দনা করছে।

নীল জলরাশির পর্ব্বত-প্রমাণ ঢেউগুলিকে শতধা-বিচ্ছিন্ন করে আমাদের জাহাজ চলেছে। শতপ্রকার বাধা-বিপত্তিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে, সহস্র প্রকার প্রতিকূলতাকে অপসারিত করে লক্ষ্যপথে ছুটে চলেছে। মানুষ সংসার-পথে সামান্য একটু বিরুদ্ধভাব বা বাধা-বিপত্তি পেলেই চরমলক্ষ্য বিশ্ব-পিতাকে বিস্মৃত হয়; সামান্য প্রতিকূল আঘাতেই মানুষের নৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙ্গে পড়ে, দারিদ্র্যের সামান্য কশাঘাতেই উদার মন সংকীর্ণতার আশ্রয় গ্রহণ করে, আর আজ দেখছি 'খাণ্ডালা' শতপ্রকার বাধা-বিপত্তিকে পদদলিত করে লক্ষ্যাভিমুখে অবিরাম গতিতে চলেছে—গৃহীত দায়িত্ব উদ্‌যোপন করতে।

দিনের পর দিন অনন্তের রূপ [illegible]

ভেসে চলেছি। একদিকে নীলাম্বুরাশির রূপ সৌন্দর্য্য, অপরদিকে পর্ব্বত প্রমাণ ঢেউএর গর্জ্জনের ভীষণতা ;—একদিকে বিশ্বের পালনকর্ত্তার শান্ত, মধুর, নয়নানন্দদায়ক মনোহর মূর্ত্তি—অপরদিকে সংহার কর্ত্তা মহাকাল রুদ্রের তাথৈ তাথৈ নৃত্য ; একদিকে সৃষ্টির মাধুর্য্য, অপরদিকে ধ্বংসের ভীষণতা।

প্রভাতে নবারুণের রক্তরাগরঞ্জিত সুবর্ণবর্ণনিন্দিত কিরণমালা পরম প্রেমভরে সর্ব্বাঙ্গে লেপন করে সমুদ্ররাণী যেন মিশর-কুমারীর ন্যায় বিলাসিনী মূর্ত্তিধারণ করেন, তরঙ্গায়িত সর্ব্বাঙ্গে তখন মহামূল্য কাঞ্চনের অলঙ্কাররাজি শোভা পায়। ঢেউএর প্রবলতাও তখন নিশার অলসতা ও ক্লান্তি মাখানো। তাই সমুদ্ররাণীর সেরূপে তেমন সৌন্দর্য

সাইসলের গাছ

নাই—পবিত্রতা নাই—আছে শ্রান্তি ক্লান্তির অলস আবেশ, মধ্যাহ্নে সাগর জননী আর এক অভিনব বেশে সজ্জিতা হন। যেদিকে তাকাই—প্রভাতের সেই বিলাসজন-সুলভ মহামূল্য কাঞ্চন-ভূষণ তাঁর অঙ্গে স্থান পায় নাই—শ্বেতবরণ রৌপ্য-ভূষণ সেস্থান দখল করেছে। প্রতিটি তরঙ্গের মস্তকোপরি হিম শুভ্র রাজমুকুট। নীলাম্বর পরিধান করে মা আমার রাজরাজেশ্বরী মূর্ত্তি ধারণ করেছেন।

মধ্যাহ্নের অবসানে ধরণীবক্ষে যখন সন্ধ্যা নেমে আসে—কর্ম্মব্যস্ত পল্লীজননী তাঁর সন্তান সন্ততির অনন্ত কল্যাণ কামনায় যখন তুলসীর বেদীমূলে অথবা দেব-দেউলে মঙ্গল প্রদীপ জ্বালিয়ে দিয়ে বিশ্ব নিয়ন্তার চরণমূলে প্রাণের আকুতি নিবেদন করে—তখন অসীম আনন্দে মুখরিত হোয়ে ওঠে সমুদ্ররাণীর অন্তরখানি। অস্তগামী ক্লান্ত রবির স্নিগ্ধ-কিরণ-মালা শুধু মানব প্রাণেই নবীন শিহরণ জাগায় না, এই জনমানবশূন্য সমুদ্রের বুকেও অভিনব পুলক সঞ্চার করে। মধ্যাহ্ণে সূর্য্যের প্রখর কিরণ স্পর্শে যে বিক্ষুব্ধ বীচিমালা সমগ্র দিবাব্যাপী প্রচণ্ড প্রতাপে জাহাজখানিকে আঘাত হানছিল—, সেই-দিনের শেষে অস্তগমনোম্মুখ স্বর্ণোজ্জ্বল-করধারী মহাতেজা প্রভাকরের শান্ত, স্নেহবর্ষণকারী কিরণ মেখে প্রেমাকুলচিত্তে জাহাজখানিকে আলিঙ্গন করে। সে আলিঙ্গনে মধ্যাহ্নের ন্যায় বেদনার প্রচণ্ডতা নাই—আছে শান্তির কোমল পরশ, সে আঘাতে বাধা-বিপত্তির তীব্র প্রচণ্ডতা নাই, আছে সখ্য সহানুভূতির অনির্ব্বচনীয় মূক আনন্দোচ্ছ্বাস। মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ডও সে

হিন্দু মণ্ডল

কোমল আবেশের নিকট পরাজয় স্বীকার করে তার সে প্রচণ্ডতা লুকিয়ে রেখে উজ্জ্বল গৈরিকবর্ণের কিরণ-মালা সাগর জননীকে উপহার দেয়। এ সৌন্দর্য্যের তুলনা নাই, অতুলনীয়, উতুঙ্গ হিমাচলে শৃঙ্গোপরি তুহিন-রাজির শীর্ষে প্রভাতের তরুণ অরুণের সোনালী কিরণ সম্পাতে যে শোভা—ইহাও তদ্রূপ। ইহা যেন নিদারুণ শৈত্যের অবসানে বসন্তের মলয় বাহিত প্রথম পুষ্পটির সৌগন্ধ তুল্য। ক্রমে সমুদ্রের বুকে গভীর অন্ধকার নেমে আসে। দৃষ্টিশক্তি তখন সমুদ্র জননীর সেই অনন্ত সৌন্দর্য্য দর্শনের সৌভাগ্য হতে বঞ্চিত হয়। এইভাবে নিশার আধিপত্য ক্রমশঃ সমুদ্রের বুকে প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু তার সে আধিপত্যকে পরাভূত করে আবার প্রভাতের আগমন—দিবার অবসানে পুনরায় নিশার আবির্ভাব। এইরূপে দিবারাত্রির প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়া আমাদের 'বাহন'

"খাণ্ডালা" অনন্ত বারিরাশির বুক চিরে অবিরাম অবিশ্রাম গতিতে লক্ষ্যপথে ছুটে চলেছে।

১৭ই জুন 'খাণ্ডালা' পূর্ব্ব আফ্রিকার প্রধান বন্দর মোম্বাসায় পৌছল। ভারত সরকারের আন্তঃরাষ্ট্রীয় বিভাগ হতে পূর্ব্ব থেকেই আমাদের মিশনের আগমনবার্ত্তা পূর্ব্ব আফ্রিকার ভারতীয় নেতা ও ভারতীয় প্রতিনিধিগণকে

আফ্রিকার আদিবাসী—মাতা-পুত্র

জানানো হয়েছিল। তাই ভারতীয় ট্রেড-কমিশনার সর্দ্দার সংগত সিং, হিন্দু ইউনিয়নের সভাপতি শ্রী টি-জে-ইনামদার বার-এট-ল, প্যাটেল, আর্য সমাজের সহ-সভাপতি শ্রীচুনা-ভাই, ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের সেক্রেটারী শ্রী আর-বি-প্যাটেল প্রভৃতি নেতৃ স্থানীয় ব্যক্তিগণ আমাদের অভ্যর্থনা করতে আসেন। প্রায় তিনটার সময় আমরা জাহাজ হতে নেমে মোটরযোগে সহরে যাই। মোম্বাসায় আমরা প্রথমে কাজ আরম্ভ করতে আসি নাই। তাই বন্দরে 'খাণ্ডালা'র অবস্থানকালে তিন দিনের জন্য আমরা কয়েকজন সহরে শ্রীচুনীভাই প্যাটেলের আতিথ্য গ্রহণ করি। মোম্বাসা একটি দ্বীপ বিশেষ। বৃটিশ কলোনী কেনিয়ার অন্তর্গত প্রধান ও প্রাচীন বন্দর। চারিদিকে লবণাম্বুবেষ্টিত ক্ষুদ্র দ্বীপের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বড়ই মনোরম। গাঢ় সবুজবর্ণ বৃক্ষশ্রেণী, সাগরতীরে অসংখ্য নারিকেল বৃক্ষের সারি, সবুজ লতাপাতায় ঘেরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 'বাংলো' প্যাটার্ণের ইউরোপীয়নদের কোয়ার্টার্স' সত্যই প্রকৃতির স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যকে আরও মনোহারী করে তুলেছে। বর্ষা বিদায় নিয়েছে—তাই বাংলার শরতের ন্যায় নীল আকাশের বুকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মেঘ-খণ্ড ভেসে বেড়াচ্ছে। কোথাও ঘন সবুজ জঙ্গলের মধ্যে রক্ত-করবী তার অলক্তরাগরঞ্জিত রূপ-সৌন্দর্য্য নিয়ে প্রকৃতি দেবীর চরণ বন্দনা করছে; কোথাও গিরিসুতা সুন্দরী ঝরণা তার স্বভাব-সুলভ চাপল্য ও কলকল হাসি-রাশি নিয়ে সমুদ্রের সন্ধানে ছুটে চলেছে। কখনও আম্রমুকুলের * সুমধুর গন্ধ ও গোলাপ মল্লিকার রূপ-মাধুর্য্যের সহিত বরুণের নয়ন-ধারা মিশ্রিত হয়ে প্রকৃতি-দেবীর অভিষেক-ক্রিয়া সমাপন করে—আবার কোথাও সুমিষ্ট ফল সম্ভারের বরণডালা হাতে নিয়ে কমলাদ্রাক্ষা দেবীপ্রকৃতির ভোগ রাগের আয়োজন করে—এরূপ, এ সৌন্দর্য্য ভুলবার নয়। আম, কমলা, নারিকেল, আলু প্রভৃতি ফল এবং টগর, করবী, মল্লিকা, গোলাপ প্রভৃতি ফুল কে যেন অতি যত্নে এখানের সবুজ বুকে সাজিয়ে রেখেছে, এ যেন বসন্তের একাধিপত্য সাম্রাজ্য।

* এখানে বৎসরের সবসময়েই আম, কমলা, আঙুর প্রভৃতি ফল ফলে।

শিলালিপি

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

দুরু দুরু বুকে ঢুকল রঞ্জু। নিজের পা দুটোকে অবশ বলে মনে হচ্ছে, কপালের দুপাশে একটা মুমূর্ষু সাপের শেষ বিক্ষোভের মতো পাক খাচ্ছে রগ দুটো, বুকের মধ্যে রেলের এঞ্জিনের মতো শব্দ উঠছে।

ইয়াদ আলী বললে, বড়বাবু এনেছি।

—হুম্—

যেন চোঙার ভেতর দিয়ে শব্দ বেরুল একটা। সে শব্দে সমস্ত ঘরটা গম্ গম্ করে উঠল।

সামনে মস্ত একটা সেক্রেটারিয়েট টেবিল। স্তূপাকার কাগজপত্র ফাইল। একটা পেতলের অ্যাশ্‌ট্রের ওপর চুরুট পুড়ছে, ঘরে ভাসছে চুরুটের তীব্র উগ্র গন্ধ। বাঁ হাতের ঠিক পাশেই পড়ে আছে একটা রিভলভার, ধনেশ্বর কী লিখে চলেছে মন দিয়ে।

রঞ্জু দাঁড়িয়ে রইল যেন বলির অপেক্ষায়।

—হুম্—

আবার সেই চোঙার আওয়াজের মতো শব্দ। এতক্ষণে চোখ তুলল গোয়েন্দা সর্দার ধনেশ্বর। প্রখর ভয়ঙ্কর চোখ, তাতে একটা কেমন লালের আভাস। বুলডগের মতো সমস্ত মুখের চেহারা, ভারী মুখের দুপাশে শিকারী বেড়ালের মতো একজোড়া খাড়া খাড়া গোঁফ ছড়িয়ে আছে। ফর্সা রঙ, ফুলো ফুলো গাল দুটোয় গোলাপী আভা। মুখের ভেতর থেকে ঝলক দিলে দুটো সোনা বাঁধানো দাঁত—যেন তেড়ে কামড়াতে আসছে।

কিন্তু কী আশ্চর্য, ধনেশ্বর হাসল। কল্পনা করা যায়, ধনেশ্বর হাসল তবুও হাসল যে কোনো ভুল নেই। যেন শেয়ালে হাঁস চুরি করে খেয়ে চেটে নিলে ঠোঁটের রক্ত।

বুলডগটা ঘোঁৎ করে বললে, বোসো।—এবার আর চোঙার আওয়াজ নয়, সুতরাং অনুমান করা গেল সে গলার স্বরে কোমলতা আনবার চেষ্টা করছে।

ভয়ের মধ্যেও কেমন বিস্ময় বোধ হচ্ছে। হঠাৎ এ জাতীয় সমাদরের মানে কী?

—আমি তোমার কাকাবাবু হই।—আবার সস্নেহে ঘোঁৎ করে বললে ধনেশ্বর।

কাকাবাবু! এবার বিস্ময়ের চমকটা রঞ্জু চেষ্টা করেও গোপন করতে পারল না। আম কাঁঠালের মতো কাকাবাবু নামে ব্যাপারটা যে গাছে গাছে ফলে—এটা তার জানা ছিল না। ধনেশ্বর কাকাবাবু হতে চাইছে! কে জানে ইয়াদ আলীও হয়তো এর পরে বলবে, আমি তোমার কাকা হই। তারপর সাক্ষাৎ যমদূত সামনে আবির্ভূত হয়ে যদি বলে যে আমি তোমার 'তালুই মশায়', তা হলেও তো আশ্চর্য হওয়ার কারণ থাকবে না!

কিন্তু কাকাবাবুর স্নেহ উপেক্ষা করা যায় না। সুতরাং বসতে হল।

বুলডগ্ কাকাবাবু খামোকা মুখটাকে খানিকটা খুলে আবার ঘোঁৎ করে বন্ধ করে ফেললে, যেন মশা গিলে নিলে একটা। রঞ্জুর কেমন খতমত লাগল, পরে অবশ্য লক্ষ্য করে দেখেছিল ওটা ওর মুদ্রা দোষ।

—হাঁ, আমি তোমার কাকাবাবু। তোমার বাবার কাছেই প্রথম এ-এস্-আই ছিলাম আমি। ছেলেবেলায় কতবার গেছি তোমাদের ওখানে, তোমরা তখন ছোট ছিলে। এই একটুকু দেখেছি তোমাদের।

আত্মীয়তার রসালাপ মন দিয়ে শুনে যেতে লাগল রঞ্জু, কোনো জবাব দিলে না।

—তোমার মা, আমাদের বৌদি—যেন স্বর্গের দেবী ছিলেন। আহা-হা—ধনেশ্বরের গলায় করুণতার আমেজ লাগল: যখন শুনলাম তিনি আর ইহজগতে নেই, তখন কী যে কষ্ট হল বলবার নয়। ভাবলাম, আহা, এখন এই নাবালক শিশুদের যে কে দেখবে!

রঞ্জু প্রায় বলে ফেলছিল—এমন সোনার কাকাবাবু থাকতে ভাবনা কি, কিন্তু কথাটার প্রতিক্রিয়াটা আন্দাজ করতে না পেরে ধনেশ্বরের অনুকরণে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল মাত্র।

মিনিট খানেক চুপ করে থেকে আবেগটাকে সামলে নিলে ধনেশ্বর। তারপর তেমনি করুণ কোমল গলায় বললে, তুমি আমার আপনার লোক, একেবারে ঘরের ছেলে। তাই ভাবছিলাম তোমাকে ডেকে গোটা কয়েক কথা জিজ্ঞাসা করব। কাকাবাবুর কাছে তো লজ্জার কিছু নেই, জবাবগুলো দেবে আশা করি।

কপালের রগদুটো আবার মোচড় খেয়ে উঠল, আবার ধড়াস্ করে শব্দ হল বুকের ভেতরে। ঝুলির ভেতরে বেড়াল নড়ে উঠেছে, সেও নড়ে চড়ে ঠিক হয়ে বসল।

—ইয়াদ মিঞা!—ধনেশ্বর ডাকল।

—স্যার?

—কিছু খাবার আর চায়ের ব্যবস্থা করুন দেখি।

—আমি কিছু খাব না—শুকনো স্বরে রঞ্জু বলতে চেষ্টা করল।

—খাওনা, কাকাবাবুর সামনে লজ্জা কি! যান ইয়াদ মিঞা—

—হ্যাঁ স্যার, আনাচ্ছি এক্ষুণি—ইয়াদ আলী বেরিয়ে গেল।

ছাইদানী থেকে চুরুটটা তুলে নিলে ধনেশ্বর। একটা দমক দিয়ে খানিক উগ্র গন্ধ ধোঁয়া প্রায় রঞ্জুর মুখের ওপরেই ছড়িয়ে দিলে সে: শহরে আজকাল একদল বদ ছেলের আমদানী হয়েছে, জানো বোধ হয়।

রঞ্জু আধখানা দৃষ্টিতে দ্বিধাগ্রস্তের মতো একবার তাকালো শুধু।

—এই সব ছেলের—ধনেশ্বরের গলায় এবারে উত্তাপ সঞ্চার হল: মরবার জন্তে পাখ্‌না গজিয়েছে। এদের ধারণা হয়েছে যে এরা দুটো পিস্তল আর চারটে বোমা দিয়ে ইংরেজকে তাড়াতে পারবে। কিন্তু ব্রিটিশ লায়ন অত দুর্বল নয়, ইচ্ছে করলে একদিনে কামানের মুখে ওরা ভারতবর্ষকে চষে ফেলতে পারে!—সমর্থনের জন্তে রঞ্জুর মুখের ওপর পূর্ণদৃষ্টি ফেলল ধনেশ্বর: কী বলো, পারেনা?

রঞ্জু সম্মতিসূচক মাথা নাড়ল। হ্যাঁ, পারে বইকি। ইংরেজের পরাক্রম সম্পর্কে তারও মনে সন্দেহের লেশমাত্র নেই।

—তবে দেখো, এসবের কোনো মানে হয়না। হয়?

রঞ্জু জানালো, না হয়না।

ধনেশ্বর হঠাৎ সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল। অত্যন্ত বিশ্বস্ত গলায় ফিস্‌ফাস করে বললে, ভাখো, স্বাধীনতা সবাই চায়। আমরা পুলিশের লোক, আমরাই কি জানিনা যে ইংরেজ কী ভাবে শোষণ করছে আমাদের, হরণ করছে আমাদের মনুষ্যত্ব? আমাদেরও অপমান বোধ আছে, আমাদের রক্তে পরাধীনতার জ্বালা আছে—যেন থিয়েটারের ঢঙে ধনেশ্বর বলে চলল: ইংরেজকে তাড়াতে পারলে আমরাও কম খুশি হবোনা।

যেন বিমূঢ় হয়ে গেল রঞ্জু। ভূতের মুখে হরি-সংকীর্তন শুনছে যে।

—কিন্তু—আবেগভরে ধনেশ্বর বললে, কিন্তু সনাতন ভারতবর্ষ আমাদের। অহিংসা, ত্যাগ, প্রেমের দেশ। এই দেশের মাটিতেই জন্মেছিলেন বুদ্ধ, নানক, মহাবীর, চৈতন্য। এঁরা সব অহিংসা আর ক্ষমার পূজারী। মহাবীরের যাঁরা শিষ্য তাঁরা একটা পোকা পর্যন্ত মারতে কষ্ট পান। খাটে তারা 'খট্‌মল'—মানে ছারপোকা পোষেন। কামড়ে জেরবার করে দিলেও টুঁ শব্দটি করেন না কখনো।

রিভলভারের ঝকঝকে নলটার দিকে চোখ পড়ল রঞ্জুর। অহিংসা আর প্রেমের আবহাওয়ার সঙ্গে কী চমৎকার খাপ খাচ্ছে। একটা বুলডগ যদি জপের মালা হাতে নিয়ে তপস্তায় বসে, তা হলে তার মুখের চেহারায় কি এই ধার্মিক কাকাবাবুর মতো একটা ঐশ্বরিক ব্যঞ্জনা ফুটে ওঠে?

—আহা—শ্রীচৈতন্য!—টপ্‌ করে আবার একটা মশা খেয়ে নিলে ধনেশ্বর: জগাই মাধাইকে বললেন 'মেরেছ কলসীর কাণা, তাই বলে কি প্রেম দিব না!'

কথাটা শ্রীচৈতন্য বলেননি, বলেছেন নিত্যানন্দ। কিন্তু রোহিণীর ইংরেজি বিস্তার মতো ধনেশ্বরের ভুল শুধ্‌রে দেবার চেষ্টা করাও বৃথা।

—হুঁ—সংক্ষেপে সমর্থন করলে রঞ্জু।

—আর এই ভারতবর্ষের মূর্ত প্রতীক হলেন ত্যাগের অবতার মহাত্মা গান্ধী। অহিংসা—প্রেম। রক্ত দিয়ে নয়, প্রেম দিয়ে মানুষের হৃদয় জয় করতে হবে, জয় করতে হবে তার অন্তরের পশুত্বকে। এ শুধু মহাত্মার কথা নয়, সমস্ত দেশেরও প্রাণের কথা। কী বলো?

রঞ্জু বললে, ঠিক।

তত্ত্বালোচনায় বাধা পড়ল। উর্দিপরা একটা চাপরাশী ঢুকল ঘরে, টেবিলের ওপর দু প্লেট মিষ্টি আর চা সাজিয়ে দিয়ে গেল। আহা, আদত কাকাবাবু যে নয়, কে বলবে!

—খাও, খাও—ধনেশ্বর সস্নেহে বললে। স্থান কালপাত্র অনুকূল নয়, তবু কেন কে জানে হঠাৎ করুণাদিকে তার মনে পড়ে গেল।

—হ্যাঁ, যা বলছিলাম—ধনেশ্বর চায়ে চুমুক দিয়ে বললে, তাই এই অহিংসার দেশে যারা রক্তপাতের কল্পনা করে তারা ভারতবর্ষের শত্রু। এই শত্রুদের ক্ষমা করা উচিত নয়, এরা মহাত্মার পবিত্র আদর্শের অসম্মান করে। দেশের আদর্শকে বজায় রাখবার জন্তে এইসব লোককে অবিলম্বে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দেওয়া আমাদের কর্তব্য।

রঞ্জুর কপালে ঘাম দেখা দিলে। ঝুলির ভেতর থেকে বেড়ালটা উঁকি দিয়েছে।

—জানোই তো—চায়ের কাপ শেষ করে একটা থ্যাবড়া আঙুলে চুরুটে টোকা দিলে ধনেশ্বর, শব্দ করে খানিকটা ছাই পড়ল কাপের তলানিতে: আমাদের এই শহরেও দেশের সেই শত্রুরা ঘাঁটি বসিয়েছে। বন্দুক রিভলভার চুরি হচ্ছে, ডাকাতি হচ্ছে এদিকে ওদিকে। এখন থেকেই এই ছোকরাদের সম্পর্কে সাবধান হওয়া দরকার। এ ব্যাপারে তুমি আমার আত্মীয়, আশা করি, আমাকে সাহায্য করবে।

ঝুলির ভেতর থেকে একলাফে বেরিয়ে পড়ল বেড়ালটা।

—আমি—আমি—জড়ানো গলায় রঞ্জু বললে: আমি তো—

—হ্যাঁ তুমি। ধনেশ্বর হাসিমুখে জবাব দিলে। কিন্তু রঞ্জুর অবচেতন মন হঠাৎ টের পেল—এই মুহূর্তে ধনেশ্বরের চোখ দুটো যেন পোকাধরা টিক্‌টিকির মতো সজাগ হয়ে উঠেছে: তোমাদের 'তরুণ-সমিতি' সম্পর্কে গোটা কয়েক খবর চাই। আশা করি, কাকাবাবুর কাছে মিথ্যে বলবেনা তুমি।

ভয়াতুর চোখে রঞ্জু তাকিয়ে রইল। কী বলবে বুঝতে পারছে না।

—তুমি 'তরুণ-সমিতি'র মেম্বার তো?

রঞ্জু নিরুত্তরে হেলাল ঘাড়টা। হাঁ, সে মেম্বার।

—তোমাদের লাইব্রেরীয়ান্ ক্ষিতীশ চক্রবর্তীকে চেনো আশাকরি?

ক্ষিতীশ চক্রবর্তী! রঞ্জুর সব যেন গোলমেলে মনে হল। ক্ষিতীশ চক্রবর্তী—ক্ষিতীশদা! 'তরুণ-সমিতি'র মধ্যে সব চেয়ে নিরীহ আর গোবেচারা লোক। বঙ্কিম আর মাইকেল নিয়ে পড়ে আছেন—যেন একশো বছর আগেকার মানুষ। ওরা ক্ষিতীশদাকে করুণা করে। ভদ্রলোক শুধু 'কৃষ্ণচরিত্র' পড়ে আর খাতা লিখেই কাটালেন, ঘুণাক্ষরেও জানলেননা তাঁর চারপাশে কী ভয়ঙ্কর একটা অগ্নিচক্র চলেছে আবর্তিত হয়ে। ওঁকে ওরা এড়িয়ে চলে সযত্নে, কোনো জরুরি কথার সময় ওঁকে আসতে দেখলে সঙ্গে সঙ্গে চুপ করে যায়। সেই ক্ষিতীশদার কথা জানতে চাইছে ধনেশ্বর! লোকটার কি মাথা খারাপ! বুলডগের চোখ ধারালো নিঃসন্দেহ, কিন্তু মগজে কি

কোনো বস্তুই থাকতে নেই তার? অথচ যে নামটার জন্যে প্রতীক্ষা করছিল—

—চেনো নিশ্চয় তাকে।

—হাঁ, চিনি বইকি।—রঞ্জুর মুখে মৃদু হাসি দেখা দিল।

—কেমন লোক?—ধনেশ্বরের গলায় চোঙাটা আবার উঠল গমগমিয়ে।

রঞ্জু সবিস্ময়ে বললে, খুব ভালো গোবেচারা লোক।

—খুব ভালো গোবেচারা লোক—অ্যাঁ?—ধনেশ্বরের মুখের চেহারা কঠিন হয়ে উঠল: খুব গোবেচারা লোক! ভাজা মাছটিও উল্টে খেতে জানেনা, অথচ আজ পার্বতীপুর ষ্টেশনে ওই লোকটিকেই অ্যারেষ্ট্ করা হয়েছে—তা জানো?

রঞ্জু অব্যক্ত শব্দ করল একটা।

—ওই ভালো লোকটির আসল নাম ক্ষিতীশ চক্রবর্তী নয়। ওর নাম মণি মুখার্জি, এলাহাবাদের বিখ্যাত টেররিষ্ট্ নেতা। রবারি, কন্স্পিরেসি এগেনষ্ট্ ক্রাউন, আর্মস অ্যাক্ট আর পোলিটিক্যাল মার্ডারের চার্জে আজ পাঁচ বছর ধরে ওকে খুঁজে বেড়ানো হচ্ছে। উই হাভ্ গট্ হিম অ্যাট লাষ্ট। সঙ্গে একজোড়া লোডেড্ রিভলভারও ছিল। ফাঁসি না হোক, ট্রান্স্পোর্টেশন ফর লাইফ হয়ে যাবে নিশ্চয়।

পক্ষাঘাতগ্রস্তের মতো অসাড় আর অনড় হয়ে গেল রঞ্জু। ক্ষিতীশদা—নিরীহ নির্বোধ সেই লাইব্রেরীয়ান! কথা বলতে বলতে বার বার 'বেশ বেশ' বলেন, বাড়িয়ে দেন চাঁদার খাতা আর গুণ গান করেন বঙ্কিমের কৃষ্ণচরিত্রের! সেই ক্ষিতীশদার ভেতরে লুকিয়ে ছিল এই বিপুল অগ্নি-যন্ত্রণার ইতিহাস! রূপকথা-বিভোর রঞ্জুর মন এ আবার কোন্ নতুন রূপকথা শুনছে।

না, না, এ বিশ্বাস করা সম্ভব নয়!

ধনেশ্বর বললে, ওই লোকটা, মানে, চীফ্ অর্গানাইজার অব্ দি পার্টি, তরুণ সমিতির ভেতর কতকটা এগিয়েছে তাই আমি জানতে চাই। আশা করি, তোমার কাছ থেকে পাকা খবর পাব একটা।

বিস্ময়টাকে সামলে নিয়ে। রঞ্জু দৃঢ় হয়ে গেছে এতক্ষণে। মন্ত্রগুপ্তি। বিপ্লবীর শপথ, বিপ্লবীর সংকল্প। কখনো দলের কথা কারুর কাছে প্রকাশ করবনা, প্রাণ গেলেও করব না সত্যভঙ্গ। হাজার অত্যাচার আসুক, আসুক মর্মান্তিক শারীরিক আর মানসিক যন্ত্রণা, বুকের ভেতর বজ্রের মতো কঠিন প্রাচীর গড়ে তুলে রক্ষা করব সেই গোপনতাকে। মনে রাখব আমার একটু মাত্র দুর্বলতার অবকাশে এত আয়োজন আমাদের ব্যর্থ হয়ে যাবে, একটু মাত্র অসতর্কতার অমার্জনীয় অপরাধে মিথ্যে হয়ে যাবে শত শত শহীদের আত্মদান।

চাপা কঠিন ঠোঁটে রঞ্জু বললে, কী খবর চান?

—তরুণ সমিতির আসল উদ্দেশ্য কী? তার প্ল্যান আর প্রোগ্রামই বা কী?

নিরীহ নির্বোধের মতো জবাব এল: কেন ভালো ভালো বই পড়া, জিমন্যাষ্টিক্ করা এই সব।

ঘোঁৎ করে আবার শব্দ করলে বুলডগটা, কোঁৎ করে একটা মশা খেয়ে নিলে। তারপর দু-পাশের খাঁটা গোঁফগুলোকে সজারুর কাঁটার মতো ছড়িয়ে দিয়ে হাসল: আরে, সে তো সবাই জানে। কিন্তু যা সবাই জানেনা, সেই রকম দুটো চারটে খবর চাই যে—বোকা ছেলে।—কাকাবাবুর স্বরে একটা স্নিগ্ধ-ভর্ৎসনার আমেজ এল: কী কী ভালো বই পড়ে? এই সব?

তারপর ধনেশ্বর গড়গড় করে কতগুলো বইয়ের নাম আওড়ে গেল। বিস্ময়ে চমকে উঠল রঞ্জু। আশ্চর্য, ঠিক এই বইগুলোই প্রথম তাকে পড়িয়েছিল পরিমল, এই বইগুলোর আগুনঝরা লেখা ছড়িয়েই রক্তে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল রঞ্জুর। আশ্চর্য, ঠিক বেছে বেছেই বইগুলোর নাম করে যাচ্ছে ধনেশ্বর!

—না, এসব বই আমি কোনোদিন দেখিনি।

—দেখোনি!—ধনেশ্বরের মুখের থেকে হাসি মিলিয়ে গেল: মিথ্যে কথা বোলো না। তুমি আমার আপনার লোক, আমার ঘরের ছেলের মতো। সেই জন্যেই যাতে তোমার সব দিক থেকে ভালো হয় সেই চেষ্টা করছি। সত্যি বলো, এ সব বই তুমি দেখোনি?

—না।

ধনেশ্বরের চোখ ঝিকিয়ে উঠল।

—না? বেশ। কিন্তু এঞ্জিনিয়ার কামিনীবাবুর বাড়ি থেকে তাঁর বন্দুকটা চুরি করেছে কে তা' জানো?

—না, তাও জানি না।

—হালদারের দোকানের ডাকাতিতে কে কে ছিল বলতে পারো?

—না।

—না?—এবার হিংস্রভাবে একটা গর্জন করলে ধনেশ্বর, সোনা-বাঁধানো দাঁত দুটো যেন সামনের দিকে এগিয়ে এল একেবারে রঞ্জুর টুঁটি কামড়ে ধরবার জন্যে। ধনেশ্বর বললে, শোনো। তুমি আমার নিজের লোক বলেই ভদ্রভাবে তোমার কাছে সব কথার উত্তর চাইছি। যদি এখনো জবাব না দাও, তা হলে তা আদায় করবার উপায় আমার জানা আছে। যা জিজ্ঞেস করছি তার জবাব দাও।

—আমি কিছুই জানি না।

ধনেশ্বরের আগ্নেয় চোখটা আবার হাসিতে কোমল হয়ে এল। মুখের ওপর আবার ফুটে উঠল স্নেহের একটা স্বর্গীয় ব্যঞ্জনা: আমি বুঝতে পারছি, তুমি কেন ভয় পাচ্ছ। ওই গুণ্ডা ছেলেগুলো টের পেলে গোল বাধাতে পারে। কিন্তু জেনো,—ধনেশ্বরের স্বর আবার উদাত্ত হয়ে উঠল: যতক্ষণ কাকাবাবু আছে ততক্ষণ তোমার আঙুলের ডগাটিও কেউ ছুঁতে পারবে না। আর তা ছাড়া যে ষ্টেটমেণ্ট্ তুমি দেবে, পৃথিবীর কেউ তা জানতে পারবে না এ সম্পর্কেও নিশ্চিন্ত থাকো।

ধনেশ্বর একটা কাগজ কলম টেনে নিলে: তুমি সব বলো, আমি লিখে যাই।

—আমার বলবার কিছুই নেই।

ধনেশ্বর কলমটা নামিয়ে রাখল। স্থির গলায় বললে, ভেবে দেখো তোমাদের সংসারের অবস্থা। তোমার মায়ের শোকে বাবা প্রায় পাগলের মতো হয়ে আছেন। এ অবস্থায় যদি তোমাকে জেলে যেতে হয়, তা হলে—আহা দেবতুল্য মানুষ—ধনেশ্বর আবেগভরে বললে: তা হলে তিনি হার্টফেল করে মরবেন। বলো, এখন কি তাঁকে তোমার এমন 'শক' দেওয়া উচিত? যা জানো বলো। এ ষ্টেট্‌মেণ্টের খবর আমি আর তুমি ছাড়া পৃথিবীর আর কেউ জানবে না—নিশ্চিন্ত থাকো।

—আমি কিছুই জানি না।

—আমার কাছে মিথ্যে বলতে চেষ্টা কোরো না। জেনে রেখো, বাতাসেও আমার কান পাতা আছে। একদিন সব খবর আমি পাবই। আজ যদি সব কথা বলো, তা হলে জেনো সেদিন তোমার কোন ভয় নেই, বরং ভালো একটা চাকরী-বাকরী যাতে পাও তার ব্যবস্থাই আমি করে দেব।

—কিন্তু কিছুই আমার জানা নেই।

—**Shut up!**—ধনেশ্বর এবার ফেটে পড়ল: ছেলেখেলা কোরো না, এ ছেলেখেলার জায়গা নয়। আপনার লোক বলেই এতক্ষণ প্রশ্রয় দিয়েছি তোমাকে—but no more! ষ্টেট্‌মেণ্টটা দিয়ে চলে যাও—**you will remain under the safest** protection of the British Government! আর যদি পরে ধরা পড়ো, ফাঁসিতে ঝুলতে হবে, দ্বীপান্তরে যেতে হবে **and you will** have no sympathy from anywhere—বুঝতে পারছ?

—আমি কিছুই জানি না।

—জানো না?—তবে কী করলে তুমি জানো সে আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। ইয়াদ মিঞা?

—স্যার?

—আমার হাণ্টার। সোজা আঙুলে ঘি উঠবে না।

হাণ্টার এল। শরীরের সমস্ত পেশীগুলোকে দৃঢ় করে রঞ্জু স্থির হয়ে বসে রইল, শুধু তার ঠোঁটের কোনা দুটো অল্প অল্প কাঁপতে লাগল—তার বেশি কিছুই না।

—জবাব দেবে না?

—আমি জানি না।

—**Take it then**—গর্জন করে ধনেশ্বর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কিন্তু মনের ভেতরে যখন আগুন জ্বলে, পরাধীনতার অপমানে সমস্ত বুক যখন পুড়ে খাক হয়ে যেতে থাকে তখন কি শরীরে আর কোনো অনুভূতিই জেগে থাকে না? শুধু পাথরের গায়ে আঘাত দিয়ে আঘাত ফিরে আসে, শুধু একটা জড়পিণ্ডকে ক্রুদ্ধ হতাশায় ঘা দিয়ে নিজেকেই আহত করে তোলা হয়?

তাই রঞ্জু কিছু টের পেল না। এমন কি নিজের নাক থেকে রক্ত গড়িয়ে যখন বুকের জামাটাকে ভিজিয়ে দিলে তখনো না। তারপর এক সময় সব আচ্ছন্ন হয়ে গেল, ঘরটা ঘুরতে লাগল চোখের সামনে, বুলডগের হিংস্র বীভৎস মুখটা ক্রমে ক্রমে আসতে লাগল অস্পষ্ট হয়ে। তার ওপরে শুধু রাশি রাশি হলদে কুয়াশা, আর কিছুই নেই।

একেবারে কিছুই নেই।

স্নিগ্ধ কোমল কণ্ঠে মিতা বললে, খুব লেগেছিল, না?

অল্প করে হাসল রঞ্জু: টের পাইনি। ওটা কাকাবাবুর স্নেহের শাসন কিনা।

—টের পাওনি? কী সর্বনাশ!—আতঙ্কে মিতা প্রায় আর্তনাদ করে উঠল: এমন করে মারল তবু টের পাওনি! আশ্চর্য তোমরা মানুষ বাপু। অসাধ্য কাজ নেই তোমাদের।

—টের পেলেই বা কী? রঞ্জু তেমনি হাসল: কুকুরে যখন কামড়ায় তখন সে কামড়াবেই। সে কামড়ে জ্বালা নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু তার জন্যে ছটফট করে তো কোনো লাভ নেই!

মিতা বললে, উঃ, ওরা কি মানুষ?

—না। ওরা প্রভুভক্ত। মানুষ ওদের চাইতে সম্মানের জীব।

—তা সত্যি।

সশ্রদ্ধ শঙ্কায় রঞ্জুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল মিতা। তার দৃষ্টিতে বীরপূজার মুগ্ধ অনুরাগ ফুটে উঠেছে। রঞ্জুর এত বীরত্বে বিশেষভাবে বিচলিত হয়েছে সে, চঞ্চল হয়ে উঠেছে। এমন কি এই ব্যাপারে যে মানসিক প্রতিক্রিয়াটা একটা বিপুল বিপর্যয়ের মতো ঘটেছে তার মধ্যে তার ফলে সেদিনকার সেই সন্ধ্যার ইতিহাসটাকেও সে ভুলে গেছে ভুলে গেছে সেই বাতলা বাতাস আর অশ্রান্ত বর্ষণের পাগলামিতে কেমন করে তার একখানা হাত রঞ্জুর হাতের মধ্যে গিয়ে পড়েছিল।

—ওরা কি সকলের ওপরই এমনি করে নাকি?

—হয়তো করে—ঠিক জানি না। তবে যাদের অ্যারেষ্ট করে রাখে তাদের ওপর অত্যাচারটা চলে আরো বেশি রকমের। কারণ সেটা নিরাপদ—বাইরে জানাজানি হওয়ার ভয় নেই।

—কী ভয়ানক! রুদ্ধস্বরে জবাব দিলে মিতা: কিন্তু বড় বড় সবাই থাকতে হঠাৎ বেছে বেছে তোমার ওপর নজর পড়ল কেন?

—কারণটা সহজ। ভেবেছিল আত্মীয়তার দোহাই দিয়ে সুবিধে করে নেবে।

—কী শয়তান!

মিতা আতঙ্কিত আর বেদনার্ত চোখে চেয়ে রইল অন্যমনস্কের মতো সে ভুলে গেছে, ভুলে গেছে বর্ষার সন্ধ্যার সেই আকস্মিক বিভ্রান্তি টুকুকেও। হয়তো বিভ্রান্তি তারও নয়, একান্তভাবেই সেটা রঞ্জুর, তার নিজের মনের একটা অর্থহীন দুর্বলতা। যা ঘটেছিল তা একান্ত আকস্মিক আর তার জন্যই সেটাকে এত সহজভাবে নিতে পেরেছে মিতা

কিন্তু রঞ্জু কেন পারছেনা ওই রকম সহজভাবে নিতে? কেন এমনভাবে তার বুকের ভেতরটা দুলে দুলে উঠছে, কেন তার মনের ভেতরে সেটা ঝিমঝিম করছে সারাক্ষণ? অনেকদিন পরে কেন তার বারে বারে মনে পড়ছে সেই শিশু-কল্পনার নীল চম্পার সঙ্গে সঙ্গে

হারিয়ে যাওয়া মালঞ্চমালা আর কঙ্কাবতীর স্বপ্নকে? সেই জানলায় এসে বসা নীল পাখিটাকে মনে পড়ে, মনে পড়ে সকালের আধফোটা প্রথম পদ্মের কুঁড়ির মতো উষার মুখখানাকে, আর এতদিন পরে আকাশ থেকে কেন আসে সাত ভাই চম্পার হাতছানি? জ্যোতির্ময় আকাশগঙ্গার স্রোতে ভেসে যেতে যেতে একরাশ বুনো-ফুল কেন তাকে পথ ভোলায় আজকে?

তাই মিতার সঙ্গে সহজভাবে কথা বলতে চাইছে সে, কিন্তু সহজ তো হতে পারছেনা। মিতার প্রতিটি কথায় সে জবাব দিচ্ছে বটে কিন্তু সে জবাবের ভেতরে একটা যান্ত্রিক নিষ্প্রাণতা আছে বলে মনে হয়। আসল কথা, অস্বস্তি বোধ হয়, উঠে পালাবার জন্যে ছটফটানি জাগে। মিতার কাছে একা বসে থাকবার মতো সাহস নেই, শক্তিও নেই তার। আশ্চর্য্য! সেই রোমান্টিক রঞ্জু, সেই ভীরু ছেলেটি এই তিন বৎসরে তো কত বদলে গেছে। আজ আর মৃত্যু-বিলাস নেই, দীক্ষা পেয়েছে কঠোর, ক্লান্তিকর, আর দুর্গম পথযাত্রার। ধনেশ্বরের হাণ্টারের ঘা যখন একটার পর একটা এসে পড়ছিল, যখন টের পাচ্ছিল তার বুকের জামায় রক্তের ফোঁটা পড়ছে টপ টপ করে, তখনো অনুভব করেছিল তার শরীরে কোনো যন্ত্রণা নেই—যেন তা পাথরে পরিণত হয়ে গেছে। সে বিপ্লবী, সে নির্ভয়। কিন্তু তিন বছর আগে প্রথম মিতার কাছে এসে যে দুর্বল সংশয় তাকে অভিভূত করে ফেলেছিল আজো কেন সে নিস্তার পাচ্ছে না তার হাত থেকে? কেন আজও সে এখানে এসে যথেষ্ট পরিমাণে কঠোর আর কঠিন হয়ে উঠতে পারলনা?

মিতা বললে,ক্ষিতীশদাকে আমিও দেখেছি। খুব নিরীহ মানুষ বলে মনে হয়েছিল। দাদাও বলত,ক্ষিতীশদা এসবের মধ্যে নেই। কিন্তু কী আশ্চর্য!

—হুঁ।

নাঃ, ভালো লাগছে না। এখন এখান থেকে তার উঠে পড়াই উচিত। আরো কী অদ্ভুত যোগাযোগ—এবাড়িতে যেদিনই সে আসবে সেদিনই কি পরিমল ইচ্ছে করে থাকবেনা বাড়িতে? আর ঠিক এই সন্ধ্যার সময় এত বড় বাড়িটা এমনি নির্জন হয়ে যাবে একটা প্রাকৃতিক নিয়মে? মিতার বাবা তাঁদের ক্লাবে যাবেন টেনিস্ আর ব্রীজ খেলতে, ওর পিসিমা জপের মালা নিয়ে পুজোর ঘরে দরজা বন্ধ করবেন—আর চাকরগুলো সব এদিকে ওদিকে জটলা পাকাবে? শুধু ও আর মিতাই মুখোমুখি বসে থাকবে—আর কেউ নয়?

আজও পালাচ্ছিল কিন্তু মিতা ডেকে আনল। ডেকে আনল ওপরে, মিতার পড়ার ঘরে। বাইরের ঘরের যদিবা একটা খোলাখুলি প্রকাশ্যতা আছে, এখানে তাও নেই। অবশ্য মিতা তাকে এ ঘরে কেন ডেকে এনেছে সে তা জানে; তার মুখ থেকে ধনেশ্বরের বিবরণ পুরোপুরি-শুনবার একটা নির্দোষ কৌতূহল আছে ওর। কিন্তু মিতার মনের সেই নির্মল কৌতূহলটা বুঝতে পেরেও স্বাভাবিক হতে পারা যাচ্ছে না, ওর কথার জবাব দিতে গিয়ে দৃষ্টি ঘন হয়ে আসছে, ভারী হয়ে উঠছে নিজের গলার স্বর। নিজের এক একটা কথায় নিজেই চমকে উঠছে সে।

—পরিমল কখন ফিরবে?

—বাবা ক্লাব থেকে আসবার আগে। কিন্তু সে আটটাও বাজতে পারে, সাড়ে আটটাও বাজতে পারে।

—তা হলে আজ যাই—

উঠে দাঁড়াতে যাবে, এমন সময় মিতা অস্ফুট একটা শব্দ করল: একি, কপাল দিয়ে যে রক্ত পড়ছে তোমার!

চুলের তলায় খানিকটা কেটে গিয়েছে। হয়তো ধনেশ্বরের হাণ্টারে, নয়তো অন্য কোনো কারণে। শিরাগুলোর স্ফীত উত্তেজনায় বোধ হয় তার মুখ খুলে গিয়ে রক্ত নামছে গড়িয়ে। মিতা বললে, কী সর্বনাশ! দাঁড়াও দাঁড়াও, আইডিন দিয়ে দিচ্ছি।

—থাক, দরকার নেই।

—দরকার নেই বললেই হয়? দাঁড়াও, পাগলামি কোরোনা।—মিতা ছুটে গিয়ে আইডিনের শিশি নিয়ে এল। এগিয়ে এল কাছে, আঙুলের স্পর্শ লাগল কপালে—শরীর শিউরে উঠল রঞ্জুর। মিতার শাড়ী আর চুল থেকে একটা নেশা ধরানো গন্ধ যেন তার স্নায়ুকে অবশ করে দিলে, হৃৎপিণ্ডের ভেতর রক্তের চঞ্চল আন্দোলন কাঞ্চন নদীর ছোট ছোট ঢেউয়ের মতো কলশব্দে ভেঙে পড়তে লাগল।

আশ্চর্য শান্ত, অপরূপ করুণকণ্ঠে মিতা বললে, রঞ্জনদা?

—বলো।

—আমার বড় কষ্ট হচ্ছে!

—কেন?

—জানিনা—প্রায় নিঃশব্দ গলায় মিতা বললে: শুধু ভয়ানক কষ্ট হচ্ছে একটা। ওরা এমন নিষ্ঠুরের মতো তোমাকে মারল কেন রঞ্জনদা, কেন তোমাকে মারল?

ঘরের শান্ত আলোয় রঞ্জুর দৃষ্টির অতি কাছে মিতার চোখ অশ্রুতে টলমল করতে লাগল: তুমি জানো, আমার কী অসহ্য কষ্ট হচ্ছে? রঞ্জনদা, তুমি আসবে বলে আমি পথ চেয়ে থাকি, তুমি চলে যাওয়ার পর আমার মন এত খারাপ হয়ে যায়! সেই তোমাকে ওরা মারল! রঞ্জনদা—

মিতা কেঁদে ফেলল। চোখ বেয়ে নেমে এল, মুক্তোর কণার মতো জলের ধারা। ওর মাথাটা যেন আপনা থেকেই রঞ্জুর বুকের মধ্যে এসে পড়ল: রঞ্জনদা!

একটা সাইক্লোনের দমকায়, একটা ভয়ানক ভূমিকম্পে যেন টলমল করে উঠল পৃথিবী। সব চেয়ে পুরোনো কবিতা সব চেয়ে নতুন সুরে গান গেয়ে উঠল, হঠাৎ রঞ্জু দুহাতে পাগলের মতো মিতাকে বুকের ভেতরে চেপে ধরল। একরাশ ফুল যেন নিষ্পিষ্ট হয়ে গেল তার সর্বাঙ্গে—একরাশ ঘূর্ণি হাওয়ার মাতলামিতে সব কিছু ওলটপালট করে দিলে। চুম্বনের পর চুম্বনের ব্যাকুলতায় এতদিনের সমস্ত অসমাপ্ত কবিতা যেন সমাপ্ত হয়ে গেল, রঞ্জুর কপালের রক্ত চিহ্নটা তার প্রিয়বিনী নায়িকার ললাটে এঁকে দিলে জীবন-বন্ধনের সীমন্তরাগ। (ক্রমশঃ)

মানভূমের কথা

শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

মহাত্মা গান্ধী ২৮ বৎসর ধরিয়া ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে নূতন ভাব প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সত্য, প্রেম ও অহিংসার নীতি কি দেশ সত্যই গ্রহণ করে নাই? চারিদিকে দুর্নীতির বিকট লীলা দেখিয়া সে বিষয়ে যে মনে সন্দেহ জাগে না এমন নহে। আমরা আশাবাদী, যতই নৈরাশ্যের অন্ধকার চারিদিক ঘিরিয়া ফেলুক না কেন, আমরা তাহার মধ্য হইতে আশার আলোকের রশ্মি খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করি। তাই মন সর্ব্বদা তাহার অনুসন্ধান করিবার জন্য ব্যস্ত। যে পরিবেশের মধ্য দিয়া জীবন কাটিয়াছে, তাহাতে চোরা-কারবারীর সান্নিধ্য ত আনন্দ দান করে না। তাই সর্ব্বদা শান্ত সমাহিত ভারতীয় সংস্কৃতির প্রকৃত রূপ দেখিবার জন্য ব্যগ্র হই।

১৯২৫ সালে যে দিন মহাত্মা গান্ধী পুরুলিয়ায় গিয়াছিলেন, সে দিন প্রথম পুরুলিয়ায় যাওয়ার সৌভাগ্য আমারও হইয়াছিল। গান্ধীজির সহিত পূর্ব্ব ও উত্তর বঙ্গ ভ্রমণে সহযাত্রী হইয়াছিলাম—কাজেই তাঁহার বা তাঁহার সঙ্গীদের সহিত পরিচয়ের অভাব ছিল না। আমি একা কলিকাতা হইতে পুরুলিয়া ষ্টেশনে নামিয়া দেখিলাম ষ্টেশন লোকে লোকারণ্য—প্ল্যাটফরমের বাহিরে যাইবার উপায় নাই—গান্ধীজি অন্য পথে আসিবেন, তখনও তিনি আসিয়া পৌছেন নাই। আধ ঘণ্টার মধ্যেই গান্ধীজির দলবল লইয়া ট্রেণ ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইল। সঙ্গে তাঁর শিষ্যের দল—কৃষ্ণদাস, আচার্য্য কৃপালানী ও স্বর্গত মহাদেব দেশাই। মহাদেবের সহিত ঘনিষ্ঠতার ফলে তাহাকে বাঙ্গালা শিখিতে ও পড়িতে প্রেরণা দিয়াছিলাম। গুজরাটী অক্ষর ও বাঙ্গালা অক্ষর প্রায় একরূপ—মহাদেব অসাধারণ তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন—কাজেই তিনি ২।৪ দিনের মধ্যেই বাঙ্গালা পড়িতে শিখিয়া গেলেন। কিন্তু অভ্যাস রাখিবেন কিরূপে? তখন আমি সঙ্গে থাকিতাম, আমার নিকট বহু বই ছিল—প্রত্যহ বহু সাময়িক-পত্র আসিত—তিনি পড়িতেন। সেজন্য গান্ধীজিকে বসুমতী-সাহিত্য-মন্দিরে লইয়া যাওয়ার পলক্ষ করিয়া মহাদেবের জন্য সাহিত্য মন্দির হইতে প্রায় ৫শত টাকা মূল্যের বাংলা পুস্তক সবরমতী আশ্রমে সরাসরি পাঠাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলাম। গান্ধীজি সেবার কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট। তিনি কংগ্রেস-প্রেসিডেণ্ট হিসাবে এক বৎসরের মধ্যে সারা ভারত ভ্রমণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন—মধ্যে মধ্যে কয়দিন করিয়া আশ্রমে ফিরিয়া যাইয়া তথায় বাস করিতেন। মহাদেবকেও আশ্রমে ফিরিয়া যাইতে হইত। বই পড়িয়া মহাদেব যে খুসী হইয়াছিলেন, সেকথা উল্লেখ করাই বাহুল্য মাত্র। পুরুলিয়া ষ্টেশন প্ল্যাটফরমে মহাদেব আমাকে পাইয়া সাদরে আলিঙ্গন করিলেন—আমাকে তাঁহাদের দলেই টানিয়া লইলেন। আমিও গান্ধীজির জন্য কয়েক ঝুড়ি ফল আনিয়াছিলাম। (অবশ্য বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের স্বর্গত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাহা আমার সঙ্গে প্রেরণ করিয়াছিলেন।) মহাদেবের মারফত গান্ধীজিকে সেকথা বলায় তিনি স্বভাব-সুলভ হাস্য দ্বারা আমাকে ধন্যবাদ জানাইলেন।

সেবার আসিয়া গান্ধীজির সহিত সাহেব বাঁধের ধারে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের গৃহে উঠিয়াছিলাম। তাহার পাশের বাড়ীতে তখন স্বর্গত নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয়ের আশ্রম অবস্থিত ছিল। তাঁহার আশ্রমেই গান্ধীজির সকল সঙ্গীদের আহারের ব্যবস্থা ছিল। ৺ক্ষীরোদ-চন্দ্র রায় মহাশয় যখন দেশবন্ধু দাশের গৃহে বাস করিতেন, তখন হইতেই তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়। ক্ষীরোদবাবু দেশবন্ধুর পক্ষ হইতে আসিয়া ঐ গৃহে গান্ধীজির বাসের সকল ব্যবস্থা ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন—সে গৃহে ক্ষীরোদ-বাবুর দ্বারা ও অভ্যর্থিত হইয়াছিলাম। সে সময়ে গান্ধীজির আগমন উপলক্ষ করিয়া পুরুলিয়ায় প্রাদেশিক-কংগ্রেস-সম্মিলন হইতেছিল···সহরে সর্ব্বত্র ভিড়—কোন গৃহে স্থান নাই—সকল গৃহেই আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবদের দ্বারা পূর্ণ হইয়াছিল। বহু দূর গ্রাম হইতে গান্ধী-দর্শনের জন্য আদি-বাসীরা আসিয়া পথ, ঘাট, মাঠ পূর্ণ করিয়াছিল। সে দৃশ্য ভুলিবার নহে। গান্ধীজির জয়ধ্বনিতে সহর তখন পরিপূর্ণ—গান্ধী-কথা ছাড়া লোকের মুখে অন্য কোন কথা নাই।

নিবারণবাবু জেলা স্কুলের হেডমাষ্টার ছিলেন—সাধু-চরিত্র ও পণ্ডিত ব্যক্তি। অসহযোগের সময় সরকারী চাকরী ছাড়িয়া দিয়া কংগ্রেস আন্দোলনে যোগ দেন। তাঁহার দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া বহু কর্ম্মী সেই দলে যোগদান করেন ও তাঁহার নেতৃত্বে আন্দোলন পরিচালন করিয়াছিলেন। প্রথম পরিচয়েই তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল।

২৩ বৎসর পরে গত ৬ই নভেম্বর আবার পুরুলিয়া যাইবার সুযোগ হইয়াছিল। বন্ধুবর সংহতি-সম্পাদক শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ নিয়োগী চিরদিনই বন্ধু-বৎসল। কয়েক বৎসর পূর্ব্বেও একবার তিনি আমাকে হরিপদ সাহিত্য মন্দিরের বার্ষিক উৎসবে পুরোহিত বানাইয়া পত্রে আমার নাম ছাপাইয়াছিলেন—কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ সে সময়ে সাংসারিক বিপাকে পড়িয়া যাইতে পারি নাই। এবার বন্ধুবর পুরুলিয়া যাওয়ার কথা বলিতেই সম্মতি দিলাম—তিনি সঙ্গী হইবেন জানিয়া আনন্দ আরও অধিক হইল। ৫ই নভেম্বর শুক্রবার রাত্রির ট্রেণে তিনি ও আমি যথাসময়ে হাওড়া ষ্টেসনে আসিয়া মিলিত হইলাম। পুরুলিয়াগামী কয়েকজন পরিচিতের সহিত 'সুরেন-দা'র সাক্ষাতও মিলিল। আশ্রমবাসী দুইটি বালকও আসিতে-ছিল, আমরা তাহাদের সহযাত্রী হইয়া সুযোগ ও সুবিধা লাভ করিলাম।

সুরেনদা সঙ্গে থাকাতে ষ্টেশনে নামার পর আদর অভ্যর্থনার ত্রুটি হইল না। সঙ্গের ব্যাগ লোক দ্বারা আশ্রমে পাঠাইয়া দিয়া উভয়ে পদব্রজে আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। ট্রেণ রাত্রি ৯টায় হাওড়া যাইয়া সকাল ৬টায় পুরুলিয়া আসে—কাজেই যাত্রীদের কোন অসুবিধার কারণ নাই।

আশ্রমটি রেল-লাইনের অপর পারে, সহরের বিপরীত দিকে মাঠের উপর অবস্থিত। চমৎকার ফাঁকা জায়গা আশ্রমে গিয়া দেখিলাম—বর্ত্তমান প্রধান আশ্রমিক শ্রীযুত অতুলচন্দ্র ঘোষ মহাশয় ১০।১২ দিন রাঁচী বাসের পর পূর্ব্ব দিন আশ্রমে ফিরিয়া আসিয়াছেন। আশ্রমে তাঁহার সহধর্ম্মিণী, কনিষ্ঠা কন্যা কমলা (অবিবাহিতা), নিবারণ-বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীবিভূতিভূষণ দাশগুপ্ত, বিভূতিদার কনিষ্ঠা ভগিনী কল্যাণীয়া বাসন্তী, তাঁহার স্বামী শ্রীসুবোধ চন্দ্র রায়, তাহাদের একটি শিশুপুত্র প্রভৃতি রহিয়াছেন। সকলেই প্রায় আমার পূর্ব্বপরিচিত; সুরেনদার সহিত ঘনিষ্ঠতার ফলে সকলের সহিতই আমার ঘনিষ্ঠতা হইয়া-ছিল। গত ১৯২৫ সাল হইতে এই স্থানে আশ্রম চলিতেছে। বাড়ীটি ছিল হরিপদ সাহিত্য মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গত হরিপদ দাঁ মহাশয়ের। পুরুলিয়ার স্বনামখ্যাত কর্ম্মী দেশসেবক শ্রীযুত জিমূতবাহন সেন মহাশয় বাড়ীটি ক্রয় করিয়া আশ্রমকে দান করিয়াছেন। এই ২২।২৩ বৎসর কাল এখানে আশ্রম চলিতেছে। মধ্যে মধ্যে রাজনীতিক কারণে এই গৃহ সরকার বাজেয়াপ্ত করিয়াছিল ও পরে আবার ফিরাইয়া দিয়াছে। ১৯৪৫ সালের পর যে স্থানে স্বর্গত নেতা নিবারণবাবু শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন, তথায় একখানি বড় পাকাঘর নির্ম্মিত হইয়াছে—তাহার নাম দেওয়া হইয়াছে নিবারণ স্মৃতি—উহা আশ্রমের পূর্ব্ব প্রান্তে অবস্থিত। আশ্রম সদর ও অন্দর দুই ভাগে বিভক্ত। অন্দরে নিবারণ স্মৃতি ছাড়া দক্ষিণ-মুখী বারান্দাযুক্ত ৭।৮টি শয়ন গৃহ—সেগুলি এসবেস্টসের ছাদযুক্ত ও পূর্ব্ব-মুখী টালী-ছাওয়া পাকের ঘর, খাইবার ঘর, স্নানের ঘর প্রভৃতি আছে। বহির্ব্বাটীতেও গোশালা, কয়েকটা বাসের ঘর প্রভৃতি আছে। প্রকাণ্ড কূপ হইতে জল সরবরাহ হয়।

অতুলবাবুর কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি—তিনি ওকালতী করিতেন—গত ২৮ বৎসর কাল দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া আছেন। নিবারণবাবুর বন্ধু ও সহকর্ম্মী—উভয়ে বহুকাল একত্রে থাকিয়া কাজ করিয়াছেন। সম্প্রতিও তিনি মানভূম জেলা কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি ছিলেন—বিহারী-বাঙ্গালী বিরোধের ফলে তাঁহাকে সভাপতির পদ ত্যাগ করিতে হইয়াছে; তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র অরুণও দেশ-সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন—তিনি অবিবাহিত। পুরুলিয়া হইতে মানবাজার যাইবার পথে মাঝিহিরা নামক স্থানে তিনি বনিয়াদী শিক্ষাকেন্দ্রে বাস করেন। নিবারণ-বাবুর কনিষ্ঠপুত্র শ্রীযুত চিত্তভূষণ দাশগুপ্ত সেই কেন্দ্রের প্রধান পরিচালক। তাঁহারা প্রকৃত গ্রাম-সেবার কাজ করিতেছেন। অতুলবাবুর দ্বিতীয় পুত্র অমল এম-এস্‌সি পাশ করিয়া উচ্চশিক্ষা লাভার্থ নরওয়ে গিয়াছেন। প্রথমা কন্যা শ্রীমতী উর্ম্মিলার সহিত শ্রীযুক্তা সুচেতা কৃপালিনীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুত ধ্রুবেন মজুমদারের বিবাহ হইয়াছে—

তাঁহারা এলাহাবাদে থাকেন। দ্বিতীয়া কন্যা কমলা অবিবাহিতা—বি-এ পর্য্যন্ত পড়িয়া বনিয়াদী শিক্ষার শিক্ষকতায় অভিজ্ঞ হইয়াছেন। নিবারণবাবুর জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুত বিভূতি ভূষণ দাস গুপ্ত অবিবাহিত। মানভূম জেলা কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদক ছিলেন—অতুলবাবুর সহিত একযোগে পদত্যাগ করিয়াছেন। তিনি বর্ত্তমানে মুক্তি প্রেস ও সাপ্তাহিক সংবাদপত্র পরিচালনা করিয়া থাকেন। কনিষ্ঠ পুত্র চিত্তভূষণের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কনিষ্ঠা কন্যা বাসন্তী বর্ত্তমানে আশ্রমে আছেন—তিনি ও তাহার স্বামী সুবোধবাবু উভয়ে চাণ্ডিল ও পুরুলিয়া রেল ষ্টেশনের মধ্যবর্ত্তী নিমডী রেল ষ্টেশনের নিকট বিঘা জমীর উপর এক মহিলা আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তথায় গৃহ নির্ম্মাণ কার্য্য চলিতেছে। নিকটবর্ত্তী আরও ৭০ বিঘা জমী সংগৃহীত হইয়াছে, তথায় ছাত্র-ছাত্রীদের বাবস্থা থাকিবে। সুবোধবাবু অতুলবাবুর কনিষ্ঠ শ্যালক। আশ্রমে বিহার ব্যবস্থাপরিষদের সদস্য শ্রীযুত শ্রীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও থাকেন—তাঁহার বাড়ী ফরিদপুর জেলায় ও সেখানে তাঁহার স্ত্রীপুত্রাদি বাস করেন। আমরা যে দিন আশ্রমে গেলাম, সে দিনই তিনি চিত্তভূষণের নিকট মাঝিহীরায় চলিয়া গেলেন। মানভূম জেলাবোর্ডের চেয়ার-ম্যান শ্রীযুত বীর রাঘব আচারীও আশ্রমে বাস করেন। তিনি আসলে মাদ্রাজী হইলেও তাঁহার পরিবারবর্গ বহু বৎসর মানভূমে বাস করিতেছেন—মানভূমের প্রসিদ্ধ পঞ্চকোট রাজবংশের গুরুরা তাঁহার বংশের লোক। আচারীজী গত ২২ বৎসর আশ্রমে বাস করিতেছেন—তিনিও অবিবাহিত—বর্ত্তমান বয়স ৫১ বৎসর।

পুরুলিয়া তাহার কুষ্ঠাশ্রমের জন্য প্রসিদ্ধ—বহু বৎসর পূর্ব্বে খৃষ্টান মিশনারীরা এই পর্ব্বত ও জঙ্গলপূর্ণ স্থানে ধর্ম্ম প্রচার করিতে আসিয়া কুষ্ঠাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কুষ্ঠরোগীদিগকে এই আশ্রমে চিকিৎসার জন্য স্থান লাভ করিতে হইলে পূর্ব্বে সপরিবারে খৃষ্টানধর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইত। সে জন্য তাহার প্রতিবাদে স্থানীয় কর্ম্মীরা ১৯৩৭ সালে তথায় নব কুষ্ঠাশ্রম নাম দিয়া এক চিকিৎসা-কেন্দ্র ও আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। পুরাতন আশ্রমে বর্ত্তমানে প্রায় ৫ শত ও নূতন আশ্রমে ৭ শত রোগী চিকিৎসিত হইতেছেন। জার্ম্মাণ মিশনারীরা এই অঞ্চলে এক সময়ে বহু জনহিতকর কার্য্য করিয়াছিলেন—১৯১৪ সালের ইঙ্গ-জার্ম্মাণ যুদ্ধের সময় সকল জার্ম্মাণ ধৃত হইলে তাহাদের কাজ বন্ধ হইয়া যায়। বর্ত্তমানে ঝালদা থানার জারগো নামক স্থানে মিশনারীদের প্রতিষ্ঠিত একটি উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় আছে।

মানভূম তাহার খনিজ সম্পদের জন্য প্রসিদ্ধ। মানভূমে সুবর্ণ-রেখা নদীর ধারে এখনও তিনটি সোনার খনি আছে—তাহার একটিতে কাজ চলিতেছে। সুবর্ণময় পাথর কাটিয়া তোলা হয় ও সেই পাথর হইতে পরে সোনা পৃথক করা হইয়া থাকে। তাহা ছাড়া সুবর্ণরেখার তীরে কয়েকটি খনি হইতে শুধু পাথর কাটিয়া তোলা হয়। রাস্তা প্রস্তুতের জন্য সেই পাথরের খোয়া বিদেশে চালান দেওয়া হয়। পাথর কাটিয়া গেলাস বাটী প্রভৃতিও প্রস্তুত হইয়া থাকে। সীতানগর ও মাড়ির মধ্যে চাণ্ডিল নামক স্থানটি অতি মনোরম—তাহা সুবর্ণরেখা নদীর ধারে ও চারিদিকে পাহাড় বেষ্টিত। বহু বাঙ্গালী তথায় বাস করেন—সেখানে মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীরাও অনেক স্থান দখল করিয়া আছে। তথায় পাথরের বাসন প্রস্তুতের কারখানা আছে। মানভূম জেলার এক চতুর্থাংশ স্থান প্রায় কয়লার খনিতে পূর্ণ। টাটা কোম্পানীর প্রায় সকল কয়লার খনি মানভূম জেলায় অবস্থিত। মানভূমে যে দলমা রেঞ্জ নামক পর্ব্বত শ্রেণী আছে, তাহার গবেষকগণ তাহার মধ্যস্থ খনিজ সম্পদ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়াছেন ও সেই পর্ব্বত শ্রেণী দখল করিবার জন্য টাটা কোম্পানী উৎসুক হইয়া আছে। লাক্ষাও মানভূমের অন্যতম সম্পদ। রঘুনাথপুর ও কাশীপুর থানার মধ্যে বহু স্থানে তসর উৎপন্ন হয়। জেলার সর্ব্বত্রই এই ব্যবসা বিস্তৃত—বহু লোক এই ব্যবসা করিয়া ধনী হইয়াছেন। তাহার পর গালা শিল্প মানভূমকে সমৃদ্ধি দান করিয়াছে। বলরামপুর ও ঝালদা অঞ্চল লাক্ষা বা গালা শিল্পের কেন্দ্র—ঐ অঞ্চলে বহু গালার কারখানা আছে। তবে কচ্ছী ও আর্ম্মেনিয়ান ব্যবসায়ীরা আসিয়া সে শিল্প ও ব্যবসা দখল করিয়া আছেন।

গত ২৮ বৎসর ধরিয়া মানভূমবাসী বাঙ্গালী কংগ্রেস-নেতারা মানভূমকে নব জাগরণের মন্ত্র দিয়া শুধু রাজনীতিক দাবী সম্পর্কে সজাগ করিয়া তুলেন নাই—সর্ব্বপ্রকারে মানভূমের উন্নতি বিধানে সচেষ্ট ছিলেন। মানভূমের গ্রাম-

সমূহের অধিকাংশ লোক এক সময়ে অশিক্ষিত ছিল বলিয়া বাঙ্গালী কংগ্রেস-কর্ম্মীরা তাহাদের উন্নয়নে বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন। পূর্ব্বেই আমি অরুণ, চিত্তভূষণ, সুবোধবাবু, বাসন্তী প্রভৃতির গ্রাম-প্রীতির কথা উল্লেখ করিয়াছি। ঐরূপ বহু কর্ম্মী গ্রামে বাস করিয়া গ্রামগুলির নষ্টশ্রী পুনরুদ্ধার করিয়াছেন। আশ্রমের শ্রীযুত রেবতী চক্রবর্ত্তী মানভূমের বান্দোয়ান থানার মধ্যে গ্রামোন্নতিকর কাজ করিয়া থাকেন—ঐ থানাটি জেমসেদপুরের নিকট অবস্থিত। নিবারণবাবুর ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুত বিমলেন্দু দাশগুপ্ত চাণ্ডিলের নিকট বাগমুড়ী থানার অন্তর্গত গ্রামে কাজ করিতেছেন। এইরূপ অসংখ্য কর্ম্মীর নাম করা যায়। জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যান শ্রীযুত আচারী মহাশয় গ্রাম-সেবা দ্বারা নিজেকে এত জনপ্রিয় করিয়াছেন যে তাঁহার মত নির্ধনের পক্ষেও জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যান হওয়া সম্ভব হইয়াছে। বহু গ্রামে বহু কর্ম্মী শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া গণ-শিক্ষা প্রসারের সাহায্য করিয়াছেন। ফলে অশিক্ষিত দরিদ্র জনগণের মধ্যে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা ও সম্মান বাড়িয়া গিয়াছিল ও যে কোন আন্দোলন সাফল্যমণ্ডিত করিতে কখনও লোকাভাব হয় নাই। কলিকাতা হইতে পুরী বা কলিকাতা হইতে পশ্চিম অঞ্চলে যাইবার জন্য অহল্যাবাঈ রোড কবে প্রস্তুত করা হইয়াছিল, তাহার কোন হিসাব পাওয়া যায় না। সেই পথের একাংশ মানভূম জেলার চাষ নামক স্থানের মধ্য দিয়া হুবড়া, রঘুনাথপুর, গোবিন্দপুর প্রভৃতি স্থান অতিক্রম করিয়াছে। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য বৃন্দাবন যাত্রার সময় ঝাড়খণ্ডের জঙ্গলের মধ্য দিয়া এই পথেই গমন করিয়াছিলেন। বীরভূমের হিন্দু রাজাদের সহিত কয়েকশত বৎসর পূর্ব্বে উড়িষ্যার মুসলমান নবাবের যুদ্ধ এই মানভূমের মধ্যেই হইয়াছিল—সে স্থানের এখনও নির্দ্দেশ পাওয়া যায়। একটি পর্ব্বতচূড়া যুদ্ধ স্থান বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে।

পুরুলিয়া শিল্পাশ্রমে দুইটি ত্যাগী ও নিষ্ঠাবান দেশ-প্রেমিক পরিবার একত্র হইয়া বহু বৎসর কিরূপ শান্তিতে বাস করিতেছেন, তাহা দেখিয়া সত্যই আনন্দিত হইতে হয়। বর্ত্তমানে বাসন্তীর বিবাহের দ্বারা সে বন্ধন আরও দৃঢ় হইয়াছে। নিবারণবাবু সর্ব্বস্ব পণ করিয়া দেশের মুক্তি সংগ্রামে যখন যোগদান করেন, তাহার পূর্ব্বেই তাঁহার পত্নী-বিয়োগ হইয়াছিল। তাঁহার কন্যা ও দুই পুত্রের লালন পালনের ভার লইয়াছিলেন অতুলবাবুর সহধর্ম্মিণী। নিবারণবাবু দীর্ঘকাল দেশ সেবা দ্বারা দেশকে ধন্য করিয়া যথাসময়ে সাধনোচিত ধামে মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। শুধু আশ্রমবাসীরা সৌধ নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে নাই, পুরুলিয়া সহরের মধ্যস্থলে তাঁহার এক মর্ম্মরমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া জেলাবাসী সকলেই সর্ব্বদা তাঁহার দান ও আদর্শের কথা শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিয়া থাকে। দুই দিন আশ্রমে বাস করিবার সময় সর্ব্বদা তাঁহার ও অতুলবাবুর আদর্শের কথা স্মরণ করিয়াছি ও কর্ম্মীদিগের সর্ব্বপ্রকার স্বার্থত্যাগ দেখিয়া বর্ত্তমান স্বার্থসর্ব্বস্ব ভারতবর্ষে যে এখনও এইরূপ বহু লোক আছেন, তাহা মনে করিয়া সান্ত্বনা লাভ করিয়াছি।

হরিপদ সাহিত্য মন্দিরের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে পুরুলিয়ায় গিয়াছিলাম। রবিবার সন্ধ্যায় সে উৎসবে পৌরোহিত্য করিতে হইয়াছিল। উৎসব এখন আনন্দময় নহে—বাঙ্গালী অধিবাসীরা সকলেই তাঁহাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তান্বিত—উৎসবে সকলের মুখেই সেই সমস্যার কথা ও তাহার সমাধানের উপায় সম্বন্ধে শুনিয়া আসিয়াছিলাম। এ বিষয়ে অগ্রহায়ণের 'ভারতবর্ষে'র সাময়িকীতে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। যে সকল বাঙ্গালী বহু বৎসর ধরিয়া মানভূম জেলাকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করিয়াছিলেন, আজ তাঁহাদের বংশধরগণের পক্ষে মানভূমে নিজ সম্মান ও সংস্কৃতি রক্ষা করিয়া বাস করা প্রায় অসম্ভব হইয়াছে। পশ্চিম বঙ্গের বাঙ্গালী মাত্রেরই আজ ইহা সর্ব্বদা মনে রাখিয়া বাঙ্গলার বাহিরের বাঙ্গালা ভাষাভাষী অঞ্চলগুলিকে পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য চেষ্টিত হওয়া উচিত। দুইদিন পুরুলিয়ায় সকল বাঙ্গালীর মধ্যে এই আশঙ্কার ভাব দেখিয়া ভ্রমণের আনন্দ ত পাই নাই—বরং বিষণ্ণ চিত্তেই আমাকে ফিরিতে হইয়াছে।

ভিত্তিতেই রচিত। ভারতের বিদেশী শাসন-কর্তৃপক্ষ এখানকার কতকগুলি সহরের কিছুটা চাকচিক্য সম্পাদন করিয়াই কর্তব্য শেষ করিয়াছেন। ইহাতে বিদেশী পর্যটকদের চোখে তাঁহাদের মর্যাদা হয়তো বাড়িয়াছে, কিন্তু সত্যকার দেশ যাহাদের লইয়া, তাহারা অস্বাস্থ্য, অশিক্ষা ও ভয়াবহ দারিদ্র্যের পেষণে জীবন্মৃত হইয়া বাঁচিতে বাধ্য হইয়াছে। ভারতের গ্রামের কথা আলোচনা প্রসঙ্গে গান্ধীজী বেদনাতুর হইয়া উঠিতেন। সরকার এ বিষয়ে আগ্রহ দেখাইলে দেশবাসীও গ্রামোন্নয়নে উৎসাহ দেখাইতেন, কিন্তু সরকারী কার্যতালিকা সহর-কেন্দ্রিক হওয়ায় দেশের শিক্ষিত ও অর্থবান ব্যক্তিমাত্রেই সহর ঘেঁষা হইয়া পড়িয়াছে এবং গ্রামগুলি হইয়াছে অবহেলিত। যাহারা গ্রামবাসী অজ্ঞতা ও দারিদ্র্যের অভিশাপে তাহারা জীবন সম্বন্ধে এত হতাশ যে ভালভাবে বাঁচিবার পথ অনুসন্ধানে কোনরূপ আগ্রহ তাহারা অনুভব করে না। গ্রামে ভারতের শতকরা ৯০জন লোক বাস করে, গ্রামাঞ্চলে একদিন যে শিল্পসমৃদ্ধি ছিল, সরকার পৃষ্ঠপোষিত বিদেশী পণ্যের প্রতিযোগিতায় তাহা বিনষ্টপ্রায়। ভারতের অসংখ্য গ্রামবাসীর কৃষিই এখন একমাত্র বা প্রধান উপজীবিকা। কৃষির অবস্থাও একদিকে স্বাভাবিক নিয়ম নীতি অনুসারে এবং আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক কৃষিনীতি অনুসরণের অভাবে ক্রমেই শোচনীয় হইয়া পড়িতেছে। একদিকে আর্থিক অবস্থা খারাপ হইতেছে বলিয়া গ্রামবাসীদের মধ্যে বিবাহ বা সন্তান উৎপাদন কমিতেছে না। ভারতে প্রতি বৎসর গড়ে ৫০ লক্ষ হিসাবে লোক বাড়িতেছে। শুধু কৃষিকর্মে এখন এত লোকের অন্নসংস্থান অসম্ভব, কাজেই কৃষির উপর ক্রমবর্দ্ধমান চাপ কমাইতেই এখন ভারতে শিল্পপ্রসারের সাহায্যে কর্মসংস্থান একান্ত আবশ্যক। বলা বাহুল্য, এই শিল্পপ্রসারের প্রয়াস সহর বা সহরতলী এলাকায় বৃহদাকার যন্ত্রশিল্পের প্রসারেই সীমাবদ্ধ করিলে চলিবে না, গ্রামাঞ্চলেও শিল্পগুলিকে ছড়াইয়া দিতে হইবে। গ্রামাঞ্চলে শিল্পপ্রসারের অর্থ কুটীর শিল্পের প্রসার। ব্যাপক সমবায় আন্দোলনের সাহায্যে অকৃষি সমবায় সমিতি মারফৎই এই ব্যবস্থা করিতে হইবে। যাহারা কৃষিকার্য করিবে, পরিবারের বেকার লোকেরা সম্পূর্ণভাবে এবং তাহারা নিজেরা অবসরমত এই শিল্পে অংশ গ্রহণ করিয়া বাড়তি আয়ের সংস্থান করিবে। ইহাতে পল্লী অঞ্চলগুলি পণ্যের দিক হইতে স্বয়ংসম্পূর্ণতা হইবেই, তাছাড়া অর্থের প্রচলনগতি বৃদ্ধি পাইয়া এখানকার জীবনযাত্রার মান উন্নত হইবে। ভারতের গ্রামকে গ্রাম রাখিয়া গ্রামবাসীদের মানুষের মত বাঁচিবার অধিকার সৃষ্টি করিতে না পারিলে মহাত্মা গান্ধীর আকাঙ্ক্ষিত ভারতের স্বাধীনতার কোন মানে হয় না।

ভারতের কৃষির উন্নতির জন্য আধুনিক বৈজ্ঞানিক নীতিতে কৃষি-কর্মের প্রবর্তন করিতে হইবে। এজন্য ব্যবস্থাদি করিবার দায়িত্ব সরকারের। স্বাধীন দেশের অধিকাংশ অধিবাসীর জীবনধারণের দায়িত্ব হাতে লইয়া সরকারী কৃষিবিভাগের আগের মত শুধু ইস্তাহার বা রিপোর্ট প্রকাশ করিলেই এখন আর কর্তব্য শেষ হইবে না। কুটীর শিল্প প্রসারিত হইলে কৃষির উপর নির্ভরশীল লোকের সংখ্যা কমিয়া যাইবে এবং কৃষকেরা নূতন ধরণের কৃষিকার্য চালাইবার দায়িত্ব গ্রহণে সাহস করিবে। কুটীর শিল্প যে সম্প্রসারিত হইবে, তাহাও বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে হওয়া দরকার। জাপান বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে ব্যাপক-ভাবে কুটীর শিল্প চালাইয়া প্রচুর পণ্য উৎপাদন করে। এই হিসাবে ভারতবর্ষের জাপানকে আদর্শরূপে গ্রহণ করা উচিত। ভারতের গ্রামাঞ্চলে বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহের ব্যবস্থার উপর গ্রামবাসীদের আর্থিক ভবিষ্যৎ প্রভূত পরিমাণে নির্ভর করিতেছে। এই বৈদ্যুতিক শক্তির গুরুত্ব শুধু কুটীর শিল্প পরিচালনায় সীমাবদ্ধ নয়, কৃষিকার্যেও এই শক্তি নানা ভাবে ব্যবহৃত হইতে পারে এবং তাহাতে উৎপাদন বৃদ্ধিরও নিশ্চিত সম্ভাবনা আছে। তাছাড়া বৈদ্যুতিক শক্তির প্রসারের ফলে গ্রামের স্বাস্থ্যের অবস্থা উন্নত হইলে গ্রাম অধিকতর বাসোপযোগী হইবে। ভারতের অনেকগুলি নদ নদী সংস্কারের পরিকল্পনা কার্যকরী হইতে চলিয়াছে। আশা করা যায় ইহার ফলে গ্রামাঞ্চলে ব্যাপকভাবে বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ ব্যবস্থা ত্বরান্বিত হইবে।

ভারতের মত যে দেশে সহরে বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহের উন্নত ধরণের ব্যবস্থা নাই, সেখানে গ্রামাঞ্চলে এই ব্যবস্থা হওয়া অবশ্যই সময়-সাপেক্ষ। তবে একদিক হইতে সরকারী ও বেসরকারী চেষ্টায় একটি দীর্ঘ-মেয়াদী পরিকল্পনা অনুসারে কাজ আরম্ভ হইলে অল্পদিনেই লক্ষণীয় ফল পাওয়া যাইবে বলিয়া আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। এক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টান্ত অনুকরণীয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মোট কৃষক পরিবারের সংখ্যা ৫৮ ৬০,০০০। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে ইহাদের শতকরা মাত্র দশভাগ বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবহারের সুযোগ পাইত। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্রে গ্রামাঞ্চলে ব্যাপক বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা সম্পর্কে একটি পরিকল্পনা গৃহীত হয়। মধ্যে এত বড় যুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইতিমধ্যেই এই পরিকল্পনা অনেকটা কার্যকরী করিয়া ফেলিয়াছে এবং এখনই যুক্তরাষ্ট্রের মোট কৃষক পরিবারের শতকরা ৭৫ ভাগের জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা করা সম্ভব হইয়াছে। এই ব্যবস্থা হইয়াছে সরকার ও দেশবাসী উভয়ের সমবেত চেষ্টায়। গ্রামাঞ্চলে মোট বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থার শতকরা ৫১ ভাগ যুক্তরাষ্ট্র সরকার চালু করিয়াছেন, বাকী চালু হইয়াছে আধা-সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক। বলা নিষ্প্রয়োজন, এইভাবে বিদ্যুৎ বিতরণের ব্যবস্থা করিতে প্রথমে কিছুটা খরচ হইলেও ইহাতে সরকারের একটা স্থায়ী আয়ের ব্যবস্থা হইয়াছে। ভারতবর্ষের মত সুলভ শ্রমশিল্প ও প্রভূত কাঁচামালসম্পন্ন বিরাট দেশে এই ফলপ্রসূ পরিকল্পনা সব সময়েই সমর্থনযোগ্য। সরকার বাজারে ঋণপত্র ছাড়িয়াও যদি এই কাজে হাত দেন ভবিষ্যৎ আয়ের সম্ভাবনার হিসাবে তাহাও দেশবাসী সমর্থন করিবে। এই কাজে সরকার অগ্রণী হইলে এ দেশের বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহও সরকারকে যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারে। এখন ষ্টার্লিং পাওনার মোটামুটি একটা ব্যবস্থা হইয়াছে, যেটুকু পাওয়া যাইতেছে তাহারই একাংশে এ দেশের আর্থিক সমৃদ্ধির পক্ষে অত্যাবশ্যক বৈদ্যুৎ সরবরাহ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (যেগুলি এ দেশে উৎপন্ন হয় না) বিদেশ হইতে আমদানী হওয়া বাঞ্ছনীয়।

ভারতে বর্তমানে ২৪টি বনস্পতির কারখানা রহিয়াছে। আরও ৩৭টি নূতন কারখানা নির্মিত হইতেছে। এই শিল্পে ২৫ কোটি টাকা মূলধন নিযুক্ত আছে। ইহার বাৎসরিক উৎপাদনের পরিমাণ ১,৩২,০০০ টন। উহার মূল্য ২৫°৫৬ কোটি টাকা।

এই সব অঙ্কের অর্থ এই যে বনস্পতি-শিল্প এত বৃহদাকার ধারণ করিয়াছে যে উহা দেশের একটি বড় আপদের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। চিনির পরই বনস্পতি আজ দেশে খাদ্য প্রস্তুতের সব চেয়ে বড় কারবার। এতগুলি নূতন কারখানা নির্মিত হইতেছে দেখিয়া ইহা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, শিল্পপতিগণ এই শিল্পপ্রসারে অতি দ্রুত গতিতে অগ্রসর হইতেছেন। ১৯৫০ সালের মধ্যে বনস্পতি উৎপাদনের পরিমাণ বাড়িয়া যেন ৩,৫০,০০০ টনে ওঠে ইহাই তাহাদের লক্ষ্য। —হরিজন পত্রিকা

* * *

গত ১৭ই নভেম্বর বিহার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী হইতে জানান হইয়াছে যে—গত ৫ই, ৬ই ও ৮ই সেপ্টেম্বরের দিল্লী বৈঠকে, কংগ্রেস কার্যাকরী সমিতি এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে-কোন কংগ্রেসকর্মী সাময়িকভাবেও সরকারী চাকুরী গ্রহণ করিলে, যতদিন তিনি চাকুরীতে বহাল থাকিবেন ততদিন কোন কংগ্রেস নির্বাচনে কোন অংশ গ্রহণ করিতে পারিবেন না, বা কোন কংগ্রেস কমিটিরই সদস্য থাকিতে পারিবেন না। মন্ত্রী অথবা পার্লিয়ামেন্টারী সেক্রেটারী আইন সভার নির্বাচিত সদস্য হিসাবে যাঁহারা বেতন পান তাঁহাদের সম্বন্ধে, সরকারী উকীল, লোকাল বা জিলা বোর্ডের কর্মচারীদের সম্বন্ধে ইহা প্রযোজ্য হইবে না। সরকারী কর্মচারীগণ যাহারা এই ভাবে এখন কোন কংগ্রেস কমিটীর সদস্য বা কার্য্যকর্ত্তা আছেন স্বাভাবিক ভাবেই তাহাদের সদস্য পদ বাতিল হইয়া গেল। —মুক্তি

* * *

ভারতীয় কেন্দ্রীয় ইক্ষু-সমিতির এক সভায় খাদ্যসচিব বলিয়াছেন: ইক্ষুশিল্প প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য দেশের লোক প্রায় ৭০ কোটি টাকা রক্ষণশুল্ক হিসাবে দিয়াছে। রক্ষণশুল্কের কথা ছাড়িয়া দিলেও কোটি কোটি টাকা খরচ করা হইয়াছে এমন বিভিন্ন জাতীয় ইক্ষু উৎপাদন করিতে, যেগুলিতে চিনি-উৎপাদনের শতকরা পরিমাণ বাড়িবে এবং যেগুলি বৎসরের বিভিন্ন সময়ে পাকিয়া চিনির কলগুলিকে সারা বৎসর চালু রাখিবে। দেহপুষ্টির উপাদান হিসাবে চিনি অপেক্ষা গুড় ভাল। ইক্ষু-উৎপাদনের জন্য জলসেচের সেরা জমির উৎপাদিকা শক্তি নিঃশেষে কাজে লাগাইতে হয়—এইরূপ জমিতে ধান ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য উৎপন্ন হইতে পারে। যে বিহারে প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধান উৎপন্ন হইত, আজ ধানের পরিবর্তে ইক্ষুর চাষের প্রচলন হওয়াতে সেই বিহারকে চালানী ধানের উপর নির্ভর করিতে হইতেছে। কলের মালিকদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যই এই পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে, অথচ অর্থ ও পুষ্টির দিক থেকে জনসাধারণের ক্ষতির পরিমাণ ভয়াবহ। —হরিজন পত্রিকা

* * *

জাতির ভাগ্যনিয়ন্ত্রণের ভার বিভিন্ন প্রদেশগুলিতে কংগ্রেস মন্ত্রী-মণ্ডলের হাতে আসিবার পর তাঁহারা অনেক লোকহিতকর প্রচেষ্টা সুরু করিয়াছেন। সে সকলের মধ্যে মাদকবর্জনের আইন প্রবর্তন সব চেয়ে সাহস ও দূরদৃষ্টিপূর্ণ এবং সর্বাপেক্ষা প্রশংসার যোগ্য সৎকার্য বলা যায়। এইটিই গান্ধীজীর অতিশয় প্রিয়কার্য ছিল। গ্রামে এবং কারখানা অঞ্চলে দুর্ভাগা দরিদ্র জনসাধারণের দুঃখ ও দুর্দশার খুব বড় একটি কারণ এই নেশার অভ্যাস। তাহা দূর করিবার জন্যই এই আইনের প্রচলন।

মাদকবর্জন আইন বলবৎ করিলে জনসাধারণের নৈতিক শক্তি বাড়িবে এবং তাহাদের সাংসারিক উন্নতি হইবে। কিন্তু উপস্থিত ইহাতে রাষ্ট্রের রাজস্বসংগ্রহে মারাত্মক পরিমাণে না হইলেও বেশ কিছু অর্থাৎ কয়েক কোটি টাকা ঘাটতি হইয়াছে। গেল বারে কংগ্রেস মন্ত্রিত্বের আমলে শ্রীচক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী (এখন ভারতের মাননীয় গবর্ণর জেনারেল বাহাদুর) মাদ্রাজের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। তিনি রাজস্ব-ঘাটতির এই সংকট বিক্রয় কর প্রবর্তন করিয়া পূরণ করিয়া লইতে চাহেন। বিক্রয়-কর দ্বারা ঘাটতি অনেকখানি মিটাইয়া দেওয়া সম্ভবপর হইয়াছিল। —হরিজন পত্রিকা

* * *

এক সংবাদে প্রকাশ যে মহাত্মা গান্ধীর নির্দ্দিষ্ট পন্থায় যে সকল প্রতিষ্ঠান কাজ করিতেছে তাহাদের লইয়া অখিল ভারত সর্ব্বসেবা সংঘ নামে একটি সম্মিলিত প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছে।

জানা গিয়াছে যে সংঘের গঠনতন্ত্রের খসড়া রচনার জন্য সম্প্রতি এক অধিবেশন আহূত হয়।

ডাঃ জাকির হোসেন, অধ্যাপক জে সি কুমারাপ্পা প্রমুখ নিষ্ঠাবান সংগঠক সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। দেশের বর্তমান অবস্থায় পরস্পরবিচ্ছিন্ন গঠনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলি কেন্দ্রীভূত করা একান্ত প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে যে সমিতি গঠিত হইয়াছে, আমরা বিশ্বাস করি তাহা একনিষ্ঠ কর্মীর তত্ত্বাবধানে এবং কার্যকুশলতায় নবগঠিত এই সম্মিলিত প্রতিষ্ঠানের কর্মধারা পূর্ণগতিতে অগ্রসর হইবে। —নির্ণয়

* * *

আশ্রয়প্রার্থীসমস্যা সমাধানের জন্য কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু সামরিক প্রয়োজনে পানাগড় বেসের উদ্বাস্তুগণ যে গত তিন বৎসর ফসলের ক্ষতিপূরণ পান নাই আজ পর্যন্ত তাহার কোন সুরাহা হইল না। নিজ বাস্তু ভিটা ত্যাগ

করিয়া নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে ঘর বাঁধিয়া তাঁহারা কোন প্রকারে দিনাতিপাত করিতেছেন। এরূপ অবস্থায় তাঁহাদের সংসার যাত্রা নির্বাহের একমাত্র সম্বল ফসলের ক্ষতি পূরণ না পাওয়ায় কিরূপ দুর্গতি ভোগ হইতেছে তাহা সহজেই অনুমেয়। আশা করি জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট যথাসত্বর এদিকে দৃষ্টি দিবেন। —বর্ধমান

* * *

পাকিস্থানের বর্ত্তমান গবর্ণর জেনারাল খাজা নাজিমুদ্দীন গদীতে পাকা পোক্ত হইয়াও পূর্ব্ব পাকিস্থানের সংখ্যালঘুদিগের সম্পর্কে একেবারে "চুপ" নীতি গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি হয়তো বুঝিয়াছেন তাঁহার উপস্থিতি ও সম্মতিতেও যখন ঢাকার সংখ্যালঘুদিগের পক্ষে জন্মাষ্টমীর শোভাযাত্রা বাহির করা সম্ভব হয় নাই, তখন পূর্ব্ব পাকিস্থানের সংখ্যালঘুদিগের নিরাপত্তা, অধিকার সংরক্ষণ প্রভৃতি সম্পর্কে কোন কথা বলাই আহাম্মকী। তাই, হয়তো তিনি চুপ করিয়া রহিয়াছেন। তিনি হয়তো জানেন তাঁহাদিগের নিজেদের কৃতকর্ম্মের ফল কিছুদিন ভুগিতে হইবে। উপায় নাই। যে গুণ্ডার সাহায্যে ও আনুকূল্যে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে হইয়াছে, উদ্দেশ্য সিদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই কি তাহাদিগকে আবার সংযত করা সহজ সাধ্য? সুতরাং নিরূপায়। কাজেই এমতাবস্থায় আন্তঃডোমিনিয়ন সম্মেলনে কি ভাবে সমস্ত সমস্যার সেরা সমস্যা—এই বাস্তহারা সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হইবে তাহা তো আমাদের বুদ্ধির অগোচর। তাহা ছাড়া, পাকিস্থানের রাষ্ট্রনীতি-থার্ম্মোমিটার মিঃ লিয়াকৎ আলী তো কমনওয়েলথ সম্মেলনোপলক্ষে য়ুরোপ গিয়া স্পষ্ট ভাষায়ই ঘোষণা করিয়া আসিয়াছেন যে কাশ্মীর সমস্যার মীমাংসা না হইলে ভারত-পাকিস্থানের কোন সমস্যারই মীমাংসা হইবে না। সুতরাং এই পণ্ডশ্রম কেন? —বিশ্ববার্ত্তা

* * *

পূর্বস্থলী থানায় পর পর তিনটী ভীষণ ডাকাতির সংবাদে আমরা বিশেষ উদ্বেগ অনুভব করিতেছি। আরও দুঃখের বিষয় এই যে স্থানীয় পুলিশ কর্তৃপক্ষ জনসাধারণের ও বিপন্ন ব্যক্তিদের অভিযোগে কোনরূপ কর্ণপাত করেন না। পরন্তু স্থানবিশেষে নিরীহ গ্রামবাসীগণের অজ্ঞতার সুযোগে তাহাদিগকে অযথা হয়রানী করেন। স্বাধীন ভারতবর্ষের শান্তিরক্ষা কার্যে রত পুলিশ কর্মচারীগণের যদি এখনও জনসাধারণের সেবক হইবার প্রবৃত্তি না জাগে তাহা হইলে বিশেষ দুঃখের কথা। আমরা এ বিষয়ে মহকুমা শাসক ও জেলা শাসকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। —বর্ধমান

* * *

সাম্রাজ্যবাদের নীতি গ্রামকে অনভিজ্ঞ করিয়া রাখা, তাহা না হইলে সাম্রাজ্যবাদী শাসকের নানা অসুবিধা। সামন্ত যুগের প্রারম্ভ হইতেই এ ব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছে। গ্রামের মানুষ শিক্ষিত হইলে শহরের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষিত হইলে, আত্মসচেতন হইবে এবং বিপদের আশংকায় শহরের জন চেতনার সঙ্গে গ্রামের সংযোগ বিচ্ছেদ রাখেন। জহরলাল নেহরুর পৃথিবীর ইতিহাস গ্রন্থটি পড়িলেই এ সকল তথ্য পাওয়া যাইবে।

জাতীয় যুদ্ধে এখন জয়ী হইয়া রাজনীতিক স্বাধীনতা আমরা পাইয়াছি, কিন্তু এখনও অনেক বাকি আছে। সরকারী পরিকল্পনায় যখন আমরা দেখিব যে রাষ্ট্রের নিরাপত্তার সঙ্গে সঙ্গে পল্লীর দুঃখ-দুর্দ্দশার কথা ভাবিয়া সরকার শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সংবাদ ও মর্য্যাদার মান রাখিয়া উপার্জ্জনের পথ আমাদের খুলিয়া দিতেছেন তখন অবশ্যই জাতীয় সরকারে জনগণ বিশ্বাস স্থাপন করিবে এবং সরকার যে সাম্রাজ্যবাদীর পরিপোষক নহেন তাহাও প্রমাণিত হইবে। —সংগঠন

ফরাসী চন্দননগর হইতে ৫ জন কঁসেইজেনারেল শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দাস, শ্রীসুধাংশুশেখর দত্ত, শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীএককড়ি দত্ত ও শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত ২৮শে কার্ত্তিক প্রত্যুষে বিমান পোতে পণ্ডিচারী যাত্রা করিয়াছেন। পণ্ডিচারীতে মঁসিয়ে গুভার ও মসিয়ে সারাভান দলের মধ্য হইতে প্যারিসেও ফরাসী ইউনিয়ন গঠিত হইতেছে। তাহাতে এক জন সদস্য মনোনীত করিবার জন্য ইঁহারা আহুত হইয়াছেন এবং মসিয়ে বাঁরোর নির্দ্দেশে পণ্ডিচারীতে ২০শে নভেম্বর হইতে ১মাস যে কঁসেই জেনারেলদের অধিবেশন চলিবে, তাহাতে ইঁহারা যোগদান করিয়া বর্ত্তমান রাষ্ট্রের সর্ব্ববিধ উন্নতির প্রচেষ্টা করিবেন। নবসংঘ

বর্ধমান জেলার চাষীদের নিকট হইতে ৭৷৷০ টাকা মণ দরে ধান্য কিনিয়া সরকার সম্প্রতি বর্ধমান জেলার সীমান্তের কয়েক গজ দূরে পাণ্ডুয়ার চাউলকল সমূহকে নাকি ১০।/০ আনা মণ দরে প্রায় ৪০,০০০ চল্লিশ হাজার মণ ধান্য বিক্রয় করিয়াছেন বলিয়া আমাদের নিকট সংবাদ আসিয়াছে। ইহাও সংবাদ আসিয়াছে যে ঐ ধান্যের চাউলের একটা বড় অংশ ভাগীরথীর বক্ষ দিয়া নিশাযোগে কোথাও চালান হইতেছে। বর্ধমান জেলার সীমান্তের অনতিদূরে হুগলী জেলার গুড়াপ বাজার হইতে আমাদের সংবাদদাতা জানাইয়াছেন হুগলী জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট গুড়াপ বাজারের ব্যবসায়ীদিগকে ১২৲ বারো টাকা মণ দরে ধান্য কিনিতে নির্দ্দেশ দিয়াছেন এবং ১২৶০ আনা দরে স্থানীয় চাউলকলকে উক্ত ধান্য দিতে বলিয়াছেন। হতভাগ্য বর্ধমান জেলার ধান্য-চাষী প্রাণান্ত পরিশ্রম করিয়া বহু হায়রাণী সহ্য করিয়া সরকারী নির্ধারিত ৭৷০ টাকা মণ দর নামে হইলেও আরো চারি আনা কম দরে ধান্য বেচিতে বাধ্য হয়। আর কয়েকগজ দূরে প্রতিমণ ধান্যে সাড়ে চারি বা পৌনে পাঁচ টাকা বেশী পাওয়া যায়; ইহার ফলে ঐ সীমান্তগুলিতে চোরাবাজারের উপদ্রব ভীষণ আকারে দেখা দিয়াছে। -দামোদর

পশ্চিম বঙ্গের ন্যায় বিহার ও যুক্তপ্রদেশ প্রভৃতি প্রদেশে কংগ্রেস-

অন্যান্য প্রাদেশিক সরকার যাহারা রক্ত জল করিয়া কঠিন মাটীর বুক চিরিয়া শস্য ফলাইয়া প্রদেশের উদরান্নের সংস্থান করে সেই কৃষককে বাঁচাইবার জন্য তাঁহারা প্রথম লক্ষ্য দিয়াছেন। আমরা সম্প্রতি বিশেষভাবে বিভিন্ন প্রদেশের চাষীদের প্রধান উৎপন্ন ফসলের বর্ত্তমান দরের তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি। আমাদের প্রতিবেশী প্রদেশ বিহার, যাহার মধ্যে বাংলা ভাষাভাষী কয়েকটি জেলা রহিয়াছে এবং যাহাদের খাদ্য পশ্চিম বাংলার অধিবাসীদের খাদ্যের সহিত খাপ খায় এবং যে প্রদেশে বাংলার ন্যায় সমতল ভূমিতে শতকরা অন্ততঃ ৬০ ভাগ ধান্য জন্মে, সেখানকার ধান্য চাষী বিনা বাধায় ১৮৲ টাকা হইতে ২০৲ টাকা পর্য্যন্ত এক মণ ধান্যের এবং ২৬৲ টাকা হইতে ২৮৲ টাকা পর্যন্ত চাউলের দর পায়। বিহার প্রদেশে কোন অঞ্চলেই টাকায় দেড় সেরের বেশী চাউল পাওয়া যায় না এবং দ্বিতীয় ফসল গম ৩৮৲ টাকা হইতে ৪০৲ টাকা মণে বিক্রীত হয়। উড়িষ্যা প্রাদেশিক সরকার উক্ত প্রদেশের চাষীকে বাঁচাইবার জন্য ফসলের দর বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু পশ্চিম বাংলার প্রধান ফসল ধান্যের উৎপাদনকারী কৃষকদের এমন দুর্দ্দশা হইয়াছে যে তাহাদের ধান্য বিক্রয় করিয়া সংসার চালানো একেবারে অসম্ভব। —দামোদর

* * *

মানভূম জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যানকে—৯৪০৮ এল, এস, জি, ও ৯০১৩ এল, এস, জি নোটীশ দ্বারা জানানো হইয়াছে যে এল, এস, জি, আইনের ধারা পরিবর্ত্তন করিয়া—জেলাবোর্ডের ও লোক্যালবোর্ডের প্রস্তাব সমূহ, হিসাব নিকাশ ও খাতা পত্র হিন্দি দেবনাগরী হরফে লিখিতে হইবে। সহসা এরূপ পরিবর্ত্তনের কোন প্রকার যৌক্তিকতা নাই। জেলা বোর্ডের অধিকাংশ সভ্য ও সমস্ত কর্ম্মচারীগণ—বাংলা ভাষী। তাঁহারা কেহই হিন্দি ভাষা লিখিতে, পড়িতে ও বলিতে পারেন না। এইক্ষেত্রে জেলা বোর্ড সংক্রান্ত লিখন পঠন, হিন্দিতে পরিবর্ত্তিত করিবার—প্রয়াস বাতুলতা মাত্র। কর্ত্তৃপক্ষ—ইহা নিশ্চিত জানেন—বিহারের কতিপয় জেলায়—হিন্দি সরকারী ও আদালতের ভাষা হিসাবে প্রচলিত হইলেও সদর মানভূম বাংলা ভাষাভাষী বলিয়া এখনকার আদালতের ভাষা বাংলাই প্রচলিত হইবে। আদালতের কাজকর্ম্ম সমস্তই বাংলাই চলিতেছে—সে ক্ষেত্রে জেলাবোর্ডের কাজকর্ম্ম হিন্দিতে চালাইতে হইবে—এরূপ সংশোধন প্রস্তাব যাহারা গ্রহণ করেন, তাঁহারা সম্পূর্ণ অন্যায় ও বিদ্বেষ মূলক কার্য্য করিয়াছেন নিঃসন্দেহই বলা যাইতে পারে। অনতিবিলম্বে প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে জেলাবোর্ডের সভ্য হইতে কর্ম্মচারীবৃন্দ সকলের আমূল পরিবর্ত্তন না করিলে, হিন্দির প্রচলন করা বর্ত্তমানে অসম্ভব। কর্ত্তৃপক্ষের আজব খামখেয়াল দেখিয়া আমরা শুধু বিস্মিতই হইতেছিনা, ইহা তাঁহাদের বিকৃত মস্তিষ্কের লক্ষণ ছাড়া আর কিছুই নয়। —সংগঠন

* * *

গোবরডাঙ্গা মিউনিসিপ্যালিটীর পূর্ব প্রান্তে কঙনা হ্রদ একটী কলিকাতার একটী ব্যবহারজীবী সেটাকে আজ কয়েক বৎসর (ইজারা) আটকাইয়া রাখিয়াছেন। দেশবাসী সরকারের কাছে বহু আবেদন নিবেদন জানাইয়াছেন ; কোন ফল হয় নাই। উহারই ধারে গোবরডাঙ্গা কলেজের ছাত্রাবাস। এই প্রকাণ্ড জলাশয় কচুরিপানায় ভরা। শোনা গেল, বর্ত্তমান ইজারাদার কয়েকটী জেলে লইয়া গিয়া উহা পরিষ্কারের চাক্ষুষ চেষ্টা করিতেছেন। তাহাতে ভ্রান্ত না হইয়া গভর্ণমেণ্ট উহা এখনই অন্ততঃ সাময়িকভাবে অধিকার করুন।

সংস্কৃত হইলে উহা ঐ স্থানের অস্বাস্থ্য দূর করিবে। উহাতে শুধু প্রচুর মৎস্য উৎপন্ন হইবে না ; দেশের লোক বিশুদ্ধ পানীয় জল পাইবে, একটী সুদৃশ্য জলাশয় দেশের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিবে এবং উহার সহিত সংযুক্ত একটী মজা খালের সামান্য সংস্কার হইলে বহু চাষের জমিতে জলসেচের সুবিধা হইবে। খাদ্য, কৃষি ও মৎস্য বিভাগের মন্ত্রী মহোদয়গণ অনুগ্রহপূর্ব্বক এদিকে দৃষ্টি দিবেন, এই নিবেদন। —সংগঠনী

* * *

দেখিয়া মনে হয়, মুদ্রাস্ফীতি ও উচ্চ মূল্য রোধ করিবার জন্য আবার নিয়ন্ত্রণ প্রথা প্রবর্তনের উপক্রম হইতেছে। নিয়ন্ত্রণ-সম্পর্কে পূর্ব অভিজ্ঞতা হইতে আমরা বুঝিয়াছি যে, নিয়ন্ত্রণের ফলে লোকের নিরতিশয় নৈতিক অধঃপতন হয়।

গান্ধীজীর প্রচণ্ড চেষ্টার ফলে নিয়ন্ত্রণ রদ করা হয়। কিন্তু তাহার প্রত্যাশিত সুফল ফলে নাই। দেশের কোন অঞ্চলে বন্যা এবং অপর অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ হইয়া অন্নসমস্যা আরও জটিল হইয়াছে। বস্ত্রের ব্যাপারে ব্যাপারীরা সাধুভাবে ব্যবসা করে নাই। এজন্য আবার বস্ত্র-নিয়ন্ত্রণ করা হইয়াছে। ইহার পর সম্ভবতঃ খাদ্য-নিয়ন্ত্রণ করা হইবে। এইরূপে আমরা আবার পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া যাইব।

আমাদের (গ্রামসেবকদের) পক্ষে চাষীদের সমস্যাই হইল মূল সমস্যা। খাদ্যের নিয়ন্ত্রণ সুরু করিবার আগে, চাষীদের সমস্যা খুব গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে। নিয়ন্ত্রণ যদি অনিবার্য বলিয়াই মনে হয়, তবে এমনভাবে তাহা করিতে হইবে যে, চাষী যেন সেই ব্যাপারে সহযোগিতা করিতে পারে। —হরিজন পত্রিকা

* * *

হাভাতের সুখ বৈকুণ্ঠেও নাই। গত বৎসর আলু চাষ বীজের অভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। আলু চাষের সুবিধার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার চলতি বৎসরে আলু বীজ নিয়ন্ত্রণ করেন নাই। কিন্তু 'দেব যদি হয় বাম, সিদ্ধ নহে কোন কাম'। কোটি কোটি টাকা খরচ করিয়া আলু চাষীগণ আলু রোপণ করিয়াছিলেন। উপর্য্যুপরি সপ্তাহ-কাল বৃষ্টি পাতের ফলে আলু ও রবি শস্যের চাষ পশ্চিমবঙ্গে এবৎসরের জন্য নষ্ট হইয়া গেল। যে সমস্ত জমির আলু রোপণের পর পচিয়া গেল তাহাতে অন্য কোন ফসল চাষের সম্ভাবনা থাকিলে কৃষকদিগকে জানাইবার জন্য ও যথা-সম্ভব সাহায্যের জন্য জেলা কৃষিবিভাগ ও প্রাদেশিক কৃষি বিভাগকে অনুরোধ জানাইতেছি। —বর্দ্ধমান

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতায় বিধিবদ্ধ প্রণালীতে নার্সিং শিখাইবার ও উত্তীর্ণ ছাত্রীদিগকে ডিগ্রী দিবার একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন। এই উদ্দেশ্যে একটি কলেজ স্থাপনের কথাও চিন্তা করা হইতেছে। নিঃসন্দেহে ইহা অত্যন্ত আশা ও আনন্দের সংবাদ।

বর্ত্তমানে এই নার্সিং শিক্ষার যেরূপ যথেষ্ট প্রসার হওয়াও প্রয়োজন, ততোধিকভাবে এই বৃত্তির সামাজিক ও সরকারী স্বীকৃতি এবং এই সেবাকার্য্যে নিযুক্তা মহিলাগণের জীবনযাত্রার মান উন্নতকরণকল্পে সরকারের পক্ষ হইতে সুষ্ঠু পরিকল্পনা লইয়া অগ্রসর হওয়াও অত্যাবশ্যক। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বর্ত্তমান প্রস্তাবিত পরিকল্পনা সেই জন্যই সর্ব্বতোভাবে অভিনন্দনযোগ্য। —নির্ণয়

* * *

প্রসাধন

শিল্পী—শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

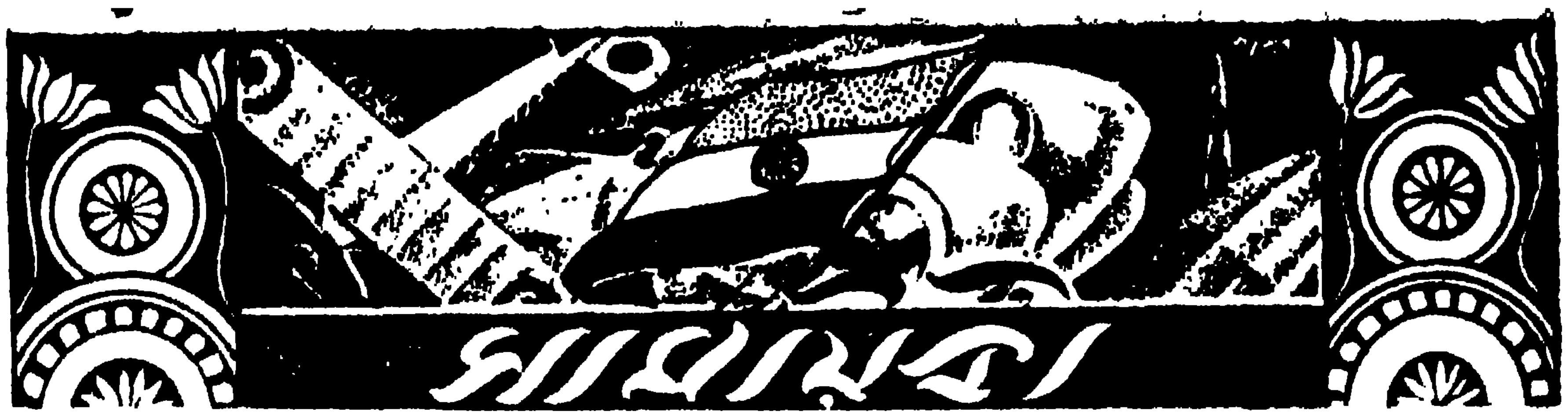

নূতন গঠনমূলক কার্য্যব্যবস্থা—

ভারত গভর্ণমেণ্টের উদ্যোগে ভারতের বিভিন্ন স্থানে কয়েকটি বিরাট গঠনমূলক কার্য্যের পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে ও তদনুসারে অনেক স্থানে কাজও আরম্ভ করা হইয়াছে। ইহা দেশবাসীর পক্ষে অবশ্যই আনন্দের ও আশার কথা। বাঙ্গালা ও বিহারে দামোদর পরিকল্পনা, উড়িষ্যায় হীরাকুণ্ড পরিকল্পনা, দক্ষিণ ভারতে তুঙ্গভদ্রা পরিকল্পনা তাহাদের অন্যতম। এই সকল ব্যবস্থা ৫ বৎসরের পূর্ব্বে শেষ হইবে না এবং এ জন্য কোটি কোটি টাকা ব্যয়িত হইবে। তাহাতে দেশে সেচের সুবন্দোবস্তের ফলে কৃষির উন্নতি হইবে, নূতন রাজপথ ও জলপথ নির্ম্মিত হইয়া যাতায়াতের সুবিধা হইবে, নূতন বড় বড় ইলেকট্রিক উৎপাদন-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়া গ্রামেও সুলভে বিজলী বিতরণের ব্যবস্থা হইবে—সঙ্গে সঙ্গে কুটীর-শিল্প ও কারখানা-শিল্প সাহায্য লাভ করিয়া আর্থিক স্বচ্ছলতা বাড়িয়া যাইবে। গত ৭ই নভেম্বর ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ত্ত, খনি ও বিদ্যুৎ বিভাগের সচিব শ্রীএন-ভি-গ্যাডগিল হীরাকুণ্ড বাঁধের নিকট মহানদীর উপর রেল সেতুর ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন। এই সেতুর দ্বারা কলিকাতার সহিত বোম্বায়ের যোগাযোগ স্থাপিত হইবে ও ব্রড গেজ রেলপথে সম্বলপুরের সহিত টাটানগরেরও সংযোগ হইবে। এই সকল নূতন পরিকল্পনা যাহাতে সত্বর কার্য্যে পরিণত হয় এবং যাহাতে এসকল কার্য্য সুসম্পন্ন হয়, সে জন্য সকল দেশবাসীর বিশেষ অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

দৈব দুর্ব্বিপাক—

গত ১০ই অগ্রহায়ণ হইতে ৪ দিন বাঙ্গালার সর্ব্বত্র অবিশ্রাম বৃষ্টির ফলে দেশ কিরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, তাহা আজ কল্পনা করাও অসম্ভব। খনার বচনে আছে—'যদি বর্ষে আঘনে' রাজা যান মাগনে; অগ্রহায়ণ মাসে বৃষ্টি হইলে রাজাকে ভিক্ষায় বাহির হইতে হয়। কয়দিন অতিবৃষ্টির ফলে বাঙ্গালার মাঠে উৎপন্ন ধান্যের অর্দ্ধেকেরও অধিক পরিমাণ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। আলুর চাষ প্রায় সমস্তই নষ্ট হইয়াছে, ডাল কলাইএর গাছ মরিয়া গিয়াছে, যে সকল গাছ বাঁচিয়া আছে সে গুলিতেও এবার পর্য্যাপ্ত ফল হইবে না। তরি তরকারীর গাছ, বিশেষ করিয়া ফুলকপি, বাঁধা কপি, মটর শুটি, বেগুন, মূলা প্রভৃতি সবই প্রায় নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এই দুঃসময়ে খাদ্যের দারুণ অভাবের মধ্যে এই দৈবদুর্ব্বিপাক মানুষকে কি অবস্থায় লইয়া যাইবে, তাহা চিন্তা করিয়া আমরা আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিতেছি। দেশের সর্ব্বত্র অর্থনৈতিক সঙ্কট দেখা দিয়াছে—তাহার ফলে দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পক্ষে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করা একেই কঠিন হইয়াছে, তাহার উপর এই অকাল বর্ষণের ফলে খাদ্যাভাব আরও বাড়িয়া গেলে বাঙ্গালা দেশে আগামী বৎসরে যে আরও কত লোক মারা যাইবে, তাহা বলা যায় না। এখনই ভারত সরকারকে চাল, আটা ও অন্যান্য খাদ্যশস্য বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হইতেছে, আগামী বৎসরে আমদানী বৃদ্ধি না হইলে অবস্থা আরও সঙ্গীন হইবে। শীতকালে তরকারী সুলভ হইলে বাঙ্গালা দেশের লোক বেশী তরকারী খায়, চাউলের ব্যবহার কম হয়। আলু অধিক উৎপন্ন হইলে ফাল্গুন হইতে ৩।৪ মাস লোক অধিক আলু ব্যবহার করিত এবার সে সকলের সম্ভাবনা চলিয়া গেল। দেশে যে পরিমাণে খাদ্যশস্য উৎপাদনের ব্যবস্থা বৃদ্ধি পাওয়া উচিত ছিল—তাহাও হইতেছে না। সে বিষয়ে গভর্ণমেণ্টেরও যেমন উপযুক্ত চেষ্টার অভাব, জনসাধারণের মধ্যেও তেমনই কোন চেষ্টা দেখা যাইতেছে না। মানুষ কৃষি-বিমুখ হওয়ার ফলেই আজ দেশে খাদ্য দ্রব্যের মূল্য এত অধিক হইয়াছে। দেশের শিক্ষিত ও ধনী লোকদিগের এ বিষয়ে মনোযোগী হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন ও মন্ত্রী শ্রীযুক্ত নিকুঞ্জবিহারী মাইতি মহাশয় নূতন সমবায় সমিতি গঠনে

উদ্যোগী হইয়াছেন দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। কিন্তু সে সকল সমিতি যেন শুধু ব্যবসাদারের কার্য্যগুলি গ্রহণ করিয়াই সন্তুষ্ট না থাকে—ঐ সকল সমিতি গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যদি কৃষির উন্নতি সাধনে যত্নবান হয়, তবেই দেশে খাদ্যশস্য অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হইতে পারে। সমবায়-প্রথা ছাড়া বর্ত্তমান অবস্থায় ব্যক্তিগত ভাবে চাষ করিয়া অধিক ফসল উৎপাদনের চেষ্টা করায় কোন ফল হইবে না।

শিয়ালদহ ষ্টেশনে পূর্ববঙ্গের বাস্তুত্যাগীর একটি দল

ফটো - শ্রীপান্না সেন

জমির ফসল বণ্টন নীতি—

পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেণ্ট বর্গাদার ও জমির মালিকের মধ্যে জমির ফসল বণ্টনের হার সম্বন্ধে গত ১৭শে নভেম্বর এক নূতন সাধারণ নীতি নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। এই নীতি অনুসারে প্রথমে জমির মোট উৎপন্ন ফসল হইতে বীজের জন্য বরাদ্দ ফসল পৃথক করিয়া রাখিতে হইবে। তৎপর অবশিষ্ট ফসল এইরূপ তিন ভাগে ভাগ করিয়া লইতে হইবে—জমির মালিক পাইবেন এক তৃতীয়াংশ, চাষী পাইবেন এক তৃতীয়াংশ, এবং অবশিষ্ট এক তৃতীয়াংশের মধ্যে ২ ভাগ চাষের বলদ ও লাঙ্গল সরবরাহকারী এবং বাকী ১ ভাগ জমির সার ও যানবাহন প্রভৃতির ব্যয়-বহনকারীর ভাগে যাইবে। প্রধান-মন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় নিজে এই ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন এবং তাঁহার বিশ্বাস ফসল এই ভাবে ভাগাভাগিতে বর্গাদার ও জমির মালিক উভয় পক্ষই সন্তুষ্ট হইবেন। আপাতঃ দৃষ্টিতে এই ব্যবস্থায় জমির মালিকের ভাগ কমিয়া যাইবে বটে, কিন্তু ইহার ফলে কৃষির প্রতি কৃষকের আগ্রহ বৃদ্ধি পাইবে এবং কৃষক অধিক ফসল উৎপন্ন করিবার জন্য চেষ্টা করিবে। বীজ, লাঙ্গল, বলদ, সার প্রভৃতির জন্য ব্যবস্থা থাকার ফলেও উৎপন্ন ফসল ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকিবে। বিষয়টি সর্ব্বত্র প্রচারের দ্বারা কৃষকদের ইহা জানানো হইলে দেশে অবশ্যই চাষ বৃদ্ধি পাইবে। শুধু ধান চাষের বেলা নহে, সকল চাষের সময়ে এই ব্যবস্থা অবলম্বিত হইলে দেশ উপকৃত হইতে পারে।

ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠন—

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যে ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠন করা হইবে সে নীতি স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু একদল নেতা বিষয়টি আপাততঃ মূলতুবী রাখার চেষ্টা করিতেছেন। তাহার ফলে প্রাদেশিকতা বৃদ্ধি পাইতেছে ও অধিবাসীদের মধ্যে তিক্ততা দারুণ আকার ধারণ করিতেছে। সম্প্রতি ভারতীয়-গণ-পরিষদের আইন সভার সভাপতি শ্রীযুত জি-ভি-মবলঙ্কর বলিয়াছেন—বিষয়টি শীঘ্র সম্পাদিত না হইলে দেশের অগ্রগতি ব্যাহত হইবে; বিশেষতঃ যখন প্রাদেশিক ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান ব্যবস্থা হইবে, তখন তৎপূর্ব্বেই প্রদেশগুলির সীমা নির্দ্ধারিত হওয়া প্রয়োজন। নূতন রাষ্ট্রপতি ডাঃ পট্টভী সীতারামিয়াও এ বিষয়ে অনুকূলে তাঁহার মত প্রকাশ করিয়া সত্বর যাহাতে ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশগুলি পুনর্গঠিত হয়, সে জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গের সহিত বিহারের যে স্থানগুলি সংযুক্ত করার প্রস্তাব করা হইয়াছে, সে সকল স্থানের প্রাদেশিক কর্ত্তৃপক্ষ এমনভাবে বাঙ্গালা-বিদ্বেষ প্রচার করিতেছেন যে, ঐ সকল স্থানে বাঙ্গালীদের পক্ষে বাস করা অসম্ভব হইয়া পড়িতেছে। অচিরে ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠিত না হইলে সিংহভূম, মানভূম, সাঁওতালপরগণা, পূর্ণিয়া, হাজারীবাগ প্রভৃতি স্থানের বাঙ্গালীদিগকে নিজ নিজ বাসস্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিতে হইবে—না হয়, সকল প্রকার আত্মসম্মান ও মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করিয়া কাঠ-কাটা ও জল-তোলার কাজ লইয়া তথায় বাস করিতে হইবে। সে জন্য আমরা এ বিষয়ে সত্বর ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হওয়ার পক্ষপাতী। প্রাদেশিকতা বৃদ্ধির ফলে পশ্চিম বাঙ্গালার অবাঙ্গালীদের প্রতি বিদ্বেষ ভাব দূর করিবার জন্যও ঐ ব্যবস্থা সত্বর সম্পাদিত হওয়া প্রয়োজন।

গোয়ালীয়রের একটি সাধারণ সভায় ভারতের সহকারী প্রধান মন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, পাশে গোয়ালীয়রের মহারাজা।

নয়া দিল্লীর লাট-প্রাসাদে গভর্ণর জেনারেল শ্রীরাজাগোপালাচারী ও অন্যান্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রী।

ধান্যচাষী সম্মেলন—

গত ২৭শে ও ২৮শে নভেম্বর বর্দ্ধমান সহরে পশ্চিমবঙ্গ ধান্যচাষী সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর সদস্য ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন এবং পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন প্রধান অতিথিরূপে তথায় উপস্থিত থাকিয়া বক্তৃতা করেন। সম্মেলনে গৃহীত একটি প্রস্তাবে—জিনিষপত্রের বর্ত্তমান দর বজায় থাকিলে মাঝারি ধরণের ধানের মণ ১০ টাকা ও উৎকৃষ্ট শ্রেণীর ধানের মণ ১২ টাকা ধার্য্য করিবার দাবী সরকারের নিকট জানান হইয়াছে। শ্রীযুত কুমারচন্দ্র জানাকে সভাপতি ও শ্রীদাশরথি তা'কে সম্পাদক করিয়া 'পশ্চিমবঙ্গ ধান্যচাষী সংঘ' নাম দিয়া একটি সংঘ গঠিত হইয়াছে। সরকার কর্ত্তৃক ধানের মণ সাড়ে ৭ টাকা ধার্য্য হওয়ার ফলে চাষের প্রতি কৃষকের আকর্ষণ কমিয়া গিয়াছে—কারণ বর্ত্তমান অবস্থায় ধান চাষ করিয়া সাড়ে ৭ টাকা মণ দরে ধান বিক্রয় করিলে কৃষককে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। সে জন্য বর্ত্তমান বৎসরে বহু কৃষক নিজ প্রয়োজনের অধিক ধান চাষ করে নাই ও অনেক জমী পতিত রহিয়াছে। সম্মেলনে কৃষকের পক্ষে প্রয়োজনীয় বহু বিষয়ে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। সেগুলি সম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেণ্ট প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করিলে দেশে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে ও সঙ্গে সঙ্গে বর্ত্তমান দারুণ খাদ্যাভাব কমিয়া যাইবে। শ্রীযুত দাশরথি তা' মহাশয়ের যত্ন ও চেষ্টায় এই সম্মেলন সাফল্য মণ্ডিত হইয়াছিল; সে জন্য তিনি বাঙ্গালী মাত্রেরই ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন।

জাতীয় রক্ষীবাহিনী—

ইংরাজের আমলে বৃটেন হইতে এ দেশে সৈন্য আমদানী করিয়া দেশ রক্ষার ব্যবস্থা করা হইত। স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে এ দেশ হইতে সকল ইংরাজ সৈন্য চলিয়া গিয়াছে। কাজেই দেশরক্ষার জন্য নূতন সৈন্যবাহিনী সত্বর প্রস্তুত করা বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। সম্প্রতি জানা গিয়াছে যে ভারতের বিভিন্ন স্থানে ৫৯টি শিক্ষাশিবিরে নূতন ৩৫ হাজার ভারতীয় জাতীয় রক্ষীবাহিনীর সৈন্যকে শিক্ষা প্রদান করা হইতেছে। শিক্ষাদান সম্পূর্ণ করিতে প্রায় ২ বৎসর সময় লাগিবে। ১৯৪৯ সালে কলেজের ছাত্রীদের মধ্য হইতে ২ হাজার মহিলাকেও যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করা হইবে। নানা কারণে বাঙ্গালী এতদিন যুদ্ধ কার্য্যে যোগদান করে নাই। বর্ত্তমানে যে সুযোগ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, প্রত্যেক বাঙ্গালী তরুণ-তরুণীর ইহা গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। সৈনিক হইয়া যাহারা কৃতিত্ব প্রদর্শন করিবেন, অর্থের দিক দিয়াও তাঁহারা জীবনে সাফল্য লাভ করিবেন। অন্য যে কোন পেশায় যে অর্থ লাভ করা যায়, সৈন্যদিগের বেতন তাহা অপেক্ষা কম নহে। শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবকগণ সৈন্য দলে যোগদান করিলে যে অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন, তাহা হায়দ্রাবাদ অভিযানে প্রমাণ হইয়াছে। আমাদের বিশ্বাস পশ্চিম বাঙ্গালায় যে জাতীয় রক্ষীবাহিনী গঠিত হইতেছে, বাঙ্গালী যুবকগণ দলে দলে তাহাতে যোগদান করিয়া বাঙ্গালী যে সমর-বিমুখ নহে, তাহা প্রমাণ করিয়া দিবেন।

সৌরাষ্ট্র ও জুনাগড় সম্পর্কীয় আলোচনায় ঐ রাষ্ট্রদ্বয়ের প্রতিনিধিদের সহিত ভারতের সহকারী প্রধান মন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল।

বঙ্গবাসী কলেজের হীরক জয়ন্তী—

গত ২৯শে নভেম্বর সোমবার সন্ধ্যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হলে ডক্টর শ্রীযুত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক সভায় কলিকাতার বঙ্গবাসী কলেজের হীরক জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ভারতের বড়লাট শ্রীচক্রবর্ত্তী রাজাগোপালাচারী ঐ উৎসবে প্রধান অতিথি হইয়া বক্তৃতা করিয়াছেন। ৬০ বৎসর পূর্ব্বে স্বর্গত গিরীশচন্দ্র বসু প্রমুখ কয়েকজন যুবকের চেষ্টায় এ দেশে উচ্চশিক্ষা প্রদানের জন্য এই কলেজ স্থাপিত হয়

এবং এই ৬০ বৎসর কোন প্রকার সরকারী সাহায্য না লইয়া এই কলেজ ধীরে ধীরে উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে। বঙ্গবাসী কলেজ আজ বাঙ্গালী মাত্রেরই গৌরবের বস্তু। স্বর্গত গিরীশচন্দ্র যে আদর্শ সম্মুখে লইয়া এই কলেজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহা সত্যই সাফল্য মণ্ডিত হইয়াছে। এই কলেজের অধ্যাপক ও ছাত্রগণের মধ্যে অনেকে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করিয়া দেশকে স্বাধীনতার পথে আগাইয়া দিয়াছিলেন—ইহাও কলেজের পক্ষে কম গৌরবের কথা নহে।

সর্দ্দার প্যাটেল—

স্বাধীন ভারতের ডেপুটী প্রধান মন্ত্রী সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেলের গত ৩১শে অক্টোবর বয়স ৭৫ বৎসর আরম্ভ হইয়াছে—সে জন্য ঐ দিন ভারতের সর্ব্বত্র দেশবাসীর পক্ষ হইতে তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করা হইয়াছে। গত ১৬ মাস ধরিয়া তিনি যে ভাবে ভারতের রাজনীতি পরিচালনা করিতেছেন, তাহা জগতের ইতিহাসে সত্যই অনন্য-সাধারণ। এই পরিণতবয়সে যুবার মত শক্তি, সাহস ও বিশ্বাস লইয়া তিনি ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলিকে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছেন। তাঁহার বুদ্ধি ও কর্ম্মকুশলতা ব্যতীত এ কার্য্য সম্ভব হইত না। দেশীয় রাজ্যগুলির অন্তর্ভুক্তির ফলে ভারতের জনসংখ্যা, আয় ও সমৃদ্ধি যে পরিমাণে বাড়িয়া গেল, তাহার সদ্ব্যবহার দ্বারা ভারতকে জগতে এক বিশিষ্ট স্থান প্রদান করা চলিবে। তাহা ছাড়া দেশরক্ষা ব্যাপারেও সর্দ্দার প্যাটেলের কৃতিত্ব কম নহে। যে ভাবে তিনি কাশ্মীর যুদ্ধ পরিচালিত করিয়া জয়ের পথে তাহাকে লইয়া আসিয়াছেন, যে ভাবে হায়দ্রাবাদে যুদ্ধ জয় করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহার তুলনা ইতিহাসে দুর্লভ। তাঁহার সহযোগিতা ও সাহায্য ব্যতীত পণ্ডিত জহরলাল নেহরুর পক্ষে ভারতের শাসন কার্য্য সুপরিচালনা করা সম্ভব হইত না। পণ্ডিত নেহরু তাঁহার উপর কার্য্যভার ন্যস্ত করিয়া নিশ্চিন্তভাবে অন্য কার্য্যে মন দিতে পারেন। বয়স অধিক হইলেই লোক যে কর্ম্মক্ষমতা হারায় না—তাহার প্রমাণ আমরা সর্দ্দারজীর জীবনে দেখিতে পাই। তাঁহার জন্মদিন উপলক্ষে আমরা তাঁহাকে সশ্রদ্ধ অভিবাদন জ্ঞাপন করি ও প্রার্থনা করি, তিনি সুদীর্ঘ কর্ম্মময় জীবন লাভ করিয়া ভারতকে দিন দিন শ্রীবৃদ্ধির পথে অগ্রসর করিয়া দিন। তিনি ভারতের স্বাধীনতা রক্ষার সুব্যবস্থা করিয়া ভারতকে স্থায়ী শান্তির পথ দেখাইয়া দিতে যেন সমর্থ হন।

দুগ্ধ-সমস্যা—

সমগ্র ভারতবর্ষে আজ দারুণ দুগ্ধ-সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে। বাঙ্গালা দেশে ৪০ বৎসর পূর্ব্বেও কলিকাতা সহরে এক টাকায় ১০ সের দুধ পাওয়া যাইত, আজ ১ টাকায় ১ সের ভাল দুধ পাওয়া কঠিন হইয়াছে। ভারতবর্ষে এক সময়ে প্রত্যেক গৃহস্থ নিজ গৃহে গরু পালন করিত—কাজেই তাহাদের দুধের জন্য বাজারে যাইতে হইত না। এখন আর সে অবস্থা নাই। সে জন্য ভারত-গভর্ণমেণ্ট এক পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা করিয়া ভারতের দুগ্ধ-সমস্যা সমাধানের চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছেন। লোক যাহাতে সমবায় প্রথায় গো-পালন করিয়া দুগ্ধ উৎপাদন-বৃদ্ধিতে মনোযোগী হয়, সে জন্য সর্ব্বত্র সরকারী কর্ম্মচারী-দিগকে অবহিত হইতে বলা হইয়াছে। যাহাতে সুলভে দুগ্ধবতী গাভী পাওয়া যায়, উপযুক্ত ভাবে গাভীর সন্তান উৎপাদন ব্যবস্থা হয়, যে সকল স্থানে অধিক দুগ্ধ উৎপন্ন হইবে তাহা সর্ব্বত্র প্রেরণের সুযোগ সুবিধা হয়—সকল বিষয়েই ব্যবস্থা করা হইবে। দুগ্ধের প্রাচুর্য্য হইলে দেশের স্বাস্থ্য ভাল হইবে, ভবিষ্যৎ বংশধরগণও শিশুকাল হইতে দুগ্ধ ব্যবহারের ফলে সুস্থ দেহ লাভ করিতে পারিবে। দুগ্ধের ব্যবসাকে উৎসাহ দান ছাড়াও প্রত্যেক গৃহস্থ যাহাতে পূর্ব্বের মত গোপালন করিয়া নিজ নিজ প্রয়োজনীয় দুগ্ধ সংগ্রহের ব্যবস্থা করে, তাহাতে উৎসাহ দান করিলে দেশের প্রকৃত উপকার করা হইবে। গো-পালন ব্যবস্থার অভাবে দেশে কৃষিরও দিন দিন অবনতি ঘটিতেছে—গৃহে গরু থাকিলে সারের অভাব হয় না, তাহার ফলে কৃষি কার্য্য প্রভৃতির বিশেষ সাহায্য হয়। দেশবাসীকে এ বিষয়ে অবহিত করিলেই দেশের সমৃদ্ধি বাড়িয়া যাইবে। গভর্ণমেণ্ট এতদিন পর্য্যন্ত যে ভাবে প্রচার কার্য্য চালাইতেন তাহার পরিবর্ত্তন সাধিত না হইলে প্রকৃত দেশবাসীরা উপকৃত হইবে না—শুধু অর্থ ব্যয়ই হইবে।

কলিকাতার নূতন শেরিফ—

কলিকাতার খ্যাতনামা কোবিদ ও ধনী শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা এম-এ, বি-এল, পিএচ্-ডি মহাশয় সম্প্রতি কলিকাতার শেরিফ নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহার পিতা রাজা ৺হৃষীকেশ লাহা এবং পিতামহ মহারাজা ৺দুর্গাচরণ

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা

লাহাও কলিকাতার শেরিফ ছিলেন। নরেন্দ্রনাথ লক্ষ্মী ও সরস্বতী উভয়েরই বরপুত্র। জ্ঞান প্রচার ও ব্যবসা-বাণিজ্য উভয় ক্ষেত্রেই নরেন্দ্রবাবুর উৎসাহ ও কর্ম্মপ্রচেষ্টা সর্ব্বজনবিদিত।

কলিকাতা কর্পোরেশন—

কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রধান কর্ম্মকর্তা শ্রীযুক্ত ভাস্কর মুখোপাধ্যায় ২০ বৎসর কাজ করার পর পদত্যাগ করায় মিঃ এ-ডি-খান আই-সি-এস ঐ পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে কর্পোরেশন গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক গৃহীত হওয়ায় শ্রী এস-এন রায় আই-সি-এস পরিচালক নিযুক্ত হইয়াছেন। এখন কর্পোরেশনে সুশাসনের অজুহাতে সিভিলিয়ানী শাসন চলিবে। আই-সি-এস ছাড়া কি বাঙ্গালা দেশে শাসন কার্য্যে অভিজ্ঞ অন্য লোক দুর্লভ হইয়াছে। পশ্চিম বঙ্গের প্রধান মন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের এই ব্যবস্থায় লোক সম্মতি দিতে পারে না। সিভিলিয়ানগণ কি তাঁহাদের মনোভাব পরিবর্ত্তন করিতে সমর্থ হইয়াছেন?

সাহিত্যিকের সম্মান—

খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও লেখক, কলিকাতা ছোট আদালতের বিচারক শ্রীযুত মতিলাল দাশ এম-এ, বি-এল সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পি এচ্-ডি উপাধি লাভ করিয়াছেন। দাশ মহাশয় বহু সাময়িক পত্রে প্রবন্ধ

শ্রীযুক্ত মতিলাল দাশ

ও বহু পুস্তক প্রকাশ করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। তাঁহার এই উপাধি লাভে সকলেই আনন্দিত হইবেন।

যানবাহানের অসুবিধা—

কলিকাতা ও সহরতলীতে জনসংখ্যা দ্বিগুণ হওয়ার ফলে ট্রাম, বাস প্রভৃতিতে যাতায়াতে মানুষকে কিরূপ কষ্ট ভোগ করিতে হইতেছে, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন, পশ্চিম বঙ্গ সরকার ষ্টেট বাস বাহির করিয়া এ সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করিতেছেন বটে, কিন্তু তাহাও পর্য্যাপ্ত নহে। সম্প্রতি আহিরীটোলা ঘাট হইতে উত্তরপাড়া পর্য্যন্ত মোটর লঞ্চে লোক যাতায়াতের ব্যবস্থা হইয়াছে দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম। গত ১৭ই নভেম্বর মন্ত্রী শ্রীভূপতি মজুমদার ও মন্ত্রী শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ ঐ যান-ব্যবস্থার উদ্বোধন করিয়াছেন। আহিরীটোলা হইতে কলিকাতা উচ্চশ্রেণীর

ভাড়া ১২ আনা ও নিম্নশ্রেণীর ভাড়া ৬ আনা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। হুগলী হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত ঐরূপ ভাবে জলপথে যাতায়াতের সুবিধা করিয়া দিলে ট্রেণ, বাস প্রভৃতির ভিড় অবশ্যই কমিয়া যাইবে। আমরা এ বিষয়ে ব্যবসায়ীদের মনোযোগ আকর্ষণ করি। জলপথে যান চলিলে গঙ্গার জল যাহাতে কমিয়া না যায় বা চড়া না পড়ে, সে বিষয়ে সকলের মনও আকৃষ্ট হইবে।

ফরেন সার্ভিসে বাঙ্গালী—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সভার সদস্য, শ্রীপূর্ণেন্দু কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ফেডারেল পাব্লিক সার্ভিস কমিশন কর্ত্তৃক মনোনীত হইয়া ইণ্ডিয়ান ফরেন সার্ভিসে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। তিনি কানাডাস্থিত ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের

শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

সেক্রেটারী হিসাবে অটোয়া যাত্রা করিবেন। তাঁহার স্ত্রী আশুতোষ কলেজের অধ্যাপিকা শ্রীমতী সোমা দেবীও তাঁহার সহিত যাইবেন। শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় দিল্লীর ইম্পিরিয়াল রেকর্ডে ভারতীয় অর্থনৈতিক ইতিহাসের গবেষক এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আইন কলেজ ও বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপক। তাঁহার অপূর্ব্ব বাগ্মিতাশক্তি বলে একাধিকবার আন্তঃ-বিশ্ববিদ্যালয় বক্তৃতা প্রতিযোগিতায় তিনি প্রথম স্থান লাভ করিয়াছেন। ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলার শ্রীপ্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র ও ডক্টর শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ভাগিনেয়।

শোক সংবাদ—

কলিকাতার খ্যাতনামা ব্যবসায়ী গৌর মোহন পাইন গত ২৭শে কার্ত্তিক ৫৭ বৎসর বয়সে তাঁহার আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটস্থ ভবনে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি উত্তর কলিকাতার দরিদ্র বান্ধব ভাণ্ডারের প্রতিষ্ঠাতা, পৃষ্ঠ-পোষক

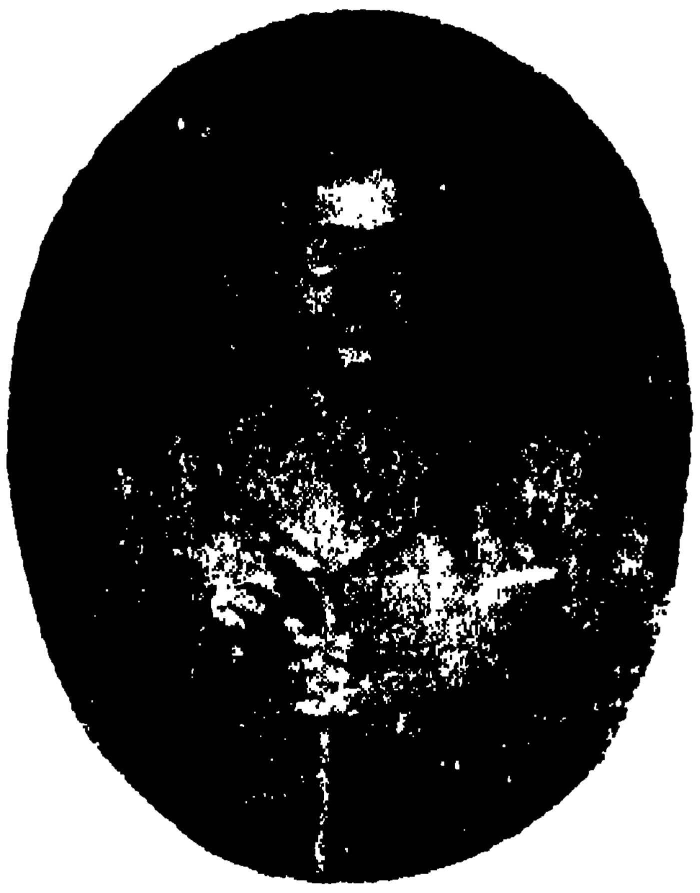

গৌরমোহন পাইন

ও সহ-সভাপতি ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন প্রভৃতিতেও তিনি বহু অর্থ দান করিতেন। তিনি অকৃতদার ও জনপ্রিয় ছিলেন। সেয়ার বাজারে কাজ করিয়া তিনি প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিতেন।

পরলোকে ধীরেন্দ্রনাথ পাল—

অধ্যাপক ধীরেন্দ্রনাথ পাল গত ১২ই নভেম্বর শুক্রবার তাঁহার বিডন রো-স্থিত বাসভবনে রক্তের চাপ বৃদ্ধিতে

ধীরেন্দ্রনাথ পাল

পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি পূর্ব্বে কলিকাতা বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যাপক ও মেট্রোপলিটন আদি

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। বিদ্যালয়ের বালিকা বিভাগটিও তাঁহার সৃষ্টি। পরে তিনি জয়পুরিয়া কলেজের সহকারী অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হন। পাঠ্যাবস্থায় তিনি অতি মেধাবী ও প্রতিভাবান ছাত্র ছিলেন এবং ম্যাট্রিকুলেশন ও আই-এ পরীক্ষায় বৃত্তি প্রাপ্ত হন এবং বঙ্গভাষা পরীক্ষায় বিশেষ পারদর্শিতার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বর্ণপদক লাভ করেন।

পণ্ডিত জহরলাল নেহরু—

গত ১৪ই নভেম্বর ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল ৫৯ বৎসর বয়সে পদার্পণ করায় সর্ব্বত্র সভা করিয়া তাঁহাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করা হইয়াছে। ১৯১৮ সাল হইতে তিনি নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর সদস্য আছেন ও দেশের মুক্তি সংগ্রামে ১৯২১ সাল হইতে ৮ বার কারাবরণ করিয়াছেন। তাঁহার জীবনী ও দেশ-সেবার পরিচয় আজ প্রত্যেক ভারতবাসী জ্ঞাত আছেন। তাঁহার নেতৃত্বে গত ১৬ মাসে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র কি ভাবে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে, তাহাও সর্ব্বজনবিদিত। তাঁহার মত অসাধারণ বুদ্ধিমান ও নিরলস কর্ম্মী ভারতে সত্যই অল্প জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। সেই জন্যই গান্ধীজি তাঁহাকে নিজ উত্তরাধিকারীরূপে ভারত রাষ্ট্র পরিচালনার ভার দিয়া গিয়াছেন। আমরা তাঁহার জন্মদিন উপলক্ষে সকল ভারতবাসীর সহিত মিলিত হইয়া প্রার্থনা জানাইতেছি যে, তাঁহার দ্বারা ভারত আবার তাহার হৃত গৌরব ফিরিয়া পাইয়া শান্তি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করুক ও বিশ্বে ভারতের উপযুক্ত স্থান নির্দ্দিষ্ট হউক।

সুদর্শন

শ্রীবিষ্ণু সরস্বতী

যুগে যুগে মানুষের মাঝে এল যারা
মানুষের দরদী বান্ধব,
তাদের সাধনা-স্রোতে করি রুদ্ধধারা,
দানবেরা নাচিছে তাণ্ডব।
বিশ্ব যাহাদের মাঝে দেবতা হেরিয়া
সর্বস্বার্থ দিয়া বিসর্জন,
প্রেম দিয়া রেখেছিল মানবে ঘেরিয়া
বারে বারে রচি বৃন্দাবন,
কে শুনে তাদের কথা অর্থ-পিপাসায়?
শুষ্ক আজি মনুষ্য হৃদয়!
মগ্ন আজি দয়ামায়া উগ্র-লালসায়।
শুধু লোভ দুর্বার দুর্জয়।
চারিদিকে শুনি শুধু সুবর্ণ বন্দনা,
চলে দৈত্য সুবর্ণের রথে,
চক্রতলে নিষ্পেষিত দরিদ্র-বেদনা,
মনুষ্যত্ব চূর্ণ প্রতি পথে।
দৈত্য-দীর্ণা ধরণীতে তবু মনে হয়
মিথ্যা নাহি হবে ভালবাসা,
আর্তিহারী দেবতার হবে অভ্যুদয়,
লুপ্ত হবে লোভ সর্বনাশা।
নৈরাশ্য-তমসাম্লান আকাশের ভালে
হেরি নব রশ্মির স্পন্দন
দুঃখ দগ্ধ মানবের চিত্ত-চক্রবালে
হেরি দর্পহারী সুদর্শন।

কলিঙ্গ বিজয়ের পরে অশোক

শিল্পী—শ্রীকমলকুমার সেন

বঙ্গব্রহ্ম কৃষ্টি-দূত

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

(উ তিন্ তু

বারো বছরেরও আগের কথা ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে শুধু এক যুগ নয়, যুগান্ত বল্লেই চলে। চাকরীর চাকায় ঘুরতে ঘুরতে ব্রহ্মদেশে পৌচেছি। পোয়ে ও প্যাগোডার দেশটা লাগছে ভাল। একদিন অফিসে এসে ঢুকলেন এক ঐ দেশীয় ভদ্রলোক। প্রশান্ত সৌম্য সপ্রাজ্ঞ চেহারা, প্রতিভাপ্রদীপ্ত নয়ন। দেখলেই মনে সম্ভ্রমের উদয় হয়। নিজের পরিচয় নিজেই দিলেন—উ তিন্-তুত। ওঁর নাম আগেই শোনা ছিল। আই-সি-এসের প্রথম বর্ম্মী সদস্য, ভারত সরকারের দপ্তরে সিমলা আর দিল্লীতে স্যার ভূপেন্দ্র-নাথ মিত্রের বিভাগে বহুদিন কর্ম্মদক্ষতার সঙ্গে রাজকার্য্য করেছেন। প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের সময় বিলাতে নাম-করা ছাত্র ছিলেন। ডালউইচ কলেজ ও কেম্ব্রিজে শিক্ষা পেয়েছেন। খেলোয়াড় হিসাবেও তাঁর নাম ছিল প্রসিদ্ধ। ডালউইচে রাগবী খেলায় তিনি প্রথম পনরো জনের একজন ছিলেন। ১৯১৩ সালে অক্সফোর্ডের বিরুদ্ধে কেম্ব্রিজ দলেরও নেতৃত্ব করেন তিনি। কেম্ব্রিজে থাকার সময় তিনি টিউক প্রবন্ধ-পুরস্কারও পান। যুদ্ধান্তে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে তিনি প্রবেশ করেন ইতিমধ্যে ব্যারিষ্টারীটাও লাভ করে নিয়েছিলেন।

তাঁর কাজ সারা হলে কিছুক্ষণ অন্য কথা হল। সেই সময় আমার টেবিলে ছিল হার্ভির ব্রহ্মদেশের ইতিহাস, থিবো মহিষী রাজ্ঞী সুপিয়ালাটের কাহিনী আর স্কট ও কনোরের "সিক্রেন্ ইষ্ট" বলে বই, লাইব্রেরী থেকে আনিয়ে পড়বার জন্য নিয়ে যাচ্ছিলাম। দেখে অত্যন্ত খুশী, বল্লেন—দেখছি আপনার ব্রহ্মদেশের ইতিহাস জানবার আগ্রহ আছে। উত্তর দিলুম—ইতিহাসের ছাত্র যে।

পাগানের আনন্দ মন্দির দেখেছি কিনা জিজ্ঞাসা করলেন, রাজা অনোরথের কাহিনীর কথা উঠলো। তখন সবে শ্রদ্ধেয় সুনীতি চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে ঐ বিষয়ে আলাপ হয়েছিল এবং আমাদের এক বন্ধু রাজার প্রার্থনা পালিভাষা হতে বাংলায় অনুবাদ করছেন। বললাম—প্রাচীন প্রার্থনা গাথাটি রসে ভাষায় ভাবে অপূর্ব্ব। ইউনাটোনোর সৌম্য গাথার মত পৃথিবীর ধর্ম্ম সাহিত্যে মনে রাখিবার মত।

কিছুদিন পরে তিনি অর্থ বিভাগের সেক্রেটারী হয়ে এলেন, ব্রহ্মদেশ তখন ভারত হতে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে গেছে। কাজের খাতিরে মাঝে মাঝে দেখা হোত—শত কাজের মধ্যেও ভারতীয় সংস্কৃতির দেশবিদেশের কৃষ্টির সম্বন্ধে খবর রাখতেন, বহু পণ্ডিত লোক, ভদ্র, অমায়িক। ঐ সময় একটি ঘটনা ঘটে। নতুন আইন হয় যে রেঙ্গুন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার ও ভাইস-চ্যান্সেলার মনোনীত না হয়ে নির্ব্বাচিত হবেন। উ-তিন-তুত গভর্ণরের কাছে অনুমতি চাইলেন যে তাঁকে ভাইস্-চ্যান্সেলারের পদের জন্য নির্ব্বাচন দ্বন্দ্বে দাঁড়াতে অনুমতি দেওয়া হোক্। শোনা যায়, গভর্ণর আদেশ দিলেন যে চ্যান্সেলারের পদের মত ভাইস্-চ্যান্সেলারের পদ যখন শুধু শোভাবর্দ্ধক নয় তখন কোন সরকারী কর্ম্মচারীর পক্ষে ঐ গুরুভার গ্রহণ নিজকার্য্যের ক্ষতিকর হতে পারে। উ-তিন-তুত পরে নাকি চ্যান্সেলার পদের জন্য পুনরায় অনুমতি চাইলেন। ঐ পদ এতদিন গভর্ণর বাহাদুর স্বয়ং অলঙ্কৃত করিতেন। বিপুল ভোটাধিক্যে উ-তিন্-তুত রেঙ্গুন ইউনিভারসিটির চ্যান্সেলার নির্ব্বাচিত হন্ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বাঙ্গীন্ উন্নতিকল্পে নিজেকে নিয়োজিত করেন। ঐ সময় হতে ব্রহ্মদেশীয় জনসাধারণ ও ছাত্র সমাজ তাঁকে অন্যতম নেতা বলে গ্রহণ করে। ব্রহ্মদেশের তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী যখন রুজভেল্ট ও চার্চ্চিলের সঙ্গে দেখা করবার জন্য গমন করেন তখন উ-তিন-তুত তার সঙ্গে যান এবং ফিরবার মুখে লিসবনে গ্রেপ্তার হন্ ও প্যালেষ্টাইনে কিছুদিন আটক্ থাকেন। পরে তিনি সম্পূর্ণভাবে নির্দ্দোষ প্রমাণিত হলে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয় ও তিনি ভারতে চলে আসেন্। ব্রহ্মদেশ তখন জাপানী কবলে। কোন বিশিষ্ট বন্ধুর মুখে শুনেছি যে সেই সময় কিছুদিন তিনি কলকাতার বউবাজারে একটি মেসে ব্রহ্মদেশীয় ছাত্রদের

সহিত অতি দীন ভাবে কাটিয়েছিলেন। ভবিষ্যৎ যখন অনিশ্চিত, স্ত্রীপুত্রের খবর যখন অজানা, অভ্যস্ত জীবনের ধারা যখন ব্যাহত, তখন তিনি কলিকাতার অখ্যাত পল্লীতে ছেঁড়া লুঙ্গী পরে ছেঁড়া মাদুরে বসে সুপণ্ডিত বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক রমাপ্রসাদ চৌধুরীর নিকট দিনের পর দিন পালিভাষায় পাঠ নিতেন্। আসল মানুষের পরিচয় ঐখানেই।

যুদ্ধাবসানে তিনি ব্রহ্মদেশে ফিরে যান্ ও কিছুদিন পরে চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন। যতদূর শোনা যায় তিনি দলনিরপেক্ষ ছিলেন। কিছুদিন পূর্ব্বে পর্য্যন্তও তিনি পররাষ্ট্র সচিব ছিলেন, পরে সামরিক বিভাগে যোগ দেন। ব্রহ্মদেশের তরফ হতে ভারতবর্ষে ও ইংলণ্ডে বহু কনফারেন্সে তিনি উপস্থিত ছিলেন। পৃথিবীর বহু চিন্তাশীল ব্যক্তির সহিত তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্ কয়েকদিন রেঙ্গুনে তাঁর গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। এইচ্ জি ওয়েলসও রেঙ্গুনে যখন নামেন্ তখন উ-তিন-তুতের সহিত বহু আলাপ আলোচনা করেছিলেন শুনেছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের বহিপরীক্ষক হিসাবেও বহু মনীষী আমন্ত্রিত হতেন।

রাজনৈতিক নেতা হিসাবে তিনি কি ছিলেন জানিনা, তাঁর মত ও পথের কথাও জানা নেই। কিন্তু ভারতীয় তথা বাংলা ও বাঙালীর সংস্কৃতি সম্বন্ধে তাঁর যথেষ্ট পরিচয় ও শ্রদ্ধা ছিল সেটুকু জানানোর জন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা। কয়েকটি উদাহরণ দিলেই যথেষ্ট হবে।

অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র যখন মারা যান তখন শরৎচন্দ্রের ছবি পুরোভাগে রেখে শোকতপ্ত প্রবাসী বাঙালীরা যে বিরাট শোভাযাত্রা করেছিলেন পদব্রজে তার নেতৃত্ব করেন উ-তিন্-তুত্। পরে একাউনটেণ্ট জেনারল্ অফিসে যে ঘরে বসে শরৎচন্দ্র কাজ করতেন সেই ঘরে যে বৃহৎ তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠা হয় তাঁরই এক-কালীন সহকর্ম্মী স্বর্গীয় কুমুদিনীকান্ত কর মহাশয়ের উদ্যোগে—তারও উদ্বোধন করেন উ-তিন-তুত। রবীন্দ্র মৃত্যুবাসরে সিটিহলে সর্ব্বসাধারণের সর্ব্বদেশবাসীর যে বিপুল জনসভা হয় তার সভাপতিত্ব করেন উ তিন তুত্। বিশ্বকবির তিরোধানে তিনি যে ভাষণ দেন তা অত্যন্ত মর্ম্মস্পর্শী হয়। সেই সময় তিনি রেঙ্গুন্ বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথের নামে ভিজিটিং অধ্যাপক্ নিয়োগ, রবীন্দ্র সাহিত্য সম্বন্ধে বক্তৃতা ও ব্রহ্মভারতীয় সংস্কৃতির আদান-প্রদানের কথায় বিশেষ উৎসাহ দেন। যতদূর মনে পড়ে বিখ্যাত আর্টক্রিটিক্ অর্দ্ধেন্দ্রকুমারের এক বিশ্বপ্রদর্শনীতেও তিনি সোৎসাহে যোগ দেন।

নিখিল ব্রহ্ম বঙ্গপ্রবাসী সাহিত্য সম্মেলনের তৃতীয় অধিবেশনে তিনি উদ্বোধন করেন ও যে বক্তৃতা দেন তারই কিয়দংশ (মডার্ণ রিভিউ ১৯৫০ ফেব্রুয়ারী) উদ্ধৃত করিতেছি—

"We are fortunate to possess in Burma a branch of the famous Bengali Academy of Literature and the special mission of the Burma Branch is to bring out the cultural affinity of Bengal and Burma and strengthen our cultural bonds through literature and arts. In particular the Burma Branch has set itself the task of promulgating Bengali literature in Burma and I trust that it will quickly take steps to translate into Burmese some of the best Bengali literature, ancient and modern. In this world of international conflict and competition, the best road to the friendship of nations lies in the mutual knowledge and appreciation of our several cultures and a nation's culture is best studied through her literature and her arts. We in Burma always have a special interest in Bengali Literature and Art—firstly because now, as always, Bengal has been a near neighbour to Burma not only geographically but also spiritually, and in the happy years my wife and I spent in India we had always felt that in spite of the superficial differences of language and dress the Bengali is in his culture and tradition very near to the Burman. We, Burmans, have

also special interest in Bengali as it is the direct lineal descendant of the Pali or Magadhi language, which is the language in which the scriptures of the Buddhist religion are recorded.

Though my acquaintance with the Bengali language is slight, I would like to add that I have enough second-hand contact with Bengali literature to be an ardent admirer of it."

এই বরেণ্য মনীষীর অকাল তিরোধানে ব্রহ্ম ভারতীয় সংস্কৃতির একটা প্রধান সূত্র ছিন্ন হল। ভারতবর্ষ যুগে যুগে বৃহত্তর ভারতে যে পূজার মন্ত্র পাঠিয়েছিল সুবর্ণ-ভূমিতে তারই একটি অম্লান ছন্দ আজও জেগে থাকুক—

পদ্মাসন্ আছে স্থির
ভগবান বুদ্ধ সেথা সমাসীন চিরদিন

মৌন যার শান্তি অন্তহার, বাণী যার করুণ সান্ত্বনার ধারা—তথাগতের সেই পুণ্যবাণীই 'তনহা'র নির্ব্বাণ করে দিকে দিকে শান্তি দিক—ওঁ শান্তি।

অলিম্পিক সন্তরণে ভারত

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস

[গত চতুর্দ্দশ বিশ্ব-অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস (অমিয়বাবু) ভারত তথা এসিয়া থেকে প্রথম আন্তর্জাতিক ওয়াটার পোলো রেফারী ও আন্তর্জাতিক ওয়াটার পোলো রেফারী বোর্ডের সভ্যরূপে যোগদান করেছিলেন। অলিম্পিকে ভারতীয় সাঁতারুদের অসাফল্যের কারণ সম্বন্ধে স্বল্প আলোচনা এখানে তিনি করেছেন। খেঃ ধুঃ সঃ]

আমরা গত অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় যোগদান ক'রেছিলাম—জয়ের আকাঙ্খা বা অহঙ্কার নিয়ে নয়, শিক্ষার্থীর মনোভাব ও বিনয় নিয়ে এবং অভিজ্ঞতা অর্জনের আশায়। আমার ধারণা সেইই হবে আমাদের উত্তরকালে জয়যাত্রার পাথেয়।

সাধারণ সন্তরণ প্রতিযোগিতার ফলাফল যা হবে তা পূর্ব্বেই ব'লে দিয়েছিল—বিশ্বের উন্নততম সময়-সূচী (world's record), তবে ওয়াটার পোলো খেলার ফলাফল ছিল—আমাদের ধারণার বাইরে।

সম্ভবতঃ ইংরাজ দলের তুলনায় আমরা তত হীনবল নই কিন্তু অন্যান্য অধিকাংশ ইউরোপীয় দলের তুলনায় আমাদের খেলার মান অনেক নিম্নে। অতুলনীয় গতি, অক্লান্ত ক্ষিপ্রতা ও অফুরন্ত দম ছাড়া তাদের ছিল বিরাট দেহ—যা আমাদের অধিকাংশ ক্ষুদ্রকায় বালকদের পক্ষে হ'য়েছিল অনমনীয়।

বল ধরা অবস্থায় আমাদের ছেলেরা প্রায়ই চুবন খেয়ে তলিয়ে যেত—জলের অতলতলে, অথচ সেইরূপ সুযোগে আমাদের ছেলেরা কদাচ তাদের বিশালকায় প্রতিপক্ষদের বাধা দিতে পারত। তাদের ক্ষিপ্র গতিবিধি প্রায়ই

আমাদের ছেলেদের পিছনে ফেলে রাখত বা কাছাকাছি যেতে দিত না, এর ফলে আমাদের বিরুদ্ধে গোলও হ'য়েছিল অনেক। হাতের তালুতে তালুতে বল খেলার দরুণ তাদের সুযোগ হ'য়েছিল—তাড়াতাড়ি বল আদান প্রদানের (passings) ও গোল দেবার অব্যর্থ লক্ষ্যের।

ওয়াটার পোলো খেলায় যদি একজন প্রতিপক্ষও পাহারা এড়িয়ে নাগালের বাহিরে চলে যায় তাহ'লে তার দম পায় গোল দেবার প্রভূত সুযোগ। এমন কি মাত্র একজন অপটু খেলোয়াড়ের জন্যও অনেক গোল হ'তে পারে। অতএব ওয়াটার পোলো খেলায় খুব বেশী গোলে হার সব সময় বিস্ময়কর নয়, বা দলের সমষ্টিগত শক্তির পরিচায়কও নয়।

আমাদের খেলোয়াড়দের মধ্যে আদানপ্রদান ও বোঝাপড়ার (understandings) অভাবও হ'য়েছিল আমাদের শোচনীয় পরাজয়ের আর একটি কারণ। উপরন্তু কখন কখন টিমে অবাঞ্ছিতরূপে খেলোয়াড় বাছাইএর ফলও ফ'লেছিল—বেশ ক'রেই—আমাদের ভাগ্যে।

যাই হোক এখন যা আমি পূর্ব্বে ব'লেছি সেই অনুসারে আমাদের দোষ-ত্রুটির বোঝা কমাতে হবে অনেকটা এবং অভাব অভিযোগও মেটাতে হবে বহু। তবেই পাব আমরা বিশ্ব-প্রতিযোগিতায় সম্মানজনক স্থান। আমাদের প্রথম কাজ হবে সারা ভারতে, সহরে সহরে, গ্রামে গ্রামে সন্তরণ সমিতির প্রতিষ্ঠান। তার পর প্রয়োজন, ব্যবহারোপযোগী সন্তরণাগার ও জলাশয়ের; যেখানে প্রথম থেকেই উপযুক্ত শিক্ষকের অধীনে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সাঁতারু, ডাইভার ও ওয়াটার-পোলো খেলোয়াড়রা শিক্ষা পেতে পারে। এ ক্ষেত্রে চাই সরকার, পৌর-প্রতিষ্ঠান, শিক্ষায়তন ও জনসাধারণের উৎসাহ, সাহায্য ও সহযোগিতা।

উৎকর্ষ সাধনের নানান নিদর্শন, যথা, দ্রুতগতি, ক্ষিপ্রতা, দম প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে সাঁতারুদের চাই নিয়মানুবর্ত্তিতা, সাধনার সহিত অনুশীলন, উপযুক্ত খাদ্য ও সুস্থ দেহ।

কর্ম্মকর্ত্তাদের নির্ব্বাচন ও অনুশীলনের প্রতিও আমাদের উপেক্ষা প্রদর্শন ক'রলে চলবে না। তাদের পরিপূর্ণতা, কর্ত্তব্যপরায়ণতা ও সাধুতা সাঁতারুদের মনে প্রভূত প্রভাব বিস্তার ক'রবে—আসল খেলোয়াড়ী চরিত্র (Sportsman spirit) গঠনে।

মনে রাখতে হবে, অন্ততঃ খেলাধূলার মধ্যে জনগত প্রাধান্য, পক্ষপাতিত্ব কিম্বা হীন চক্রান্তের স্থান নাই, একে রাখতে হবে ওসকলের অনেক উর্দ্ধে এবং এতে ক'রে গ'ড়ে উঠবে ঐক্য ও অবিশ্বাসপূর্ণ বিশ্বমাঝে আদর্শ মানব-জাতি—তার দেহের ও অন্তরের সকল সৌন্দর্য্য নিয়ে।

ভরসা রাখি

শ্রীবিভুরঞ্জন গুহ

আমি যে দেখেছি ফুল ফুটিবারে
পাষাণ বুকে।
দেখেছি প্রীতির স্নিগ্ধ আলোক
ক্লিষ্ট মুখে।
আমি যে দেখেছি, জীর্ণ ঘোড়ারে
জিতিতে বাজি
তাই তো নিরাশ হই নাকো ভাই,
ভরসা রাখি।

Jonn Masefield-এর An Epilogue কবিতার মর্ম্মানুবাদ।

চলন্তিকা

শ্রীসুধাংশুকুমার হালদার আই-সি-এস

ঈগল মরেছে শুনে কহিল জোনাকি,—
'মোর সম না হ'লেও, ছিল বড় পাখী।'

* * *

'গান্ধী'-সড়ক, নালা, 'গান্ধী' সহর,—
'মোদের কি দোষ?'—কহে মস্তক সাগর।

ওজনেতে এক নয় ঘুঘু, রাজহংস,—
কম্যুনিষ্ট তাই বলে, 'বিধাতা নৃশংস!'

খেলাধুলা

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

ক্রিকেট টেষ্ট ম্যাচ ঃ

ভারতবর্ষ ঃ ৪৫৪ ও ২২০ (৬ উইকেট

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ঃ ৩১৬

ভারতবর্ষ বনাম ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের প্রথম টেষ্ট ক্রিকেট ম্যাচ অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে।

১০ই নভেম্বর দিল্লীর উইলিংডন প্যাভিলিয়ন মাঠে বিপুল দর্শকমণ্ডলীর উপস্থিতিতে প্রথম টেষ্ট খেলা আরম্ভ হয়। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের অধিনায়ক গডার্ড টসে জয়লাভ ক'রে প্রথম ব্যাটিংয়ের সুযোগ গ্রহণ করেন। সূচনা ভাল হয়নি। ১ম, ২য় এবং ৩য় উইকেট যথাক্রমে ১১,২২ এবং ২৭ রাণে পড়ে যায়। সি ওয়ালকট এবং জি গোমেজ জুটি হয়ে খেলার মোড় ঘুরিয়ে দেন। প্রথম দিনের খেলার শেষে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের ৩ উইকেটে ২৯৪ রাণ উঠে। সি ওয়ালকট ১৫০ রাণ এবং জি গোমেজ ৯৯ রাণ ক'রে নট্ আউট থাকেন। সি রঙ্গচারী একাই ঐদিন ৩টে উইকেট ফেলেছিলেন ৬৯ রাণ দিয়ে।

১১ই নভেম্বর দ্বিতীয় দিনের খেলা আরম্ভের পাচ মিনিটের মধ্যেই ওয়ালকট ১৫২ এবং গোমেজ ১০১ রাণ করেই আউট হয়ে যান। মধ্যাহ্ন ভোজের সময় ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের ৬ উইকেটে ৪০৪ রাণ উঠে। মধ্যাহ্ন ভোজের পর ক্রিশ্চিয়ানী এবং উইক্‌সের জুটী দর্শকদের প্রচুর আনন্দ দান করে। উভয় ব্যাটসম্যানের কাটিং, পুলিং এবং ড্রাইভিং দর্শকদের আনন্দবর্দ্ধন করে এবং দ্রুত রাণ তুলতে সাহায্য করে। উইক্‌স এবং ক্রিশ্চিয়ানীর সপ্তম উইকেটের জুটিতে ১১৮ রাণ উঠলে পর উইক্‌স ১২৮ রাণ করে আউট হ'ন। চা-পানের সময় ৮ উইকেটে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের ৫৪৯ রাণ উঠে। দ্বিতীয় দিনের খেলার শেষে দেখা গেল ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের ৮ উইকেটে ৬২৩ রাণ উঠেছে। ক্রিশ্চিয়ানী ১০৩ এবং এ্যাটকিনসন ৭২ রাণ করে নট আউট থাকেন। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের সি ওয়ালকট, জি গোমেজ, ই উইক্‌স এবং আর ক্রিশ্চিয়ানী এই চার জন খেলোয়াড় শতাধিক রাণ করেন।

১২ই নভেম্বর প্রথম টেষ্ট ম্যাচ খেলার তৃতীয় দিনের ২০ মিনিট খেলার পর ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের প্রথম ইনিংস ৬৩১ রাণে শেষ হ'য়ে যায়। এই দিন সি রঙ্গচারী প্রথম চারটি বলে ২ জনকে আউট করেন। প্রথম দিনের খেলাতে তাঁর মারাত্মক বোলিংয়ে ১ রাণে ৩ জন ব্যাটসম্যান আউট হন।

বিপক্ষের এই বিপুল রাণ সংখ্যার সামনে দাঁড়িয়ে ভারতীয় দলকে প্রথম ইনিংসের খেলা আরম্ভ করতে হয়। তৃতীয় দিনের খেলার শেষে ভারতীয় দলের ৩ উইকেটে ২২৩ রাণ উঠে। কে সি ইব্রাহিম ৮৫, আর এস মোদী ৬৩ ক'রে আউট হ'ন। অমরনাথ ৫০ এবং হাজারে ১৮ রাণ ক'রে নট আউট থাকেন।

১৩ই নভেম্বর চতুর্থ দিনের খেলায় ভারতীয় দলের প্রথম ইনিংস ৪৫৪ রাণে শেষ হয়। এইচ অধিকারী ১১৪ রাণ ক'রে শেষ পর্য্যন্ত নট্ আউট থাকেন। অমরনাথ ৬২ রান করেন। 'ফলো-অন'-এর হাত থেকে অব্যাহতি লাভের সকল চেষ্টা ভারতীয় দলের ব্যর্থ হয়। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের জোন্স দলের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ৩টে উইকেট পান।

১৪ই নভেম্বর প্রথম টেষ্ট ম্যাচের পঞ্চম অর্থাৎ শেষ দিনে ভারতীয় দল 'ফলো-অন' ক'রে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে। নির্দ্দিষ্ট সময়ে দেখা গেল ভারতীয় দলের ৬ উইকেটে ২২০ রাণ উঠেছে। ফলে প্রথম টেষ্ট খেলাটি

অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়। দ্বিতীয় ইনিংসের খেলাতেও অধিকারী নট্ আউট থাকেন। চা-পানের সময় ভারতীয় দলের ৬ উইকেটে ১৬৯ রাণ উঠে। এই সময়ের খেলা দেখে দর্শকদের মনে হয়েছিল ভারতীয় দলের ভাগ্যে শেষ পর্য্যন্ত পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। ভারতীয় দলের ১০২ থেকে ১৬২ রাণের মধ্যে অর্থাৎ মাত্র ৬০ রাণের মধ্যে মোদী, অমরনাথ, ফাদকার এবং হাজারে এই পাঁচজন নাম করা ব্যাটসম্যান আউট হয়ে যান। এই পতনের মুখে অধিকারী এবং সারভাতে দৃঢ়তার সঙ্গে খেলে দলের ভাঙ্গন রক্ষা করেন। প্রকৃতপক্ষে অধিকারীর খেলার জন্যই ভারতীয় দল প্রথম টেষ্ট খেলায় পরাজয়ের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে।

খেলোয়াড় ঃ

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দল : এ রি, ষ্টেলমায়ার, জি হেডলে, সি ওয়ালকট, জি গোমেজ, জে গডার্ড (অধিনায়ক), ই উইক্‌স, আর ক্রিশ্চিয়ানী, ক্যামেরণ, এ্যাটকিন্‌সন ও পি জোন্স।

ভারতীয় দল : বিনু মানকড়, কে সি ইব্রাহিম, আর এস মোদী, লালা অমরনাথ (অধিনায়ক), ভি এস হাজারে, ডি জি ফাদকার, এইচ অধিকারী, সি টি সারভাতে, পি সেন, সি আর রঙ্গচারী এবং কে কে তারাপুর।

ভারতীয়-ওয়েষ্টইণ্ডিজ ক্রিকেট টেষ্ট ঃ

ওয়েষ্টইণ্ডিজ দলের সঙ্গে ভারতীয় দল মোট ৫টি টেষ্ট ম্যাচ খেলবে। টেষ্টম্যাচের খেলার তারিখ ও স্থানের নাম নীচে দেওয়া হ'ল।

১ম টেষ্টম্যাচ ১০—১৪ই নভেম্বর, দিল্লী (খেলার ফলাফল : ড্র)

২য় টেষ্টম্যাচ : ৯—১৩ই ডিসেম্বর, বোম্বাই

৩য় টেষ্ট ম্যাচ ৩১শে ডিসেম্বর—৫ঠা জানুয়ারী, ক'লকাতা

৪র্থ টেষ্ট ম্যাচ : ২৭—৩১শে জানুয়ারী, মাদ্রাজ

৫ম টেষ্টম্যাচ : ৩—৭ ফেব্রুয়ারী, বোম্বাই

টেষ্টখেলায় সেঞ্চুরী ঃ

ইংলণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া এবং ওয়েষ্টইণ্ডিজ দলের বিপক্ষে ভারতীয় দলের পক্ষে এপর্য্যন্ত যে সাতজন ভারতীয় খেলোয়াড় শত রাণ করেছেন তাঁদের নাম ও রাণ সংখ্যা ইংলণ্ডের বিপক্ষে :

১৯৩৩—লালা অমরনাথ : ১১৮ রাণ (বোম্বাই)

১৯৩৬—মুস্তাক আলী : ১১২ রাণ (মাঞ্চেষ্টার)

১৯৩৬—ভি এম মার্চেণ্ট : ১১৪ রাণ („)

১৯৪৬—ভি এম মার্চেণ্ট : ১২৮ (ওভাল)

অষ্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ঃ

১৯৪৮—ভিনু মানকড় : ১১৬ (মেলবোর্ণ

১৯৪৮—ডি ফাদকার : ১২৩ (এডলেড)

১৯৪৮—ভি হাজারী : ১১৬ * („)

১৯৪৮—ভি হাজারী : ১৪৫ * („)

১৯৪৮—ভি মানকড় : ১১১ (মেলবোর্ণ)

ওয়েষ্টইণ্ডিজের বিপক্ষে—এইচ আর অধিকারী : ১১৪ (দিল্লী ১ম টেষ্ট)। নটআউট।

পি বি দত্ত ঃ

তরুণ বাঙ্গালী ক্রিকেট খেলোয়াড় পি বি দত্ত ইংলণ্ড থেকে স্বদেশে ফিরে এসেছেন। ১৯৪৭ সালে তিনি 'কেম্ব্রিজ ব্লু' সম্মান লাভ করেন। ভারতীয় ক্রিকেট খেলোয়াড়দের মধ্যে যাঁরা 'কেম্ব্রিজ ব্লু' পেয়েছেন তাঁদের মধ্যে তিনি চতুর্থ ব্যক্তি। ইতিপূর্ব্বে যাঁরা কেম্ব্রিজব্লুতে সম্মানিত হয়েছিলেন তাঁদের নাম রঞ্জি, দিলীপ সিং এবং জাহাঙ্গীর খাঁ।

ডন্ ব্র্যাড্‌ম্যানের অবসর গ্রহণ ঃ

ক্রিকেট জগতের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক অষ্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট খেলোয়াড় ডন্ ব্র্যাডম্যান প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলা থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন। তাঁর এই অবসর গ্রহণ উপলক্ষে মেলবোর্ণে ডন্ ব্র্যাডম্যান একাদশ বনাম হ্যাসেট একাদশের একটি বিশেষ প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলা হয়েছিল।

খেলাটি এক নাটকীয় পরিসমাপ্তির মধ্যে 'ড্র' গেছে। উভয় পক্ষেই সমান রাণসংখ্যা দাঁড়িয়েছিল। সুদীর্ঘ ক্রিকেট খেলোয়াড় জীবনে ব্র্যাডম্যান প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলায় ৪৩৬ ইনিংস খেলেছিলেন এবং ৪৩ বার নট আউট

ছিলেন। প্রথম শ্রেণীর খেলায় তিনি ২৭,৯৮৪ রাণ করেছিলেন—রাণসংখ্যার গড়পড়তায় ৯৫৫ রাণ। ১১৭টি সেঞ্চুরীর মধ্যে ৩৭টি ডবল সেঞ্চুরী করেন।

রেফারিং ঃ

রেফারীং একেবারে ত্রুটিশূন্য হতে পারে না ; কারণ মানুষ মাত্রেই ভুলের দাস। ইংলণ্ডে, যে দেশে ফুটবল খেলার জন্ম, সে দেশেও হয় না। কিন্তু রেফারির বার বার মারাত্মক ত্রুটি এবং তার জন্য একপক্ষের ক্ষতি, এই শ্রেণীর অযোগ্য রেফারীকে খেলা পরিচালনা থেকে বাদ না দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ খেলায় পুনরায় বহাল করা, রেফারী এসোসিয়েশনের বহুদিনের অভ্যাস। বৈদেশিক শাসন আমলে কড়া পুলিশী শাসন ব্যবস্থা ছিল, সেই কারণে পুলিসের ভয়ে জনসাধারণ কিছু করতে পারতো না, ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটলে দর্শকরা মাঠের মধ্যে বিক্ষোভ করতো, বড় জোর জুতোটা ছুড়তো। লীগ-শাসন আমলে স্বায়ত্তশাসনের সুযোগ নিয়ে কোন সম্প্রদায়পুষ্ট ক্লাবের একদল সমর্থকেরা বিধর্ম্মী রেফারীকে প্রহার করেছে, এই বিক্ষোভের মূলে রেফারীর ত্রুটির কারণ অপেক্ষা দলের প্রতি গোঁড়ামির কারণ বেশী থাকতো। ভুল দু'রকম আছে, এক অসাবধানতাবশতঃ, প্রকৃত অবস্থা রেফারীর চোখে না পড়ার জন্য। এই ধরণের ভুলত্রুটি অনিচ্ছাকৃত সুতরাং খুব নিন্দনীয় নয়। কিন্তু রেফারীর এমন সমস্ত বিচার চোখে পড়ে যা রেফারীর দুরভিসন্ধিমূলক অথবা আইন সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতা হেতু বলে ধরা যায়। এই শেষোক্ত শ্রেণীর রেফারীর বিচার নিন্দনীয় এবং কঠোর সমালোচনার যোগ্য। অনেক সময় বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ মহল থেকে জনসাধারণকে এইরূপ উপদেশ বিতরণ করা হয়, কোন অন্যায়ের প্রতিবাদ নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে পেশ করা উচিত ; এ কথা খুবই যুক্তিপূর্ণ হবে তখনই, যখন প্রতিবাদের প্রতিকার ব্যবস্থা থাকে এবং কর্তৃপক্ষ সচেতন থাকেন। কিন্তু যখন দেখা যায়, নিয়মতান্ত্রিকভাবে অন্যায়ের প্রতিবাদ করেও কোন ফল হয়না — বরং অন্যায়ের পুনরাবৃত্তিই ঘটছে, তখন জনসাধারণের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটা অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। আমাদের দেশে চারিদিক থেকে আজ যে বিক্ষোভ দেখা দিচ্ছে তার মূলে আছে জনসাধারণ কর্তৃক অভিযুক্ত প্রতিবাদ দূরীকরণে কর্তৃপক্ষের অক্ষমতা ও সদিচ্ছার একান্ত অভাব। আমাদের দেশে যদি প্রথম শ্রেণীর রেফারী তৈরীর কোন সম্ভাবনাই আজ না থাকে তাহলে অন্ততঃ খেলার সময় গোলের পিছনে রেফারীর পদমর্য্যাদাসম্পন্ন লোক রেখে, যে সব জটিল আইনের বিচার দিতে রেফারীরা অক্ষম হ'ন সেগুলির বিচার দিতে রেফারীকে সহযোগিতা করা যায়, যে পর্য্যন্ত রেফারীর বিচারের ষ্ট্যাণ্ডার্ড উন্নত না হচ্ছে। রেফারীরা পরীক্ষায় পাশ করার পর প্রথম শ্রেণীর খেলা পরিচালনা করতে নামেন, কিন্তু তাঁদের খেলা পরিচালনার মান নির্ণয়ের জন্য ক্যালকাটা রেফারী এসোসিয়েশনের কর্তৃপক্ষ কোন গঠনমূলক ব্যবস্থা করেছেন কিনা জানি না, অন্ততঃ আমাদের চোখে পড়ে না। রেফারী এসোসিয়েশনের উচিত, গোল-পোষ্টের নেটের পিছনে এবং খেলার থ্রো-ইন লাইনের পাশে উপযুক্ত পরিমাণ লোক রাখা। দুই গোল-পোষ্টের মধ্যস্থ গোল-লাইন অতিক্রম ক'রে বলটি পুনরায় মাঠে ফিরে আসা, গোল-লাইন অতিক্রম করার পর ভিতর থেকে বলটি বের করা, গোলের মুখে ফাউল, হ্যাণ্ডবল এবং অফসাইড প্রভৃতি সম্পর্কে রেফারী কি ধরণের বিচার দিচ্ছেন তা লক্ষ্য করা এবং খেলার পর রেফারীকে ভুল সম্বন্ধে জানানো এসোসিয়েশনের খুবই উচিত। এইরূপ ব্যবস্থায় রেফারী নিজের ভুল জানতে পারবেন এবং সতর্ক থাকবেন। অফসাইড আইনটি খুবই জটিল এবং দ্রুত খেলার দরুণ অনেক সময় রেফারীরা প্রকৃত অবস্থা অনুধাবন করতে না পেরে ভুল বিচার দিয়ে বসেন। রেফারী এসোসিয়েশন নিয়মিত সরকারীভাবে তদন্ত রাখার ব্যবস্থা করলে ভুল-ভ্রান্তি প্রতিরোধের জন্য এসোসিয়েশনের সাধু প্রচেষ্টাকে বিক্ষোভ দ্বারা অবমাননা করতে জনসাধারণ কখনও উৎসাহবোধ করবে না।

সখের ও পেশাদার খেলা ঃ

অজ্ঞতা দূরীকরণের জন্য বিদ্যাদান করার মত মহৎ কাজ আর নেই এবং এই কাজের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ প্রথা নিন্দনীয় নয় এবং সম্মানজনক। চিকিৎসার দ্বারা মানুষের প্রাণদান করা স্বাধীন এবং সম্মানজনক শ্রম হিসাবে বহুদিন থেকেই সুসভ্য দেশে প্রচলিত আছে, আমাদের দেশেও আছে। কিন্তু আমাদের দেশে ক্রীড়াক্ষেত্রে ফুটবল খেলাকে পেশাদারী হিসাবে গ্রহণ করতে এত বাধা কেন? আত্মসম্মান হানির দুর্ভাবনার জন্যই কি কর্তৃপক্ষমহলের এত আইনের কঠোরতা? কিন্তু এদিকে খেলোয়াড়দের জীবিকা সংগ্রহের দুর্ভাবনা কম নয় এবং সে দুর্ভাবনায় প্রপীড়িত হয়ে খেলার অনুশীলনের সময় এবং মনের সুস্থ অবস্থা তাদের কোথায়? কেবলমাত্র সংবাদপত্রে ছবি, খেলার মাঠে হাততালি এবং নামের মোহ বেশীদিন খেলোয়াড়দের খেলাধূলায় আকৃষ্ট ক'রে রাখতে পারে না। আমাদের দেশে যেখানে আর্ত্তসেবায় চিকিৎসক, অজ্ঞতা দূরীকরণে শিক্ষক, সাহিত্য সৃজনে লেখক, ন্যায়বিচারদানে বিচারক—প্রভৃতিরা বিবিধ কার্য্যে উপযুক্ত পারিশ্রমিক গ্রহণ ক'রে থাকেন এবং সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন সেক্ষেত্রে ফুটবল খেলোয়াড়রা শ্রমের মূল্য থেকে বঞ্চিত হবেন কেন? দৈহিক শক্তি এবং ক্রীড়ানৈপুণ্যে দেশের জনসাধারণকে নির্দ্দোষ আমোদ বিতরণ করা এবং স্বাস্থ্য রক্ষা দ্বারা জাতির মেরুদণ্ড দৃঢ় রাখতে লোককে

অনুপ্রাণিত করার জন্য পারিশ্রমিক পাওয়ার কি কোন অধিকার ফুটবল খেলোয়াড়দের থাকতে পারে না! ফুটবল ইংলণ্ডের জাতীয় খেলা। আমরা ইংলণ্ডের খেলার নিয়মানুসারে ফুটবল খেলা পরিচালনা করি এবং আমাদের দেশের আই-এফ-এ এবং এ-আই-এফ-এ ফুটবল নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠান হিসাবে ইংলণ্ডের ফুটবল এসোসিয়েশনের অনুমোদন লাভ ক'রে আন্তর্জাতিক পদমর্য্যাদায় সম্মানিত হয়েছে। এদেশীয় ফুটবল খেলায় কৃতিত্বের পরিচয় প্রদর্শনের জন্য আমরা ৬০ বৎসরের উপর ফুটবল খেলার চর্চ্চা করেছি। কিন্তু ইংলণ্ডের ফুটবল খেলার গঠনমূলক কর্ম্মপদ্ধতি অনুসরণ করিনি, যা করলে সত্যই ফুটবল খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ড উন্নত করা যেত। সেখানের গঠনমূলক কর্ম্মপদ্ধতির মধ্যে খেলায় পেশাদারী প্রথা প্রবর্ত্তন অন্যতম ঘটনা। সেখানে সখের ও পেশাদারী খেলা ফুটবল খেলার জগতে মর্য্যাদা অক্ষুন্ন রেখেছে। সখের খেলোয়াড়রা পেশাদার খেলোয়াড় হিসাবে অর্থ এবং সম্মান লাভের উদ্দেশ্যে সখের খেলোয়াড় জীবনে অধ্যবসায় সহকারে খেলার উৎকর্ষ সাধনে মন দেয়। পেশাদার খেলোয়াড়রাও পেশাদার পদমর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য এবং অর্থ-নৈতিক উন্নতির জন্য খেলাকে জীবনধারণের অবলম্বন হিসাবে গ্রহণ করে; তারা সেই কারণে ফুটবল খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ডকে উপেক্ষা করতে পারে না, জীবিকা হারাবার আশঙ্কায়। ফলে যে সমস্ত খেলায় পেশাদারী প্রথার প্রচলন আছে অর্থাৎ খেলোয়াড়রা খেলাকে বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করেছে তাদের ষ্ট্যাণ্ডার্ডের একটা সমতা দীর্ঘকাল ধরে বজায় রাখা সম্ভব হয়েছে। পেশাদারী খেলার প্রবর্ত্তনের বিরুদ্ধে আমাদের দেশে কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখানো হয়নি; কায়েমী স্বার্থই এই প্রথার প্রস্তাবকে কর্ত্তৃপক্ষমহলে তুলতে দেয়নি। পেশাদারী প্রথা চালু হ'লে ফুটবল ক্লাবগুলিকে টিকিট বিক্রীর মোটা অংশ তাদের ক্লাবের খেলোয়াড় প্রতিপালনের জন্য দিতে হবে, সুতরাং এই প্রথার বিরুদ্ধে কোন্ কোন্ প্রতিষ্ঠানের সক্রিয় অংশ রয়েছে আশা করি জনসাধারণ বুঝতে পেরেছেন। আমাদের দেশের ফুটবল খেলোয়াড়রা তাঁদের শ্রম দিয়ে ফুটবল মাঠের একচেটিয়া ঠিকেদারদের আজ পর্য্যন্ত কি পরিমাণ টাকা তুলে দিয়েছেন তার যথার্থ হিসাবপত্র না থাকলেও টাকার অঙ্ক যে মোটা তা নিঃসন্দেহে বলা চলে। এক চ্যারিটি ম্যাচের কথা ধরা যাক। মাত্র কয়েক বছরে সংবাদপত্রে যে আনুমানিক টিকিট বিক্রীর সংখ্যা বের হয়েছে তা ধরলে লক্ষ লক্ষ টাকা দাঁড়ায়। অথচ যাঁরা এই অর্থ দিয়ে সমাজকে প্রভূত উপকার করেন তাদের কদর ছাপার অক্ষরে এবং মাত্র যে কয়েকদিন খেলতে পারেন ততদিনই। আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধুবান্ধবদের জন্য চ্যারিটি ম্যাচের টিকিট সংগ্রহ করতে গিয়ে সখের খেলোয়াড়দের হয়রাণি, অধিকরাত্রি পর্য্যন্ত ক্লাবের তাঁবুতে এবং কর্ত্তৃপক্ষের বাড়িতে বাড়িতে অনুরোধ এবং কাকুতি দেখে বেদনা বোধ করেছি। চ্যারিটি ম্যাচ দেখতে গিয়ে খেলোয়াড়দের দৈহিক স্বাস্থ্যহীনতা, ব্যর্থতার জন্য সমর্থকদের গালিমন্দ এবং উপযুক্ত শিক্ষা এবং শক্তির অভাবে ব্যর্থ প্রয়াস বারম্বার একটি ইংরাজি কথা মনে করিয়ে দেয় 'charity begins at home'। চ্যারিটি ম্যাচ খেলে টাকা তুলে দেবার পূর্ব্বে আমাদের দেশের খেলোয়াড়দের স্বার্থের জন্য সর্ব্বাগ্রে একাধিক চ্যারিটি ম্যাচ ব্যবস্থার প্রয়োজন বোধ করছি।

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

গিরীন্দ্র সিংহ সম্পাদিত গল্প-গ্রন্থ "শুধু গল্প"—১৲

সুভো ঠাকুর প্রণীত "পট ও ভূমিকা"—১৲

সন্তোষকুমার দে প্রণীত গল্প-গ্রন্থ "স্ট্রাইক"—১৷৷০

মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত গল্প-গ্রন্থ "বিপ্লবের বিয়ে"—২৲

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রণীত নাটক "তাপিত-তারণ"—২৲

শ্রীসুকুমার ভট্টাচার্য্য প্রণীত "ছোটদের রামায়ণ"—৷৷০

গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু সম্পাদিত গল্প-সঙ্কলন "আঠারো বসন্ত"—৩৷০

হেমেন্দ্রবিজয় সেন প্রণীত রহস্যোপন্যাস "ইয়ং ফটোগ্রাফার"—১৷০

শ্রীচারুবিকাশ দত্ত প্রণীত "চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন"—৩৲

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

২০৩৷১৷১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শিল্পী—শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়　　সাঁওতালী মেয়ে　　ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ভারতবর্ষ

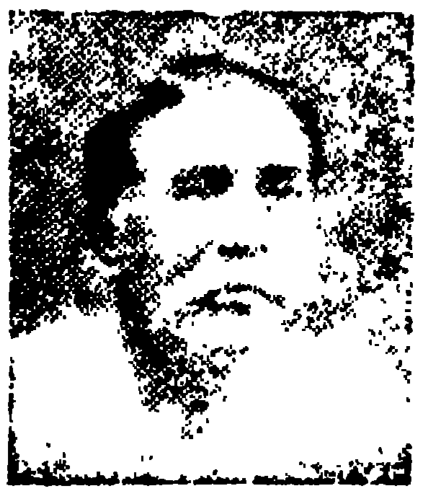

মাঘ—১৩৫৫

দ্বিতীয় খণ্ড | ষ ংশ বর্ষ | দ্বিতীয় সংখ্যা

শাহিরাজ্যের পতন

অধ্যাপক শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার এম-এ, পি-আর-এস, পি-এইচ-ডি

উত্তর পশ্চিম ভারত এবং আফ্‌গানিস্থানের বিস্তৃত অঞ্চলে শাহিবংশীয় হিন্দু সম্রাট্‌গণ রাজত্ব করিতেন। সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে আরবজাতীয় মুসলমানেরা পারস্য দেশ অধিকার করে; তখন হইতেই শাহিরাজগণের সহিত তাহাদের বিরোধ চলিতে থাকে বৎসর শাহিরা আরব আক্রমণ ঠেকাইয়া রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন; কিন্তু ৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে আরব সেনাপতি ইয়াকুব কাবুল অধিকার করেন। ইহার ফলে রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চল শাহিরাজের হস্তচ্যুত হইল। তখন শাহিরাজ সিন্ধুনদের তীরস্থিত উদ্‌ভাণ্ডপুর হইতে রাজ্যশাসন করিতে থাকেন। প্রাচীন উদ্‌ভাণ্ডপুর অর্থাৎ আধুনিক আটকের নিকটবর্ত্তী উণ্ড্‌ পূর্ব্বে শাহিসাম্রাজ্যের পূর্ব্বাঞ্চলের রাজধানী ছিল। যাহা হউক, এই সময়েও আফ্‌গানিস্থানের লম্‌মান বা লম্‌ঘান প্রদেশ (প্রাচীন 'লম্পাক' দেশ) হইতে পঞ্জাবের অন্তর্গত সিরহিন্দ পর্য্যন্ত এবং কাশ্মীরের দক্ষিণ হইতে মুলতানের উত্তর সীমান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত বিশাল সাম্রাজ্য শাহিরাজগণের অধিকারভুক্ত ছিল। তখনও শাহিরাজকে উত্তরাপথের (অর্থাৎ পশ্চিম পাঞ্জাব হইতে 'বংক্ষু' বা অক্‌সস্ নদীর উপত্যকা পর্য্যন্ত বিস্তৃত প্রাচীন ভারতের উত্তর পশ্চিম বিভাগের) সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নরপতি বলিয়া স্বীকার করা যাইত। নবম শতাব্দীর শেষাংশে লল্লিয় শাহি উদ্‌ভাণ্ডপুরে রাজত্ব করিতেন। কাশ্মীরের প্রাচীন ঐতিহাসিক কহ্লন পণ্ডিত বলিয়াছেন যে, উত্তরাপথের রাজমণ্ডলের লল্লিয়শাহির স্থান ছিল নক্ষত্রমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী সূর্য্যের ন্যায়; শত্রু কর্ত্তৃক রাজ্য হইতে বিতাড়িত অসংখ্য নরপতি তাঁহার আশ্রয়ে নির্ভয়ে উদ্‌ভাণ্ডপুরে বাস করিতেন। কিন্তু দশম শতাব্দীতে গজনীতে তুর্কী জাতীয় মুসলমানদিগের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়; তাহারা নূতন উদ্যমে শাহিরাজ্য আক্রমণ করিতে থাকে।

এই শতাব্দীর শেষভাগে শাহিরাজ জয়পাল একাধিক বার গজনীরাজ্য অধিকারের চেষ্টা করেন; কিন্তু ভাগ্য বিড়ম্বনায় তাঁহার উদ্যম সফল হয় নাই। জয়পালের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন গজনীর তুর্কীশাসক সবুক্তগীন ও তাঁহার সুবিখ্যাত পুত্র সুল্তান মহ্মুদ। ইঁহারা উভয়েই অতিশয় রণদক্ষ সেনাপতি ছিলেন। ইঁহাদের আক্রমণে জয়পালকে বারবার বিব্রত হইতে হইয়াছিল। একাদশ শতাব্দীর সূচনায় জয়পালের পুত্র আনন্দপাল সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি সুল্তান মহ্মুদের আক্রমণ হইতে শাহিরাজ্য রক্ষা করিতে পারেন নাই।

শাহিরাজ আনন্দপালের কার্য্যকলাপ ঐতিহাসিকগণের বিস্ময়ের উদ্রেক করে। শাহিরাজ্যের দক্ষিণে মুলতান; সেখানে আরব মুসলমানেরা রাজত্ব করিত। তাহাদের সহিত শাহিরাজ সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। একবার সুল্তান মহ্মুদ মুলতান আক্রমণে উদ্যোগী হইলেন। তিনি দেখিলেন, শাহিরাজ্যের ভিতর দিয়া মুলতানে প্রবেশ করা সহজসাধ্য। তাই তিনি আনন্দপালের নিকট শাহিরাজ্যের মধ্য দিয়া সৈন্য চালনার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। ইহার পূর্ব্বেই সুল্তানের হস্তে পরাজিত হইয়া শাহিরাজ বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য হইয়াছিলেন। আবার সন্ধিসত্ত্বেও আরবেরা তুর্কীদিগের বিরুদ্ধে জয়পাল ও আনন্দপালকে কিছুমাত্র সাহায্য করে নাই। বিশেষতঃ আনন্দপাল জানিতেন যে, সুলতানের বিরোধী হইলে তাঁহার পক্ষে উহার পরিণাম ভয়াবহ হইবে। সুতরাং শাহিরাজ অবিলম্বে তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন, সে বিষয়ে মহ্মুদের কোন সন্দেহ ছিল না। কিন্তু আনন্দপালের চরিত্র স্বতন্ত্র ধাতুতে গঠিত ছিল। তাঁহার মনে হইল, অকারণে নিরপেক্ষ মিত্ররাজ্যের বিরুদ্ধে শত্রুকে সাহায্য করা বিশ্বাসঘাতকতা ব্যতীত আর কিছু নহে। তিনি সুল্তানের প্রস্তাবে সন্ধির মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিতে সম্মত হইলেন না। ইহার ফলে মহমুদ শাহিরাজ্য আক্রমণ করিলেন। আনন্দপাল বারবার পরাজিত হইয়া শাহিরাজ্যের পশ্চিমাংশ অর্থাৎ লব্‌মান ও পেশোয়ার (প্রাচীন 'পুরুষপুর') অঞ্চলের অধিকার হারাইলেন। এই সময়ে সুখপাল নামক শাহিরাজ্যের একপুত্রকে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া নওয়াসা শাহ নাম দেওয়া হয়। ইহাতে তুর্কীদিগের প্রতি মর্ম্মাহত শাহিরাজের বিদ্বেষ শতগুণে বৃদ্ধি পাইল।

ইতিমধ্যে সুল্তান মহ্মুদের এক ভয়ঙ্কর বিপদ্ উপস্থিত হয়। মধ্য-এশিয়া হইতে ইলক্ খাঁ নামক এক শক্তিশালী তুর্কী নায়ক অক্সস্ নদী পার হইয়া গজনীরাজ্য আক্রমণ করেন। মহমুদ তাড়াতাড়ি তাঁহাকে বাধাদিতে অগ্রসর হইলেন। লব্‌মান-পেশোয়ার অঞ্চলের শাসনভার তিনি নওয়াসা শাহ্ অর্থাৎ শাহিরাজপুত্র সুখপালের হস্তে ন্যস্ত করিয়া গেলেন। মহমুদ খোরাসানে ইলক্ খাঁয়ের সহিত যুদ্ধে বিব্রত। তুর্কীতে-তুর্কীতে যুদ্ধ; জয়লক্ষ্মী কাহাকে অনুগৃহীত করিবেন, তাহা অনিশ্চিত। সুলতানের এই বিপদের সুযোগ লইয়া সুখপাল আবার হিন্দু ধর্ম্মে ফিরিয়া আসিলেন। মুসলমান কর্ম্মচারী ও সেনানীদিগকে বিতাড়িত করিয়া অবিলম্বে তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, এই কার্য্যে তিনি আনন্দপালের নিকট হইতে কোনই সাহায্য পান নাই। অবশ্য সুখপাল ও আনন্দপাল সম্মিলিত হইলে পরিণামে তুর্কী আক্রমণ রোধ করা কতদূর সম্ভব হইত, তাহা নিশ্চিত বলা যায় না। যাহা হউক, শাহিরাজ কেবল যে পুত্রকে বিদ্রোহে সাহায্যে করেন নাই, তাহা নহে; এই সময়ে তিনি সুল্তানকে একখানি অদ্ভুত পত্র লিখিলেন। পত্রখানি এই: "শুনিলাম, তুর্কীরা বিদ্রোহী হইয়া খোরাসান অধিকারে অগ্রসর হইয়াছে। আপনি যদি ইচ্ছা করেন, তবে আমি পাঁচ হাজার অশ্বারোহী, দশ হাজার পদাতিক এবং একশত হস্তী লইয়া স্বয়ং আপনার সাহায্যার্থ উপস্থিত হইতে পারি; অথবা ইহার দ্বিগুণ সৈন্যসহ আমার পুত্রকে আপনার সাহায্যের জন্য পাঠাইতে পারি। আমি যে আপনার কাছ হইতে কিছু প্রতিদানের আশায় আপনাকে সাহায্য করিতে চাহিতেছি, সেরূপ মনে করিবেন না। আপনি আমাকে পরাজিত করিয়াছেন; আমি চাহিনা যে আপনি আর কাহারও হস্তে পরাজিত হন।"

শত্রুর বিপদের সময় উহার সম্পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ না করিয়া আনন্দপাল যে রাজনৈতিক অদূর-দর্শিতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহাতে বোধ হয় কাহারও সন্দেহ হইবে না। কিন্তু যে শত্রুকে তিনি মনে প্রাণে ঘৃণা করিতেন, তাহারও বিপদের দিনে এইরূপ উদার ব্যবহার যে অনেকখানি মহত্বেও পরিচায়ক, তাহা অস্বীকার করা যায় না। সেইজন্যই শাহিরাজগণের চরিত্র সম্বন্ধে প্রাচীন মুসলমান পণ্ডিত

অল্‌বীরূণী লিখিয়া গিয়াছেন, "একথা নিশ্চিত যে, শাহি-রাজগণ কেবল আড়ম্বরপ্রিয় ছিলেন না; সৎকার্য্য এবং কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে তাঁহারা কদাপি পশ্চাৎপদ হন নাই। তাঁহাদের চরিত্র মহৎ এবং ব্যবহার উদার ছিল।"

যাহা হউক, শীঘ্রই আনন্দপালের অদূরদর্শিতার ফল ফলিল। শাহিরাজের দুর্ভাগ্যক্রমে সুলতান মহমুদ খোরাসানের যুদ্ধে জয়ী হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। নিঃসহায় সুখপাল সহজেই পরাজিত ও বন্দী হইলেন। তাঁহার নিকট হইতে চার লক্ষ মুদ্রা জরিমানা আদায় করিয়া তাঁহাকে চিরজীবনের জন্য কারাগারে আবদ্ধ করা হইল। তারপর সুলতানের মুলতান আক্রমণে বাধা সৃষ্টি করার অজুহাতে আনন্দপালের রাজ্য পুনরায় আক্রান্ত হইল। পরাজিত শাহিরাজ—সম্পূর্ণরূপে সুলতানের বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য হইলেন। কিছুকাল পরে শাহিরাজের অনুরোধ অগ্রাহ্য করিয়া মহমুদ থানেশ্বরের চক্রস্বামীর মন্দির ধ্বংস করেন এবং বিগ্রহটি গজনীতে লইয়া যান; সে সময় দুর্ভাগা আনন্দপাল নানাভাবে সুলতানের সৈন্যদলকে সাহায্য করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু তখনও সুলতান শাহিরাজকে মনে মনে ভয় করিতেন; তাই তিনি থানেশ্বরের পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইতে সাহসী হন নাই। সুলতানের মন্ত্রীরা পরামর্শ দিলেন যে, শাহিরাজ্য সম্পূর্ণ ধ্বংস না হওয়া পর্য্যন্ত যমনা ও গঙ্গানদীর তীরে মুসলমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইবে না। সুতরাং কিছুকাল পরে পুনরায় শাহিরাজ্য আক্রমণ করা হইল।

ইতিমধ্যে আনন্দপালের মৃত্যু হইয়াছিল। তাঁহার পুত্র ত্রিলোচনপাল ঝেলম নদীর তীরবর্ত্তী বালনাথ পর্ব্বতের উপরে নন্দনদুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। দুর্গ মুসলমান কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইল। শাহিরাজ ত্রিলোচনপাল পুত্র ভীমপালের সহিত দুর্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক দক্ষিণ কাশ্মীরের পার্ব্বত্য অঞ্চল আশ্রয় করিয়া যুদ্ধ চালাইতে লাগিলেন। এই দুর্ভাগ্যের দিনে ত্রিলোচনপাল কাশ্মীরের অধিপতি সংগ্রামরাজের সাহায্যপ্রার্থী হন। তখন উত্তরাপথের পশ্চিমাংশ তুর্কী মুসলমানের কবলিত; সমগ্র ভারতবর্ষ বিপন্ন। কাশ্মীররাজ ভারতের এই বিপদ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন না। শাহিরাজের প্রার্থনার উত্তরে তিনি বিরাট একদল সৈন্যসহ প্রাচীন সেনাপতি তুঙ্গকে তাঁহার সাহায্যের জন্য প্রেরণ করিলেন। বহু যুদ্ধ জয় করিয়া তুঙ্গ কাশ্মীরদেশে মহাবীর বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। অগ্রহায়ণ মাসে তুঙ্গের অধীন কাশ্মীরসৈন্য ত্রিলোচনপাল ও তাঁহার পুত্রের সহিত মিলিত হইল। ঝেলমের শাখা তৌষী (আধুনিক 'তোহী') নদীর তীরে কাশ্মীরের অন্তর্গত পুঞ্চ (প্রাচীন 'পর্ণোৎস') দেশের পার্ব্বত্য অঞ্চলে সৈন্য সমাবেশ করা হইল।

পিতামহের আমল হইতে ত্রিলোচনপাল তুর্কীমুসলমানের সহিত যুদ্ধ করিয়া আসিতেছেন। তিনি মুসলমানদিগের যুদ্ধকৌশল অবগত ছিলেন এবং তুর্কী প্রথায় নিজ সৈন্যগণকে সুশিক্ষিত করিয়াছিলেন। পাঁচছয় দিন কাশ্মীর সৈন্যের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া শাহিরাজ নিরাশ হইলেন। তিনি দেখিলেন যে, কাশ্মীর সেনাদলে রাত্রিতে পাহারার কোন ব্যবস্থা নাই; স্থানে স্থানে চর বসাইয়া শত্রুর আগমন পর্য্যবেক্ষণের চেষ্টা নাই; এমন কি, যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইবার উদ্দেশ্যে অস্ত্রশস্ত্র চালনার অভ্যাসও অজ্ঞাত। শা তুঙ্গকে বলিলেন, সেনাপতি, তুরস্কদিগের সহিত যুদ্ধে জয়ী হইতে হইলে যে রীতিতে সৈন্য শিক্ষিত করা প্রয়োজন, আপনার সে দিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত। যতদিন পর্য্যন্ত আপনার সেনাদল উপযুক্ত শিক্ষা না পায়, ততদিন আমাদিগকে এই পর্ব্বতের আশ্রয়েই থাকিতে হইবে। কোনক্রমেই নদী পার হইয়া সমতল-ভূমিতে যাওয়া উচিত হইবে না।" প্রাচীন সেনাপতি তুঙ্গ অত্যন্ত দাম্ভিক প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি নিজেকে অজেয় মনে করিতেন। তুর্কীদিগের বলবীর্য্য সম্বন্ধেও তাঁহার কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। তাঁহার স্থির বিশ্বাস ছিল যে, কাশ্মীর সেনার সহিত যুদ্ধ হইলে মুসলমানেরা একদণ্ডও টিকিতে পারিবে না। তিনি শাহিরাজের পরামর্শ উপেক্ষা করিয়া দম্ভভরে বলিলেন, "আপনি অত ভয় পাইতেছেন কেন? কাশ্মীর সেনাপতি মুসলমানদের তৃণজ্ঞান করে। আমার সেনাদল তাহাদিগকে উপযুক্ত শিক্ষা দিবার জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত আছে।" বিপন্ন ত্রিলোচনপাল বারবার অনুরোধ করিয়াও তুঙ্গের আত্ম-বিশ্বাস ভাঙিতে পারিলেন না।

একদিন তৌষী নদীর পরপারে ক্ষুদ্র একদল তুর্কী সেনা দেখা গেল। উহারা হিন্দু সৈন্যের অবস্থান নির্ণয়

এবং অবস্থা পর্য্যবেক্ষণের জন্য আসিয়াছিল। কাশ্মীর সেনাপতি অবিলম্বে ঐ সেনাদলকে আক্রমণ করিতে উদ্যোগী হইলেন। কিন্তু শাহিরাজ তাঁহাকে বারবার নিষেধ করিলেন। তুর্কীদিগকে হিন্দুসৈন্যের অবস্থান জানিতে দেওয়া তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না। সমগ্র তুর্কী সেনাদল যদি হিন্দু সেনার সন্ধান না পাইয়া সম্মুখে অগ্রসর হইয়া যাইত, তবে সঙ্কীর্ণ পার্ব্বত্যপথে পশ্চাৎ হইতে আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে ধ্বংস করা অসম্ভব হইত না। কিন্তু উদ্ধত কাশ্মীর সেনাপতি শাহিরাজের কথায় কর্ণপাত করিলেন না। তুঙ্গের আদেশে একদল হিন্দু সেনা নদী পার হইয়া মুঘলদিগকে আক্রমণ করিল। কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর তুর্কীরা পরাজিত হইল; তাহাদের ক্ষুদ্রদলের অধিকাংশ সেনাই নিহত হইল। তুঙ্গ গর্ব্বিতভাবে হাসিয়া বলিলেন, "কেমন শাহিরাজ, কাশ্মীর সেনার বীরত্ব দেখিলেন ত? আপনি বৃথাই তুর্কীদিগের ভয় করিতেছেন। হম্মীর ('আমীর' অর্থাৎ সুলতান মহমুদ) স্বয়ং যুদ্ধে আসিলেও তাঁহাকে এইরূপ শিক্ষা দিতে আমাদের বিলম্ব হইবে না।" 'আহব-তত্ত্বজ্ঞ' (অর্থাৎ যুদ্ধ শাস্ত্র পারদর্শী) ত্রিলোচনপাল উত্তর দিলেন, "আমি পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি, এখনও সেই কথাই বলি। পার্ব্বত্য আশ্রয় ত্যাগ করা আমাদের পক্ষে কোনমতেই শুভ হইবে না। তাহাতে আমরা জয়ী হইতে পারিব না।" বিজয়গর্ব্বী তুঙ্গ অভিজ্ঞ শাহিরাজের আশঙ্কাকে হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন।

অগ্রবর্ত্তী সেনাদলের সহিত হিন্দু সৈন্যের সংঘর্ষের সংবাদ সুলতান মহমুদের কর্ণগোচর হইল। সেই 'ছলাহববিশারদ' (অর্থাৎ কূট-কৌশলী সেনাপতি) সুলতান শত্রুসৈন্যের অবস্থান জানিয়া আনন্দিত হইলেন। পরদিন প্রাতঃকালেই তিনি সমগ্র তুর্কী সেনাদলের সহিত তৌষী নদীর তীরে উপস্থিত হইলেন। এবারেও শাহিরাজ তুঙ্গকে পর্ব্বতের আশ্রয় ত্যাগ করিতে বারবার নিষেধ করিলেন। কিন্তু বলগর্ব্বিত কাশ্মীর সেনাপতি তুর্কী সৈন্য পরাজিত করিয়া খ্যাতিলাভের আশায় অস্থির হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি অবিলম্বে সমুদয় কাশ্মীরসৈন্য নদীর পরপারে লইবার ব্যবস্থা করিলেন। শাহিরাজ প্রমাদ গণিলেন; কিন্তু তুঙ্গের অনুসরণ ব্যতীত তাঁহার আর উপায়ান্তর ছিল না।

তারপর শাহিরাজ ও তুঙ্গের সেনাদলের সহিত তুর্কী সৈন্যের তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল। কিন্তু শীঘ্রই ত্রিলোচন পালের ভবিষ্যদ্বাণী সত্যে পরিণত হইল। অল্পক্ষণ যুদ্ধের পর কাশ্মীরসৈন্য ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। সেনাপতি তুঙ্গের সহিত অধিকাংশ সৈন্য পলাইয়া প্রাণরক্ষা করিল। আরও কিছুকাল যুদ্ধ চলিবার পর শাহিরাজের সেনাদলও পরাজিত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। কিন্তু শাহিরাজ ত্রিলোচন পাল এবং জয়সিংহ, শ্রীবর্দ্ধন ও বিভ্রমার্ক নামক তিনজন কাশ্মীরদেশীয় বীর প্রবল বিক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহাবীর ত্রিলোচন পাল অসংখ্য শত্রু বেষ্টিত হইয়াও যুদ্ধে বিমুখ হইলেন না। তিনি অগণিত তুর্কী সেনা সংহার করিলেন; কিন্তু নিঃসহায় পাইয়াও মুসলমানেরা তাঁহাকে ধ্বংস করিতে পারিল না। চারিদিকে চাহিয়া শাহিরাজ যখন বুঝিলেন যে, আর জয়ের আশা নাই, তখন তিনি ক্ষুণ্ণমনে রণক্ষেত্র ত্যাগ করিলেন। ত্রিলোচন পালের বলবীর্য্যের উল্লেখ করিয়া কাশ্মীরের প্রাচীন ঐতিহাসিক বলিয়াছেন, "হম্মীর যুদ্ধে জয়ী হইলেন বটে, কিন্তু ত্রিলোচনের অমানুষিক বীরত্বের কথা স্মরণ করিয়া তিনি জয়ের আনন্দ অনুভব করিতে পারিলেন না। রাজ্যভ্রষ্ট ত্রিলোচনপাল মহোৎসাহে হস্তিসৈন্যের সাহায্যে হৃতরাজ্য উদ্ধার করিতে উদ্যোগী হইলেন।" কিন্তু হতভাগ্য ত্রিলোচনপাল ভ্রষ্টরাজ্য উদ্ধার করিতে পারেন নাই। শাহিরাজ্যের পতন সম্পর্কে এই ঐতিহাসিক দুঃখের সহিত বলিয়াছেন, "বিধাতার অসাধ্য কিছুই নাই। যাহা স্বপ্নের অতীত, যাহা কল্পনার অগোচর, বিধাতা তাহা অনায়াসে সম্পাদন করেন। পূর্ব্বে যে শাহিরাজ্যের বিশালতার সামান্যমাত্র উল্লেখ করিয়াছি, বিধির বিধানে আজ রাজা, অমাত্য ও সেনাদলসহ সেই সুবিশাল সাম্রাজ্য কোনদিন ছিল কি ছিল না, ইহাই লোকের বিতর্কের বিষয় হইয়াছে।" সেনাপতি তুঙ্গের অদূরদর্শিতার নিন্দা করিয়া ঐতিহাসিক বলিয়াছেন, "তারপর তুঙ্গ আপন পরাজয়ের দ্বারা সমগ্রদেশে (অর্থাৎ ভারতবর্ষে) তুরস্কদিগের প্রথম আগমন ঘটাইয়া ধীরে ধীরে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন। তিনি রণক্ষেত্র হইতে প্রহৃত শৃগালের ন্যায় পলাইয়া আসিয়াছিলেন।"

১০১৯ খ্রীষ্টাব্দে শাহিরাজ ত্রিলোচনপাল রাহীব নদীর

তীরে মহমুদ পরিচালিত তুর্কীসেনাকে বাধা দিতে শেষ চেষ্টা করেন। এই সময়ে তিনি মধ্যভারতের চন্দেল্ল-বংশীয় পরাক্রান্ত নরপতি বিদ্যাধরের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। বিদ্যাধর তাঁহার সাহায্যের জন্য সৈন্য-প্রেরণের অঙ্গীকার করেন। কিন্তু সাহায্য পৌঁছিবার পূর্ব্বেই ত্রিলোচনপালকে পরাজিত হইয়া সন্ধির প্রস্তাব করিতে হয়। সন্ধি প্রস্তাবের উত্তরে সুলতান বলিলেন যে, শাহিরাজ মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ না করিলে সন্ধি করা হইবে না। ধর্ম্মান্তরগ্রহণ ত্রিলোচন পালের অভিপ্রেত ছিল না; তখনও তিনি শাহিরাজ্যের লুপ্ত গৌরব ফিরাইয়া আনিবার স্বপ্ন দেখিতেন। নিরুপায় হইয়া তিনি চন্দেল্লরাজ বিদ্যাধরের সহিত মিলনের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করিলেন। কথিত আছে যে, দুর্ভাগ্য শাহিরাজ চন্দেল্ল দেশে পৌঁছিতে পারেন নাই। তৎপূর্ব্বে কয়েকজন হিন্দু আততায়ী তাঁহাকে হত্যা করিয়াছিল। ১০২১ খৃষ্টাব্দে ত্রিলোচন পালের মৃত্যু হয়। পাঁচ বৎসর পরে তাঁহার পুত্র ভীমপালও মৃত্যুমুখে পতিত হন। ইহার পর তুর্কী মুসলমানেরা পঞ্জাব ও উত্তরপশ্চিম সীমান্তপ্রদেশে অপেক্ষাকৃত নিষ্কণ্টকে রাজত্ব করিতে থাকে।

শাহিরাজ ত্রিলোচন পালের প্রকৃত হত্যাকারী কাহারা, তাহা নির্ণীত হয় নাই। তবে কেবল যে তুর্কী মুসলমানেরাই তাঁহার শত্রু ছিল, তাহা নহে। চন্দ্ররাজ নামক একজন প্রতিবেশী হিন্দুরাজার সহিতও ত্রিলোচনপালের শত্রুতা ছিল বলিয়া জানা যায়। বহুদিন যুদ্ধ বিগ্রহের পর উভয় পক্ষে সন্ধি হয়। সন্ধিবন্ধন দৃঢ় করিবার উদ্দেশ্যে শাহি-রাজ পুত্র ভীমপালের সহিত চন্দ্ররাজের কন্যার বিবাহ স্থির হইয়াছিল। কিন্তু ভীমপাল বিবাহের জন্য চন্দ্ররাজ ভবনে উপস্থিত হইলে তাঁহাকে বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক বন্দী করা শাহিরাজপুত্রের মুক্তিপণস্বরূপ চন্দ্ররাজ প্রচুর অর্থ দাবী করিয়াছিলেন।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে কয়েকজন শাহিবংশীয় নরপতি সম্বন্ধে কয়েকটি কাহিনীর ঐতিহাসিক কাঠামো উপস্থিত করা হইল। ইহার ভিত্তিতে কল্পনার সাহায্যে চিত্তাকর্ষক উপন্যাস রচিত হইতে পারে

যা বলেছি

শ্রীজ্যোৎস্নানাথ চন্দ এম-এ, বি-এল্

যা বলেছি সে কী মোর সব?
কামনা-কম্পিত বক্ষে, বন্ধু, লক্ষ কথা রহিল নীরব!
ভুলের ভুবনে কে জানিল তাহা
বাক্য যাহা
ভাষা দিয়া করিল প্রকাশ?
সে তো শুধু বুঝাবার বিফল প্রয়াস!
জীবনে জোয়ার জাগে:
সোনালী-সূর্য্য ক্ষণে ক্ষণে অমরার প্রেম মাগে—
মনে হয়
ধরণীর যত কিছু অপচয়—
যত শঙ্কা, যত ভয়
মুহূর্ত্তেকে পেয়ে গেছে লয়!
যৌবনের অনন্ত উচ্ছ্বাসে
দিগন্তের রেখা টানি অন্ত-হীন নীলাকাশে
অঞ্চলিত করিবার আশা বুঝি আসে!
তুমি কি গো খুঁজে পাও বাণী
আকাশের তারালোক করে যবে কানাকানি—
নিখিলের মরম শয্যায়: হিয়া যবে ওঠে পূর্ণ হয়ে,
আপনাতে আপনি হারায়, নিশাশেষে ব্যাকুল বিস্ময়ে?
আবেগ-কম্পিত বক্ষে কোটী কথা এই মুখে
চাহে বাহিরিতে—তবু হায় রয়ে যায় বুকে
কত বাণী বাক্য-হারা: অশ্রু শুধু নামে চোখে—
হেথা দেখি স্বপ্ন জাগে অমরার অমৃত-লোকে!

যুগে যুগে মানবের লক্ষ কথা হয় নাকো বলা;
শুধু দ্বার হতে দ্বারে চলা!
কত নারী আসে চারিপাশে—
কেহ তুচ্ছ করে: কেহ অকারণে ভালবাসে:
সবে এরা নহে সোনা,
কারো চোখে অগ্নি-রেখা; কারো অশ্রু লোনা!
তবু তাই ভালো—
আমার ভুবন আমি রচিয়াছি নিজে,
যেথা জ্বলে শুধু এক তারা মরমের মনসিজে!

বনফুল

২৭

"অনীতা কোথা? এত দেরি কেন তোমার! এতক্ষণ আমাকে কি দুশ্চিন্তার মধ্যে ফেলে রেখেছ বল তো। তোমার পাঁচীর-মাকে আমি দূর করে' দিয়েছি। অত্যন্ত অবাধ্য। অনীতা কই?"

সদারঙ্গবিহারীলাল ঢুকতেই স্বয়ম্প্রভা উপরোক্তভাবে সম্ভাষণ করলেন। ক্লান্ত সদারঙ্গ চশমা খুলে লেন্স থেকে ধুলো পরিষ্কার করলেন আগে। এত ধুলো জমে ছিল যে ভাল করে' দেখতে পাচ্ছিলেন না তিনি।

"অনীতা আসে নি?"

স্বয়ম্প্রভা আত্মসম্বরণ করে' রইলেন দণ্ডটা পারলেন। তারপর সংযত কণ্ঠেই বললেন, "তুমি গিয়েছিলে তাকে আনতে—ফিরে এসে আমাকে জিগ্যেস করছ সে এসেছে কিনা। তুমি—"

"এতক্ষণ তার আসা উচিত ছিল। আশ্চর্য্য তো। ফানি! সে আমার আগে মোটরে করে' বেরিয়েছে। বাঃ—"

"সে বেরিয়েছে ঠিক তো?"

"ঠিক বই কি! মোটরে করে"

"আমার চিঠি পড়ে কি বললে"

"তা শুনিনি। শুনলাম চুপ করে ছিল। কিন্তু বেশ মজা হ'ল তো। বাঃ। হয় তো—"

"তুমি তার সঙ্গে দেখা করনি?"

"সে দোতলায় ছিল। আমি সেখানে উঠব কি করে'। সুরেশ্বরী দেবী চিঠিটা নিয়ে গিয়ে তাকে দিয়েছিলেন"

"বাবাজি ছিলেন কোথা"

"বাবাজি? মানে, ওদের ঠাকুর?"—বিস্মিত হ'য়ে প্রশ্ন করলেন সদারঙ্গবিহারীলাল।

"ইয়ার্কি করছ নাকি"

"ঠাকুরকেই তো বাবাজি বলি আমরা, মানে এ অঞ্চলে সবাই বলে" —বিস্মিত সদারঙ্গ উত্তর দিলেন—"ওদের ঠাকুরটা কোথায় ছিল জানতে চাইছেন?"

"ওর স্বামী কোথা ছিল"

"কার স্বামী? সুরেশ্বরী দেবীর?"

"আরে না, না—কি গাড়োলের পাল্লাতেই পড়েছি! অনীতার স্বামী সুশোভন"

"জানি না"

"সে ওর কাছে ছিল না?"

"কার কাছে?"

"অনীতার কাছে। তুমি কি ভেবে ছিলে সুরেশ্বরী দেবীর কাছে বলছি?"

"হ্যাঁ"

"সুরেশ্বরী দেবীর কাছে ছিল?"

"না। আমি ভেবেছিলাম সুরেশ্বরী দেবীর কাছে সুশোভন আছে কিনা আপনি জানতে চাইছেন"

"আহ্ হ্। ওকে দেখে ছিলে?"

"কাকে"

"কি বিপদ। সুশোভনকে, সুশোভনকে"

"বললাম তো। ওর খবর জানি না"

"না বলনি তুমি"—অযথা ধমকে উঠলেন স্বয়ম্প্রভা। তারপর একটু থেমে আসল প্রসঙ্গে এলেন আবার।

"অনীতা আমার চিঠি পড়ে' মোটরে করে' বেরিয়েছে সেখান থেকে?"

"হ্যাঁ। এ কথাও তো বলেছি আপনাকে। দেখুন, বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে আমার। কিছু খেয়ে নি। শরীর আর বইছে না"

"সুশোভন কোনও সুলুক-সন্ধান পায় নি তো?"

"সুলুক?"

"সুলুক-সন্ধান। ও টের পায় নি তো যে অনীতা চলে এসেছে?"

"না। এক মিনিট, একটু সবুর করুন। গোড়া থেকে সব বলব আবার। হাত মুখ ধুয়ে একটু কিছু খেয়ে নিতে দিন আমাকে"

"অনীতাকে আনতে গেলে, কিন্তু সে-ই এখনও এল না। তার খবরটা পর্য্যন্ত দিতে পারব না"

"এক্ষুণি আসবে। ড্রাইভার হয় তো রাস্তা চেনে না, কিম্বা বাড়ি চেনে না। ঘুরছে। এক্ষুণি এসে পড়বে"

"ঠিক বলেছ। আশ-পাশেই ঘুরছে হয় তো। তুমি এক কাজ কর না হয়"

"কি"

"রাস্তায় গিয়ে তোমার মোটর সাইকেলের হর্ণটা বাজাও। তাহলে ওরা বুঝতে পারবে। অন্ধকারে রাস্তা খুঁজে পাচ্ছে না ঠিক। যাও—"

"দেখুন বড্ড খিদে পেয়েছে আমার। আর পেরে উঠছি না। সেই সকাল থেকে সমস্ত দিন—মানে এক নাগাড়েই প্রায়। তা ছাড়া আপনি এমন অস্থির হচ্ছেন কেন তাও তো বুঝছি না। আমি গোড়া থেকেই তো বলছি—সান্ত্বনা মেয়েটি খুব ভাল—একা একটা নাইট-স্কুল চালাত—রীতিমত 'গুড' যাকে বলে—সুরেশ্বরী দেবীও 'কনফার্ম' করলেন এ কথা"

"বাজে বক্তৃতা না করে' যা বলছি কর গে যাও। রাস্তায় হর্ণ বাজাও গিয়ে। যাও, আর দেরি কোরো না"

সদারঙ্গ আর প্রতিবাদ করতে সাহস করলেন না। রাস্তায় দাঁড়িয়ে হর্ণ বাজাতে লাগলেন। কোনও ফল হল না। ফিরে এসে খেতে বসলেন। স্বর্ণপ্রভার তাড়ায় খেতে খেতেও বার দুই উঠে গিয়ে হর্ণ বাজিয়ে আসতে হ'ল তাঁকে। কিন্তু অনীতার মোটর এল না।

গোঁসাইজি প্রাত্যাহিক নিয়ম অনুসারে হোটেল বন্ধ করবার পূর্ব্বে চারিদিকটা দেখে নিচ্ছিলেন একবার। দোরগোড়ায় ঠেসানো বাইসিকলটার দিকে একবার চাইলেন। কখন এসে ভদ্রলোক নিয়ে যাবেন কে জানে। বাইরের ঘরে একটা ব্যাগ আর একটা বেঁটে ছাতা রয়েছে, সেই মেয়েটির বোধ হয়, যিনি হোটেলে এসে রাত্রিবাস করতে চাইছিলেন। নাক কুঁচকে এমনভাবে চাইলেন সেগুলোর দিকে—যেন সেগুলো থেকে কোনও দুর্গন্ধ নির্গত হচ্ছে। তারপর উপরে গেলেন। গুরু-ভগ্নীর খোঁজ নিলেন একবার। নাবছেন এমন সময় দেখলেন একটি মোটর এসে দাঁড়াল তাঁর হোটেলের সামনে। আবার কে জুটল এসে এ সময়। বাইরের ঘরটাতে অপেক্ষা করতে লাগলেন। তিনি যে আপাতত অতিথি-সৎকার করতে অক্ষম এই কথাগুলি আর একবার উচ্চারণ করবার সুযোগ পেয়ে ঈষৎ পুলকিতও হলেন মনে মনে।

অনীতা মোটর থেকে নেবে এল।

"আপনিই কি এই হোটেলের মালিক"

"হ্যাঁ। কিন্তু আপাতত অতিথি-সৎকার করতে অক্ষম আমি। আমার দু'টি ঘরেই লোক আছে"

"এখানে সকালের দিকে আমি এসেছিলাম একবার। তখন আপনি ছিলেন না—"

"ও। এই জিনিসগুলি আপনার তাহলে"

"হ্যাঁ"

"তাহলে নিয়ে যান। এখানে তো স্থান নেই। আর একজন মহিলাও আসতে চেয়েছিলেন—তিনি সদারঙ্গবাবুর বাইকের পিছনে চড়ে যাচ্ছিলেন—আমি ভেবেছিলাম এগুলো তাঁরই বুঝি"

"হ্যাঁ, আমাদেরই। আমি তাঁর মেয়ে"

"ও! এই বয়সেও আপনার মায়ের বুকের পাটা আছে বলতে হবে। বাইসিকলের পিছনে ঝুলতে ঝুলতে যাওয়া কম সাহসের কাজ নয়, বিশেষত এ বয়সে। জিনিসগুলো নিতেই এসেছেন তাহলে আপনি"

"হ্যাঁ। আর একটু কাজও আছে--"

"আবার কি"

"একটা খবর যদি দিতে পারেন"

"কিসের খবর"

"দেখুন, আপনার এই হোটেলকে কেন্দ্র করে' নানা রকম অদ্ভুত খবর শোনা যাচ্ছে। আমিও তার মধ্যে জড়িয়ে পড়েছি। আপনার মুখ থেকে সত্যি কথাটা শুনতে চাই"

"আমার হোটেল সম্বন্ধে অদ্ভুত খবর! শুনে স্তম্ভিত হচ্ছি। কে বলেছে—"

"সদারঙ্গবিহারীলাল বলে এক ভদ্রলোক। তিনি নাকি কাল রাত্রে এখানে এসেছিলেন। তিনি বলেছেন—"

"ও, তিনি! তাঁর অসাধ্য কিছু নেই"

"তিনি কাল রাত্রে এখানে না কি একজন ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলাকে দেখেন। তাঁরা এখানে না কি কাল রাত্রে ছিলেনও। তাঁদের সঙ্গে আর কোনও তৃতীয় ব্যক্তি ছিল কি?"

"কংগ্রেসকর্ম্মী অধ্যাপক ব্রজেশ্বর দে আর তাঁর স্ত্রীর কথা বলছেন কি"

"হ্যাঁ। অন্তত—তাঁরা দু'জনে কি ছিলেন এখানে?"

"আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য নই আমি জানবেন। ওরকম ভাবে জেরা যদি করেন কিছু বলব না। তবে ভদ্রভাবে যদি জানতে চান বলছি, হ্যাঁ তাঁরা ছিলেন। তৃতীয় ব্যক্তি আর কেউ ছিল না। একটা হতচ্ছাড়া কুকুর ছিল অবশ্য—"

"দেখুন সমস্ত ঘটনা আমার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানা দরকার। আপনি দয়া করে যা জানেন খুলে বলুন। খবরগুলো আমাকে জানতেই হবে যেমন করে' হোক। দরকার হ'লে আইনের সাহায্যও নিতে হবে শেষ পর্য্যন্ত—"

"আইনের সাহায্য! আপনি কি বলতে চান, আমার হোটেলে বে-আইনী কিছু করি আমি? আইন দেখাচ্ছেন আমাকে! জানেন আমার হোটেল যে আইন অনুসারে চালাই আমি—তা একেবারে নিখুঁত? সন্দেহজনক কোন কিছুকেই প্রশ্রয় দেওয়া হয় না এখানে"

"তা জানি বলেই তো আপনাকে এত কথা জিগ্যেস করছি"

গোঁসাইজির ভাব-ভঙ্গী দেখে অনীতা ঈষৎ মোলায়েম সুর ধরলে। তা না হলে কার্য্যোদ্ধার হবে না। তার এ কথায় প্রীতও হলেন গোঁসাইজি। বললেন, "কোনও বাজে লোককে ঢুকতে দিই না আমি এখানে। এখানে ও-সব চালাকি চলবার উপায় নেই"

ঈষৎ হেসে অনীতা বললে—"কিন্তু আপনাকে কেউ ঠকাতেও তো পারে"

"ঠকাবে? আমাকে? আমি কি কচি খোকা?"

"ধরুন, কাল যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা যে ব্রজেশ্বরবাবু আর তাঁর স্ত্রী এ কি করে' জানলেন আপনি"

"সৎরংবাবু এই সব বলে' বেড়াচ্ছেন বুঝি! দেখুন, আমি প্রমাণ না রেখে কোনও কাজ করি না। একবার এক অ্যানার্কিষ্ট ছোকরা আমাকে ফাঁকি দিয়েছিল, তার পর থেকে আমি সাবধান হয়েছি। তা ছাড়া একজন কংগ্রেসকর্মী অধ্যাপক কি মিছে কথা বলবেন?"

"তিনি হয়তো বলবেন না, কিন্তু তাঁর নাম করে' অপর কেউ আপনাকে ঠকিয়ে যেতে পারে"

"তাঁর নাম করে'?"—ঈষৎ থতমত খেয়ে গেলেন গোঁসাইজি, তার পর অযৌক্তিকভাবে বলে' উঠলেন—"দেখুন, আপনি যদি আইনের সাহায্য নেন আপনার বন্ধু সৎরংবাবু মানহানির দায়ে পড়ে' যাবেন বলে দিচ্ছি। আমার হোটেলের নামে এ রকম যা তা কথা রটিয়ে পরিত্রাণ পাবেন না উনি—"

"না, তাঁর কথায় বিশ্বাস করি নি আমি। আমি শুধু জানতে চাইছি যিনি এসেছিলেন তিনিই যে ব্রজেশ্বরবাবু এর কোনও প্রমাণ আছে কি আপনার?"

"প্রমাণ? তিনি তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে একঘরে এক খাটে শুয়েছিলেন আমি তা স্বচক্ষে দেখেছি—মানে, দৈবাৎ দেখে ফেলেছি"

"এটা কি একটা প্রমাণ হল? আপনিই বলুন"

ভ্রূ কুঞ্চিত করে' গোঁসাইজি চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ অনীতার দিকে। সঙীন মেয়ে তো! কালে কালে হচ্ছে কি!

"আরও প্রমাণ আছে, আসুন আমার সঙ্গে। আমি যতটা পেরেছি প্রমাণ রেখেছি। আসুন—"

অনীতার চোখের দৃষ্টি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। গোঁসাইজির পিছু পিছু আপিস ঘরে ঢুকল সে। আশা আর আশঙ্কার দ্বন্দ্ব চলছিল তার মনে। বুকের ভিতরটা ঢিপ ঢিপ করছিল।

গোঁসাইজি তাঁর 'অ্যাডমিশন রেজিষ্টার'খানি পাড়লেন।

"এই খাতায় প্রত্যেক অতিথিকে স্বহস্তে নিজের নাম এবং পরিচয় লিখে দিতে হয়। আমি স্বচক্ষে ব্রজেশ্বরবাবুকে এই খাতায় নিজের নাম এবং পরিচয় লিখতে দেখেছি। এই দেখুন—"

"দেখি"

দেখেই অনীতার মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

"আপনি স্বচক্ষে তাঁকে লিখতে দেখেছেন?"

"তিনি যখন লিখছিলেন আমি ঘরে এসে ঢুকলাম। স্বচক্ষে দেখেছি বই কি—"

অনীতার বুকের ভিতরটা সহসা মুচড়ে উঠল অনুতাপে। ছি, ছি, সুশোভনের প্রতি কি অবিচারই করেছে সে। এ হাতের লেখা সুশোভনের হতেই পারে না। এমন স্পষ্ট গোটাগোটা করে' লিখতেই পারে না সুশোভন। তার লেখা তো অর্ধেক পড়াই যায় না, এমন হিজিবিজি করে' লেখে সে।

খাতা বন্ধ করে অনীতা বেরিয়ে এল আপিস ঘর থেকে। গোঁসাইজিও এলেন।

"দেখুন, আমার হোটেলের বদনাম দেবার সাহস হয় নি আজ পর্যন্ত কারও—তা তিনি সৎরংই হোন বা সবিক্রমই হোন। কোনও খুঁত রাখি নি আমি। এটা হোটেল নয়, পান্থনিবাস—"

"না, আপনার ব্যবস্থা সত্যিই খুব ভাল। আমাদেরই ভুল হয়েছিল। অনেক ধন্যবাদ। নমস্কার—"

অনীতা মোটরে চড়ে বসল। কতকগুলো সমস্যার সমাধান হল না এখনও। সুশোভন কাল রাত্রে কোথায় শুয়েছিল? সুশোভন বললে কাল রাত্রে সে এখানে ছিল। কোথা শুয়েছিল তাহলে? যাই হোক, একটা ব্যাপার সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া গেল—সুশোভনকে মিছে সন্দেহ করেছিল তারা। কাল রাত্রে সুশোভন যাই করে' থাক, সে নির্দোষ। বেচারি বারবার চেষ্টা করেছে নিজের দোষস্খালন করবার—কিন্তু সে তার কথায় কর্ণপাত পর্যন্ত করে নি।

"এখন কোথায় যাব মা?"—ড্রাইভার জিগ্যেস করল।

"ফিরে চল—"

"বাড়ি?"

"হ্যাঁ"

"এই থাম থাম"—

চীৎকার করে' উঠল সুশোভন।

"দিগ্বিজয়বাবুর গাড়ি না কি"

ক্যাঁচ করে থেমে গেল গাড়িটা।

"আজ্ঞে হ্যাঁ"—ড্রাইভার জবাব দিলে মুখ বাড়িয়ে।

"শোন, আমি গাড়ি নিয়ে ফিপ্‌চররামারি বা কাৎনা ফিরিঙ্গিপুরে যাব—মানে, অনীতাকে যেখানে রেখে এসেছ সেইখানে রেখে এস আমাকে। জরুরি দরকার"

"তুমি!"

"অনীতা?"

"এস, ভিতরে ঢোক"

তড়াক করে' মোটরে উঠে বসল সুশোভন।

"দেখ, আমি সব বুঝিয়ে বলতে চাই। তুমি অমন অবুঝের মতো করছ কেন। বুঝিয়ে বলছি সব, শোন আগে—"

"দরকার নেই। কিচ্ছু বলবার দরকার নেই। পরে বোলো কোন সময়ে যদি তোমার ইচ্ছে হয়। আমি সব খবর নিয়েছি। বড় অন্যায় হয়ে গেছে আমার। রাগ কোরো না, লক্ষ্মীটি। প্রথমটা মনে হয়েছিল—আমায় মাপ কর তুমি—মাপ কর—বল, মাপ করেছ?"

সুশোভন এটা প্রত্যাশা করে নি। ঘটনা-পরম্পরা যে এমন নাটকীয়ভাবে হঠাৎ ডিগবাজি খেয়ে যাবে তা তার কল্পনাতীত ছিল।

"মাপ? মোটেই না, মানে ও প্রশ্নই ওঠে না। আমাকে ভুল বুঝে তোমরা কেন যে এমন করছ—"

"আর কক্ষণো করব না। এইবারটি মাপ কর"

"না, না, মাপ মানে—উঃ একটা দুঃস্বপ্ন দেখে উঠলাম মনে হচ্ছে। যাক্‌, এখন কি করা যায় বল তো"

সুশোভনের ইচ্ছে করছিল বেলুনের মতো উড়তে।

"চল দু'জনে কোলকাতা ফিরে যাই"

"তা তো যাবই। রাতটা কোথায় কাটানো যায়? এখানে ভালো হোটেল আছে কোথাও বলতে পার"

"দীঘড়াতে আছে। কাছেই"—ড্রাইভার উত্তর দিলে।

"তাহলে সেইখানেই নিয়ে চল আমাদের"

গাড়ি দীঘড়া অভিমুখে ধাবিত হল।

"এইবার সব বলি তাহলে খুলে"—অনীতার দিকে ঘুরে বসল সুশোভন।

"কি দরকার—আসল কথাটা জেনেই গেছি যখন"

"কি করে' জানলে"

"গোঁসাইজির সঙ্গে দেখা করে'। অ্যাডমিশন রেজিষ্টারটা দেখেছি। দু'একটা কথা যদিও স্পষ্ট হয় নি এখনও, কিন্তু সে পরে হলেও চলবে"

গাড়ী দীঘড়ায় এসে পৌঁছল।

নেবেই সুশোভন চেঁচিয়ে উঠল—"আরে গণেশ যে! তুমি এখনও যাও নি!"

গোঁফ চুমরে গণেশ বললে, "এইবার যাব। সমস্ত দিন লেগে গেল রেডিয়েটারটা সারাতে। এখানকার মিস্ত্রি সব অতি বাজে। কাজই জানে না"

"ঠিক হয়েছে এখন?"

"হয়েছে"

"গাড়ি কোথায় তোমার"

"মিস্ত্রির বাড়ির সামনে"

"চল তাহলে তোমার গাড়িতেই ফিরি। এখনি যাব কিন্তু"

"বেশ। গাড়িটা আনি তাহলে"

গণেশ চলে গেল।

সুশোভন অনীতার দিকে ফিরে বললে, "দিগ্বিজয়বাবুকে একটা চিঠি লিখে দি তাহলে—যে পরে কোনও এক সময় আসব আমরা। এখন ফিরে চললুম"

"বেশ"

পকেটবুক থেকে একখানা পাতা ছিঁড়ে সুশোভন একখানা চিঠি লিখে দিলে। ড্রাইভারকে বখশিসও দিলে। তারপর হোটেলে ঢুকল। গরম ভাত, মুগের ডাল, আর গরম মাছভাজা পাওয়া গেল। যথেষ্ট।

খাওয়া দাওয়া সেরে অনীতা বললে—"কোলকাতা যাবার আগে মাকে কিন্তু খবরটা দিতে হবে"

"হ্যাঁ, সদারঙ্গ-বিহারীলালকেও"

"আমি গিয়ে দেখা করে' এলে কেমন হয়। কাছেই তো, না?"

সুশোভন ইতস্তত করতে লাগল।

"তোমার গিয়ে দরকার নেই। এখানকার পথঘাট ভাল নয়, তাছাড়া তোমাকে তোমার মা হয় তো ছাড়তে চাইবেন না—সে আবার এক বখেড়া হবে। তার চেয়ে আমিই যাই বরং। খবরটা দেওয়া তো কেবল—"

"আমি মাকে একটা চিঠি লিখে দিই না হয় যে ভয়ের কোনও কারণ নেই। আমাদের আশঙ্কা অমূলক—কি বল—"

মুচকি হেসে সুশোভনের দিকে চাইলে অনীতা।

"বেশ তাই দাও"

হোটেলওলার কাছ থেকে কাগজ চেয়ে অনীতা চিঠি লিখতে বসল। লিখতে লিখতে অনীতা হঠাৎ জিগ্যেস করলে "আচ্ছা কাল রাত্রে তুমি ছিলে কোথা? তুমিও ওইখানেই ছিলে?"

"সে অনেক কথা। পরে শুনো"

"এইটুকু বল না এখন—"

"হুঁ, ওই হোটেলেই ছিলাম। তবে নানা স্থানে। ঘর তো একটা। কখনও বারান্দায়, কখনও [illegible], কখনও মোটরে, কখনও সিঁড়িতে—এইভাবে কাটিয়েছি আর কি। ঘুমিয়েও ছিলাম বেশ—"

"ছি, ছি, কি দুর্গতি"

"চরম"

"অসুখ না করে"

"না, কিছু হবে না"

"কিন্তু তোমরা দু'জনে মিলে মিথ্যে কথাটা বললে কেন তা এখনও বুঝতে পারছি না আমি। সাগ্নিকা হোটেলে আছে—মিছে করে' একথা বলতে গেলে কেন"

"না বললে তুমি আমাদের সঙ্গে মোটরে আসতে না"

"আহা"

"দাও, চিঠিটা লিখে ফেল চটপট"

"এতো সঙীন প্যাঁচ হ'ল দেখছি"—সদারঙ্গবিহারী চিবুক চুলকে বলে উঠলেন।

"প্যাঁচ! মেয়েটা অন্ধকারে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছে, সেটা তোমার কাছে প্যাঁচ মনে হচ্ছে! আবার যাও, দেখ কি হ'ল"

"রাস্তায় গিয়ে আমি আর কি করব। দু'বার তো গেলাম। দিগ্বিজয়বাবুর 'কারে' এসেছে, চিন্তার কোনও কারণ আছে বলে' মনে হয় না। প্যাঁচ অন্য কারণে বলছিলাম। আমাদের কি হবে"

"আমাদের?"

"মানে, শোবার কথা ভাবছি। দোতলায় পাঁচির মায়ের ঘরটায় অবশ্য আপনি শুতে পারেন"

"আমি ঘুমুব না। চিন্তায় আমার ঘুম আসবে না। যেখানেই আমাকে শুতে দাও—খাড়া বসে থাকব আমি সারারাত"

"ও। তাহলে, মানে রাগ করবেন না, আমিই ভাবছিলাম পাঁচির মায়ের ঘরটায় শোব। আপনার সেখানে হয় তো কষ্ট হবে। কিন্তু আপনি যদি জেগে থাকাই 'ডিসাইড' করে' থাকেন তাহলে—ঘরটা কিন্তু—"

"আমি দেখেছি সে ঘর, রাতটা কাটিয়ে দিতে পারব"

"বেশ। কিন্তু আপনি গায়ে কি দেবেন? পাঁচির মায়ের লেপ ছিল একটা—"

"চল দেখি গিয়ে"

"সেই ভাল। না হয় পাড়া থেকে চেয়ে নিয়ে আসব একটা। জনার্দনবাবু একটা এক্সট্রা লেপ করিয়েছেন এবারে শুনেছি"

"চল"

একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠলেন দুজনে। পাঁচির মা থাকত ছাতের সেই ঘরটায়। সিঁড়ির দুয়ারে শিকলের তালা লাগানো ছিল একটা, চাবি আলমারিতে লুকোনো থাকে। ঘরে যেতুলে—আবার টিপলেন বন্ধ হয়ে যায়। সদারঙ্গ চাবিটা খুললেন রিংসমেত তালাটা 'অসোয়াস্তি' বুঝতে পারা গেল।

...পাঁচির মার তক্তপোশের উপর কোণের দিকে বিছানার মতো কি একটা গোটানো ছিল। স্বয়ম্প্রভা—খুলে দেখলেন সেটা। দেখে নাক সেঁটকালেন।

সদারঙ্গবিহারী বললেন, আপনি যদি ওটা গায়ে না দিতে চান, আমিই দেব না হয়, আমার লেপটা আপনি নিন। তাহলে পাড়ায় বেরিয়ে ছুটোছুটি করতে হয় না আর। রাত প্রায় একটা হল তো—"

"বেশ তাই হবে। চল নীচে যাই। সিঁড়ির কপাট আবার বন্ধ করতে গেলে কেন। খোল"

"বন্ধ তো করি নি। হাওয়ায় বন্ধ হয়ে গেছে বোধ হয়। খুলছি। আরে—এ কি—"

"কি হল"

"এ যে বন্ধ। বাইরে থেকে বন্ধ—আরে"

"শিগ্‌গির কপাট খোল বলছি। রসিকতা করবার সময় এ নয়"

"খুলছে না। এ কি—আরে"

"খোল বলছি"

"পারছি না, বাইরে থেকে বন্ধ করে' দিয়েছে কেউ। তালাটা বাইরে ঝুলছিল"

"বাজে কথা। ধাক্কা মার। বন্ধ করতে আসবে কে? আর করবেই বা কেন? ঠেল, জোরে ঠেল, ধাক্কা দাও"

সদারঙ্গ-বিহারীলাল ধাক্কা দিলেন, ঠেললেন, তারপর স্বয়ম্প্রভার দিকে চাইলেন একবার। মুখে করুণ হাসি। মাথা নাড়লেন। আবার ঠেললেন। কিন্তু না, কপাট খুলল না।

"বাইরে থেকে বন্ধ করে' দিয়েছে কেউ। তালাটা বাইরে ঝুলছিল কি না। কেউ হয়তো ঠাট্টা করে' কিম্বা, কি জানি—"

"আবার ঠেল। ঠেল। গুঁতো মার। গায়ে জোর নেই না কি! সর—"

"দেখুন আপনি যদি পারেন। দেখুন। পারবেন না। অসম্ভব"

স্বয়ম্প্রভা চেষ্টা করলেন। দাঁতে দাঁত দিয়ে প্রাণপণে চেষ্টা করলেন। হ'ল না। তারপর হঠাৎ তিনি রুখে দাঁড়ালেন। হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন—"তুমিই ষড় করেছিলে বোধহয় কারও সঙ্গে—"

"ষড়! রাম—না—না—ছি—বাঃ। পা ছুঁয়ে বলতে পারি আপনার"

"কে তবে বন্ধ করলে কপাট"

"কে করে—বলব। আপনিও যেখানে আমিও সেখানে। হয়তো পাড়ার কেউ ঢুকেছিল, ইয়ার্কি করে' গেছে। অন্যায় কিন্তু। খুব। ভাবতেই পারি না"

"যেমন করে' হোক বেরুতেই হবে"

"কি করে' তাতো বুঝতে পারছি না"

"সমস্ত রাত এখানে থাকব বলতে চাও তোমার সঙ্গে! বেরুতে হবে যেমন করে' হোক। অনীতা যে কোনও মুহূর্তে এসে পড়তে পারে"

"তা পারে। কিন্তু—ছি—কি কাণ্ড। কি করি বলুন তো"

"চেঁচাও। পাড়ার সবাইকে জাগাও। চেঁচাও—"

"না, না, 'হ, সে কি হয়! আমি এখানে বাস করি, আমার একটা মানসম্ভ্রম আছে এখানে। না—চেঁচানো চলবে না। লোকে হাততালি দেবে। চেনেন না আপনি এদের। গুজবের চোটে কান পাতা যাবে না। সে ভয়ানক ব্যাপার হবে। আপনার পক্ষেও। ঘাবড়ে যা তা করবেন না। দাঁড়ান—"

স্বয়ম্প্রভা পাঁচির মার খাটের উপর বসে' পড়লেন। বিস্রস্ত কেশ শাড়ীর আঁচল। সদারঙ্গবিহারী কালো চশমাটা খুলে মুছলেন। তারপর সেটা পরে' সভয়ে চেয়ে রইলেন তাঁর দিকে।

"সমস্ত রাত তোমার সঙ্গে এই ঘরে থাকতে হবে না কি"—চীৎকার করে' উঠলেন স্বয়ম্প্রভা।

"দোহাই আপনার, চেঁচাবেন না অমন করে"

"কপাট খোল এক্ষুণি। তা নাহলে চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করব আমি—"

"না, না, লোকে তাহলে ভাববে আমি বলাৎ—মানে, খারাপ কিছু করছি বুঝি একটা। একটু সবুর করুন। আমি দূরে থেকে দৌড়ে গিয়ে ধাক্কা মেরে দেখি। হয় তো ভেঙেও যেতে পারে—ভয়ানক শব্দ হবে কিন্তু—"

"যা করবার কর। আমি এখানে আর একদণ্ড থাকতে চাই না"

ছোট ঘর। দৌড়বার বেশী স্থান ছিল না। মালকোচা মেরে সামান্য একটু ছুটে এসে সদারঙ্গবিহারী যে ধাক্কাটা মারলেন তা নিতান্তই হাস্যকর। কপাট খোলা দূরে থাক তেমন কোনও শব্দও হল না।

"ঠেল, ঠেল, জোরে, আরও জোরে"—চেঁচাতে লাগলেন স্বর্ণপ্রভা।

"উঁইও—হেঁইও"—সদারঙ্গ চেঁচাতে লাগলেন ঠেলতে ঠেলতে।

"ঠেল, ঠেল, আরও জোরে—"

"বাপ্‌স্—উঃ। চেঁচাবেন না অত জোরে দোহাই আপনার। পাড়ার লোকে যদি শুনে ফেলে—বুঝতেই পারছেন"

...

অনুসন্ধান করতে করতে সুশোভন সদারঙ্গবিহারীর বাড়ি এসে দেখলে কপাট খোলা। ... ... এবং ব্যাগটি সে মেঝেতে নামিয়ে রাখলে। তারপর ... চিঠিটা বার করে টেবিলের উপর ঠিক সামনেই এমন ভাবে রাখলে যাতে ঘরে ঢুকলেই চোখে পড়ে।

উপরে শব্দ শুনে ঘাড় ফিরিয়ে দেখলে—সিঁড়ি রয়েছে একটা বারান্দার দিকে। আলো দেখা যাচ্ছে, কথাবার্তাও শোনা যাচ্ছে। ঘর থেকে বেরিয়ে সন্তর্পণে সিঁড়ি বেয়ে উঠে ... ... পায়ে ছিল রবার সোলের জুতো, কোনও শব্দ হল না। সিঁড়ির কপাটটি হাওয়াতে আপনিই বন্ধ হয়ে গেছে ... দোতলায় ... তালাটা চোখে পড়ল। সদারঙ্গবিহারীলাল এবং স্বর্ণপ্রভার কথার টুকরো শুনতে পেলে দু' একটা। ক্ষণকাল স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সুশোভন। পরমুহূর্তেই হাসি চিক্‌মিক করে' উঠল তার চোখে। আস্তে আস্তে উঠে তালাটি কুট করে' লাগিয়ে দিয়ে নেমে এল সে। চাবির রিংটি টেবিলের উপর রেখে বেরিয়ে পড়ল। মিনিট দশেকের মধ্যেই হোটেলে পৌঁছে গেল আবার।

"খুব চট্ করে' ফিরলে যে"

"হাঁ, চিঠিটা সদারঙ্গবাবুকে দিয়েই চলে এলাম। কথাবার্তা হ'ল না তেমন কিছু"

"তাঁকে কেমন দেখলে"

"... ... ... ছিলেন ... ..."

"... ..."

"... ..."

"... "

"চল তবে আর দেরি কেন"

"চল"

মোটরে ... ... করে'। ... ... সুশোভন। সুশোভনের ... ...

সমাপ্ত

ভারতের খাদ্য-সমস্যা

শ্রীসন্তোষকুমার রায়চৌধুরী

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রারম্ভেই ভারতবাসীর সামনে খাদ্য সমস্যা প্রথমে প্রকট হয়ে দেখা দেয়। যুদ্ধের সময়ে সেই অবস্থা চরমে উঠে এবং তারই প্রতিক্রিয়ায় সম্ভব হয় এই ভারতের অন্তর্গত সেই শস্যসম্পদশালিনী প্রদেশ বঙ্গদেশে ১৯৪৩ সালে ভয়াবহ মন্বন্তর। সেই ভয়ানক দিনগুলিও আমরা পার হইয়া আসিয়াছি। যুদ্ধ শেষ হইয়া গিয়াছে। তাহারও পর আমরা ছিন্ন করিয়া আসিয়াছি আমাদের দীর্ঘ দুই শতাব্দীর অধীনতার নাগপাশ। কিন্তু ফিরিয়া আসিল না সেই যুদ্ধপূর্ব দিনগুলি। খাদ্য সমস্যা দিন দিন প্রকট হইতে প্রকটতর হইয়া উঠিতেছে; দুষ্কর হইয়া উঠিতেছে দৈনন্দিন জীবনযাত্রা—আর অর্দ্ধাহার ও অনাহারে মৃত্যু-পথ-যাত্রী-জাতি তিলে তিলে আগাইয়া যাইতেছে মৃত্যুর দিকে। কিন্তু কেন?

ইহার উত্তরে অনেক অর্থনীতিবিদ্ বলেন—লোকসংখ্যার অস্বাভাবিক বৃদ্ধিই নাকি এই প্রকটতর খাদ্য-সমস্যার মূল কারণ। ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায় এই উক্তিরই সমর্থনে তাঁহার "... ... এণ্ড পপুলেশন" নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন ...—বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই প্রয়োজনীয় খাদ্য ও লোকসংখ্যা প্রায় সমানে সমান চলিয়া আসিয়াছিল। পরে লোক সংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় খাদ্য উৎপাদন কম হইতে আরম্ভ হয়—১৯৩০-৩১ সালে লোক সংখ্যার তুলনায় খাদ্য উৎপাদন শতকরা ১৫ ভাগ কম।'

অবশ্য বিগত কয়েক শতাব্দীর লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হিসাব দেখিলে দেখা যাইবে যে উপরোক্ত উক্তিটি অনেকাংশে সমর্থনযোগ্য। সপ্তদশ শতাব্দীতে ভারতের লোক সংখ্যা ছিল ১০ কোটি, অষ্টাদশ শতাব্দীতে হয় ১৩ কোটি। তাহার পর ঊনবিংশ শতাব্দীতে পর পর ৩০টা দুর্ভিক্ষে মৃত আনুমানিক তিন কোটি লোককে বাদ দিয়াও শতাব্দীর শেষে ১৯০১ সালের আদম সুমারীতে দেখা যায় যে ভারতবর্ষের লোক সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ২৯ কোটি। একটী শতাব্দীতে ১৬ কোটি লোক

"মানে, শোবার কথা ভাবছি। দোতলায় পাঁচির মায়ের ঘরটায় বরং আপনি শুতে পারেন"

"আমি ঘুমুব না। চিন্তায় আমার ঘুম আসবে না। যেখানেই আমাকে শুতে দাও—খাড়া বসে থাকব আমি সারারাত"

"ও। তাহলে, মানে রাগ করবেন না, আমিই ভাবছিলাম পাঁচির মায়ের ঘরটায় শোব। আপনার সেখানে হয় তো কষ্ট হবে। কিন্তু আপনি যদি জেগে থাকাই 'ডিসাইড' করে' থাকেন তাহলে—ঘরটা কিন্তু—"

"আমি দেখেছি সে ঘর, রাতটা কাটিয়ে দিতে পারব"

"বেশ। কিন্তু আপনি গায়ে কি দেবেন? পাঁচির মায়ের লেপ ছিল একটা—"

"চল দেখি গিয়ে"

"সেই ভাল। না হয় পাড়া থেকে চেয়ে চিন্তে আনব একটা। জনার্দ্দনবাবু একটা একসুট্রা লেপ করিয়েছেন এবার জানি"

"চল"

একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠলেন দু'জনে। পাঁচির মা থাকত ছাতের ছোট্ট ঘরটায়। সিঁড়ির দুয়ারে বিলাতের তালা লাগানো ছিল একটা, চাবি লাগাবামাত্র লাফিয়ে খুলে যায় অমনি—আবার টিপলেই বন্ধ হয়ে যায়। সদারঙ্গ চাবিটা খুললেন এবং সমেত তালাটা 'স্ক্রুটা'তে ঝুলতে লাগল।

…পাঁচির মার তক্তাপোশের উপর কোণের দিকে বিছানার মতো কি একটা গোটানো ছিল। স্বয়ম্প্রভা—খুলে দেখলেন সেটা। দেখে নাক সেঁটকালেন।

সদারঙ্গবিহারী বললেন, "আপনি যদি ওটা গায়ে না দিতে চান, আমিই দেব না হয়। আমার লেপটা আপনি নিন। তাহলে পাড়ায় বেরিয়ে ছুটোছুটি করতে হয় না আর। রাত প্রায় দশটা হল তো—"

"বেশ তাই হবে। চল নীচে যাই। সিঁড়ির কপাট আবার বন্ধ করতে গেলে কেন। খোল"

"বন্ধ তো করি নি। হাওয়ায় বন্ধ হয়ে গেছে বোধ হয়। খুলছি। আরে—এ কি—"

"কি হ'ল"

"এ যে বন্ধ। বাইরে থেকে বন্ধ—আরে"

"শিগ্‌গির কপাট খোল বলছি। রসিকতা করবার সময় এ নয়"

"খুলছে না। এ কি—আরে"

"খোল বলছি"

"পারছি না, বাইরে থেকে বন্ধ করে' দিয়েছে কেউ। তালাটা বাইরে ঝুলছিল"

"বাজে কথা। ধাক্কা মার। বন্ধ করতে আসবে কে? আর করবেই বা কেন? ঠেল, জোরে ঠেল, ধাক্কা দাও"

সদারঙ্গ-বিহারীলাল ধাক্কা দিলেন, ঠেললেন, তারপর স্বয়ম্প্রভার দিকে চাইলেন একবার। মুখে করুণ হাসি। মাথা নাড়লেন। আবার ঠেললেন। কিন্তু না, কপাট খুলল না।

"বাইরে থেকে বন্ধ করে' দিয়েছে কেউ। তালাটা বাইরে ঝুলছিল কি না। কেউ হয়তো ঠাট্টা করে' কিম্বা, কি জানি—"

"আবার ঠেল। ঠেল। গুঁতো মার। গায়ে জোর নেই না কি! সর—"

"দেখুন আপনি যদি পারেন। দেখুন। পারবেন না। অসম্ভব"

স্বয়ম্প্রভা চেষ্টা করলেন। দাঁতে দাঁত দিয়ে প্রাণপণে চেষ্টা করলেন। হ'ল না। তারপর হঠাৎ তিনি রুখে দাঁড়ালেন। হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন—"তুমিই ষড় করেছিলে বোধহয় কারও সঙ্গে—"

"ষড়! রাম:—না—না—ছি—ছা:। পা ছুঁয়ে বলতে পারি আপনার"

"কে তবে বন্ধ করলে কপাট"

"কি করে—বলব। আপনিও যেখানে আমিও সেখানে। হয়তো পাড়ার কেউ ঢুকেছিল, ইয়াকি করে' গেছে। অন্যায় কিন্তু। খুব। ভাবতেই পারি না"

"যেমন করে হোক বেরুতেই হবে"

"কি করে" তাতো বুঝতে পারছি না"

"সমস্ত রাত এখানে থাকব বলতে চাও তোমার সঙ্গে। বেরুতে হবে যেমন করে' হোক। অনীতা যে কোনও মুহূর্ত্তে এসে পড়তে পারে"

"তা পারে। কিন্তু—ছি—কি কাণ্ড। কি করি বলুন তো"

"চেঁচাও। পাড়ার সবাইকে জাগাও। চেঁচাও—"

"না, না, ছি, সে কি হয়! আমি এখানে বাস করি, আমার একটা মানসম্ভ্রম আছে এখানে। না—চেঁচানো চলবে না। লোকে হাততালি দেবে। চেনেন না আপনি এদের! গুজবের চোটে কান পাতা যাবে না। সে ভয়ানক ব্যাপার হবে। আপনার পক্ষেও। ঘাবড়ে যা তা করবেন না। দাঁড়ান—"

স্বয়ম্প্রভা পাঁচির মার খাটের উপর বসে' পড়লেন। বিস্রস্ত কেশ শ্লথনীবিবন্ধ। সদারঙ্গবিহারী লাল চশমাটা খুলে মুছলেন। তারপর সেটা পরে' সভয়ে চেয়ে রইলেন তাঁর দিকে।

"সমস্ত রাত তোমার সঙ্গে এই ঘরে থাকতে হবে না কি"—চীৎকার করে' উঠলেন স্বয়ম্প্রভা।

"দোহাই আপনার, চেঁচাবেন না অমন করে"

"কপাট খোল এক্ষুণি। তা নাহলে চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করব আমি—"

"না, না, লোকে হয়তো ভাববে আমি বদমাৎ—মানে, খারাপ কিছু করছি বুঝি একটা। একটু সবুর করুন। আমি দূরে থেকে দৌড়ে গিয়ে ধাক্কা মেরে দেখি। হয় তো ভেঙেও যেতে পারে—ভয়ানক শব্দ হবে কিন্তু—"

"যা করবার কর। আমি এখানে আর একদণ্ড থাকতে চাই না"

ছোট ঘর। দৌড়বার বেশী স্থান ছিল না। মালকোচা মেরে সামান্য একটু ছুটে এসে সদারঙ্গবিহারী যে ধাক্কাটা মারলেন তা নিতান্তই হাস্যকর। কপাট খোলা দূরে থাক তেমন কোনও শব্দও হল না।

"ঠেল, ঠেল, জোরে, আরও জোরে"—চেঁচাতে লাগলেন স্বয়ম্প্রভা।

"হেঁইও—হেঁইও"—সদারঙ্গ চেঁচাতে লাগলেন ঠেলতে ঠেলতে।

"ঠেল, ঠেল, আরও জোরে—"

"বাপ্‌স্—উঃ। চেঁচাবেন না অত জোরে দোহাই আপনার। পাড়ার লোকে যদি শুনে ফেলে—বুঝতেই পারছেন"

অনুসন্ধান করতে করতে সুশোভন সদারঙ্গবিহারীর বাসায় এসে দেখলে কপাট খোলা। আলো জ্বলছে। ঘরে নেই কেউ। ছাতাটি এবং ব্যাগটি সে মেঝেতে নামিয়ে রাখলে। তারপর অনীতার চিঠিটা বার করে' টেবিলের উপর ঠিক সামনেই এমন ভাবে রাখলে যাতে ঘরে ঢুকলেই চোখে পড়ে।

উপরে শব্দ শুনে ঘাড় ফিরিয়ে দেখলে—সিঁড়ি রয়েছে একটা বারান্দার দিকে। আলো দেখা যাচ্ছে, কথাবার্ত্তাও শোনা যাচ্ছে। ঘর থেকে বেরিয়ে সন্তর্পণে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল সে। পায়ে ছিল রবার সোলড জুতো, কোনও শব্দ হ'ল না। সিঁড়ির কপাটটা হাওয়াতে আপনিই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। দোদুল্যমান নিমারের তালাটা চোখে পড়ল। সাদরঙ্গবিহারীলাল এবং স্বয়ম্প্রভার কথার টুকরো শুনতে পেলে দু' একটা। ক্ষণকাল স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সুশোভন। পরমুহূর্ত্তেই হাসি চিকমিক করে' উঠল তার চোখে। আস্তে আস্তে উঠে তালাটি কুট করে' লাগিয়ে দিয়ে নেবে এল সে। চাবির রিংটি টেবিলের উপর রেখে বেরিয়ে পড়ল। মিনিট দশেকের মধ্যেই হোটেলে পৌঁছে গেল আবার।

"খুব চট করে' ফিরলে তো"

"হাঁ, চিঠিটা সদারঙ্গবাবুকে দিয়েই চলে এলাম। কথাবার্ত্তা হ'ল না তেমন কিছু"

"মাকে কেমন দেখলে"

"তিনি পাশের ঘরে ছিলেন, তাঁর সঙ্গে আর দেখা করি নি"

"চটবেন খুব"

"গণেশ এসেছে"

"হ্যাঁ"

"চল তবে আর দেরি কেন"

"চল"

মোটর ছুটে চলেছে নিঃশব্দ দ্রুতগতিতে অন্ধকার ভেদ করে'। ঘেঁসাঘেঁসি করে' পাশাপাশি বসে' আছে অনীতা আর সুশোভন। সুশোভনের ঘাড়ে মাথা রেখে অনীতা ঘুমুচ্ছে।

সমাপ্ত

ভারতের খাদ্য-সমস্যা

শ্রীসন্তোষকুমার রায়চৌধুরী

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রারম্ভেই ভারতবাসীর সামনে খাদ্য সমস্যা প্রথমে প্রকট হয়ে দেখা দেয়। যুদ্ধের সময়ে সেই অবস্থা চরমে উঠে এবং তারই প্রতিক্রিয়ায় সম্ভব হয় এই ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শস্যসম্পদশালিনী প্রদেশ বঙ্গদেশে ১৯৪৩ সালে ভয়াবহ মন্বন্তর। সেই ভয়ানক দিনগুলিও আমরা পার হইয়া আসিয়াছি। যুদ্ধ শেষ হইয়া গিয়াছে। তাহারও পর আমরা ছিন্ন করিয়া আসিয়াছি আমাদের দীর্ঘ দুই শতাব্দীর অধীনতার নাগপাশ। কিন্তু ফিরিয়া আসিল না সেই যুদ্ধ-পূর্ব্ব দিনগুলি। খাদ্য সমস্যা দিন দিন প্রকট হইতে প্রকটতর হইয়া উঠিতেছে; দুষ্কর হইয়া উঠিতেছে দৈনন্দিন জীবনযাত্রা—আর অর্দ্ধাহার ও অনাহারে মৃত্যু-পথ-যাত্রী-জাতি তিলে তিলে আগাইয়া যাইতেছে মৃত্যুর দিকে। কিন্তু কেন?

ইহার উত্তরে অনেক অর্থনীতিবিদ্ বলেন—লোকসংখ্যার অস্বাভাবিক বৃদ্ধিই নাকি এই প্রকটতর খাদ্য-সমস্যার মূল কারণ। ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায় এই উক্তিরই সমর্থনে তাঁহার "ফুড সাপ্লাই এণ্ড পপুলেশন" নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন যে—'বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই প্রয়োজনীয় খাদ্য ও লোকসংখ্যা প্রায় সমান সমান হইয়া আসিয়াছিল। পরে লোক সংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় খাদ্য উৎপাদন কম হইতে আরম্ভ হয়—১৯৩০-৩১ সালে লোক সংখ্যার তুলনায় খাদ্য উৎপাদন দাঁড়ায় শতকরা ১৫ ভাগ কম।'

অবশ্য বিগত কয়েক শতাব্দীর লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হিসাব দেখিলে দেখা যাইবে যে উপরোক্ত উক্তিগুলি অনেকাংশে সমর্থনযোগ্য। সপ্তদশ শতাব্দীতে ভারতের লোক সংখ্যা ছিল ১০ কোটি, অষ্টাদশ শতাব্দীতে হয় ১৩ কোটী। তাহার পর উনবিংশ শতাব্দীতে পর পর দুর্ভিক্ষে মৃত আনুমানিক তিন কোটি লোককে বাদ দিয়াও শতাব্দীর শেষে ১৯০১ সালের আদম সুমারীতে দেখা যায় যে ভারতবর্ষের লোক সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ২৯ কোটি। একটী শতাব্দীতে ১৬ কোটি লোক

সংখ্যা বৃদ্ধি সত্যই বিস্ময়কর। কিন্তু সেই বিস্ময়কর লোক সংখ্যা বৃদ্ধিই ভারতবর্ষের পক্ষে প্রাণান্তকর হইয়া উঠিল দ্রুত লোক সংখ্যা বৃদ্ধির তালে তালে। আদম সুমারীর হিসাব অনুযায়ী প্রতি দশ বৎসরের শেষে অর্থাৎ ১৯৩১ ও ১৯৪১ সালে যথাক্রমে এদেশের লোক সংখ্যা দাঁড়াইল ৩৫ কোটী ও ৪০ কোটী। এই বৃদ্ধির সহিত খাদ্য উৎপাদন তাল রাখিতে পারিল না। অবশ্য যেখানে তদানীন্তন সাম্রাজ্যবাদী সরকারের শোষণই ছিল অন্যতম নীতি, সেখানে তাল রাখিতে না পারাই স্বাভাবিক। কিন্তু তাহারই ফলে বিপর্য্যস্ত হইয়া গেল খাদ্য ব্যবস্থা।

লোক সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মাথা পিছু জমির পরিমাণও কমিয়া গেল। জমির পরিমাণ কমিয়া যাওয়ার ফলে অভাবের তাড়নায় নগদ পয়সার মোহে মানুষ হইল শহরাভিমুখী। শিল্পাঞ্চলের প্রয়োজনে হাজার হাজার চাষী হইল মজুর আর শ্রমিক। চাষের প্রতি সাধারণ মানুষের আগ্রহ আসিল কমিয়া। এমনি সাধারণ অবস্থাতেই ভারতবর্ষে চাউলের গড়পড়তা বাৎসরিক উৎপাদন হইত ২৬৪৪ লক্ষ টনের মত। সেই উৎপাদনও কমিয়া আসিতে লাগিল। ওদিকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আরম্ভেই ব্রহ্মদেশ, থাইল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশ হইতে যে পরিমাণ চাউল আমদানী হইত তাহাও বন্ধ হইয়া গেল। সেই চাউলের পরিমাণ ছিল প্রায় ২৪ লক্ষ টন।

শুধু তাহাই নহে, এই ভারতের কৃষিসম্পদের অন্যতম মেরুদণ্ড চাষীকুলও দিন দিন দুর্বল হইয়া পড়িতে লাগিল। তাহার অবশ্য অনেক কারণ আছে, আর সেই কারণগুলির অন্যতম কারণ হইতেছে এই যে—ভারতের চাষীদের শতকরা ৬০ ভাগ চাষীর নিজস্ব জমির পরিমাণ হইতেছে পাঁচ একরের কম। সেই পাঁচ একর পরিমিত জমি হইতে একটী সাধারণ চাষীর পরিবারের সারা বৎসরের অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সঙ্কুলান হওয়া কঠিন। কয়েকটী প্রধান প্রধান শস্য অঞ্চলের হিসাব হইতে দেখা যায় যে—বাঙলার চাষীদের শতকরা ৮০ জন চাষীর জমি আছে দুই একর বা তাহার কম এবং যথাক্রমে মাদ্রাজ, যুক্তপ্রদেশ ও পাঞ্জাবের চাষীদের শতকরা ৭০ ভাগের, মধ্যপ্রদেশের চাষীদের শতকরা ৬৮ ভাগের ও বোম্বাই প্রদেশের চাষীদের শতকরা ৫০ ভাগের জমি আছে পরিবার পিছু পাঁচ একরের কম। কাজেই এই বিপুলসংখ্যক চাষীদের দৈনন্দিন অভাব মিটাইবার জন্য অনেককেই কাম-কর্মে মনোযোগ দিতে হয় ও সেই সঙ্গে চাষের দিকে তাহারা অনেকটা অমনোযোগী হইয়া পড়ে, তাহার ফলেও অনেকখানি ব্যাহত হয় খাদ্য উৎপাদন।

অবশ্য জগতের অন্যান্য কৃষিপ্রধান দেশের তুলনায় ভারতবর্ষের জমির একর পিছু ফলনও অত্যন্ত কম। এই কম ফলন বর্ত্তমান খাদ্য সমস্যার অন্যতম প্রধান কারণ হইলেও ইহার জন্য প্রকৃতপক্ষে দায়ী জন-সাধারণ ও সরকার; আর প্রকৃতপক্ষে ইহা চাষের প্রতি তাহাদের অমনোযোগিতারই একটা প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। নিম্নের ১নং ছকটীতে কয়েকটা দেশের গড়পড়তা একর পিছু ফলন, পৃথিবীর একর পিছু ফলন ও ভারতের একর পিছু ফলনের হিসাব দিলাম।

১নং ছক :— একর পিছু ফলন

(পাউণ্ড)

	চাউল	গম
ভারতবর্ষ	৭৩৮	৬৬৬
চীন	২৪৩০	৯৮৯
জাপান	৩০৭০	১৩৫০
আমেরিকা	১৬৮০	৯৯০
পৃথিবী	১৪৪০	৮৪০

উপরিউক্ত ছকটী হইতে এই কথাই স্পষ্টতঃ প্রমাণিত হয় যে, সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করিয়া খাদ্য শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে পারিলে খাদ্য-সমস্যা আমাদের অনেকখানি কমিতে পারে। অন্যান্য দেশের তুলনায় সেচের সুব্যবস্থা ও চাষের উন্নততর বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা থাকিলে ভারতবর্ষের ও জমির একর পিছু ফলন আরও বেশী হইত তাহার অনেক প্রমাণ এদেশেই আছে। নিম্নের ২ (ক) ও ২ (খ) নং ছক দুইটীতে এদেশেরই কয়েকটী প্রদেশের সেচযুক্ত ও সেচবিহীন অঞ্চলের ধান ও গমের একর পিছু ফলনের তারতম্যের একটা হিসাব দিলাম। ছক দুইটা হইতে দেখা যায় যে—সুযোগ ও সুবিধা পাইলে এদেশের চাষীরাও অন্যান্য দেশের মত ফসল ফলাইতে পারিবে। হিসাব দুইটা সংগৃহীত হইয়াছে ভারতসরকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত 'টেকনোলজিক্যাল পসিবিলিটিজ অব এগ্রিকালচারাল ডেভেলপমেণ্ট ইন ইণ্ডিয়া' হইতে।

২ (ক) নং ছক :—

ধান

একর পিছু ফলন।

(পাউণ্ড)

প্রদেশ	সেচযুক্ত অঞ্চল	সেচবিহীন অঞ্চল
মাদ্রাজ	১৬৯৪	১১৩৮
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার	১২০০	৯০০
যুক্তপ্রদেশ	১১০০	৮৫০
পাঞ্জাব	১২৬৯	৫৮৭

২ (খ) নং ছক :—

গম

একর পিছু ফলন।

(পাউণ্ড)

প্রদেশ	সেচযুক্ত অঞ্চল	সেচবিহীন অঞ্চল
পাঞ্জাব	৯৬৭	৫৭২
যুক্তপ্রদেশ	১২০০	৮০০
বোম্বাই	১২৫০	৫০১

সেচের সুবিধা পাওয়া ও না পাওয়ার ফলে একই প্রদেশে একর পিছু ফলনের এই যে বিরাট পার্থক্য, উপযুক্ত তত্ত্বাবধানে ইহা নিশ্চয়ই করা যায় [illegible]

পরিকল্পনা, সেচের পরিকল্পনা প্রভৃতি সুদূর ভবিষ্যতে হয়তো সেই সুদিনেরই পথ নির্দ্দেশ করবে।

যাই হোক, এইবার বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ্ ও সংখ্যাতাত্ত্বিকের হিসাব হইতে উদ্ধৃত করিয়া লোকসংখ্যা বৃদ্ধিও যে খাদ্যসমস্যার অন্যতম কারণ সেই কথাটাই প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিব। পর পর কয়েকটী ছকে বিগত পঞ্চাশ বৎসরে ভারতের কয়েকটী প্রধান শস্য অঞ্চলের বর্দ্ধিত লোকসংখ্যা, মাথা পিছু উৎপন্ন চাউল ও মাথা পিছু প্রয়োজনীয় চাউলের হিসাব দিলাম।

৩নং ছক :—

লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হিসাব।

(লক্ষের হিসাবে)

প্রদেশ	১৯১১	১৯২১	১৯৩১	১৯৪১
বাঙ্গলা	৪৫৪	৪৬৭	৫০১	৬০৩
বিহার উড়িষ্যা	৩৪৪	৩৩৯	৩৭৬	৪৫০
মাদ্রাজ	৩৯১	৪০১	৪৪২	৪৯৩
যুক্তপ্রদেশ	৪৬৮	৪৫৩	৪৮৪	৫৫০
আসাম	৬৫	৭৪	৮৬	১০২

৪নং ছক :—

মাথা পিছু উৎপন্ন চাউল।

(পাউণ্ডে)

প্রদেশ	১৯১০-১৫	১৯২০-২৫	১৯৩০-৩৫	১৯৩৫-৪০
বাঙ্গলা	৫১৮	৩৯৮	৪০২	৩১৪
বিহার উড়িষ্যা	৪৭২	৩৯৯	২৯২	২২৩
মাদ্রাজ	২৫২	২৯১	২৬৭	২০৯
যুক্তপ্রদেশ	৮৬	১০২	৮১	৮৬
	৫৩৪	৪৪২		

৫নং ছক :—

মাথা পিছু উৎপন্ন চাউলের তুলনায় মাথা পিছু প্রয়োজনীয় চাউল ও হার।

(পাউণ্ড)

	উৎপন্ন চাউল	প্রয়োজনীয় চাউল	শতকরা কত ভাগ কম
প্রদেশ	১৯৩৫-৪০	১৯৩৪-৩৮	
বাঙ্গলা	৩১৪	৩৪৪	১০
বিহার উড়িষ্যা	২২০	২৫৯	১৬
মাদ্রাজ	২০৯	২৩০	১০
যুক্তপ্রদেশ	৮৬	৯৪	৯
আসাম	৩৭৩	৩৮২	৩

অবশ্য গত পঞ্চাশ বৎসরে চাষের জমির পরিমাণ বাড়িয়াছে নিঃসন্দেহে, কিন্তু সেই তুলনায় সার ও পরিচর্য্যার অভাবে জমির উৎপাদনী শক্তি দিন দিন কমিয়া যাওয়ার ফলে ও সেই সঙ্গে সেচ-ব্যবস্থার অভাবে মোট ফসল আমরা পাইতেছি অনেক কম। ভারতবর্ষের মোট জমির শতকরা প্রায় ৪২ ভাগ ব্যবহৃত হয় চাষাবাদের কাজে, যথাক্রমে ১০ ও ১৩ ভাগ আছে পতিত ও জঙ্গল, আর বাকী ৩৫ ভাগের মধ্যে ১৮ ভাগ চাষের জন্য পাওয়ার কোন সম্ভাবনা না থাকিলেও খাদ্য উৎপাদনের জন্য উৎসাহী হইলে শেষ ১৭ ভাগকে আমরা পাইতে পারি চাষের জন্য। মোট জমির যে শতকরা ১৭ ভাগ আমরা পাইতে পারি চাষের জন্য—তাহার পরিমাণ আনুমানিক ১১ কোটী একর। এই সংখ্যা নিশ্চয়ই নগণ্য নয়। কিন্তু নগণ্য না হইলেও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত এই বিপুল পরিমাণ ভূমিখণ্ডের সংস্কারের প্রয়োজন আছে, আর সেই সঙ্গে এই ভূমিখণ্ডকে চাষোপযোগী করিতে হইলে প্রয়োজন আছে জনসাধারণের উৎসাহের ও সেই সঙ্গে সরকারের পৃষ্ঠপোষকতার। আর সেই প্রয়োজন নিছক দৈনন্দিন প্রয়োজনেই অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে। কারণ এই বৎসরে ও ভারতবর্ষকে বাহির হইতে ১২০ কোটী টাকার মত খাদ্য শস্য আমদানী করিতে হইবে। যদিও ভারত বিভাগের ফলে পূর্ব্বোক্ত ৪০ কোটী লোকসংখ্যা বর্ত্তমানে দাঁড়াইয়াছে ৩৪ কোটিতে, তবু ও খাদ্য সমস্যার প্রকটতার ভাব কমে নাই, বরঞ্চ পশ্চিম পাঞ্জাব ও পূর্ব্ব বাঙ্গলার শস্য অঞ্চলকে বাধ্য হইয়া পরিত্যাগ করিবার পরে লক্ষ লক্ষ আশ্রয়প্রার্থীকে আশ্রয় দিতে হইয়াছে বলিয়া ঐ সমস্যা আরও বাড়িয়াছে।

ইতিমধ্যেই ভারতসরকারকে চলতি বৎসরের খাদ্য শস্যের ঘাটতি পূরণ করিবার জন্য ৬ লক্ষ ২০ হাজার টন গম, ৬ লক্ষ ১৮ হাজার টন চাউল, ২ লক্ষ ৮৩ হাজার টন ভুট্টা, ১ লক্ষ ৪৬ হাজার টন যব, ১ লক্ষ টন ময়দা ও আরও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য আমদানী করিতে হইয়াছে। শুধু এই বৎসরই নয়; প্রতি বৎসরই আমাদিগকে এই ধরণের খাদ্য-শস্য আমদানী করিতে হয়। ১৯৪৬-৪৭ সালে ভারতবর্ষে ধান ও চাউল আসিয়াছিল ৪ কোটী টাকার, গম আসিয়াছিল ১০ কোটি টাকার, ময়দা ১ কোটী টাকার ও অন্যান্য খাদ্যশস্য আসিয়াছিল ৩ কোটি টাকার মত। আর শুধু ধান, গম, যবই যে আমাদের কিনিতে হয় তাহা নহে, প্রতি বৎসর মাছ, তরিতরকারী, ফল, দুগ্ধ বা দুগ্ধজাত দ্রব্য, জ্যামজেলী ইত্যাদি আমরা কিনিয়া থাকি কোটী কোটী টাকার। খাদ্যশস্য ক্রয় করিবার জন্য যে পরিমাণ অর্থ প্রতিবৎসর আমাদের ব্যয় করিতে হয় ও খাদ্যশস্যের জন্য যে সমস্ত অমূল্য খনিজ পদার্থ বা কাঁচা সম্পদ বাধ্য হইয়া অল্পমূল্যে বা বিনিময়ে বিলাইয়া দিতে হয় তাহার দ্বারা ভারতবর্ষ যে কোন প্রথম শ্রেণীর স্বাধীন রাষ্ট্রের সমকক্ষ হইতে পারিত, যদি কেবলমাত্র খাদ্যশস্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হইত এই ভারতভূমি।

১৯৪৫ সালে ভারতের মোট উৎপন্ন খাদ্যশস্যের পরিমাণ ছিল ৪ কোটি ৪০ লক্ষ টন, ১৯৪৬ সালে ছিল ৪ কোটি টন, ১৯৪৭ সালে উৎপন্ন হইয়াছিল ৪ কোটি ১০ লক্ষ টন। আনুমানিক হিসাবে দেখা যায় যে, উক্ত তিন বৎসরে ভারতবর্ষে আবাদী জমির পরিমাণ যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে কিন্তু উৎপাদন সেই তুলনায় মোটেই বৃদ্ধি পায় নাই। অথচ গত দশ বৎসরে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে পাঁচ কোটির মত।

তবে হায়দরাবাদ সহ ভারত ইউনিয়নে আলোচ্য বৎসরে জোয়ার ও ছোলার চাষ বেশ আশাপ্রদ হইয়াছে। যেখানে ১৯৪৬-৪৭ সালে ৩ কোটী ৭৮ লক্ষ ৪৪ হাজার একর জমিতে ৫২ লক্ষ ৭৭ হাজার টন জোয়ার উৎপন্ন হইয়াছিল; আলোচ্য বৎসরে সেখানে ৩ কোটী ৫৬ লক্ষ ৬৫ হাজার একর জমিতে জোয়ার উৎপন্ন হইয়াছে ৫৭ লক্ষ ৩০ হাজার টন। আর যেখানে ১৯৪৬-৪৭ সালে ১ কোটী ৬৯ লক্ষ ৭১ হাজার একর জমিতে ছোলা উৎপন্ন হইয়াছিল ৩৫ লক্ষ ৯৯ হাজার টন, সেখানে আলোচ্য বৎসরে ছোলা উৎপন্ন হইয়াছে ১ কোটী ৮৪ লক্ষ ৯৮ হাজার একর জমিতে ৪৩ লক্ষ ১০ হাজার টন।

অন্যান্য উৎপন্ন খাদ্যশস্যের বিস্তারিত বিবরণ না পাওয়ায় ব্রিটিশ অধিকৃত ভারতের ১৯৩৮ সাল হইতে ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত পাঁচ বৎসরে উৎপন্ন কয়েকটী প্রধান প্রধান খাদ্যশস্যের আবাদী জমির ও উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ নিম্নে দিলাম। ছকটী সংগৃহীত হইয়াছে ভারতসরকার কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তক হইতে।

৬নং ছক :—

বৎসর	জমির পরিমাণ (লক্ষ একর)	উৎপন্ন দ্রব্য (লক্ষ টন)
	চাউল	
১৯৩৮-৩৯	৬৯৯	২২৯
১৯৩৯-৪০	৭০১	২৪৬
১৯৪০-৪১	৬৮৮	২১০
১৯৪১-৪২	৬৯৬	২৪৩
১৯৪২-৪৩	৭০৪	২৩০
	গম	
১৯৩৮-৩৯	২৬৮	৮০
১৯৩৯-৪০	২৬১	৮৯
১৯৪০-৪১	২৬৪	৮১
১৯৪১-৪২	২৬১	৮২
১৯৪২-৪৩	২৫৯	৯০
	বার্লি	
১৯৩৭-৩৮	৬৩	২১
১৯৩৮-৩৯	৬২	১৯
১৯৩৯-৪০	৬১	২০
১৯৪০-৪১	৬৩	২৩
১৯৪১-৪২	৬৫	২০
	বজরা	
১৯৩৭-৩৮	১২৫	১৯
১৯৩৮-৩৯	১২৮	১৮
১৯৩৯-৪০	১৩৪	২০
১৯৪০-৪১	১৪১	২৯
১৯৪১-৪২	১৪২	২২

উপরিলিখিত সংখ্যাগুলি হইতে খাদ্যশস্যের বর্ত্তমান অবস্থা না জানা যাইলেও কতকটা আভাষ যে পাওয়া যাইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই সংখ্যাগুলিই যথেষ্ট নয়। খাদ্য সমস্যার আতঙ্কে ও ভয়াবহ আশঙ্কায় কোটী কোটী জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা আজ যে ভাবে ব্যাহত হইতেছে তাহার প্রতিবিধান করিয়া সুস্থ ও স্বাভাবিক নাগরিক জীবন ফিরাইয়া আনিতে হইলে আমাদিগকে সুরু করিতে হইবে সত্যকার 'ফসল ফলাও' আন্দোলন। মনে রাখিতে হইবে যে শুধু বড় বড় বিজ্ঞাপন ও সভা সমিতি 'ফসল ফলানর' পক্ষে মোটেই যথেষ্ট নয়। বরঞ্চ যখন লক্ষ লক্ষ দেশবাসী অর্দ্ধাহার আর অনাহারে মৃতপ্রায় হইয়া উঠিতেছে, তখন তাহাদের সামনে এই ধরণের আশার সৌধ রচনা করা মর্ম্মান্তিক প্রহসন ছাড়া আর কিছুই নয়। ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায় তাঁহার 'ফুড ফর ফোর হানড্রেড মিলিয়নস্' গ্রন্থে লিখিয়াছেন 'আমাদের দেশে যা আবাদযোগ্য জমিতে এখনো চাষ হয়, তাহার জন্য প্রয়োজনীয় সেচের ব্যবস্থা করিলে বর্ত্তমান জনসংখ্যা তো দূরের কথা, আরও সাত কোটী লোকের প্রয়োজনীয় খাদ্য উৎপন্ন হইতে পারে। তিনি সেই কথা লিখিয়াছিলেন ১৯৩৮ সালে। আজ দশ বৎসর পরে ১৯৪৮ সালেও আমরা সেই প্রয়োজনই অনুভব করিতেছি। বিগত দশ বৎসরে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইলেও উন্নততর সেচ ব্যবস্থা করিয়া চাষের উন্নতি করিয়া খাদ্য সমস্যা রোধ করার কোন ব্যবস্থাই হয় নাই। তাই আজও আমাদের নতুনতর ব্যবস্থারই প্রয়োজন আছে। আর আছে বলিয়াই ব্যবস্থা হইতেছে বিভিন্ন নদীর উপত্যকায়—উন্নততর সেচ ব্যবস্থায়। কিন্তু যেভাবে সুদূর-প্রসারী পরিকল্পনা লইয়া সরকার অগ্রসর হইতেছে, তাহাতে সেদিনকার আনন্দোজ্জ্বল দিনগুলিকে দেখিয়া যাইবার মত সৌভাগ্য অনেকেরই হইবে কিনা সন্দেহ। তবু সুফল যে ফলিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের বিগত পাটনা অধিবেশনে ডাঃ বীরেশ গুহ এই প্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছেন, সেই কথা কয়টি উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধটী শেষ করিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। তিনি বলিয়াছিলেন—"আমাদের দেশে আগামী দশ বৎসরের মধ্যে প্রতি একর জমিতে খাদ্য শস্যের শতকরা ৩০ ভাগ বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। তবে, তার জন্য আগে প্রয়োজন জমি বিলি ব্যবস্থার আমুল পরিবর্ত্তন ও কৃষি জীবীদের সাহায্য দান।......

......বৃটেন বৎসরে ৪০০ কোটী টাকা ব্যয় করে কৃষি খাতে। আমাদের অন্ততঃ ৫০ কোটী টাকা ব্যয় করা প্রয়োজন।"

ভেজাল

শ্রীকানাইলাল বসু

১নং গল্প

যাত্রা করিবার সময় হইল।

এতক্ষণ যে ক্রন্দন চাপা ছিল, ছলছল চক্ষু ও ফোঁস ফোঁস নাসার মধ্যে বন্দী ছিল। তাহা এইবার পথ কাটিয়া আত্মপ্রকাশ করিল। মা কাঁদিয়া উঠিলেন—'ও গো তুমি কোথা গেলে গো—তোমার এত আদরের নাদুকে একবার দেখে যাও গো…'

পিসিমাও গলা দিলেন—'ও গো দাদা গো, একটিবার এস গো। এমন রাজপুত্তুর ছেলেকে ফেলে কেমন করে চলে গেলে গো…'

বাড়ীর সামনে অনেক লোকের ভিড়। কতক সঙ্গে যাইবে বলিয়া সাজিয়া প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছে। কতক আসিয়াছে দেখা করিতে, এইখান হইতেই লৌকিকতা রক্ষা করিয়া বিদায় লইবে। আর অনেকে আছে নিঃসম্পর্কীয় দর্শক, তাহাদের মধ্যে পাড়াপড়শীও আছে, পথের পথিকও আছে—চলিতে চলিতে দাঁড়াইয়া পড়িয়াছে। ভিড়ে রাস্তা প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

এমন সময়ে ভিড় ঠেলিয়া পাড়ার নরকিং সেজবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অত্যন্ত ব্যস্ত ও কর্মী লোক। পাড়া সুদ্ধ সকলেরই সেজবাবু। সকলের সকল প্রয়োজনেই আছেন। শ্মশানে বা রাজদ্বারে, উৎসবে ব্যসনে তাঁহাকে বাদ দিয়া কাহারও চলে না। শবদাহই হোক আর ফুলশয্যাই হোক, সেজবাবুর ব্যবস্থা আর হাঁকডাক না হইলে কোন কার্যই সুসম্পাদিত হয় না।

সেজবাবু আসিয়াই হাঁকিলেন—'কই হে, তোমরা এখনও বেরোও নি? এখনও সব গুলতুনি করছ এখানে? ছি ছি—'

একজন বলিলেন 'না, এই যে ফুলের মালাগুলো আনতে গিয়েছিল কিনা—'

'এত রাত্তিরে ফুলের মালা আনতে গেছে? কেন, এতক্ষণ কী করছিল সব? দরকার নেই ফুল, বেরিয়ে পড়—'

'আজ্ঞে না, সে এসে গেছে। আমরা রেডি। নাদু নাবলেই হয়, তাহলেই বেরিয়ে পড়ি।'

সেজবাবু কিঞ্চিৎ নরমসুরে বলিলেন—"হ্যাঁ, আর দেরি করা নয়। বেরিয়ে পড়, বেরিয়ে পড়। এই বিষ্টিবাদলার রাত, অনেকখানি পথ। কই, নাদুকে ডাকো না। কী করছে সে? ডাকো ডাকো।"

বলিতে বলিতে অপরের ডাকের অপেক্ষায় না থাকিয়া তিনি নিজেই বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলেন এবং উঠানে দাঁড়াইয়া স্বাভাবিক উচ্চকণ্ঠ উচ্চতর করিয়া হাঁক পাড়িলেন—'নাদু-উ-উ-নাদু কোথায়? নেমে এস, নেমে এস। আর দেরি করবার সময় নেই। ওখানে কে দাঁড়িয়ে? নেপেনবাবু? নাদুকে নিয়ে নেমে আসুন!'

উপরের বারান্দা হইতে নাদু নামক এবাড়ীর বড় ছেলের মাতুল নৃপেনবাবু জবাব দিলেন—'হ্যাঁ, এই যে, মেয়েরা সব ছাড়ছেন না সেজবাবু ধমক দিলেন—"আঃ, মেয়েদের কথা ছেড়ে দিন। মেয়েদের সঙ্গে আপনারাও কি মেয়ে হয়ে গেলেন নাকি? হোপলেস্!"

নাদু রহিয়াছে মেয়েদের মধ্যে। তাহাকে ও তাহার বিধবা জননীকে ঘেরিয়া পিসি মাসি খুড়ী জেঠীর দল। নৃপেনবাবু অদূরে দাঁড়াইয়া ডাকিলেন—'নাদু, বাবা, আর দেরি কোরো না। চলে এস বাবা।'

কিন্তু চলিয়া আসা অত সহজ নহে। কান্না আর থামে না। মা পিসি তো আছেন, সমবেত মহিলারা সকলেই চোখ মুছিতেছেন, নাক টানিতেছেন। যাঁহারা বলিতে কহিতে পারেন, তাঁহারা বুঝাইতেছেন—"অমন কোরো না, ও নাদুর মা, চুপ করো, চুপ করো।"

"কী করবে বল দিদি, সংসারের নিয়মই এই। তুমি কেঁদে কী করবে বল। ছেড়ে দাও নাদুকে।"

"হ্যাঁ। তোমার নাদু খাঁদু বেঁচে থাক। ওদের নিয়ে সুখী হও মা। কাঁদতে নেই। ভগবানের বিধেন। কেঁদো না মা, কেঁদো না" ইত্যাদি ইত্যাদি।

২নং গল্প

বৃদ্ধ রাধানাথ শান্তভাবে বসিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছেন।

ইহা আর একদিনের, আর এক বাড়ীর কথা। এক নং গল্পের সহিত ইহার কোনও সংস্রব নাই। তবে ইহাও ভেজাল। তাই এক সঙ্গে বিবৃত হইতেছে।

এক গৃহস্থ-বাড়ীর এক কক্ষে গৃহস্বামী বৃদ্ধ রাধানাথ এক কোণে চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। মৃদু হাস্যমাখা তাঁহার প্রশান্ত মুখ। সেই কক্ষে এক কিশোরী কন্যার অঙ্গসজ্জার আয়োজন চলিতেছে। সুবাসিত তেল, স্নো, পাউডার, আলতা, ক্রিম ইত্যাদি আসিয়াছে। বড় বোন চুল আঁচড়াইয়া দিল, মেজ বোন মুখে স্নো ঘষিয়া পাউডারের মৃদু প্রলেপ মাখাইয়া দিল, সুন্দর দুইটি নিমীলিত চোখের কোণে অঞ্জনের সূক্ষ্ম রেখা টানিয়া দিল ও দুইটি বঙ্কিম ভ্রূর সংযোগস্থলে অস্ত সূর্যের মতো উজ্জ্বল স্নিগ্ধ রক্তবর্ণের টিপ আঁকিয়া দিল। মা-মাসী অলক্তরাগে দুই চরণ রাঙাইয়া দিল। বড় বোন কেশচর্চা সারিয়া চন্দনের তারকায় ললাট হইতে কপোল অবধি চিত্রিত করিয়া দিল। স্বভাবসুন্দর তরুণ মুখখানি অপার্থিব শোভায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে।

কন্যার সেই নয়নাভিরাম মুখখানি স্নেহকরুণ দৃষ্টিতে নির্নিমেষে দেখিতেছেন রাধুবাবু। তাঁহার মুখে শিশুর মতো অর্থহীন হাসির আভাস।

এমন সময় এক যুবক ঘরে প্রবেশ করিয়া মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—"হল তোমাদের? আর দেরী করিসনে সরো, ছেড়ে দে।"

বড় বোন সরোজ বলিল—"এই হয়েছে। খালি কাপড়টা জামাটা পরানো এইবার। বাবাকে নিয়ে বাইরে যাও সুধীরদা।"

রাধুবাবুর কাছে গিয়া সুধীর বলিল—"আসুন কাকা, আমরা বাইরে যাই এবার।"

"বাইরে? কেন, বাইরে যাব কেন?" সরল অবোধ চোখ তুলিয়া প্রশ্ন করিলেন রাধুবাবু।

সুধীর বলিল—"কাপড় পরাবে কিনা, তাই। আসুন।"

"কাপড় পরাবে? ও, আচ্ছা, আচ্ছা।" আমি যাচ্ছি। অত্যন্ত অনাবশ্যক রকম ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া পড়িলেন রাধুবাবু। দরজার কাছে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"হ্যাঁ, কোন কাপড়টা পরাচ্ছিস সরো?"

সরো বলিল—"এই যে, এই নতুন ফিরোজা রঙের শাড়ীখানা।"

"ফিরোজা? দেখি।"

হাতে লইয়া দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়া রাধুবাবু বলিলেন—"এটা তো ও-ই পছন্দ করে কিনেছিল না রে? তা বেশ, দে, এইটেই পরিয়ে দে।"

কাপড় ফিরাইয়া দিয়া বৃদ্ধ চুপি চুপি সুধীরকে বলিলেন—"দেখেছ সুধীর? মুখখানি দেখেছ? এই মেয়েকে তুমি কালো মেয়ে বলবে?"

উহারা বাহির হইলে মেয়েদের একজন উঠিয়া দরজাটা বন্ধ করিয়া দিল। বাহিরে আসিয়া সুধীর কহিল—"আপনি আর এদিকে থেকে কী করবেন কাকা? নীচে আসুন না। নীচে হরিচরণদা এসেছেন, কালু জ্যাঠা এসেছেন আপনার সঙ্গে দেখা করতে।"

রাধুবাবু মাথা নাড়িয়া কহিলেন—"নাঃ, বড়ো বকায় ওরা। কেবল এ কেমন আছে, ও কেমন আছে, জ্বর কতো, কাশি কেমন। ও আমার ভালো লাগে না। আমি এইখানেই থাকি।"

"কাকীমার কাছে কে আছে? সেখানে কি—"

"সেখানে আছে, লোক আছে। নতুন নার্স'টা আছে। আমি এখানেই থাকি।"

সুধীর নামিয়া গেল। রাধানাথ বারাণ্ডায় পায়চারি করিতে লাগিলেন।

১নং গল্প

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

দুমদাম্ পা ফেলিয়া ভারী শরীর লইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে সেজবাবু উঠিয়া আসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সকলে তটস্থ হইল। এমন কি রোদনধ্বনিও স্তব্ধ হইয়া গেল। নিতান্ত বৃদ্ধারা ব্যতীত সকলেরই গুরুজন সেজবাবু। তাঁহার রসনাকে ভয় করে না এমন লোক প্রায় নাই পাড়ায়।

সেজবাবু গর্জন করিলেন—"কী মনে করেছ তোমরা

সব শুনি? সমস্ত রাত এমনি কান্নাকাটিই চলবে না কি? হ্যাঁ বৌঠান?"

নাড়ুর জননী উত্তর দিলেন না, কেবল মাথার কাপড়টা সামান্য টানিয়া দিলেন।

"যত সব মেয়েলি কাণ্ড! দেখদিকি, ছেলেটাকে সুদ্ধু কাঁদাচ্ছ তোমরা। ধন্যি আক্কেল তোমাদের। কাঁদতে পেলেই হোলো, আর কিছু চাও না।"

এক বৃদ্ধা নাক ঝাড়িয়া গলা পরিষ্কার করিয়া লইয়া বলিলেন—"ওমা, অমন কথা বলিসনে ফটে, কাঁদবে না? এতটুকুটি রেখে বাপ গেলো, সেই নাড়ু আজ মানুষ হয়েছে। রাজপুত্তুর সেজে বউ আনতে যাচ্ছে, আহা কাঁদবে না? আজ যদি ওর বাবা বেঁচে থাকতো—"

সেজবাবু ধমক দিলেন—"থামো ছোটখুড়ি। তোমাদের কেবল ঐ আছে। সেই বিশ বছরের শোক আজ উথলে উঠলো শুভকর্ম্মের গন্ধ পেয়ে! একটা ছুতো পেলে হয়, অমনি কান্নার পুঁটুলি খুলে বসলে। এই ছুঁড়িগুলো, তোরা হাঁ করে শাঁক হাতে করে দাঁড়িয়ে আছিস যে? বাজাতে জানিস না?"

ভাড়া-করা রাজবেশ-পরিহিত শ্রীমান নাড়ুকে লইয়া সেজবাবু নীচে চলিলেন। এক সঙ্গে অনেকগুলি শাঁকের ধ্বনি উঠিল।

এবং তাহার মধ্যে সেই বৃদ্ধা বিড় বিড় করিতে লাগিল—"ফটেটার সবই যেন গোঁয়ার্তুমি। আহা কাঁদবে না গা, কী অনাছিষ্টি কথা।"

২নং গল্প

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

বৃদ্ধ রাধানাথ হাসিতেছেন।

তাঁহাকে ঘেরিয়া পাড়ার কয়েকটি সহানুভূতিশীল প্রবীণ ব্যক্তি বসিয়া আছে। সুধীরও আছে। রাধানাথ হঠাৎ হা হা শব্দে হাসিয়া উঠিলেন।

হরিচরণবাবু বলিলেন—"দরজাটা বন্ধ করে দাও সুধীর। তোমার কাকীমার কানে গেলে চমকে উঠবেন।"

দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া সুধীর বলিল—"চুপ করুন কাকা। অমন করে হাসছেন কেন? চুপ করুন।"

রাধানাথ বলিলেন—"হাসবো না? কালুদার কথা শুনেছিস? আমাকে বোঝাচ্ছেন দুঃখ করো না, জন্ম-মৃত্যু সবই ভগবানের হাত, আমাকে বোঝাচ্ছেন। আরে দুঃখুটা আমি করলুম কখন বল? আমি কি জানি নে, ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন। মেয়েটা আর দু'বছর পরে গেলে, সে তো যেতোই, মাথা গোঁজা বাড়ীখানাও বিক্রি করিয়ে যেতো। বুদ্ধিমতী মেয়ে, জানে তো বড়দি মেজদির জন্যে বাঁধা পড়েছিল, এবার তার জন্যে বিক্রি হোতো। তাই চলে গেল আগে হতেই। তার জন্যে দুঃখু করব আমি? পাগল নাকি? হাঃ হাঃ হাঃ·

কালুবাবু জনান্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার কাকীমার অবস্থাটা আজ কেমন সুধীর? তিনি শুনেছেন নাকি?"

সুধীর বলিল—"অবস্থা সেই একই, আচ্ছন্নভাবে পড়ে আছেন। এক একবার হুঁশ হয়, জিজ্ঞেস করেন খুকি কেমন আছে? মিথ্যে কথা বলা হয়—ভালো আছে! শোনালে এখুনি হয়ে যাবেন, আর না শোনালেও হার্টের যা অবস্থা, উনিও আর বেশি দিন নন।"

"আহা। এমন দুঃসময়ও মানুষের হয়।" কালুবাবু একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

নিবারণবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"মেয়েরা সব কোথায়? কান্না-কাটি করছে খুব?"

কালুবাবু বলিলেন—"আহা, তা আর করবে না, অত বড় বোনটা—"

সুধীর কহিল—"আজ্ঞে না, কাঁদবার কি উপায় আছে? কাকীমার কাছেই তো আছে সব। এতক্ষণ এটাকে সাজিয়ে টাজিয়ে দিচ্ছিল। ওরা বেরিয়ে গেলে আমি বল্লুম—চ ও-বাড়ী থেকে, মানে আমাদের বাড়ী থেকে ঘুরে আসবি। তা গেল না। বলে, যতক্ষণ মায়ের কাছে থাকতে পাই। তাদেরই হয়েছে সবচেয়ে বিপদ, কান্না গিলে ফেলে মুখে কাপড় পুরে দিয়ে বসে আছে।"

শ্রোতারা 'আহা' করিয়া উঠিল। হরিচরণ বলিলেন—"উঃ, কী শাস্তি! অত বড়ো মেয়েটা মরে গেল, মায়ের পেটের বোন, তা মুখ ফুটে একবার কাঁদবার জো নেই। ওদিকে মাটা শুষছে, এদিকে বাপটার মাথার ঠিক নেই। ভগবানের যে কী লীলা তা বুঝি না। আহা।"

রাধানাথ বলিলেন—'আহা আহা করছো কেন গো!

দেখেছ বুঝি? আমার খুকীমাকে দেখেছ? যাও, দেখে এস গে ওপোরে গিয়ে। মনে কর কালো মেয়ে বুঝি সুন্দর হয় না। যাও, একবার দেখে এস। বলে কিনা কালো মেয়ে—হাঃ হাঃ হাঃ…"

সুধীর বলিল—'আপনি আবার হাসছেন কাকা? খুকী মরে গেছে, তাকে এই মাত্তর শ্মশানে নিয়ে গেছে, আর আপনি হাসছেন? আপনার খুকী মরে গেছে, বুঝতে পারছেন না?

বুঝিয়াছেন এই ভাবে মাথা নাড়েন রাধানাথ। তাঁহার মুখের বিকৃত হাসি বন্ধ করিবার চেষ্টায়, তাঁহার চোখে দুই ফোঁটা অশ্রু আনাইবার উদ্দেশ্যে সুধীর নির্মম হইয়া বার বার শুনাইতেছে—তাঁহার স্নেহের কন্যা মারা গিয়াছে।

কেমন এক রকম ভাবে চাহিয়া শোনেন রাধানাথ, মাথা নাড়েন, কিন্তু মুখের হাসি তাঁহার নিবিতে চায় না।

মৌর্য্য সাম্রাজ্য ও অশোক

ডক্টর বিনয়চন্দ্র সেন, এম-এ, বি-এল, পি-আর-এস, পি-এইচ-ডি (লণ্ডন)

মৌর্য্য সাম্রাজ্য গঠনের ইতিহাসে অশোকের প্রকৃত স্থান নির্দ্দেশ করিতে হইলে কয়েকটি সিদ্ধান্ত যথা সম্ভব নির্ভুল হওয়া উচিত। কারণ কতকগুলি ভ্রান্ত বা অর্দ্ধ-সত্য ধারণা লইয়া এ ক্ষেত্রে বিচার করিতে অগ্রসর হইলে আমরা আসল তথ্য উদ্ধার করিতে অসমর্থ হইব। ঐতিহাসিক ও গবেষকগণ এ পর্য্যন্ত আমাদিগকে যাহা শুনাইয়াছেন, তাহা হইতে সাধারণতঃ আমরা নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছি :—

(১) যে বিরাট মৌর্য্য-সাম্রাজ্যের পরিচয় অশোক-অনুশাসন ও অন্যান্য প্রমাণাদিতে পাওয়া যায়, অশোকের পূর্ব্বেই সেই সাম্রাজ্য মোটামুটিভাবে তার চিহ্নিত সীমানা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল, অশোক শুধু কলিঙ্গ দেশ অধিকার করিয়া ঐ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন; ইহা ছাড়া তিনি আর কোন দেশই জয় করেন নাই।

(২) কলিঙ্গদেশ বিজয়ের পর অশোক ধর্ম্ম-বিজয়ে মনোনিবেশ করেন। তাঁহার নিজ জীবনের কর্ম্ম-তালিকা দিবার সময় অশোক যে অর্থে 'ধর্ম্ম বিজয়' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা হইতেছে তাঁহার প্রচারিত 'ধর্ম্মের' সাফল্য; ধর্ম্ম বিজয় তাঁহার নিজ জীবনে রাজনীতি-সংজ্ঞাজ্ঞাপক কোন বিশেষ অর্থ বহন করে নাই।

(৩) অশোক যে ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, তাহার অন্যতম প্রধান তত্ত্ব ছিল—অহিংসানীতি ও অস্ত্র প্রয়োগের অস্বীকৃতি। তিনি সৈন্যবিভাগ উঠাইয়া দেন নাই, কিন্তু তিনি কলিঙ্গ যুদ্ধের পর কোন সামরিক উদ্যম ও প্রচেষ্টায় সৈন্যবাহিনী নিযুক্ত করিয়াছিলেন বলিয়া কোন প্রমাণ নাই। সামরিক বিভাগ দীর্ঘকাল নিশ্চেষ্ট ও নিরুদ্যম অবস্থায় থাকিয়া হতবীর্য্য হইয়া পড়িয়াছিল, সুতরাং মৌর্য্য সাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম কারণ, অশোকের সামরিক নিস্পৃহতা ও সৈন্যবাহিনীর উপর উক্ত নীতির প্রভাব।

এই সিদ্ধান্তগুলি যে সকল প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে তাহার কতকগুলি ত্রুটির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতে বাধ্য: সেই ত্রুটিগুলির প্রতি আমরা ভ্রূক্ষেপ করি না; কারণ অশোককে আমরা প্রধানতঃ ধর্ম্মপ্রচারক বৌদ্ধ সম্রাট্‌রূপে দেখিতেই অভ্যস্ত হইয়াছি এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এবংবিধ নৃপতির ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটা স্বাভাবিক, এই অবিসংবাদিত সত্য মানিয়া লইয়া অশোককে বিচার করিয়া একদিকে তাঁহাকে যেমন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নৃপতিবৃন্দের সঙ্গে একাসনে বসাইয়াছি, অন্যদিকে মৌর্য্য সাম্রাজ্যের পতন-সংশ্লিষ্ট বহু দুর্ভোগ ও বিড়ম্বনার জন্য তাঁহাকে দায়ী করিয়াছি। কেহ কেহ অবশ্য তাঁহার পক্ষে ওকালতী করিয়া এই দায়িত্ব হইতে তাঁহাকে অব্যাহতি দিবার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের যুক্তিতে অপর পক্ষের সিদ্ধান্ত যে প্রমাণ সাক্ষেপ সেই মৌলিক প্রমাণ পরীক্ষা করিবার বিশেষ উৎসাহ দেখা যায় না।

এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে প্রচলিত সমস্ত যুক্তির বিচার অসম্ভব, শুধু উপরি উদ্ধৃত সিদ্ধান্তগুলি সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিয়া ক্ষান্ত হইব। প্রথম সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এইরূপ :—

অশোকের পূর্ব্বে মৌর্য্য সাম্রাজ্য যে পরিপূর্ণভাবে গঠিত হইয়া গিয়াছিল, তাহার কোন অভ্রান্ত প্রমাণ আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। অশোক-অনুশাসনে যে সীমানার ইঙ্গিত পাওয়া যায়, সেই সীমানা তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী যুগেই চিহ্নিত হইয়া গিয়াছিল, ইহা কিছুটা ঐতিহাসিকের ধারণা মাত্র। বৈদেশিক লেখক বলিয়াছেন, চন্দ্রগুপ্ত সারা ভারত জয় করিয়াছিলেন, কিংবা বহু পরবর্ত্তী যুগের লিপিতে বা তামিল সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত কোন কোন কিম্বদন্তীতে দক্ষিণ ভারতে চন্দ্রগুপ্ত বা মৌর্য্যদিগের অধিকার স্থাপনের কথা পাইয়া কিংবা দ্বিতীয় খৃষ্টাব্দে রচিত রুদ্রদমনের গির্ণার অনুশাসনে চন্দ্রগুপ্তের নাম দেখিয়া আমরা চন্দ্রগুপ্তের কৃতিত্ব সম্বন্ধে যে ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াছি, তাহার প্রমাণ আমাদের

পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তের পক্ষে কতটুকু বিশ্বাসযোগ্য, অনুকূল ও যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইবার যোগ্য তাহা ভাল করিয়া বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক। বিন্ধ্য পর্ব্বতের দক্ষিণে চন্দ্রগুপ্ত কি তাঁহার পুত্র বিন্দুসার মৌর্য্য প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তাহাও স্থির করিতে না পারিয়া এই সিদ্ধান্ত করিয়া থাকি যে, উঁহাদের মধ্যে যে কোন একজনই নিশ্চয় এই গুরুতর কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছিলেন। কিন্তু অশোক তাঁহার অনুশাসনে যে সকল দেশের উল্লেখ করিয়াছেন, মৌর্য্য সাম্রাজ্যের সহিত তাহাদের যে সম্বন্ধের কথা জানিতে পারি, সেই সকল দেশের সহিত ঠিক ঐ সম্বন্ধ অশোক-পূর্ব্ব যুগ হইতেই বর্ত্তমান ছিল, না অশোকের রাজত্বকালেই তাহার উদ্ভব হইয়াছিল, এই প্রশ্ন উত্থাপন করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। অবশ্য, যখন অশোকের অনুশাসন ভারতের বিভিন্ন স্থানে পাওয়া গিয়াছে, এবং তাঁহার অনুশাসনে বহু দেশ বিজয়ের কোন প্রত্যক্ষ দাবীর কথা উল্লিখিত হয় নাই, তখন মৌর্য্য সাম্রাজ্যের অধিকাংশই যে অশোক-পূর্ব্ব যুগে প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছিল তাহা সন্দেহ না করিলেও চলিতে পারে। সাধারণভাবে এই ধারণার যৌক্তিকতা অস্বীকার করিতে পারি না, কিন্তু সাম্রাজ্যের যে বিশিষ্ট মূর্ত্তিটির সহিত অশোক-অনুশাসনের মধ্য দিয়া আমাদের পরিচয় ঘটে, মৌর্য্য-সাম্রাজ্যের সেই মূর্ত্তিটি কোন্ ঘটনাবলী ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার নিগূঢ় নিয়মে গড়িয়া উঠিয়াছিল, সেই ঘটনাবলী ও অবস্থার সঙ্গে অশোকের কতখানি সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ছিল, তৎসম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পক্ষে অবশ্য বিশ্বাস্য সমসাময়িক প্রমাণের অভাব আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, অশোকের রাজত্বকালে মৌর্য্য সাম্রাজ্যের সহিত অন্ধ্রদিগের যে সংযোগ লক্ষ্য করা যায় তাহা কত প্রাচীন, তাহা নিরূপণ করিবার কি কোন অভ্রান্ত প্রমাণ বাহির হইয়াছে? অশোক ভোজ, রিষ্টিকের উল্লেখ করিয়াছেন, ইহাদের সহিত তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী মৌর্য্যদিগের সম্বন্ধ অনুরূপ ছিল কি না, তাহাও কি সঠিকভাবে আমাদের জানার উপায় আছে? মহাপদ্ম নন্দ ক্ষত্রিয়দিগকে নির্ম্মূল করিয়া একচ্ছত্র অধিকার স্থাপন করিয়াছিলেন, পুরাণোক্ত এই প্রমাণের উপর বিশেষ ভাবে নির্ভর করিয়া ও কলিঙ্গরাজ খারবেলের অনুশাসনে নন্দ নামের উল্লেখ দৃষ্ট হওয়ায় আমরা মগধ সাম্রাজ্যের ক্রমবর্দ্ধন সম্বন্ধে একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি। মোট কথা, মৌর্য্য সাম্রাজ্য গঠনের গৌরব শুধু চন্দ্রগুপ্ত বা বিন্দুসার বা এই দুইজনের উপর যুক্তভাবে আরোপ করিয়া আমরা অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া আছি, অশোককে শুধু কলিঙ্গদেশ জয়ীরূপে স্বীকার করিয়া সেই গৌরবের সামান্য একটু অংশ অর্পণ করিতে দ্বিধা করি নাই, কিন্তু মনে হয় তাঁহার প্রাপ্য আরও অনেকটা বেশী।

এইবার আমরা প্রমাণের উল্লেখ করিব :—

প্রথমে অশোকের ত্রয়োদশ গিরিলিপিখানি আর একবার পড়িয়া দেখিতেছি। এই গিরিলিপি প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে :—(১) প্রথমাংশে কলিঙ্গ যুদ্ধ এবং ঐ যুদ্ধে লোকক্ষয় ও অন্যান্য ক্ষতির কথা উল্লেখ করা হইয়াছে; (২) দ্বিতীয়াংশে ধর্ম্ম-বিজয়ের প্রসঙ্গ উত্থাপিত এবং উহার ভৌগলিক সীমানা সূচিত হইয়াছে; (৩) তৃতীয়াংশে অশোক তদীয় পুত্র প্রপৌত্রদিগের উদ্দেশ্যে দেশ-বিজয় সম্বন্ধে তাঁহার উপদেশ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

প্রথমাংশ পাঠ করিয়া বেশ বুঝিতে পারি, কলিঙ্গযুদ্ধের ফলেই কলিঙ্গদেশ অশোক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। কিন্তু একটি কথা অনুধাবন করা প্রয়োজন, ত্রয়োদশ গিরিলিপির কোথাও অশোক বলেন নাই, তিনি কলিঙ্গবিজয়ের পর দেশ জয়ের সংকল্প একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছেন এবং তিনি ভবিষ্যতে আর কখনও যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবেন না।

এই কথা অবশ্য সত্য, কলিঙ্গযুদ্ধে যে প্রভূত ক্ষতি সাধিত হইয়াছিল, তজ্জন্য অশোক অনুতপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি নিজেই বলিয়াছেন—ঐ ক্ষতির শত বা সহস্র ভাগ ক্ষতি ঘটিলেও তিনি তীব্র অনুশোচনা বোধ করিতেন, অর্থাৎ যে যুদ্ধে উক্ত পরিমাণ লোকক্ষয় ও অন্যান্য ক্ষতি হয়, সেই যুদ্ধের প্রতি অশোকের সত্যই বৈরাগ্য আসিয়াছিল। অনুতাপের কারণ শুধু কলিঙ্গ যুদ্ধই নয়, অন্য কারণেও তাঁহার অনুতাপের সৃষ্টি হইয়াছিল। সেই কারণটির প্রতি আমাদের দৃষ্টি পতিত হওয়া প্রয়োজন। কলিঙ্গ-বিজয়ের উল্লেখের অব্যবহিত পরেই অশোক আটবিক দেশের নাম করিয়াছেন এবং ইহার কথা বলিতে গিয়া তিনি আবার তাঁহার অনুতাপ প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং যদি এই সিদ্ধান্ত করা যায় আটবিক দেশজয় করিতে তাঁহাকে সামরিক অস্ত্র প্রয়োগ করিতে হইয়াছিল, তাহা হইলে সেই মতের বিরুদ্ধে কোন যুক্তির অবতারণা করা যায় কি না, তাহা জানিতে ইচ্ছা হয়। আটবিক দেশের কথা বলিতে গিয়া অশোক তাহাকে 'বিজিত' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন ('বিজিতে ভোতি')। উহা পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার রাজ্যের অন্তর্গত ছিল এই ধারণা করিলে অশোকের অনুতাপের কোন কারণ এবং সেই অনুতাপ কলিঙ্গযুদ্ধজনিত অনুতাপের সহিত সমপর্য্যায়ে প্রকাশ করিবার যুক্তি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সুতরাং 'বিজিতে ভোতি'র অর্থ এইভাবে করিতে হইবে; যাহা বিজিত হইয়াছে, অর্থাৎ অশোক স্বয়ং যাহা বিজয় করিয়াছেন। আটবিক ভূভাগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া অশোক ঐ স্থান তাঁহার অধিকারভুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু ত্রয়োদশ গিরিলিপি যে সময়ে লিখিত হইয়াছিল, তখন পর্য্যন্ত ঐ দেশের প্রতিপক্ষতা বা বিরোধিতা সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হয় নাই, অশোকের উক্তি হইতেই তাহা প্রতীয়মান হয়। তিনি বলিয়াছেন,—ঐ দেশের অধিবাসিগণ যেন তাহাদের ব্যবহারে অনুতপ্ত হয়। তাহা হইলেই তিনি উহাদের ধ্বংস বা ক্ষতিসাধন করিবেন না; তাহারা যেন হৃদয়ঙ্গম করে অশোক স্বয়ং, অনুতপ্ত হইলেও প্রভাবশীল। মনে হয়, কলিঙ্গযুদ্ধের পরে তিনি আটবিক দেশের সহিত সংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু শেষোক্ত যুদ্ধের সহিত কলিঙ্গযুদ্ধের পার্থক্য, এই স্থানে যে, তিনি উহাতে অবারিতভাবে ক্ষতিসাধন করিয়া স্বীয় উদ্দেশ্য লাভের চেষ্টা হইতে বিরত হইয়াছিলেন। তথাপি এই যুদ্ধে যতটুকু ক্ষতি হইয়াছিল তাহার জন্যও মহানুভব সম্রাটের অনুশোচনার উদ্রেক হইয়াছিল। ইহার পর ধর্ম্মবিজয় প্রসঙ্গে যে সকল দেশ বা রাজার

নাম উল্লিখিত হইয়াছে, তৎসম্পর্কে 'অনুতাপ' শব্দের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায় না। কলিঙ্গদেশ বিজয়ের পর ঐ দেশস্থ অপকর্ম্মকারীদিগের প্রতি তাঁহার নীতি কি হইবে তাহা যেমন অল্প কথায় তিনি বিশদ্‌ভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন, তেমনই আটবিকদিগের প্রতি তৎকর্তৃক কি নীতি অবলম্বিত হইবে তাহাও প্রকাশ করিয়াছেন। অনুনয়ের দ্বারা, যুক্তির দ্বারা বিজিত আটবিকদিগকে বশীভূত করিতে হইবে, তাহারা তাহাদের ব্যবহারে লজ্জিত বোধ করিলেই তিনি তাহাদিগকে ধ্বংস করিবেন না। তাহাদের লজ্জিত হইবার কারণ কি? যদিও ইহার কোন স্পষ্ট উত্তর অশোক-বচনে পাওয়া যাইতেছে না, তথাপি এই অনুমান করা যাইতে পারে, অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল দেশ যদি অশোকের ন্যায় প্রবল পরাক্রান্ত সম্রাটের আনুগত্য অস্বীকার করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার উত্তেজনা প্রদর্শন করে, কিংবা প্রত্যক্ষ সংগ্রাম আমন্ত্রণ করিয়া বসে, তাহা হইলে তাহার অবশ্যম্ভাবী ভয়াবহ পরিণামের কথা স্মরণ করিয়া তাহাদের অনুসৃত নীতি ও কৃতকর্ম্মের প্রশংসা করা চলে না। স্বাধীনতাকামী কলিঙ্গ দেশ ও আটবিক দেশ উভয়েরই দোষ একই শ্রেণীর; শুধু কলিঙ্গ দেশ নয়, আটবিক দেশেও সংগ্রামের দ্বারা অশোক তাহা বুঝাইয়া দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এইজন্যই কলিঙ্গ ও আটবিক ভূভাগকে একই সঙ্গে উল্লেখ করা হইয়াছে। অশোক একদিকে যেমন তাঁহার অনুতাপের কথা বলিয়াছেন, অন্যদিকে তাঁহার প্রভাব ও ক্ষমতার প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন; প্রয়োজন হইলে তিনি অপকারকদিগের নিধন সাধন করিয়া তাঁহার ক্ষমতার পরিচয় দিতে ইতস্ততঃ করিবেন না, এই উক্তি করিতে তিনি দ্বিধাবোধ করেন নাই।

ইহার পর ত্রয়োদশ গিরিলিপির দ্বিতীয় অংশের আরম্ভ। এই অংশে তিনি ধর্ম্মবিজয় সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া প্রারম্ভেই বলিয়াছেন যে, যাহাকে ধর্ম্মবিজয় আখ্যা দেওয়া হয়, সেই ধর্ম্মবিজয়কেই প্রিয়দর্শী শ্রেষ্ঠ বিজয়রূপে গণ্য করিয়া থাকেন, "অয় চ মুখ-মুত বিজয়ে দেবনংপ্রিয়স যো ধ্রমবিজয়ো।" ঠিক এই ঘোষণার আগেই যে কয়টি কথা আছে, অশোকের নীতি অবগত হইবার পক্ষে তাহার চেয়ে মূল্যবান্ কথা আর কোথাও খুঁজিয়া পাই নাই, এই কথা কয়টি হইল—'ইচ্ছতি হি দেবনংপ্রিয়ো সর্ব-ভুতন অক্ষতি সংযমং সম (চ) রিয়ং রভসিয়ে'। উদ্ধৃত অংশের শেষ শব্দ 'রভসিয়ে' শুধু সাহ্‌বাজগড়হিতে প্রাপ্ত ত্রয়োদশ গিরিলিপিতেই পাওয়া যায়। অন্যত্র এই শব্দের স্থলে 'মাদব' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। মনিয়র উইলিয়ামস 'রভস' শব্দের অর্থ নির্ণয় করিতে গিয়া যে সকল ইংরাজি প্রতিশব্দ দিয়াছেন তাহার কয়েকটি তুলিয়া দিতেছি,—Violent, impetuous, fierce, wild। বিনা বাধায় আমরা অশোক-ব্যবহৃত শব্দটি সংগ্রাম-অর্থে গ্রহণ করিতে পারি। এই সংগ্রামে বলপ্রয়োগ খুব উগ্র ধরণের হইলেও হইতে পারে। কিন্তু অশোক বলিতেছেন, সংঘর্ষ ঘটিলেও তিনি অক্ষতি, সংযম ও সমচর্য্যা এই ত্রিবিধ গুণপ্রয়োগেরই পক্ষপাতী। অর্থাৎ যুদ্ধ বাধিলেও তিনি অহৈতুকভাবে লোকক্ষয় হইতে দিবেন না; এক কথায় সামরিক শক্তির প্রয়োগ অপরিহার্য্য হইলেও তিনি প্রয়োজনের সীমা লঙ্ঘন করিতে ইচ্ছুক নন। এই কথা কয়টিতেই অশোকের ধর্ম্ম বিজয়ের প্রকৃত ব্যাখ্যা রহিয়াছে। সুতরাং আমরা বেশ বুঝিতে পারি—অশোক কখনও যুদ্ধ করিবেন না—এই প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেন নাই। প্রয়োজন হইলে, তিনি যুদ্ধ করিবেন, কিন্তু মাত্রা অতিক্রম করিবেন না—ইহা স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন। আমরা যে তিনটি ভাগে ত্রয়োদশ গিরিলিপি বিভক্ত করিয়াছি, তন্মধ্যে দ্বিতীয় ভাগটিতে অশোক তাঁহার নিজের নীতি ও ধর্ম্মবিজয়ে সাফল্যেরই আলোচনা করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার যে-বাণী আমরা উপরে উদ্ধৃত করিয়াছি তাহা নিজকে লক্ষ্য করিয়াই রচিত হইয়াছিল। উহাতে যে নীতি অভিব্যক্ত হইয়াছে তাহার সাফল্যের উপরই অশোকের ধর্ম্ম বিজয় স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ দেখিতেছি না। সেই ধর্ম্ম বিজয় তিনি লাভ করিয়াছিলেন—পাঁচটি গ্রীক রাজ্যে; দক্ষিণ-ভারতস্থ তামিল রাষ্ট্র চোল, পাণ্ড্য, সতিয়পুত্র, কেরলপুত্রে; তাম্রপর্ণীতে (সিংহল কিংবা দক্ষিণ ভারতে); এবং যোন-কম্বোজ-নভক-নভপংক্তি, ভোজ-পিতিনিক, অন্ধ্র, পালদ প্রভৃতি দেশে। অবশ্য, সর্ব্বত্রই যে তাঁহাকে যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল, তাহা নাও হইতে পারে; যদি কোন রাষ্ট্র যুদ্ধ না করিয়াই তাঁহার নীতির প্রতি সম্মান দেখাইতে প্রস্তুত হইয়া থাকে তাহা হইলে অশোক নিশ্চয়ই তাহার বিরুদ্ধে অভিযান করেন নাই।

তৃতীয় অংশে সম্রাট্ অশোক পুত্র প্রপৌত্র দিগের উদ্দেশ্যে তাঁহার উপদেশ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই অংশ পাঠ করিয়া আমরা পূর্ব্ববর্ত্তী অংশে বর্ণিত ধর্ম্ম-বিজয়ের নীতির সহিত তাঁহার প্রদত্ত উপদেশের সামঞ্জস্য লক্ষ্য করিতে পারি। এই উপদেশের মূল কথা এই হইল যে, তাঁহার নিজবংশীয় পরবর্ত্তী শাসকগণও যেন নূতন বিজয়ের কথা মনে স্থান না দেন,—"কিতি পুত্র পপৌত্র মে অসু নবংবিজয়ং ম বিজতবিঅ।" যদি সামরিক অস্ত্র প্রয়োগের দ্বারা বিজয়লাভের প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে ক্ষান্তি ও লঘুদণ্ডের নীতি যেন তাঁহাদের মনঃপূত হয়। যে বিজয়কে ধর্ম্ম বিজয় বলা হয়, সেই ধর্ম্ম বিজয়ের পথই যেন তাঁহারা অবলম্বন করেন।" অর্থাৎ যে ধর্ম্ম বিজয়ের প্রস্তাব তিনি এই স্থলে উত্থাপন করিয়াছেন, সেই ধর্ম্ম বিজয়ে সামরিক শক্তির ব্যবহার প্রয়োজনীয় হইতে পারে, কিন্তু তাহা ক্ষান্তি ও লঘুদণ্ডের নীতির দ্বারা প্রভাবান্বিত হওয়া চাই, তাহা হইলেই এই প্রকার বিজয় 'ধর্ম্ম বিজয়' নাম গ্রহণ করিতে পারে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তিনি এই উপদেশ দিতে গিয়া বলিয়াছেন, তাঁহার বংশধরগণ যেন নূতন বিজয়ের আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করেন। এই নূতন বিজয়ের অর্থ "নূতন দেশ জয়" না ধরিয়া, ইহা তাঁহার বর্ণিত বিজয়ের পন্থা হইতে কোন স্বতন্ত্র পন্থা সূচিত করিতেছে—এই অর্থ ধরিলেই তাঁহার উক্তির পৌর্ব্বাপর্য্য ও সামঞ্জস্যের সূত্রটি খুঁজিয়া পাওয়া যায়। আসলে তিনি বলিতে চাহিয়াছেন তাঁহার নির্দ্দিষ্ট নীতি বা পরিকল্পনা বর্জ্জন করিয়া ধর্ম্ম বিজয়ের পথ ছাড়িয়া তাঁহারা যেন বিজয়ের উদ্দেশ্যে অন্য কোন নীতি সমর্থন বা অবলম্বন না করেন।

দেখা যাইতেছে, মোটামুটিভাবে তিনি নিজ জীবনে ধর্ম্ম বিজয়ের যে-নীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন সেই একই নীতি তিনি তাঁহার বংশধরদিগকে অনুসরণ করিতে বলিয়া গিয়াছেন। ধর্ম্ম বিজয়ের যে ব্যাখ্যা তাঁহার নিজ জীবনের ঘটনাবলীর সহিত সংশ্লিষ্ট, যাহা আমরা পূর্ব্বেই উদ্ধৃত করিয়াছি, তদীয় বংশধরদিগের রাজত্বে সেই ব্যাখ্যাই প্রশস্ত বলিয়া তিনি বিবেচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু ত্রয়োদশ গিরিলিপিতে একটি বিষয়ের উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে না। অশোক নিজ জীবনে ধর্ম্ম বিজয়ের সহিত কোন কোন ক্ষেত্রে তৎপ্রবর্ত্তিত 'ধর্ম্ম' প্রচারের ভৌগোলিক গণ্ডীর প্রসারতা সম্পাদনে যে স্বকীয় নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা পরবর্ত্তী শাসকগণের কাছে প্রত্যাশা করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না, এই জন্য তাঁহার উপদেশের মধ্যে 'ধর্ম্ম' প্রচারের কোন উল্লেখ নাই। অথচ অশোকের ধর্ম্ম বিজয়ের সহিত তাঁহার 'ধর্ম্ম' প্রচারের সম্বন্ধ এত নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ, যে ধর্ম্ম বিজয় ও 'ধর্ম্ম' প্রচার একই অর্থ-দ্যোতক বলিয়া ভুল করিলে তাহা অস্বাভাবিক অপরাধ বলিয়া মনে করা চলে না।

অশোকের উপদেশে দূরদর্শিতা ও রাজনীতিজ্ঞতায় পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। তিনি নিজ জীবনে ধর্ম্ম বিজয়ের যে চক্র রচনা করিয়াছিলেন, তাহার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে তাঁহার নিজের সতর্ক থাকার যেমন প্রয়োজন ছিল, তেমনি যাঁহারা ঐ বিজয়ের নীতিতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তাঁহার সহিত সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, তাঁহারাও যাহাতে তাঁহার ও তাঁহার পরবর্ত্তী রাজগণের কথা ও কার্য্যে আস্থা রক্ষা করিয়া ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিরুদ্বিগ্ন ও চিন্তামুক্ত হইতে পারেন তজ্জন্য অশোককে সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। তাঁহার রাজত্বের অবসানে যাহাতে তাঁহার নীতি পরিত্যক্ত হইয়া নূতন পরিস্থিতির সঞ্চার না করে, সেই বিষয়ে তাঁহাকে সতর্ক হইতে হইয়াছিল।

এবার আমরা দ্বিতীয় পৃথক গিরিলিপিতে (যে গিরিলিপি শুধু কলিঙ্গস্থিত ধৌলি ও জৌগড়ে পাওয়া গিয়াছে) প্রাপ্ত তথ্যের কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। যে কলিঙ্গদেশ বিজয় করিতে গিয়া অশোককে প্রচণ্ড সংগ্রাম চালাইতে হইয়াছিল, সেই কলিঙ্গদেশে স্থিত তাঁহার অধীন রাজপুরুষদিগকে আহ্বান করিয়া তিনি এই গিরিলিপি প্রচার করিয়াছিলেন। এই লিপিতে তিনি কলিঙ্গ প্রদেশের সীমান্তবর্ত্তী 'অবিজিত' দেশের অধিবাসীদিগের প্রতি কি নীতি অবলম্বিত হইবে তাহা বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। এই সকল লোক নিশ্চয়ই জানিতে চাহে, তাহাদের সম্বন্ধে অশোকের কি ইচ্ছা—"অংতানং [অ] বিজিতানং কিং ছংদে সু লাজা অফেসূতি।" প্রথমেই পরিষ্কারভাবে জানা যাইতেছে, এই সকল ব্যক্তি বা ইহাদের দেশ উক্ত গিরিলিপি প্রণয়নের সময় পর্য্যন্ত অশোক কর্ত্তৃক বিজিত হয় নাই। অশোক এইবার উহাদের প্রতি কি নীতি প্রযুক্ত হইবে তৎসম্বন্ধে উপদেশ দিতেছেন। কলিঙ্গস্থিত রাজপুরুষগণ তাহাদিগকে যেন বুঝাইয়া বলেন, তিনি উহাদিগকে সম্পূর্ণভাবে আশ্বস্ত করিতেছেন, তাহাদিগকে কোন দুঃখই দেওয়া হইবে না ; তাহারা সুখে অবস্থান করুক, তাহারা যে অপরাধ করিয়াছে তাহা ক্ষমার যোগ্য হইলে তিনি নিশ্চয়ই উহা ক্ষমা করিবেন। তাহাদিগকে যেন তাঁহার অচল প্রতিজ্ঞা ও ধৃতির কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়া হয়—"সর্ব্বদেশের" সহিত গভীর সংযোগ স্থাপন করিতে তিনি সংকল্পবদ্ধ হইয়াছেন এবং এই সংকল্প হইতে তিনি কখনও বিচ্যুত হইবেন না। কলিঙ্গের রাজপুরুষগণ ধীর, স্থির রাজনীতির পথ ধরিয়া ক্রমশঃ পার্শ্ববর্ত্তী অবিজিত দেশের অধিবাসীদিগকে আকৃষ্ট করিয়া ইহাদের সহিত মৌর্য্য সাম্রাজ্যের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ স্থাপন করিবেন, অশোকের আজ্ঞা-পত্রের উদ্দেশ্য তদ্ব্যতীত অন্য কিছু নয়। কলিঙ্গ সীমানার বহিঃস্থিত যে অবিজিত অন্তের কথা বলা হইয়াছে সেই অন্ত ও আটবিক দেশ যে এক নয়, তাহার প্রমাণ এই যে আটবিক দেশ অশোক-সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হইয়াছিল, কিন্তু এই অন্ত ছিল 'অবিজিত'।

ত্রয়োদশ গিরিলিপি হইতে জানা যায়, অশোক প্রয়োজন হইলে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে প্রস্তুত ছিলেন। আমাদের পক্ষে এই সংবাদটুকু যথেষ্ট ; তিনি যে ধর্ম্ম বিজয় চক্রের সীমানা প্রকাশ করিয়াছেন, সেই ধর্ম্ম-চক্র গঠন করিতে তিনি কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁহার কথিত নীতি অবলম্বন করিয়া পরিমিত-ভাবে সামরিক অস্ত্র ব্যবহার করিয়াছিলেন, এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে বাধা নাই। কিন্তু ধর্ম্ম বিজয়ী অশোকের আদৌ অস্ত্রের ব্যবহার প্রয়োজন হইয়াছিল কিনা এবং হইয়া থাকিলে কোন্ কোন্ দেশের বিরুদ্ধে তিনি যুদ্ধ করিয়াছিলেন,সাক্ষাৎ প্রমাণাভাবে তাহা পরিষ্কার করিয়া বলিবার উপায় নাই। ইহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে, তিনি যে দেশে ব্রাহ্মণ-শ্রমণের সাক্ষাৎ মিলিত ও যে দেশে মিলিত না এই দুই দেশের মধ্যে পার্থক্য সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। কলিঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ-শ্রমণে ভক্তিমান্ ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিবর্গের প্রভূত ক্ষতি হয়, এজন্য তাঁহার অনুশোচনা তীব্রতর হইয়াছিল। যে দেশে যুদ্ধের ফলে ঐরূপ ক্ষতির সম্ভাবনা ছিল না সেই দেশের সহিত ধর্ম্ম বিজয়ের উদ্দেশ্য পরিপূরক যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইলে তাঁহার মানসিক উদ্বেগ যে অপেক্ষাকৃত ন্যূন এবং তাঁহার যুদ্ধ বিরোধী সংস্কার ক্ষীণতর হইত তাহা বুঝা যাইতেছে। যবন দেশে যে ব্রাহ্মণ শ্রমণ ছিল না তাহাও তিনি—এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ, শুধু সাহ্‌বাজ্‌গড়িতেই ধর্ম্ম বিজয়ের প্রসঙ্গে তিনি সংযম-মিশ্রিত যুদ্ধের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এই অঞ্চলেই যত গোলমাল, ইহারই নিকটবর্ত্তী দেশগুলি গ্রীকদিগের অধিকারে ছিল। খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে সিরিয়ার গ্রীক অধিপতির বিরুদ্ধে পার্থিয়ার ও ব্যাক্‌ট্রিয়াস্থিত গ্রীক শাসকদিগের স্বাধীনতার আন্দোলন আরম্ভ হয়। প্রতিবেশী রাষ্ট্র ও দেশ হইতে বিপদের আশঙ্কা অশোক অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন। প্রয়োজন হইলে তিনি যে সংগ্রামে অবতীর্ণ হইতে পারেন, সেই কথা তিনি ঐ অঞ্চলে দৃঢ়কণ্ঠে প্রচার করিতে ত্রুটি করেন নাই। ঘনায়মান বিপদ্‌জাল বেষ্টিত বৈদেশিক রাষ্ট্রগুলির নিকটবর্ত্তিতায় উত্তর পশ্চিম প্রদেশে যে পরিস্থিতি বিরাজ করিতেছিল, তাহার সহিত তাহার যুদ্ধার্থে প্রস্তুতি ও সংগ্রামের

আপেক্ষিক প্রয়োজনীয়তা স্বীকার সর্ব্বতোভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও প্রাসঙ্গিক হইয়াছিল। এই রাষ্ট্রগুলির সহিত তিনি যে সৌহার্দ্দ্যের কথা বলিয়াছেন, সেই সৌহার্দ্দ্যের রাজনৈতিক ভিত্তি অস্বীকার করা যায় না। এই সৌহার্দ্দ্য স্থাপন করিতে গিয়া তাঁহাকে নিশ্চয়ই কূটনৈতিক কৌশল কিংবা সামরিক ও অন্যান্য শক্তির শ্রেষ্ঠত্ব বা উভয়েরই পরিচয় দিতে হইয়াছিল। ভারতের অন্তর্গত স্বাধীন রাষ্ট্রগুলির সহিত তাঁহার যে ধর্ম্ম বিজয়ের সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল, সেই সম্বন্ধ স্থাপনে হয়ত 'সাহবাজগড়ি লিপিতে উল্লিখিত পরিমিত যুদ্ধেরও প্রয়োজন হয় নাই। মনে হয়, অশোকের সহিত এই রাষ্ট্রগুলির সম্বন্ধ যে বরাবর একই প্রকারের ছিল তাহা নাও হইতে পারে। তাঁহার লিপিগুলিতে চোল, পাণ্ড্য, সতিয়পুত্র, কেরলপুত্র এই চারিটি রাষ্ট্রই নিয়মিতভাবে একই সঙ্গে উল্লিখিত হয় নাই। সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি দেশ সম্বন্ধেও একই কথা বলা যাইতে পারে। স্বাধীন গ্রীক রাজ্যগুলির সব কয়টিও যে একই সময়ে তাঁহার সহিত সৌহার্দ্দ্যসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিল তাহা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। দ্বিতীয় গিরিলিপিতে মাত্র দুইটি গ্রীক রাজার নাম ও অনির্দ্দিষ্টভাবে তাঁহাদের প্রতিবেশীদের কথার উল্লেখ আছে, কিন্তু শুধু ত্রয়োদশ গিরিলিপিতেই পাঁচটি রাজার নাম পাওয়া যাইতেছে। অশোকের কর্ম্মবহুল জীবনে বিচিত্র ঘটনাবলীর মধ্য দিয়া অপর রাষ্ট্রগুলির সহিত তাঁহার সম্বন্ধ পরিবর্ত্তিত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তাঁহার রাজনৈতিক চিন্তা ও উদ্যম যে কখনও আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছিল তাহা বুঝিতে পারি না। পরিস্থিতির পরিবর্ত্তনের সহিত সংযোগ রাখিয়া তাঁহাকে ধর্ম্মবিজয়ের পন্থা অনুসরণ করিতে হইয়াছিল।

সাম্রাজ্যগঠনে অশোকের অবদান নিরূপণ করিতে হইলে আমাদিগকে নিম্নলিখিত তথ্যগুলি বিবেচনা করিতে হইবে :—

(১) তিনি যুদ্ধের দ্বারা কলিঙ্গ ও আটবিক দেশ জয় করিয়াছিলেন।

(২) তিনি ধর্ম্ম বিজয়ের নীতি অবলম্বন করিয়া পাঁচটি গ্রীক রাজ্য ও সম্ভবতঃ সিংহলের সহিত সম্প্রীতিমূলক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে শুধু মিশর ও সিরিয়ার সহিত অশোক-পূর্ব্ব মৌর্য্য সাম্রাজ্যের বন্ধুত্বমূলক সম্বন্ধের প্রমাণ পাওয়া যায়, কিন্তু অবশিষ্ট রাষ্ট্রগুলির সহিত সম্বন্ধ তাঁহার রাজত্বকালেই সংঘটিত হয়। তামিল রাষ্ট্রগুলিও দ্বিতীয় এবং ত্রয়োদশ গিরিলিপিতে উল্লিখিত অশোক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির সহিত অশোক-পূর্ব্ব মৌর্য্যসাম্রাজ্যের কি সম্পর্ক ছিল তাহা সঠিকভাবে জানিবার উপায় না থাকায় এই ক্ষেত্রে অশোকের ব্যক্তিগত কৃতিত্ব পরিমাপের উপযোগী মানদণ্ড অবর্ত্তমান। কিন্তু যে ধর্ম্মবিজয় অশোকের কাম্য ছিল, এই সকল দেশের সহিত তাহার পরিপোষক সম্বন্ধের স্থাপন অশোকের রাজত্বকালেই ঘটিয়াছিল, আর সেই ধর্ম্মবিজয় স্থাপনে সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা অশোক কর্ত্তৃক স্বীকৃত হওয়ায় মনে হয়, তাঁহার সময় ইহাদের সহিত মৌর্য্যসাম্রাজ্যের একটা নূতন রকমের ও দৃঢ়তর সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল। এই দিক হইতে বিচার করিলেও অশোকের কৃতিত্বকে খর্ব্ব করা চলে না।

(৩) এই সম্বন্ধ স্থাপন করিতে গিয়া সম্ভবতঃ অশোককে জীবনব্যাপী প্রচেষ্টার দ্বারা ক্রমোন্নতির বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করিতে হইয়াছিল।

(৪) অশোক ভারতস্থিত 'অবিজিত' অন্ত স্বচক্রে আনয়ন করিবার জন্য উৎসুক ও উদ্যোগী ছিলেন। তাঁহার প্রজাবাৎসল্যের কথা, তাঁহার অপরিসীম শক্তির কথা, ইহাদের মধ্যে প্রচার করিয়া ক্রমশঃ ইহাদের মনহরণ করিবার নীতির প্রয়োগে তাঁহার চেষ্টার ত্রুটি ছিল না।

(৫) অশোক বিভিন্ন দেশে দূত পাঠাইয়াছিলেন। দূতগণ বিদেশে তাঁহার ধর্ম্মমত প্রচারে সহায়তা করিয়াছিলেন তাহা স্বীকার্য্য। কিন্তু তাঁহার ধর্ম্মবিজয়ের প্রসঙ্গে ধর্ম্মপ্রচারের কথা উল্লিখিত হওয়ায় সাধারণতঃ ধারণা করা হইয়া থাকে, ধর্ম্মপ্রচারই যেন তাঁহার মুখ্য কাজ ছিল এবং যেখানে সে প্রচার সার্থক হইয়াছে, সেইখানেই যেন শুধু 'ধর্ম্মবিজয়' লব্ধ হইয়াছে। এই ধারণার পক্ষে প্রমাণের অভাব দেখিতেছি। দূতের মুখ্য কাজ ধর্ম্মপ্রচার নয়, তাহা গৌণ ও আনুসঙ্গিক মাত্র হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, অশোক যে ধর্ম্মমত প্রচার করিয়াছিলেন তাহা কেবল ভারতে প্রচলিত ধর্ম্মমতগুলির সহিতই সাক্ষাৎভাবে সম্পর্কযুক্ত। তিনি ব্রাহ্মণ, শ্রমণ, আজীবিক, নিগ্রন্থ—ইঁহাদের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, কোথাও অন্য কোন ধর্ম্মাবলম্বীর পৃথক উল্লেখ নাই। বিশেষতঃ, ব্রাহ্মণ-শ্রমণের সংস্কৃতি রক্ষণে তিনি যে আগ্রহশীল ছিলেন তাহা ত্রয়োদশ গিরিলিপি হইতে জানা যায়। যবনদেশে এই দুই সম্প্রদায় পরিলক্ষিত হইত না, তাহাও তিনি জানিতেন। যে যবন দেশগুলিতে ব্রাহ্মণ, শ্রমণ, প্রভৃতি ধর্ম্মাবলম্বী সম্প্রদায় পরিদৃষ্ট হইত না, সেই সকল দেশে তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম কি আকারে প্রচারিত ও কতখানি স্থানকালপাত্রের উপযোগী হইয়াছিল, তাহা সম্যক্‌ভাবে বিচার করিবার সমসাময়িক প্রমাণের অভাব রহিয়াছে। মৌর্য্য রাজত্বকালে বৈদেশিকদের সহিত ভারতবর্ষের পরিচয় বেশ খানিকটা ঘনিষ্ঠ রকমেরই ছিল। বহু বৈদেশিককে সাম্রাজ্যের রাজধানী পাটলিপুত্রে দেখা যাইত এবং তাহাদের স্বার্থসংরক্ষণ এবং সুবিধা সৌকর্য্যের ভার একটি বিশেষ পৌরসমিতির উপর ন্যস্ত ছিল। ইঁহাদের ধর্ম্মমতের কোন উল্লেখ অশোক অনুশাসনে দেখি না। সুতরাং অশোক প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের প্রসারিত ক্ষেত্র ভারতবর্ষেই ছিল, অন্যত্র তাহার সার্থকতা খানিকটা সীমাবদ্ধ ছিল, ইহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। এই সকল দেশে তিনি বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, সে কথাও তিনি কোথাও বলেন নাই। এজন্য মনে হয় তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের যে রাজনৈতিক দিকটা আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে পড়িয়া গিয়াছে,—যুদ্ধের কুফল সম্বন্ধে তাঁহার সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতার কথা, আন্তর্জ্জাতিক সম্বন্ধে মৈত্রী ও সৌহার্দ্দ্যের প্রয়োজনীয়তার কথা,—সম্ভবতঃ ব্যবসায় ও বাণিজ্যের দ্বারা আর্থিক সম্বন্ধ সুদৃঢ়ীকরণের প্রয়োজনীয়তার কথা এবং লোকহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত সহানুভূতিপূর্ণ সংযোগ স্থাপনের তথ্যই দূতের সাহায্যে বিদেশে প্রচারে তিনি উদ্যোগী হইয়াছিলেন।

দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর ধরিয়া অশোক মৌর্য্যসাম্রাজ্যের পরিচালনা করিয়াছিলেন।

এই সময়ে তিনি যেমন বৃহৎ যুদ্ধে সাফল্যলাভ করিয়াছিলেন তেমনই হয়ত পরিমিতভাবে সামরিক শক্তির প্রয়োগ করিয়া বা যুক্তিসঙ্গতভাবে ভীতিপ্রদর্শন ও অন্যান্য উপায়ে তাঁহার ক্ষমতার প্রতি বিভিন্ন রাষ্ট্রনায়কগণকে শ্রদ্ধাসম্পন্ন ও আনুগত্যশীল করিয়াছিলেন। এই দীর্ঘ সময়ে তাঁহার সাম্রাজ্য আক্রমণ করিতে কাহারও সাহস হয় নাই। মৌর্য্য সাম্রাজ্যের যে চিত্র অশোক অনুশাসনে পাওয়া যাইতেছে, সেই চিত্র চন্দ্রগুপ্ত ও বিন্দুসারের সময়েই প্রায় অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল ইহা অনেকটা অনুমান মাত্র। ভারতের অভ্যন্তরে স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ কিংবা সাম্রাজ্যের চতুঃসীমানার অন্তর্গত বিশিষ্ট দেশগুলিতে তিনি ধর্ম্মপ্রচারের সুবিস্তৃত ক্ষেত্র লাভ করিয়াছিলেন; তাঁহার সার্ব্বজনীন মতবাদ গ্রহণে যে আগ্রহ পরিদৃষ্ট হইয়াছিল—তাহা নিছক রাজনৈতিক শ্রেষ্ঠত্ববোধকেও সঞ্জীবিত ও সুদৃঢ় করিয়া তুলিয়াছিল।

ভাঙা-দেউলের দেবতা

শ্রীআশা দেবী এম-এ

(কোনার্ক)

কোথায় কবে যেন ছোট্ট একটু ভালোলাগা মনকে গভীর ভাবে ছুঁয়ে যায়—, সেই বিলীয়মান অনুভূতিটুকু মধুর করে তোলে মানুষের কর্ম্মহীন অবসর মুহূর্ত—কোনার্ক থেকে বহু শত মাইল দূরে বসে আজ আমি সেই কালজয়ী সূর্য্য-সারথি-রথ পরিকল্পনার কথাই ভাবছি।

রাত এগারোটা।—নিশুতি আঁধার ভেদ করে আকাশের বুকে জেগে ছিল নিদ্রাহীন তারাদল নীরব সাক্ষীর মতো; আর নিচে নিষ্ফল আক্রোশে গর্জ্জন করছিল বঙ্গোপসাগর—সেই আলোহীন জনহীন পথে আমরা চলেছিলাম দুটী গোযানে—পাঁচটী প্রাণী।

উড়িষ্যার নিদ্রালু গ্রামগুলো গোরুর পায়ের শব্দে যেন চমকে উঠছিল। দূরে মর্ম্মরিত নারিকেল বীথি কালো আকাশের বুকে প্রকাণ্ড প্রেতিনীর মতই দেখাচ্ছিল। মাঝে মাঝে নাম-না-জানা পাখীর কুলায়; স্বপ্নকাকলীর কলতানের মধ্যে দিয়ে রাত্রের বীণা তার নৈশ-রাগিণী সমাপ্ত করলে—; পথের পাশে পাশে উষর শুভ্র বালিয়াড়ীতে দণ্ডায়মান ঝাউএর শ্রেণী প্রভাতী মিঠে বাতাসে গা ঝাড়া দিয়ে জেগে উঠলো—; উৎকলের তৃণহীন অঙ্গের মত বালির উপর তরুণ সূর্য্য মুঠি মুঠি সোনা ছড়িয়ে দিলো।

পথের ধারে ভৈরবী রাগিণীতে আলাপ সুরু করলে ছোট বড় পাখীর ঝাঁক। গ্রামের পথে তাম্বুল-রাগরঞ্জিত অধর ও কোমরে বটুয়া সমেত দর্শন দিলেন কলির দ্রৌপদীর বংশধর একটী দুটী করে। আলো আঁধারের নিরিবিলিতে লঘুপদে চলাফেরা কর্‌ছিল দুটী একটী শৃগালমাতা;—সঙ্গে দু'একটী পুত্রকন্যাও ছিল। প্রাতরাশের সন্ধানে বৃথায় বালিতে খুঁজে মর্‌ছিল লম্বা লম্বা পাওয়ালা পাখীর দল। কাকের দল স্বভাবসিদ্ধ মধুকর কণ্ঠে বনভূমিকে সচকিত করে তুলছিল—।

প্রভাতী উষ্ণ পানীয়ের জন্য যে আমাদেরও মনটা ছট্‌ফট্ কর্‌ছল না তা করে বলবে কিন্তু উড়িষ্যার বিচক্ষণ গাড়োয়ান জগুয়া আমাদের অন্তরের কথা বাক্যে প্রকাশ করলে :

খাবেন বাবু, চা?—চলুন না আমার বাসায়। খাওয়াও হবে আপনাদের, আমার বলদ দুটোও একটু বিশ্রাম পাবে!

বলা বাহুল্য আমরা মৌন হেয়েই সম্মতি দিলাম—। জগুয়া দুর্ব্বোধ্য ভাষায় বলদ দুটোকে গাল দিয়ে বাড়ীর পথ ধরলে।

দুধারে আবার দেখা দিল নূতন শ্যামলতার সমারোহ! ধরিত্রীমাতা এবার মানুষের নিত্য প্রয়োজনের মত প্রসব করেছে শাক, সব্জি, আনাজ তরকারি। ফলের গাছও বাদ পড়েনি—অপ্রয়োজনে ফুলের গাছ ও বাগান আলো করে আছে।

জগুয়ার বাড়ী পৌঁছুলাম—। গাড়ী দাঁড়াল বাড়ীর একধারে। সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্যহীন হতশ্রী নগ্ন ছেলের দল গাড়ী ঘিরে দাঁড়াল—। দাওয়ায় সারি দিয়ে দেখতে

লাগলো বুড়োর দল, ঘুলঘুলির রন্ধ্রপথে পর্য্যবেক্ষণরতা অবগুণ্ঠনবতীদেরও চাপা কণ্ঠে কথাবার্ত্তা শোনা গেল।

গাড়ী থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গে এক বর্ষীয়সী খেদ প্রকাশ করলে—জগুয়ার স্ত্রী বাড়ী নেই—আমাদের আদর আপ্যায়নের ত্রুটি হবে। কিন্তু ত্রুটি হতে দিলে না জগুয়া। একগাছা বেড়া ভাঙা কঞ্চি নিয়ে সে সামনের স্কুল ঘরটার মধ্যে ঢুকলো—।

জনা চোদ্দ পনর ছাত্র নিয়ে স্কুল ঘর। মাষ্টারও ছাত্রদের সঙ্গে পাটিতে বসা, কিন্তু তার মেজাজ ভালো নয়; কারণ সামনের উন্মুক্ত অপরিসর বাতায়নপথে তাদের চোদ্দ জোড়া চোখ আমাদের উপর নিবদ্ধ। মাষ্টারের কড়া শাসনও তাদের মনোযোগ পাঠে নিবদ্ধ করাতে পারছিল না—! জগুয়া ঘরে ঢুকেই মাষ্টারের হাতের কঞ্চিটা নিয়ে উনুনে দিলে—। মাষ্টারও লেগে গেল আমাদের পরিচর্য্যায়; ছাত্রেরা বাঁচলো—তাদের ছুটী আজ আমাদের সম্মানার্থে।

সামনের পুকুরের ঘোলা জলে চা তৈরী গেলো অত্যন্ত সমারোহে। সবাই তা খেয়ে প্রস্থানের ক্লান্তি দূর করলেন—জগুয়াও প্রসাদ পেলো।

কিন্তু আমার যেন খাওয়ায় কোন রুচি নেই। ঐ অপরিষ্কার জল—ঐ ময়লা পাত্র আমার মনের ভেতর এনে দিয়েছিল বিরাগ। গ্রাম্য অশিক্ষিত গাড়োয়ান তার বাড়ী থেকে অভুক্ত মাকে ছেড়ে দিতে চাইলে না। বারবার খাবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানালে—। বারম্বার না করা সত্ত্বেও খাঁটী উত্তপ্ত এক বাটি দুধ এনে সামনে বিনীত মুখে এসে উপস্থিত করলে।

ওর আগ্রহভরা ব্যাকুল মুখের দিকে চেয়ে ফেরাতে পারলাম না। পাত্রটা হাতে তুলে নিলাম। মুখে দিতে গিয়ে গিয়ে দাওয়ায় বসা জীর্ণ হাড়গিলের মত ছেলেগুলোর দিকে হঠাৎ চোখ পড়লো, ওরা আমার দিকেই চেয়েছিল—হয়তো অকারণ কৌতূহল, কিন্তু মনে হলো আমায় বিনা প্রয়োজনে এরা জোর করে খাওয়াচ্ছে, আর ঐ অস্থি-চর্ম্মসার ছেলেগুলোর মধ্যে যে কোন একটীকে আজ হয়তো উপোসী থাকতে হবে।

গাড়ী আবার চলেছে—পিছে পড়ে রইলো গ্রাম;—জনারণ্য—আবাস—চন্দ্রভাগা সবই। অতীত যেন আমাদের আকর্ষণ করছে। আকর্ষণ করছে তার শত সহস্র শতাব্দীর জীর্ণ কঙ্কালসার বাহু দিয়ে!

গোরু দুটো ক্লান্ত পায়ে এগিয়ে চলেছে। সুদক্ষ চালক জগুয়া গাড়াতে বোসেই ঝিমোচ্ছে! সম্মুখে উন্মুক্ত, রোদে পোড়া তামাটে আকাশের গায়ে ফুটে উঠলো সূর্য্য-সারথি রথচূড়ো। সামনে এখনো পথ অনেক পড়ে আছে। চলেছি এগিয়ে, ক্রমে ঝাউএর শ্রেণী আরো নিবিড় হলো। অরণ্য আরো নিস্তব্ধ হলো—নিস্তব্ধতা আরো গভীর হলো। ভগ্ন প্রাচীর প্রাসাদ, প্রস্তর-স্তূপ নিরালা পথের যাত্রীপঞ্চককে টেনে নিয়ে চললো—আজ থেকে হাজার বছর আগেকার বিস্মৃত দেব-দেউলে—।

অতীতের তমসা ভেদ করে সেখানকার অধিবাসীরা যেন এক সঙ্গে জেগে উঠলো কথা কয়ে—পথের পাশে পাশে ঝাউশ্রেণীর ফাঁকে ফাঁকে তাদের কলগুঞ্জন যেন ভেসে আসতে লাগলো।

কোন এক সিংহদেব হয়তো বা কঠিন ব্যাধি থেকে মুক্তি পাবার জন্য এ সূর্য্য পূজার আয়োজন করেছিলেন; আজ সে ভক্তও নেই, দেবতাও বিদায় নিয়েছে, শুধু পড়ে আছে আয়োজন সম্ভার এই রুক্ষ শুষ্ক প্রান্তরের বনবাসে! কত কিম্বদন্তী না শোনা যায়—এর চূড়ায় নাকি চুম্বক ছিল, সেটা নাকি পর্তুগীজ জাহাজ আকর্ষণ করত—। মাতাল উন্মাদ সমুদ্র নাকি এরই পাশে ছিল নির্জ্জনতার সাথী কিন্তু আজ যোগে রইলো ঐতিহাসিক, প্রত্ন-তত্ত্ববিদ গবেষকের চিন্তনীয় বিষয়বস্তু।—আমরা এর মুগ্ধ দ্রষ্টা আমাদের কাছে শিল্পই সত্য, সত্য এই কালজয়ী স্থপতি নিদর্শন!

ডাক বাংলোয় আশ্রয় পেলাম। বাংলোর তত্ত্বাবধায়ক অর্জ্জুন বিনীতমুখে অভ্যর্থনা জানালো এবং কারণে অকারণে তাকে নিইয়ে ডাকাডাকি করবার জন্য ব্যাকুল মিনতি জানিয়ে প্রস্থান করলে! চা খাওয়া হলো। স্নান হলো! আহার্য্য প্রস্তুতের ভার অর্জ্জুনই নিলে—। আমাদের এবার দেখবার পালা সুরু হলো!

ইতিহাসের কতগুলো পাতা একসঙ্গে উল্টে গেলাম। দুর্দ্ধর্ষ পাঠান মোগল বিজয়ের অবসান; পাল ও সেন বংশের রাজত্ব কালের কথা ভাবতে ভাবতে তপ্ত বালুরাশি পার হয়ে রথ-মন্দিরের সিংহদ্বারে উপস্থিত

হলাম। অতীতের হাড় মালা বিরাটের বুকে দুলছে যেন সত্যিই! কি বিশাল সে মন্দির! পথের ধারে রথচ্যুত পাথর অযত্নে আরো ভেঙেছে। কিন্তু কি তার বর্ণ, কি কারু কাজ, চোখ জুড়িয়ে দেয়! সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়লো এর শিল্পীকে। আজ সে সব কারিকর পটুয়া কোথায়! তারা কি এক যোগে সবাই অতীতের সমাধিগর্ভে লীন হলো—! যাদের হস্ত-চিহ্ন উৎকলের প্রতি মন্দিরে দেখা যায়, যাদের হাতের কারু নীলমাধবের মন্দিরেও ভাস্বর হয়ে আছে অভগ্ন অবস্থায়, তারা আজ কোথায়—। আর পুরীর মন্দিরের সে প্রচণ্ডরূপী পাণ্ডাবেশী উড়িয়া কাবুলী-ওয়ালা, এরা কি সেই মৃত্যুঞ্জয়ী রূপদক্ষদেরই উত্তরাধিকারী এবং উত্তরসাধক?

সবাই দেখতে ছুটেছে—; ছুটেছে এধারে ওধারে। দল ছত্রভঙ্গ—আমি একা, আর সামনে এই বিশাল রথ! হঠাৎ যেন মনে হয় হাজার বছরের অতীত যদি এ মুহূর্তে প্রাণ পায়! ঐ যে নিখুঁত হাতে গড়া রথচক্র, ওরা যদি এই ক্ষণে গতি পেয়ে ওঠে। অরুণ যদি সপ্ত অশ্বের বল্গা টেনে আবার ছুটিয়ে দেয় তার এই বিশাল শিলা-শকট, সমগ্র অরণ্যপথ কাঁপিয়ে যদি এ প্রস্তর রথ চলতে থাকে! কিন্তু অকারণে দৃষ্টি পড়ে সিংহাসন শূন্য, রাজা নেই। রাজা আকাশের মধ্যভাগে নিষ্ঠুর ভাবে দুহাতে মুঠো মুঠো আগুন ছড়াচ্ছে। আপাততঃ তার নেমে আসবার কোন প্রয়োজন নেই।

রথচক্রের কারুকার্য্য, রথ নির্ম্মাণ ও পরিকল্পনা অপূর্ব্ব! রথের সম্মুখ থেকে আরম্ভ করে পশ্চাৎভাগ পর্য্যন্ত নিখুঁত শিল্প কৌশল। সমগ্র মন্দিরের গায়ে চোখে পড়ে অসংখ্য নগ্ন মিথুন। কিন্তু প্রকৃতির এই নিরাবরণ বুকে, গ্রামের এমন নির্জ্জন একান্তে এরা চোখকে বিব্রত করলেও মনকে বিপর্য্যস্ত করে না। রথের আয়োজন সম্ভারের মধ্যে ভগ্ন হস্তী, গজ, সিংহ, অশ্ব ও নানা আকারের রথ থেকে খসা অংশও চোখে পড়ে। এসব উদ্যোক্তার আয়োজন সম্ভার। আজ তাদের কাজ ফুরিয়েছে, কাজেই তারা পথে পড়ে আছে। যারা এদের দেশ বিদেশ থেকে এনে জড়ো করেছিল তারা আর নেই, কাজেই এদের কদরও নেই। আজ সেই উদ্যোক্তাদের কথাই আমার মনে পড়ছিল—।

একটু দূরে এসে একটী জীর্ণ বেদীর ওপর এসে বসলাম—। নীল আকাশ, আরো নীল ঝাউ শ্রেণীর পটভূমিতে যেন আঁকা এই রক্তাভ সূর্য্যরথ তৃণহীন নীরস মাঠের মাঝে দাঁড়িয়ে আছে—; পথে পড়ে আছে অসংখ্য ঝরা ঝাউপাতা ও ফল; চৈতালী বাতাসে উড়ে বেড়াচ্ছে তারা এদিক থেকে ওদিক লক্ষ্যহীন ভাবে, আর বিমনা পথিকের পায়ে এঁকে দিচ্ছে আঘাতের ক্ষতচিহ্ন রক্তের আঁচড়ে—।

এই মুহূর্তে নিজেকে ভারি বিপন্ন, ভারি একা লাগছে—যারা একে গড়েছে তারা নেই—; যারা উদ্যোক্তা তারা নেই, শুধু যেন আমি একা বসে নীরব অতীতের কাছে কৈফিয়ৎ দিচ্ছি—কেন হাজার বছরের শিল্পকে আধুনিক চোখে বিচার করছি—কী আমার অধিকার?

ঠিক এমনি মহাধ্বংসের সম্মুখে দাঁড়াবার সৌভাগ্য হোয়েছিল আরো দুবার, নালান্দায়, মৃগদাব সারনাথে—; সে মহাবিহারও এমনি নিস্তব্ধ—এমনি সমাহিত, তবে এর চাইতেও সে আরো জরাগ্রস্ত, আরো পুরাতন! কিন্তু তাদের সঙ্গে এ মন্দিরের একটা মুখ্য পার্থক্য চোখে পড়লো—বিশ্ববিদ্যালয়ে আছে নিরলস অধ্যয়নের কঠিন সাধনার শুভ্রতার ছাপ; আর এখানে জীবন এবং সাধনা—প্রিয় এবং দেবতা অঙ্গাঙ্গীভূত, একাকার। কাজেই বর্ত্তমান পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানীর চুলচেরা দৃষ্টিতে বিচার করলে এখানে হয়তো রুচি বিকার চোখে পড়বে। কিন্তু সেদিন যারা দেবতাকে প্রিয়, আর প্রিয়কে দেবতা বলে জেনেছিল—এ উন্নাসিক শ্লীলতা-বুদ্ধি তাদের ছিল না।

এবার বিদায়ের পালা! হে মহাদ্যুতিমান সূর্য্যদেব, তুমি তো প্রগতি-পথে এগিয়ে চলেছ—, চলেছ তো তোমার সাত-রঙা রামধনু রথ ও সপ্ত অশ্বের বল্গা টেনে—। তুমি তো তোমার প্রাত্যহিক পরিক্রমা শেষ করে পূবে থেকে পশ্চিমের আকাশে ক্লান্ত হোয়ে হেলে পড়লে—। তোমার অঙ্গুলি সঙ্কেতে জগৎ এগিয়ে চলেছে। দিন থেকে সপ্তাহ, সপ্তাহ থেকে মাস, মাস থেকে যুগে যুগান্তরে। তোমার পূজারীর অর্ঘ্য তো পড়ে রইলো—। তুমি চলেছ এগিয়ে, কিন্তু তোমার পৃথিবীর এই রথ তো

অচল ; প্রগতি পথে সে থেমে দাঁড়িয়েছে চিরদিনের মত। কালকে সে অতিক্রম করতে পারলো না যা তুমি পেরেছ ; তোমার ভক্ত আর নেই, কিন্তু তুমি তার মনের ইচ্ছা পূর্ণ কোরো—পৃথিবী কলুষমুক্ত করো

আবার চলেছি। বাহু বাড়িয়ে বাড়িয়ে ঝাউ এর শ্রেণী বনমর্ম্মরের সাথে তাল মিলিয়ে বিদায় রাগিণী গাইছে, গোযান চক্রেও তুলেছে করুণ আর্ত্তনাদ—। আমরা পেরিয়ে চলেছি গ্রাম—নগর—বন—মাঠ—

চন্দ্রভাগায় জোয়ার এসেছে—। আকাশে পূর্ণচন্দ্রের মালিন্য মুক্ত আলোতে মাঠ ঘাট ঝলমল করছে দূরে—বহুদূরে দেখা গেল বিলীয়মান সূর্য্যসারথি, চিরস্থির প্রস্তর-রথ—যেন আকাশের বুকে তুলিতে আঁকা কাজলকালো ছবি—।

শব্দপ্রয়োগে অনবধানতা

অধ্যাপক শ্রীদুর্গামোহন ভট্টাচার্য

শব্দের অপপ্রয়োগের কথা অন্যত্র বলিয়াছি। কয়েকটি চলিত পদের অর্থবিচার প্রসঙ্গে আরও কিছু আলোচনা করিব।

আঙ্গিক

আঙ্গিক শব্দ techniqueএর প্রতিশব্দরূপে বাংলায় চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু অঙ্গের সহিত techniqueএর কোন সম্বন্ধ নাই। প্রত্যুত আঙ্গিকের ভিন্ন এক অর্থ সুপ্রসিদ্ধ। নাট্যশাস্ত্রে চারিপ্রকার অভিনয়ের নাম পাওয়া যায়—আঙ্গিক, বাচিক, আহার্য ও সাত্ত্বিক। অঙ্গসঞ্চালন দ্বারা ভাব প্রকাশ করিলে তাহা হয় আঙ্গিক অভিনয়।

টেক্‌নিক অর্থে স্থলবিশেষে কৌশল, কলাকৌশল, প্রয়োগকৌশল এবং সাধারণভাবে 'প্রযুক্তি' চলিতে পারে। তাহা হইলে Technologyর বাংলা হইবে 'প্রযুক্তিবিদ্যা', technologistএর নাম হইবে 'প্রাযুক্তিক' বা 'প্রযুক্তিবিৎ'।

প্র-পূর্বক যুজ্ ধাতু হইতে প্রযুক্তি পদ সিদ্ধ হয়। প্রাচীন গ্রন্থে বিশিষ্ট কৌশল বা শিল্পজ্ঞান বুঝাইবার জন্য যুজ্ ধাতু হইতে উৎপন্ন 'যোগ' ও 'যুক্তি' শব্দের প্রয়োগ পাওয়া যায়। গীতায় কর্মের কৌশলকে যোগ বলা হইয়াছে—'যোগঃ কর্মসু কৌশলম্'। বাৎস্যায়নসূত্রে চতুঃষষ্টি কলাবিজ্ঞান যোগ নামে অভিহিত হইয়াছে—যেমন 'কেশশেখরাপীড়-যোগ'। 'যুক্তিকল্পতরু'-নামক গ্রন্থে বাস্তুযুক্তি, আসনযুক্তি, ছত্রযুক্তি, ধ্বজযুক্তি, যানযুক্তি প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন পরিচ্ছেদে নানাপ্রকার শিল্পযুক্তির আলোচনা আছে। কিন্তু যোগ ও যুক্তি বাংলায় ভিন্ন অর্থে প্রসিদ্ধ। সুতরাং প্রযুক্তি হইবে techniqueএর উপযুক্ত প্রতিশব্দ।

Technical শব্দের অনুবাদে প্রকরণভেদে বিভিন্নরূপ প্রকাশভঙ্গী আবশ্যক হইবে—যেমন technical knowledge = বিশেষজ্ঞান ; technical treatise = লাক্ষণিক গ্রন্থ ; technical defect = নামতঃ ত্রুটি, শব্দপরক ত্রুটি ; technical discussion = বিশেষধর্মিক আলোচনা কিংবা কূট, সূক্ষ্ম বা লাক্ষণিক আলোচনা।

আবহ-সঙ্গীত

আবহ-সঙ্গীত পদটি background musicএর পরিবর্তে অল্পদিন ব্যবহৃত হইতেছে। চলচ্চিত্রে বীর, করুণ, হাস্য, মধুর যখন যে রসের অভিনয় হয়, তাহার সঙ্গে রসানুকূল যন্ত্রসঙ্গীত চলিতে থাকে। ইহাই background music। অনুকূল ভাব বহন করিয়া আনে বলিয়া আবহসঙ্গীত নামকরণ হইয়াছে মনে হয়। কিন্তু এস্থলে প্রসঙ্গবাদ্য, প্রসঙ্গসঙ্গীত, অনুগসঙ্গীত, অনুগুণবাদ্য, সংবাদী-সঙ্গীত প্রকৃত ভাবপ্রকাশে যোগ্যতর শব্দ।

আবহ পদ সংযুক্তবর্ণরহিত এবং স্বল্পাক্ষর, সুতরাং প্রয়োগের পক্ষে লোভনীয়। শুনিয়াছি—এক সময়ে তিনজন বিজ্ঞানী পণ্ডিত স্বতন্ত্রভাবে একটি বৈজ্ঞানিক তথ্য আবিষ্কার করেন। তিনজনের মধ্যে যে ব্যক্তির নাম সুখোচ্চার্য ছিল, তাঁহার নামে আবিষ্কৃত তথ্যটির নামকরণ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আবহ সুশ্রব বলিয়াই উহার অপব্যবহার অনুচিত।

ভারতীয় জ্যোতিঃশাস্ত্রে আকাশের বিভিন্ন বায়ুস্তরের সাতটি নাম পাওয়া যায়। প্রথম স্তরের বায়ুর নাম 'আবহ'। তদনুসারে পৃথিবীর atmospheric regionএর নাম হইবে 'আবহমণ্ডল'। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'পরিভাষাসমিতি' Meteorologyর (= the study of the earth's atmosphere in relation to weather and climate) নাম দিয়াছেন 'আবহবিদ্যা'। সংজ্ঞাটি সুনির্বাচিত হইয়াছে সন্দেহ নাই।

উপাধ্যক্ষ

উপাধ্যক্ষ পদ Vice-Chancellorএর প্রতিশব্দরূপে বেশ চলিয়া গিয়াছে। সরকারী পরিভাষায় Deputy Magistrateকে উপশাসক নাম দেওয়ায় যাঁহারা উপপতির কথা তুলিয়া কৌতুক করিয়াছিলেন, তাঁহারাও Vice Chancellorকে উপাধ্যক্ষ বলিতে কুণ্ঠা বোধ করেন না। শব্দটি শুদ্ধ। কিন্তু কলেজের প্রিন্সিপ্যালকে অধ্যক্ষ বলিলে ভাইস্-চ্যান্সেলরের উপাধ্যক্ষ নাম বড়ই বিসদৃশ বোধ হয়। প্রকৃতপক্ষে ভাইস্ প্রিন্সিপ্যালকে উপাধ্যক্ষ বলা সমীচীন। ভাইস্-চ্যান্সেলরের জন্য একটি যোগ্য সংজ্ঞা স্থির করিয়া লইতে হইবে।

ভাইস্ চ্যান্সেলরের উপর ইউনিভার্সিটির পালনকর্ম ন্যস্ত থাকে।

তদনুসারে তাঁহাকে 'বিদ্যাপাল' বলা অসংগত নয়। বিদ্যাপালের সহিত বিশ্ববিদ্যালয়ের শব্দগত সাহচর্য ভালই চলিবে। পাল-শব্দের গুণ এই যে, উচ্চ নীচ সকল পদে ইহার প্রয়োগ খাটে। দেশপাল, দ্বারপাল, নরপাল, পশুপাল—সর্বত্র 'পাল' তাহার পদানুযায়ী মর্যাদা রক্ষা করিয়া চলে। ভাইস্‌-চ্যান্‌সেলর 'বিদ্যাপাল' হইলে চ্যান্‌সেলর 'বিদ্যাধিপাল' হইতে পারিবেন। সম্ভত প্রয়োগের ক্ষেত্রে হয়তো কালক্রমে ইঁহারা কেবল 'পাল' ও অধিপালে পরিণত হইবেন।

Vice Chancellor বা Chancellorএর মূল অর্থের সঙ্গে বিদ্যার প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ নাই। সুতরাং উঁহাদের অনুবাদেও 'বিদ্যা'পদ বাদ দিয়া শুদ্ধ অধিপাল, মহাধিপাল কিংবা অধিপ মহাধিপ বলা যায়। তাহা হইলে ভাইস্‌ চ্যান্‌সেলর হইবেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিপাল বা অধিপ, চ্যান্‌সেলর হইবেন মহাধিপাল বা মহাধিপ। ভাইস্‌ চ্যান্‌সেলরকে কোন ক্রমেই উপাধ্যক্ষ বলা উচিত নয়।

জাতীয়করণ

জাতীয়করণ শব্দ সংবাদপত্রে nationalisationএর অনুবাদে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কোনও শিল্প ব্যবসায় বা সম্পত্তি যখন ব্যক্তি বা সংঘবিশেষের হাত হইতে রাষ্ট্রের অধিকারে আসে, তখন তাহার nationalisation হইল বলা হয়। ঐ অর্থে 'জাতীয়করণ' অপেক্ষা 'রাষ্ট্রসাৎ-করণ' ভাল কথা। রাষ্ট্রসাৎ পদের অর্থ 'রাষ্ট্রায়ত্ত'। এরূপ স্থলে 'তদধীন' অর্থে সাতি প্রত্যয় হইয়া থাকে। সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মে একাধিক অর্থে সাতি প্রত্যয় হইতে পারে—যেমন অগ্নিসাৎ (অগ্নিময়) গৃহ, ভস্মসাৎ (ভস্মীভূত) পুস্তক, রাজসাৎ (রাজায়ত্ত) দেশ, পাত্রসাৎ (পাত্রাধীন) কন্যা। বাংলায় আত্মসাৎ, উদরসাৎ প্রভৃতি প্রয়োগ দেখিয়া মনে করা উচিত নয় যে, সমস্ত সাতি-প্রত্যয়ান্ত শব্দ ঐরূপ দুশ্চেষ্টাবোধক হইবে। চৈতন্য ভাগবতে আছে—

দুগ্ধ আম্র পনসাদি করি কৃষ্ণসাৎ।
শেষ খায় দুই প্রভু সন্ন্যাসী সাক্ষাৎ॥

এস্থলে 'কৃষ্ণসাৎ' অর্থ কৃষ্ণাধীন। রাষ্ট্রসাৎ শব্দের অর্থও হইবে রাষ্ট্রাধীন। তাহা হইলে nationalisationএর প্রকৃত অর্থ প্রকাশ করিবার জন্য আমরা এইরূপ বলিতে পারিব—"ভারত সরকার কয়লা ও লৌহশিল্পকে রাষ্ট্রসাৎ করার কথা ভাবিতেছেন।" "ভারতের শ্রেষ্ঠ অর্থকোষ Reserve Bank 'সংবিধান সভার' বিধানে রাষ্ট্রসাৎ হইয়া গেল।" জাতীয়করণের পরিবর্তে 'রাষ্ট্রস্বীকরণ'ও চলিতে পারে। রাষ্ট্রস্বীকরণ শব্দের অর্থ যাহা পূর্বে রাষ্ট্রের স্ব (=সম্পত্তি) ছিল না, তাহাকে রাষ্ট্রের স্ব করা। প্রচলিত জাতীয়করণ অপেক্ষা প্রস্তাবিত শব্দ দুইটির অভিপ্রেত অর্থ প্রকাশে সামর্থ্য অধিক। 'রাষ্ট্রীয়করণ' শব্দও জাতীয়করণ অপেক্ষা ভাল।

পূর্তবিভাগ

পূর্তবিভাগ বহুদিন যাবৎ Water Works, Public Works এবং Engineering Departmentএর প্রতিশব্দরূপে চলিতেছে। প্রাচীনকালে ধর্মার্থী গৃহস্থগণ 'ইষ্ট' ও 'পূর্ত' কর্মের অনুষ্ঠান করিয়া পুণ্যার্জন করিতেন। ইষ্ট শব্দে কূপাদিখনন, মন্দিরপ্রতিষ্ঠা, অন্নদান, আর উদ্যানরচনা বুঝাইত। গ্রহণ, সংক্রান্তি, দ্বাদশী উপলক্ষে দানও পূর্তকর্মের মধ্যে পরিগণিত ছিল। পুষ্করিণীখননের সহিত মন্দিরপ্রতিষ্ঠা, অন্নদান, অর্থদান এ সকলও পূর্তের মধ্যে পড়ে। পূর্ত একেবারেই প্রাতিজনিক ধর্মকার্য। সুতরাং সার্বজনিক Water worksএর অনুবাদে শব্দটি শোভন হইয়াছে বলা চলে না। বিশেষতঃ Public Works বা Engineering অর্থে পূর্ত শব্দের প্রয়োগ নিতান্তই অসংগত। ঐ অর্থে 'বাস্তু' পদ অধিক উপযোগী হইবে।

বাস্তু শব্দে কেবল বাসভূমিই বুঝায় না। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে 'বাস্তুকম্' নাম দিয়া তিনটি অধ্যায় (৩।৮-১০) আছে। তাহাতে দেখা যায়—গৃহ, ক্ষেত্র, উদ্যান, সেতু, তড়াগ, আধার এ সকল বাস্তু। জলনির্গম-পথ, মলমূত্রের স্থান, পথের সংক্রম প্রভৃতিও উক্ত তিন অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে। বাস্তুবিদ্যার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'মানসার' (৩য় অধ্যায়) অনুসারে ভূমি, প্রাসাদ, মণ্ডপ, সভা, শালা, প্রপা, রঙ্গ, শিবিকা, রথ, মঞ্চ, আসন প্রভৃতি বাস্তুর অন্তর্গত।

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় ডক্টর শ্রীপ্রসন্নকুমার আচার্য তাঁহার *Dictionary of Hindu Architecture* গ্রন্থে (৫৪৮ পৃঃ) বাস্তুকর্ম পদের বিবরণ দিয়াছেন এইরূপ—

"Vastukarman—The building work; the actual work of constructing temples, palaces, houses, villages, towns, forts, tanks, canals, roads, bridges, gates, drains, moats, sewers, thrones, couches, bedsteads, conveyances, ornaments and dresses, images of gods and sages."

এই বিবরণ অনুসারে বাস্তুকর্ম হইবে প্রকৃত Public Works, পূর্তকর্ম নয়।

এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, নবরচিত সরকারী পরিভাষায় Civil Engineerকে 'বাস্তুকার, বাস্তুবিৎ' নাম দেওয়ায় কেহ কেহ আপত্তি করিয়াছেন।

কবি শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত প্রস্তাব করিয়াছেন এইরূপ (শনিবারের চিঠি, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৫)—

"বিশ্বকর্মা শব্দের অন্তস্থ কর্ম শব্দটির ভিতর Engineering বিভাগের প্রাণ লুক্কায়িত।...ইঞ্জিনীয়ার গোত্রীয় মানব মুখ্যত কর্ম লইয়া চিরজীবন ব্যস্ত থাকেন।...বিশ্বকর্মার ন্যায় তাঁহারা সকলেই 'কর্মা', কেহ 'যন্ত্রকর্মা', কেহ 'স্বাস্থ্যকর্মা', কেহ 'পূর্তকর্মা'...। 'কর্মা' শব্দটি যদি লঘু বিবেচিত হয়, তবে 'কর্মবিৎ' শব্দটি গ্রহণ করা যাইতে পারে।...তাহা হইলে পরিভাষা এইরূপ দাঁড়ায়—

Building Engineer	বাস্তুকর্মা, বাস্তুকর্মবিৎ
Mechanical Engineer	যন্ত্রকর্মা, যন্ত্রকর্মবিৎ
Naval Engineer	নৌকর্মা, নৌকর্মবিৎ

Chief Engineer মুখ্যকর্মা, মুখ্যকর্মবিৎ
College of Engineering কর্মবিদ্যায়তন
Engineering Service কর্মকৃত্যক" ইত্যাদি।

Engineering শব্দ সম্পর্কে অধ্যাপক শ্রীনির্মলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ও আলোচনা করিয়াছেন (ভারতবর্ষ, আশ্বিন, ১৩৫৫)। তাঁহার বক্তব্য এই যে, Engineer প্রধানতঃ নির্মাণ কার্যে অভিজ্ঞ হইয়া থাকেন, সুতরাং তাঁহাকে 'নির্মাণবিৎ' বলা সমীচীন।

সুচিন্তিত প্রস্তাব, সহায়ক পরামর্শ উপেক্ষণীয় নয়। সরকারী 'পরিভাষাসংসদ্' অবশ্য এসকল কথা ভাবিয়া দেখিবেন। Engineerএর জন্য অল্পাক্ষরে 'নির্মাণী' শব্দ চলে কিনা তাহাও বিবেচনার যোগ্য। 'নির্মাণী' সংজ্ঞাটি বিজ্ঞানী ও রসায়নীর সমগোষ্ঠীরূপে ভাষায় স্থান করিয়া লইবে। বিভিন্ন প্রকারের Engineerকে বাস্তুনির্মাণী, যন্ত্র-নির্মাণী, নৌনির্মাণী, মুখ্যনির্মাণী প্রভৃতি নাম দেওয়া চলিবে। Engineering হইবে 'নির্মাণবিদ্যা', Engineering Service হইবে 'নির্মাণকৃত্যক' আর College of Engineering and Technologyর বাংলা নাম হইবে 'নৈর্মাণিক ও প্রাযুক্তিক মহাবিদ্যালয়'।

সর্বজনীন ও সার্বজনীন

সর্বজনীন সার্বজনীন এই দুইটি পদ সাধারণের অনুষ্ঠেয় পূজা-পার্বণ সম্পর্কে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। বিশেষতঃ দুর্গোৎসবের সময় সর্বজনীন সার্বজনীন দুই প্রকারের লেখাই পথে ঘাটে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। উভয় পদই সুন্দর, কিন্তু উভয়ের অর্থ ভিন্ন।

'তস্মৈ হিতম্' অর্থে সর্বজন শব্দের উত্তর খ (=ঈন) প্রত্যয়ে সর্বজনীন পদ সিদ্ধ হয়। উহার অর্থ 'সর্বজনের হিতকর'। যে ধর্মানুষ্ঠান সাধারণের চাঁদায় সর্বজনের হিতার্থে অনুষ্ঠিত হয়, তাহার সর্বজনীন আখ্যা সংগত। জনকল্যাণের জন্য প্রতিষ্ঠিত অন্নসত্র, আপন্নাশ্রম প্রভৃতিও অবশ্যই সর্বজনীন। খ প্রত্যয়যোগে বৃদ্ধি হয় না সুতরাং সর্বশব্দের আদিস্বরের বৃদ্ধি (সার্ব) হয় নাই।

'তত্র সাধুঃ' অর্থে সর্বজন শব্দ খঞ্ (= ঈন) প্রত্যয়ে সার্বজনীন রূপ লাভ করে। এস্থলে প্রত্যয়স্থ ঞ্-যোগে সর্বপদে বৃদ্ধি হইয়াছে সার্বজনীন শব্দের অর্থ 'সর্বজনের মধ্যে যোগ্য বা প্রবীণ'। সুতরাং দুর্গোৎসবকে সার্বজনীন বলা যায় না। যদি বলি—'বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সার্বজনীন নেতা ছিলেন' তাহা হইলে সার্বজনীন শব্দের প্রকৃত অর্থ প্রকাশিত হয়। অর্থের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া শব্দ দুইটিকে যথাযথ প্রয়োগ করা কঠিন নয়। সর্বজনীন অর্থ সকলের হিতকর, আর সার্বজনীন অর্থ—সকলের মান্য।

ব্যপদেশ

ব্যপদেশ শব্দ উপলক্ষ অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে। কিন্তু ইহার প্রকৃত অর্থ ছল। রামচন্দ্র জানকীর ইচ্ছাপূরণ ব্যপদেশে তাঁহাকে বনে পাঠাইয়াছিলেন এরূপ বাক্য শুদ্ধ। কিন্তু দুষ্মন্ত মৃগয়া ব্যপদেশে বনে দর্শনে ইচ্ছা প্রকাশ করেন, অরণ্য দেখাইবার ছলে তাঁহাকে নির্বাসন দেওয়া হয়—ইহা রামায়ণের কথা। কিন্তু মহাভারতের কাহিনীতে আছে—দুষ্মন্ত মৃগয়া উপলক্ষে শকুন্তলার আশ্রমে উপনীত হইয়াছিলেন, মৃগয়ার ছলে নয়। ছল, উক্তি, নাম, বংশ, কুলবোধক পদবী এই সকল অর্থে ব্যপদেশ শব্দের ব্যবহার আছে, উপলক্ষ অর্থ প্রামাণিক অভিধানে পাওয়া যায় না, প্রাচীন প্রয়োগেও দেখা যায় না। বণিজ্যব্যপদেশ, উৎকণ্ঠাব্যপদেশ, রোগব্যপদেশ, শিরঃশূলব্যপদেশ, বন্ধুদিদৃক্ষাব্যপদেশ প্রভৃতি প্রয়োগ সংস্কৃত সাহিত্যে আছে। সর্বত্রই ব্যপদেশের অর্থ ছল। উপলক্ষ অর্থে শব্দটির ব্যবহার স্পষ্টই ভ্রান্তিমূলক।

আলোচিত আঙ্গিক, আবহ, ব্যপদেশ, সার্বজনীন সবই তৎসম শব্দ। প্রাচীন গ্রন্থে ইহাদের প্রয়োগের অভাব নাই, অনুসন্ধান করিলেই অর্থ জানা যায়। সুন্দর ও সুষম শব্দ স্বভাবতঃই লেখককে প্রলুব্ধ করে, অনবধান হইলে স্খলনের আশঙ্কা আছে। লেখকের পথ সংকটময়। তাঁহার মুহূর্তের ত্রুটি ভাষায় চিরন্তন অনর্থের সৃষ্টি করে। সাধারণের গুণাগুণ বিচার করিবার প্রবৃত্তিও নাই, অবসরও নাই। হাতের কাছে শব্দ পাইলেই তাঁহারা নিঃসংশয়ে চালাইয়া যান। এ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু মহাশয় আনন্দবাজার পত্রিকায় (১৬ মাঘ, ১৩৫০) লিখিয়াছিলেন—

"লেখকরা যদি নিরঙ্কুশ হন এবং তাঁদের ভুল বারংবার ছাপার অক্ষরে দেখা দেয়, তবে সংক্রামক রোগের মত সাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে ;"

কথা সত্য। বাংলা ভাষায় দিন দিন অপপ্রয়োগ বাড়িয়া চলিয়াছে। অনুচিত অর্থে প্রযুক্ত হইয়াও বহু শব্দ চলিত পর্যায়ে উঠিয়া গিয়াছে। অবদান, অভ্যর্থনা, আন্তর্জাতিক প্রভৃতি শব্দের কথা পূর্বে বলিয়াছি। বিদ্বান ও খ্যাতিমান লেখকগণও এ সকল শব্দ প্রয়োগ করিতে দ্বিধা করেন না।

বাংলা জীবন্ত ভাষা, সুতরাং সর্বত্র ব্যাকরণের শাসন বা অভিধানের নির্দেশ মানিয়া চলিবে এমন আশা করা যায় না। কিন্তু কোন প্রয়োগটি একান্তই লেখকের অনবধানতার ফল, আর কোন প্রয়োগের মূলে ভাষার প্রাণধর্মের প্রেরণা আছে, তাহা চিন্তার বিষয়। বর্তমান আলোচনার উদ্দেশ্য এই যে, যাঁহারা বঙ্গভাষার যোগক্ষেমবহনের গুরু দায়িত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, সেই সাংবাদিক ও সাহিত্যিকগণ শব্দের নির্মাণ ও যোজনকালে অবহিত হইবেন।

এতক্ষণ বিশেষধর্মিক শব্দ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। সাধারণ ইংরেজী শব্দের অনুবাদেও বড় অনিয়ম চলিতেছে। কয়েকটি উদাহরণ দিয়া বক্তব্য শেষ করিব।

সেদিন চোখে পড়িল—একখানি মাসিক পত্রে অষ্ট্রেলিয়ার বিখ্যাত খেলোয়াড় ব্র্যাড্‌ম্যান 'ক্রিকেটদানব'রূপে প্রশংসা লাভ করিয়াছেন। এখানে giantএর অনুবাদে 'দানব' পদ ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু ভারতীয় কল্পনায় 'দানব' দুর্বৃত্তপক্ষী। এরূপ স্থলে ক্রিকেটবীর,

আর একখানি সাময়িক পত্রে এক বিদেশী গল্পের অনুবাদে অনুবাদক লিখিয়াছেন—"যে বিষয় হাটমনে উপেক্ষা করা উচিত, পৃথিবী মানুষকে তারই বিজ্ঞপ্তি নিতে বাধ্য করে।" বিজ্ঞপ্তি অবশ্য notice শব্দের অনুবাদ। অভিধানে notice এর এক অর্থ আছে বিজ্ঞপ্তি, বিজ্ঞাপন—তাহা সকলে জানেন। কিন্তু "তারই বিজ্ঞপ্তি নিতে" স্থলে লেখা উচিত ছিল 'তা গ্রাহ্যের মধ্যে আনতে' 'তাতে মনোযোগ দিতে' কিংবা 'সে দিকে দৃষ্টি দিতে'।

আজকাল কলিকাতার পথে পথে 'বিভাগীয় বিপণি' খোলা হইতেছে। এই নবরচিত শব্দটি departmental store এর অনুবাদ। কিন্তু বাংলায় বিভাগীয় বলিলে বিভাগ সম্বন্ধীয় অর্থ আসে। বিভাগীয় অপেক্ষা 'বিভাজিত' শব্দ প্রকৃত অর্থ প্রকাশে অধিক উপযোগী।

অভিধান হইতে নির্বিচারে শব্দ চয়ন করিলে পদে পদে বিপত্তির সম্ভাবনা আছে, উল্লিখিত তিনটি দৃষ্টান্ত তাহার প্রমাণ।

ভারত-তীর্থ

শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

আমরা আজ স্বাধীন দেশের অধিবাসী! কিন্তু এই স্বাধীনতা অধিকার ক'রবার জন্য দেশের যে বলীয়ান্ সন্তানেরা একদিন "মুক্তি অথবা মৃত্যু"-পণ গ্রহণ ক'রেছিল, তাদের কথা আজ কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি।

উপল-কঠিন নির্ম্মম পথে সুরু হ'য়েছিল তা'দের দুরন্ত অভিযান; পশ্চাতে ফেলে এসেছিল তা'রা ছন্দোময় জীবনের গীতি-ঝঙ্কার। সম্মুখে ছিল—তা'দের মৃত্যুর ইঙ্গিতময় আহ্বান-ভেরী। স্বপ্নালস জীবনের জড়িমা ত্যাগ ক'রে শঙ্কাভয়হীন চিত্তে তা'রা দলে দলে এগিয়ে চ'লেছিল সেই মৃত্যু-ভয়ঙ্কর পথে! মহাত্মাজীর অভয়-শঙ্খ-নিনাদে মূর্চ্ছাপন্ন ভারত মোহনিদ্রা হ'তে জেগে উঠ্‌ল—অপূর্ব্ব ত্যাগের দীপ্ত মহিমায় মুগ্ধ নিখিল বিশ্ব সেই মহামানবের বন্দনা-গানে মুখরিত হ'য়ে উঠ্‌ল। আত্মাহুতির সেই অলৌকিক দৃশ্যে পূর্ব্বগগনে ফুটে উঠেছিল নবারুণ-রাগের রক্তিম আলিম্পন, যুগান্তরের তমিস্রা ভেদ ক'রে—!

যুগান্তরের তমিস্রা ছেদি', ছোঁয়ায়ে তরল সোনা,
পূর্ব্বগগনে নবারুণ রাগে আঁকি' দিল আলিপনা;
অরুণ আভাসে সুপ্তি ত্যজিয়া উঠিল নিখিল নর—
নহে নবারুণ, মহামানবেরে বন্দিল চরাচর।
মূর্চ্ছা-মগন ছিল এ ভারত, ছিল এ বঙ্গভূমি,
ফুকারি' তোমার অভয় শঙ্খ জাগায়ে দিয়েছো তুমি!
তরুণ ভারত পেয়েছে শক্তি, পেয়েছে অমর প্রাণ,
শুনেছে সকলে অন্তর মাঝে, তোমার বজ্র গান।

অমৃত পুত্র, রক্ত-তিলক ঝলকিছে তব ভালে,
জাগো রে নূতন, পুণ্যতীর্থে শুভ প্রত্যুষকালে!
"মৃত্যু অথবা মুক্তি" সকলে শুধু এই কর পণ,
সুচির নিদ্রা অথবা তোমার অনন্ত জাগরণ!
গিরি-কান্তার সঘনে কাঁপিল, কাঁপিল সাগর জল,
দিকে দিকে ওঠে হোমানল শিখা, বুকের বজ্রানল;
সুপ্তি-জড়িমা নিমেষে টুটিল, উঠিল দৃপ্ত তেজে,
চরণে বাজিছে শৃঙ্খল তবু বুকে হাসি ওঠে বেজে!
নিদ্রা-অলস নেত্র মেলিয়া, চমকিয়া ওঠে সবে,
পূর্ব্বগগনে রক্ত লেখায় ডাকিছে মহোৎসবে।
আহ্বান-ভেরী গরজে সঘন—জাগে জীবনের গান;—
ঘুমাবে সে কি?—না—দিবে প্রাণাহুতি কণ্টক অভিযান!
দলে দলে চলে ভক্ত পথিক—না জানে শঙ্কা ভয়;
সত্যের লাগি' এ কারাবরণ, মৃত্যুর পরাজয়।
উপল-কঠিন নির্ম্মম পথে সুরু হ'ল অভিযান;—
পশ্চাতে কাঁদে জীবনের গীতি, সুমুখে মরণ-গান!

অনাগত দিবসের বৈভবে উন্মুখ, আর অতীতের মহিমায় মগ্ন তা'দের স্বপ্ন ছিল সততায় রঞ্জিত। মৃত্যুকে যা'রা তুচ্ছ ক'রেছিল, সেই শহীদগণের জাগরণ-মন্ত্র সর্ব্বহারার গণতন্ত্র রচনা ক'রে মর্ম্মহারার বুকে জাগিয়ে তুলেছিল সুগভীর সান্ত্বনা। নেতাজীর "জয়হিন্দ" ডঙ্কা মৃত্যুপথযাত্রীর রক্ত-প্রবাহের মধ্যে সঞ্চারিত করেছিল অগ্নির উদ্দীপনা—ঐ, জাগে নব-যুগ-সূর্য্য—ঐ শোনো স্বাধীনতার তূর্য্য-

নিনাদ! ফাঁসির মঞ্চে উৎসর্গ-করা শত শত প্রাণ, যারা মুক্ত ক'রেছে চরণের শৃঙ্খল—ইতিহাসের পাতায় রক্ত-পাগল করা ছন্দে লেখা তা'দের বন্দনা-গীতি শ্রবণ কর।

কত শত প্রাণ দিল ফাঁসীর মঞ্চে যা'রা
ইতিহাস তাহাদের বন্দে—
ভেসে আসে দিগন্তে সেই গীতি-ঝঙ্কার—
রক্ত-পাগল-করা ছন্দে
রচিয়াছে শহীদের চির-নিদ্রার বেদী
তৃষার্ত ধরণীর বক্ষে—
ঘনায়ে উঠিল তাই পুঞ্জিত ব্যথা যত
অন্ধ সে কারাগার-কক্ষে!
মরণের বেদীমূলে ঝরে যায় আঁখিজল
স্তব্ধ কাকলী মৃদু মন্দ,
চকিতে থামিয়া যায় বিহগের কলতান,
বিরহীর মরমিয়া ছন্দ।
স্বপ্ন তাদের ছিল সততায় রঞ্জিত,
উচ্ছল অন্তর-লগ্ন,
অনাগত দিবসে বৈভবে উন্মুখ
অতীতের মহিমায় মগ্ন!
মুক্ত ক'রেছে যা'রা চরণের শৃঙ্খল
আনিয়াছে জাগরণ-মন্ত্র—
মর্ম্মহারার বুকে সুগভীর সান্ত্বনা—
সর্ব্বহারার গণতন্ত্র!
বিশ্ব কাঁপায়ে জাগে সেই মহাসঙ্গীত
দীর্ণ দলিত ভয় শঙ্কা—
মৃত্যু পথের জয়-যাত্রীর রক্তে
নেতাজীর "জয়হিন্দ্" ডঙ্কা!

ঐ জাগে নব যুগ সূর্য্য—
আকাশ বাতাস আর উছলিয়া ক্ষিতি জল,
মন্দ্রিত স্বাধীনতা-তূর্য্য!

তিমির-রাত্রির অবসানে আজ গৌরবময় প্রভাতের অভিসূচনা! আকাশ, ধরণী, সাগরের জল আজ রঙীণ উষার রক্ত-রাঙা ফাগে রঞ্জিত। উপনিষদের সেই অমৃতময়ী বাণী "তমসো মা জ্যোতির্গময়" আজ ভারতবর্ষ সফল

হে আলোক! হে দুঃখ-তিমির-বিনাশিনী আনন্দ-রূপিণী প্রভা! আজ আমরা তোমার উপাসনা করি। তোমার পবিত্র অংশুধারায় স্নাত হ'য়ে পাপ আজ পুণ্যে রূপান্তরিত হোক—অবসাদ রূপান্তরিত হোক্ উৎসাহে। উচ্ছল জীবনের উদ্দীপনা-দৃপ্ত গানের মধ্য দিয়ে অভিযান সুরু হোক্ নূতনের! আজ ভারতের উদয়-শিখরে অপরূপ রূপরাগে নবারুণ আভা জাগ্রত!

অপরূপ রূপরাগে
ভারতের রবি জাগে;
উদয় শিখরে নবারুণ আভা
ধরণীর বুকে লাগে!
শ্যামল বনানী মাঝে
মিলন রাগিণী বাজে,
আকাশ বাতাস সাগরের হিয়া
রঞ্জিত রাঙা ফাগে!
নরনারী সবে করিল বরণ
অরুণ-কিরণ-ভাতি—
গৌরবে আজ ফুটেছে প্রভাত
কেটেছে তিমির রাতি!
এলো জীবনের গান—
নূতনের অভিযান;
চঞ্চল আজি তরুণ ভারত
উচ্ছল অনুরাগে!

এই তরুণের অভিযানে, হে ভারতের নরনারী, তোমরা সকলে জাগ্রত হও। দুঃখাবরিত রজনীর শেষে, আজ শৃঙ্খলের অবসান হ'য়েছে।

এই বিমুক্তি অর্জ্জন ক'রবার জন্য যে অপরিমিত মূল্য দিতে হ'য়েছে—সেই নির্দ্দয় হানাহানি, নিষ্ঠুর রক্তপাত, আর দুর্ব্বহ অপমান বিস্মৃত হও। মিলন-তীর্থ এই ভারতবর্ষে মৃত্যুর পরাজয় ঘটেছে। শুধু প্রেমেই শঙ্কাভয় পরাজিত হ'বে। শত শহীদের তপ্ত রুধিরে দেশ জননীর যে বেদী রঞ্জিত হ'য়েছে, সেখানকার প্রেম-তর্পণে, জীবনের জয় গানে, হে ভারতের নরনারী তোমরা জাগ্রত হও।

জাগো ভারতের নরনারী, আজ
তরুণের অভিযান—

ছিন্ন হ'য়েছে বন্ধন যত
শৃঙ্খল অবসান!
ভুলে যাও যত হানাহানি, আর
রক্তের পথে গতি দুর্ব্বার,
ভুলে যাও সেই জীবনের ভার—
দুর্ব্বহ অপমান!
মিলন-তীর্থ এ মহাভারতে
মৃত্যুর পরাজয়—
শুধু প্রেম আর প্রেম দিয়ে শুধু
জিনিব শঙ্কাভয়!
শত শহীদের তপ্ত রুধির-
-রঞ্জিত বেদী দেশ-জননীর;
প্রেম-তর্পণে জাগে যেন সেথা
জীবনের জয় গান!

ঘন অন্ধকারের বুক চিরে আজ স্বাধীন ভারতের জয়-রথ বহ্নি-বাণের মত ছুটে চ'লেছে! এ দুর্ম্মদ গতি-তরঙ্গ রোধের শক্তি কা'র আছে? পরাধীনতার শত লাঞ্ছনার আজ অবসান। শ্রাবণের গহন তিমির হ'তে ঘুমন্ত ধরণী, ধীরে ধীরে জেগে উঠ্ছে, চেয়ে দেখ।

ঘুমন্ত ধরণীরে
শ্রাবণ গহন তিমির হইতে
কে জাগালো ধীরে ধীরে।
কত জয়গান, কত কলরোল,
কত উৎসব ছন্দ-বিভোল,
নবীন সূর্য্য গৌরবে আজ
রাঙিয়া উঠিল ফিরে!
পরাধীনতার শত লাঞ্ছনা
হ'য়ে গেল অবসান—
ধরণীর বুকে ধ্বনিয়া উঠিল
ভারতের জয়গান।
স্বাধীন আমরা, স্বাধীন ভারত
বিজয়-দীপ্ত তা'র জয়রথ
ছুটিল বহ্নি-বাণ সম ঘন
আঁধারের বুক চিরে।

বহু যুগের পরাধীনতার শৃঙ্খল পরাজিত, খণ্ডিত হ'য়ে স্বাধীন ভারতের পদ চুম্বন ক'র্ছে। বহুদিনের ভুলে যাওয়া স্বাধীনতার গান আজ ঘরে ঘরে প্রতিধ্বনিত। বাধা বিপত্তি ঝঞ্ঝা ভ্রূকুটি তুচ্ছ ক'রে সৌধে উড়ছে বহু সাধনার ত্রিবর্ণ পতাকা!

এত বড় সৌভাগ্যের মূলে কি আছে, জানো? আছে মেবার সূর্য্য রাণা প্রতাপের বীরত্বের তূর্য্যনাদ, আছে মারাঠাবীর শিবাজীর হর হর হর রণ হুঙ্কার, আর অসির ঝন্ ঝন্ শব্দ; আছে গুরু গোবিন্দ, প্রতাপাদিত্য, রাজা সীতারাম, বীর শশাঙ্ক ও চাঁদ কেদারের দুর্জ্জয় সংগ্রাম, আছে ঝান্সীর রাণীর বৃটেনের বুক কাঁপানো বীরত্বের প্রদীপ্ত ইতিহাস; আর আছে প্রাচীদিগন্তে মণিপুর প্রাঙ্গণে সুভাষের জ্বলন্ত সমর-বহ্নির অপূর্ব্ব ঐন্দ্রজালিক কাহিনী।

বহুদিন পরে—বহুদিন পরে আমরা নিজের ঘর ফিরে পেয়েছি, তাই আজ রক্তস্নাত ধরণীর বুকে 'মুক্ত ভারতে দীপ্ত পতাকা উড়িছে সৌধ পরে—'

ভুলে যাওয়া সেই স্বাধীনতা গান জাগে
প্রতি ঘরে ঘরে!
শ্রাবণের ঘন মেঘের অঙ্কে নাচেরে বিজলী-শিখা—
নব-জাগ্রত জাতির ললাটে জ্বলেরে বিজয় টীকা।
মেবার-সূর্য্য রাণা প্রতাপেরে বন্দিল ইতিহাস—
তূর্য্য-নিনাদে কীর্ত্তি যাহার ছাইল ভারতাকাশ।
বাধা বিপত্তি ঝঞ্ঝা ভ্রূকুটি তুচ্ছ করিয়া বীর—
বরিল মৃত্যু, হয়নি নমিত তবু উন্নত শির!
দুর্দ্দম সেই মারাঠা বীর, গৈরিক আভরণ,—
হর হর হর রণ হুঙ্কারে অসি বাজে ঝন্ ঝন্!
প্রাণের অর্ঘ্য ঢালিয়াছে মা'র চরণ-যুগল চুমি',—
আপন শৌর্য্যে আপন বীর্য্যে রচিল তীর্থ-ভূমি!
গুরুগোবিন্দ, প্রতাপাদিত্য,
হেথা রাজা সীতারাম—
বীর শশাঙ্ক, চাঁদ কেদারের দুর্জ্জয় সংগ্রাম!
ঝান্সীর রাণী গরজি' উঠিল, ছুটিল অশ্বারোহে—
বৃটেনের বুক কাঁপিয়া উঠিল সিপাহীর বিদ্রোহে!
সে সব সাধনা করিতে সফল,
প্রাচীদিগন্ত কোণে—
জ্বালিল সুভাষ সমর-বহ্নি মণিপুর প্রাঙ্গণে!
দধীচি দিয়াছে আপন অস্থি শত্রু নিধন লাগি'—
সেই আদর্শ এ মহাজাতির স্মরণে রহিবে জাগি'!
রক্ত-স্নাত ধরণীর বুকে পেয়েছি আপন ঘর—
দুঃখ-দহন-অবসানে মোরা ভুলেছি আত্মপর!
বহুযুগ পরে পরাধীনতার খণ্ডিত শৃঙ্খল—
মুক্ত স্বাধীন মহাভারতের চুম্বিছে পদতল।

বন্দে মাতরম্ *

* এই গীতআলেখ্যটী কলিকাতা বেতারকেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়।

অর্থনৈতিক দৃষ্টিতে বাংলার সমাজ, সাহিত্য ও ভাষা

কৌটিল্য

আজ যে সকল সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ঘটনার কারণ সহজে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, অতীতে সমাজ-জীবনে কালভেদে বস্তুর বিভিন্ন মূল্য-জ্ঞানের ইতিহাস সে সন্ধান দিতে পারে। অর্থনীতির ঐতিহাসিক ও দার্শনিক দিক আলোচনা প্রসঙ্গে বর্তমান সমাজের রূপবিকাশের অনেক বিস্মৃত খেই সংগ্রহ করা যায়। সামাজিক ইতিহাস আলোচনা কখনই সার্থক হয় না, যদি না সে আলোচনা বর্তমান সমাজকে বুঝতে এবং প্রয়োজন হলে সংস্কার করতে সাহায্য করে।

অধিক দিনের ইতিহাস নয়, ১০০০ বছর আগের বাংলা থেকে ধরলে দেখতে পাই বাংলার মানুষ বিত্ত সম্বন্ধে একটি মারাত্মক রকম ভুল করেছিল। আজ সেই ভুলের পরিণতি হয়েছে বাংলা বিভাগের মূল কারণ। প্রাচীন বর্ণাশ্রমধারা হাজার হাজার বছর ধরে কুটিল পঙ্কিল পথে চলতে চলতে সঙ্কীর্ণ ও দুষ্ট হয়ে উঠে, শুধু বাংলায় নয় সমগ্র ভারতে। কাল'দুষ্ট এই সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে বাংলার অদূরদর্শী সমাজপতি বল্লাল সেন কৌলিন্য প্রথা নামে এক বিজ্ঞান ও নীতি বিরুদ্ধ ব্যবস্থার সূচনা করেন। বহুবার বিয়ে করে নিষ্কর্মা (কুলীন) যেদিন থেকে সমাজের পূজ্য হলো, সেদিন থেকেই বাংলার সমাজের নৈতিক মেরুদণ্ড সম্পূর্ণরূপে ভেঙে গেল। বাংলার মানুষ পশুর পর্যায়ে ক্রমে নেমে দাঁড়ালো। মানুষের মূল্য একদিকে যেমন অসম্ভব রকম কমে গেল, অপরদিকে বিজেতা মুসলমান বাদশাগণের ভোগ ও অর্থলিপ্সার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বাঙ্গালী বিত্ত সম্বন্ধে ধারণা করে নিল, টাকাকড়িই প্রকৃত ধন, আর শিল্প বাণিজ্য একান্তভাবে অনুন্নত; এই দেশে টাকাকড়ি লাভের একমাত্র উপায় হলো ছলে বলে ভূসম্পত্তি আত্মসাৎ করা। ধনবলের প্রতি দোষনীয় আগ্রহ এ আর জনবলের প্রতি অন্যায় অবজ্ঞার ফলে ঃ বাংলা ও প্রায় সমপরিমাণ বাঙ্গালী আজ ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। বাংলার জনসংখ্যা সম্বন্ধে সামান্য ধারণা যাঁর আছে, কি সব অবাঞ্ছিত কারণে বাংলার হিন্দু দলে দলে বিধর্মী হয়ে গেছে, সে সত্য তাঁর অবিদিত নয়। অদূরদর্শী বঙ্গ সমাজ একদিকে ভূসম্পত্তির ক্রমক্ষয়িষ্ণু বিপর্যয়ের বিষয় অনবহিত থেকে ও অপরদিকে মানুষকে পায়ে ঠেলে যে সর্বনাশ ডেকে এনেছে সে সম্বন্ধে আজও যদি হিন্দু (পশ্চিম ও পূর্ব উত্তর বাংলার) সচেতন না হয় তবে বাংলায় যে বিপর্যয় ঘটবে ১৯৪৩।৪৪ সালের দুর্ভিক্ষ ও ১৯৪৭ সালের বঙ্গ বিভাগ সে তুলনায় অতি তুচ্ছ মনে হবে।

মনে পড়ে কিছুদিন আগে বঙ্গ বিভাগ আন্দোলনের স্বপক্ষে বক্তৃতা করতে উঠে নয়া দিল্লীতে এক সভায় শ্রীযুত তুষারকান্তি ঘোষ মশাই ও অন্যান্য বক্তাগণ নতুন বাংলার এক অতি মনোরম চিত্র এঁকেছিলেন। কল্পিত সেই বাংলা কতই না সুন্দর ও সুখের হবে। আজ সেই কল্পনার বাংলা বাস্তবরূপ ধারণ করেছে, কিন্তু তার সে আকাঙ্ক্ষিত সৌন্দর্য ও সুখ ত দেখতে পাচ্ছি না। আদি বঙ্গ জননীকে আমরা বিসর্জন দিয়েছি—নতুন দেবীর কাঠামো আজ আমাদের সুমুখে, তাতে রূপ, রস ও প্রাণ সঞ্চার আমাদের করতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকার, কংগ্রেস হাই কমাণ্ড বা প্রাদেশিক সরকার এই কাজ করতে পারেন, এ বিশ্বাস আমার নেই। বাঙ্গালীর যৌথ চেষ্টার বলেই এ কাজ সাধ্য। আর এই জীবনপণ শুভ প্রচেষ্টায় সজীব বাংলা ভাষা আমাদের অন্তরের সংযোগ ও বাইরের অগ্রগতিকে পুষ্ট করবে। বাঙ্গালীর এই নতুন দায়িত্ব ও বাংলা ভাষার এই অভিনব প্রয়োগ সম্বন্ধে বিশেষভাবে ভাববার সময় আজ এসেছে।

বঙ্কিম, মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের পদাঙ্ক অনুসরণ করে যাঁরা বাংলা সাহিত্যের সৃষ্টি ও সেবার কাজে নিযুক্ত আছেন তাঁদের প্রতি আমার উপযুক্ত পরিমাণ শ্রদ্ধা আছে। যাঁরা বর্তমানে বাংলা সাহিত্যের আপেক্ষিক অবগতি ঘটেছে মনে করে চিন্তিত হয়ে পড়েছেন, তাঁদের দুর্ভাবনা অমূলক বলেই মনে করি। আকাশে দিনের পর দিন ও রাত্রির পর রাত্রি রবি ও শশীর উদয় হতে পারে, কিন্তু সাহিত্য গগনে রবি ও শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব বহু শতাব্দীর সাধনার ফলে সম্ভব। বাঙ্গালীর সাহিত্য সাধনা যুগোপযোগী চরম সার্থকতা লাভ করেছে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের মধ্যে। এই সিদ্ধি সাধনের সম্বল নিয়ে আবার নতুন সাধনা চাই অনাগত যুগে অভিনব সার্থকতা লাভের জন্য। পক্ষান্তরে যাঁরা মহা উল্লাসে আজ ঘোষণা করছেন—বাংলা সাহিত্যের নবযুগ এসেছে—Bengali Literature goes left, ইত্যাদি, তাঁদের ক্ষীণদৃষ্টি ও অল্প প্রাণ বলে মনে হয়। বাংলায় গত কয়েক বছরের ঘটনার কথা বলছি। শয়তানসম টেগার্ট (ক'লকাতা), প্রেসবী (ঢাকা) ও এণ্ডারসনের (স্যার জন—গভর্ণর) কুশাসন ও অসহনীয় অত্যাচার বারোজের (বাংলার শেষ ব্রিটিস্ গভর্ণর) উদ্ভিদসম অবর্ণনীয় নিষ্ক্রিয়তার কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। এই যে ১৯৪৩-৪৪ সালে পঙ্গু, দুষ্ট ও বর্বরোচিত শাসন ব্যবস্থার জন্য বাংলার পথে ঘাটে হা অন্ন হা অন্ন বলতে বলতে একটি নয়, দুটি নয়, শত কি সহস্রটি নয়, ৫০ লক্ষ লোক মরল, সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাস খুঁজলেও এমন একটা শোচনীয় ঘটনার তুলনা কি কোথায়ও মিলে! এই একটি মাত্র ঘটনা প্রত্যক্ষদর্শী শত শত সাহিত্যিককে উগ্র বামপন্থী করে তুলতে পারে। কিন্তু বাংলার মানুষ কি ভাবে মরেছে, বাঙ্গালী সেই মহামৃত্যু কি ভাবে দেখেছে—সে ইতিহাস বড়ই কলঙ্কময়। অল্প যেটুকু পড়িয়ে পড়েছে, বাঙ্গালীর লেখনী মুখে যে সামান্য অগ্নি স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়েছে, ঘটনার তুলনায় তা অতি অকিঞ্চিৎকর। বাম পথ বড় বন্ধুর ও কণ্টকময় পথ,

সে পথে ছায়াতরু নেই, পান্থশালা নেই, সান্ত্বনা দেবার সহচর মিলে না। ঐ সর্বনাশা পথের আহ্বানে গৃহ ছেড়ে যে একবার বেরুবে, আর তার গৃহে ফেরা ভার। ভরতসম রাজপাদুকা মাথায় ধরে, মিত্র চার্চিলকে নিয়মিতভাবে ভোজসভায় আপ্যায়িত করে সে এটলী-মার্কা বামপন্থী সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠছে তা প্রতিক্রিয়াশীল পরিহাস বই আর কিছুই নয়। বাম পথের যাত্রা শেষে গৌরবময় প্রভাতের উদয় হবে—শুধু এই আশায় বুক বেঁধে ঘোর অন্ধকার সীমাহীন দুঃখাস্তীর্ণ পথে চলেছে বামপন্থীর সুদীর্ঘ অভিযান। বালীগঞ্জে, না হয় নিদেন পক্ষে সহরতলীতে কোথাও সুন্দর ছোট্ট একখানা কোঠাবাড়ি হবে, একটু আরাম, একটু আয়াস মিলিবে, এই আশায় সম্পাদকের মুখ চেয়ে পাঠকের নাড়ীতে এক হাত রেখে আর সব করা যেতে পারে—বামপন্থী সাহিত্য সৃষ্টি করা যায় না। যা হক, বামপথ ও বাংলা সাহিত্যকে যদি এক সঙ্গে উল্লেখ করতে হয় তবে আমি বর্তমানে এইটুকু স্বীকার করতে রাজি আছি—Bengali literature looks left—একে বামপথের দিকে দৃষ্টি বলা যেতে পারে, বামপথে চলা বলা যায় না। এই বামপথের দিকে ফিরে দেখবার শক্তি ও সাহস যাঁদের আছে তাঁদের অভিনন্দন জানাবার ও উৎসাহ দেবার সময় এসেছে। আর যারা পঙ্কিল দক্ষিণ পথে চলে স্বার্থের খাতিরে বামপথের বুলি আওড়াচ্ছেন তাদেরও সতর্ক করে দেবার সময় উপস্থিত।

বাংলায় ও বাংলার বাইরে বাঙ্গালী সমাজে সাহিত্যিক সাজা কিছু কঠিন কাজ নয়। ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীর এজেন্সি বা ঐ রকম যা হয় একটা কিছু কাজে দু পয়সা বেশ আয় থাকলে যে কোন ক্লাবের সাহিত্য-শাখার সেক্রেটারী হওয়া যায়। যুবজন আয়োজিত রবীন্দ্র সাহিত্য-বৈঠকে সভাপতিত্ব করতে হলে "ভাঙরে হৃদয় ভাঙরে বাঁধন, সাধরে আজিকে প্রাণের সাধন," এই দু'ছত্র রবীন্দ্র কাব্যের সঙ্গে পরিচয় থাকলেই যথেষ্ট। রসায়ন শাস্ত্রের একজন ডি-এস-সি, পি-এইচ্-ডি, যিনি কোন এক সরকারী বিজ্ঞান শিক্ষাকেন্দ্রের কাজে নিযুক্ত আছেন, সেদিন দেখালেন তাঁর ইংরেজী কবিতা কাগজে ছাপা হয়েছে। ফলিত পদার্থবিজ্ঞান, চিকিৎসা, কৃষি ইত্যাদি বিজ্ঞান কলেজের ছাত্র ও অধ্যাপকগণ যে সুযোগ পেলে নিজ নিজ কবিতা ও গল্পের খাতা বার করে ধরেন সেরূপ ঘটনা বাংলায় বিরল নয়। কিন্তু এই বিশেষজ্ঞগণ নিজ নিজ বিষয় সম্বন্ধে বাংলায় কিছু লেখার কথা ভেবেও দেখেন না। বাংলা সাহিত্যের মূল্যবান সম্পদের অধিকারী বাঙ্গালী মাত্রেই। কিন্তু বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, চিকিৎসক সকলেই কবিতা ও গল্প লিখচেন—এমনটি হতে পারে না দু'কারণে—প্রথমত সকলের কবিতা ও গল্প লিখবার ক্ষমতা থাকে না, আর দ্বিতীয় কারণ—বাংলা ভাষাকে আরও সম্পদশালী করবার জন্য, সমাজের কল্যাণের জন্য বিজ্ঞান, দর্শন, ইত্যাদি বিষয়ে লেখার কাজে এই সব বিশেষজ্ঞগণের প্রয়োজন। একবার বাংলার কোন একটি বিখ্যাত কাপড়ের মিলের গ্রন্থাগার দেখি। সেখানে গল্প, নাটক, নভেল সব রকম বই-ই (ইংরেজী ও বাংলা) রয়েছে, কিন্তু বয়নশিল্প সম্বন্ধে কোন বই দেখতে পেলাম না (বাংলায় ইতিমধ্যে বয়নশিল্প সম্বন্ধে মিলের কর্মী ও শিক্ষানবীশগণের হিতার্থে কিছু না লিখে (গতিক দেখে মনে হয়, হয়ত বা কিছু না পড়েও) সাহিত্যিক হওয়া যায়। আর সাহিত্য বিষয়ে না লিখেও লেখক হওয়া যায়। বাংলায় সাহিত্যিক অনেক, লেখক কম। এই অবস্থার জন্য কে কতটা দায়ী সে আলোচনায় লাভ হবে না ; বরং যে সব কারণে এ অবস্থা বর্তমান, সেগুলি সম্বন্ধে সংক্ষেপে উল্লেখ করলে ভবিষ্যতে ফল ভাল হতে পারে। বাংলার বর্তমান বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, চিকিৎসক সকলেই ইংরেজীর মারফত নিজ নিজ বিষয়ে শিক্ষালাভ করেছেন। বাংলা ভাষার সাহায্যে এই সব বিষয়ে লেখা যায়, একথা তাঁদের অনেকেরই ধারণার বাইরে। সঠিকভাবে না বলতে পারলেও মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে—আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ ডক্টরেট পর্যন্ত উপাধি লাভের জন্য যে থিসিস্ লেখেন তাই তাঁদের প্রথম ও শেষ লেখা। অন্যদের কথা ছেড়েই দিলাম—বাংলা দেশে (পূর্ব ও পশ্চিম মিলিয়ে) হাইস্কুল ও কলেজে প্রায় ১৫,০০০ শিক্ষক ও অধ্যাপক রয়েছেন, তাঁদের সকলের নিজ নিজ বিষয় সম্বন্ধে সম্বৎসরের লেখা একত্রিত করলেও একখানা মাসিক পত্রের সমান আকার ধারণ করবে কিনা সন্দেহ। এই গেল একদিক, অপরদিকে শিক্ষা দীক্ষা, দর্শন, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে বাংলায় লেখা তৈরী হলেই বা ছাপা হবে কোথায়? অন্যান্য দেশের ন্যায় এ দেশে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে দেশীয় ভাষায় উপযুক্তসংখ্যক সাময়িক পত্রাদিও নেই। যে কয়েকখানা বাংলা সাধারণ সাময়িক পত্র রয়েছে তাদের গ্রাহক সংখ্যা খুবই কম। অনিবার্য কারণে কবিতা, গল্প ও চলতি ঘটনার সমালোচনাই সেগুলিতে অধিক স্থান পায়। বিজ্ঞান, দর্শন, অর্থনীতি ইত্যাদি বিষয়ে সারগর্ভ আলোচনামূলক প্রবন্ধাদি একপ্রকার অচল বলেই ছাপা হয় না। স্কুলের শিক্ষকগণের আর্থিক অবস্থা অবর্ণনীয়, বাংলার কলেজের অধ্যাপকগণ আজও ১০০-১৫০৲ টাকা মাসিক বেতনে কাজ করছেন। উচ্চশিক্ষার ফলে জীবন যাত্রার এক উন্নতমান আকাঙ্ক্ষা করে যখন এই সকল ব্যক্তিগণ বাস্তবজীবনে এইরূপ ব্যর্থতার সম্মুখীন হন তখন নিজের সাধনার বিষয়ের প্রতিও ঔদাসিন্য, এমনকি অশ্রদ্ধা জন্মে। যদি কেহ জোর-জবরদস্তি করে এই ব্যর্থতাকে অস্বীকার করে নিজ আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে প্রবন্ধাদি লিখে কোন সাময়িক পত্রে প্রকাশের জন্য পাঠান তবে সে লেখা অগ্রাহ্য হবার সম্ভাবনাই অধিক। আর যে ক্ষেত্রে সম্পাদক মশাই বিশেষ সুবিবেচক, সে ক্ষেত্রে লেখা ছাপা হলেও লেখককে উৎসাহ (বিশেষ প্রয়োজনীয়) দেবার কোন ব্যবস্থা প্রায়ই হয় না। গল্প কবিতা লিখলে কিঞ্চিৎ পারিশ্রমিক কখন কখন মিলে থাকে। কিন্তু কোন তত্ত্ব বিষয়ে প্রবন্ধ লেখার কোন দাম নেই বললেই চলে। এই সব অবস্থা সমাজের শিক্ষা ও সংস্কারের একান্ত পরিপন্থী। এ বিষয়ের প্রতি বাংলার প্রকাশক, সম্পাদক ও জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করার সময় এসেছে। বাংলা আজ আমাদের প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় ভাষা। বাংলার উন্নতির জন্য আজ উপযুক্ত পরিমাণ শিক্ষক, বৈজ্ঞানিক, অর্থনীতিজ্ঞ ও সমাজতত্ত্ববিদদিগকে কলম ধরতে হবে। বাংলা ভাষার এই অভিনব প্রয়োগের সাহায্যে নতুন বাংলাকে

পেনিসিলিন ও অন্যান্য অ্যান্টিসেপটিক

শ্রীহরগোপাল বিশ্বাস এম-এসসি, ডি-ফিল্

আমরা সচরাচর যে সব রোগে ভুগে থাকি সেগুলিকে দুটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে :—প্রথম খাদ্যের কোনও নির্দিষ্ট উপাদানের অভাব বা অল্পতাজনিত ব্যাধি। দ্বিতীয়—জীবাণুঘটিত ব্যাধি।

প্রথম শ্রেণীর ব্যাধির মধ্যে বেরিবেরি, রিকেট্স, স্কার্ভি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই রোগগুলি প্রাচীনকাল থেকে পরিচিত হলেও এবং তাদের প্রতিষেধকের বিষয় মোটামুটি জানা থাকলেও বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে রসায়নশাস্ত্রের অদ্ভুত উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যস্থ কোন্ কোন্ পদার্থের অভাবে এই রোগগুলি জন্মে তাহা সঠিক্ নির্ণীত হয়েছে। ভিটামিন বি, বেরিবেরি, ভিটামিন ডি রিকেট্সের এবং ভিটামিন সি স্কার্ভির প্রতিষেধক বলে সাধারণ লোকেও আজ জান্‌তে পেরেছেন। খাদ্যে ঐ পদার্থগুলির সম্পূর্ণ অভাব ঘটলে ঐ ব্যাধিগুলি আত্মপ্রকাশ করে থাকে।

জীবাণু ঘটিত ব্যাধিগুলির চারটি উপবিভাগ করা যেতে পারে—

খাদ্য ও পানীয়ের সহিত শরীরে ব্যাধি-বীজাণু প্রবেশের দরুণ ব্যাধি—যেমন, কলেরা, আমাশয়, টাইফয়েড প্রভৃতি।

মশা, ছারপোকা, উকুন প্রভৃতি বাহিত ব্যাধি জীবাণু ঘটিত অসুখ—যেমন, ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, ফাইলেরিয়া, টাইফাস, প্লেগ প্রভৃতি।

সংস্পর্শ ঘটিত ব্যাধি—যেমন, উপদংশ, গণোরিয়া প্রভৃতি।

কাটা, ছেঁড়া প্রভৃতি আহত স্থানে বাতাস ও মাটি লেগে জীবাণুঘটিত ব্যাধি—যেমন, দুষ্ট ক্ষত, ধনুষ্টংকার প্রভৃতি।

জীবাণুঘটিত ব্যাধিতে অ্যান্টিসেপ্টিক শ্রেণীর ঔষধগুলির ক্রিয়া এবং এ যাবৎ আবিষ্কৃত প্রচলিত অ্যান্টিসেপটিকগুলির সঙ্গে সম্প্রতি আবিষ্কৃত পেনিসিলিনের পার্থক্য কোথায় সে বিষয়ে এখন কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাচ্ছে।

অ্যান্টিসেপটিক কথাটির প্রকৃত অর্থ যে পদার্থে পচন নিবারণ করে। কিন্তু সাধারণ বীজাণুনাশক হিসাবেও এখন এ কথাটির প্রচলন হয়েছে। অ্যান্টিসেপটিকের মধ্যে কার্ব্বলিক অ্যাসিডের নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। প্রথিতযশা বৈজ্ঞানিক লিষ্টার অস্ত্রোপচারে এই পদার্থের প্রথম ব্যবহার আরম্ভ করেন। তার আগে অস্ত্রোপচারের পর ক্ষত দূষিত হয়ে বহু লোক প্রাণ হারাত। কিন্তু লিষ্টারের এই আবিষ্কারের ফলে ক্ষত দূষিত হয়ে প্রাণহানি খুব কমে যায়। লিষ্টারের আবিষ্কারের পরে আরও অনেক অ্যান্টিসেপটিক্ আবিষ্কৃত হয়েছে এবং এগুলি যে কেবল ক্ষতস্থানে ব্যবহৃত হয় তাহা নহে—ব্যাধি বিশেষে অনেক প্রকার অ্যান্টিসেপটিক্ ঔষধ সেবন করা হয়ে থাকে কোনও কোনটি বা ইনজেকশনরূপে ব্যবহৃত হয়। আমাশয় এনটারোভায়োফরম নামক যে ঔষধটি খাওয়া হয় বা কালাজ্বরে ইউরিয়াষ্টিবামিন নামে যে ঔষধটি ইনজেকশন দেওয়া হয়ে থাকে এ ঔষধগুলিও অ্যান্টিসেপটিক শ্রেণীর ঔষধরূপে পরিগণিত, অ্যান্টিসেপটিক পদার্থের মধ্যে কার্ব্বলিক অ্যাসিড, ইউসল, অ্যাক্রিফ্ল্যাভিন মারকিউরিক ক্লোরাইড, সেটাভিয়ন, সালফন অ্যামাইড ও নব আবিষ্কৃত পেনিসিলিন সুপরিচিত।

অনেকেই জানেন, রক্তের শ্বেতকণিকাগুলি শরীরের স্বাভাবিক অ্যান্টিসেপটিক। মানুষের শরীরে অর্থাৎ রক্তস্রোতে যখন কোনও ব্যাধিবীজ প্রবেশ করে তখন রক্তের শ্বেত কণিকাগুলি আগন্তুক জীবাণুগুলির সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। ক্ষতস্থানে যে শ্বেতবর্ণের পূঁজ জমতে দেখা যায় সেগুলি আগন্তুক জীবাণুর সহিত যুদ্ধে নিহত শ্বেতরক্তকণিকার সমষ্টি মাত্র। পূর্ব্বে যে সব অ্যান্টিসেপটিকের উল্লেখ করা হ'ল তাদের ক্রিয়া বুঝতে হলে শ্বেতরক্তকণিকার ক্রিয়া সম্বন্ধে ধারণা থাকা দরকার বলে তার উল্লেখ করা হ'ল।

আর একটি জ্ঞাতব্য বিষয় এই যে, বিভিন্ন ব্যাধি বীজাণুর উপর অ্যান্টিসেপটিক্‌গুলির ক্রিয়া বিভিন্ন ধরণের। কোনও অ্যান্টিসেপটিক্ কয়েক প্রকারের ব্যাধির জীবাণু নাশ করতে পারে, কিন্তু অন্য ব্যাধির জীবাণু নাশে তার অক্ষমতা দেখা যায়। প্রথম যুগের আবিষ্কৃত কার্ব্বলিক

অ্যাসিড, মারকিউরিক ক্লোরাইড, হাইপোক্লোরাইট প্রভৃতি অ্যান্টিসেপটিকের কিন্তু প্রায় সকল ব্যাধি বীজাণুর উপরেই সুস্পষ্ট ক্রিয়া বিদ্যমান। কিন্তু পরে যে সব অ্যান্টিসেপটিক আবিষ্কৃত হয়েছে তাদের ক্রিয়া অনেক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ।

আর একটি আশ্চর্য্য বিষয় এই যে, কাচের পাত্রে উপযুক্ত মিডিয়াম যোগে বর্দ্ধিত বীজাণুর উপনিবেশের উপর কোনও অ্যান্টিসেপটিক অতি মাত্রায় সক্রিয় হ'লেও ঐ বীজাণু যখন মানুষের শরীরের মধ্যে থাকে তখন তার উপর ঐ অ্যান্টিসেপটিকের হয় তো কোনও ক্রিয়াই লক্ষিত হয় না। সাপকে পরিষ্কার জায়গায় পেলে তাকে হত্যা করা যেমন সহজ, অথচ ঝোপঝাপ বা গর্ত্তের মধ্যের সাপকে মারা যেমন কষ্টকর এমন কি অনেক ক্ষেত্রে অসম্ভব—এও যেন সেইরূপ ব্যাপার। মানুষের শরীরে রক্তের বিভিন্ন উপাদান মধ্যে ব্যাধি বীজাণুগুলি এমন ওতপ্রোতভাবে থাকে যে অনেক অ্যান্টিসেপটিক সেগুলি ভেদ করে তাদের মুখোমুখি পৌঁছতে না পারায় কোনও ক্রিয়া প্রকাশ করতে পারে না। অনেক ব্যাধির বীজাণু এমন কঠিন বর্ম্ম তৈরী করে অবস্থিতি করে যে তা ভেদ করে কোনও অ্যান্টিসেপটিক তাদের নাগাল পায় না। উদাহরণ স্বরূপ, যক্ষ্মা রোগের জীবাণুগুলি এরূপ ঘন কফ জাতীয় পদার্থে পরিবেষ্টিত থাকে যে এখনও পর্য্যন্ত সেগুলি ভেদ করে তাদের আক্রমণ করবার মত কোনও অ্যান্টিসেপটিকই আবিষ্কৃত হয় নাই। আর একটি বিষয় জেনে রাখা দরকার যে, সালফোন অ্যামাইড প্রভৃতি অনেক অ্যান্টিসেপটিক ব্যাধি বীজাণুনাশক ঠিক নয়—পরন্তু ব্যাধি বীজাণু প্রতিরোধক (Bacterio static)। উপযুক্ত মাত্রায় এদের প্রয়োগে শরীরের মধ্যে ব্যাধি বীজাণুগুলি আর বংশ বিস্তার করতে পারে না—ইতিমধ্যে রক্তের শ্বেতকণিকাগুলি এসে ঐ বীজাণুগুলিকে মেরে ফেলে। সুতরাং বৈজ্ঞানিকগণ যে সব অ্যান্টিসেপটিক প্রস্তুত করেন সেগুলি শরীরের স্বাভাবিক অ্যান্টিসেপটিক অর্থাৎ শ্বেত রক্ত কণিকাগুলির সহায়তা করে মাত্র। কোন অ্যান্টিসেপটিক কি পরিমাণে ব্যবহারে শরীরস্থ স্বাভাবিক অ্যান্টিসেপটিককে সব চেয়ে ভালভাবে সাহায্য করতে পারে শরীর বিজ্ঞানবিদের নিকট সেইটি বড় সমস্যা। পেনিসিলিন আবিষ্কারের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যত প্রকার অ্যান্টিসেপটিক জানা ছিল সবগুলিই ব্যাধি বীজাণু প্রতিরোধের সঙ্গে সঙ্গে শরীরস্থ শ্বেতকণিকাগুলিরও অল্প বিস্তর বিনাশ সাধন করে থাকে। সুতরাং অ্যান্টিসেপটিক আবিষ্কারকের প্রধান উদ্দেশ্য হবে এমন পদার্থের সন্ধান করা—যার ন্যূনতম মাত্রাতেই ব্যাধি বীজাণু প্রতিরোধ করবে, অথচ সেই মাত্রায় উহা রক্তের শ্বেত কণিকাগুলির আদৌ কোনও ক্ষতি করবে না।

পরিচিত অ্যান্টিসেপটিকগুলির ক্রিয়া সম্বন্ধে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে ৩২০ ভাগ রক্তের মধ্যে ১ ভাগ কার্বলিক অ্যাসিড থাকলে তাতে ব্যাধি বীজাণুর বৃদ্ধি স্থগিত হয়, কিন্তু ১২৮০ ভাগ রক্তে ১ ভাগ কার্বলিক অ্যাসিড থাকলেই শ্বেত রক্ত কণিকার ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। সুতরাং বুঝা যাচ্ছে রক্তের মধ্যে প্রবেশকালে কার্বলিক অ্যাসিড উপকারের পরিবর্তে অপকারই বেশী করে। অনেকে বলতে পারেন পুঁজযুক্ত ক্ষতস্থানে কার্বলিক অ্যাসিড প্রয়োগেও সুফল পাওয়া যায়। এরূপ স্থলে এমন মাত্রায় কার্বলিক অ্যাসিড দেওয়া হয় যে উহা পুঁজ কোষগুলি নষ্ট ক'রে দেয়, তখন নূতন নূতন দল শ্বেত রক্তকণিকা এসে সেখানকার ব্যাধি বীজাণুর বিনাশ সাধন করে। পক্ষান্তরে, ২ লক্ষ ভাগ রক্তের মধ্যে মাত্র ১ ভাগ সালফোন অ্যাসাইড থাকলেই উহা ষ্ট্রেপটোকোকাস বীজাণুর বৃদ্ধি রোধ করিতে পারে, অথচ ২০০ ভাগ রক্তের মধ্যে ১ ভাগ সালফোন অ্যাসাইড থাকলে তাতে রক্তের শ্বেত কণিকার ক্ষতিকারক হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে পরিমাণ সালফোন অ্যাসাইড ব্যাধি বীজাণু নিরোধের জন্য আবশ্যক, তাতে শ্বেতরক্ত কণিকার আদৌ কোনও ক্ষতি হয় না।

নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত সার আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিংএর আবিষ্কৃত পেনিসিলিন এ বিষয়ে সালফোন অ্যাসাইডকেও আশ্চর্য্যরূপে পিছনে ফেলে গিয়াছে। কারণ, ৫ কোটি ভাগ রক্তে ১ ভাগ পেনিসিলিন থাকলেই রক্তস্থ ষ্টাফাইলোকোকাস বীজাণুর বংশবৃদ্ধি নিবারণে সক্ষম, অথচ রক্তের একশত ভাগে এক ভাগ পেনিসিলিন থাকলে উহা রক্তস্থ শ্বেতকণিকার ক্রিয়া নিরোধ করতে পারে। অনেকেই জানে ফোঁড়া এবং কার্বাংকলের প্রধান বীজাণু এই ষ্টাফাইলোকোকাস। এখন পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে

যে পরিমাণ পেনিসিলিন রোগ নিবারণে আবশ্যক তার হাজার হাজার গুণ বেশী মাত্রায় দিলেও রক্তের ক্ষতি হতে পারে না। সুতরাং চোখ বুঁজে যে কোন মাত্রায় পেনিসিলিন ব্যবহার করা যেতে পারে। এখানেই পেনিসিলিনের সঙ্গে অন্যান্য ঔষধের পার্থক্য। এতদিন যে সব অ্যান্টিসেপটিক আবিষ্কৃত হয়েছে সেগুলির ব্যবহারে চিকিৎসককে সর্বদাই সজাগ থাকতে হত যে মাত্রাধিক্যে রোগীর শরীরে বিষক্রিয়া না ঘটে। অনেকক্ষেত্রে এই আশঙ্কায় অল্প মাত্রায় ঔষধ প্রয়োগ করায় ব্যাধি বীজাণুগুলি ঐ ঔষধে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে এবং পরে সহজে ঐ ঔষধে কোনও ফল পাওয়া যায় না। একটিবার মাত্র কড়া মাত্রায় পেনিসিলিন প্রয়োগে গণোরিয়া প্রভৃতি কঠিন ব্যাধি নির্দোষভাবে সেরে যাচ্ছে বলে শুনা যায়। সালফোন অ্যাসাইড ও তজ্জাতীয় ঔষধগুলির চেয়ে পেনিসিলিন অন্য একটি গুণের জন্যও উৎকৃষ্টতর বলে প্রমাণিত হয়েছে। সালফোন অ্যাসাইড শ্রেণীর ঔষধগুলি পূঁজের মধ্যে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে কিন্তু পেনিসিলিন পূঁজের মধ্যেও বেশ সক্রিয় থাকে। সুতরাং পূঁজ সংযুক্ত ক্ষত বা ফোঁড়ার মধ্যে পেনিসিলিন ইন্‌জেক্‌শন করে সুফল পাওয়া যায়। কথায় বলে চাঁদের কলঙ্ক আছে সুতরাং পেনিসিলিনকেও আমরা সম্পূর্ণ নির্দোষ বলে আশা করতে পারি না। পূর্বেই বলেছি পেনিসিলিন সব ব্যাধি বীজাণুর উপর সক্রিয় নয়—হয়ত ভগবানের সেরূপ অভিপ্রেতও নয়। কারণ এক ঔষধে সব ব্যারাম সারলে আমাদের ঔষধের কারখানাগুলিই যে উঠে যেত এবং সঙ্গে সঙ্গে অনেক চিকিৎসককেও হাত পা গুটিয়ে বসতে হত। পেনিসিলিন খাওয়া চলে না, কারণ ইনসুলিন প্রভৃতির মত পাকস্থলীর অম্লরস সংস্পর্শে পেনিসিলিন নিষ্ক্রিয় হ'য়ে পড়ে। অবশ্য খুব অল্প দিন হ'ল অনেক গবেষণার পর বিশেষ প্রকারের কোটিংএর সাহায্যে পেনিসিলিন ট্যাবলেট আকারে খাবার ঔষধরূপেও বের হয়েছে বলে প্রকাশ।

পেনিসিলিন ব্যবহারের আর একটি বড় অসুবিধা এই যে, ইহা শরীর থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যায়। এজন্য ঘন ঘন পেনিসিলিন ইনজেকশনের প্রয়োজন হয়। ইহা তৈরী করে খুব বেশী দিন রাখাও যায় না। কয়েক মাসের মধ্যেই এর গুণ নষ্ট হয়ে যায়। শরীরের মধ্যে বেশীক্ষণ থেকে যাতে বেশী কাজ করতে পারে সে সম্বন্ধে পেনিসিলিন নিয়ে অনেক গবেষণা চলেছে। ইতিমধ্যে এবিষয়ে কিছু সাফল্যও দেখা গেছে। প্যারা অ্যামিনো হিপিউরিক অ্যাসিড নামক পদার্থের সহযোগে প্রয়োগ করায় পেনিসিলিন শরীরের মধ্যে অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় বলে জানা গেছে। রোমানস্কি এবং রিটম্যান সম্প্রতি প্রকাশ করেছেন যে, বাদাম তেল এবং মোমের মিশ্রণ সহযোগে ব্যবহার করায় রক্তের মধ্যে পেনিসিলিন ৬ থেকে ১২ ঘণ্টা পর্যন্ত সক্রিয় থাকে। অবশ্য ঐ মাত্রায় পেনিসিলিন সাধারণ লবণ দ্রব (স্যালাইন) সহযোগে ইনজেকশন দিলে মাত্র ২ ঘণ্টা কাল রক্তস্রোতে থাকে।

ইতিমধ্যে ইংলণ্ড ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে পেনিসিলিন প্রস্তুতের বিরাট বিরাট কারখানা স্থাপিত হয়েছে এবং বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকগণের একনিষ্ঠ সাধনায় ইহার প্রস্তুত, সংরক্ষণ প্রভৃতি ব্যাপারে অভূতপূর্ব সাফল্য লাভের সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে। রাসায়নিক বিশ্লেষণে পেনিসিলিনের রাসায়নিক অন্বয়ও স্থিরীকৃত হয়েছে। আশা করা যায়, অদূর ভবিষ্যতে ভিটামিন বি প্রভৃতির ন্যায় পেনিসিলিনও কৃত্রিম উপায়ে রসায়নাগারে প্রস্তুতের ব্যবস্থা হবে। মূল সালফোন অ্যাসাইডের সঙ্গে অন্যান্য পদার্থের রাসায়নিক সংযোগে যেমন বিভিন্ন ব্যারামে উপকারী বহু সংখ্যক অমূল্য ঔষধের আবিষ্কার হয়েছে, পেনিসিলিন সম্বন্ধেও আরও গবেষণা হলে পেনিসিলিনের মূল কাঠামোর সঙ্গে অন্যান্য সক্রিয় পদার্থের রাসায়নিক সংযোগে পেনিসিলিনের অপেক্ষাও অধিক শক্তিশালী এবং অধুনা যে সব ব্যারামে পেনিসিলিনের কোনও ক্রিয়া নাই ব'লে প্রমাণিত হয়েছে সে সব ব্যারামেরও অব্যর্থ ঔষধের আবিষ্কার হওয়া আশ্চর্য্য নয়। পক্ষান্তরে যে পেনিসিলিয়াম নোটেটাম নামক ছাতা (mould) থেকে পেনিসিলিন প্রস্তুত হচ্ছে, বৈজ্ঞানিকগণের গবেষণায় কোনও নূতন প্রকারের ছাতা থেকে পেনিসিলিনের চেয়ে সক্রিয় এবং অধুনা দুরারোগ্য অনেক ব্যাধিতে ফলপ্রদ নূতন নূতন ঔষধেরও সন্ধান মিলিতে পারে। গবর্ণমেণ্ট ও ধনিকগণের উদ্যোগে আমাদের দেশেও এ বিষয়ে জোর গবেষণা চলা উচিত এবং জনস্বাস্থ্যের উন্নতিকল্পে উপযুক্ত কারখানা স্থাপন করে প্রভূত পরিমাণে পেনিসিলিন দেশেই তৈরীর ব্যবস্থা করাও সর্বাগ্রে কর্ত্তব্য।

বৈদিক-সংস্কৃতির সার্ব্বজনীনতা

ডাঃ শ্রীমতিলাল দাশ এম-এ, পি এচ্-ডি

ভারতীয় কৃষ্টি বেদ-সাহিত্যের রসে রসায়িত। নানা উত্থান পতন, নানা পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়াও বৈদিক সংস্কৃতি ভারতীয় সভ্যতার দীর্ঘ জয়যাত্রাকে পরিব্যাপ্ত করিয়া রাখিয়াছে। আজ স্বাধীন ভারতবর্ষ তাহার এই অমূল্য পিতৃধনের যদি সদ্ব্যবহার করে, তবে ভারতের অগ্রগতি ধ্রুব ও নিশ্চিত হইবে।

ভারতীয় দৃষ্টি দ্বৈপায়ন ও কৌশিক এ কথা অনেকেই বলেন, কিন্তু যখন মূল বেদ অধ্যয়ন করি তখন ঋষিদের বিশ্বজনীন আদর্শ ও সমুদার দৃষ্টি আমাদিগকে মুগ্ধ করে।

সাধারণ মানুষ মনে করে যে বেদে স্ত্রী ও শূদ্রের অধিকার নাই। স্মৃতির বচনের উপর নির্ভর করিয়া ভারতবর্ষ তাই বেদপাঠ ও বেদের পঠনকে একান্ত সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে কিন্তু মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিরা অন্যভাবে ভাবিতেন। বেদের অনেক সূক্ত নারী কবিদের লেখা। অনেক শূদ্র বেদমন্ত্র রচনা করিয়াছেন। বেদ সুস্পষ্ট স্বরে বেদের অমৃতবাণী বিশ্বমানবকে দিতে বলিয়াছেন।

যথেমাং বাচং কল্যাণীমাবদানি জনেভ্যঃ।
ব্রহ্মরাজন্যাভ্যাম্ শূদ্রায় চার্য্যায় চ স্বায় চারণায়চ।
প্রিয়ো দেবানাং দক্ষিণায়ৈ দাতুরিহ ভূয়াসময়ং
মে কামঃ সমৃধ্যতামুপ মাদো নমতু।

যজুর্বেদ ২৬ অধ্যায় ২ বর্ত্তিকা

এই অমৃতময়ী কল্যাণী বাণী আমি সমস্ত বিশ্বজনকে উপহার দিব। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র, আত্মীয় অনাত্মীয় সমস্ত লোকের নিকট এই অভয় মন্ত্র উচ্চারণ করিব। এই প্রচারের ফলে আমি দেবতাদের প্রিয় হইব। দক্ষিণাদাতা যাজ্ঞিকেরা আমার উপর প্রীতিমান হইবেন। আমার হৃদয়ের বাসনা পূর্ণ হইবে। আমার মনোবাঞ্ছা দেবকৃপায় সফল হউক।

এই মন্ত্র সুস্পষ্ট ভাষায় বুঝাইতেছে যে বেদবাণী সর্ব্বজনগ্রাহ্য। সকল মানুষেরই বেদের মধুময় কল্যাণময় মন্ত্র পাঠে অবাধ অধিকার বেদবাক্য স্মৃতি অনুসরণ করিয়া আমরা যেন তমোনিষ্ঠ না হই।

বেদের মূল কথা যজ্ঞ-জীবন। যজ্ঞকে য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা ভুল বুঝিয়াছেন—যজ্ঞ দেবতাদিগকে খুসি করিবার উৎসব নহে—অমৃতস্য চেতনং যজ্ঞং—যজ্ঞ অমৃতত্বের চেতন করে। যজ্ঞ বিশ্বে মানুষকে আত্মকেন্দ্রিক না হইয়া বিশ্বকেন্দ্রিক হইতে বলে। কেবলাদো কেবলাঘো ভবতি—যে কেবল নিজের জন্য ব্যস্ত সে কেবল পাপেরই সেবা করে—যজ্ঞাবশেষ ভোজন করিতে হইবে। ধনলোভী হইলে যজ্ঞচক্র ব্যাহত হইবে। পৃথিবীতে আজ যে ঘোর অর্থনৈতিক বিপ্লব—তাহার মূল কারণ মানুষের স্বার্থান্ধ আত্মীয়তা। মানুষ ভাবিতেছে সে কেবল নিবে, কিছুই দিবে না। এই আত্মগ্রাসী ক্ষুধা সমস্ত দুঃখ ও বিপর্য্যয়ের কারণ। তাই সকলকে যজ্ঞার্থ জীবন যাপন করিতে শিখাইতে হইবে—তবেই পৃথিবীর শান্তি।

এই যজ্ঞে সকল মানুষের সমান অধিকার। অগ্নি বিশাম্পতি, বিশে বিশে তিনি পূজা পান। সমস্ত সেবক তাঁহারই পূজা করে। মধুচ্ছন্দা ঋষি বলিতেছেন—

ইন্দ্রং বো বিশ্বতস্পরি হবামহে জনেভ্যঃ।
অস্মাকমস্তু কেবলঃ।

ইন্দ্র বিশ্বজনের দেবতা। সেই বিশ্বজনের জন্য আমাদের প্রত্যেকের চেতনা ঘিরিয়া তাঁহাকে আহ্বান করিব। একান্তই তিনি আমাদের হউক।

এই আহ্বান সকলের জন্য। বিশ্বের সমস্ত মানুষ আসিয়া আজ সর্ব্বমেধযজ্ঞ আরম্ভ করুন। সকলের শান্তি হউক। সকলের কল্যাণ হউক।

যে ভেদ, যে ছেদ ভারতকে শতধা বিভক্ত করিয়াছে বৈদিক যুগে তাহা ছিল না। মনুষ্যত্ব তখন আপন তপস্যার দীপ্তির উপর নির্ভর করিত। জন্মগত গৌরবের প্রত্যাশায় কেহ লোভী ছিল না। এই মনোভাব সম্ভবপর ছিল, কারণ বেদের ঋষির মনে সর্ব্বত্রাত্মা ঈশ্বরের অনুভূতি—তাই সর্ব্বাত্মদর্শন তাঁহার পথে বুদ্ধির চাতুর্য্য ছিল না—স্বতঃস্ফূর্ত্ত স্বতঃসিদ্ধ সত্য ছিল।

ঈশোপনিষদ যজুর্ব্বেদেরই অংশ। যজ্ঞ কর্ম্মের বিচিত্র ক্রিয়াকলাপ শেষ করিয়া এখানে যে পরম জ্ঞানের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে তাহাকে শ্রদ্ধায় ও বিশ্বাসে আমাদের বারংবার স্মরণ করা উচিত।

পৃথিবীকে ঈশ্বর দ্বারা ব্যাপ্ত করিয়া দেখিতে হইবে—যাহা কিছু এই বিশ্বচরাচরে তাহাকে ঈশ্বরময় করিয়া দেখিলে পরাশান্তি লাভ হয়। ত্যাগের দ্বারাই ভোগ করিবে অপরের ধন লোভ করিবে না।

বিশ্বসৃষ্টি সহস্রাক্ষ সহস্রপাৎ পরম পুরুষের আত্মবলি। পুরুষ সূক্তে বিশ্বনাথের এই আত্মবিসর্জ্জন লীলা ঋষির দৃষ্টিতে প্রতিভাত হইয়াছে। তিনি আপনাকে আহুতি দিয়া জগৎ-চক্রের লীলা চালাইতেছেন। তিনি যেমন নিজেকে বলি দিয়াছেন—সমস্ত মানুষই তেমনই আত্মবিসর্জ্জন দিয়া তাঁহার লীলা-নাট্যে খেলা করিবে। সেই বিরাট-যজ্ঞে সকলের সমান দাবি—সকলের সমান অধিকার। সেই মহোৎসবে কেহই অনিমন্ত্রিত নহে—কেহই বারিত নহে।

অগ্নিকে বৈদিক ঋষিরা পরমেশ্বরের প্রত্যক্ষ স্বরূপ বলিয়া মনে করিতেন। তিনি বিশ্বনরের, তাই তিনি বৈশ্বানর। এই বৈশ্বানরের নিকট ঋষি সংবনন বিশ্ববাসীর ঐক্যের প্রার্থনা করিয়াছেন। তিনি চাহিয়াছেন

সকলের এক মন্ত্র, এক সংঘ ও এক আকুতি। আজিও সে স্বপ্ন সফল হয় নাই। কিন্তু তবু আজ তারস্বরে সেই মন্ত্র বলিবার প্রয়োজন আছে—

সং গচ্ছধ্বম্ সংবদধ্বম্ সংবো মনাংসি জানতাম।

তোমরা এক সাথে সবাই চল, এক সাথে সবাই বল—তোমাদের সকলের মন একই হউক।

বিশ্বস্বাধীনতার আজ একান্ত প্রয়োজন। মানুষের বিজ্ঞান ও কলা অপূর্ব্ব সাফল্যমণ্ডিত হইয়া বিশ্বজগৎকে একত্র করিয়াছে। কিন্তু আণবিক বোমার মত মৃত্যুবাণও মানুষের হাতে আসিয়াছে। আমরা যদি মৈত্রী ও করুণা পন্থা বাহির করিতে না পারি—যদি ঐক্য ও মিলনের সেতু নির্ম্মাণ করিতে না পারি তবে মানব সভ্যতার ধ্বংস অনিবার্য্য।

বেদ বিশ্বসৃষ্টির অন্তরালে একই সত্যের ও একই সৎ পদার্থের ক্রিয়া লক্ষ্য করিয়া বিস্ময়ে ও আনন্দে সেই পরমাত্মার অমৃতস্বরূপ উপলব্ধি করিবার জন্য বিশ্বমানুষকে ডাকিয়াছেন।

এই জগৎ বিশ্ব বিধাতার লীলার ক্ষেত্র—ইহা হেলার নহে—ইহা তুচ্ছ নহে। তাই বৈদিক ঋষি পার্থিব ধন ও সম্পৎ প্রার্থনা করেন।

অগ্নিনা রয়িমশ্নবৎ পোষমেব দিবে দিবে। যশসং বীরবত্তমম্।

অগ্নি দেবেন পরিপূর্ণতা—যে পরিপূর্ণতা প্রতিদিন নব নব রূপে সমৃদ্ধ ও পুষ্ট হইয়া ওঠে যাহা দিক হইতে দিগন্তের নব নব বাণীর সন্ধানে চলে—সেই চির অপ্রাপ্য অথচ চির ঈপ্সিত প্রগতির জন্য ঋষি ব্যাকুল। জীবনে চাই যশোগৌরব—চাই পরিপূর্ণ বীর্য্য ও ওজস্বিতা।

কিন্তু কেবল পার্থিব ধন লইয়াই মানুষের চলে না। তাহার মনে জাগে অসীমের আকুতি—অজানার অবকাশ। অনন্ত অদিতির উপলব্ধি হয় তাহার জীবনের এক শুভক্ষণে তখন সমস্ত জীবনকে মধুময় মনে হয়। তখন মধুরতায় জগৎ প্লাবিত হয়। তখন তিনি অমৃতের নিধি মধুবাতের নিকট অমৃতত্ব প্রার্থনা করেন :—

যদদো বাত তে গৃহেঽমৃতস্য নিধির্হিতঃ
ততো নো দেহি জীবসে।

হে বায়ু, তোমার ঐ গৃহে অমৃতনিধি গোপন রহিয়াছে—পরিপূর্ণ জীবনের জন্য আমরা সেই অমৃত প্রার্থনা করি।

এই প্রার্থনা একার নহে—বাতায়ন ঋষির নহে—সর্ব্ব মানবের—সর্ব্ব জগতের।

যো বিশ্বাভি বিপশ্যতি ভুবনা সংচ পশ্যতি। স নঃ পর্ষদতি দ্বিষঃ।

কারণ সেই পরম সমস্ত বিশ্বকে দেখেন—তাহার স্নিগ্ধ প্রেম দৃষ্টি দিয়া সকলকে তিনি বোঝেন। তাই ত আমরা নির্ভয়। তিনি আমাদের সমস্ত অন্তরায়, সমস্ত রিষ্টি হইতে পরিত্রাণ করিবেন।

ভারতবর্ষে গৃহে গৃহে আবার ধ্বনিত হউক বেদ মন্ত্র। স্বাধীন ও বলিষ্ঠ ভারত তাহার অমৃত সত্যের বাণী দিয়া জগৎকে তৃপ্ত ও শান্ত করুক। ভারতের অভ্যুদয় কেবল পার্থিব সমৃদ্ধিতে নহে—তাহা অপার্থিব কল্যাণে দীপ্ত হউক—অমর অধ্যাত্ম প্রেরণায় সঞ্জীবিত হউক—আজ এই কামনাই করি।

মৌন-রাত্রি

শ্রীবটকৃষ্ণ দে

উত্তর সমুদ্রে আজ তীব্র ঝড়—উত্তাল কল্লোল
সন্ত্রাসে মৃত্তিকা-নীড় কেঁপে ওঠে, বুঝি ভেঙ্গে যায়!
বিষাক্ত পৃথ্বীতে হবে বাতাসের কম্পিত হিল্লোল
বজ্রের নির্ঘোষ জাগে ধ্বংসের চেতনা লয়ে হায়!
জানি জানি অস্তিমের ক্ষুব্ধ বাণী প্রকৃতি শোনায়,
যাযাবরী গতি আজ রুদ্ধ হ'বে প্রচণ্ড আঘাতে
চিরন্তনী আশা আজি নৈরাশ্যের ধূসর ছায়ায়
ক্ষণিকের দীপ্তি শেষে নিভে যাবে উন্মত্ত হাওয়াতে!
পুঞ্জীকৃত আবর্জনা শ্যামলের যে স্বপ্নে বিভোর,
সে শুধু অলীক মায়া—বাস্তবের নৈরাজ্যে আসন,
মদ-দৃপ্ত ক্রামশিক আকাঙ্ক্ষার উষ্ণ-আঁখি-লোর
সনাতন সত্যরূপে ধরা দেবে—এই প্রবচন!
(আজ) জাগরীর মত্ততায় কুম্ভকর্ণ সমুখে দাঁড়াক—
হিমেল মরুর ঘুম—মৌনতার রাত্রিরে বিছাক্!

চাওয়া ও পাওয়া

কুমারী চন্দ্রা রায়

যখন আমি তোমায় খুঁজে ফিরি
বিশ্ব মাঝে সবার ঘরে ঘরে,
তখন তুমি বিলীন হয়ে থাক
লতায় পাতায় বিরাট চরাচরে।

যখন তোমার চরণ আঁকি বুকে
আকুল বুকের জানাই নিবেদন।
তখন তুমি লুকিয়ে বসে থাকো,
খুঁজে তোমায় নয়ন অকারণ।

আবার যখন ক্লান্ত নতশিরে,
ফিরিয়া যাই ব্যাকুল হতাশায়
তখন তুমি পিছন হতে ডাক
চিত্ত আমার ব্যাকুল হয়ে ধায়।

নায়িকা মেনকা

শ্রীফণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

মেনকাকে এক কথায় দিল্লীতে আনিয়া মনে একটা খটকা লাগিল। যাদের সঙ্গে হুল্লোড় করিয়া দিল্লীতে সে কয়েকটা দিন কাটাইতে পারিত, সরকারী চাকরির খাতিরে তার সেই পরিচিত গোষ্ঠী সদলবলে সিমলায় গিয়াছে পক্ষকাল আগেই।

দিল্লীতে আনিয়া মেনকাকে একটু মুস্কিলেও ফেলিয়াছি। তবে দিল্লীতে যখন আসিতে পারিয়াছে, সিমলা পর্যন্ত বাকি পাহাড়ী পথটুকু উৎরানো তার পক্ষে এমন কিছুই নয়। মেনকাকে আমি যে-ভাবে মানুষ করিয়াছি, সে-কথা চিন্তা করিলে তার বর্তমান মানসিক পরিস্থিতিতে সুটকেস মাত্র সম্বল করিয়া সিমলায় যাইতে যে বিশেষ আপত্তি হইবে না তা বুঝি। আপত্তিটা আমার নিজের।

তবে? মেনকাকে এখন দিল্লীতেই রাখিব, না কলিকাতায় ফিরাইয়া আনিব ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়িলাম।

ঘুম ভাঙিল গৃহিণী অমলার ডাকে।

চোখ খুলিয়া দেখিলাম—সদ্যস্নাতা অমলার এক হাতে ধূমায়িত চা, অন্য হাতে গরম নিমকি। কিন্তু তার কুঞ্চিত ভ্রূযুগলের নীচে দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা দেখিয়া আবার চোখ বুজিলাম।

ঠক ও ঠকাস করিয়া দুইটা শব্দ হইল—চা ও নিমকি টিপয়ের উপর রাখা হইল বোধ হয়।

"জেগে মানুষ ঘুমোয় কি করে বুঝি নে। তা বাপু রোজ তো ডাকি নে। নিজেই কথা দিয়েছিলে—আগামী রবিবার প্রাতে অতীনদের বাড়ি নিশ্চয় যাব। এদিকে ঘড়িতে আটটা বাজতে চলল—সকালে যাবে—না বিকালে যাবে তা বলবে কি?"

কয়েক মিনিটের মধ্যে চা ও নিমকি খাইয়া পথে বাহির হইলাম।

অমলার মামাতো বোন রুবির স্বামী অতীন আমার বাল্যবন্ধু। বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটা ধাপ উৎরাইবার সময় সে সরস্বতীর চেয়ে লক্ষ্মীর বন্দনা-সুরগুলিই গোপনে সাধিয়া রাখিয়াছিল তাহা জানিতে পারিলাম—যখন শুনিলাম বি-এ পাশ করার কয়েক মাসের মধ্যে সে অর্ডার সাপ্লাইএর কাজে নামিয়া মোটা কিছু কামাইতেছে। তারপর গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কয়েকটা বছরে রৌদ্রোজ্জ্বল বাঁধানো পথ বাহিয়া অতীনের টাকা আসিয়াছে মুঠায় মুঠায়, ব্যাঙ্কের খাতার পৃষ্ঠাগুলি পূর্ণ করিয়া ও রুবির সর্বাঙ্গ ভরিয়া।

অমলার কাছে অতীন সেদিন বলিয়া গিয়াছিল, সে নাকি আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রমেনের জন্য একটা ভালো কাজ জুটাইয়া দিতে পারে। তাই ঠিক করিয়াছিলাম এই রবিবার অতীনের সহিত আলোচনা করিয়া একটা কিছু স্থির করিব।

ছোট ভাই রমেনকে বর্তমানে বেকার বলিয়া পরিচয় দিলে তাকে ছোট করাই হইবে। দু'বছর আগে সে বি-কম্ পাশ করিয়াছিল এবং এ যাবৎ অর্থকরী কাজে বিশেষ কিছু করিয়া উঠিতে না পারিলেও সে বেকার নয়। দু'বছর আগে সে যেমন বিলুচিস্থান থেকে লিথুনিয়া পর্যন্ত বহু দেশের বহু জাতির সমাজনীতি ও রাজনীতি লইয়া প্রচুর গবেষণা করিত, বর্তমানেও তেমনি আফ্রিকার মাদাগস্করী সাহিত্যের সাম্প্রতিক বিবর্তন ও দক্ষিণ আমেরিকার ইকুয়েডারে ডেমোক্রাটিক দলের নবোদ্যম, ইত্যাদি নিত্য প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি লইয়া অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছে। সুতরাং রমেনকে বেকার আখ্যা দিলে আমার নিজেরই যে অখ্যাতি হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

অতীনের বাড়ি পৌঁছিতে একটু দেরী হইল। আসিয়া শুনিলাম, অতীন কিছুক্ষণ আগেই বাহিরে গিয়াছে, তবে গাড়ি লইয়া গিয়াছে বলিয়া শীঘ্রই ফিরিবে এবং আমি যেন তার জন্য অপেক্ষা করি।

বসিব কি উঠিব ভাবিতেছি এমন সময় অতীনের স্ত্রী রুবি আসিয়া আমাকে প্রায় টানিতে টানিতে তার নিজের ঘরে লইয়া গিয়া এক নিঃশ্বাসে বলিল :—"বাবাঃ, সেই যে কাল আসবো বলে চলে গেলেন তারপর এই এতদিনে আর দেখা নেই। যাক আজ আর সহজে ছাড়ছি নে, অনেক

কথা আছে। ভালো কথা—ওঁর এক লেখক বন্ধু এই বইটা দিয়েছেন, আর এই বইটার—দাঁড়ান আগে চা নিয়ে আসি, তারপর সব বলছি—"

কথাটা অসমাপ্ত রাখিয়া রুবি আমার হাতে একখানা সুন্দর মলাটের ঝকঝকে নূতন বই দিয়া দরজার দিকে পা বাড়াইল।

রুবি চা আনিতে গেল, কিন্তু তার রঙীন শাড়ির ঝলমলানির হাওয়া ও সারা অঙ্গে দেড় সের ওজনের অলঙ্কারের মৃদু ঝন্‌ঝনানির রেশ রাখিয়া গেল।

সম্পর্কে শ্যালিকা হইলেও রুবিকে খাতির করিয়া চলিতে হয়। তার গুণের কথা বলিয়া শেষ করা যায় না। দৈনন্দিন জীবনে সে সদাসর্বদা আর্টের আটঘাট বাঁধিয়া চলা ফেরা করে। মাদুর ও সোফায়, পিলসুজ ও টেবিল ল্যাম্পে মিলন ঘটাইবার যাদুমন্ত্র নাকি তার জানা আছে।

রুবি চা আনিতে গেলে নূতন বইখানিতে মনোনিবেশ করিলাম। লেখক হলধর মিত্রের সহিত আমার পরিচয় না থাকিলেও পুস্তকের বহিরাবরণ, সাজসজ্জা ইত্যাদি দেখিয়া মিত্র মহাশয়কে ঈর্ষা না করিয়া পারিলাম না। দুই পাতা উল্টাইতেই চোখে পড়িল—'উৎসর্গ—অক্লান্তকর্মী বাণিজ্য-বীর বন্ধুবর অতীন্দ্রনাথের করকমলে।'

মিত্র মহাশয়কে মনে মনে নমস্কার জানাইলাম। একটি বিশেষ বিষয়ে তিনি আমার তমসাচ্ছন্ন মনের উপর আলোকপাত করিলেন। আমাদের পাড়ার কাউন্সিলার থেকে মোড়ের ঐ পোষাকের দোকানের স্ফীতবপু মালিক পর্যন্ত অনেকেরই সদ্‌গুণের পরিচয় পাইয়াছি বহু লেন-দেনের ভিতর দিয়া, কিন্তু পরিচিত সদাশয় ব্যক্তিগণের কারও হাতে আমার একখানি পুস্তকও তুলিয়া দিবার কথা এযাবৎ মনে আসে নাই। লেখকরূপে গুণীজনের গুণ স্বীকারের সহজ উপায়টি চোখে আঙুল দিয়া শিখাইবার জন্য মিত্র মহাশয়কে আবার নমস্কার।

স্থির করিলাম—যে কোম্পানির প্রচার বিভাগটি আমার ঘাড়ে চাপানো আছে সেই কোম্পানির বড়কর্তার নামেই আমার পরবর্তী উপন্যাস উৎসর্গ করিব।

রুবি ফিরিয়া আসিল চা ও খাবার লইয়া। সেগুলির জানা নেই শোনা নেই, বাসে একদিন আলাপ হলো—তাতেই মানুষ প্রেমে পড়েছে বলে ব্যক্ত করতে পারে?"

কনিষ্ঠ ভ্রাতার চাকুরিবৃত্তির সন্ধানে আসিয়া কারুর হৃদয়বৃত্তির প্রশ্ন উঠিবে তা জানিতাম না। তবু রুবির কাছে ঠকিতে চাই না বলিয়া পাল্টা প্রশ্ন করিলাম: "কেন, আলাপের পক্ষে বাসটা ভারী বিশ্রী জায়গা বলে মনে হয় না কি?"

রুবি ঠোঁট উলটাইয়া বলিল: "আহা, তাই বলছি নাকি? মানে—একদিনের আলাপের সূত্র ধরে—"

বাধা দিয়া বলিলাম: "সূত্রের গোড়া তো ঐ এক দিনের আলাপ থেকেই—"

—"সে কথা হচ্ছে না। মানে—ঐ আলাপ থেকেই হঠাৎ প্রেমে পড়বে, এ কেমন কথা?"

তার্কিক রুবিকে নিরস্ত করার একমাত্র উপায়, তার কথায় সায় দেওয়া। তাই বলিলাম—"তা যা বলেছো; ও সব ক্ষেত্রে একটু র'য়ে স'য়ে এগুতে হয়। যেমন সর্বাগ্রে দশখানা কাগজে বিজ্ঞাপন দেবে—'আমি শ্রীমান অমুক সেদিন বাসে শ্রীমতী অমুকার সহিত যে আলাপ হইয়াছিল তাহাতে আমি তাহাকে ভালোবাসিয়াছি।' তারপর—বিজ্ঞাপনটা যদি শ্রীমতী অমুকার দৃষ্টি আকর্ষণ না করে তখন গাজনের বাজনাদারদের একজনকে ধরে এনে শ্রীমানের ভালোবাসার কথাটা ঢাক পিটিয়ে শ্রীমতীর নিজ পাড়ায় প্রচার করবে। তাতেও যদি কার্যসিদ্ধি না হয় তখন করবে—"

—"তখন করবে হাতা।"

রুবি কথঞ্চিৎ চটিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলাম—"বাসে কারুর সঙ্গে আলাপ করে মনটা তোমার—"

ফিক করিয়া হাসিয়া রুবি বলিল: "আমার হলে তো কোন কথাই ছিল না। ফ্যাসাদ বাধিয়েছেন হলধরবাবুর হিরো।"

—"হলধরবাবুর হিরো?"

"হলধরবাবুর হিরো ঘোড়ায় চড়তে জানে না, শুধু বাসেই চড়েছে।"

—"আমার কি মানে ? হলধরবাবুর এই বইটার যে আমরা ফিল্ম তুলছি।"

—"তাই না কি ?"

—"আহা, জানেন না যেন কিছু।"

—"শুনেছিলাম বটে অতীন একটা ফিল্ম কোম্পানি খুলবে, কতদূর এগিয়েছে তা জানতাম না।"

—"কেন, অমলাদি কিছু বলেনি আপনাকে ?"

—"হলধর মিত্রের উপন্যাসের ফিল্ম হবে এতে অমলারই বা বিশেষ করে জানবার কি আছে ?"

—"আছে সত্যেন, অমলারও জানবার প্রয়োজন আছে বই কি—" বলিতে বলিতে অতীন আসিয়া একটা চেয়ার টানিয়া বসিল।

ব্যাপার কিছুই আঁচ করিতে না পারিয়া অতীনকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"তোদের মতলবটা কি বলতো।"

অতীন সহাস্যে উত্তর করিল—"ভয় নেই, অমলাকে ফিল্মে নামতে হবে না।"

—"হবে না ? বাঁচালি ভাই।"

অতীন একটু গম্ভীর হইয়া বলিল : "তুমি তো বাঁচলে, এখন আমাকে বাঁচাও।"

বলিলাম : "আমি এসেছি রমেনের জন্যে চাকরির উমেদারি করতে ; এর মধ্যে তোমাদের ফিল্মের হিরোর হাত থেকে সবে সামলিয়ে উঠেছি, এখন তুমি ডেকে আনছো ঘরোয়া বিবাদ ; সুতরাং আমি নিজের পথ দেখি।"

অতীন আমার হাত ধরিয়া বলিল : "আরে ভাই, বোস বোস। সব কথা বলছি। তুই বোধ হয় শুনেছিস, লেখক হলধর মিত্তিরের এই বইটার আমরা ফিল্ম তুলছি। কিন্তু ছবিটা যত এগুচ্ছে, রুবির মেজাজও তত গরম হচ্ছে—"

রুবি ফোঁস করিয়া বলিল : "আমার মেজাজটাই শুধু দেখলে ?"

জিজ্ঞাসা করিলাম : "এ সব ব্যাপারে রুবির মাথা ঘামাবার কি থাকতে পারে ?"

অতীন বুঝাইয়া দিল। তার কতকগুলি পৃথক ব্যবসাও আছে ; তাই মোট লাভের উপর কোথায় অবশ্য-ফিল্ম কোম্পানির মালিকানা রুবির নামেই লিখাইয়াছে। রুবি সম্প্রতি শুধু কাগজে কলমে মালিক হইতে চায় না, কোম্পানির উপর ষোল আনা স্বত্ব কাজেও জাহির করিতে চায়। হাজার হোক, অতীনের চেয়ে সিনেমা সম্বন্ধে তার জ্ঞান অনেক বেশী। ফলে, একাধারে কাহিনীকার ও পরিচালক হলধরবাবু পুস্তকের কাহিনী ও সংলাপ বারকতক চালিয়া সাজিয়াও শেষ পর্যন্ত রুবির কাছে হার মানিয়া ছুটি চাহিতেছেন।

এতক্ষণে মিত্র মহাশয়ের আসল অবস্থাটা হৃদয়ঙ্গম করিলাম। মুখে বলিলাম—"ব্যাপার তা হলে মন্দ দাঁড়াচ্ছে না।"

অতীন বলিল : "মন্দটা সামলানো যেতে পারে, যদি আপাতত তোর ভাই রমেনকে হলধরবাবুর এ্যাসিস্ট্যাণ্ট্ করে নিই।"

—"রমেনকে ?"

—"আশ্চর্য হবার কিছু নেই। একটা ব্যবসায় নামতে হলে তার বাজারে ঢোকবার যতগুলো দরজা আছে সবই চিনে রাখতে হয়। ছায়া জগতের সম্পাদকের কাছে শুনলাম—রমেন ফিল্ম সম্বন্ধে একস্‌পার্ট ; কাগজে লেখে, রেডিয়োতে বক্তৃতা দেয়—অবশ্য ছদ্ম নামে।"

—"তাই নাকি ?"

—"তুই তো কোন খবর রাখিস না। যাক্ সে কথা। এখন তুই মত করলেই ওকে কাজে লাগিয়ে দিই।"

—"রমেন নিজে যদি রাজী হয়, আমার অমত হবে না।"

অতীন মরুব্বিয়ানা সুরে বলিল : "অবশ্য তোদের মতের অপেক্ষায় আমি বসেছিলাম না। তোর আসতে দেরী দেখে আমি নিজেই চলে গেলাম তোদের বাড়িতে। তুই ছিলিনে বলে রমেনের সঙ্গে খোলাখুলি আলোচনা করা গেল। ও শুধু রাজীই হয় নি, সিনেমা ব্যাপারে আমাকে কিছু উপদেশও দিয়েছে। অমলাও ভারী খুশী ; বল্লে—জহুরী না হলে কি আর জহর চিনতে পারে।"

তাইতো, রমেনের সম্বন্ধে এতদিন অবিচারই করিয়াছি। সাহিত্য, রাজনীতি, সমাজনীতি ছাড়া সিনেমা বিষয়ে

আজ জানিয়া মনে মনে গর্ব বোধ করিলাম। কিছুদিন আগে কে যেন বলিয়াছিল, রমেন নৃত্য সম্বন্ধে গবেষণা-মূলক একখানা চিঠি লিখিয়াছিল ফ্রেড্ অস্টারকে। সে-চিঠি পড়িয়া ফ্রেড্ অস্টার নাকি অ-স্টার জনোচিত মুখভঙ্গী করিয়াছিল। এখন বুঝিলাম—কথাটা নেহাৎ নিন্দুকের রটনা।

রুবি বলিল: "এত ভাবছেন কি সতিদা? রমেন-বাবুকে পেলে হাতের বইখানা শেষ হলে হলধরবাবুকে একেবারেই ছুটি দেবো।"

রুবি দেখি মিত্র মহাশয়ের উপর মর্মান্তিক চটিয়াছে।

অতীন বলিল—"তারপর নতুন ধারায় কাজ চলবে। রুবি প্রডিউসার, আর রমেন ডিরেকটার—মানে ফিল্ম জগতে যুগান্তর।"

অতীন খাঁটি ব্যবসাদার।

অতীন বলিল—"আর একটা কথা আছে, কথাটা অবশ্য রুবির।"

—"রুবির?" বলিয়া রুবির দিকে তাকাইতেই সে যে ভঙ্গীটা দেখাইল, রূপালি পর্দায় তাহা কতখানি মানাইত জানি না, তবে সিনেমা সংক্রান্ত ব্যবসাদারি কথার মাঝখানে একেবারে অচল।

ভ্রু-জোড়া কপালে তুলিয়া রুবি বলিল—"না না, আমি তোমার ও-সব কথার মধ্যে আর থাকতে চাইনে।"

হঠাৎ ওর কি হইল বুঝিলাম না, তাই জিজ্ঞাসা করিলাম—"ব্যাপার কি রুবি?"

অতীন বিষয়টা আমাকে স্মরণ করাইয়া দিল। নিতান্ত আত্মীয়জন বলিয়া আমার উপন্যাসের ওপর ওদের যথেষ্ট দাবী আছে এবং পাঁচমাস আগে আমি না কি কথাও দিয়াছিলাম যে কোম্পানিটা খোলা হইলে লেখা দিয়া ওদের যথাসাধ্য সাহায্য করিব।

কবে কি কথা দিয়াছিলাম মনে করিতে পারিলাম না। হইতে পারে, রুবির মুখের তর্কের স্রোত বন্ধ করিবার জন্য কোন দিন কথার কথা একটা কিছু বলিয়া ফেলিয়াছি।

অতীন শেষে সোজাসুজি বলিল: "তুই বর্ত্তমানে যে

বাধা দিয়া বলিলাম—"কি যা তা বলিস। যত সব বাজে খবর কোত্থেকে পেলি জানি নে—"

—"খবর যেখান থেকেই পাই তোর জেনে কাজ নেই। তুই শুধু ডজনখানেক গান জুড়ে দিবি।"

—"গান?"

—"গান হচ্ছে ফিল্মের প্রাণ—"

—"অর্থাৎ আমার প্রাণান্ত।"

অতীন আমার কথায় কান না দিয়া বলিল—"অমলারও খুব ইচ্ছে···তাই আগে থেকে বলে রাখছি বইটা ছাপাবার আগে আমার সঙ্গে যদি পাকা বন্দোবস্ত না করিস, ত হলে—কি আর বলবো—"

রুবি বলিল—"থাক, তোমাকে আর বলতে হবে না।"

রুবির কথাটা লুফিয়া লইয়া বলিলাম—"সেই ভালো, যা বলবার তুমিই একদিন ধীরে সুস্থে বলো। অনেক বেলা হয়েছে, এখন উঠি—" বলিয়া দরজার দিকে পা বাড়াইলাম।

রুবি কয়েক পা আগাইয়া আসিয়া নীচু গলায় বলিল—"লেখা হলে বইটা কিন্তু আমার হাতে দেবেন, ওকে নয়।"

—"শেষ তো হোক আগে"—বলিয়া সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিলাম।

পথে আসিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম।

কিন্তু বাঁচিলাম মনে করিলেই বাঁচা যায় না। কোথা থেকে দ্বিতীয় রিপু আসিয়া মনের মধ্যে ফণা তুলিয়া কার উপর ছোবল মারিবে খুঁজিতে লাগিল। আমার লেখার পাণ্ডুলিপি অমলা ছাড়া আর কেউ নাড়াচাড়া করে না। তার কি মাথা খারাপ হইয়াছে?—আমার অসমাপ্ত উপন্যাসের পাতাগুলি অতীনের কাছে খুলিয়া না ধরিলে তার কি চলিত না?

বাড়ি আসিতেই অমলা বলিল—"মাছের তেলের বড়া ভাজা হয়েছে, দু'খানা গরম গরম খাবে?"

—"মাছের তেলের বড়া?"

—"দাঁড়াও, নিয়ে আসছি" বলিয়া অমলা রান্নাঘরে

জিনিষটার ওপর আজও লোভ আছে। হন্তদন্তভাবে ছুটিয়া আসিয়াই রাগটা প্রকাশ করা উচিত হইবে না।

ডিসে করিয়া খানকতক সদ্য-ভাজা বড়া আনিয়া মিষ্টি হাসিয়া আবদারের সুরে অমলা বলিল—"অতীনবাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল ?"

ইচ্ছা হইল বলি—"না", কিন্তু শেষে অমলাই বলিল—"তুমি বেরুবার আধঘণ্টা পরে দেখি অতীনবাবু নিজেই হাজির—হাতে নিয়ে এতবড় এক মাছ।"

বড়া ফুরাইলে মনে মনে মুসাবিদা করিতে লাগিলাম—কোথা থেকে জেরাটা সুরু করিব।

অমলা বলিল : "কি গো, কথা কইছো না যে ?"

এবার বলিয়া ফেলিলাম—"রমেনের কাজটা তোমরাই যখন ঠিক করে রেখেছিলে, অতীনের বাড়ি যাবার জন্যে সকাল বেলা মিছিমিছি আমাকে এত তাগাদা দেবার দরকার কি ছিল ?"

অমলা অবাক হইয়া বলিল—"আমরাই ঠিক করেছিলাম মানে ?"

—"তোমরা করো নি ?"

—"না, অতীনবাবু ঠাকুরপোর কাছে আজ বল্লে যে কাল তার সঙ্গে তোমার যখন দেখা হয়েছিল তখনই কথাবার্তা তোমরা ঠিক করেছিলে। আমি বরং ভাবলাম যে কালকের কথাটা যদি আমাকে জানাতে—তা হলে ভোর বেলা তোমায় ডাকাডাকি করতে হতো না। বেশ লোক তুমি, নিজেই সব ঠিক করে এখন উল্টো চাপ দিচ্ছ আমার ওপর।"

বুঝিলাম, হলধরবাবুকে লইয়া যে সমস্যাটা দাঁড়াইয়াছে তার একটা নিষ্পত্তি করিবার জন্য অচিরে রমেনকে কাজে লাগাইবার উদ্দেশ্যে ব্যবসাদার অতীন এই চালটি চলিয়াছে।

কিন্তু পাণ্ডুলিপির কথাটা চাপিয়া রাখিতে পারিলাম না। বলিলাম : 'সে যাই হোক, আমার অর্ধেক লেখা বইটা অতীনকে দেখাতে গেলে কেন ?'

—কি যা তা বলো ?

—'তবে সে বলে কি করে যে আমার নতুন বইটার ফিল্ম তুললে জমবে ভালো, আর তোমারও তাই ইচ্ছে—'

অমলা খিল খিল করিয়া হাসিয়া বলিল : 'লোকে শাক ঢেকে গেছে।' অমলা হাসিতে হাসিতে বিষম খাইবার উপক্রম করিল।

জিজ্ঞাসা করিলাম : 'ব্যাপার কি ?'

—'ছোট ভাইকে জিজ্ঞাসা করো, সে সব জানে।' বলিয়া অমলা রান্নাঘরে চলিয়া গেল।

অমলার উপর মিছামিছি চটিয়া গিয়া রাগটা যে শেষ পর্যন্ত প্রকাশ করিয়া ফেলি নাই, সে জন্য নিজেকে ধন্যবাদ দিলাম। বেচারি অনেকদিন পরে মস্ত একটা মাছ লইয়া যখন উনানের আঁচে তাতিয়া উঠিয়াছিল তখন যদি আমার মনের দ্বিতীয় রিপুটা ফণা তুলিয়া তাকে ছোবল মারিত, ফলটা তাহাতে ভালো হইত না।

খাইতে বসিয়া রমেনই কথাটা পাড়িল। রুবি ফিল্মের সহকারী পরিচালকের পদ সে পাইয়াছে।

আহারাদির পর পাণ্ডুলিপিটা লইয়া বসিলাম। আর কয়েকটা পরিচ্ছেদ জুড়িয়া দিতে পারিলেই বইখানা শেষ হইবে। কিন্তু যে-সব দর্শক আমার উপন্যাসের ফিল্ম দেখিয়া মাথা ঘামাইবে—কাহিনীর মার-প্যাঁচে তাদের মাথা ঘুরাইয়া দিতে পারে এমন সব উপাদান আমার উপন্যাসে আছে কিনা জানি না। নায়িকা মেনকাকে যে সব ধাতু দিয়া গড়িয়াছি তার মধ্যে কোনটা আসল আর কোনটা মেকি বলিয়া রূপালি পর্দায় ফুটিয়া উঠিবে, তাও বিবেচ্য। আর নায়ক প্রবীর···তার কথা তো ভুলিয়াই গিয়াছিলাম। তাকে কোথায় যেন ফেলিয়া আসিয়াছি, স্মরণ করিতে পারিতেছি না। এ কয়দিন মেনকাকে লইয়াই ব্যস্ত ছিলাম। প্রবীর তো অতি সাধারণ নিরীহ মানুষ, কিছুটা মুখচোরাও বটে। কয়েক শত দর্শকের সম্মুখে দাঁড় করাইয়া তাহাকে দিয়া রীতিমত অভিনয় করানো হইতেছে, এ কথা ভাবিলেই তার কাঁপুনি দিয়া জ্বর আসিবে নিশ্চয়। চলনে যার চাল নাই, বাক্যে ব্যঞ্জনা নাই, এরূপ একটি নায়ককে স্টুডিয়োতে পাঠাইলে সেখানকার কর্মকর্তারা তাহাকে লইয়া কি করিবে ?

প্রশ্ন উঠিতে পারে, এমন একটি গোবর-গণেশকে উপন্যাসের নায়ক করিলাম কোন আক্কেলে ? উত্তরে বলিতে পারি যে গোবর গণেশই হউক বা আর যাহাই হউক, নায়িকা মেনকা তাকে ভালোবাসিয়াছে, তাও

ইতিহাসটা এক্ষেত্রে একেবারে অবান্তর এবং সে বিষয়ে কারও কৌতূহল প্রকাশ না করাই উচিত। তবে এটুকু বলিতে পারি যে চঞ্চলা মেনকা হঠাৎ মুগ্ধ হইয়াছিল প্রবীরের মাথায় কদম ছাট চুল দেখিয়া, আর প্রবীর আকৃষ্ট হইয়াছিল মেনকার চোখের বিদ্যুতের ঝলকানিতে।

কেহ হয়তো বলিবে—পাইয়াছি। অর্থাৎ নায়ক গো-বেচারি হইলেও আপত্তি নাই, নায়িকার চোখের বিদ্যুতের ঝলকানিটাই আসর মাৎ করিবে। এখানে বলা প্রয়োজন যে মেনকার চোখে বিদ্যুতের ঝলকানি থাকিলেও, কণ্ঠে তার সুর নাই। কারণ সঙ্গীতের কোন অঙ্গেই সে হাত বুলায় নাই। অবশ্য গাহিতে না পারিলেও কিছুটা সে নাচিতে পারে, তবে পায়ে ঘুমুর বাঁধিয়া তবলার তালে তাল রাখিয়া নয়। তার মন যাহাতে অধীর হয় সেই কাজে ছুটিবার জন্য পা দুটা তার নাচিয়া ওঠে এবং চলিবার সময় সে মাঝে মাঝে যেন নাচিয়া চলে। মেনকার নৃত্য-পরিচয় ঐ পর্যন্ত।

সুতরাং ভালোমানুষ নায়ক প্রবীরকে যতটা সম্ভব নেপথ্যে রাখিয়া একা মেনকাকে দিয়া কতকগুলা মুখস্থকরা কথা বলাইলেই সমজদাররা যে বাহবা দিবে তাতে সন্দেহ আছে।

তা ছাড়া কাহিনীর মধ্যে পরিস্থিতি বলিয়া একটা কথা আছে। কলমের গতি বাগ মানাইতে না পারিয়া উপন্যাসে যে সব ঘটনা সৃষ্টি করিয়াছি সেগুলায় জোড়া-তালি দিয়া গল্পটা পর্দার উপর ঠিক মত খাড়া করিতে না পারিলে দর্শকরা হাততালি দিবে না।

কাজেই অগ্র পশ্চাত বিবেচনা না করিয়া উপন্যাসটা স্টুডিয়োতে পাঠাইলে ওখানকার কলা-রসিকদের কাছে আমার বিদ্যা-বুদ্ধি ধরা পড়িতে বিলম্ব হইবে না এবং যতীন তখন বাল্যবন্ধু বলিয়া ক্ষমা করিবে না; রমেনও দাদার লেখা বলিয়া খাতির করিয়া মাথায় তুলিবে না; আর আর্টের আর্ট-ঘাট বাঁধিয়া চলে যে রুবি, তার কাছে তখন মুখ দেখাইতে পারিব না।

ভাবিতে ভাবিতে মাথায় কতকগুলা আইডিয়া কিল-বিল করিয়া উঠিল। কিন্তু ফ্যাসাদ বাধাইল মেনকার দিল্লী-যাত্রা পর্বটা। ওটার একটা গতি করা দরকার সবার আগে, নহিলে···

—'হ্যাঁগো, জিবরাল্‌টারি গোঁপ কোত্থেকে এলো জানো?'—অমলা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল।

—'জিবরাল্‌টারি গোঁফ!'

শব্দটা নিজেই সংশোধন করিয়া অমলা বলিল: 'জিবরাল্‌টারি নয়, গিল্‌বার্টি গোঁফ—'

বলিলাম—'তাই বলো। তা হঠাৎ গোঁফের কথা কেন?'

—'গিল্‌বার্টি গোঁফ যদি হতে পারে, তা হলে প্রবীর-ছাট চুল হবে না কেন?'

—'প্রবীর-ছাট চুল! এ সব কি বলছো?'

অমলা বলিল: 'ঠিকই বলছি মশাই। তোমার প্রবীরকে ফিল্মে তুললে ওর মাথার কদম ছাট চুলের বাহার দেখে লোকে কদম ছাটের নতুন নামকরণ করবে—প্রবীর-ছাট, তা বুঝি জানো না? প্রবীর-ছাট নামে কদম-ছাটের তখন কদর বাড়বে।'

ভাবিলাম উত্তরে বলি: তাইতো, এ সম্ভাবনার কথাটা ভাবিয়া দেখি নাই; আর ফিল্মে প্রতিফলনে ও সাধারণের পরিগ্রহণে এক একটা পদার্থ কেমন ভাবে উৎরাইয়া নি[illegible] নব কলেবর ও অভিনব সংজ্ঞা লাভ করে, আগে থেকে সে বিষয়ে কিছু ধারণা করা যায় না। মুখে বলিলাম: 'আমি কিন্তু ভাবছি মেনকার কথা। ওকে নিয়ে একটু মুস্কিলে পড়েছি। দশের পরিচ্ছেদে ওর দিল্লীওয়ালা বন্ধুদের সিমলেতে পাঠিয়ে তারপর বারোর পরিচ্ছেদে মেনকাকে দিল্লীতে টেনে এনে শেষ রক্ষা করবো কি করে তাই ভাবছি। অর্থাৎ ওর একটা দীর্ঘ অজ্ঞাত বাস অধ্যায় দেখাতে চাই; সেটা কোথায় এনে উপসংহার টানবো—'

অমলা বাধা দিয়া বলিল—'ও এই কথা? আমি যা ভেবেছি তাই শোনো। প্রথমে, ঐ অজ্ঞাতবাসের অধ্যায়টা খুব খাটো করতে হবে। প্রবীর রাগ করতে জানে কিনা, তাই পরখ করবার জন্যেই মেনকা গেছে দিল্লীতে; কিন্তু সেখানে ওর একা একা ভালো লাগছে না। এদিকে মেনকার দিল্লী যাওয়ার খবর পেয়ে প্রবীর রাগ না করে, প্রকাশ করলে চাঞ্চল্য। অর্থাৎ একটা এরোপ্লেনে চড়ে সেও গেলো দিল্লীতে।'

—'তারপর?'

—'তারপর'—অমলা বলিল—'তারপর দেখা গেল,

প্রবীর যখন দিল্লীর হোটেলে বসে গালে হাত দিয়ে ভাবছে, মেনকা তখন কুতব-মিনারে উঠে গান গাইছে। হাওয়ায় সেই চেনা গলার সুর ভেসে এসে হোটেলের জানলা দিয়ে ঢুকে প্রবীরের মরমে প্রবেশ করলো। প্রবীর তৎক্ষণাৎ একটা ট্যাক্সি ভাড়া করে কুতবমিনারের তলায় এসে মেনকার উদ্দেশ্যে রুমাল উড়াতে লাগলো—'

বাধা দিয়া বলিলাম—'ধন্যবাদ। কিন্তু আমি মেনকার গলায় গানের কোন সুরই যে দিই নি—'

অমলা বলিল: 'আহা, তুমি না দিলেও অতীনবাবুর স্টুডিয়োর কলাবিদরা মেনকার গলায় সুর যে দেবে না, তা ধরে নিচ্ছ কেন ?'

—'যাক, তারপর ?'

—'তারপর'—অমলা বলিল—'মেনকা আর প্রবীর আর একটা এরোপ্লেনে চড়ে কলকাতায় ফিরে আসবে।'

আমি বলিলাম: 'এরোপ্লেনে চড়ে নয়, ঘোড়ায় চড়ে ওরা কলকাতায় ফিরবে—'

—'ঘোড়ায় চড়ে দিল্লী থেকে কলকাতায় আসবে ?'

বলিলাম: 'হলধরবাবুর হিরো ঘোড়ায় চড়তে জানে না। আমার কাহিনীর নায়কনায়িকারা ঘোড়ায় চড়ে হাজার মাইল পথ পার হতে থোড়াই করে—তাই যদি দেখানো যায়—'

অমলা বলিল: 'আঃ থামো। আগে বলো, হলধর-বাবু কে ?'

বলিলাম: 'তাও জানো না? তুমি দেখি কিছুই জানো না।'

অমলা হঠাৎ গম্ভীর হইয়া বলিল: 'আমার জেনে কাজ নেই, শুনে কাজ নেই। আমার উপদেশ যদি ভালো না লাগে, তা হলে পাঁচজন যারা ছবি দেখে তাদের জিজ্ঞেস করো গে। এখন আমায় ঘুমুতে দাও।' কথাটা শেষ করিয়াই অমলা ধুপ করিয়া শুইয়া পড়িল।

ঠিক কথা। আপনারা পাঁচজন, অর্থাৎ দশজন বাঁচিয়া থাকিতে আমি অনর্থক ভাবিয়া মরিতেছি কেন? আপনারা এককালে আমার উপন্যাস পড়িয়া কিঞ্চিৎ সুখ্যাতি করিয়াছিলেন; আসুন, আজ আমাকে পরামর্শ দিন—সাতশো বছরের প্রাচীন কুতবমিনারের চূড়ায় উঠিয়া মেনকা খাঁটি আধুনিক একখানা গান গাহিবে, না ডাউন দিল্লী মেলে চড়িয়া বিরহ-কাতর প্রবীরের কাছে সোজাসুজি ফিরিয়া আসিবে।

আপনারা পাছে আসিতে দ্বিধা বোধ করেন, সে জন্য আমিই আপনাদের আগামী শনিবার বিকালে চায়ের নিমন্ত্রণ করিলাম। অমলার জন্য ভয় নাই; কষায় অম্ল ঝাল পানসে পদার্থগুলি আপনাদের পাতে পরিবেশন করিবে না। শনিবার বিকালে আসিবার সময় আপনারা যে কিছু চিনি ও এক কৌটা জমাট দুধ সঙ্গে আনিবেন সে-কথা অবশ্য বলিয়া দিতে হইবে না।

স্মরিলে তোমার পুরাতন পরিচয়ে !

শ্রীশচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

পর্ব্বতময় ভীষণ বনানী ঘেরা—
দুর্গম পথে নাহি কোন পথ-চারী
এ হেন সময় বন্ধু কে এলে নামি—
অঙ্গনে তব ধীর পদ সঞ্চারি ?
অন্ধ-কারায় বন্ধ্যা রজনী শেষে,
বন্ধুর-পথ-যাত্রী থামিল এসে ;
কণ্টকাহত রক্ত-ক্ষরিত পদে,
মৃত্তিকা বুকে চরণ চিহ্ন আঁকি ;

তন্দ্রামগ্ন নিশীথে উপল-গাত্র
ধ্বনিত করিয়া কেবা সে ফিরিল ডাকি !
তুমি কি সহসা আধ-জাগ্রত হয়ে,
স্মরিলে তোমার পুরাতন পরিচয়ে,
জড়িত-কণ্ঠে ডাকিলে সে প্রিয়তমে
কর-কম্পনে জাগাতো যে তোমা আসি ;
শিথিল মনের স্খলিত বাসনা লয়ে—
ঝরিল সে বাণী, 'আজো তোমা ভালবাসি'!

স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম

শ্রীগোকুলেশ্বর ভট্টাচার্য্য

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

রৌলট আইন এবং পাঞ্জাবের লোমহর্ষক অত্যাচার আঘাত করিল জনসাধারণের মর্ম্মমূলে। গান্ধীজীর নেতৃত্বে ভারতের কোটি কোটি নরনারী আবার নূতন করিয়া উপলব্ধি করিতে লাগিল তাহাদের স্বাধীন সত্তাকে।

প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে মিত্রশক্তি তুরস্কের অঙ্গচ্ছেদ করেন এবং তুর্কী সুলতানের উপর নানা অপমানজনক সন্ধি-সর্ত্তও আরোপ করেন। ইহারই ফলে ভারতীয় মুসলমান-সমাজ হইলেন বিক্ষুব্ধ এবং খিলাফৎ আন্দোলনের সূত্রপাত হইল। ১৯২০ সালের ২৮শে মে বোম্বাই সহরে অনুষ্ঠিত খিলাফৎ সম্মেলনে মহাত্মা গান্ধীর প্রবর্ত্তিত অসহযোগ প্রস্তাব গৃহীত হয়। ইতিপূর্ব্বেই গান্ধীজী নিখিল ভারত মোস্লেম লীগ কৌন্সিলের এলাহাবাদ অধিবেশনে অসহযোগের অর্থ ও কার্য্যকারিতা ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের হিন্দুগণের সহিত একযোগে কাজ করিবার প্রয়োজনীয়তা মুসলমান নেতৃবৃন্দ এই সময় অনুভব করেন। ইহার ফলে জাতীয় আন্দোলনের শক্তি বৃদ্ধি পাইল।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসের অমৃতসহর অধিবেশনে পাঞ্জাবের অত্যাচার-অনাচারের নিন্দাসূচক এক প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং শাসন-সংস্কার সম্বন্ধে বৃটিশ-প্রস্তাব অসন্তোষজনক বলিয়া বিবেচিত হয়। ১৯২০ সালের সেপ্টেম্বরে লালা লাজপৎ রায়ের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে কলিকাতায় মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ প্রস্তাব গৃহীত হইল। কংগ্রেসের সহিত মোস্লেম লীগেরও যে বিশেষ অধিবেশন হয়, তাহাতেও উক্তরূপ প্রস্তাবই গৃহীত হয়।

অহিংস অসহযোগের প্রস্তাব ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসে সূচনা করিল এক যুগান্তকারী পরিবর্ত্তনের। সরকারের সাহায্য ও আশ্রয় ত্যাগ করিয়া সর্ব্ব বিষয়ে পরিপূর্ণভাবে আত্মশক্তির উপর নির্ভরতাই অসহযোগের প্রধান কথা।

সরকারী বিদ্যালয়, আইনসভা, বিচার-প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি বর্জ্জনের বাণী লইয়া গান্ধীজী এই আন্দোলনের সূচনা করিলেন। মাদক-দ্রব্য ও বিদেশী পণ্য বর্জ্জন এবং স্বদেশী প্রচারের মন্ত্রে সমগ্র দেশ যেন প্রাণময় হইয়া উঠিল। প্রিন্স অফ্ ওয়েল্সের ভারত-আগমন উপলক্ষে ১৯২১ সালের ২১শে নভেম্বর ঘোষিত হইল হরতাল। এই উপলক্ষে ঐদিন হইতে কয়েক দিন যাবৎ বোম্বাই-এ ভীষণ দাঙ্গা চলিতে লাগিল। দাঙ্গা বন্ধ করার জন্ত মহাত্মা গান্ধীকে প্রায়োপবেশন করিতে হইল।

অর্ডিনান্স রচনা করিয়া এই সময় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীকে বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করা হইল। চিত্তরঞ্জন, মতিলাল, জওহরলাল প্রভৃতি নেতৃবর্গ কারারুদ্ধ হইলেন। মহাত্মাজী সিদ্ধান্ত করিলেন বার্দ্দোলীতে প্রথম করবন্ধ আন্দোলন আরম্ভ করিতে।

কিন্তু ১৯২২ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারি এক কাণ্ড ঘটিয়া গেল। উক্ত দিবসে যুক্তপ্রদেশের অন্তর্গত গোরক্ষপুর জেলায় পুলিশের অত্যাচারে ক্ষিপ্ত একদল লোক চৌরীচৌরা নামক থানার একজন দারোগাকে একুশজন কনেষ্টবলসহ অগ্নি-দগ্ধ করিয়া হত্যা করিল। অহিংসার চির-বিশ্বাসী গান্ধীজী এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া অতিশয় ব্যথিত হইলেন। তিনি বুঝিলেন যে, সত্যাগ্রহ-আন্দোলনের জন্ত দেশ তখনও প্রস্তুত হয় নাই। ইহার ফলে, ১২ই ফেব্রুয়ারি বার্দ্দোলীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে বার্দ্দোলীতে করবন্ধ আন্দোলন স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইল এবং গান্ধীজী তাঁহার আইন-অমান্ত আন্দোলন প্রত্যাহার করিয়া লইলেন।

গুপ্ত বিপ্লবী আন্দোলনের জন্ত যাঁহারা কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন, মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তনের সময় তাঁহাদের অনেককে মুক্তি দেওয়া হয়। এই সকল মুক্তিপ্রাপ্ত বিপ্লবীদের অনেকে এবং এতদিন যাঁহারা আত্মগোপন করিয়া থাকিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তাঁহাদেরও কেহ কেহ কংগ্রেসের গণ-আন্দোলনে যোগদান করিয়া পুনরায় কর্ম্মে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কম্যুনিষ্ট দল গঠন করিবার জন্ত মানবেন্দ্রনাথ রায় এই সময় অবনী মুখোপাধ্যায়কে ভারতবর্ষে প্রেরণ করেন এবং দেশের মধ্যে কম্যুনিষ্ট মতবাদও প্রসারিত হইতে থাকে। যুদ্ধের পরবর্ত্তী কালেই সমগ্র ভারতে ব্যাপক গণ-আন্দোলনের সূচনা হয় এবং নানা গণ-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে।

অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করিয়া বিপ্লবীরা যে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতেছিলেন, গান্ধীজী উক্ত আন্দোলন প্রত্যাহার করায় তাহা হইতে তাঁহারা বঞ্চিত হইলেন। ইহার ফলে তাঁহাদের মনে সৃষ্ট হইল তীব্র প্রতিক্রিয়ার। আন্দোলন দমনকল্পে কর্ত্তৃপক্ষ যে চণ্ডনীতির অনুসরণ করিতে লাগিলেন, তাহাতেও দেশের আবহাওয়া পুনরায় বিষাক্ত হইয়া উঠিল। এই পরিস্থিতিতে বিপ্লবী সন্তোষ মিত্র (যিনি ১৯৩১ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর পুলিশের গুলিতে হিজলী বন্দীনিবাসে প্রাণ দিয়া শহীদ হইয়াছেন) প্রভৃতির নেতৃত্বাধীন দলের দ্বারা দুইটি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইল। চট্টগ্রামের বিপ্লবীদিগেরও ইঁহাদের সহিত যোগাযোগ ছিল বলিয়া জানা যায়।

১৯২৩ সালের ৩রা আগষ্ট তারিখে নরেন্দ্র ঘোষ অন্ত তিন জন সঙ্গীসহ অপরাহ্ণকালে কলিকাতার শাঁখারীটোলা পোষ্ট অফিসে প্রবেশ করেন এবং পোষ্টমাষ্টার অমৃতলাল রায়ের নিকট অর্থ দাবী করেন।

বিপ্লবীদিগের হাতে ছিল আগ্নেয়াস্ত্র আর মুখে ছিল মুখোস। পোষ্টমাষ্টার ইতস্ততঃ করিলে তাঁহার প্রতি গুলি বর্ষিত হয় এবং তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। বিপ্লবীদের পলায়নকালে পোষ্ট অফিসের দুইজন কর্ম্মচারী তাঁহাদের পশ্চাদ্ধাবন করে এবং সেণ্ট জেমস্ স্কোয়ারে গিয়া আগ্নেয়াস্ত্রসহ বরেন্দ্রকে ধরিয়া ফেলিতে সক্ষম হয়।

বরেন্দ্রের বাসস্থান খানাতল্লাস করিয়াও পুলিশ দুইটি রিভলভার হস্তগত করে। ঘটনার মাত্র তিন মাস পূর্ব্বে বরেনের বিবাহ হইয়াছিল বলিয়া প্রকাশ পায়।

হাইকোর্টে বিচারের সময় বরেন্দ্র দোষ স্বীকার করেন এবং তৎকাল-প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী সে ক্ষেত্রে তাঁহার দ্বীপান্তর দণ্ড হওয়াই উচিত ছিল। বিশেষতঃ তাঁহার বিরুদ্ধে পর্য্যাপ্ত প্রমাণও ছিল না; কিন্তু বিচারপতি মিঃ পেজ তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন। ইহার পর হাইকোর্টের ফুলবেঞ্চে পুনর্বিচারে এবং প্রিভি কৌন্সিলে আপিল করিয়াও কোন ফল হইল না। শেষ পর্য্যন্ত রাজানুকম্পায় তাঁহার প্রাণদণ্ডের পরিবর্ত্তে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ হয়।

এই ঘটনার পর সন্তোষ মিত্র প্রভৃতি কয়েকজনের বিরুদ্ধে একটি ষড়্যন্ত্র মামলা খাড়া করা হয় কিন্তু জুরিরা অভিযুক্তদিগকে নির্দ্দোষ বলিয়া সাব্যস্ত করায় জজ মিঃ এস্. কে. ঘোষ তাঁহাদিগকে মুক্তিদান করেন। আসামীদের পক্ষে দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত প্রভৃতি মামলা পরিচালিত করিয়াছিলেন।

১৯২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসেই উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিন-বিহারী গঙ্গোপাধ্যায়, ভূপতি মজুমদার, ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্র দত্ত, জ্যোতিষ ঘোষ প্রভৃতিকে ১৮১৮ সালের ৩নং আইনে আটক করা হইল।

দ্বিতীয় হত্যাকাণ্ড সাধিত করিলেন বিপ্লবী গোপীনাথ সাহা। মিঃ আর্ণেষ্ট ডে নামক জনৈক শ্বেতাঙ্গ মেসার্স কিলবার্ণ এণ্ড কোম্পানিতে কাজ করিতেন। তিনি বাস করিতেন লোয়ার সার্কুলার রোডে অবস্থিত লর্ডস বোর্ডিং হাউসে। প্রতিদিনের ন্যায় ১৯২৪ সালের ১২ই জানুয়ারি তারিখে তিনি সকাল বেলা যথারীতি প্রাতর্ভ্রমণে বাহির হইয়া যখন চৌরঙ্গীতে হল এণ্ড এণ্ডার্সনের দোকানের সম্মুখে শো-কেসে জিনিষপত্র দেখিতেছিলেন, তখন অতর্কিতভাবে গোপীনাথ তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। চার্লস টেগার্ট বলিয়া ভুল করিয়াই গোপীনাথ তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় গুলিতেই মিঃ ডে সংজ্ঞা হারাইয়া ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িলেন কিন্তু গোপীনাথ তথাপি ক্ষান্ত হইলেন না। উপর্য্যুপরি আরও কয়েকটি গুলি তিনি সাহেবটির উপর বর্ষণ করিলেন। মোট সাতটি গুলি মিঃ ডে-র শরীরে বিদ্ধ হইয়াছিল।

গুলি বর্ষণ শেষ হইলে গোপীনাথ পার্ক ষ্ট্রীট ধরিয়া দৌড়াইতে লাগিলেন। জনৈক ট্যাক্সি-চালক ট্যাক্সি লইয়া তাঁহার অনুসরণের চেষ্টা করিলে তিনি ফিরিয়া দাঁড়াইয়া তাহার উপরও গুলি চালাইলেন। গুলি তাহার তলপেট ভেদ করিয়া গেল। পার্ক ষ্ট্রীট ধরিয়া ছুটিতে চালককে বলিলেন—তাঁহাকে লইয়া ওয়েলেস্লি ষ্ট্রীটের দিকে গাড়ী হাঁকাইতে। গাড়ীর চালক তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত না হওয়ায় তিনি তাহার উপরও গুলি চালাইলেন। ফ্রি স্কুল ষ্ট্রীটে একজন দরোয়ান তাঁহাকে ধরিবার চেষ্টা করিয়া আহত হইল।

ওয়েলেস্লি ষ্ট্রীট ও রিপণ ষ্ট্রীট যেখানে আসিয়া মিলিত হইয়াছে, সেখানে আসিয়া গোপীনাথ একখানি গাড়ীতে উঠিবার চেষ্টা করিতে-ছিলেন। মিঃ এ.ডব্লিউ.অগ্ নামক জনৈক ব্যক্তি তাঁহার হাতে আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়া এই সময় তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। কয়েকজন কনষ্টেবলও আসিয়া এই ব্যাপারে তাঁহাকে সাহায্য করিল। গোপীনাথের শরীর তল্লাসী করিয়া পাওয়া গেল—একটি মশার পিস্তল, একটি পাঁচঘরা রিভলভার, কতকগুলি কার্ত্তুজ এবং কার্ত্তুজের খোল।

গোপীনাথ সাহা

ঘটনার দিনেই অপরাহ্ণে মিঃ ডে কলিকাতা মেডিকেল কলেজে প্রাণত্যাগ করিলেন। অপর যে দুই ব্যক্তি আহত হইয়াছিল, তাহাদেরও অবস্থা আশঙ্কাজনক দেখিয়া তাহাদের জবানবন্দী গ্রহণ করা হইল।

মিঃ ডে-র মৃত্যুতে কলিকাতার সাহেব মহলে রীতিমত উত্তেজনার সঞ্চার হইল। এম্পায়ার থিয়েটারে ১৫ই জানুয়ারি কলিকাতার ইউরোপীয় এবং এংলো-ইণ্ডিয়ান অধিবাসীদের এই উপলক্ষে এক প্রতিবাদ সভা হইল এবং বক্তৃতাও দেওয়া হইল তীব্র ভাষায় এই হত্যাকাণ্ডের নিন্দা করিয়া। একটি প্রস্তাবে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টগুলিকে কোনও আন্দোলনের নিকট নতি স্বীকার না করিয়া দৃঢ় থাকিবার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করা হইল এবং গভর্ণমেণ্টের উক্ত অনমনীয়তার নীতিতে ইউরোপীয় ও এংলো-ইণ্ডিয়ান সমাজের পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দেওয়া হইল।

মাসে ১৫ই জানুয়ারি গোপীনাথের মামলা উঠিল। মিঃ ডে-কে ইচ্ছাপূর্ব্বক হত্যা এবং অপর তিনজন ভারতীয়কে হত্যার চেষ্টা করার অভিযোগ তাঁহার বিরুদ্ধে আনীত হইল। গোপীনাথকে আদালতে হাজির করা হইল কপালে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা অবস্থায়। পাবলিক প্রসিকিউটর রায় বাহাদুর তারকনাথ সাধু সরকার পক্ষে মামলার উদ্বোধন করিলেন। গোপীনাথের পক্ষে কোনও আইনজীবী দণ্ডায়মান হন নাই। গোপীনাথ নিজেই মধ্যে মধ্যে সাক্ষীদের প্রশ্ন করিতে লাগিলেন।

শ্রীরামপুরে গোপীনাথ যে বাড়ীতে বাস করিতেন—মণিমোহন দাস ছিলেন সেই বাড়ীরই একজন ভাড়াটিয়া। তাঁহার সাক্ষ্য হইতে জানা যায় যে, গোপীনাথের পিতার নাম বিজয়কৃষ্ণ সাহা, গোপীনাথরা চার ভাই এবং তাঁহাদের জননী তখনও জীবিত। গোপীনাথ তাঁহার ভ্রাতা শ্যামাচরণের সহিত শ্রীরামপুরের ক্ষেত্রমোহন সাহা লেনে বাস করিতেন এবং শ্যামাচরণই তাঁহার ভরণপোষণ করিতেন। শ্রীরামপুরের ইউনিয়ন ইন্‌ষ্টিটিউটে নবম শ্রেণী পর্য্যন্ত গোপীনাথ পড়াশুনা করিয়াছিলেন।

ডেপুটি কমিশনার মিঃ বেভিন-এর সাক্ষ্যে প্রকাশ পাইল যে, শাঁখারীটোলা পোষ্ট অফিসে হানা দেওয়ার সময় যে রকমের কার্ত্তুজ ব্যবহৃত হইয়াছিল, গোপীনাথের নিকট হইতে প্রাপ্ত কার্ত্তুজও তাহারই অনুরূপ।

আদালতে যখন মামলার শুনানী চলিত, তখন গোপীনাথ বসিয়া থাকিতেন নির্ব্বিকারভাবে চুপ করিয়া। তাঁহারই বিরুদ্ধে যে হত্যার অভিযোগে মামলা চলিতেছে, তাহা তাঁহার হাব-ভাব দেখিয়া বুঝা যাইত না। তুচ্ছ সাক্ষ্য-প্রমাণাদির সম্বন্ধে তাঁহার বিন্দুমাত্রও আগ্রহ ছিল না। টেগার্ট সাহেবকেও শুনানীর সময় আদালতে আসিতে হইয়াছিল। সাক্ষ্য-প্রমাণাদি গ্রহণ সমাপ্ত হইলে গোপীনাথ আদালতে এক বিবৃতি দিলেন। সে বিবৃতি যেমন নির্ভীক—তেমনই চাঞ্চল্যকর।

গোপীনাথ তাঁহার বিবৃতিতে পাবলিক প্রসিকিউটরের উক্তির প্রতিবাদ করিলেন। তাঁহাকে ইতিপূর্ব্বেও লালবাজারে ঘুরাফিরা করিতে দেখা গিয়াছে এবং একজন লোকের সহিত বহুবাজারের কোন একটি বাড়ীতে পুলিশ তাঁহাকে একদিন প্রবেশ করিতে দেখিয়াছে—পাবলিক প্রসিকিউটরের এই উক্তি সত্য নয় বলিয়া তিনি জানাইলেন। তিনি বলিলেন, সকল সময় তিনি একাই বাহির হইতেন এবং সর্ব্বদাই টেগার্ট সাহেবকে নিহত করার জন্য তাঁহার লক্ষ্য থাকিত (এই কথা বলিবার সময় তিনি কঠোর দৃষ্টিতে আদালতে উপস্থিত মিঃ টেগার্টের দিকে চাহিয়া বিদ্রূপের হাস্য করিলেন)। গোপীনাথ জানাইলেন, টেগার্ট সাহেবকে তিনি খুব ভালভাবেই চিনিতেন, কিন্তু টেগার্টেরই মত দেখিতে এক নিরপরাধ ব্যক্তি দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার হস্তে নিহত হইয়াছে। টেগার্ট সাহেব পরিত্রাণ পাওয়ায় তাঁহার দেশের একজন শত্রুকে নিপাত করিতে না পারার জন্য তিনি আক্ষেপ প্রকাশ করিলেন। পরিশেষে তিনি এই আশা ব্যক্ত করিলেন যে, যদিও তাঁহার ভুল হইয়াছে বটে, কিন্তু দেশের মধ্যে অন্য কোনও দেশ-প্রেমিক যুবক থাকিলে তাহার দ্বারা তাঁহার অসম্পন্ন কার্য্য অধিকতর দক্ষতার সহিত নির্ভুলভাবে সম্পন্ন হইবে।

শুনানীর পর গোপীনাথের মামলা ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক হাইকোর্টের দায়রায় প্রেরিত হইল। তাঁহার রায় শ্রবণ করিয়া গোপীনাথ পরম সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। বিচারপতি পিয়ার্সনের এজলাসে হাইকোর্টে ১১ই ফেব্রুয়ারি তাঁহার মামলার পুনরায় শুনানী আরম্ভ হইল।

গোপীনাথের পক্ষ সমর্থনের জন্য নিম্ন আদালতে কোনও আইনজীবী না থাকার বিষয় পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। হাইকোর্টের দায়রায় বিচারের সময় কয়েকজন আইনজীবী তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিলেন। তাঁহারা যুক্তি দেখাইলেন যে, যেহেতু গোপীনাথ সুস্থমস্তিষ্ক নন, সেহেতু তাঁহার বিচার চলিতে পারে না।

জুরি মণ্ডলী গঠিত হইয়াছিল আটজন ভারতীয় ও একজন ইউরোপীয় লইয়া। আসামী সুস্থমস্তিষ্ক কিনা তাহা নির্দ্ধারণ করিবার ভার তখন জুরিদের উপর ন্যস্ত হইল। জুরিগণ গোপীনাথকে কতকগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন এবং পরদিন সর্ব্বসম্মত সিদ্ধান্ত প্রদান করিলেন যে, আসামী সম্পূর্ণ সুস্থমস্তিষ্ক। যাহা হউক, তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগাদি শ্রবণ করিয়া গোপীনাথ জানাইলেন, তিনি নিরপরাধ। সরকার পক্ষের সওয়াল জবাবের পর তিনি আদালতে এক বিবৃতি দিলেন। তাহাতে তিনি ঘোষণা করিলেন, টেগার্ট সাহেবকে তিনি বহুবার দেখিয়াছেন এবং তাঁহাকে হত্যা করিবার উদ্দেশ্যে আগ্নেয়াস্ত্রসহ তিনি বহুবার তাঁহার অনুসরণ করিয়াছেন; এমন কি, একবার তিনি গুলি বর্ষণের জন্যও উদ্যত হইয়াছিলেন, কিন্তু মাতৃ আদেশ না পাওয়ার জন্যই তিনি তখন গুলি করেন নাই। ঘটনার কয়েকদিন পূর্ব্ব হইতেই তিনি অতিশয় মানসিক উত্তেজনার মধ্যে দিন কাটাইতেছিলেন। গৃহের মধ্যে আর থাকিতে না পারিয়া তিনি বাহির হইয়া গড়ের মাঠে উপস্থিত হন এবং চলিতে চলিতে বহুদূর অগ্রসর হইয়া যান। তারপর সহসা একজন সাহেবকে দেখিয়া তাঁহার টেগার্ট বলিয়া ধারণা জন্মে এবং তাঁহার উপরই তিনি গুলি নিক্ষেপ করেন। গোপীনাথ ইহাও জানাইলেন যে, জেলে জীবন যাপন তাঁহার পক্ষে সম্ভব নহে বিবেচনা করিয়া যেন তদনুযায়ী দণ্ডবিধান করা হয়। তিনি তাঁহার মাতার নিকট গমন করিতে উৎসুক।

আসামী পক্ষের সওয়াল জবাব শেষ হইলে গোপীনাথকে যখন আসামীর কাঠগড়া হইতে লইয়া যাওয়া হইতেছিল, সেই সময় তিনি চীৎকার করিয়া বলিলেন,—"টেগার্ট সাহেব হয় তো মনে করেন যে তিনি খুব নিরাপদ—কিন্তু আসল ব্যাপার তা নয়; আমি আমার কর্ত্তব্য সম্পাদনে ব্যর্থ হয়ে থাকলেও আমার অসম্পূর্ণ কাজের ভার আমার দেশবাসীর ওপরই দিয়ে গেলাম।"

তাহার পরদিন—অর্থাৎ ১৬ই ফেব্রুয়ারি জুরিরা তাঁহাদের সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করিলেন। গোপীনাথকে তাঁহারা সর্ব্বসম্মতিক্রমে দোষী স্থির করিয়াছিলেন। জজ জুরিদের অভিমত গ্রহণ করিয়া আদেশ দিলেন গোপীনাথের মৃত্যুদণ্ডের। সেদিনও কাঠগড়া হইতে লইয়া যাওয়ার

সময় গোপীনাথ চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"আমার রক্তের প্রতি ফোঁটায় ভারতের ঘরে ঘরে স্বাধীনতার বীজ রোপিত হোক।"

জেলে থাকিবার সময় কানাইলালের মত গোপীনাথের শরীরের ওজনও পাঁচ পাউণ্ড বাড়িয়া গিয়াছিল। তাঁহার মনে বিন্দুমাত্রও দুশ্চিন্তা ছিল না এবং হাসি তাঁহার মুখে লাগিয়াই থাকিত। আসন্ন মৃত্যুর জন্য যিনি প্রতীক্ষা করিতেছেন—তাঁহার এত নিশ্চিন্তভাব আসে কি করিয়া, ইহা ভাবিয়া সকলকে বিস্মিত হইতে হইত।

প্রেসিডেন্সি জেলে ১লা মার্চ তারিখে গোপীনাথের ফাঁসি হইয়া গেল। শব-সৎকারের সুবিধা দিবার জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করা হয়। দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন প্রভৃতির চেষ্টায় শব-সৎকারের অনুমতি মিলিল, কিন্তু জেলের বাহিরে শবদেহ লইয়া যাওয়ার প্রস্তাব মঞ্জুর হইল না। কর্তৃপক্ষ জানাইলেন যে, জেলের অভ্যন্তরে চারিজন আত্মীয় গিয়া অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিতে পারিবেন।

সুভাষচন্দ্র প্রমুখ নেতৃবৃন্দ ফাঁসির সময় জেল-গেটে উপস্থিত ছিলেন—ভিতরে প্রবেশের অনুমতি তাঁহাদিগকে দেওয়া হয় নাই। ফাঁসি শেষ হওয়ার বহুক্ষণ পরে বেলা প্রায় সাড়ে আটটার পর গোপীনাথের আত্মীয়দের জেলের মধ্যে যাইতে দেওয়া হইল। শব-সৎকারের পর গঙ্গায় নিক্ষেপ অথবা গয়ায় পিণ্ডদানের উদ্দেশ্যে নাভি বা অস্থি-গ্রহণ করিতে দেওয়া হইল না।

গোপীনাথের দেশপ্রেম এবং তাঁহার কর্মপন্থার সমর্থনের ব্যাপার লইয়া বাংলার কংগ্রেসে মতবৈষম্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। সিরাজগঞ্জে এই সময় বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির যে অধিবেশন হইয়াছিল, তাহাতে গোপীনাথের কার্য্যের প্রশংসাসূচক একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়; কিন্তু গান্ধীজী উক্ত প্রস্তাবের সমর্থন না করায় পর বৎসর ফরিদপুর অধিবেশনে উক্ত গৃহীত প্রস্তাবটি বাতিল করিয়া দেওয়া হয়। নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনেও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ গোপীনাথের প্রশংসাসূচক এক প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন এবং উক্ত প্রস্তাবের পক্ষে অনেকগুলি ভোটও লাভ করিয়াছিলেন। গোপীনাথের নাম তখন সারা ভারতেই সাড়া তুলিয়াছিল।

চট্টগ্রামে এক ডাকাতির দ্বারা বিপ্লবীরা এই সময় ১৭ হাজার টাকা হস্তগত করেন এবং কলিকাতা ও ফরিদপুরে দুইটি বোমার কারখানা আবিষ্কৃত হয়।

বিপ্লববাদকে বাংলা দেশে পুনরায় প্রসার লাভ করিতে দেখিয়া গভর্ণমেন্ট অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইলেন; ইহার ফলে ১৯২৪ সালের ২৫শে অক্টোবর অর্ডিনান্স জারি করিয়া ৬৭ জন বিপ্লবীকে করা হইল অন্তরীণ। সুভাষচন্দ্র বসু, সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র ও অনিলবরণ রায় ১৮১৮ সালের ৩ আইনে আটক হইলেন।

এক তহশীলদারের শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে শ্রীরাম রাজু এই সময় দক্ষিণ ভারতে এক বিদ্রোহের চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার দলবল-সহ তিনি কয়েকটি থানা আক্রমণ করিয়া লুণ্ঠন করেন এবং বন্দুক প্রভৃতি হস্তগত করেন। গভর্ণমেন্টের সহিত ছয়বার সংঘর্ষের পর অবশেষে ১৯২৪ সালের মে মাসে তিনি পরাজিত হন। গভর্ণমেন্ট ঘোষণা করেন যে, শেষবারের সংঘর্ষে রাজু নিহত হইয়াছেন; কিন্তু সেখানকার অনেকের বিশ্বাস এই যে, রাজু নিহত হন নাই—তিনি আত্মগোপন করিয়া আছেন মাত্র।

(ক্রমশঃ)

ভবঘুরে ভিখারী

ভিখারী: (ঘুমুতে ঘুমুতে) কেন ওরকম ধাক্কা মেরে রসিকতা করছ দাদা! জানো না তো আমার মেজাজ—আচমকা ঘুম ভাঙালে আমি ভারী চটে যাই।

শিল্পী—শ্রীসৌম্যেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

শিলালিপি

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

তেরো

"এখন যে কী ভয়ানক কাজ পড়েছে, তা লিখে তোমায় বোঝাতে পারবনা। সারাটা দিন বাইরে ছুটোছুটি করে এই ফিরে এলাম। এখন রাত প্রায় নটা। ঘরে ঢুকে আলোটা জ্বেলেই তোমাকে চিঠি লিখতে বসেছি।

পালপাড়ার সেই চালের কলগুলোর কথা মনে আছে তো তোমার? ওখানে একটা ইউনিয়ান করেছি আমরা। তুমি শুনলে বিশ্বাস করবে, আমি এক্ষুণি সেখানে বক্তৃতা দিয়ে এলাম? তোমার হাসি পাচ্ছে তো? কিন্তু জানো—যাদের কাছে বলেছি তারা একটুও হাসেনি। কী অদ্ভুত আলোয় জ্বলছিল তাদের চোখ, কী কঠিন হয়ে উঠছিল তাদের মুখের চেহারাটা। থেকে থেকে হাত মুঠো করে ধরছিল তারা—আমার মনে হচ্ছিল যেন মুঠির ভেতর বজ্র পেয়েছে কুড়িয়ে। আশ্চর্য, এতবড় শক্তিকে আমরা এতকাল ভুলেছিলাম কী করে!

আমাদের শান্তিদাকে মনে আছে—সেই Fire-brand শান্তি মৌলিক? সে আজকাল সন্ন্যাসী হয়েছে—গেরুয়া পরে, শুনছি একটা ব্রহ্মচর্য আশ্রম খুলবে। রাজনীতির নাম শুনলে যেন তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠে। বলে, পরমার্থ ছাড়া পথ নেই। সুতপাদির খবর আরো ইন্টারেষ্টিং। সে তোমায় পরে লিখব।

দাদা গ্রামে গ্রামে ঘুরছে, ন মাসে ছ মাসে একদিন খোঁড়া কাকের চেহারা নিয়ে দেখা দেয়। এখানকার যত কাজের ঝক্কি আমাকেই পোয়াতে হচ্ছে।

এত কাজ—এত অদ্ভুত ভালো লাগে কাজ করতে। তবু তোমাকে এই যে চিঠি লিখতে বসেছি, বাইরে চাঁদ ডুবে যাওয়া অন্ধকার থেকে এই যে ঝিরঝির করে হাওয়া আসছে, এখন ভাবি, তুমি পাশে থাকলে কত কাজ যে আরো করতে পারতাম! সেদিন তোমাকে আমি ঘৃণা করতে শুরু করেছিলাম—মনে হয়েছিল তুমি একটা বিশাক্ত কালো সাপ ছাড়া আর কিছু নয়। আজ মনে হয় তুমিই আমার সবচেয়ে বড় ইন্‌স্‌পিরেশন!

তুমি কবে আসবে? সবাইকেই তো ছেড়ে দিচ্ছে একে একে, তোমাকে কবে ছাড়বে?

কিন্তু সত্যি, কবে আসবে তুমি?"

চিঠিটা বন্ধ করে খামে ভাঁজ করে রাখল রঞ্জন চট্টোপাধ্যায়। মিতা অপেক্ষা করে আছে। আজ আর ব্যবধান নেই—আজ দুজনের মাঝখানে জীবনের একটা নিশ্চিত পথ তৈরী হয়ে গেছে। পরিমল আর মিতাকে ওদের বাবা বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। মিতা একটা স্কুলে মাষ্টারী করে, পরিমল ঘোরে গ্রামে গ্রামে। রূপকথার মেয়ে আজ মাটির কন্যা। আর অবাস্তব কোনো স্বপ্ন-চারণার মধ্য দিয়ে পৌঁছুতে হয়না তার কাছে। মাটির মাধ্যাকর্ষণে ছায়াতরুতে সার্থক হয়েছে আকাশ অর্কিড। কিন্তু সেই—সেদিন?......

......মনে হল রঞ্জু যেন মরে গেছে, তার সত্যিকারের অপমৃত্যু হয়েছে এতদিন পরে। এ সে কী করল? এতদিন ধরে সঞ্চয় করা তার গৌরব, তার বিপ্লবীর ঐতিহ্য সে এমনি করে পথের ধুলোয় মিলিয়ে দিলে! আজ আর বিপ্লবের পথে চলবার অধিকার তার নেই। আজ সে ব্রতভ্রষ্ট, কর্তব্যচ্যুত। সে বিশ্বাসঘাতক। বিশ্বাসঘাতকতা করেছে পার্টির কাছে, বিশ্বাসহন্তা হয়েছে তার পরমতম বন্ধু পরিমলের। এই মুহূর্তে মনসাতলার ওই অত্যন্ত হীন, অত্যন্ত শুভ্র মার্বেল কোম্পানির সঙ্গে তার কোনো পার্থক্য নেই, কোনো তফাৎ নেই ভোলা, কালী, খাঁদু অথবা পূর্ণের সঙ্গে।

এর চেয়ে মৃত্যুও ভালো। শুধু ভালো নয়, মৃত্যুই তার প্রাপ্য, তার প্রাপ্য বিশ্বাসঘাতকের সত্যিকারের দণ্ড, প্রাণদণ্ড। তার এখনি গিয়ে একথা বেণুদার কাছে স্বীকার করতে হবে, অকুণ্ঠ অকম্পিত গলায় ঘোষণা করতে হবে নিজের সীমাহীন অপরাধের কাহিনী।

কিন্তু বলবে কী করে? শুধু কি তারই অপরাধ? তার অপরাধের সঙ্গে আর একজনের চরম লজ্জাও তো নিষ্ঠুর ভাবে উদ্‌ঘাটিত হয়ে যাবে! তাদের নিষ্ঠুরতার নীচে দলে যাবে আর একজন—যার চারদিক ঘিরে অর্থহীন গুঞ্জন ওঠে—যার চোখে আকাশের সাতভাই চম্পার স্বপ্ন!

অপরাধ! পাপ! কিন্তু কী অপূর্ব অপরাধ। মিতার বুকের ছোঁয়া এখনো তো কাঁপছে তার নিজের সঙ্গে। যা মৃত্যু তার মধ্যে এমন অমৃত আছে তা কে জানত! তাই কি বেণুদা সুতপাকে—

সুতপা। ঘুমের মধ্যে শোনা সেই আর একটি রূপকথার মায়া কাহিনী। প্রেম একটা নিবিড় ব্যথার মতো লুকিয়ে আছে সেই আগ্নেয় পুরুষের পাথরে তৈরী হৃদয়ের আড়ালে। প্রেম আর সংস্কারের দ্বন্দ্ব মুহূর্তে মুহূর্তে ক্ষত-বিক্ষত করে চলেছে সেই অগ্নিকন্তার নিভৃত সত্তাকে। সেদিন সন্ধ্যায় বেণুদা গান করেছিলেন, "দাও দুঃখ বন্ধ তারণ মুক্তির পরিচয়।" সেদিন রাত্রে মনে হচ্ছিল খোলা তলোয়ারের তীক্ষ্ণোজ্জ্বল দীপ্তিটাকে আচ্ছন্ন করে দিয়ে তার ওপর ঝলমল করছে মেঘভাঙা

আলো। সেই থেকেই কি রঞ্জুর মনের মধ্যেও এসেছিল একটা অলক্ষ্য প্রেরণা, যার ফলে আজ তার এই স্খলন, এই অবতরণ?

কিন্তু বেণুদা। তার সঙ্গে কি তার তুলনা হয়? মৃত্যুবিজয়ী সেনাপতির পাশে দাঁড়িয়ে তার মতো দাবী জানাতে পারে কি একজন সাধারণ সৈনিক? অমন করে নির্ভীক উন্নত মাথা তুলে যে দাঁড়াতে জানে, অমনি করে ভালোবাসবার তারই তো অধিকার আছে। আর সুতপা। রাত্রির জ্যোৎস্নায় যত করেই সে সরে থাকনা কেন, কিন্তু দিনের প্রখর উগ্র আলোয় তাকে তো চিনতে বিন্দুমাত্র ভুল হয় না। চট্টগ্রামের রণক্ষেত্রে তার রুক্ষ বিস্রস্ত চুল ঝড়ের বাতাসে উড়ে যায়, বুড়িবালামের তীরে তার চোখ থেকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ঠিকরে পড়তে থাকে।

রঞ্জুর সে জোর কোথায় বেণুদার মতো? মিতা তো অগ্নিকন্যা নয়, হাস্নাহেনার গন্ধভরা রাত্রির অন্ধকারের সঙ্গে সে মিশে একাকার হয়ে যায়। তবে? তবে সান্ত্বনা কোথায় তার, কোথায় তার জোর? সে বিপ্লবী, সে সৈনিক—সে ভালোবাসল একজন সাধারণ, অতি সাধারণ পরাধীন দুর্বলচেতা মানুষের মতো? চারদিকে যখন অগ্নিকুণ্ড জ্বলেছে, যখন রক্তাক্ত হৃৎপিণ্ডের অঞ্জলি দিয়ে যজ্ঞের উদ্‌যাপন করতে হবে, তখন অতি রোম্যান্টিক্—অতি পুরোণো ভাবে, আরো দশজন অন্ধ নির্বোধের মতো সে এ কী করল?

এ অবিশ্বাস্য। প্রেম কি কখনো শিথিল করতে পারে বিপ্লবীর সংকল্পের রুদ্র কঠিন গ্রন্থি, ব্রহ্মচারী দৃঢ়ব্রত মানুষকে কি কখনো টলাতে পারে তা? ঝর্ণা নেমে আসে বলেই তো হিমালয় কখনো ভেঙে পড়ে না।

কিন্তু—

ঝর্ণা নেমে আসে বলেই হিমালয় কখনো ভেঙে পড়ে না। তাই যদি—হঠাৎ রঞ্জুর মনে নতুন জিজ্ঞাসা দেখা দিলে একটা: তাই যদি, তা হলে মিতাকে এইটুকু ভালোবাসবার মধ্যে এমন ভয়ঙ্কর অপরাধ কোথায়? ভালোবাসলেই কি নিজের কর্তব্যবোধ শিথিল হয়ে যায়, ভেঙে পড়ে নিজের এত বড় প্রেরণা, এত বড় জোরালো প্রতীতি? মৃত্যুর আর সর্বনাশের পথে যখন সব ছেড়েই বেরিয়ে পড়তে হয়েছে, তখন থাকুক না নিজের জন্যে এইটুকু পাথেয়, এতটুকু সঞ্চয়।

বেণুদার মতো শক্তি নেই তার? না যদি থাকে, তা সে অর্জন করবে। বরাবর একটা অপমানবোধ তার মনের মধ্যে রয়েছে—সে ছোট, সে ছেলেমানুষ; এই অসম্মানিত আত্মপীড়নের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার সময় এসেছে তার। এবার সে প্রমাণ করে দেবে—সে শুধু ছেলেমানুষ নয়, বড়ও হতে পারে, কঠিন কর্তব্যের সঙ্গে প্রেমের একটা নিঃশব্দ আগুনের ফুলকেও জ্বেলে রাখতে পারে প্রাণের গভীরে। মিতা সুতপা নয়? কিন্তু গড়ে তুলতে কতক্ষণ লাগবে? সেও মিতাকে তৈরী করে তুলবে তার পথসঙ্গিনীর উপযুক্ত মর্যাদা দিয়ে, দীপ্তি দিয়ে, শক্তি দিয়ে। আজ যার চোখে সে ঘুমের আমেজ দেখতে পাচ্ছে, ফুলের মতো। তবু সে ফুল সূর্যমুখী। তার তপস্যা সূর্যের তপস্যা। রঞ্জুর আগুন-ঝরা কবিতাগুলো যখন সে সুরেলা গলায় পড়ে যায় তখন তার সেই পড়ার মধ্যে রঞ্জু শুনতে পায় অগ্নিমন্ত্রের প্রতিধ্বনি। এ তো চরিত্রহীনতা নয়।

তবে কী এ? ঠিক বুঝতে পারছে না। তার এই মানসিক প্রতিক্রিয়াটার সত্যিকারের সংজ্ঞা কী? এ অপরাধ—কিন্তু সত্যিই কি অপরাধ? তাই যদি তবে এ অপরাধ এমন করে তাকে আলো করে তুলল কেন, কেন মনে হচ্ছে এতদিনের ক্লান্তিকর রক্তাক্ত পথচলায় হঠাৎ একটা নতুন পাথেয় কুড়িয়ে পেল সে?

আকস্মিক একটা শব্দে রঞ্জু উৎকর্ণ হয়ে উঠল। বাবার গলা।

"মূঢ়, জহীহি ধনাগমতৃষ্ণাং
কুরু তনুবুদ্ধে মনসি বিতৃষ্ণাং,
যল্লভসে নিজঃ কর্মোপাত্তং
বিত্তং তেন বিনোদয় চিত্তং—"

মোহ-মুদ্গার পড়ছেন বাবা। একটা শান্ত বিতৃষ্ণা তাঁর গলায়, একটা তিক্ত বৈরাগ্য। প্রায় ছ মাস পরে কাল তিনি বাসায় এসেছেন, বিচিত্র একটা অনাসক্তি যেন তাঁকে ঘিরে রেখেছে। কথাবার্তা বলেন না বিশেষ কারও সঙ্গে, নিজের ঘরে চুপচাপ বসে গীতা পড়া ছাড়া তাঁর আর কোনো কাজই নেই।

অথচ অমন শক্তিমান পুরুষ। দীর্ঘ দেহ, ঋজু মেরুদণ্ড, প্রাণের পরিপূর্ণ প্রতিমূর্তি। ওঁর চোখের দিকে তাকিয়ে কোনোদিন কথা পর্যন্ত বলতে সাহস পেত না ওরা। সেই বাবা কী হয়ে গেলেন!

"দিনযামিন্যৌ সায়ম্প্রাতঃ
শিশিরবসন্তৌ পুনরায়াতঃ
কালঃ ক্রীড়তি গচ্ছত্যায়ু
স্তদপি ন মুঞ্চত্যাশা বায়ুঃ—"

মা মারা যাওয়ার পর থেকেই এ কী হল তাঁর! এক মুহূর্তে জীবনে যেন সমস্ত বন্ধন তাঁর শিথিল হয়ে গেছে। নিজের মধ্যে তিনি সমাহিত হয়ে গেছেন—তাঁর কাছে এই পৃথিবীর কোনো দামই নেই—শুধু একটা অহেতুক আশার ছলনার মতো। কিন্তু সেদিনের কথা সে তো ভোলেনি। চাকরী যাওয়ার পরেকার সেই ঘটনা। হরিণের চামড়ার আসনে বসেছেন উজ্জ্বল দীপ্ত মূর্তি ঋত্বিকের মতো, সর্বাঙ্গ থেকে যেন আলোর মতো কী ঠিকরে পড়ছে তাঁর—কপালে রক্তচন্দনের ফোঁটা। তিন ভাইকে তিনি শপথ করিয়েছিলেন—রঞ্জুর জীবনে প্রথম আলোক-বাহী সেই অবিনাশ বাবুর চোখ যেন তাঁর চোখে এসে দেখা দিয়েছিল: প্রতিজ্ঞা করো, জীবনে কখনো ইংরেজের চাকরী করবে না, প্রতিজ্ঞা করো—যারা অন্যায় করবে তাদের কোনোদিন ক্ষমা করবে না—

সে প্রতিজ্ঞা তো রঞ্জু ভোলেনি। বাড়ির সকলের চোখ ফাঁকি

পড়লে দৃষ্টি নামিয়ে নেয় সে। ধনেশ্বরের হাতে অবিচলিতভাবে মার খেয়ে যে বীরত্ব গৌরব সে বয়ে এনেছিল, নিজের অপরাধের কালি ছড়িয়ে নিজেই তাকে কলঙ্কিত করে দিয়েছে!

তবু মনে হচ্ছে আর দেরী নেই। সময় এল এগিয়ে, এল তার সমস্ত মানসিক-যন্ত্রণার উপশমের মুহূর্ত। মারবার পরে ধনেশ্বরই তার পরিচর্যা করেছে, মাথায় জল দিয়েছে, রক্ত মুছিয়ে পরিষ্কার করে দিয়েছে, এক চুলের ভেতরে একটুখানি কাটা জায়গা ছাড়া আর কোথাও নিজের কীর্তির বিন্দুমাত্র চিহ্ন না থাকে—সব রকম সাবধানতা অবলম্বন করেছে তার জন্যে। তারপর আর এক কাপ গরম চা খাইয়ে তাকে বিদায় দিয়েছে। আর বলে দিয়েছে, আজ মুখ খুললে না, কিন্তু সেজন্যে ভেবো না তোমার দুর্গতি এর ওপর দিয়েই শেষ হল। আজ শুধু ছুঁইয়ে রাখলাম। আমার হিসেব-নিকেশ তৈরী হচ্ছে—যথাসময়ে চুনো-পুঁটি থেকে শুরু করে রাঘব বোয়াল পর্যন্ত কেউ বাদ যাবে না।—রিভলভারটা হাতের ওপর লোফালুফি করতে করতে গর্জন করেছিল বুলডগের মতো: সেদিন টের পাবে ধোলাই কাকে বলে। আজ এই নমুনাটুকু দিলাম শুধু অনুতাপের সুযোগ দেবার জন্যে। কিন্তু লাষ্ট্ চান্স্ এখনো আছে, নিজের ভালো চাও তো এসে সব কন্‌ফেস্ করে যেয়ো। আর যদি না করো—শহরের প্রত্যেকটি জায়গায় আমার চোখ মেলা আছে, সব আমি দেখতে পাচ্ছি—এর পরের বার সমস্ত আদায় করে নেব সুদে আসলে।

ধনেশ্বর মিথ্যে শাসায়নি। মিথ্যে শাসানোর মতো লোকই সে নয়। হাঁ—দেরী নেই আর। তারও নয়, পার্টিরও না। হঠাৎ রঞ্জুর মনে হচ্ছে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। আর—আর—অনুতপ্ত ক্ষুব্ধ মন বার বার বলতে লাগল সেদিন যত তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসে ততই ভালো। আজ আর জেলকে তার এড়িয়ে চলতে ইচ্ছে নেই। আজ মনে হচ্ছে ফাঁসির দড়ি তার পুরস্কার না হোক, তার প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছে। আত্মহত্যা করতে পারে না, স্বীকারোক্তি দিয়ে মৃত্যুদণ্ডকে আহ্বান করে নেবার শক্তি নেই তার—কাজেই সে দণ্ড না হয় ধনেশ্বরের হাত দিয়েই নেমে আসুক।

রাত প্রায় বারোটা হবে।

শহর থেকে মাইল পনেরো দূরে একটা মজা দীঘির উঁচু পাড়ির ওপরে জমা হয়েছে সকলে। মরা মরা জ্যোৎস্নায় চারদিকে দীর্ঘ দেহ তালগাছের প্রেতচ্ছায়া। পেছনে ধূ ধূ মাঠের বুকে সাবধানের সংকেত-বাণীর মতো আলেয়ার চোখ জ্বলছে দপ দপ করে। মজা দীঘির বুকে অজস্র পদ্মপাতা আর কলমিদামে বাতাস যেন ত্রস্ত নিশ্বাস ফেলছে। আর স্তব্ধতা।

সমস্ত পৃথিবী জুড়ে চক্রান্তের মতো স্তব্ধতা।

তালগাছের প্রলম্বিত ছায়াগুলোর নীচে আধশোয়া ভঙ্গিতে অপেক্ষা করছে সবাই। একটা অসহ্য নিষ্ঠুর প্রতীক্ষা। রঞ্জুর বুকের তলায় একটা ছোট কাঁটা ঝোপের তীক্ষ্ণ আঁচড় লাগছে। একটু সরে গেলে হয়, কিন্তু সাহস হচ্ছে না। যতক্ষণ আদেশ না পাওয়া যায়, ততক্ষণ নড়তে চড়তে পর্যন্ত পারবে না ওরা।

আট জোড়া চোখ স্থির-দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে দীঘির ওপারে বড় দোতলা বাড়িটার দিকে। ওর একটা জানালায় আলো জ্বলছে এখনো—সেটা নেভবার প্রতীক্ষা। বাড়ির সমস্ত লোক আগে নিশ্চিন্ত হয়ে বিশ্রাম করুক। একেবারে অপ্রস্তুত অবস্থায় আক্রমণ করা দরকার। এমনভাবে হানা দিতে হবে, এত সতর্কতার সঙ্গে যে মথুরা পোদ্দার তার বন্দুকটা হাতে পর্যন্ত তুলে নেবার সময় পাবে না। তা ছাড়া গ্রাম এখনো জেগে, মাঠের ভেতর দিয়ে দুচারটে লণ্ঠন এখনো চলে ফিরে বেড়াচ্ছে, ওদের গতিবিধিটাও একটু কমে আসুক।

অসহ্য দীর্ঘ মুহূর্তগুলো—অসহ্যতর প্রতীক্ষা। পরস্পরের নিশ্বাসে চমকে উঠছে সবাই। তালগাছের শুকনো পাতায় এক আধটু বাতাসের শব্দও মুহূর্তে হৃৎস্পন্দন থামিয়ে দিচ্ছে—যেন শুকনো পাতার ওপর পা ফেলে ফেলে হেঁটে আসছে কেউ। বুকের নীচে কাঁটার ঝোঁপটা হিংস্রভাবে আঘাত করছে প্রতিবাদের মতো। ওগুলো কি মশাল নাকি? মশাল জ্বেলে কারা কি এগিয়ে আসছে ওদের দিকে? না—না, আলেয়া।

—রেডি!

একটা চাবুকের মতো শব্দ এসে পড়ল তালগাছের নীচে জমাট ছায়াচ্ছন্নতাকে তাড়না করে। মুহূর্তে নিজেদের অস্ত্রগুলো গুছিয়ে নিয়ে নক্ষত্রবেগে উঠে দাঁড়ালো দলটা। উত্তেজনায় নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। হাঁ,—আলো নিবেছে ওপরতলার জানালাটায়।

—ওয়ান—টু—থ্রী—

সার বেঁধে দুপা এগিয়েছে সবাই, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই যেন পাথর হয়ে গেছে। চারদিকের স্তব্ধতা চকিতে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল বন্দুকের গম্ভীর কঠিন শব্দে।

—পুলিশ!

এক সঙ্গে সমবেত আর্তনাদ বেরুল: পুলিশ!

—দুম্—দুম্—

ওপার থেকে বন্দুকের সাড়া।

—বিট্রেয়াল!—সেণুদা গর্জন করে উঠলেন আহত জানোয়ারের মতো: রোহিণী।

—ঠাস্ ঠাস্—

এপার থেকে এদের রিভলভার জবাব দিলে। কিন্তু এ প্রতিদ্বন্দ্বিতা বৃথা। ওদের রাইফেল এদের অব্যর্থ সন্ধানে লক্ষ্যবেধ করতে পারবে, কিন্তু রিভলভারের রেঞ্জ্ দীঘির অর্ধেকও গিয়ে পৌঁছুবে না।

—ট্রুপ ডিস্পার্স—

কিন্তু পালাবে কোন্ পথে? এদিক থেকেও রাইফেল সাড়া দিয়েছে, আয়োজনের ত্রুটি রাখে নি কোথাও। একটা বজ্রকণ্ঠের আদেশ এল: Surrender!

—No surrender! Troop disperse—

রাইফেল আর রিভলভারের শব্দ—অমানুষিক কোলাহল। কয়েক মিনিটের মধ্যে যেন খণ্ড প্রলয় ঘটে যাচ্ছে। শরীরের রক্ত যেন আগুন হয়ে জ্বলছে। বিট্রেয়াল! বিশ্বাসঘাতকতা করেছে রোহিণীই। কিছুদিন থেকেই তার ওপর সন্দেহ জাগছিল. এতদিনে সন্দেহটা পরিণত হয়েছে নিশ্চিত প্রত্যয়ে।

—ট্রূপ্ ডিস্পার্স—

ছুট্ ছুট্। যে যেদিকে পারো। প্রাণ থাকতে ধরা দিয়োনা। বিদ্যুৎশিখার মতো বড় বড় টর্চের সন্ধানী আলোতে চোখ ঝলসে যাচ্ছে, বজ্রের মতো উঠছে রাইফেলের গর্জন। ছুট্ ছুট্। রঞ্জুর পেছনেই চাপা আর্তনাদ করে কে যেন পড়ে গেল। পড়ুক—থেমে দাঁড়িয়ো না। Let him die a hero's death!

রোহিণী! এই মুহূর্তে তাকে হাতে পাওয়া গেল বাঘের নখের মতো তার গলায় থাবা বসিয়ে সেটাকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলা যেত! বিট্রেয়ার! বিশ্বাসঘাতক! নরেন গোস্বামীদের কি মৃত্যু নেই?

ছুট্—ছুট্—ছুট্—

—We are lost friends - but we will win!

……রাত শেষ হয়ে আসছে। মরা মরা চাঁদের জ্যোৎস্না হেলে পড়েছে পশ্চিমে। বুক সমান উঁচু বিন্নাঘাসের বনের মধ্যে শান্তিতে শুয়ে আছেন বেণুদা। ম্লান জ্যোৎস্নায় অদ্ভুত শান্ত সে মুখ। হিংস্রতা নেই, উগ্রতা নেই—পরাধীনতার জ্বালা আর অপমান—সমস্ত নিবে গেছে! কালো পাথরে গড়া কঠোর শরীরে একটা আশ্চর্য কোমলতা ছড়িয়ে পড়েছে। রক্তে রাঙা হয়ে গেছে বিন্নাঘাস, কাঁধের পাশ দিয়ে এখনো গড়িয়ে পড়ছে রক্ত। আশ্চর্য, ওই রকম একটা মারাত্মক ক্ষত বয়েও কী করে একটা পথ তিনি ছুটে এসেছিলেন!

মৃত্যু। অবিনাশবাবুর মৃত্যু মনে আছে, এই আর একটা মৃত্যু দেখল রঞ্জু। ছিন্নমস্তা ভারতবর্ষের পায়ে আর একটি রুধিরাঞ্জলি। স্বাধীন হোক দেশ, স্বতন্ত্র হোক ভারতবর্ষ। এই মৃত্যু আর রক্তের মধ্য দিয়েই মুক্তির রাজরথ এগিয়ে আসুক।

দুঃখ নয়, শোকও নয়।

কী আশ্চর্য শান্তি মুখের ওপর ছড়িয়ে পড়েছে। বেণুদার অমনি প্রশান্ত কোমল মুখ কি আর একদিন দেখেছিল রঞ্জু? না, অন্ধকারে তা আচ্ছন্ন ছিল সেদিন?

"করুণাময় মাগি শরণ, দুর্গতি ভয় করহ হরণ
দাও দুঃখ বন্ধতরণ মুক্তির পরিচয়—"

মুক্তি এল। এল দুঃখ দুর্গতির অবসান। শেষ চন্দ্রের ক্ষীণ আলোয় পৃথিবী শান্তিতে ঘুমুচ্ছে। বেণুদাকেও ঘুমুতে দাও। বিশ্রাম করতে দাও সারাজীবন অশ্রান্ত বিপ্লবীকে।

নীরবে উঠে দাঁড়ালো ওরা তিনজন। রঞ্জু, পরিমল আর বিশ্বনাথ।

কোথায় যাব?

ঘরের বন্ধন ছিঁড়েছে। এবার নিরুদ্দেশ যাত্রা। তিনজনে তিন দিকে। যদি সুযোগ হয় পরশু গঙ্গাপুরের উপেন রাজবংশীর বাড়িতে মিলব আমরা। নইলে এখানেই শেষ দেখা, চিরদিনের মতো বিদায়।

বেণুদার ঘুমন্ত মুখের দিকে ওরা আর একবার তাকালো। তারপর ঘাসবন ভেঙে অন্ধের মতো তিনজনে হেঁটে চলল তিন দিকে। মাটির তলায় অন্ধকারে সুরু হল নতুন জীবনের আর এক অধ্যায়।

শুধু একটা জিনিস বাকী দুজনে টের পায়নি। দরকারী কাগজ আর অস্ত্রশস্ত্র সরাতে গিয়ে বেণুদার পকেটে রঞ্জু পেয়েছে একটা ছোট আংটি। কার আংটি সে জানে। কেন বেণুদা আজও ও আংটিটাকে বিক্রী করতে পারেননি তাও বুঝতে বাকী নেই আর।

বিপ্লবী শহীদের এই দুর্বলতাটুকু দেশ-জননী নিশ্চয় ক্ষমা করবেন—শান্তিতে ঘুমুক বেণুদা, ঘুমুক পরম আর নিশ্চিন্ত বিশ্রামে। রঞ্জু জেনেছে, কিন্তু এ আংটির খবর পৃথিবীর আর কেউ জানবে না—কেউ না!

আর যদি কোনোদিন পারে তবে এ আংটি সে ফিরিয়ে দেবে মৃত্তপাকে।

(ক্রমশ)

বিশ্ব ও বিশ্বনাথ

শ্রীআশুতোষ সান্যাল

কি মোহন মায়া দিয়া নিখিল সংসার
রেখেছ আচ্ছন্ন করি, হে প্রভু আমার
চিরলীলাময়! হায়, মনে ভাবি যত
তোমার সৃষ্টিরে ছাড়ি' এবার নিয়ত
তোমা পানে ফিরাইব মোহান্ধ হৃদয়—
তত যেন এ সংসার মন কেড়ে লয়
নবীন নাগরী সম! কেন এ সৃষ্টিরে
অনন্ত মাধুর্য্যে নাথ, রাখিয়াছ ঘিরে?
কেন বুলায়েছ চোখে এ মায়াকাজল?
চতুর্দ্দিকে স্নেহপ্রেম সৌন্দর্য্য উচ্ছল
হৃদয়, ইন্দ্রিয় মোর দিতেছে প্লাবিয়া—
করিছে বিহ্বল! তাই ভ্রান্ত এই হিয়া
কায়া ছাড়ি, ছুটিয়াছে ছায়ার পশ্চাতে,
বিশ্বেরে জেনেছে শুধু—ভুলি, বিশ্বনাথে!

'তথাপি সিংহ পশুদের রাজ'। 'পতি' শব্দের সঙ্গে যে আধিপত্যের ভাব জড়ানো তাহা আমরা কোনো কর্মচারীতে, তা সে তিনি যতই উচ্চ-পদস্থ হউক না কেন, আরোপ করিতে নারাজ। 'পাল' বা 'শাসক' প্রত্যয়টি কিসে অপ্রযুক্ত হইল? গভর্ণর ও প্রদেশপাল 'অধ্যক্ষ' উপাধির প্রয়োগ শিক্ষাসংক্রান্ত বিষয়েই সীমাবদ্ধ রাখা সমীচীন; অতিবিস্তৃতে ইহা অর্থহীন হইয়া পড়ে। শুধু অফিসের কর্তাকে 'অধ্যক্ষ' নামে অভিহিত করিলে উহার সঙ্গে যে নৈতিক নিয়ন্ত্রণের বাঁধন থাকে তাহার যথার্থ প্রয়োগ হয় না। যেখানে Commissioner এর নীচে আর কোনোও অধীনস্থ কর্মচারী থাকে না, যেমন (Commissioner for workmen's Compensation) সেখানে অধ্যক্ষ বলা চলে; তাহাকে 'শ্রমিক নিষ্ক্রয়-নির্ধারক' নাম দিলে হয়ত অভিধান গৌরব করে, কিন্তু কর্তব্যের সুষ্ঠুতর নির্দেশ দেওয়া হয়। সেইরূপ Agricultural Development Commissioner এর । ইহাঁর অধীনস্থ কর্মচারীর নাম তালিকায় দেখিলাম না। প্রতি শব্দ 'কৃষি নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থাপক' করিলে মনে হয় যেন ভালই শোনায়, 'কৃষিবর্ধন' কথাটি নিছু প্রয়োগ নহে বলিয়া ঠিক তাৎপর্যের অনুসরণ করে না।

তারপর 'Director' কথাটির প্রয়োগ বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। ইহাকে 'অধিকর্তা' শব্দে ভাষান্তরিত করা হইয়াছে। 'অধিকর্তা'র মধ্যে যেন 'overlordism' এর গন্ধ পাওয়া যায়। হয়ত সংসদ ইহাকে অধিকার পরিচালনার সক্রিয় শক্তি রূপেই প্রয়োগ করিয়াছেন, কিন্তু এইরূপ প্রয়োগ আমাদের পরিচিত নয়। Director এর প্রতিশব্দ রূপে 'নির্দেশক' বা 'নিয়ামক' শব্দটিই অধিকতর ভাবানুযায়ী বলিয়া মনে হয়। নিয়ামক 'Controller এর প্রতিশব্দরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহার অর্থ 'Director' হইতে ঈষৎ বিভিন্ন। 'Director' যদি নীতি নির্দেশ করেন, Controller অনেকটা অস্থায়ীভাবেই হউক, বা দৈনন্দিনরূপ-ভাবেই হউক নিয়ন্ত্রণ মাত্র করেন। এ ক্ষেত্রে 'Director'কে নির্দেশক বা নিয়ন্তা বলিয়া Controllerকে নিয়ন্ত্রক বলিলে উভয়ের কর্তব্যের পার্থক্যটুকু বজায় থাকে। 'Director of public Instruction or Director of public Health'কে শিক্ষা নির্দেশক ও স্বাস্থ্য-নির্দেশক বলা বেশ চলে। Director of Fire services'কে controller বলা অধিকতর সঙ্গত হইবে কি না, তাহা তাঁহার কর্তব্যের প্রকৃতি হইতে নির্ধারিত হইতে পারে। 'Director of health services ও 'Director of public health' এর মধ্যে দুইটি স্বতন্ত্র অভিধানের উপযোগী কোনো পার্থক্য আছে কিনা তাহা বিচার করিয়া উভয়কে এক নামে অভিহিত করা যাইতে পারে।

৭

এইবার কতকগুলি বিশেষ শব্দ লইয়া আলোচনা করিব। 'Assistant-in-charge'—'ভারপ্রাপ্ত সহায়ক' শব্দটি কেমন কেমন ঠেকে। এই Assistant কি কেরাণী না চতুর্থ পদাধিকারী? যদি কেরাণী হন, তবে সহায়ক পদটির অর্থ কি? তিনিও তাঁহার সাধারণ 'করণিক' নামেই অভিহিত হইতে পারেন। যদি তিনি কোনো অনু-বিভাগের কর্তা হন, তবে Head Assistant এর প্রতিশব্দ তাঁহার প্রতি 'প্রযোজ্য', অথবা তাঁহাকে 'ভার প্রাপ্ত করণিক' বলা যাইতে পারে। District Magistrate and Collector'কে শুধু জেলা-শাসক বলিলে ক্ষতি কি? তাঁহার রাজস্ব-সংক্রান্ত কর্তব্যটুকু না হয় একটু অন্তরালেই থাকিল। প্রজা সাধারণের চক্ষে তিনি রাজস্ব-সংগ্রাহকরূপে নন, শাসক-রূপেই প্রতিভাত হন। 'Commissioner of Excise'কে 'অন্ত-শুল্ক মহাধ্যক্ষ' বলা হইয়াছে—শুল্ক সংগ্রহের সঙ্গে অধ্যক্ষতার যোগসূত্র ঠিক স্বাভাবিক বলিয়া ঠেকে না। Collector of Excise'কে 'অন্তঃশুল্ক সংগ্রাহক' বলিয়া Commissioner এর প্রতি 'সমাহর্তা' প্রয়োগ করিলে বোধ হয় উভয়ের পদমর্যাদার তারতম্য ঠিক থাকে। Commercial manager এর ব্যাপার-নির্বাহক অভিধানের ফলে তাঁহার অর্থবিষয়ক দায়িত্বটুকু চাপা পড়িয়াছে—বরং তাঁহাকে অর্থব্যাপারিক বলিলে তাঁহার কর্তব্যের বৈশিষ্ট্যটুকু পরিস্ফুট হয়। Vagrancy র প্রতিশব্দ 'চক্রচর' কথাটি যে পরিমাণে আমাদের চিত্ত-সৌন্দর্যবোধের উদ্রেক করে, সে পরিমাণে অর্থস্ফূর্তি আনে না। 'ভবঘুরে' বা বাস্তুহীন একটি অভিধের দিক দিয়া সংস্কৃত না হইলেও অর্থবোধের দিক দিয়া বোধহয় শ্রেষ্ঠ। Caretaker, Overseer ও Electrical Overseer' এই তিনটি শব্দের বিভিন্ন প্রতিশব্দ দেওয়া হইয়াছে। অবশ্য Caretaker এর হয়ত কোনো বিশেষ গুণপনা না থাকিতে পারে—সুতরাং তাহাকে শুধু 'রক্ষক' বলিয়া আর দুইজনকে 'নির্দেশক' বলিলে অন্ততঃ একটি অতিরিক্ত পারিভাষিকের চাপ হইতে ভাষা বাঁচে। "Inspecting Overseer" এর প্রতিশব্দ 'পরিদর্শী উপদর্শক' 'পরিধি উপরে দর্শী' যদি কোনো পাঠককে স্মরণ করাইয়া দেয়। 'নিরীক্ষক' তথা 'উপদর্শক' বলিলে কি চলে না? Deputy Administrator general and official trustee এর কি অর্থ ঠিক বুঝি না; সুতরাং নাম বিশ্লেষিত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য এই পদটির বিশুদ্ধতা সম্পাদন সম্ভব কিনা তাহা ভাবিয়া দেখা উচিত। Deputy Director of Post and Telegraphs'কে ডাক তার-উপনিয়ামক ও Deputy Postmaster General সহকারী ডাকবর্তা নামে অভিহিত করিলে উভয়ের কর্তব্যের পার্থক্য সুপরিস্ফুট হইতে পারে। Deputy Provincial Transport Commissioner এর নামটি অযথা ভারাক্রান্ত করা হইয়াছে। প্রথমতঃ Commissioner এর কোনো সার্থকতা নাই, বরং controller প্রযোজ্যতর মনে হয়। দ্বিতীয়তঃ Provincial কথাটি যোগ না করিলেইবা ক্ষতি কি? সুতরাং পরিবহণ সংজ্ঞা যোগ করিলে প্রাদেশিক কর্তার আর বিশেষ পদমর্যাদা বিজ্ঞাপিত করিতে হইবে না। ইহাকে সুতরাং 'উপ-যান-নিয়ামক' বলিলে বুঝিবার কষ্ট হইবে না। Director of Fees ও Director of Employment (এরূপ চাকরী আছে নাকি?) ইহাদিগকে controller নামে অভিহিত করাই অধিক সঙ্গত। Director of Rationing ও controller of Rationing এর প্রতিশব্দ যথাক্রমে দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ নিয়ামক ও দ্রব্যনিয়ন্ত্রক বলা যাইতে পারে। এখানে

নীতি নির্ধারণ করিবেন, অপরজন নির্ধারিত নীতির ব্যবহারিক প্রয়োগ করিবেন।

এক্ষণে পুলিশ বিভাগের কয়েকটি পদের নামকরণ আলোচ্য। District Police Superintendent ও Deputy Superintendent of Police জেলা-পুলিশাধিনায়ক ও সহকারী জেলা-পুলিশাধিনায়ক শব্দদ্বয়ের দ্বারা নির্দেশিত হইতে পারে। অধিনায়ক শব্দটি পুলিশের আধা-সৈনিক প্রকৃতির সহিত খাপ খায়। Police Inspector ও Sub-Inspector of Police পদ দুইটির প্রতিশব্দ নির্বাচনে সংসদ হাঙ্গরের বিভ্রান্তিতে পতিত হইয়াছেন বলিয়া মনে হয়। Inspector অর্থে পরিদর্শক শব্দটিকে তাঁহারা সর্বত্র প্রয়োগ করিয়াছেন, কিন্তু ভুলিয়া গিয়াছেন যে ইঁহাদের কাজ পরিদর্শন নয়, অনুসন্ধান। আমি ইঁহাদের পুলিশ-আনুসন্ধানিক ও সহকারী আনুসন্ধানিক এইরূপ নামকরণের প্রস্তাব করিতেছি। আশা করি, আরক্ষা-পরিদর্শক ও অবর-আরক্ষা-পরিদর্শক অপেক্ষা এই বৈকল্পিক পদগুলি অধিকতর গ্রহণীয় হইবে।

Extra Assistant পদের প্রতিশব্দরূপে 'অতিরিক্ত' ব্যবহৃত হইয়াছে। এখন Additional এর পরিবর্তে অতিরিক্ত এর প্রয়োগ সুপরিচিত Extra Assistant খুব বিরল ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হইবে; পরন্তু Additional এর প্রয়োগ অনেক বেশী ব্যাপক। সুতরাং 'অপর' কথাটি Extra Assistant সম্বন্ধে প্রয়োগ করিয়া Additional এর 'অতিরিক্ত' সংজ্ঞা পুনর্গঠন করিলে লোকের অভ্যাসের উপর বেশী জুলুম করা হইবে না। House Surgeon ও Civil Surgeon এর এক যাত্রায় পৃথক ফল হইয়াছে; একজন কেবল চিকিৎসক ও অপরজন শল্য-চিকিৎসক সংজ্ঞাচিহ্নিত হইয়াছেন। উভয়ে এরূপ বিধান কি কোনোও বাধা আছে? Industrial Chemistকে হঠাৎ স্ত্রীলোকের ছদ্মবেশে সাজানোর কি প্রয়োজন হইল? "শিল্প-রাসায়নিক" বলিলে কি কিছু অপরাধ হইত? Instrument keeper এর সংজ্ঞা নির্দেশে 'সাধিত্র' কথাটি যেন একটু বেশ মাত্রায় পাণ্ডিত্য প্রকাশক মনে হয়। যন্ত্ররক্ষক বলিলে যদি Engineering বিভাগের সহিত কোনো যোগাযোগ নির্দেশক, তবে বন্ধনীর মধ্যে বিভাগ নির্দেশ করিলে সে প্রশ্নের অপনোদন হইতে পারে। Circle Officerকে মণ্ডলাধিকারিক না বলিয়া মাণ্ডলিক বলিলে অনেক সরকারী কালি ও কাগজ বাঁচিতে পারে। Labour Commissionerকে শ্রম-মহাধ্যক্ষ বলার কোনো যৌক্তিকতা নাই। শ্রমনীতি-বিধায়ক বা 'শ্রম-কল্যাণ-বিধায়ক' প্রয়োগ করিলে মহাধ্যক্ষের মহত্ত্বের অপপ্রয়োগ হয় না। একজন সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তি Assistant এর প্রতিশব্দরূপে 'সহ' এর প্রয়োগ সম্বন্ধে আপত্তি জানাইয়াছেন, 'সহ' শব্দ সম-মর্যাদাজ্ঞাপক, যথা সহাধ্যায়ী, সহকর্মী। পরিভাষায় কিন্তু ইহার মধ্যে অধীনত্ব সূচিত হইতেছে। Assistant অর্থে 'সহকারী' শব্দটিই শুদ্ধ। সহকে সহরূপে সহকারীর সংক্ষিপ্ত সংকেত বলিয়া গ্রহণ করিলে এই বৈয়াকরণিক আপত্তির নিরসন হইতে পারে। পরিভাষা সম্বন্ধে সংস্কৃতের প্রতি অতিমাত্রায় আনুগত্যশীল হইয়া সংস্কৃত প্রয়োগরীতি কেন উল্লঙ্ঘন করিয়াছেন বুঝিলাম না।

(৮)

আর বেশী দৃষ্টান্ত আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। অনেকগুলি প্রতিশব্দ ভালই হইয়াছে এবং সেগুলি গ্রহণ সম্বন্ধে কোন আপত্তি উঠিতে পারে না। কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গীর মূলনীতি পরিবর্তন করা দরকার। সমগ্র ভারতকে বুঝাইতে গিয়া নিজ-প্রদেশবাসীর বিভীষিকা উৎপাদন ও নিজের ভাষার অন্তঃপ্রকৃতিকে উৎকটভাবে উল্লঙ্ঘন করিলে, হিত অপেক্ষা অহিতই বেশী হইবে। 'ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর' —প্রেমের সাধনার এই নীতি বর্তমান যুগে ও অবস্থায় ঠিক প্রযোজ্য বলিয়া মনে হয় না। ঘর সামলাইয়া বাহিরের সঙ্গে যথাসম্ভব মিতালীতে কোন আপত্তি নাই।

উপসংহারে এইটুকু বলিতে চাই যে, পরিভাষা সংসদের সদস্যবৃন্দের পাণ্ডিত্য বা বিজ্ঞতার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করার আমার অনুমাত্র উদ্দেশ্য নাই। আমার মনে হয় যে এই পরিভাষা প্রণয়ন ব্যাপারে তাঁহাদের কর্তব্য সম্বন্ধে বিশেষভাবে সংকীর্ণ ধারণার জন্যই তাঁহাদের স্বাধীন ইচ্ছা সম্পূর্ণরূপে স্ফূর্তি পায় নাই। ঐরূপ ধারণার লৌহ-বন্ধনের মধ্যে তাঁহাদের মানস স্থিতিস্থাপকতা অনেকটা আড়ষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। অনুরূপ ধারণার বশবর্তী হইলে অপরেরও হয়ত সেই দুর্দশা হইত। অন্ততঃ আমি আমার নিজের সম্বন্ধে এই কথা বলিতে পারি। হরধনুতে জ্যা আরোপণ পরীক্ষায় অনেক ধনুর্ধরই ধরাশায়ী হইয়াছিলেন। বিশেষতঃ যদি এই ধনুককে বিপরীত দিকে বাঁকাইয়া তাহাতে গুণ-সংযোগ ধনুর্বেদ পারদর্শিতার পরীক্ষা বলিয়া বিবেচিত হয়। ধূলিশয্যানের সম্ভাবনা বহুগুণ বাড়িয়া যায়। তবে হয়ত এই কর্তব্য পালন যদি রসবোধ ও মাত্রাজ্ঞানের দ্বারা আর একটু লঘুভাবে নির্দিষ্ট হইত, তবে কোনো কোনো শব্দ সম্বন্ধে উৎকট অসঙ্গতি কিছু পরিমাণে হ্রাস পাইত। সংসদের সদস্যবৃন্দ তাঁহাদের পুস্তিকায় নূতন শব্দ সংকলনে সংস্কৃত সাহিত্যের অসাধারণ উপযোগিতা, ইহার অতুলনীয় শব্দৈশ্বর্যের কথা উল্লেখ করিয়া এই ভাষা-পিতামহীর অকুণ্ঠ গুণগান করিয়াছেন। আমি এবিষয়ে সম্পূর্ণভাবে তাঁহাদের সহিত একমত। কিন্তু বাংলা দেশে সংস্কৃতের চর্চা আজ যে কি শোচনীয় অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে, তাহা সংসদের শিক্ষাব্রতী সদস্যেরা নিশ্চয়ই জানেন। এমন কি তাঁহাদের মধ্যেও একজন কি দুইজন ছাড়া অন্যান্য সদস্য রীতিমত ভাবে সংস্কৃতের আলোচনার সুযোগ পাইয়াছেন কি না সন্দেহ। মনে হয় যে এই জ্ঞান লাভ না করিলে সংস্কৃতের এই অসাধারণ গুণগুলি তাঁহাদের নিকট অনাবিষ্কৃতই থাকিয়া যাইত। এইরূপ অবস্থায় সাধারণ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে যে পর্যন্ত সংস্কৃতবিদ্যা অনুশীলনের সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা অবলম্বিত না হয়, যে পর্যন্ত না তাঁহারা সংস্কৃতের রসগ্রহণ ও মহিমা উপলব্ধির যোগ্যতা অর্জন করেন, সে পর্যন্ত সদস্যগণের পাণ্ডিত্য ও অনুসন্ধিৎসা লোকমতের দ্বারা যথোপযুক্তরূপে অভিনন্দিত না হওয়াই স্বাভাবিক। শিক্ষিত সমাজের সমর্থন পাইলে ইহা ক্রমশঃ অর্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িয়া তাহাদের অভ্যস্ত হইয়া যাইত ও এই অভ্যাস ক্রমে এক প্রকারের অনুমোদনে পরিণতি লাভ করিত। তাঁহারা অসীম ধৈর্য ও শিল্পকৌশলের সহিত পরিভাষার যে রথ খানি প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহাকে চালু করিতে হইলে জনসাধারণের মানস সমর্থন-রূপ ঘোড়ার সহিত ইহাকে সংযুক্ত করিতে হইবে। এখানে ঘোড়া ও রথ দুইই আছে, কিন্তু তাহাদের সংযোগ স্থাপনে একটু গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। আর রথের গঠনে ত্রুটির জন্য যদি ঘোড়া ভড়কাইয়া উঠে, তবে অন্ততঃ যে পর্যন্ত ঘোড়া সায়েস্তা না হয় সে পর্যন্ত ইহাকে রাস্তা হইতে সরাইয়া মিউজিয়মের শান্ত, নিরাপদ বেষ্টনীর মধ্যে রাখার ব্যবস্থা করাই বিধেয়। পাণ্ডিত্যের জগন্নাথকে রাস্তা দিয়া টানিয়া লইয়া যাইবার উপযুক্ত ঘোড়া এখনও তৈয়ার হয় নাই বলিয়া মনে হইতেছে।

আকাশপথের যাত্রী

শ্রী সুষমা মিত্র

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

আমেরিকা যুক্তরাজ্যে দক্ষিণের ষ্টেটগুলিতে নিগ্রোই বেশী। সেখানে চাষের কাজে গতর খাটিয়ে এরা পুরুষানুক্রমে ধনী বণিকের অর্থ সঞ্চয়ে সহায়তা ক'রে আসছে। কিন্তু, তাদের নিজেদের ভালো রকম ভরণ-পোষণ তবুও চলে না, একটু বাসস্থানের সংস্থান হয় না। কথায় বলে—"Negro skins the land and the landlord skins the Negro" আজ অবশ্য আমেরিকার কাগজে কলমে নিগ্রোদের দাসত্ব আইন তুলে দিয়ে নাগরিকের অধিকার দেওয়া হয়েছে বটে, কিন্তু বস্তুতঃ তাদের কোন অধিকারই কোথাও দেখতে পাওয়া যায় না। রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে পদে পদে মনুষ্যত্বের অমর্য্যাদা। কুলি-মজুর ও দাস-দাসী শ্রেণীর লোক এরা। আমাদের দেশের হরিজনদের চেয়েও অস্পৃশ্য

উপসাগরের মাঝে ছোট্ট এই আলকাট্রাস দ্বীপে কয়েদীদের জেলখানা করা হয়েছে

হয়ে এরা বাস করছে। তা না হ'লে যে Paul Robeson এর গান শুনতে লক্ষ লক্ষ আমেরিকান সিনেমায় যায় সেই Paul Robeson এর নিজের প্রবেশ অধিকার সে সব সিনেমাতে নেই। যে Dr. Bois বিদ্যায় ও জ্ঞানে Bernard Shaw এবং Einstein এর চেয়ে কোন অংশে কম নন—তাঁরও নাকি Atlanta লাইব্রেরীতে প্রবেশাধিকার ছিল না। এই Dr. Bois হচ্ছেন Harvard University র Ph.D এবং বার্লিনপ্রমুখ আরো ৩টী ইউনিভারসিটির ডক্টর উপাধিপ্রাপ্ত। একই দেশের তথাকথিত স্বাধীন নাগরিক হয়েও এদেশের উচ্চশিক্ষিত সমাজের লোকেরা পর্য্যন্ত নিগ্রো সহকর্মীকে রাস্তায় দেখলে চিনতে চায় না, এমন কি পরিচয়ও অস্বীকার করে। Democracy র এমন চূড়ান্ত হাস্যকর দৃষ্টান্ত আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ।

আফ্রিকা হতে আমদানী করা এই হতভাগ্যের দল স্বদেশ ও স্বজাতির বন্ধন ভুলেছে; এদের অতীত মুছে গেছে; বর্ত্তমান এইরূপ নির্যাতন ও নৈরাশ্যপূর্ণ এবং ভবিষ্যতের পথও অজানা। এ যেন কোন দূর দেশের চারা গাছগুলি উৎপাটন করে তুলে এনে এক নূতন অসহায় পরিবেশের মাঝে অপরিচিত মাটিতে অযত্নে রোপন করা হয়েছে। অনন্ত দুঃখের মাঝে সুরু হয় এদের জীবনযাত্রা এবং শেষ হয় অসীম অবহেলার মধ্যে। জীবনের এ হেন সংগ্রামে পড়েও এরা নিজেদের শিক্ষার উন্নতির জন্য খুবই সচেষ্ট ও যত্নবান। এদের শিক্ষালয়গুলি সর্ব্বত্রই স্বতন্ত্র। অর্থাৎ শ্বেতাঙ্গ ছাত্রদের স্কুল কলেজে এদের প্রবেশাধিকার নেই। তথাপি শিক্ষাক্ষেত্রে এদের প্রতিভা যথেষ্ট দেখা যাচ্ছে। অধুনা এদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার আরো দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে, নিগ্রো গ্রেজুয়েটের সংখ্যা এখন প্রায় ৫৫০০০ হবে।

গত মহাযুদ্ধের পর নিগ্রো-জাতির অবস্থার কিছুটা পরিবর্ত্তন হয়েছে বটে, কিন্তু এখনও চাকরির ক্ষেত্রে এদের অধিকার সম্বন্ধে সরকারি মহল হ'তে খুবই সাবধান ও সতর্কতাপূর্ণ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়।

পথের মাঝে এই সব নানারকম চিন্তা করতে করতে চলেছি, হঠাৎ দেখি বাঁকা দিয়ে গাড়ী দাঁড়াল। উনি বল্লেন, নামতে হবে, Standford University পৌঁছে গেছি। নেমে দেখি Dr. Greulich ও তাঁর স্ত্রী আমাদের নিতে এসেছেন। পরস্পর আলাপ-পরিচয় হল, Mrs. Greulich গাড়ী চালিয়ে আমাদের University Town এ নিয়ে গেলেন। ডাক্তারের ল্যাবরেটরি রুমে বসে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করা গেল। পথশ্রমে খুকুকে ক্লান্ত দেখে ডাক্তার অতি সযত্নে তাকে তাঁর আরাম কেদারায় শুইয়ে দিলেন, গায়ে একটি কম্বল ঢেকে দিয়ে ও পরদা টেনে দিয়ে বল্লেন "Honey" "ঘুমাও।" এ দেশে ছোটদের আদর করে 'Darling' বলে না, বলে—"Honey"।

আমরা পৃথিবী পরিক্রমণে বেরিয়েছি শুনে তাঁরা দু'জনে উচ্চ সিত

হয়ে উঠলেন। কথা-প্রসঙ্গে Dr, Greulich বল্লেন, তাঁরাও দেশবিদেশে বেড়াতে ভালোবাসেন, শীঘ্রই কাজের জন্য তাঁদের জাপানে যেতে হবে। এ্যাটম বোমায় বিধ্বস্ত Hiroshimaর অবশিষ্ট জীবিত অধিবাসীদের দেহের অভ্যন্তরীণ অবস্থার পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে গবেষণা করতে যাচ্ছেন তিনি। সরকার মহল থেকে তাঁকে পাঠানো হচ্ছে।

বেলা ২টোর নিকটে একটি Charity Homeএ সবাই মিলে খেতে গেলাম। এটি একটি বিকলাঙ্গদের আশ্রম। কয়েকজন স্ত্রীলোক এই আশ্রম পরিচালনা করেন। তাঁরা স্বহস্তে আশ্রমের সকল কাজ ও রোগীর সেবা করে থাকেন। এই রেষ্টুরেণ্টে যা কিছু লাভ হয় সবই সেই অনাথ আতুরদের জন্য ব্যয় করা হয়। খাওয়ার শেষে Mrs. Greulich আমাকে ও স্কুলের University Town ঘুরে দেখাতে নিয়ে গেলেন। Standford University একটি ছোটখাট সহর বিশেষ। ছাত্র জীবনের সংগঠনের জন্য অতি সুচারুরূপে এই University Town তৈরী করা হয়েছে। ছাত্র জীবনকে সুস্থ সবল ও স্বাভাবিকভাবে গড়ে তোলার জন্য চেষ্টার কোন ত্রুটি করা হয়নি। শিক্ষক ছাত্রের সম্পর্ক এদের জীবনে শুধু ক্লাশে বা

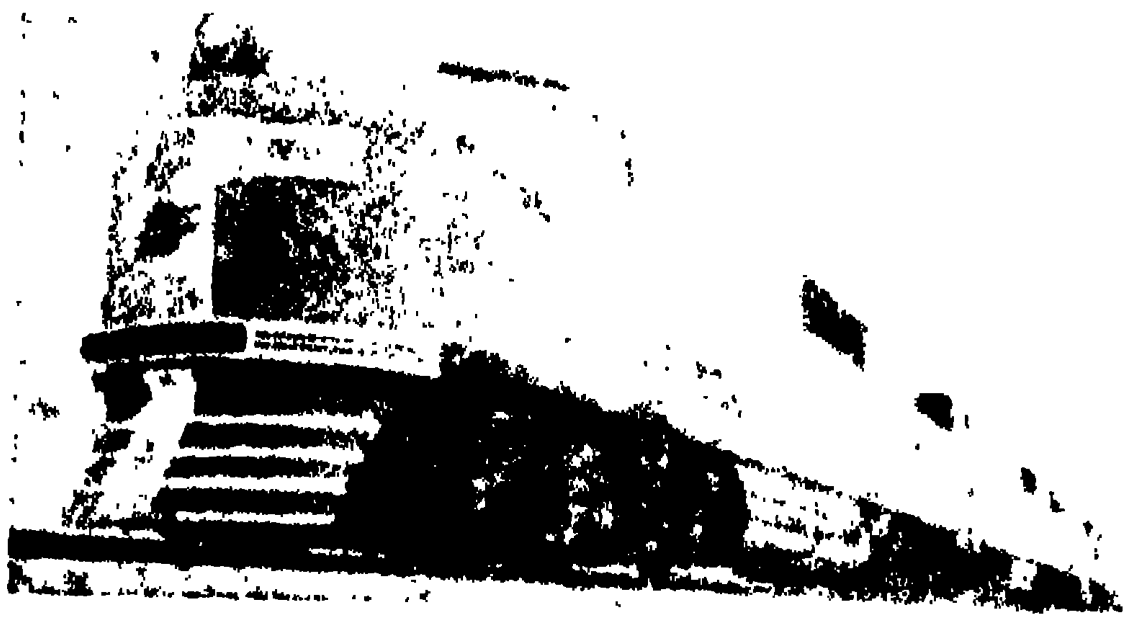

আমেরিকার ষ্ট্রীম লাইন ট্রেন

ল্যাবরেটারিতেই সীমাবদ্ধ নয়; দৈনন্দিন জীবনের মাঝে ছাত্রগণ শিক্ষকদের সাহচর্য্যে সত্যিকার মানুষ হবার বহু উপাদান ও সুযোগ পেয়ে থাকে। প্রচুর অর্থ ব্যয় করে এই University Townটি তৈরী হয়েছে। এই Standford Universityর একটি ছোট্ট কাহিনী আছে।

Mr. Standford ছিলেন একজন অতি সাধারণ মানুষ। তিনি সামান্য চাকুরী জীবন হতে আরম্ভ করে পরে ব্যবসায়ে কোটিপতি হয়েছিলেন। একবছর তাঁরা স্বামী স্ত্রী তাঁদের একটিমাত্র পুত্রসহ পৃথিবী ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। ঘুরতে ঘুরতে যখন তাঁরা ইটালীতে পৌছান, পুত্রটি রোগাক্রান্ত হয়ে অতি অল্পদিনের মধ্যেই সেইখানে মারা যায়। শোকে মূহ্যমান হয়ে মাতা পিতা স্বদেশে ফিরে যান। তাঁদের সেই একমাত্র পুত্রের স্মৃতি রক্ষার্থে আপন সঞ্চিত অর্থের অর্দ্ধেক দান করে এই Standford University তৈরী করেন। বাৎসল্যের যে দীপ নিভে গেছে তার জীবনকে প্রদীপ্ত করে তুললেন শত শত ছাত্রের জীবনের মধ্যে। সার্থক এ স্মৃতি! আমরা Townটি ঘুরে দেখলাম। সহর যেন মূক হয়ে কাজ করে চলেছে। এই নীরব নিস্তব্ধ পরিবেশের মাঝে এই রকম একটি আদর্শ বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলার যথার্থ যোগ্য স্থানই বটে। ঘুরতে ঘুরতে আমরা একটি সুদৃশ্য chapelএর সামনে এলাম। Mr Greulich গীর্জ্জা দেখতে নিয়ে গেলেন। গীর্জ্জাটির চারিদিকে সবুজ মাঠ ও মাঠের শেষে চার কোনায় চারিটি স্তম্ভ। গীর্জ্জার সামনে সারা দেওয়ালের গায়ে নানা রংএর ইটালিয়ান পাথর দিয়ে যীশুখৃষ্টের জীবনী আঁকা। ভিতরের হলটি অতি জাঁকজমকের সঙ্গে

সানফ্রানসিস্কোর Union Square. ইহার তলায় মাটির নীচে বহুশত গাড়ী রাখিবার গ্যারেজ রয়েছে

সাজানো, সুসজ্জিত বেদীর মধ্যভাগে দেওয়ালের গায়ে Last Supperএর ছবিখানি জীবন্তের মত ফুটে উঠেছে। উপরে Balconyর দু'ধারে বড় বড় পিতলের চোঙগুলি পিঁজরার চূড়ার মত ঠেকেছে, প্রার্থনাকালে অর্গ্যান বাজলে এই চোঙগুলির ভিতর দিয়ে সুরের ঝঙ্কার ওঠে। শুনলাম Mr Standfordএর মৃত্যুর পর তাঁর সহধর্ম্মিণী বাকি সমুদয় অর্থ দান করে স্বামীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে এই chapelটি প্রতিষ্ঠা করেছেন। স্বামী ও পুত্রের স্মৃতি মন্দিরে সর্ব্বস্ব দান করে Mrs. Standford নিজে তাঁর বাকি জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি এই গীর্জ্জায় বসে ভগবৎ আরাধনায় কাটিয়ে গেছেন।

আমরা ল্যাবরেটারিতে ফিরে গিয়ে দেখি তখনও Dr. Greulich ও উনি কাজে ব্যস্ত। একটু পরেই রওনা হওয়া গেল। আমাকে বাস-ষ্টেশনে তুলে দিয়ে Dr. ও Mrs. Greulich ফিরে গেলেন।

সানফ্রানসিস্কোর মাছ ধরিবার বন্দর

গোধূলির আলোয় মাঠের অপূর্ব্ব শোভা দেখতে দেখতে চলেছি, সাগর তীরে এসে দেখি—আকাশে তখন লাল রং ছড়িয়ে সূর্য্যদেব সাগর জলে ডুব দিচ্ছেন। অন্ধকারে আকাশ ঢেকে গেল, আমরা San Franciscoতে ফিরে এলাম। (ক্রমশঃ)

বাঙ্‌লার মঞ্চ ও চিত্র কোন পথে

অধ্যাপক শ্রীঅরুণ চক্রবর্তী এম-এ, বি-এল

"A nation is known by its stage"—বহুজন বহুভাবে এই একটি কথাই বলে গেছেন। এটি যে কত বড় সত্য, আজ্‌কার দেশ এবং মঞ্চ ও চিত্রের দিকে চাইলেই সে কথা বড় নিদারুণভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে হয়। ভগ্নহাল, ছিন্নপাল স্রোত-তাড়িত নৌকার মত ভারতবর্ষ আজ ভেসে চলেছে কোন অজানা অনির্দিষ্টের পানে. সকলের সামনে আছে বাংলা দেশ। তার sentiment তাকে এগিয়ে দিয়েছিল, তার sentiment তাকে পেছিয়ে দিয়েছে। তাই আঘাত যদি লাগে, তাকেই দিতে হবে আত্মবলিদান সকলের আগে। প্রস্তুতি নেই, চেষ্টা নেই, সংযম নেই—আছে শুধু গালভরা বক্তৃতা আর কথার তুবড়ি। জাতির আশাআকাঙ্খা, মঞ্চ আর চিত্রের ঠিক একই পরিণতি। 'অভাবনীয়' 'অনবদ্য' 'hit' ইত্যাদি বাঁধা বুকনীর অন্তরালে বিরাজ করে নিদারুণ ব্যর্থতা। সস্তার দেশপ্রেম আর দামের কচকচির চাটনী দিয়ে যে সমস্ত জিনিষ পরিবেশিত হয়, চিন্তাশীল তাতে ভীত হয়ে ওঠেন, জনসাধারণ বিরক্ত হন, ব্যাঙ্ক ফেল হয় এবং শেষকালে প্রযোজক হা-হুতাশ করেন; তবু বিরাম নেই এই একঘেয়েমির। কিন্তু এ হলে চলে না, চলবেও না। স্রোতের মুখে কুটির মত আমরা ভেসে যেতে পারি না—আজকের দিনে পারা সম্ভব নয়, উচিতও নয়। তাই বাধা দিতেই হবে।

চিত্র আর মঞ্চ কত তাড়াতাড়ি দেশকে গড়ে তুলতে পারে, তার উদাহরণ রাশিয়ার মস্কো আর্ট থিয়েটার। আর এই চিত্র আর মঞ্চ কত তাড়াতাড়ি যে দেশকে ধ্বংসের পথে নামিয়ে আনতে পারে, তার প্রমাণ আমাদের দেশের তথাকথিত নাটক ও ছায়াচিত্র, হলিউড-আগত কদর্য-রুচিপূর্ণ ছবিগুলি এবং তাদেরি অন্ধ এবং ব্যর্থ অনুকরণে তথাকথিত স্বদেশী হিন্দী ছবিগুলি।

আজকাল চিত্র ও মঞ্চের প্রত্যেকটি নাটকে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে দেশের কথা। এতে করে নায়ক-নায়িকার cheap romance-এর সংগে সেগুলি cheap stunt হয়ে গিয়ে রসিকজনের বিরক্তির উদ্রেক করে এবং যেটি সত্যিকারের সমস্যা—সমষ্টিগত এবং ব্যক্তিগতভাবে যে সমস্যা মানুষের জীবনকে ওতপ্রোত করে রেখেছে তার পরিস্ফুটনার মহাকল্পনা—কোথাও নেই। শুধু এইটিকে নিয়ে ছেলে ভুলাবার যন্ত্ররূপে ব্যবহার করা হচ্ছে। সমাজ-দর্শন, জীবনদর্শন, আত্মদর্শন—এ কথাগুলো শুধু কথা হিসেবেই ব্যবহার করা হচ্ছে, এদের নাম হয়েছে 'বুকনী'। কারণ যারা এগুলোর ব্যবহার করে, তাদের নিজেদের এগুলো সম্বন্ধে কোন সঠিক ধারণা নেই, তাই তাদের বক্তব্যও সুপরিস্ফুট হতে পারে না। "বাংলার মাটিতে যাই আসুক না কেন, তার একটা বিকৃতরূপ আপনা থেকে গড়ে উঠবেই"—এই বলেই হতাশ হয়ে একদল 'সিনিক' সেজে বসে থাকেন। বেশী realistic যাঁরা জোর করে এগিয়ে আসেন, তাঁরা নেতা হন। স্বার্থ তাঁদের প্রবল সবসময়ে, তাই দেশের কোন লাভ হয় না তাঁদের নেতৃত্বে। আর একদল উদাসীন—সাতেও নেই, পাঁচেও নেই; বড়-সাহেবের আমলের সুখের গল্পে এঁরা এখনও মাঝে মাঝে উৎসুক হয়ে ওঠেন, তাই কোনদিকে গঠনমূলক প্রচেষ্টা নেই বললেই হয়।

প্রায় দু'বছর হতে চলল, দেশ স্বাধীন হতে চলেছে। অথচ মানুষের শিক্ষার সবচেয়ে সার্থক medium বলে সারা পৃথিবীতে যার স্থান—সেই মঞ্চ ও চিত্রের দিকে কোন দৃষ্টি দেওয়া দরকার মনে করেন না। শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় এবং তার কর্তৃপক্ষগণ এ সম্বন্ধে কোন চিন্তা করেন না—হয় সামর্থ্য নেই, ক্লিকের জোরে গদী দখল করেছেন; আর না হয়, "ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াব কেন"—এমনি একটা আত্মকেন্দ্রিক মনোবৃত্তি নিয়ে তাঁরা বসে থাকেন; কোন কোন রঙ্গালয়ের কর্তৃপক্ষ চিত্র বা নাটকের-শুভ উদ্বোধনের সময় দেশনেতা বা বিশ্ববিদ্যালয়ের হোম্‌রাচোম্‌রাদের ধরে এনে সামনের আসনে বসিয়ে দেন। অর্ধেক দেখবার পর আভিজাত্য বজায় রেখে চলে যাবার সময় কর্তৃপক্ষের অনুরোধে

যা তা একটা মন রাখা কথা বলে যান ; আর কর্তৃপক্ষ তাই নিয়ে ঢাক পিটিয়ে বেড়ান। কারণ মাল তাঁরা যা তৈরী করেছেন তার ধারের সম্বন্ধে সন্দেহ আছে তাঁদের নিজেদেরই ; তাই ভার চাই। কাটাতেই হবে যে কোন প্রকারে। জবাব—ব্যবসার দিকটা আপনারা ভাবতে চান না—অর্থাৎ—প্রয়োজন টাকার ; ওটাই সবচেয়ে বড়, আর কিছুই নয়। অথচ টাকা হচ্ছে না, কারণ টাকা ও ভাবে হয় না—এটা তাঁরা বুঝতে চান না কিছুতেই বা চাটুকারের দল খোসামোদের চোটে বুঝতে দেয় না কিছুতেই। সমাজের যাঁরা পিতামাতা, সমাজের যাঁরা প্রতিষ্ঠাতা—তাঁরা এ সম্বন্ধে কোন চিন্তাই করেন না, একটা inferiority complex-এর reaction-এর দরুণ নিজেদের খুব উচ্চস্তরের লোক ভেবে নিয়ে তাঁরা এ ছেড়াক্সাটায় যোগ দিতে চান না। শিক্ষিত মার্জিত যে দুএকজন এ সম্বন্ধে খোঁজখবর রাখেন inflation money'র মোটা অঙ্কটাই তাঁদের চোখ ধাঁধিয়ে রাখে। তাই biggest medium of mass education এই চিত্র আর রঙ্গমঞ্চ প্রায়ই অক্ষম ফিকবাজ লোকের হাতে পড়ে মানুষের সামনে এমন বিসদৃশ জিনিষ পরিবেশন করে, যাতে তরুণ মনের ক্ষুধার সামগ্রী নেই—পরিণত মনের সান্ত্বনার চিহ্ন নেই। সাধারণ মানুষ হাহুতাশ করে, আর যারা তথাকথিত বড় হয়ে গেছেন, তাঁরা তাঁদের fossilised taste নিয়ে চুপচাপ বসে আছেন পরম বিজ্ঞের মত।

যে যুগটি এসেছে সেটি সত্যি বড় সাংঘাতিক। মানুষের মন এত বেশী analytical হয়ে পড়েছে, যে তার শান্তি নেই। কেউ নিজের অবস্থায় সুখী নয়, তাই অপরের দিকে যে দৃষ্টি নিয়ে সে তাকায়, তার মধ্যে অপমান, ঈর্ষা আর নীচতা ভর্তি হয়ে গেছে। মানুষ মানুষের সম্মান করে না, শ্রদ্ধা করে না ; টেক্কা দিয়ে চলাই যেন যুগের বিশিষ্টতা। উকিল ব্যারিষ্টার চোর, মাষ্টার প্রফেসার গরীব, ব্যবসাদার কালো-বাজারী, ছাত্র দুর্বিনীত, কেরাণী জগতের সম্বন্ধে নিম্ন ধারণা পোষণ করে, মজুর কৃপার পাত্র—এমন সব ধারণা মানুষের মনে ধীরে ধীরে বদ্ধমূল হতে চলেছে। জাতিকে ধ্বংসের পথে এনে দিতে এই ধারণার মত কার্যকরী হয়ত আর কিছুই নেই। এমন দিনে যে দেওয়া যেত, তা হচ্ছে চিত্র আর মঞ্চ। হাজার নেতার হাজার বক্তৃতা যা করতে পারে না, একটি মাত্র চিত্রে তা খুবই সম্ভব। আদর্শের publicity'র এত বড় medium কল্পনা করা যায় না। গল্পের মাদকতায় শ্রোতা বা দর্শককে মুগ্ধ করে সুবিধামত আদর্শের serum inject করবার মত এত কার্যকরী উপায় আর নেই। তাই এই চিত্র আর মঞ্চের উন্নতির যে কত বড় প্রয়োজন তার ঠিকানা নেই।

এতদিন হয়ে গেল, এখনও জাতীয় রঙ্গমঞ্চ তৈরী হল না। জাতীয় নাটক "কুলীনকুলসর্বস্ব" সমাজের বুকে আঘাত হেনে চিন্তার মোড় ফিরিয়ে দিল। জাতীয় নাটক "নীল দর্পণে" চাষার মুখ দিয়ে নাট্যকার যখন বললেন—মোরা জেলে পচে মরব, তবু গোরার নীলচাষ করব না—ধ্বংসোন্মুখ বাংলা নবজীবন ফিরে পেল, বিকারগ্রস্ত বাঙালীকে স্বপদে প্রতিষ্ঠিত করল বিল্বমঙ্গল, চৈতন্যলীলা, সিরাজদ্দৌলা, রাণাপ্রতাপ। অথচ আজ এমন দিনে যখন এই জাতীয় নাটকের বড় প্রয়োজন, জাতিকে বাঁচাতে যে হবে মৃতসঞ্জীবনী, হতমান ভিক্ষুকে পরিণত মানুষের বুকে যে আনবে আশার আলো, তরুণের বুকে যে দেবে অনুপ্রেরণা, সে জাতীয় নাটক রচিত হল না, জাতীয় নাট্য-মঞ্চও রচিত হ'ল না।

বাঙলার জলহাওয়ায়, বাঙলার ইতিহাসে আছে নাটকের বীজ ; তাই বাঙলা দেশে নাটকের প্রচলন অনেকদিনের কথা। নেপালে প্রাপ্ত নাটাবলী তার সাক্ষ্য প্রমাণ হয়ে আছে। তাই জাতির এত বড় সঙ্কটময় মুহূর্তে নাট্যকার সৃষ্টি হয়নি, এ কথা আমি বলতে পারি না। নাট্যকার আছে, হয়ত কোথায় নিভৃতে বসে নিজের সাধনা করে চলেছে। কিন্তু স্বার্থান্ধ যুগ নিজের স্বার্থের খাতিরে তাকে প্রতিষ্ঠিত হতে দিচ্ছে না। তাই সুধীবৃন্দ, যাঁরা সত্যিকারের দেশের মঙ্গল চান, তাদের করতে হবে জাতীয় নাট্যমঞ্চের প্রতিষ্ঠা। খুঁজে বের করতে হবে সেই মহানাট্যকারের দলকে। যে বাণী, যে সমস্যা মুমূর্ষু মানুষের মনের দ্বারে আঘাত দেয় অনবরত, মানুষ যত নীচে নামুক, একদিন না একদিন তারই লেখনী অবলম্বন

আজকের যুগে মঞ্চে ও চিত্রে যা পরিবেশিত হচ্ছে, তার খুঁটিনাটি বিচার করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু সমগ্রভাবে এই কথা বলা যায় এদের মাঝে সত্যিকার বড় ড্রামা কিছু নেই, যা মানুষকে ভাবায়, উদ্বুদ্ধ করে, চেতনা আনে; তাতে থাকে সস্তার romance আর sex stunt। এইভাবে exploitation of adolescence এই যদি নোতুন যুগের স্রষ্টাদের ধারণা হয়, এই অমৃতের নামে বিষ পরিবেশন যদি তাঁদের উদ্দেশ্য হয়, তাঁদের ধ্বংসেই আনন্দ। যে সুস্থ নাট্যপরিবেশনের মাঝে আছে এত possiblity, যা দিতে পারে কত কিছু, তাকে নিয়ে এই prostitution মনোবৃত্তি অমার্জনীয় অপরাধ। মহামানবের চরিত্রের carricature এ ধর্মপ্রাণ মানুষকে exploit করে পয়সা উপার্জন—এর চেয়ে জঘন্য অপরাধ; কারণ এ জাতীয় নাটকে সমাজ-মস্তিষ্ককে ধীরে ধীরে আরও বিকৃতির পথে আনা হয়, মানুষের মনুষ্যত্ব আহত হয়।

এই অপদার্থতা এবং অক্ষমতার বিরুদ্ধে সত্যকারের আঘাত হানতে হবে। হয়ত যারা তথাকথিত প্রযোজক, যুদ্ধের কালোবাজারস্ফীত হঠাৎ গজিয়ে ওঠা প্রযোজক, যারা মানুষকে exploit করে তাদের ব্যাঙ্কের মোটা অঙ্ক আরও মোটা করতে চায়, তাদের ক্ষতি একটু হবে। কিন্তু দেশের স্বার্থের দিকে চেয়ে তাদের উপর করুণা করে কোন লাভ নেই। সর্পদষ্ট অঙ্গুলি বেশীদিন দেহের সংগে লেগে থাকা দেহীর পক্ষে যুক্তিযুক্ত নয় এতটুকু।

ক্ষমা যেথা ক্ষীণ দুর্বলতা
হে রুদ্র, নিষ্ঠুর যেন হতে পারি তথা
তোমার আদেশে, যেন রসনায় মম
সত্য বাক্য ঝলি উঠে খরখড়্গ সম…

বাহির বিশ্ব

শ্রীঅতুল দত্ত

চীনের সঙ্কট

চীনে কম্যুনিষ্টদের বিশাল সামরিক সাফল্যে মার্শাল চিয়াং-এর আসন টলিয়া উঠিয়াছে। সমগ্র মাঞ্চুরিয়ায় এখন কম্যুনিষ্টদের নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত। পিপিং ও তিয়েনসিন অবরুদ্ধ। রাজধানী নানকিং-এর দ্বারবর্তী সুচাও পরিবেষ্টিত রাখিয়া কম্যুনিষ্ট বাহিনী বহু দূর অগ্রসর হইয়াছে। নানকিং-এর প্রত্যক্ষ বিপদ আসন্ন। ইয়াংসী নদীর তীরবর্তী এই নগরে এখন প্রতিরোধ-ব্যবস্থা রচিত হইতেছে। শত্রু-বাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটিগুলিকে চতুর্দিক হইতে পরিবেষ্টনের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন-সংযোগ করিবার পর পরবর্তী লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হওয়াই কম্যুনিষ্টদিগের রণনীতি। এই নীতি অনুসরণ করিয়া কম্যুনিষ্টরা এত দ্রুত অগ্রসর হয় যে, পশ্চাদ্বর্তী অবরুদ্ধ স্থানগুলিকে মুক্ত করা সরকারপক্ষের অসম্ভব হইয়া পড়ে।

চিয়াং গভর্ণমেণ্ট আরও সামরিক সাহায্যের জন্য আমেরিকার নিকট আকুল আবেদন জানাইয়াছেন। চীনের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষভাবে আলোচনা করিয়া আমেরিকা হইতে সাহায্য লাভের ব্যবস্থা করিবার উদ্দেশ্যে মাদাম চিয়াং কাই সেক্ আমেরিকায় গমন করেন। ট্রুম্যান্ গভর্ণমেণ্ট কিন্তু এই সময় চীন সম্পর্কে বেশ জাপান পরাজিত হইবার পর হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত চিয়াং গভর্ণমেণ্ট আমেরিকার নিকট হইতে নানাভাবে ৫শত কোটি ডলারের অধিক সাহায্য পাইয়াছেন। কিন্তু এই সাহায্যলব্ধ শক্তি সামরিক ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হয় নাই। ইহার কারণ চিয়াং গভর্ণমেণ্টের কুশাসন, সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে ব্যাপক দুর্নীতি এবং অর্থনৈতিক অব্যবস্থা হেতু জনসাধারণের দারুণ দুঃখ ও অসন্তোষ। কিছুকাল পূর্বে মার্কিণ পররাষ্ট্র সচিব মিঃ মার্শাল চীন পরিদর্শন করিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, কুয়োমিণ্টাং গভর্ণমেণ্টের আমূল সংস্কার না হইলে চীনে সাহায্য প্রেরণ বৃথা। বস্তুতঃ অনেক মার্কিণ সাহায্য যত না কম্যুনিষ্টদের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে, তত কম্যুনিষ্টরাই সরকারপক্ষের বিরুদ্ধে উহা প্রয়োগ করিয়াছে। এক একটি যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া কম্যুনিষ্টরা প্রচুর পরিমাণে মার্কিণ সমরোপকরণ হস্তগত করিয়াছে; সরকারপক্ষের দুর্নীতিপরায়ণ সামরিক কর্মচারীরা শত্রুপক্ষের নিকট অস্ত্রশস্ত্র বিক্রয় করিতেও ইতস্ততঃ করে নাই। দলে দলে সরকার পক্ষের সৈন্য বহু অস্ত্রশস্ত্র লইয়া কম্যুনিষ্টদের সহিত যোগ দেয়। আমেরিকার ডলারে চীনের জনসাধারণের দুঃখের বিন্দুমাত্র লাঘব হয় নাই। এই অর্থের অধিকাংশ অসাধু সরকারী কর্মচারী ও ব্যবসায়ীদের পকেটে গিয়াছে।

সহজে অভিভূত হওয়া স্বাভাবিক নহে। কিন্তু বর্তমান সামরিক অবস্থা সত্যই আশঙ্কাজনক। নানকিং-এর যদি পতন হয়, অথবা নানকিংকে অবরুদ্ধ রাখিয়া কমুনিষ্টবাহিনী যদি ইয়াংসী নদীর দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইতে পারে, তাহা হইলে সাংহাই, হ্যাংচাও প্রভৃতি উপকূলবর্তী নগরসহ সমগ্র দক্ষিণ-চীন বিপন্ন হইয়া পড়িবে। চিয়াং অথবা তাঁহার অন্য কোনও কুয়োমিণ্টাঙ্গী সহযোগী এশিয়াখণ্ড পরিত্যাগ করিয়া ফরমোজায় যাইয়া কুয়োমিণ্টাং পতাকা উড্ডীন রাখিতে বাধ্য হইবেন। কিন্তু এইভাবে কমুনিষ্টদের আধিপত্য বিস্তৃত হইতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কি নিরপেক্ষ থাকিবে? কমুনিষ্ট রুশিয়ার উদ্দেশ্যেই সমগ্র প্রশান্ত মহাসাগরে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ঘাঁটী প্রস্তুত হইতেছে। জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ার প্রতি তাহার এত আগ্রহও সোভিয়েট-বিরোধী ও কমুনিজম্-বিরোধী উদ্দেশ্যেই। বস্তুতঃ, সমগ্র জগতে কমুনিজম্ প্রসারে বাধা দিবার সর্ব্বপ্রধান দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র। সে কি চীনে কমুনিজমের এই প্রসারে শেষ পর্য্যন্ত উদাসীনই থাকিবে? ইহা কি সম্ভব?

আপাততঃ দৃষ্টিতে ট্রুম্যান গভর্ণমেণ্টের এই ঔদাসীন্য প্রকৃতপক্ষে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। কুয়োমিণ্টাং গভর্ণমেণ্টকে চরম নীতি স্বীকার করাইয়া চীনের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক ক্ষেত্রে তাঁহারা পূর্ণ কর্তৃত্ব চাহিতেছেন। বলা বাহুল্য, চিয়াং গভর্ণমেণ্ট এখন যে কোনও সর্ত্তে মার্কিণ সাহায্য গ্রহণ করিতে প্রস্তুত। ওয়াশিংটনস্থিত চীনা দূত ডাঃ ওয়েলিংটন্ কু প্রকাশ করিয়াছেন যে, "দুর্নীতি প্রতিরোধক" মার্কিণ নিয়ন্ত্রণ তাঁহারা মানিয়া লইতে প্রস্তুত। এই দুর্নীতি চীনের সর্ব্বক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত, সুতরাং মার্কিণ নিয়ন্ত্রণও হইবে সর্ব্বগ্রাসী। চিয়াং অথবা তাঁহার অন্য কোনও সহযোগী সম্পূর্ণরূপে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ক্রীড়নক হইয়াই শাসনকার্য্য চালাইবেন। এইভাবে আমেরিকা তাহার সর্ব্বাত্মক কর্তৃত্বে দক্ষিণ চীনে কমুনিষ্ট-বিরোধী পতাকা উড্ডীন রাখিতে সচেষ্ট হইবে। কমুনিষ্টদিগকে তাহাদের অধিকৃত অঞ্চল হইতে বিতাড়িত করিতে হইলে এখনই এই অঞ্চলে আমেরিকার পূর্ণাঙ্গ সামরিক অভিযানে প্রবৃত্ত হওয়া প্রয়োজন। সে অভিযান কেবল চীনেই সীমাবদ্ধ থাকিবে না। অতি সত্বর সারা পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হইয়া চরম বিধ্বংসী তৃতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইয়া যাইবে। আমেরিকা এখনই তত দূর অগ্রসর হইবার মত প্রস্তুত হয় নাই।

বর্তমানে চীনের গৃহ-যুদ্ধ যে অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তাহাতে চীন দুইভাগে বিভক্ত হইবারই সম্ভাবনা। নানকিং অধিকার করিতে পারিলেই কমুনিষ্টরা সেখানে পিপলস্ গভর্ণমেণ্ট করিবে। বস্তুতঃ কমুনিষ্টদের দ্বারা উত্তর চীনে পিপলস্ গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠার কথা বহু পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছে। আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে সোভিয়েট রুশিয়ার সহিত ইঙ্গ-মার্কিণ পক্ষের বিরোধ আরও প্রবল হইবামাত্র সোভিয়েট রুশিয়া ও তাহার অনুগত রাষ্ট্রগুলি এই পিপলস্ গভর্ণমেণ্টকেই চীনের প্রকৃত গভর্ণমেণ্ট বলিয়া স্বীকার করিয়া লইবে। এই সময় এক নূতন অবস্থার সৃষ্টি হওয়াও অসম্ভব নহে। বৃটেন্ চিয়াং গভর্ণমেণ্টের প্রতি সন্তুষ্ট নহে, চীনের কমুনিষ্টদিগকে খুব মারাত্মক বলিয়াও সে মনে করে না। কাজেই, কমুনিষ্টরা যদি সামরিক শক্তির বলে ও জনসাধারণের সমর্থনে চীনের অধিকাংশ অঞ্চলে তাহাদের রাজনৈতিক অধিকার প্রতিপন্ন করিতে পারে, তাহা হইলে তাহারা বৃটেনের সহানুভূতি পাইতে পারে।

বার্লিন-সমস্যা

পশ্চিম জার্ম্মাণীর নূতন মুদ্রা বার্লিনে প্রচলন করিবার পরই গত জুন মাসে সোভিয়েট রুশিয়া বার্লিনে যে অবরোধ আরম্ভ করে, সে অবরোধ এখনও চলিতেছে। বৃটেন্, ফ্রান্স ও আমেরিকার প্রতিনিধিরা মস্কোয় যাইয়া দীর্ঘকাল আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। চতুঃশক্তির নিয়ন্ত্রণে বার্লিনের মুদ্রা ব্যবস্থা সম্পর্কে একটা আপোষ মীমাংসাও হইয়াছিল। কিন্তু মিত্রপক্ষ এই জিদ্ ধরিয়া থাকেন যে, বার্লিনের অবরোধ পূর্ব্বে উত্তোলন করিতে হইবে, তাহার পরে চতুঃশক্তির নিয়ন্ত্রণে মুদ্রাব্যবস্থা প্রচলনের ব্যবস্থা হইবে। সোভিয়েট রুশিয়া শেষ পর্য্যন্ত এই প্রস্তাব করিয়াছিল যে, একই সময় অবরোধ উত্তোলনের ও মুদ্রা ব্যবস্থায় চতুঃশক্তির নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হউক। সে প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়। সোভিয়েট রুশিয়ার প্রতিবাদ উপেক্ষা করিয়া ইঙ্গ-মার্কিণ-ফরাসী পক্ষ হইতে প্রসঙ্গটি জাতিসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদে উত্থাপিত হইয়াছিল। সোভিয়েট প্রতিনিধির "ভেটো" প্রয়োগে এই পরিষদের পক্ষে কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব হয় নাই। অতঃপর এখন বার্লিন সম্পর্কে একটা আপোষ-মীমাংসার চেষ্টা আবার নূতন করিয়া হইতেছে। এই চেষ্টায় অগ্রণী হইয়াছেন আর্জ্জেণ্টিনার প্রতিনিধি ডাঃ ব্রামুগ্লিয়া। মিত্রপক্ষ নিরাপত্তা পরিষদে বার্লিন প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া ঠকিয়াছেন। এই পরিষদ যে সোভিয়েট রুশিয়াকে সায়েস্তা করিতে পারে না, ইহা তাঁহারা জানিতেন। তবু, তাঁহারা এই আশায় ঐ পরিষদের আশ্রয় লইয়াছিলেন যে, উহাতে সোভিয়েট-বিরোধী জনমত গঠিত হইতে পারিবে। কিন্তু সে আশাও পূর্ণ হয় নাই। বার্লিন সম্পর্কে সোভিয়েট রুশিয়ার দাবী যে অসঙ্গত নহে, ইহা স্বীকার করিয়া লইয়াই ডাঃ ব্রামুগ্লিয়া উভয়পক্ষের মধ্যে আপোষের চেষ্টা করিতেছেন।

বার্লিন সম্বন্ধে কোনও মীমাংসা হইলে সে মীমাংসা সাময়িক-ভাবেই হইবে; স্থায়ী মীমাংসা এখন আর সম্ভব নহে। বার্লিনের সমস্যাটি জার্ম্মাণীর ভবিষ্যৎ সংক্রান্ত প্রশ্নের সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট। সোভিয়েট রুশিয়া পোট্‌সড্যাম্ চুক্তির ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ জার্ম্মাণী চায়; পক্ষান্তরে, পশ্চিম জার্ম্মাণীকে স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের রূপ দিবার আয়োজন মিত্রপক্ষ প্রায় সমাধা করিয়া ফেলিয়াছে। বস্তুতঃ, ইউরোপ পুনর্গঠনের যে মার্কিণী পরিকল্পনা, তাহা পশ্চিম জার্ম্মাণীকেই কেন্দ্র করিয়া পরিচালিত হইবে। মিত্রপক্ষের এই আয়োজন বাতিল করিয়া ঐক্যবদ্ধ জার্ম্মাণী গঠনের ব্যবস্থা আর সম্ভব নহে। ইঙ্গ-মার্কিণ-ফরাসী কর্তৃত্বে পশ্চিম জার্ম্মাণী যদি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হয়, তাহা হইলে সোভিয়েট রুশিয়া তাহার এলেকায় অবস্থিত বার্লিনের একাংশে এই তিনটি শক্তির প্রভুত্বে বিঘ্ন উপস্থিত

করিবেই। বর্ত্তমান মুদ্রাব্যবস্থা সংক্রান্ত সমস্তার মীমাংসা হইলেও নূতন বিরোধের সূত্র খুঁজিয়া বাহির করিতে তাহার বিলম্ব হইবে না।

রুঢ়

আমেরিকার ইউরোপ পুনর্গঠনের পরিকল্পনাটি শ্রমশিল্পোন্নত রুঢ়সহ পশ্চিম জার্মানীকে কেন্দ্র করিয়া পরিচালিত হইবে—ইহাই আমেরিকার অভিপ্রায়। পরিকল্পনাটি সেইভাবে রচিত এবং সেইভাবে উহাকে কার্য্যকরী করিবার ব্যবস্থাও হইতেছে। সোভিয়েট এলেকার বহির্ভূত ইউরোপকে পুনর্গঠিত করিয়া সোভিয়েট-বিরোধী রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রাচীর রচনাই তাহার উদ্দেশ্য। কোনও বিশেষ দেশকে উন্নত করা, কোনও বিশেষ দেশের অর্থনীতিকে জাতীয় ভিত্তিতে গড়িয়া তোলা এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য নহে। ১৬টি দেশের (পশ্চিম জার্মানী লইয়া ১৭টি) অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে পশ্চিম জার্মানীর সহিত যুক্ত করিবার চেষ্টাই হইতেছে। এই জন্যই পশ্চিম জার্মানীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিল্পকেন্দ্র রুঢ়ে আন্তর্জ্জাতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য সোভিয়েট রুশিয়ার যে দাবী, এংলো-স্যাকসন শক্তি তাহাতে প্রবলভাবে আপত্তি করে। ফ্রান্সের বর্ত্তমান কর্তৃপক্ষ নিজ দেশের কম্যুনিষ্টদের জ্বালায় অস্থির; সুতরাং সোভিয়েট রুশিয়া সম্পর্কে তাঁহাদের বিরূপতা কম নহে। রুঢ়ে আন্তর্জ্জাতিক কর্তৃত্বের ব্যবস্থা হইলে সোভিয়েট রুশিয়াও যে সে কর্তৃত্বের অন্যতম অংশীদার হইবে, ইহা তাঁহারা জানেন। কিন্তু জার্মানীর সামরিক শক্তিতে পুনঃ পুনঃ নির্য্যাতিত ফরাসী জাতি সামরিক শক্তিসম্পন্ন জার্মানীর পুনরভ্যুত্থান সম্পর্কে অত্যন্ত আতঙ্কগ্রস্ত। এই জন্য ফ্রান্সের পক্ষ হইতেও রুঢ়ে আন্তর্জ্জাতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব আসিয়াছিল। এই প্রস্তাব তাহার শক্তিশালী মিত্ররা প্রত্যাখ্যান করে। অতঃপর ফ্রান্স প্রস্তাব করে যে, রুঢ়ের শ্রমশিল্পে ৬টি শক্তির পরিচালন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হউক এবং এই শ্রমশিল্পে উৎপন্ন পণ্য এই ৬শক্তি কর্তৃক বন্টনের ব্যবস্থা হউক। এংলো-স্যাক্‌শন পক্ষ এই প্রস্তাবও অগ্রাহ্য করেন। গত গ্রীষ্মকালে লণ্ডনে ৬শক্তির সম্মেলনে স্থির হয় যে, জার্মান শিল্পপতিরাই রুঢ়ের শ্রমশিল্প পরিচালনা করিবেন; কেবল পণ্য বন্টন-নিয়ন্ত্রণে ছয় শক্তির কর্তৃত্ব থাকিবে। ফরাসী জাতীয় পরিষদ তখন এই ব্যবস্থা অনুমোদন করিয়াছিলেন বটে; কিন্তু ফরাসী জাতির মনোভাব ইহার বিপক্ষেই ছিল। সম্প্রতি লণ্ডনে আর এক সম্মেলনে পূর্ব্ব সিদ্ধান্ত বলবৎ রাখা হইয়াছে। এবার মঃ দ্য গল পর্য্যন্ত ইহাতে প্রবল আপত্তি জানাইয়াছিলেন। সম্প্রতি ফরাসী জাতীয় পরিষদ বিপুল ভোটাধিক্যে রুঢ়ের কয়লা ও ইস্পাত শিল্পে জার্মান শিল্পপতিদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন।

রুঢ়ে জার্মান শিল্পপতিদের কর্তৃত্ব স্থাপনের এই ব্যবস্থায় পরোক্ষে আমেরিকারই কর্তৃত্ব স্থাপিত হইতেছে। পশ্চিম জার্মানী এখন মিত্রপক্ষের সামরিক অধিকারে; মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্রই এই পক্ষের নিরঙ্কুশ নেতা। নূতন ব্যবস্থায় রুঢ়ের শ্রমশিল্পগুলি প্রাচীন শিল্পপতি-সমবায়গুলির (combines) হাতে অর্পিত হইবে না। প্রাগ্‌যুদ্ধকালীন সমবায়গুলি ভাঙ্গিয়া দিয়া পশ্চিম জার্মানীর বর্ত্তমান কর্ত্তাদের নিযুক্ত ট্রাষ্টিদের হাতে শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি অর্পিত হইবে। শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির প্রকৃত মালিক স্থির করিবেন জার্মানীর ভবিষ্যৎ গভর্ণমেণ্ট। পশ্চিম জার্মানীর বর্ত্তমান কর্ত্তাদের তত্ত্বাবধানে গঠিত গণপরিষদে সেই গভর্ণমেণ্ট সম্পর্কিত শাসনতন্ত্র রচিত হইবে।

ইহা সুস্পষ্ট যে, দ্বিবিধ গভীর উদ্দেশ্য লইয়া রুঢ় সম্পর্কে বর্ত্তমান ব্যবস্থা করা হইতেছে। প্রথমতঃ আন্তর্জ্জাতিক কর্তৃত্বের ব্যবস্থা না করিয়া রুশ প্রভাবে শ্রমশিল্প জাতীয়-করণের দাবী উত্থিত হইবার পথ বন্ধ করা হইয়াছে। তাহার পর, পুরাতন শিল্পপতি সমবায়গুলি ভাঙ্গিয়া দিয়া অর্থনীতিক্ষেত্রে এংলো-স্যাক্‌শান্ শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে জার্মানীর পুনরুত্থানের পথও বন্ধ করা হইল। রুঢ়ের শ্রমশিল্পে আপাততঃ যে সব জার্মান ধনিক কর্তৃত্ব করিবে, তাহারা আমেরিকার অনুগত; ঐ সব শিল্পের মালিকানাও ভবিষ্যতে এই শ্রেণীর জার্মানদের উপর বর্ত্তাইবে।

বিশ্বরূপ

অধ্যাপক শ্রীবিভুরঞ্জন

দেয়ালে ফাটল ফুঁড়ি
ফুটিয়াছে এক জীর্ণ চারায়
একটি ফুলের কুঁড়ি।
শিকড় সমেত উপাড়ি তাহারে
হাতে তুলে ধরি' দেখি বারে বারে।
ছোট চারাগাছ, ছোট নীল ফুল
দুটি কচিপাতা, সরু সরু মূল।
এই তার পরিচয়?
ছোট ফুল, তুমি নও ছোট নও,
বিশ্বদেবের ছায়া তুমি হও।
তোমারে জানিলে বিশ্বেরে জানি
এক তারে বাঁধা সবি।
ছোটর মাঝারে বিশ্বভুবন
দেখে আপনার ছবি।

সংকলন

দেশের সর্বত্রই আজকাল শ্রমিক শ্রেণীকে এই শ্রেণীর সাধারণ ধর্মঘট পালনে উস্কানী দেওয়া হইতেছে। বর্তমানে এই জাতীয় ধর্মঘট পালনে কেবল জনসাধারণের অসুবিধা হইবে তাহা নহে, পরন্তু উহার ফলে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থাও অত্যন্ত খারাপ হইবে বলিয়া মনে হয়। শ্রমিক সম্প্রদায়েরও উহাতে কোন সুবিধা হইবে বলিয়া মনে হয় না। দেশের বর্তমান অবস্থায় উৎপাদন বৃদ্ধি যখন একান্ত প্রয়োজন, তখন এইরূপ ধর্মঘটের আহ্বান জাতীয় স্বার্থের কতখানি পরিপন্থী তাহা বলাই বাহুল্য। —নির্ণয়

* * *

দিল্লীতে অনুষ্ঠিত সমাজ-সেবা সম্মেলনের উদ্বোধন উপলক্ষে ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরু স্বাধীনতা অর্জনের কথা বলিতে গিয়া বলিয়াছেন, রাজনৈতিক স্বাধীনতাই স্বাধীনতার শেষ কথা নয়। পণ্ডিত নেহেরু সর্বত্রই এই কথা বারবার বলিতেছেন ইহার এক বিশেষ তাৎপর্য্য আছে। দেশের সর্বত্র আজ নানাসমস্যাকে উপলক্ষ করিয়া যে সকল প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে, রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে চরম জ্ঞান করাইতে তাহার সূচনা বলা যায়। সরকারী কর্মচারী হইতে আরম্ভ করিয়া কংগ্রেসকর্মী, জনসাধারণ সকলের মধ্যেই এই রাজনৈতিক স্বাধীনতার মোহ-বিভ্রান্তি অতি মাত্রায় প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। ইহাকে কোনক্রমেই সুলক্ষণ বলা যায় না। —নির্ণয়

* * *

ভূতপূর্ব জনসংভরণ মন্ত্রী শ্রীচারুচন্দ্র ভাণ্ডারী মহাশয় মন্ত্রিত্বের গদিতে বসিয়া বলিয়াছিলেন—নিয়ন্ত্রণ প্রথা তুলিয়া দিলে দেশের প্রভূত ক্ষতি হইবে। তখন মহাত্মাজী জীবিত ছিলেন। মহাত্মাজী নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া দিবার পক্ষপাতী হইলেও গান্ধী-পন্থী ভাণ্ডারী মহাশয় আই. সি. এস প্রভাবে এবং মন্ত্রিত্বের খাতিরে গান্ধীজীর মতের বিরোধিতা করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। হঠাৎ ভাণ্ডারী মহাশয়কে নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া দিবার পক্ষপাতী দেখিয়া বিস্মিত হইতেছি। তবে কি ইহা—"বদলে গেল মতটা, ছেড়ে দিলাম পথটা।" —বর্ধমান

* * *

পূর্বের সভাপতিগণের অভিভাষণের ধারা ও প্রথা অনুযায়ী নয়। ডাঃ সীতারামিয়া তাঁহার নিজস্ব মনোভাব ও ধারা অনুসারে ও ভারতে অবস্থা পরিবর্তনের জন্য কেবল সমালোচকের ও ইতিবৃত্ত লেখকের ভূমিকাই গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি যে সকল বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন, তাহা বিবিধ তথ্যে পূর্ণ ও অনেকেরই কাজে লাগিবে। বর্তমানে কংগ্রেসকে পুরোহিত, উপদেষ্টা বা সমরাভিযান-পরিচালক হইতে হইবে না। কংগ্রেস যদি শাসনকারী কর্তৃপক্ষ ও জনগণের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করিতে পারে, তাহা হইলেই তাহা জনগণের কৃতজ্ঞতা অর্জন করিবে। —নেশন

* * *

মহীশূরের ভূতপূর্ব দেওয়ান এবং ভারতের একজন শ্রেষ্ঠ ইঞ্জিনীয়ার স্যার এম বিশ্বেশ্বরাইয়া এবার মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে যে অভিভাষণ দিয়াছেন—ভারতের কল্যাণ যাঁহারা আন্তরিকতার সহিত কামনা করেন প্রত্যেকেরই সেইটি বার বার পড়িয়া দেখা কর্তব্য। দেশে উৎপাদন বৃদ্ধির উপায় স্বরূপ তিনি বলিয়াছেন কর্মীগণকে কঠিনপরিশ্রমে অভ্যস্ত হইতে হইবে, কাজের সময় working hours বাড়াইতে হইবে এবং দক্ষতার সহিত কাজ করিতে শিখিতে হইবে। আমেরিকার শ্রমিকেরা এইভাবেই উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া, দেশকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে, ভারতকেও সেই পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে! কঠিন পরিশ্রম করিলে স্বাস্থ্য নষ্ট হয় এই ভ্রান্ত ধারণা দূর করিবার জন্য তিনি আমেরিকার দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। আমেরিকায় স্ত্রীলোকের গড় পরমায়ু হইতেছে ৬৩ বৎসর এবং পুরুষের ৬২ বৎসর। আর ভারতে গড় পরমায়ু হইতেছে ২৮ বৎসর। অর্থাৎ কঠিন পরিশ্রম করিয়াও আমেরিকার লোকের পরমায়ু ভারতবাসীর পরমায়ু অপেক্ষা দ্বিগুণ অধিক। উপনিষদের ঋষিরা নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন।

শ্লোকটা এই :—

কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ

অর্থাৎ কাজ করিতে করিতেই একশত বৎসর বাঁচিতে চাহিবে। —সারথি

* * *

গত ১৫ই ডিসেম্বর ইঞ্জিনিয়ারিং এসোসিয়েশন অব ইণ্ডিয়ার পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশনে এসোসিয়েশনের সভাপতি শ্রীবিনয়কৃষ্ণ রোহাটগীর শ্রমিক ও শ্রমিক নেতাদের প্রতি তীব্র কটাক্ষ এবং গভর্ণমেণ্টের শিল্পনীতির সমালোচনার প্রত্যুত্তরে ভারত সরকারের শিল্প ও সরবরাহ সচিব ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় যে উক্তি করিয়াছেন তাহার জন্য তাঁহাকে অভিনন্দিত করিতেছি। আশাকরি ডাঃ মুখার্জীর উক্তিতে শিল্পপতিরা কিঞ্চিৎ সংযত হইবে। কারণ ডাঃ মুখার্জী তাঁহাদিগকে স্পষ্ট ভাবেই জানাইয়া দিয়াছেন যে, দেশের অগ্রগতি কাহারও অপেক্ষায় বসিয়া থাকিবে না এবং তাহাদের বা অন্যান্যের (ধনিকদের) সাহায্যে যদি দেশের উন্নতি সাধিত না হয় তাহা হইলে পুঁজিবাদী অর্থনীতির অবসান ঘটিবে ও নূতন প্রথার অবতারণা হইবে।

শ্রমিকদের সম্পর্কেও শিল্পপতিদিগকে সতর্ক হইতে বলিয়া ডাঃ মুখার্জী বলিয়াছেন "আপনারা কি ইহা চান যে, যখন তখন পুলিশ বা সৈন্যবাহিনী ডাকিয়া সরকার শ্রমিককে সায়েস্তা করিবেন? শ্রমিককে

সন্তুষ্ট করার দায়িত্ব মালিকের। শ্রমিকদের গুলি করা যাইতে পারে, কিন্তু কাজ করান যাইবে কি? সুতরাং এ ক্ষেত্রে অন্যভাবে অগ্রসর হইতে হইবে। বস্তুতঃ এই শ্রমিকেরা তাঁহাদেরই আত্মীয়স্বজন, ভাই-ভগ্নী, তাঁহাদেরই দেশবাসী—এ কথা বিস্মৃত হইলে চলিবে না এবং ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে আমরা মুষ্টিমেয় কয়েকজনই কেবল মাত্র লক্ষ্মীর বরপুত্র হিসাবে জন্মগ্রহণ করিয়াছি।" ডাঃ মুখার্জীর এই দৃঢ়তা ব্যঞ্জক উক্তিতে শিল্পপতিদের চৈতন্যোদয় হইবে কি?

—সংগঠনী

* * *

আমাদের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক দপ্তরখানাগুলিতে সম্প্রতি যাঁহারা ক্ষমতার আসনে আসীন হইয়াছেন পদের মাদকতা তাঁহাদের মধ্যে অনেককেই পাইয়া বসিয়াছে। কয়েক বৎসর পূর্বে আমাকে গান্ধীজী যে কথা বলিয়াছিলেন এই প্রসঙ্গে আমি তাহার পুনরুল্লেখ করিতে চাই। ১৯৪০ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারী তারিখ। গান্ধীজী তখন দুইদিনের জন্য শান্তিনিকেতনে আসিয়াছেন। সন্ধ্যায় তিনি যখন যথারীতি ভ্রমণে বাহির হন তখন তাঁহার সহিত থাকিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ 'শ্যামলী'তে তাঁহার থাকিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। আমরা 'শ্যামলী'তে ফিরিবামাত্র সান্ধ্য প্রার্থনাসভার জন্য প্রস্তুত হইয়া তিনি অকস্মাৎ বলিলেন, "মন্ত্রিত্বগ্রহণের ফলে আমাদের ভাল ভাল কর্মীদের মধ্যে এতজনের নৈতিক অধঃপতন ঘটিবে জানিলে আমি কখনও এই পরামর্শ দিতাম না।" আমি তাঁহার মুখের আকৃতি লক্ষ্য করিলাম। প্রচণ্ড অন্তর্দাহে সেই মুখ কঠিন হইয়া গিয়াছিল।

—হরিজন পত্রিকা

* *

বহরমপুরে গত ১৯শে ডিসেম্বর মুর্শিদাবাদ জিলার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক সম্মিলনে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি-সচিব শ্রীযাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা এই প্রদেশে শিক্ষাপদ্ধতির পরিবর্তন প্রয়োজন—এই মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি বলেন, আজ যখন অন্ন-বস্ত্রের সমস্যা সর্বাপেক্ষা প্রবল সমস্যা, তখন যে শিক্ষায় তাহার সমাধান হইতে পারে, ছাত্রদিগকে সেই শিক্ষা প্রদান করা সর্বপ্রথম প্রয়োজন। কিন্তু কিরূপে তাহা হইবে, তাহা তিনি বলেন নাই। সেদিনও শিক্ষা-সচিব দুঃখ করিয়াছেন, পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষার জন্য যে অর্থ বরাদ্দ হয়, তাহাতে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে না। কিন্তু যতদিন সরকারী দপ্তরের ব্যয়বাহুল্য দূর করা না হইবে, ততদিন অর্থাভাব ঘুচিবে না। —দেশ

* *

পুঁজিপতিদের গুদামে মাল ধরে রাখার কারসাজি আর চোরা-কারবারীদের বেপরোয়া উৎপাত আজ পনেরো মাসের মধ্যেও কংগ্রেস গভর্ণমেণ্ট কোনও রকমেই বন্ধ করতে পারছে না। এটাকে জনসাধারণও তাদের অক্ষমতা বলে মেনে নিতে পারছে না। বরং এটাকে তারা কংগ্রেসের স্বেচ্ছাকৃত ঔদাসীন্য অথবা শাসনের অযোগ্যতা বলেই মনে করছে এবং কংগ্রেসকে 'পুঁজিবাদী সরকার' বলে অপবাদ দিচ্ছে। জনসাধারণের সমর্থন ও সহানুভূতি থেকে কংগ্রেস তাই ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছে এবং সোভিয়েট আদর্শে পরিচালিত সাম্যবাদীর দল এই সুযোগে অনায়াসে তাদের প্রভাব বিস্তার করছে। কমিউনিষ্ট দমন নীতি বা নিরাপত্তা আইন পাশ করিয়ে যেমন এই সাম্যবাদী বন্যা রোধ করা যাবে না, তেমনি কণ্ট্রোল চালু করেও পুঁজিপতিদের কালোবাজারী উৎপাত দমন করা যাবে না। জনসাধারণের দুঃখ দুর্দশা দূর করতে পারলেই আমাদের বিশ্বাস সাম্যবাদী শিবির শূন্য হয়ে যাবে। কারণ সাধারণতঃ এদেশের জনসাধারণ শান্তিপ্রিয়। তারা পেট ভরে খেতে পরতে পেলে সরকারের বিরুদ্ধে কোনও সংঘর্ষে যোগ দিতে চাইবে না। জলের কল বন্ধ করা বা টেলিফোন এক্সচেঞ্জ ধ্বংস করা মুষ্টিমেয় দুষ্কৃতিকারীর দুর্বুদ্ধিপ্রসূত ষড়যন্ত্রের ফলেই ঘটছে একথা হয়ত ঠিক, কিন্তু এর পশ্চাতে রয়েছে কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে দলবিশেষের দীর্ঘ-সঞ্চিত আক্রোশ! কমিউনিষ্ট-দমন-নীতির প্রতিশোধ বা প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি থেকেই তারা কংগ্রেস সরকারকে আঘাত করে তাদের বিপন্ন ও অচল করে তোলবার চেষ্টা করছে। এই দেশদ্রোহিতা ও বিশ্বাসঘাতকতা বন্ধ করতে হলে শ্রমিকদের সম্বন্ধে উদারনীতি অবলম্বনে ওদের পশ্চাতের প্ররোচনাকারীদের দুর্বল করে ফেলা দরকার। দুঃখ কষ্ট থেকে মুক্তি পেলেই মানুষ শান্ত হয়ে থাকে। ক্রমাগত অভাবের তাড়নায় উত্যক্ত হলেই মানুষ মরিয়া হয়ে ওঠে এবং এই ধরণের সব সাঙ্ঘাতিক হিংস্র কার্য করতেও পশ্চাদপদ হয় না।

—পাঠশালা

* *

গত এক মাসের মধ্যে ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে একাধিক ভারতীয় জননায়ক ও শিক্ষাবিদ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদের উপদেশ দিয়াছেন। তাঁহাদের কথা মূলতঃ এক—স্বাধীন ভারতের নূতন পরিস্থিতিতে ছাত্রগণের নূতন কর্তব্যবোধ জাগরিত করিতে হইবে। স্বাধীন নাগরিকের গুরুতর দায়িত্ব বহন করিবার উপযোগী চরিত্র ও মনোভাব গঠন করিতে হইবে। আমরা এই উপদেশ সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করি। সত্যই আজ দেশের ছাত্রগণের নিকট এক মহৎ কর্তব্যের আহ্বান আসিয়াছে। সেই কর্তব্য পালনে তাহাদের সাহায্য করিবার জন্য শিক্ষা ও সংস্কারে আমূল পরিবর্তন আবশ্যক। দেশ যতদিন বিদেশীয় শাসকের করতলগত ছিল তখন যে সকল চিন্তা ও কার্য্য প্রয়োজনীয়, এমন কি প্রশংসনীয় বলিয়া মনে হইত আজ তাহা বর্জন করিয়া এক নূতন রাষ্ট্রচেতনা জাগাইয়া তুলিতে হইবে। সেই রাষ্ট্রচেতনার বিশেষত্ব হইবে প্রতিকূলতা নহে—সহযোগিতা, বিদ্রোহের ব্যাকুলতা নহে, ধৈর্য্যের সহিত সুদিনের জন্য অপেক্ষা। বর্তমানের দুঃখকষ্টের অন্ধকারের মধ্যে ভবিষ্যতের উজ্জ্বল আলোকের প্রতীক্ষায় আজ নাগরিকগণকে সকল কর্তব্য সম্পন্ন করিয়া যাইতে হইবে।

—শিক্ষক

* *

গণপরিষদ গৃহে ভারতের রাষ্ট্রপাল শ্রীচক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণাধীন শ্রমিক বীমা কর্পোরেশনের উদ্বোধন করেন। রাষ্ট্র-

পরিচালিত এই বীমা পরিকল্পনা শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তা আয়ত্ত করার পথে প্রথম পাদক্ষেপ স্বরূপ। এই সম্ভাবনাপূর্ণ পরিকল্পনাটি কেবল যে ভারত সরকারের মনোভাবের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া রচিত হইয়াছে, তাহা নহে,—উপরন্তু সমগ্র এশিয়ার মধ্যে এই জাতীয় পরিকল্পনা এই প্রথম। শ্রমিক বীমা কর্পোরেশনের উদ্বোধন প্রসঙ্গে ভারত সরকারের শ্রম-সচিব মাননীয় জগজীবন রাম বলেন যে, "সামাজিক নিরাপত্তা যে কেবল একান্তভাবে কাম্য, তাহা নহে, ইহা একটি অতীব জরুরী জাতীয় সমস্যা। বর্ত্তমান পরিকল্পনাটিতে শ্রমিকদের যাবতীয় ঝুঁকি বহিবার ব্যবস্থা করা হয় নাই—এমন কি, ইহাতে সকলের স্থানও করা যায় নাই। সুসংগঠিত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের স্বাস্থ্য, বীমা ও চিকিৎসা সাহায্যই প্রধান সমস্যা, এই সমস্যা সর্ব্বাগ্রে দূর করিতে হইবে। আজিকার এই সামান্য সূত্রপাত ভবিষ্যতে বিরাটাকার ধারণ করিবে।

—আর্থিক বাংলা

যানবাহনের সুব্যবস্থা না থাকার ফলে পল্লীগ্রামের অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। রাস্তাঘাটের সংস্কার করিয়া যাহাতে যানবাহনের সুব্যবস্থা হয় তাহার ব্যবস্থা করা আমাদের সরকারের কর্ত্তব্য। অত্যধিক ভিড়ের চাপে সহরের আবহাওয়া দূষিত হইতে চলিয়াছে। যানবাহনের সুব্যবস্থা ও সহরের সুখসুবিধার ব্যবস্থা করিয়া দেশের প্রাণকেন্দ্র পল্লীগ্রামকে বাঁচাইতে ও দূষিত আবহাওয়া হইতে সহরকে রক্ষা করিবার কার্য্যে আর বিলম্ব না করিলেই ভাল হয়।

—সমাধান

"সংস্কৃত ভাষা ব্যতীত ভারতের রাষ্ট্রভাষা হইবার যোগ্যতা অন্য কোন ভাষার নাই। কোন প্রাদেশিক ভাষার সংস্কৃত ভাষার ন্যায় বহুল প্রচারও নাই। ভারতবর্ষের এমন একটি গ্রাম নাই, যেখানে অন্ততঃ ৪।৫ জন লোকও সংস্কৃত জানে না।" চন্দননগর প্রবর্ত্তক আশ্রমে অখিল ভারত দেবভাষা পরিষদ সম্মেলনের ১৭শ বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত চিন্নস্বামী শাস্ত্রী মহোদয় সভাপতির অভিভাষণ প্রসঙ্গে উক্তরূপ অভিমত ব্যক্ত করেন। প্রমাণ ও যুক্তি দ্বারা তিনি ইহাও জ্ঞাপন করেন যে, সংস্কৃত ভাষা বিশাল ভারতের কেবলমাত্র রাষ্ট্রভাষা নহে; পরন্তু বৈদেশিক দেশ-সমূহের সহিত সম্বন্ধ ও সম্পর্ক রক্ষার ব্যবস্থাদিও অতীতে সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে হইত। ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে।

—নবসংঘ

বৃটিশ শাসনকে উন্মূলিত করিয়া কংগ্রেস আপনার শক্তির বিপুলতাকে প্রমাণিত করিয়াছে, কিন্তু স্বরাজ আমরা এখনও অর্জ্জন করিতে পারি নাই। এই কঠিন সত্যকে অন্তরের মধ্যে উপলব্ধি করা প্রয়োজন। ভারতের সাতলক্ষ গ্রাম যে তিমিরে ছিল এখনও সেই তিমিরেই আছে। আমরা যদি মনে করিয়া থাকি গভর্ণমেন্ট যখন কংগ্রেসের, তখন আর চিন্তা কি—তবে ভুল করিব। ক্ষমতার একটা দুর্জ্জয় মোহ আছে। ক্ষমতার অপব্যবহার হওয়াও অস্বাভাবিক নহে। কংগ্রেস গবর্ণমেন্টের হাতে এখন শাসনদণ্ড। শাসনক্ষমতার অপব্যবহার হইলে নিপীড়িত জনগণের আশ্রয় কোথায়? আশ্রয়—কংগ্রেস। কংগ্রেস জনগণের মনে রাষ্ট্রচৈতন্য উদ্বুদ্ধ করিবে, গঠনমূলক কাজের মধ্য দিয়া শতধাবিচ্ছিন্ন জনসাধারণকে এক সূত্রে বাঁধিবে। অত্যাচার হইলে অত্যাচারের কথা কর্ত্তৃপক্ষের গোচরে আনিবে ও সেই অত্যাচারের যাহাতে প্রতিকার হয় তাহার জন্য স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল আলোড়িত করিয়া তুলিবে।

—লোকসেবক

সর্ব্বোদয় প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করিতে গিয়া বড় দুঃখেই আচার্য্য বিনোবা ভাবে বলিয়াছেন, "কংগ্রেসকর্ম্মীরা পূর্ব্বেকার ত্যাগকে মূলধন করিয়া নিজের নিজের কাজ গুছাইয়া লইতেছে। তাহাদের মধ্যে নূতন ধরণের ত্যাগের কোন প্রেরণা দেখা যাইতেছে না। কংগ্রেসের মধ্যে আজ সত্যের কোন স্থান নাই। আজ তাহাদের মধ্যে ক্ষমতার জন্য কাড়াকাড়ি পড়িয়া গিয়াছে।" আচার্য্য ভাবের এই উক্তি মর্ম্মান্তিক হইলেও সত্য। স্বরাজ এখনও দূরে, কিন্তু কংগ্রেসকর্ম্মীরা স্বরাজের মন্দির প্রাঙ্গণে পৌঁছিবার কথা ভুলিয়া গিয়া ক্ষমতাকে করতলগত করিবার জন্য নিজেদের মধ্যে কদর্য্য প্রতিযোগিতা সুরু করিয়া দিয়াছে। বহু জেলায় কংগ্রেস নেতাদের কাজ হইয়াছে, কল্পতরু হইয়া স্তাবকগণকে দুই হস্তে অনুগ্রহ বিতরণ করা। এই অনুগ্রহ বিতরণের পিছনে অনেক ক্ষেত্রেই রহিয়াছে আগামী নির্ব্বাচন যুদ্ধে কেল্লা ফতে করিবার পাটোয়ারী কৌশলী বুদ্ধি। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী করিয়া তুলিতে হইলে সকল শ্রেণীর লোকেরই সহযোগিতা প্রয়োজনীয়। নেতাদের মধ্যে সাধারণের সহযোগিতা চাহিবার মনোবৃত্তির একান্ত অভাব দেখা যাইতেছে।

—লোকসেবক

গত ১৯৪৩ সালের বন্যায় আমীরপুরে দামোদরের উত্তর বাঁধ ভাঙ্গিয়া শক্তিগড় পর্য্যন্ত সহস্র সহস্র বিঘা উৎকৃষ্ট চাষের জমিতে মোটা বালু জমিয়া মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছে। ঐ অঞ্চলের অধিবাসীরা—যাহাদিগকে জমির উপর নির্ভর করিতে হয়, তাহাদের দুরবস্থার অন্ত নাই। লীগ মন্ত্রিত্বের আমলে মহাত্মা গান্ধী যখন কলিকাতায় আসেন তথা হইতে বীরভূম যাইবার পথে শক্তিগড়ের নিকট জমিগুলির অবস্থা তাঁহাকে দেখানো হয়। তিনি ইহার প্রতিকারের জন্য তৎকালীন লীগ মন্ত্রিসভাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই। তাহার পর অনেক বৎসর গিয়াছে, এখন দেশ স্বাধীন হইয়াছে এবং কংগ্রেস পরিচালিত জাতীয় সরকার দেশের শাসনভার গ্রহণ করিয়াছেন।

দুর্গতগণ জাতীয় সরকারকে বহু আবেদন করিয়াছে, কিন্তু এখনো বিশেষ কোন সাড়া পাইতেছে না। নানা কাজের মধ্যে এতদিন ব্যস্ত থাকিলেও যাহাতে এই বৎসর ধান্য উঠিবার পরেই ঐ অঞ্চলের বালুপড়া জমিগুলির উদ্ধার হয় তাহার জন্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। জমিতে ফসল হইবে না এবং তাহার খাজনা গুণিতে হইবে এরূপ ব্যবস্থা বাস্তবিকই দুঃসহ।

—দামোদর

গত ১৭ই অগ্রহায়ণ র‍্যাভেনশ কলেজ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫ম বার্ষিক সমাবর্তন উৎসবে বক্তৃতা প্রসঙ্গে ডাঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন্ বলেন, "গত দেড় বৎসরকাল আমাদের নেতৃবর্গকে লক্ষ লক্ষ আশ্রয়প্রার্থীর পুনর্বসতি স্থাপনে এবং দেশীয় রাজ্যসমূহকে আমাদের রাজনীতিক কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত করার ব্যাপারে নিদারুণ পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। বিরাট সামাজিক ও বৈষয়িক সমস্যা সমাধানকল্পে তাঁহারা উৎসাহী ও চরিত্রবান যুবক-যুবতীর সাহায্য চান। সমাজের সর্বস্তরে ব্যাপক দুর্নীতি, শাসনকার্যে যোগ্যতার অপহ্নব এবং মামুলী শাসন পরিচালনা ব্যবস্থায় আইন সভার সদস্যদের হস্তক্ষেপের জন্য তাঁহারা তীব্র ভাষায় অভিযোগ করিতেছেন। সরকারী চাকুরীতে যোগ্যতা উপেক্ষা করিয়া ব্যক্তি ও দলগত স্বার্থসিদ্ধি করায় নেতৃবর্গ ক্ষোভ প্রকাশ করিতেছেন। স্বাধীনতালাভে আমরা ক্ষমতামত্ত হইয়া মানসিক ক্ষমতা হারাইয়া ফেলিয়াছি বলিয়া মনে হয়। সাফল্যের মধ্যে আমাদের দুর্বলতা ধরা পড়িয়াছে। অধুনা দেশবাসী পরীক্ষার সম্মুখীন; স্বাধীনতার ভিত্তি সুদৃঢ় করিতে হইলে যে মহৎ গুণাবলীর জন্য আমরা স্বাধীনতা লাভ করিয়াছি, তাহার বিকাশসাধন প্রয়োজন।

চীন, ব্রহ্ম ও মালয়ে যেসব ঘটনা ঘটিতেছে, সে বিষয়ে আমাদের বিশেষ সতর্ক হইতে হইবে। মার্ক্সবাদের অন্তর্নিহিত গুণাবলীর জন্যই সাধারণ লোক সাম্যবাদের প্রতি আকর্ষণ বোধ করে না, আমাদের সামাজিক সংস্থায় মূলগত ত্রুটির জন্যই ঐ আকর্ষণ। দারিদ্র্য ও বুভুক্ষার ফলেই অন্ধ গোঁড়া মত সৃষ্টি হইয়া থাকে। আমাদের বিচ্যুতির মধ্যেই বিপদ নিহিত। সমাজ যদি দুর্বল হয়, যুব সমাজের যদি আশাভঙ্গ ঘটে, সামাজিক সংস্থায় যদি অবিচার ও অন্যায়ের প্রাবল্য হয়, সমাজের উচ্চস্তরে আছে বলিয়াই যদি দুর্নীতির সহিত আপসরফা করিতে হয় এবং গণতন্ত্র রক্ষায় যদি আমরা অপারগ হয়, তাহা হইলে জনসাধারণ হতাশায় নূতন পথের সন্ধান করিলে আমরা অভিযোগ করিতে পারি না।

—উদ্বোধন

* * *

ভারতের পররাষ্ট্রনীতি কি হবে তা নিয়ে কারও কারও মনে প্রশ্ন জেগেছে: (১) ভারত কি আগেকার মতোই কমনওয়েল্থ জাতিসমূহের অন্তর্ভুক্ত থাকবে? এবং (২) ভারত কি আগামী যুদ্ধে ইঙ্গ-মার্কিন দলে যোগদান করবে? সম্প্রতি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি এই দুটি প্রস্তাবেরই উত্তর দিয়েছেন।

প্রথম প্রস্তাবটি সম্বন্ধে তাঁরা এই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে,—

"ভারত পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করেছে এবং সেখানে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। তার ফলে বিভিন্ন জাতিসমূহের মধ্যে সে তার ন্যায্য মর্যাদা লাভ করবে। সুতরাং বৃটেন ও কমনওয়েল্থের সঙ্গে তার সম্পর্কের পরিবর্তন হতে বাধ্য।"

কিন্তু সেই সম্পর্ক যে ঠিক কি হবে সে সম্বন্ধে স্পষ্ট ক'রে কিছু বলেন নি। তা কি সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন হবে, না কিছুটা থাকবে?

দ্বিতীয় প্রশ্ন সম্বন্ধে ওয়ার্কিং কমিটির অভিমত স্পষ্টতর। বলেছেন: "সকল জাতির সঙ্গেই বন্ধুত্বপূর্ণ ও সহযোগিতামূলক সম্পর্ক বজায় রাখাই ভারতের পররাষ্ট্রনীতি হওয়া উচিত। যে সামরিক অথবা অন্য মৈত্রীর ফলে পৃথিবী দুটি বিবদমান দলে বিভক্ত হতে পারে কিংবা বিশ্বশান্তিতে ব্যাঘাত ঘটতে পারে, তেমন মৈত্রী ভারত পরিহার ক'রে চলবে।

এই প্রস্তাবের মধ্যে কোনো অস্পষ্টতা নেই। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, তা সত্য সত্যই সম্ভব কি না? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গত মহাযুদ্ধের শেষ পর্যন্ত নিরপেক্ষ ও নির্লিপ্ত থাকতে পারেনি। অথচ তুরস্ক এবং কমনওয়েল্থের অন্তর্গত হয়েও আয়র্ল্যাণ্ড তা পেরেছে। অবশ্য ছোট রাষ্ট্র ব'লেই হয়তো পেরেছে এবং তার জন্যে তাকে বেগও কম পেতে হয়নি। রাষ্ট্র হিসাবে ভারত অবশ্য ছোট নয়, কিন্তু শিশু। তা ছাড়া প্রধান রঙ্গমঞ্চ থেকে (যদি অবশ্য ইউরোপই সমর রঙ্গমঞ্চ হয়) দূরেও অবস্থিত। সুতরাং ভারতের পক্ষে একেবারে নির্লিপ্ত থাকা অসম্ভব হবে না। কিন্তু রঙ্গমঞ্চ যে বিশ্বের ভাগ্যদেবতা কোথায় পাতছেন, তা কি কেউ নিশ্চয় ক'রে বলতে পারে? সে রকম ক্ষেত্রে ভারতের বিবেচ্য হবে, অন্ধভাবে কোনো একটি দলের লেজে বাঁধা থাকা নয়,—ন্যায় ও নীতি কোন দলের পক্ষে এবং কোন দলের সঙ্গে তার আদর্শ ও কল্যাণ জড়িত, তাই বিবেচনা করা।

—বর্তমান

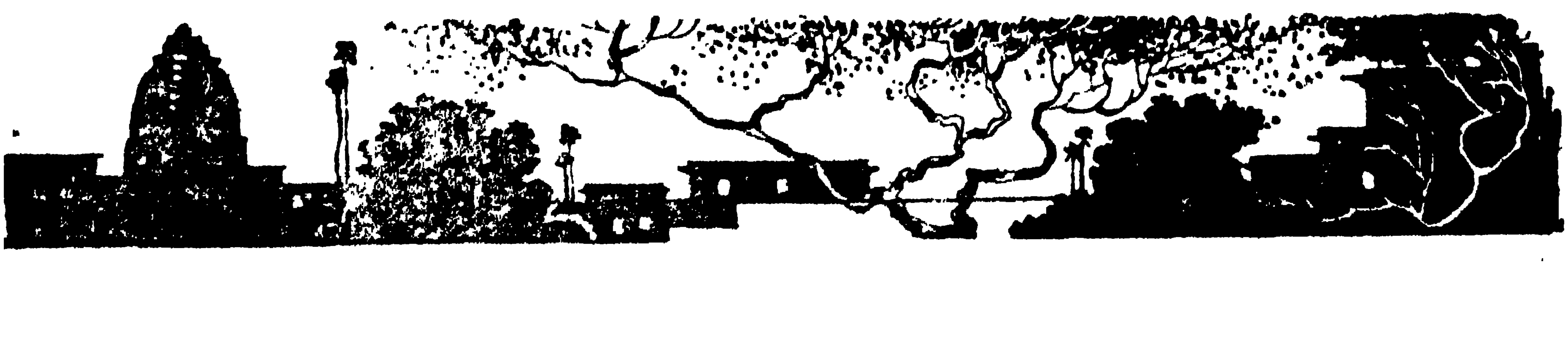

রাষ্ট্রপতির অভিভাষণ—

কংগ্রেসের জয়পুর অধিবেশনের সভাপতি শ্রীযুত পট্টভি সীতারামিয়া তথায় সে সুদীর্ঘ অভিভাষণ পাঠ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে কোন নূতনত্ব দেখা যায় নাই। শ্রীযুত সীতারামিয়া দীর্ঘকাল কংগ্রেসের কাজের সহিত নিজেকে সংযুক্ত রাখিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে লোক শুধু নীতি-কথা পারেন নাই। তাঁহার মধ্যে সর্দ্দার বল্লভভাইএর দৃঢ়তা, পণ্ডিত-জহরলালের ভাবপ্রবণ আদর্শবাদ বা ডক্টর রাজেন্দ্র-প্রসাদের কর্ম্মকুশলতা কিছুরই পরিচয় পাওয়া যায় নাই। সে জন্য লোক তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করিয়া হতাশ হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে যেমন দেশের শাসকবৃন্দের সুবিধা অসুবিধার কথা ভাবা প্রয়োজন, তেমনই সঙ্গে সঙ্গে

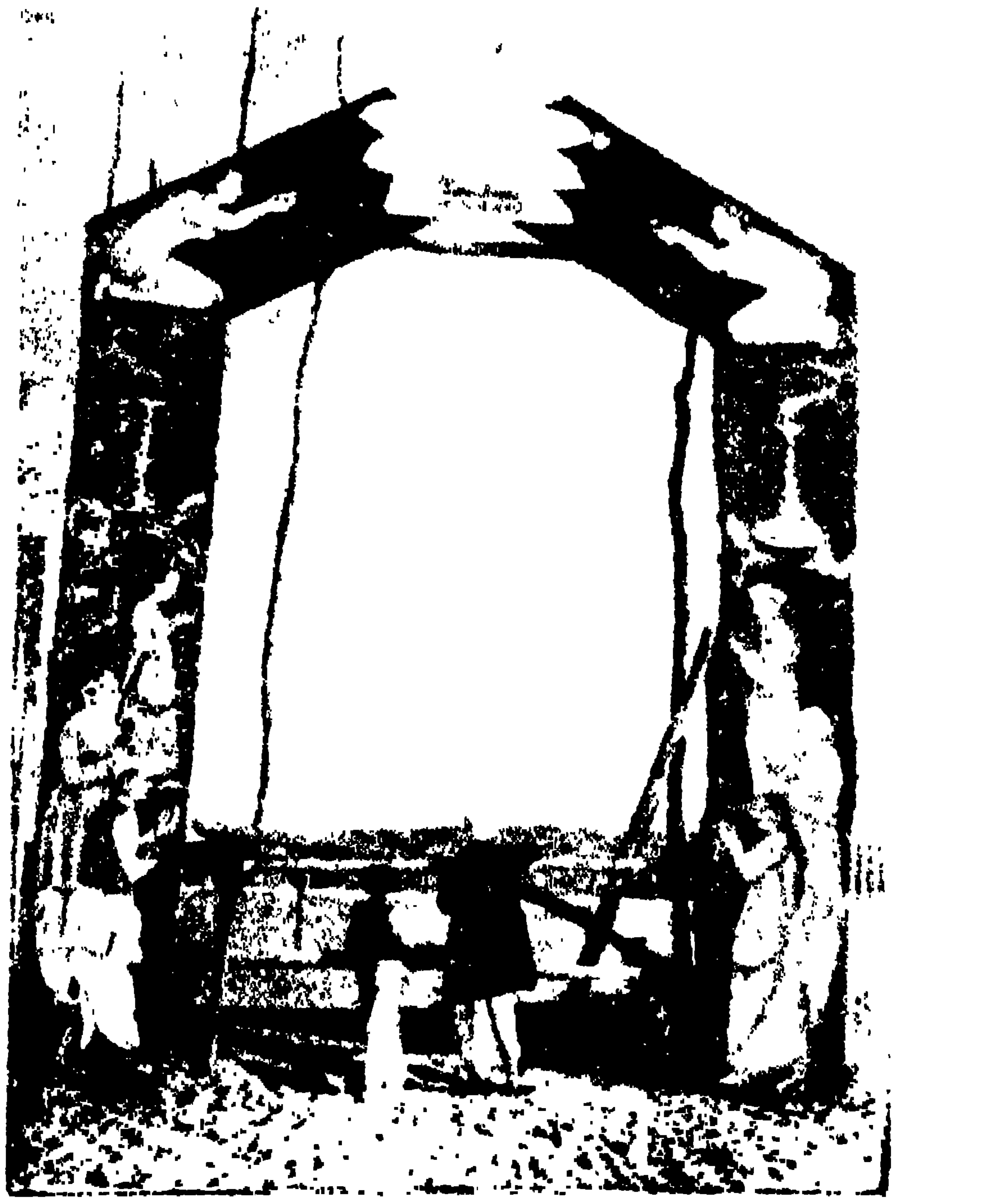
জয়পুর গান্ধীনগরে নির্ম্মিত তোরণ, উহাতে ভারতের সংস্কৃতি অঙ্কিত ফটো—পান্না সেন

গান্ধীনগরে (জয়পুর) নির্ম্মিত ৩৭টি তোরণের অন্যতম—রাজপুতানার গ্রামচিত্র অঙ্কিত ফটো—পান্না সেন

শুনিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না। স্বাধীন ভারতে এই প্রথম কংগ্রেসের অধিবেশন হইল। কংগ্রেসকর্ম্মীরা দেশের শাসনভার গ্রহণ করিয়াছেন। এ সময়ে জনগণের সহিত কংগ্রেসের ও কংগ্রেসের সহিত দেশের শাসন-ব্যবস্থার সম্পর্ক কি হইবে তাহা জানিবার জন্য সকলে উদগ্রীব হইয়াছিল। রাষ্ট্রপতি সে বিষয়ে জনগণকে কোন নির্দ্দেশ দিতে দেশের অগণিত জনগণের দুঃখ কষ্টের কথাও চিন্তা করা দরকার। রাষ্ট্রপতির অভিভাষণে তাহার অভাব দেখা গিয়াছে। দেশবাসী বর্ত্তমানে নানা কারণে অধীর হইয়াছে—এ সময়ে তাহাদের মধ্যে নূতন প্রেরণা দানই রাষ্ট্রপতির প্রথম কর্ত্তব্য ছিল। তাহা না করিয়া তিনি যে বিবৃতিমূলক অভিভাষণ দিয়াছেন, তাহাতে কংগ্রেসের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের

সম্বন্ধে লোক আরও সন্দিহান হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার মত প্রবীণ ও বুদ্ধিমান লোকের নিকট দেশবাসী যাহা আশা করিয়াছিল, তাহা পায় নাই। তিনি যে নূতন ওয়ার্কিং কমিটী গঠন করিয়াছেন, সেই কমিটী যদি উপযুক্ত কর্ম্মপন্থা স্থির করিতে পারে, তবেই কংগ্রেসের অস্তিত্ব সার্থক হইয়া থাকিবে।

ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠন—

মহাত্মা গান্ধী তাঁহার হত্যার মাত্র ৫ দিন পূর্ব্বে ১৯৪৮ সালের ২৫শে জানুয়ারী তাঁহার প্রার্থনান্তিক ভাষণে বলিয়াছিলেন—"কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যগণ ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশসমূহের পুনর্গঠনের বিষয় আলোচনা করিতেছেন। কংগ্রেস ইতিপূর্ব্বেই উক্ত নীতি গ্রহণ করিয়া শাসন ক্ষমতা গ্রহণের সঙ্গে উহা কার্য্যকরী করার অভিপ্রায় ঘোষণা করিয়াছে। কারণ এইরূপ ভাবে প্রদেশসমূহ পুনর্গঠিত হইলে উহা দেশের সংস্কৃতিমূলক উন্নয়নের সহায়ক হইবে।" ইহার পর গণপরিষদের সভাপতির নির্দেশে ভারতের ৪টি নূতন প্রদেশ গঠনের দাবী (ভাষাগত ভিত্তিতে) বিবেচনা করার জন্য কমিশন গঠিত হইয়াছে।

কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের ন্যায়সঙ্গত দাবী হিসাবে অন্য প্রদেশভুক্ত অঞ্চলগুলি ফিরাইয়া পাইবার কথা কেহ বিবেচনা করা সঙ্গত বলিয়া মনে করিলেন না। দিল্লীতে গণপরিষদের সদস্যগণ একযোগে এ দাবী উপস্থিত করিয়াছিলেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সদস্য ডক্টর শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী মহাশয়ও তাহাতে যোগদান করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার পর কয়েক মাস অতীত হইলেও সে দাবীর আলোচনার কোন ব্যবস্থাই এখন পর্য্যন্ত হইল না। নূতন রাষ্ট্রপতি ডক্টর পট্টভি সীতারামিয়া ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের দাবী যে সঙ্গত, সে কথা বার বার উল্লেখ করিয়াছেন। আমাদের বিশ্বাস, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বাঙ্গালী সদস্য ডক্টর শ্রীযুত প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের চেষ্টায় নূতন কমিটি এ বিষয়ে উদ্যোগী হইয়া কার্য্যারম্ভ করিবেন এবং বাঙ্গালীর ন্যায়সঙ্গত দাবী রক্ষার যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে।

জয়পুরের পথে রাষ্ট্রপতির মিছিল—বলীবর্দ বাহিত রৌপ্যরথে রাষ্ট্রপতি ডাঃ সীতারামিয়া   ফটো—পান্না সেন

শিক্ষার দুরবস্থা—

স্বাধীনতার পর ১৬ মাস অতীত হইলেও ভারতের শিক্ষা-ব্যবস্থা পরিবর্ত্তনের কোনরূপ ব্যবস্থায় কেহ মনোযোগী হন

নাই। কেরাণী তৈয়ারী করিবার জন্য বৃটীশ সরকার এদেশে যে শিক্ষাপদ্ধতি প্রবর্ত্তন করিয়াছিল তাহাই চলিতেছে। নিয়মে নহে, ব্যতিক্রমে এদেশে বহু মনীষী শিক্ষা লাভ করিয়া প্রকৃত মনুষ্যত্ব অর্জ্জন করিয়াছেন এবং তাঁহাদের চেষ্টার ফলেই এদেশের সংস্কৃতিরক্ষা সম্ভব হইয়াছে—তাঁহারাই ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আনয়ন করিয়াছেন। সম্প্রতি মাদ্রাজে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হলে আন্তর্বিশ্ববিদ্যালয় সম্মিলনের পঞ্চবার্ষিক সভার ষষ্ঠ অধিবেশন ও ব্রহ্মের ২৩টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার ও প্রতিনিধিবর্গ তথায় উপস্থিত ছিলেন। প্রকৃত মনুষ্যত্বের যাহাতে উন্মেষ হয়, সেইরূপ শিক্ষা-ব্যবস্থা স্থির করিবার এখন প্রকৃত সময় আসিয়াছে—এ কথা আজ আমাদের বিস্মৃত হইলে চলিবে না। দেশে গত ২ শত বৎসর ধরিয়া যে কুশিক্ষা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে দেশবাসী তথাকথিত শিক্ষিত বলিয়া পরিচয় দিতে পারে বটে, কিন্তু তাহা যে লোককে মানুষ করে নাই, তাহার প্রমাণ—আজ চারি-

অখণ্ডজ্যোতি লইয়া জয়পুরে মিছিল—সম্মুখে হস্তীপৃষ্ঠে 'জাতীয় পতাকা' ফটো—পান্না সেন

হইয়া গিয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকার বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজনায় পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য সার ডাঃ এস্ রাধাকৃষ্ণনের সভাপতিত্বে যে বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন গঠন করিয়াছেন, সেই কমিশনের সদস্যগণও ঐ সময়ে মাদ্রাজে উপস্থিত থাকায় তাঁহারা উক্ত অধিবেশনে যোগদান করিয়াছিলেন। মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার ডাঃ এ-লক্ষ্মণস্বামী মুদেলিয়ার উক্ত অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন এবং ভারত, সিংহল দিকের দুর্নীতি। শিক্ষার বনিয়াদ ভাল থাকিলে মানুষ এমন দুর্নীতিপরায়ণ হইয়া উঠিত না। শিক্ষার পরিবর্ত্তনের ব্যবস্থা করার সময় সে জন্য নীতি ও সৎশিক্ষার ব্যবস্থা প্রথমেই করা প্রয়োজন। দেশ যাহাতে আর ধ্বংসের পথে অগ্রসর না হয়, আমাদের সর্ব্বদা সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। বর্ত্তমান শিক্ষা মানুষকে বিলাসী, পরিশ্রম-বিমুখ ও সহরমুখা করিয়া তোলার ফলে আজ ভারতের গ্রামগুলি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তাহার ফলে দেশে আজ

নিদারুণ খাদ্যাভাব ও বস্ত্রাভাব উপস্থিত হইয়াছে। এখন নূতন ব্যবস্থা করার প্রয়োজন, যাহার ফলে মানুষের মনের ভাব পরিবর্ত্তিত হয় ও দেশ স্বাধীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ নিজের প্রকৃত অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেশের ও নিজের প্রকৃত উন্নতি বিধানে সমর্থ হয়। নচেৎ শুধু সম্মিলন করিয়া বা তদন্ত কমিশন বসাইয়া কোন লাভ হইবে না। বর্ত্তমান তদন্ত কমিশনের নির্দ্দেশের ফল যেন সুদূর-প্রসারী হইয়া দেশের সমৃদ্ধি লাভের উপায় স্থির করে, আজ সকলে সর্ব্বান্তঃকরণে তাহাই কামনা করিতেছে।

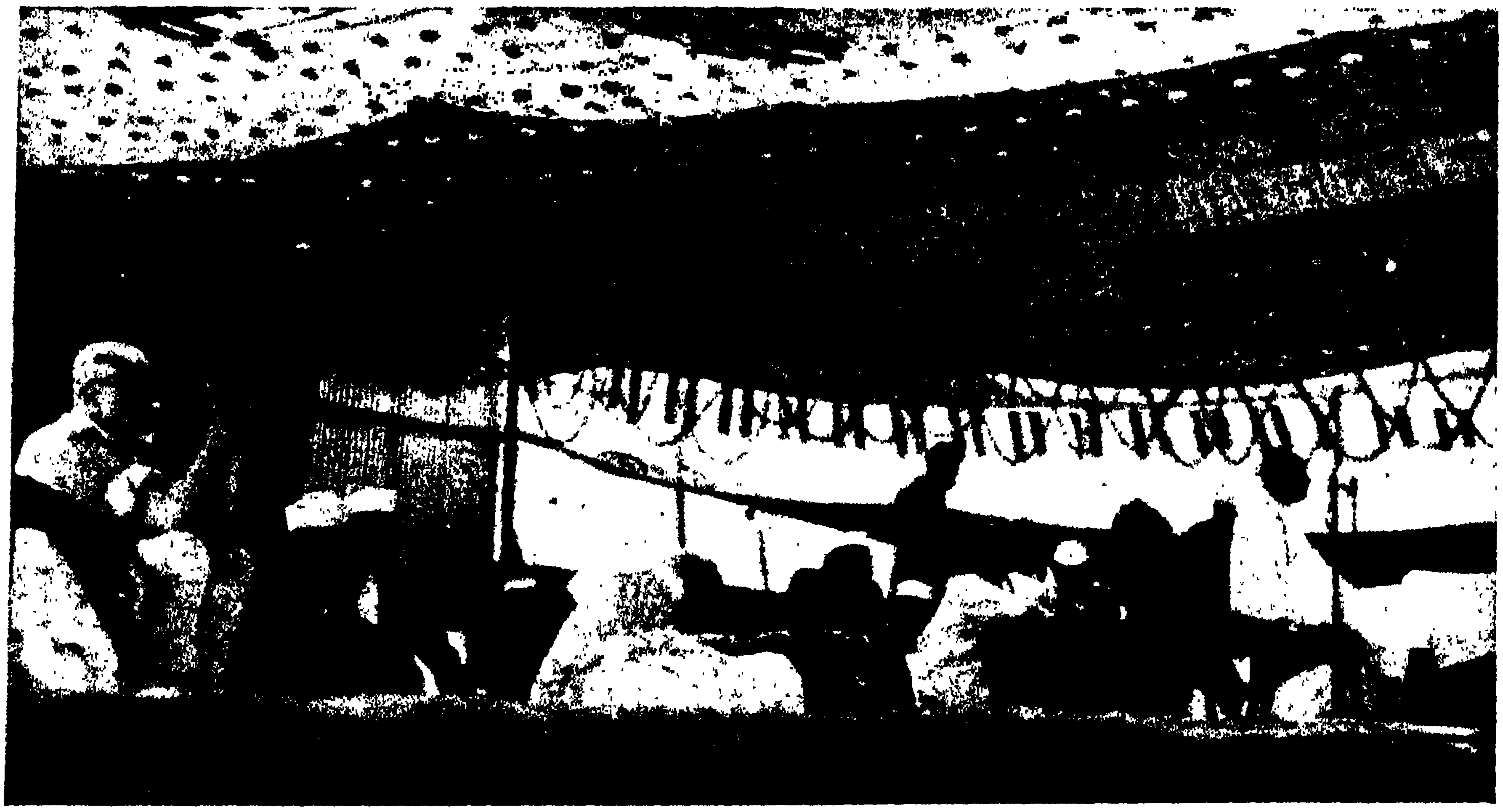

জয়পুর কংগ্রেসে 'গান্ধীনগরে' কংগ্রেসের বিষয় নির্ব্বাচন সমিতিতে (১৬ই ডিসেম্বর) ভারতের ডেপুটী প্রধানমন্ত্রী সর্দ্দার প্যাটেলের বক্তৃতা—পশ্চাতে রাষ্ট্রপতি, পণ্ডিত নেহরু, মৌলানা আজাদ, শ্রীজগজীবন রাম প্রভৃতি ফটো—প্রচার বিভাগ

করিয়াছেন এবং বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার ডাঃ পি-ভি-কানে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে সকলকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করিয়াছেন। সাধারণ লোকের ধারণা—দর্শন বিলাসের সামগ্রী—মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই; কবে ও কি প্রকারে মানুষের মনে এই ভ্রান্ত ধারণার উদ্ভব হইয়াছে তাহা বলা যায় না। ভারতের দর্শন তাহার অধিবাসীদের জীবন ও মনের সহিত এত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ যে দর্শনের সাহায্য ভিন্ন ভারতবাসী কোন দিন কোন কাজ করে নাই। তাই

ডাঃ সার রাধাকৃষ্ণন ভারতীয় সংস্কৃতির রক্ষক—তিনি যে এ বিষয়ে সর্ব্বদা অবহিত থাকিবেন এবং তাঁহার সহকর্ম্মীদের এ বিষয়ে তাঁহার মতাবলম্বী করিতে পারিবেন, সকলে তাহাই আশা করে।

দর্শন ও তাহার ব্যবহার—

গত বড়দিনের ছুটীতে বোম্বায়ে ভারতীয় দার্শনিক সম্মিলনের ২৩শ অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ এস-কে-মৈত্র উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করিয়াছেন, পুনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার ডাঃ এম-আর-জয়াকর সভার উদ্বোধন

তাহাদের সমাজ, রাষ্ট্র প্রভৃতি ক্ষেত্রে তাহাদের জীবন এত সুপ্রতিষ্ঠিত ও উচ্চ আদর্শে গঠিত হইয়াছিল। দার্শনিকগণ যদি মানুষের দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার প্রণালী সম্বন্ধে নির্দ্দেশ না দেন, তবে তাঁহাদের সার্থকতা কোথায়? আজ ভারতবর্ষকে একথা বিশেষ করিয়া বুঝিতে হইবে, যে ভারতের দার্শনিকগণ যে নির্দ্দেশ প্রদান করিতেন, তাহার অনুসরণ করিয়াই ভারতীয়গণ তাহাদের জীবন সুসংবদ্ধ ও সুপরিচালিত করিবার সুযোগ লাভ করিতেন। দর্শনকে জীবন হইতে পৃথক রাখার ফলে আজ ভারতে এরূপ শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। ডাঃ মৈত্র প্রভৃতির

মত ব্যক্তিদের দ্বারা আজ ভারতে নূতন আলোক প্রচারিত হইলে তদ্বারা ভারতবাসী আবার তাহাদের শান্তিময় জীবন ফিরাইয়া পাইবে—ইহাই আমরা মনে করি।

নূতন ওয়ার্কিং কমিটী—

রাষ্ট্রপতি শ্রীযুত পট্টভি সীতারামিয়া গত ৫ই জানুয়ারী দিল্লীতে বসিয়া নূতন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর সদস্যদের নাম ঘোষণা করিয়াছেন। এবার সদস্যর সংখ্যা ১৫ স্থানে ২০ জন করা হইয়াছে। জয়পুর কংগ্রেসের তাহাই নির্দ্দেশ ছিল। বোম্বাই প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি শ্রীএস-কে-পাতিল, অন্ধ্র প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি আত্মনিয়োগ করিবেন। পুরাতন সদস্যদের মধ্যে পণ্ডিত জহরলাল নেহরু, সর্দ্দার বল্লভভাই পেটেল, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, রফি আমেদ কিদোয়াই, শ্রীজগজীবনরাম, পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ, সর্দ্দার প্রতাপ সিং কায়রণ, ডাক্তার রাজেন্দ্রপ্রসাদ, ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, শ্রীশঙ্কর রাও দেও ও শ্রীমতী সুচেতা কৃপালানী সদস্য হইয়াছেন। শ্রীশঙ্কর রাও দেও ও শ্রীকালা বেঙ্কট রাও দুই জনে সাধারণ সম্পাদকের কাজ করিবেন ও সর্দ্দারজী পূর্ব্বের মত কোষাধ্যক্ষ থাকিবেন। নূতন কমিটীতে বাঙ্গালা হইতে ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ—একজন মাত্র সদস্য আছেন।

জয়পুরে রাষ্ট্রপতির মিছিলের পুরোভাগে মীরাট হইতে আনীত 'অখণ্ডজ্যোতি ফটো—পান্না সেন

শ্রীএন-জি-রঙ্গ, তামিলনাদ প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি শ্রীকামরাজ নাদার, আসাম প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি শ্রীদেবেশ্বর শর্ম্মা, কর্ণাটক প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি মহীশূররাজ্যবাসী শ্রীনিজালিঙ্গাপ্পা, রাজপুতানা প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি শ্রীগোকুল ভাই ভাট ও আলোয়ার নিবাসী (গোয়ালিয়র) শ্রীরাম সহায় সদস্য হইয়াছেন। মাদ্রাজের রাজস্ব-মন্ত্রী শ্রীকালা ভেঙ্কট রাও নূতন সদস্য ও সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত শ্রীযুক্তা সুচেতা বাঙ্গালার মেয়ে হইলেও সিন্ধী বিবাহ করিয়াছেন। তিনি আর বাঙ্গালী নহেন। এবার দক্ষিণ ভারত হইতেই অধিক সদস্য গ্রহণ করা হইয়াছে। উড়িষ্যা হইতে এবার কোন সদস্য গ্রহণ করা হয় নাই কেন, তাহা বুঝা গেল না। রাষ্ট্রপতি নিজে দক্ষিণ ভারতের লোক, কাজেই তাহার দেশবাসীদিগকে অধিক বিশ্বাস-ভাজন ও কাজের লোক মনে করাই তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সদস্যগণ কংগ্রেস ওয়ার্কিং

নহে। জয়পুর কংগ্রেসের অধিবেশনে এ বিষয়ে সমালোচনা হওয়া সত্ত্বেও কয়েকজন নেতা হয়ত মনে করেন যে তাঁহারা সদস্য না থাকিলে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর কাজ চলিবে না। রাষ্ট্রপতির পক্ষে তাঁহাদের প্রভাব মুক্ত হইয়া থাকাও সম্ভব কিনা সন্দেহের বিষয়। কাজেই নূতন ওয়ার্কিং কমিটীর সদস্য তালিকা দেখিয়া দেশের লোক সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই।

প্রাদেশিক গভর্ণর ও কংগ্রেস—

জয়পুর কংগ্রেসে পশ্চিম বাঙ্গালার গভর্ণর ডক্টর কৈলাসনাথ কাটজু, বিহারের গভর্ণর শ্রীমাধব শ্রীহরি আনে ও উড়িষ্যার গভর্ণর শ্রীআসফ আলি যোগদান করিয়াছিলেন। তাঁহারা কি জন্য কংগ্রেসে যোগদান করিতে গিয়াছিলেন, তাহা জানা যায় নাই। তাঁহারা যদি স্বব্যয়ে কংগ্রেস দেখিতে গিয়া থাকেন, তবে তাহাতে কাহারও কিছু বলিবার নাই। যদি ঐ সফরের খরচ সরকারী তহবিল হইতে প্রদত্ত হইয়া থাকে, তবে জনগণ অবশ্যই তাহাতে আপত্তি করিতে পারে। তাঁহাদের মত কাজের লোকদের পক্ষে কংগ্রেস দেখিতে যাওয়ায় কোন সার্থকতা থাকিতে পারে না। কোন কোন প্রদেশ হইতে মন্ত্রীরাও কংগ্রেস দেখিতে গিয়াছিলেন। কংগ্রেসকে যদি বর্ত্তমান শাসন ব্যবস্থার সমালোচনা করিবার অধিকারী বলিয়া মনে করা হয়, তবে তথায় প্রাদেশিক গভর্ণর বা মন্ত্রীদের যোগদান না করাই সঙ্গত বিবেচিত হইবে।

জয়পুরে সর্ব্বোদয় প্রদর্শনীতে সূত্রযজ্ঞ—শ্রীবিনোবাভাবে, শ্রীশঙ্কর রাও প্রভৃতি সূতা কাটিতেছেন

ফটো—পান্না সেন

সংস্কৃত ভাষা ও রাষ্ট্রভাষা—

ডাক্তার কৈলাশনাথ কাটজু যখন উড়িষ্যার গভর্ণর ছিলেন, তখনই তিনি এক সভায় ঘোষণা করিয়াছিলেন যে সংস্কৃত ভাষাই সর্ব্ব-ভারতীয় ভাষা বা রাষ্ট্রভাষার সম্মান পাইবার যোগ্য। গত ১৫ই পৌষ কলিকাতা গভর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজে জয়ন্তী উৎসবেও তিনি সেই কথা আবার উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—"সংস্কৃত ভারতের সকল প্রাদেশিক ভাষার মাতৃস্বরূপ—এই মাতা হৃত-সৌন্দর্য্য বা জরাগ্রস্ত নহেন, সম্পূর্ণ জীবন্ত। ইনিই ভারত-মাতা। তাঁহাকেই ভারতের রাষ্ট্রভাষা করা কর্ত্তব্য।" একদল লোক হিন্দী বা হিন্দুস্থানী ভাষাকে সর্ব্ব-ভারতীয় ভাষারূপে চালাইবার চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহাদের কি জানা নাই যে দক্ষিণ ভারতের প্রায় সকল লোকই হিন্দী ভাষায় অনভিজ্ঞ। হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা করা হইলে বাঙ্গালা দেশের যেমন অসুবিধা হইবে, মাদ্রাজ, বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশেরও নানাস্থানে সেই অসুবিধা হইবে। কিন্তু তাহার স্থলে সংস্কৃতকে রাষ্ট্রভাষা করা হইলে ঐ সকল প্রদেশের ত কোন অসুবিধাই হইবে না—তাহা ছাড়া উত্তর পশ্চিম ভারতের অধিবাসীদেরও সংস্কৃত-ভাষা আয়ত্ত করা আদৌ কষ্টকর হইবে না। যাহাতে সংস্কৃত ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করা হয়, সেজন্য ভারতের সর্ব্বত্র প্রবল আন্দোলন হওয়া উচিত। মহারাষ্ট্র, বাঙ্গালা, মাদ্রাজ প্রভৃতি অঞ্চলে সংস্কৃত ভাষায়

শিক্ষিত লোকসংখ্যা অধিক। ডাঃ কাটজুর মত তাঁহারা সর্ব্বত্র এই কথা প্রচার করিলে গণপরিষদে এই দাবী উপেক্ষিত হইবে না। সকল দিক দিয়া বিচার করিলে দেখা যায়, সংস্কৃত ভাষার রাষ্ট্রভাষা হইবার যোগ্যতা যত অধিক, ভারতে আর কোন ভাষার যোগ্যতা তত অধিক নহে।

পশ্চিম বঙ্গে দুর্নীতি দমন—

পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেণ্ট সম্প্রতি এক ইস্তাহার প্রচার করিয়া সকলকে জানাইয়াছেন যে তাঁহাদের দুর্নীতি-দমন-বিভাগে সন্তোষজনক কাজ চলিতেছে। আমরা এই ইস্তাহার পাঠ করিয়া স্তম্ভিত হইয়াছি। বাঙ্গালা দেশে কোথায় যে দুর্নীতি বন্ধ হইয়াছে, তাহা দেখিতে পাই না। কলিকাতা সহর রেশন এলাকা, তথায় মাথা পিছু সপ্তাহে এক সের ৬ ছটাক চাউল বরাদ্দ আছে। নূতন লোক সহরে আসিলে তাহার রেশন কার্ড করিতে অফিসের দোষে ২ সপ্তাহ সময় লাগিয়া যায়—কাজেই মানুষ চাউলের অভাবে খাইতে পায় না। কিন্তু সহরের রাজপথে প্রকাশ্য-ভাবে যে সাড়ে ১৭ টাকা মণের চাউল ৫০ টাকা মণ দরে বিক্রীত হয়, তাহা কি পশ্চিমবঙ্গের পুলিস-কর্ত্তাদের অজ্ঞাত। সহরের বহু স্থানেই এইরূপ চাউল বিক্রয়ের ব্যবস্থা আছে ও এক এক স্থানে ৫০জন চাউল বিক্রেতা পাশাপাশি বসিয়া চাউল বিক্রয় করিয়া থাকে। কাপড় সম্বন্ধেও ঐ একই কথা বলা যায়। দোকানে কাপড় পাওয়া যায় না—কারণ দোকানীকে নির্দ্দিষ্ট মূল্যে তাহা বিক্রয় করিতে হয়। আর সেই ৬ টাকা জোড়ার কাপড় পথের ধারে ১০ টাকা জোড়া দরে সর্ব্বত্রই কিনিতে পাওয়া যায়। এইভাবে কলিকাতার রেশনিং ব্যবস্থা চলিতেছে। মানুষ বাধ্য হইয়া দুর্নীতি-পরায়ণ হয় ও সরকারী ব্যবস্থা তাহাকে সে কার্য্যে সাহায্য করিয়া থাকে। পুলিস এ সকল কাজ দেখিয়াও দেখে না। ইহার পরও যদি কর্ত্তৃপক্ষ বলেন যে দুর্নীতি দমন কার্য্য সন্তোষজনক হইতেছে, তাহাতে জনসাধারণ কি মনে করিবে? আমরা শাসকবর্গকে একটু সচেতন হইয়া বিবৃতি প্রকাশ করিতে বা বক্তৃতা করিতে অনুরোধ করি। তাঁহারা যদি মাটীর পুতুলের মত চোখ থাকিতেও না দেখেন, তবে সে দোষ কি জনসাধারণের?

ক্ষমতার আড়ম্বর—

আচার্য্য জে-বি-কৃপালনী কংগ্রেসের সভাপতি বা ভারতের রাষ্ট্রপতি ছিলেন। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের সহিত একমত হইতে না পারিয়া তিনি পদত্যাগ করিয়াছিলেন। একদিকে যেমন তিনি নিষ্ঠাবান কর্ম্মী, অন্যদিকে তেমনই তাঁহার সাহসও অসাধারণ। সম্প্রতি তিনি 'ক্ষমতার আড়ম্বর' সম্বন্ধে এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে তিনি বলিয়াছেন—কংগ্রেসের সেবকগণ দেশের শাসন ক্ষমতা লাভ করিয়া অর্থাৎ বড়লাট, ছোটলাট, মন্ত্রী প্রভৃতি

পণ্ডিত জহরলাল নেহরু ও সর্দ্দার বল্লভভাই পেটেল জয়পুরে কংগ্রেস অধিবেশনে যোগদান করিতে যাইতেছেন। ফটো—পান্না সেন

নিযুক্ত হইয়া দেশের আবহাওয়ার কোন পরিবর্ত্তন সাধন করিতে সমর্থ হন নাই। তাঁহারা যে সমস্ত গৃহে বাস করেন তাদের ঠাটঠমকের কোনই পরিবর্ত্তন হয় নাই, উর্দ্দীপরা ভৃত্য ও চাপরাশির সংখ্যা কমে নাই—পার্টি ও খানাপিনার ঘটারও বিরাম নাই। এখনও সর্ব্বত্র বহুসংখ্যক কর্ম্মী প্রহরী দাঁড়াইয়া পাহারা দিয়া থাকে।—এই সকল বাহিরের জাঁকজমক না থাকিলে যে কর্ম্মীদের সম্মান বা প্রতিপত্তি কমিয়া যাইবে, এমন মনে করিবার কোন কারণ নাই।

তাহা জানিয়াও কেন যে কংগ্রেসকর্ম্মীরা নূতন পদ পাইয়া পদমর্য্যাদা রক্ষা করার জন্য এত ব্যস্ত, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। বিশেষ করিয়া যে সকল ভারতীয় নেতাকে রাষ্ট্রদূত করিয়া বিদেশে প্রেরণ করা হইতেছে, তাহাদের ব্যয়বাহুল্য দেখিয়া সকলেই স্তম্ভিত হইয়া যান। এই ব্যয়বাহুল্য না করিলে বিদেশে ভারতের নূতন রাষ্ট্রের মর্য্যাদা রক্ষিত হইবে না—পণ্ডিত জহরলাল নেহরুর মত লোকও যে কেন এমন মনে করেন, তাহা বুঝা কঠিন। মস্কো বা নিউইয়র্কে রাষ্ট্রদূতের জন্য যে বিপুল অর্থব্যয় করা হইয়াছে, তাহা ভারতের মত দরিদ্র দেশের পক্ষে শোভন

জয়পুরে রাষ্ট্রপতি ডাঃ পট্টভী সীতারামিয়া পত্র পাঠ করিয়া পণ্ডিত নেহরুকে শুনাইতেছেন। ফটো—পান্না সেন

হয় নাই। লণ্ডনেও ভারতীয় রাষ্ট্রদূত তাঁহার অফিস, আসবাবপত্র, মোটর গাড়ী প্রভৃতির জন্য অত্যধিক ব্যয় করিয়াছেন। এ বিষয়ে জনগণের সমালোচনা উপেক্ষার বিষয় নহে। ভারত চিরদিন দারিদ্র্যকে সম্মান দিয়াছে, অনাড়ম্বর জীবন যাত্রাকে সমর্থন করিয়াছে—সেই ভারত স্বাধীন হইয়া অনাবশ্যক আড়ম্বরের জন্য যদি অর্থের অপব্যয় করে, তবে কেহই তাহা সমর্থন করিবে না। আজ ভারতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা বা প্রাদেশিক মন্ত্রীরা যে ভাবে রাষ্ট্র-পরিচালনার ব্যয় বাড়াইয়া দিতেছেন, তাহা ভারতবাসীর কল্পনার অতীত ছিল। যে দেশে গান্ধীজি বর্ত্তমান যুগেও সর্ব্বত্যাগী হইয়া দেশের সকল অধিবাসীর পূজার পাত্র হইয়াছেন, সে দেশে মন্ত্রীদের ঘন ঘন উড়োজাহাজ চড়িতে দেখিলে লোক সত্যই মনে করে যে গান্ধীজির প্রদর্শিত পথ কংগ্রেস ত্যাগ করিয়াছে—ভারতের চিরন্তন সভ্যতা নষ্ট করিবার জন্য সকলে উদ্যোগী হইয়াছে। আমরা কংগ্রেস-সেবক মন্ত্রীদিগকে সকল দিক বিবেচনা করিয়া কাজ করিতে অনুরোধ করি। আমাদের বিশ্বাস, লোক আজ ভূতপূর্ব্ব রাষ্ট্রপতি আচার্য্য কৃপালানীর কথা ধীরভাবে চিন্তা করিবে ও তাঁহার পরামর্শ অনুসারে কাজ করিয়া ভারতের গৌরব সর্ব্বত্র অক্ষুণ্ণ রাখার ব্যবস্থা করিবে।

মানভূমে চাকরী ও শিক্ষা—

মানভূম জেলার অধিকাংশ অধিবাসী বঙ্গভাষাভাষী—এতদিন পর্য্যন্ত তাঁহারাই জেলার সকল সরকারী চাকরীতে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। সম্প্রতি বিহার গভর্ণমেণ্ট ঐ জেলাটিকে হিন্দী ভাষাভাষী বলিয়া প্রমাণ করিবার জন্য সকল সরকারী চাকরী হইতে বঙ্গভাষাভাষীদিগকে সরাইয়া সেই সকল স্থানে হিন্দীভাষাভাষী লোক বসাইতেছেন। তাহার ফলে বর্ত্তমানে মানভূম জেলায় মানভূমবাসী নহেন এমন লোকই অধিক সংখ্যায় সরকারী চাকরী পাইতেছেন। সকল ছোট ছোট কাজের জন্য মানভূমের এলাকার বাহির হইতে হিন্দীভাষাভাষী লোক আনায় সরকারী কাজেরও অসুবিধার অন্ত নাই। সহসা সকল স্থানে হিন্দী ভাষা ব্যবহারের ব্যবস্থার ফলে সাধারণ লোক কিছুই জানিতে বা বুঝিতে পারে না—সেজন্য লোকের হায়রাণির অন্ত থাকে না। বাহির হইতে যাঁহারা সরকারী চাকরী করিতে আসিতেছেন, তাঁহারা সাধারণ লোকের সহিত মেলামেশা করেন না—ফলে উভয়পক্ষের কষ্ট হইতেছে। বঙ্গভাষাভাষীদিগকে এইভাবে ছলে, বলে ও কৌশলে জেলা হইতে তাড়াইবার ব্যবস্থা দেখিয়া লোক স্তম্ভিত হইতেছে। এই সঙ্গে জেলার গ্রামে গ্রামে হিন্দী শিক্ষক প্রেরণ করিয়া লোককে হিন্দীভাষা শিখাইবার ব্যবস্থা হইতেছে। শিক্ষকগণ স্কুল খুলিয়া বসিয়া থাকেন—শিক্ষার্থী পাওয়া যায় না—এরূপ ঘটনাও বিরল নহে। বঙ্গভাষা-ভাষীদিগকে জোর করিয়া হিন্দী শিখাইয়া হিন্দী ভাষাভাষী বলিয়া ঘোষণা করার জন্যই ইহা করা হইতেছে। এ বিষয়ে

কংগ্রেসের ঊর্দ্ধতম কর্ত্তৃপক্ষকে জানাইয়া কোন ফল হয় নাই। কতদিন বিহার গভর্ণমেণ্টের এইরূপ স্বেচ্ছাচারিতা চলিবে তাহা কে বলিতে পারে?

সমবায় সমিতি গঠন—

পশ্চিম বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট দেশের সর্ব্বত্র সমবায় সমিতি গঠন দ্বারা লোককে সমবায় প্রথায় ব্যবসা বাণিজ্য করিতে উপদেশ দান করায় পশ্চিম বাঙ্গালার সর্ব্বত্র সর্ব্বার্থ-সাধক বা মালটি-পারপাসেস্ সমবায় সমিতি গঠনের হিড়িক পড়িয়া গিয়াছে। সমবায় প্রথায় কাজ করিলে দেশ উন্নত হইবে—দেশের বহু অভাব অভিযোগ আমরা নিজেদের চেষ্টায় দূর করিতে পারিব—এ সকল সত্য কথা। কিন্তু বর্ত্তমানে যাঁহারা সমবায় সমিতি গঠনে উদ্যোগী হইয়াছেন, তাঁহাদের অধিকাংশের উদ্দেশ্য যে সাধু নহে, তাহা তাঁহাদের কর্ম্ম-প্রচেষ্টা দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। সমবায় সমিতি গঠন করিলে বস্ত্র বা খাদ্যদ্রব্য বিক্রয়ের দোকান পাওয়ার সুবিধা হইবে বলিয়াই দেশের একদল স্বার্থপর লোক এই সমিতি গঠন করিতেছেন। গত মহাযুদ্ধের সময় যাহারা নানা প্রকার অসৎ উপায় অবলম্বন করিয়া বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে অনেকে সহসা কংগ্রেস-সেবী সাজিয়া এই সকল সমিতির মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইতেছেন। মজার কথা এই যে, যাঁহারা সারা জীবন ধরিয়া কংগ্রেস তথা দেশের মুক্তি-আন্দোলনের বিরোধিতা করিয়াছেন, যাঁহারা জীবনে কোনদিন খদ্দর পরিধান করেন নাই—আজ তাঁহারা খদ্দর পরিতে আরম্ভ করিয়াছেন ও দেশসেবক সাজিয়া সমবায় সমিতির মারফত আবার কালো-বাজার চালাইবার আশায় কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এ ব্যাপার দেখিয়া দেশের সাধারণ লোক শঙ্কিত হইয়াছেন। বর্ত্তমান সমবায় মন্ত্রী শ্রীনিকুঞ্জবিহারী মাইতি নিজে কংগ্রেস-সেবক—দেশের জনগণের সুখ-দুঃখের সহিত তাঁহার সংযোগ আছে। কাজেই লোক আশা করে—সমবায় বিভাগে ও সমবায় সমিতিগুলির মধ্যে যাহাতে দুর্নীতি প্রবেশ না করে, সে বিষয়ে সর্ব্বদা অবহিত থাকিয়া তিনি কার্য্য করিবেন। বাঙ্গালা দেশে বহুবার সরকারী চেষ্টায় বহুসংখ্যক করিয়া সমবায় সমিতি গঠিত হইয়াছে এবং দেশের দুর্ভাগ্যের বিষয় যে সে সকল সমিতি দেশবাসীর উপকার সাধন না করিয়া বহু দরিদ্র অধিবাসীর সঞ্চিত অর্থ নষ্টই করিয়াছে। সমবায় ঋণদান সমিতি ও ব্যাঙ্কগুলিও এদেশে আশানুরূপ সাফল্যলাভ করিতে পারে নাই। আজ স্বাধীন দেশে লোক আশা করে, নবগঠিত সমবায় সমিতিগুলি যেন দেশের প্রকৃত উপকার করিতে সমর্থ হয়।

জয়পুরে মঞ্চের উপর উপবিষ্ট রাষ্ট্রপতি। ফটো—পান্না সেন

স্বাস্থ্য সম্মেলন—

গত বড় দিনের ছুটীতে কলিকাতায় এবার বহু চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য সম্মিলন হইয়া গিয়াছে। তাহার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান ছিল—নিখিল ভারত মেডিকেল কনফারেন্সের রজত জয়ন্তী অধিবেশন। গত ২৮শে ডিসেম্বর কলিকাতা মেডিকেল কলেজের মাঠে যুক্তপ্রদেশের গভর্ণর শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু উক্ত সম্মেলনের উদ্বোধন করেন, কাশীবাসী ডাক্তার ক্যাপ্টেন এন-কে চৌধুরী তথায় সভাপতিত্ব করেন ও কলিকাতাবাসী ডাঃ অমলকুমার রায়চৌধুরী অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে প্রতিনিধিগণকে সাদর সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। দেশের বিভিন্ন স্থানের ৮ শত চিকিৎসক সম্মিলনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। দেশে চিকিৎসা-শিক্ষার বিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়িতেছে, চিকিৎসকের সংখ্যা বাড়িতেছে - কিন্তু তাহা দ্বারা দেশ

কতটা লাভবান হইতেছে, তাহা জনসাধারণ বুঝিতে পারে না। চিকিৎসকের দর্শনী কলিকাতার মত সহরে ৩২ টাকা ও ৬৪ টাকা পর্য্যন্ত হইয়াছে এবং মফঃস্বলে ৮ টাকা ও ১৬ টাকায় গিয়া দাঁড়াইয়াছে। গ্রামে এখনও অধিক-সংখ্যক চিকিৎসক যাইতে সম্মত হন না। কংগ্রেসের চেষ্টায় বহু শিক্ষিত চিকিৎসককে গ্রামে প্রেরণের ব্যবস্থা হইয়াছিল বটে, কিন্তু সে চেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই। সকলেই অধিক অর্থ উপার্জ্জনের লোভে সহরের দিকে ছুটিয়া আসে—ফলে গ্রামে রোগীদের চিকিৎসার অভাবে বা অনভিজ্ঞ চিকিৎসকের হাতে পড়িয়া মারা যাইতে হয়। পাশ্চাত্য প্রথায় শিক্ষিত চিকিৎসকগণ শুধু পাশ্চাত্য ঔষধের প্রতিই অনুরাগী হন। ফলে বিলাতী পেটেণ্ট ঔষধ ব্যবহার দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে এবং পাশ্চাত্য প্রথায় শিক্ষিত চিকিৎসকগণকে 'বিলাতী পেটেণ্ট ঔষধের দালাল' ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। দেশ স্বাধীনতা লাভের পর যদি দেশ হইতে এই মনোভাব দূর করার ব্যবস্থা না করা হয়, তবে এই সকল চিকিৎসক-সম্মেলন বা স্বাস্থ্য-সম্মিলনের কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। দেশে খাদ্যাভাবের সঙ্গে সঙ্গে রোগের সংখ্যা বাড়িতেছে—চিকিৎসকগণ দেশী খাদ্য বা ঔষধের ব্যবস্থা না করিয়া শুধু বিলাতী খাদ্য ও বিলাতী ঔষধের ব্যবস্থা দিয়া দেশের যে কত অপকার সাধন করেন, তাঁহারা কি তাহা বুঝিতে সমর্থ হন না। এ দেশে খাদ্য বা ঔষধ প্রস্তুতের কারখানাও আশানুরূপ বৃদ্ধি পায় নাই—এক দল চিকিৎসক যদি সে কার্য্যের ভার গ্রহণ করেন, তাহা হইলে আমরা ক্রমে ক্রমে বিদেশী টিনে-ভরা বা শিশিতে-ভরা খাদ্য ত্যাগ করিতে পারি ও দেশী ঔষধের ব্যবহার দ্বারা বিদেশী ঔষধ ও খাদ্যের আমদানী বন্ধ করিতে পারি, স্বাধীন ভারতে সকলের সে কথা সর্ব্বাগ্রে চিন্তা করা বিশেষ প্রয়োজন।

ট্রামের ভাড়া বৃদ্ধি—

কলিকাতার ট্রাম কোম্পানী গত ১লা জানুয়ারী হইতে প্রথম শ্রেণীর গাড়ীতে যাতায়াতের ও মাসিক টিকিটের ভাড়া বাড়াইয়া দিয়াছেন। যুদ্ধের পূর্ব্বে ট্রামের যাত্রীরা অনেক রকম সুবিধা ভোগ করিতেন। কোম্পানী একে একে সে সকল সুবিধা হইতে—ট্রান্সফার টিকেট, চিপ্ মিড্ ডে ফেয়ার প্রভৃতি—সাধারণকে বঞ্চিত করিয়াছেন। ট্রাম কোম্পানী যে লাভ করেন না তাহা নহে। উক্ত বিলাতী কোম্পানী বৎসরের শেষে বহু টাকা লাভ করিয়া বিদেশে লইয়া যান। অথচ যে সকল কর্ম্মী এখানে ট্রাম চালান, তাঁহাদের উপযুক্ত বেতনাদি দানের কোন ব্যবস্থা নাই। সম্প্রতি এক ট্রাইবিউনাল নিযুক্ত করিয়া শ্রমিকদিগকে সুবিধা দানের অভিনয় করা হইয়াছে বটে, কিন্তু শ্রমিকরা তদ্দ্বারা বিশেষ লাভবান হন নাই। তাহা গত মাসের কয়দিন ধর্ম্মঘট হইতেই বুঝিতে পারা যায়। কোম্পানীর আয় অধিক করার ব্যবস্থা হইল—কিন্তু ব্যয়-বৃদ্ধির কোন ব্যবস্থা হইল না—ইহা দ্বারা কি প্রমাণ হইবে না যে স্বাধীন ভারতেও ধনী দ্বারা শ্রমিকের শোষণ বন্ধ হইবে না। যাহারা ট্রামে চড়েন তাঁহাদেরও এ বিষয়ে কর্ত্তব্য আছে বলিয়া আমরা মনে করি। ট্রামের যাত্রীরা সংঘবদ্ধ হইয়া এই বৈষম্য দূর করার চেষ্টা করিলে কোম্পানীকে বহু অনাচার বন্ধ করিতে বাধ্য করিতে পারেন। আমাদের বিশ্বাস, জাতীয় গভর্ণমেণ্ট ভাড়াবৃদ্ধি ব্যবস্থা মঞ্জুর করার সঙ্গে শ্রমিকগণ ও যাত্রীরা যাহাতে অধিক সুযোগ সুবিধা ভোগ করে, তাহার ব্যবস্থাতেও আর অনবহিত থাকিবেন না।

জয়পুরে মঞ্চের উপর উপবিষ্ট নেতৃবৃন্দ—আচার্য্য কৃপালানী, ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু, ডাঃ কাটজু, শ্রীযুত আনে, মৌলানা আজাদ প্রভৃতি ফটো—পান্না সেন

খাদ্যাভাব ও কর্ত্তব্য—

গত এক বৎসরে ধীরে ধীরে ভারতে খাদ্যাভাবের প্রকোপ বৃদ্ধি পাইয়া ক্রমে আজ তাহা এমন অবস্থায় উপনীত হইয়াছে যে তাহাকে 'দুর্ভিক্ষ' ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। কলিকাতায় চালের দর মণ প্রতি সাড়ে ১৭ টাকা বাঁধা থাকিলেও প্রায় সকল লোককেই ৩০ টাকা মণ দরে চাউল কিনিতে হয় এবং সে চাউলও কলিকাতার পথে পথে বহু স্থানে প্রকাশ্যভাবে বিক্রীত হয়। রেশনের দোকানে যে চাউল দেওয়া হয়, তাহা অধিকাংশ স্থলে অখাদ্য এবং জনপ্রতি সপ্তাহে মাত্র ১ সের ৬ ছটাক। কাজেই ৩০ টাকা মণ দরে কালো বাজারে চাউল ক্রয় করা ছাড়া মানুষের অন্য উপায় নাই। তরিতরকারার মূল্য এত অধিক যে সাধারণ দরিদ্র লোকদিগের পক্ষে তাহা ক্রয় করা সাধ্যাতীত—পৌষ মাসের শেষেও আলুর সের ॥০ আনা, বেগুনের সের ॥০ আনা, কপি দুর্মূল্য, কলাই শুঁটী ৷০ আনা সের। সরিষার তৈল ২ টাকা সেরের কমে পাওয়া যায় না—ঘৃত দুষ্প্রাপ্য। দুধ টাকায় এক সের। শীতকালেও মাছের সের দেড় টাকার কমে নামিল না। ডালগুলি সবই টাকায় ১ সের হইয়াছে। এ অবস্থায় লোক যে না খাইতে পাইয়া মরিয়া যাইবে, তাহা আর বিচিত্র কি? নূতন স্বাধীন দেশের শাসকগণ খাদ্যোৎপাদনে অধিক আগ্রহশীল না হইয়া বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানী ব্যাপারেই অধিক মনোযোগী হইয়াছেন। তাহার ফলে বিদেশ হইতে অত্যধিক দাম দিয়া ভারতে খাদ্য আমদানী করিতে হইতেছে। যে দয়া করিয়া যাহা দেয়, তাহা খাইয়া আমাদের বাঁচিয়া থাকিতে হয়। গত ২ মাস ধরিয়া রেশনের দোকানে যে আতপ চাউল দেওয়া হয়, তাহা কোন দেশ হইতে আমদানী করা হইয়াছে জানি না, তবে ইহা নিঃসঙ্কোচে বলা যায় যে, সে চাল মানুষের গ্রহণের উপযুক্ত নহে। আটা ও ময়দা খাইলেই লোকের উদরাময় হইতেছে—ইহার কোন প্রতীকারের উপায় নাই। কারণ অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশ হইতে যে আটা ও ময়দা আমদানী করা হয়, তাহা যাহাই হউক না কেন, আমাদের তাহা গ্রহণ করিতে হইবে। দেশের অবস্থা যখন এরূপ, তখন আমাদের দেশে দেশসেবক

দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে ১লা জানুয়ারীতে অনুষ্ঠিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের কল্পতরু উৎসবে বক্তৃতারত সভাপতি প্রদেশপাল ডাঃ কাটজু এবং উপবিষ্ট প্রধান অতিথি পণ্ডিত শ্রীগোপেন্দুভূষণ সাংখ্যতীর্থ। ফটো—পান্না সেন

তথা কংগ্রেসকর্ম্মীর দল দেশগঠন কার্য্যে মন না দিয়া শক্তি লাভের আশায় পরস্পরের সহিত কলহ ও বিবাদে উন্মত্ত হইয়াছেন। যদি সত্যই তাহাদের মনে দেশ সেবার আগ্রহ থাকিত, তাহা হইলে তাহারা দেশে যাহাতে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি হয়, সেদিকে মন দিতেন। মহাত্মা গান্ধী চিরদিন বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানী করার বিরোধী ছিলেন—সে জন্য তিনি লোককে সহরের বাস ত্যাগ করিয়া গ্রামে যাইতে উপদেশ দিয়াছিলেন। আজ দেশের শাসন ব্যবস্থা কংগ্রেসের অধীন হওয়ায় গ্রাম হইতে কংগ্রেস-সেবকের দল সহরে আসিয়া অধিক ক্ষমতা লাভের জন্য লোলুপ হইয়াছেন। কি করিয়া আজ দেশবাসীর মনোভাব পরিবর্ত্তন করিয়া অধিক লোককে গ্রামে লইয়া গিয়া কৃষির উন্নতি বিধান করা যায়, তাহাই সকলের একমাত্র চিন্তার বিষয় হওয়া প্রয়োজন। বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্ট দেশের উন্নতি বিধানের জন্য বহু বড় বড় পরিকল্পনা গ্রহণ করিতেছেন বটে, কিন্তু সেগুলি কার্য্যে পরিণত করিতে দীর্ঘ সময় লাগিবে—ততদিন আবার দেশে ৫০ সালের মত দুর্ভিক্ষ আসিয়া পড়িবে—এবারের দুর্ভিক্ষ আর ৫০ লক্ষ লোক মারিয়া সন্তুষ্ট থাকিবে না—আগামী দুর্ভিক্ষে কোটি কোটি লোক মারা যাইবে। ইতিমধ্যে ভারত গভর্ণমেণ্টের কৃষি ও খাদ্য মন্ত্রী দেশকে খাদ্য বিষয়ে আত্মনির্ভরশীল করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছেন। সে চেষ্টা কবে ফলবতী হইবে তাহা মন্ত্রী শ্রীযুত জয়রামদাস দৌলতরামই বলিতে পারেন। আমরা সংবাদপত্রে শুধু তাঁহার বক্তৃতা পাঠ করি—কোন কার্য্যকরী ব্যবস্থা হইতে দেখি না—বাজারে যাইয়া সুলভে খাদ্য ক্রয় করা ত দূরের কথা। দেশের ভবিষ্যৎ খাদ্যাবস্থা চিন্তা করিয়া আমরা শঙ্কিত হইতেছি।

যাদবপুর এঞ্জিনিয়ারিং কলেজের সমাবর্ত্তন উৎসবে ডাঃ কাটজু, শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু, সর্দ্দার বলদেব সিং ও ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ফটো—বীরেন ভাদুড়ী

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস—

গত ৩রা জানুয়ারী হইতে কয়দিন এলাহাবাদে এবার ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৩৫তম বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। পণ্ডিত জহরলাল নেহরু কংগ্রেসের উদ্বোধন করেন এবং যুক্তপ্রদেশের গভর্ণর শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু কংগ্রেসে উপস্থিত থাকিয়া বক্তৃতা করেন। এবারের মূল-সভাপতি ডাক্তার সার কে-এস-কৃষ্ণন জগৎবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক, বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁহার অভিভাষণে অনেক নূতন তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন। পণ্ডিত জহরলাল বৈজ্ঞানিকদিগকে দেশের জনগণের দুঃখদুর্দ্দশা দূর করিবার ব্যবস্থায় অধিক মনোযোগী হইতে উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু আমরা প্রত্যক্ষ জগতে কি দেখিতেছি। বিজ্ঞান এখন পর্য্যন্ত মানুষের সেবার ভার গ্রহণ না করিয়া মানুষের ধ্বংসের পথ সৃষ্টি করিবার জন্য অধিক আগ্রহশীল। জাপানে আমেরিকা অধিক প্রতিপত্তিশালী হইবে, না রুসিয়া জাপানকে গ্রাস করিবে, তাহার বৈজ্ঞানিক উপায় নির্ণয়ে রুসিয়া ও আমেরিকার বৈজ্ঞানিকদিগকে অধিক চিন্তা করিতে হয়। পরাজিত জার্ম্মানীকে ভাগ করিয়া রুসিয়া, ইংরাজ প্রভৃতি কে কতটা অংশ গ্রহণ করিবে, কে তাহার কত অধিক যন্ত্রপাতি দখল করিয়া লইয়া অধিক পরিমাণ মারণাস্ত্র নির্ম্মাণ করিবে, তাহাই জগতের একমাত্র সমস্যা বলিয়া যতদিন বৈজ্ঞানিকগণ মনে করিবে, ততদিন বিজ্ঞানের

উন্নতি জনগণের কল্যাণদায়ক হইতে পারে না। ভারতের বৈজ্ঞানিকগণকেও প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল তাহাদের গবেষণাগার হইতে বাহির করিয়া লইয়া দিল্লীতে সরকারী কার্য্যে লাগাইবার জন্য অধিক আগ্রহশীল। জহরলালকেও কাশ্মীর বা হায়দ্রাবাদের যুদ্ধের জন্যই অধিক চিন্তা করিতে হয়। আবার তিনি নূতন করিয়া সমস্ত দক্ষিণ-এসিয়ার শক্তিকে সংহত করিতে অগ্রসর। এ অবস্থায় তাঁহার গভর্ণমেণ্টের অধীনস্থ বৈজ্ঞানিকগণ মারণাস্ত্র নির্ম্মাণে অধিক আগ্রহশীল হইবে—না জাতিকে রক্ষা করিবার উপায় নির্ণয়ে অধিক সময় নিয়োগ করিবে, তাহাও সমস্যার বিষয়। আমরাও বৈজ্ঞানিকদের ভবিষ্যত চিন্তা করিয়া ব্যথিত হই। এবারকার বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতি ডাঃ কৃষ্ণণ আণবিক শক্তি সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন ও সে বিষয়ে অভিজ্ঞ। তিনি কি সেই আণবিক শক্তি দেশের কল্যাণকর কার্য্যে নিযুক্ত করার কথা চিন্তা করিয়া থাকেন! যদি তিনি তাহা করিতে পারেন, তবেই কংগ্রেসের সভাপতিত্ব করা তাঁহার পক্ষে সার্থক হইবে। আমরা দেশের বৈজ্ঞানিকদিগকে জাতি গঠন কার্য্যে অধিকতর মনোযোগী হইতে দেখিলে তবে মনে করিব যে—ভারতে বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশন সত্যই সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

কলিকাতা লাট প্রাসাদে ইণ্ডিয়ান রেডক্রস্ ওয়েলফেয়ার সার্ভিস প্রদর্শনীতে ভারতের স্বাস্থ্য মন্ত্রী রাজকুমারী অমৃত কাউর, ডাঃ কাটজু, বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ শ্রীউদয়চাঁদ মহাতাব প্রভৃতি

ফটো—অসিত মুখোপাধ্যায়

শিক্ষক সমস্যা—

গত বড়দিনের ছুটীতে ভারতের নানা স্থানে শিক্ষক সম্মিলন হইয়া গিয়াছে। স্বাধীনতা লাভের পর ১৬ মাস অতীত হইলেও এ দেশে শিক্ষকদিগের সম্বন্ধে কর্ত্তৃপক্ষ কোন ব্যবস্থাই করেন নাই। ইংরাজ আমলে শিক্ষকগণ যেমন অনাদৃত ও অবহেলিত ছিল, বর্ত্তমানেও তাহাদের সেই অবস্থাই থাকিয়া গিয়াছে। বিখ্যাত শিক্ষাব্রতী ডাঃ অমরনাথ ঝা মহীশূরে নিখিল-ভারত-শিক্ষক-সম্মিলনে সভাপতি হইয়া বলিয়াছেন—'বভুক্ষু শিক্ষক রাষ্ট্রের পক্ষে বিপজ্জনক।' বহরমপুরে পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সম্মিলনে সভাপতি হইয়া অধ্যাপক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসুও ঐরূপ কথাই বলিয়াছেন। সকল শ্রেণীর লোকের বেতন বৃদ্ধির ব্যবস্থা হইলেও শিক্ষকদের বেতন বর্ত্তমান দুর্দ্দিনে পূর্ব্বের মতই থাকিয়া গিয়াছে। তাঁহারা যে বেতন পান, তাহাতে কোন প্রকারে একটি লোকের গ্রাসাচ্ছাদন চলিতে পারে—সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করা চলে না। বাঙ্গালা দেশে একজন শ্রমিক তাহার নির্দ্দিষ্ট বেতন ছাড়া মাসে ৩০ টাকা মাগ্‌গী ভাতা পাইয়া থাকেন—আর প্রাথমিক শিক্ষকদের মাসিক ৩ টাকা, উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মাসিক টাকা ও কলেজ শিক্ষকদের মাসিক ১০ টাকা ভাতা ব্যবস্থা আছে। গ্রাম্য প্রাথমিক শিক্ষকদের মাসিক বেতন এখনও ১০ বা ১৫ টাকা ধার্য্য আছে—অথচ গ্রামাঞ্চলে যে কোন শ্রমিক দৈনিক ২ টাকার কমে কাজ করে না। এই ব্যবস্থার মধ্যে দেশের শিক্ষার উন্নতিবিধান সম্ভব নায়

শিক্ষকগণের পক্ষে অনাহারে থাকিয়া শিক্ষাদান কার্য্য করা কিছুতেই সমর্থনযোগ্য হইতে পারে না। সম্প্রতি পশ্চিম-বঙ্গ গভর্ণমেণ্টের শিক্ষা বিভাগ উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ের

২রা জানুয়ারী তারিখে আরিয়াদহ (২৪ পরগণা) অনাথ ভাণ্ডারে বার্ষিক শীতবস্ত্র বিতরণ উৎসবে সমবেত শ্রীবিপিনবিহারী গাঙ্গুলী, শ্রীব্যোমকেশ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি।

শিক্ষকগণের যে বেতনের হার প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহাও আদৌ সন্তোষজনক নহে। গ্র্যাজুয়েট শিক্ষকগণের বেতন ৬০ টাকা মাত্র ধার্য্য করা হইয়াছে। নূতন পরিকল্পনা কোন উর্ব্বরমস্তিষ্ক-প্রসূত জানি না, কিন্তু নূতন প্রস্তাবিত হারে বেতন দিয়া কোন স্থানেই বিদ্যালয় পরিচালনা করা সম্ভব হইবে না। প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষকদের বেতনের হার কম বলিয়া ঐ সকল বিদ্যালয়ে এখন আর ভাল শিক্ষক পাওয়া যাইতেছে না। তাহার ফলে প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থার দিন দিন অবনতি ঘটিতেছে। সে জন্য ছাত্রদের মধ্যেও আর শিক্ষায় উৎসাহ দেখা যায় না। শুধু আদর্শবাদের কথা বলিয়া শিক্ষকগণকে তাঁহাদের কার্য্যে প্রবৃত্ত করা চলে না। দেশে পূর্ব্বের অবস্থা নাই। পূর্ব্বে সমাজে শিক্ষক সম্প্রদায়ের যে সম্মানিত স্থান ছিল, তাহাও আর নাই। ছাত্রগণও শিক্ষকদিগকে পূর্ব্বের মত সম্মানিত দৃষ্টিতে দেখেন না বা সেরূপ ব্যবহার করেন না। দেশে এই বিরাট সমস্যার সমাধান না করিলে দেশ কোনদিক দিয়া উন্নতি লাভ করিবে না। যত শীঘ্র সম্ভব সকল শ্রেণীর শিক্ষকদের বেতনের হার পরিবর্ত্তন করিয়া শিক্ষকদের বাঁচিবার উপায় করিয়া না দিলে—দেশে বিদ্যালয় থাকিতে পারে, কিন্তু ছাত্রগণ উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করিয়া মানুষ হইবে না। আমরা এ বিষয়ে পশ্চিম বাঙ্গালার শিক্ষা-মন্ত্রীকে বিশেষভাবে অবহিত হইয়া কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে অনুরোধ করি।

সার আকবর হায়দারী—

আসামের গভর্ণর সার আকবর হায়দারী গত ২৯শে নভেম্বর সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার সময় ইম্ফল হইতে ৩০ মাইল দূরে সহসা রক্তের চাপ বৃদ্ধির ফলে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। তিনি মণিপুর রাজ্যে সফরে গিয়াছিলেন—হঠাৎ অজ্ঞান হইয়া যান্—৫ ঘণ্টা অজ্ঞান থাকার পর মারা গিয়াছেন—ইতিমধ্যে তথায় কোন চিকিৎসার বন্দোবস্ত করা সম্ভব হয় নাই। তাঁহার স্ত্রী, এক পুত্র, এক কন্যা ও জামাতা তাহার সঙ্গে ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার মাত্র ৫৪ বৎসর বয়স হইয়াছিল। তাঁহার পিতা সার আকবর হায়দারীও ভারতবিখ্যাত লোক ছিলেন। গভর্ণর সার আকবর ১৮৯৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন ও আই-সি-এস পাশ করিয়া সরকারী কাজ গ্রহণ করেন। তিনি বহু বৎসর বড়লাটের শাসন পরিষদের সেক্রেটারী ও সদস্য ছিলেন। তিনি এক সুইডেনবাসিনীকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

খেলাধুলা

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

তৃতীয় টেষ্ট খেলা ঃ

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ঃ ৩৬৬ ও ৩৩৬ (৯ উইঃ ডিক্লেয়ার্ড)

ভারতবর্ষ ঃ ২৭২ ও ৩২৫ (৩ উইকেটে)

ক'লকাতায় ইডেন উদ্যানে অনুষ্ঠিত ভারতবর্ষ বনাম ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের তৃতীয় টেষ্ট ম্যাচও অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে প্রথম এবং দ্বিতীয় টেষ্ট ম্যাচের মত। আর দুটি টেষ্ট ম্যাচ বাকি আছে—চতুর্থ টেষ্ট ম্যাচ খেলা হবে মাদ্রাজে ২৭শে জানুয়ারী থেকে এবং পঞ্চম অর্থাৎ শেষ টেষ্ট ম্যাচ খেলাটি বোম্বাইয়ে হবে ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে।

ইডেন উদ্যানে তৃতীয় টেষ্ট ম্যাচ খেলা দেখার জন্য বিপুল জনসমাগম হয়েছিল। ইতিপূর্ব্বে ক'লকাতায় অনুষ্ঠিত কোন ক্রিকেট টেষ্ট ম্যাচ বা অপর কোন খেলাতেও এত অধিক দর্শক সমাগম হয়নি এবং টাকার পরিমাণও এত উঠেনি। উচ্চ মূল্যের সিজন টিকিটও শেষ পর্য্যন্ত নিঃশেষ হয়ে যায়। দশটাকা মূল্যের দৈনিক টিকিটের গেটও দু'একদিন আগে বন্ধ হয়েছিল। এই থেকেই অন্যান্য দৈনিক টিকিটের ভীড়ের অবস্থাটা অনুমান করা যায়। টিকিট না পাওয়ার দরুণ বহু লোককে হতাশ হয়ে বাড়ী ফিরে যেতে হয়। ক'লকাতায় যে ষ্টেডিয়াম একান্তই প্রয়োজন, খেলা পরিচালকমণ্ডলী এবং জনসাধারণ বারম্বার তা অনুভব করছেন। এত বিপুল জনসমাগম হওয়া সত্ত্বেও সৌভাগ্যক্রমে মাঠে বিশেষ কোন আকস্মিক দুর্ঘটনা হয়নি কিম্বা দর্শকদের মধ্যে কোন বড় রকমের উচ্ছৃঙ্খলতা পরিলক্ষিত হয়নি। অত্যন্ত আশার কথা, জনসাধারণের মধ্যে শুভবুদ্ধির উদয় হয়েছে। অনেক অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও ক্রীড়ামোদীরা কোন অখেলোয়াড়ী আচরণের পরিচয় দেয়নি। পরিচালকমণ্ডলীও পূর্ব্বাপর বছরের থেকে দর্শকদের সুখ-সুবিধার প্রতি এবার যথেষ্ট সজাগ দৃষ্টি দিয়েছিলেন। তাই বলে তাঁদের এইখানেই কর্ত্তব্য শেষ হয়েছে বলি না। ক্রীড়া জগতের তীর্থস্থান ক'লকাতায় একটি প্রথম শ্রেণীর খেলার ষ্টেডিয়াম নির্ম্মাণের ব্যবস্থা না হওয়া পর্য্যন্ত জনসাধারণের প্রতি তাঁদের প্রাথমিক কর্ত্তব্য পালন করা হয়েছে একথা কোন মতেই বলা চলে না। তাঁরা যে ব্যবস্থা করেন তা সাময়িক মাত্র, ব্যয়বাহুল্য এবং ব্যবস্থার মধ্যে বহু ক্রটি থেকে যায়। পাকাপাকি একটি খেলার ষ্টেডিয়াম না হ'লে ঐ সব ক্রটি সংশোধন ক'রে জনসাধারণের সহযোগিতা এবং প্রশংসা লাভ করা যায় না। আমরা আশা করি, অবস্থার গুরুত্ব অনুভব করে জাতীয় সরকার, ক'লকাতার বিভিন্ন ক্লাব, ক্রীড়ামোদী, খেলার পরিচালকমণ্ডলী এবং নাগরিকগণ একটি প্রথম শ্রেণীর ষ্টেডিয়াম নির্ম্মাণের কাজ ত্বরান্বিত করবেন।

৩১শে ডিসেম্বর শুক্রবার, ইডেন উদ্যানে বেলা ১০টা ১৫ মিঃ থেকে তৃতীয় টেষ্ট ম্যাচের সূচনা হয়। খেলার নির্দ্দিষ্ট সময় ছিল পাঁচদিন—৩১শে ডিসেম্বর থেকে ১৯৪৯ সালের ৪ঠা জানুয়ারী পর্য্যন্ত। টসে অপর দুটি টেষ্ট ম্যাচের পুনরাবৃত্তি এবারও ঘটলো, ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের অধিনায়ক গডার্ড টসে জয়লাভ ক'রে প্রথমেই ব্যাটিংয়ের সুযোগ নিলেন। বেচারা অমরনাথ দল নিয়ে ফিল্ডিং করতে নামলেন।

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের সূচনা ভাল হ'ল না। দলের মাত্র এক রাণের মাথায় কোন রাণ না করেই ওপনিং ব্যাটসম্যান এ্যাটকিন্‌সন মণ্টু ব্যানার্জ্জির বলে বোল্ড আউট হয়ে যান। এরপর ওপনিং ব্যাটসম্যান রে

ব্যানার্জ্জির বলে ১৫ রাণ করে আউট হলেন। দলের রাণ তখন মাত্র ২৮। তৃতীয় উইকেটে ওয়ালকট এবং উইকসের জুটী খেলার মোড় সম্পূর্ণ ঘুরিয়ে দেয়। ওয়ালকট নিজস্ব ৫৪ রাণ ক'রে দলের ১০৯ রাণে গোলাম আমেদের বলে ক্রসে ক্যাচ তুলে ব্যানার্জ্জির হাতে ধরা পড়ে আউট হ'ন। মধ্যাহ্ন ভোজের সময় ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের তিনটে উইকেট পড়ে মোট ১৩৪ রাণ উঠে। উইকস ৫৬ এবং গোমেজ ৯ রাণ ক'রে নট আউট থাকেন। মধ্যাহ্ন ভোজের পর উইকস শতরাণ পূর্ণ করেন, মোট ১০৮ মিনিট খেলে। এই শতরাণে ১৭টা বাউণ্ডারী ছিল। দলের ১৮৮ রাণে গোমেজ (২৬ রাণ), ২৩৮ রাণে কাক্স (১১ রাণ) আউট হ'ন। এরপর গডার্ডের জুটিতে উইকস তাঁর নিজস্ব ১৫০ রাণ পূর্ণ করেন। এই রাণে বাউণ্ডারী ছিল ২৩টা। দলের ২৮৪ রাণের মাথায় উইকস নিজস্ব ১৬২ রাণ ক'রে গোলাম আমেদের বল ড্রাইভ করতে গিয়ে বোলারের হাতে ধরা পড়ে আউট হয়ে যান। উইকসের রাণে ২৫টি বাউণ্ডারী ছিল। এভার্টন উইকস উপর্যুপরি চারটি টেষ্ট খেলায় শতাধিক রাণ ক'রে অষ্ট্রেলিয়ার জে এটিচ ফিঙ্গলটোন এবং দক্ষিণ আফ্রিকার এ মেলভিল কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত পৃথিবীর রেকর্ডের সঙ্গে নিজের নাম তালিকাভুক্ত করেন। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ বনাম ইংলণ্ডের শেষ খেলাতে উইকস ১৪১ রাণ করেন। তারপর ভারতবর্ষের সঙ্গে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় টেষ্ট ম্যাচে যথাক্রমে ১২৮, ১৯৪ ও ১৬২ রাণ করেন। চা পানের সময় ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের ২৯১ রাণ উঠে ৬ উইকেটে। খেলার নির্দ্দিষ্ট সময়ে ৩৩৯ রাণ উঠে ৭ উইকেটে। নট আউট থাকেন জে গডার্ড এবং ক্যামেরন উভয়েই ২২ রাণ করে। মণ্টু ব্যানার্জ্জি ১০৫ রাণে ৩টে, গোলাম আমেদ ৮৩ রাণে ২টা এবং মানকড় ৭৪ রাণে ২টা উইকেট পান।

১লা জানুয়ারী, ইংরাজী নববর্ষের প্রথম দিন অপর দিকে খেলার দ্বিতীয় দিনে অবশিষ্ট ৩ উইকেটে মাত্র ২৭ রাণ যোগ হওয়ার পর ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের প্রথম ইনিংস ৩৬৬ রাণে শেষ হয়। গডার্ড ৩৯ রাণে নট আউট থাকেন।

বেলা ১১টা ১৭ মিনিটে ভারতীয় দলের প্রথম ইনিংসের খেলা আরম্ভ হয়। কে সি ইব্রাহিম ৪ রাণ ক'রে দলের মাত্র ১২ রাণের মাথায় আউট হন। মুস্তাক আলীর সঙ্গে রো সি মোদী যোগ দিয়ে খেলতে থাকেন। মধ্যাহ্ন ভোজের সময় ভারতবর্ষের ১ উইকেটে ৪৯ রাণ উঠে, মুস্তাক আলী ৩৫ এবং মোদী ১২ রাণ ক'রে নট আউট থাকেন।

বিপুল আনন্দ ধ্বনির মধ্যে মুস্তাক ৫০ রাণ পূর্ণ করেন কিন্তু ৫৪ রাণের মাথায় গডার্ডের বলে বোল্ড হয়ে আউট হন। মোদীর সঙ্গে হাজারে জুটী হন এবং ঐদিনের খেলার শেষ পর্য্যন্ত এই জুটী নট্ আউট থেকে যায়। দ্বিতীয় দিনের খেলার শেষে ভারতীয় দলের ২ উইকেটে ২০২ রাণ উঠে। মোদী ৭৮ এবং হাজারে ৫৯ রাণ ক'রে নট আউট থাকেন।

২রা জানুয়ারী, খেলার তৃতীয় দিনের সূচনা থেকেই ভারতীয় দলের ভাগ্যবিপর্য্যয় দেখা দিল। পূর্ব্বদিনের রাণের স্বপক্ষে আর মাত্র ২ রাণ করে মোদী নিজস্ব ৮০ রাণে আউট হলেন। মোদীই নিজ দলের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী রাণ করেন। হাজারে ঐ দিন কোন রাণ না করেই নিজস্ব ৫৯ রাণে আউট হলেন। মোদী এবং হাজারের জুটী ভেঙ্গে যাওয়ার পর ভারতীয় দলের দারুণ ভাঙ্গন দেখা দিল। মধ্যাহ্নভোজের আগেই মাত্র ৬৮ রাণে ভারতীয় দলের ৮টা উইকেট পড়ে গেল অর্থাৎ পূর্ব্বদিনের রাণের সঙ্গে আর মাত্র ৭০ রাণ যোগ হয়েছিল। সারভাতে শেষ পর্য্যন্ত নট আউট থাকেন। এই বিপর্য্যয়ের কারণ শোনা গেল পূর্ব্বদিন রাত্রিতে নিমন্ত্রণ খেয়ে নাকি কয়েকজন খেলোয়াড় অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন, নিয়মানুবর্ত্তিতা ভঙ্গের শোচনীয় পরিণাম আরও কতদিন দেখতে হবে জানি না।

তৃতীয় দিনের শেষে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের ৩ উইকেটে ১২০ রাণ উঠে। গডার্ড এবং উইকস যথাক্রমে ৬ এবং ৬২ রাণ ক'রে নট আউট থাকেন।

৩রা জানুয়ারী, চতুর্থ দিনের খেলা একাধিক কারণে স্মরণীয়। খেলার প্রথম দিকেই ভারতীয় দল উইকসের ২টি এবং ওয়ালকটের ১টি ক্যাচ নষ্ট করেছে। উইকস তাঁর নিজস্ব ৭১ রাণের মাথায় অমরনাথের বলে স্লিপে যে ক্যাচ তুলেন, হাজারে সে ক্যাচটি ধরতে পারেন নি। অন্যদিকে ওয়ালকট তাঁর নিজস্ব মাত্র ২ রাণের মাথায় ব্যানার্জ্জির বলে যে ক্যাচ তুলেন স্বয়ং অধিনায়ক বলটি ধরে শেষ পর্য্যন্ত হাতে রাখতে না পেরে ফেলে দিয়েছিলেন।

এই তিনটির মধ্যে দুটি ক্যাচ ধরা পড়লে উইকস এবং ওয়ালকটের শত রাণ উঠতো না। অপরদিকে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দল দ্বিতীয় ইনিংসে যে রাণ তুলেছে তা শেষ পর্য্যন্ত হয়তো উঠতো না। অন্ততঃ উইকস এবং ওয়ালকটের মত দু'জন ব্যাটসম্যানকে তিন তিনবার আউট করার সুযোগ নষ্ট ক'রে বিপক্ষদলকে যে নৈতিক বলে বলীয়ান করা হয়েছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। উইকস মধ্যাহ্নভোজের পূর্ব্বে নিজস্ব ১০১ রাণ ক'রে আউট হন এই শতরাণ ক'রে পৃথিবীর টেষ্ট ক্রিকেট ইতিহাসে এভার্টন উইকস এক নতুন রেকর্ড স্থাপন করেছেন। ইতিপূর্ব্বে অপর কোন ক্রিকেট খেলোয়াড় টেষ্টম্যাচে উপর্যুপরি পাঁচবার সেঞ্চুরী করতে পারেন নি। একমাত্র উইকস এই প্রথম সেই সম্মানের অধিকারী হয়েছেন। দ্বিতীয় ইনিংসে শত রাণ পূর্ণ করার পর আর মাত্র এক রাণ তিনি যোগ করেন এবং গোলাম আমেদের হাতে 'কট এ্যাণ্ড বোল্ড আউট' হ'য়ে বিদায় গ্রহণ করেন।

মধ্যাহ্নভোজের সময় ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের ১৩৯ রাণ উঠে ৫ উইকেটে। গোমেজ ২৬ এবং ওয়ালকট ৪৪ রাণে নট আউট থাকেন।

মধ্যাহ্নভোজের পর গোমেজ ক্রিশ্চিয়ানী এবং ক্যামেরণ আউট হয়ে যান। ওয়ালকট উভয় দলের মধ্যে এই টেষ্ট খেলায় সর্ব্বপ্রথম ওভার বাউণ্ডারী করেন অমরনাথের বলে নিজস্ব ৮৭ রাণের মাথায়; এরপর মানকড়ের বলে ষ্ট্রেট ড্রাইভ ক'রে দ্বিতীয়বার ওভার বাউণ্ডারী করেন কিন্তু পুনরায় মানকড়ের বল ওভার বাউণ্ডারীতে পাঠাতে গিয়ে বাউণ্ডারী সীমানায় অমরনাথের হাতে ধরা পড়ে আউট হন ১০৮ রাণ ক'রে। ভারতবর্ষে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের সফরে ওয়ালকটের নিজস্ব এক হাজার সম্পূর্ণ রাণ পূর্ণ হয়। ওয়ালকট আউট হবার পর গডার্ড ৯ উইকেটের ৩৩৬ রাণে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা ডিক্লেয়ার্ড করেন।

ভারতীয় দলের দ্বিতীয় ইনিংসে কোন উইকেট না পড়ে চতুর্থ দিনের শেষে ৬৬ রাণ উঠে। মুস্তাক আলী এবং ইব্রাহিম যথাক্রমে ৪৫ এবং ২১ রাণ ক'রে নট আউট থাকেন।

৪ঠা জানুয়ারী, টেষ্ট ম্যাচের পঞ্চম দিন অর্থাৎ শেষ দিনের খেলা বিশেষ আকর্ষণীয় হয়ে উঠে মুস্তাক আলীর ব্যাটিং নৈপুণ্যে এবং খেলার শেষ ফলাফল দেখার আগ্রহে। মুস্তাক আলী উইকেটের চারিদিকে চমৎকার খেলে নিজস্ব ১০৬ রাণ করেন। এই রাণ সংখ্যায় ৯টি বাউণ্ডারী ছিল। শেষ দিনের খেলা দেখবার জন্য মাঠে বিপুল জনসমাগম হয় এবং মুস্তাক আলীর শতরাণ পূর্ণ হওয়ার সময় উদ্যানটি আনন্দে মুখরিত হয়ে উঠে, এবং তার পূর্ণচ্ছেদ ঘটতে সময় নেয়। মধ্যাহ্নভোজের সময় ভারতীয় দলের দু' উইকেটে ১৭৮ রাণ উঠে। মুস্তাক আলী ১০৬ এবং ইব্রাহিম ২৫ রাণ করে আউট হন। অপরদিক নট আউট থাকেন মোদী ও হাজারে যথাক্রমে ৩৬ ও ৭ রাণ ক'রে।

মুস্তাক আলীর আউট হবার পর মোদীর শতরাণ দেখার জন্য দর্শকবৃন্দ উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠে। কিন্তু সহযোগী হাজারের অসহযোগের দরুণ মোদী শেষ পর্য্যন্ত শতরাণ করতে সক্ষম হ'ন না, ৮৭ রাণে গডার্ডের বলে ক্রিশ্চিয়ানীর হাতে ধরা পড়েন। ইতিপূর্ব্বে তিনি দু'বার আউট হ'তে গিয়ে রক্ষা পান। মোদীকে রাণ তোলার ব্যাপারে হাজারের অখেলোয়াড়ী মনোভাব দর্শকবৃন্দকে উত্তেজিত করে তুলেছিলো। অনেকের কাছে হাজারের খেলা দৃষ্টিকটু হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। মোদী আউট হ'লে অমরনাথ হাজারের জুটি হন।

চা-পানের সময় ভারতীয়দলের ৩ উইকেটে ২৭৩ রাণ উঠে। স্কোরবোর্ডে রাণ উঠেছিল হাজারের ৩৪ এবং অমরনাথের ৬ রাণ উভয়েই নট আউট।

নির্দ্দিষ্ট সময়ে খেলা শেষ হলে দেখা গেল ভারতীয়দলের ৩ উইকেটে ৩২৫ রাণ উঠেছে। হাজারে এবং অমরনাথ যথাক্রমে ৫৮ ও ৩৪ রাণ ক'রে নট আউট রইলেন।

পঞ্চম দিনের নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ভারতীয়দলের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা শেষ করার জন্যে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের অধিনায়ক গডার্ড যথাসাধ্য চেষ্টা করেন কিন্তু ভারতীয়দলের দৃঢ়তায় তা শেষ পর্য্যন্ত ব্যর্থ হয়ে যায়।

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের ফিল্ডিং দর্শকদের চমৎকৃত করেছিলো, তুলনায় আমাদের ফিল্ডিং অনেক খারাপ হয়েছিলো।

দ্বিতীয় টেষ্ট ম্যাচ ঃ

বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত ভারতীয়দল বনাম ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের দ্বিতীয় টেষ্ট ম্যাচ খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়।

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ঃ ৬২৯ (৬ উইকেট ; উইকস ১৯৪ এ রে ১০৪, ষ্টল মেয়ার ৬৬, ওয়ালকট ৬৮, ক্রিশ্চিয়ানী ৭৪, ক্যামেরন ৭০। মানকড় ২০২ রাণে ৩টি উইকেট পান)

ভারতবর্ষ ঃ ২৭৩ (ফাদকার ৭৪। ফার্গুসন ১২৬ রাণে ৪ উইকেট পান) ও ৩৩৩ (৩ উইকেট ; আর এস মোদী ১১২, হাজারে নট আউট ১৩৪ এবং অমরনাথ নট আউট ৫৮।)

ডন্ ব্র্যাডম্যান ঃ

খ্যাতনামা ক্রিকেট খেলোয়াড় এবং অষ্ট্রেলিয়া দলের অধিনায়ক ডন্ ব্র্যাডম্যানকে ইংরাজী নববর্ষে 'নাইট' উপাধি দ্বারা সম্মানিত করা হয়েছে।

টেষ্টে উপর্যুপরি সেঞ্চুরীর রেকর্ড ঃ

জে এইচ ফিঙ্গলটোন (অষ্ট্রেলিয়া) : ১৯৩৫-১৯৩৬ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে টেষ্ট ম্যাচে কেপটাউনে ১১২ রাণ, জোয়ান্সবার্গে ১০৮ এবং ডারবানে ১১৮ রাণ এবং ১৯৩৬-৩৭ সালে ইংলণ্ডের বিপক্ষে টেষ্ট ম্যাচে ব্রসবনে ১০০ রাণ। মোট ৪টি সেঞ্চুরী।

এ মেলভীল (দক্ষিণ আফ্রিকা) : ১৯৩৮-৩৯ সালে ইংলণ্ডের বিপক্ষে ডারবানে ১০৩ এবং ১৯৪৭ সালে নটিংহামে ১৮৯ এবং ১০৪ এবং লর্ডসে ১১৭ রাণ। মোট ৪টি সেঞ্চুরী।

ই উইকস (ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ) : ১৯৪৮ সালে ইংলণ্ডের বিপক্ষে কিংসটোনে ১৪১ এবং ১৯৪৮-৪৯ সালে ভারতবর্ষের বিপক্ষে দিল্লীতে ১২৮, বোম্বাইতে ১৯৪, ক'লকাতায় তৃতীয় টেষ্ট ম্যাচের প্রথম ইনিংসে ১৬২ এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ১০১ রাণ। ই উইকস উপর্য্যুপরি পাঁচবার টেষ্ট ম্যাচে শতাধিক রাণ ক'রে পৃথিবীর রেকর্ড স্থাপন করেছেন।

ইংলণ্ড—দক্ষিণ আফ্রিকা ঃ

দ্বিতীয় টেষ্ট : ইংলণ্ড : ৬০৮। ওয়াসব্রুক ১৯৫, হাটন ১৫৮, ডেনিস কম্পটন ১১৪। ম্যাকার্থি ১০২ রাণে ৩ এবং ম্যান ১০৭ রাণে ৩ উইঃ)

দক্ষিণ আফ্রিকা : ৩১৫ (মিচেল ৮৬, ওয়েড ৮৫। জেঙ্কিনস ৮৮ রাণে ৩ এবং রাইট ১০৪ রাণে ৩ উইঃ) ও ২৭০ (ই রোয়েন ১৫৬ নট আউট, ডি নোর্স ৫৬ নট আউট)।

ইংলণ্ড-বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা দলের দ্বিতীয় টেষ্ট ম্যাচ খেলা ড্র গেছে।

তৃতীয় টেষ্ট ম্যাচ : ইংলণ্ড : ৩০৮—প্রথম ইনিংস (ওয়াসব্রুক ৭৪। রোয়েন ৮০ রাণে ৫ উইঃ) ও ২৭৬ —দ্বিতীয় ইনিংস (৩ উইঃ ডিক্লেয়ার্ড)।

দক্ষিণ আফ্রিকা : ৩৫৬—প্রথম ইনিংস (বি মিচেল ১২০, এ ডি নোর্স ১১২। কম্পটন ৭০ রাণে ৫ উইঃ) ও ১৪৪—দ্বিতীয় ইনিংস (৯ উইঃ)।

টেনিস ঃ

ন্যাশনাল টেনিস চ্যাম্পিয়ানসীপ প্রতিযোগিতার ফলাফল :

পুরুষদের সিঙ্গলসে দিলীপ বসু ৩-৬, ৬-১, ৬-৩, ৮-৬ গেমে ভারতবর্ষের এক নম্বর খেলোয়াড় সুমন্ত মিশ্রকে পরাজিত করেন

মিক্সড ডবলসে সুমন্ত মিশ্র ও শ্রীমতী মোদী ৭-৫ ও ৬-৯ গেমে দিলীপ বসু ও শ্রীমতী কে সিংকে পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডবলসে দিলীপ বসু ও নরেন্দ্রনাথ ৭-৫, ৬-২ এবং ৬-৯ গেমে সুমন্ত মিশ্র এবং রমা রাওকে পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিঙ্গলসে শ্রীমতী কে সিংহ ৩-৬, ৯-৭ এবং ৬-৩ গেমে কুমারী পি খান্নাকে পরাজিত করেন।

টেষ্টে উভয় ইনিংসে সেঞ্চুরী ঃ

এ পর্য্যন্ত ১৩ জন ক্রিকেট খেলোয়াড় ক্রিকেট টেষ্ট ম্যাচের ইতিহাসে একই টেষ্ট ম্যাচের উভয় ইনিংসের খেলাতেই সেঞ্চুরী করেছেন। সর্বশেষ এই কৃতিত্ব অর্জন করেছেন ই উইকস ইডেন উদ্যানে অনুষ্ঠিত ভারতবর্ষ বনাম ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের তৃতীয় টেষ্ট খেলাতে। একমাত্র হার্বার্ট সাটক্লিফ এবং জর্জ হেডলে ছাড়া অপর কোন ক্রিকেট খেলোয়াড় জীবনে দু'বার এই সম্মান লাভ করতে পারেননি। ভবিষ্যতে এ রেকর্ডও হয়তো আর থাকবে না।

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

বনফুল প্রণীত চিত্র-নাট্য "মন্ত্র-মুগ্ধ"—২.
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত সচিত্র ঐতিহাসিক-চিত্র "দিল্লীশ্বরী"—২.
শ্রীউপেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত উপন্যাস "একক"
শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত উপন্যাস "অন্তরীপ"—৩.

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শিল্পী—শ্রীসুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়   মগ্ন.   ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

নয়া পটচিত্রে মাতা

নয়া পটচিত্রের মাতা ব্যাপক বিজ্ঞপ্তি লাভের পর, নবতম সংবাদ সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, গরীব মাতা নাকি ধনী মাতা অপেক্ষা অধিকতর স্নেহময়ী হইয়া থাকেন

দৈন্যের জয় হউক।

শিল্পী— শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

ভারতবর্ষ

ফাল্গুন—১৩৫৫

দ্বিতীয় খণ্ড | ষট্‌ত্রিংশ বর্ষ | তৃতীয় সংখ্যা

কৃষি-সংস্কার ও ভূমির পুনর্বণ্টন

শ্রীশ্যামাপদ চট্টোপাধ্যায় বি-এল

জমিদারীপ্রথার বিলোপের পর কিরূপভাবে জমির পুনর্বণ্টন হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে ধীরভাবে বিবেচনা দরকার। ভারতের পল্লীবাসীদের অধিকাংশই কৃষিজীবী। কৃষিজীবী বলতে—যারা নিজেরা কৃষি কার্য্য করে বা কৃষি কার্যের দ্বারা উৎপন্ন ফসলের অংশ গ্রহণ করে জীবিকা অর্জন করে, তাদের বুঝায়। এই সংজ্ঞা অনুসারে কৃষিজীবীদের নিচের কয়েক শ্রেণীতে ভাগ করা চলতে পারে :

(ক) যারা কৃষি কার্যের দ্বারা উৎপন্ন ফসলের অংশ গ্রহণ করে—(১) জমিদার, (২) মধ্যস্বত্বাধিকারী, (৩) যারা আধিদার দিয়ে চাষ করায়।

(খ) যারা নিজেরা কৃষি কার্য করে—(১) যাদের খুব বেশি জমি আছে, (২। স্বল্প ভূমিবিশিষ্ট কৃষক, (৩) ভূমিহীন কৃষিজীবী।

প্রতি বৎসর বিদেশ থেকে খাদ্যশস্য আমদানী করতে হয়। যদি দেশে খাদ্যশস্য অধিক উৎপন্ন হয় তাহলে বিদেশ থেকে খাদ্যশস্য আমদানী করতে হবে না। ফলে দেশের অনেক টাকা বেঁচে যাবে। অধিক ফসল উৎপন্ন করতে গেলে (১) বর্তমানে যে কৃষি-উপযোগী জমি আছে সেগুলিতে যাতে সারা বছর ধরে চাষ চলে তার জন্য (ক) জল সেচের ব্যবস্থা, (খ) বন্যা নিরোধের ব্যবস্থা, (গ) উপযুক্ত বীজ ও সারের ব্যবস্থা করতে হয়; (২) পতিত জমিকে কৃষি-উপযোগী করে তুলতে হয়। এই গেল জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধির কথা। এটা করতেই হবে। তা না করলে ঘাটতি নিবারিত হবে না।

কিন্তু ঘাটতি নিবারণের অর্থ জনসাধারণের কষ্ট নিবারণ নয়। যাদের যা আছে তাদের যদি তাই থাকতে দেওয়া

হয় এবং যাদের নাই তাদের মধ্যে যদি জমি বিতরণ না করা হয়, তাহলে ভূমিহীন কৃষিজীবী অথবা স্বল্পভূমিবিশিষ্ট কৃষিজীবীর অবস্থার কোনো পার্থক্য হবে না। ভূমির পুনর্বণ্টন সমস্যার সমাধান সরকারের মূল নীতির উপর নির্ভরশীল। এই সমস্যাকে একক ভাবে বিচার করতে যাওয়ার অর্থ প্রকৃত সমস্যাকে চাপা দেওয়া, কিম্বা দেশের নাগরিকদের ভাগ্যের কবলে নিক্ষেপ করা।

সরকার যদি ভারতের প্রতি নাগরিকের অন্নবস্ত্রাদির ভার গ্রহণ করেন, তাহলে একরকম ভাবে ভূমি বণ্টন করা চলবে, আর তা যদি না করেন তাহলে আর এক রকম ভাবে ভূমি বণ্টন করা চলবে। দ্বিতীয় প্রকারের ভূমি বণ্টনের সংগে জনমতের কোনো সম্পর্ক নাই। জমিদার, ব্যবসায়ী, জোতদার এবং সহুরে বাবুরা বা চাকরে বাবুরা তার পরিপোষকতা করবে

আমরা প্রথম প্রকারের ভূমি বণ্টন নিয়ে আলোচনা করব। আমরা ধরে নিচ্ছি যে, স্বাধীন ভারতে বেকার বলতে কেউ থাকবে না। সকলে সাধ্যানুরূপ পরিশ্রম করে জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি করবে। বিনিময়ে সরকার সকলের ভরণপোষণের ভার গ্রহণ করবেন।

সরকার প্রত্যেকের ভরণপোষণের ভার গ্রহণ করবেন, অথচ ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকবে, তা হতে পারে না। কারণ এ দুটা পরস্পর বিরোধী। যার যা আছে তা সরকারের হেফাজতে গিয়ে জাতীয় সম্পদে পরিণত না হলে সরকার সকলের ভরণপোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারেন না। ব্যক্তিগত সম্পত্তি সরকারের হাতে এলে সেই সম্পত্তি দিয়ে সরকার দরকারী যন্ত্রপাতি খরিদ করে দেশের প্রয়োজনীয় পদার্থ উৎপাদনোপযোগী কল-কারখানাদি স্থাপন করতে পারবেন, কৃষি কার্যেরও উন্নতিবিধান করা চলবে। সরকার যদি সত্যই সদাশয় হন এবং দেশের জনসাধারণের দারিদ্র্য দূর করতে চান, তাহলে ব্যক্তিগত সম্পত্তিপ্রথা লোপ করতে ভীত হবেন না বা দেরী করবেন না। কথাটা কমিউনিজম্ অনুযায়ী হলেও তা কিছু জনস্বার্থবিরোধী বা পাপজনক কথা নয়। 'কমিউনিজম' নীতি হিসাবে অপাংক্তেয় নয়, তা কমিউনিস্টদের নীতি—যাই হোক। যাদের আছে তারাই কমিউনিজম আতংকগ্রস্ত। যারা ভালো ভাবে খেতে পরতে পায়, ভারত সরকার যদি তাদের দিকেই ঢলে থাকেন—তাহলে ভারতের অগণিত দরিদ্র জনসাধারণ রাষ্ট্রের কর্ণধারদের আপনার লোক মনে করতে পারবে না। স্বাধীনতা সুবিধাপ্রাপ্ত মুষ্টিমেয় ধনী ও বুদ্ধিজীবীর জন্যই নয়। সরকার সত্যই জনস্বার্থানুকুল কিনা, তার পরিচয় মিলে সরকারী নীতিতে। সরকার যদি প্রত্যেকের ভরণপোষণের ভার গ্রহণ করেন এবং তার জন্য যা করা দরকার তাই করেন, তাহলেই সরকারকে গণ-সরকার বলতে পারব।

জমিদারেরা মধ্যস্বত্বাধিকারী ও রায়তদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করে থাকেন। সেই খাজনার কিয়দংশ রাজস্ব হিসেবে সরকারকে দিতে হয়। জমিদারীপ্রথার বিলোপ হলে খাজনার সমস্তটাই সরকার পাবেন। জমিদার অপেক্ষা সরকারের আদায়ী খরচ যদি কম হয়, তাহলে রাজস্বের পরিমাণ বেশি হবে। সেই বেশি রাজস্বটা ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধির জন্য এবং কৃষি-উপযোগী জমির পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য ব্যয়িত হলে ফসল বেশি উৎপন্ন হবে। কিন্তু জমিদারদের চলবে কি করে? জমিদাররা বলবেন, জমিদারী আমার ব্যক্তিগত সম্পত্তি। ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপরই যদি তোমরা বিরূপ, তাহলে ব্যবসায়ীদের জমানো টাকা বাজেয়াপ্ত কর, কলকারখানার লভ্যাংশ সরকারের হোক, বেশি মাহিনার কর্মচারী রেখো না, মহাজনদের টাকা বাজেয়াপ্ত কর, ইত্যাদি।

জমিদারদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার অর্থ সুবিধাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের আরো সুবিধা দেওয়া। জমিদারেরা সামাজিক ও রাষ্ট্রিক অধম ব্যবস্থার ফলে যেমনভাবে দিন যাপন করেছে, স্বাধীন ভারতে তাদের তা করতে দেওয়া হবে না। তাঁরাও নিজেদের জনসাধারণের পর্যায়ভুক্ত বলে মনে করুন এবং দেশের জনসাধারণের মতো নিজেরাও চলুন। দেশের যারা খেতে পাচ্ছে না, তাদের খাওয়াতে হলে অর্থের দরকার। সে অর্থ আকাশ থেকে পড়বে না, বিদেশীরা তা নিঃস্বার্থ ভাবে ভারতকে দিয়েও দিবে না। ভারতের যাদের যা আছে তাই নিয়েই সকলের অভাব মোচনের চেষ্টা করতে হবে। তার জন্য প্রত্যেক ভারতবাসীকে—যতদিন পর্যন্ত অনুরূপ ব্যবস্থা না হয় ততদিন পর্যন্ত—যদি আধপেটা খেয়ে থাকতে হয় বা অর্ধনগ্ন অবস্থায় থাকতে হয় জনস্বার্থের খাতিরে তাও সকলকে স্বীকার করে নিতে হবে এবং

যাতে প্রত্যেকে তা স্বীকার করতে বাধ্য হয় সরকারকে এম্নি ভাবে আইন প্রণয়ন ও রাষ্ট্র পরিচালন করতে হবে। অতএব ক্ষতিপূরণের প্রশ্ন আসে না।

মধ্য-স্বত্বাধিকারীর স্বত্ব জমিদারেরই মতো। জমিদারকে যদি ক্ষতিপূরণ দেওয়া না হয় তাহলে মধ্য-স্বত্বাধিকারীকেও দেওয়া উচিত নয়।

যারা আধিদার দিয়ে চাষ করায় তাদের তিন শ্রেণীতে ফেলা যায়, (১) যারা বিদেশে চাকরি করে, (২) যারা বিধবা, নাবালক বা অকর্মণ্য (৩) যাদের জমি কম বা যারা খরচের অভাবে কৃষি-সরঞ্জাম কিনতে পারে না।

যারা বিদেশে চাকরি করে তাদের কেউ কেউ বেশি বেতন পেয়ে থাকে এবং বেতনের দ্বারাই তাদের সংসারের খরচ চলে যায়। কৃষি থেকে যা আয় সেটা তাদের বাঁচে। এ রকম চাকুরে যারা তাদের জমি—যাদের জমি নাই তাদের মধ্যে বিলি করে দেওয়া উচিত।

যারা বিধবা, নাবালক বা অকমণ্য, তাদের জমি বাজেয়াপ্ত করলে তাদের সম্পূর্ণ দায়িত্ব সরকারকে গ্রহণ করতে হয়।

যাদের জমি কম তাদের উপযুক্ত পরিমাণে জমি দিতে হবে এবং যারা খরচের অভাবে স্বয়ং চাষ করতে পারে না তাদের খরচ দিতে হবে।

বেশি পরিমাণে জমি থাকলেই যে বেশি পরিমাণে ফসল উৎপন্ন হবে তা নয়। জমির পরিমাণের উপর ভিত্তি না করে জমির উৎপাদিকা-শক্তির উপর ভিত্তি করে ভূমির বণ্টন হওয়া উচিত। কোনো স্থানের জমি ভালো, কোনো স্থানের জমি খারাপ। যে স্থানের জমি ভালো সে স্থানের অল্প পরিমাণ জমিতে বেশি ফসল উৎপন্ন হবে, যে স্থানের জমি খারাপ সে স্থানে বেশি পরিমাণ জমিতে অল্প পরিমাণ ফসল উৎপন্ন হবে। তা ছাড়া এক-ফসল ও একাধিক-ফসল জমি থাকতে পারে। কি পরিমাণ ফসল হলে একএক জনের খাওয়া-পরা ও অন্যান্য খরচ চলতে পারে, তা স্থির করে সেই পরিমাণ ফসল-উৎপাদনোপযোগী জমি জন পিছু কৃষকের হাতে রাখা উচিত। ফসলের বিনিময়ে কৃষককে অন্যান্য দ্রব্য ক্রয় করতে হয়। অতএব ফসলের সংগে অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের আনুপাতিক মূল্য নির্ধারিত থাকা দরকার। মোট কথা, স্বাধীন ভারতে কোনো ব্যাপারই অস্পষ্ট রাখা চলতে পারে না।

যাদের জমি কম বা যাদের মোটেই জমি নাই অথচ যারা জমির উপর নির্ভরশীল, তাদের সমস্যাই আসল সমস্যা। সংখ্যায় তারাই বেশি; অর্ধাহারে, অনাহারে তারাই মরে, দুর্ভিক্ষ হলে প্রথম ধাক্কাটা তাদের উপরই পড়ে। প্রকৃত জনসাধারণ বলতে তাদেরই বুঝায়। কৃষি-সংস্কারের দ্বারা বা ভূমির পুনর্বণ্টনের দ্বারা যদি তাদের সমস্যার সমাধান না হয়, তাহলে ভারতে প্রকৃত গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা কখনো হতে পারে না। তাদের উন্নতি করা যেতে পারে দু' উপায়ে—(১) ভূমির উপর চাপ কমিয়ে তাদের অন্য কর্মে নিযুক্ত করা, (২) তাদের মধ্যে উপযুক্ত পরিমাণে জমি বিলি করা।

তাদের অন্য কর্মে নিযুক্ত করতে গেলে পরিশ্রমোপজীবীদের দৈহিক শ্রম করতে বাধ্য করতে হয়। পল্লীর অধিবাসীদের অধিকাংশ কৃষিজীবী। কৃষিকার্যের জন্য তারা ভূমিহীন কৃষি-শ্রমিকদের উপর নির্ভর করে। কৃষি-শ্রমিকদের অন্য কর্মে নিযুক্ত করলে মধ্যবিত্তদের নিজ হাতে লাঙ্গল ধরতে হয়। তাতে আপত্তির কিছুই নাই। সে রকম ব্যবস্থা আইন করে করলে দেশের শ্রমশক্তির অপচয় নিবারিত হবে। কেউ গায়ে ফুঁ দিয়ে ঘুরে বেড়াবে, আর অপরে তার জন্য প্রাণান্ত পরিশ্রম করবে, এই ব্যবস্থা যত শীঘ্র লোপ পাবে, তত শীঘ্র দেশের মঙ্গল হবে।

তাদের মধ্যে উপযুক্ত পরিমাণ জমি বিলি করলে জমির পরিমাণ ও উৎপাদিকা শক্তি বাড়াতে হবে এবং তা করলেও মধ্যবিত্তদের নিজ হাতে জমি চষতে হবে। কারণ কৃষি-শ্রমিকরা জমি পেলে তারা নিজের জমিই চাষ করবে, পরের জমিতে খাটতে যাবে না।

ভূমি বণ্টন সমস্যার সমাধান বিচ্ছিন্ন ভাবে করা যেতে পারে না। ভূমির সংগে সংশ্লিষ্ট অপরাপর সমস্যার সমাধান একই সংগে করলে তবে সে সমাধান প্রকৃত সমাধান হবে। অন্য সব সংশ্লিষ্ট সমস্যার সমাধান একই সংগে হবে এই মেনে নিলে নিচের সমাধানটি সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত মনে হয়।

সমস্ত জমিই রাষ্ট্রের সম্পত্তি। প্রতি মৌজায় জমির পরিমাণ, উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ, কৃষি-কর্মীর সংখ্যা, জন-

সংখ্যা ও প্রয়োজনীয় ফসলের পরিমাণ সর্বাগ্রে স্থির করতে হবে। জমির পরিমাণ কম এবং কৃষিকর্মীর সংখ্যা বেশি হলে কর্মীর সংখ্যা কমিয়ে তাদের অন্যত্র পাঠাতে হবে, না হয় জমির পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে। জমি চাষ হবে একত্রে। কৃষি-কার্য পরিচালনার ভার থাকবে য়ুনিয়ন বোর্ডের উপর। কৃষি কার্যের জন্য যা খরচ হবে, তা বোর্ডের মারফৎ সরকার বহন করবেন। সমষ্টিগতভাবে চাষ হবে। যে যে পরিমাণ শ্রম নিয়োগ করবে, সে সেই পরিমাণ ফসলের অংশ পাবে। নিম্নতম ও উচ্চতম অংশের পরিমাণ নির্দিষ্ট থাকবে। য়ুনিয়ন বোর্ডের উপর যাবতীয় ব্যবস্থার ভার থাকবে। বোর্ডের তহবিলে প্রতি বৎসর উৎপন্ন ফসলের একটা নির্দিষ্ট অংশ রাজস্ব হিসেবে জমা রাখতে হবে। যারা অকর্মণ্য বা রোগগ্রস্ত, বোর্ড তাদের ভরণ পোষণের ব্যবস্থা করবে।

গ্রামে কেউ নিষ্কর্মা বসে থাকতে পারবে না। গ্রামের প্রতি নর-নারীকে দৈহিক পরিশ্রম করে কৃষিকার্য করতে হবে, কৃষি-উপযোগী জমির পরিমাণ বাড়াতে হবে, জলাশয় খনন করতে হবে। একত্রে পরিশ্রম করে প্রতি পরিবারের জন্য স্বাস্থ্যকর গৃহ নির্মাণ করতে হবে, বিদ্যালয়, চিকিৎসালয় প্রভৃতি নিজেদেরই তৈরী করতে হবে।

ভারতের শতকরা সাতাশীজন পল্লীগ্রামে বাস করেন, তাঁরা বড় জোর বছরে ছ'মাস পরিশ্রম করেন। বাকী সময়টা কর্মাভাবে বেকার বসে থাকেন। এই বিরাট শ্রমশক্তিকে যদি উপযুক্তভাবে কাজে লাগানো যায় তাহলে ভারতের সব সমস্যারই ধীরে ধীরে সমাধান হয়ে যাবে। তবে ইচ্ছা করে কেউ খাটতে যাবে না। সেই জন্য আইন করে তাদের খাটতে বাধ্য করতে হবে। বিনিময়ে সরকার তাদের সকল দায়িত্ব গ্রহণ করবেন।

কৃষিকার্যের জন্য সকলের শ্রমের দরকার না হলে উদ্বৃত্তদের অন্য কর্মে নিযুক্ত করতে হবে। শাসন কার্য পরিচালকেরা যদি সত্যই জনকল্যাণ চান তাহলে এই প্রস্তাবের মধ্যে অন্যায়ের কিছু দেখিতে পাবেন না।

ফাল্গুনী

শ্রীজ্যোৎস্নানাথ চন্দ এম-এ, বি-এল্

আজ্‌কে প্রিয় ফাগুন-হাওয়া
আগুন দিল ছিটিয়ে,
তারার দলের কিস্‌-কিসানির
পিয়াস্ যত মিটিয়ে!
আলোর ঝারি পড়্‌ল নুয়ে
হৃদয় কাঁপে তার বুকটা ছুঁয়ে—
কান্না-হাসির দোদুল্ দোলা
থাম্‌লো যে গো এক নিমেষে!

২

সুপ্ত বুকের সুরের আগুন
ফাগুন্ নিল ছিনিয়ে,
ঝাঁপ্‌সা হ'ল আঁখির আলো
চল্‌ব আমি কি নিয়ে?
আজ্‌কে আসর ফুল-বনে
নানান্ সুরের গুঞ্জনে—
বুঁজ্‌ব আঁখি আন্‌-মনে
ফুল-পরীদের দীপ্ত দেশে!

ফুল-দোলাতে রাত-কাটানো
আজ্‌কে সখি শেষ,
উতল্ হাওয়া কয় যে কেঁদে
এখন হল বেশ!
নীলিম্-কোণে বাজ্‌ল বাঁশী
উঠ্‌লো দুলে কান্না-হাসি—
ফাগুন তুমি ফাগের রঙে
রাঙ্‌লে বুঝি রক্ত-কমল!

৩

কোন্ গালে হায় রং বুলোল
চম্‌কা ফাগুন হাওয়া?
কোন্ বুকে আজ মুখ লুকিয়ে
ঘুচ্‌লো সকল চাওয়া!
ডালিম-রাঙা গালটী কার
আনন্দে টেনে মুখের ধার?
কোন্ তারারই চাউনিটী
শুক্‌নো আঁখি কর্‌লো সজল?

শিলালিপি

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

—চৌদ্দ—

মাটির তলার অন্ধকারের নতুন জীবনের আর এক অধ্যায়।

সারাদিন কাটল একটা জঙ্গলের মধ্যে। যা চেহারা খুলেছে দিনে পথ দিয়ে চলা যাবেনা। বুকের কাছে জামাটায় রক্তের দাগ লেগেছে—বেণুদার রক্ত! পায়ে জুতো নেই, পরণের কাপড়টা ছিঁড়ে টুকরো হয়ে গেছে। নিতান্ত নির্বোধ লোকের চোখ পড়লেও সন্দেহ জেগে উঠবে তার।

যেমন ক্ষিদে—তেমনি ক্লান্তি। ঘাড়ের ওপর থেকে মাথাটা যেন খসে পড়তে চাইছে। থেকে থেকে অন্ধকারে ডুবে আসে চোখের দৃষ্টি। বাড়ির কথা মনে পড়ে। নরম বিছানা—দু'মুঠো ভাত, কয়েক ঘণ্টা বিভোর হয়ে ঘুমুনো। উৎকণ্ঠা নেই, আশঙ্কা নেই, মাতলামি নেই বুকের ভেতরে। বিশ্রাম, গভীর সমুদ্রে ডুব দিয়ে তলিয়ে যাওয়ার মতো অতলান্ত বিশ্রাম।

বিশ্রাম! এও বিশ্রাম বই কি। যেন সব কাজ শেষ হয়ে গেছে—যেন এতদিনের জীবনটা একটা স্বপ্নের মতো সুদূর। কোথায় আত্রাই—কোথায় তার নীলজলে টকটকে রাঙা শিমুলের ফুল দক্ষিণা বাতাসে ঝরে ঝরে পড়তে থাকে! কোথায় আলেয়া-দীঘির ওপারে রাঙা মাটির পথটা এগিয়ে চলে গেছে হাড়ের পাহাড়, কড়ির পাহাড় পেরিয়ে! অথবা মহাপৃথিবীর পথ—ভূগোলের পাতায় পড়া কন্যাকুমারী আর তুষারশৃঙ্গের সীমা ছাড়িয়ে যায় অজানা পরিক্রমা!

কাঞ্চনের কাকচক্ষু জল—সে স্বপ্ন। শহর মুকুন্দপুর—কোথাও কি তা আছে, কোথাও কি ছিল? মিত্রা—করুণাদি—সুতপা। ঘুমের ঘোরে যেন কতগুলো ছায়ামূর্তি অতি লঘুছন্দে তার চেতনার ওপরে পদচারণা করে গেছে। আজ এই মুহূর্তে একটা মৃদুগন্ধের আমেজের মতো তারা মনের মধ্যে ঘুরে ফিরছে, আর কোথাও নেই তারা—আর কিছুই নেই।

যেন চটকা ভাঙে। নিজেকে প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করে—আমি কে? ঘাসের ওপর শুয়ে শুয়ে মনের মধ্যে ঘুরে বেড়ায় বৈরাগ্যভরা একটা শান্ত জিজ্ঞাসা। আমি কোথায় ছিলাম?

আশ্চর্য মানুষের মন। যেন কিছুই হয়নি—যেন এই ঘন মহুয়া বনের মধ্যে, এই নিরালা নির্জন ছায়ায় সে একজন নতুন মানুষ। তার পৃথিবী আলাদা—তার পরিচয় আলাদা।

রবীন্দ্রনাথের কবিতার লাইন মনে পড়েছে:

"আমি এলে ভাঙল তোমার ঘুম—
ফুটল শূন্যে তারায় তারায় আনন্দ কুহুম—"

আমি এলাম। এলাম নতুন হয়ে—আবিষ্কার করলাম নিজেকে এক অজানা নতুন জগতের পরিবেশে। কিন্তু কার ঘুম ভাঙল? পৃথিবীর? আকাশের? এই মহুয়া বনের?

অনেকদিন পরে কবি রঞ্জু জেগে উঠছে—সাড়া দিচ্ছে হারানো দিনের সেই স্বপ্ন শিল্পী। চরম বিপর্যয়ের ভেতরেই কি এমনি চূড়ান্ত করে আত্মকেন্দ্রিক হয়ে গেল তার মন? কঠিনতম জগতের মাটিতে বাস করেও যে রঞ্জু চিরকাল মনের মধ্যে খুঁজে ফিরেছে স্বপ্নের ছায়াপথকে, এই একান্ত নিভৃত আর বিচিত্র অবকাশে সে কি নিজের সেই অপরূপ জগৎটাতে ফিরে গেছে?

আজ তার কবিতা লিখতে ইচ্ছে করছে। আশ্চর্য, আজ এই মুহূর্তে কবিতা লিখতে ইচ্ছে করছে তার। অদ্ভুত মানুষের মন। এতদিন ধরে যে নানা টানা-পোড়েনের মধ্যে বুক দুলছিল, সঙ্কিত হয়েছিল যা কিছু সংশয় আর সমস্যা—কে যেন তাদের সব কিছুর ওপর দিয়ে টেনে দিয়েছে একটা সমাপ্তির সীমারেখা। সব মিলিয়ে গেছে, সব ছায়া হয়ে গেছে—পাক খেয়ে মিলিয়ে গেছে একরাশ কুয়াশার মতো।

এই মহুয়াবনের মধ্যে, এই ঝিরঝিরে বাতাসে একি তার নবজন্ম। পাতার ফাঁকে ফাঁকে মাথার ওপরে স্নিগ্ধ নীল আকাশ; ডালে ডালে হরিয়ালের নাচ। ঘুমের মধ্যে বৃষ্টির আওয়াজ শোনার মতো মহুয়া পড়বার শব্দ, একটা মিষ্টি স্বপ্নের আমেজের মতো মহুয়ার বিহ্বল গন্ধ। বাতাসে যেন মহুয়ার নেশা ছড়িয়ে পড়েছে, আড়ষ্ট হয়ে আসছে চোখের পাতা। গান তো গাইতে জানেনা, একটা কাগজ কলম থাকলে নিশ্চয় কবিতা লিখত।

কী কবিতা? 'আমি এলেম, ভাঙল তোমার ঘুম'—রবীন্দ্রনাথের লাইন। ওই লাইনটা ওরও মনের ভেতরে ঘা দিয়ে দিয়ে প্রতিধ্বনি জাগিয়ে তুলতে চাইছে। একটা সুরের পাগলা দমকা এসে অন্য সুরের দরজা খুলে দিতে চাইছে যেন।

অথচ—

অথচ কী বিচিত্র একটা অবস্থা। কোথা থেকে কোথায় এসেছে সে—কী আশ্চর্য, অবিশ্বাস্য বিপর্যয়ের পথ বেয়ে! তবু এখন যেন কিছুই নেই। ফিরে এসেছে স্মৃতির গভীরে হারিয়ে যাওয়া আত্রাই—তালবীথির ওপারে আলেয়া-দীঘির ইসারা, কাঞ্চনের ঘন নীল জলধারা আর ঘন নিবিড় বৈঁচিবনের ছবি। ছেলে বেলায় প্রকৃতি হাতছানি

দিয়েছিল, মন ভুলিয়েছিল তালবীথির সংকেত দেওয়া দিগন্তের ইঙ্গিতে। আজ তারা রঞ্জুকে ফিরে পেল, রঞ্জুও যেন ফিরে পেয়েছে তাদের।

পৃথিবী। চারদিকে প্রকৃতি তাকে পরিপূর্ণ করে জড়িয়ে নিয়েছে আজ। শহর মুকুন্দপুর—বিস্মরণীয় স্বপ্ন। কিছুই নেই। এই তো প্রকৃতি—যেখানে দ্বন্দ্ব নেই, সেই সমস্যা, সেই সংঘাত! এইখানেই কি এতদিনের হারিয়ে যাওয়া মন ফিরে পেলো নিজেকে, কবি রঞ্জু ফিরে এল নিজের সত্তায়!

লাল মাটির ছোট বড় টিলা। তারই ওপরে সারি সারি মহুয়ার গাছ। আকাশে রোদ বাড়ছে—দুপুরের উত্তাপে যেন ঘন হয়ে উঠছে গন্ধের নেশা, আরো তীব্র হয়ে উঠছে, হয়ে উঠছে আরো নিবিড়। দুটো টিলার মাঝখানে একটা নীচু গর্তের মতো জায়গা—চারপাশে মহুয়া পাতার ছায়া—সেইখানে চুপ করে শুয়ে আছে রঞ্জু। শুয়ে আছে স্বপ্নব্যাকুল অর্ধমুদিত চোখ মেলে।

সময় কেটে যাচ্ছে। পাতার ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মাঝে রোদ দোলা খেয়ে চলেছে মুখের ওপর। কেউ নেই কোথাও—ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের বাঁধের মতই উঁচু রাস্তাটা থেকে অনেক দূরে সরে এই মহুয়া বনের মধ্যে আসবার সম্ভাবনাও নেই কারো। 'আমি এলেম, তাই তো তুমি এলে।' কে এল? কবিতাটার অর্থ জানেনা রঞ্জু, তবু মনে হল একটা কিছু যেন সে বুঝতে পেরেছে এই মুহূর্তে। বহুকালের একটা বন্ধ জানালা হঠাৎ খুলে গিয়ে রোদের ঝলকানির মতো পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে এর মর্মকথা। কে এল? আমি এলাম, তাই কি প্রকৃতি আবার ফিরে এল আমার কাছে? যে আকাশে রক্তের বহ্নিশিখা শুধু ঝলমল করত সেদিন, আজ কি সেখানে নতুন করে: "ফুটবে শূন্যে তারায় তারায় আনন্দ কুসুম?"

হঠাৎ চমকে উঠল রঞ্জু। আত্মদর্শনটা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল অতি বাস্তব, অতি ভয়ংকর একটা সম্ভাবনার সংকেতে। খট্ খট্ করে দ্রুত কতগুলো পায়ের শব্দ।

রক্তে বিদ্যুৎ বয়ে গেল। তীরের মতো উঠে বসল রঞ্জু।

না—মানুষ নেই কোথাও। এক পাল ছাগল ছুটে আসছে, ডাকছে ভয়াতুর ব্যাকুল কণ্ঠে। কিন্তু এক পাল ছাগল? পেছনে নিশ্চয় রাখাল আসছে। শরীরটা আতঙ্কে শক্ত হয়ে এল।

কিন্তু না—রাখাল তো নেই। ওদের পেছনে তাড়া করে আসছে পাটকিলে রঙের দুটো শেয়াল। মাত্র দুটো শেয়াল—আয়তনেও এমন কিছু বড় নয়। কিন্তু তাদেরই ভয়ে এতগুলো ছাগল পালিয়ে আসছে এমন করে অথচ একবার যদি বড় বড় শিংগুলো বাঁকিয়ে ফিরে দাঁড়াতো—

স্বাভাবিক একটা সংস্কারবশেই উঠে দাঁড়ালো সে, গোটা দুই ঢিল ছুঁড়ল শেয়াল দুটোকে লক্ষ্য করে। ফলে শেয়ালগুলো ছুটল জঙ্গলের দিকে, আর ছাগলের পাল মহুয়াবন পেরিয়ে সোজা বেরিয়ে গেল ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা লক্ষ্য করে।

রঞ্জু আবার শুয়ে পড়তে যাবে, এমন সময় বনের মধ্য থেকে ছাগলের আর্তনাদ উঠল: ব্যা-ব্যা—

সে কি! সবগুলোই যে রাস্তার দিকে ছুটে গেল। তবে?

উঠে পড়ল আবার—মহুয়াবনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে গেল ছাগলের ডাক লক্ষ্য করে। খানিকটা এগোতেই একটা চমৎকার দৃশ্য পড়ল চোখে।

করিৎকর্মা জাত শেয়াল—কোনো সন্দেহ নেই সে বিষয়ে। কোন্ ফাঁকে দলছাড়া একটা মস্ত ছাগলকে এদিকে তাড়িয়ে এনেছে সে লক্ষ্যই করতে পারেনি। সামনেই একটা ঘোলা পচা ডোবা, ছাগলটাকে একেবারে তারই ভেতরে নিয়ে গিয়ে নামিয়েছে। একগলা জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে আর্ত চীৎকার তুলেছে ছাগলটা, আর শেয়াল দুটো ঝপ ঝপ করে জল ভেঙে এগিয়েছে তার দিকে। আসন্ন মৃত্যুর সম্ভাবনায়, অবর্ণনীয় আতঙ্কে অসহায় প্রাণীটা থর থর করে কাঁপছে।

আবার একটা তাড়া দিতেই জল থেকে উঠে জঙ্গলের দিকে সরে পড়ল শেয়াল দুটো। ছাগলটা জলের মধ্যে তেমনি দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ—যেন বিপদমুক্তির ব্যাপারটা এখনো সে বিশ্বাস করতে পারছে না। তার পর উঠে এল কাঁপতে কাঁপতে, ছুটে পালিয়ে গেল মহুয়াবন পার হয়ে।

নিজের জায়গায় ফিরে এল রঞ্জু। পাতার ফাঁকে ফাঁকে রোদ পিছলে পিছলে পড়ছে লাল মাটির টিলার এখানে ওখানে, জ্বলছে ছোট ছোট কাঁকর, রাশি রাশি বালি-পাথরের টুকরো। নির্জন বন ভরে শুধু শুকনো পাতার ওপর টুপটাপ করে মহুয়া পড়বার শব্দ; ডালে ডালে হরিয়ালের নাচ। উত্তপ্ত মদির গন্ধ নেশায় আবিষ্ট করে আনতে চায়, ভারী হয়ে আসতে চায় চোখের পাতা।

কিন্তু বনের স্বপ্ন কেটে গেছে, মন থেকে মুছে গেছে প্রকৃতি-বিলাস। এমন সুন্দর, এমন আশ্চর্য কবিতায়-ভরা দুপুরের মোহ-মদির মহুয়া বনের মধ্য থেকে কালো হিংসার একটা ছায়ামূর্তি মাথা তুলেছে, এক মুহূর্তে আচ্ছন্ন করে দিয়েছে সমস্ত।

সব এক—সব একরকম। কোনো পার্থক্য নেই। কোনো পার্থক্য নেই জটিলতায় জর্জরিত শহর মুকুন্দপুরের সঙ্গে এই কাব্যময় অপরূপ মহুয়া-বীথিকার। এক নীতি—একটিমাত্র সত্য। ওই শেয়াল দুটো চেনা, ওই ছাগলের পাল প্রতিদিনই তো আশে-পাশে ঘুরে বেড়ায়। ছত্রিশ কোটি মানুষ আমরা—একবার যদি মাথা তুলে দাঁড়াই তা হলে কতক্ষণ সময় লাগে এই বিদেশী অত্যাচারের শিকড়শুদ্ধ উপড়ে ফেলতে? কিন্তু মাথা তুলে আমরা কোনোদিন দাঁড়াবো না, ওই ধনেশ্বর আর তার সাদা মালিকের দল এমনি করেই আমাদের ঠেলে নিয়ে যাবে, নিয়ে যাবে অনিবার্য অপঘাতের মধ্যে।

অকস্মাৎ মহুয়াবনের এই গন্ধভরা বাতাসকে অত্যন্ত বিষাক্ত বলে মনে হল, মনে হল ঝিরঝিরে মহুয়ার পাতায় যেন কাদের চক্রান্তভরা একটা কুটিল ফিস্‌ফিসানি কানে আসছে। জ্বলজ্বলে রোদের ফালি-গুলোতে যেন কোনো একটা হিংস্র শ্বাপদ থাবা মেলে রেখেছে তার।

প্রকৃতি ! প্রকৃতির যেন একটা নতুন তাৎপর্য ধরা পড়ল তার কাছে। আর এই নিরাবরণ মুক্ত প্রকৃতির বুকে একটি প্রাণীর প্রাণ বাঁচাতে একজন মানুষের প্রয়োজন হল ! আশ্চর্য, পৃথিবীর হিংসাকে যে জয় করতে পারল সে একজন মানুষ !

ঘোর ভেঙে গেল। হঠাৎ আর একটা রাত্রির কথা মনে পড়ল তার। চিন্তার মোড়টা ঘুরে গেল সম্পূর্ণ অন্যদিকে।

মনে পড়ল বাবার সঙ্গে গোরুর গাড়িতে করে ফিরছিল আলোয়া খাওয়ার মেলা দেখে। মাঝরাত্রে নামল প্রচণ্ড আর প্রবল বৃষ্টি। বাতাসের ঘায়ে চট উড়ে গিয়ে বৃষ্টির ঝাপটায় সব ভিজে যেতে লাগল, টাপরের ফাঁক দিয়ে জল গড়িয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল গায়ে। মনে হতে লাগল দুপাশের মাতাল কালো অরণ্য এখুনি বা ভেঙে পড়বে তাদের ওপর—পিষে তাদের চুরমার করে দেবে।

তবু গাড়ি চলছিল। হঠাৎ ঝুপ করে একটা শব্দ। পা ভেঙে বসে পড়ল বলদ, বুক সমান কাদায় গাড়ির চাকা আটকে গেছে। গাড়োয়ান শুষ্ক কণ্ঠে বললে, পিছারির গাড়ি না আসিলে গাড়ি উঠিবেনা বাবু। বড় ভারী 'ডহ' আছে।

ঘন জঙ্গল, ঝড় বৃষ্টি। কালো অন্ধকার, আকাশে বজ্রের গর্জন। গাড়িতে বসে ভিজতে ভিজতে অসহায় আকুলতার সঙ্গে মনে হয়েছিল কোনো মন্ত্রবলে কি এখন ফিরে যাওয়া যায়না তাদের মুকুন্দপুরের বাড়িতে, ঘরের স্নিগ্ধ নিরাপদ আশ্রয়ে ? সেদিন প্রথম প্রকৃতিকে শত্রু মনে হয়েছিল তার, সেদিন প্রথম—

স্মৃতির মধ্য থেকে ভেসে এল কিছুদিন আগে পড়া মাসিকপত্রের একটা প্রবন্ধ। একজন বিদেশী বিদ্রোহী কবি নিজের আত্মজীবনীতে বলছেন : "অন্ধকারে আমরা পথ হারাইলাম। চারিদিকে ঘন কুয়াশা ও নিবিড় অরণ্য। কাঁটা লতায় সর্বাঙ্গ ছিঁড়িয়া যাইতেছে। নির্জন আরণ্যক পাহাড়ে আমরা একান্ত অসহায়। অকস্মাৎ কোথা হইতে একটি বৈদ্যুতিক প্রদীপের আলো আসিয়া পড়িল। আর সেই মুহূর্ত হইতে একদিকে যেমন আমি প্রকৃতিকে ঘৃণা করিতে শিখিলাম, তেম্নি সেই সঙ্গে শিখিলাম বিজ্ঞানকে ভালোবাসিতে—"

এই তো সত্য। এই প্রকৃতি প্রেম, এই মুগ্ধতা— নিজেকে ফাঁকি দেওয়া, জীবনকে বঞ্চনা করা। প্রকৃতির পরিণতিই তো শহর মুকুন্দপুর। সেই মুকুন্দপুরকে আরো বড়, আরো বিস্তীর্ণ করাই তো বিপ্লবীর স্বপ্ন—স্বাধীন ভারতবর্ষের সত্যিকারের স্বাধীনতা ! চাঞ্চল্যের কাঞ্চনের নীল জলে কালী থাকেন কিনা রঞ্জু তা জানে না, জানবার কৌতূহলও আর অবশিষ্ট নেই এখন ; তবে এটা আজ স্পষ্ট বুঝতে পারছে যে সেই অলৌকিক ভয়ের চেয়ে ঢের সত্য ওই লোহার পুলটা—ঢের বেশি সত্য গাড়ির কামরায় ঘুমন্ত আর নিশ্চিন্ত মানুষগুলো।

'আমি এলেম, ভাঙল তোমার ঘুম—'

ঘুম ভাঙবে বইকি। কিন্তু নিজে ঘুমিয়ে পড়ে নয়, প্রকৃতিকে পূর্ণ থেকে পূর্ণতর করে দিয়ে। শিলালিপির ফলকে প্রথম ফুটে উঠল জীবন-বোধের অক্ষর বাক্য।

না—প্রকৃতি নয়। মিথ্যে হয়ে যাক মহুয়া ফুলের এই মাদকতা, এই নেশার উত্তপ্ততা। আজ সত্য হয়ে উঠুক শহর জনপদের ধুলো, গাড়ির চাকার শব্দ, আর সুখ দুঃখ, ভালোমন্দ, অজস্র সংঘাত-চঞ্চল অসংখ্য, অগণিত মানুষ !

* * *

নিশিরাত্রে একটা বিশ্রী গোলমালে ঘুম ভেঙে গেল।

ধড়মড় করে উঠে বসল রঞ্জু, বুকের ভেতরে হৃৎপিণ্ড মাতামাতি শুরু করে দিলে। তা হলে কি সত্যিই পুলিশ এসে পড়ল ? বিছানার তলা থেকে রিভলভারটা বের করে নিয়ে সে খাট থেকে নেমে দাঁড়ালো।

দরজায় টোকা পড়ল আস্তে আস্তে।

—কে ? কে ?

—ডর নি খাও বাবু, আমি কৈরজ।

আশ্রয়দাতা কৈরজ মোল্লা। ওদের দলের সঙ্গে কৈরজের কী একটা যোগাযোগ ছিল, তারি সূত্র ধরে খুঁজতে খুঁজতে এখানে এসে পৌঁছেছে রঞ্জু, আশ্রয় পেয়েছে।

—বাইরে কিসের গণ্ডগোল কৈরজ ভাই ? পুলিশ নাকি ?

—না, না, তোমার ডর নাই। দুই ভাই জমি লিই কাজিয়া করোছে।

—মারামারি হচ্ছে বুঝি ?

—হাঁ, হচ্ছে। তুমি নি ডরাও, শুতি থাকো।

লাঠির ঠকাঠক আওয়াজ উঠছে, উঠছে পৈশাচিক চীৎকার। রঞ্জু সভয়ে বললে, খুনোখুনি হবে নাকি ?

দরজা ঠেলে এতক্ষণে লণ্ঠন হাতে ঘরে ঢুকেছে কৈরজ। হেসে বললে, হবা পারে।

—সর্বনাশ ! সে কি কথা ! আমি যাচ্ছি—

—ক্যানে ব্যস্ত হছেন ?—কৈরজ হাসল : বহৎ মানুষ জড়ো হই গেইছেন, তুমি ঠ্যাকাবা নি পারিবেন মান্‌সিলাক্। ফের তো তুমাক্ একটা বল্লম মারি দিবে হয়। যাবা দাও—যাবা দাও। অমন ত এইঠে হামেশাই হছে।

কথাটা ঠিক। তা ছাড়া খেয়ালই ছিলনা সে ফেরারী—এখানে অন্ধকারে লুকিয়ে থাকতে হচ্ছে তাকে। এ অবস্থায় ওদের মাঝখানে ঝাঁপিয়ে পড়লে দাঙ্গা থামানো তো যাবেই না, বরং লাভের মধ্যে নিজেকে নিয়েই ঝামেলা বেধে যাবে।

ক্ষুব্ধস্বরে রঞ্জু বললে, কিন্তু দুই ভাই মারামারি করছে ! আপন ভাই ?

—না তো কী !—কৈরজ হতাশভরে বললে, জমি বড় বদ চীজ জী। আর অদেরও দোষ নাই। পাছত্ শয়তান নাগিলে কী করিবে উমারা ?

—শয়তান ?

—শয়তান তো। জোতদার আমীন মুন্সীর ঘর দেখেন নাই ? ওই উদিকে পাকা দালান, বড় বড় ধানের মরাই ? ভারী বদমাস

উ। ই জমিটা বড় ভালো জমি—ইটা লিবার মতলব করোছে। তাই মতলব দিই দিই দোনো ভাইয়ের কাজিয়াটা লাগাইলে। দুটা একটা খুন হেবে, জেল হেবে, মামলা করি করি সাবাড় হই যিবে, তো ওই জমিটা অর প্যাটত্ যাই সাঁন্ধাইবে।

—চমৎকার মতলব—খাসা মতলব।

—খাসা তো!—

দূরের থেকে চীৎকার আর লাঠির শব্দ আসছে সামনে। একটা অবর্ণনীয় ভয় আর বেদনায় যেন পাথর হয়ে বসে রইল রঞ্জু। কৈয়জ মোল্লা ক্লান্তভাবে দীর্ঘশ্বাস ফেলল একটা।

—এই করিই তো হামাদের চাষার সর্বনাশ হচ্ছে বাবু। হামাদের ভালোমন্দ হামরা বুঝি না, উয়ারা য্যামন করি হামাদের নাচায়, সেই পাকে হামরা নাচোছি। উয়ারা দাঙ্গা-ফ্যাসাদ বাধাই দেয়, হামরা মারামারি আর করি, মাথা ফাটাই। ফের অরা 'দেওনিয়া' (উকিল-মোক্তারের দালাল) হই হামাদের শহরত্ উকিলের পাস্ লিই যায়, মামলা করি, সব হামাদের চলি যায় অদেরই প্যাটে। এই তো সবঠে হচ্ছে বাবু—দুনিয়াটা এমন করিই চলিছে!

দুনিয়াটা এম্নি করেই চলছে বটে। মুঠোর মধ্যে শক্ত করে রিভলভারটা আঁকড়ে ধরলে রঞ্জু।

—তোমরা কেন দল বাঁধো না? কেন নিজেদের মধ্যে মারামারি করো? সবাই মিলে একজোট হয়ে নেমে পড়লে দুদিনেই তো ঠাণ্ডা করে দিতে পারো এই সব শয়তানদের!

—হায় হায় বাবু, এত বুদ্ধি যদি চাষার হইত, তবে তো মানুষই হইত উয়ারা—কপালে করাঘাত করলে কৈয়জ।

—হুঁ:—

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে বসে রইল রঞ্জু। স্মৃতির পটে ছবি ভেসে উঠেছে, দেখা দিয়েছে পিছনে ফেলে আসা বিস্মৃতপ্রায় শৈশবের এক-খানা ছবি। নিশিকান্ত! ধনঞ্জয় পণ্ডিত যাকে মুখ ভেংচে বলতেন: নিশ্-শি-খান্ত! যার কানে হাত দিতে গিয়ে সে অগ্নিস্পৃষ্টের মতো হাত সরিয়ে এনেছিল, যে নির্বোধ পরম সহিষ্ণু নিশিকান্ত একদিন দায়ের কোপ বসিয়েছিল আপন খুড়োর গলায়, চাপ চাপ রক্ত দেখে তার মাথা আতঙ্কে ঘুরে উঠেছিল!

বাইরে থেকে চীৎকার আসছে সামনে। সে নিশিকান্ত আর আজকের দিনের এই দাঙ্গা—এদের পেছনে একই সত্য—একমাত্র ইতিহাস! কিন্তু সেদিনকার নিশিকান্ত অগ্নিপুত্তলি হয়ে শুধু নিজের খুড়োকেই আঘাত করতে পেরেছিল, আজকের এরাও আত্মঘাতটাকেই জেনেছে একমাত্র সত্য বলে। কিন্তু কোনোদিন এই আগ্নেয় মানুষগুলো কি একটা প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ড হয়ে উঠবে না, জ্বালিয়ে শেষ করে দিতে পারবেনা পৃথিবীর যত আমিন মুন্সীদের?

কৈয়জ হঠাৎ প্রশ্ন করে বসল: আচ্ছা বাবু?

—বলো।

—তোমরা তো দেশ থাকি ইংরাজক্ তাড়াবা চাহেন?

—হ্যাঁ, সে তো চাই।

—কিন্তু হামাদের কী হেবে?

—কেন, দেশ স্বাধীন হবে?

—হুঁ—সি তো হেবে—কৈয়জ অপরাধীর মতো বললে, সিটা হেবে কি না হেবে উটা লিয়ে হামারা ভাবিনা। ইংরেজ গেলে আমীন মুন্সীর কাছ থাকি হামাদের জমি জিরাতগুলান্ কি ফিরি আসিবে? প্যাট ভরি খাবা পামু হামরা? কহেন বাবু, হামরা চাষী মানুষ, সিটাই হামাদের কহেন।

রঞ্জু চুপ করে রইল, জবাব দিলনা।

—ইটা যদি না হৈল্ তো ফের ইংরাজ গেলেই কি ফের রহিলেই কি? হামাদের খাজ্না তো ইংরাজ ল্যায়না, ল্যায় তশিলদারে। সাটিফিকিট্—সিতো করে জমিদার। হামাদের সব খাই লায় আমিন মুন্সী আর মহাজন—ইংরাজ তো ল্যায়না। কহেন বাবু, ইংরাজ গেলেই ইগিলা সব মিটিবে কী?

রঞ্জু চুপ করে রইল। আশ্চর্য সব প্রশ্ন করেছে কৈয়জ মোল্লা, আশ্চর্য এবং অপ্রত্যাশিত। এসব প্রশ্নর উত্তর দেবার জন্যে প্রস্তুতি নেই তার, তার জানা নেই এসব প্রশ্নের উত্তর। কিন্তু—কিন্তু—বিদ্যুৎচমকের মতো মনে হল: তাই তো! এদের শত্রু তো ইংরেজ নয়। এদের যারা প্রত্যক্ষ শত্রু তাদের হাত থেকে এদের বাঁচাবার জন্যে কোন্ পথের নির্দেশ দিতে পেরেছে ওরা? তাই কি বিপ্লবীদের এত বড় আত্মত্যাগের আহ্বানেও সাড়া দিতে পারেনি দেশের সমস্ত মানুষ, তাই কি এত রক্ত—এত মৃত্যু শুধু ব্যর্থই হয়ে গেছে, দেশের মর্মকেন্দ্রে তা বিন্দুমাত্রও চাঞ্চল্য দিতে পারেনি জাগিয়ে? কৈয়জ মোল্লার এ প্রশ্নের জবাব বেণুদা তো কোনোদিন দেননি!

তবে?

সেই বইটা! সেই অবহেলিত, প্রায় দুর্বোধ্য কাগজের মলাট দেওয়া চটি বইটা। 'লেনিন ও সাম্যবাদী রুশিয়া।' সব বুঝতে পারেনি—কিন্তু হঠাৎ যেন মনে হল সেই সত্যহীন দেশের মানুষগুলো অন্তত এসব প্রশ্নের জবাব দিতে পেরেছিল। কিন্তু!—

রঞ্জু কোনো কথা বলতে পারলনা। শুধু তেম্নি নিথর হয়ে বসে শুনতে লাগল বাইরে জনতার রাক্ষস গর্জন! (ক্রমশঃ)

মহারাজ প্রতাপাদিত্য—ইতিকথা বনাম ইতিবৃত্ত

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

(আলোচনা)

দেশবরেণ্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক। বাংলার ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁহার মতামত শুধু প্রামাণিক নয়, সুধীসমাজ ও জনসাধারণ শ্রদ্ধার সহিতই গ্রহণ করিয়া থাকেন। সুতরাং পৌষের ভারতবর্ষে "মহারাজ প্রতাপাদিত্য—ইতিকথা বনাম ইতিবৃত্ত" নামক প্রবন্ধ যে কৌতূহল উদ্রেক করিবে তাহা স্বাভাবিক। তাহার উপর "যশোর নগর ধাম, প্রতাপাদিত্য নাম, মহারাজ বঙ্গজ কায়স্থ" সম্বন্ধে বাঙালীর একটু দুর্ব্বলতা আছে। সেইজন্য অধ্যাপক মহাশয় প্রচলিত কাহিনীর মূলে শুধু কুঠারাঘাত নয়, কঠোর কশাঘাতও করিয়াছেন বলিয়া বেশ একটু বিস্ময়মিশ্রিত চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছে। যশোরেশ্বর প্রতাপাদিত্যকে ঘিরিয়া বাংলার নবজাগ্রত স্বাধীনতাপ্রবণ মন অনেক স্বপ্ন দেখিয়াছে—রঙ্গমঞ্চে ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটক হইতে অহংকার প্রতাপ-জয়ন্তী পর্য্যন্ত। প্রবল-পরাক্রান্ত মুঘল শক্তির বিরুদ্ধে বাংলার একজন ক্ষুদ্র ভূঞা জমিদার যে নিজের ও স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বহু বৎসর ধরিয়া প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াছিলেন ইহার বিচিত্র কল্পনা স্বাধীনতাকামী লোকের মনকে দেশপ্রেমের পরিপ্রেক্ষিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। এই বিশ্বাসের যথেষ্ট উপকরণেরও অভাব ছিল না। ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল', রামরাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র', ক্ষিতীশবংশাবলী চরিত, ঘটককারিকা, 'জয়পুরের রাজকাহিনী', কৃষ্ণনগর, চাঁচড়, বাঁশবেড়ে, নলডাঙা প্রভৃতি বিস্তীর্ণ জমিদারীর প্রতিষ্ঠাতৃগণের সরকারী কাগজপত্র প্রতাপাদিত্য জীবনীর অনেক পরিচয় দেয়। সমসাময়িক সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবি গোবিন্দদাসের পদাবলীতে প্রতাপাদিত্য ও তাঁহার খুল্লতাতের নাম পাওয়া যায়। এই সব কাহিনী কতদূর নির্ভরযোগ্য ও বিচারবিশ্লেষণসহ সে বিষয়ে ঐতিহাসিকদের সুচিন্তিত মতই গ্রাহ্য।

অপরদিকে সমসাময়িক আকবরনামা, ইকবালনামা প্রভৃতি প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে নীরব। জেসুইট্ ফাদারদের বিবরণে কিছু তথ্য পাওয়া যায়। বহারিস্তান্-ই-ঘয়বীর বিবরণ অধ্যাপক মহাশয় নিজেই সবিস্তারে উদ্ধৃত করিয়াছেন। আবদুল লতীফের ভ্রমণ শীর্ষক ফার্সী হস্তলিপি হইতে, জেসুইট পাদ্রীদের বিবরণ এবং বহারিস্তানের বর্ণনা হইতেও স্যার যদুনাথ পূর্ব্বে ও সম্প্রতি প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে অনেক নূতন সংবাদ পরিবেশন করিয়াছেন। পরলোকগত নলিনীকান্ত ভট্টশালী ও স্বর্গীয় দীনেশচন্দ্র সেনও বহারিস্তানে বর্ণিত প্রতাপের ইতিহাস কিছু আলোচনা করিয়াছেন।

আমরা জিজ্ঞাসু, প্রণম্য শিক্ষকদের বিচার শিরোধার্য্য করিয়া লইলেও কতকগুলি প্রশ্ন থাকিয়া যায়, যাহার আলোচনা অসঙ্গত হইবে বলিয়া মনে হয় না।

(১) অন্নদামঙ্গল, ক্ষিতীশবংশাবলীচরিত, ঘটককারিকা রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আমলের সঙ্কলন ও প্রণয়ন। স্বদেশী যুগে স্বাধীনতাকামী দিনে প্রতাপাদিত্য-বীরত্বের প্রচারের হয়ত একটা অর্থ ছিল, কিন্তু বাংলার মুসলমান যুগের অস্তমান অবস্থায় ইংরাজ শাসনের পূর্ব্বে ঐ সব পুস্তকে বিকৃত ইতিহাস বা "অলীক জনশ্রুতি" দেওয়া হইল কেন? বিশেষ করিয়া পরবর্ত্তীকালের রাজারাম বসুর "প্রতাপাদিত্য-চরিত্র" যখন মূল ফার্সী গ্রন্থ হইতে গৃহীত। ঐ ফার্সী বই এখন পাওয়া যায় কিনা ও ইহার ঐতিহাসিক মূল্য কি? স্যার যদুনাথ উদ্ধৃত (শনিবারের চিঠিতে) যশোহর খুলনার ইতিহাসের রচয়িতা সতীশচন্দ্রের টীকায় দেখা যায় যে রামরাম বসুর প্রতাপাদিত্য-চরিত্র অনেক বিষয়ে বহারিস্তানের অনুগামী। বহারিস্তানই কি সেই ফার্সী বই?

(২) অধ্যাপক মহাশয় নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে বাংলার শেষ পাঠান সুলতান দায়ুদ খাঁর পতনের সঙ্গেই বঙ্গদেশ মুঘল অধীনতা স্বীকার করে নাই। মানসিংহের প্রথম অভিযান পাঠান কতলু খাঁর বিরুদ্ধে। প্রথম যৌবনে বারভূঁইয়াদের অন্যতম প্রতাপাদিত্য পাঠানদের পক্ষ হইয়া মুঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন কিনা? ইহার সম্বন্ধে যদি কোন প্রামাণিক সমসাময়িক তথ্য না থাকে তাহা হইলে প্রচলিত কাহিনী অবিশ্বাস করিবার কারণ কি?

বাংলাদেশে মুঘল প্রভুত্ব কায়েমী করিতে বহুদিন লাগিয়াছিল এবং ইসলাম খাঁর সময়েই ইহার সমাপ্তি। বহারিস্তানের ইতিহাসকে প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিলেও উহা মুঘলদের বঙ্গবিজয়ের শেষের দিকের ইতিহাস। যদি তাহা হয় তাহা হইলে প্রতাপাদিত্য যে কখনও "স্বাধীনতার পতাকা উড়ান নাই," "মুঘলদের বিরুদ্ধে লড়েন নাই" ইহা সত্য কিনা বিবেচ্য। অধ্যাপক মহাশয়ের মতে "প্রতাপাদিত্য মানসিংহের হস্তে পরাজিত ও বন্দী হন নাই, বস্তুতঃ তাহার পরাজয়ের সময় মানসিংহ বাংলাদেশে ছিলেন না"। মানসিংহ শুধু ১৬০৫ অব্দে বাংলার শাসনকর্তা ছিলেন না, ১৫৯৪ খৃঃ অঃ হইতে ১৬০৫ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত বাংলার সুবাদার ছিলেন এবং বঙ্গবিজয়ে ব্যাপৃত ছিলেন। তখন প্রতাপের মুঘলদের সহিত কি সম্পর্ক ছিল—তিনি স্বাধীন রাজা হিসাবে বৈরী ছিলেন? না মুঘলদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছিলেন, না আশ্রিত সামন্ত জমিদার ছিলেন? অধ্যাপক মহাশয় কি বলিতে চান যে প্রতাপের সঙ্গে মানসিংহের বা মুঘলদের কোন সজ্বর্ষই হয় নাই। মানসিংহ যে বঙ্গবিজয়ে আসিয়া বিশেষ সুবিধা করিতে পারেন নাই সে কথা ইতিহাস সম্মত। মনে হয় বাংলার বারো ভূঁইয়াদের বিরুদ্ধতা বেশ প্রবল ও শক্তিশালী ছিল। ইসলাম খাঁ সুবাদার হইয়া আসিয়া বাংলা দমনের জন্য জাহাঙ্গীরের কাছে বিশেষ সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন ইহাও ইতিহাসে বলে। মহারাজ প্রতাপাদিত্য মানসিংহের সময় বা তাহ পূর্ব্বে মুঘল বিরোধিতায় কোন অংশ গ্রহণ করেন নাই—বহারিস্তানের কাহিনীর উপর ইহা নির্ভর করে না, কারণ 'বহারিস্তান' ইসলাম খাঁর সময়ের কাহিনী। স্যার যদুনাথও বহারিস্তানে বর্ণিত প্রতাপাদিত্যের পরাজয়কে "শেষ পরাভব" বলিয়া বর্ণিত করিয়াছেন। হয়ত মানসিংহের সময়েই প্রতাপাদিত্য বিজিত হইয়া নামে মুঘল বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন এবং প্রকৃত স্বাধীনতা-কামীর মত বশ্যতাপাশ ছিন্ন করিবার সময় ও সুযোগ খুঁজিতেছিলেন। সেইজন্য 'বহারিস্তান' তাঁহাকে বাদশাহের "অনুগত রাজা" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা স্মরণযোগ্য যে শাহপুর থানায় আত্রেয়ী নদীর তীরে বজ্রপুরে শেখ বদীর সঙ্গে প্রতাপ ইসলাম খাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে ইসলাম খাঁ মিত্র রাজন্যবর্গের অন্যতমের মত তাহার সহিত সসম্মানে ব্যবহার করেন। প্রতাপও ভূঁইয়াদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হন। মুসলমান সেনাপতি মির্জা নথন্ যাহাকে অনুগত করদরাজ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য সর্ত্ত বলিয়া মনে করিতেন তাহা offensive defensive মৈত্রীও হইতে পারে। প্রচণ্ড মুঘলশক্তি তখন ভারতে প্রবল। স্বাধীনতার শত আকাঙ্ক্ষা থাকিলেও তাহার বিরোধিতা করার কি ফল প্রতাপ যে জানিতেন না তাহা নয়, তবু তিনি কোন সাহসে বিরোধিতা করিলেন, স্বজন রাজন্যবর্গের বিরুদ্ধে সর্ব্বমত সাহায্য দিলেন না, ইহা কিসের পরিচয়? মুঘলরা অবশ্য চাহিয়াছিল যে বারভূঁয়াদের মধ্যে Divide ও Rule করিতে ও প্রতাপকে শ্রীপুর ও বিক্রমপুর উৎকোচ দিয়া বশীভূত করিতে। প্রতাপ যে মুঘলদের পক্ষ লইয়া তাঁহার প্রতিবেশী রাজাদের সহিত লড়েন নাই, ইহা কি তাঁহার মুঘল আনুগত্যের লক্ষণ, না স্বজাতিপ্রীতির পরিচয়, না সুবিধাবাদীর দৃষ্টান্ত? না ইহা তাঁহার strategy, না বিশ্বাসঘাতকতা? ভূঁইয়াদের বিরুদ্ধে তিনি লড়িয়াছিলেন, না মুঘলদের সাহায্য দিয়াছিলেন -ইহার অন্য কি প্রমাণ আছে?

বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারতবর্ষের অভিশপ্ত ইতিহাসে স্থানীয় রাজাগণ (কি হিন্দু কি মুসলমান) কখনই যে সমবেতভাবে আক্রমণশক্তির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন নাই, ইহার বহু দৃষ্টান্ত আছে। বাংলার বারভূঁইয়ারাও যে তাহা পারেন নাই ইহাতে আর নতুনই কি। যখন ঈশা খাঁ, কেদার রায় প্রভৃতি অন্য সামন্ত নরপতিরা বিধ্বস্ত হইলেন, তখন যে প্রতাপাদিত্য জয়ের আশা করিবেন না বা বিজিত হইবেন ইহাতে আশ্চর্য্য কিছু নাই। তবু বশ্যতা স্বীকারের পূর্ব্বে তিনি বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন তাহার বিস্তৃত বিবরণ বহারিস্তানই দিয়াছেন। তাহা হইলে বহারিস্তানের মতেও প্রতাপ 'বিদ্রোহী' হইয়াছিলেন এবং পরে তজ্জন্য সুবাদারের নিকট সমুচিত শাস্তিও পাইয়াছেন। ইহাতে প্রতাপের হীনতা প্রকাশ পায় কিরূপে? মোটকথা বিচার্য্য বিষয় হইতেছে যে প্রতাপ স্বাধীনতা রক্ষার জন্যই হউক বা মুঘল বশ্যতা ছিন্ন করিবার জন্যই হউক প্রবলপরাক্রান্ত মুঘলদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন কিনা? যদি দাঁড়াইয়া থাকেন, তবে কি উদ্দেশ্য লইয়া এবং কবে?

এই প্রসঙ্গে আর একটি বক্তব্য আছে। অধ্যাপক মহাশয় নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে বহারিস্তানের বিবরণ পুরাপুরি সত্য নাও হইতে পারে। গ্রন্থকার মুসলমান সেনানায়ক, সম্ভবতঃ বিদ্রোহী জমিদারগণের যুদ্ধ-প্রচেষ্টা ও বীরত্বের সমুচিত মর্য্যাদা দেন নাই। ইতিহাস যে কতদূর বিকৃত হইতে পারে তাহা লক্ষ্মণ সেনের ইতিহাসেই প্রমাণ। ঘটনার মাত্র চল্লিশ বৎসর পরে মীনহাজুদ্দীনের কাহিনীর উপর নির্ভর করিয়া লোকে লক্ষ্মণ সেনকে কাপুরুষ বলিত, অথচ সেই মীনহাজুদ্দীনই তাঁহাকে—সুলতান করিম কুতবদ্দীন হাতে মুজ্জমান—বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

(৩) প্রতাপাদিত্য যে বাংলা বিহার উড়িষ্যা আসামের একচ্ছত্র অধিপতি ছিলেন, একথা প্রতাপাদিত্যের অতি ভক্তেরাও হয়ত বলিবেন না। তবে তিনি যে অন্য রাজা অপেক্ষা পরাক্রান্ত সমৃদ্ধিশালী রাজা ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। "এই প্রতাপাদিত্যের মত সৈন্য ও অর্থবলে বলী রাজা বঙ্গদেশে আর নাই। তাহার যুদ্ধ সামগ্রীতে পূর্ণ সাতশত নৌকা, বিশ হাজার পাইক ও ১৫ লক্ষ টাকার রাজ্য আছে" (সার যদুনাথ উদ্ধৃত আবদুল লতীফের ভ্রমণ)। খনকার দিনে ১৫ লক্ষ টাকার আয়ের রাজাকে ক্ষুদ্র অথবা বলা যায় না, আইন-ই-আকবরী মতে সমগ্র সুবে বাংলারই যখন আয় মোট দেড় কোটি টাকার কাছাকাছি। 'বৃহৎ বঙ্গে' তাঁহার ১৪টি প্রধান দুর্গের কথা পাই—এই দুর্গগুলি ঠিক কোথায় ছিল তাহা বিচার বিশ্লেষণ সাপেক্ষ—যেমন যশোহর ধূমঘাটেরও নাম আছে, আবার শালকা ইত্যাদির নাম আছে। রেনেলের ম্যাপের সঙ্গে মিলাইয়া লইতে হয়। বহারিস্তান কর্তৃক বর্ণিত প্রতাপের পরাজয় "বঙ্গাধিপ পরাজয়ের" বিজেতা কর্তৃক কাহিনী। তাহা হইলেও জঙ্গলবাড়ীর ঈশা খাঁ, শ্রীপুরের কেদার রায়ের বীরত্ব বাঙালী সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করে। 'বৃহৎ বঙ্গে' বর্ণিত ফিরোজ খাঁ শীর্ষক পল্লীগাথায় সেই কালের মুঘল-বিরোধী মনোভাবের একটি সুন্দর চিত্র পাওয়া যায়। ফিরোজ খাঁ ঈশা খাঁর পুত্র। আবুলফজল্ ঈশা খাঁকেই ভাটির রাজা এবং বারভূঁইয়াদের প্রধান বলিয়াছেন। তজ্জন্য অনেকে মনে করেন যে প্রতাপাদিত্য একজন নগণ্য ভূঁইয়া ছিলেন। কিন্তু আবদুল লতীফের সাক্ষ্য অন্যরূপ। হয়ত 'গঙ্গাদানী' কালিদাসের রাজপুতরক্ত ইহাদের মুঘল বিরুদ্ধে বিদ্রোহের প্রেরণা দিয়াছিল।

(৪) কৃষ্ণনগরের রাজবাটীতে জাহাঙ্গীরের দুই ফর্মান রক্ষিত আছে। একটি ১৬০৬ খৃঃ অঃ ও আর একটি ১৬১৩ খৃঃ অঃ। যদি বোগায়ান্, মাটিয়ারী, নদীয়ার চৌধুরাই ও কানুনগোই ভবানন্দ ভোগ করিয়া আসিতেছিলেন তবে তাঁহাকে নতুন সনদ দেওয়া হইল কেন? ইহা কি নতুন সম্রাট কর্তৃক পুরাতন জায়গীরের পুনরনুমোদন, না নতুন দান? ১৬১৩ খৃঃ অঃ ইসলাম খাঁর সুবেদারীর সময় আরও সাতটি পরগণার অধিকার তাঁহাকে দেওয়া হয়। মানসিংহ বা ইসলাম খাঁ কর্তৃক, প্রতাপাদিত্য তথা বারভূঁইয়ার বিরুদ্ধে মুঘল শক্তিকে সাহায্য করিবার পুরস্কার স্বরূপ কি তিনি এই গুলি পাইয়াছিলেন? তবে মুঘলশক্তিপুষ্ট ঐ রাজবংশেরই আশ্রিত ভারতচন্দ্রের কাব্যে প্রতাপাদিত্যকে বড় করা হইল কেন—ইহাতে কি ঐ বংশের প্রতিষ্ঠাতার উপর কটাক্ষপাত হইল না? ইহার একটি সঙ্গত কারণ হইতে পারে যে হিন্দু রাজা মুসলমান সেনাপতির হস্তে পরাজিত হইয়াছেন, ইহা অপেক্ষা সুপ্রসিদ্ধ রাজপুতবীর মানসিংহের হস্তে পরাজিত হইয়াছেন ইহাতে অগৌরব কম। এই সব পরগণা পূর্ব্বে কাহার জমিদারীভুক্ত ছিল এই সম্বন্ধে তখনকার দিনের রাজস্ব বিধানে (যেমন টোডরমলের বা শাহ সুজার তৌজিতে) কোন তথ্য পাওয়া কিনা?

(৫) আকবরনামায় প্রতাপাদিত্যের সহিত যুদ্ধের উল্লেখ নাই সত্য। তাহার এক কারণ হইতে পারে যে মুঘল শক্তি তখনও একজন ক্ষুদ্র জমিদারকে দমন করিতে পারেন নাই সে কথার উল্লেখ শ্লাঘার নয়। তা ছাড়া জেসুইট ফাদারদের সাক্ষ্য অনুসারে দেখা যায় (১৬০০ খৃঃ অঃ নাগাদ) যে "সমস্ত পাঠান ও দেশের আদিম অধিবাসী বাঙ্গালীগণ বারো ভূঁইয়াকে মানিয়া চলে ইহাদের মধ্যে তিনজন হিন্দু যথা চাঁদেকান, শ্রীপুর এবং বাকলার রাজা অপর নয় জন মুসলমান" (স্যার যদুনাথ উদ্ধৃত)। আমরা ইহাও জানি যে মানসিংহ ঐ সময় বরাবর বঙ্গ-বিজয়ে ব্যাপৃত ছিলেন। তখন প্রতাপাদিত্য কি মুঘল অনুগত রাজা ছিলেন? জেসুইট্ ফাদাররা বাংলায় মুঘল বিজয়ের কথা উল্লেখ করেন নাই।

আইন-ই-আকবরীর তকসীমা জমা অনুসারে সুবে বাংলার সরকার খলিফাবাদের অধীনে যশোর মহলের নাম পাওয়া যায়। অবশ্য অন্য ভূঁইয়াদের রাজস্বেরও উল্লেখ আছে, যেমন সরকার বাক্‌লা বামুরাদ খাঁ ও মুকুন্দের কাহিনী। বারভূঁইয়া ছাড়া অন্য দেশও অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে, যেমন সরকার সিলেট, সরকার চাটগাঁ। টোডরমলের সময় এই সব স্থানে মুঘল প্রাধান্য কতটা ছিল তাহা ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। যশোর মহলের রাজস্ব ছিল ১৭,২৩,৬৫০ দাম। বেভেরিজের বর্ণনানুযায়ী Ven Den Brouckeএর ম্যাপে ১৫৮২ খৃঃ অঃ যশোরের পরিচয় আছে। পাঠান বিজয়ের পর মুঘলরা বাংলা দেশকে সুবাভুক্ত করিয়া লইলেও বাঙালী রাজা ও প্রজা ইসলাম খাঁর পূর্ব্বে সম্পূর্ণ ভাবে মুঘল বশ্যতা স্বীকার করে নাই। এই ২৫।৩০ বৎসরের ইতিহাস কি? এই সময়েই মানসিংহ শাসনকর্ত্তা হইয়া আসিয়াছিলেন। মনে হয় সুবিধামত সামন্ত রাজগণ কখনও লড়িয়াছেন, কখনও দরবারে পেশকশ পাঠাইয়া নামে বশ্যতা স্বীকার করিয়াছেন। একটা প্রবল প্রতিরোধ বর্ত্তমান ছিলই। ইহাতে কে কি অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহার উপরই অনেকটা যোগ্য অযোগ্য বীরের বিচার নির্ভর করে। ইহা বহারিস্তানের পূর্ব্বের ইতিহাস।

(৬) কিম্বদন্তী যে মানসিংহ যশোর হইতে দেবীমূর্ত্তি লইয়া গিয়া আম্বেরে প্রতিষ্ঠিত করেন। সেই সঙ্গে বাঙ্গালী পুরোহিতও গিয়াছিল এবং তাহার বংশধরেরা আজও জয়পুরে দেবীর পূজারী। এই তথ্য যদি স্বীকার্য্য হয় তবে যশোরের সহিত মানসিংহের যে সম্পর্ক ছিল তাহা অস্বীকার করা যায় না। কারণ হিন্দু তাঁর উপাস্যা দেবীকে সহজে ছাড়িয়া দিবে না। হয় তাঁহারা সমানে সমানে সৌহার্দ্য-সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিল বা প্রতাপাদিত্য পরাজিত হইয়াছিলেন। অবশ্য ঐ মূর্ত্তি যদি যশোরেশ্বরী কালী না হন্ তবে আলাদা কথা—কিন্তু এই কিম্বদন্তী প্রচলনের ভিত্তি কি? মানসিংহের জীবনী বা জয়পুরের কোন নির্ভরযোগ্য ইতিহাস কি পাওয়া যায় না—যাহাতেদেবীর জয়পুর আগমন ও ঐ সময়ের ইতিহাসের কিছু উপকরণ পাওয়া যায়? এই দেবীমূর্ত্তি যদি"শিলাদেবী" হন—এই মূর্ত্তি কোথা হইতে আসিল—যশোর না বাংলার অন্য স্থান হইতে এবং বাঙ্গালী পুরোহিতই বা কেন নিযুক্ত হইল?

(৭) স্যার যদুনাথ ইকবল-নামা ৬৯ পৃঃ হইতে দেখাইয়াছেন যে সুবাদার ইসলাম খাঁর পুত্র যখন বঙ্গ-বিজয়ের স্মৃতিস্বরূপ বন্দী ও উপঢৌকনাদি লইয়া বাদশাহের নিকট পেশ করেন তখন প্রতাপ তাহাদের মধ্যে ছিলেন না। প্রতাপ সমসাময়িক বঙ্গরাজাদের মধ্যে প্রধান, তাঁহাকে খাঁচায় বন্দী ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া লইয়া যাওয়া অসম্ভব নহে এবং তিনি যে পথে কাশীতে মারা যাইতে পারেন তাহাও মিথ্যা না হইতে পারে। কাশীতে মহারাজ প্রতাপাদিত্যের পিতা শ্রীহরির একটি সুন্দর মন্দির ছিল এবং "জহাঙ্গীর যুবরাজ অবস্থায় উহা ভাঙিয়া ফেলিতে হুকুম দেন কিন্তু মানসিংহের মিনতিতে মন্দিরটি রক্ষা পায়" (স্যার যদুনাথ)—মানসিংহ এই মিনতি করিয়াছিলেন কেন? শুধু হিন্দু মন্দির বলিয়া? ঐ মন্দির মানসিংহের মন্দির অপেক্ষাও "উৎকৃষ্ট" ছিল।

(৮) স্যার যদুনাথ ফাদার পিয়ার দু জুরিকের পুস্তকে চাঁদেকানের রাজার (প্রতাপাদিত্যের) কিছু বিবরণ ফাদার ফনসোকার পত্র হইতে (২০শে জানুয়ারী ১৬০০ খৃঃ অঃ) উদ্ধৃত করিয়াছেন—"তিনি আমাদিগকে এত মান্য করিলেন যে আমাদের দেখিবামাত্র সিংহাসন ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া মাথা নত করিলেন। ইহার কারণ এই যে এদেশের লোকেরা ব্রহ্মচর্য্যকে অত্যন্ত ভক্তি করে এবং আমরা পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করি শুনিয়া আমাদের সম্বন্ধে অতি উচ্চমত পোষণ করিয়াছেন···তিনি খুব ভক্তির সহিত গির্জ্জা ঘরে প্রবেশ করিলেন—জুতা খুলিয়া ফেলিলেন, এমন কি তাঁহার জন্য রাখা চেয়ার বা কার্পেটেও বসিলেন না, শুধু সিঁড়ির উপর একটি ছোট মাদুরে বসিলেন"···বিদেশীর এই সব উক্তি প্রতাপ ও তৎকালীন হিন্দুসমাজের উচ্চ আদর্শের একটি প্রশংসাপত্র বিশেষ।

(৯) এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে স্যার যদুনাথের মতে বহারিস্তানের কাহিনী (১৬৮ খ পৃষ্ঠা) সত্য হইলে জেসুইট্ পাদ্রীদের বর্ণিত কার্ভালো হত্যাকারী বলিয়া প্রতাপকে দোষী করা যায় না। অন্ততঃ এই দিকে প্রতাপ-চরিত্রের একটি দোষ স্খলন্ হইল।

মোটের উপর কথা হইতেছে যে অন্নদামঙ্গল, ঘটক-কারিকা প্রভৃতি কাহিনীর অনুসরণে মহারাজ প্রতাপাদিত্যের যে বিরাট্ চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে তাহা অতিরঞ্জিত সন্দেহ

নাই। কিন্তু শুধু বহারিস্তানের কাহিনী অবলম্বন করিয়া বলা যায় কি যে প্রতাপাদিত্য মুঘলের বিরুদ্ধে বীরের ন্যায় যুদ্ধ করেন নাই এবং যাঁহারা তাঁহাকে সম্মান দিতেছেন তাঁহারা বাংলার মুখে কলঙ্ক লেপন করিতেছেন। ইহা ঠিক যে প্রতাপাদিত্য বা ভুঁইয়ারা প্রবল পরাক্রমে যুদ্ধ করিলেও আজিকার দিনের স্বাধীনতার সংজ্ঞা লইয়া করেন নাই। তখনকার দিনের রীতিনীতি, দৃষ্টিভঙ্গী, আদর্শও বিভিন্ন ছিল। সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতও ছিল অন্যরূপ। তাই যুগে যুগে বিচারের মানদণ্ডে ইতিহাসের নিরীখ বদলাইতে বাধ্য। তিনি নিজেদের শক্তি ও রাজত্ব রক্ষা করিবার জন্যই ছলে বলে কৌশলে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তবু প্রবলের বিরুদ্ধে অপেক্ষাকৃত দুর্বলের আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ হেয় নহে ও জনসাধারণের দৃষ্টিতে অপ্রশংসনীয়ও নয়।

নচিকেতার জয়

শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বসু

"পিণ্টুদা—ও পিণ্টুদা!"

মাঝ রাত। অন্ধকার ঘরে বিছানায় পাশাপাশি শুয়ে ছিল পাঁচ বছরের ছেলে ঝণ্টু, আর তার সাত বছরের দাদা পিণ্টু। একটা আওয়াজে দুজনেই জেগে উঠেছে। শুধু কান নয়, সারা শরীর দিয়ে সেই আওয়াজটাকে তারা শুনছে। ঝণ্টুর ডাকে তার দাদা আস্তে একটু শব্দ করে সাড়া দিল। ঝণ্টু শুধোলে—

"ও কিসের আওয়াজ?"

"চুপ। মা কাঁদছে।"

অন্ধকারের মধ্যে ঝণ্টুর ডাগর চোখদুটী বিস্ময়ে আরো বড় হয়ে উঠল। সে কি! বড়রা তো কাঁদে না, কাঁদে ছোটরা। শুধোলে—"কাঁদছে কেন?"

"মণ্টুদা মরে গেছে কিনা তাই।"

বিস্ময়! রাজ্যের বিস্ময়! ঝণ্টুর শিশুমনে নেমে আসে শিশুবিশ্বের নিঃসীম কুয়াশা। অন্ধকার পৃথিবী, অন্ধকার শিশুমন, তাকে দীর্ণ করে যাচ্ছে ছুরির ফলার মতো মায়ের কান্না, আর সেই দুর্নিরীক্ষ্য রহস্যের সামনে বিস্ফারিত দুটী শিশুচক্ষু।

মৃত্যু! কান্না! চুপ!

কদিন হয় মণ্টুদার অসুখ হয়েছিল। ঝগড়া, মারামারি, খেলা, হাসিকান্না সব বন্ধ রেখে নিঃসাড় হয়ে বিছানায় প'ড়ে থাকতো সে, মা আগলে রাখতো তাকে, শুতো তার সংগে। পিণ্টু-ঝণ্টু তাই দিন কয়েক যাবত আলাদা শোয়। ঝণ্টুর মনে প্রথমে রাগ হয়েছিল—মা তো ছোটর পাওনা, মণ্টুদা কেন দখল করেছে মাকে। কিন্তু ওকে দেখে কেমন যেন মায়া হয়। অসুখ হ'লে কষ্ট লাগে সে জানে। মা শুকগে দু'দিন ওর কাছে। আহা কেমন শুকিয়ে গেছে মণ্টুদার মুখখানি।

কিন্তু এ তো জানতো না যে অসুখ হ'লে মরে! মরা মানে কি? মরলে কাঁদতে হয় নাকি? মা-কে তো কেউ মারেও নি, বকেও নি, তবে মা কাঁদে কেন?

প্রশ্ন ঠেলে আসছে বুকে, কিন্তু কথা বলা যায় না। মৃত্যু-বিদ্ধ এই নিশ্ছিদ্র মৌন অন্ধকারের ভেতর মা-র কান্না ছাড়া আর কোন শব্দের যেন স্থান নেই।

শেষে ঝণ্টু আর চাপতে পারে না। আস্তে আস্তে বলে—

"ম'রে গেছে বলে কাঁদছে কেন?"

"জানিস না? মরে গেলে চলে যায়, আর আসে না। মণ্টুদা আর আসবে না।"

"কোথায় যায় তা হলে?"

"ভগবান নিয়ে যায়। চুপ কর, কথা বলিস নে।" কাঁদতে না শিখলেও মরণকে যে মৌন সমীহ দিয়ে গ্রহণ করতে হয় পিণ্টু তা শিখেছে।

ঝণ্টু চুপ করল। ভগবান নিয়ে গেল মণ্টুদাকে। তবে যে বলে ভগবান ভালো? মা তো পূজো করতো ভগবানকে।

ভাবতে ভাবতে ঝণ্টু ঘুমিয়ে পড়লো বোধ হয়। মণ্টুকে কখন নিয়ে গেল তা সে জানে না। সকালে উঠে দেখে মণ্টুদা নেই—ভগবান নিয়ে গেছে।

কিন্তু কে জানে কেন—রোজ মনে হয় ফিরে আসবে সে। ইস্কুলের সময়ে, বিকেলে বাঁধে বেড়াতে যেতে, দু'বেলা খেতে ব'সে—মনে হয় আসবে মণ্টুদা। ঝণ্টুর লাট্টুতে নাল লাগানো হয় নি, তাকে কাঁদতে দেখে মণ্টুদা নিজের লাট্টুটা তাকে খেলতে দিয়ে বলেছিল, ওরটাতে নাল লাগিয়ে দেবে। না এলে কি করে করবে এসব? আর মা-তো এখনো ঠাকুর ঘরে গিয়ে ভগবানের পূজো করে। ভগবান নিশ্চয় ওকে ফিরিয়ে দেবে। ঝণ্টুও তাই অনেক সময়ে ভগবানকে ডাকে, বলে মণ্টুদাকে ফিরিয়ে দাও।

না, ঠিক ওর লাট্টুর নালের জন্যে নয়। মণ্টুদার জন্যে খুব যে কষ্ট হয় তাও নয়। কষ্ট হয় মার কান্না দেখে। মা যখন তখন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। খেতে, শুতে, তাদের দু-ভাইকে আদর করতে—সবতাতেই তার কান্না। ঝণ্টু মৃত্যু-রহস্যের কিছু বোঝে না, কিন্তু বোঝে মা-র বুকের দুঃসহ বেদনা। সে বেদনার তরংগ তার কচি বুকেও আঘাত হানে—দুহাত জোড় করে বলে—"ওগো ভগবান! ফিরিয়ে দাও না মণ্টুদাকে মার কাছে।"

কিন্তু কান্না তার আসে না।

জ্যেঠিমা, বড় পিসীমা, পাশের বাড়ির নন্দিদিদি সবাই এসে মা-র পাশে বসে। চোখের জল ফেলে বলে মণ্টুদার কথা—সোণার টুকরো মার কোল আলো-করা ছেলে এমনটী আর হয় না। তারা আঁচল দিয়ে মার চোখের জল মুছিয়ে দেয়। ঝণ্টু থাকতে পারে না কাছে। পালিয়ে যায়, চেষ্টা করে কাঁদতে। ভাবে মণ্টুদার কথা—কবে মা'র কাছে নালিশ করে মার খাইয়েছিল তাকে। আহা ঠিক হয় নি মণ্টুদাকে মার খাওয়ানো। না হয় রাগ করে ছিঁড়ে দিয়েছিল ছবিটা, কিন্তু ওরও তো দোষ ছিল—ওই তো আগে মণ্টুদাকে বলেছিল 'পাজিটা', —দাদা হয় না!

তারপর এই সেদিনের কথা। কতো খোসামোদ করলে দুটো চকোলেটের জন্যে, কিছুতেই ঝণ্টু একটার বেশী দিলে না।

এমন কতো অন্যায়ের কথা মনে পড়ে। মণ্টুদার ওপর মায়া হয়, মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে আর অমন করবে না ওর সংগে। কিন্তু অনভিজ্ঞ বুকে শোকের কম্পন ওঠে না, চোখে কান্না নামে না।

এক একদিন যখন মা-র চোখের ধারা বাঁধ মানে না, সজল-নয়না কোন বর্ষীয়সী আত্মীয়া পিণ্টুকে কিম্বা ঝণ্টুকে ধরে এনে মা-র কোলে ফেলে দেয়, মা-র চোখের ঝোরা আরো অঝোরে ঝরতে থাকে, শেষে ছেলেকে বুকে চেপে শান্ত হয় মা। নিজের বুকের তলায় ঝণ্টু অনুভব করে নিরুদ্ধ বাষ্পের গুমোট, কিন্তু দুয়ার ভাঙে না।

মণ্টুর খেলনাগুলো, ধারাপাত-শিলেট, হাপপ্যাণ্ট-সার্ট সব একটা পুঁটুলি বেঁধে মা তুলে রেখেছে, ঝণ্টু জানে না এ খবর। এক একবার ভাবে সে, মণ্টুদার খেলনা, পোষাক, বই পত্র সব গেল কোথা? এ আর এক হেঁয়ালি, যার কিনারা পায় না সে।

রাতে মাঝে মাঝে ঘুমের ঘোরে মা ঝণ্টুকে বুকে জড়িয়ে ধরে। ঝণ্টু চমকে জেগে ওঠে, কিন্তু কথা বলে না। মনে হয় মণ্টুদা এসেছে—মার দেহ ভরে যেন মণ্টুদা—মা-র দেহ থেকে এসেছিল আবার ফিরে গেছে মারই দেহে—ফিস্ ফিস্ করে যেন বলছে—জানিস ঝণ্টু, ভগবান ফগবান সব বাজে, আমি মা-র কাছে ফিরে গেছি। এদিকে মা তখন গাঢ় আলিংগনে জড়িয়ে ধরেছে ঝণ্টুকে।

ঝণ্টুর মনে হয় মণ্টুদা তাকে ডাকছে, বলছে—আয়না আমার সংগে, দেখবি কেমন মজা।—ক্রমে একি হচ্ছে! সেই যেন মণ্টুদা! * * *

* * * অকুল সমুদ্র, নিস্তরংগ স্থির, জলে জলময়। আকাশ নেই, শুধু জল আর মৃদু স্তিমিত আলো। মা-র কোলের মতো স্নিগ্ধ পরম-নির্ভর অন্তহীন জল। ঝণ্টু ভাসছে—একা। কোথাও কেউ নেই, নিঃসংগ নিস্তব্ধ, কিন্তু ঝণ্টুর একটুও ভয় করছে না। সমস্ত গা হাত পা ছেড়ে দিয়ে আত্মসমর্পণ করেছে যেন মা-র কোলে, না তার চেয়েও নিবিড় অন্তরংগ করে যেন মা-র জঠরে। আর ওপরে ঘিরে আছে আবছায়া আলো, মা-র চুমুর মতো মধুর।

মা-র কোলের মতো জল, আর মা-র চুমুর মতো আলো। সে মিশে যাচ্ছে তার মধ্যে।

"মণ্টু, মণ্টু"

"আঃ—কেন বিরক্ত কর? আর কি আমি ফিরতে পারি? আমি হারিয়ে যাচ্ছি যে। তোমরা কাঁদলে কি করব!"—ঝণ্টু ভাবছে। সে এখন মণ্টু হয়ে গেছে কিনা!

"মণ্টু!" মা-র নাড়া খেয়ে ঝণ্টু জেগে উঠল। কিছুক্ষণ লাগল ভাবতে সে আবার ফিরে এল কেমন করে? —সে মণ্টু না ঝণ্টু? এদিকে মা ঘুমের ঘোরে ডাকছে মণ্টুকে, হারা ছেলে মণ্টু। ঝণ্টু ভয় পেয়ে গেল। চিৎকার করে মাকে ডাকলে।

মা-র মুখ বালিস জলে ভিজে গেছে। কি স্বপ্ন দেখছিল কে জানে। জেগে উঠে ঝণ্টুর মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। শুধোলে—

"ভয় পেয়েছিলি?"

"না। জানো মা, মণ্টুদা এসেছিলো।"

"দেখেছিস্ তুই? আমিও তো দেখলুম।"

দুজনের কারো চোখে ঘুম নেই। ঝণ্টু বুঝতে পারলে, মা নিঃশব্দে কাঁদছে। মা-র স্পর্শ থেকেও যেন ফুটে বেরুচ্ছে সেই কান্না। মা বোধ হয় চায়, তার সংগে সেও কাঁদুক একটু। কিন্তু কান্না যে কিছুতেই আসে না, বড় অসোয়াস্তি লাগে।

"মণ্টুদা তোকে খুব ভালবাসতো, না রে ঝণ্টু?"

"হ্যা মা। আমাকে ওর লাট্টুটা দিয়েছিল। আর আমার লাট্টুটায় নাল লাগিয়ে দেবে বলেছিল।"

আবার দুজনে চুপ। শেষে মা আস্তে আস্তে বললে—

"তোর কষ্ট হয় না মণ্টুদার জন্যে?" কথার ভেতর এক ব্যাকুল মিনতি, মণ্টু সবই বোঝে। বলে—"হয় মা।"

বলেই সে বুঝতে পারে অন্যায়। তার প্রথম সজ্ঞান প্রবঞ্চনা। সাহস করে মণ্টু শুধোলে—"মণ্টদা আর আসবে না?"

মা জবাব দিতে গিয়ে ভেঙে পড়ল। চোখের জলে ঝণ্টুর মাথা ভিজতে লাগল। আর ঝণ্টুর বুকে জলোচ্ছ্বাসের ওপর যেন পাথরের আস্তর পড়েছে। আঃ—এক ফোঁটা জল আসে না চোখে। শিশুর অন্তর অস্বস্তিতে ছটফট্ করে।

কিন্তু আজ সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তার জিদ চলেছে, মৃত্যুর রহস্য ভেদ করবে সে। এই রহস্যটাই তাকে মা-র কাছ থেকে আড়াল ক'রে রেখেছে। ঝণ্টু আবার মা-কে শুধোয়—

"মণ্টুদা কোথায় গেল মা?"

"ওকে ভগবান নিয়ে গেছে বাবা।"

"ওর বই-এর ব্যাগ আর খেলার বাক্সটা?"

"সংগে করে নিয়ে গেছে ভগবানের কাছে।"

"সব নিয়ে গেছে? তবে আর আসবে না?"

পাথরে ফাটল ধরেছে, মুখর বর্ষণবেগ গুমরে উঠছে তার নীচে। ঝণ্টুর গলা কেঁপে উঠল। মা-র কণ্ঠে বিস্ময়—

"কিরে, কি হোল?"

"মণ্টুদার লাট্টুটা?—"

চৌচির হয়ে গেল পাথরের কবাট। কোমল তনুদেহ গলে যেতে লাগল কান্নায়। মা আর একবার তার অফুরন্ত বেদনার ভার মুক্ত করে দিল। মাতৃহারা শিশু যেন ফিরে পেল মা-কে, আর মা যেন পেল প্রথম সমব্যথী, প্রথম বুক-জুড়োনো সান্ত্বনা।

দুটী মাটির জীবের পদতলে পরাহত মৃত্যু পড়ে রইল তার অপার রহস্য নিয়ে। বিস্ময়ের পালা এবার তার।

বেলওয়ার তাম্রশাসনের দেশে

শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত বি, এস-সি

প্রথম প্রস্তাব

প্রায় ১২ বৎসর পূর্ব্বের কথা। দিনাজপুর বগুড়ার সীমানাস্থিত হিলি রেলষ্টেশনে নামিয়া সোজা পূর্বদিকে ঘোড়াঘাটের দিকে গরুর গাড়ীতে চড়িয়া যাইতেছিলাম। এই সেই ঘোড়াঘাট যা'র সম্বন্ধে গোলাম-হোসেন তদীয় রিয়াজউস্‌সালাতিনে লিখিয়াছেন, (১) 'কোচদেশাগত সাঙ্গলদেব গৌড়নগর পত্তন করিয়া…গর্বিত হইয়া…ইরাণাধিপতির প্রাপ্য রাজস্ব বন্ধ করেন…তৎফলে 'বঙ্গদেশস্থিত ঘোড়াঘাটের সীমায় উত্তর পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হয়। (৪০ পৃঃ) (২) ভূটান দেশজাত টাঙ্গন ঘোড়া বিক্রয়ার্থ এখানে আনয়ন করা হয়। লটকা নামক ফল…কোষ তিনটি…স্বাদ দাড়িম্বের ন্যায়…এ অঞ্চলে জন্মে। (৩৩ পৃঃ) (৩) সুজার আমলে অরাজকতা উপস্থিত হওয়াতে কোচবিহারাধিপতি ভীমনারায়ণ সাহসী হইয়া সসৈন্যে ঘোড়াঘাট আক্রমণপূর্বক এস্‌লাম ধর্ম্মাবলম্বী কতিপয় স্ত্রী পুরুষ বন্দী করেন। (২০৬ পৃঃ) (৪) সুজার দক্ষিণহস্ত হাজি আহম্মদের দ্বিতীয় পুত্র মিরজা মহম্মদ সৈয়দ ঘোড়াঘাট, রংপুর ও কোচবিহারে ফৌজদার ছিলেন। তাহার অত্যাচারে রঙ্গপুর মহাল শ্রীহীন হইয়া পড়িল। (২৮৭ পৃঃ) [রামপ্রাণগুপ্ত সম্পাদিত রিয়াজউস্ সালাতিন]

এই ঘোড়াঘাটই রাজা টোডরমল কর্ত্তৃক একটি সরকারে (বর্ত্তমান জেলার অনুরূপ) নির্দ্দিষ্ট হয়, উহাতে ৮৪টি পরগণা ছিল। [এবং বর্ত্তমান রঙ্গপুর ও দিনাজপুর জেলার কিয়দংশ লইয়া ইহা গঠিত ছিল] এবং করতোয়ার তীরবর্তী ঘোড়াঘাট সহরই উপরোক্ত ফৌজদারের রাজধানী ছিল। [আইন-ই-আকবরী]

পলাশীর যুদ্ধের অব্যপরে রেণেল সাহেব যে ভারতবর্ষের নানা অংশের ম্যাপ প্রস্তুত করেন, তন্মধ্যে ঘোড়াঘাট সরকারের (জেলা) নকসা আছে। তাহাতে প্রদর্শিত ঘোড়াঘাটের (Goragot) সন্নিহিত রাণীগঞ্জই ছিল আমার গন্তব্য স্থান।

গরুর গাড়ীতে চড়িয়া সোজা পূর্বদিকে চলিতে লাগিলাম। রস-সাহিত্যিক ললিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের (কোয়ারা) মত আমার ভাগ্য নয়; গরুর গাড়ীতে আমি একাকী…গাড়োয়ানের সঙ্গেই গল্প জুড়িয়া দিলাম।

প্রায় ৮ মাইল অতিক্রম করিয়া পাইলাম একটি ছোটনদী—উপরে কাঠবাঁশ দিয়া যে সেতু ঘাটোয়াল তৈরী করিয়া এপারে ওপারে পয়সা আদায় করিতেছে, সেই তুলসী গঙ্গা উপর দিয়া পার হইয়া গেলাম। বামে একটি বড় গাছ, তাহার নীচে মস্ত মস্ত পাথরে গড়া কারুকার্যময় দেব ও দেবী মূর্তি কে যেন বসাইয়া রাখিয়াছে। একটি মূর্তি তো প্রায় ৫ ফুট উঁচু।

গাড়োয়ান আমার 'বিস্ময়' দেখিয়া চমৎকৃত হইল; বলিল, তাহাদের এ অঞ্চলে দিঘীতে, ধাপে (উঁচু টীলা) ও জমিতে লাঙ্গল দিতে ঐরূপ কত মূর্তিই তো উঠে, উহাতে বিস্ময়ের কি আছে?

এ তো দেখিতেছি হিন্দু ও বৌদ্ধ রাজত্বের চিহ্ন: গোলাম-হোসেন ও আইন-ই-আকবরীতে লিখিত মুসলমান রাজত্ব ও ফৌজদারের শাসনের চিহ্ন কোথায়?

অগ্রসর হইলাম, রাস্তার দুইধারে লোকালয় বড় নাই, দূরে দূরে গ্রাম। ঘোড়াঘাট আরও তিন মাইল; বামে পাইলাম মস্ত আঙ্গিনা ও পুকুর সমন্বিত পুরা মসজিদ। ঘোড়াঘাটের পথ ছাড়িয়া তখন আমরা উত্তরে অল্প পথ চলিয়া রাণীগঞ্জ পৌঁছিয়া গেলাম।

অপরাহ্ণে ঘোড়াঘাটের এই সব প্রাচীন চিহ্ন বিষয় আলোচনা করিতেছিলাম। একজন মুসলমান যুবকের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল এবং সেই সেদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে লুকাইয়া আমাকে একফুট উঁচু অতিসুন্দর কারুকার্যখচিত এক দেবীমূর্তি আনিয়া দিল; বলিল, তাহাদের ভাতছালা গ্রামে হাল দিবার সময় মাটির নীচে উহা পাইয়াছে। [মূর্তিটি আমার ৯ই যোগোদ্যান লেনের বাড়ীতে রক্ষিত আছে]।

রাণীগঞ্জে আমাদের বাসস্থানের পশ্চাতে প্রায় ৩০০ বিঘা ব্যাপিয়া এক বিস্তীর্ণ জঙ্গল; তাহারই প্রান্ত ঘেরিয়া মহলনদী বা কালানদী (পরিখা বলিয়া বোধ হয়, কারণ উত্তর পাড়ে কাটামাটি পাহাড়ের মত উঁচু করা) প্রায় ১০।১২ মাইল লম্বা, ঘোড়াঘাটের উত্তরে করতোয়া হইতে বাহির হইয়া ১০।১২ মাইল আরও উত্তরে আবার তাহার সহিত মিলিত হইয়াছে। এই নদীর ওপারে রাণীর গড়: বড় বড় অট্টালিকার ভিত ও পরিখা দেখিয়া আসিলাম: সর্পভীতিতে খুব সমীপবর্তী হওয়া গেল না।

পরদিন মহল ও করতোয়ার সঙ্গমস্থল দেখিতে গেলাম। যে পথে গেলাম তা 'পলীঅঞ্চল' বলিয়া এদিকে খ্যাত। ইহার মাটি, শস্য, বাড়ীঘর, গাছপালা সব পূর্ববঙ্গীয়; যেন এক ফসলী (ধান) খিয়ার অঞ্চল নয়। অর্থাৎ কোন বৃহৎ নদীর (নিঃসন্দেহ করতোয়া) পলিমাটি হইতে যেন এই বিস্তীর্ণ ভূভাগের সৃষ্টি হইয়াছে। অথবা ইহাই সম্ভবত কালে করতোয়া নদীর গর্ভ ছিল। এবং করতোয়া নদী অতবড় ছিল বলিয়াই হিউএন্‌সঙ পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ছাড়িয়া কামরূপ যাইবার কালে (Watters, Vol II) যে নদীর উল্লেখ করিয়াছেন তাহাকে অনেক পণ্ডিত করতোয়া মনে করেন, ব্রহ্মপুত্র বলিয়া স্বীকার করেন না। করতোয়ার এই বিশালতা (এবং ইহাতে স্নানের পুণ্য) এখন 'করতোয়া-মাহাত্ম্য' গ্রন্থে কীর্ত্তিত হইতেছে।

বিষয়কর্ম্ম ডাকিতেছিল, ঘোড়াঘাট সহরে যাওয়া ঘটিল না। রাণীগঞ্জ বন্দর হইয়া হিলি রেল ষ্টেশনে ফিরিয়া আসিলাম। পথে গাড়োয়ান দেখাইল 'ভীমের জাঙ্গাল'—সেই কৈবর্ত্ত যোদ্ধা ভীম, যিনি দিব্বোকের পরে এই বরেন্দ্রভূমিতে রামপালের সঙ্গে দীর্ঘকাল (রমেশ মজুমদার প্রভৃতি সম্পাদিত সন্ধ্যাকর নন্দী কৃত রামচরিত কাব্য) যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

তারপর এই দীর্ঘ বার বৎসর কতবার রাণীগঞ্জ গিয়াছি, কিন্তু আর কোন অনুসন্ধানের সুযোগ ঘটে নাই। কেবল একবার রাণীগঞ্জ হইতে বাহির হইয়া গরুর গাড়ীতে চড়িয়া দক্ষিণদিকে প্রায় ২০ মাইল দূরস্থিত তালোড়াবাগুনী (বগুড়া জেলার অন্তর্গত) গ্রামে যাইবারকালে পথে দেখিয়াছিলাম মাঝে মাঝে ভীমের জাঙ্গাল (উচ্চপাড় বিশিষ্ট পথ, যুদ্ধের জন্য Rampart বা দেয়াল, অথবা বন্যার জল রোধ করার জন্য প্রাচীর) এবং বিরাটের মেলার স্থলে ৬০।৭০ ফুট উচু মাটি চাপা মন্দির এবং প্রায় অর্দ্ধ মাইল লম্বা ও বিশেষ গভীর নান্দাইল দীঘি।

আবার অনুসন্ধানের সুযোগ মিলিয়াছে, এই সম্প্রতি। গত ২০এ নভেম্বর, ১৯৪৬ খ্রীঃ কশীগাড়ী (পুরাতন ম্যাপে 'কেশরী গড়') অন্তর্গত পূর্বোক্ত রাণীগঞ্জস্থিত জমিদারী কাছারীর কর্ম্মচারী শ্রীমান বঙ্কিম সরকার আমাকে পত্রদ্বারা জানায়, "ভাতছালার পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম বেলওয়ার খাড়ুসাওতাল নিজ উঠানস্থ উনান বড় করার সময় দুইটি বড় তামার পাত পাইয়াছে।" আমি তৎক্ষণাৎ তাহা চাহিয়া পাঠাই এবং পরে তাহার মারফৎ আমার দাদা শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় উহা পাইয়া গত ১লা জানুয়ারী ১৯৪৭ খ্রীঃ আমাকে কলিকাতায় আনিয়া দিয়াছেন।

এই তাম্রশাসন দুইটির আয়তন এক। প্রস্থে ১৩″ ইঞ্চি এবং লম্বায় ১৪-৬″ ইঞ্চি। এই লম্বার দিকেই রাজচিহ্নটি যুক্ত আছে। রাজচিহ্নের মাপ লম্বায় ৭-২″ এবং পার্শ্বে ৫″ ইঞ্চি। একটী শাসন মহীপালের, অপরটি তৃতীয় বিগ্রহপাল দেবের। (মহীপালের বেলওয়া লিপির এই লেখকের সম্পাদিত পাঠ, ব্যাখ্যা ও টীকা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় প্রকাশিত হইতেছে)। যখন খুব ভাল পরিষ্কার হয় নাই তখনই বেঙ্গল কেমিক্যালের বিদ্যোৎসাহী ম্যানেজার শ্রীযুক্ত সত্যপ্রসন্ন সেন মহাশয় তাহার ফটো তুলিয়া দিয়াছিলেন।

হিলি হইতে ১২ মাইল পূর্বে এই বেলওয়া। সেখানকার প্রাচীন চিহ্নাদির বিষয় তখন অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম। শ্রীযুক্ত জগদীশ চন্দ্র, বঙ্কিম সরকার ও শ্রীভবানীচরণ দাস মহাশয়গণ যে সংবাদ দিয়াছেন তাহা এই—"বেলওয়ার সেটেলমেণ্টের ম্যাপ পাঠাইলাম * * * দাগের মধ্য দিয়া হরঘাটার বিলের পাড়ে উপস্থিত হই। এই বিলের আয়তন ½ মাইল * * * স্থানে স্থানে ইষ্টক খণ্ড * * উহার সংলগ্ন উচু বাঁধান বেদীর মত পীরের দরগা। ইটগুলি ১০″ ইঞ্চি স্কোয়ার ও এক ইঞ্চি পুরু। তথা হইতে…দাগের উপর দিয়া যাইয়া খাড়ু সাওতালের বাড়ীতে উপস্থিত হই। * * মনে হয় ১ বা ১।০ হাত খননের পরই তাম্রশাসন দুইটির উপর সাবলের ঘা লাগে। ঐ বাড়ীর চতুর্দ্দিক এক বিঘা জমি বেষ্টন করিয়া ২ হাত প্রস্থের পুরাতন প্রাচীর দেখিলাম। ইহার ইটও ঠিক আগের মত। ওখান হইতে দক্ষিণ পশ্চিমে…দাগের মধ্য দিয়া …দাগে যাই।…পরিখা বিশেষ,…৩০ হাত প্রস্থ। তারপর… দাগের ঢিপিতে উঠি। এখানে বহু ইঁটে-স্তূপ…দাগের মধ্য দিয়া আবার পরিখা পার হইয়া ঢোল চৌধুরীর বাটীতে উঠি। ইহা একটি প্রাচীন ইষ্টকের স্তূপ। এখানেই মস্ত দীঘির পাড়ে প্রাচীন একটি ভগ্নমন্দির দেখিলাম।

উপরোক্ত বিবরণ জানিয়া আমার তরুণ শিল্পীবন্ধু শ্রীমান কমলকুমার বসু একটি চিত্র আঁকিয়া দিয়াছেন।

প্রায় হাজার বৎসর আগেকার এই দুই তাম্রশাসন এখনও নষ্ট হয় নাই। ইহা দেখিয়া ধাতুর অনুপাত জানিতে কৌতুহল হয়। রাসায়নিক শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষ এম, এস্‌সি মহাশয় উৎসাহ-পূর্বক বেঙ্গল কেমিক্যালের পরীক্ষাগারে ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন।

(১) মহীপালের তাম্রশাসনে শতকরা ৭৫ ভাগ তামা আছে।

(২) মহীপালের রাজচিহ্নে শতকরা ৭৭·৪ ভাগ তামা আছে।

(৩) বিগ্রহপালের তাম্রশাসনে শতকরা ৭১·৪ ভাগ তামা আছে।

(৪) বিগ্রহপালের রাজচিহ্নে শতকরা ৭১·৬ ভাগ তামা আছে।

এই বিগ্রহপাল হইলেন মহীপালের নাতি। তবু আমরা দেখিতেছি এই ঠাকুরদাদার শাসনটির চাইতে যেন নাতির শাসনটি বেশী জীর্ণ হইয়াছে। তামার ভাগ কম থাকাই ইহার কারণ, কিম্বা রক্ষণাবেক্ষণের তারতম্যে এরূপ ঘটিয়াছে বলা শক্ত।

বহুযত্নে শাসন দুইটি পরিষ্কার করিতে হইল। দীর্ঘ সময় ইহাতে গেল। নিঃসংশয়ে সমুদয় পাঠ, অনুবাদ ও তাৎপর্য অনুধাবন করিতে অনেক দিন গেল। এ সকল সমাপ্ত হইলে গত ফেব্রুয়ারী মাসে আবার এই বেলওয়ার তাম্রশাসনের দেশে গিয়াছিলাম। উদ্দেশ্য, তাম্রশাসনোক্ত স্থানগুলি চিনিতে চেষ্টা করিব। বেলওয়ায় পূর্বোক্ত বর্ণনার সবই দেখিলাম, আর দেখিলাম 'গুদির থাপ' নামক মস্ত এক অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ।

মহীপাল এই শাসনটি দিয়াছেন, 'ভাগীরথী তীরস্থ সাহসগণ্ড নগর সমীপবর্ত্তী জয়স্কন্ধাবার হইতে। দত্ত বস্তু হইল, "কৈবর্ত্তদিগকে যে বৃত্তিপ্রদত্ত ছিল, তাহার নিকটবর্ত্তী কাণিতবীথি সম্বন্ধ অমল…২১০ প্রমাণ, পুণ্ডরিকা মণ্ডলান্তঃপাতি ৪৯০ প্রমাণ নন্দিবাদিনী; পক্কনগরী বিষয়ান্তঃপাতি ১৫১ প্রমাণ গংগবর সমেত গ্রাম পুষ্করিণীতে (প্রদত্ত হইল)। (সাহিত্য-পরিষদ পত্রিকা, ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা, ১৩৫৪; ৫২ পৃঃ) এই শাসনের দান পাইয়াছেন, 'হস্তিদাসগোত্র শ্রীজীবধর দেবশর্ম্মণ' (কোথায় অধিবাস, উল্লেখ নাই) এবং শিল্পী ছিলেন পোষলী গ্রামাগত পুণ্ডাদিত্য।

কিন্তু ইহাতে তো বেলওয়ার নাম নাই। তবে বেলওয়ার সহিত এই শাসনের সম্বন্ধ কী? এই মহীপালের শাসনটির সহিত প্রাপ্ত বিগ্রহপালের শাসনটির দানগ্রহীতা হইলেন 'ভরদ্বাজ গোত্র, ভরদ্বাজ আঙ্গিরস বার্হস্পত্যপ্রবর, শ্রীঅনন্তের সব্রহ্মচারী, পিপ্পলাদ শাখাধ্যায়ী মীমাংসাব্যাকরণ তর্কবিদ্যাবিৎ বাহড়াগ্রাম হইতে বিনির্গত, বেল্লবা-গ্রামবাসী...শ্রীজয়ানন্দ দেবশর্ম্মা।

বেলওয়া গ্রামের নকসাটি হইতেই বোঝা যায় যে বাহড়া হইল এখনকার চকবয়রা এবং বেল্লাবা এখন বেলওয়া হইয়াছে।

কিন্তু কাশিতবীথি কোথায়? পঞ্চনগরীও তো চিনিতে চাই। গুপ্ত আমলের বৈগ্রামলিপিতে এক পঞ্চনগরীর কথা আছে (Epigraphia India, Vol XXI, p 81. 82)। টলেমীর ভারতের ভূগোলে যে Pentapolis পেন্টাপোলিসের কথা আছে (সুরেন্দ্র শাস্ত্রী সম্পাদিত Mcrindle's Ancient India as described by Ptolemy page 191/2/3 তাহাকে) অধ্যাপক বিনয়চন্দ্র সেন পঞ্চনগরী বলিয়া মনে করেন (Som Historical Aspecfs of the Inscriptions of Bengal, page 110)। এবং অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র সরকার গুপ্ত আমলের কলাইকুড়ি তাম্রশাসনের আলোচনায় (The Indian Historical Quartery Vol YIX No b page 15) পঞ্চনগরীকে বগুড়া জেলার আধুনিক পাঁচবিবি বলিয়া অনুমান করেন। কিন্তু আরও যুক্তি ও স্থানীয় প্রমাণের অভাবে উহা নিঃসংশয় স্থিরিকৃত হয় নাই আমার মনে হয়। এইটি স্থির হওয়া খুব দরকার। কারণ দ্বিতীয় শতক হইতে আরম্ভ করিয়া একাদশ শতক (মহীপালের কাল) পর্যন্ত যে পঞ্চনগরী এই অঞ্চলের শাসনযন্ত্রের রাজধানী ছিল তাহা সামান্য স্থান নহে।

কিন্তু ঐ সাহসগণ্ড কোথায়? মহীপালের দ্বিতীয় জয়স্কন্ধাবার হইবার যোগ্যতাধারণকারী (তাঁহার বাণগড়লিপির জয়স্কন্ধাবারের নাম 'বিলাসপুর') ভাগীরথীতীরস্থ এই রাজধানীর (?) সন্ধান তো করিতে হইবে।

মহীপালের বেলওয়া লিপির প্রদত্ত ভূমি কৈবর্তদের প্রদত্ত বৃত্তির সমীপবর্তী, এ কথা শাসনে উল্লেখ করা হইয়াছে। উপরোক্ত কলাইকুড়ি লিপিতে আছে যে গ্রামস্থ অন্যান্য সজ্জনদের যখন দানের কথা জানান হইতেছে তখন 'কৈবর্তশর্ম্ম'কেও তাহাদের মধ্যে উল্লেখ করা হইতেছে, (I. H. Q maroh 1943. page 21)। এই কৈবর্তশর্ম্ম বাক্যটি কৌতুহলোদ্দীপক এবং রাজসরকারের বৃত্তিধারী (মহীপালের বেলওয়া লিপি) এই কৈবর্তরাই একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে পালরাজাদের হাত হইতে রাজরশ্মি কাড়িয়া নিয়া ছিল।

এই অঞ্চলের নকসাটি হইতে বুঝা যায় যেন কৈবর্ত রাজ ভীমের জাঙ্গালের কয়েকটি শাখা এই বেলওয়া গ্রামাঞ্চলে মিলিত হইয়া এই স্থানটাকে অপেক্ষাকৃত বিশিষ্টতা দান করিয়াছেন। আরও লক্ষ্য করার বিষয় এই যে বেলওয়া গ্রামটিকে কেন্দ্র করিয়া ৮।১০ মাইল ব্যাসার্দ্ধ ধরিয়া একটি বৃত্ত আঁকিলে তাহার মধ্যবর্তী স্থানের অধিবাসীরা শতকরা প্রায় ৮০জন মুসলমান। বাকী যা হিন্দু আছে তা' প্রায় সবাই কৈবর্ত।

বারান্তরে এই সকল প্রশ্নের সমাধানের চেষ্টা করিব।

ভস্মাবশেষ

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

খুব ভোরে বাইরে এসে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকা রঞ্জনার অনেকদিনের অভ্যাস। কি জানি কেন এই স্বল্প আঁধারির আপনি-মগ্ন লগ্নটিকে বড় ভাল লাগে তার। সম্ভ্রান্ত বাপের একমাত্র মা-মরা মেয়ে, অতি আদরের; রূপে গুণে বিদ্যায় অভিজাত সমাজের শীর্ষে। মাকে সে চোখ মেলে দেখেনি কোনদিন, শুনেছে এমনি এক আলোভরা ভোরে তার মা চিরকালের জন্য বিদায় নেন্। তাই সকাল হলেই মনে হয়, যেন জননীর আশীর্ব্বাদ নেমে আসছে ঐ আলোর ধারা বেয়ে, সপ্তাশ্ববাহিত রথচক্র ভেদ করে, চিরঞ্জীবের বিজয়বার্ত্তা নিয়ে। মেঘ ঢাকা সকালকে কোনদিনই তাই সে প্রসন্ন মনে গ্রহণ করেনি। আকাশের দিকে চেয়ে আজও তার বিক্ষিপ্ত মনটা আরো বিষণ্ণ হয়ে উঠলো। মায়ের আশীষ নিয়ে একফালি কচি সোনালী রোদ্দুরের স্বাদু উষ্ণ স্পর্শের জন্য মনের কোণে একটা অতৃপ্ত আকাঙ্খা জমেই রইলো।

রঞ্জনার হাতে ছিল একখানা বই। বইটা যে তাকে বেশ বিচলিত করেছে তা দেখলেই বোঝা যায়। সারারাত জেগে সে পড়েছে। বইটা খুলে সে খানিকটা আবার পড়লে, আবার রেখে দিলে—তার পর উঠে দাঁড়িয়ে চেয়ে রইলো বাইরের দিকে।

অভিজাত লেকপল্লীর চওড়া পাড়ার মার্বেল মোসেইক্ মণ্ডিত ব্যালকনি থেকে দৃষ্টি চলে গেল জলের সমারোহ

ছাড়িয়ে, রেল লাইন পেরিয়ে দাক্ষিণ্যেভরা দক্ষিণের দিকে। যেন দেখা যায় দূরে, অতিদূরে—অথচ অতি কাছে শ্রীহীন হ্রীহীন গ্রামের একটু ছায়া, যেখানে শুধু দেবতার দেউলই ভেঙ্গে পড়েনি, মানুষও হয়েছে ভগ্নাংশ; জীবন যেখানে আনন্দ নয়, মরণ যেখানে শাস্তি আর জলন্ত কাহিনী। এইমাত্র সে এই পড়েছে বইটাতে—আর তারই পরিপ্রেক্ষিতে সে চেয়ে দেখেছে নিজেদের উপরতলার লোকেদের। ভাবতে গিয়ে কেঁপে ওঠে রঞ্জনা।

কে লিখেছে এই বইটা—অভীক—সেটা ত শুধু 'পেননেম'।

—কি হচ্ছে মা মণি—বলে ঢুকলেন অবিনাশবাবু—

—এই যে বাবা—

তকমা আঁটা বয় ঢুকলো ট্রে নিয়ে, টি টোষ্ট আণ্ডা জ্যামজেলি সমেত।

—কাল রাতে কি ঘুম হয়নি মা—মেয়ের শুকনো মুখ দেখে উৎকণ্ঠিত হন্ তিনি—

—না, বাবা—

—হাতে ওখানা কি—

—ও, একখানা বই, অভীক নাম নিয়ে একজন অনামী লেখক লিখেছেন—

—ও, তাই নাকি—কিছুমাত্র উৎসাহ দেখান না অবিনাশবাবু—

জানলে বাবা—উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে রঞ্জনা—অপূর্ব্ব সৃষ্টি, সবাই বলছে এ রকম বই একশো বছরে একটাই বেরোয়। কাল রত্না এসেছিল, আমায় বল্লে—দিস্ জ্যাঠামশাইকে পড়তে—

হো হো করে হেসে ওঠেন অবিনাশবাবু—বলিস কিরে, আমায় একটু শিক্ষা দিতে চায় বুঝি, কালাপাহাড় ঠাউরেছে বল—

—কি যে বলো বাবা, এইটে পড়তে হবে কিন্তু!

—আচ্ছা রে আচ্ছা, খুব ভাল লেগেছে বইটা না—

—হ্যাঁ বাবা, যার হাত দিয়ে এই লেখা বেরিয়েছে, তাঁকে দেখতে ইচ্ছে করে, কী দরদ, কী মমতা, কী অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে লেখা, মানুষ নন্ তিনি, দেবতা।

অন্যমনস্ক হয়ে পড়েন অবিনাশবাবু, কি যেন ভাবেন। জেলি-মাখানো টোষ্টটা আগিয়ে দেয় রঞ্জনা, বলে—স্বয়ং সর্ব্বেশ্বরবাবু নাকি বলছিলেন—খোঁজ হচ্চে লেখকের—এমন বই আর হয় না—জোর অভিনন্দন দেওয়া হবে।

—বেশতো, লেখককে খুঁজে পেলে একদিন নিমন্ত্রণ করে খাইয়ে দিস্—তোর হাতের রান্না যা মিষ্টি—ঠিক তোর মায়ের মত—কণ্ঠস্বর গাঢ় হয়ে আসে। চোখ দুটো চক্ চক্ করে, তলিয়ে যান তিনি অতীতের স্মৃতিতে। যে অতীতকে তিনি নির্ম্মমভাবে পেছনে ফেলে এসেছেন, যাকে তিনি বাইরে স্বীকার করেন না, অথচ মনে তার প্রভাব আজও সক্রিয়।

বেয়ারা এসে ডাক দিয়ে যায়—সঙ্গে অনেকগুলো দৈনিক মাসিক সাপ্তাহিক। রঞ্জনা দু-একটা খুলে চোখ বুলোয়, হঠাৎ তার মুখ রাঙা হয়ে ওঠে। মেয়েকে লক্ষ্য করছিলেন অবিনাশবাবু।

কি হলো, মা—

মিথ্যুক নিন্দুক, জেলে দিতে হয় এই সব ক্রিটিক্‌দের, স্বাধীনতা পেয়েছেন, না উচ্ছৃঙ্খলতার ছাড়পত্র—

—কি হয়েছে মা—

ঐ যে, যে বইটা পড়ছিলুম, তারই উচ্ছ্বসিত সমালোচনার সঙ্গে জড়িয়েছে তোমার নাম—বলে কিনা বাঙালী দেখুক, একদিকে অভীকের মত মানুষ, খাড়া দাঁড়িয়ে আছে, নির্য্যাতীত অপমানিত মনুষ্যত্বের প্রতীক, আর একদিকে অবিনাশবাবুর মত লোক—প্রিন্স অফ্ কালোবাজার, লুব্ধতার যার সীমা নেই, অন্যায়ের যার সীমা নেই, অন্যায়ের যার প্রতিকার নেই, মা লক্ষ্মীকে ব্যাঙ্কে পুরতেই জীবনের সবটুকু যার গেলো, একদিকে সংযম, দরদ জীবননিষ্ঠচেতনার আদর্শ—আর একদিকে সমাজ-দ্রোহিতা, স্বদেশবিরোধিতা, আত্মসুখমগ্নতার ক্লিন্ন চেহারা—

—বলে বলুক না মা। কি যায় আসে তোর আমার। উঠি, আজ আবার বোর্ডের মিটিং, কাল কোলিয়ারীতে যেতে হবে, হাইকোর্টে দুটো কেস ঝুলছে—কিন্তু বইটা ভাল লেগেছে তোর, না, মা মণি—

রঞ্জনা বিস্মিত হয় তার এই পুনরায় জিজ্ঞাসা করবার ধরণটা দেখে। তার এই তেইশ বছর বয়সে বাপকে সাহিত্যপথ পথিক, কাব্যরস রসিক বলে দেখেনি জানেনি—দেখেছে যেন তেন প্রকারেণ নিক্ষিপ্ত হয়ে অর্থ ও আভিজাত্যের পেছনে ছুটতে, নিন্দাস্তুতিতুল্যমৌনী হয়ে।

দেখেছে দিনের পর দিন রায় বাহাদুর অবিনাশচন্দ্র কাঞ্চন কৌলীন্সের ধাপে ধাপে উঠেছেন, খেলাঘরের তলোয়ার হাতে মধ্যযুগীয় লাইট্ ব্যাচেলার হয়েছেন। তাঁর প্রাসাদের পর প্রাসাদে লক্ষ্মীর পায়ের ছাপ পড়েছে। কিন্তু এক এক সময় মনে হয়েছে এই অমিতবিত্তের মধ্যেও যেন একটা নির্ব্বিকার উদাসীন চিত্ত লুকিয়ে আছে। একদিনের কথা তার মনে আছে—বাপকে ডাকতে গিয়ে দেখে ছাদের উপর তিনি পায়চারী করছেন—সঙ্গে রয়েছে আইনষ্টাইনের একখানা বই—অবাক্ হয়ে গিয়েছিল রঞ্জনা ধনকুবের অবিনাশবাবুর ভাবভঙ্গী দেখে।

কোটীপতি এই লক্ষ্মীর বাহনটি সম্বন্ধে দেশের লোকের মনোভাব কিন্তু অনমনীয়ই ছিল। দুএকজন অতি অন্তরঙ্গ ছাড়া সবাই বলতো যাকে দেশদ্রোহী, সমাজদ্রোহী; তিনি নাকি প্রত্যেকটি সুযোগকে কাজে লাগাতে ওস্তাদ। তাঁর দরাজ কপালের জোরে উনিশশো চোদ্দ সাল বারে বারে এসেছে। নিন্দুকরা এমনও বলেছে যে, কত ছেলেকে ইনি জেলে পাঠিয়েছেন সত্য মিথ্যায় রং মেশানো তাদের গোপন ইতিহাস টেনে এনে। তাঁরই স্বদেশী মার্কা মিল ফ্যাক্টরীতে, তাঁরই মুনাফার জন্য তারা খেটেছে, তাঁরই মানবৃদ্ধির জন্য সঙ্কটত্রাণ কো-অপারেটিভে ঢুকেছে। তাঁর অর্থলিপ্সার কাছে কত ঘর ভেঙেছে, কত মন ভেঙেছে, কত মা কেঁদেচে, কত স্ত্রী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেছে!

রঞ্জনা রেগে উঠতো এই সব সমালোচনা শুনে—অক্লান্ত-কর্ম্মী বলে বাপের উপর তার ছিল অগাধ বিশ্বাস, কতো প্রতিষ্ঠান তিনি গড়ে তুলেছেন, ভাঙা সোজা—কিন্তু গড়া···

বাপকে বলতো—বাবা, জবাব দাও না কেন?

কি হবে মা, হিংসে।

আচ্ছা বাবা, কি হবে আমাদের এতো টাকায়—

কি করতে চাস্ বল—তার দৃষ্টি সুদূরে অতীতে চলে যেত। অবিনাশবাবু বলতেন—হবে, হবে, না হয় একদিন সব বিলিয়ে দিয়ে চলে যাবো হিমালয়ে, কি বলিস্—

হেসে উঠতো রঞ্জনা।

ক্রিটিক্‌দের এই চীৎকারে তাঁর ক্যারাভানের বিজয়রথ থামেনি। পালিয়ে যান্‌নি তিনি বিবেকের দোহাই দিয়ে। দিকে দিকে দিকপাল হয়ে উঠেছেন। শুধু সে আমলেই নন্, যখন প্রভুভক্তির প্রিমিয়ম্ ছিল—আজকের নতুন মহলেও তাঁর অতুল প্রতাপ বিপুল বিক্রম—বড় বড় প্রতিষ্ঠান তাঁর দেওয়া মোটা চাঁদায় বর্দ্ধমান্। রাশভারী কাগজগুলো তারই মিল ফ্যাক্টরী শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপনে ভর্ত্তি—তবু রৌপ্যচক্র ভেদ করে সমালোচনা হতো না যে তা নয়, কিন্তু আজকের এই বইটা দেশের যে নগ্নরূপ দেখিয়ে, মূর্ত্তিমতী করে তুলেছে যে ঘরছাড়া অলক্ষ্মীকে, তা ভীত করে তুলেছে রঞ্জনাকে, তার ভিত নড়িয়ে দিয়েছে।

কে এই অভীক—কেন সে এই বই লিখলো, তার বাপের প্রচ্ছন্ন ইতিহাস যে এইখানে, সুস্পষ্ট ইঙ্গিত।

সারা দেশে তখন বানচাল অবস্থা—যুদ্ধোত্তর দিনের নানা সমস্যা। অবিনাশবাবুর ব্যবসা তখন আকাশ ছোঁয় আর কি--কোটী কোটী টাকার ছিনিমিনি চলে একদিকে, আর একদিকে কোটী কোটী মানুষের দীর্ঘশ্বাস। ভালবাসা, আদর্শ সব কিছু গুঁড়িয়ে যায় স্টীম রোলারের নীচে—হয়ত জীইয়ে থাকে ধিকিধিকি ভস্মাবশেষ হয়ে—একদিন অনুকূল হাওয়ায় যে আগুন জ্বলে উঠবে—অভীকের অগ্নিগর্ভ সেই বইখানা অগ্নিসাক্ষী করেই নিয়ে এলো সেই আবহাওয়া।

এক নিমিষে স্তম্ভিত হয়ে উঠলো পাঠক সমাজ—বিদ্রোহী হয়ে উঠলো জনমন—এতো সৌখীন সাহিত্য নয়—বাগ্‌বৈখরী ইনিয়ে বিনিয়ে কথা নয়—এ যে স্বয়ং আহিতাগ্নি—যে আগুন রক্তে রক্তে প্রতিটি জীবকোষে বেঁচে থাকার দাবী জানিয়ে ঝঙ্কার তোলে—ঝিমিয়ে যাওয়া সস্তা যৌন উত্তেজনার খোরাক্ যাতে নেই, মরচে-পড়া ভালবাগালাগির নেশা নেই, না আছে জোলো দেশপ্রেমের অহেতুকী বুলি, বা দেশ বিদেশের অনুকরণে স্বগতোক্তি। শুভ্র শুচি সংস্কারমুক্ত সবল বলিষ্ঠ কথা, যা ছিল, যা হয়েছে, যা হওয়া উচিত তারই নব নির্দ্দেশ, ইতিহাসের ধারা বেয়ে, জীবনকে স্বীকার করে, রসকে সৃষ্টি করে, সত্যকে সামনে রেখে।

যেদিন থেকে রঞ্জনা এই বই পড়েছে, সেই দিন থেকে তার মনের মধ্যে সব কিছু যেন গুলিয়ে গেছে। উল্টে গেছে অনেকদিনের ধ্যান ধারণা—নতুনের নিরীখে সে দেখছে।

অবিনাশবাবু জিজ্ঞাসা করেন—কি হলো মা। কিছু বলতে পারে না রঞ্জনা, কোথায় যেন বাধে, নিজেকে অপরাধী বলে মনে হয়।

রত্না এগিয়ে এসে হেসে বলে—জ্যাঠামশাই, পড়েছেন বইটা।

সবাইকে অবাক্ করে তিনি বলেন—হাঁ মা পড়েছি

ছুই সখী তাকিয়ে থাকে—হলো কি অবিনাশবাবুর, রত্না বলে—যেন আপনারই জীবন লেখা, আচ্ছা ঠুকেছে আপনাদের, দেখেছেন।

—তা আর দেখিনি, ওরা যে আমাদের বড্ড চেনা, সত্যি কথা সহ্য করবার ক্ষমতাই ত মনুষ্যত্ব—মানুষ যা ভাবে আর মানুষ যা করে দুয়ের যদি সামঞ্জস্য থাকতো—মনের অন্দর আর বাহির যদি এক হতো, তাহলে পাপপুণ্যের, সুন্দর অসুন্দরের বিচারও হতো অন্য রকম। আমাদের একটা মানুষের ভেতর কতগুলো জীব যে বসে টানাটানি করে তা যদি জানতিস্ মা।

কি বলছেন্ জ্যাঠামশাই—

মা, আমার মতন কোটীপতিরও একদিন কি ইচ্ছে হয় না যে, ঐ পথের পাশে যারা মূক বধির খঞ্জ ক্ষুধিত তাদের কাছে জীবনের নিরীখ বদলে নেওয়া শিখে নেই। কত অল্পে সন্তুষ্ট ওরা। আবার একদিন ওদেরও চোখে স্বপ্ন ভিড় করে আসে, লোভ হয়, হিংসে হয়, মার্বেলে মোড়া বাড়ীগুলোর ভিতরে গিয়ে গদি আঁটা চেয়ারে বসবে, মাথার উপরে বন্ বন্ করে ঘুরবে পাখা, খাবে কোপ্তা কোপ্তা কাবাব। রঞ্জনা বলে—চলো না বাবা শুক্রবার অভীকবাবুর সম্বর্দ্ধনা হবে। ক্লান্ত সুরে অবিনাশবাবু বলেন—যেতে চাও যেয়ো মা, তাতেই কি তাকে সব দেওয়া হলো—কি সে জীবনে হারিয়েছে, কে জানে, আজকের এই মান সম্মান কতটুকু ক্ষতিপূরণ করবে তার—ধরো সমাজব্যবস্থার দোষে সে যদি হারিয়ে থাকে তার স্ত্রী, তার মা, তার ছেলে, তার শান্তি, তার আদর্শ—কোটী কোটী টাকাই যদি সে পায় তাতেই কি সান্ত্বনা দেবে—

কি বলছো বাবা—

তার উত্তেজনা ও আবেগ দেখে রঞ্জনা ও রত্না অবাক্ হয়ে যায়—হলো কি অবিনাশবাবুর—

সহরে কিন্তু অভীককে নিয়ে জল্পনা কল্পনা বেড়েই চলে। একটা কাগজ গণভোট নিলে—ট্রামে একদিন মারামারি হয়ে গেলো, পুরস্কার ঘোষণা করলে একটা পত্রিকা—একদল গোয়েন্দাই লেগে গেল বার করতে কে ইনি—লোকচক্ষুর অন্তরালে কীর্ত্তির বিরাট্ সিংহাসনে বসলেন অশরীরী হয়ে—জনগণের মনোহরণ করে।

রাজসূয়যজ্ঞের সব প্রস্তুত—শুধু সেই যজ্ঞ-সম্ভব লোকটিকে পাওয়া গেল না—অজ্ঞাতবাসের পর্ব্ব কি শেষ হলো না—কাগজে কাগজে আবেদন বেরুলো—হে অনামী কবি, হে অতনুশিল্পী, তুমি প্রকট হও, তোমায় আমরা বরণ করি, গ্রহণ করি।

বিশ্ববিদ্যালয় শেষ পর্য্যন্ত ডি-লিট্ ডিগ্রী দিলে—ইন্‌এবেস্টিয়া সাহিত্য সমাজ দিলে বিরাট সম্বর্দ্ধনা, তাঁর বইকে সামনে রেখে সীতাবিহীন যজ্ঞে স্বর্ণ সীতার মত—ধন্য ধন্য করলে সবাই।

সবাই অবাক্ যে অবিনাশবাবুর মত অতি-বাস্তব হিসাবী লোকও বেহিসাবীদের দলে সেদিন হাজির—রঞ্জনা গদগদ; রত্না বল্লে—কি লেখাই লিখেছে, জেঠামশাই!

অবিনাশবাবু হেসে বলেন—কি আর এমন ভাল লেখা মা, পেটে ভাত না থাকলে ক্ষিধের জ্বালায় অনেকেরই মাথা চড় বড় করে, যা তা আবোল তাবোল বকে, অন্নহীন হাবাতেদের ভালো ত লাগবেই মেয়ে রঞ্জনা সত্যিই ক্ষুণ্ণ হয়—এ তোমার অন্যায় কথা, বাবা।

অবিনাশবাবু বলেন—দেখেছিস্ মা কোন দিন সত্যিকার না খাওয়া না পরা, মাথা গোঁজবার আশ্রয় না থাকা। তোরা বড় লোকের মেয়ে, শ্লোগান নিয়ে পতাকা হাতে দাবী জানিয়ে ঘুরতে পারিস বড় জোর—এই পাঁকের ভিতর নেমে দিনে দিনে দেখেছিস্ কোনদিন?

চুপ করে যান তিনি—তার পেছনে যে ইতিহাস আছে সেটা যেন মুখর হয়ে উঠতে চায়, তাকে তিনি থামিয়ে দেন্ জোর করে। কিন্তু সমস্ত মন দিয়ে অনুভব করতে চান সেই অতীত সত্তাটিকে একান্ত নিরালায় এমন কি মেয়েকেও এড়িয়ে।

সেদিন দুপুরে বাপের প্রাইভেট্ টেবিলটা নিজের হাতে ঝেড়ে মুছে গুছিয়ে রাখছিল রঞ্জনা। ড্রয়ারগুলোর ভিতরে কোনদিনই হাত দিত না। হঠাৎ কি ভেবে সেদিন সেগুলোও পরিষ্কার করতে আরম্ভ করলে। একটা ড্রয়ার চাবি দেওয়া—বাপের কোন জিনিষই তার অস্পৃশ্য নয়, অজ্ঞাত নয়, ভাবলে নিজের রিংএর একটা চাবি দিয়ে দেখা যাক্ খোলা যায় কিনা—একটা লেগে গেল, খুলে গেল ড্রয়ারটা।

তার মায়ের একটা ফটো জলজল করছে, বহুদিনের রক্ত চন্দনের ছাপে তখনো লেগে কয়েকটি শুকনো ফুলের পাপড়ি।

নমস্কার করলে রঞ্জনা—মা, মাগো⋯

দৃষ্টি তুলতেই বেরিয়ে পড়লো কতকগুলি বাংলা লেখা,—পরিষ্কার গোটা অক্ষরে একটা বড় পাণ্ডুলিপি। তুলে পড়তেই চমকে ওঠে সে—কে যেন তার পিঠে শপাং করে বেত মারলে—এ কী, এ যে অভীকের বইয়ের পাণ্ডুলিপি। আর তার বাবার নিজের হাতে লেখা। অসহ্য আবেগে চোখ বেয়ে দরদর করে জল পড়ে তার।

সখী রত্না কখন এসে ঢুকেছে—

দেখি, দেখি, বলে টেনে নেয় কাগজগুলো। তারপর বেরিয়ে যায় হন্ হন্ করে।

সেদিন অপরাহ্নে সহরের রাস্তাঘাটে ট্রামে বাসে পার্কে রেস্তোরায় কি বিপুল উত্তেজনা—কোটীপতি কুখ্যাত অবিনাশবাবুই পথের পাশের লেখক, তিনিই অভীক।

মার, ব্যাটাকে মার, লোকের রক্ত শুষে পয়সা করে এখন লুকিয়ে সাহিত্যচর্চ্চা।

—সাক্ষাৎ জোচ্চোর—

—ভণ্ড—

শিক্ষা দাও যে ওকে আমরা স্বীকার করি না, যতবড় লেখকই হোক্ না কেন।

—পড়ব না ওর বই।

—দেশদ্রোহী, সমাজদ্রোহী—

—প্রোফিটিয়ার, ব্ল্যাকমারকেটিয়ার—

—পুড়িয়ে ফেল ওর বই সব।

দেখতে দেখতে কি হয়ে গেল, ছড়িয়ে পড়লো মারণবিদারণ মন্ত্র বিস্ফোরণের মত দিকে দিকে। গলি থেকে, বড় রাস্তা থেকে, মাঠ থেকে, স্কুল থেকে, সিনেমা থেকে, মেস থেকে, সহরের প্রত্যেক কোণ থেকে বেরিয়ে এলো ছেলেমেয়ের দল অভীকের বই হাতে হাজারে হাজারে কাতারে কাতারে।

নিপাত যাক্

ডাউন্ উইথ্—

বিরাট জনতা বিপুল উৎসাহ নিয়ে হৈ হৈ করে এগিয়ে চললো—যে উৎসাহ নিয়ে তারা একদিন তার বইকে অভিনন্দন জানাতে গিয়েছিলো। দিন শেষের চিতাগ্নিতে তখন আকাশ রাঙা—সূর্য্যদেব নেমে যাচ্ছেন অস্তদিগন্তে।

ক্রুদ্ধ জনতাকে দেখে বারান্দায় চিত্রার্পিতের মত দাঁড়িয়ে রইলেন অবিনাশবাবু নির্ব্বাক্ নির্ব্বিকার। বাড়ীর দরোয়ানরা গেট্ বন্ধ করে দিলে, চাবি দিলে কোলাপ্‌সিবলে, ম্যানেজারবাবু পুলিশে টেলিফোন করলেন।

উত্তেজিত জনসংঘ এসে দাঁড়ালো তাঁর বাড়ীর সামনে সুদৃশ্য লনে—ছুড়ে ছুড়ে ফেলতে লাগলো বইগুলো—মরা হাড়ের পাহাড়ের মত স্তূপীকৃত হয়ে উঠলো সেগুলো। দেখতে দেখতে তাতে অগ্নিসংযোগ হল—বহ্ন্যুৎসবের লেলিহান্ শিখা অবিনাশবাবুকেও ছাড়িয়ে আকাশের দিকে হাত বাড়ালো।

ভণ্ড,

জোচ্চোর,

খাড়া দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি—দেখতে লাগলেন জনতার পৈশাচিক উল্লাস।

রঞ্জনা দৌড়ে আসে।

হঠাৎ যেন ধ্যান ভাঙে অবিনাশবাবুর, এগিয়ে যান তিনি—ঝুঁকে বলেন—

—ওরে, অন্ততঃ একখানা রাখ, আমার বুকে ছুড়ে মারবার জন্যে—

তারপর থর থর করে কেঁপে অজ্ঞান হয়ে লুটিয়ে পড়লেন সেইখানে।

রঞ্জনা চেঁচিয়ে ওঠে—বাবা, বাবা—

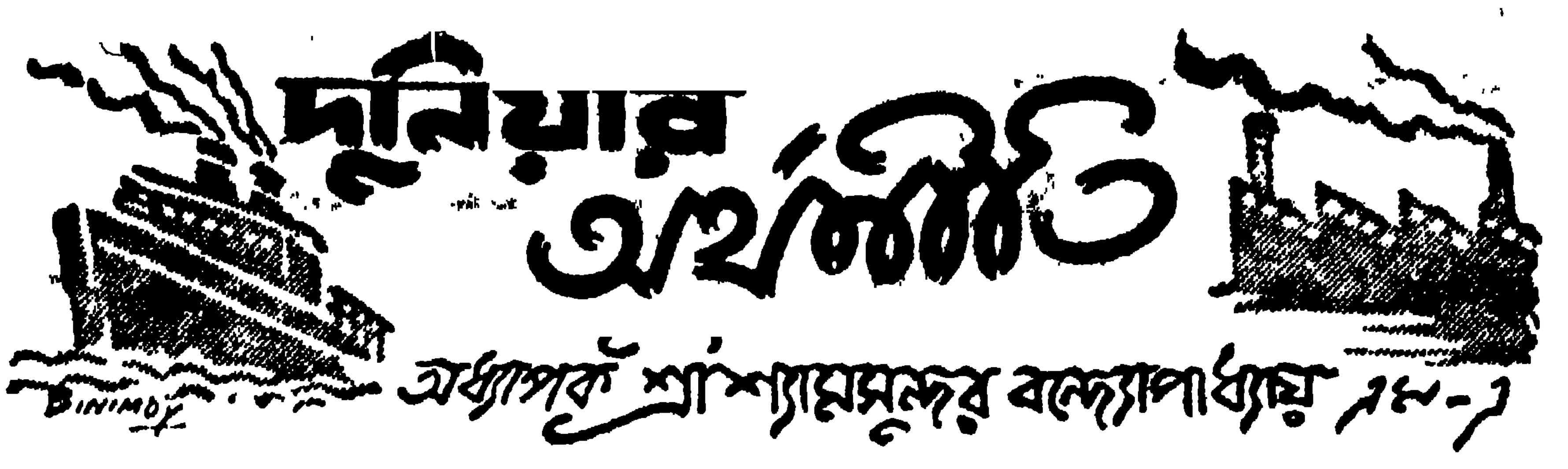

ভারতে অসামরিক বিমান চলাচল

সকলেই জানেন, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে বিমান চালানো শেখা এবং বিমানে চড়া দুইই বিলাসের ব্যাপার ছিল। অবস্থা খুব ভাল না হইলে তখনকার দিনে বিমান ভ্রমণ ঘটিয়া উঠিত না। যুদ্ধের নানা ওলট পালটের সঙ্গে এদিক হইতেও পরিবর্তন হইয়াছে। যুদ্ধের সময় ভারতসরকার আপন গরজে বহু যুবককে বিমানচালনা এবং বিমান ইন্‌জিনিয়ারিং সংক্রান্ত শিক্ষা দিয়াছেন এবং এদেশে বিমানও সংগৃহীত হইয়াছে অনেকগুলি। যুদ্ধোত্তরকালে উদ্বৃত্ত বিমান, বিমান-ক্ষেত্র, বিমানচালক এবং বিমান সংক্রান্ত কর্ম্মবৃন্দ লইয়া ভারতে অসামরিক বিমান চলাচল ব্যবসায় প্রভূত সুযোগ সম্ভাবনার সৃষ্টি হইয়াছে। এখন যুদ্ধের আগের ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল এয়ারওয়েজ, টাটা এয়ার লাইন প্রভৃতি ভারতীয় প্রতিষ্ঠানগুলি পূর্ণোদ্যমে কাজ তো করিতেছেই, তাছাড়া ডালমিয়া জৈন এয়ারওয়েজ, মিস্ত্রি এয়ার লাইন, এয়ারওয়েজ (ইণ্ডিয়া), ভারত এয়ারওয়েজ, অম্বিকা এয়ার লাইনস, জুপিটার এয়ারওয়েজ, ডেকান এয়ারওয়েজ, হিন্দুস্থান এয়ারওয়েজ, দমদম এয়ার সারভিস কোম্পানী প্রভৃতি অনেকগুলি নূতন জাতীয় প্রতিষ্ঠান এদেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অবশ্য এখনও আন্তর্জাতিক বিমানপথে ভারতীয় বিমান প্রতিষ্ঠানগুলি অপেক্ষা প্যান আমেরিকান, ট্রান্স ওয়ার্লড এয়ার লাইন (মার্কিন কোম্পানী), বি ও এ সি, ইম্পিরিয়াল এয়ারওয়েজ (ব্রিটিশ কোম্পানী), ডাচ কোম্পানী কে এল এম, ফরাসী কোম্পানী এয়ার ফ্রান্স ইত্যাদির কাজ কারবার বেশী, তবে ভারতের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর জাতীয় সরকার এ বিষয়ে যেরূপ সহানুভূতি দেখাইতেছেন এবং এদেশের অর্থবান ব্যক্তিরা দীর্ঘদিন অপেক্ষা করিবার ধৈর্য্য লইয়া যেভাবে বিমান ব্যবসায়ে টাকা লগ্নী করিতে আগ্রহ দেখাইতেছেন, তাহাতে আশা করা যায় আন্তর্জাতিক বিমান পথেও অন্ততঃ ভারতীয় ভ্রমণকারীদের হিসাবে ভারতীয় বিমান প্রতিষ্ঠানগুলি আর অধিক দিন পিছাইয়া থাকিবে না। বর্ত্তমানে* ভারতে বিমান কোম্পানীর সংখ্যা ২৩ এবং এই কোম্পানীগুলির অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ৪২ কোটি ২০ লক্ষ টাকা। ওরিয়েণ্ট এয়ারওয়েজ নামক বিমান প্রতিষ্ঠানটি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সহিত পাকিস্তানের এবং এয়ার-সিলোন নামক বিমান ঘাঁটি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সহিত সিংহলের বিমান পথের সংযোগ রক্ষা করিতেছে।

ভারতে অসামরিক বিমান চলাচল সত্যই দ্রুতগতিতে উন্নতিলাভ করিতেছে। গত এক বৎসরের মধ্যে এদিক হইতে যে উন্নতি হইয়াছে তাহা বাস্তবিক বিস্ময়কর। গত ৩০শে জুন ভারতে রেজেষ্ট্রিকৃত যাত্রী ও মালবাহী বিমানের সংখ্যা ছিল ৬১৪, ইহা মাত্র আর ৬ মাস পূর্ব্বে ছিল ৫৫১। এখন ভারতে 'এ' ও 'বি' শ্রেণী জড়াইয়া মোট বিমান-চালকের সংখ্যা ৬২২ এবং গ্রাউণ্ড ইনজিনিয়ারের সংখ্যা ৩৪৩। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুলাই হইতে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে জুন এই এক বৎসরে ভারতে অসামরিক বিমানপোতগুলি ৪৮,৬২৯ ঘণ্টায় ৭৫,০৯,৬৬০ মাইল উড়িয়াছিল এবং যাত্রী বহন করিয়াছিল ১৮৮,৭৯৬জন। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুলাই হইতে ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে জুন এই এক বৎসরে সে তুলনায় অসামরিক বিমানপোতগুলি ৬৬,৫৫৪ ঘণ্টায় ১,০৫,৯৪,২৪২ মাইল উড়িয়াছে এবং যাত্রী বহন করিয়াছে ৩,১৪,৫৪৬জন। ভারতে বিমান ব্যবসায়ের প্রভূত সম্ভাবনা লক্ষ্য করিয়া ভারত সরকার এদেশের এরোড্রোম বা বিমানপোতাশ্রয়-গুলির উন্নতির এবং উন্নত ধরণের বিমান চালনা শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। বাঙ্গালোরের হিন্দুস্থান এয়ারক্রাফ্‌ট ফ্যাক্টরি প্রসারিত হইতেছে। আশা করা যায় শীঘ্রই এদেশে পূর্ণাঙ্গ বিমান নির্ম্মাণের চেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হইবে। ভারতে এখন মোট ১০টি ফ্লাইং ক্লাবে বিমানচালনা শিক্ষা দেওয়া হয়, আরও তিনটি ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। বিমানচালনা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ তৈয়ারীর জন্য এলাহাবাদে একটি বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বিমান ঘাঁটিসমূহের উন্নতিসাধনের জন্যও ভারত সরকার লক্ষণীয় আগ্রহ দেখাইতেছেন। এই সূত্রে যে দশ-বার্ষিকী পরিকল্পনা রচিত হইয়াছে তাহাতে মোট ৫৪ কোটি টাকা খরচ হইবে। এই টাকায় ভারত সরকার বর্ত্তমান ঘাঁটিগুলির সংস্কার এবং ২১টি নূতন ঘাঁটি নির্ম্মাণের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ৫৪ কোটি টাকার মধ্যে কিঞ্চিদধিক ৫ কোটি টাকা ব্যয়িত হইবে বোম্বাইয়ের সাণ্টা ক্রুজ, কলিকাতার দমদম এবং দিল্লীর পালাম—এই তিনটি আন্তর্জ্জাতিক বিমান ঘাঁটির উন্নয়ন কার্য্যে। ভারত বিভাগের ফলে করাচীর সমৃদ্ধ বিমান ঘাঁটিটি হাতছাড়া হইয়া যাওয়ায় আন্তর্জ্জাতিক পথে বোম্বাই ঘাঁটির গুরুত্ব অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই গুরুত্ব অনুযায়ী ভারত সরকার আগামী পাঁচ বৎসরের মধ্যে বোম্বাই ঘাঁটিটিকে পৃথিবীর অন্যতম প্রধান বিমান ঘাঁটিতে পরিণত করিবার সংকল্প করিয়াছেন। এছাড়া আমেদাবাদ, এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ (অমৌসী), মাদ্রাজ (সেণ্ট টমাস), নাগপুর, ভিজাগাপটম ও পাটনার বিমান ঘাঁটিগুলিকে প্রথম শ্রেণীর ঘাঁটিতে পরিণত করিবার চেষ্টা চলিতেছে। আসানসোল, বারাণসী, বেজোয়াদা, বোম্বাইয়ের জুহু, কোচিন, কোয়েম্বাটুর, কটক,

---

* ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুলাইয়ের হিসাব। এই হিসাবে ভারতীয় সরকারের অধীনস্থ সামরিক বিভাগের বিমানবহরের হিসাব নাই।

শিলার-অন, পুনা, কানপুর, গোরেরাজী, খরসাওড়ে ও জিচিরা-র বিমানঘাঁটি যদিও খুব বড় করিবার সিদ্ধান্ত হয় নাই, তথাপি চলাচল সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় সর্বপ্রকার ব্যবস্থা এই ঘাঁটিগুলিতে মজুত রাখা হইতেছে। উপরিউক্ত পরিকল্পনা অনুসারে ভারতীয় রাষ্ট্রে নিম্নলিখিত নূতন বিমান ঘাঁটিগুলি নির্মিত হইবে :—

[illegible], বহরমপুর, আলিগড়, কালিকট, দেরাদুন, বাঙ্গালোর, [illegible]ার, দেরাদুন, হুবলী, নেলোর, উটকামণ্ড, রত্নগিরি, সালেম, [illegible] হুয়াট। *

প্রতিষ্ঠানগত চেষ্টায় গৃহ-সমস্যার সমাধান

বর্তমানে কলিকাতা সহর ও সহরতলীতে গৃহ-সমস্যা যেরূপ তীব্র হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে অবিলম্বে ইহার সন্তোষজনক একটা সমাধান না হইলে শুধু জনসাধারণই বিপন্ন হইবে না, কর্তৃপক্ষের অক্ষমতার প্রতিবাদে জনসাধারণের বিক্ষোভও অবাঞ্ছিতভাবে প্রকাশ হইয়া উঠিবে। যুদ্ধ অনেকদিন হইল শেষ হইয়াছে, গৃহ নির্মাণের জিনিষপত্র সামরিক প্রয়োজনে লাগিবার প্রশ্ন এখন আর উঠে না। কাজেই লোকে এখন অবস্থার উন্নতি আশা করে। জাতীয় সরকারের আমলে দেশবাসীর [illegible]বৃত্তি বা বিবেচনাবোধও যেমন থাকা দরকার, তাহাদের ন্যায্য দাবীর উগ্রতাও তেমনি স্বাভাবিক।

জমি অনেক পড়িয়া আছে, মুদ্রাস্ফীতির যুগে লোকের হাতে টাকাও জমিয়াছে ঢের, তবু কলিকাতায় ও সহরতলীতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় বাড়ী-ঘর হইতেছে না। হইতেছে না বলিয়াই পাকিস্তান হইতে আগত লক্ষ লক্ষ হতভাগ্যের সহিত এখানকার ক্রমবর্দ্ধমান জনসংখ্যা পাগলের মত একটু মাথা গুঁজিবার ঠাঁই খুঁজিয়া মরিতেছে। ১৯৪৫—১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের তুলনায় ভারতে ১৯৪৬—১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে সিমেন্ট লৌহ ইত্যাদি পণ্য উৎপাদন কিছুটা কমিয়াছিল, এখন ক্রমে অবস্থা আবার অনেকটা স্বাভাবিক হইয়া আসিতেছে। তবু দুঃখের বিষয়, [illegible]রে উৎপাদনক্ষেত্রে কিছুটা শৃঙ্খলা স্থাপিত হওয়া সত্ত্বেও এখনও কিন্তু পণ্যের বাজারে এতটুকু নরমভাব দেখা যাইতেছে না। যুদ্ধের আগে বাজারে জিনিষ পাওয়া যাইত, উৎপাদনের হার তখন এখনকার তুলনায় অনেক কম ছিল, আগের তুলনায় এখন আমদানী কমিয়া গেলেও বর্তমান পণ্য বাজারের অবস্থা এতটা শোচনীয় হওয়া সত্যই অস্বাভাবিক। দেশে নিয়ন্ত্রণপ্রথা চলিতেছে, চাহিদা যোগানের তুলনায় বেশী হইলে নিয়ন্ত্রণ প্রথার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য; কিন্তু এদেশে বণ্টন ব্যবস্থা এত নিম্নশ্রেণীর যে নিয়ন্ত্রণ করিয়াও সমহারে গৃহ-নির্মাণের জিনিষপত্রের যোগান চলিতেছে না। সকলের মুখেই পণ্যাভাবের কথা, বাস্তবিক জমি লইয়া বসিয়া আছে অনেকেই, অথচ দেশের উৎপন্ন সিমেন্ট, লৌহ ইত্যাদির পরিমাণও কম নয়। তদ্বির ইত্যাদির দ্বারা যে ভাবেই হউক এক শ্রেণীর লোক সরকারী কর্তৃপক্ষকে ফাঁকি দিয়া বাজারের স্বল্প পরিমাণ পণ্যের সর্ব্বাধিক সুবিধা লইতেছেন। ইহাদিগকে গৃহ নির্মাণের পণ্য যোগাইবার ফলে সরকার দেশের সত্যকার গৃহ নির্মাণার্থীদের চাহিদা ভালভাবে মিটাইতে পারিতেছেন না।

জনসাধারণের মধ্যে প্রয়োজন অনুযায়ী গৃহনির্মাণ-পণ্য বণ্টন করা অনতিবিলম্বে সুষ্ঠুভাবে যদি সম্ভব না হয়, তাহা হইলে ব্যক্তিগত চাহিদা অনুযায়ী পণ্য সরবরাহ ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করিয়া সরকারের অন্য উপায়ে গৃহসমস্যার সমাধানে যত্নবান হওয়া দরকার। আমরা সমষ্টিগত চেষ্টায় পাইকারী হারে বাড়ী নির্মাণের কথা বলিতেছি। কলিকাতা কর্পোরেশন বা সহরতলীর মিউনিসিপালিটিগুলি সরকারী সাহায্যে এই দায়িত্ব ভার গ্রহণ করিতে পারে। প্রয়োজন হইলে এজন্য ঋণপত্র বা ডিবেঞ্চার বিক্রয় করিয়াও অর্থসংগ্রহ করা চলে। আইনের সাহায্যে বৃহদাকার পতিত জমি সংগ্রহ করিয়া সেই জমিতে বড় বড় ফ্ল্যাট বাড়ী তৈয়ারী করাইয়া লইলে এবং সেই সব বাড়ী ভাড়া দিলে এ বাজারে লোকসান হইবার কোনই ভয় নাই। কর্পোরেশন বা মিউনিসিপালিটির এই প্রচেষ্টায় সরকার নিয়ন্ত্রিত পণ্যাদি যোগাইয়া সাহায্য করিতে পারেন। মাঝে শুনা গিয়াছিল কলিকাতায় পূর্ব্বাঞ্চলে কর্পোরেশন ও সরকারের চেষ্টায় এইভাবে বহুসংখ্যক বাড়ী তৈয়ারীর পরিকল্পনা হইয়াছে। বলা বাহুল্য, এ সংবাদে দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত দেশবাসী আশান্বিত হইয়া উঠিয়াছিল, কারণ সরকারী বাড়ী ভাড়া করিলে চোরাবাজারী ভাড়ায় বা সেলামীর জুলুম নিশ্চয়ই ভোগ করিতে হইবে না। দুঃখের বিষয়, এ সম্বন্ধে এখন আর কিছুই বলা যাইতেছে না, অথচ এই ধরণের কোন ব্যবস্থা হইবার প্রয়োজন এখনই সবচেয়ে বেশী। সরকারী চেষ্টায় পাইকারী হারে বাড়ী নির্মিত হইলে তাহাতে খরচ অবশ্যই কম হইবে এবং খরচ কম হওয়ার জন্য ভাড়াও কম হওয়া স্বাভাবিক। কর্পোরেশন ও মিউনিসিপালিটিগুলির সহিত সমবেতভাবে সরকার এইরূপ গৃহসমস্যা সমাধানে প্রত্যক্ষ আগ্রহ দেখাইলে জনসাধারণের দুর্গতি দূরীকরণে তাঁহাদের আন্তরিকতা উপলব্ধি করিয়া অভাবী দেশবাসীর বিবেচনাবোধও নিঃসন্দেহে বাড়িয়া যাইবে।

সরকার এবং মিউনিসিপ্যালিটিগুলির চেষ্টায় তো হইতেই পারে, তা ছাড়া বড় বড় যৌথ কোম্পানী উপযুক্ত সাহায্য পাইলেও এদিক হইতে লক্ষণীয় কাজ আশা করা যায়। অবশ্য যুদ্ধোত্তরকালে, বিশেষ করিয়া বঙ্গ-বিভাগের যুগে ব্যাঙের ছাতার মত যে সব ল্যাণ্ড ডেভেলপমেন্ট ট্রাষ্ট শ্রেণীর চোরাকারবার গজাইয়া উঠিয়াছে তাহাদের কথা বলিতেছি না, যেসব প্রতিষ্ঠান সুস্থ এবং [illegible] তাহাদের গৃহ-নির্মাণের পণ্যাদি নিয়ন্ত্রিত মূল্যে যোগান হইলে তাহাদের চেষ্টায়

---

* এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে ভারত বিভাগের পর ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সহিত আসামের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া যাওয়ায় এই যোগাযোগ রক্ষা [illegible] উদ্দেশ্যে আসামের গৌহাটি, তেজপুর, জোড়হাট ও মোহনবাড়ী এই চারিটি স্থানে চারিটি নূতন বিমান ঘাঁটি নির্মিত হইয়াছে। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই ডিসেম্বর ভারতীয় ইউনিয়ন হইতে ডাক ও যাত্রীবাহী বিমান আসামের গৌহাটি বিমান ঘাঁটিতে প্রথম অবতরণ করে।

সমাধান হওয়া খুবই সম্ভব। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে বীমা প্রতিষ্ঠানগুলির কথা আমাদের মনে উদিত হইতেছে। বীমা কোম্পানীগুলির তহবিলে যথেষ্ট টাকা আছে এবং এই টাকার অতি সামান্য অংশই দায় মিটাবার জন্য অবিলম্বে প্রয়োজন। দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনায় ভালভাবে লগ্নী করিতে পারিলে লাভ তাহাদের কম হইবে না। সরকার যদি পরিকল্পনাটিকে সকল দিক হইতে সাহায্য এবং নিয়ন্ত্রণ করেন, অর্থাৎ তাঁহারা কোম্পানীগুলিকে জমি সংগ্রহ ও নিয়ন্ত্রিত মূল্যে গৃহনির্ম্মাণের জিনিষপত্র যোগাইবার ভার লন এবং কোম্পানীর নিম্নতম মুনাফার প্রতিশ্রুতি দিয়া কাজকর্ম্মের প্রতি কঠোর লক্ষ্য রাখেন তাহা হইলে পশ্চিমবঙ্গের বীমা কোম্পানীগুলির এই পরিকল্পনায় হাত দিতে সাহস না পাইবার কারণ নাই। বর্ত্তমান বাজার এখনও বেশ কিছুদিন চলিবে, কলিকাতা ও সহরতলীর উপর জনতার চাপ শীঘ্র কমিবে না, কাজেই সরকারের পক্ষে বীমা কোম্পানীগুলিকে মুনাফার নিম্নতম প্রতিশ্রুতি দেওয়া এমন কিছু দায়িত্বের ব্যাপার নয়। বীমা কোম্পানীগুলি তাঁহাদের প্রিমিয়ামের দরুণ আয়ের অর্দ্ধাংশের বেশী সরকারের কাছে গচ্ছিত রাখে। এই পরিকল্পনায় উৎসাহ দিতে ভারত সরকার পশ্চিমবঙ্গীয় বীমা কোম্পানীগুলিকে এই প্রদেশের কাজের টাকার একাংশ এইখাতে লগ্নী করিবার অনুমতি দিলে কোম্পানীগুলি খুবই উৎসাহ পাইবে। এইরূপ পরিকল্পনা যে বীমা কোম্পানীর পক্ষে লাভজনক, তাহা ইতিমধ্যেই কোন কোন কোম্পানী উপলব্ধি করিতেছেন। আর্থিক জগতের এক সংবাদে প্রকাশ, মাদ্রাজ সহরের বাস-গৃহের অভাব দূরীকরণার্থে বোম্বাইয়ের এক বিশিষ্ট বীমা কোম্পানী মাদ্রাজে ২ কোটী টাকায় ২ হাজার বাসভবন নির্ম্মাণের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। প্রস্তাবটি এখন মাদ্রাজ সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

আমাদের বাড়ী

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

আমাদের বাড়ী অজয় হইতে অনেক দূরে ছিল—কিন্তু অজয় বৎসর বৎসর সরিয়া আসে। ছয় বিঘা জমি লইয়া বাড়ী, উৎকৃষ্ট আম জামের গাছ ও অসংখ্য ফুলের গাছে সুশোভিত। অগ্নিকোণে একটী প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ ছিল, তাহা বহুদূর হইতে দৃষ্টিগোচর হইত। সাত আটটী সু-উচ্চ তালগাছ ছিল, তাহাতে কাকেরা বাসা করিত, বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে সেই সকল বাসায় কোকিলের ছানা পাওয়া যাইত। শ্যামলতার বনে দুটি খরগোস থাকিত। কত পাখী যে বাসা বাঁধিয়া থাকিত, গণিয়া শেষ হয় না—কত বনফুল ফুটিত, তাহাদের গন্ধে বাড়ী সর্ব্বদা সুরভিত। তাই লিখিয়াছিলাম—

বাড়ী আমার ভাঙন-ধরা অজয়-নদের বাঁকে,
জল যেখানে সোহাগ ভরে স্থলকে ঘিরে রাখে।
সামনে ধূসর বেলা জলচরের মেলা,
সুদূর গ্রামের ঘর দেখা যায় তরুলতার ফাঁকে।
মাধবী আর মালতীতে ঘেরা উঠান মোর,
আমের গাছে কোকিল ডাকে দিবস নিশি ভোর
দোয়েল পাপিয়ার গীতে কানন ছায়,
চক্র রচে মৌমাছিরা নিত্য ঝাঁকে ঝাঁকে।

দরিদ্রের বাড়ী হইলেও বাড়ীটী বড় শোভার ও শান্তির বাড়ী ছিল।

যখন বাড়ী অজয়ের ভাঙনে বৎসর বৎসর থাকে, তবুও তাহার শোভা অটুট ছিল—

ফটকের দুই ধারে শিউলির গাছ,
তলে ফুল বিছাইয়া ডাকে যেন আজ।
দক্ষিণে সারি সারি হাস্নুহানা
ছেড়ে যেতে বারবার করিছে মানা।
মাথা নাড়ে বেহুবন ওই বুড়া বট,
বহুদিন কাটায়েছি তাদের নিকট।
ফুটেছে গোলাপ হয়ে শাখায় শাখায়,
সুদীন নয়নে মোর পানে যে তাকায়।
ভবন ছাড়েনি আজও কপোতগুলি,
বুলবুলি ফিরে ঘুরে আসে কেবলি।
এখনো আসিছে ঝাঁক কাক শালিকের
সঙ্গ ছাড়েনি তারা গৃহ-মালিকের।
অর্দ্ধেক বাড়ী গেছে অজয়ে পড়ি,
তবুও তাহার কিবা ভরা মাধুরী।

পূর্ব্ব ও উত্তর মেঘের মাঝায়,
এ অজয় যক্ষের চক্ষের ধার।
শোভে বাড়ী আহা একি ভাঙনের ছাঁদ
মহাকাল তালে যেন তৃতীয়ার চাঁদ।

বাড়ীতে যখন বাস করা বিপদজনক—তখনও আমি উহা ত্যাগ করিতে পারি নাই। স্বর্গীয় বন্ধু মিঃ গুরুসদয় দত্ত ওই ভাঙা বাড়ী দেখিয়াই বাড়ীটির অজস্র প্রশংসা করিয়াছিলেন। সেই বাড়ীতেই সমারোহের সহিত বীরভূমের সাহিত্যিক বন্ধু রায় বাহাদুর নির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবরতন মিত্র, বর্দ্ধমানের তদানীন্তন জজ মিঃ জ্ঞানাঙ্কুর দে, বর্দ্ধমানের কবি দেবপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় এবং বীরভূম পল্লী-সংস্কার সমিতির সভ্যগণকে লইয়া আমরা একসঙ্গে আনন্দে বনভোজন করি। সেদিন নীলকণ্ঠের এই কয়টী লাইন আমার বারবার মনে পড়িতেছিল—

কেমন করে করি এমন ঘরে বাস ?
এযে ভব নদীর কুল, ভাবনা অকুল
কুল কুল শব্দ উঠে বার মাস।

বাড়ীতে আমার শৈশবে মাত্র ২।৩ খানি ঘর ছিল, তার মধ্যে যে ঘরে আমরা থাকিতাম তাকে 'বড় ঘর' বলা হইত। সেখানি আমাদের বড় প্রিয় এবং উহা অজয়ে ভাঙিয়া গেলে বড় দুঃখ হইয়াছিল—তাই লিখিয়াছিলাম—

জীর্ণ প্রাচীন তুচ্ছ অতি, খড়ে ছাওয়া মাটির ঘর,
একি দরদ উহার প্রতি ? কি মমতা উহার পর ?
'বসুধারা'র সলিল ধারা, মোহামোছা আলিম্পন,
করছে আহা আপনহারা ? একি অবুঝ মানব মন!
সুখের দুখের শিলালিপি—আনন্দের ও অজস্র,
মোর কাছে ওর মূল্য কত বুঝবে বল কজন তা ?
প্রতি রাঙা মাটির লেপে—কান্নাহাসি জড়িয়েছে
উৎসবেরি উল্লাস রস—ওই মাটিতে গড়িয়েছে।
ভাঙন-ধরা মাটির পরে দেখছ না মোর কি শ্রদ্ধা ?
ওযে আমার এক সাথেতে পঞ্চবটী অযোধ্যা।

ওই বাড়ীরই একটী গৃহে আমি ভূমিষ্ট হই। জননী ষোড়শ বর্ষে আমাকে গর্ভে ধারণ করেন—সেইজন্য দিদিমা বহু অর্থ ব্যয় করিয়া ষোড়শী যজ্ঞ করান—ঐরূপ সন্তান সাধারণতঃ নাকি বাঁচেনা এবং মা বাপেরও জীবন হানি হইতে পারে। যাহা হউক কৈচরনিবাসী প্রসিদ্ধ যাজ্ঞিক বিপিন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কৃতিত্বে কাহারো কোনো অনিষ্ট হইল না—আমিও বাঁচিয়া গেলাম, নতুবা এ কাহিনী শুনাইবার আর অবসর হইতনা।

আমার জন্মের কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমার মাতামহদেব হঠাৎ মারা যান—তিনি বর্দ্ধমানের জেলা জজের মহাফেজ ছিলেন—তাঁহার মৃত্যুতে সকলেই মর্ম্মাহত হন। আমাদের বাড়ীতে সে শোকের ছায়া বহুদিন ধরিয়া ছিল। মাতামহী দেবী গ্রাম ত্যাগ করিয়া যাইবেন সকলে আশঙ্কা করিয়াছিলেন। আমিই প্রকারান্তরে তাঁহাকে নূতন করিয়া সংসারী করিলাম, ইহাই গ্রামবাসীরা বলাবলি করিতেন। আমার জন্মে গ্রামবাসী ও আত্মীয় কুটুম্বগণ এতই উল্লসিত হইয়াছিলেন যে আমাদের বাড়ীর নাপিত বহুবিধ তৈজস পত্র, ঘড়া ও অন্যান্য দ্রব্য উপঢৌকন পাইয়াছিল—তাহারা তাহা আনন্দের সহিত দেখাইত।

আমার মাতামহীর মত মহীয়সী মহিলা বিরল—তিনি যেমন তেজস্বিনী তেমনি দয়াবতী ছিলেন—তাঁহার প্রচুর অর্থ ও স্বর্ণের কথা শুনিয়া আসিতেছি—সে খ্যাতি তাঁর চিরদিন ছিল। লোচন দাস তাঁর মাতামহী সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন—"ধন্য মাতামহী সে অভয়া দেবী নামে"। আমি যদি তাঁহার মত বড় কবি হইতাম—আমার মাতামহী সম্বন্ধেও অনুরূপ উক্তি করিতে পারিতাম।

বাড়ীতে একমাত্র পুত্র সন্তান বলিয়া দিদিমা ও মাসি-মাতাদের অত্যধিক আদরে আমি পল্লীগ্রামে যাহাকে "সোহাগে ছেলে" বলে তাহাই হইয়াছিলাম। ৭।৮ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত মাটিতে পা দিই নাই, তাঁহাদের কোলে কোলে ফিরিতাম—যাহা চাইতাম—তাহাই তাঁহারা দিতেন। কত ভাল ভাল জিনিষ ভাঙিয়াছি তাহার ইয়ত্তা নাই। নানাবিধ পুতুল ও খেলনায় একটী আলমারী ভর্ত্তি ছিল, আমার দৈনিক আবদার ও উৎপাতে উহা প্রায় শূন্য হইয়াছিল। আমার কোনো অন্যায় আবদার মা সহ্য করিতেন না এবং সুবিধা পাইলেই প্রহার করিতেন—কিন্তু সুবিধা পাওয়া কঠিন ছিল—আমি অহোরাত্র দিদিমা ও মাসিমাদের কাছেই থাকিতাম—সেখানে আমার গায়ে হাত দেওয়া সহজ নহে।

ক্রমে ক্রমে আমার আবদার মাত্রা অতিক্রম করে। একবার ত্রিবেণীতে আমার বড় মামার বাড়ী গিয়া ত্রিবেণী

বাজারে দিদিমা আমাকে ৬।৭ টাকার খেলনা কিনিয়া দেন। সহ-স্নানযাত্রীর দল এবং শেষে দোকানদার স্বয়ং দিদিমাকে বলিল—"মা, ছেলে যা চায় তাই দিতে নাই—অকারণে খেলনায় এত টাকা খরচ করবেন না—উহা কোনো কাজেই লাগ্‌বে না।"

নিকট-প্রতিবেশী ভিন্ন অন্য কাহারো বাড়ী আমার যাইবার উপায় ছিল না। আমার স্নেহময়ী সেজ মাসিমা বাড়ীতে ২।৩টী "নাগদানা" গাছ রোপণ করিয়াছিলেন, আমার কপালে উহার পাতার রসের ফোঁটা দিবার জন্য। ওই ফোঁটা কপালে থাকিলে নাকি ডাইনী, ডাকিনী, প্রেতিনীরা কিছুই করিতে পারেনা। প্যারী ডোমের মাত ও নূতনহাটের এক বৈষ্ণবীর ডাইনী অপখ্যাতি ছিল—আমাকে দেখিতে চাহিলে নানা ওজর করিয়া মাসিমারা দেখাইতেন না। পরে কিন্তু ইহার জন্য আমার বড়ই লজ্জা ও দুঃখ হইত, তাঁহারা আমাকে কত স্নেহ করিতেন, কত আশীর্ব্বাদ করিতেন।

মাসিমারা কোলে করিয়া আমায় 'সূর্য্যোদয়' দেখাইতেন—"সূয্যি মামা সূয্যি মামা রোদ কর গো" পল্লী বালকদের কাছে শুনিতাম এবং বলিতাম উহাই আমার বাল্যের গায়ত্রী। রাত্রে চাঁদা-মামাকে টিপ দিয়া যাইবার জন্য তাঁরা ডাকিতেন। চন্দ্র সূর্য্যের সঙ্গে আমার খুব অল্প বয়সেই আলাপ পরিচয়।

আমি অপেক্ষাকৃত বেশী বয়সে কথা কহিতে শিখিয়াছিলাম, অনেকে ভয় করিয়াছিলেন আমি 'বোবা' হইব—কিন্তু সেটা আর হইল না।

আমাদের বাড়ীতে সর্ব্বদাই ভগবৎ-কথা হইত। আমি ভক্তির আবহাওয়ায় প্রতিপালিত। আমার দিদিমার সঙ্গিনীরা বড়ই ভক্তিমতী পবিত্রচরিত্রা পুণ্যময়ী ছিলেন। তাঁহাদের মুখে সর্ব্বদাই হরি-কথা—ধর্ম্মালোচনা ছাড়া অন্য আলোচনাই হইত না। মায়ের "রাজেশ্বরী দিদি" সর্ব্বদা মহাভারত, রামায়ণ, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, ভক্তমাল পাঠ করিয়া শুনাইতেন, পূজা অর্চনায় তাঁর অহোরাত্র কাটিত। তাঁহার সঙ্গে মায়ের 'বিমলা পিসি' 'গিরি পিসি' 'মনো-পিসি' সর্ব্বদাই থাকিতেন। বিমলা দেবীর গৃহেই তাঁহাদের পাঠাদি চলিত। সমস্ত গ্রামে তাঁহারা একটা আধ্যাত্মিক পরিবেশ সৃজনা করিয়াছিলেন। সব গৃহই তপোবনের গৌরব লাভ করিত। আমাদের বাড়ীই তাঁহাদের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় ছিল। শিশুকালে 'রাজেশ্বরী দিদি'র মুখে "শ্রীবৎস চিন্তার" উপাখ্যান শুনিয়াছিলাম—উহা আমার শিশু-হৃদয়কে অভিভূত করিয়াছিল—সমস্ত জীবনে উহা প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। নদীতে যখন বড় বান আসিত, জ্যোৎস্না রাত্রিতে সেই দিগন্তব্যাপী বন্যায় বৃদ্ধ মাঝি ও খেয়ার নৌকা দেখিলেই আমার কেবল মায়া নদী ও মায়া তরীর কথা মনে হইত। সুরভি আশ্রম, কাঠুরিয়াসঙ্গ, তালবেতাল, সোনার ইঁট—সবই আমার সত্য মনে হইত। তাঁহাদের কাছে যে সব উপাখ্যান শুনিতাম তাহা সম্যক বুঝিবার বয়স তখন আমার নয়, কিন্তু কতকগুলি কথা মনের মধ্যে যে ছবি ফুটাইয়া তুলিত, যে ভাবের ঝিলিমিলি মনকে অনুরঞ্জিত করিত, তাহার মূল্য ঢের বেশী। বালক হৃদয়ে কত মেঘ-রৌদ্রের, কত হাসি-অশ্রুর খেলা চলিত। ভক্তি জগতের আভাস পাইতাম—কোন্ এক বিরাট মধুর দেশের যেন সংবাদ পাইতাম। বুঝার চেয়ে সে না-বুঝার আনন্দ আরও অধিক, আরও নিবিড়। এখন যাহা কথা, তখন তাহা ছিল সুর—

"রবির আলো যাই ভুলে যাই
কেন্দু উষার বাহারে।"

আমার দিদিমা ও মাসিমারা সর্ব্বদাই আমার বিপদের আশঙ্কা করিতেন—আমার সামান্য অসুখে ব্যাকুল হইতেন—বাড়ীর উপর দিয়া শকুনি বা চিল উড়িয়া গেলে তাঁহারা মধুসূদন নাম জপ করিতেন—সাধু সন্ন্যাসী গণক—যে কেহ আসিয়া—আমার 'ফাঁড়া' আছে এবং তাহার প্রতীকার তাঁহারা করিয়া দিবেন বলিয়া অনেক অর্থ লইয়া যাইতেন। একবার আমার মাসাবধি জ্বর হয়—তাহা স্বস্ত্যয়ন, ঔষধ কিছুতেই ছাড়িল না—এক চতুর গণক আসিয়া দিদিমাকে বলিল—

বাড়ীর সুমুখে ওই তালগাছ বড়ই উচ্চশির
গোপন কুলায় আছে হোথা শকুনির।
একটা শকুনি মাঝে মাঝে এসে কুদৃষ্টি দেয় ঠিক
এই পানে রয় তাকায়ে নির্নিমিখ।
গাছটি কাটিলে ঘুচে যাবে বলা—আপদ যাইবে চুকে,
ভাল হবে খোকা বেড়াইবে হাসি মুখে।

গণক গাছটি কোনো সিদ্ধ গ্রহ-বিপ্রকে দান করিতে বলিল,

দিদিমা বলিলেন—অন্য আর কাহাকে পাইব—তুমিই গাছটি কাটিয়া লইয়া যাও।

গণক বলিল 'আপনার কথা এড়াই সাধ্য নাই
'আলাই বালাই' খুঁটে বেঁধে নিয়ে যাই।

তার পর দিন সারবান গাছটি গণক কাটিয়া লইয়া গেল, যে গাছ বিশটাকা মূল্য দিলে মিলিত না তাহা সে আনন্দে গ্রহণ করিল। আমার জ্বর ছাড়িয়া গেল—সুস্থ হইলাম। গ্রামবাসীরা গণককে দেখিয়া বলিতেন—তোমার নূতন ঘরের 'রুয়া' তৈয়ার করিবার বিশেষ প্রয়োজন ছিল—গাছটীতে তাই তোমার নজর লাগিয়াছিল—

তোমারি ঘরের ভাবনা ভাবিত গাছে বসি মনে হয়—
শকুনিটি তব সুহৃদ সুনিশ্চয়।

গণক নানা ছলে হাস্য লুকাইত। কত রকমে যে দিদিমা আমার মঙ্গলের জন্য বৃথা খরচ করিতেন তাহা বলিতে পারি না; আমি দীর্ঘজীবী, যশস্বী, ধনী হইব, ভাগ্যবান হইব, এই সব উৎকট ভবিষ্যৎবাণী করিয়া যে কোনো ভিখারীই পয়সা আদায় করিত।

হাঁচি, টিকটিকী ও কাকের ডাক কত ভাবে অর্থ প্রকাশ করিত। যেন চারিদিকে গ্রহগণ সর্ব্বদাই আমার অনিষ্ট করিবার ষড়যন্ত্র করিতেছেন, কাড়িয়া লইবার সুযোগ খুঁজিতেছেন, কেবল শ্রীভগবানের নাম গুরু ও দেব-ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ সর্ব্বদা আমাকে রক্ষা করিতেছে। গ্রামের ছোট বড় সকল লোকের নিকট, প্রতি অতিথি সাধু সন্ন্যাসীর নিকট দিদিমা আমার জন্য আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা ও ক্রয় করিতেন। দেবতার স্নানজলে, দেব অঙ্গনের ধূলিতে আমার সারাদেহ অভিষিক্ত হইত।

আমার মাসিমাতাদের ভক্তির কথা কি বলিব! দারুণ বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে নির্জ্জলা একাদশী করিয়া পঞ্চাগ্নি-মধ্যস্থা তাপসীর ন্যায় তাঁহারা নাম জপ করিতেন, প্রাতে সূর্য্যোদয়ে স্নান আহ্নিক শেষে আমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কত বেলায় জলগ্রহণ করিতেন।

বাড়ীর পুণ্য পরিস্থিতি এবং গ্রামের ভক্তিমতী ও ভক্তগণের চরণধূলাই আমাকে শিশুকাল হইতে ভগবানের দয়ায় বিশ্বাসী ও তাঁহার উপর নির্ভরশীল হইতে শিক্ষা দিয়াছিল।

গ্রামের যাঁহারা অভিভাবক, তাঁহাদের স্নেহের অন্ত ছিল না। যাহাতে দিদিমা গ্রাম ছাড়িয়া না যান এবং বাড়ীটি বজায় থাকে তজ্জন্য তাঁহারা সর্ব্বদা আশীর্ব্বাদ করিতেন। হরিসংকীর্ত্তন গ্রাম পরিক্রমা করিবার সময় আমাদের দুয়ারে দাঁড়াইত—পরে উহা আমাদের বাড়ীর অঙ্গনে উপস্থিত হওয়ার প্রথা প্রবর্ত্তন করিয়া গৃহস্থকে তাঁহারা ধন্য করিলেন। দেবালয় ভিন্ন অন্য কোনো গৃহের অঙ্গনে সংকীর্ত্তন যায় না—ইহা গ্রামবাসীর একটী বিশিষ্ট স্নেহ ও কৃপার নিদর্শন। এই আশীর্ব্বাদের গৌরব তাঁহারা আমাকে চিরদিন দিয়া আসিতেছেন।

আর একটী ব্যাপারেও গভীর স্নেহ ভালবাসার পরিচয় পাই। আমি ধনী নহি—তথাপি শ্রীশ্রী৺ মঙ্গলচণ্ডী মাতার সেবাইত স্বর্গীয় হরিশ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় মহাপীঠে মহাষ্টমীর সন্ধিক্ষণের পূজার বলিদানের পর মঙ্গলা মার শুভ চরণ-নির্ম্মাল্য আমাকে সর্ব্বাগ্রে দিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেন—এই প্রথা তিনি দীর্ঘকাল নিজে রাখিয়া যান এবং তাঁহার সুযোগ্য উত্তরাধিকারী সেবাইত শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন রায়ও উহা সমভাবে বজায় রাখিয়াছেন। দেশবাসীর অকুণ্ঠিত আশীর্ব্বাদ আমি সর্ব্বদা পাইয়া আসিতেছি—ইহাই আমার সৌভাগ্য। আমার বন্ধু বান্ধবেরা অনেকে আজ সুবিখ্যাত, ভারত-জোড়া তাঁহাদের খ্যাতি প্রতিপত্তি—আমার সে সৌভাগ্য না থাক, আমার পাওনাও কম নহে—তবে দুঃখ হয়—

এত জীবনের স্নেহ প্রীতিধারা—
দেখি বুকে ব্যথা বাজে
যতনে লালিত এ তৃণ কুসুম
লাগিল না কোনো কাজে?
সুরভিত করি দেব মন্দির
সাজালো না পূজাথালা,
রহিল কেবল কৌটায় তোলা
ক্ষীণ কর্পূর মালা।
হল নাক পাঠ হল নাক গীত
বারেক হল না খোলা
স্নেহের ডোরেতে জড়ানো এ পুঁথি
'তাকে'ই রহিল তোলা।

স্বাধীনতা লাভ ও অন্ন সমস্যা

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

১৫ই আগষ্ট ১৯৪৭ হইতে আমরা স্বরাজ লাভ করিয়াছি। এ স্বরাজ অর্থ অবশ্য স্বাধীনতা, কারণ বৃটিশ পার্লামেন্ট ১৯৪৭ সনের স্বাধীনতা (ইনডিপেন্ডেন্স) আইন পাস করিয়া এই স্বাধীনতা ভারত ও পাকিস্থানকে দান করিয়াছে। নেতাদের সঙ্গে চীৎকার করিয়া আমরা এই স্বাধীনতাকে অভিনন্দিত করিয়াছি। আমরা চাহিয়াছিলাম 'পূর্ণ স্বাধীনতা', কিন্তু উহা এই আইন দ্বারা লাভ না হইলেও, আমরা যে কোন সময় ইংরেজের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিতে পারি। এই বিষয়ে আর যত বাধাই থাকুক আইনের বাধা রহিল না, ইহাই সকলকে বুঝাইয়া দেওয়া হইল।

আমরা ইহা বুঝিয়াই সুখী হইলাম, কারণ এখন পর্য্যন্ত আইনজ্ঞের কথাই রাষ্ট্রীয় মহলে বিনা আপত্তিতে গৃহীত হইতেছে। হয় ত ইহার একটা কারণ উকীলদের প্রতিষ্ঠা ও প্রাধান্য। কিন্তু বড় কারণ হইতেছে সংগ্রাম এড়াইয়া চলিবার ইহাই প্রকৃষ্ট পথ। এইরূপভাবে বুঝিলে নেতা এবং চেলাদের উভয়েরই কাজ কমিয়া যায় অর্থাৎ নিজ নিজ কাজের সুবিধা হয়। জনসাধারণের সুখ দুঃখ আরও অনেক পরে বিচার্য্য, কারণ এ সমস্যা এত বিরাট, সমাধান ত দূরের কথা—বিচার বিবেচনার সময়ও অনেক পরে আসে।

স্বাধীনতা লাভের পর এক বৎসর গত হইয়াছে ভারতে ও পাকিস্থানে ছাড়াছাড়ি হইয়াও কোন কিছুরই মীমাংসা হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। বরং ভাল ভাল বক্তৃতা ও বুলির পশ্চাতে দুই দেশের মধ্যে শত্রুতা ও বিরোধ দানা বাঁধিয়া উঠিতেছে। পাকিস্থানের হিন্দুগণ এবং ভারতের মুসলমানগণ নিজ নিজ রাষ্ট্রের প্রতি খুবই আনুগত্য প্রকাশ করিতেছে যেন ইহাতেই রাষ্ট্র-প্রীতির চরম কর্ত্তব্য শেষ হইল। অথচ পাকিস্থান হইতে হিন্দুর পলায়ন ও অন্তত: পাকিস্থানের মতে হিন্দুস্থান হইতে মুসলমানগণের বিতাড়ন স্থগিত রহিতেছে না। ভারত ধর্ম্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র, কিন্তু পাকিস্থান খাঁটি মুসলমানের দেশ ; সেখানে মুসলমান ধর্ম্মসম্মত শাসন-ব্যবস্থা হইবে। ভারত ধর্ম্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হইলেও সেখানে হিন্দুধর্ম্ম বা হিন্দুসমাজ সম্পর্কীয় আইন করা চলিবে যদিও তাহাতে হিন্দুর আপত্তি থাকে। কিন্তু অপর ধর্ম্মাবলম্বী সম্পর্কে ভারত কোন আইন করিবে না এবং নিরপেক্ষতা বজায় রাখিবে। ভারতে সকল ধর্ম্মাবলম্বী সমান, কিন্তু মুসলমানগণকে একটু পৃথকভাবে খাতিরের নজরে দেখিতে হইবে, আইনসভায় তাহাদের জন্য আসন সংরক্ষণ করিতে হইবে। কারণ ভারতের ধর্ম্মনিরপেক্ষতা কেবল অ-হিন্দুর জন্য। এতকালের ইংরেজের অধীনতা হইতে যে কুফল ফলিয়াছে, আজ তথাকথিত স্বাধীনতা পাইয়াও তাহার ফলন বাড়িয়া চলিয়াছে। সেই পুরাতন দাসমনোবৃত্তি আজ আমাদের রাষ্ট্রীয় নেতাগণের মগজে নূতন যুক্তি যোগাইয়া পুরাতন বিষকেই জিয়াইয়া রাখিবার চেষ্টায় পর্য্যবসিত হইতেছে। খুব একটা বড় বিপ্লবের রক্ত স্নানের ভিতর দিয়া আমরা স্বাধীনতা না পাইলেও একটা বিরাট পরিবর্ত্তন—তাহাকে বিপ্লব বলি বা নাই বলি—ব্যতীত এই স্বাধীনতা যে অর্থহীন, নিতান্ত অর্ব্বাচীনকেও তাহা কষ্ট করিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। সেই পরিবর্ত্তন আনিবার সৎসাহস যাহার নাই, দেশের বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে তাহার নেতৃত্ব করিবার যোগ্যতা বিষয়ে স্বতঃই সন্দিগ্ধ হইতে হয়। সরল পথে জাতির উন্নতি হয় না, আর বিভিন্ন অবস্থায় জাতি নূতন নূতন নেতাকে পথপ্রদর্শক এবং চালকরূপে বাছিয়া লয়। নূতন সঙ্কটময় অবস্থায় জাতি নূতন আলো খুঁজিতেছে—স্বাধীনতায় সে কতকগুলি সমস্যাই পাইয়াছে—আজ সমাধানের জন্য তাহার মন উদ্বেলিত উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। ইহার সমাধানের যিনি পথ দেখাইবেন তিনিই দেশের প্রকৃত নেতা হইবেন। পুরাতনের নজীরে কেহ নেতার গদী দখল করিয়া থাকিতে পারিবেন না। কারণ বর্ত্তমানের জীবনধারণের প্রতি সমস্যার অন্তত: আংশিক সমাধান না হইলে এই নবলব্ধ স্বাধীনতা সত্ত্বেও জাতি মরিয়া যাইবে।

অবশ্য কেবল আন্দোলন ও চীৎকার করিয়া ব্যক্তি ও দলবিশেষকে গালাগালি দিলেই দেশের প্রতি কর্ত্তব্য শেষ হয় না। মন্ত্রীগণকে গদীচ্যুত করিয়া আসন দখল করিলেও কোন সমস্যা সমাধান হইবে বলিয়া মনে করা ভুল হইবে। চাই গঠনমূলক কাজ—যাহা দ্বারা আমাদের অন্ন-বস্ত্রের দুঃখ দূর হইবে। বাহির হইতে কেহ আসিয়া আমাদের দুঃখ দূর করিবে এরূপ ভুল ধারণা কাহারও নাই। আমাদের সমস্যা আমাদের নিজের চেষ্টা দ্বারাই সমাধান করিতে হইবে। রাষ্ট্রনায়কগণের কার্য্য হইল সংগঠন প্রতিভার প্রয়োগ দ্বারা দেশের এই বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত শক্তিকে কার্য্যকরী করিয়া তোলা। অধৈর্য্য হইলে চলে না একথা সত্য সন্দেহ নাই, কিন্তু অন্নহীনকে উপবাসের আধ্যাত্মিকতা স্মরণ করাইলে তাহার ধৈর্য্যচ্যুতি হইবার সম্ভাবনা। দুঃখ দূর করিবার জন্য সকলকেই সাম্প্রতিক দুঃখ কিছুটা বরণ করিতে হইবে, কিন্তু সেই দুঃখভোগটা নেতাদেরও সাধারণের সঙ্গে সমানভাবে করিতে হইবে। তবেই সর্ব্বসাধারণ বুঝিবে যে নেতাগণও তাহাদেরই আপনার একজন। যে কারণে মহাত্মা গান্ধী নগ্নগাত্রে ও কটিবস্ত্রে জীবনধারণ করিয়া গিয়াছেন সেই কারণেই তাঁহার আদর্শে অনুপ্রাণিত কর্ম্মীগণ দারিদ্র্যকে স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া ভারতে মহারাষ্ট্র গঠন করিবেন। আধুনিক রাশিয়ার স্রষ্টা লেনিনের জীবন আদর্শও আমাদের নেতৃস্থানীয়গণের স্মরণীয়। লেনিন একজন সাধারণ নাগরিকের জীবনযাপন করিয়া

অতবড় রাষ্ট্র পরিচালন করিতেন। তাঁহার স্ত্রী নিজে খাটিয়া নিজের অন্নসংস্থান করিতেন। রুশ দেশের রাষ্ট্রীয় আদর্শ ভারত অপেক্ষা বিভিন্ন বিষয়ে পৃথক হইলেও উভয়ের নেতাগণের জীবনাদর্শ অন্ততঃ আত্ম-ত্যাগের দিক্ দিয়া অভিন্ন হওয়া উচিত। উচ্চাদর্শে অনুপ্রাণিত নেতাগণই নিম্নস্তরের কর্মী ও কর্মচারীগণকে আত্মত্যাগে অনুপ্রাণিত করিতে পারেন। ভারতের বর্ত্তমান অবস্থায় আমরা দুঃখের সহিত এই আদর্শভ্রষ্টতা লক্ষ্য করিতেছি। অর্থ লোভেই কর্ম্মিগণ দেশসেবায় ব্রতী হইতেছেন। চাকুরী লাভের জন্য কাড়াকাড়ি পড়িয়া গিয়াছে। গান্ধীজী জীবিতকালেই ইহা লক্ষ্য করিয়া ব্যথিত হইয়াছিলেন। এখন গঠনমূলক কার্য্যের দিকে দৃষ্টি দেওয়া যাউক।

খাদ্যের কথা ধরা যাউক। ভারতের খাদ্যের অনটনের প্রধান কারণ উৎপাদনের অপ্রাচুর্য্য। বিদেশ হইতে বৎসরের পর বৎসর খাদ্য আমদানি করিয়া দেশের লোককে বাঁচাইয়া রাখা সম্ভব বা সমীচীন নহে। আমাদের উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হইবে। ভারত সরকার সার উৎপাদন, জলসেচ, বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রভৃতি বড় বড় পরিকল্পনায় হাত দিয়াছেন। এই সকল পরিকল্পনা কার্য্যকরী হইতে কয়েক বৎসরের প্রয়োজন, কিন্তু সম্প্রতি খাদ্য ব্যবস্থা না করিতে পারিলে দেশবাসী মরিয়া ভূত হইবে অথবা অল্পাহার করিয়া দুর্ব্বল ও রোগগ্রস্ত হইবে। সুতরাং যাহাতে বর্ত্তমানের কর্ষণযোগ্য ভূমিতেই অধিক পরিমাণে খাদ্য-শস্য উৎপন্ন হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। হয়ত বেশী সার প্রয়োগের প্রয়োজন হইবে, হয়ত বর্ত্তমানে অকর্ষিত ভূমিগুলি কর্ষণযোগ্য করিতে হইবে, হয়ত বা বর্ত্তমান ভূমি ব্যবস্থা, বর্গাদারী আইনের কিছু অদলবদল পরিবর্ত্তন করিতে হইবে, কিন্তু এই বিষয়ে আর সময় নষ্ট করা চলিবে না। আজ ঝাঁপাইয়া পড়িতে হইবে। এ বিষয়ে সকলকে মনোযোগী হইতে হইবে, কেবল সহরে বসিয়া বক্তৃতা বা হুকুমজারি করিলেই চলিবে না। দেশ বিভাগের দরুণ সমস্যা আরও জটিল হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু যে সমস্যার সমাধানের উপর জীবন-মরণ নির্ভর করে তাহা এড়াইয়া চলার অর্থ মৃত্যু বরণ করা। এই বাঙ্গালা দেশের ৩০ লক্ষ লোককে মরিতে দিয়া আমরা বাঁচিয়া আছি এ কলংক অপনোদন করিবার জন্য আমাদিগকে নূতন করিয়া খাদ্যোৎপাদনে ব্রতী হইতে হইবে। সম্ভব মত সকলকেই খাদ্য উৎপাদন করিতে হইবে। দৈনন্দিন চরকা কাটার মত সকলকেই কৃষিকার্য্য করিতে হইবে। গ্রামের কথা ছাড়িয়া দিলেও কলিকাতার মত সহরে আমরা কিছু কিছু তরিতরকারি উৎপাদন করিতে পারি। মহাযুদ্ধের দুর্দ্দিনেও ইংলণ্ডের মত স্থানে যদি ইহা সম্ভব হয় তবে ভারতের মত দেশে ইহা আরও বেশী সম্ভব। কিন্তু আমাদের সে যত্ন, সে উৎসাহ, সে অনুপ্রেরণা, সে মানুষের মত বাঁচিবার ইচ্ছা কোথায়! আমাদের নেতারা বক্তৃতা করেন আর আমরা করি সমালোচনা—আর দেশের যে দুর্দ্দশা তাহাই রহিয়া যাইতেছে। কাজের এ পন্থা নহে। কাজের পন্থা কাজে, কথায় নহে। এই সহজ কথা আমরা যত সহজে বুঝিব, আমাদের উন্নতির পথ তত সরল হইবে।

অবশ্য খাদ্য উৎপাদনই খাদ্য সমস্যার একমাত্র পথ নয়। আর চাষ বর্ত্তমান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিখণ্ডে চালাইয়া উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হইবে, না সমবায় প্রথায় চাষের জমিগুলির আয়তন বাড়াইতে হইবে, বা অনেকগুলি জমিখণ্ড এক একটা বৃহৎ অংশে পরিণত করিয়া মার্কিন প্রথায় ট্রাক্টার বা যন্ত্র-লাঙ্গল ব্যবহার দ্বারা চাষ করিতে হইবে, তাহাও এক সমস্যা। ভারতবর্ষের মত বিরাট মহাদেশে কোন এক প্রথাই সর্ব্বত্র চালাইবার চেষ্টা করিলে উহার সফলতা শীঘ্র হওয়ার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং উল্লিখিত তিন উপায়েই—অর্থাৎ যেখানে যাহা সহজে সুষ্ঠুভাবে হয়—উৎপাদন বৃদ্ধির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কাজ চালাইয়া যাইতে হইবে। তবে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যাহাতে সমবায়ের ভিত্তিতে ভারতের কৃষি নূতনভাবে গড়িয়া উঠে। সমবায়ের ভিত্তিতেই ছোট ছোট কৃষি ক্ষেত্রগুলি বৃহতে পরিণত হইতে পারে, অথচ এজন্য কোন বাহিরের বিপ্লব দরকার হইবে না। সমবায় অন্তরের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই বাহিরকে বদলাইয়া ফেলে এবং ইহা স্থায়ী ও শুভফল প্রসব করে। হঠাৎ রাষ্ট্রের সাহায্যে জমি ছিনাইয়া লইয়া বৃহৎভাবে চাষের প্রবর্ত্তন করিলেই উৎ-পাদন বৃদ্ধি হইয়া দেশের অভাব দূর করিবে এরূপ যাহাদের ধারণা, তাহাদের রুশিয়ার সাম্প্রতিক কৃষি বিপ্লবের ইতিহাস জানা প্রয়োজন। মানুষকে মারিয়া মানুষ বা মনুষ্য সমাজের উপকার করা চলে না। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই একটা ব্যক্তিগত সত্তা আছে। সেই সত্তাকে স্বীকার করিয়া উহার বিকাশে সাহায্য করিয়া তবেই ব্যক্তির ও বৃহৎ সমাজের হিতসাধন করা চলে। মানুষের ছোট স্বার্থকে বিকশিত করিয়াই পরার্থের সৃষ্টি করিতে হয়। কেবল স্বার্থ ত্যাগ স্বার্থের বিনাশ বলিলেই তাহা সম্ভব হয় না। রুশদেশের মত বিপ্লবী দেশেও কৃষকের জমির মালিকানা এক কথায় উড়াইয়া দেওয়া সম্ভব হয় নাই, বরং স্বীকার করিয়াই ক্রমে ক্রমে কৃষি জগতে সমবায়ের ভিত্তি পাকা করা হইয়াছিল। আমাদের দেশে সমবায় উপর হইতে চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে, এজন্য সরকারী কাগজপত্রের কেতাদুরস্ত রিপোর্ট সত্ত্বেও উহার উন্নতি খুব অল্পই হইয়াছে। আন্তরিকতায় ও সমবায়ের ভিত্তিতে আমাদের গ্রাম্যজীবন পুনর্গঠিত করিতে পারিলেই আমাদের কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির সমস্যা সরল হইয়া আসিবে। ভারতের মত গরীব দেশে কেবল বড় বড় পরিকল্পনা করিয়াই সকল সমস্যার সমাধান হইবে না, বরং জটিল হইয়া পড়িবে। আমাদের দৃষ্টি দিতে হইবে ব্যক্তির দিকে, পরিবারের দিকে, গ্রামের দিকে, কুটির শিল্পের দিকে এবং ইহাদের বাঁচাইবার জন্য, সার্থক করিবার জন্য বৃহৎ পরিকল্পনার দরকার হয় তাহা করিব। পুঁজিবাদের গলদ এড়াইয়া চলিতে হইলে ইহাই আমাদের আদর্শ হওয়া উচিত। আমরা যেন যন্ত্রদানব নিজ হাতে সৃষ্টি করিয়া সমস্ত সমাজকে তাহার গোলাম করিয়া দিয়া আদর্শ ভ্রষ্ট না হই।

মানুষ বর্ত্তমান জগতে অনেক অঘটন ঘটাইয়াছে। সমস্ত প্রাচীন পদ্ধতি উপড়াইয়া ফেলিয়া নূতন করিয়া সমাজ গঠন করিতে চেষ্টা করিতেছে। বর্ত্তমানের উৎপাদন পদ্ধতি হইতে নূতন সংগঠন জন্মলাভ করিতেছে এবং এই রূপান্তর সমাজদেহে এরূপ মৌলিক পরিবর্ত্তন

আসিতেছে যে, ভাবিবার সময় আসিয়াছে যে অন্যে আমরা উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছি কিনা? আজ স্বাধীন ভারতে নিজেদের গতি নিয়ন্ত্রণের ভার অনেকটা স্বদেশী রাষ্ট্র পাইয়াছে। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও পৃথিবীর অন্যান্য সভ্যজাতিসমূহের অগ্রগতি হইতে ভারত নিজেকে সম্পূর্ণ পৃথক করিয়া লইতে পারিতেছে না। অথচ নিশ্চল হইয়া থাকিবার উপায় নাই। পিছাইয়া পড়িবার কথা আসিতেই পারে না। তাই পৃথিবীর এই অগ্রগতিতে আমরা কি ভাবে আমাদের জাতীয় গতি মিলাইব সেই প্রশ্নই বিশেষভাবে ভাবিবার। আমরা যেরূপ পৃথিবী ছাড়া নই, পৃথিবীর অন্যান্য জাতিও আমাদের ছাড়া নয়। যদি অন্যান্য জাতি দ্বারা আমাদের নিয়ন্ত্রণের সম্ভবনা থাকে, তবে আমাদের দ্বারাই বা তাহাদের নিয়ন্ত্রণের কথা উঠিবে না কেন? অবশ্য এই নিয়ন্ত্রণ আদর্শের শক্তি দ্বারা, রাষ্ট্রীয় বল দ্বারা নহে। পাশ্চাত্যের ধনতন্ত্রের আদর্শ বাস্তব জগতে যথেষ্ট আধিপত্য বিস্তার করিয়াও আজ নিজেকে বিপন্ন মনে করিতেছে, এই জন্যই জাতি সমবায়ের (ইউনাইটেড নেশন্‌স্) সৃষ্টি করা হইয়াছে। সকলে মিলিয়া তাই আজ বিশ্ব সমস্যাগুলির সমাধানের চেষ্টা চলিতেছে। অবশ্য এই সমস্যাগুলির সমাধানে সকল জাতির হয়ত সমান আন্তরিকতা নাই অথবা বিশ্ব রাষ্ট্র সমবায়ের মারফত কোন কোন রাষ্ট্র হয়ত নিজেদের স্বার্থ বা নিজেদের রাষ্ট্রের বা শ্রেণীগত আদর্শ বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রের উপর প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে চাপাইবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু ইহা সত্ত্বেও পরস্পরের আদানপ্রদানে বিশ্বের জাতিসমূহ যে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে সন্দেহ নাই। এই অগ্রগমনের পথে ভারতের সাহায্য কম কাম্য নহে। কারণ ত্রিশ কোটী মানবের সুখ দুঃখ, শ্রম, স্বাস্থ্য, ধর্ম্ম ও শিক্ষা সভ্য জগতের এক বিরাট স্থান অধিকার করিয়া আছে। ইংরেজের অধিকারে ভারতের আত্মা সুপ্ত জীবন্মৃত হইয়া পড়িয়াছিল। আজ সে মুক্তি পাইয়া বিশ্ব মুক্তিতে নূতন অবদান যোগাইবে। প্রাচীনের অমৃত বিশ্বের জাতি-সমূহের নিকট নূতনভাবে বণ্টন করিবে। কিন্তু এই আত্মলাভ, আত্মদান বলীয়ান ভারতের পক্ষেই সম্ভব। সুতরাং প্রাচীন আধ্যাত্মিক জাতির বংশধর হইলেও ভারতকে তাহার খাওয়া পরার সমস্যা এরূপভাবে সমাধান করিতে হইবে যাহাতে মানুষে মানুষে দ্বন্দ্ব কমিয়া যায়, সমাজ ব্যক্তিকে তাহার আত্মবিকাশে সাহায্য করে এবং আর্থিক সম্পদে পরিপূর্ণ মানুষের সমাজে আধ্যাত্মিক গৌরব আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠে।

কিন্তু ভারতকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে,'নায়মাত্মা বল হীনেন লভ্যঃ'।

মাটির পুতুল

শ্রীনীরেন্দ্র গুপ্ত

ছোট একটা ঝুড়িতে কয়েকটা মাটির পুতুল নিয়ে বিক্রী করতে এলো বসন্ত। মুকুন্দ তখন জমিদারবাবুর পায়ে তেল মেখে দলাইমলাই করছিল।

একদিন ছিল যখন মাটীর মূর্ত্তি আর পুতুল তৈরী করে বসন্ত বেশ দু-পয়সা আয় করত। কিন্তু আজকাল দেশগাঁয়ে পুজো একরকম উঠেই গিয়েচে, কারণ মানুষ শিক্ষিত হয়েছে—কুসংস্কার কাটিয়ে উঠেছে। তাই দেবদেবীর নানামূর্ত্তির আজ আর চাহিদা নেই। দেশি কুমোরের তৈরী পুতুলই বা কে কেনে, আজকাল বিদেশের সুন্দর সুন্দর 'মডার্ণ টয়' ফেলে। তাই বড় দুঃসময় এসেছে বসন্তের। চাক থেমে গেছে—ঘর ভেঙ্গে পড়েছে। অনেকদিন হয় ছেলেবউ মরে গেছে—এখন একা পেট বসন্তের, তাও চলে না আর। তাই বসন্ত জমিদারবাবুর কাছে এসেছে তার হাতে তৈরী সবচেয়ে ভাল কয়েকটা পুতুল নিয়ে—যে পুতুলকটা সে কোনোদিন বিক্রী করবে না বলে ভেবেছিল। যদি জমিদারবাবু দয়া করে কিছু কেনেন—এই আশা মনে।

অনেকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল বসন্ত। তারপর একসময় মৃদুকণ্ঠে বলল—হুজুর।

গড়গড়ার নলটা মুখ থেকে বিচ্ছিন্ন করে জমিদারবাবু গম্ভীর গলায় বললেন—কী বলতে চাস?

বসন্ত বললে—কয়েকটা পুতুল এনেছিলাম হুজুর, যদি কিছু কেনেন দয়া করে।

হেসে উঠলেন জমিদারবাবু, বললেন—আমি ছেলেমানুষ তাই পুতুল নিয়ে খেলব, না? বলিহারি বুদ্ধি তোদের!

বসন্ত মাথা নীচু করে বলল—না খেয়ে মরছি হুজুর, তাই ভাবলাম যদি আমাকে সাহায্য করার জন্যেও দুএকটা কেনেন

জমিদারবাবু আদেশের সুরে বললেন—পুতুল আছে তো হাটে বাজারে গিয়ে বিক্রী কর। আমাকে বিরক্ত করিস্ নে, যা।

বসন্ত আর কয়েকমুহূর্ত্ত নীরবে দাঁড়িয়ে থেকে ধীরে ধীরে চলে গেল। মুকুন্দের বড় কষ্ট হতে লাগল বসন্তের জন্যে। কিন্তু তার কী সাধ্য আছে?—কী করতে পারে সে?

কিছুদিন পরে মুকুন্দ শুনতে পেল, বসন্ত তার ভাঙ্গা ঘরের মধ্যে মরে পড়ে আছে—চারদিকে ছড়িয়ে আছে অনেক মাটির পুতুল।

কয়েক বছর পরে। জমিদারবাবু কলকাতায় একখানা নূতন প্রকাণ্ড বাড়ী তুলেছেন। তার ড্রইংরুমটী রুচিসম্মত-ভাবে সাজাবার জন্যে নানা দোকানে ঘুরে ঘুরে অনেক দামী জিনিষ কিনছেন। সেদিন কয়েকখানা মূল্যবান্ ছবি আর মূর্ত্তি কিনবার জন্যে একটা বড় দোকানে গিয়ে ঢুকলেন। সুসজ্জিত একটী যুবক এগিয়ে এলো—নমস্কার! কী দেবো আপনাকে?

—আমার ড্রইংরুম সাজাবার জন্যে কয়েকখানা ছবি আর মূর্ত্তি চাই।

—কী ধরণের?

—যে ধরণের হলে অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত এবং আধুনিক ড্রইংরুমে মানায়।

যুবকটী একবার তার ক্রেতার দিকে ভালভাবে দৃষ্টিপাত করল, তারপর বলল—আধুনিক অভিজাত সমাজে আজকাল পল্লীশিল্পেরই আদর বেশি। এজন্যে অনেক চেষ্টা করে আমরা নানাদেশ থেকে লুপ্তপ্রায় পল্লীশিল্পের কিছু কিছু নমুনা সংগ্রহ করে রেখেছি। অবশ্য এসব জিনিষ খুবই মূল্যবান্ এবং আপনাদের মত ধনীছাড়া আর কেউ এর আদরও বুঝবে না।

—দামের জন্যে কিছুই আটকাবে না—জমিদারবাবু বললেন।

—ওকথা না বললেও চলবে। আমি এখুনি আমাদের সবচেয়ে ভাল 'কলেকসন' আপনাকে দেখাচ্ছি।

গ্রাম্যপটুয়ার আঁকা কয়েকখানা পট, আর প্রাচীন জাভাশিল্পের অনুকরণে তৈরী কয়েকটা মূর্ত্তি এনে সে দেখালে। এর মধ্যে যেগুলো জমিদারবাবুর কাছে সবচেয়ে কুৎসিত বলে মনে হল যুবকটী সেগুলোই সবচেয়ে মূল্যবান্ বলে ঘোষণা করল। জমিদারবাবু ভেবে দেখলেন, সৌন্দর্য্য দিয়ে নয়, মূল্য দিয়েই জিনিষের বিচার করতে হবে। যে জিনিষের দাম বেশি, তার শিল্পসম্পদ নিশ্চয়ই বেশি। তাই সবচেয়ে বেশিদামের কয়েকখানা পট আর মূর্ত্তি তিনি কিনে নিলেন।

যুবকটী বললে—আমার এখানে আর একটী খুব দামী জিনিষ আছে, যা এ-শহরের আর কোথাও আপনি পাবেন না। একজন 'টুরিষ্ট' সাহেবের কাছ থেকে অনেক চেষ্টায় এটী সংগ্রহ করতে হয়েছে। এটী হচ্ছে বাংলার পল্লীর মৃৎশিল্পের একটী নিদর্শন। অনেক বড় বড় শিল্পীই এটীর উচ্চ প্রশংসা করেছেন, কিন্তু দাম একটু বেশি বলেই এপর্য্যন্ত এটী হাতছাড়া হয় নি। আর সত্যকথা বলতে কি, এসব জিনিষ আমরা সবাইকে দেখাইও না।

অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে জমিদারবাবু সেটী দেখতে চাইলেন। বিক্রেতা একটী ছোট মাটীর পুতুল নিয়ে এলো। কুব্জদেহ এক বৃদ্ধের মূর্ত্তি। মাথাটা আলগাভাবে বসানো, একটু নাড়া লাগলেই তা দুলতে থাকে। জমিদার-বাবু ভাবলেন—পুতুলটা নিশ্চয়ই খুব সুন্দর।

—দাম কতো এর? তিনি প্রশ্ন করলেন।

বিক্রেতা যুবকটী একটা কাগজে অনেকক্ষণ ধরে কী সব হিসেব লিখল, তারপর মুখ তুলে বলল—তিনশো টাকার কমে এটী আমরা ছাড়তে পারি নে।

জমিদারবাবু নিতান্ত ঔদাসীন্য দেখিয়ে একশো টাকার তিনখানা নোট বের করে দিলেন, যেন ও কটা টাকা তাঁর কাছে নিতান্তই তুচ্ছ।

বাড়ী ফিরে জিনিসগুলো মুকুন্দের হাতে দিয়ে জমিদার-বাবু বললেন—এগুলো খুব সাবধানে রাখতে হবে, বিশেষ-করে ওই মাটির বুড়ো-পুতুলটা। ওর দাম তিনশো টাকা।

জমিদারবাবু চলে গেলে মুকুন্দ তিনশো টাকার পুতুলটাকে ভাল করে দেখবার জন্যে এগিয়ে গেল। পুতুলটা হাতে নিয়ে সে বিস্ময়ভরে তাকিয়ে রইল তার পানে। না, কোনো সন্দেহ নেই এতে! সত্যি সে পুতুলটাকে চিনতে পেরেছে। তবু একেবারে নিশ্চিন্ত হবার জন্যে পুতুলটাকে সে উল্টে দেখলে। তলায় ছোট ছোট অক্ষরে শিল্পীর নাম লেখা রয়েছে—বসন্ত।

মুকুন্দ ভাবতে লাগল। এ পুতুলের দাম যদি তিনশো টাকা, তাহলে বসন্ত একমুঠো ভাতের অভাবে উপোস করে' মরল কেন?

ব্রহ্মপুরের স্মৃতি

শ্রীজনরঞ্জন রায়

রোমাঞ্চকর পরিবেশের মধ্যে ব্রহ্মপুরের সংস্থান। বলিবার আছে বহু কথা, কিন্তু কোনটা আগে বলি?

পরিবেশের জন্যই বুঝি এই স্থানটিকে এত ভাল লাগিল।

অতি ভোরের দিকে যখন মাদ্রাজ-মেল চিল্কা হ্রদের তিনদিক পরিক্রমা করিয়া লম্বা দৌড় দিতে থাকে, তখনই ভাবপ্রবণ বাঙালীর রোমাঞ্চ দেখা দেয়। তারপর সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে যখন পূর্ব্ব ঘাটের একটানা পাহাড়-প্রাকার চোখে পড়ে, তখন সে বিস্ময়ে হতবাক হইয়া যায়। এই পাহাড়ের উপত্যকা ক্ষেত্র এই গঞ্জাম জেলা। যেন কোন রাজাধিরাজ সমুদ্রপতির হাত হইতে নিজ রাজ্য রক্ষার জন্য সৈকত-ভূমিতে এই বিরাট পাহাড়-প্রাচীর তুলিয়াছিলেন। ছবি লওয়া গেল, জানি—এ বিরাটের মহিমা ছবির স্বল্প পরিসরে প্রকাশ করা অসম্ভব··· সীমার মধ্যে ইহাকে ধরিয়া রাখা যায় না। তবু মানুষ চিরদিন অসীমকে সসীম করিয়াই ধরিতে চায়—কারণ, তার মনের আধার যে ক্ষুদ্র···সীমাবদ্ধ।

ব্রহ্মপুর ষ্টেশনে দাঁড়াইয়া সবিস্ময়ে চাহিয়া থাকিলাম এই কঙ্করময় ধরণীর মহান পটভূমিকার দিকে। শীতের হাওয়ায় শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল···আত্মীয়বর্গ অপেক্ষমান রহিয়াছেন, দ্রুতপদে 'ঝট্কায়' গিয়া উঠিলাম।

এই ঝট্কা যান এখানকার এক অভিনব বস্তু খুব দ্রুতগামী একঘোড়ার স্প্রীং ও রবারটায়ারযুক্ত টাঙ্গরবেরা এক গাড়ী বিশেষ পিছন হইতেই চড়িতে হয়। তবে বসিবার জন্য মাদুর আছে।

দু'দিন না-যাইতেই শরীর মনে যেন উচ্ছ্বাসের প্লাবন বহিয়া যাইতে লাগিল। এখানকার প্রধান দ্রষ্টব্য—সমুদ্রতটে গোপালপুর, তপ্তপাণি গন্ধক-প্রস্রবণ ও ঋষিকুল্যা পাহাড়ের ঝরণা হইতে রক্ষিত পানীয় জলের হ্রদ (reservoir) এবং পৌষ সংক্রান্তির বহ্ন্যুৎসব।

প্রথমেই ব্রহ্মপুর শহরটি দেখিতে বাহির হইলাম।

ব্রহ্মপুর নূতন শহর। গঞ্জাম এখন জেলার নাম। গঞ্জাম গ্রামটির নাম বাতিল করিয়া এই ব্রহ্মপুর জেলাকোর্ট কলেজ প্রভৃতি সমন্বিত প্রধান শহরে পরিণত হইয়াছে। গোপালপুরের সান্নিধ্যবশতঃই ব্রহ্মপুরের এইভাবে কপাল ফিরিয়াছে তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। ইংরাজলোক ও মার্কিনীলোক এই গোপালপুরকে (Gopalpur-on-Sea) পুরীর অপেক্ষা অধিক স্বাস্থ্যপ্রদ মনে করিত। তাই ব্রহ্মপুরে আদালত স্থাপন করিয়া তাহাকে প্রশস্ত করিতে থাকে। এখনও প্রাদেশিক সরকার এই শহরের বাণিজ্য বৃদ্ধির পথ মুক্ত করিতে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে দিকে দিকে রাস্তা প্রস্তুত করিতেছে। পাহাড়তলি পর্য্যন্ত শহর বিস্তৃত হইতেছে। খালিকোট, পার্লাকামিডি প্রভৃতির রাজন্যবর্গের দানে বিশ্ববিদ্যালয়, টাউন-হল প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে। বিজলীবাতি শোভিত প্রশস্ত পিচঢালা রাস্তাসকল নির্ম্মিত হইয়াছে। রেডিওযুক্ত দুইটি বেড়াইবার পার্ক নির্ম্মিত হইয়াছে। তাহাতে কিন্তু এখনও অল্-ইণ্ডিয়া-রেডিও'র বাঙলা এবং ইংরাজীতে সংগীত ও সংবাদ বিতরিত হয়। আধুনিক সুরুচিসঙ্গত দ্রব্যসম্ভারপূর্ণ দুইটি বিপনি ক্রেতাতে পরিপূর্ণ থাকে। সিনেমা আসিয়াছে, মাড়োয়ারী আসিয়াছে, ব্যবসায় বাড়িতেছে। একস্থানে গঞ্জামীদের স্থাপিত, পরিপাটীভাবে ঘাট বাঁধানো রামলিঙ্গেশ্বরম্ দীর্ঘিকার সম্মুখে রামলিঙ্গেশ্বর শিবমন্দির, সত্যনারায়ণ মন্দির, দূরে মহুরী কালুয়া—মহুরীরাজ পরিবারের পাহাড়ে কালীর মন্দির, আরও দূরে পাহাড় গাত্রে নীলকণ্ঠেশ্বর শিবমন্দির এবং পাহাড় নিম্নে সবুজ বনাস্তীর্ণ তমালতালিকুঞ্জ—মনের মধ্যে শান্তসমাহিত ধর্ম্মভাব ফুটাইয়া তোলে।

পরের দিন বিকালে বেড়াইতে বাহির হইব, তখন আমার ছোট বৈবাহিক জানাইলেন যে একজন বাঙালী ষ্টেশন মাষ্টার আসিয়াছেন, তাঁর স্বাগত আগমন ও গঞ্জামী ষ্টেশন মাষ্টারের বিদায় চা-আমন্ত্রণে যাওয়া যাউক। সেদিন ষ্টেশনে বেড়াইতে বেড়াইতে দেখা গেল, ইংরাজী অক্ষরে ষ্টেশনেরর নাম লেখা আছে বাহরামপুর। কিন্তু উড়িয়া ও গঞ্জামী অক্ষরে লেখা আছে ব্রহ্মপুর। বুঝিলাম একদিন আড়ষ্ট সাহেবি জিহ্বা ব্রহ্মপুরকে বাহরমপুর করিয়াছিল। বেড়াইবার পক্ষে ষ্টেশনটি বড়ই মনোরম। হিন্দু ও সাহেবী দুই রকম খানারই হোটেল আছে। একদিকে একটি লম্বা প্লাটফরম, দুইদিকে নাই। কারণ এদিকে রেলের একটি লাইন মাত্র, ডবল লাইন হয় নাই। সেদিনটা ছিল পূর্ণিমা। বেয়াই সেই নূতন ষ্টেশন মাষ্টারের সঙ্গে গল্পরত। আমি একটা নূতন দৃশ্যের দিকে চাহিয়া আছি···পাহাড় গাত্র হইতে পূর্ণ চন্দ্রোদয়ের দৃশ্যের দিকে। একটা যেন নূতন জিনিষ আবিষ্কার করিলাম—পুরীতে সমুদ্র হইতে প্রভাত সূর্য্য যেমন অগ্নি-কলসের আকারে উত্থিত হয়···আজ এখানে পাহাড় শীর্ষ হইতে তেমনি উঠিতেছে একটি রৌপ্য কলস! আমার পূর্ব্বে কেহ এ দৃশ্য কি দেখেন নাই?···আমিও তো কখন দেখি নাই এত বয়সে এতদিন। কেবলই কলসাকারে সমুদ্রে সূর্য্যোদয়ের কথাই শুনিয়া আসিতেছি। চিন্তা করিয়া এই রহস্য উদ্ঘাটন করিলাম—পূর্ণচন্দ্রও পাহাড় চূড়া হইতে উঠিবার কালে রজত কলসাকারে ওঠে এরূপ মনে হয়। বুঝিতেছি দুই আমাদের দৃষ্টি বিভ্রম। উঠিবার কালে শেষাংশটা যেন আটকাইয়া থাকে, তাহাই কলসীর কানার মতো দেখায়। তাহা ছাড়াইয়া যে মুহূর্ত্তে উহা উপরে উঠে, তখনই গোলাকার দেখায়।

রশলকোণ্ডা—ইহাই ব্রহ্মপুরের পানীয় জলাধার। গঞ্জামীয়া

এমনভাবে উচ্চারণ করে যে মানে বোঝা যায় না। রুশল অর্থে ঋষির, কোণ্ডা বা কুণ্ড অর্থে জলের আধার। ইহাতে ঋষিকুল্যা নদীর জল আসিতেছে। কুল্যা অর্থে কন্যা। ঋষিকুল্যা অর্থাৎ ঋষিকন্যা নদীর জল। এই সব পাহাড়ে অনেক গুহা আছে। তাহাতে ঋষিরা বাস করিতেন মনে করিয়া পাহাড় ও নদীগুলির নামের সঙ্গে ঋষির নাম যোগ করা হইয়াছে বোধ হয়। নিকটেই দণ্ডকারণ্য…রামায়ণ বর্ণিত স্থান সকল। বাছিয়া লওয়া শক্ত। গঞ্জামীদের একাংশ রাক্ষসবংশ …ক্রমে একথা সকলেই বলিতেছেন। ইহা রাবণরাজ্য অন্তর্ভুক্ত দেশ ছিল।

ব্রহ্মপুর ষ্টেশন হইতে ৫ মাইল উত্তরে এই জলাধার (reservoir) ইহা ১৯২১ সালে প্রস্তুত হয়। তখন ব্রহ্মপুরে ১৫ হাজার লোক ছিল। এখন লোকসংখ্যা প্রায় ৫৫ হাজার। পুরাতনকে নূতন করিয়া গড়া জিনিষ। তবে অতি পূর্ব্বকালে কি ভাবে এই জলাধারটি ছিল তাহা কেহ বলিতে পারে না। প্রত্নতত্ত্বের কোন প্রশ্ন করিয়া কোনো গঞ্জামীর নিকট সদুত্তর পাই নাই।

রুশলকুণ্ডা বাহিয়া ঋষিকুল্যার কতকাংশ জলধারা এই রিজার্ভয়ারে পড়িতেছে (একটি sluice আধার দিয়া)। অতিরিক্ত জলধারা শস্য-ক্ষেত্রে পড়িতেছে। সম্ভব, পূর্ব্বে এখানে একটি দীর্ঘিকা ছিল, যাহা এক্ষণে 'রিজার্ভয়ার' বা রক্ষিত জলধারে পরিণত হইয়াছে। সেখানে জলটি পরিশ্রুত হয় এবং নলযোগে ব্রহ্মপুর সহরে পরিবেশিত হয়। সহরে প্রতি মোড়ে মোড়ে এক একটি জলের ট্যাপ আছে। ক্ষীণ ধারায় জল আসে মাত্র। তাই এখানে পানীয় জল এত অল্প পরিমাণে পাওয়া যায়।

স্থানটির দৃশ্য দেখিয়া উঠিতে ইচ্ছা হয় না।

উত্তর-দক্ষিণ-পশ্চিমে পাহাড়। বাঁধানো সুউচ্চ বিরাট ½ মাইল ব্যাপী হ্রদের (tank এর) পশ্চিম দিকে ঠিক বাল্মীক স্তূপের মতো কতকগুলি পাহাড়ের শ্রেণী। মনে হইতেছিল যেন একদল কৃষ্ণ অতিকায় নগ্ন মানুষ শীতে জড়োসড়ো হইয়া মুখ লুকাইয়া ঠাসাঠাসি করিয়া বসিয়া আছে। ঠিক সম্মুখেই আগাইয়া আসিয়া বসিয়া আছে যেন একটা বিরাটকায় প্রস্তরময় শতহস্ত সিংহ, তার উপর দাঁড়াইয়া আছে ঊর্দ্ধমুখ একটা পাথরের দৈত্যরাজ। ভাবিলাম—এসব সেই ত্রেতাযুগের জীবজন্তু, এখন তাহারা পাষাণ হইয়া গিয়াছে। তাহার দূরে আরও একসারি বনরাজিযুক্ত পাহাড়। আরও বহুদূরে পূর্ব্বঘাটমালা। এইভাবে পর পর তিন সারি পাহাড় দূরে ও নিকটে। সিঁড়ি বহিয়া উঠিতে হয় এই রক্ষিত হ্রদে। নিম্নে গোলাপ ফুলের বাগান…আম গাছগুলি ভেদ করিয়া অস্তমান সূর্য্যের আলো আসিয়া পড়িতেছে যবের শিষগুলিতে, মটরের ক্ষেতে। আমগাছের উপর দিয়া দৃষ্টি পড়িতেছে দূরে শস্যক্ষেতের মাঝে মাঝে ছোট ছোট খোলার-চালের কুঁড়ে ঘরে পূর্ণ গ্রামটির দিকে। মাঝে মাঝে নারিকেল তালগাছে ঢাকা ছোট এক একটি মন্দির। ঠাণ্ডা হাওয়া বহিল, রাত্রি হইয়াছে। এখানে আর থাকা চলে না। আষগড়ে বন্য ভালুক আছে। সিঁড়ি দিয়া নামিব, চাঁদ উঠিল। বিরাটকায় বাঁধা হ্রদের মধ্যে চাঁদ দুলিতেছে। ছোট সাদা সাদা কয়েকখানি মেঘ ঘাটমালার উপর দিয়া ভাসিয়া আসিতেছে…যেন পরীরা আকাশ নৌকায় মন্দারপথে অভিসারে চলিয়াছে! ভাবিলাম—কেন আমাদের ছায়া-চিত্রের শিল্পীরা এসব সত্যকার ছবি তুলিতে আসেন না?…ইহার অপেক্ষা জীবন্ত ছবি আর কোথায় মিলিবে? পথে আষগড়ের রঘুনাথ ও ঈশ্বর মন্দির এবং দক্ষিণপুরে রাধাকৃষ্ণ মন্দির পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

গোপালপুরের সমুদ্র—ব্রহ্মপুর হইতে প্রায় ১৬ মাইল পূর্ব্বপ্রান্তে। প্রতিদিন মাদ্রাজ মেলে এখনও দলে দলে শ্বেতাঙ্গরা আসে এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। প্রাচীন ব্রহ্মপুরের ভিতর দিয়া যাইতে হয়। এইখানেই বিজলী উৎপাদন কারখানা। ট্রাঙ্ক রোডের পাশ দিয়া মাদ্রাজ রেল লাইন পার হইলাম। অতিদূরে সেই পূর্ব্বঘাট পর্য্যন্ত প্রাকার। কাছে দূরে ছোট বড় পাথর চ্যাঙড়। মনে হয় যেন ঐ পূর্ব্বপ্রাকার গড়ার সময় ময়দানবের রথ হইতে এগুলি পথে পড়িয়া গিয়াছিল। ট্রাঙ্ক সড়ক হইতে দুইটি পথ বাহির হইল। একটি গোপালপুরের দিকে, অন্যটি গ্রামাঞ্চলে। গ্রামাঞ্চলে সেদিন পূর্ণিমার 'যাত' হইতেছিল। যাত অর্থে যাত্রাগান বা পূজা উৎসব। নমুনা পাইলাম—একদল লোক নৈবেদ্য লইয়া যাইতেছে…আর একদল মাদল বাজাইয়া একটা লোককে পালকপরানো পরী সাজাইয়া নাচিয়া গাহিয়া গ্রামের দিকে চলিয়াছে। গোপালপুরে ঢুকিতেই একটি বিষ্ণুমন্দির। শুনিলাম অগ্নি-উপাসকরা সেখানে থাকেন। দিনরাত হোমকুণ্ড জ্বলে। তারা রক্তবস্ত্র পরেন সবাই। তার পর পাইলাম বস্তি। বোধ হইল সবাই জেলে ও নুলিয়া। সব এক ধরণের গায়ে-লাগা-লাগা উঁচু দাওয়া চালা ঘর। দাওয়া হইতে ঘরের আধখানি দেওয়াল পর্য্যন্ত লাল গেরুমাটি লেপা। কোথাও সারি সারি মাছধরা জাল শুকাইতেছে। সমুদ্রের মাছ মাথায় নিয়া নুলিয়ারা শহরে বেচিতে চলিয়াছে। সমুদ্রের যত নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলাম, দেখা গেল সুন্দর সুন্দর 'বাঙলা' বাড়ি…প্রত্যেকের চারি দিকে এক একটি ফল ফুলের বড় বাগান। ঠিক পুরীর স্বর্গদ্বারের মতো। গোপালপুরের ভিতরটাতে খুব ঘন বসতি। ইহার কারণ রেল আসার পূর্ব্বে গোপালপুর গঞ্জাম জেলার প্রধান একটি বন্দর ছিল। তাই মাড়োয়ারী, চেট্টি, পাঞ্জাবী, হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান ও শ্বেতাঙ্গরা এখানে ভীড় করিয়া থাকিত। সমুদ্রের উপরে ভাঙা বন্দর, শুল্ক গ্রহণের (কাষ্টম আফিস) ভাঙা বাড়ি প্রভৃতি তার সাক্ষ্য দেয়। শ্বেতাঙ্গদের 'হাইবীচ', 'এক্কোয়েল' প্রভৃতি সারি সারি হোটেলগুলি সবই সমুদ্রের ধারে। যুদ্ধের কয় বছর মার্কিনী সেনারা দলে দলে এখানেই আসিত, পুরীতে ততো নয়। কতকগুলি এখনও এখানে বাস করে। তবে সকলেরই যেন মুখপোড়া। মানে—দেহের রঙের চেয়ে মুখের রঙ ঢের কালো। সমুদ্রের হাওয়াতে ইহা হয় জানিতে পারিলাম।

ফিরিবার পথে ভাবিলাম গোপালপুরের হাওয়া খাওয়া গেল অনেকক্ষণ, এবার একটু জল খাওয়া যাউক। সঙ্গে

আহার্য্য ছিল। একটি কূপের জল তোলা হইল···বেশ একটু ঘোলা জল। সৈকতের পাশেই রহমন মল্লিক নামে একটি মুসলমান ব্যবসায়ীর নূতন বাড়ি···নিকটে একটি অর্দ্ধভগ্ন মসজিদ পূর্ব্ব সম্পদের সাক্ষ্য দিতেছে। গ্রামের ভিতরে হিন্দুদের মন্দির, মাড়োয়ারীদের ধরমশালা, সাহেবদের গির্জ্জা ও সমাধিস্থান। আরও দূরে একটি টিলার উপর বেঙ্গল নাগপুর রেলের সুসজ্জিত হোটেল আছে শুনিতে পাইলাম।

বেলা পড়িয়া গেল, উঠিয়া আসিতেছি। দেখিলাম সম্মুখ দিয়া একটি অর্দ্ধনগ্ন যুবতী মেম সাঁতারু পোষাকে আর একটি সঙ্গিনীসহ সৈকতের উপর দিয়া চলিয়াছে···পিছু পিছু দু'তিনটা নুলিয়া মেমের সাঁতারের হাওয়াভরা রবারের বেল্ট বহন করিয়া চলিতেছে। অনতিদূরে একটি মুখপোড়া সাহেব সাঁতারুবেশে সমুদ্রের ধারে টিপ্‌সী হোয়ে অচৈতন্য···তার কাছেই একটি নুলিয়া মুখ গুঁজিয়া তাড়ি আবেশে পড়িয়া আছে।—হাসি পাইল···দুঃখও হইল। দেরি হইতেছে, গাড়িতে আসিয়া বসিলাম···ফিরিতে রাত হইয়া যাইবে।

তপ্তপাণি—ব্রহ্মপুর হইতে ৩১ মাইল দূরে। হাড়ভাঙা পথ। ব্রহ্মপুর হইতে বহু স্থানের জন্য মোটরযান আছে। লোকনাথ মটোর কোম্পানীর লোহাগুড়ির মটোরবাসে প্রাতঃকালে বাহির হইতে হয়। লোহাগুড়ির রাস্তাটি ভালই। প্রথমেই দক্ষিণপুর গ্রাম। গ্রামে উড়িয়া ও তেলেগুদের বাস। অনেকগুলি মন্দির আছে। তারপর বড়পেমেণ্ডি গ্রাম। এখানে আরোহীরা প্রাতঃরাশ খায়। আধ ঘণ্টা পরে বাস ছাড়িল। তারপর বড় একটি পুলে লোহাগুড়ি পার হইতে হয়। হাওড়ার ধরণের পুল। সানপেমেণ্ডি গ্রামে আসিয়া আবার বাস দাঁড়াইল। এইবার যাত্রী-সংখ্যা কমিয়া গেল। এখানকার বাজারটি বেশ বড়। সামনে বিরাট পর্ব্বত। ইহা পার হইতে হইবে। দুনিয়ার এক একটি ঘাট। এখানেও আধ ঘণ্টা জিরাইয়া বাস ছাড়িল। তারপর আর কি—ওঠানামা প্রেমের তুফানে। রাস্তার এত কুটিল আঁকা বাঁকা গতি যে, কোথাও ১৫০ গজ সোজা নয়। খুব স্থিরধীর চালক ভিন্ন এখানে গাড়ি চালাইতে পারে না। রাস্তার দুই পাশে ঘন বন। তপ্তপাণির ঝর্ণাধারা এইবার চোখে পড়ে। কোথাও ডান পাশ হইতে বামে, কোথাও বাম হইতে ডাহিনে। ডাক-বাঙলার পাশে বাস আসিল, তিন ঘণ্টা চলার পর বেলা ১০টায়। আকাশচুম্বী পাহাড়ের মধ্যে এই বিশ্রাম ঘর। চারিদিকে ফুলের বাগান। তপ্তপাণি দেখিতে তিনটি নাতিক্ষুদ্র স্নানাগারের মত। প্রথমটির জল গরম। সেই জল দ্বিতীয় কুণ্ডে গেলে কিছু ঠাণ্ডা হয়। সেই জল তৃতীয় কুণ্ডে পড়িয়া একটি নালা বহিয়া বাহিরে পড়ে। প্রথমটিকে পুরোহিত সকালে পূজা করিয়া গিয়াছেন। সেই পুষ্প ভাসিয়া চলিয়াছে দ্বিতীয় কুণ্ড দিয়া। সবাই দ্বিতীয় কুণ্ডে স্নান সারিল। জলে বেশ গন্ধকের গন্ধ। তারপর আবার সেই ডাকবাঙলায় আশ্রয় গ্রহণ। সঙ্গে খাবার না লইয়া গেলে অসুবিধা হইত। বেলা ২½টায় আবার বাসে আরোহণ। সন্ধ্যার আগেই ব্রহ্মপুরে আসা গেল। আসার সময় সঙ্গে আসিস ডাকবাঙলার গোলাপফুল, আর পাহাড় প্রাকার উঠানামার স্মৃতি।

পৌষ সংক্রান্তি বা উত্তরায়ণ সংক্রান্তি আসিল। এইদিন রাত্রে তেলেগুদের 'পঙ্গল' পর্ব্ব। ঐতিহাসিক এই পর্ব্বটি। কিন্তু কি বাঙালী, কি তেলেগু—কেহই ইহার উপযুক্ত মর্য্যাদা দেন বলিয়া মনে হয় না। রাবণের মৃত্যুবার্ষিকীরূপে তেলেগু সমাজে ইহা আজও প্রতিপালিত হয়। তবে বাঙলার নেড়াপোড়ার মতো, অতি হাল্কা আনন্দের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। 'পঙ্গ' বা 'পঙ্গল' তেলেগু শব্দের অর্থ—শ্রাদ্ধ। পৌষসংক্রান্তি রাত্রে এই সব দেশে পথে ঘাটে অগ্ন্যুৎসব হয়। কাহারও বাগানের বেড়া রেহাই পায় না। রাস্তার কাছে বাঁশ কাঠ পড়িয়া থাকিলে ছেলেবুড়োয় টানিয়া নিয়া গিয়া তাহা পোড়ায়। তাহাকে বলা হয় রাবণের চিতা। সেই চিতায় জল গরম করা হয়। সেই জলে স্নান করিয়া পরের দিন সকালে ইহারা পিতৃতর্পণ করে এবং বিঘ্নেশ্বর পূজা করিয়া নববর্ষকে স্বাগত জানায়। ইহাদের নববর্ষ আরম্ভ হয় ১লা মাঘ তারিখে। রামবৈরী দুষ্ট রাবণের ধ্বংসে রামরাজত্বের-শুভসূচক স্বরূপ হয় যদি এই পর্ব্বটি—তাহাতেও ঐতিহাসিকের বাধে না। কারণ তাহাতেও জানা যায় রাবণবধের কোন একটা উৎসব এইভাবে সম্পন্ন হয়। বিশেষতঃ দেখা যাইতেছে ইহা উত্তরায়ণ সংক্রান্তিতে অনুষ্ঠিত হইতেছে দক্ষিণায়ণের শুভ সংক্রমণকালে। ইহা অতি শুভকাল। হিন্দু জ্যোতিষ মতে ঐদিন সন্ধ্যা হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত (সংক্রমণ মুহূর্ত্ত) পুণ্যতর-পুণ্যতম সময়। আমাদের যত কিছু ধর্ম্মকার্য্য···শ্রীকৃষ্ণের জন্ম ও উৎসবাদি···এমন কি বৃত্রাসুরবধ—সব কিছু বাছিয়া বাছিয়া সূর্য্যের এইরূপ একটি সংক্রমণকালে নির্দ্দিষ্ট করা হইয়া থাকে। রাবণবধকাল সেইরূপ একটি সময়ে যে প্রদেশ নির্দ্দিষ্ট করেন, তাঁহারা রাবণকে অশেষ শ্রদ্ধার পাত্র মনে করেন বলিতে হইবে। দুঃখের বিষয়, রামায়ণের ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের পর আর কেহ বিশেষ কিছু আলোচনা করিলেন না। পঙ্গল পর্ব্বকে ভিত্তি করিয়া তাহার কিছু আলোচনা হউক, প্রত্নতাত্ত্বিকগণকে অনুরোধ জানাইতেছি।

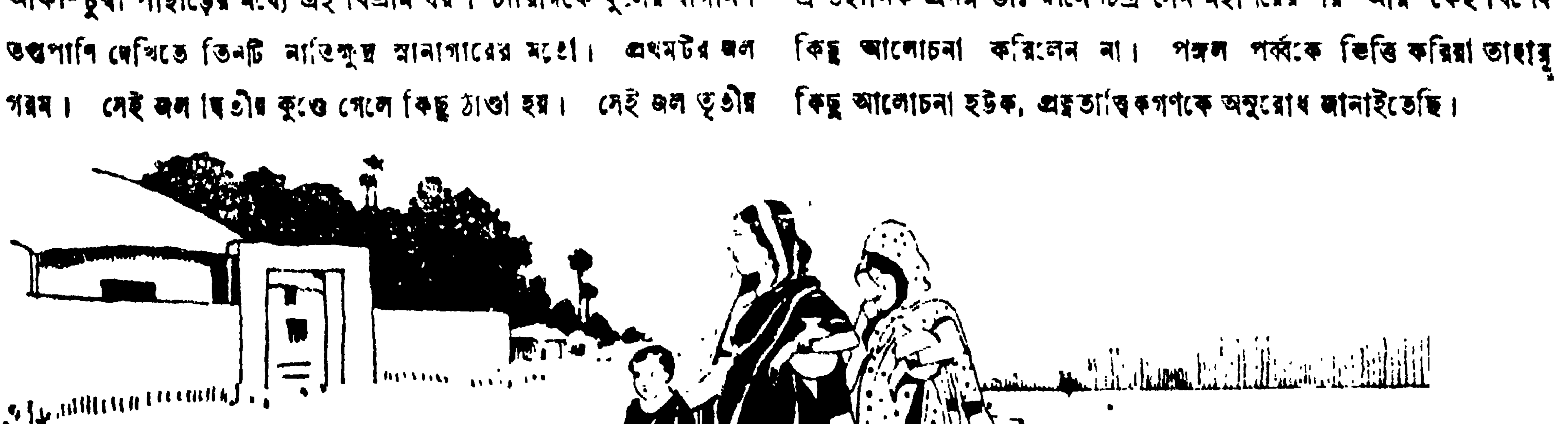

মোষ-রাখালের বৌ

শ্রীগুরুদাস সরকার

অনেকদিন আগেকার কথা। একটি ছেলে ছিল, সে করতো মোষের রাখালী। রাত্তির একটু বেশী না হলে সে মোষ নিয়ে বাড়ী ফিরতো না। এই ছিল তার নিত্যকার অভ্যেস। এক রাত্তিরে সে মোষ নিয়ে বাড়ী ফিরছে এমন সময় একটা চৌমাথা রাস্তার উপর দেখ্তে পেলে যে একটা অশ্বত্থ গাছে ঠেস্ দিয়ে একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ছেলেটি মনে করলে যে মেয়েটি হয়তো পথ ভুলে এখানে এসে পড়েছে, না হয় গোসা করে এসে এই গাছতলাটায় দাঁড়িয়ে আছে। সে জান্তো না যে গাঁয়েরই একজন লোককে অপদেবতায় পেয়েছিল। সেটা ছিল মেয়ে-ভূত। আর সেই দিনই ওঝা এসে মন্ত্রতন্ত্র পড়ে সেই অপদেবতাকে এই অশ্বত্থ গাছেরই গুঁড়ির সঙ্গে কাঁটা দিয়ে আট্‌কে রেখে গিয়েছে। অত শত না ভেবে রাখাল ছেলেটা জিজ্ঞেস করলে, "বন্ধু ("পেরা"), তুমি এলে কোত্থেকে"। সে বল্লে "বন্ধু, আমি বড় দূর থেকে এসেছি।" তাদের মধ্যে অপরিচিতকে, তা সে ছেলেই হোক আর মেয়েই হোক—"পেরা" বলে ডাকাই রীতি। রাখাল ছেলেটি মনে মনে বল্লে—"ও যেখান থেকেই আসুক না কেন সে কথায় আমার কাজ কি? আমাদের তল্লাটে যখন এসে পড়েছে, গাছের তলায় ও আর থাকতে যাবে কেন? যাই, ওকে সঙ্গে করে নিয়ে আমাদের বাড়ীতে। এই রাতটুকুন তো কাটিয়ে দিক্, তার পর ভোরে উঠে যেখানে ইচ্ছে চলে যাবে।" এই না ভেবে সে মেয়েটিকে বল্লে "দেখ বন্ধু,—যদি এদিকে আস্বার কালে পথ হারিয়ে গিয়ে থাক তো চলো আমার সঙ্গে, আমি তোমাকে সাথে করেই বাড়ী নিয়ে যাব।" মেয়েটি বল্লে "বেশ বন্ধু, তুমি যদি নিয়ে যাও তাহলে আমি তোমার সঙ্গেই যাব।" রাখাল জিজ্ঞেস্ করলে "কোন গ্রাম থেকে এসেছো তুমি তা আমাকে ঠিক করে বলো, তাহলে বাড়ীতে যখন আমাকে এ সব কথা জিজ্ঞেস করবে, তখন ঠিক ঠাক বলে দিতে পারবো। তা নইলে হঠাৎ কথার জবাব দেব কেমন করে?" মেয়েটি তখন একটা গ্রামের নাম করে বল্লে—"আমি অমুক গ্রামের মেয়ে। সেখান থেকেই এসেছি।" ছেলেটি বল্লে "বেশ কথা, এখন চল আমাদের বাড়ীতে। যদি কেউ তোমার খোঁজে আসে, তাহলে আমরা বল্তে পারবো তুমি এখানেই এসে রয়েছ। তার পর সকালে উঠে যদি কোথাও তোমার যাবার ইচ্ছে হয়, চলে যেও।" মেয়েটি বল্লে—"বেশ, তুমি যদি নিয়ে যাও তোমার সঙ্গেই যাব, আর তা নৈলে ভোর পর্য্যন্ত এখানেই থাকবো।" ছেলেটি বল্লে "বেশ কথা, আপন ইচ্ছেয় যদি তুমি আসো, আমি সঙ্গে নিয়ে যাব, আর যদি ইচ্ছে তুমি না করো, তাহলে তোমাকে কখ্খনোই নিয়ে যাব না।" মেয়েটি এবার বল্লে "আমি বেশ খুশী মনেই তোমার সঙ্গে যাব, কিন্তু আমার পা হাত কাঁটায় আট্‌কে আছে, আগে সেই কাঁটাগুলো খুলে নাও।" ছেলেটি কাঁটা সরিয়ে তাকে ছাড়িয়ে নিতেই মেয়েটি সেই রাখাল ছেলের সঙ্গে সঙ্গে মোষগুলো তাড়িয়ে নিয়ে তাদের বাড়ীর দিকে যেতে লাগ্‌লো। যতক্ষণ দুজনের মধ্যে এই সব কথাবার্ত্তা হচ্ছিলো, মোষগুলো ততক্ষণ সেই অশ্বত্থ গাছের কাছে এক জায়গাতেই দাঁড়িয়েছিল। বাড়ী এসে পৌঁছতেই বাড়ীর লোকেদের মধ্যে দুই একজন পিদ্দিম জেলে বেরিয়ে এল, মোষগুলো গোয়ালে নিয়ে বাঁধবার জন্যে। তারা ছেলেটিকে জিজ্ঞেস্ করলে—"কাকে সঙ্গে করে এনেছো?" মেয়েটি তখন উঠোনে দাঁড়িয়ে, আর ছেলেটি গেছে গোয়ালের ভেতর মোষ বাঁধতে। ছেলেটি গোয়াল থেকে বেরিয়ে আস্তেই তারা আবার জিজ্ঞেস্ করলে—"এ মেয়েটি কে একবার বলতো বাপু, একে কি তুমি বিয়ে করে নিয়ে এলে, না এম্নিই সঙ্গে এনেছো?" ছেলেটি বল্লে "এ আমার বন্ধু, যেখানে তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল সেইখান থেকে এনেছি।" তারা বুঝ্‌লো যে মেয়েটিকে সে পছন্দ করে এনেছে, বৌ করবে বলেই। তারা তখন মেয়েটিকে ডাক দিয়ে বল্লো "এসো গো মেয়ে এসো, এই বারান্দায় এসে বসো।" বারান্দায় সে বস্‌বে বলে তাকে একটা টুল পেতে দিল। সে এসে বস্‌তেই তারা তাকে জিজ্ঞেস্

করতে লাগ্‌লো—"হ্যাগা তুমি কোন গাঁয়ের মেয়ে।" সে বল্‌লে—"অনেক দূরের মানুষ আমি গো, আমাদের বাড়ী অমুক গাঁয়ে।" তারা জিজ্ঞেস্ করলো "তুমি যাবে কোথায়?" সে বল্‌লো "আমি গোঁসা করে চলে এসেছি, যেদিকে দুচোখ যায় সেদিকে যাব, যে দিকের ডাক দুই কানে শুন্‌বো—সেই দিকে যাবো।" ও যখন মোষ নিয়ে আসে তখন পথে আমাকে দেখে বল্‌লে—"সঙ্গে এসো, তোমাকে আমাদের বাড়ী নিয়ে যাব, তাই আমি এসেছি।" এই শুনে তারা ফের আবার সেই ছোক্‌রাকে জিজ্ঞেস্ কর্‌লে—"দেখ্ বাপু, সত্যি করে বল, মেয়েটি তোর বৌ কি না?" ছেলেটি বল্‌লে "না, ও আমার বৌ নয়, আমি মোষ খেদিয়ে নিয়ে বাড়ী আস্‌ছি, দেখি যে তেমাথায় অশ্বত্থ গাছের গুঁড়িতে ঠেস্ দিয়ে ও দাঁড়া রয়েছে। দেখ্‌তে পেয়েই জিজ্ঞেস করলাম—তুমি কোথা থেকে এলে? তুমি পথ হারিয়েছে, না গোঁসা করে এসে এখানে দাঁড়িয়ে আছ? একলাটিই বা এমন করে দাঁড়িয়ে আছ কেন? তুমি কি আমাদের সাঁওতাল, না অন্য কোন জাত? এসো, আমি তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাব। আমাদের বাড়ীতে রাতটুকুন থেকে ভোর হতেই যেখানে ইচ্ছে যেও। এই না বলে, আমি তাকে সঙ্গে নিয়ে এলাম।" এর পর আর কেউ কোনো কথা জিজ্ঞেস্ কর্‌লে না। রান্না-বান্না শেষ হলে মেয়েটিকে তারা খেতে দিলে, নিজেরাও সব খাওয়া দাওয়া সেরে নিলে। তারপর আপন আপন খাটিয়া পেতে নিয়ে, মেয়েটার জন্যে একটা চাটাই বিছিয়ে দিয়ে তারা রাতের মত শুয়ে পড়্‌লো। পরের দিন ভোর হতে না হতেই মেয়েটা গোবরের ঝুড়ি টেনে নিয়ে, গোয়ালে গিয়ে, গোবর টোবর সব কুড়িয়ে গোয়াল পরিষ্কার করে ফেল্‌লো, তারপর উঠোন ঝাঁট দিয়ে, কলসী কাঁকে জল আন্‌তে চলে গেল; দেখ্‌তে দেখ্‌তে তার জলভরা শেষ হয়ে গেল, সংসারে যত লাগে সবই সে একাই এনে ফেলেছে। গিন্নীকে সবাই বল্‌তে লাগ্‌লো, "এই যে মেয়েটা এসেছে, কাজে কম্মে সে যে কি চট্‌পটে তা আর বল্‌বার নয়, তার কাজ দেখে অবাক হয়ে যেতে হয়। জানিনা এদের দুজনার মধ্যে কি রকম বোঝাপড়া হয়েছে।" মেয়েটিকে তারা বেশ ভাল করেই দেখে নিলে। তার গড়ন পিঠন, মুখচেহারা, বল্‌তে কি পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্য্যন্ত সবই সুন্দর, অমন পরমা সুন্দরী মেয়ে সাঁওতালের ঘরে দেখা যায় না। তার পর ছেলেটির বাপমায়ে বসে যুক্তি করে স্থির কর্‌লে যে, এমন একটা ভাল কনে যখন পাওয়া গেছে তখন আর তাকে হাতছাড়া করা হবে না। ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেবে বলে তারা মেয়েটিকে রেখে দিলে, আর দুজনার মন আছে দেখে বিয়েও তাদের হয়ে গেল।

বিয়ের পর মেয়েটি একদিন তার স্বামীকে বল্‌লে, "দেখ—এখন আমরা স্ত্রী-পুরুষ, একদিন দুদিন নয়, চিরদিন একত্তরে ঘর-বসত করতে হবে বলে মা বাপে আমাদের এক করে দিয়েছেন! একটা কথা আমি তোমাকে বলবো, তুমি হাল্‌কা ভাবে নিও না। বেশ ঠাণ্ডা হয়ে যদি শোন তাহলে বলি। এখন তুমি আমার কথা রাখ্‌বে কি না তাই বলো। যদি তুমি রাজী হও, তা হলেই আমি থাক্‌বো, আর তা নইলে আমি আর তোমার সঙ্গে ঘর করতে পারবো না। কোলে কাঁকে দু একটি ছেলে মেয়ে যখন বইতে হবে—তখন ছেড়ে যাওয়া বড় মুস্কিল। সেই জন্যেই আমি আগে ভাগে বলে রাখ্‌ছি। আমি যা বল্‌বো তাতে যদি রাজী হও তো বলি, নইলে সে কথা তুলে আর কি হবে।"

ছেলেটি বল্‌লে—"বেশ তাই হবে, তবে ব্যাপারটি কি আমাকে একবার জানাতে হবে তো।"

মেয়েটি বল্‌লে "যা বলতে চাই তা এই—দেখ, কোন না কোনও দিন, যে কোনও কারণে, বাপে মায়ে, ভায়ে বোনে, স্বামী স্ত্রীতে, এক কথায় বাড়ীর সব লোকেরই, কারও না কারও সঙ্গে ঝগড়া বাধ্‌তে পারে। হয়তো আমাদের দুজনার মধ্যেও গেরস্থালির কাজকম্ম কি আর কিছু নিয়ে একদিন না একদিন ঝগড়া বেধে যাবে। তোমরা, পুরুষেরা, হাঁড়িয়া (পচাই মদ) খেয়ে মাতাল হলে পর এমন বকাবকি লাগাও যে বল্‌বার নয়। যেদিন বাড়াবাড়ি রকমের হয় সেদিন হয়তো মারধোরও করে বসো। সেই জন্যেই আমাদের দুজনের মধ্যে এখন থেকেই একটা বোঝাপড়া হয়ে যাক্। দেখ, যদি কোনও দিন আমাদের মধ্যে কোন্দল বাধে, তা হলে যদি তুমি গুঁতো-গাতা দাও, কি হাত দিয়েই দুই এক ঘা বসিয়ে দাও, তা আমি কোনও রকমে সহ্য করে যাবো। কিন্তু পা যদি

গায়ে ঠেকাও, তা হলে আমি কিছুতেই সহ্য কর্‌বো না। আমি তোমাকে আগে থেকেই মানা করে দিচ্ছি, পা দিয়ে দলিয়ে দেওয়া, পায়ের তলা দিয়েই হোক্, কি পায়ের আঙুলের ডগা দিয়েই হোক্, গায়ে আমার মারা একবারেই চল্‌বে না। আমাকে তুমি কখনও লাথি মার্‌তে, কি দলিয়ে দিতে পার্‌বে না। তোমাকে এই সাবধান করে দেওয়া সত্বেও যদি তুমি আমার কথা না শুনে আমার গায়ে পা তোলো, তা হলে আমি সেই দিনই তখনই চলে যাবো। যা বল্‌লাম, সে কথা স্মরণ রেখো, আর যদি না শোনো তবে এখনই আমাকে ছাড়ান দাও। এই কথাই আমি বল্‌তে চেয়েছিলাম, আর কিছু নয়।" ছেলেটি বল্‌লে, "বেশ, এ আমি নিশ্চয়ই মনে রাখ্‌বো, কখ্‌খনো তোমার গায়ে আমি পা দিয়ে আঘাত করবো না।" মেয়েটি তখন বল্‌লে "দেখ, আমার বাপ মা কত দূরে রয়েছে। তুমিও কোনও দিন তাঁদের বাড়ী যাওনি। আমাদের দুজনার দেখা হলো পথের ওপর, আর সেইখান থেকেই তুমি আমাকে নিয়ে এলে।" ছোকরাটি জবাব দিল, "তুমি কি একবারও আমাকে শ্বশুর ঘরে নিয়ে যাবে না? একবারও কি আমাকে সেই ঠাঁইটা দেখাবে না?" মেয়েটি বল্‌লে, "বড় দুঃখে আমি সেখান থেকে চলে এসেছি, আর আমি সেখানে ফিরে যাবো না।" সেই দিন এই পর্য্যন্তই কথাবার্ত্তা হলো। তার পর তারা ক্ষান্ত দিল। ছেলেটি তার বৌকে অন্য কিছু আর জিজ্ঞাসাবাদ কর্ত্তে ভুলেও গেল।

বিয়ে হলো তাদের অঘ্রাণ মাসে, আর বছর খানেক যেতেই তাদের একটি সন্তান হলো। মেয়েটি তখন খুসী-মনে ঘর গেরস্তালি কর্‌ছে। এদিকে তাদের অবস্থাও বেশ ফিরে গিয়েছে। ধনদৌলত তাদের উথ্‌লে উঠ্‌তে লাগ্‌লো। কোনও জিনিসের অভাব নাই। খুব ভাল অবস্থা। খাসা ঘর দোর, কতো তাদের বিষয় সম্পত্তি। এর মধ্যে তাদের আর একটি সন্তানও হয়েছে। সকলের সঙ্গে তাদের সদ্ভাব। খুব শান্তিতেই তারা বসবাস কর্‌ছে।

এইভাবে অনেক দিন কেটে গেলে পর মেয়েটার স্বামীর হঠাৎ মনে হলো, 'দেখা যাক্ না একদিন মিছামিছি করে ঝগড়া বাধিয়ে তার গায়ে একটু লাথি দিয়ে দেখি, বৌ থাকে না চলে যায়।'

যেমন মনে আসা, তেমনি কাজ করা। সেদিন হাঁড়িয়া খেয়ে মাতাল হয়ে এসে, বৌয়ের সঙ্গে কি একটা খুঁটিনাটি নিয়ে ঝগড়া বাধিয়ে, হঠাৎ সে তাকে লাথি মেরে বস্‌লো। বৌটা বড় দুঃখে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠে বল্‌তে লাগ্‌লো "হায়, হায়, হায়, এইবার সর্ব্বনাশ হলো, এইবার আমাকে শেষ কর্‌লে। তোমার কি এতটুকুও জ্ঞান বুদ্ধি নাই! এই আমাকে লাথি মার্‌লে, যা হবার তা শেষ করে দিলে। বুঝি সেই জন্যেই তুমি মেরেছো। সেই দিনই তোমাকে বলে দিয়েছিলাম, যে পা দিয়ে কখনো আমাকে ছোঁবে না। দেখ, কি কর্‌লে তুমি! তোমরা পুরুষেরা বড়ই মিথ্যাবাদী। এতদিন তোমার সঙ্গে ঘর-বসত কর্‌লাম, এবার আমি ছেড়ে যাচ্ছি, আর এই ছেলে দুটোকেও নিয়ে যাচ্ছি।"

লোকটার মুখ দিয়ে তখন আর একটি কথাও বের হলো না। সে যেন হতভম্ব হয়ে গিয়েছে। মেয়েটি দুই কাঁকে দুই ছেলে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। লোকটির মনে তখন সত্যি সত্যিই খুব পস্তানি হতে লাগ্‌লো। সে বউ আর বাচ্চা দুটিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে যথেষ্ট চেষ্টা কর্‌লে, কিন্তু তারা আর ফিরে এলো না। তারপর সেই বাড়ীর লোকেরা সব এসে যথাসাধ্য চেষ্টা কর্‌লে, কিন্তু তারাও আর ফিরিয়ে আন্‌তে পার্‌লে না। তখন তারা বল্‌লে, 'যাক্ ওরা খানিক দূর, তার পর ওদের ফিরিয়ে আনা যাবে। আমরা যা বল্‌ছি তা যদি এখন না শোনে, তার আর করা যাবে কি?'

মেয়েটি তখন বল্‌লে—'তোমাদের বাড়ীর ছেলে, তাকে যা বলেছিলাম তা যখন শুন্‌লে না, তখন আমিই বা আর কি কর্‌বো। আমি যারা থাকিয়ে তাদেরি একজন, ছাড়িয়েদের মধ্যে নয়। আমার ছেড়ে যাবার ইচ্ছেও ছিল না। ছেলেদের বাবাই যখন বিদেয় করে দিল, তখন আর আমি কি কর্‌বো।" এই বলে সে মাঠের পথ ধর্‌লে। তাদের বাড়ীর লাগা যে ক্ষেত, সেই জমির উপর দিয়েই যেতে লাগ্‌লো। তারপর জমিটার মাঝামাঝি পৌঁচেছে, তখন সে আর তার ছেলে দুটো দপ্ করে জ্বলে উঠ্‌লো। তাই না দেখে, আর সকলে খুব ভয় পেয়ে গেল। তারা সবাই বল্‌তে লাগ্‌লো "বাপ্‌রে বাপ, কি মেয়েকে আমরা বাড়ীর বৌ করে রেখেছিলাম। কি ভাগ্যি যে আমাদের খেয়ে

ফেলে নি।" কিন্তু সেই বৌটার স্বামীর আর মনকষ্টের অন্ত ছিল না। নিজ মনে সে কেবলই বল্‌তে লাগ্‌লো "কেন আমার এ দুর্ম্মতি হলো, কেন ওকে লাথি মার্‌তে গেলাম, সেই জন্যেই তো সে চলে গেল, তা নইলে নিশ্চয় যেতো না। আর আমাকে এসব কথা বলে আগে ভাগে সে বারণ কর্ত্তে গেলই বা কেন? তা নইলে তো এ রকমটা হতো না। আর তার মত কাকেও পাবো না।"

বৌটা ছেড়ে গেলে পর তাদের সংসারের অবস্থা নাকি খুব খারাপ হয়ে পড়েছিল। লোকের মুখে এই রকমই শুনেছি।

[সাঁওতালরা অবসর সময় গালগল্প করে, পরস্পরকে উপকথা শুনিয়ে আনন্দ পায়। নৃতত্ত্বের দিক্ থেকে সে সকল উপকথার মূল্য আছে। অপদেবতায় তাদের খুব বিশ্বাস। ভূতপ্রেতকে তারা "বোঙ্গা" বলে। পাদরী বোডিং সাহেব (Revd. O. P. Boding) কতকগুলি উপকথা সংগ্রহ করে নরওয়ের রাজধানী অস্‌লো নগর থেকে সেগুলি প্রকাশ করেছেন। মানুষের ও বোঙ্গার মেলা-মেশার কয়েকটি গল্প তাতে আছে। সকল বোঙ্গাই যে অপকার করে সাঁওতালরা তা বিশ্বাস করে না। সাধারণতঃ সাঁওতালদের বিয়ের সম্বন্ধ ঘটকের (রায়বারী'র) সাহায্যেই করা হয়। বরপক্ষের ঘর বাড়ী দেখারও নিয়ম আছে। তবে আগে থাকৃতে ভাব-সাব হলে কনে কোন কোনও ক্ষেত্রে—বোধ হয় লোকলজ্জা এড়াবার জন্য নিজেই বরের বাড়ীতে এসে বাড়ীর বৌয়ের মত বাসনকোষণে হাত দেয়। তখন মজ্‌লিস্ ডেকে বিয়ে সম্বন্ধে স্থির করা হয়। সাঁওতালদের মধ্যে বিবাহ-বিচ্ছেদের প্রথাও আছে। স্বামীত্যাগিনী ("ছাড়ুই")দের লোকে ভাল চোখে দেখে না। বিয়ের সময় কন্যাপক্ষ স্পষ্ট স্বীকার করিয়ে নেয় যে মেয়ের কান কি মাথা থেকে রক্তপাত করবার অধিকার দেওয়া হলো না। মেয়ে যদি তেমন দোষ করে, মেয়ের বাপমাকে জানিয়ে দিতে হবে। মেয়ের সঙ্গে কুকুর শেয়ালের মত ব্যবহার তারা সহ্য করবে না। আলেয়াকে আমরা যেমন অপদেবতা বলে মনে করি, সাঁওতালরাও কোথাও কিছু জ্বলে উঠতে দেখলে কিসের আলো তা যদি না বুঝতে পারে—তাহলে অপদেবতা বলেই মনে করে। সাঁওতালদের কাহিনী বলবার সরল ভঙ্গীটি এ গল্পে অনেকটা প্রকাশ পেয়েছে। ওঝাকে বলে "জান্‌গুরু"। সাঁওতালদের মধ্যে ওঝার বেশ প্রতিপত্তি। অসুখ-বিসুখ হলে, কি কেউ প্রেতাবিষ্ট হয়েছে মনে হলে ওঝাকেই আগে ডাকা হয়। অনুবাদ যতদূর সম্ভব মূলানুগ করা হয়েছে।]

আচার্য্য গৌড়পাদ

শ্রীননীগোপাল গোস্বামী এম্-এ

শংকরাচার্য্যের সাক্ষাৎ শিষ্য আচার্য্য সুরেশ্বর তাঁহার 'নৈষ্কর্ম্ম-সিদ্ধি' গ্রন্থে একজন বাঙালী আচার্য্যের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এই বাঙালী আচার্য্যপাদই হইতেছেন অদ্বৈত-বেদান্তের প্রাচীনতম আচার্য্য এবং শংকরাচার্য্যের গুরু গোবিন্দাচার্য্যের গুরু। শংকরাচার্য্যও তাঁহার এই পরম-গুরুর অতিমানুষী প্রতিভা এবং অসামান্য পাণ্ডিত্য দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন।

কে সেই বাঙালী আচার্য্য? সেই কথাই আজ এই ক্ষুদ্র নিবন্ধে প্রকাশ করিতে প্রয়াস পাইব।

জ্ঞানগরিষ্ঠ এই বাঙালী আচার্য্যপাদের নাম হইতেছে, আচার্য্য গৌড়পাদ। কখন, কোথায় তিনি ভারতের বুকে আবির্ভূত হইয়াছিলেন তাহা নির্ণয় করা এক দুরূহ ব্যাপার। সন্ন্যাসিগণের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায় না; আর যতটুকুই বা পাওয়া যায়, তাহা দ্বারা একটি জীবনের সম্পূর্ণ চিত্র অংকন করিতে পারা যায় না। এই জন্য ঋষিশ্রেষ্ঠ, জ্ঞানগরিষ্ঠ, ধর্মনিষ্ঠ ব্যাস-বশিষ্ঠগণের ন্যায় ভারত-রত্ন আচার্য্য-সন্ন্যাসিগণের সম্পূর্ণ জীবন কথা এখনও অন্ধকারাচ্ছাদিতই রহিয়া গিয়াছে। পণ্ডিত-প্রবর Max Muller বড় দুঃখেই তাই বলিয়াছেন,—"We have some idea of who Thales was, and who was Plato, where and when they lived and what they did; but of Kapila, the supposed founder of the Sankhya Philosophy, of Patanjali, the founder of the Yoga, of Gotama and Kanada, of Badarayana and Gaimini, we know next to nothing, and what we know hardly ever rests

on contemporary and trustworthy evidence." এখন এই আঁধারে হাত বাড়াইয়া গৌড়ীয় আচার্য্যের জীবন-কথা কতটুকু জানিতে পারা যায়, দেখা যাক্।

লক্ষ্মীনারায়ণ কারণ সলিলে অনন্ত শয্যায় শয়ান ছিলেন। সেই অনন্ত সর্পের নাম শেষজী বা আদিশেষ। নারায়ণের এই মূর্ত্তিকে সেই জন্য শেষশায়ী নারায়ণ বলা হয়। এই শেষজীই অত্রিপুত্র মহাভাষ্যকার পতঞ্জলিরূপে আবির্ভূত হয়। এই পতঞ্জলির এক হাজার শিষ্য ছিল। আচার্য্য গৌড়পাদ এই সহস্র শিষ্যেরই একজন।

কথিত আছে, মহর্ষি পতঞ্জলি শেষ মূর্ত্তি-ধারণ করিয়া প্রত্যহ এই এক হাজার শিষ্যকে পাঠ দিতেন। তিনি যে স্থানে বসিয়া অধ্যাপনা করিতেন তাহার চতুর্দিক পর্দাবেষ্টিত করিয়া রাখিতেন এবং শিষ্যেরা পর্দার বাহিরে থাকিয়া পাঠ শ্রবণ করিতেন। এইরূপভাবে কার্য্য সম্পাদনের সময় মহর্ষি দুইটি নিষেধ করিয়াছিলেন। প্রথমটি হইতেছে যে, কেহ কখনও পর্দা সরাইবে না, তাহা হইলে তখনই সে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে ; আর দ্বিতীয়টি হইতেছে যে, পাঠকালে বিনা অনুমতিতে কেহ কখনও স্থান ত্যাগ করিবে না, করিলে তাহাকে ব্রহ্মরাক্ষস হইতে হইবে।

কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া একদিন এক শিষ্য একটু-পর্দা সরাইলেন। সংগে সংগে এক হাজার শিষ্যকেই নাগরাজ্যের নিঃশ্বাসে নিমেষের মধ্যে প্রাণ হারাইতে হইল। এক শিষ্য পাঠ বুঝিতে না পারিয়া পূর্ব্বেই উঠিয়া গিয়াছিলেন, তিনিই একমাত্র জীবিত রহিলেন। কিন্তু যেহেতু তিনি মহর্ষির বিনা অনুমতিতে উঠিয়া গিয়াছিলেন, এই জন্য তাঁহাকে ব্রহ্মরাক্ষস হইতে হইল। তবে কোনো শিষ্যকে যদি তিনি তাঁহার সমগ্র জ্ঞানরাশি দান করিতে পারেন, তাহা হইলেই তাঁহার মুক্তি।

এই জীবিত শিষ্যই হইতেছেন গৌড়পাদ। গুরু আজ্ঞা লঙ্ঘন করায় ইনি ব্রহ্মরাক্ষস হইলেন এবং নর্মদা-তীরে এক অশ্বত্থবৃক্ষে আরোহণ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। এইরূপে তিনি তথায় রহিয়া গেলেন এবং কোনো ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতকে গাছের নীচে দিয়া যাইতে দেখিলেই তাহাকে পচ্ ধাতুর উত্তর ক্ত প্রত্যয় করিলে কি পদ হইবে তাহা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। এই পচ্ ধাতুর একটু বিশেষত্ব আছে। 'ক্ত' প্রত্যয় করিলে পাণিণির সূত্রানুসারে 'পক্ত' না হইয়া 'পক্ক' হইয়া থাকে।

অনেকদিন পর এক সুদর্শন ব্রাহ্মণ বালকের সন্ধান মিলিল এবং তাহাকে প্রশ্ন করিতেই বিশুদ্ধ উত্তর পাওয়া গেল। ব্রহ্মরাক্ষসরূপী গৌড়পাদ বুঝিলেন যে, এই ব্রাহ্মণকুমারই শিষ্য হইবার একমাত্র উপযুক্ত। তখন গৌড়পাদ ব্রাহ্মণ বালককে অশ্বত্থবৃক্ষে আরোহণ করিয়া মহাভাষ্যের পাঠ লইতে বলিলেন। গাছের উপর গুরু-শিষ্যের আলোচনা চলিতে লাগিল। ব্রাহ্মণ বালক নিজের উরুদেশ কাটিয়া রক্তধারা গাছের পাতার উপর সমস্ত লিখিয়া লইল। ৯দিন ধরিয়া অবিশ্রান্ত আলোচনার পর শেষ হইলে দুইজনে নামিয়া আসিলেন। লিখিত পাতাগুলি হইতে সংগ্রহ করিয়া যাহা দাঁড়াইল, তাহাই বর্ত্তমানে পাণিণি-ব্যাকরণের 'মহাভাষ্য'।

ব্রাহ্মণ বালকটির নাম হইতেছে চন্দ্রশর্মা। কথিত আছে, গৌড়পাদের ব্রহ্মরাক্ষসত্ব হইতে মুক্তিলাভের উপায় নাই দেখিয়া পতঞ্জলি স্বয়ং চন্দ্রশর্মা হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। গৌড়পাদ মুক্তি পাইলেন এবং চন্দ্রশর্মাও পাঠগ্রহণের পর সন্ন্যাস লইলেন। চন্দ্রশর্মার সন্ন্যাস আশ্রমের নাম হইয়েছে গোবিন্দাচার্য্য এবং তিনিই হইলেন শিবাবতার ভগবান্ শংকরাচার্য্যের গুরু।

তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, একজন বাঙালী আচার্য্যই হইয়েছেন পৃথিবীর জ্ঞানভাণ্ডারের অন্যতম উৎস এবং তাঁহার নাম হইতেছে আচার্য্য গৌড়পাদ। জ্ঞানভাণ্ডারে ইঁহার অশেষ অবদান। মাণ্ডুক্যোপনিষদকারিকা, অনুগীতাভাষ্য, সাংখ্য-কারিকাভাষ্য, উত্তরগীতাভাষ্য, নৃসিংহতাপিনীভাষ্য, দেবীমাহাত্ম্যের চিদানন্দবিলাস নামে টীকা প্রভৃতির রচয়িতা এই আচার্য্য গৌড়পাদ।

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসুর মতে আচার্য্য গৌড়পাদ ৫৫৭ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন। ডাঃ শ্রীআশুতোষ শাস্ত্রী, এম-এ, পি-আর-এস, পি-এইচ্-ডি এই আচার্য্যপাদের জীবৎকাল ৭ম শতক বলিয়া অনুমান করেন। কিন্তু একটি কথা স্মরণ রাখিয়া এ বিষয়ে অগ্রসর হইলে সমস্যা সমাধান অনেকটা সহজ হইয়া পড়ে। গৌড়পাদ শংকরের পরম গুরু এবং ভগবান্ শংকরের সহিত আচার্য্যপাদের সাক্ষাৎ হইয়াছিল, এ কথা 'শংকর দিগ্বিজয়ে' উল্লেখ আছে। তাহা হইলে শংকরের অবস্থান কাল স্থির করিতে পারিলেই আচার্য্য গৌড়পাদেরও অবস্থান কাল কথঞ্চিৎ নির্ধারিত হয়। শংকর ৭৮৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ৮২০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে জীবিত ছিলেন বলিয়া মোটামুটিভাবে স্থিরীকৃত হইয়াছে। যদিও এ সম্বন্ধে অনেক মতদ্বৈধ* আছে এবং সে-সব বিভিন্নমতের গভীর গহনে প্রবেশ করিবার এখানে কিছুমাত্র অবকাশ নাই। যাহা হোক্, এ কথা আংশিকভাবে সত্য হইলেও আমরা মোটামুটিভাবে বলিতে পারি যে, আচার্য্য গৌড়পাদ সপ্তম শতকের শেষপাদ হইতে অষ্টম শতক পর্য্যন্ত বিদ্যমান ছিলেন।

* দেখুন :—(1) Indian Antiquary, XIII.
(2) Indian Philosophy-Max Muller, pp 223.

স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম

শ্রীগোকুলেশ্বর ভট্টাচার্য্য

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

বাঙালী বিপ্লবীদের নেতৃত্বে যুক্তপ্রদেশেও পুনরায় এই সময় একটি শক্তিশালী গুপ্ত বিপ্লবী প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিতেছিল। রাসবিহারী বসুর ভারত ত্যাগের পর ১৯১৫ সালে যে বেনারস ষড়যন্ত্র মামলার সৃষ্টি হয়, তাহাতে অভিযুক্ত হইয়া বিপ্লবী শচীন্দ্রনাথ সান্যালের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড প্রাপ্তির বিষয় ইতিপূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। মণ্টেগু-চেমসফোর্ড শাসনসংস্কার আইন প্রবর্তনের সময় ১৯২০ সালে তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হয়। মুক্তিলাভের পর তিনি বাংলায় আসেন। কিছুদিন পরে তাঁহারই প্রচেষ্টায় যতীন দাস প্রভৃতির নেতৃত্বে দক্ষিণ কলিকাতায় একটি বিপ্লবী দল গঠিত হয়।

কিন্তু স্বয়ং শচীন্দ্রনাথ সান্যাল, রাজেন্দ্রনাথ লাহিড়ী এবং যোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির নেতৃত্বে কাশী ও লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি সহরে যে নূতন বিপ্লবী প্রতিষ্ঠানটি গঠিত হইল, তাহাই হইয়া উঠিল সেই সময়কার সর্ব্বাপেক্ষা দুর্দ্ধর্ষ বিপ্লবী প্রতিষ্ঠান। এই সমিতির আদর্শ ও গঠন-পদ্ধতি ইত্যাদির বিষয় বিবৃত করিয়া শচীন্দ্রনাথ যে শ্বেতপত্র সাধারণ্যে প্রচারিত করিলেন, তাহার ফলে রাজদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়া ১৯২৫ সালের জানুয়ারি মাসে বাঁকুড়ায় তাঁহার দুই বৎসরের কারাদণ্ড হইল। ইতিপূর্ব্বেই যোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কেও ১৯২৪ সালের ১৮শে অক্টোবর তারিখে কলিকাতায় অন্তরীণাবদ্ধ করা হইয়াছিল।

যাহা হউক, নূতন বিপ্লবী দলটি কার্য্য চালাইয়া যাইতে লাগিল ; কিন্তু কার্য্য চালাইয়া যাইবার ও অস্ত্র-শস্ত্র ক্রয় করিবার জন্য প্রয়োজন অনুভূত হইল অর্থের, সুতরাং স্বদেশী ডাকাতি পুনরায় আরম্ভ করা হইল। প্রথম ডাকাতি হইল ১৯২৪ সালের ২৫শে ডিসেম্বর পিলভিত জিলার অন্তর্গত বামরৌলি গ্রামের বলদেও প্রসাদের গৃহে। এই অভিযানের সময় বলদেও আহত এবং আর এক ব্যক্তি নিহত হইল। অন্যান্য কয়েকটি ডাকাতিতেও কয়েকজন হইল হতাহত ; কিন্তু এইভাবে অনুষ্ঠিত সব কয়টি ডাকাতি ও লুণ্ঠনকার্য্যের মধ্যে কাকোরী ট্রেণ ডাকাতিই সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

অযোধ্যা-রোহিল খণ্ড রেলপথে আলমনগর ষ্টেশনে ট্রেণ-ডাকাতি করিবার জন্য বিপ্লবীরা দুই দিন সমবেত হইয়াও বিশেষ সুবিধা করিতে না পারিয়া প্রত্যাবর্ত্তনে বাধ্য হইলেন। ইহার পর পুনর্ব্বার প্রচেষ্টা হইল ১৯২৫ সালের ৯ই আগষ্ট। উক্ত রেলপথের ৮নং ডাউন প্যাসেঞ্জার ট্রেণ তখন আলমনগরের পূর্ব্ববর্ত্তী ষ্টেশন কাকোরীতে আসিত আনুমানিক সন্ধ্যা সাত ঘটিকার সময়। ঐ তারিখে উক্ত ট্রেণ কাকোরী ষ্টেশন ত্যাগ করিয়া আলমনগরের দিকে মাইলখানেক অগ্রসর হইবার পর বিপ্লবীরা শিকল টানিয়া ট্রেণের গতি রুদ্ধ করিয়া দিলেন এবং রাজেন্দ্রনাথ লাহিড়ী প্রভৃতি তৎক্ষণাৎ আগ্নেয়াস্ত্রসহ গার্ডের গাড়ির দিকে অগ্রসর হইয়া একটি লোহার সিন্দুক বাহির করিয়া ফেলিলেন। কতকগুলি ষ্টেশন হইতে সংগৃহীত প্রায় সাড়ে চার হাজার টাকা ঐ সিন্দুকে রক্ষিত ছিল। বিপ্লবীরা সিন্দুক ভাঙ্গিয়া টাকা লইয়া পলায়ন করিলেন, কিন্তু এই উপলক্ষে যে গোলমাল হইল, তাহাতে বিপ্লবীদের গুলিতে একজন নিহত ও কয়েকজন আহত হইল।

এই সকল ডাকাতি ও লুণ্ঠন, বিস্ফোরক পদার্থ প্রাপ্তি এবং শচীন্দ্রনাথ সান্যাল রচিত নানা প্রচারপত্র প্রভৃতি অবলম্বন করিয়া গভর্ণমেণ্ট কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করিয়া যে মামলা দায়ের করেন—তাহাই কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলা নামে অভিহিত। আসফাক্ উল্লা, চন্দ্রশেখর আজাদ এবং শচীন্দ্র বক্সী ধরা না দিয়া আত্মগোপন করিয়া রহিলেন। বিচারকার্য্য শেষ হইবার পূর্ব্বেই পুলিশের কঠোর উৎপীড়ন ও নির্য্যাতনে দামোদরস্বরূপ জেলখানায় মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন।

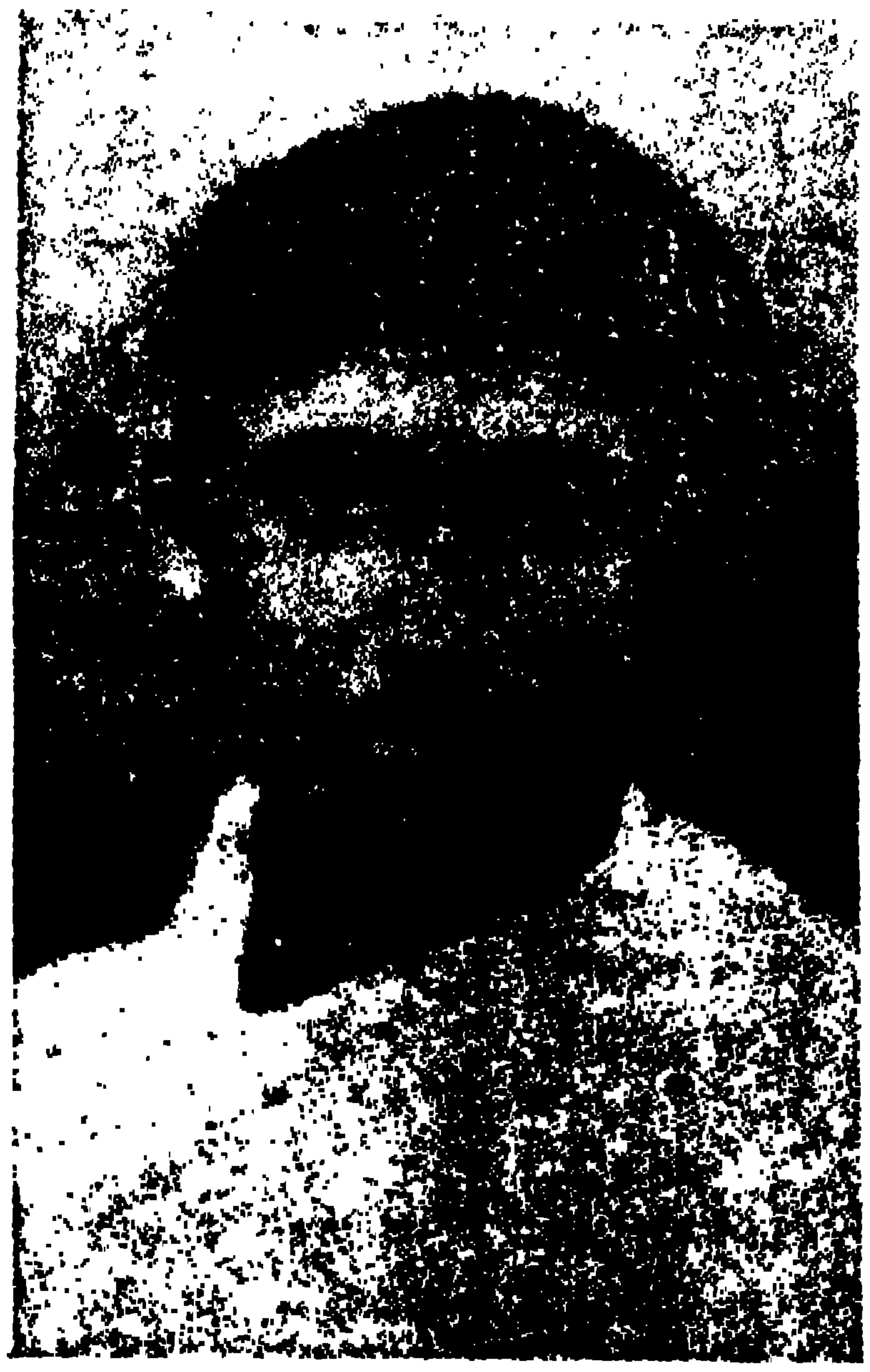

অনন্তহরি মিত্র

আসামীগণ দায়রায় সোপর্দ্দ হইবার পর স্পেশ্যাল জজ মিঃ হ্যামিল্টনের আদালতে লক্ষ্ণৌ সহরে ১৯২৬ সালের ৩রা মে মামলার বিচার আরম্ভ হইল। এই সময় অভিযুক্তগণ তিন সপ্তাহকাল অনশন পালন করেন।

মোকদ্দমায় দুইজন রাজসাক্ষী হয়। যাহা হউক, এই ষড়যন্ত্র মামলার শুনানী শেষ হয় ১৯২৭ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারি এবং রায় প্রদত্ত হয় ৬ই এপ্রিল তারিখে। রাজেন্দ্রনাথ লাহিড়ী, রোশন সিং এবং রামপ্রসাদ প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন; আর শচীন্দ্রনাথ সান্যালের প্রতি পুনরায় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডের আদেশ হইল। অন্যান্য কয়েকজনের হইল পাঁচ হইতে চৌদ্দ বৎসর পর্য্যন্ত বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ড।

আসফাক্ উল্লা এবং শচীন্দ্র বক্সী পরে ধরা পড়িবার পর স্বতন্ত্রভাবে তাঁহাদের বিচার হইল। বিচারে আসফাক্ উল্লার প্রতি আদেশ হইল মৃত্যু দণ্ডের।

স্বল্প প্রমাণ এবং সন্দেহের উপর নির্ভর করিয়া যে চারি জনের প্রতি প্রাণদণ্ডাদেশ প্রদত্ত হইল, সেই চারিজনের পক্ষ হইতে আপিল করা হইল লক্ষ্ণৌ-এর জুডিসিয়্যাল কমিশনার স্যার লুই ষ্টুয়ার্টের নিকট। পুনর্ব্বিচারেও মৃত্যুদণ্ডই বহাল রহিল। প্রিভিকৌন্সিল-এ আপিলের জন্য আবেদন মঞ্জুর হইল না।

১৯২৭ সালের ১৭ই ডিসেম্বর গোণ্ডা জেলে প্রাণদণ্ডপ্রাপ্ত চারিজনের ফাঁসি হইয়া গেল। ইহার ফলে বিপ্লবীদের সঙ্কল্প আরও দৃঢ়তর হইল।

১৯২৪ সালের অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি মীরাটে বিপ্লবীদিগের একটি গুপ্ত অধিবেশন হইয়াছিল এবং তাহাতে রাজেন্দ্রনাথ লাহিড়ীকে বাংলাদেশে বোমা তৈয়ারী শিখিবার জন্য পাঠাইবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছিল। তদনুযায়ী কাকোরী ডাকাতিতে অংশ গ্রহণের পর রাজেন্দ্রনাথ ধৃত হইবার পূর্ব্বেই বাংলায় চলিয়া আসেন। কলিকাতার শোভাবাজার ষ্ট্রীটে এবং দক্ষিণেশ্বরে দুইটি বাড়ীতে তখন কয়েকজন বিপ্লবী বোমা তৈয়ারীর প্রণালী শিক্ষা করিতেন। ১৯২৫ সালের ১০ই নভেম্বর পুলিশ সংবাদ পাইয়া দক্ষিণেশ্বরের বাড়ীটি ঘেরাও করিয়া ফেলে এবং খানাতল্লাস করিয়া বিস্ফোরক পদার্থ, রিভলভার ও বোমা প্রভৃতি প্রাপ্ত হয়। সেই বাড়ী হইতেই রাজেন্দ্রনাথ লাহিড়ী, অনন্তহরি মিত্র প্রমুখ নয় জন বিপ্লবী ধৃত হইলেন। ইহার পর শোভাবাজারের বাড়ীটিও খানাতল্লাস করিয়া পুলিশ প্রাপ্ত হইল নাইট্রিক এসিড ইত্যাদি এবং একজন সঙ্গীসহ তথা হইতে গ্রেপ্তার করিল প্রমোদরঞ্জন চৌধুরীকে।

দক্ষিণেশ্বরে বোমার কারখানায় ধৃত নয়জন বিপ্লবীর প্রতিই ১৯২৬ সালের ৯ই জানুয়ারি তারিখে দণ্ডাদেশ ঘোষিত হইল। রাজেন্দ্রনাথ লাহিড়ী, অনন্তহরি মিত্র প্রভৃতি তিন জনের হইল দশ বৎসর করিয়া দ্বীপান্তর দণ্ড এবং অন্যান্য সকলের হইল দুই অথবা পাঁচ বৎসর করিয়া কারাদণ্ড। রাজেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে তখন কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলা উপলক্ষে ওয়ারেন্ট ঝুলিতেছিল। দক্ষিণেশ্বর মামলার বিচারের পরই কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলায় তাঁহার বিচারের জন্য তাঁহাকে লক্ষ্ণৌ পাঠাইয়া দেওয়া হয়। সেখানে তাঁহার প্রাণদণ্ড প্রাপ্তি এবং ফাঁসি হইয়া যাওয়ার বিষয় পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

শোভাবাজার বাটী হইতে ধৃত দুইজনেরও পাঁচ বৎসর হিসাবে সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইল।

বাটী হইতে ধৃত এবং দণ্ডপ্রাপ্ত মোট এগারজন বিপ্লবীর অবশিষ্ট দশ জনকে রাখা হইয়াছিল আলিপুর সেন্ট্রাল জেলের বোমা ইয়ার্ডে। বোমা ইয়ার্ডের উত্তরদিকে যে ষ্টেট ইয়ার্ড ছিল, অন্তরীণে আবদ্ধ রাজনৈতিক বন্দীগণকে সেখানে রাখা হইত। গুপ্ত সংবাদসংগ্রহের আশায় পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের ডেপুটি সুপারিন্টেণ্ডেন্ট রায় বাহাদুর ভূপেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই ষ্টেট ইয়ার্ডে মাঝে মাঝে যাতায়াত করিতেন। বিপ্লবীরা তাঁহার উপর তুষ্ট ছিলেন না। ১৯২৬ সালের ২৮শে মে তারিখে সন্ধ্যার অল্প পরে তিনি যখন ষ্টেট ইয়ার্ডে কিয়ৎকাল অবস্থান করিয়া প্রস্থান করিবার জন্য ষ্টেট ইয়ার্ডের বাহিরে আসিয়াছেন, অমনি বোমা ইয়ার্ডের কয়েকজন বিপ্লবী ওয়ার্ডারের নিকট হইতে বলপূর্ব্বক চাবি কাড়িয়া লইয়া তদ্দ্বারা দরজা উন্মুক্ত করিয়া বাহির হইয়া আসেন এবং লৌহদণ্ডের আঘাতে ভূপেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে সেই-খানেই নিহত করেন।

এই হত্যাকাণ্ডকে অবলম্বন করিয়া ১৯২৬ সালের ৯ই জুন আলিপুর ট্রাইব্যুনালে তিন জন বিচারকের নিকট দশ জনের পুনরায় বিচার আরম্ভ হইল। এই মামলার বিচারে অনন্তহরি মিত্র, প্রমোদ চৌধুরী ও বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ফাঁসির আদেশ হইল, আর অবশিষ্ট সাতজনের হইল দ্বীপান্তর দণ্ড।

কলিকাতা হাইকোর্টে যখন এই মামলার পুনর্ব্বিচার হইল, তখন বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ পাঁচ জন অভিযুক্ত আসামী নিরপরাধ বলিয়া সাব্যস্ত হইলেন; অনন্তহরি মিত্রের প্রাণদণ্ডই সমর্থিত হইল; তিন জনের হইল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড এবং প্রমোদ চৌধুরীর দণ্ড লইয়া দুইজন বিচারপতির মধ্যে উপস্থিত হইল মতদ্বৈধতার। একজন বিচারপতি তাঁহাকে দ্বীপান্তর দণ্ডে এবং অপর জন তাঁহাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিবার পক্ষে অভিমত প্রকাশ করিলেন। ফলে প্রমোদ চৌধুরীর মামলাটি প্রধান বিচারপতির নিকট প্রেরিত হইল এবং তিনি তাঁহার মৃত্যুদণ্ডই সমর্থন করিলেন। ১৯২৬ সালের ৯ই আগষ্ট এই রায় প্রদত্ত হইল।

দেওঘর ষড়যন্ত্র মামলাতেও এই সময় কয়েকজন দণ্ডপ্রাপ্ত হন।

এদিকে চৌরীচৌরার ঘটনার পরই যে গণ-আন্দোলন অনেকটা নিস্তেজ হইয়া পড়িল, পূর্ব্বেই তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। ১৯২২ সালের ১৩ই মার্চ্চ মহাত্মা গান্ধীও গ্রেপ্তার হইলেন। তিনটি অপরাধের জন্য দুই বৎসর হিসাবে তাঁহার ছয় বৎসর বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইল।

খিলাফৎ সমস্যার এই সময় অনেকটা সমাধান হইয়া যাওয়ায় একদল স্বার্থপর লোক হিন্দু মুসলমানে পুনরায় বিভেদ ঘটাইবার চেষ্টা করিতেছিল। ইহার ফলে ১৯২২ সালে মহরম উপলক্ষে মুলতানে উভয় সম্প্রদায়ে বাধিল দাঙ্গা। ১৯২৩ সালে বাংলা দেশ ও পাঞ্জাবে ব্যাপকভাবে দাঙ্গা-হাঙ্গামা দেখা দিল। ইহার পর হইতেই মাঝে মাঝে এখানে-ওখানে দাঙ্গা চলিতেই লাগিল। ১৯২৬ সালে স্বামী শ্রদ্ধানন্দ দিল্লীতে নিজ ভবনে একজন মুসলমান আততায়ীর হস্তে নিহত

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু প্রভৃতি নেতৃগণ কারামুক্তির পর বাহিরে আসিয়া গঠন করিলেন স্বরাজ্য দল এবং তাঁহারা কৌন্সিলে প্রবেশের সিদ্ধান্তও গ্রহণ করিলেন। ইহার ফলে আইন সভার নির্ব্বাচনে বাংলা দেশে এবং মধ্যপ্রদেশ ও বেরারে স্বরাজ্য-দল বিশেষ সাফল্যলাভ করিল।

মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড শাসন-সংস্কার আইনে এইরূপ একটি বিধান ছিল যে, উক্ত শাসনব্যবস্থা চালু হইবার দশ বৎসর পরে ভারতীয় শাসন ও রাজনৈতিক অবস্থা পর্য্যালোচনার জন্য একটি কমিশন নিযুক্ত হইবে এবং ঐ কমিশন আবশ্যক পরিবর্ত্তনাদির বিষয়ে নিজেদের সিদ্ধান্ত বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের বিবেচনার জন্য দাখিল করিবে; কিন্তু ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা দ্রুত অবনতির দিকে যাইতেছে দেখিয়া নির্দ্দিষ্ট দশ বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ভারতের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিতে একটি কমিশন প্রেরণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিলেন। ভারতীয়দের দাবী মিটাইবার পক্ষে কিন্তু মাত্র একটি কমিশন প্রেরণের ঘোষণায় কিছুই কাজ হইল না। চালু শাসন-ব্যবস্থার সামান্য কিছু রদ্‌-বদল তখন ভারতীয়গণের কাম্য নহে—তাহারা তখন সর্ব্বপ্রকার নিয়ন্ত্রণ-মুক্ত পূর্ণ স্বাধীনতালাভের জন্য অধীর এবং ব্যাকুল। ১৯২৭ সালের ডিসেম্বর মাসে মাদ্রাজে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হইল, তাহাতে "পূর্ণ স্বাধীনতাই ভারতবাসীর লক্ষ্য" এই মর্ম্মে গৃহীত হইল একটি প্রস্তাব এবং সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট-প্রেরিত উক্ত কমিশন সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জনের। কাকোরী মামলায় গুরুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামীদের প্রতিও সুবিবেচনার দাবী জানান হইল।

যাহা হউক, ঘোষণা অনুযায়ী ১৯২৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে একটি কমিশন ভারতে আসিল। তাহাতে সদস্য ছিলেন সর্ব্বশুদ্ধ সাত জন। কমিশনের সভাপতি সাইমনের নামানুসারেই কমিশনের নাম হইল সাইমন কমিশন।

উক্ত কমিশনে কিন্তু একজনও ভারতীয় সদস্য গ্রহণ করা হয় নাই। যাহাদের শাসনব্যবস্থা পর্য্যালোচনা করিবার জন্য এই কমিশন, তাহাদেরই মধ্য হইতে কোনও প্রতিনিধি গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষ অনুভব করিলেন না। এই স্বৈরাচার এবং ধৃষ্টতার বিরুদ্ধে সমগ্র ভারতব্যাপী প্রবল প্রতিবাদ উত্থিত হইল। কমিশন ৩রা ফেব্রুয়ারি বোম্বাই-এ পদার্পণ করিলে "Go back Simon" লিখিত কৃষ্ণ পতাকা প্রদর্শিত ও সর্ব্বত্র হরতাল প্রতিপালিত হইল। কমিশন লাহোরে উপস্থিত হইলে সেখানে এক বিরাট বিক্ষোভ শোভাযাত্রা বাহির হয়। লালা লাজপৎ রায়, ডাঃ সত্যপাল, ডাঃ আলম প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ এই শোভাযাত্রা পরিচালিত করেন। লাহোরের পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ স্কট ও তাঁহার সহকারী মিঃ সাণ্ডার্স পুলিশদল লইয়া বেপরোয়াভাবে লাঠি চালাইয়া ঐ শোভাযাত্রা ছত্রভঙ্গ করিয়া দিবার চেষ্টা করিলে এক অতি শোচনীয় দুর্ঘটনা সংঘটিত হইল। পুলিশের লাঠিতে স্বয়ং লালা লাজপৎ রায় বুকে, মাথায় ও শরীরের অন্যান্য স্থানে গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হইলেন। এই আঘাতপ্রাপ্তির ফলে লালাজী সাংঘাতিকভাবে পীড়িত হইয়া শয্যা গ্রহণে বাধ্য হইলেন এবং তাঁহার ফুসফুসে যন্ত্রণা উপস্থিত হইল। এইভাবে ভুগিতে ভুগিতে ইহা উপলক্ষ করিয়াই ১৯২৮ সালের আগষ্ট মাসে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। লক্ষ্ণৌ-এ পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুও পুলিশের হস্তে নিগৃহীত হইলেন।

এদিকে কমিশনকে বর্জ্জন করিয়া কংগ্রেস ভারতের দাবী প্রস্তুতের জন্য নিজেরাই হইলেন উদ্যোগী। ১৯২৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে দিল্লীতে এক সর্ব্বদল-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইল। উক্ত সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর নেতৃত্বে যে কমিটি গঠিত হইল, তাহাতে করা হইল ডোমিনিয়ন ষ্টেটাসের দাবী। এই বৎসর কলিকাতায় পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর সভাপতিত্বে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয়, তাহাতে মহাত্মা গান্ধীর চেষ্টায় নেহেরু-রিপোর্টই সমর্থিত হইল এবং বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকে জানাইয়া দেওয়া হইল যে, ১৯২৯

ভগৎ সিং

সালের ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে এই দাবী পূরণের ব্যবস্থা না করিলে কংগ্রেস অহিংস অসহযোগ আন্দোলন সুরু করিয়া জনসাধারণকে কর প্রদান বন্ধ করিতে অথবা অন্যান্য উপায় অবলম্বন করিতে নির্দ্দেশ দিবেন।

চরমপন্থী দল কিন্তু এই ডোমিনিয়ন ষ্টেটাসের দাবীতে সন্তুষ্ট হইলেন না। তাঁহাদের মুখপাত্র হিসাবে সুভাষচন্দ্র (পরে নেতাজী) ও পণ্ডিত জওহরলাল পূর্ণ স্বাধীনতার দাবীই উত্থাপন করেন। শেষ পর্য্যন্ত কিন্তু গান্ধীজীর প্রস্তাবই গৃহীত হয়।

কংগ্রেসের এই কলিকাতা অধিবেশনের সময় সুভাষচন্দ্রের পরিচালনা ও অধিনায়কত্বে এক বিরাট্ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী সংগঠিত হইয়াছিল। যতীন দাস ছিলেন এই বিষয়ে সুভাষচন্দ্রের সহকারী। এই অধিবেশনের আর একটি গুরুত্ব হইল এই যে, ভারতের নানা স্থান হইতে বিপ্লবীরা আসিয়া এই অধিবেশনে সমবেত হইয়াছিলেন এবং তাঁহারা একত্রে পরামর্শ করিয়া তাঁহাদের পরবর্ত্তী কর্ম্মপন্থা নির্ণয়ে

সুযোগ পাইয়াছিলেন। ভগৎ সিং, যতীন দাস, সূর্য্য সেন প্রভৃতি মুক্তি-সাধকগণের এই অধিবেশন উপলক্ষেই একত্র যোগাযোগ হইয়াছিল।

গোপীনাথ সাহা, রাজেন্দ্রনাথ লাহিড়ী প্রভৃতির ফাঁসির পর হইতেই অসন্তোষের বহ্নি পুনরায় ধূমায়িত হইতেছিল। তদুপরি সাইমন কমিশনের ভারতে আগমন ও অবস্থান উপলক্ষে চতুর্দ্দিকে যে বিক্ষোভ ও আন্দোলন চলিতেছিল, তাহা দমন করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট রুদ্র নীতি অবলম্বন করায় অবস্থার আরও অবনতি ঘটিল। বিপ্লবী ভগৎ সিং-এর আবির্ভাব এই সময়কার এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

ভগৎ সিং ছিলেন বিখ্যাত বিপ্লবী সর্দ্দার অজিত সিং-এর ভ্রাতুষ্পুত্র। তাঁহার পিতার নাম কিষেণ সিং। অল্প বয়স হইতেই বিপ্লবীদিগের সহিত ভগৎ সিং-এর মেলামেশা ছিল। ১৯২০-২১ সালের গণ-আন্দোলন ব্যর্থ হওয়ার পর যখন ধীরে ধীরে দেশ আবার বিপ্লবান্দোলনের দিকে অগ্রসর হইতেছিল, তখন ভগৎ সিং অন্যান্য সহকর্ম্মীর সহিত পাঞ্জাবে নওজোয়ান সভা নামে এক বিপ্লবী সমিতির সংগঠন করিতেছিলেন। এদিকে কাকোরী মামলায় অভিযুক্ত বিপ্লবীরা যে "হিন্দুস্থান সোস্যালিষ্ট রিপাবলিকান এসোসিয়েসন" গঠিত করিয়াছিলেন, নিরুদ্দিষ্ট অবস্থায় চন্দ্রশেখর আজাদ তখনও তাহাই নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করিতেছিলেন। এই চন্দ্রশেখর আজাদকে পুলিশ বহু চেষ্টা করিয়াও বহুদিন যাবৎ গ্রেপ্তার করিতে সক্ষম হয় নাই। অবশেষে ১৯৩১ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারি এলাহাবাদ সহরের এলফ্রেড পার্কে পুলিশ যখন তাঁহাকে ধরিবার চেষ্টা করে, তখন একটি ছোটখাট লড়াই বাধিয়া যায়। ইহাতে একজন শ্বেতাঙ্গ পুলিশ কর্ম্মচারী গুরুতররূপে আহত হয় এবং চন্দ্রশেখর আজাদ শেষ পর্য্যন্ত ধরা না দিয়া নিজের আগ্নেয়াস্ত্রের গুলিতেই নিজে আত্মহত্যা করেন।

যাহা হউক ভগৎ সিং প্রভৃতি বিপ্লবীরাও চন্দ্রশেখর আজাদ নিয়ন্ত্রিত দলের সংস্পর্শে আসায় বিপ্লবীদিগের শক্তি ও কর্ম্মতৎপরতা পুনরায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। স্বদেশী ডাকাতি আবার সুরু হইল পুরাদমে। লাহোরের কাশ্মীরী বিল্ডিং এবং সাহারাণপুর, আগ্রা ইত্যাদি স্থানে বোমা তৈয়ারির কারখানা স্থাপিত হইল।

বিপ্লবীদিগের কার্য্যের নানারূপ পরিকল্পনা রচিত হইতে লাগিল। কাকোরী ষড়্‌যন্ত্র মামলায় দণ্ডপ্রাপ্ত শচীন্দ্রনাথ সান্যাল ও যোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে যে ট্রেণে লইয়া যাওয়া স্থির হইয়াছিল, সেই ট্রেণ হইতে তাঁহাদিগকে বলপূর্ব্বক ছিনাইয়া লইবারও একবার সঙ্কল্প করা হয়। আর একটি পরিকল্পনা এইরূপ ছিল যে, উক্ত মামলার রাজসাক্ষীদিগকে হত্যা করা হইবে। সাইমন কমিশনের সভ্যগণ যে ট্রেণে যাইবেন, তাহা ডিনামাইট সংযোগে বিধ্বস্ত করিয়া দেওয়াও একবার স্থির হইয়াছিল। শেষ পর্য্যন্ত অবশ্য উক্ত পরিকল্পনাগুলিকে আর কার্য্যে পরিণত করা হয় নাই।

মিঃ স্কট ও সাণ্ডার্সের নেতৃত্বে লাহোরে বিক্ষোভ-শোভাযাত্রার উপর পুলিশের লাঠি চালনা এবং তাহাতে আহত হইয়া ভুগিতে ভুগিতে লালাজীর মৃত্যুর বিষয় পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। বিপ্লবীদের দৃষ্টি কতিপয় বিপ্লবীর হস্তে লাহোরের কোর্ট ষ্ট্রীটের মোড়ে অপরাহ্ণকালে মিঃ সাণ্ডার্স ও তাঁহার সঙ্গী চন্দালাল প্রাণ হারাইলেন। ট্রাফিক ইন্‌সপেক্টর মিঃ ফার্ণ আততায়ীদের ধরিবার চেষ্টা করিলেন—কিন্তু তাঁহার উপরও গুলি বর্ষিত হইল। হস্তে গুলির আঘাত পাইয়া তিনি পলাইয়া যাইতে বাধ্য হইলেন। ভগৎ সিং এবং তাঁহার দলবলের দ্বারাই এই হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হইল।

সাণ্ডার্স-হত্যার কয়েকমাস পরেই ১৯২৯ সালের ৮ই এপ্রিল দিল্লীর আইন-পরিষদ ভবনেও এক কাণ্ড ঘটিয়া গেল। পরিষদের সভাপতি যখন Publio Safety Bill সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত প্রকাশ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তখন অকস্মাৎ পরিষদের দুই স্থানে সশব্দে ঘটিল বোমার বিস্ফোরণ। ইহার ফলে কয়েকজন আহতও হইলেন। ভগৎ সিং এবং বটুকেশ্বর দত্তের দ্বারাই এই বোমা বিস্ফোরিত হইয়াছিল। ইহার পর ভগৎ সিং দুইবার গুলিও ছুড়িলেন। প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা ব্যতীত অবশ্য এই সকল কার্য্যকলাপের আর অন্য উদ্দেশ্য ছিল না।

বিস্ফোরক আইনের তিন ধারা অনুযায়ী এবং হত্যার চেষ্টার অভিযোগে ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্তের বিচার হইল। বিচারে দুই জনের প্রতিই প্রদত্ত হইল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড।

পরিষদে বোমা-বিস্ফোরণ ঘটনার কয়েকদিন পরেই পুলিশ লাহোরের কাশ্মীরী বিল্ডিং খানাতল্লাস করে এবং বহু পরিমাণ বিস্ফোরক দ্রব্য প্রাপ্ত হয়। শুকদেব, কিশোরীলাল প্রভৃতি কয়েকজন সেইখানেই গ্রেপ্তার হইলেন। ধৃত ব্যক্তিদের মধ্যে কয়েকজনের স্বীকারোক্তির ফলে পুলিশ সকল ব্যাপার জানিতে পারিল এবং নানা প্রদেশ হইতে গ্রেপ্তার করিল বহু বিপ্লবীকে। পরে এই সকল ধৃত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে লাহোর ষড়্‌যন্ত্র মামলা নামে রুজু হইল এক বিরাট মামলা। যতীন দাস, শুকদেব, কিশোরীলাল প্রভৃতি বহু বিপ্লবীকে এই মামলায় আসামী করা হইল। ভগৎ সিং এবং বটুকেশ্বর দত্তও আবার নূতন করিয়া এই মামলায় অভিযুক্ত হইলেন। মুক্তিলাভের আশায় ধৃত ব্যক্তিদের মধ্যে সাতজন হইল রাজসাক্ষী।

১৯২৪ সাল হইতে ভারত-সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণার্থ অর্থ, অস্ত্র শস্ত্র ও লোকজন প্রভৃতি সংগ্রহ এবং এতদুদ্দেশ্যে সমিতি-গঠন ইত্যাদির অভিযোগ আসামীদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত হইল। মামলার শুনানী আরম্ভ হইল ১৯২৯ সালের জুলাই মাসে। রাজবন্দীদের প্রতি দুর্ব্ব্যবহারের প্রতিবাদে ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্ত ইতিমধ্যেই জেলখানায় প্রায়োপবেশন আরম্ভ করিয়াছিলেন। অনশনের ফলে ভগৎ সিং এই সময় খুব দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে ষ্ট্রেচারে করিয়া আদালতে আনা হইতে লাগিল।

মামলা চলিতে থাকার সময় অভিযুক্ত বিপ্লবীরা আদালতে একত্রে মিলিয়া তাঁহাদের পরবর্ত্তী কর্ম্মপন্থা নিরূপিত করিলেন। তাঁহারা স্থির করিলেন যে, উত্তম খাদ্য, সংবাদপত্র ও পুস্তকপ্রাপ্তি এবং সকলের একই শ্রেণীতে অবস্থান ইত্যাদির দাবীতে প্রায়োপবেশন সুরু করিবেন। পরামর্শমত আরম্ভও হইল সেই ঐতিহাসিক অনশন, যাহার পরিসমাপ্তিতে জীবন

অগাধ জলে

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

১

সোমনাথ অগাধ জলে পড়িল। যে কাজের স্থায়িত্বের ভরসায় সে ব্যাঙ্কের চাকরি ছাড়িয়া দিয়াছিল তাহাও গেল। এখন সে কী করিবে, কোথায় যাইবে? সোমনাথের মনে হইল, অদৃষ্ট তাহাকে লইয়া নিষ্ঠুর পরিহাস করিয়াছে, যে অবলম্বনের উপর ভর করিয়া সে ভাসিয়া ছিল, তাহা ভুলাইয়া কাড়িয়া লইয়া তাহাকে তীরে লইয়া যাইবার ছলে গভীর জলে ঠেলিয়া দিয়াছে।

দিদি বলিলেন—তুই অত মনমরা হচ্ছিস কেন? ও চাকরি গেছে ভালই হয়েছে। আরও কত সিনেমা কোম্পানী আছে, খবর পেলে তোকে লুফে নেবে।'

সোমনাথ কিন্তু ভরসা পাইল না। এখানে আসিয়া অবধি সে পিলে সাহেবের ষ্টুডিওতেই দিন যাপন করিয়াছে, অন্য কোনও সিনেমা কোম্পানীর খোঁজ খবর রাখে নাই, কাহারও সহিত মুখ চেনাচেনি পর্যন্ত নাই। কে তাহাকে কাজ দিবে? সে-ই বা কোন্ মুখে অপরিচিতের কাছে উমেদার হইয়া দাঁড়াইবে? আর, কাজ যদি না পাওয়া যায় তবে দিদির বাড়ীতেই বা কতদিন নিষ্কর্মার মত বসিয়া থাকিবে? তার চেয়ে কলিকাতায় ফিরিয়া গিয়া যা হোক একটা চেষ্টা করা ভাল। হয় তো চেষ্টা করিলে ব্যাঙ্কের কাজটা আবার পাওয়া যাইতে পারে।

এইরূপ নানা সংশয়ময় দুশ্চিন্তায় হপ্তাখানেক কাটিয়া যাইবার পর একদিন বৈকালে পাণ্ডুরঙ্ আসিয়া উপস্থিত হইল। ভর্ৎসনা করিয়া বলিল,—'বা দোস্ত, তুমি এখানে ছিপে রুস্তম হয়ে বসে আছ, আর আমি হাযারব ক'রে তোমাকে চারিদিকে খুঁজে বেড়াচ্ছি।'

আহ্লাদে সোমনাথ তাহার হাত চাপিয়া ধরিল।

'আমি ভুলে গিছলাম ভাই। কোত্থেকে আমার ঠিকানা পেলে?'

পাণ্ডুরঙ্ বলিল,—'কেউ কি তোমার ঠিকানা বলে? যাকে জিগ্যেস করি সেই গুম হয়ে যায়। শেষে এক মৎলব বের করলাম; ক্যাপ্টেন পেমের সেক্রেটারিকে বললাম, তুমি আমার কাছে টাকা ধার করে কেটে পড়েছ। তখন ঠিকানা পাওয়া গেল। যা হোক, পিলে তোমাকে বিস্তিপত্র শুঁকিয়েছে জানি। এখন সব কেচ্ছা খুলে বল।'

সোমনাথ তখন সেই আউট-ডোর শুটিং-এর দিন হইতে আগাগোড়া কাহিনী শুনাইল। পাণ্ডুরঙ্ ঘোর বাস্তবপন্থী লোক, সে দুঃখিতভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, 'ভুল করেছ বন্ধু, দেবীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করলেই ভাল করতে। তাতে চাকরি যেত না, বরং উন্নতি হ'ত।'

সোমনাথ বলিল,—'সে আমার দ্বারা হ'ত না পাণ্ডুরঙ্। তার চেয়ে চাকরি গেছে, মাথায় মিথ্যে কলঙ্ক চেপেছে এ বরং ভাল।

পাণ্ডুরঙ্ একটু ম্লান হাসিল,—'তুমি যে সুযোগ হেলায় ছেড়ে দিলে সেই সুযোগ পাবার জন্যে অনেক মিঞা জান্ কবুল করত। যেমন আমি। কিন্তু আমার পাথর-চাপা কপাল; আমাকে দেখলে দেবীদের হাসি পায়, প্রেম পায় না। কিন্তু সে যাক, এখন কি করবে ঠিক করেছ?'

'কিছুই ঠিক করিনি, চুপ করে বসে আছি।'

পাণ্ডুরঙ্ বলিল,—'আমিও তাই ভেবেছিলাম।—চল, আমার জানা কয়েকজন প্রডিউসার আছে, তাদের সঙ্গে দেখা করিয়ে দিই। তোমার চেহারা আছে, কাজ জুটে যাবেই।'

সোমনাথ কিছুক্ষণ পাণ্ডুরঙের পানে চাহিয়া রহিল—'তুমি প্রকাশ্য-ভাবে আমাকে সাহায্য করলে তোমার অনিষ্ট হবে না? পিলে সাহেব বা চন্দনা দেবী যদি জানতে পারেন—'

'জানতে তারা পারবেই, কারণ সিনেমার রাজ্যে হরদম রেডিও চলছে, কে কি করছে কিছুই অজানা থাকে না।'

'তবে? তুমি তাদের চাকরি কর—'

'চাকরি করি তো কী? আমার বন্ধুর বিপদের সময় তাকে সাহায্য করব না? এই যদি চাকরির সর্ত হয় তাহলে ঝাড়ু মারি আমি চাকরির মুখে।'

সোমনাথ মাথা নাড়িয়া বলিল,—'কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে—আমাকে সাহায্য করলে তোমার চাকরি যাবে পাণ্ডুরঙ্।'

পাণ্ডুরঙ্ তাহার পিঠ চাপড়াইয়া বলিল,—'ভাই, আমি সতেরো বছর বয়স থেকে সিনেমা করছি, অনেক ঘাটের জল খেয়েছি—আবার না হয় নতুন ঘাটের জল খাব। তাতে বান্দা ভয় পায় না। অবশ্য এ কথা ঠিক যে পিলের ষ্টুডিওতে সুখে আছি, লোকটা ছবি তৈরী করতে জানে। কিন্তু তাই ব'লে আমি তার কেনা গোলাম নই। নাও, চল তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়া যাক, সন্ধ্যে হ'য়ে গেলে আর প্রডিউসার সাহেবদের খুঁজে পাওয়া যাবে না।'

'খুঁজে পাওয়া যাবে না কেন?'

'তাঁরা তখন গুপ্ত বেহেস্তে গা-ঢাকা দেন। সব প্রডিউসারের একটি করে গোপন বেহেস্ত আছে কিনা। কিন্তু তুমি সাধু সন্নিসি মানুষ, এ সব বুঝবে না।'

দুই বন্ধু বাহির হইল। পাণ্ডুরঙ্ বলিল,—'একটা ট্যাক্সি ধরা যাক।'

সোমনাথ বলিল,—'কেন, ট্রামে বাসে যাওয়া চলবে না?'

পাণ্ডুরঙ্ বলিল,—'ভাই সোমনাথ, তোমাকে একটা উপদেশ দিই, মনে রেখো। সিনেমার বড় সাহেবদের সঙ্গে যখন দেখা করতে যাবে, ট্যাক্সিতে যাবে; নৈলে কদর থাকবে না।'

'তুমি বুঝি ট্যাক্সি ছাড়া চল না ?'

'হরগিস না। তাছাড়া ট্রামে-বাসে কি আমার চড়বার উপায় আছে ? গাড়ীশুদ্ধ লোক হাঁ ক'রে মুখের পানে চেয়ে থাকবে আর খিলখিল করে হাসবে। তোমারও ছবি বেরুক না, দেখবে তখন। রাস্তায় বেরুনো প্রাণান্তকর হয়ে উঠবে।'

একটা ট্যাক্সি ধরিয়া দু'জনে আরোহণ করিল ; পাণ্ডুরঙ্ একটি ষ্টুডিওর ঠিকানা দিল, ট্যাক্সি চলিতে লাগিল। সোমনাথ পাণ্ডুরঙ্‌কে সিগারেট দিয়া নিজে একটা ধরাইল, প্রশ্ন করিল,—'ছবি কতদিনে বেরুবে কিছু জানো ?

'ফাউন্টেন পেন বিজ্ঞাপন দিতে আরম্ভ করেছে। তার মানে মাস খানেকের মধ্যেই বেরুবে।

'বিজ্ঞাপন বেরুচ্ছে না কি ?'

'হাঁ, তবে এখন খুব বেশী নয়। ছবি বেরুবার হপ্তাখানেক আগে থেকে চেপে পাব্‌লিসিটি করবে। ফাউন্টেন পেন হুসিয়ার লোক, বাজে খরচ করে না।'

সোমনাথ একটু বিমনা হইল। বিজ্ঞাপনই চিত্রশিল্পীর জীবন। ছবির বিজ্ঞাপনে তাহার নাম কি ভাবে থাকিবে কে জানে ! ক্রমে ট্যাক্সি নির্দিষ্ট ষ্টুডিওতে আসিয়া পৌঁছিল। ভাগ্যক্রমেই হোক, বা ট্যাক্সির মাহাত্ম্যেই হোক, বেশীক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল না, ষ্টুডিওর কর্তা রুস্তমজি তাহাদের ডাকিয়া পাঠাইলেন। রুস্তমজি প্রবীণ বয়স্ক পার্সী, মাথায় ডাক-বাক্স টুপী, অনশনক্লিষ্ট গৃধ্রের মত মুখের ভাব, চোখদুটি অতিশয় ধূর্ত। ইনি চিত্রশিল্পের নির্বাক যুগ হইতে কর্ম করিতেছেন, প্রায় পঞ্চাশটি ছবির জন্মদান করিয়াছেন। যদিও তন্মধ্যে মাত্র গুটি পাঁচেক ছবি ভাল হইয়াছে, তবু বাজারে তাঁহার বেশ নাম-ডাক আছে।

রুস্তমজি প্রথম কিছুক্ষণ পাণ্ডুরঙের সহিত আদিরসাশ্রিত রসিকতা করিলেন, তারপর কাজের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

পাণ্ডুরঙ্ বলিল,—'ইনি আমার বন্ধু সোমনাথ, আমরা দু'জনে পিলের ছবিতে কাজ করেছি। ইনি হিরো ছিলেন। আপনার যদি হিরোর দরকার থাকে—'

ইতিমধ্যে রুস্তমজি তাঁহার ধূর্ত চোখ দিয়া সোমনাথকে বেশ ভাল করিয়া দেখিয়া লইয়াছিলেন, বলিলেন,—'চেহারা তো লা-জবাব। কাজও নিশ্চয় ভাল করেছেন ?'

পাণ্ডুরঙ বলিল,—'খুব ভাল কাজ করেছেন। যেমন চেহারা তেমনি কাজ—দুই পাল্লাই সমান ভারি।' রুস্তমজি বলিলেন,—'বটে ? তুমি জামিন হচ্চ ?' পাণ্ডুরঙ বলিল—'আলবৎ—জান জামিন ইমান জামিন। আমার সুপারিশ যদি মিথ্যে হয় ডালকুত্তা দিয়ে আমাকে খাওয়াবেন।'

রুস্তমজি হাসিলেন,—'পাণ্ডুরঙ্, তুমি মারাঠী তো ?'

'জি।'

'তবে এমন মোগলাই বচন-বিন্যাস শিখলে কোত্থেকে ? মারাঠী ভাইরা তো এমন চোস্ত-জবান হয় না।'

'হুজুর, তবে শুনুন, আমার খানদানি কেচ্ছা বলি।—পেশোয়াদের আমলে মারাঠারা একবার দিল্লী দখল করেছিল জানেন বোধ হয় ?'

'জানিনা, তবে হ'তে পারে। মারাঠীদের অসাধ্য কাজ নেই।'

'আমার পূর্বপুরুষ সেই মারাঠা পল্টনে ছিলেন। তিনি আর ফিরে এলেন না, দিল্লীতেই বসে গেলেন। সেই থেকে আমরা দিল্লীর বাসিন্দা।'

'বুঝেছি। তোমার বন্ধুও কি দিল্লীর বাসিন্দা ?'

'না, উনি বাঙালী।'

রুস্তমজি বলিলেন,—'মন্দ নয়। তুমি মারাঠী হয়ে দিল্লীর বাসিন্দা, উনি বাঙালী হয়ে বম্বের বাসিন্দা, আর আমি পার্সী হয়ে হিন্দুস্থানের বাসিন্দা। ভাল ভাল। কিন্তু উনি পিলের কাজ ছেড়ে দিলেন কেন ?' সোমনাথ ও পাণ্ডুরঙ দৃষ্টি বিনিময় করিল, এ প্রশ্নের উত্তর সাবধানে দেওয়া প্রয়োজন। সোমনাথ বলিল,—'মিঃ পিলের সঙ্গে আমার মাত্র তিন মাসের কনট্রাক্ট্ ছিল—'

রুস্তমজি প্রশ্ন করিলেন,—'পিলের অপ্‌শান ছিল না ?'

'ছিল।'

'তবে সে ছেড়ে দিলে যে বড় ?'

সোমনাথ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—'তাঁর সঙ্গে আমার একটু মনোমালিন্য হয়েছিল। কিন্তু কাজের সম্পর্কে নয়।

রুস্তমজি কিছুক্ষণ চক্ষু কুঞ্চিত করিয়া রহিলেন, তারপর বলিলেন,—'হুঁ। আপনার নাম ঠিকানা দিয়ে যান, যদি আমার দরকার হয় আপনাকে খবর দেব।—পাণ্ডুরঙ্, তুমি এখনও চন্দনার দিকে নজর দিচ্ছ না যে বড় ?' পাণ্ডুরঙ বলিল,—'চাকরি যাবে হুজুর।'

রুস্তমজি বলিলেন,—'তা বেশ তো। ফাউন্টেন পেন যদি তোমাকে তাড়িয়ে দেয়, সটান আমার কাছে চ'লে আসবে। আমি তোমাকে বেশী মাইনে দেব।'

পাণ্ডুরঙ হাত জোড় করিয়া বলিল, 'হুজুর মেহেরবান।' ষ্টুডিও হইতে বাহির হইয়া পাণ্ডুরঙ বলিল,—'বুড়ো ভারি ধড়িবাজ, ঠিক আন্দাজ করেছে চন্দনা-ঘটিত মনোমালিন্য ? পিলের কাছে তোমার সম্বন্ধে খুলুক সন্ধান নেবে।'

সোমনাথ বলিল,—'হুঁ। পিলে সাহেব বিশেষ ভাল সার্টিফিকেট দেবেন বলে মনে হয় না। এখানে কোনও আশা নেই পাণ্ডুরঙ্।'

পাণ্ডুরঙ বলিল,—'তা বলা যায় না। যাহোক, কাল পরশু আমি আবার তোমাকে নিয়ে বেরুব, আরও দু'একজনের কাছে নিয়ে যাব। একটা না একটা লেগে যাবেই।' তারপর কয়েকদিন ধরিয়া পাণ্ডুরঙ সোমনাথকে অনেকগুলি চিত্র-প্রণেতার কাছে লইয়া গেল। কিন্তু সকলের মুখেই এক কথা। চেহারা তো বেশ ভালই, কিন্তু পিলের চাকরি ছাড়লেন কেন ? নাম-ধাম রেখে যান, যদি দরকার হয় খবর দেব। সোমনাথের মনে হইল, কোনও অদৃশ্য শত্রু চারিদিকে প্রাচীর তুলিয়া তাহাকে বন্দী করিবার চেষ্টা করিতেছে, কোনও দিক দিয়াই বাহির হইবার পথ নাই।

একদিন বাড়ী ফিরিবার পথে সোমনাথ জিজ্ঞাসা করিল,—'আচ্ছা

[illegible]

হয়ে গেছি? তুমি কিছু শুনেছ?' পাণ্ডুরঙ বলিল,—'বড় সাংঘাতিক কথা বলেছে?'

'কি? চন্দনা সম্বন্ধে?'

'পাগল! ওরা জানে তাতে তোমার কোনও অনিষ্ট হবে না। সিনেমা রাজ্যে স্ত্রীলোক ঘটিত দুর্বলতা কেউ গ্রাহ্য করে না। ওরা রটিয়েছে যে তুমি মন দিয়ে কাজ কর না, আর অর্ধেক ছবি তৈরি হবার পর মোচড় দাও।'

'সে কি?'

'হ্যাঁ। এমন আর্টিষ্ট আছে যারা অর্ধেক ছবি তৈরি হবার পর বাড়ী গিয়ে বসে থাকে, বলে বেশী টাকা দাও তো কাজ করব—নৈলে করব না। এই ব'লে মোচড় দিয়ে বেশী টাকা আদায় করে। তারা জানে অর্ধেক ছবি তৈরি হয়ে গেছে, এখন তাকে বাদ দিয়ে নতুন ক'রে ছবি তৈরি করতে গেলে অনেক খরচ। তাই এ রকম আর্টিষ্টকে প্রডিউসারদের ভারি ভয়।'

'কিন্তু কন্ট্রাক্ট আছে যে!'

'থাকলই বা কন্ট্রাক্ট্। আর্টিষ্ট বলে, আদালতে যাও। আদালতে গেলে দু'বছরের ধাক্কা। ততদিন ছবি বন্ধ রাখলে প্রডিউসারের সর্বনাশ হয়ে যাবে; তার চেয়ে বেশী টাকা দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়া ভাল। তোমার নামে ওরা সেই অপবাদ দিয়েছে। ও অপবাদ যে আর্টিষ্টের হয়, তাকে কেউ কাঠি ক'রে ছোঁয় না।

সোমনাথ হতাশ স্বরে বলিল, 'তবে আর চেষ্টা করে লাভ কি পাণ্ডুরঙ? তার চেয়ে দেশে ফিরে যাই।'

পাণ্ডুরঙ সহজে হার মানে না, বলিল,—'আর কিছুদিন দেখা যাক। বদনাম দিলেই সকলে বিশ্বাস করে না। ছবিটা বেরুলে সুরাহা হ'তে পারে।'

পরদিন খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন বাহির হইল। ছোট বিজ্ঞাপন, তাহাতে কেবল ছবির নাম ও চন্দনার হাসিমুখ আছে। অন্য কাহারও উল্লেখ নাই। চন্দনা দেবী যে শীঘ্রই আসিতেছেন, এই খবরটি কেবল সাধারণকে জানানো হইয়াছে।

দিনের পর দিন বিজ্ঞাপন আকারে বাড়িতে লাগিল। চন্দনার নাম ছাড়াও ক্রমে প্রযোজকের নাম, পরিচালকের নাম, সঙ্গীত পরিচালকের নাম, অন্যান্য আর্টিষ্টদের নাম, এমন কি ষ্টুডিওর দরোয়ানটার পর্যন্ত নাম ছাপা হইল, কিন্তু সোমনাথের নাম কুত্রাপি দেখা গেল না। একদিন মহাসমারোহ করিয়া খবরের কাগজের অর্ধেক পৃষ্ঠা জুড়িয়া চিত্রের মুক্তির দিন বিঘোষিত হইল—আগামী শনিবার বম্বের বিখ্যাত 'রসিক' সিনেমায় ছবি মুক্তিলাভ করিবে।

সোমনাথের মনের অবস্থা অনুমান করা কঠিন নয়। সুখের লাগিয়া এঘর বাঁধিনু অনলে পুড়িয়া গেল। তাহার ভাগ্যলক্ষ্মী অকস্মাৎ কোন্ অশুভ মুহূর্তে তাহার প্রতি বিরূপ হইয়া বিপরীত মুখে যাত্রা সুরু করিলেন, কোনও কারণ দেখাইলেন না, ত্রুটির ছিদ্র অন্বেষণ করিলেন না, কিন্তু সোমনাথের জীবনে সকলি গরল হইয়া গেল। ইতিমধ্যে রত্নার চিঠি আসিল। ইংরেজিতে একটা কথা আছে, যখন বর্ষণ হয় তখন আকাশ ভাঙিয়া পড়ে। চিঠিখানা হাতে পাইয়া সোমনাথের মনে হইল, দুঃখের বরষায় সত্যই তাহার মাথায় আকাশ ভাঙিয়া জল ঝরিতেছে। রত্নার চিঠি দিদিকে লেখা। দিদি বোধ হয় চিঠির বক্তব্য সোমনাথকে মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিবেন না বলিয়া চিঠিখানি তাহার ঘরে রাখিয়া গিয়াছেন।

সোমনাথ চিঠি খুলিয়া পড়িল।

শ্রীচরণেষু, ভাই বৌদি, শুনে সুখী হবে আমি পাস করেছি। ফল খুব ভাল হয়নি, টায় টায় পাস। ভাবছি থার্ড ইয়ারে ভর্তি হব।

বম্বেতে তুমি আমাকে একটা প্রশ্ন করেছিলে, তার উত্তর না দিয়েই চলে এসেছিলাম। এখন দিচ্ছি। আমার মত নেই। সোমনাথবাবু যেপথে নেমেছেন সেপথে পতন অনিবার্য। তাছাড়া, যিনি বিয়ে করে বাইরের আক্রমণ থেকে চরিত্র রক্ষা করতে চান তাঁর চরিত্রকেও আমি শ্রদ্ধা করতে পারি না।

ভালবাসা নিও। ইতি

তোমাদের রত্না

রত্নার হাতের লেখা খুব সুন্দর, ছোট ছোট সুগঠিত অক্ষরগুলি মুক্তাশ্রেণীর মত পাশাপাশি সাজানো; কোথাও অপরিষ্কার নাই, কাটাকুটি নাই, দ্বিধা সংশয় নাই। রত্নার হস্তাক্ষর যেন তাহার চরিত্রের প্রতিবিম্ব।

তিক্ত অন্তরে সোমনাথ চিঠিখানি সরাইয়া রাখিয়া দিল। আর কতদিন এভাবে চলিবে? সংসারের অবহেলা ও অপমানের কি শেষ নাই?

২

শনিবার সন্ধ্যাবেলা সোমনাথ চোরের মত চুপি চুপি ছবি দেখিতে গেল। ষ্টুডিওর চেনা লোক পাছে তাহাকে দেখিয়া ফেলে এ সঙ্কোচও তাহার মনে ছিল, কিন্তু 'রসিক' সিনেমা আজ লোকে লোকারণ্য, চন্দনার নূতন ছবি দেখিবার জন্য সহস্রমুন্ড ভাঙিয়া পড়িয়াছে; সোমনাথের সহিত চেনা কাহারও দেখা হইল না। টিকিট বিক্রয় অবশ্য বহু পূর্বেই বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু ফুটপাথে কালাবাজারের কারবার চলিতেছিল। সোমনাথ দ্বিগুণ মূল্যে টিকিট কিনিয়া প্রেক্ষাগৃহে গিয়া বসিল।

ছবি আরম্ভ হইল। পরিচয় পত্রে মধুর বাদ্য-শিঞ্জন সহযোগে প্রথমেই চন্দনা দেবীর নাম, তারপর আর সকলে। অন্যান্য নটনটীর সহিত সোমনাথের নামটাও আছে বটে, কিন্তু সে-ই যে এই চিত্রের নায়ক তাহা বুঝিবার উপায় নাই।

কিন্তু ছবি দেখিতে দেখিতে সোমনাথ তন্ময় হইয়া গেল। গল্পের বিষয় বস্তুতে যত না হোক, তাহার প্রকাশভঙ্গীতে এমন একটি সরস মসৃণ নৈপুণ্য আছে যে দর্শকের মনকে সম্পূর্ণরূপে আকর্ষণ করিয়া লয় এবং শেষ পর্যন্ত দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিয়া রাখে।

চলিলেও চলে; সোমনাথের ভূমিকা আকারে ক্ষুদ্র হইলেও তাহার প্রিয়দর্শন আকৃতি ও সহজ অনাড়ম্বর অভিনয় মনের উপর দাগ কাটিয়া দেয়। দর্শকমণ্ডলী যে তাহাকে সমাদরের সহিত গ্রহণ করিয়াছে তাহাও তাহাদের আচরণ হইতে বারবার প্রকাশ পাইল। চিত্রদর্শী জনতার অনুরাগ বিরাগ প্রকাশ করিবার এমন একটি নিঃসংশয় ভঙ্গী আছে যাহা বুঝিতে তিলমাত্র বিলম্ব হয় না।

ছবি শেষ হইলে রাত্রি সাড়ে নয়টার সময় সোমনাথ অশান্ত হৃদয়ে বাড়ী ফিরিল। জামাইবাবু অফিসের কাজে দু'দিনের জন্য পুনা গিয়াছিলেন, দিদিও পুনা বেড়াইবার উদ্দেশ্যে সঙ্গে গিয়াছিলেন। সোমনাথ বাড়ীতে একা। শূন্য বাড়ীর ড্রয়িংরুমে সে একা বসিয়া রহিল। ভৃত্য আসিয়া আহারের তাগাদা দিল; সোমনাথের ক্ষুধা ছিল না, খাবার ঢাকা দিয়া রাখিতে বলিয়া সে আবার বিষণ্ণমনে ভাবিতে লাগিল।

এখন সে কী করিবে? ছবি উৎকৃষ্ট হইয়াছে, সম্ভবত এই একই চিত্রগৃহে বৎসরাধিক কাল চলিবে। সোমনাথের অভিনয় ভাল হইয়াছে, এমন কি তাহার অভিনয় চিত্রটিকে একটি বিশেষ মর্যাদা দিয়াছে একথাও বলা চলে। অথচ তাহার কৃতিত্বের প্রাপ্য পুরস্কার সে কিছুই পাইল না, অজ্ঞাতনামা হইয়া রহিল। যে খ্যাতি ও স্বীকৃতির উপর তাহার ভবিষ্যৎ জীবিকা নির্ভর করিতেছে তাহা হইতে সে বঞ্চিত হইল। এখন সে কী করিবে?

একটা প্রবল অসহিষ্ণুতায় তাহার অন্তর ছটফট করিয়া উঠিল। না, আর এখানে নয়, যথেষ্ট হইয়াছে। কালই সে দেশে ফিরিয়া যাইবে। সেখানে যা হইবার হইবে। বোম্বাই আর নয়, যথেষ্ট হইয়াছে।

এই সময় টিং টিং করিয়া টেলিফোন বাজিয়া উঠিল। এত রাত্রে কে টেলিফোন করে? সোমনাথ উঠিয়া গিয়া ফোন ধরিল।

'হ্যালো?'

একটি পরিচিত কণ্ঠস্বর হিন্দীতে প্রশ্ন করিল,—'সোমনাথবাবু বাড়ীতে আছেন কি?'

'আমিই সোমনাথ। আপনি কে?'

অপরিচিত ব্যক্তি উত্তর দিল না, টেলিফোন রাখিয়া দিল। কিছুক্ষণ বোকার মত দাঁড়াইয়া থাকিয়া সোমনাথ ক্লান্তভাবে ফিরিয়া আসিয়া বসিল। ইহা বোধ হয় বোম্বাই রসিকতা? কিন্তু রসিক ব্যক্তিটি কে? কণ্ঠস্বর পুরুষের, সুতরাং চন্দনা নয়। তবে কি পিলে সাহেব? কিন্তু তিনি এমন অর্থহীন রসিকতা করিবেন কেন? দশ মিনিট এইরূপ চিন্তায় কাণামাছির মত পাক খাইবার পর সোমনাথ শুনিতে পাইল, বাড়ীর সম্মুখে একটি মোটর আসিয়া থামিয়াছে। পরক্ষণেই সদর দরজার ঘণ্টি বাজিয়া উঠিল। সোমনাথ গিয়া দ্বার খুলিয়া দেখিল, ডাক-বাক্স টুপীপরা ধূর্ত চক্ষু বৃদ্ধ রুস্তমজি দাঁড়াইয়া আছেন।

রুস্তমজি বলিলেন,—'আমিই ফোন করেছিলাম।' সময় নষ্ট করিলেন না, বলিলেন,—'আপনার ছবি এইমাত্র দেখে এলাম। আমার ছবিতে আপনাকে হিরো সাজতে হবে। আমি হাজার টাকা মাইনে দেব।'

সোমনাথের মাথা ঘুরিয়া গেল। সে উত্তর দিতে পারিল না, ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল।

রুস্তমজি পকেট হইতে দশকেতা একশত টাকার নোট বাহির করিয়া সোমনাথের সম্মুখে রাখিলেন,—'এই নিন আপনার একমাসের মাইনে। আজ থেকে আপনি আমার কাজে বাহাল হলেন। আসুন, এই রসিদ দস্তখৎ করুন। পাকা কন্ট্রাক্ট পরে হবে।'

রুস্তমজি একটি ছাপা রসিদ ও ফাউন্টেন পেন সোমনাথের সম্মুখে ধরিলেন, সোমনাথ প্রায় অবশভাবে দস্তখত করিয়া দিল।

রুস্তমজি উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন,—'আজ আমি চললাম, রাত হয়েছে। কাল আপনি ষ্টুডিওতে যাবেন, তখন কথা হবে।'

দৃঢ়ভাবে সোমনাথের করমর্দন করিয়া রুস্তমজি বিদায় লইলেন।

সারা রাত্রি আনন্দে উত্তেজনায় সোমনাথের ঘুম হইল না। এ কী অভাবনীয় ব্যাপার! তাহার ভাগ্য-প্রদীপ চিরদিনের জন্য নিভিয়া গিয়াছে মনে করিয়া সে চারিদিক অন্ধকার দেখিতেছিল, এখন সেই প্রদীপ আবার দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল! ইহাকেই বলে পুরুষের ভাগ্য। রুস্তমজির আশা তো সে ছাড়িয়াই দিয়াছিল—কিন্তু বৃদ্ধ তাহাকে ভোলেন নাই। কী অদ্ভুত মানুষ! রাত্রি সাড়ে দশটার সময় নিজে আসিয়া টাকা দিয়া গেলেন! কিন্তু এত রাত্রে নিজে আসিলেন কেন? কাল সকালে একবার খবর পাঠাইলেই তো সোমনাথ কৃতার্থ হইয়া যাইত! মহাপ্রাণ ব্যক্তি এই রুস্তমজি।

শুধু মহাপ্রাণ নয়, রুস্তমজি যে অতি দূরদর্শী ব্যক্তি তাহা জানিতে সোমনাথের এখনও বাকি ছিল।

রাত্রি তিনটার সময় সে অনুভব করিল ক্ষুধায় তাহার পেট জ্বলিয়া যাইতেছে। মনে পড়িল রাত্রে আহার করিতে ভুল হইয়া গিয়াছে। তাড়াতাড়ি ভোজনকক্ষে গিয়া দেখিল তাহার খাবার ঢাকা দেওয়া রহিয়াছে। তখন পেট ভরিয়া আহার করিয়া সে তৃপ্তমনে শুইতে গেল।

পরদিন ভোর হইতে না হইতে পাণ্ডুরঙ্ আসিল, বলিল,—'কাল আসতে পারিনি। ছবি ভাল হয়েছে। তোমার কাজ দেখে সবাই মুগ্ধ। চল, আজ তোমায় ছবি দেখিয়ে আনি।'

সোমনাথ হাসিয়া বলিল,—'ছবি আমি দেখেছি।' বলিয়া গত রাত্রির সমস্ত বিবরণ বলিল।

পাণ্ডুরঙ্ বলিল, 'আরে, ভারি ঘাগী বুড়ো তো! পাছে আর কেউ কন্ট্রাক্ট করিয়ে নেয়, তাই রাত্তিরেই এসেছে। তুমি এক হাজারে রাজি হয়ে গেলে? দম দিলে বুড়ো দু'হাজারে উঠ্‌তো।'

সোমনাথ বলিল,—'না না, এক হাজারই যথেষ্ট, তার বেশী কে দেবে পাণ্ডুরঙ্?'

ছিল। আমরা যখন ঘোরে ঘোরে ঘুরে বেড়িয়েছি তখন কেউ গ্রাহ্যই করেনি। এইবার ভাখো না—সবাইকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাব।'

'আরে নাকে দড়ি বেঁধে কি ক'রে—টাকা যে নিয়ে ফেলেছি।'

'হুঁ—কাজটা ভাল করনি। যাহোক একটা কথা বলে রাখি, লম্বা কন্ট্রাক্ট কোরো না, একটা ছবির কন্ট্রাক্ট কোরো, বড় জোর দুটো। তোমার এখন সিতারা বুলন্দ্, টাকা রোজগারের মরসুম—এখন যদি বুড়ো রুসি-বাবার কাঁদে পড়ে যাও, তাহলে ঐ এক হাজার টাকাতেই জীবন কাটাতে হবে।'

পাণ্ডুরঙ্ নিঃস্বার্থ বন্ধু, তাহার কথা সোমনাথের মনে ধরিল। কিন্তু তবু, তাহার ঘোরতর দুঃসময়ে রুস্তমজিই আসিয়া প্রথম আশার আলো জ্বালিয়াছিলেন তাহাও সে ভুলিতে পারিল না।

পাণ্ডুরঙ্ চলিয়া গেলে সোমনাথ পর পর গোটা তিনেক টেলিফোন কল্ পাইল। সকলেই চিত্র-প্রণেতা, সকলেই মধুক্ষরিত কণ্ঠে তাহাকে ষ্টুডিওতে গিয়া তাঁহাদের সহিত দেখা করিতে অনুরোধ করিলেন; একজন এমন আভাসও দিলেন যে তিনি চুক্তিপত্র হাতে লইয়া বসিয়া আছেন, সোমনাথ গিয়া তাহাতে বেতনের অঙ্কটি বসাইয়া দিবে। কিন্তু সোমনাথ সকলকে সবিনয়ে জানাইল যে সে পূর্বেই চুক্তিবদ্ধ হইয়াছে, তাঁহারা যেন তাহাকে ক্ষমা করেন। সকলেই অত্যন্ত বিমর্ষ হইলেন এবং বারম্বার অনুরোধ জানাইলেন সোমনাথ যেন মুক্তি পাইলেই তাঁহাদের স্মরণ করে।

সোমনাথ বুঝিল তাহার কপাল খুলিয়াছে। এমন রাতারাতি কপাল খোলা সিনেমা ছাড়া আর কোনও ক্ষেত্রে হয়না।

স্নানাহার সারিয়া সোমনাথ বাহির হইল। প্রথমেই ব্যাঙ্কে গিয়া টাকাগুলি জমা দিতে হইবে। সোমনাথ কলিকাতায় যে ব্যাঙ্কে কাজ করিত সেই ব্যাঙ্কের একটি শাখা বম্বেতে ছিল, সোমনাথ পূর্ব-সম্পর্কের মমতায় সেই ব্যাঙ্কেই টাকা রাখিয়াছিল।

টাকা ব্যাঙ্কে জমা দিয়া সোমনাথ রুস্তমজির ষ্টুডিওতে গেল। পাণ্ডুরঙের উপদেশ তাহার মনে ছিল, সে ট্যাক্সি চড়িয়া গেল।

রুস্তমজি আদর করিয়া তাহাকে কাছে বসাইলেন, বলিলেন—'আমি তোমার চেয়ে বয়সে অনেক বড়, তুমি আমাকে রুসি-বাবা বলে ডেকো। এখানে সবাই তাই বলে। আমার স্ত্রীপুত্র কেউ নেই, সব মরে গেছে; ষ্টুডিওর ছেলেরাই আমার ছেলে।'

সোমনাথ বলিল—'যে আজ্ঞে।'

রুস্তমজি তখন বলিলেন—'ভাখো সোমনাথ, আমি ত্রিশ বছর সিনেমা করছি, ভুরু দেখে মানুষ চিনতে পারি। তোমাকে দেখে আমি বুঝেছি তুমি বড় ভাল ছেলে। কিন্তু শুধু ভালমানুষ হলেই চলে না; সিনেমায় হিরো হ'তে গেলে ঠাট্ চাই। তুমি একটা মোটর কিনে ফ্যালো।'

'সোমনাথ অবাক হইয়া বলিল,—'মোটর? কিন্তু আমার তো মোটর কেনার টাকা নেই। আজকাল নতুন মোটর কিনতে গেলে—'

রুসিবাবা বলিলেন—'নতুন মোটর কেনবার দরকার নেই, পুরোনো হলেও চলবে।'

সোমনাথ বলিল,—'কিন্তু পুরোনো মোটরই বা কোথায় পাব?'

'সে জন্যে তোমায় ভাবতে হবে না, আমি যোগাড় করে দেব। আমার জানা একটি সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড মোটর আছে, ভাল অবস্থায় আছে, অষ্টিন টেন। আমি শস্তায় তোমায় কিনিয়ে দেব।'

সোমনাথ বিব্রত হইয়া বলিল—কিন্তু মোটর কেনা কি নিতান্তই দরকার?'

রুস্তমজি বলিলেন,—'দরকার। আমার ষ্টুডিওতে যে-কেউ সাতশো টাকার বেশী মাইনে পায় তাকেই আমি মোটর কিনিয়ে দিয়েছি। ওতে ষ্টুডিওর ইজ্জত বাড়ে; তা ছাড়া, যার গাড়ী আছে তাকে পুলিসেও খাতির করে। তুমি ভেবো না। খুব শস্তায় গাড়ী পাবে; হাজার খানেকের মধ্যে। তাও নগদ টাকা দিতে হবে না, আমি মাসে মাসে তোমার মাইনে থেকে কেটে নেব। তুমি জানতেও পারবে না।'

সোমনাথ আর না বলিতে পারিল না, রাজি হইল। রুস্তমজি তখন চুক্তিপত্রের খসড়া বাহির করিয়া সোমনাথকে দিলেন, বলিলেন—'একবার চোখ বুলিয়ে নাও, যদিও আপত্তি করার কিছু নেই।'

সোমনাথ পড়িয়া দেখিল, হাজার টাকা মাহিনায় পাঁচ বছরের চুক্তি, মাহিনা বাড়ার কোনও সর্ত নাই। পাণ্ডুরঙ তাহাকে পূর্বেই মন্ত্র দিয়াছিল, সে বাঁকিয়া বসিল,—'আমি একটা ছবির জন্য কন্ট্রাক্ট করতে পারি, তার বেশী নয়।'

রুস্তমজি বোধ হয় মনে মনে আপত্তির জন্য প্রস্তুত ছিলেন, তিনি সোমনাথকে বুঝাইতে আরম্ভ করিলেন। নূতন অভিনেতার পক্ষে পাঁচ বছরের চুক্তি যে কতদূর ভাগ্যের কথা, যে শিল্পী দীর্ঘ চুক্তি করিয়া নিজের ভবিষ্যৎ পাকা এবং নিরুদ্বেগ করিয়া লইতে চায় না তাহার ভাগ্য বিপর্যয় যে কিরূপ অবশ্যম্ভাবী, রুস্তমজি তাহা মসৃণ বাক্পটুতার সহিত প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিলেন।

সোমনাথ কিন্তু ভিজিল না। তাহার এখন সিতারা বুলন্দ্, সে পাঁচ বছরের জন্য জীবন বন্ধক রাখিতে প্রস্তুত নয়। শিল্পীর জীবনে পাঁচ বৎসর যে অতি দীর্ঘ সময়, অনেক অভিনেতার শিল্পী-জীবন পাঁচ বৎসরের মধ্যেই শেষ হইয়া যায় তাহা তাহার অজানা ছিল না। ত্রিশ বছর বয়সের পর যাহারা নবীন হিরো সাজে তাহারা শিং ভাঙিয়া বাছুরের দলে ঢুকিবার চেষ্টা করে এবং হাস্যাস্পদ হয়; সুতরাং বেলা থাকিতে থাকিতে ভবিষ্যতের সংস্থান করিয়া লইয়া আলোয় আলোয় বিদায় লওয়া ভাল।

অনেক ধস্তাধস্তির পর স্থির হইল, সোমনাথ এক হাজার টাকা মাহিনায় রুস্তমজির দুইটি ছবিতে হিরোর কাজ করিবে; তবে এই দুইটি ছবির কাজ যতদিন শেষ না হয় ততদিন সে অন্যত্র কাজ করিতে পারিবে না।

নূতন চুক্তিপত্র তখনই ছাপা হইয়া আসিল। সোমনাথ তাহাতে সহি করিয়া দিল। রুস্তমজি তাহার পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন—

'সোমনাথ, তোমাকে যতটা গোবেচারি ভেবেছিলাম তুমি তা নও। যাহোক, এ ভালই হল, তুমিও খুশী হলে—আমিও খুশী হলাম।

এবার মন দিয়ে কাজে লাগতে হবে।'

সোমনাথ জিজ্ঞাসা করিল,—'কাজ আরম্ভ হবে কবে?'

'মাস খানেকের মধ্যেই। আর সব ঠিক আছে, কেবল গল্পটা নিয়ে একটু গোলমাল চলছে।

'গল্প লিখেছেন কে?

'একজন বাঙালী। নাম জানো কি? ইন্দু রায়।'

সোমনাথ লাফাইয়া উঠিল। ইন্দু রায়। ইন্দু রায়ের নাম শিক্ষিত বাঙালী কে না জানে? সোমনাথ তাঁহার লেখার প্রগাঢ় ভক্ত। সে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

'তিনি কি বোম্বাইয়ে থাকেন?'

'হ্যাঁ, প্রায়ই ষ্টুডিওতে আসেন। লেখক তো ভালই, কিন্তু বড় একগুঁয়ে। ক্রমে সকলের সঙ্গেই তোমার পরিচয় হবে।'

কাজ আরম্ভ না হইলেও সোমনাথ প্রত্যহ ষ্টুডিওতে যাতায়াত করিতে লাগিল। রুস্তমজি প্রায়ই তাহাকে নিজের অফিস ঘরে ডাকিয়া গল্প গুজব করেন; বৃদ্ধের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠতা বেশ গাঢ় হইয়া উঠিল। ষ্টুডিওর কয়েকজন বিশিষ্ট কর্মচারীর সহিতও আলাপ হইল।

দিগম্বর শম্ভুলিঙ্গম্ ষ্টুডিওর খাজাঞ্চি ও হিসাবনবিশ। ইনি মাদ্রাজদেশীয়, সুতরাং অর্থনৈতিক ব্যাপারে অতিশয় পোক্ত। কিন্তু জন্মাবধি তেঁতুল গোলা রসম খাইয়াই বোধকরি শম্ভুলিঙ্গ মহাশয়ের অন্তর বাহির একেবারে টকিয়া গিয়াছিল এমন কি তাঁহার চেহারাটাও তিন্তিড়ি ফলের ন্যায় বক্র ভাব ধারণ করিয়াছিল। সোমনাথের সহিত প্রথম আলাপে তিনি নিশ্বাস ফেলিয়া বলিয়াছিলেন,—'আপনি ভাগ্যবান লোক, এই বয়সেই হাজার টাকা মাইনে পেয়ে গেলেন। আর আমি এগারো বছর কাজ করছি—আমার মাইনে ছ'শো টাকা। যাক—সবই ভাগ্য। আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।'

শম্ভুলিঙ্গ প্রসঙ্গে রুস্তমজি একদিন হাসিয়া বলিয়াছিলেন,—'শম্ভুলিঙ্গ খাঁটি লোক, পরের পয়সা ওর কাছে হারাম। কিন্তু লোকটা সুখী হবার ফন্দি জানে না। ওকে যদি গলা টিপে ছ'পেগ্ মদ গিলিয়ে দিতে পারতাম তাহলে হয়তো—'

কিন্তু মদও শম্ভুলিঙ্গের কাছে পরধনের মতই অমেধ্য, তাই তাঁহাকে সুখী করা মানুষের সাধ্য নয়।

ইহার ঠিক বিপরীত চরিত্র—চক্রধর রায়। লোকটি লাহোরের পাঞ্জাবী, চিত্র-পরিচালক বলিয়া নিজের পরিচয় দিয়া থাকে। রুস্তমজির সাম্প্রতিক কয়েকটি চিত্র পরিচালনা করিয়াছে। এমন দাম্ভিক ও আত্ম-প্রসন্ন ব্যক্তি কম দেখা যায়। লোকটির চেহারা যেমন বাদশাহী আমলের মিনার গম্বুজ দিয়া তৈয়ার মনে হয়, অন্তরও তেমনি দম্ভ ও আত্মম্ভরিতার স্তম্ভের উপর উদ্ধতভাবে দাঁড়াইয়া আছে। নিজের প্রশংসা ও পরের নিন্দা ছাড়া তাহার মুখে অন্য কথা নাই। শিষ্ট সমাজে এরূপ ব্যক্তি একদণ্ডের জন্যেও আমল পাইত না; কিন্তু সিনেমা-রাজ্যে নিজের ঢাক যে যত জোরে পিটাইতে পারে তাহার কদর তত বেশী। তাই চক্রধর রায় একজন গুণী ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল।

প্রথম পরিচয়েই সোমনাথ বুঝিয়াছিল চক্রধর রায়ের সহিত তাহার পোট হইবে না। চক্রধরই পরবর্তী ছবি পরিচালনা করিবে জানিয়া সে একটু অস্বস্তি অনুভব করিয়াছিল। এরূপ প্রকৃতির লোকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করিতে গেলে ঠোকাঠুকি অবশ্যম্ভাবী। অথচ রুস্তমজি চক্রধর সম্বন্ধে ওই ধারণা পোষণ করেন বলিয়াই মনে হয়। এরূপ অবস্থায় 'যা হইবার হইবে' ভাবিয়া সোমনাথ মনের অস্বাচ্ছন্দ্য দমন করিয়া রাখিয়াছিল।

তৃতীয় যে ব্যক্তির সহিত সোমনাথের পরিচয় হইল তিনি লেখক ইন্দু রায়। সোমনাথ লক্ষ্য করিয়াছিল, একটি কোটপ্যান্ট-পরা মধ্য-বয়স্ক ভদ্রলোক মাঝে মাঝে আসিয়া ষ্টুডিওর ওয়েটিং রুমে বসিয়া থাকেন, তারপর রুস্তমজির সহিত দেখা করিয়া চলিয়া যান। তাঁহাকে একটু কড়া মেজাজের লোক বলিয়া মনে হয়; কাহারও সহিত যাচিয়া কথা বলেন না, বরং নিজের চারিপাশে স্বতন্ত্রতার এমন একটি দৃঢ় গণ্ডী কাটিয়া রাখেন যে সহজে কেহ তাঁহার দিকে ঘেঁষিতে পারে না।

ইনি যে বাঙালী, তাহাই সোমনাথ প্রথমে বুঝিতে পারে নাই। যখন জানিতে পারিল ইনিই ইন্দু রায়, তখন সাগ্রহে গিয়া তাঁহার সহিত আলাপ করিল। ইন্দুবাবু প্রথমে একটু গম্ভীর হইয়া রহিলেন; তারপর ধীরে ধীরে তাঁহার ছিপি-আঁটা মন উন্মোচিত হইতে লাগিল। সোমনাথ দেখিল, ইন্দুবাবু আসলে বেশ মিশুক ও রসিক লোক, কিন্তু কোনও কারণে নিজেকে তিনি সম্বরণ করিয়া রাখিয়াছেন। হয়তো মন খুলিয়া কথা বলিবার মতো লোক পান না বলিয়াই এরূপ হইয়াছে।

সোমনাথ উৎসাহভরে বলিল,—'আপনার লেখা আমার বড় ভাল লাগে। এমন সহজ মাধুর্যপূর্ণ বলিষ্ঠতা আর কারুর লেখায় দেখতে পাই না।'

ইন্দুবাবু ভ্রূ তুলিয়া কিছুক্ষণ সোমনাথকে নিরীক্ষণ করিলেন, তারপর ব্যঙ্গ-মন্থর কণ্ঠে বলিলেন,—'আমি পাঁচ বছর বোম্বাইয়ে আছি, কিন্তু এ ধরণের কথা কারুর মুখে শুনিনি। আপনি তাহলে বাংলা বই পড়েন।'

সোমনাথ বলিল—'আপনার সব বই পড়েছি।'

ইন্দুবাবু বলিলেন—'ভাল করেন নি। বোম্বাইয়ের প্রডিউসারেরা যদি জানতে পারে আপনি বই পড়েন, তাহলে আপনার নামে ঢ্যাড়া পড়বে।'

এই বক্রোক্তিটুকুর ভিতর দিয়া সোমনাথ ইন্দুবাবুর মানসিক অবস্থার পরিচয় পাইল। সেই যে কোন্ গুণী ওস্তাদ বড় মানুষের বাড়ীতে গান গাহিতে গিয়া 'নাকেড়া' গাহিবার ফরমাস পাইয়াছিল, ইন্দুবাবুর অবস্থা অনেকটা তাহার মতো। জেড়ায় নিংড়ে পড়িলে হীরার ধার ভাঙিয়া যায়, একদল অশিক্ষিত হস্তিমূর্খের মাঝখানে পড়িয়া ইন্দুবাবুরও অপে দুর্গতি হইয়াছে।

তাঁহার অন্তরের তিক্ততা কিয়ৎ পরিমাণে দূর করিবার জন্য সোমনাথ

বলিল,—'সিনেমা-শিল্প এখনও সাহিত্যের কদর জানেনা তা সত্যি। ক্রমে জানবে বোধহয়। কিন্তু আমি আপনার গল্পে কাজ করতে পাব ভেবে ভারি আনন্দ হচ্ছে।'

ইন্দুবাবু বলিলেন—'আনন্দটা বোধহয় বাজে খরচ করলেন।'

সোমনাথ চকিত হইয়া বলিল,—'কেন? আমি তো শুনেছি আপনার গল্পই এবার হবে!'

ইন্দুবাবু বলিলেন,—আমার গল্প এরা কিনেছে বটে কিন্তু কিনেই তাকে বেয়াদব করবার জন্যে উঠে-পড়ে লেগেছে। সুতরাং আমার গল্প শেষ পর্য্যন্ত কতখানি থাকবে তা বলতে পারি না।

এই সময় চাকর আসিয়া ইন্দুবাবুকে রুস্তমজির ঘরে ডাকিয়া লইয়া গেল। সোমনাথ একাকী বসিয়া ভাবিতে লাগিল, ইন্দুবাবুর লেখার উপর কলম চালাইতে পারে এমন প্রতিভাবান ব্যক্তি এখানে কে আছে?

রুস্তমজি? চক্রধর রায়? সোমনাথ মনে মনে স্থির করিল, সুবিধা পাইলে সে এইরূপ আত্মঘাতী ধৃষ্টতার প্রতিরোধ করিবে।

কয়েকদিন কাটিয়া গেল; ছবি আরম্ভ করিবার দিন আগাইয়া আসিতেছে। সোমনাথ টের পাইল, গল্প লইয়া ভিতরে ভিতরে একটা গণ্ডগোল পাকাইয়া উঠিতেছে। একদিন দুপুরবেলা সে রুস্তমজির ঘরে অনাহূত প্রবেশ করিয়া দেখিল, রুস্তমজি, চক্রধর রায় ও ইন্দুবাবু বসিয়া আছেন। গল্প সম্বন্ধে আলোচনা হইতেছে; ঘরের আবহাওয়া বেশ উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। সোমনাথ চলিয়া যাইতেছিল, রুস্তমজি তাহাকে ফিরিয়া ডাকিলেন—'এসো সোমনাথ তুমিও শোনো।'

সোমনাথ একটু দূরে বসিল। ইন্দুবাবু যে বেশ উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছেন তাহা তাঁহার মুখ দেখিয়াই বোঝা যায়, তবু তিনি সংযত-ভাবেই কথা বলিতেছেন—'নায়ক নায়িকার ডুয়েট্ গান বাস্তব জগতে অসম্ভব হ'লেও নাটকে যে তা মানানসই করে জানানো যায় একথা আমি অস্বীকার করিনা। কিন্তু আমার এ গল্প সে-ধরণের নয়। আমার নায়ক নায়িকা দুজনেই গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ। তাদের দিয়ে ডুয়েট গাওয়ানো অসম্ভব। মাফ করবেন, সে আমি পারব না।'

চক্রধর রায় মাতব্বরি ভাবে বলিল,—'ঐ তো আপনাদের দোষ, সিনেমার কিছুই বোঝেন না, অথচ তর্ক করেন।'

ইন্দু রায় তীক্ষ্ণ স্বরে বলিলেন,—'আপনি আমার চেয়ে সিনেমা বেশী বোঝেন তার কোনও প্রমাণ নেই।' আলোচনা ক্রমশ ঝগড়ায় পরিণত হইবার উপক্রম করিল। সোমনাথ বড় অস্বস্তি অনুভব করিতে লাগিল। শেষে রুস্তমজি তর্কে বাধা দিয়া বলিলেন, 'দেখুন ইন্দুবাবু, আপনি যা আপনার দিক থেকে বলছেন, তা সত্যি হতে পারে কিন্তু সিনেমার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে আমি দেখেছি ডুয়েট না থাকলে ছবি চলে না।'

ইন্দুবাবু বলিলেন—'ডুয়েট থাকলেও অনেক সময় ছবি চলে না দেখা গেছে।'

চক্রধর বলিল,—'সে অন্য কারণে। ছবি তৈরি করবার সময় আমাদের দেখতে হবে পাব্লিক কি চায়। আমাদের দেশের পাব্লিকের বুদ্ধি দশ বছরের ছেলের সমান। সেই হিসেব করে আমাদের ছবি তৈরি করতে হয়।'

ইন্দুবাবু বলিলেন,—'পাব্লিকের বুদ্ধি দশ বছরের ছেলের সমান এ বিশ্বাস যদি আমার থাকত, তাহলে আর কিছু না লিখে শিশু-সাহিত্য লিখতাম এবং আপনাদেরও উচিত ছেলে-ভুলোনো রূপকথা নিয়ে ছবি তৈরি করা।'

চক্রধর বলিল,—'ওসব বাজে কথা। আপনি গল্পের মধ্যে ডুয়েট রাখবেন কিনা বলুন। অন্তত দু'টো ডুয়েট আমার চাইই।'

ইন্দুবাবু রুস্তমজিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—'দেখুন, গল্প আপনি কিনেছেন, গল্পের চিত্রস্বত্ব এখন আপনার। আপনার পাঁঠা আপনি ইচ্ছে করলে ল্যাজের দিকে কাটতে পারেন, আমার কিছু বলবার নেই। কিন্তু ও কাজ আমাকে দিয়ে হবে না।' বলিয়া একরকম রাগ করিয়াই তিনি চলিয়া গেলেন।

চক্রধর কিছুক্ষণ ধরিয়া গল্প-লেখক সম্প্রদায়ের বুদ্ধিহীন একগুঁয়েমি সম্বন্ধে গজ্ গজ্ করিয়া শেষে বলিল—'নতুন আইডিয়া গ্রহণ করবার ক্ষমতাই ওদের নেই। আমি মুন্সি বিস্মিল্লাকে ডেকে পাঠাচ্ছি, সে হুঁসিয়ার লোক, যা বলব তাই লিখে দেবে।'

রুস্তমজি বলিলেন,—'তাই করতে হবে দেখছি। ইন্দুবাবু এমন অবুঝ লোক জানলে ওঁর গল্প আমি নিতাম না। যাহোক, হটোপাটি করলে চলবে না, একটু ভেবে দেখি।'

চক্রধর উঠিয়া গেলে রুস্তমজি সোমনাথকে বলিলেন,—'তুমি তো সব শুনলে। কি মনে হ'ল?'

সোমনাথ বলিল,—'গল্প না শুনে আমি কিছু বলতে পারি না।'

রুস্তমজি বলিলেন,—'বেশ তো। গল্প এই রয়েছে, তুমি আজ বাড়ী নিয়ে যাও। ভাল ক'রে প'ড়ে কাল এসে তোমার মতামত আমায় বলবে। তুমি যখন ছবির নায়ক, তখন তোমার মতটাও জানা ভাল।'

টাইপ-করা চিত্রনাট্যের ফাইল রুস্তমজি তাহাকে দিলেন। ফাইল লইয়া সোমনাথ বাড়ী গেল!

চিত্রনাট্যটি ইংরেজিতে লেখা, কারণ এখানে বাংলা কেহ বোঝে না। সংলাপগুলিও ইংরেজিতে, যথাসময় হিন্দীতে অনূদিত হইবে। তবু সোমনাথ পাঠ করিয়া মুগ্ধ হইয়া গেল। ইংরেজিতে লেখার জন্য ইন্দুবাবুর স্বভাবসিদ্ধ সাবলীলতা কিছু ক্ষুণ্ণ হইয়াছে বটে, কিন্তু আখ্যান-বস্তু চমৎকার। একেবারে নূতন ধরণের গল্প। একটি বেকার যুবক কি করিয়া সংসারের সহিত যুদ্ধ করিয়া শেষে প্রতিষ্ঠা লাভ করিল এই লইয়া কাহিনী। প্রেমের কথাও আছে বটে—কিন্তু তাহা অন্তঃসলিলা, কোথাও হ্যাব্লামি নাই, ডুয়েট গাহিয়া বা ভাঁড়ামি করিয়া নিরন্তরের রসসৃষ্টির চেষ্টা নাই। কিন্তু তবু পদে পদে পর পর ঘটনার সংঘাতে বহু বিচিত্র চরিত্রের সংঘর্ষে নাটকীয় রস জমাট বাঁধিয়া উঠিয়াছে।

পড়িয়া সোমনাথ উত্তেজিত হইয়া উঠিল। এই গল্প উহারা অদল-বদল করিতে চায়? ডুয়েট-গান ঢুকাইয়া খেলো করিতে চায়?

কখনই সে তাহা হইতে দিবে না। এজন্য রুস্তমজির সহিত ঝগড়া হইয়া যায় সেও ভাল।

পরদিন একটু সকাল-সকাল সোমনাথ স্টুডিওতে গেল। দেখিল, রুস্তমজি তখনও আসেন নাই বটে, কিন্তু ইন্দুবাবু আসিয়া বসিয়া আছেন। তাহাকে দেখিয়া ইন্দুবাবু বলিলেন,—'এই যে, কাল তো আপনি ছিলেন, সবই শুনেছেন। আজ আমি একটা হেস্ত-নেস্ত করব বলে এসেছি।'

'কিসের হেস্ত-নেস্ত?'

'আমি ভেবে দেখলাম, ওরা যদি অদল বদল করতে চায় আমি গল্প দেব না। টাকা এনেছি গল্প ফেরৎ নেব।'

সোমনাথ বলিল—'আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আগে আমি রুস্তমজির সঙ্গে দেখা করি, তারপর আপনি যা ইচ্ছে করবেন।'

ইন্দুবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—'কেন?'

সোমনাথ বলিল,—'আমি আপনার গল্প পড়েছি, আমার খুব ভাল লেগেছে। রুস্তমজি আমার মতামত জানবার জন্যে গল্প আমাকে পড়তে দিয়েছিলেন। আমি প্রাণপণে চেষ্টা করব যাতে গল্প অদল-বদল না হয়।

ইন্দুবাবু কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন,—'আপনি চেষ্টা করতে চান করুন, কিন্তু ভস্মে ঘি ঢালা হবে। ঐ ব্যাটা চক্রধর রায় চক্কর ধ'রে বসে আছে, কাছে গেলেই ছোবল মারবে।'

'দেখা যাক।'

রুস্তমজির আসিতে দেরী হইতেছে, তাই দুজনে বসিয়া একথা সেকথা আলোচনা করিতে লাগিলেন। কথাপ্রসঙ্গে ইন্দুবাবু নিজের সিনেমাক্ষেত্রে আগমনের কাহিনী বলিলেন—'কথায় বলে, খাচ্ছিল তাঁতি তাঁত বুনে, কাল করলে এঁড়ে গরু কিনে। আমার হয়েছে তাই। বেশ ছিলাম সাহিত্য নিয়ে, হঠাৎ বোম্বাইয়ের এক নামজাদা ফিল্ম কোম্পানী ডেকে পাঠালো ফিল্মের গল্প লেখার জন্যে। নাটকের দিকে আমার বরাবরই ঝোঁক—খুব মেতে উঠলাম। ভাবলাম এতদিনে একটা কাজের মত কাজ পেয়েছি; সিনেমা শিল্পকে উন্নত করে তুলব, ভদ্রলোকের পাতে দেবার যোগ্য করে তুলব। সব ছেড়ে দিয়ে বোম্বাই চলে এলাম। 'যে কোম্পানী আমাকে এনেছিল তাদের অবস্থা তখন টলমল করছে; পর পর চারখানি ছবি মার খেয়েছে, এবার মার খেলেই কোম্পানী লাটে উঠবে। প্রযোজক মহাশয়ের অবস্থা অতি করুণ। যাহোক আমি তো গল্প লিখলাম। প্রযোজক মহাশয় অবশ্য গল্পটি সর্বাংশে পছন্দ করলেন না; কিন্তু বারবার ঘা খেয়ে তাঁর সারা গায়ে দরকচা, আমার গল্পে তিনি কলম চালাতে সাহস করলেন না। গল্প যেমন ছিল তেমনি ছবি হল।

'ছবিখানা উৎরে গেল—রৈ রৈ করে চলতে লাগল। কোম্পানীও দাঁড়িয়ে গেল। ব্যস্, আর যায় কোথায়! প্রযোজক মহাশয় মনে করলেন সব কৃতিত্ব তাঁরই। আশ্চর্য মানুষের আত্মপ্রতারণার ক্ষমতা। এতদিন যিনি কেঁচো হয়ে ছিলেন, তাঁর আর মাটিতে পা পড়ে না। আমার দ্বিতীয় গল্প তিনি কেটেকুটে একেবারে শতছিন্ন ক'রে দিলেন।... লোকটা নির্বোধ নয়, বিষয়বুদ্ধি খুবই তীক্ষ্ণ; কিন্তু বিষয়বুদ্ধি আর সৃষ্টি-হ'তে পারত। ছবি যখন বেরুলো তখন লোকে আমাকেই গালাগাল দিতে লাগল। ছবি সাত দিনও চলল না। আমি রাগ করে চাকরি ছেড়ে দিলাম।

'তার পর থেকে ফ্রি লান্সিং করছি, ছবির বাজারে গল্প বিক্রি করি। কিন্তু অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। যিনিই গল্প কিনুন, তিনিই চান গল্পকে মেরামৎ করতে। যাঁর রসবোধ যত কম, মেরামৎ করবার বাতিক তাঁর তত বেশী। অথচ ছবি খারাপ হলে—ধেড়ে ব্যাটাকে ধর্, সব দোষ গল্প-লেখকের। গত পাঁচ বছরে আমার সাতখানা গল্প ছবি হয়েছে, কিন্তু তার একখানাও পাতে দেবার মতো হয়নি। মেরামৎ করে সবাই আমার গল্পের দফারফা করে দিয়েছে।

'একেই বলে চোরা গরুর দায়ে কপিলের বন্ধন; বাজারে বদনাম হয়ে যাচ্ছে—আমার গল্প চলে না। তাই ঠিক করেছি আর কাউকে গল্প বদ্‌লাতে দেব না। চুক্তিপত্রে সর্ত থাকবে—কেউ একটা কথা বদলাতে পাবেনা। এতে আমার গল্প বিক্রি হয় ভাল, না হয় পাততাড়ি গুটিয়ে দেশে ফিরে যাব।'

* * * *

লাঞ্চের পর রুস্তমজি স্টুডিওতে আসিলেন। প্রবীণ ব্যবসায়ীদের মুখ দেখিয়া তাঁহাদের মনের অবস্থা বড় একটা ধরা যায় না; রুস্তমজির মেজাজ যে বিশেষ কোনও কারণে ভিতরে ভিতরে অগ্নিবৎ হইয়া আছে তাহাও কেহ লক্ষ্য করিল না। বিশেষ কারণটি সাধারণের অজ্ঞাত হইলেও বড়ই গুরুতর।

রুস্তমজি নিজের অফিস ঘরে প্রবেশ করিবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সোমনাথ গিয়া হাজির হইল, ফাইলটি তাঁহার সম্মুখে রাখিয়া বলিল—'গল্প পড়েছি।'

রুস্তমজির মন অন্য বিষয়ে ব্যাপৃত ছিল, তিনি মনকে জোর করিয়া টানিয়া আনিয়া ঈষৎ অপ্রসন্ন স্বরে বলিলেন—'হুঁ—কি মনে হ'ল?'

সোমনাথ দৃঢ়ভাবে বলিল—'চমৎকার গল্প। রুসিবাবা, এ গল্পে একটা কথা অদল-বদল করা চলবে না।'

এই সময় চক্রধর আসিয়া উপস্থিত হইল, মুখ বাঁকাইয়া বলিল—'আপনি তো বলবেনই; আপনিও বাঙালী কিনা।'

কথাটা এতই বর্বরোচিত যে সোমনাথ দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল; আরক্ত মুখে চক্রধরের দিকে তাকাইয়া বলিল,—'আপনাকে যখন প্রশ্ন করব তখন তার উত্তর দেবেন, Speak when you are spoken to—এখন আমি রুসিবাবার সঙ্গে কথা বলছি।'

চক্রধর এরূপ কড়া জবাবের জন্য প্রস্তুত ছিল না, সে ভ্যাবাচাকা খাইয়া গেল। সে এমনই নিরেট অসভ্য যে আপত্তিকর কোনও কথা তাহার মুখ দিয়া বাহির হইয়াছে তাহা বুঝিবার শক্তিও তাহার নাই।

কিন্তু রাগ জিনিষটা ছোঁয়াচে। রুস্তমজির মনের নিগূহীত উষ্মা এই সূত্রে বাহির হইয়া আসিল, তিনি তিরিক্ষি ভাবে বলিয়া উঠিলেন,—

করতে হবে? তা হলে ছবি করবার কি দরকার—বই বাঁধা দপ্তরীর কাজ করলেই হয়।'

সোমনাথ মনের উত্তাপ দমন করিয়া বলিল—'উপমাটা ভাল দিয়েছেন। চিত্র-প্রণেতার কাজ দপ্তরীর কাজের মতোই, গল্পটিকে সাজিয়ে গুজিয়ে দর্শকের সামনে হাজির করা—তার বেশী নয়।'

চক্রধর গাল ফুলাইয়া বলিল,—'আমরা মাছি-মারা দপ্তরী নই। আমরা ছবি তৈরি করি, লেখক আমাদের মনের মতো গল্প লিখে দেয়; এই এখানকার রেওয়াজ। লেখকদের আমরা আস্কারা দিই না।'

সোমনাথ রুস্তমজিকে বলিল,—'ইনি যাদের কথা বলছেন তারা লেখক নয়—তারা মুহুরী। ইন্দুবাবু মুহুরী নন, তিনি প্রতিভাবান লেখক। তাঁর গল্প নষ্ট করবার অধিকার আমাদের নেই।'

রুস্তমজি টেবিল চাপড়াইয়া বলিলেন—'আলবৎ আছে। আমি গল্প কিনেছি—আমার যেমন ইচ্ছে যেখানে ইচ্ছে অদলবদল করব। কারুর কিছু বলবার নেই।'

সোমনাথ গোঁ-ভরে বলিল—'তাহলে সব নষ্ট হয়ে যাবে—ছবি একদিনও চলবে না।'

রুস্তমজি আরক্ত-চোখে তাহার পানে চাহিয়া বলিলেন,—'আমি ত্রিশ বছর ছবি তৈরি করছি, পঞ্চাশটা ছবি করেছি। তুমি কালকের ছেলে আমাকে শেখাতে এসেছ—কি ক'রে ছবি তৈরি করতে হয়!'

সোমনাথ এতক্ষণ অতি কষ্টে ধৈর্য্য ধারণ করিয়া ছিল, এবার আর পারিল না; সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল,—'আপনি পঞ্চাশটা ছবি করেছেন বটে কিন্তু কটা ভাল ছবি করেছেন?'

রুস্তমজিও লাফাইয়া উঠিলেন,—'ভাল ছবি! আমার পঞ্চাশটা ছবিই ভাল। তুমি তার ভালমন্দ কী বুঝবে—সিনেমার কী জানো তুমি?'

'আমি অনেক কিছু জানি যা আপনারা জানেন না। আপনার পঞ্চাশটা ছবির মধ্যে পাঁচটিও ওৎরায় নি। তার কারণ কি জানেন? আপনি লেখকের ওপর কলম চালান, খোদার ওপর খোদগারি করেন—'চক্রধরের দিকে আঙুল দেখাইয়া বলিল,—'এই সব অশিক্ষিত অপদার্থ লোকের পরামর্শে আপনি প্রতিভাবান লেখকের ওপর কলম চালাতে সাহস করেন।'

রুস্তমজি বলিলেন,—'ব্যস, যথেষ্ট হয়েছে। আমার ছবিতে আমি যা-ইচ্ছে করব'—যার পছন্দ হবে না সে কাজ করবে না।'

সোমনাথ বলিল,—'সেই কথা আমিও বলতে যাচ্ছিলাম। আপনারা যদি গল্পে অদলবদল করেন আমি ছবিতে কাজ করবনা।'

'কি—এত বড় কথা! যাও, আমার ছবিতে তোমাকে কাজ করতে দেব না। এখনি বিদেয় হও।'

৪

কোথাকার জল কোথায় গড়াইল।

মাথা ঠাণ্ডা হইলে সোমনাথ বিবেচনা করিয়া দেখিল, এতটা বাড়াবাড়ি না হইলেই ভাল হইত বটে, কিন্তু নিজের ব্যবহারের জন্য লজ্জা বা অনুতাপ অনুভব করিবার কোনও হেতু নাই। সত্যের জন্য, ন্যায়ের পক্ষে সে লড়িয়াছে। ইহাতে তাহার যদি ক্ষতি হয় তো হোক।

ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা আর বিশেষ ছিল না। তাহার প্রথম ছবিতে সে দর্শকমণ্ডলীর চিত্তহরণ করিয়া লইয়াছে; এখন যে-কোনও প্রযোজক তাহাকে লুফিয়া লইবে। সে রুস্তমজির কাজ ছাড়িয়া দিয়াছে একথার খবর পাইলে হয়।

তবু তাহার মনটা বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিল। ঝগড়াঝাঁটি সে ভালবাসে না, অথচ অতর্কিতভাবে পরের ঝগড়া তাহার ঘাড়ে আসিয়া পড়িল। ইন্দুবাবুর সহিত পরে আর তাহার দেখা হয় নাই; তিনি হয়তো গল্প ফেরৎ লইয়াছেন।......রুস্তমজির সহিত এত শীঘ্র এমন ভাবে ছাড়াছাড়ি হইবে কে ভাবিয়াছিল! কিন্তু যেখানে চক্রধর আছে সেখানে ভদ্রলোকের থাকা অসম্ভব।......এই সময় পাণ্ডুরঙ্ থাকিলে শুধু সৎ পরামর্শই দিত না, তাহার সহিত কথা বলিয়া সোমনাথের মন অনেকটা হাল্কা হইত। কিন্তু পাণ্ডুরঙ্কে খুঁজিয়া বাহির করা দুঃসাধ্য কাজ। সে হয়তো আড্ডা দিতে বাহির হইয়াছে, কিম্বা কাজে গিয়াছে।

জামাইবাবু ও দিদি ইতিপূর্বে পুনা হইতে ফিরিয়াছিলেন, কিন্তু সোমনাথ তাঁহাদের কোনও কথা বলিল না। মিছামিছি তাঁহাদের উদ্বিগ্ন করিয়া লাভ নাই। একেবারে অন্য চাকরি যোগাড় করিয়া তাঁহাদের জানাইবে।

পরদিন সকালে সোমনাথ ব্যাঙ্কে গেল; সেখান হইতে একহাজার টাকা বাহির করিয়া ষ্টুডিওতে উপস্থিত হইল।

আজ রুস্তমজি ঠিক সময়েই আসিয়াছেন। এত্তালা দিয়ে সোমনাথ তাঁহার ঘরে প্রবেশ করিল।

একহাত কপালের উপর রাখিয়া রুস্তমজি নতমুখে টেবিলে বসিয়া আছেন; সোমনাথের সাড়া পাইয়াও তিনি মুখ তুলিলেন না। সোমনাথ একটু অপেক্ষা করিয়া গলাসাড়া দিয়া বলিল—'আপনার টাকা এনেছি।'

রুস্তমজি মুখ তুলিলেন। সোমনাথ চমকিয়া দেখিল, তাঁহার গালের মাংস ঝুলিয়া গিয়াছে, মুখের ফরসা রঙ্ পাংশু বর্ণ; ধূর্ত চক্ষুদুটির ধূর্ততা আর নাই, রাঙা টকটক্ করিতেছে। এক দিনে মানুষের চেহারা এতখানি পরিবর্তিত হইতে পারে তাহা সোমনাথ কখনও দেখে নাই। সে থতমত খাইয়া গেল।

'কিসের টাকা?'

'আপনি যে-টাকা আগাম দিয়েছিলেন।'

রুস্তমজি কিছুক্ষণ তাহার পানে তাকাইয়া থাকিয়া বলিলেন—'বোসো। তোমার সঙ্গে কথা আছে।—না, আগে দরজা বন্ধ করে দাও।'

দ্বার বন্ধ করিয়া সোমনাথ রুস্তমজির সম্মুখে বসিল।

রুস্তমজি আরও কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন—'কাল সারা রাত্রি ঘুমোই নি, শ্রেফ মদ ঢেলেছি।'

সোমনাথ কি বলিবে খুঁজিয়া পাইল না। একটা বিষম দুর্বিপাক ঘনাইয়া উঠিয়াছে সন্দেহ নাই। সে নীরবে প্রতীক্ষা করিয়া রহিল।

'—কাল তুমি রাগ করে চলে যাবার পর ইন্দুবাবু এলেন। তিনি

গল্প ফেরৎ চাইলেন। আমি বললাম—সে না গল্প, আমি কিনেছি, গল্প আমার। তিনিও রাগারাগি করে চলে গেলেন।'

সোমনাথ কুণ্ঠিত স্বরে বলিল—'কিন্তু—'

হঠাৎ রুস্তমজির স্বর ভাঙিয়া গেল, তিনি বলিয়া উঠিলেন,—'আমি ডুবতে বসে'ছি, আমার মাথার ওপর খাঁড়া ঝুলছে, আর এই সময় তোমরা আমায় ফেলে পালাচ্ছ! কিন্তু তুমি সব কথা জানো না, তোমাকে দোষ দেওয়া অন্যায়। সোমনাথ, আমি তোমাকে স্নেহ করি, তাই যে-কথা কাউকে বলিনি তাই আজ তোমাকে বলছি—শোনো।'

নিজেকে একটু সামলাইয়া লইয়া তিনি বলিতে আরম্ভ করিলেন—'আমার স্ত্রীপুত্র নেই। স্ত্রী অনেকদিন গেছেন; ছেলেটা ছিল, সেও মদ খেয়ে বদ্‌খেয়ালি করে মরেছে। তাদের জন্যে আমার দুঃখ নেই। কিন্তু এই স্টুডিও আমার প্রাণ—আমার বুকের ধন। এ যদি যায়, আমি এক দিনও বাঁচব না।

'তুমি কাল বলেছিলে আমি অনেক ছবি করেছি বটে কিন্তু ভাল ছবি একটাও করিনি। তোমার কথা মিথ্যে নয়। ভাল ছবি চেষ্টা করেছি, কিন্তু পারিনি। প্রথম প্রথম দু'একটা কিছু পয়সা দিয়েছিল, সেই পয়সায় এই স্টুডিও কিনেছিলাম। তারপর থেকে যত ছবি করেছি সব দু'কুড়ি সাত—কোনমতে খরচ উঠেছে, তার বেশী নয়।

এইভাবে চল'ছিল, কিন্তু গত তিনটে ছবিতে খরচ ওঠেনি। এখন এমন অবস্থা হয়েছে, নতুন ছবি করবার পয়সা নেই। বাইরে চাকচিক্য বজায় রেখেছি, কিন্তু ভেতরটা একেবারে ফোঁপ্‌রা হয়ে গেছে। এমন অবস্থায় এসে ঠেকেছি যে স্টুডিও বাঁধা রেখে নতুন ছবি তৈরি করতে হবে। বুঝতে পারছ ব্যাপার? এবার যদি ছবি না ওৎরায় আমি ধনে-প্রাণে গেলাম।

'বাইরে বুঝতে দিই না, কিন্তু ভেতরে ভেতরে আমার অবস্থা পাগলের মত হয়েছে। কী ক'রে ভাল ছবি তৈরি করব? কী ক'রে মান-ইজ্জৎ বাঁচাব? আমি জানি—সত্যিকার ভাল ছবি তৈরি করবার ক্ষমতা আমার নেই, পঞ্চাশটা ছবি করে আমি তা বুঝতে পেরেছি। ছবি তৈরি করতে আমি ভালবাসি, ওছাড়া অন্য কাজও কিছু জানি না—ছবি তৈরি করা আর বেঁচে থাকা আমার কাছে সমান।

'আমি মূর্খ, লেখাপড়া শিখিনি, সত্যিকার ভাল নাটক কাকে বলে আমি জানিনা। ত্রিশ বছর আগে যখন এ কাজ আরম্ভ করেছিলাম তখন সকলেই আমার মতো ছিল, সবাই বেঁড়ে ওস্তাদ, না-পড়ে পণ্ডিত! কিন্তু আজকাল সিনেমায় ভাল লোক আসছে, ভাল ছবি দিচ্ছে, লোকের রুচির উন্নতি হচ্ছে। এখন আমার ছবি কেউ চায়না।

'চক্রধরকে নিয়েছিলাম। আশা করেছিলাম ও হয়তো ভাল ছবি দিতে পারবে। কিন্তু দু'টো ছবি যা তৈরি করেছে তাতেই বুঝতে পেরেছি ও একটা windbag, একটা ধোঁয়ায়-ভরা ফানুস। ওর দ্বারা কোনও কালে ভাল ছবি হবে না।

'কাল আমি স্টুডিও বন্ধক রেখে আড়াই লাখ টাকা নিয়েছি, এই আমার শেষ পুঁজি। এখন এ ছবি যদি ভাল না হয় তাহলে আমার স্টুডিও লাটে উঠবে। তোমরাই বলে দাও, আমি কী করে ভাল ছবি তৈরি করব! ইন্দুবাবু ভাল গল্প লেখেন, তাঁর গল্প নিয়েছি। তুমি ভাল আর্টিষ্ট, তোমাকে নিয়েছি। আর কি করব বল? টাকা খরচের ত্রুটি করব না, কিন্তু ছবি ভাল হবে কি?'

এই দীর্ঘ আত্মকথা শুনিয়া সোমনাথ বুঝিল—রুস্তমজির মানসিক অবস্থা এখন কোথায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। তিনি যে কাল এত সহজে ধৈর্য হারাইয়াছিলেন তাহার কারণও সে বুঝিতে পারিল। অনেকক্ষণ নীরবে চিন্তা করিয়া সে বলিল,…'রুসি বাবা, আমি একটা কথা বলব, আপনি শুনবেন?'

রুস্তমজি বলিলেন,—'শুনব। তোমার কথা শুনব বলেই তো এত কথা তোমাকে বললাম।'

'আমার ওপর আপনি এ ছবি তৈরি করার ভার ছেড়ে দিন।'

'তোমার ওপর?'

'হ্যাঁ, আমার ওপর। আমি টেক্‌নিক্ কিছুই জানি না, কিন্তু সেজন্যে আট্‌কাবে না। যে গল্প আমরা পেয়েছি, আমার বিশ্বাস আমরা ভাল ছবি তৈরি করতে পারব।'

রুস্তমজি টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া আরক্ত চক্ষু সোমনাথের মুখের উপর স্থাপন করিলেন,—'ছবি ওৎরাবে এ জামিন তুমি দিবে?'

মাথা নাড়িয়া সোমনাথ বলিল,—'না। ছবি ওৎরাবে এ জামিন ভগবানও দিতে পারেন না। তবে ছবি ভাল হবে এ জামিন দিচ্ছি। রুসি বাবা, আমি নাটক লিখতে জানিনা বটে, কিন্তু ভাল নাটক দেখলে চিনতে পারি। এ নাটক যত্ন ক'রে তৈরি করতে পারলে এমন জিনিষ হবে যা আজ পর্যন্ত ভারতবর্ষে হয়নি।'

রুস্তমজি দীর্ঘকাল দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া রহিলেন, তারপর উঠিয়া আসিয়া সোমনাথের কাঁধের উপর হাত রাখিলেন; বলিলেন,—'সোমনাথ, তুমিই ছবি কর। তোমার সিতারা এখন বুলন্দ, হয়তো লেগে যেতে পারে। সিনেমা মানেই তো জুয়া খেলা—লাগে তাক্ না লাগে তুক্। যা হবার হবে, আর ভাবতে পারিনা। আমার ভাবনার ভার তুমি নাও।'

সোমনাথ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল,—'সব ভার আমি নেব।—কিন্তু চক্রধর?'

'ওটাকে আজই দূর করে দিচ্ছি। তোমার যাকে পছন্দ তুমি নাও, গল্প যেমন ইচ্ছে রাখো; কেউ তোমার কাজে হস্তক্ষেপ করবে না। আমার শুধু ভাল ছবি চাই।'

সোমনাথ আবার ধীরে ধীরে বসিয়া পড়িল। এতক্ষণ সে মনে বেশ দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় অনুভব করিতেছিল, এখন দায়িত্ব ঘাড়ে লইবার পর সহসা তাহার মনে হইল সে একান্ত অসহায়। বিরাট পর্বতপ্রমাণ কাজের ভার সে ঘাড়ে তুলিয়া লইয়াছে, অথচ এ কার্যের বিন্দুমাত্র অভিজ্ঞতা তাহার নাই, একজন নির্ভরযোগ্য সহকারী পর্যন্ত নাই। সিনেমা জগতে কাজের লোক কাহাকেও সে চেনে না। এত বড়

কাল হাতে লইয়া শেষে কি ভরা-ডুবি করিবে! ভয়ে তাহার বুক কাঁপিয়া উঠিল।

রুস্তমজি বলিলেন—'কি ভাবছ? তোমার বর্তমান কন্‌ট্রাক্ট বলবৎ থাকবে না, নতুন কন্‌ট্রাক্ট হবে। তুমি যা চাও তাই দেব।'

সোমনাথ বলিল—'না, আমার আর কিছু চাই না, যা দিচ্ছেন তাই যথেষ্ট।'

রুস্তমজি বলিলেন—'তা হতে পারে না। নতুন কন্‌ট্রাক্টে তুমি এখন যা পাচ্চ তাই পাবে, উপরন্তু ছবি থেকে যদি লাভ হয়, লাভের অর্ধেক তোমার।—কেমন—রাজি?'

সোমনাথ বলিল—'রুসিবাবা, নিজের কথা আমি ভাবছি না। আপনার যা ইচ্ছে দেবেন, আমার কোনও দাবী নেই। আমি ভাবছি—'

এই সময় তাহার অমুক্ত ভাবনার উত্তরস্বরূপ দ্বারে টোকা পড়িল। রুস্তমজি দ্বার খুলিয়া দিলেন।

পাণ্ডুরঙ ঘরে প্রবেশ করিল। তাহার একটু ব্যস্ত-সমস্ত ভাব বলিল,—'হুজুর, গোস্তাকি মাফ করবেন। কাউন্টেস পেনের সঙ্গে ঝগড়া করে চাকরী ছেড়ে ফিরেছি। এবার আমার একটা ব্যবস্থা করুন।'

রুস্তমজি হাসিয়া বলিলেন,—'আমি কিছু পারব না। তোমাকে চাকরি দিতে পারে সে ঐ।' বলিয়া সোমনাথকে দেখাইলেন।

সোমনাথ ছুটিয়া আসিয়া পাণ্ডুরঙকে জড়াইয়া ধরিল, বলিল,—'পাণ্ডু, তুমি এসেছ! বাঁচলাম।'

সেদিন অপরাহ্নে নূতন চুক্তি-পত্র সোমনাথের দ্বারা সহি করাইয়া আসিয়া দিগম্বর শম্ভুলিঙ্গ বলিলেন,—'আপনার কপাল বটে—একবেলায় উন্নতি। আর আমি এগারো বছর ধ'রে—' বলিয়া তিনি ম্লান অশ্রু-করুণ হাসিলেন।

ধ্বংসের মাঝে আছ কংস-অরি!

শ্রীরামেন্দু দত্ত

অপার করুণা তব কংস-অরি!
বোঝালে আমার সব ধ্বংস করি!
    ধন মান ধ্বংস হয়
    হ'ল বন্ধু-বংশ লয়,
ত্রিভুবনে বাকী শুধু তুমিই হরি!
সব নিলে, যা'তে তোমা' স্মরণ করি!
অল্প বয়সে তব করুণা লাভ'
পেয়েছি জ্ঞানের কণা, হয়েছি কবি।

    নিঃস্বের কি আছে বাকী
    আঁখি জলে পূর্ণ আঁখি
তোমার মুরতি ভাসে, সে জল-ছবি!
আঁধার আঁখিতে সে যে চন্দ্র, রবি!
সে চোখের জল আজো লুপ্ত নয়
বিম্বিত তুমি তাহে করুণাময়!

    প'ড়ে আছি শয্যাগত
    অর্থাভাব মজ্জাগত
দুখের দুলালে পথে নামাতে হয়—
কারাগারে দিলে তা'রে, তোমারি জয়!

হে নাড়ু-গোপাল! সে যে তোমারি সাথী!
জীবন-প্রভাতে তা'র কী অমা-রাতি!
    নিষ্পাপ কোরক সম
    সে বীর-বালক মম।
হে বাল-গোপাল! তারো শক্ত ছাতি!
আমার নয়ন-মণি, আঁধারে বাতি!

কংসের কারাগারে জন্ম তব—
ধ্বংসের হে সারথি, মধু-মাধব।
    কৈশোরে পেয়েছি বুকে—
    বালকের অংশে ঢুকে
সংসার-কারাগারে, হে অভিনব!
ধ্বংসের মাঝে পুন এলে কেশব!

তোমার প্রতীক মাঝে মূর্ত্তি ধরি'
তুমিই প্রলয় আনো সৃষ্টি করি'
    আমার এ দুঃখ মাঝে
    তোমারই করুণা রাজে
এ বোধ জানায়ে তুমি বাঁচালে হরি!
সব গেছে, তুমি আছ; "কংস"-অরি!

আকাশ পথের যাত্রী

শ্রীসুষমা মিত্র

(সান্‌ফ্রান্‌সিস্‌কো)

১২ই জুন। আজ খুব ভোরেই খুকু উঠেছে। আমার ঘুম ভাঙতেই সে কোথা থেকে—সুন্দর একটি প্লাসটিকের খাপে ভরা একশিশি সুগন্ধ ওডিকোলন এনে আমায় দিয়ে গেল, বল্লে "তুমি আজ তোমার জন্মদিনে এটা মেখো"। কিছুক্ষণ পরে দেখি আমার নামে এক তোড়া ফুল এলো, সঙ্গে গাঁথা একটুকরো কাগজে খুকুরই স্বহস্ত লিখিত—"Many Happy Returns of the Day." লেখা রয়েছে। কোথা থেকে যে সে এ সব জোগাড় করেছে এবং কখন যে করেছে তা' জানি না। তাই এ গুলি পেয়ে যে আমার বিস্ময় ও আনন্দ হ'ল খুবই, একথা বলাই বাহুল্য।

আজ বেলা ১২টায় আমরা ট্যাক্সি নিয়ে বিখ্যাত Rel wood Forest Gate দেখতে গেলাম। সান্‌ফ্রান্‌সিস্‌কোর উপসাগর তীরে 'Golden Gate Park' নামে একটি বিখ্যাত ফুলের বাগান দেখলাম।

গোল্ডেন গেট পার্ক প্রতিষ্ঠাতার মূর্ত্তি

কথিত আছে এই 'Golden Gate Park' পূর্ব্বে একটি অনুর্ব্বর বালুকাময় পতিত জমি মাত্র ছিল। কোন একজন সৌখীন ব্যক্তির পরিকল্পনায় ও চেষ্টায় এই পতিত জমিটি একটি সুরম্য উদ্যানে পরিণত হয়েছে।

আমরা Gol len Gate Bridge এর উপর দিয়ে চলেছি। উপসাগর তীরে এই ব্রীজটি San Francisco'র একটি দর্শনীয় গৌরবের জিনিষ, ব্রীজটি যেন সরু সূক্ষ্ম সুতোয় গাঁথা। ব্রীজের অপর পাশে এক নূতন জায়গায় আমরা এসে পড়লাম, চারিদিকে অসংখ্য ছোট ছোট পাহাড় ও উপত্যকার মাঝে মাঝে উঁচুনীচু পথ দিয়ে আমাদের গাড়ী চলল। ক্রমে আমরা পাহাড়ের উপরে উঠলাম, খাদের গা ঘেঁসে গাড়ী ছুটে চলল। হঠাৎ নজর পড়ল খাদের ইউক্যালিপটাস্ গাছ পাহাড়ের গা ঢেকে দিয়েছে। গাড়ী দাঁড় করিয়ে পাতা কুড়িয়ে দেখলাম সত্যই ইউক্যালিপটাসের পাতা কিনা। ইউক্যালিপটাসের বন পেরিয়ে আমরা নামতে সুরু করেছি। শেষে আমাদের গাড়ী একটি জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে 'Muir Forest' লেখা গেটের সামনে এসে দাঁড়াল। এটি Rel Wood Forest এরই একটি অংশ। আমরা নেমে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকলাম। সামনেই দেখি বড় বড় গাছগুলি ডালে ডালে পাতায় পাতায় জড়িয়ে অনেকখানি জায়গা জুড়ে বিরাট একটি চাঁদোয়ার মত ছাউনি তৈরী করেছে। এত ঘন বন যে গাছের নীচে রোদ ঢুকতে পারে না, মাটী অপরিষ্কার ও স্যাঁৎ-সেঁতে। এই জঙ্গলের বিশাল বৃক্ষগুলি হাজার হাজার বছর ধরে দাঁড়িয়ে আছে, তাদের শাখা প্রশাখা জালের মত চারিদিকে বিস্তারিত একটি প্রকাণ্ড গাছের কাণ্ড চাকা করে কাটা রয়েছে, তার উপরে লেখা রয়েছে তার বয়স, বৃদ্ধির সময় ইত্যাদি। দেখলাম গাছটির বয়স অনুমান ২০০০ বৎসর। একটি প্রাচীন বৃক্ষের কাণ্ড এত মোটা যে তার মধ্যভাগ ফুটো ক'রে মোটর যাতায়াতের রাস্তা করা;

গোল্ডেন গেট ব্রিজ

হয়েছে। এখানে দর্শকদের ভীড় বড় কম হয়নি, চারিদিকে ক্যামেরা নিয়ে কেবল ছবি তোলার ধুম চলেছে। জঙ্গলের মধ্যে আবার একটি রেষ্টুরেন্টও রয়েছে। যাত্রীরা ক্লান্ত হয়ে আহারের সন্ধানে সেখানে ঢুকেছে। পাশেই একটি ঘরে এখানকার কাঠের তৈরী নানারকম souvenir বিক্রয়ের জন্য দোকান রয়েছে।

Red wood Forest থেকে ফিরবার পথে মোটর চালক ধ'রে বসল, তার বাড়ীটি একবার দেখতে হবে। কথাটা শুনে মোটেই ভালো লাগল না; ড্রাইভারের বাড়ী আবার যেতে যাব কেন! সময় বেশী নেই বলে প্রথমে কাটাবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তার মনক্ষুন্ন ও হতাশের ভাব দেখে অল্প সময়ের জন্য ড্রাইভারের বাড়ী দেখতে যেতে রাজী হলাম। ড্রাইভার তখন তার একটি মনের কথা প্রকাশ করে আমাদের জানালো। ব্যাপারটা হ'ল এই যে, হালের এই যুদ্ধের সময় তার শ্যালক ভারতে এসেছিল। বোম্বাই সহরে অবস্থান কালে সে

সাংঘাতিকভাবে নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে এবং একটি ভারতীয় হাসপাতালে যায়। সেই হাসপাতালের ইণ্ডিয়ান মেট্রোন ও ডাক্তাররা নাকি তাকে খুবই সেবা যত্ন করেছিলেন এবং তাঁদেরই অক্লান্ত সেবা, শুশ্রূষা ও চিকিৎসার গুণে ছেলেটি মৃত্যুমুখ হতে ফিরে আসে।

গোল্ডেন গেট ব্রিজের সামনে "লাইট হাউস"

সেই থেকে ভারতবাসীর প্রতি তাদের কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। ভারতবাসী দেখলেই তাদের অনুরোধ ক'রে সে তার বাড়ীতে নিয়ে যায় এবং কৃতজ্ঞতা সহকারে নানা ভাবে তাদের অভ্যর্থনা ও আপ্যায়িত করে। ড্রাইভার বার বার বলতে লাগল যে, একজন অচেনা অজানা

রেড-উডের জঙ্গলে বিশাল বিশাল বৃক্ষ

বিদেশীকে যারা এমন আন্তরিক সেবা যত্ন করে বাঁচিয়ে তোলে, তারা সত্যই মহৎপ্রাণের মানুষ। এখানকার ভারতীয়দের সাথে ড্রাইভার ও তার স্ত্রীর খুব আলাপ পরিচয় ও বন্ধুত্ব আছে শুনলাম। পথেই তার বাড়ী পড়ল। গাড়ী থামিয়ে আমরা নামলাম। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পাড়াটি—রাস্তায় কোথাও একটু ধুলো কুটো নেই। বাড়ীগুলি সব রং-করা ছবির মতন। ফুলে ফুলে চারিদিক ভরে আছে। গ্যারেজে ড্রাইভারের নিজেরও একটি বড় গাড়ী রয়েছে দেখলাম। বাড়ীর ভিতরে ঘরগুলি নিখুঁতভাবে সাজানো—বসবার ঘরে দামী কারপেটের উপরে ভেলভেটের সোফাকৌচ, জানলায় সিল্কের পরদা। প্রতি ঘরে একটি ক'রে রেডিও সেট রয়েছে। সবচেয়ে সুন্দর হল—সাদা ধবধবে তাদের রান্না-ঘরটি! সেখানে ওজনকরার যন্ত্র, তাপ দেখার যন্ত্র, টেলিফোন, রেডিও ইত্যাদি সব কিছু রয়েছে। ইলেকট্রিক চুলাটি আবার অটোমেটিক—রান্না হয়ে গেলে আপনা হতেই বন্ধ হয়ে যায়। শুনলাম বাড়ীটিও ড্রাইভারের নিজের সম্পত্তি। আমরা ভারতবাসীরা এটা কল্পনাও করতে

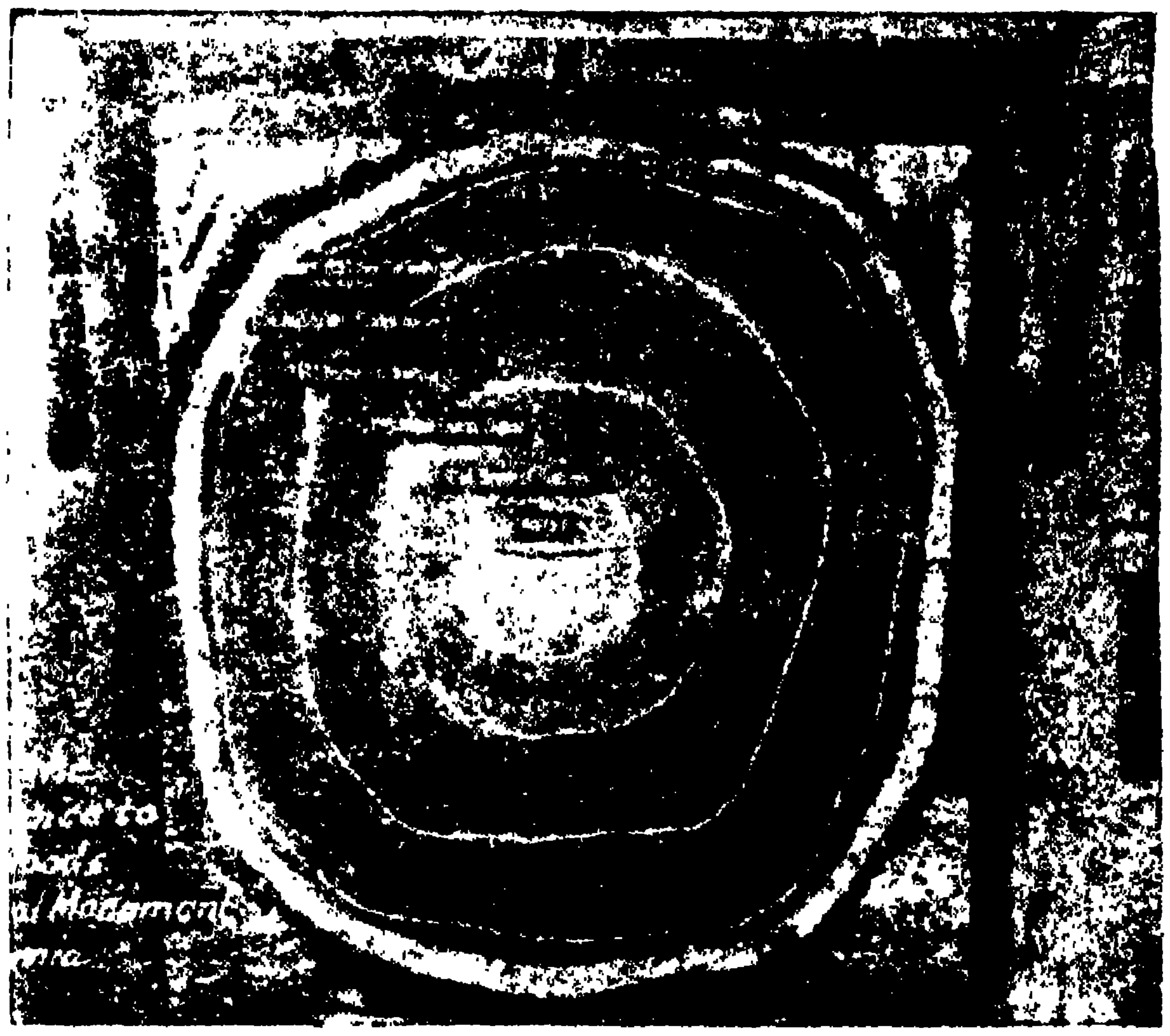

"রেড উড ফরেষ্টের" একটি প্রাচীন বৃক্ষের একাংশ কেটে তার পরিচয় ও ইতিহাস উপরে লেখা রয়েছে। গাছটির জন্ম ৯০৯ খৃষ্টাব্দ।

পারি না। আমেরিকার সামান্য একজন মোটর ড্রাইভারের এত ঐশ্বর্য্য দেখে অবাক্ হলুম। Rotarianদের ছেলেমেয়েদের জন্য আজ এই সমুদ্রতীরে একটি কার্ণিভেলের বন্দোবস্ত হয়েছে। খুকু আগে থেকে ঠিক করে রেখেছিল—যাবার পথে এই কার্ণিভেলটা একবার ঘুরে যাবে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েতে কার্ণিভেল ভর্ত্তি, খুব হৈ চৈ চলছে,—'Merry-go-Round'এ চড়া, ইলেকট্রিক মোটরে ঘোরা ও Fun Houseএর নানা রকম মজার খেলায় সব মেতেছে। কার্ণিভেল থেকে ঘণ্টাখানেক পরে হোটেলে ফিরে এলাম।

১৩ই জুন। আজ শিকাগো ফিরে যাবার দিন। আমেরিকার পশ্চিম প্রান্ত দেখা শেষ হল। এবার আবার পূবের দিকে ফিরে যাব। সকাল ১০॥ টায় এয়ার-ওয়েজ টারমিনাসে উপস্থিত হয়েছিলুম। ঘণ্টা দু'য়ের মধ্যেই বিমান আকাশে উড়ল। United Air Lineএর এই বিমানগুলি দেখতে যেমন সুন্দর, ভিতরের

ব্যবহারও তেমনি আরামের। ষ্টুয়ার্ডেস্‌রা যথারীতি যাত্রীদের দেখাশুনা করছে, অনবরত চকোলেট, চুইংগাম ও কফি মুখে দিয়ে যাত্রীরা মুখ নাড়তে নাড়তে চলেছে। দিনের আলোয় পথের শোভা অতি সুস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। অল্পক্ষণের মধ্যেই আমরা রকি পর্ব্বতের উপরে এসে পড়লাম, বিমান ক্রমেই উপরে উঠছে। চোখের সামনে ভেসে উঠল সাদা বরফের টোপর পরা অসংখ্য শৈলশিখর। ফেনিল সাগরের মত পর্ব্বততরঙ্গমালা পার হয়ে চলেছি। পর্ব্বতোত্থিত নদীগুলি সাদা সরু সুতোর মত এঁকে বেঁকে চলেছে। তারপর জনমানবহীন, জলহীন এক বিশাল মরুভূমি। বেলা ১টায় ট্রে-সাজানো লাঞ্চ এল—ফলের রস, সুপ, রুটি, মাংস, স্যালাড, আইসক্রিম, কফি, কেক্—ঠাণ্ডা গরম সবই রয়েছে। আকাশে উড়তে উড়তে এই রকম তৈরী খাবারগুলি খেতে আর বাইরের দৃশ্য দেখতে কি ভালোই না লাগ্‌ছিল! খাওয়ার পাট চুকতে, যাত্রীরা সব জানালা-দরজার পরদা টেনে নাক ডাকাতে সুরু করলে। আমি বসে বসে বাইরের শোভা দেখছি। বেলা প্রায় ৩টায় বিমান Denver সহরে নামল; বিমানঘাঁটির চারি দিকে ছোট ছোট পাহাড়, লালমাটির রাস্তা, জায়গাটি বড় সুন্দর লাগল।

রাত ২টোয় আমরা শিকাগোতে নামলাম। বিমান কোম্পানীর বাসে চড়ে সহরের দিকে রওনা হয়েছি, দেখি রাস্তায় তখনও লোক চলাচল করছে, দোকানের শোকেসে জোর আলো জ্বালা কয়েকটি Drug Storce খোলা রয়েছে। Hotel Palmer House এর সামনে ভীষণ ভীড়; দরজার পোর্টার থেকে আরম্ভ করে অফিসে, লিফ্‌টে, দোকানে সর্ব্বত্রই লোক রয়েছে ও রীতিমত কাজ চলছে। হোটেলের নাচঘর ও বসবার ঘর তরুণ তরুণীর নৃত্যে ও আমোদে মুখরিত। এ দেশে শনিবার ও রবিবার দুদিনই ছুটী থাকে, তাই শুক্রবার রাত্রি থেকেই নাচ গানের হৈ-হল্লা চলে।

অফিসে খবর নিয়ে আমরা ২১ তলায় একখানি ঘরে গিয়ে উঠলাম, ভীষণ ক্লান্ত, তাই মোট-ঘাট ও বাক্স পেটি তেমনি রেখেই শুয়ে পড়লাম।

(ক্রমশঃ)

ভবঘুরে-ব্যুরো

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

ভারতবর্ষব্যাপী হত্যাকাণ্ড অনেক কাল চলিবে না, এ আশা আমরা অবশ্যই করিতে পারি। নরকোল্লাস অদূর ভবিষ্যতেই স্তব্ধ হইবে এই ভরসা আমাদের আছে। প্রবল প্লাবন একদিন অপসৃত হইবেই এই আশাতেই মানুষ বাঁচিয়া থাকিবে। নতুবা, কুরুক্ষেত্রের পরে ভারতবর্ষে কতকগুলো বিধবা ব্যতিরেকে মড়া কান্না কাঁদিবার জন্তও যেমন অন্ত লোক ছিল না, এবারের 'কুরুক্ষেত্রে'র পরে হয়ত বিলাপ করিবার জন্ত তাহারাও থাকিবে না। কারণ পুরুষ ত ছার, বর্ত্তমান ভারত-ক্ষেত্রে নারী ও শিশু নিষ্কৃতি পাইতেছে বলিয়া শুনি না। সাধারণতঃ মরণের পরে শোকোচ্ছ্বাস ধ্বনিত হইবে, পরলোক-যাত্রীর মনে ইহা এক মস্ত সান্ত্বনা। কুরুক্ষেত্রে নিঃশেষিত মনুষ্যজাতির সে সান্ত্বনা ছিল: হায় হায়, আমরা যে তাহাতেও বঞ্চিত হইতে চলিয়াছি, ইহা কি অল্প মনস্তাপের কারণ? ধর্ম্মযুদ্ধে রত বীরেন্দ্র সমাজের নিকট তাই আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ, পা ছড়াইয়া কাঁদিবার লোকাভাব ঘটাইয়া মরণের ক্ষুদ্র সুখটুকু হইতে তাঁহারা মনুষ্য সমাজকে বঞ্চিত করিবেন না।

আমি আমার এই সুন্দর ভারত, শোভন ভারত, সমৃদ্ধ ভারত ও লীলাচঞ্চল ভারতের কথা ভাবিতেছিলাম। ভাবিতেছিলাম, পৃথিবীর লোককে দেখাইবার, শুনাইবার, বুঝাইবার ও উপঢৌকন দিবার সামগ্রী আমার যত আছে, এমন আর কাহার আছে? কোন্ দেশ এমন ভাবে ভারে সৌন্দর্য্যের ডালি উজাড় করিতে পারে? প্রকৃতি কাহাকে এমন অমূল্য সম্পদে সমৃদ্ধ করিয়াছে? মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে পাল্লা দিয়া, প্রতিযোগিতা করিয়া এত সৃষ্টি চাতুর্য্য প্রকাশ আর কোথায় করিয়াছে?

এমন হিমালয় আর কাহার আছে? শৃঙ্গে শৃঙ্গে এত শোভা, এত সৌন্দর্য্য, এত লীলা আর কোথায় বিকশিত হয়? তুষারকিরীটিনী ভারত কি সৌন্দর্য্যের মুকুটমণি হইয়াই অনাদি অনন্তকাল ধরিয়া নব নব অভিনব রূপরশ্মি বিকীরণ করিতেছে না? ইহার তুলনা কোথায়? কালে-ভদ্রে আকাশে ইন্দ্রধনু উঠিলে মানুষ বিমুগ্ধচিত্তে আত্মহারা হইয়া চাহিয়া থাকে; আমার হিমাচলে নিত্যই নব ইন্দ্রধনু!

আগ্রার তাজ কি বিশ্বের বিস্ময় নহে? নশ্বর মানুষের প্রেম যে মোহন মর্ম্মর রূপ পরিগ্রহ করিয়া অবিনশ্বরত্ব প্রাপ্ত হয়, আমার ভারতবর্ষ ছাড়া আর কে তাহা দেখাইতে পারিয়াছে? হাজা মজা শুষ্ক ভাট কাল কালিন্দীর কূলে এই যে অক্ষয় অব্যয় ইন্দ্রধনুবর্ণবিরঞ্জিত বিরহীর দীর্ঘশ্বাস, একি ভারতেরই নিজস্ব সম্পদ নহে? প্রেমিকের অতৃপ্ত বক্ষের উচ্ছ্বাস আর কোথায় এমন মনোহর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আগত, বিগত, অনাগত কালের প্রেমিক প্রেমিকার চিরমিলনের আকাঙ্ক্ষাকে স্ফটিকে গ্রথিত করিয়া রাখিয়াছে? পাষাণের গায়ে চোখের জল আর কোথায় চিরস্থায়ী হইয়াছে?

কাশ্মীরকে কেহ পর্ব্বত-বাস বলে না। বলে, ভূস্বর্গ। প্রকৃতিরাণী ফুলসাজে সাজিয়া কোন সে প্রেমিকের আগমনাশায় বাসর সাজাইয়া

জ্যোতিষ-তর্কবাগীশ তার কমনীয় তনু এলাইয়া বন মর্ম্মর গান শুনিতেছেন। এই কাশ্মীর ভূতলে স্বর্গ. পৃথিবী খুঁজিয়া এমন আর একটিও কেহ পাইবে কি? কল্পনার স্বর্গ বাস্তবে সত্য আর কোথায় হইতে কে দেখিয়াছে?

আমি অজন্তা ইলোরা দেখাইতে পারি। বিশ্ব সৃষ্টির দরবারে মানুষ যখন বন্য পশুর মত বিচরণ করিত, তখনকার কালের যে শিলা-কলা আমার ভারতবর্ষ দেখাইতে পারে, কোন্ সুসভ্য জাতি সুদূর কল্পনাতেও তাহার চরণরেণু স্পর্শের যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়াছে?

আমি পুরীর জগন্নাথের মন্দির দেখাইব, কণারকের ধ্বংসস্তূপ দেখাইব, মীনাক্ষীর মন্দির দেখাইব, শ্রীরঙ্গনাথ দেখাইব। এস শিল্পী, এস কারিকর, এস ইঞ্জিনীয়র, এস নৃপতি, তুমি গবেষণা করিয়া বলিবে এস, যখন কল ছিল না, ক্রেইন্ ছিল না, ইঞ্জিন বয়লার জন্মায় নাই, তখনও ভারতের মানুষ, ভারতের কারিকর অসাধ্য সাধন করিল কিরূপে? এস বিদ্যাভিমানী পাশ্চাত্য—তোমার বিদ্যাভাণ্ড লইয়া এস, তোমার কম্পাস, থিয়েডো লাইট অনুবীক্ষণ, দূরবীক্ষণ লইয়া এস, যুগ যুগান্তের সমস্যা—চিরন্তনের সমস্যা ভঞ্জন করিবে এস।

ধনগর্ব্বে গর্ব্বিত ইয়োরোপ-আমেরিকা, তুমিও এস। সসাগরা ধরণীর অধীশ্বরের একমাত্র কুমার, সিংহাসন অধিকারী, রোগ, শোক ও মৃত্যু বেদনায় ব্যথিত চিত্তে রাজগৃহ, রাজভোগ, রাজপত্নী ও রাজকুমার পরিত্যাগ করিয়া বিশ্বের মানব সন্তানের জন্য অমৃত আহরণে সিদ্ধার্থের সাধন পীঠ দেখাইতে আমি পারি—পীঠস্থান ভারতবর্ষের পাটলিপুত্রে। বিশ্বের অনন্ত দুঃখসাগর মন্থনে অমৃতের সন্ধান আপনার লৌকিক, পারলৌকিক, আধ্যাত্মিক হিতার্থ নহে; জরামরণশীল মানবকে সাধন-সুধা আস্বাদ করাইতেই সারনাথ ও বুদ্ধগয়া আজও অক্ষয় হইয়া আছে। অহিংসা পরম ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিতে আজিকার হিংসায় উন্মত্ত বিশ্ব পারিবে না তাহা আমি জানি; তবু দেখাইতে ইচ্ছা করে—কি সে বিশাল শক্তি, কি তাহার প্রবল আকর্ষণ, কি তাহার দিব্য জ্যোতিঃ, যাহার প্রভাবে সম্রাট তাহার সাম্রাজ্য লোষ্ট্রখণ্ডের মত দূরে নিক্ষেপ করিয়াও ধরাতলে স্বর্গসুখ সম্ভোগ করে। কি তাহার অবিনাশী প্রতাপ যে কল্প কল্পান্তে সেই অহিংসাই মদগর্ব্বিত বৃটিশকেও সাম্রাজ্যের মরকতমণি দানে উদ্বুদ্ধ করে। অশোকের ধর্ম্মচক্র গান্ধীর চরকায় পূর্ণাহুতি প্রাপ্ত হয়। ধর্ম্মচক্রও আমার, চরখাও আমি দেখাইতে পারি।

এই ভারতের শান্তিনিকেতন দেখাইব। অতীতের সহিত ভবিষ্যতের, পূর্ব্বের সহিত পশ্চিমের, জ্ঞানের সহিত বিজ্ঞানের, স্থূলের সহিত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মের, বহির্বিশ্বের সহিত অন্তঃপ্রকৃতির, কল্পনার সহিত বাস্তবের, কাব্যের সহিত ব্যবহারের এমন অনুপম সামঞ্জস্য ভারতের ঋষির দ্বারাই সম্ভব হইতে পারে। ভারতের নালন্দা, ইংলণ্ডের অক্সফোর্ড, প্রাচ্যের প্রজ্ঞা, প্রতীচ্যের প্রতিভার যুক্ত সমন্বয় দেখাইতে কবির শান্তিনিকেতনই পারে, ইউরোপ অক্ষম, আমেরিকা অজ্ঞান। ভারতে তাহার পূর্ণ বিকাশ।

আমার ভারতে যত পণ্য, এত আর কোন্ দেশে আছে? আমার ভারতের পণ্যে যত সৌন্দর্য্য, যত কলা-চাতুর্য্য, যত শিল্প নৈপুণ্য, ভূমণ্ডলে আর কাহার আছে? কাল করাল-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সনাতন নিয়মে স্বকার্য্য সাধন করিয়াছে; প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় আঘাতের পরে আঘাত হানিয়াছে; কিন্তু বিশ্ব স্রষ্টা অকৃপণ করে আপন রত্ন ভাণ্ডার যেখানে উজাড় করিয়া ঢালিয়াছেন, সেখানে মণি মাণিক্যের অভাব কোনওদিন হয় নাই; কোনওকালে হইবে না। ভারতের ভাণ্ডার অক্ষয়, অব্যয়।

এই 'পণ্য' আমরা বিক্রয় করিব। বিশ্বের হাটে আমাদের পণ্য সম্ভারের বিজ্ঞাপন দিব। বিশ্বের খরিদ্দার আকর্ষণ করিব। ফ্রান্স তাহার ক্ষণভঙ্গুর বিলাসের পণ্য দেখাইয়া কোটী কোটী মুদ্রা অর্জ্জন করিয়া ফরাসী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রকোষ পূর্ণ করে; তাহার লক্ষ কোটীগুণ গুণ-যুক্ত ভারতের পণ্য বিক্রয় করিয়া কেন ভারতের রাষ্ট্রভাণ্ডার আমরা পূর্ণ করিব না? আজ বিশ্বের সকল দেশেই আমাদের দূতাবাস স্থাপিত হইয়াছে; সভ্য জগতের সর্ব্বত্রই ভারতের প্রচার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; আমাদের পণ্য প্রচারে আজ কোন বাধাই আর নাই। আমরা আমাদের ঐশ্বর্য্য প্রচার করিব।

'টুরিজম্' ভ্রমণ-ব্যবসায় আজ বিশ্বের সর্ব্বত্রই সমাদৃত। ফ্রান্স, ইংলণ্ড, আমেরিকায়—মায় আফ্রিকা ভ্রমণ, বহুদিন যাবত ব্যবসায়কে রাষ্ট্রের বাণিজ্য দপ্তরের অঙ্গীভূত করিয়া লইয়াছে; আর বিশ্ব-বিমোহন পণ্যাধিকারী হইয়াও ভারতবর্ষ শম্বুকের মত আপনাকে আপনি আবরিয়া রাখিবে? কেন রাখিবে? আমি আজ আমার অক্ষম লেখনীর সাহায্যে সর্ব্বাগ্রে বাঙ্গালীর ছেলেকেই আহ্বান করিয়া বলিব, ওঠো ভাই বাঙ্গালীর ছেলে, নূতন নূতন পথের সন্ধান করো; নূতন নূতন ব্যবসায়ের সন্ধান করো। তোমার প্রতিভা, তোমার মনীষা, নব নব উন্মেষশালিনী বিদ্যার প্রভায় ভারতকে আচ্ছন্ন করিয়া দাও; বিশ্বে তাহার দীপ্তি বিকীর্ণ হোক। ওঠো ভাই, ছোট! বিমানের কল্যাণে বিশাল বিশ্ব তোমার মুঠার ভিতরে। এই বিশ্বকে তুমি আবাহন করিয়া আনো; দেখাও তাহাকে, তোমার দেশের ঐশ্বর্য্য, জানাও তাহাকে, তোমার মহান্ ঐতিহ্য। পৃথিবীময় ভরিয়া দাও ভারতবর্ষের বিজ্ঞাপন। বৃটিশের পদানত ভারতবর্ষের গ্লানি বিমোচন করিয়া পরিপূর্ণ গৌরবে তাহাকে বিশ্বের সম্মুখে ধরিবার ভার তোমাদের। পৃথিবীকে আমন্ত্রণ দিয়া আনিয়া তাহাকে মাহেঞ্জদাড়ো দেখাও, তক্ষশীলা দেখাও। দেখাও যে বৃটিশের কাচখণ্ডই ভারতের সম্পদ নহে; কল্পে কল্পে, শতাব্দীতে শতাব্দীতে সৃষ্টির আড়ষ্টে ভারত রত্নাকর। রত্নবিতায় ভারত চিরোজ্জ্বল।

ইয়োরোপের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ভ্রমণ করো—দেখিবে, নায়াগ্রা প্রপাতের সচিত্র বিজ্ঞাপনের নামাবলী গায়ে দিয়া রেলের ষ্টেশন, জাহাজ ঘাট, রাস্তার আলোক-স্তম্ভ পথিকের চিত্তাকর্ষণ করিতেছে! তোমার নর্ম্মদার মর্ম্মরমণ্ডিত জলপ্রপাত কি চিরকাল নির্জ্জন বিলাপ করিবে? তোমার "রাজগীর" কি আমার মত কয়েকটি বেতো রোগীর জন্যই সৃজিত হইয়াছিল? পৃথিবীর লোক সুইট্জারল্যাণ্ডের "স্পা" দেখিতে ছুটে, রাজগীরের উষ্ণ প্রস্রবণ কি

তাহাদের আকর্ষণ করিতে পারে না? বিন্ধ্যাচলের সীতাকুণ্ড কি বিশ্বের বিস্ময় নহে?

কবি লিখিয়াছিলেন, "এত কথা আছে, এত গান আছে!" আমি মহাকবির পদাঙ্কানুসরণ করিয়া বলি, এত সুদৃশ্য দৃশ্য, এত রম্য বন-উপবন, ইতিহাসের এত মণি-মাণিক্য আছে যে পৃথিবীর লোকের দেখিয়া তৃষ্ণা মিটিবে না, আকাঙ্ক্ষা পুরিবে না, কখন অরুচি হইবে না! বিদ্যার মত এ ধন ফুরাইবার নহে—যতই করিবে 'দান', তত যাবে বেড়ে। আমাদের দেশের রেলওয়ে 'দিও কিঞ্চিৎ না করো বঞ্চিত' হিসাবে দুই দশটি স্থানের চিত্র বিজ্ঞাপনী করিয়া রেলের ষ্টেশনে ভাঙ্গা পাঁচিলে লটকাইয়া কর্ত্তব্যের শেষ করিয়াছে; তদধিক করিবার প্রয়োজন বিদেশী সরকার কোনদিন অনুভব করে নাই। আজ সে পাপ ঘুচিয়াছে; তোমার দেশ আজ তোমার। তোমার পণ্য তুমি বিক্রয় না করিলে কে করিবে? আমরা অনেক কেশ তৈল বাহির করিয়াছি, অনেক পুষ্পসার প্রচার করিয়া বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী হইয়াছে, দাদের মলম হইতে বিস্কুটের কারখানা করিয়া শিল্পপতি হইয়াছি; এখন কিছুদিন কেশ তৈলের অভাবে ইন্দ্রলুপ্ত ঘটে ঘটুক, ক্ষতি নাই। তাই বাঙ্গালি, তুমি দিন কতক ভবঘুরে সাজিয়া ভবঘুরে ধরিয়া আনিয়া তোমার দেশ—তোমার ভারতবর্ষ ভরিয়া দাও ত! একটা ভবঘুরে ব্যুরো করো, আমি পণ্ডিতজীকে ধরিয়া আনিয়া তোমার ললাটে জয়টীকা দেওয়াইব দিব্য করিলাম। জয় হিন্দ। বন্দে মাতরম্।

জাহানারার আত্মকাহিনী

অধ্যাপক শ্রীমাখনলাল রায়চৌধুরী শাস্ত্রী

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

আমি সমাধি অতিক্রম করে স্তম্ভ কক্ষে উপস্থিত হলাম। আমি কিন্তু ভারতবর্ষের কথাই ভাবছিলাম—আর হিন্দু নৃপতির আদর্শানুযায়ী পরিকল্পিত সম্রাট আকবরের স্তম্ভগুলি নিরীক্ষণ করলাম। প্রার্থনাবেদীর সম্মুখে চতুষ্পার্শ্বের পদ্মকোরকগুলি নীরব ভাষায় গৌতম বুদ্ধের জীবন-কথাই বলছিল। শাক্যমুনি বোধিতরু মূলে যে সত্য উপলব্ধি করেছিলেন, সে সত্যই ত একদা তৈমুরের চক্ষুতে অতি ক্ষীণ ছায়াসম্পাত করেছিল। তৈমুর বেগ শৈশবে কোন জীবন্ত প্রাণীকে আঘাত করেন নি, এমন কি একটা পিপীলিকাও পদদলিত করেন নি। একদিন সম্রাট আকবর মৃগয়ায় নির্গত হয়েছেন। বন্য পশু শীকার-চক্রের মধ্যে প্রবেশ করেছে—শীকারের তীব্র উন্মাদনা। অসংখ্য পশুর মৃত্যু আসন্ন—অকস্মাৎ সম্রাট অশ্ব সংযত করলেন; সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন, আদেশ দিলেন—"কোন প্রাণীর একটা প্রাণ নষ্ট করবে না—সমস্ত প্রাণীই পবিত্র।"

সেই দিনই সেই সত্যের জ্যোতি সম্রাট আকবরকে উদ্ভাসিত করেছিল।

মহব্বৎখানার এক গভীর ছায়াসমাচ্ছন্ন কোণে প্রার্থনাবেদীর পার্শ্বে মর্ম্মরতলে উপবেশন করলাম। মধ্যাহ্ন সূর্য্যের খর রৌদ্রে আমি ঘর্ম্মাক্ত হয়েছিলাম। আমার শিরায় ছিল উদ্বেগের চঞ্চলতা। আমি প্রাচীরের পার্শ্বে মাথা এলিয়ে দিলাম। ভাটা যেমন জোয়ারকে অনুসরণ করে, তেমনি আমার মধ্যেও বিশ্রান্তি এসে পড়ল, মনে হল যেন একটা দেবদূত কক্ষ অতিক্রম করে গেল। নিদ্রা এবং জাগরণের মধ্যে আমি ক্রমশঃ গভীর ভাবে সমাধিস্থ হয়ে পড়েছিলাম। তারপর যেন দেখলাম একটা উচ্চ পর্ব্বত শিখর। কোথায় যেন আমি এ জিনিষ দেখেছি। ক্রমশঃ সেই অস্পষ্ট জিনিষটা স্পষ্টতর হয়ে উঠে সরোবরের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। আমি দেখলাম পর্ব্বত গাত্রে একটা গহ্বর, তার পাশে গবাক্ষের আকারে একটা চতুষ্কোণ অর্গলের মতন পথ। সলিল-রেখাস্তে প্রস্তরে খোদিত একটা অস্পষ্ট হস্তী, তার উপরিভাগে একটা মানুষের মর্ম্মর মূর্ত্তি দেখতে পেলাম, অপূর্ব্ব এই ভাস্কর্য্য, মূর্ত্তিটা যেন জীবন্ত। সেই অচল মূর্ত্তি—আর শূন্যে নিবদ্ধ দৃষ্টি মূর্ত্তির পরম গম্ভীর ভাব—সত্যিই আমার ভীতির সঞ্চার করেছিল।

আবার পাষাণ গায়ে আলো জ্বলে উঠল। আলোর শিখা সরোবরের জলে প্রতিফলিত হয়ে ক্রমশঃ উজ্জ্বলতর হয়ে উঠল; মনে হল যেন জলতলে একটা সোণার বৃত্ত অঙ্কিত করে দিয়েছে। একটা বাণী শুনতে পেলাম:—"বহু দূরে বনে বসে আছেন এক ঋষি, ধ্যান নিমগ্ন। তাঁর নয়নের অজ্ঞান-অঞ্জন দূরীভূত; তিনি উপলব্ধি করেছেন মানুষ যা' ভোগ করে, যার জন্য সংগ্রাম করে, যার জন্য জীবনপাত করে, তার মূল্য কিছুই নেই। সে রাজকুমারী, সেই মহাপুরুষ পুরুষোত্তমের সাক্ষাৎলাভ করেছেন—তাঁর আর কোন আকাঙ্ক্ষা নাই। সমস্ত সুর তাঁর কাছে একটামাত্র ধ্বনিতে মিশে গেছে। সমস্ত বর্ণ বৈচিত্র্য একটা মাত্র আলোর শিখায় মিলে গেছে। সেই আলোর একটা শিখা তাঁর আত্মাকে উদ্ভাসিত করে দিয়েছে—তাঁর ইন্দ্রিয়ের সমস্তার ভিতর দিয়ে তিনি আত্মার বিশালতা উপলব্ধি করেছেন। তিনি ভারতবর্ষের যথার্থ সম্রাট…"

আমি হঠাৎ সম্বিৎ লাভ করলাম—যেন একটা হস্ত আমার স্কন্ধদেশ স্পর্শ করেছে। আমি অনুভব করলাম—আমার সূক্ষ্মদেহ সিংহল পরিদর্শন করে এসেছে। একবার আমি জলপথে সুরাট থেকে সিংহল গিয়েছিলাম,—অনুরাধাপুরে সেই ঋষির মর্ম্মর সৌধ অবলোকন করেছিলাম। কিন্তু আমি যে বাণী শুনেছিলাম, তা' স্পষ্টই শুনেছিলাম—তা' এসেছিল আমার দিল্লীর গ্রীষ্মাবাস থেকে।

আমার স্বপ্ন-জাগরণের বিহ্বলতায় আমি অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। আমি যেখানে বসেছিলাম—আমার শরীর যেন সেখানে স্নায়ুর মত ভূমিনিবদ্ধ হয়ে গেছে। তারপর আমি অনুভব করলাম বনৌষধি নিঃসৃত একটা মৃদু নির্য্যাসের সুগন্ধ; প্রার্থনালয়ের প্রবেশ দ্বারের সম্মুখে রক্ষিত কাংস্যপাত্রোত্থিত তীব্র কৃষ্ণকুহেলিকা। তার অভ্যন্তরে দেখলাম একটা মনুষ্যাকৃতি জীব! আমি আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম—তারপরই দেখলাম, শীর্ণকায় মানুষটা রাজপ্রহরী কর্তৃক বিতাড়িত জনতার একজন। লোকটা বোধ হয় জানত যে, সুবর্ণ পাত্র নিঃসৃত কস্তুরী অগুরু গন্ধ সম্রাট আকবরের ইবাদৎখানাকে(১) আমোদিত করছে। বোধ হয় তার উদ্দেশ্য ছিল, সে আমাকে সেই বনস্পতির অর্ঘ্য দিয়ে সম্ভাষণ করে তৃপ্ত হবে। আমাদের পরস্পরের দৃষ্টি বিনিময়ে দেখলাম তার নয়নে করুণ ব্যথা—এই বিষাদ কি তার অন্তরের রূপান্তরিত ব্যথা? তাকে আমার সর্ব্বোত্তম কঙ্কনটী উপহার দিলাম। ইবাদৎখানার বহির্ভাগে এসে আমার মনে খুব একটা তৃপ্তির ভাব এল—যেমন মেঘের কোলে সূর্য্য রশ্মি…

বিজয়িনীর গর্ব্বে আমি পথ চলতে লাগলাম, আমাদের যুদ্ধ-জীবন জয়ের পরে রাখিবন্ধ ভাইয়ের সাথে এই ফতেপুর শিক্রীতেই অতিবাহিত করব, এখানে তৌহিদ্-ই-ইলাহি (একেশ্বরবাদ) পুনরুজ্জীবিত হবে—সম্রাট আকবরের উদারমত আবার প্রচারিত হবে। আল্লাহ্‌র করুণা সর্ব্বজীবে সমভাবে বর্ষিত হউক।

আমি গম্বুজের নিম্নে বৃহৎ কক্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করলাম। আমি যে কেবল অতীতের বিষয়ই স্মরণ করেছিলাম তা নয়, অন্ধকারময় গহ্বর থেকে আমার ভবিষ্যৎ আনন্দের আভাস পেলাম।

কিন্তু তখনও আমি প্রার্থনা করতে পারিনি। সুতরাং আমি স্থির করলাম দ্বিপ্রহরের নমাজের জন্য অপেক্ষা করব পরের দিন সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত বিশ্রাম করব; রাজপরিবারের জন্য নির্দ্দিষ্ট একটী ক্ষুদ্র প্রাসাদে রাত্রি বাস করব। রাজতোরণের পার্শ্বে আমার জন্য শকট অপেক্ষা করছিল। আমি শহরের প্রাচীন অংশে চলে গেলাম। প্রাচীনই আজ আমাকে নূতনের মতন আকর্ষণ করছিল।

প্রথমে আমি মহল ই-খাসের সম্মুখে নেমে আদালত প্রাঙ্গণ অতিক্রম করলাম। এক সময় ফতেপুর শিক্রী ছিল ভারতবর্ষের অন্তঃস্থল, আর আমার সম্মুখের ক্ষুদ্র প্রাসাদটী ছিল ফতেপুর-শিক্রীর প্রাণ। এখানেই সেই মহাপুরুষ আকবর তাঁর ব্রাহ্মণ বন্ধুর (বীরবল) সঙ্গে বাস করতেন। এই প্রাসাদটী আমাকে হুমায়ুন বাদশাহ্‌র শিবির স্মরণ করিয়ে দিল—যেখানে আকবর জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সেখানে কোন রাজকীয় সম্পদ ছিল না। কেবল কস্তুরীপূর্ণ পাত্র ছিল—সম্রাট হুমায়ুন সেই কস্তুরী তাঁর সৈন্যদের মধ্যে বণ্টন করে দিয়ে বলেন:—

"আজ যেমন এই কস্তুরীর সৌরভ সমগ্র শিবিরের মধ্যে ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে তেমনি আমার পুত্রের খ্যাতি যেন পৃথিবীময় ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে…"

সম্রাট আকবরের সমাধি-প্রাসাদ ছিল ঐশ্বর্য্যময়, কিন্তু তাঁর আবাসস্থল ছিল আড়ম্বর-বিহীন। তার মধ্যস্থলে ছিল সম্রাটের শয়নকক্ষ। সেই কক্ষের নাম ছিল '(আখাজাব)-বাগ'।

'চাজীব' আমার মাথার উপরে আলোর আবরণ উন্মোচন করে, আমি প্রাসাদের সম্মুখে শুভ্র সেতু অতিক্রম করে সরোবরের মধ্যস্থিত মর্ম্মর দ্বীপে উপস্থিত হলাম। ঝরণার জল-কল্লোল এখন আর শ্রুত হয় না। কিন্তু তুর্কী-বেগমের প্রাসাদ এখনো জলের উপর প্রতিবিম্বিত হচ্ছে; সেই অপ্সরা মহলে প্রত্যেকটী শ্বেত-প্রস্তর যেন ক্ষোদিত গজদন্ত। স্তম্ভ গাত্রে ক্ষোদিত দেখা যাচ্ছে সম্রাটের প্রিয় ফলসম্ভার—আঙ্গুর, বেদানা, তরমুজ…।

আজকে কেন ঐ জলাশয়ের সমস্ত পদার্থ, সেই জলনিম্নের প্রত্যেকটী জিনিষ আমার কাছে স্পর্শায়ত্ত বাস্তব জিনিষের চেয়েও বাস্তব মনে হচ্ছে? এই মহলটী আমার অত্যন্ত আপন বলে বোধ হল। আমি খুব দ্রুতপদে অগ্রসর হলাম, তারপর আরও দূর স্বপনপুরীর পথে অগ্রসর হলাম। আমার মনে হল কে যেন আমার আশায় এখানে অপেক্ষা করছে। কে সেই মহাপুরুষ, যিনি বৃহতের মধ্যে বৃহত্তম—যিনি দীনের প্রতি দয়াময়—যাঁর মণিবন্ধে রয়েছে কঙ্কন!

যদিও এই কক্ষটী আয়তনে ক্ষুদ্র, এর মধ্যে অতি অপরূপ বর্ণ-সামঞ্জস্য রয়েছে—বিভিন্ন বর্ণচ্ছটা ঐক্যতান বাদ্যের সুরের মতন সুসজ্জিত। আমি শৈশবে এখানে প্রাচীর গাত্রে আটটী চিত্র দেখেছিলাম—তা এখনো আমার স্পষ্ট মনে পড়ে। একটী চিত্রে ছিল রক্তবসন পরিহিত বিরাট পুরুষ, তাঁর অধরপুটে নিবদ্ধ অঙ্গুলি। তাঁর পার্শ্ববর্ত্তিনী নারী দূরের পানে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে কি যেন ইঙ্গিত করছিল; একজন মানুষ চলেছে নগরকে পশ্চাতে ফেলে নৌকারোহণে,……। একটী শিশু আশ্চর্য্য হয়ে অনুসন্ধান করছে প্রাচীর গাত্রের নীল তোরণের অন্তরালে পিতামহের গচ্ছিত গুপ্তধন। সে রাজপ্রাসাদের দ্বারের উপরে স্বর্ণাক্ষরে ক্ষোদিত পারসী কবিতার তাৎপর্য্য অনুসন্ধান করছিল:—

"এই দরজার ধূলিকণা হুরীর কালো চোখের—সুর্‌মা হয়ে উঠুক। যারা দেবদূতের মতন শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত ক'রে তোমার দরজায়—তারা শুক্র তারকার মতন উজ্জ্বল হয়ে উঠবে ধূলিকণা স্পর্শ করে।"

শিশুটী কিন্তু গবাক্ষ গাত্রের উপর অঙ্কিত। চিত্রগুলি দেখে অধিকতর বিস্ময় বোধ করছিল। চৈনিক শিল্পরীতিতে অঙ্কিত বুদ্ধদেবের একটী চিত্র রয়েছে। নীলাভ মন্দিরে স্থাপিত ছিল সেই মূর্ত্তিটী—রক্তবর্ণ-স্বর্ণাভ পরিচ্ছদ; শিরে তাঁর ক্ষুদ্র একটা মুকুট। চতুপার্শ্বে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ছিল কতকগুলি নরমুণ্ড, কতিপয় খণ্ডিত নরদেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ—কোনটী পীতাভ রক্তবর্ণ, কোনটি কৃষ্ণবর্ণ, কোনটী শুভ্র, কোনটী বা স্বর্ণ প্রভ, কোন কোন মুণ্ড মুকুট শোভিত। আমার মনে হল যেন এই মূর্ত্তিটী স্বয়ং সম্রাট আকবরের প্রতিমূর্ত্তি—তার চারিদিকে রয়েছে পরাজিত শত্রু পরপারের অভিযাত্রী; এর বেশী কিছু ধারণা কর্ত্তে সাহস পাচ্ছি না। একটী চিত্রে রয়েছে—একটী দেবদূত অন্ধকার গহ্বর থেকে ছুটে বেরিয়ে পড়েছে—গহ্বরের মুখটী

(১) ফতেপুর শিক্রীতে আকবরের ধর্ম্মসভা। প্রতি শুক্রবারে নমাজের পর সভার অধিবেশন বসত।

বহু খোদিত প্রস্তর খণ্ড। একটু উপরে যুগল ময়ূর চিত্রিত। দেবদূতের মুকুট মুক্তাহার পরিশোভিত—পালকগুলি ঊর্দ্ধমুখী। দেবদূতের পক্ষদ্বয় তুষার শুভ্র—স্বর্গের বিহঙ্গমের মত সুন্দর, তার চঞ্চল পরিচ্ছদ স্বর্ণাভ-নীল-লোহিত,—কটিদেশে একখণ্ড শুভ্র বস্ত্র বিলম্বিত তার বাহুবন্ধ একটী নবজাত শিশু। এই শিশু কি শাহ্‌জাদা সেলিম? সেলিম চিস্তীর আশীর্ব্বাদে তার জন্ম—জন্মের পূর্ব্বে সেই রাজকুমার এই পুণ্য গুহাভ্যন্তরে বাস করতেন। আজও আমার সেই বিশ্বাস অটল। কিন্তু ফতেপুর-শিক্রীর অতীতের স্মৃতির কথা ত কেউ আলোচনা করে না।

যদি আমার পিতামহ জাহাঙ্গীর জন্মগ্রহণ না করতেন তবে কি সম্রাট আকবরের রাজ্য ধ্বংস হয়ে যেত? আমার মস্তিষ্কে চিন্তার স্রোত বয়ে চলেছে—এই গৃহে যে মহাপুরুষ চির নিদ্রায় শায়িত! তাঁর বংশে জন্মগ্রহণ করবার তাৎপর্য্য আমি একটু উপলব্ধি করলাম।

হঠাৎ আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করছে এক মৃদু করুণ গানের সুর। এই সুর কোথা হ'তে আসছে? স্বর্গলোক হ'তে সম্রাট আকবরের গায়কদের সুরের রেশ ভেসে আসছে; কোন অলৌকিক শক্তি যদি আমাকে সেই স্বর্গলোকের সঙ্গীত শোনবার শক্তি দিত! আমি আমার হস্তদ্বারা মুখমণ্ডল আবৃত করলাম,—মনশ্চক্ষে দেখলাম, যেন আমি আবার সেই যুগে প্রত্যাবর্ত্তন করেছি—যখন 'খাস্মাব বাগ' প্রভাতে সঙ্গীত মুখরিত হয়ে উঠত, আর সন্ধ্যার পূত বাতাসে ভেসে আসত সুমধুর সঙ্গীত ধারা। সেই অসংখ্য সুমধুর বাদ্যযন্ত্র সঙ্গীতের সুরে তান মিলিয়ে নিত। প্রভাতের প্রথমভাগে সঙ্গীত ছিল কোমল; দ্বিতীয়ভাগে বহু সুরের সংযোজনায় বহু বাদ্যযন্ত্রের ঐক্যতানে, করতালের কলরোলে একটী অপূর্ব্ব ঐক্যতান সঙ্গীত সৃষ্টি হত! দিবসের শেষে যখন সম্রাট আকবরের উপর ভগবানের আশীর্ব্বাদ যাচ্ঞা করা হত, তখন সমস্ত সঙ্গীত হয়ে উঠত মন্ত্রমুগ্ধ। জরথুস্ট্রের উপাসনা মন্দিরে বহুবার হত হয়ে পবিত্র অগ্নি যেমন উপাসকদের নয়নে দীপ্তি সঞ্চার করে, তেমনি সন্ধ্যার সঙ্গীত মানুষের কর্ণে করত আনন্দ সঞ্চার।

আমি অলিন্দের বাইরে এলাম, সঙ্গীত নিস্তব্ধ হ'য়ে গেছে। সরোবরের পাশে অপেক্ষা করছিল একদল মানুষ—তাদের হাতে ছিল বাঁশী ও তার-যন্ত্র। তারা উত্তেজিত কণ্ঠে পরস্পরের সঙ্গে আলোচনা করছিল। তাদের বিভিন্ন বর্ণের উষ্ণীষগুলি পরস্পর মিশে গিয়েছিল। তাদের মধ্যে একজন আমাকে চিনতে পেরেছিল। তার চোখে দীপ্তি ফুটে উঠল, এই সেই শীর্ণকায় ব্যক্তি। সে দলের অন্য লোক থেকে দূরে সরে গেল—তার বীণায় ঝঙ্কার দিয়ে একটা গান আরম্ভ করল।

এই সুরই ত তানসেনের অভিনন্দন। মেবারের রাণী মীরাবাইএর আত্মনিবেদন। মীরাবাই শৈশবেই শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি ভালবেসেছিলেন, সেই ভালবাসা জীবনের শেষ পর্য্যন্ত তাঁকে অভিভূত করে রেখেছিল। তাঁর সর্ব্বস্ব তিনি শ্রীকৃষ্ণকে উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁর ললাট আর কোন মানুষের সম্মুখে অবনমিত হয়নি……

সেই সঙ্গীত আমাকে শ্রীকৃষ্ণের রাজ্য শ্রীবৃন্দাবন নিয়ে গেল। শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ চিরবসন্তে গোপীগণের সম্মুখে বংশী বাদন করতেন। আমি সেখানে দেখলাম রূপসী মীরা দেবতার মূর্ত্তির সম্মুখে রহস্যময় নৃত্যের জন্য উৎসর্গিতা। মীরা তাঁর জীবনের সর্ব্বস্ব শ্রীকৃষ্ণের চরণে নিবেদন করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, যে মানব কৃষ্ণকে ভজনা করে তাহার বিনাশ নাই। এই শ্রীকৃষ্ণই বিষ্ণুর অবতার—তিনি পৃথিবীর পাপের ভার লাঘবের জন্য মনুষ্যদেহ ধারণ করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের আলোক সকলের আত্মাকে উদ্বুদ্ধ করে।

কিন্তু এই ছিন্নবস্ত্র-পরিহিত মানুষটি কে? কি গভীর দুঃখময় তার স্বর! ফতেপুরের বিষাদ-পুরীতে আমার পথ অতিক্রম করে সে আমার স্বপ্নের মাঝে আমাকে সাবধান করে দিচ্ছে। সে কি আমার এক বংশেরই সন্তান, সে আমারই মতন একই প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ? (১)

লোকটী মীরাবাইয়ের একটা কৃষ্ণ ভজন গেয়ে চলেছে। ক্রমশঃ তার সঙ্গীত আলোকময় হয়ে উঠল—সে সঙ্গীত আমার অন্তর মথিত করে দিল।

"আমি আমার রাজ্য পরিত্যাগ করেছি।

আমি আর রাজমহিষী নই, রাজ্য ও ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করেছি।

তোমার দাসী মীরা—তোমার আশ্রয়প্রার্থিনী মীরা।

মীরা তার দেহ—তার মন তোমায় সমর্পণ করেছে।"

মীরাবাই শেষ জীবনে দ্বারকার মন্দিরে আশ্রয় নিয়েছেন—আমরণ আশ্রমবাসিনী। সেই মন্দির, মন্দিরের প্রদীপ, পুষ্পসম্ভার আমার মনশ্চক্ষুতে মূর্ত্ত হয়ে উঠল। আশ্চর্য্য এই মানুষ। মীরা দেবী সেখানে তাঁর কালোমাণিককে আত্মোৎসর্গ করেছিলেন।

আজ মানুষ দেবতার সম্মুখে জীব-বলি দিচ্ছে—মীরার মূর্ত্তি দেবতার মূর্ত্তির বিপরীত দিকে স্থাপন করেছে। পুরুষোত্তম বংশীধারীর প্রেম ইহজগতে মীরাবাইকে তাপসী করেছে,—পরজগতে নারায়ণীর আসন দান করেছে।

আমার রক্তের মধ্য দিয়ে অগ্নিশিখা ছুটে চলেছে। যদিও অন্ধকার ভারতবর্ষকে সমাচ্ছন্ন করে, দারা যুদ্ধে পরাজিত হয়, যদি আমার প্রিয়তম রাওএর মৃত্যু হয়, তবু আমি তাঁর স্মৃতি পূজা করব—তিনি আমার চির বসন্তোদ্যানের রাজা—তিনি আমার শ্রীকৃষ্ণ।

"দশ পঁচিশী" খেলা-ঘর অতিক্রম করে দেওয়ান-ই-খাসে এলাম। বাদশাহ্ স্বয়ং একটী ক্ষুদ্র মর্ম্মর আসনে বসে সতরঞ্চ খেলতেন। জীবন্ত ক্রীতদাসী ছিল তার সতরঞ্চের চলন্ত ঘুটী। আমি সশ্রদ্ধ ভীত মনে সেই কল্পলোকের প্রাসাদের সম্মুখে দাঁড়ালাম; ভাবলাম; অতীতে কি ঐশ্বর্য্যের বিলাস ছিল এই স্থানে!

দেওয়ান ই-খাসের শ্রেণীবদ্ধ গবাক্ষের মধ্য দিয়ে দৃষ্টিক্ষেপ করলে ধারণা হয় প্রাসাদটী দ্বিতল; কিন্তু অভ্যন্তরে প্রবেশ করলে প্রতীয়মান হয় যে একটী বিরাট কক্ষ। আমি গবাক্ষ প্রান্তে বিশ্রাম করলাম, স্থানটী সুশীতল। সেই সঙ্গীতের রেশ তখনও আমার কানে আসছিল—

(১) খসরুর পুত্র দারবক্স সংসার ত্যাগ করে ফকির হয়ে গান গেয়ে বেড়াতেন, বোধ হয় জাহানারা তার গানের ইঙ্গিত করেছেন।

আমার সমস্ত শক্তি সংগ্রহ করে যেন আমি ভারতের সেই পবিত্র মন্দির রক্ষা করছিলাম, কারণ সে মন্দির দানব অধিকার কর্ত্তে চেয়েছিল।

কক্ষের মধ্যস্থলে প্রস্তরের স্তম্ভটী অপূর্ব্ব। মনে হয় যেন প্রকাণ্ড পুষ্পের মৃণাল কক্ষের মধ্যস্থলে স্থাপিত ছিল সম্রাট আকবরের রাজ-সিংহাসন। আমার কল্পনায় প্রতিভাত হল স্তম্ভটী বিরাট বিশ্ব বৃক্ষের কাণ্ড। যে বৃক্ষের পত্রপল্লব—অসীম শূন্য, তার ফল সূর্য্য চন্দ্র তারকা। মেরু পর্ব্বতে সেই বৃক্ষটী পরিণত হল—জ্ঞানবৃক্ষে, তার পার্শ্বে বিষ্ণু দেবতার অপরূপ স্তম্ভ। মেরু শিখরে সমাসীন ছিল দেবতার প্রতীক।

সম্রাট আকবরই ভারতের অজ্ঞান-অন্ধকার দূর করেছেন, তিনিই তৈমুরের রাজবংশকে গৌরবোজ্জ্বল করেছেন।

আমি উপরের গবাক্ষ দিয়ে প্রাচীরের পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ আসনগুলির দিকে দেখলাম। আমার মনে হল যেন সিংহাসনের পার্শ্বে সমাসীন অম্বররাজ বিহারীমল। তাঁরই কন্যার সঙ্গে বিবাহ হয়েছিল সম্রাটের। তিনিই ত জাহাঙ্গীরের জননী; আরও একজন দেখলাম বীর সেনাপতি রাজা মানসিংহ—কত যুদ্ধ জয় করেছিলেন—তিনি তৈমুর বংশের ক্ষমতা সুদৃঢ় করবার জন্য।

মধ্যস্থলের স্তম্ভকে কেন্দ্র করে চতুষ্ক নির্ম্মাণ করা হয়েছে। সৃজনী শক্তির প্রতীক চতুর্দ্দিক বিসপা সেতু চতুষ্টয়ও নির্ম্মিত হয়েছিল। আমি যেন দেখলাম—সম্রাটের অমাত্যগণ তাঁর সিংহাসনের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন—প্রথমে টোডরমল, সেই সাহসী বীর যোদ্ধা ও কোষাধ্যক্ষ; তাঁর চেষ্টায় সমস্ত দরিদ্র প্রজার প্রতি শস্য কর্ত্তনের সময়ে সুবিচার হ'ত। তারপর দেখলাম সম্রাটের প্রিয় বয়স্য রাজা বীরবল। তাঁর সুতীব্র পরিহাসগুলি এখনো আমাদের শ্রবণকে আনন্দ দেয়।—হঠাৎ দেওয়ান-ই-খাসের বিরাট প্রশস্তি অনুভব করলাম। প্রধান অমাত্য আবুল ফজলের আগমন, আবুল ফজল দীন-ই-ইলাহী প্রবর্ত্তন করে বিশ্বব্যাপী অগ্নি জ্বালিয়ে দিলেন। কক্ষের দূরতম কোণ থেকে আমি অসন্তোষের গুঞ্জন শুনতে পাচ্ছি * * *।

আমি দেখতে পাচ্ছি সম্রাট আকবর অতীত দিনের মত বিচারাসনে দণ্ডায়মান—অতি বিনম্র বেশ, বিনীত রাজশ্রী। কিন্তু কি দৃঢ়তাব্যঞ্জক দৃষ্টি! সে দৃষ্টিতে অত্যাচারী সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে, পীড়িতজন আশ্রয়ের সন্ধান পায়। তাঁর মুখমণ্ডলে প্রতিভাত হয় আত্মার দীপ্তিশিখা। এই বিদেশী বংশজাত রাজপুত্রের রাজ্য সহস্র যোজনব্যাপী—পূর্ব্বে ঢাকা, পশ্চিমে কাবুল, উত্তরে কাশ্মীর, দক্ষিণে আহ্মদনগর। এই বিরাট রাজ্যের প্রজাবৃন্দের কল্যাণের জন্য তাঁর কি সদাজাগ্রত দৃষ্টি! বোধ হয় কোন 'গ্রামণী' ও (১) তার গ্রামবাসীর সুখ সুবিধার জন্য অত উদ্বিগ্ন ছিল না। শিরা যেমন শরীরের বিভিন্ন অংশে হৃদপিণ্ড থেকে রক্ত সঞ্চালন করে—তেমনি সম্রাটের আদেশ বহন করে সম্রাটের অমাত্যগণ দেশ

[illegible]

হইক—এই

কর্ত্তে চেষ্টা করেছেন। সূর্য্যালোক পত্রে পত্রে প্রবেশ করে উদ্ভিদের প্রাণসঞ্চার করে, সম্রাট আকবরও তেমনি সমগ্র রাজ্যে প্রাণশক্তি সঞ্চার করেছেন। সুতরাং রাজ্যের প্রজাকুল বিদ্রূপ দূরাতিরিক্ত [illegible] আকবরের সম্মুখে কৃতজ্ঞচিত্তে অর্ঘ্য প্রদান করত। যদিও জিজিয়াকর উচ্ছেদ করা হয়েছিল, তবু সম্রাটের রাজকোষ পরিপূর্ণ ছিল।

ঈশ্বরের প্রতিনিধি সম্রাট আকবর ঘোষণা করেছিলেন, "মানুষের অন্তর সহস্র পথে তার লক্ষ্যের সন্ধান করে।" সেই শক্তিমান সম্রাট প্রত্যেক মানুষকে এই সত্য প্রমাণ করবার অবাধ অধিকার দিয়েছিলেন। সেই দিন কোণারকের সূর্য্য মন্দিরে, আবু পর্ব্বতের দেবমন্দিরে, অজন্তা এলোরার গুহাভ্যন্তরে প্রস্তর নির্ম্মিত দেবমূর্ত্তিগুলি কি জীবন্ত হয়ে উঠে নি? সমস্ত দেশব্যাপী অসংখ্য দেবতার গৃহে কি মানুষ মস্তক অবনত করে এই সত্য প্রচার করে না? যখন অসংখ্য তীর্থযাত্রী পুণ্যতোয়া স্রোতস্বতী সলিলে অবগাহন করে আত্মশুদ্ধি করতে আসত—তখন তাদের সঙ্গীতে কি সম্রাটের প্রার্থনার সুর মিশে যেত না?

আমি সেই সুদূর অতীতের ঐশ্বর্য্যের মধ্যে কিসের দীপ্তি—কিসের ঔজ্জ্বল্য দেখছি? আমি দেখছি দিল্লীর ময়ূর সিংহাসন দিনরাত্রি খোজাপ্রহরীবেষ্টিত? আমার কল্পনায় ভেসে আসছে আমার সম্রাট-পিতা তাঁর পূর্ব্ব গৌরবে ময়ূর সিংহাসনে সমাসীন, চন্দ্রাতপের নিম্নে দ্বাদশ স্তম্ভ থেকে স্ফুরিত হচ্ছে সহস্র প্রস্তরের উজ্জ্বল আভা। না, না, সেই আভা যে সিংহাসনেরই দীপ্তি। তারপর আমি দেখলাম সম্রাট একটী পিঞ্জরে আবদ্ধ, তৈমুর বায়াজিদকে যে পিঞ্জরে বন্দী করেছিলেন। তাহা এই পিঞ্জরের চেয়ে কম ভীষণতর নয়।

কিন্তু আমাদের এখানে ছিল বিশ্ব-কল্পদ্রুম।

যখন 'হাজির' পুনরায় আমার মাথার উপরে আলোর আবরণ উন্মোচন করে দিল—আমার মনে হল আগ্রা বহুদূর। অতীত আমার বর্ত্তমানে পরিণত হল। ভবিষ্যৎ মনে হল আমার মাত্র একটী দিন—অর্থাৎ আগামীকাল। ঐ শোনা যাচ্ছে নহবৎখানায় তানসেনের সুমধুর সুর বেজে উঠেছে—তারা—দারা শুকোকে অভিনন্দন করবে—দারা চলেছেন ফতেপুরে তিনি তাঁর প্রথম দরবার উদ্বোধন করবেন।

মহল-ই-খাসের বালিকা বিদ্যালয়ের মধ্য দিয়ে আমি রাজপথের উপর এলাম। পথগুলি প্রশস্ত, প্রত্যেকটী পথ প্রাসাদসংলগ্ন, কিন্তু প্রত্যেকটী পথের নিজস্ব রূপ আছে, একটী অন্যটী থেকে বিভিন্ন—ভীষণ তীব্র সূর্য্য কিরণে কোন প্রাণীই দৃষ্টিপথে পড়ে না—কিন্তু বাতাস যেন কি একটা আশঙ্কায় কম্পমান।

ঐ বিপরীত দিকে পাঁচমহল (২)। মনে হয় যেন প্রাসাদটী একটী সুললিত পদ্ম; প্রাসাদের পাঁচটী তল সূচিকণ ক্ষোদিত প্রস্তর স্তম্ভ

---

(১) "গ্রামণী" ভারতের গ্রামদেশে প্রত্যেক অঞ্চলে শাসন ব্যবস্থা ছিল। গ্রাম-বৃদ্ধ অথবা গ্রামণী গ্রামবাসীদের কল্যাণের জন্য দায়ী ছিল, সুতরাং তার সদাজাগ্রত দৃষ্টি গ্রামবাসীদের মঙ্গল সাধনে নিয়োজিত ছিল।

(২) পাঁচমহল বৌদ্ধ বিহারের স্থপতি রীতি অনুসারে নির্ম্মিত হয়েছিল। সম্রাট আকবর ধর্ম্ম সমন্বয়ের প্রচ্ছদপটরূপে শিল্পকলা করতে চেষ্টা করেছিলেন।

দিয়ে নির্ম্মিত। সর্ব্বনিম্নতলে স্তম্ভের সংখ্যা ক্রমশঃ লঘু হয়ে গেছে। সর্ব্বশেষে একটা চন্দ্রাতপ চারিটী স্তম্ভের ভিত্তির উপরে স্থাপিত।

আমি অভিভূত ব্যক্তির মতন প্রাসাদে প্রবেশ করলাম। প্রথম কক্ষে আমি দীন-ই-ইলাহী সম্প্রদায়ের শিষ্যদের দেখলাম। তাদের মধ্যে অনেককে পূর্ব্বে দেওয়ান-ই-খাসে দেখেছিলাম। আমি মনশ্চক্ষে দেখলাম পরস্পর গম্ভীর আলোচনা চলেছে। স্তম্ভ পার্শ্বে মাথার উপরে ছাদের নীচে ক্ষোদিত রয়েছে পুতপদ্মপুষ্প, নিম্নমুখী পুষ্পদল ছড়িয়ে রয়েছে—যেন ধরিত্রীকে বক্ষে ধারণ করে আছে। এখানে বৌদ্ধ সংঘের মতন মানুষকে সংসার ত্যাগ করতে উপদেশ দেয়নি। প্রথমস্তরে দীন-ই-ইলাহী ধর্ম্মের নির্দ্দেশ ছিল যে, ইলাহীয়গণ তাদের সমস্ত পার্থিব সম্পদ সম্রাটকে নিবেদন করবার জন্য প্রস্তুত থাকবে।

আমি দ্বিতীয়তলে আরোহণ করলাম—চিন্তা করলাম দ্বিতীয় স্তরের বিষয়; এই স্তরে ইলাহীয়গণ সম্রাটের জন্য প্রাণত্যাগ করতে প্রস্তুত থাকবে। এই পার্থিব সাম্রাজ্য গঠনেরও প্রয়োজন আছে।

এখানে ছাপ্পান্নটী স্তম্ভ আছে—কোন একটী অপরটীর মতন নয়। কি অপরূপ এই স্তম্ভবীথি—প্রত্যেক স্তম্ভ এক একটী নিজস্ব বাণী প্রচার করছে। আমি সুন্দরতম স্তম্ভকে বাহুপাশে আবদ্ধ করলাম। আর সম্রাট আকবরের সাম্রাজ্যের স্তম্ভস্বরূপ অমাত্যদের কথা ভাবলাম। আমি স্তম্ভটীর পার্শ্বে আমার কপোল স্তম্ভ করলাম।

সেই মুহূর্ত্তে কক্ষের ভিতর দিয়ে এক ঝলক বাতাস বয়ে গেল। বাতাস আমাকে একটী আনম্র বসন্ত পল্লব উপহার দিয়ে গেল। সেই পল্লবটী এসেছিল আমার কাছে অতীতের বার্ত্তার রূপ নিয়ে—আমার মধ্যে পুনরায় জীবনের তীব্র জ্বালা ফুটিয়ে তুলল। আমি শিলাতলে অস্থির চরণক্ষেপে চলতে লাগলাম। আমরা ভ্রাতাভগ্নিগণ ত এই প্রাঙ্গণেই শৈশবের খেলা খেলেছি। সেদিনগুলি আমার স্পষ্ট মনে আছে—কেমন করে সেদিন দারা-শুকো একটী ময়ূর পুচ্ছ তার উষ্ণীষে লাগিয়ে তার শির সঞ্চালন করে 'রাজা রাজা' খেলেছিলেন; ঔরঙ্গজেব প্রাসাদের কোণে বসে বসে মালা সঞ্চালন করছিলেন। গোলাপী শাড়ী প'রে আমার ছোট ছোট বোনগুলি স্তম্ভকে বেষ্টন করে লুকোচুরী খেলত।

আমি যে স্তম্ভটীকে আলিঙ্গন করেছিলাম—তার পাশে আমি নীরবে দাঁড়িয়ে রইলাম, আর দেখছিলাম...

এখনো যেন দেখলাম, একটা বিক্ষুব্ধ বাতাস দারার ময়ূর-পুচ্ছকে উড়িয়ে নিয়ে গেল। ঔরঙ্গজেব বসে মালা হস্তে তার মস্তক উত্তোলন করে দেখলেন—তার দৃষ্টিতে ছিল তাচ্ছিল্যের হাসি। দারা দাঁড়িয়ে ছিল—বিহ্বল দৃষ্টি।

তখনও আমরা শিশু—আমাদের মধ্যে কেহই ভবিষ্যৎ ভাগ্যের কথা চিন্তা করিনি।

আমি অতীতের স্মৃতি আর বর্ত্তমানকে বিস্মৃত হবার জন্য তৃতীয়তলে চলে গেলাম। আমার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গে তীব্র শিহরণ অনুভব করছিলাম। আমাদের মধ্যে অনেকেই সম্রাট আকবরের ভারতবর্ষের জন্য আমাদের জীবনপণ কর্ত্তে পারিনি। বিংশতি স্তম্ভের অন্তরালে আমি সমস্ত নগরের বিভিন্ন অংশ দেখলাম—অবশ্য তখন নগরে সামান্য অংশমাত্র অবশিষ্ট ছিল। আমি ইন্দ্রিয়াতীত দৃষ্টি দিয়ে অনেক কিছুই দেখলাম, কারণ আমি ফতেপুর সম্বন্ধে আবুল ফজলের বিবরণী পাঠ করেছিলাম। আমি চিত্রশালা নিরীক্ষণ করলাম, এইখানে ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আমন্ত্রিত ইলাহীয় শিষ্যগণ সমবেত হয়েছিলেন। পৃথিবীর নানা দেশ থেকে অনেক জ্ঞানী গুণী এসেছিলেন—এই নগরীর খ্যাত গজনীর মত বিশ্ববিশ্রুত ছিল। ইলাহীয়া শিষ্যগণ সম্রাট আকবর ও আবুল ফজলকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। ইরাণীর চিত্রকর একমাত্র হিরাত ও সিরাজ থেকেই সংগ্রহ করে নিয়ে আসতেন তা নয়। খিলাফতের যুগের এবং প্রাচীন চীন দেশেরও অনেক চিত্র তারা সংগ্রহ করে এনেছিলেন। এই চিত্রশালায় মহিমমণ্ডিত অতীত যুগের মূর্ত্তি এই সমস্ত তরুণ চিত্র শিল্পীদের মনে এক অপূর্ব্ব মন্ত্রশক্তি সঞ্চার করেছিল। ভারতের পুষ্পসার থেকে সংগৃহীত রস দিয়ে তাঁরা চিত্রশালায় রঙের খেলার নবীন স্বপ্ন দেখতেন। নবীন চিত্রকর সৃষ্টি করল নিত্য নতুন অপরূপ প্রচ্ছদপট। তাদের কল্পনা তৈমুর রাজবংশের গ্রন্থাগারের সুবিখ্যাত প্রাচীন চিত্রাবলীর সমতুল। কিন্তু হিন্দুরাই ছিল সর্ব্বোত্তম অঙ্কনশিল্পী—তাঁরা যেন তখনও অজন্তার গুহাপীঠে সমাসীন হয়ে তুলিকা-সম্পাতে বহির্জগতের জীবনের প্রাচীর রূপায়িত করছিলেন।

এবার মনে হচ্ছিল নগরীর কর্ম্মকোলাহল আমার কাণে এসে পৌঁছচ্ছে। আমি মুদ্রাশালা দেখলাম, সেখানে পৃথিবীর মধ্যে সুন্দরতম মুদ্রা বাদশাহদের চিত্র সম্বলিত হয়ে তৈরী হত। যন্ত্রগৃহ দেখলাম—তার মধ্যে রয়েছে সম্রাটের আবিষ্কৃত বৃহৎ কামানশ্রেণী।

শতাধিক যন্ত্রশালা দেখলাম—সেখানে সভাকক্ষের জন্য রেশমের উপর স্বর্ণ রৌপ্যের সূত্রখচিত ঝালর তৈরী করা হত। অপূর্ব্ব লিপি সম্বলিত পুস্তক লিখিত হয়। প্রতিক্ষেত্রেই স্বয়ং সম্রাট উপস্থিত আছেন—তিনি নিজেই সকল কাজের তত্ত্বাবধান করেন। সম্রাটের পরীক্ষমান চক্ষুর অগোচরে প্রাচীর গাত্রে কোন রেখা সম্পাত হত না—অথবা কোন পুস্তক চিত্রালঙ্কৃত হত না।

তারপর দেখলাম; গ্রন্থাগারে সেখানে রয়েছে শ্রেণীবদ্ধ সুন্দর কারুকার্য্যখচিত পাণ্ডুলিপি—তৈমুরের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রত্নরাজি। সেগুলি বাদশাহ্ বাবর ইরাণ থেকে ভারতবর্ষে স্থানান্তরিত করেছিলেন। সেখানে রয়েছে সম্রাট আকবরের ভারতবর্ষ, পারস্য, আরব, গ্রীস, প্যালেষ্টাইন থেকে সংগৃহীত কাব্য ও দর্শন। অত গ্রন্থ তাঁর কোন পূর্ব্বগামী অথবা পশ্চাদ্‌গামী কোন সম্রাটই সংগ্রহ কর্ত্তে পারেন নি। একখানি পুস্তক ছিল অপরূপ সুন্দর—অলঙ্কৃত তৈমুরের জীবনী ও বিধান—যা' আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি। সে পুস্তকে আছে:—

"আমার বংশমর্য্যাদার গর্ব্বে আমি আমার আত্মীয়তার বন্ধন বা দানের মর্য্যাদা নষ্ট করি নাই এবং আত্মীয়দের বিনাশ করতে কিংবা শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতে আদেশ প্রচার করি নাই।"

রাজপ্রাসাদের প্রত্যেক তলে দ্বারদেশে পৃথিবীর নৃপতিবৃন্দ তৈমুরের অভ্যর্থনার জন্ম দণ্ডায়মান থাকতেন। যখন তৈমুর বিরাট আড়ম্বরের সঙ্গে তাঁর ছয়টী পৌত্রের বিবাহ উৎসব 'কানিগুল'(১) উদ্যানে সুসম্পন্ন করেছিলেন। পৃথিবীব্যাপী মোগল সাম্রাজ্য তাঁর বংশধর দ্বারা একসূত্রে গ্রথিত থাকবে—এই কি তাঁর স্বপ্ন ছিল না?

তৈমুরের মতন রাজ্যজয়ের জন্ম সম্রাট আকবর অসংখ্য দেশ ধ্বংস করেন নি। তাঁর অভিলাষ ছিল, ভারতবর্ষ তার পুরাতন ভিত্তির উপর পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হউক, দিল্লীর চতুষ্পার্শ্বে তৈমুরের শেষ বংশধরগণ শান্তি-শিবির প্রতিষ্ঠিত করুক।

একটী বিরাট মহীরুহ সেই বীজ থেকে গড়ে উঠেছিল, তার শাখা-প্রশাখা কি এখন খণ্ড বিখণ্ড হয়ে যাবে? সেই প্রকাণ্ড কাণ্ডটী পৃথিবীর বুক থেকে লুপ্ত হওয়া পর্য্যন্ত কি তার ফলগুলি নিরর্থক হয়ে যাবে? এই জন্ম কি বাবর ভারতবর্ষে এসেছিলেন? আমার অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে আর একখানি গ্রন্থ অবলোকন করলাম,—"সর-ই-আস্‌রার"(২) বেদের জ্ঞানকাণ্ড। শাহ্‌জাদা দারা সেই পুস্তকখানি পারসী ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। দীন্-ই-ইলাহি শিষ্যের উপযুক্ত কাজ বটে।

নিম্নতল থেকে পরিহাস-ব্যঞ্জক হাসি শুনলাম। আমি ঔরঙ্গজেবের বিস্ফারিত দন্তপাটি দেখলাম—হিংস্র পশু তার ভিতরে জাগ্রত হয়ে উঠেছে। সেই ত দারাকে আখ্যা দিল—"রাফিজী" অর্থাৎ বিধর্ম্মী, ধর্ম্মদ্রোহী, অবিশ্বাসী; তাকে পৌত্তলিক অপবাদ দিয়ে পৃথিবী থেকে অপসারিত কর্ত্তে হবে। আঃ, একথা আমি পূর্ব্বে বুঝিনি কেন?

দীন্-ই-ইলাহি শিষ্যগণ তৃতীয় স্তরে সম্রাটের জন্ম আত্মসম্মান নিবেদন করতেন। আত্মসম্মান ত মানুষের নিকট তার প্রাণের অপেক্ষাও মূল্যবান। "সর ই-আসরার" গ্রন্থে দারা সম্রাট আকবরকে শ্রদ্ধা নিবেদন করছিলেন—হে অদৃশ্য জগতের বিধাতা!

আল্লাহ্‌ আমার ভ্রাতার উপর আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করুক।

আমি আরও উপরের তলে দ্বাদশ স্তম্ভের কক্ষে উপস্থিত হলাম।

চতুর্থ স্তরে দীন-ই-ইলাহির শিষ্যগণ বাদশাহের ধর্ম্ম অনুসরণ করবে। দ্বিপ্রহর নামাজের সময় হয়েছে, আমি নতজানু হয়ে যুক্তকরে উপবিষ্ট হলাম।

মুয়াজ্জিনের কণ্ঠস্বর বায়ুমণ্ডল ভেদ করে চল্ল। সম্রাট আকবর যে মুহূর্ত্ত থেকে ঈশ্বরের একত্ব চিন্তায় নিমগ্ন সেদিন থেকে জুম্মা মসজিদে নামাজের সময় ঘোষণার জন্ম এই মুয়াজ্জিন অপেক্ষা করে থাকেন।

একটী আলোর শিখা আমাকে পরিবৃত করে ফেল্ল, আমার আত্মা সেই আলোকে অবগাহন করে নিল। আমি অনুভব করলাম—সম্রাট আকবরের নয়ন কিভাবে উন্মিলিত হয়েছিল।

সম্রাট আকবর শৈশবে অস্ত্রের মধ্য দিয়ে সত্য উপলব্ধি কর্ত্তে চেষ্টা করেছিলেন। যৌবনে তিনি অভিষ্ট সন্ধানদাতা গুরুর সন্ধান না পেয়ে নিরাশ হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি ধারণা কর্ত্তে পারেননি যে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রতি পদক্ষেপেই তিনি তাঁর অভিষ্ট লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হয়েছিলেন।

আমি যেন স্বপ্নের মধ্যে ইবাদৎখানার উলেমা ইমামদের দেখলাম। তাদের উষ্ণীষ ঝড়ের দোলায় সুবৃহৎ পুষ্পের মতন আন্দোলিত হচ্ছিল। এই সমস্ত জ্ঞানী শাস্ত্রের বিধান ছিন্ন করে দিচ্ছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আতিশয্যের আবেগে পরস্পরকে ছিন্ন করতে দিতেন। আমি দেখলাম—রাত্রিতে পণ্ডিত ও সুফীগণ সম্রাটের শয়নকক্ষের বারান্দায় দোলায় আন্দোলিত হয়েছেন। দোলায় সমাসীন হয়ে নক্ষত্রের নীচে তাঁদের জ্ঞান ভাণ্ডারের ব্যাখ্যা সম্রাটের নিকট শুনাতেন। তাঁরা বলেছিলেন—"মানুষ নিজের চেষ্টায় যোগবলে নিজের শরীরকে সূক্ষ্ম ক'রে (৩) বিদেহ ক'রে হীরকের অণুর মধ্যে প্রবেশ কর্ত্তে পারে অথবা দেহকে চন্দ্রগ্রহের প্রান্ত দেশে নিয়ে যেতে পারে। মানুষ নিজকে আলোর রেখার মধ্য দিয়ে উর্দ্ধলোকে নিয়ে যেতে পারে, অথবা ধরিত্রীর অন্তস্থলে বিলীন করে দিতে পারে, আবার ভেসে উপরে উঠতে পারে তাদের কাছে জলও ভূমি সমান পদার্থ।

আমি দেখলাম, তখনও সমস্ত জগৎ নিস্তব্ধ, প্রভাতের আকাশ ক্রমশঃ নীল পাংশু বর্ণ ধারণ করতে আরম্ভ করেছে—সম্রাট ফতেপুর শিক্রীর এক পরিত্যক্ত কোণে একখণ্ড বৃহৎ প্রস্তরের উপর সমাসীন। নির্জ্জন নিশীথে চিন্তায় নিমগ্ন সম্রাট সেই স্বপ্নলোক থেকে নির্গত হয়েছেন, প্রভাতের প্রথম বাতাস তাঁর শরীরকে স্নিগ্ধ করে দিচ্ছিল, কিন্তু জীবনের অপর তীরেই মৃত্যু। তাঁর স্থূলদৃষ্টি বক্ষনিবদ্ধ, তাঁর আত্মার দৃষ্টি অন্তর্মুখী। সেই রাজ্যে তিনি অভিষ্ট পদার্থের সন্ধান পেয়েছেন। (ক্রমশঃ)

(১) "কানিগুল" উদ্যান সমরখন্দের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রমোদ কানন।

(২) "সর ই-আস্‌রার" দারা শুকো সংকলিত উপনিষদের সার সংগ্রহ। ১৬৫৫ সালে লিখিত হয়েছিল। হিন্দু মুসলিম সমন্বয়ের অপরূপ চেষ্টা।

(৩) বাদায়ুনী বলেন সম্রাট আকবর হিন্দুযোগ ও বৌদ্ধতন্ত্র আলোচনাও অভ্যাস করেছিলেন এবং কতগুলি অলৌকিক শক্তি সঞ্চয় করেছিলেন। আমার দীন-ই-ইলাহী গ্রন্থে এ বিষয়ে বিশেষ আলোচনা করেছি।

"বাঙ্গালী হিন্দু"

শ্রীগোপেন্দ্রকৃষ্ণ দত্ত এম-এ

ভারতবর্ষে যতগুলি প্রদেশ আছে তাহাদের মধ্যে বাঙলা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। বাঙলাকে আমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিলাম, হয়ত এই কথায় অবাঙ্গালীরা ক্রোধান্বিত হইবেন। কিন্তু যাহা সত্য—সর্ব্ববাদিসম্মত তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। বাঙ্গালীর জ্ঞান, বাঙ্গালীর বুদ্ধি, বাঙ্গালীর বিদ্যা, বাঙ্গালীর শক্তি, বাঙ্গালীর তেজস্বিতা, বাঙ্গালীর শিল্পকলা, বাঙ্গালীর ধ্যানধারণা প্রভৃতি চিরপ্রসিদ্ধ। গোপালকৃষ্ণের অমরবাণী—What Bengal thinks to-day, India thinks to-morrow (বাঙলা যাহা আজ ভাবে, ভারতবর্ষ তাহা কাল ভাবে),—কি বাঙ্গালীর গুণগরিমার জলন্ত সাক্ষ্য দেয় না? গোপালকৃষ্ণ ছিলেন বিদ্বান, উদার, শ্রদ্ধাবান, গুণগ্রাহী ও হিংসা দ্বেষ পরিশূন্য; সেই জন্ত তিনি বাঙ্গালী জাতির বিদ্যাবুদ্ধিজ্ঞানাদিগুণে মুগ্ধ হইয়া জীমূতমন্দ্রে মুক্তকণ্ঠে সত্য প্রচার করিয়াছিলেন।

ইংরাজ প্রথমে বাঙ্গালীকে মেষসদৃশ নিরীহ জীব ভাবিয়াছিলেন; তাই টমাস ব্যাবিংটন মেকলে তাঁহার "Warren Hastings" নামক প্রবন্ধে স্পষ্টাক্ষরে লিখিলেন—A war of Bengalies against Englishman was like a war of sheep against wolves, of men against demons. এতদ্ব্যতীত তিনি বাঙ্গালীকে মিথ্যাবাদী, ফাঁকিবাজ, জালিয়াত ইত্যাদি অনেক মুখরোচক বিশেষণে বিশেষিত করিলেন। পরে ইংরাজগণ দেখিলেন—বাঙ্গালী মেষ নয়, শার্দ্দূলের মত ভয়ঙ্কর—মানুষ—'টেররিষ্ট'। কিন্তু ইহাও ভুল। বাঙ্গালী মেষও নয়, ব্যাঘ্রও নয়, বাঙ্গালী মানুষ—আকাশের মত উদার, কুসুমের মত কোমল, আবার প্রয়োজন হইলে বজ্রের মত কঠিন। বাঙ্গালী হিন্দু—'কন্‌জার ভেটিভ' (সংরক্ষণশীল)।

ভারতবর্ষ হিন্দুর দেশ, আর বাঙ্গালী সেই দেশের শ্রেষ্ঠ ও বিশিষ্ট জাতি। হিন্দু বলিতে আমরা বুঝি যিনি সভ্য তিনিই হিন্দু। সভ্যতার মধ্যে আছে বিদ্যা, বুদ্ধি, বিবিধ শাস্ত্রজ্ঞান, সত্যবাদিতা, ত্যাগস্বীকার, নিঃস্বার্থপরতা, নৈতিক নিয়মানুবর্ত্তিতা, প্রীতি-পরায়ণতা, পরোপকার-প্রবৃত্তি ইত্যাদি। হিন্দুর উপর দিয়া কত বটিকাতরঙ্গ বহিয়া গিয়াছে, গ্রীক, সিদিয়ান, মঙ্গোলিয়ান, তাতার, মুসলমান, পর্ত্তুগীজ, দিনেমার প্রভৃতি কত বিদেশী হিন্দুদের আক্রমণ করিয়াছে। শেষে ইংরাজ প্রায় ২০০শত বৎসর ধরিয়া ভারতবর্ষে রাজত্ব করিয়াছে, কিন্তু তবুও হিন্দু এখনও সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। ইহার প্রধান কারণ হিন্দুর সংরক্ষণশীলতা। হিন্দুধর্ম্ম ঠিক ন্যগ্রোধ পাদপের ন্যায়, ইহার শাখা প্রশাখা বীভৎস অত্যাচার, অবিচার ও অনাচারের মধ্যে পড়িয়া কতক পরিমাণে ভগ্নদশাগ্রস্ত হইয়াছে সত্য, কিন্তু ইহার গুঁড়ি অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

হিন্দু সকলকে সমানভাবে ভালবাসে—মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ মানে না, কারণ হিন্দু বেদান্তবাদী—প্রেমের পূজারী—সত্যের উপাসক। হিন্দু সেনেকার ন্যায় সাম্যবাদী, হাওয়ার্ডের ন্যায় পরোপকারী, মহম্মদের ন্যায় উদার, যীশুখৃষ্টের ন্যায় প্রেমিক। রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, পরমহংস, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয় হিন্দু। খৃষ্টপূর্ব্ব ১৫০০ শতাব্দী হইতে খৃষ্টপূর্ব্ব ৫০০ শতাব্দী পর্য্যন্ত হিন্দুধর্ম্ম জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, দর্শনে, শিল্পে, সঙ্গীতে ও চিকিৎসা-শাস্ত্রে এতাদৃশ উন্নতিলাভ করিয়াছিল যে অন্য কেহ তাহার সমকক্ষ হইতে পারে নাই। প্লাইনি (Pliny), ষ্ট্রাবো (Strabo), মেগাস্থিনিস্ (Megasthenes), হেরোডোটাস্ (Herodotus) প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ হিন্দুর তদানীন্তন শ্রেষ্ঠতার কথা নিঃসঙ্কোচে স্বীকার করিয়াছেন। ওয়ারেণ হেষ্টিংসের আমলে চার্লস্ উইলকিন্‌স্ নামক জনৈক ইংরাজ ভাগবদ্গীতার অনুবাদ করেন। বিখ্যাত লেখক কারলাইল (Carlyle) গীতার উক্ত অনুবাদ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ পাঠ করিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। আমেরিকার বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থকার এমারসন উপনিষদ পাঠে অপূর্ব্ব আনন্দলাভ করিতেন। আমেরিকায় তিনিই প্রথমে হিন্দুর চিন্তাধারা প্রচার করিয়াছিলেন। ইউরোপের প্রসিদ্ধ দার্শনিক সোপেনহার (Schopenhauer) হিন্দুধর্ম্মের মূল বেদান্তদর্শনের বিষয় উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, "I know of no other thought which is more ennobling than the Vedanta. It has been the solace of my life and it will be the solace of my death."

Miss Katherine Mayo ও Miss Patricia Kendall নাম্নী দুটী সুলেখিকা ভারতীয় হিন্দুদের নামে জঘন্য কুৎসা রটাইয়া বেশ দু'পয়সা রোজগার করিয়াছেন, এতদ্ব্যতীত আরও কয়েকজন মহাশয় ইংরাজ-আমেরিকান এসিয়ার অধিবাসীবৃন্দকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন "...they are still animals." সুতরাং তাহাদের শাসনের জন্য "The man with the whip"এর দরকার। শ্বেতাঙ্গদের এরূপ মিথ্যাপ্রচার সত্ত্বেও পাশ্চাত্যদেশ হিন্দুর চিন্তা ও আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াছে ও হইতেছে। "Benjamin Disraeli (Lord Beaconsfield) ইউরোপের দীনতা ও হীনতায় ব্যথা পাইয়া বলিয়াছেন, "Unhappy Asia! Do you call it unhappy Asia?—this land of divine needs and divine thought! Its slumber is more vital than the waking life of the rest of the globe, as the dream of genius is more precious than the vigils of ordinary men. Unhappy Asia do you call it? It is the unhappiness of Europe over which I mourn."

জগতের মধ্যে হিন্দুরা একটী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতি,—একথা মানিয়া লইয়াছেন, ইউরোপ ও আমেরিকার নবীন ও প্রাচীন শিক্ষিত

সম্প্রদায় ; আর বাঙ্গালী সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠশ্রেণীভুক্ত। সুতরাং বাঙ্গালী অতীত গৌরবে গৌরবান্বিত। আজ যাহা ইউরোপ ও আমেরিকায় গৌরবের বস্তু হইয়া পড়িয়াছে, ভারতবর্ষে তাহা বহু শতাব্দী পূর্ব্বে বিরাজমান ছিল। এ্যাটম ইলেকট্রন প্রভৃতি যে সকল অণু-পরমাণু সংক্রান্ত অনুমান লইয়া আজ পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-গর্ব্বিত ও সমস্ত ভারতবর্ষে Empedocles ও Democritus জন্মাইবার শত শত শতাব্দী পূর্ব্বে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। অণু পরমাণুর আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ-শক্তির ফলে হয় সৃষ্টি—ইহাই Empedocles প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু এই সৃষ্টিরহস্য মহামুনি কপিল (বাঙ্গালী হিন্দু) খৃষ্টপূর্ব্ব ৭০০ সাত শত বৎসর পূর্ব্বে জগত সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রথম ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। এরোপ্লেন, টেলিভিসন প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের জন্য পাশ্চাত্য দেশ সম্মানিত, কিন্তু এ সকল আবিষ্কার যে ভারতবর্ষে এককালে বিরাজিত ছিল এবং ভারতের হিন্দুরাই যে ছিল সেই আবিষ্কার-যজ্ঞের পুরোহিত তাহা রামায়ণ ও মহাভারত পাঠ করিলেই জানা যায়। এই প্রাচীন গৌরবের মূল উৎস ছিল ভারতের সেরা বাঙ্‌লা।

কিন্তু আজ বাঙ্‌লা তাহার অতীত গৌরব হারাইতে বসিয়াছে। অনৈক্য, ভ্রাতৃ-বিবাদ, গৃহ-বিচ্ছেদ, হিংসা-দ্বেষ, অসূয়া-পরায়ণতা, পরশ্রী-কাতরতা প্রভৃতি দুর্নিমিত্ত বাঙলার ঘরে ঘরে ভরিয়া উঠিয়াছে। সোণার বাঙ্‌লা আজ শ্মশানে পরিণত হইতে চলিয়াছে। বাঙ্‌লার আজ নেতা নাই, দেশবন্ধু নাই, দেশপ্রিয় নাই, আশুতোষ নাই, রবীন্দ্রনাথ নাই, সুরেন্দ্রনাথ নাই, সুভাষচন্দ্রও হয়ত নাই!—যেদিকে তাকাই, দেখি শুধু নাই। একজন মাত্র আছেন—ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়; কিন্তু দৈবক্রমে তিনিও এখন দূরে—প্রবাসে। পশ্চিমবঙ্গের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে কর্ম্মের খাতিরে বাঙ্‌লার বাহিরে যাইতে হইয়াছে। বাঙলার এরূপ অবস্থায় বাঙ্গালীর একতাই একমাত্র আশা—একতাই একমাত্র উপায়—একতাই একমাত্র ভরসা। তাই বিশ্বকবির সুরে সুর মিলাইয়া বলি—

বাঙ্গালীর প্রাণ, বাঙ্গালীর মন,
বাঙ্গালীর ঘরে যত ভাই, বোন্
এক হৌক্ এক হৌক্, এক হৌক্,
হে ভগবান!

বাংলা চিত্রের কাহিনী

অধ্যাপক শ্রীঅরুণ চক্রবর্ত্তী এম-এ, বি-এল

চিত্রের কাহিনী চিত্রের যে কতখানি, অভিজ্ঞতা তার স্পষ্ট জবাব দেয়। দেখা গেছে অন্যান্য শিল্পগত বহু ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও মাত্র কাহিনীর সাবলীলতা ও অনবদ্যতার গুণে একটি বিশেষ চিত্র মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে; আবার অন্যান্য গুণাবলী প্রচুর বিদ্যমান আছে অথচ দুর্ব্বল কাহিনী সংযুক্ত চিত্র রসিক মানুষের হৃদয়ের দ্বারে ব্যর্থ আঘাত করে ফিরেছে—এ উদাহরণও অপ্রচুর নয়। তাই ছবির কাহিনী নির্বাচন চলচ্চিত্র শিল্পের এক অতি প্রয়োজনীয় কাজ।

এই কাহিনী নির্বাচন বিষয়ে চলচ্চিত্র প্রযোজকদের ব্যর্থতা যেন দিন দিন প্রকট হয়ে উঠছে. পুরাণো যুগের বাংলা ছবিগুলোর মধ্যে তবু বাঙালীত্ব দেখতে পাওয়া যেত। কিন্তু যত দিন যাচ্ছে, পরিচালকদের ইঙ্গিত মত বিদেশী কাহিনীর দুর্ব্বল ছাপসমন্বিত এমন সব খিচুড়ী ভাবধারা সম্পন্ন কাহিনী আজকের যুগে পরিবেশিত হচ্ছে, যাতে বাঙালীত্ব ত নেই, মানবত্বও নেই। এই সব ছবিতে যদি কথা না দেওয়া হত, তাহলে মাঝে মাঝে বুঝতে পারা শক্ত হয়ে যেত যে এ কোন দেশের, কোন সম্প্রদায়ের ছবি আমরা দেখছি। তার উদ্দেশ্য মোটেই সুপরিস্ফুট নয়। ও ছবির কিছুটা, ওর কিছুটা নিয়ে এমন জিনিষ তৈরী হচ্ছে, যার কোন প্রয়োজনীয়তা নেই।

মানুষের জীবনের সত্যকার সমস্যা, যা মানুষকে বাঁচার পথে হাজার বাধা এনে দিয়েছে, তার ছবি কোথাও নেই। এখনও বৃটিশকে গালাগালি দিয়ে আমাদের নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার চেষ্টাই সমস্যা-মূলক ছবির একমাত্র উপাদান। মানুষ আজ আর ওতে সন্তুষ্ট হতে পারে না, এমন একদিন হয়ত ছিল যেদিন ওই সমস্ত কথায় আমাদের অবমানিত আত্মা তৃপ্তি পেত, শোষকদের অপমানে আমরা স্বস্তি বোধ করতুম্; কিন্তু সে যুগ পেরিয়ে গেছে। আজকের জীবনে, এই স্বাধীনতার সূর্য্যালোকে আলোকিত হতে চেষ্টা করার যুগে, বহু সমস্যা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। আজকের চিত্রে তার কোন ছবি নেই, এদিকে গভর্ণমেণ্টের ত্রুটি কম নয়। প্রযোজকদের অনেকের মনে এমন ধারণা, গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে কিছু বললেই সেন্সার তা আটকে দেবে; এ ধারণার মধ্যে হয়ত কিছুটা সত্যতা আছে, কিন্তু স্বাধীন দেশের গভর্ণমেণ্টের নিজের বিরুদ্ধ আলোচনা শোনবার এবং নিজের দুর্ব্বলতা স্বীকার করবার শক্তি থাকা খুবই বাঞ্ছনীয়।

এক শ্রেণীর প্রযোজক আছেন, তাঁরা বলেন—সিনেমায় মানুষ আসে আনন্দের জন্য। একথা অস্বীকার করবার কোন কারণ নেই। তবে এই আনন্দ কি প্রকৃতির—এটা আলোচনার বিষয় বস্তু হওয়া উচিত। এই আনন্দ কথাটা নিয়ে অনেক কথা বলা যায়, তবে ঐ সমস্ত প্রযোজকদের ধারণা—'সত্যিকার বোঝা কজন আছে? তাদের দিয়ে ব্যবসা চলে

না। massএর জন্য আমার চিত্রের কাহিনী রচনা করতে হবে।' কাজেই শরৎ-বঙ্কিমের ঘণ্ট করে তাঁরা কাহিনী রচনা করলেন, মিশিয়ে দিলেন কিছুটা সস্তা স্বাদেশিকতার কারি' পাউডার। কাহিনীর-বা আর হেলে, গরীব, দেশপ্রেম, পুলিশ আর কান্না; না হয়—স্বামী-স্ত্রী সাধারণ সন্দেহ-বিরহ-মিলন। কিছু চাঁদ, কিছু কোকিল, কিছু কান্না আর আজকালকার বম্বে-ছবির অনুকরণে একটা ছুটে পার্টি বা নাচগান, কিছুটা সস্তার ভাঁড়ামি—ব্যস্। massএর উপযোগী কাহিনী রচনা হয়ে গেল।

এই শ্রেণীর প্রযোজকদের ধারণা mass অর্থাৎ তাঁর ছবির দর্শক এমন একদল নির্বোধ লোক, যারা নির্বিচারে তাঁদের এই বহুশ্রুত আখ্যান শোনবার, দেখবার এবং দেখে ঠকবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে রয়েছেন। তাঁদের ধারণা—দেশ এখনও অনেক পিছিয়ে আছে, আপনারা দু একজন হঠাৎ খেয়ালের বশে এ নিয়ে মাথা ঘামাতে আসেন বটে; কিন্তু mass এখনও এসব বোঝে না, বুঝতে চায় না।' তাই একের পর এক তাঁদের ছবি চিত্রিত হয়। মহা-আড়ম্বরে শুভ উদ্বোধন হয়; কিন্তু সব হওয়াটাই ক্রমে ব্যর্থ হয়ে যায়। যুদ্ধের বাজারে যখন লোকের হাতে পয়সা ছিল প্রচুর, মানুষ খরচ করবার নানা উপায়ের মধ্যে একটা উপায় ভেবে, বা চারিদিকের প্রাণঘাতী সমস্যার মধ্যে একটু স্বস্তি পাবার আশায় টিকিট কেটে প্রেক্ষাগৃহে ঢুকত; তারপর গালাগাল দিতে দিতে বেরিয়ে আসত। আজকাল তাও হয় না। বড় বড় চিত্রতারকা সমন্বিত ছবিগুলো বোকা mass আকর্ষণ করবার ব্যর্থ চেষ্টায় প্রেক্ষাগৃহের দ্বারে বিজ্ঞাপিত হয়ে শুধু শোভাই পায়। তবু প্রযোজকদের জ্ঞান ফেরে না। কূপ-মণ্ডুকের মত ওই একই ধারণা নিয়ে তাঁরা বসে থাকেন; সামাজিক বই অর্থাৎ কান্না আর মিলন—এই নিয়েই কারবার করেন।

এক শ্রেণীর প্রযোজক আছেন—তাঁরা বাজার যাচাই করতে ব্যস্ত; কিন্তু experiment করতে চান অপরের দিয়ে। একটা experiment এর ফলে একটা বিশেষ ধরণের ছবি হয়ত উৎরে গেল। ব্যস্—অমনি এঁরা সুরু করলেন, সেই ছবির অনুকরণে হুবহু একই রকমের ছবি তৈরী করতে। একটি বিশেষ লেখকের একটি ছবি সাফল্যমণ্ডিত হল; সেই লেখকটির যা তা একটি কাহিনী সংগ্রহ করে advertisement সুরু করলেন—অমুকের কাহিনী। এর ফলে সেই বিশেষ ধরণের কাহিনীর মাধুর্য গেল নষ্ট হয়ে। সেই বিশেষ লেখক হারালেন তাঁর popularity, কচ্‌লাবার ফলে লেবু গেল তেতো হয়ে, আর বিশেষ তার বিশিষ্টতা নিয়ে মানুষকে আকর্ষণ করতে পারল না। উদাহরণ স্বরূপ আমরা 'উদয়ের পথে'র যশস্বী লেখকের পরবর্তী চিত্র 'অভিযাত্রী'র ব্যর্থতার কথা বলতে পারি।

যুদ্ধের বাজারে কালোবাজার স্ফীত একদল নোতুন প্রযোজক গড়ে উঠেছে দেখতে পাই। এঁদের মধ্যে বেশীর ভাগেরই এ শিল্প সম্বন্ধে সঠিক কোন ধারণা নেই, তবে ব্যর্থতা এখনও যারা বরণ করবার সুযোগ পান নি, তাঁদের এটুকু ধারণা আছে—যেমন তেমন একটা ছবি তুলতে পারলেই লাভ বাঁধা আছে। সুতরাং কাহিনীর দিকে দৃষ্টি দেওয়া তাঁরা প্রয়োজন বোধ করেন না। তাঁদের জানা-শোনা বন্ধু-বান্ধব কোন একটি কাহিনী এনে খাড়া করে একটু তৈলদান করতে পারলেই তাঁরা সেইটে নিয়ে ছবির কাজ সুরু করে দেন, এর ফল আরও বিষময়। কারণ চিত্রের কাহিনী রচনা ও তার treatment এটি একটি বিভিন্ন টেকনিক। এমন উদাহরণ পাওয়া যায়, এক শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্যকার উপন্যাসকার হিসাবে অচল এবং এক শ্রেষ্ঠ উপন্যাসকার চিত্রনাট্যকার হিসাবেও অচল, সুতরাং এরূপ ভাববিলাসী অসাহিত্যিক খোসামোদপটু লেখকের কাহিনী মানুষের মনকে যে সাড়া দেবে না—সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় অনায়াসে।

তাই বাংলা ছবির এই নিদারুণ ব্যর্থতা দেখেই প্রযোজকরা অনেক সময় মোটা দক্ষিণা দিয়ে নামকরা লেখকের কাহিনীর জন্য ছুটে বেড়ান, সংগ্রহও করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সব ব্যর্থ হয় সুষ্ঠু treatmentএর অভাবে। কাহিনীর চিত্ররূপদান সার্থক হয়না বলে, সেই সার্থক কাহিনী তার সার্থকতা নিয়ে দর্শকের মনের দ্বারে উপস্থিত হতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ আমরা "ধাত্রীদেবতার" নাম করতে পারি। উপন্যাস হিসাবে 'ধাত্রীদেবতার' সৌন্দর্য অস্বীকার করা সম্ভব নয়, কিন্তু এর চিত্ররূপ প্রতিপদে ব্যর্থ হয়ে গেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের "চন্দ্রশেখর"কে 'অধঃশেখরে' পরিণত করার গ্লানি যেন আজও বাঙালী দর্শকের মনকে মলিন করে রেখেছে। অথচ কর্তৃপক্ষ কোন দিকে কোন ত্রুটি রাখতে দেননি বলেই শোনা গেছে।

নামকরা ঔপন্যাসিক বা চিত্র নাট্যকাররাও এ অপবাদ হতে মুক্ত নন। অনেক সময় প্রযোজকরা তাঁদের দুয়ারে ধর্ণা দেন। কিন্তু যে নিষ্ঠা যে সাধনা দিয়ে সত্যিকারের ছবির কাহিনী রচিত হয়, তাঁদের মধ্যে সে নিষ্ঠা, সে সাধনার চিহ্ন থাকে না। সহজ সুলভ চাটুভাষণের মোহে মোহান্বিত হয়ে তাঁরা তাঁদের উদ্ভট খেয়াল চরিতার্থ করতে এমন অদ্ভুত কিছু সৃষ্টি করে বসেন, যা শুধু ব্যর্থতাই বহন করে আনে।

এই প্রসংগে সমালোচকদের অপরাধ ও অগ্রাহ্য করবার নয়। একথা সত্যি, সমালোচকদের তীব্র কশাঘাতে সাহিত্যিক চেতনা ফিরে পান; তাঁর দুর্বলতা সম্বন্ধে তিনি অবহিত হন। কিন্তু বাংলাদেশে সত্যিকার সমালোচক নেই, সমালোচনা প্রকাশিত হবার উপযুক্ত পত্রিকাও দুর্লভ। যে সমস্ত পত্রিকা নাম করেছেন, তাঁরা বলেন—'সকলকে নিয়ে আমাদের চলতে হবে এবং কাউকে রুষ্ট করলে আমাদের চল্‌বে না, সুতরাং কারুর বিরুদ্ধে আমরা কিছু বলতে পারব না।' যাঁরা এখনও অনামা পরিচয়ভুক্ত, তাঁদের বিষ প্রথমটা একটু তীব্র থাকে। তবে তার মধ্যে নিজের নিজের দুর্বলতাই জাহির হয় একটু বেশী। সমালোচনা অর্থ অবিমিশ্র নিন্দা নয়। কিন্তু এ জাতীয় সমালোচনায় নিন্দার সংগে ঈর্ষ্যা মিশে একটু দৃষ্টিকটু হয়ে ওঠে। কিন্তু ধীরে ধীরে সেই পত্রিকা যদি ক্রমোন্নতির পথে যায়, দলে দলে প্রযোজকের খোসামুদের দল এসে সেই পত্রিকার পরিচালকবর্গকেও খোসামোদ সুরু করে। Studioতে নিমন্ত্রণ, ট্রেড শো'তে নিমন্ত্রণ—

বিচার করলে দেখা যায়, এ না হলেও সাধারণ মানুষের উপায় নেই। ছবির কাহিনীর নিন্দা করলে কাহিনীকার ভাবেন, এ নিন্দা আক্রোশ করা হল। নিজের দোষত্রুটি ভুলে তিনি সমালোচকের উপর তীব্র প্রতিহিংসা পোষণ করে তাকে জব্দ করবার উপায় খুঁজতে বদ্ধপরিকর হলেন। এছাড়া দেখা গেছে দু একটি পত্রিকার পরিচালক মাঝে মাঝে আক্রমণাত্মক মনোভাব অবলম্বন করে প্রদেশে এমন এক একটি মণ্ডলী গঠন করে ফেলেছেন, যাঁরা সাহিত্যের সমস্ত বিভাগের মান নির্ণয় সুরু করেছেন। এর মধ্যে ভেজাল মেশে সহজে। দু একটি খ্যাতনামা পত্রিকার ক্ষেত্রে আমরা এই ঘটনার অভিনয় প্রতিদিন উদ্দেশ্যে এবং তাদের আয়োজনে [illegible] স্বার্থ এবং সার্থকতার জন্য যায় তার সার্থকতা [illegible]

বাঙালী দর্শক তাই বাংলা ছবিতে খুঁজে পায় না। তারা দর্শক রুচিপূর্ণ হিন্দী ছবি এবং শিল্পরুচিপূর্ণ ইংরাজী ছবিকেই তাহাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। উচ্চশ্রেণীর মানুষের মনে দেখবার বাসনা—দেখলেও ইংরেজী ছবি। দেশের মধ্যে উপাদান থাকা সত্ত্বেও বিত্ত প্রযোজক, সার্থক কাহিনীকার এবং সমালোচকের অভাবে বাংলা ছবি ধীরে ধীরে নিম্নাভিমুখী। শুধু সাবলীল নাটকের অভাবে রঙ্গমঞ্চের পাদপ্রদীপ ক্ষীণতর।

সর্ব্বহারী ও সর্ব্বহারা

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

দিন গেল চলে কল-কোলাহলে রজনী আসিছে আগে
অন্ধের লাগি রজনীগন্ধা ফুটাইয়া অনুরাগে।
বধির শোনে না মধুর বাঁশরী মূর্চ্ছনা গীড় গাওয়া
দেখে শুধু হায় রন্ধে রন্ধে আঙুলে বুলায়ে যাওয়া।
অন্ধেরো তাই রজনীগন্ধা রজনীর পরিচয়
পাখীর কাকলি শুনি বিভাবরী পোহাইল মনে হয়।

এমনি দিবস আসে আর যায়, এমনি পোহায় রাতি
কাহারো বিজলী জ্বলে সারারাতি, কাহারো জ্বলে না বাতি।
তৈল-বিহীন সলিতা বিহীন গলিত পলিত বাস
প্রভাত হইলে চুলা কিসে জ্বালে ফেলে সে দীর্ঘশ্বাস।
ফুৎকার দিতে কলিজার ভিতে ব্যথা আসে টনটনি
'হরিনাম' যদি ভাসে অভ্যাসে বাজেনাক খঞ্জনি।

উঠিবে কেমনে যাইবে কোথায় কে দিবে তাহারে ভিখ্
ভিক্ষা মেলে না হায় রে! যে কালে এই তো সে দুর্ভিখ।
নিঃস্ব ভিখারী বিশ্বের দ্বারে বিফলে পাতিয়া হাত
চতুষ্পদের পংক্তিতে ব'সে চাটে এঁটো কলাপাত।
কে বলে মানব চতুর্ব্বর্গ? আমি জানি শুধু দুই
সর্ব্বহারীর স্বর্ণপালং, সর্ব্বহারার ভুঁই।

পথ

শ্রীসমর সরকার

আমায় তুমি পথ দেখিয়ে দিও
আমায় তুমি সঙ্গে করে নিও।
হাজার পথ আমার কাছে খোলা
সকল পথ দিচ্ছে আমায় দোলা,
কোন্ পথেতে চলবো নাহি জানি।
সকল পথে আছে রবির আলো,
সকল পথে তারার ঝমকালো,
হাতছানিতে ডাকে মোরে সবাই
কোথা যাব এদিক ওদিক চাই,
তাইত' তোমায় মনে মনে মানি॥
আমায় তুমি যেথায় নিয়ে যাবে
যাক্ সে পথ ক্ষতি কিংবা লাভে,
তোমার সঙ্গ ছাড়্‌বো নাক কভু
যদি হেথায় প্রলয় আসে তবু
তুমিই হবে চিরকালের সাথী।
তোমার হাতে আমায় ছেড়ে দিয়ে
আপন হৃদয় ফেল্‌বো হারিয়ে।
তোমার মাঝে আমায় খুঁজে পাব,
যখন আমি পথের শেষে যাব,
বাঁধা ঘুচে জ্বল্‌বে মনের বাতি॥

সংকলন

স্বাধীনতা অর্জ্জনের পরেও প্রতিষ্ঠান হিসাবে কংগ্রেসের কোন অস্তিত্ব থাকা উচিত কিনা এ বিষয়ে এখনো কিছু কিছু মতভেদ থাকিলেও [illegible] লোকই একথা স্বীকার করেন যে দেশকে বিদেশী শাসন হইতে মুক্ত করা কংগ্রেসের পক্ষে বিরাট সাফল্য হইতে পারে, কিন্তু তাহাই কংগ্রেসের প্রকৃত আদর্শ নয়। বিদেশী [illegible] মুক্ত করাকে কংগ্রেসের একটি গৌণ কৃতিত্ব বলা যায়। কংগ্রেস পূর্ব্বে যে আদর্শের কথা ঘোষণা করিয়াছে তাহাতে সে এমন এক সর্বোদয় সমাজের জন্য সংগ্রাম করিবে বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে, একমাত্র যে সমাজ-ব্যবস্থাই মানুষকে জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে সমান অধিকার দান করিবে এবং আত্মোন্নতির সমান সুযোগ-সুবিধা এবং অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি করিবে। গান্ধীজী এই সমাজ ব্যবস্থাকে 'সর্বোদয়' বলিয়া আখ্যা দিয়াছিলেন এবং এই সর্বোদয় সমাজ গঠনের জন্যই তিনি স্বাধীনতা অর্জ্জনের পর কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকে লোকসেবক সঙ্ঘে পরিণত করার ইচ্ছা পোষণ করিতেন। স্বাধীন-ভারতে কংগ্রেসের অস্তিত্ব কিরূপ হইবে সে সম্বন্ধে গান্ধীজী স্বীয় মতও ব্যক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে কংগ্রেসের আর কোন রাজনৈতিক দল হিসাবে দেশের দৈনন্দিন রাজনীতিতে আত্মনিয়োগ করা উচিত নয়, বরং তাহার পরিবর্ত্তে লোকসেবক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা করিয়া কংগ্রেস-কর্ম্মিগণ তাঁহাদের সেবা এবং ত্যাগের দ্বারা সরকার এবং জনসাধারণের উপর তাঁহাদের নৈতিক প্রভাব বিস্তার করিয়া তাহাদের সৎপথে পরিচালিত করিবেন ইহাই তাঁহার কাম্য ছিল। গান্ধীজী যে গণতন্ত্রের কথা বলিতেন সেই সত্যকারের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে অবশ্য এই জাতীয় সংস্থা এবং কর্ম্মীর প্রয়োজন অত্যন্ত বেশী—যাঁহারা নিঃস্বার্থভাবে সেবা করিবেন এবং এই মানবতার সেবায় যাঁহারা নিজেদের একেবারে উৎসর্গীকৃত করিয়া দিবেন। —নির্ণয়

* * *

—কাবুল বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কৃত ভাষাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে অবশ্যপাঠ্য তালিকাভুক্ত করিয়াছেন। পার্শী ও পুস্তু সংস্কৃত হইতে প্রত্যক্ষভাবে উদ্ভূত এবং অনেক শব্দই সংস্কৃত হইতে গৃহীত। এই কারণেই উপরোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে। আফগানিস্থানের কাবুল বিশ্ববিদ্যালয় যে কারণে সংস্কৃত ভাষা অবশ্য পঠনীয়রূপে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। দিল্লীস্থিত আফগান প্রতিনিধির এক পত্রে কারণটি প্রকাশ পাইয়াছে। মধ্য প্রদেশের স্পীকার শ্রীযুক্ত ঘনশ্যাম সিং গুপ্তকে তিনি লিখিয়াছিলেন—"পারসি ভাষা এবং পুস্তু ভাষা প্রত্যক্ষভাবে সংস্কৃত ভাষা হইতে উদ্ভূত। এই দুই ভাষায় আজিও বহু সংস্কৃত শব্দ প্রচলিত আছে। পুস্তুকে অধিকতর বিজ্ঞানসম্মত রূপ দিবার অভিপ্রায় লইয়াই সংস্কৃতকে অবশ্য পঠিতব্য ভাষা বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে।" ইহাতে বোঝা যায়, সংস্কৃত যে এশিয়ার ভাষা-জননী, বহু ভাষার জন্মদাত্রী, একথা শিক্ষিত আফগান সমাজ সম্যক-রূপেই উপলব্ধি করিয়াছেন। আমরা আশা করি, ভারতবর্ষের বিশ্ব-বিদ্যালয়সমূহও সংস্কৃত ভাষাকে মর্যাদা দিতে পশ্চাৎপদ হইবেন না। —উদ্বোধন

* * *

রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান বলিয়া গভর্ণমেন্ট ইহাকে বে-আইনি বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন এবং হাজার কয়েক লোককে কারারুদ্ধ করিয়াছেন। সবিনয়ে নিবেদন করিতে চাই যে ইহাতে গবর্মেণ্ট ও সমাজসেবকদের খুশী হইবার কিছু নাই। কংগ্রেস ইহা জানে যে, কোন কিছুকে বে-আইনি ঘোষণা করিয়া ব্যাপকভাবে গ্রেপ্তার করা হইলে—যে কাজকে বে-আইনি ঘোষণা করা—তাহার কাজ গোপনে চলিতে থাকে। হাজার হাজার তরুণ-তরুণীকে—তাহাদের বেশির ভাগ আবার ছোট ছোট ছেলেমেয়ে, কারারুদ্ধ করিলে এবং যষ্টিচালনা ও অনুরূপ যে কোন রকম জবরদস্তি করা হইলে, তাহার ফল হয় এই যে, আইন-অমান্যকারীগণ ও তাহাদের পরিবারবর্গের যথেষ্ট দুঃখভোগ করিতে হয়। এই দুঃখভোগ এতই স্পষ্ট যে জন-সাধারণ ঘটনার মূল কারণ ভুলিয়া গিয়া এই দুঃখকষ্টের কথাই মনে করিয়া রাখে। নিজেদের অজ্ঞাতে তাহারা আইন ও শৃঙ্খলারক্ষাকারী পুলিশকে ঘৃণা করিতে আরম্ভ করে ও দণ্ডিতের প্রতি সমবেদনাশীল হয়। জনগণের এইরূপ মনোভাব অতীতে কংগ্রেসের কাজে লাগিয়াছে এবং তাহাই এখন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ ও অন্যান্য সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে কাজ করিতে পারে। জবরদস্তিমূলক সর্বাধিক নীতির মত দমননীতিও নিউটনের আবিষ্কৃত পদার্থ-বিজ্ঞানের তৃতীয় নিয়ম মানিয়া চলে। কোন কিছুর উপর তুমি যত তীব্র আঘাত হানিবে সেও তোমার তত বেশি ক্ষতি করিবে। বর্তমান ক্ষেত্রে ক্ষতি এই হইতে পারে যে, যে-সাম্প্রদায়িক মনোভাবকে আমরা দূর করিতে চাই তাহা বাড়িয়াই যাইবে। —হরিজন পত্রিকা

সরকারী অনুজ্ঞার প্রভাবে এই বৎসর হইতে নীচের দিকের গোটা-কয়েক ক্লাশে ইংরাজী শেখা উঠিয়া গেল। ছাত্ররা এই সময়ে বাঙ্গালা (এবং সংস্কৃত) যাহাতে ভাল করিয়া শেখে, তাহার ব্যবস্থা করিলে ভাল এবং সঙ্গত হইত। কিন্তু বহু স্কুল তাহা না করিয়া ইংরাজীর শূন্যস্থানে হিন্দি পড়ানর ব্যবস্থা করিয়াছেন। ব্যাপারটা আমাদের চোখে অত্যন্ত বিসদৃশ লাগিতেছে। তাহারা এখনও স্কুলের আওতায় আছে এবং যাহারা নূতন করিয়া আসিতেছে, তাহারা সকলেই এখন

হইতে একথা মনে মনে বিশ্বাস করিবে যে, হিন্দি বাঙ্গালার চেয়ে অধিকতর প্রয়োজনীয় এবং ভালোও বটে। শিশুমনের এই স্বীকৃতি অদূর ভবিষ্যতে বাঙ্গালা ভাষার উন্নতির পথ রুদ্ধ করিয়া উহাকে মৃত ভাষার পর্য্যায়ে পৌঁছাইয়া দিবে। —বাঙ্গালার শিক্ষক

বর্দ্ধমান জেলাকে উদ্বৃত্ত অঞ্চল ঘোষণা করিয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকার বর্দ্ধমান জেলা হইতে কেবল ধান্য ও চাউল সংগ্রহের অভিযানই চালাইয়া আসিতেছেন, কিন্তু এই জেলার যেখানে খাদ্য শস্যের ঘাটতি অথবা যে অঞ্চলের অধিবাসীদিগকে চাউল কিনিয়া খাইতে হয় তাহাদের প্রতি যে সরকারী কর্তব্য আছে তাহা তাঁহারা এড়াইয়া চলিতেছেন। বর্দ্ধমানের চাষীর রক্তজল-করা পরিশ্রমে উৎপাদিত শস্যকে একরূপ জবরদস্তি করিয়াই তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে নামমাত্র মূল্যে লওয়া হইতেছে, কিন্তু তাহার প্রতিবেশী যেখানে অন্নাভাবে হাহাকার করিতেছে—সরকারী ব্যবস্থা সেখানে অন্ধ। বর্দ্ধমানবাসী নিজেদের রাষ্ট্রকে সাহায্য করিবার জন্য নির্বিচারে সরকারের হাতে সমস্ত উদ্বৃত্ত ধান্য তুলিয়া দিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের জেলার অভাবের সময় সরবরাহ বিভাগের নিকট মাথা খুঁড়িয়াও এককণা খাদ্য তাহারা সাহায্য পায় নাই। এ তিক্ত অভিজ্ঞতা আমাদের আছে। লক্ষ্মীর বরপুত্র বর্দ্ধমান জেলার চাষীকে অন্নের কাঙ্গাল সাজিয়া চোরাবাজারের নিকট আত্মবলি দিতে হইয়াছে। এ বৎসর ধান্যের যে অবস্থা তাহাতে আমাদের দৃঢ় ধারণা বর্দ্ধমান জেলাও এবার ঘাটতি অঞ্চল হইয়া গিয়াছে। দামোদর

গান্ধীজীর প্রতি আমাদের যে শ্রদ্ধা সেই শ্রদ্ধাকে বাস্তব রূপ দেওয়া দরকার। যখন আমরা তাঁহার জন্মতিথির উৎসব করি তখন তাহা যেন কেবলমাত্র জনসভার চাইতে বেশি আর একটা কিছু হয়। যখন আমরা তাঁহার স্মৃতি রক্ষা করিতে চাই তখন তাহা যেন ছবি বা মূর্তি দিয়া না করিয়া আর কিছু মূল্যবান জিনিস দিয়া করি। গান্ধীজী আমাদের সারাজীবনব্যাপী কাজ দিয়াছেন। যদি আমরা যথার্থ আন্তরিকতার সঙ্গে তাঁহাকে গ্রহণ করি, যদি আমরা সত্যসত্যই তাঁহাকে ও তাঁহার জীবনধারাকে মানিয়া নিই, তবে সেই জীবনধারাকে—যে জীবনধারা শুধু ভারতের পক্ষে নয়, বিশ্বের পক্ষেও প্রয়োজনীয়—সুসম্পূর্ণ করিয়া তোলা আমাদের কাজ। তাঁহার জীবনধারা যে কাজের ইঙ্গিত দেয়, সেই কাজে সম্পূর্ণ সময় দেওয়ার সৌভাগ্য আমাদের কাহারও কাহারও আছে। অন্যেরা যেমন যেমন পারেন আমাদের শক্তি বাড়াইয়া দিবেন। কিন্তু যতটুকুই আমরা করিতে পারি না কেন, এই স্বার্থমগ্ন, বিভক্ত পৃথিবীতে, জাতিহীন ও শ্রেণীহীন সমাজের—যে সমাজের ভিত্তি হইবে জলন্ত ঈশ্বরবিশ্বাস—প্রতিষ্ঠার কাজে আমরা লাগিয়া থাকিব। এই বিশ্বাস যে জীবনধারার ইঙ্গিত আসিয়া দেয়, আমরা প্রত্যেকে, নিজের নিজের ক্ষেত্রে এবং নিজের নিজের বিশিষ্ট রকমে, জীবনে সেই জীবনধারারই অনুসরণ করিয়া চলিব।

হরিজনপত্রিকা

জয়পুর কংগ্রেসে বিষয় নির্ব্বাচনী সভায় আশ্রয়প্রার্থীদের সম্বন্ধে প্রস্তাবের আলোচনায় প্রত্যুত্তরে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল যে দীর্ঘ বক্তৃতা দেন, তাহা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহাতে তিনি বিশেষভাবে পূর্ব্ব পাকিস্তানের শরণাগত সমস্যা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত উক্তি করেন। "...পশ্চিম পাকিস্তানে আর একজনও হিন্দু বা শিখ নাই। তাহারা সকলেই ভারতবর্ষে চলিয়া আসিয়াছে। কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গে এখনও দেড় কোটি হিন্দু বসবাস করিতেছে। তাহারা পাঞ্জাবী বা শিখদের মত নয়, যে মুসলমানদের সঙ্গে মার-দাঙ্গা করিয়া চলিয়া আসিবে। তাহাদের পক্ষে বাস্তুত্যাগ করিয়া ভারতে চলিয়া আসা কিম্বা সরকারের সঙ্গে ঝগড়া করাও অসম্ভব। যদি পাকিস্তান হইতে তাহারা সকলেই ভারতে চলিয়া আসিতে বাধ্য হয়, ভারত সরকার সম্ভবতঃ সে পরিস্থিতি সামলাইতে পারিবেন না। এই পরিস্থিতি সত্যই খুব কঠিন। ভারতে সমাগত আশ্রয়প্রার্থী অনাহার অর্দ্ধাহারের সম্মুখীন, আর পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দুদের মান-মর্য্যাদা লোপ পাইতেছে। সেই কারণেই আমি পূর্ব্ব পাকিস্তানের অংশবিশেষ দাবী করিয়াছি। আমরা সেই অংশে পূর্ব্ববঙ্গের আশ্রয়প্রার্থীদের পুনর্বসতির ব্যবস্থা করিব। "ইহার অর্থ এই নয় যে ভারত সরকার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে লড়াই করিতে চায়। আমার মতে, সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য ইহাই একমাত্র পথ। পাকিস্তান যদি আমার প্রস্তাব সমর্থন না করেন, তাহা হইলে তাঁহারা সমস্যা সমাধানের জন্য কোনও নূতন উপায় উদ্ভাবন করুন। আমি যদি শান্তিকামী না হইতাম, তাহা হইলে কি করিয়া আমি দীর্ঘকাল গান্ধিজীর সঙ্গে কাটাইলাম। আমার অপেক্ষা বেশী শান্তিকামী কে আছে? আমি সোজা কথা জানি এবং যাহা মনে করি মুখে তাহা বলিতে দ্বিধা করিনা। সে কথা হিন্দু বা মুসলমানের মনোমত না হইলেও আমার কিছু যায় আসে না। গান্ধীজীর কাছে আমি সোজা কথা বলিতেই শিখিয়াছি, কেবল সে কথা প্রকাশের ভাষা শিখি নাই। এই সমস্যার যে সমাধান আমি করিয়াছি, পাকিস্তান যদি তাহা ভুল মনে করেন, তবে তাঁহারা নির্ভুল সমাধানটি বলিয়া দিন। তাই বলিয়া সমস্যাটির কোনও আশু প্রতিকার যদি তাঁহারা না করেন এবং অবস্থার আরও অবনতি হয়, আমি বলিলে ভারত তাহা নীরবে সহ্য করিবে না।"

—গণরাজ

সাময়িকী

নেতাজী দিবস—

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ১৮৯৭ সালের ২৩শে জানুয়ারী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন—গত ২৩শে জানুয়ারী রবিবার ভারতের সর্ব্বত্র লোক সোৎসাহে নেতাজী দিবস পালন করিয়াছেন। সুভাষচন্দ্র জীবিত আছেন, কি পরলোকগমন করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে এখনও জনগণের মনে দারুণ সন্দেহ বর্ত্তমান। ভারতের বহু লোক মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন যে নেতাজী জীবিত আছেন এবং যথাসময়ে তিনি আমাদের মধ্যে পুনরায় আগমন করিবেন। আজ ভারতে, বিশেষ করিয়া বাঙ্গালা দেশে উপযুক্ত নেতার অভাব বিশেষ ভাবে অনুভূত হইতেছে। স্বাধীনতা লাভের পর দেশকে সুপরিচালিত করিবার উপযুক্ত লোক পাওয়া যাইতেছে না। কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থায় পণ্ডিত জহরলাল নেহরু ও সর্দ্দার বল্লভভাই পেটেলের মত লোক থাকিলেও অধিকাংশ প্রদেশের প্রধান মন্ত্রীরা দেশবাসীর ইচ্ছানুরূপ সত্বর কোন জাতিগঠন কার্য্য সম্পাদনে সমর্থ হইতেছেন না। পশ্চিম বাঙ্গালায় ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ দীর্ঘকাল প্রধান মন্ত্রীর কাজ করিতে পারেন নাই। ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় অসাধারণ বুদ্ধিমান ও কর্ম্মশক্তিসম্পন্ন লোক হইলেও তাঁহার নেতৃত্বে পশ্চিম বাঙ্গালার মন্ত্রিসভা সুপরিচালিত হইতেছে না এবং জনগণের কল্যাণজনক কার্য্যেও লোক যতটা উৎসাহ আশা করিয়াছিল, তাহা দেখা যাইতেছে না। সে জন্য লোক আজ সুভাষচন্দ্রের অভাব অধিক পরিমাণে অনুভব করিতেছে। নেতাজী দিবসে সর্ব্বত্র নেতৃবৃন্দের বক্তৃতায় এই কথাই প্রকাশ পাইয়াছে যে, আজ পশ্চিম বাঙ্গালায় নেতৃত্ব করিবার জন্য যোগ্যতর ব্যক্তির প্রয়োজন। পশ্চিম বাংলায় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের মধ্যে উপযুক্ত নেতার অভাবে দলাদলি অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে। তাহার ফলে দেশের সর্ব্বত্র কংগ্রেসের সম্মান প্রতিপত্তি কমিয়া যাইতেছে। একদিকে মন্ত্রিমণ্ডলীর কার্য্যে লোকের অসন্তোষ বৃদ্ধি, আর এক দিকে কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের মধ্যে দলাদলির ফলে দেশবাসী তাহাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিরুৎসাহ হইয়া পড়া স্বাভাবিক।

২৬শে জানুয়ারী স্বাধীনতা দিবসে কলিকাতা শ্রদ্ধানন্দ পার্কে আচার্য্য কৃপালানী কর্ত্তৃক শহীদ বেদীতে মাল্য দান

ফটো—পান্না সেন

এই দুরবস্থায় লোক নেতাজীর মত নেতার অভাব অনুভব করিয়া এ বৎসর নেতাজী দিবসে সুভাষচন্দ্রের কথা বিশেষ ভাবে স্মরণ করিয়াছে। নেতাজী কলিকাতায় যে মহাজাতি সদন প্রতিষ্ঠার আয়োজন করিয়াছিলেন বর্ত্তমান পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেণ্ট তাহার নির্ম্মাণ কার্য্য সম্পাদনের ভার গ্রহণ করায় দেশবাসী সন্তুষ্ট হইয়াছে। এক দিকে যেমন—যে কারণেই হউক, বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্ট নেতাজীর

প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শনে কার্পণ্য দেখাইয়াছেন, রেডিও মারফত নেতাজীর কথা অধিকতর ভাবে প্রচারের ব্যবস্থায় ত্রুটি দেখা গিয়াছে, অন্য দিকে তেমনই মহাজাতি সদনের নির্মাণ কার্য্য শেষ করার ব্যবস্থা করায় নেতাজীর আরব্ধ কার্য্যের প্রতি আগ্রহ প্রদর্শিত হইয়াছে। এই অবস্থার মধ্যে বাঙ্গালার লোক গ্রামে গ্রামে, গৃহে গৃহে সেদিন নেতাজীর আদর্শ স্মরণ করিয়া নিজেদের শক্তিমান করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছে। নেতাজী ফিরিয়া আসুন আর নাই আসুন, নেতাজীর আদর্শে দেশে আজ একদল সাহসী শক্তিমান দেশপ্রেমিক সৃষ্ট হইলে, দেশ অবশ্যই তাহাদের কার্য্যের দ্বারা উপকৃত হইবে। নেতাজী দিবসে লোক সর্ব্বত্র তাহাই কামনা করিয়াছে।

প্রতিষ্ঠার কার্য্যে সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, সেই কাজ করিতে করিতেই তাহার দেহাবসান হয়। বর্ত্তমান যুগে তিনি যে জগতের একজন শ্রেষ্ঠ মানব, সে কথা জগদ্বাসী সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। তিনি ভারতে জাতীয় আন্দোলনকে নূতন পথে পরিচালিত করিয়া অসহযোগের মধ্য দিয়া নিষ্ক্রিয়প্রতিরোধ দ্বারা দেশকে স্বাধীনতা লাভে সমর্থ করিয়াছিলেন। গত ২৮ বৎসর ধরিয়া এই স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতারূপে তিনি জগদ্বাসীকে নূতন পথ দেখাইয়াছেন। আমাদের দুর্ভাগ্য, ভারতবাসী তাঁহার কথা উপযুক্তভাবে গ্রহণ করে নাই। তিনি ভারতকে স্বাবলম্বী করিবার জন্য যে চরখা ও খদ্দরের বাণী দিনের

গত ১০ই জানুয়ারী কলিকাতা কর্পোরেশনে পণ্ডিত জহরলাল নেহরু কর্ত্তৃক মহাত্মা গান্ধীর চিত্রের আবরণ উন্মোচন

পর দিন প্রচার করিতেন, ভারত যদি তাহা গ্রহণ করিত, তাহা হইলে ভারতবাসীকে আজ বস্ত্রাভাবে দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইতে হইত না। তিনি সহরের সভ্যতার পাপ হইতে দেশবাসীদিগকে রক্ষা করিবার জন্য সকলকে গ্রামে ফিরিয়া যাইতে উপদেশ দিয়াছিলেন—তাহা করিলে আজ দেশে

৩০শে জানুয়ারী—

৩০শে জানুয়ারী ভারতের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। ১৯৪৮ সালের ৩০শে জানুয়ারী সন্ধ্যায় মহাত্মা গান্ধী নয়াদিল্লীতে প্রার্থনা সভায় যাইবার পথে নিহত হন। তিনি শেষ জীবনে যে সাম্প্রদায়িক মিলন

এইরূপ খাদ্যাভাব উপস্থিত হইত না। যাহা হউক, এক দল শক্তিমান লোক গান্ধীজির নীতি গ্রহণ করায় আজ ভারত স্বাধীন হইয়াছে। তাঁহার দেহাবসানের এক বৎসর পরে তাই ৩০শে জানুয়ারী পৃথিবীর সর্ব্বত্র লোক তাঁহার জীবনের কথা শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিয়াছে। তিনি উপবাস ও প্রার্থনা দ্বারা জীবন নিয়ন্ত্রণ করিতেন, তাই গত ৩০শে জানুয়ারী বহু ভারতবাসী সারাদিন উপবাস ও প্রার্থনা করিয়া আত্মশুদ্ধি করার চেষ্টা করিয়াছে। গান্ধীজি দীর্ঘদিন ধরিয়া প্রচার করিয়াছিলেন তাহাই ভারতের সকল প্রকার মুক্তির একমাত্র পথ। ভারতকে অর্থনৈতিক পরাধীনতা হইতে মুক্তিলাভ করিতে হইলে সেই পথেই অগ্রসর হইতে হইবে—গান্ধীজি তাঁহার জীবনে সেই শিক্ষাই সকলকে দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পর পণ্ডিত জহরলাল নেহরু প্রমুখ যাঁহারা দেশ পরিচালনের ভার গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারাই দেশবাসী সকলকে সেই ত্যাগ, সেবা ও প্রেমের পথে অগ্রগমন করিয়া দেশকে

রাজকোটে সৌরাষ্ট্র গণপরিষদের উদ্বোধন—সর্দ্দার বল্লভভাই পেটেল, সৌরাষ্ট্র ব্যবস্থা পরিষদের স্পীকার শ্রীমতী পুষ্পাবেন মেটা, এন-ভি-গ্যাডগিল, জামনগরের জামসাহেব প্রভৃতি।

ভারত স্বাধীনতা লাভ করিলেও এখন পর্য্যন্ত সে স্বাধীনতা ভোগের অধিকারী হয় নাই। বহু শত বৎসরের পরাধীনতা ও দুইশত বৎসরব্যাপী বৃটীশ সভ্যতা ও শিক্ষার প্রভাব ভারতবাসীদিগকে অমানুষ করিয়া দিয়া গিয়াছে। ভারতকে সকল বিষয়ে উন্নতি লাভ করিতে হইলে যে গান্ধীজির আদর্শ গ্রহণ করিতে হইবে, আজ সকলেই সে কথা স্বীকার করিতেছে। ত্যাগ, সেবা ও প্রেমের যে বাণী সমৃদ্ধ, শক্তিশালী ও উন্নততর করিতে উপদেশ দিতেছেন। গান্ধীজির দেহাবসানের ঠিক এক বৎসর পরে তাঁহার মৃত্যু বার্ষিকী পালন উপলক্ষে দেশবাসী সেই কথাই বার বার স্মরণ করিয়াছে এবং প্রার্থনা দ্বারা ও উপবাসের দ্বারা আত্মশুদ্ধি করিয়া সেই পথে নিজেদের পরিচালিত করিবার সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছে।

বারাকপুরে গান্ধী-ঘাট—

গান্ধীজির মৃত্যুর পর সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালা দেশে তাঁহার স্মৃতিরক্ষার যে ব্যবস্থা হইয়াছে, গত ১৫ই জানুয়ারী ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহরু কলিকাতায় আসিয়া বারাকপুরের সেই গান্ধী-ঘাটের উদ্বোধন উৎসব সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। গান্ধীজি ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতীক স্বরূপ ছিলেন—কাজেই বাঙ্গালী অন্য পথে তাঁহার স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা না করিয়া গঙ্গাতীরে স্নানের ঘাট নির্ম্মাণ করিয়া গান্ধীজির উপযুক্ত স্মৃতি-রক্ষারই ব্যবস্থা করিয়াছেন। আমরা বহু শত বৎসরের পরাধীনতার পর স্বাধীন হইয়া যে আবার আত্মস্থ হইতে সমর্থ হইয়াছি, তাহা এইভাবে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীজির স্মৃতি-রক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। পশ্চিম বাঙ্গালার পূর্ত্ত-সচিব শ্রীযুত বিমলচন্দ্র সিংহ এই ব্যবস্থায় প্রধান উদ্যোগী হইয়া দেশবাসী মাত্রেরই কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন। বারাকপুরে গঙ্গা-তীরে যে প্রকাণ্ড সরকারী বাগান ছিল, এতদিন তাহা প্রমোদোদ্যান রূপেই ব্যবহৃত হইত—গান্ধীজির শ্রাদ্ধ দিবসে বাঙ্গালার তৎকালীন গভর্ণর শ্রীযুত চক্রবর্ত্তী রাজাগোপালাচারী ঐ স্থান হইতে গান্ধীজির চিতাভস্ম গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। সেদিন যে স্থানে চিতাভস্ম বিসর্জ্জনের উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, সেই স্থানেই বর্ত্তমান সুদৃশ্য ঘাট নির্ম্মিত হইয়াছে। ঘাটের সংলগ্ন মন্দিরে একটি রজত-পাত্রে রক্ষিত মহাত্মার দেহাবশেষ পণ্ডিতজী সেদিন রক্ষা করিয়াছেন। সিংহলের অনুরাধাপুর হইতে যে বোধিদ্রুমের চারা ভারতে প্রেরিত হয়, তাহাও ঐ ঘাট সংলগ্ন জমিতে রাখার ব্যবস্থা হইয়াছে। প্রমোদোদ্যান আজ তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে ও প্রত্যহ তথায় হাজার হাজার নরনারী সমবেত হইয়া গান্ধীজির আদর্শ ও জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছেন। সন্ধ্যাকালে বিজলী আলোকে ঘাটটি সুসজ্জিত করা হইলে অতি মনোরম দৃশ্যে পরিণত হয় যাঁহারা তথায় গমন করেন।

ভারতের প্রথম গান্ধী-স্মৃতি মন্দির—বারাকপুর গান্ধীঘাটে প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু কর্ত্তৃক স্মৃতি স্তম্ভের আবরণ উন্মোচন ফটো—পান্না সেন

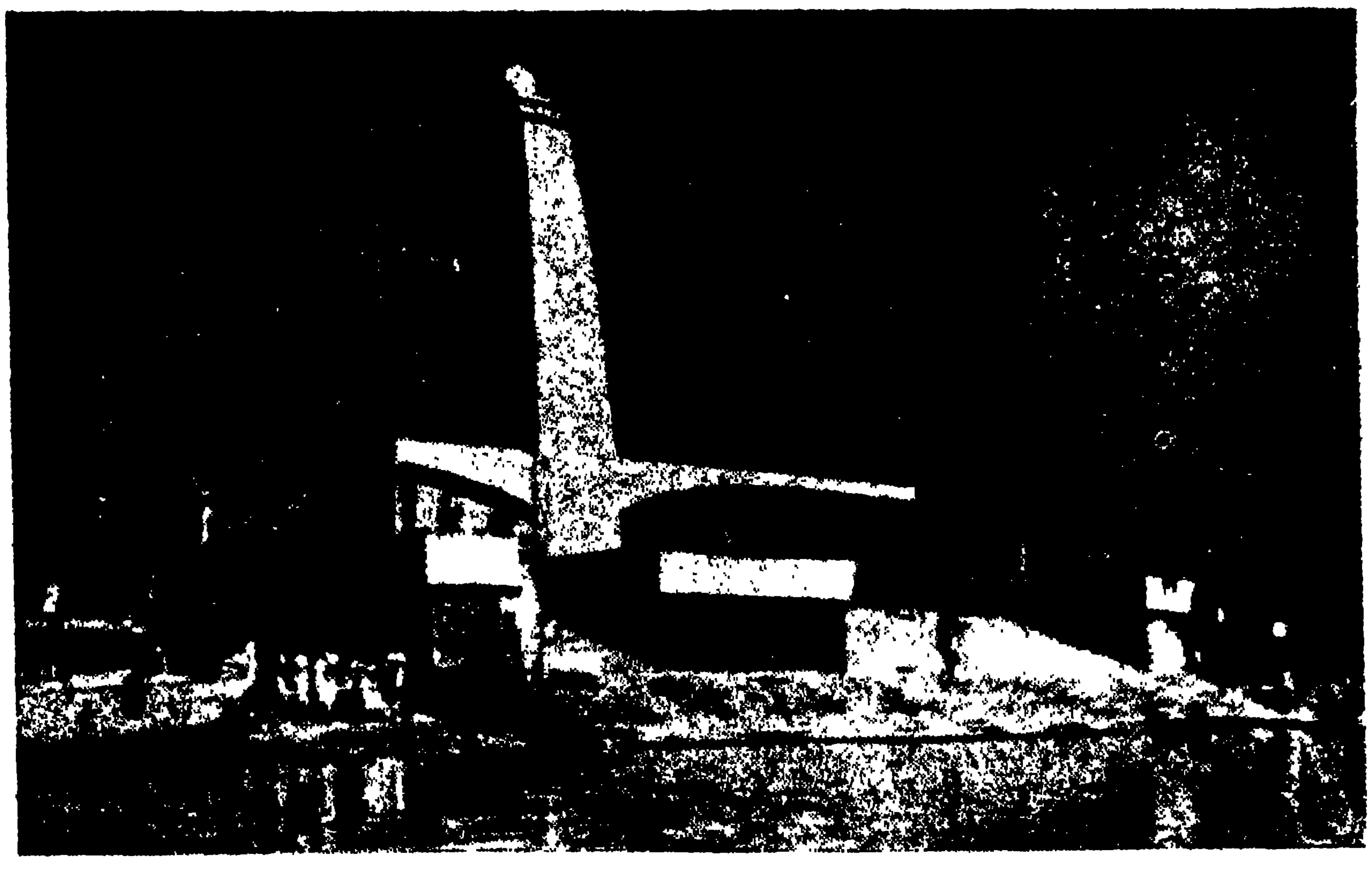

বারাকপুরে নবনির্ম্মিত গান্ধীঘাট ও গান্ধী স্মৃতিস্তম্ভ ফটো—পান্না সেন

গান্ধীজির আশীর্ব্বাদে তাঁহাদের জীবন ও মন ধন্য হয় ও তাহার ফলে তাঁহারা নূতনভাবে জীবন গঠনে সমর্থ হইয়া থাকেন। গঙ্গা-তীরে বহু স্নানের ঘাট বহুকালের ঐতিহ্য বহন করিয়া দণ্ডায়মান থাকিলেও বারাকপুরের গান্ধী-ঘাট বিংশ শতাব্দীর এক অভিনব সংস্কৃতির পরিচায়ক হইয়াছে। আমরা প্রত্যেক বাঙ্গালী, তথা ভারতবাসীকে গান্ধী-ঘাট দর্শন করিয়া আত্মশুদ্ধির উপায় অনুসন্ধান করিতে অনুরোধ করি।

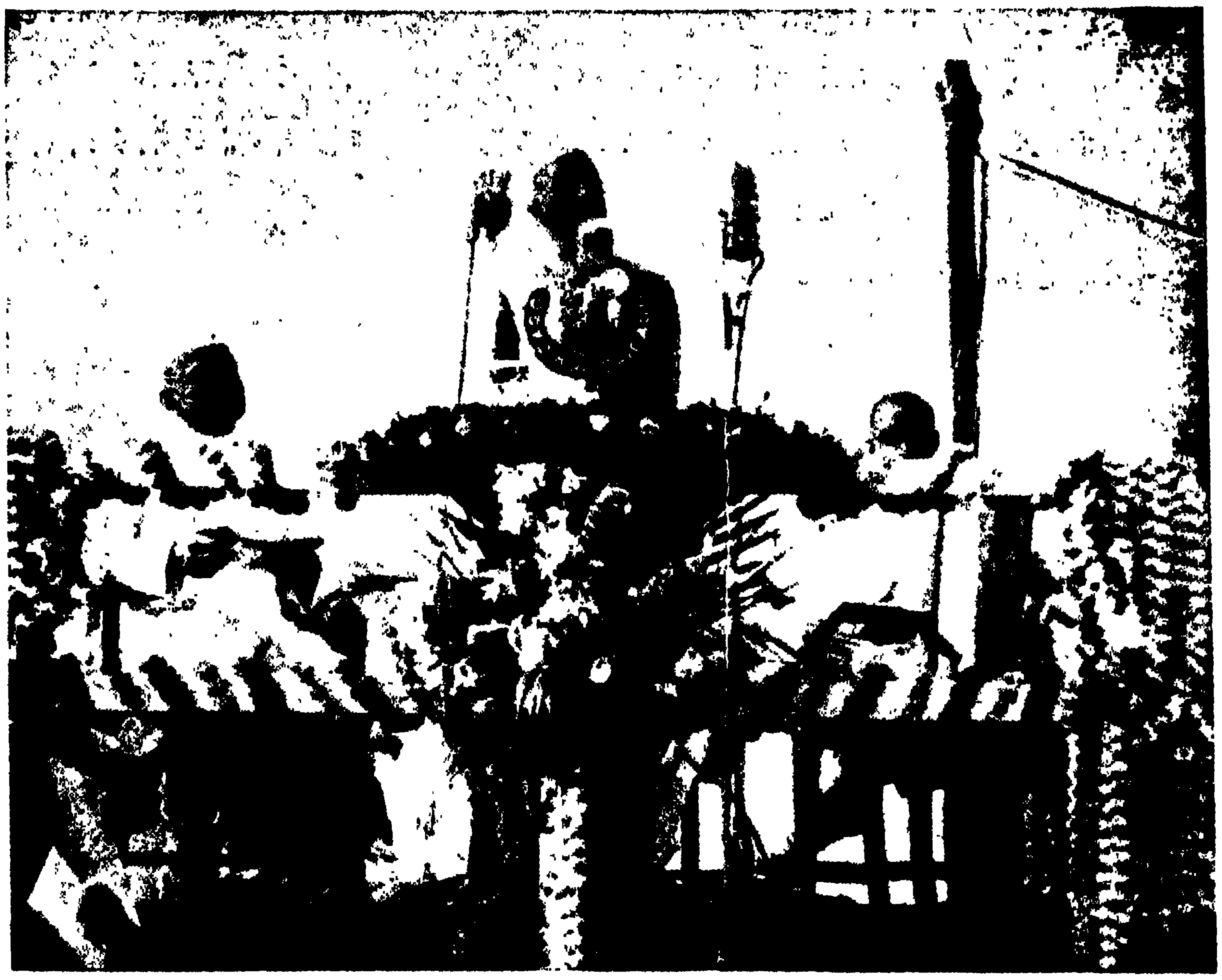

বারাকপুরে গান্ধী-ঘাটের উদ্বোধনে পণ্ডিত জহরলাল ফটো—অসিত মুখোপাধ্যায়

বারাকপুর গান্ধীঘাটে সিংহল অনুরাধাপুর হইতে আনীত বৃক্ষ রোপণ—পণ্ডিত নেহরু, ডাঃ কাটজু, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় প্রভৃতি
ফটো—অসিত মুখোপাধ্যায়

বিহার ও বাঙ্গালার সীমা সমস্যা—

পরিমাণ মাত্র ২৮ হাজার বর্গ মাইল। উহা বাঙ্গালার জনগণের অন্ন সংস্থান ও বাসের সমস্যা পূরণের পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে। ৩৭ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালার ৮ হাজার বর্গ মাইল স্থান বিহারের সহিত যুক্ত করিয়া বিহারের আয়তন ৭০ হাজার বর্গ মাইল করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ১৯১১ সাল হইতে বিহারী নেতারা আশ্বাস দিয়াছেন, ঐ জমী বাঙ্গালাকে ফেরত দেওয়া হইবে। ১৯২৮, ১৯৩৯ ও ১৯৪৫ সালে কংগ্রেস সে কথা সমর্থন করিয়াছেন। ঐ অঞ্চলে মোট ৩৭ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে ২৭ লক্ষ বাঙ্গালী। হিন্দী ভাষাভাষী মাত্র ৬ লক্ষ লোক তথায় বাস করে। এখন বিহার গভর্ণমেণ্ট ঐ সমস্ত অঞ্চলকে হিন্দী ভাষাভাষী বলিয়া ঘোষণা করিয়া উহা বাঙ্গালাকে ফিরাইয়া দিতে অস্বীকার করিতেছে। ইহার বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলনের ফলে মানভূম জেলায় বাঙ্গালী পীড়ন ও নির্য্যাতন চলিতেছে। কেন্দ্রীয় সরকারকে সে কথা জানাইয়া কোন ফল হইতেছে না। কাজেই সমগ্র পশ্চিম-বঙ্গে এখন এ জন্য এমন আন্দোলন করা দরকার, যাহাতে কেন্দ্রীয় সরকার বাঙ্গালার দাবী স্বীকার করিয়া বিহার প্রদেশকে বাঙ্গালার ন্যায়সঙ্গত

প্রত্যেক বাঙ্গালীকে তাঁহাদের কর্ত্তব্যে অবহিত হইতে অনুরোধ করি।

পূতাস্থি রক্ষা ব্যবস্থা—

গত ১৪ই জানুয়ারী পূর্ণিমা তিথি বাঙ্গালার তথা ভারতের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। পণ্ডিত জহরলাল নেহরু স্বাধীন ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রী হইয়া সকল দিক দিয়া ভারতের গৌরব বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করিতেছেন। ভগবান বুদ্ধের দুইজন প্রধান শিষ্য শ্রীসারিপুত্ত ও শ্রীমোগ্যলায়নএর পূত অস্থি ভারতবর্ষ হইতে লণ্ডনে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। পণ্ডিত নেহরুর চেষ্টায় তাহা পুনরায় ভারতে আনা হইয়াছে এবং ঐ দিন কলিকাতা গড়ের মাঠে এক বিরাট উৎসব করিয়া পণ্ডিত নেহরু ঐ অস্থি ভারতীয় মহাবোধি সোসাইটীর সভাপতি ডক্টর শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের হস্তে প্রদান করিয়াছেন। ঐ দুই মহাপুরুষের অস্থি ভূপাল রাজ্যে সাঁচীতে ছিল—আবার সেখানে নূতন মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া অস্থি রক্ষা করা হইবে। বহু শতাব্দীর প্রাচীন এই নিদর্শন রক্ষার

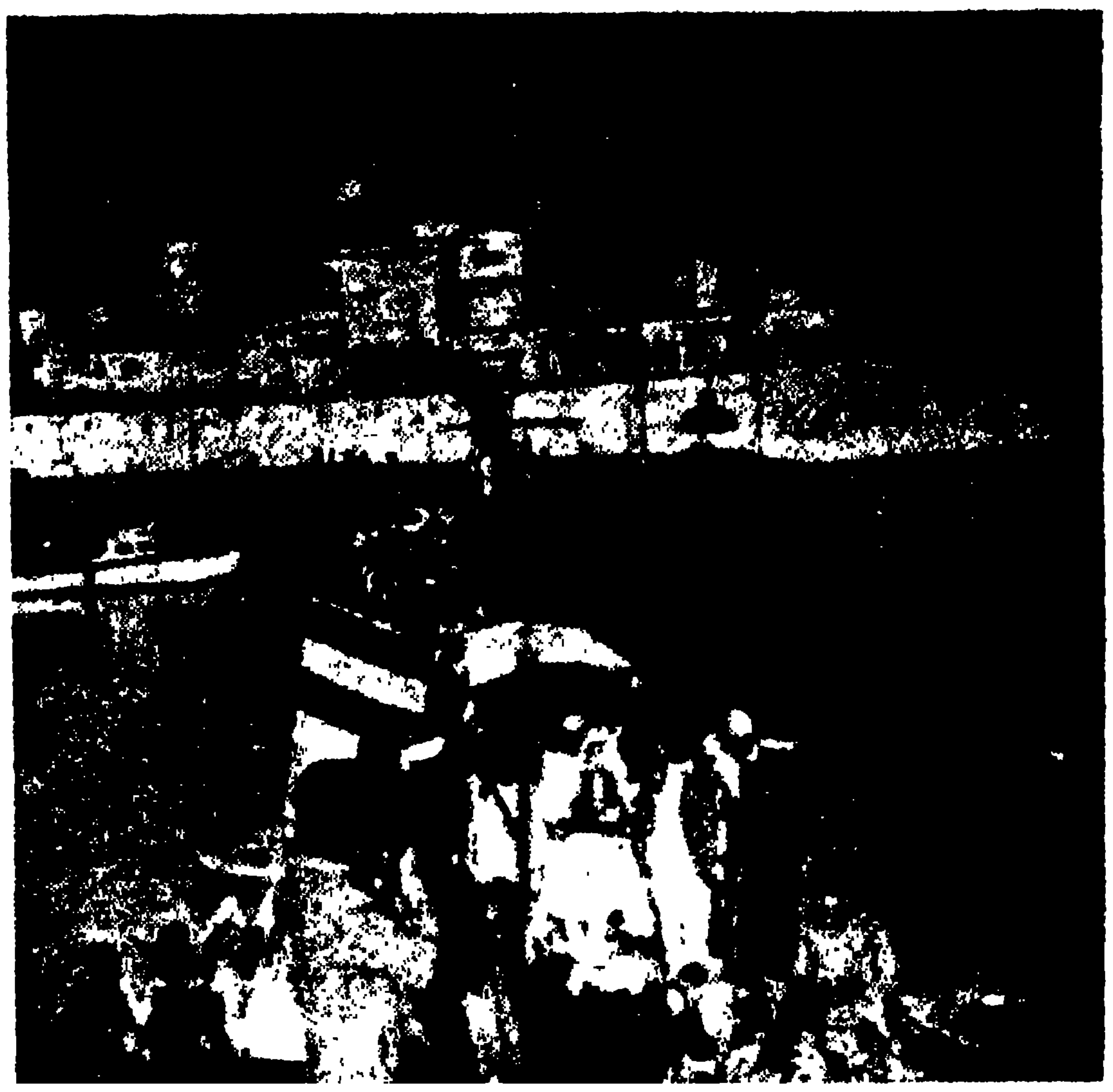

কলিকাতা গঙ্গাতীরে 'তীর' জাহাজ হইতে বুদ্ধ শিষ্যদ্বয়ের পূতাস্থি গভর্ণর ডাঃ কাটজু কর্ত্তৃক তীরে আনয়ন   ফটো—পান্না সেন

ব্যবস্থা করিয়া পণ্ডিত নেহরু ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতি যে সম্মান প্রদর্শন করিলেন, তাহা ভারতের ইতিহাসে স্মরণীয়। সমগ্র এসিয়াখণ্ডের বহু লোক এখনও

বুদ্ধ-শিষ্য সারিপুত্ত ও মোগ্যলায়নের অস্থি সমেত পাত্র লইয়া কলিকাতা গঙ্গাতীরস্থ জাহাজ হইতে লাটপ্রাসাদে আনয়ন। মিছিলে—ডাঃ কাটজু (গভর্ণর), ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (মহাবোধি সোসাইটীর সভাপতি), ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় (প্রধান মন্ত্রী) প্রভৃতি   ফটো—পান্না সেন

পূতাহি রক্ষা উৎসবে দার্জ্জিলিং হইতে আগত খাসিয়া বৌদ্ধ মহিলা মিছিলের একাংশ

ফটো—পান্না সেন

পূতাহি রক্ষা উৎসবে সিকিম ও ভূটান হইতে আগত রাজ-প্রতিনিধিবৃন্দ

ফটো—পান্না সেন

পূতাহি রক্ষা উৎসবে শোভাযাত্রায় সিংহল হইতে আগত নর্ত্তক দল

ফটো—পান্না সেন

ভগবান বুদ্ধের পূজা করে—বুদ্ধদেবের দুই প্রধান শিষ্যের অস্থির প্রতি এই সম্মান প্রদর্শনের ফলে সমগ্র বৌদ্ধ

কলিকাতায় পূতাস্থি লইয়া শোভাযাত্রার একাংশ ফটো—পান্না সেন

জগত পণ্ডিত নেহরুর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হইবেন। স্বাধীন ভারত যে তাহার সংস্কৃতি রক্ষার দ্বারা আবার জগতে তাহার সম্মানিত স্থান অধিকার করিবার দাবী রাখে,

পূতাস্থি রক্ষা উৎসবে আগত বৌদ্ধগণের সহিত প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহরুর পরিচয় ফটো—পান্না সেন

এই ঘটনা হইতে তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। রাজনীতিক স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে পণ্ডিত নেহরুর চেষ্টায় পৃথিবীর সর্ব্বত্র ভারতের গৌরব বৃদ্ধির এই চেষ্টা সর্ব্বথা প্রশংসনীয়। জাতির ইতিহাস চিরদিন ভারতকে শ্রেষ্ঠের আসন দান করে—সে কথা স্মরণ করিবার জন্যই এইরূপ উৎসবের সার্থকতা আছে।

শরৎচন্দ্র মৃত্যুবার্ষিকী—

গত ১৬ই জানুয়ারী হুগলী দেবানন্দপুরে অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের একাদশতম মৃত্যুবার্ষিকী উৎসব সম্পাদিত হইয়াছে। ঐ উপলক্ষে সে দিন তথায় বাঙ্গালা দেশের বহু খ্যাতনামা মনীষী সমবেত হইয়া শরৎচন্দ্রের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এখনও পর্য্যন্ত দেবানন্দপুরে শরৎচন্দ্রের স্মৃতি রক্ষার কোন ব্যবস্থা হয় নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর এ জন্য এক আবেদন প্রচারিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু অর্থ সংগ্রহে কেহই মনোযোগী না হওয়ায় মাত্র ১৪ হাজার টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। ঐ উৎসবের পর একদিন পশ্চিম বাঙ্গালার প্রদেশপাল ডাঃ কাটজু ও ঐ স্থান দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। হুগলী জেলা তথা বাঙ্গালায় শরৎচন্দ্রের গুণগ্রাহী ভক্তের অভাব নাই। তাঁহারা যে কেহ চেষ্টা করিলে দেবানন্দপুরে শরৎস্মৃতি রক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে পারেন; কেন এপর্য্যন্ত কেহ এ বিষয়ে উদ্যোগী হন নাই, তাহাই বিস্ময়ের বিষয়। আমাদের বিশ্বাস, দেশবাসী অচিরে এই কর্ত্তব্য-সম্পাদনে অগ্রসর হইয়া জাতীয় ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করিবেন।

খাদ্য-ব্যবস্থা—

ভারতের খাদ্যাবস্থা বর্ত্তমানে শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। খাদ্য উৎপাদন এত অধিক কমিয়া গিয়াছে ও লোকসংখ্যা এত বাড়িয়াছে যে, স্বাধীন ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গভর্ণমেণ্টকে প্রতি বৎসর বহু শত কোটি টাকার খাদ্য বিদেশ হইতে অধিক মূল্যে ক্রয় করিয়া আনিয়া দেশবাসীদিগকে রক্ষা করিতে হইতেছে। অধিক খাদ্য উৎপাদনের জন্য আন্দোলনও ভাল হয় নাই—যদি কোন আন্দোলন হইয়া থাকে, তাহাও সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই। বাঙ্গালার সরবরাহ-সচিব শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন সর্ব্বত্র লোককে আ-কাঁড়া চাল খাইতে উপদেশ দিতেছেন—ফলে কম পরিমাণ চাল

খাইয়া লোক বাঁচিতে পারিবে। পশ্চিম বাঙ্গালার স্বাস্থ্য বিভাগের পরিচালক মেজর জেনারেল শ্রীঅনিলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় লোককে ফেন-ভাত খাইতে উপদেশ দিয়া থাকেন। ফেন-শুদ্ধ ভাত খাইলে কম পরিমাণ চাউলে অধিক পুষ্টি হইয়া থাকে। লোককে এ সকল কার্য্যে বাধ্য না করিলে লোক উপদেশ কতটা মান্য করিবে বলা যায় না। ধান্য ছাড়া অন্যান্য খাদ্যও দেশে প্রচুর পাওয়া যায় না, যে লোক তাহা খাইয়া জীবনধারণ করিবে। ফলে দেশে মৃত্যুর হার দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে ও রোগের প্রকোপ বাড়িতেছে। লোক স্বল্পাহারের ফলে ক্রমে দুর্ব্বল হইয়া যাইতেছে। এ অবস্থায় কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট এক পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়া অধিক খাদ্য উৎপাদনের জন্য আগামী কয়েক বৎসরে ২৭১ কোটি টাকা ব্যয় করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। স্থির হইয়াছে—(১) আগামী ৭ বৎসরের মধ্যে ৬০ লক্ষ একর অনাবাদী জমীতে চাষের ব্যবস্থা করা হইবে (২) ৩০ লক্ষ একর জমীতে জলসেচের ব্যবস্থার জন্য ৪হাজার ৫শত গভীর নলকূপ খনন করা হইবে (৩) রাসায়নিক সার প্রস্তুত ও সরবরাহের উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হইবে (৪) সমুদ্রে মাছ ধরার ব্যবস্থা করিয়া জনগণের মধ্যে সুলভে প্রচুর মাছ সরবরাহ করা হইবে। ভারতবর্ষে মোট পতিত ও অনাবাদী জমীর পরিমাণ ৬কোটি ৫০ লক্ষ একর। তন্মধ্যে এই পরিকল্পনায় মাত্র ৯০ লক্ষ একর জমী উদ্ধারের ব্যবস্থা আছে। নিম্নলিখিত হারে নূতন জমীতে চাষের ব্যবস্থা হইবে—পূর্ব্ব পাঞ্জাবে ৫ লক্ষ একর, পূর্ব্ব পাঞ্জাবের দেশীয় রাজ্য অঞ্চলে—৪ লক্ষ একর, উড়িষ্যা—৫ লক্ষ একর, মধ্যপ্রদেশ ও বেরারে ৩ লক্ষ একর, যুক্ত-প্রদেশে—৩ লক্ষ একর, বিহারেও কিছু পতিত জমীতে চাষের ব্যবস্থা হইবে—জমীর পরিমাণ এখনও স্থির হয় নাই। জমীগুলি উদ্ধার করিয়া চাষ হইলে মোট ২০ লক্ষ টন অধিক খাদ্য উৎপন্ন হইবে। গত বৎসর যুক্তপ্রদেশে ৩২ হাজার একর পতিত জমীতে চাষ হইয়াছে ও আগামী বৎসর ১লক্ষ ১০ হাজার একর পতিত জমীতে চাষ হইবে। এই পরিকল্পনা সত্বর কার্য্যে পরিণত না হইলে দেশের বহু লোক অনাহারে যে মারা যাইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। সকলেই আশঙ্কা করিতেছেন যে ১৯৪৯ সালে ভারতে যে খাদ্যসঙ্কট আরম্ভ হইয়াছে, তাহার ফলে কয়েক কোটি লোক না খাইয়া মারা যাইবে। এখন পর্য্যন্ত তাহার প্রতিকারের কোন উপায় নির্ণীত বা অবলম্বিত হয় নাই। লোক ইতিমধ্যে অখাদ্য খাইতে বাধ্য হইতেছে ও তাহার ফলে নানাপ্রকার রোগে আক্রান্ত হইয়া লোক মারা যাইতেছে। যে পরিকল্পনাই করা হউক না কেন, তাহা যদি সত্বর কার্য্যে পরিণত করা না যায়, তবে যখন দেশে অধিক খাদ্য উৎপন্ন হইবে, তখন আর খাইবার লোক থাকিবে না—তৎপূর্ব্বেই তাহারা না খাইতে পাইয়া নিঃশেষ হইয়া যাইবে।

সরস্বতী পূজা—

স্বাধীনতা লাভের পর চারিদিক হইতে নানা দুরবস্থা আসা সত্বেও দেশবাসী সকলের মধ্যে সকল কার্য্যে অধিকতর উৎসাহ দেখা যাইতেছে। সে জন্য বর্ত্তমান বৎসরে পশ্চিম বাঙ্গালার সর্ব্বত্র সরস্বতী পূজা উৎসবে যুবক ও বালকগণের মধ্যে অধিক আগ্রহ দেখা গিয়াছে। প্রতি গ্রামে ও প্রতি পল্লীতে বহু সংখ্যক মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়া বাগ্‌দেবীর আরাধনা করা হইয়াছে। ইহা আনন্দের বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু এই ঘটনার মধ্য দিয়া দেশে যদি দলাদলি বাড়িয়া যায় ও সংহতির অভাব দেখা যায়, তবে তাহা সত্যই অত্যন্ত বেদনাদায়ক। সরস্বতী পূজা উপলক্ষে মূর্ত্তি নির্ম্মাণ, অস্থায়ী মণ্ডপ নির্ম্মাণ, সাজ-সজ্জা, আলোক ব্যবস্থা, বাদ্য-ভাণ্ড, মাইক ও এম্প্লিফায়ার ব্যবস্থা প্রভৃতিতে কত টাকা অপব্যয়িত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। একদিকে খাদ্যাভাবে দেশবাসী অনশনে ও অর্দ্ধাশনে দিন যাপন করিতে বাধ্য হইতেছে, অন্যদিকে এই ভাবে অর্থ অপব্যয়িত হইতেছে—ইহা কি সত্যই লজ্জা ও দুঃখের কথা নহে। যুবক ও বালকগণের এই উৎসাহ সৎকার্য্যে ব্যয়িত হইলে তাহার দ্বারা দেশ বহু প্রকারে উন্নত করা যাইত। কিন্তু সেদিকে কাহারও লক্ষ্য নাই। খাদ্যাভাবে লোক মরিয়া যাইতেছে দেখিয়াও আমরা কেহই—বৃদ্ধ, যুবক, বালক—অধিক খাদ্য উৎপাদন বিষয়ে উৎসাহী নহি। দেশের স্বাস্থ্যের দারুণ অবনতি দেখিয়াও আমরা কেহই স্বাস্থ্যোন্নতিকর কার্য্যের প্রতি আগ্রহ প্রদর্শন করি না। অথচ এই সরস্বতী পূজার মত সাময়িক উৎসবে বহু অর্থ ও শক্তির অপব্যয় করি। দেশ স্বাধীনতা লাভের পর দেশের

গণশক্তি জাগ্রত হইয়াছে—এখন সেই জাগ্রত গণশক্তিকে সুপথে পরিচালিত করিতে না পারিলে দেশকে উন্নতির পথে আগাইয়া লইয়া যাওয়া চলিবে না। দেশের রাষ্ট্র-পরিচালক ও রাজনীতিক নেতাদিগকে সে জন্য এখন বিশেষ বিবেচনার সহিত সকল বিষয়ে দেশবাসী জনগণকে সুপরামর্শ দান করিতে হইবে। এই সকল ব্যাপারে আমরা আজ দেশে প্রকৃত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির অভাব অনুভব করিয়া থাকি। একদল লোককে সকল প্রকার স্বার্থ ত্যাগ করিয়া জনকল্যাণ কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। তবেই দেশের লোক তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হইয়া তাঁহাদের কথা শুনিবে ও তাঁহাদের উপদেশ মত কাজ করিয়া দেশের উন্নতি বিধানে যত্নবান হইবে।

যশোহরে মাইকেল জন্মোৎসব—

গত ২৫শে জানুয়ারী যশোহর সাহিত্য সঙ্ঘের উদ্যোগে স্থানীয় সিনেমা হলে মাইকেল মধুসূদন দত্তের ১২৫ তম জন্মোৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। নাট্যকার শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত সভাপতিত্ব করেন। শ্রীযুক্ত সুধাংশু কুমার রায় চৌধুরী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। সঙ্ঘের সম্পাদক শ্রীযুক্ত অবলাকান্ত মজুমদার সকলকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি সভায় উপস্থিত থাকিয়া মাইকেলের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। কবিতাপাঠ, আবৃত্তি ও সঙ্গীতাদির ভিতর দিয়া মাইকেল বন্দনা হয়।

যশোহরে মাইকেল জন্মোৎসবে উপস্থিত সুধীবৃন্দ

লোক-শিক্ষা ও নিরক্ষরতা দূরীকরণ—

দেশ স্বাধীনতা লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে একদল দেশবাসীর মনে যে দেশকে উন্নত করার আগ্রহ দেখা দিয়াছে, তাহা কলিকাতা ৬৭নং এজরা ষ্ট্রীটের গ্রন্থাগার প্রচার সমিতি হইতে অনুষ্ঠিত লোক-শিক্ষা ও নিরক্ষরতা দূরীকরণ অভিযান দেখিলে বুঝা যায়। এ বিষয়ে শুধু সরকারের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে আমাদের চলিবে না—এই কার্য্যের ভার যে দেশবাসী সকলকে গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা বিবেচনা করিয়া একদল লোক এ কার্য্যে অগ্রণী হইয়াছেন। গ্রামে গ্রামে গ্রন্থাগার স্থাপন করিয়া, গ্রন্থাগারকে কেন্দ্র করিয়া লোক-শিক্ষার বিস্তার করা প্রয়োজন। গ্রন্থাগারের সহিত নৈশ বিদ্যালয়, রেডিও, গ্রামোফোন, আলোক চিত্র প্রভৃতির সাহায্যে নিরক্ষরতা দূরীকরণ করার আয়োজন করিলে অতি সহজেই সেই কাজে সাফল্য লাভ করা যায়। দেশের জনগণ শিক্ষিত না হইলে রাষ্ট্র পরিচালনা কার্য্য উত্তমরূপে হওয়া সম্ভব হইবে না—একথা বিবেচনা করিয়া সকলকেই এই কার্য্যে আগ্রহশীল হইতে হইবে—তবেই দেশ উন্নত হইবে। গ্রন্থাগার প্রচার সমিতির এই কার্য্যের উদ্যোগ সর্ব্বথা প্রশংসনীয়।

কলিকাতায় ছাত্র চাঞ্চল্য—

গত ১৮ই ও ১৯শে জানুয়ারী কলিকাতা সহরে ছাত্র-সমাজকে কেন্দ্র করিয়া যে উচ্ছৃঙ্খলতা হইয়া গেল তাহাতে শান্তিকামী ব্যক্তিমাত্রই দুঃখিত, ব্যথিত ও শঙ্কিত হইয়াছেন। ছাত্রগণ কর্ত্তৃক অযথা আইন অমান্যের চেষ্টা যেমন নিন্দনীয়, পুলিস কর্ত্তৃক বিক্ষুব্ধ ছাত্র জনতার উপর গুলীবর্ষণ ততোধিক নিন্দনীয়। তাহার পর একদল

হাঙ্গামাকারী কলিকাতার পথে পথে ট্রামগাড়ী ও সরকারী বাসগাড়ী জ্বালাইয়া তাণ্ডবের চূড়ান্ত করিয়াছিল। পশ্চিম বাঙ্গালার স্বরাষ্ট্র-সচিব শ্রীকিরণশঙ্কর রায় অসুস্থ—প্রধান মন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এ বিষয়ে বিবৃতি প্রকাশ করিয়া ইহার যবনিকা পাতের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই ঘটনার প্রথম হইতে মন্ত্রীরা যদি সাবধানতা অবলম্বন করিতেন, তাহা হইলে এই সামান্য ব্যাপার এতদূর গড়াইতে পারিত না। পুলিস এখনও নিজেদের জনগণের সেবক মনে না করিয়া যে কোন অত্যাচার ও অনাচার করিতে অগ্রসর হয়, স্বাধীন দেশে ইহা অপেক্ষা কলঙ্ক ও লজ্জার বিষয় আর কি হইতে পারে। ছাত্ররা অপরিণত বয়স্ক ও অপরিণত বুদ্ধি—সে বিষয়ে কাহারও কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। তাহাদের দমন করিবার জন্য মন্ত্রীদের মুখের কথাই যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হওয়া উচিত ছিল—সেজন্য 'মশা মারিতে কামান পাতা'র মত গুলীবর্ষণের প্রয়োজন ছিল না—একথা সকল বিবেচক ব্যক্তিই স্বীকার করিবেন। ভবিষ্যতে যাহাতে এইরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হয়, সে জন্য মন্ত্রীদিগকে সর্ব্বদা উপযুক্ত ব্যবস্থা সম্বন্ধে অবহিত হইয়া কাজ করিতে হইবে।

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় হত্যা—

গত ১৪ই ও ১৫ই জানুয়ারী দক্ষিণ আফ্রিকায় ডারবান ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী জেলাসমূহে হাজার হাজার আফ্রিকাবাসী মিলিত হইয়া যে ভাবে ভারতীয়দের উপর অত্যাচার উৎপীড়ন করিয়া কয়েক শত ভারতবাসীকে হত্যা করিয়াছে, তাহার বিবরণ পাঠ করিলে মানুষ মাত্রেই স্তম্ভিত হইয়া যায়। হাজার হাজার আফ্রিকাপ্রবাসী ভারতীয়কে সর্ব্বস্বহারা নিঃস্ব হইয়া পথের ভিখারী হইতে হইয়াছে। বহু ভারতীয় নিজ নিজ বাসস্থান ও আত্মীয়-স্বজন ত্যাগ করিয়া বনে জঙ্গলে পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছে। জেনারেল স্মাট্স, প্রধান মন্ত্রী মালান প্রভৃতি বহুদিন হইতে দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় বিদ্বেষ প্রচার করিয়াছেন—ইহা তাহারই যে পরিণতি সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বৃটীশ সরকার প্যালেষ্টাইন, ভারতবর্ষ প্রভৃতি স্থানের মত দক্ষিণ আফ্রিকাতেও এই অনাচার পরোক্ষভাবে সমর্থন করিয়া থাকেন। পণ্ডিত জহরলাল নেহরু ইন্দোনেশিয়ার দুঃখে ব্যথিত হইয়া ভারতে এসিয়া সম্মিলন আহ্বান করিয়া তাহার প্রতিকারের উপায় স্থির করিয়াছেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় এইরূপ ভারতীয় নির্য্যাতনের প্রতিবাদেও তাঁহাকে কঠোরভাবে কার্য্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। দেশবাসী তাঁহার নিকট ইহাই প্রত্যাশা করিতেছে।

মানসিক রোগের চিকিৎসা—

গত জানুয়ারী মাসে এলাহাবাদে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশনের সঙ্গে তিন দিন ধরিয়া মানসিক

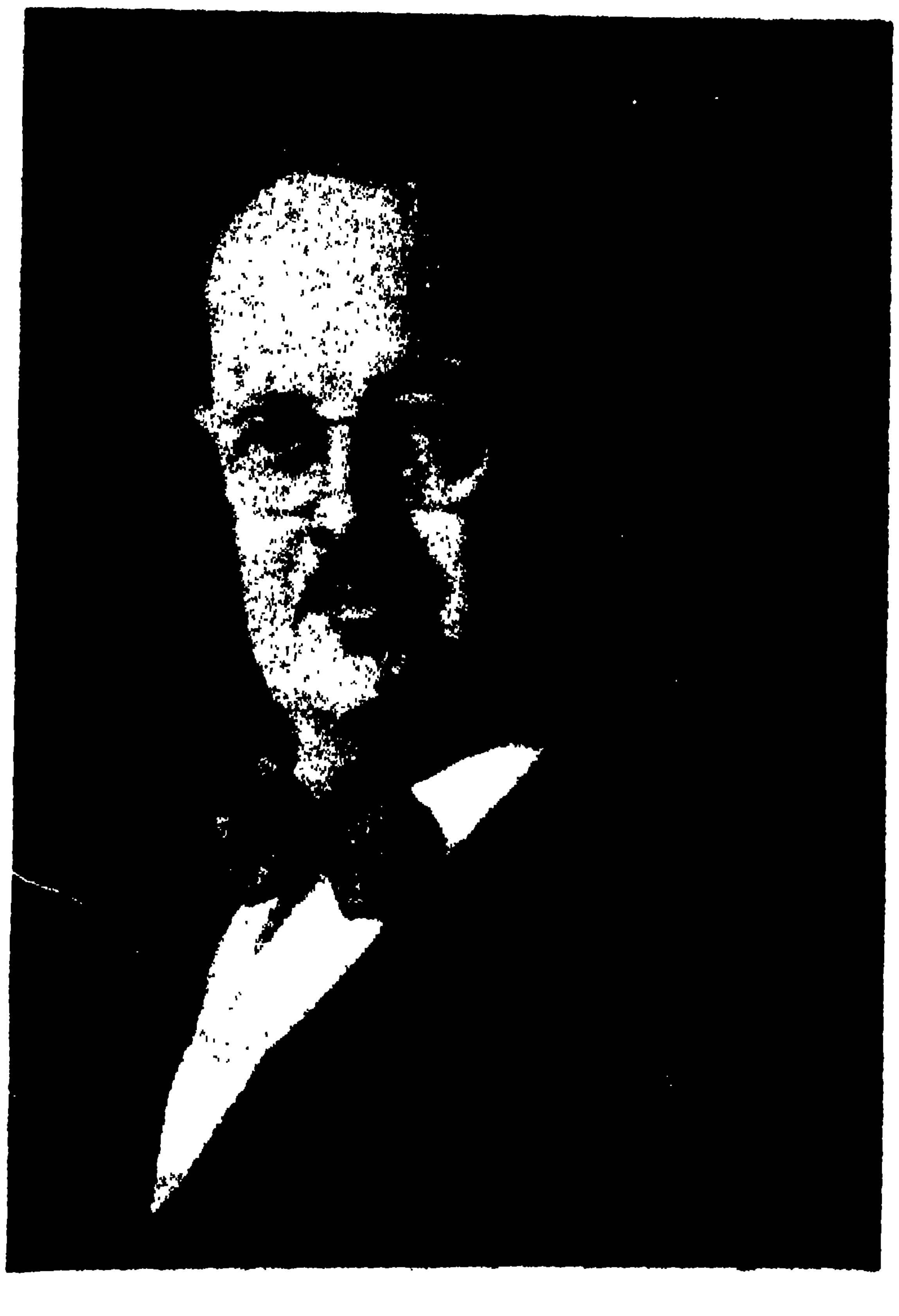

ডাঃ বার্লিংগাম

রোগের চিকিৎসা বিষয়ক সমিতির দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। তিন দিনই ডাঃ নগেন্দ্রনাথ দে সভাপতি হইয়াছিলেন। নূতন 'ভারতীয় মানসিক স্বাস্থ্য আইন' এর খসড়া আলোচিত ও গৃহীত হইয়াছে এবং ঐ বিষয়ে একটি ত্রৈমাসিক পত্র প্রকাশের প্রস্তাব হইয়াছে। সমিতির সভাপতির আমন্ত্রণে মার্কিণ সভ্য ডাঃ বার্লিংগাম আমেরিকা হইতে আসিয়া সভায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তিনি বলেন—আমেরিকার হাসপাতালগুলিতে শতকরা ৬০ ভাগ স্থান মানসিক রোগীদের জন্য নির্দ্দিষ্ট থাকায় ওদেশে প্রথমাবস্থাতেই সকল মানসিক রোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা

হয়। ডাঃ বার্লিংগাম তথায় যে সমিতির সভাপতি, তাহা গত ১২৬ বৎসর ধরিয়া মানসিক রোগের চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিতেছে। তিনি ভারতীয় চিকিৎসকগণকে আমেরিকায় যাইয়া সেখানকার ব্যবস্থা পরিদর্শনের জন্য আমন্ত্রণ জানাইয়াছেন। তিনি সমিতির পত্রিকার জন্য ২ শত ডলার দান করিয়াছেন ও ভারতের স্বাস্থ্য-মন্ত্রী রাজকুমারী অমৃত কাউরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মানসিক রোগের চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা ও পরামর্শদান করিয়াছেন। আমাদের দেশে বহু লোক মানসিক ব্যাধি দ্বারা অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়—তাহাদের চিকিৎসার উপযুক্ত ব্যাপক ব্যবস্থা হইলে দেশের বহু অকর্ম্মণ্য লোককে কাজে লাগান যাইবে। এ বিষয়ে সমিতির প্রচেষ্টা অবশ্যই প্রশংসনীয়।

প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন—

আগামী ১৩ই, ১৪ই ও ১৫ই মার্চ্চ দিল্লীতে প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের ষড়বিংশ অধিবেশন হইবে। শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত মূল-সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ডক্টর শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে সভাপতি ও ডাঃ শ্রীসুরেন্দ্র নাথ সেনকে সম্পাদক করিয়া তথায় অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হইয়াছে। এই সম্মিলন প্রবাসী বাঙ্গালীদের মিলন ক্ষেত্র এবং বৃহত্তর বাঙ্গালায় বাঙ্গালী সংস্কৃতি রক্ষার উপায় নির্ণয় স্থান। কাজেই সকল বাঙ্গালীর এই সম্মিলনে সাহায্য ও সহানুভূতি থাকা প্রয়োজন। সম্মিলন সম্বন্ধে সকল জ্ঞাতব্য নয়া দিল্লীর ১৫ অশোক রোডে ডাঃ সেনের সহিত পত্র ব্যবহার করিলেই জানা যাইবে।

এশিয়া সম্মেলন—

গত ২০শে জানুয়ারী হইতে ২৩শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত নয়াদিল্লীতে এশিয়া সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। ইন্দোনেশিয়ায় ওলন্দাজ গবর্ণমেণ্ট যে সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে, সেই সমস্যায় এশিয়ার অপরাপর রাষ্ট্রসমূহের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিবার জন্যই এই সম্মেলন আহূত হইয়াছিল। এই সম্মেলনে আফগানিস্থান, অষ্ট্রেলিয়া, ব্রহ্মদেশ, সিংহল, মিশর, ইথিওপিয়া (আবিসিনিয়া), ভারতবর্ষ, ইরান, ইরাক, লেবানন, পাকিস্থান, ফিলিপাইন, সৌদি আরব, সিরিয়া ও ইয়েমেনের গবর্ণমেণ্টসমূহ তাঁহাদের সরকারী প্রতিনিধি পাঠাইয়াছিলেন এবং চীন, নেপাল, নিউজিল্যাণ্ড ও শ্যাম পর্য্যবেক্ষক পাঠাইয়াছিলেন। সম্মেলনে ইন্দোনেশিয়া সম্পর্কে সর্ব্বসম্মতিক্রমে আট দফা প্রস্তাব গৃহীত হয়; পরে সেই প্রস্তাবসমূহ নিরাপত্তা পরিষদে পেশ করা হইয়াছে। এশিয়া সম্মেলনের প্রস্তাবসমূহের আসল কথা হইল, ১৯৫০ সালের ১লা জানুয়ারীর মধ্যে ওলন্দাজদিগকে দেশের শাসনভার ইন্দোনেশিয়দের হাতে অর্পণ করিতে হইবে। নিরাপত্তা পরিষদ এশিয়া সম্মেলনের এই সুপারিশি প্রস্তাবসমূহ কি ভাবে গ্রহণ করিবে এবং গ্রহণ না করিলে এশিয়ার রাষ্ট্রগুলি তখন কোন পন্থা অবলম্বন করিবে, সম্মেলনে সে বিষয়ে কোন অভিমত প্রকাশ করা হয় নাই। যাহাই হউক, এই এশিয়া সম্মেলন হইতে এশিয়ার দেশসমূহের এই উপকার হইল যে, ইহার পর হইতে তাহারা তাহাদের স্বাধীনতা ও মর্য্যাদা-বিরোধী ঘটনার বিরুদ্ধে মিলিতভাবে দাঁড়াইবার শক্তিলাভ করিল।

পরলোকে তারিণীপ্রসাদ রায়—

জলপাইগুড়ির খ্যাতনামা ব্যবসায়ী ও জনসেবক তারিণী প্রসাদ রায় মহাশয় গত ১০ই পৌষ প্রায় ৯০ বৎসর বয়সে

তারিণীপ্রসাদ রায়

পরলোক গমন করিয়াছেন। বাল্যকাল হইতে তাঁহাকে দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। তাঁহা

বাড়ী ছিল ঢাকা জেলার দিয়াবাড়ী গ্রামে। ২৮ বৎসর বয়সে তিনি জলপাইগুড়িতে যান ও পরে বহু দিন তথায় আইন ব্যসা করেন। কিন্তু চা-বাগান ব্যবসাতেই তাঁহার ভাগ্যোন্নতি হয় ও তিনি উপার্জ্জিত অর্থের বহুলাংশ জনকল্যাণ কার্য্যে নিযুক্ত করিতেন। তিনি সকল প্রকার রাজনীতিক আন্দোলনের সহিত নিজেকে সংযুক্ত রাখিতেন ও শিক্ষা বিস্তার আন্দোলনে সর্ব্বদা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতেন। তিনি বহু বাঙ্গালীকে ব্যবসায় ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভের সুযোগ করিয়া দিয়াছিলেন।

পরলোকে গোবিন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

কলিকাতার বিশিষ্ট নাগরিক রায় বাহাদুর পণ্ডিত গোবিন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় সম্প্রতি ৭৯ বৎসর বয়সে

গোবিন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

পরলোক গমন করিয়াছেন। ইনি পটলডাঙ্গার প্রসিদ্ধ বন্দ্যোপাধ্যায় বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ৫০ বৎসরের ও অধিককাল স্বগৃহে হরিসভা করিয়া গীতা প্রচার করিতেন। তিনি বহু ধর্ম্মগ্রন্থ, সঙ্গীতাদি রচনা করিয়া বর্ত্তমান যুগেও জনসাধারণকে ধর্ম্ম শিক্ষা দানের চেষ্টা করিতেন।

নূতন শিক্ষা পরিকল্পনা—

কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের শিক্ষা সচিব মৌলানা আবুল কালাম আজাদ সম্প্রতি জানাইয়াছেন যে, কেন্দ্রীয় সরকার তাহার নূতন শিক্ষা পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। এই পরিকল্পনা ৩টি পর্য্যায়ে ১৬ বৎসরে সম্পূর্ণ হইবে। প্রথম ৫ বৎসরে ৬ হইতে ১১ বৎসর বয়স্ক অধিকাংশ বালক বালিকাকে বুনিয়াদি শিক্ষা গ্রহণে বাধ্য করা হইবে। দ্বিতীয় পর্য্যায়ে অবশিষ্ট বালক বালিকার শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। তৃতীয় পর্য্যায়ে ৬ বৎসরে ১৪ বৎসর বয়স্ক বালক বালিকাদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইবে। এই পরিকল্পনা অনুসারে কাজ করা হইলে ১৬ বৎসর পরে ৬ হইতে ১৪ বৎসর বয়স্ক কোন বালক বালিকা নিরক্ষর থাকিবে না। ঐ সঙ্গে প্রাপ্ত বয়স্কদিগকেও শিক্ষাপ্রদানের ব্যবস্থা থাকিবে। প্রাপ্তবয়স্কদিগকে কেবল অক্ষর জ্ঞান শিক্ষা দিয়াই সরকার সন্তুষ্ট থাকিবেন না। প্রত্যেক ব্যক্তির মনে সমাজ ও রাষ্ট্র চেতনা জাগ্রত করিয়া দেওয়া হইবে। তাহা ছাড়া খেলাধূলাও নির্দ্দোষ আমোদের মধ্য দিয়া শিক্ষাদানেরও ব্যবস্থা থাকিবে। এ বিষয়ে কর্ত্তব্য শুধু সরকারের—একথা মনে রাখিয়া আমাদের বসিয়া থাকিলে চলিবে না। আমরা এ বিষয়ে সরকারকে কি ভাবে কতটা সাহায্য করতে পারি, প্রত্যেককে তাহা চিন্তা করিয়া নিজ নিজ কর্ত্তব্য সম্পাদনে অবহিত হইতে হইবে।

ভারতে গৃহ-সমস্যা—

সম্প্রতি সমগ্র বিশ্বের বাসগৃহ সমস্যা সম্বন্ধে যে আলোচনা হইয়াছিল, তাহাতে জানা যায়, ভারতবর্ষেই বর্ত্তমানে বাসগৃহ-সমস্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। গত মহাযুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে মাত্র শতকরা ৪জন লোকের উপযুক্ত বাসগৃহ ছিল। বর্ত্তমানে কি অবস্থা হইয়াছে তাহা বলা কঠিন। কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট দিল্লীতে একটি গৃহ-নির্ম্মাণ কারখানা করিতেছেন। সেখান হইতে গৃহের সরঞ্জাম নির্ম্মিত হইয়া ভারতের নানাস্থানে প্রেরিত হইবে এবং সেই সরঞ্জামগুলি একত্র করিলেই বাসের উপযোগী গৃহে পরিণত হইবে। সেজন্য নাকি শতকরা ৪০ ভাগ আসবাব এদেশে পাওয়া যাইবে ও বাকী ৬০ ভাগ বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হইবে। তাহা পাইতে কত বিলম্ব হইবে তাহারও স্থিরতা নাই। কিন্তু একদল বিশেষজ্ঞ এদেশে মাটীর ঘর তৈয়ারীর কথা বার বার বলিয়াছেন। এখনও বর্দ্ধমান, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি জেলার গ্রামে অধিকাংশ লোকই মাটীর ঘরে বাস করে। সে ঘর তৈয়ার করিতে যত কম

খরচ হয়, তাহা অপেক্ষা কম খরচে গৃহ নির্ম্মাণের কথা বোধ হয় চিন্তা করা যায় না। বাঁশ, খড়, দড়ি ও মাটী হইলেই সে ঘর প্রস্তুত হয়। দেশী আম, জাম, কাঁঠাল, তাল প্রভৃতির কাঠে ঐ সকল গৃহের দরজা জানালা নির্ম্মিত হইতে পারে। পশ্চিম বঙ্গ গভর্ণমেণ্ট যদি স্বব্যয়ে সহরগুলির নিকটস্থ ফাঁকা স্থানগুলিতে ঐরূপ সহজ উপায়ে ও স্বল্প ব্যয়ে বহু গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিতেন, তাহা হইলে এক শ্রেণীর লোক ঐ সকল গৃহে যাইয়া বাস করিতে পারিত ও তাহার ফলে আমাদের গৃহ-সমস্যার সমাধান হইত। শুনিয়াছি, এদেশে মাটীর ঘরে বাস করিলেই লোকের স্বাস্থ্য ভাল থাকে। পশ্চিম বঙ্গের স্বাস্থ্য বিভাগের পরিচালক মহাশয়ও ঐ বিষয়ে চিন্তা করিয়া উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে পারেন। আমরা এ বিষয়ে এদেশের সমবায় সমিতিগুলিকেও উদ্যোগী হইতে বলি। বর্ত্তমানে কলিকাতা ও সহরতলীতে বাসগৃহ-সমস্যা এত গুরু আকার ধারণ করিয়াছে যে, লোক যে কোন ব্যবহার-যোগ্য বাড়ী পাইলেই তাহাতে বাস করিতে সম্মত হইবে। বাঙ্গালার গ্রামে বহু ধনী লোকও এখন পর্য্যন্ত মাটীর ঘরে বাস করে। কাজেই 'মাটীর ঘর' বলিয়া সে গৃহ অবহেলার বা তাচ্ছিল্যের জিনিষ হইবে না। এ বিষয়ে সর্ব্বত্র আন্দোলন করা হইলে বহু লোক এই কার্য্যে অগ্রসর হইয়া আমাদের অন্যতম বিরাট সমস্যার সমাধান করিয়া দিবে।

ভারতে বিদেশী মূলধন—

গত দুই বৎসরে ভারত হইতে ৬০ হইতে ৭৫ কোটি টাকার বিদেশী মূলধন সরাইয়া লইয়া যাইবার পরও বর্ত্তমানে ভারতে ৮ শত হইতে ১১ শত কোটি টাকার বিদেশী মূলধন নিয়োজিত আছে। উহার বেশীর ভাগই বৃটীশ জাতির—মাত্র এক দশমাংশ টাকা মার্কিণ জাতির হইতে পারে। পরাধীন ভারতে বিদেশীদিগের পক্ষে এই টাকা কারবারে খাটানোর ব্যবস্থা করা সম্ভব হইয়াছিল। স্বাধীনতা লাভের পর যাহাতে বিদেশীরা আসিয়া ভারতে নূতন মূলধন খাটাইবার ব্যবস্থা করিতে না পারেন, সে জন্য কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত। আর এখনও যে বিদেশী টাকা ভারতে খাটিতেছে, তাহার লভ্যাংশ যাহাতে অধিক না হয় বা সেই টাকা দ্বারা ভারতীয় শ্রমিক শোষিত ও বিদেশীরা অধিক লাভবান না হয়, সে জন্যও আইন প্রণীত হওয়া প্রয়োজন। ক্রমে ক্রমে বিদেশী ব্যবসা ও শিল্পগুলিকে ভারতীয়দের আয়ত্তে আনার ব্যবস্থা হইলে, তাহাতে ভারতীয় গভর্ণমেণ্ট ও ভারতের জনসাধারণ উপকৃত হইতে পারিবে। পণ্ডিত জহরলাল নেহরু প্রধান মন্ত্রী হইয়া এ বিষয়ে কঠোরতা অবলম্বনের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত কোনরূপ কঠোরতা ত দেখা যায় নাই বরং বিদেশীদের লুণ্ঠন কার্য্যে বাধা প্রদান চেষ্টা শিথিল বলিয়াই মনে হইতেছে। দেশবাসী অর্থনীতিক-নেতৃবৃন্দের এবিষয়ে সজাগ থাকিয়া গভর্ণমেণ্ট যাহাতে উপযুক্ত ব্যবস্থায় অবহিত থাকেন, তাহার চেষ্টা করা প্রয়োজন।

সর্ব্বোদয় দিবসের সঙ্কল্প—

গত ৩০শে জানুয়ারী মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যুর ঠিক এক বৎসর পরে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর নির্দ্দেশ মত দেশের সর্ব্বত্র এক সঙ্কল্প গ্রহণ করা হইয়াছে। তাহাতে অন্যান্য কথার সহিত বলা হইয়াছে—"গান্ধীজির নেতৃত্বে অহিংসার পথে সমগ্র জাতির জন্য রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা অর্জ্জিত হইয়াছে, এখন আমাদিগকে সামাজিক ও অর্থ-নৈতিক স্বাধীনতার জন্য প্রয়াস করিতে হইবে। আমাদিগকে অবশ্যই স্মরণে রাখিতে হইবে যে, জনসাধারণের সেবা করিবার কাজকেই সব চেয়ে বড় সুযোগ ও ব্রতরূপে আমরা গ্রহণ করিয়াছিলাম—ভবিষ্যতে এই জনসেবার কাজকেই ব্রতরূপে আমাদিগের পালন করা উচিত এবং পালন করিতে হইবে। যাঁহারা এই দায়িত্ব ভুলিয়া গিয়া সরকারী পদ ও ক্ষমতার জন্য প্রলুব্ধ হইতেছেন, তাঁহারা দেশেরই ক্ষতি করিতেছেন। * * * সবার উপর গান্ধীজি এই শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন যে, সর্ব্ব অবস্থায় সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকার করিয়াও নৈতিক সততার প্রতি নিষ্ঠা রাখিতে হইবে, কারণ জীবনের তাৎপর্য্যই এই নৈতিক সততার দ্বারা নিরূপিত হইবে।" আজ দেশের নৈতিক অবনতি দেখিয়া এই কথাই বার বার আমাদের মনে হয়, গান্ধীজির আদর্শ জীবনে গ্রহণ করিয়া সকল প্রকার স্বার্থত্যাগ করিয়া দেশ-সেবার ব্রত গ্রহণ করার লোক কোথায়? ২।১ জন বা ২।১ শত নহে, আজ দেশে লক্ষ লক্ষ এরূপ ত্যাগ ও সেবা-ব্রতী কর্ম্মীর প্রয়োজন, তবে দেশকে বর্ত্তমান সঙ্কটময় পরিস্থিতি হইতে উদ্ধার করা সম্ভব হইবে।

খেলাধুলা

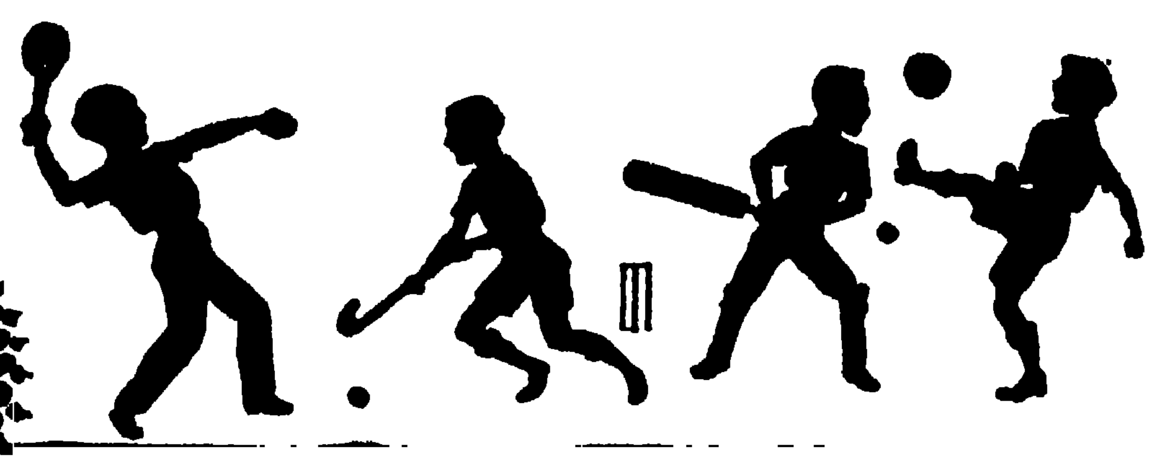

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

৺সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

টেষ্ট ক্রিকেট ঃ

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ঃ ৫৮২ রান, ১ম ইনিংস (রে ১০৯, ষ্টলমায়ের ১৬০, উইকস ৯০, গোমেজ ৫০, ওয়ালকট ৪৩, এবং ক্যামেরণ ৪৮ রান করেন। বোলিং : ফাদকার ১৫৬ রানে ৭টি, এন চৌধুরী ১০৩ রানে ১টি এবং মানকড় ৯৩ রানে ১টি উইকেট লাভ করেন।)

ভারতীয় দল ঃ ২৪৫ রান, ১ম ইনিংস। মোদী ৫৬, ফাদকার ৪৮, মুস্তাক আলী ৩২, অধিকারী ৩২ রান করেন।

বোলিং : ট্রিম ৪৮ রানে ৪টি, জোন্স ২৮ রানে ২টি এবং ফার্গুসন ৭২ রানে ২টি উইকেট পান) এবং ১৪৪ রান, ২য় ইনিংস (হাজারে ৫২ রান। বোলিং : জোন্স ৩০ রানে ৪টি, গোমেজ ৩৫ রানে ৩টি এবং ট্রিম ২৮ রানে ৩টি উইকেট পান।)

মাদ্রাজে চীপক মাঠে অনুষ্ঠিত ওয়েষ্ট ইণ্ডিজদল বনাম ভারতীয়দলের চতুর্থ টেষ্ট ম্যাচ খেলাটিতে ভারতীয়দল শোচনীয়ভাবে এক ইনিংস ও ১৯৩ রানে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের কাছে পরাজিত হয়েছে। ভারতীয় দলের সঙ্গে অনুষ্ঠিত টেষ্ট খেলায় ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের এ বিজয় প্রথম। পূর্ব্ববর্ত্তী তিনটি টেষ্ট ম্যাচই অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়, জয়-পরাজয় নিষ্পত্তি হয়নি।

চতুর্থ টেষ্ট ম্যাচ খেলায় ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের ব্যাটিং, বোলিং এবং ফিল্ডিং নৈপুণ্য শেষ পর্য্যন্ত জয়-পরাজয়ের সুনিশ্চিত মীমাংসা করে দেয়। প্রথম এবং দ্বিতীয় টেষ্ট ম্যাচে বিপুল রান সংখ্যায় অগ্রগামী থেকেও শেষ পর্য্যন্ত ভারতীয় দলের আত্মরক্ষামূলক, দৃঢ়তাপূর্ণ খেলা এবং সময়াভাবের জন্ম ওয়েষ্ট ইণ্ডিজদল জয় লাভ করতে সমর্থ হয়নি।

এই টেষ্ট খেলাতেও ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের প্রথম ইনিংসের বিপুল রান দেখে হতাশ না হয়ে অনেকেই হয়ত আশা ক'রেছিলেন ভারতীয়দল শেষ পর্য্যন্ত খেলাটা ড্র ক'রে ফেলবে নির্দ্ধারিত সময়ের সুযোগ নিয়ে। কিন্তু দেখা গেল নির্দ্ধারিত সময়ের একদিন পূর্ব্বেই জয়-পরাজয়ের সুনিশ্চিত মীমাংসা হয়ে গেছে। অন্যান্য বারের মত এবারও ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের ক্যাপটেন গর্ডাড টসে অমরনাথকে হারিয়ে ব্যাটিংয়ের প্রথম সুযোগ গ্রহণ করেন। টসে জয়লাভ বা পরাজয় ভাগ্যের কথা সন্দেহ নেই, কিন্তু গডার্ড যেভাবে উপর্য্যুপরি টেষ্ট ম্যাচের টসে বিজয়ী হয়ে চলেছেন তাতে দেখা যাচ্ছে ভাগ্যের খেলাতেও ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দল বেশ সিদ্ধহস্ত।

২৭শে জানুয়ারী, চতুর্থ টেষ্ট ম্যাচের প্রথম দিনের খেলার নির্দ্ধারিত সময়ে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দল মাত্র এক উইকেট হারিয়ে ৩১৫ রান করে। এ রে ১০৯ রান করেন, ২৩০ মিনিট খেলে; রানে ৫টি বাউণ্ডারী এবং ৩টি ওভার বাউণ্ডারী ছিল। জে ষ্টলমেয়ার ১৫৭ রান এবং ওয়ালকট ৪২ রান ক'রে নট আউট থাকেন। এ রে এবং ষ্টলমেয়ারের প্রথম উইকেটের জুটিতে ২৩৯ রান উঠে। এ পর্য্যন্ত ভারতীয় দলের বিপক্ষে কোন দলই প্রথম উইকেটে এত অধিক রান তুলতে সক্ষম হয়নি। সুতরাং এ বিষয়ে রে এবং ষ্টলমেয়ারের সহযোগিতায় ২৩৯ রান রেকর্ড হয়ে রইলো। ভারতীয় দলের ৬জন বোলার সারাদিন নিয়মিত বল করেও কোন সুবিধা করতে পারেন নি। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের খেলোয়াড়রা সাবলীলভঙ্গীতে ব্যাট চালিয়ে ভারতীয় বোলারদের উপর সম্পূর্ণ আধিপত্য স্থাপন করেন। ৩০০ মিনিটে ৩১৫ রান উঠে। এই থেকেই খেলার স্বাভাবিক গতি পরিস্ফুট হয়। ফিল্ডিংয়ে ত্রুটি বিচ্যুতি ভারতীয় দলের

মজ্জাগত ব্যাপার, তার ব্যতিক্রম কোন খেলাতে হয়নি। এন চৌধুরীর বলে রে তাঁর নিজস্ব ৬৬ রানে সর্টস্কোয়ার লেগে যে বলটি তুলেন, মানকড় তা ধরতে পারেন নি। মধ্যাহ্ন ভোজের সময় কোন উইকেট না পড়ে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের ১০৯ রান উঠে। প্রথম আউট হ'ন রে, নিজস্ব ১০৯ রান ক'রে দলের ২৩৯ রানের মাথায়।

২৮শে জানুয়ারী, চতুর্থ টেষ্ট খেলার দ্বিতীয় দিনের নির্দ্ধারিত সময়ে ওয়েষ্টইণ্ডিজ দলের প্রথম ইনিংসে ৫৮২ রাণ উঠে। উইকস ৯০ রান ক'রে দুর্ভাগ্যক্রমে রান আউট হ'ন। মাত্র ১০ রাণের জন্য টেষ্টখেলায় উপর্য্যুপরি ষষ্ঠ সেঞ্চুরী করা থেকে তিনি বঞ্চিত হ'ন। ভারতীয়দলের ফাদকার একাই ৭টি উইকেট পান, ১৫৯ রান দিয়ে।

২৯শে জানুয়ারী, খেলার তৃতীয় দিনের নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে ভারতীয় দলের প্রথম ইনিংসের ৬ উইকেটে মাত্র ২২৫ রান উঠে। মুস্তাক এবং রেগ ভারতীয় দলের খেলার প্রশংসনীয় সূচনা করেন। দলের ৪১ রানে মুস্তাকআলী এল-বি-ডবলিউ হয়ে আউট হ'ন। ভাঙ্গন এই সময় থেকেই আরম্ভ হয়। পরে তৃতীয় উইকেটে হাজারে-মুদী দলের ভাঙ্গনের গতি রক্ষা করেন। কিন্তু এই জুটি ভেঙ্গে যায় দলের ১১৬ রানে, হাজারে ২৭ রান ক'রে গডার্ডের হাতে ধরা পড়লে। গডার্ড অদ্ভুতভাবে এক ইঞ্চি মাটির উপরের বলটি লুফে তাঁকে আউট করেন। একমাত্র মোদীই দলের মধ্যে প্রশংসনীয় ৫৬ রাণ ক'রে আউট হ'ন। জোন্স, ট্রিম এবং ফার্গুসন প্রত্যেকেই ২টি ক'রে উইকেট পান।

৩১শে জানুয়ারী, খেলার চতুর্থ দিনে, ভারতীয় দল পূর্ব্বদিনে গান্ধীজীর প্রথম মৃত্যু বার্ষিকী উপলক্ষে বিশ্রামলাভ ক'রে ২৯শে তারিখের অসমাপ্ত ১ম ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে। কিন্তু পূর্ব্বের রাণের সঙ্গে আর মাত্র ১৯ রান যোগ করার পরই ভারতীয় দলের ১ম ইনিংসের খেলা ২৪৫ রানে শেষ হয়ে যায়। প্রথম ইনিংস স্থায়ী ছিল মাত্র ৩৫০ মিনিট। ৩৩৭ রাণের পিছনে পড়ে ভারতীয় দল ফলো-অন করতে বাধ্য হ'ল। কোন রাণ না উঠার আগেই রেগ আউট হন। এর পর দারুণ ভাঙ্গন সুরু হ'ল। মধ্যাহ্ন ভোজের সময় ভারতীয় দলের ৩ উইকেটে মাত্র ৩৭ রান উঠে। মুস্তাক ১৪ এবং মোদী ৬ রান করে আউট হ'ন। নট আউট থাকেন অমরনাথ ও হাজারে যথাক্রমে ৬ এবং ২১ রান ক'রে। চা-পানের সময় দেখা গেল ভারতীয় দলের ৬টা উইকেট পড়ে মাত্র ১০৬ উঠেছে। হাজারে ৪৪ এবং মানকড় ২১ রান ক'রে তখনও ব্যাট করছেন।

দলের ১৪৪ রানের মাথায় ভারতীয় দলের ২য় ইনিংসের খেলা শেষ হয়। দলের সর্ব্বোচ্চ ৫৮ রান করেন হাজারে। জোন্স ৩০ রানে ৪টি, গোমেজ এবং ট্রিম যথাক্রমে ৩টি ক'রে উইকেট পান।

চতুর্থ দিনে ভারতীয় দলের ১৪টি উইকেটের পতন হয় মাত্র ১৬৪ রানে।

খেলোয়াড় ঃ

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দল : ষ্টলমেয়ার, রে, ওয়ালকট, উইকস, গডার্ড, গোমেজ, ক্রিশ্চিয়ানী, ক্যামেরণ, ফার্গুসন, জোন্স ও ট্রিম।

ভারতীয় দল : অমরনাথ, পি সেন, হাজারে, মোদি, মুস্তাক, অধিকারী, ফাদকার, গোলাম আমেদ, মানকড়, এন চৌধুরী ও রেগ।

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের পরাজয় ঃ

ভারতবর্ষে ক্রিকেট খেলারত ভ্রমণকারী ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেট দল পূর্ব্বাঞ্চল (ইষ্ট জোন) দলের কাছে প্রথম পরাজয় স্বীকার করে এবং এবারের ভ্রমণের তালিকায় ইহাই দলের প্রথম এবং একমাত্র পরাজয়। পূর্ব্বাঞ্চল দলের অধিনায়ক পালিয়া টসে জয়লাভ করে প্রথম ব্যাটিংয়ের সুযোগ গ্রহণ করেন। ১ম ইনিংসে ২৯৮ রাণ উঠে। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের প্রথম ইনিংসের খেলায় ১১৮ রাণ উঠে। ফলে তাদের ফলো-অন করতে হয়। দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা সুটে ব্যানার্জির মারাত্মক বোলিংয়ের দরুণ মাত্র ১৮৪ রাণে শেষ হয়। কোন উইকেট না হারিয়ে পূর্ব্বাঞ্চল দলের ৬ রাণ উঠলে খেলা শেষ হয়ে যায়। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দল ১০ উইকেটে পরাজিত হয়।

পূর্ব্বাঞ্চল ঃ ২৯৮ ১ম ইনিংস (ক্র্যাঙ্ক ১২৩) ও ৬, ২য় ইনিংস (কোন উইকেট না দিয়ে)

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ঃ ১১৮ (গাইকোয়ার ৪০ রাণে ৫ ও গিরাধারী ৩১ রাণে ৫ উইঃ) ও ১৮৪ (ওয়ালকট ৪৩ এবং গোমেজ ৪৩ রাণ; সুটে ব্যানার্জি ৬৭ রাণে ৭ উইকেট পান)

পঞ্চম টেষ্ট ম্যাচ ঃ

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ঃ ২৮৬, ১ম ইনিংস (ষ্টলমেয়ার ৮৫, উইকস ৫৬, ক্রিশ্চিয়ানী ৪০, গডার্ড ৪০। ফাদকার ৭৪ রাণে ৪টি, মানকাদ ৫৪ রাণে ৩টি, গোলাম আমেদ ৫০ রাণে ২টি উইকেট পান) ও ২৬৭, ২য় ইনিংস (রে ৯৭, উইকস ৪৮, গডার্ড ৩৩। সুটে ব্যানার্জি ৫৪ রাণে ৪টি, মানকাদ ৭৭ রাণে ৩টি উইকেট পান)

ভারতীয় দল ঃ ১৯৩ (হাজারে ৪০, মোদী ৩৩, মুস্তাক আলী ২৮ রাণ। ট্রিম ৬৯ রাণে ৩টি, এ্যাটকিনসন ও গোমেজ ২টি ক'রে উইকেট পান) ও ৩৫৫ (৮ উইকেটে। হাজারে ১২২, মোদী ৮৬ এবং ফাদকার ৩৭ নট আউট।

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দল বনাম ভারতীয় দলের ৫ম অর্থাৎ শেষ টেষ্ট ম্যাচ খেলায় ভারতীয় দল মাত্র ৬ রাণের জন্য নিশ্চিত টেষ্ট বিজয়ের সম্মান থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

টেষ্ট খেলার নির্দ্ধারিত সময় পর্য্যন্ত ভারতীয় দলের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা অসমাপ্ত থাকে; অর্থাৎ ভারতীয় দলের হাতে তখনও ২টি উইকেট বাকি ছিল। খেলাটি ড্র যায়। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দল বনাম ভারতীয় দলের মধ্যে যে ৫টি টেষ্ট ম্যাচ হয়, তার মধ্যে ৪টি ম্যাচ ড্র গেছে, একটিতে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দল বিজয়ী হয়েছে। সুতরাং এবার টেষ্ট ম্যাচে 'রবার' সম্মান পাওয়ার কৃতিত্ব এই বিদেশী ক্রিকেট দলেরই। পঞ্চম টেষ্ট ম্যাচের শেষ দিনে খেলা খুবই উত্তেজনাপূর্ণ এবং প্রতিযোগিতামূলক হয়ে উঠে ছিল। খেলার প্রতিটি সেকেণ্ড ভারতীয় দর্শকদের কাছে এক অমূল্য সম্পদে পরিণত হয়েছিল। মাঠে তিল ধারণের স্থান ছিল না। চতুর্থ দিনের নট আউট খেলোয়াড়দ্বয় মোদি এবং হাজারে ভারতীয় দলের ২য় ইনিংসের খেলা শেষ দিনের নির্দ্দিষ্ট সময়ে পুনরায় আরম্ভ করেন। রাণ তখন ৩ উইকেটে ৯০। হাতে ৫ ঘণ্টা সময়; জয়লাভের জন্য ২৭১ রাণ আরও দরকার। মধ্যাহ্নভোজের সময় ৩ উইকেটে ১৭৫ রাণ উঠে; মোদী ৬৬ এবং হাজারী ৫৪ ক'রে নট আউট থাকেন।

মধ্যাহ্ন ভোজের পর নিজস্ব ৮৬ রাণ ক'রে মোদী আউট হ'ন দলের ২২০ রাণে; চা পানের আগেই মানকড় দলের ২৭৫ রাণে এবং হাজারে নিজস্ব ১২২ রাণ ক'রে দলের ২৮৫ রাণে আউট হয়ে যান। হাজারে এবং মোদীর চতুর্থ উইকেটের জুটিতে ১৩৯ রাণ উঠে। ৫০ রাণ পূর্ণ হওয়ার পর মোদী রাণ তোলার দিকে লক্ষ্য না রেখে উইকেট রক্ষা করে খেলতে থাকেন। এক ঘণ্টার খেলায় তিনি মাত্র ৭টি রাণ করেন। এতখানি সতর্কতার সঙ্গে না খেললে তাঁর পক্ষে জয়লাভের প্রয়োজনীয় ৬ রাণ করা অসম্ভব হত না। চা-পানের সময় ভারতীয় দলের ৬ উইকেটে ২৮৯ রাণ উঠে। চা-পানের পর খুবই উত্তেজনার মধ্যে খেলা চলতে থাকে। এমন এক সময়ে খেলা পৌছায় যখন জয়লাভের জন্য আর মাত্র ৪০ রাণ প্রয়োজন হয়, সময় হাতে ৩০ মিনিট। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ঐ সময়ের মধ্যে ২৪ রাণের বেশী রাণ উঠলো না। শেষ ওভারের কোন বলেই রাণ উঠেনি; ৬ষ্ঠ বল নিক্ষেপের আগেই টেষ্ট ম্যাচ খেলার স্মৃতিস্বরূপ উইকেট সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের খেলোয়াড়রা উইকেটের পাশে ভীড় করেন; আম্পায়ার খেলা বিরতির নির্দ্দেশ দেন। সুতরাং শেষ বল ওভার বাউণ্ডারীতে পাঠিয়ে প্রয়োজনীয় ৬ রাণ তুলে টেষ্ট জয়ী হওয়ার সুযোগ থেকেও ভারতীয় দল বঞ্চিত হয়।

চিত্র কথা

চিত্র চক্র লিমিটেডের প্রযোজনায় সপ্তর্ষি চিত্র মণ্ডলী লিমিটেডের প্রথম বাণী চিত্র 'ঘার-যেথা-ঘর', এর চিত্র গ্রহণ ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে সমাপ্ত হইয়াছে। এর কাহিনী রচয়িতা শ্রীনিতাই ভট্টাচার্য্য। টেকনিকাল উপদেষ্টা রাজেন চৌধুরীর সাহচর্য্যে শিল্পী [illegible] এর পরিচালনা করিয়াছেন। সুর সংযোজনা করিয়াছেন শ্রীপ্রতাপ মুখোপাধ্যায় ও শিল্প নির্দ্দেশ করিয়াছেন শ্রীবিজয় বসু।

* * * *

কল্প রূপায়ণী লিমিটেডের প্রথম চিত্রার্ঘ্য "বহুব্রীহি"র চিত্র গ্রহণ ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে শেষ হইয়াছে। "বহুব্রীহির" কাহিনী ও সংলাপ রচনা এবং পরিচালনা রচনা করিয়াছেন নাট্যকার জলধর চট্টোপাধ্যায়। চিত্রনাট্য রচনা করিয়াছেন অশোক চট্টোপাধ্যায়। কুমার প্রদ্যোৎ নারায়ণ সুর সংযোজনা করিয়াছেন।

* * *

শ্রীসত্যাংশুকিরণ দালালের প্রযোজনায় ভারতী চিত্র পীঠ 'দাসীপুত্র' নামক চিত্র প্রস্তুত করিয়াছেন। খ্যাতনামা নাট্যকার শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত উহার রচনা ও পরিচালনার এবং শ্রীবিভূতি দত্ত সুরসৃষ্টির ভার গ্রহণ করিয়াছেন। শীঘ্রই উহা প্রদর্শিত হইবে।

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত গল্প-গ্রন্থ "শাদা পৃথিবী"—৩৲

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী প্রণীত উপন্যাস "চিরবাঞ্ছিতা"—২৲

শ্রীকালিদাস রায়-সম্পাদিত "সপ্তকাণ্ড রামায়ণ"—১০৲

শ্রীরামকমলাল মুখোপাধ্যায় সঙ্কলিত "শ্রীশ্রীনারায়ণ পূজা-পদ্ধতি"—১৲

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ গুহ অনূদিত "গান্ধী উপাখ্যান"—১।০

শ্রীঅশ্বিনীকুমার পাল প্রণীত উপন্যাস "ঝটিকার গেল ঘরে"—২৸০

শ্রীবিষ্ণু সরস্বতী প্রণীত কাব্য-গ্রন্থ "যুগ শংখ"—১৲

শ্রীসাথী প্রণীত উপন্যাস "কীর্ত্তিনাশা"—২৸০

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

"কর্ম্ম-রত অঙ্গে কান্তি পড়ে উছলিয়া
কূপোদক রূপ-রাগে রহে মৌন-হিয়া।"

শিল্পী—শ্রীযতি গাঙ্গুলী

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

শিল্পী
শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

পটচিত্রের নয়া ফরমা

পাটরন্ (Pattern) এমনই অপূর্ব্ব যে ছবিকে ঝালে ঝোলে অম্বলে সর্ব্বত্র ব্যবহার করা চলে। যথা—নামকরণে সদ্য বিধবা কিম্বা নববধূ অথবা মল্লযুদ্ধে নারী। আপত্তি থাকিলে নামজাদা ঔষধ বিক্রেতা পুষ্টিকারক ঔষধের বিজ্ঞাপন হিসাবেও ব্যবহার করিতে পারেন।

জনরব, বিজ্ঞপ্তিতেই নয়া আর্টের মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে।

ভারতবর্ষ

চৈত্র—১৩৫৫

দ্বিতীয় খণ্ড — চতুর্থ সংখ্যা

অদ্বৈতং

শ্রীসুধাংশুকুমার হালদার আই-সি-এস্

স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশে আর কোনো বিষয়ের চর্চা তেমন ব্যাপকভাবে বাড়ে নি, যেমন রাজনীতির চর্চা। সেদিন রেডিয়োতে বললে, আজকাল রাজনীতি হচ্ছে শিশুর ক্রীড়নক, যুবার ব্যসন, বৃদ্ধের মুক্তি। ধর্ম তো রাজনীতি নয়, কাজেই ধর্মকথা শুনবে কে? তাছাড়া রাজনৈতিক কারণে ধর্ম এখন প্রায় সমস্ত আসর হতেই বহিষ্কৃত। সেজন্য নালিশ নেই, কেননা এ অনিবার্য্য। বক-ধার্মিকেরা এতদিন ধর্মের নাম নিয়েই, ধর্মের মুখোষ পরেই লুঠতরাজ, দস্যুবৃত্তি, দাঙ্গাহাঙ্গামা সাম্প্রদায়িকতা এবং সাম্রাজ্যবাদ পরিচালনা করে এসেছেন। দীনদুর্বল পদানত মানুষকে দাবিয়ে রাখতে রাজভয়, রাষ্ট্রভয় এবং ধর্মভয় সমানভাবে সাহায্য করেছে। এসব আপদ বিদায় করতে হলে ধর্মের মুখোষটাকেও বিদায় করতে হবে, মুখোষটা পড়ে থাকলে কি জানি কখন কে এসে সেটা মুখে চড়িয়ে নিয়ে আবার কী বিভ্রাট ঘটায়!

কিন্তু আমরা ভারতবর্ষীয়রা চিরদিন এই নিয়ে সান্ত্বনা লাভ করেছি, পরাধীনতার ঘনান্ধকারময় যুগে এই নিয়ে বুকে সাহস পেয়েছি যে আমাদের ধর্ম কখনো নিপীড়িতের শৃঙ্খল নয়, আমাদের ধর্ম জীবনযুদ্ধে জয়ী হবার মহামন্ত্র। লোকভয়, সমাজভয়, রাজভয়, সর্বত্র সর্বপ্রকারের ভয় যখন আমাদের কণ্ঠরোধ করতে চেয়েছে তখন আমরা এই মহামন্ত্র জপ করেছি, "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বন্ ন বিভেতি কুতশ্চন"—ব্রহ্মের আনন্দকে যিনি জেনেছেন তাঁর আর কোনোখানে ভয় নেই।

জানি এ নিয়ে কারো মতভেদ হবে না, তবু ধর্মালোচনা করায় বিপদ আছে। মানুষ বারংবার ঠকে এখন সন্দেহ-

সম্বল। হয়তো ভাববে ধর্মের আছিলা ক'রে কোনো 'ism' প্রচার করাই আমার লক্ষ্য। সাহিত্যের হাটে এই পশরা নামালে অনেকেই তাই লাঠি নিয়ে তেড়ে আসবেন। তবু এ বিশ্বাস আছে যে দুএকজনের স্নেহদৃষ্টি হতে বঞ্চিত হব না। হয় তো কোনো এক অভাবনীয় মুহূর্তে কারো অপ্রত্যাশিত আশীর্বাদে আমার শূন্য ঝুলি ভরে উঠবে। সে তো পরম সৌভাগ্য।

'শান্তং শিবং অদ্বৈতং' ভারতবর্ষের আকাশে এ বাণী যুগে যুগে প্রতিধ্বনিত হয়েছে। ভারতবর্ষের মনীষা ব্রহ্মের অনন্তপ্রকাশকে তিনটি বিশেষ দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ ক'রে দেখতে চেয়েছে। তাঁর একটি প্রকাশে তিনি শান্তং, আর একটি প্রকাশে তিনি শিবং। আবার তিনিই অদ্বৈতং। 'শান্তং' আর 'শিবং' সম্বন্ধে 'ভারতবর্ষে' এর আগেই কিছু আলোচনা করেছি *। এইবারের আলোচনা অদ্বৈতং নিয়ে। আগেই বলে রাখি, বেদান্তের দ্বৈত-অদ্বৈত বাদ-বিসংবাদের মধ্যে প্রবেশ করা আমার উদ্দেশ্য নয়। তিনি অদ্বৈতং—অদ্বিতীয় তুলনারহিত, এই বিষয়েই আজ আলোচনা।

এই অনন্ত বিশ্বমণ্ডলে প্রতি মুহূর্তে কত শক্তির বিপর্যয়, কত অভাবনীয় চাঞ্চল্য ঘটছে, কিন্তু এই বিশ্বের স্রষ্টা যিনি, তিনি শান্ত, স্থির, সমাহিত। সমস্ত চাঞ্চল্য, সব বিপর্যয় তাঁর অন্তর-স্পর্শের যাদুমন্ত্রে ছন্দ হয়ে বেরিয়ে আসছে—এ তো প্রতি-নিয়ত আমরা নৈসর্গিক ব্যাপারে চোখের সামনে প্রত্যক্ষ করছি। গীতা বললেন, মানুষকে তার জীবন-নাট্যে সেই মহান্ নটের অনুসরণ করতে হবে, তাঁরি বর্ত্মের অনুবর্ত্তী হ'তে হবে।

যোঽন্তঃ সুখোঽন্তরারামস্তথান্ত র্জ্যোতিরেব চ
স যোগী ব্রহ্মনির্বাণং ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি ॥

যিনি অন্তঃসুখ, অন্তরারাম, অন্তর্জ্যোতিঃ—সেই যোগী হ'য়ে অর্থাৎ ব্রহ্মত্বপ্রাপ্ত হ'য়ে ব্রহ্মনির্বাণ লাভ করেন।

সুখ আরাম বাইরে নেই—কোথায় বাইরে তাকে খুঁজতে যাবো? তা মানুষের অন্তরের জিনিষ। আরামের লালসায়, সুখের মৃগয়ায় যত্র তত্র দৌড়াদৌড়ি করা নয়, আত্মস্থ হয়ে, আত্মসমাহিত হয়ে অন্তরের প্রদীপশিখা জ্বালিয়ে দাও। চিত্তকে প্রশান্ত না করতে পারলে সমস্তই ব্যর্থ, মানবজন্মই ব্যর্থ। গীতা জ্ঞানযোগের বর্তিকা দিয়ে অন্তরের দীপশিখা জ্বালিয়ে দিয়েছেন, তারই নির্মল স্নিগ্ধ আলোকে সকল অশান্তি দূরীভূত হবে। কিন্তু শান্ত হয়ে হাতপা গুটিয়ে বসে থাকলেই মনুষ্যত্বের বিকাশ শেষ হয়ে যায় না। বস্তুতঃ শান্তির একটি গূঢ় উদ্দেশ্য আছে, লক্ষ্য আছে—সে হ'ল শিবং, মঙ্গল। এই মঙ্গল কর্মযোগের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত। এই নিখিল বিশ্ব-চরাচরে এক আদিহীন অন্তহীন মঙ্গল যজ্ঞচক্র প্রবর্তিত রয়েছে, সে চক্রের প্রবর্তনকারী স্বয়ং ভগবান। মানুষকে তিনি তাঁর সেই 'এবং প্রবর্তিতং' চক্রে—সেই মঙ্গলযজ্ঞচক্রে যোগ দিতে আহ্বান করেছেন, প্রশান্ত চিত্তে এই মঙ্গলকর্মচক্রে যোগ দিতে হবে, আর কর্মফলে অনাশ্রিত হ'য়ে তাঁর কর্মকে সার্থক ক'রে তুলতে হবে। শ্রীভগবান শান্তি-স্বরূপ, আর তিনি আদর্শ কর্মযোগী। তাই ব্রহ্ম সম্বন্ধে উপনিষৎ বলেছেন, তিনি শান্তং, তিনি শিবং। এইবার প্রণিধান করতে হবে সেই রূপহীনের আর এক রূপ—অদ্বৈতং।

তাঁর এই প্রকাশ অশেষরূপে অনন্তরূপে জগৎ চরাচরের মধ্যে আপনাকে ব্যক্ত করছে। সে সমস্ত অশেষ অভিব্যক্তিকে কথার বাঁধন দিয়ে বাঁধতে পারে এমন সাধ্য কারো নেই। শুধু আভাষ দিতে পারি, শুধু ইঙ্গিতে, ইসারায় তাঁর কণামাত্র ছুঁয়ে যেতে পারি, তার বেশি আর কিছুই পারি না।

জ্ঞান তাঁকে জানবার পথ ব'লে দেয়, পাওয়ার পথ তো বলে না। শুধু জ্ঞান নিয়ে আমাদের কি হবে? কিন্তু তাই ব'লে জ্ঞানকে উপেক্ষা করবার মূঢ়তা যেন না হয়। অজ্ঞানতাকে বর্বরতা বলে যেন ঘৃণা করতে পারি। কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনের হেতু-বিহীন ভক্তির মাতলামির মধ্য দিয়ে শ্রীভগবানের মন্দির প্রবেশের পথ নেই—জ্ঞানী-ভক্তই ঈশ্বরের অত্যন্ত প্রিয়—

তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।
প্রিয়োহি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ ॥

—তাদের মধ্যে আমাতে (ঈশ্বরে) নিত্যযুক্ত একভক্তি জ্ঞানীই শ্রেষ্ঠ। আমি জ্ঞানীর অত্যন্ত প্রিয়, জ্ঞানীও আমার প্রিয়।

"একভক্তি জ্ঞানী কাকে বলে? যাঁর জ্ঞান কেবলমাত্র

* ভারতবর্ষ, আশ্বিন ১৩৫১, পৌষ ১৩৫১, মাঘ ১৩৫১

শাস্ত্রের অধ্যয়ন আর অধ্যাপনায় পর্য্যবসিত নয়, যিনি জ্ঞানের আলোকে বিশুদ্ধ ভক্তির পথ আবিষ্কার করতে করতে চলেন, যাঁর ভক্তি কুসংস্কারাচ্ছন্ন অন্ধবিশ্বাস মাত্র নয়, সাংসারিক সুখসুবিধা স্বার্থসিদ্ধির বিনিময়ে ঈশ্বরকে দেয় মূল্যমাত্র নয়, যাঁর ভক্তি বিশুদ্ধ প্রজ্ঞায় প্রতিষ্ঠিত, দীপ্ত মনীষায় প্রোজ্জ্বল, তিনিই জ্ঞানী ভক্ত। এই জ্ঞান যখন এই অনন্তবিশ্বচরাচরের মধ্যে পরিব্যাপ্ত ঈশ্বরের নানা অভিব্যক্তির মধ্যে তাঁর বিরাট একত্বকে অনুভব করে, ভক্তিকে সেই একের উদ্দেশ্যে নিয়ন্ত্রিত করে যিনি বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেক স্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্বং—যিনি বৃক্ষের মতো আকাশে স্তব্ধ হয়ে আছেন সেই এক, যে পুরুষের দ্বারা এই যা কিছু সব পরিপূর্ণ—তখন সেই জ্ঞানীকে বলি "একভক্তি" জ্ঞানী।

এই বিষয়টি পরিষ্কার ক'রে বোঝা চাই; 'ঈশ্বরের একত্ব'—এই কথাটা আমরা কেবলমাত্র অভ্যাসবশতঃ আউড়ে যাই, তলিয়ে বুঝে দেখি না।

এই তলিয়ে বোঝবার কত রকম অন্তরায় যে আছে মানুষের মনে তার সংখ্যা গোণা যায় না। সংস্কার যখন আমাদের পেয়ে বসে, জ্ঞানকে তখন আমরা তুচ্ছ করতে শিখি—আর মানুষের মন সংস্কারের খুঁটার চারিদিকে বদ্ধজীবের মতো ঘুরতে ভালবাসে, জ্ঞানের অতন্দ্রিত আলোকে সর্বদা জাগ্রত থাকবার ক্লেশ থেকে সংস্কারের স্তিমিত-জ্যোতি অন্ধকারে ঘুমিয়ে থাকতেই মানুষের অলস প্রবৃত্তি। মানুষ ক্রমে তার মনের চারিদিকে দেওয়াল গেঁথে জ্ঞানের আলো বাতাস বন্ধ করতে চায়। অন্ধকারের বদ্ধ ঘরে সে ভক্তির উচ্ছ্বাস নিয়ে মাতামাতি শুরু করে, নইলে অন্ধকারের একঘেয়েমি সে সহ্য করবে কেমন ক'রে?

এই ভারতবর্ষে, কর্মযোগের পাঞ্চজন্য বেজেছিল যেখানে—সেই মহাদেশই কর্মত্যাগী সন্ন্যাসীদের এবং কর্মবিমুখ সংসারীর লীলানিকেতন। আর যে ইয়োরোপ দীক্ষা নিয়েছিল শুধু আজকের রুটি ছাড়া আর সমস্ত পার্থিব সম্পদত্যাগ করবার দীক্ষা, সে হ'য়ে উঠল প্রচণ্ড জড়বাদী। কোন্ বিধাতার পরিহাস এ? ওরা হল প্রচণ্ড কর্মী, আর আমরা হলাম নিষ্কর্মা। আমরা জোর ক'রে আমাদের মনের অনেকগুলি দুয়ার বন্ধ করেছিলুম—ওরাও তাই। কিন্তু মানুষের জ্ঞান বলে কোনো কিছুকেই এড়িয়ে গেলে চলবে না, সকল দিক দিয়েই তাঁর দিকে যেতে হবে, সকল দুয়ারকেই তাঁর মন্দিরের দিকে খুলে রাখা চাই। যেদিকে দুয়ার বন্ধ রাখবে, সেদিক থেকেই আসবে মহতী বিনষ্টিঃ। এর কারণ এই যে বন্ধ দুয়ারে বাধাগ্রস্ত যে দৃষ্টি তা ঈশ্বরের একত্বদর্শী দৃষ্টি নয়, সে দৃষ্টি তাঁকে খণ্ডিত করে দেখে, তারি ফলে আমাদের সাধনা কেবলি বিফল হতে থাকে।

আদিম যুগের মানুষ যেখানেই বড় কিছু দেখেছে, আশ্চর্য কিছু দেখেছে, যা বুঝতে পারে নি, যা দেখে ভয় করছে—তারই কাছে সে মস্তক অবনত করেছে। এমনি করে আকাশ, বাতাস, অন্তরীক্ষ, গিরিশৃঙ্গ, নদনদী, মহাসাগর—সমস্তই উপাস্য দেবদেবীতে ভরে উঠেছে। নানার উপাসনায় মন বিভ্রান্ত হয়, বিষাদে ভয়ে উদ্বেগে আকুল হয়ে ওঠে। বেদের মধ্যে দেখতে পাই এই নানা দেব-দেবীর উপাসনা। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, এই পরম শুভক্ষণে বোধ করি ভাগবত প্রেরণায় মানুষের মন প্রথম ঈশ্বরের একত্ব অনুভব করল। সে আজ কত হাজার বৎসরের কথা! তখন আজিকার অধিকাংশ সুসভ্যজাতিরাই বর্বরতার গণ্ডী পার হয় নি। উপনিষৎ হতে দু'একটি শ্লোক উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

ঋষি বলেছিলেন—

যথা সৌম্য বয়াংসি বাসোবৃক্ষং সংপ্রতিষ্ঠন্তে।
এবং হ বৈতৎ সর্বং পর আত্মনি সংপ্রতিষ্ঠন্তে॥

হে সৌম্য, পক্ষীগণ যেমন বাসবৃক্ষে এসে প্রতিষ্ঠিত হয়, তেমনি এই যা কিছু সব পরমাত্মায় এসে প্রতিষ্ঠিত হয়। বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেক স্তেনেদং পূর্ণ পুরুষেণ সর্বং। বৃক্ষের মতো আকাশে স্তব্ধ হ'য়ে আছেন সেই এক। সেই পুরুষের দ্বারা এই সমস্তই পরিপূর্ণ।

মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি

মৃত্যু হতে সে মৃত্যুকেই পায় যে এখানে নানা ক'রে দেখে। ঋষি রবীন্দ্রনাথ চমৎকার ভাষ্য দিয়েছেন তাঁর নৈবেদ্যের একটি গানে—

"মৃত্যু সে ধরে মৃত্যুর রূপ
দুঃখ হয় সে দুঃখের কূপ
তোমা হ'তে যবে স্বতন্ত্র হ'য়ে
আপনার পানে চাই।

হে পূর্ণ তব চরণের কাছে
যাহা কিছু সব আছে আছে আছে,
নাই নাই ভয় সে শুধু আমারি
নিশিদিন কাঁদি তাই।

কঠোপনিষদের পঞ্চমী বল্লীর ৯-১১ শ্লোকগুলি পড়লে মনে হয় ঈশ্বরের একত্ব অনুভব করার প্রয়াসে মন কি অপূর্ব বিস্ময় রসে ভ'রে উঠেছে—। এ শ্লোকগুলি সকলেরই পরিচিত, সুতরাং সেগুলির উল্লেখ এখানে বাহুল্য। ব্রহ্মের সঙ্গে অগ্নি, বাতাস ও সূর্য্যের তুলনা ক'রে তাঁর একত্ব উপলব্ধির প্রয়াস করা হয়েছে। এখানে আমার ভাষ্যানুবাদের সামান্য একটু অংশ উদ্ধৃত করলে অপ্রাসঙ্গিক হবে না—

"অগ্নি যেমন সবখানে এক
তেম্‌নি বুঝি সে!
হয় মনে হয় বুঝতে পারি,
বুঝতে পারি নে!

* * *

বাতাস যেমন সবখানে এক
তেম্‌নি বুঝি সে!
একটি রূপের ধারা চলে
বিভেদ পারায়ে।

* * *

সূর্য যেমন সৌরলোকের
আলোর খনি রে।
তেম্‌নি বুঝি সকল মণির
মধ্য-মণি সে!"

(অরণ্যের অঞ্জলি—৩৫,৩৬)

ঈশ্বর যে এক এবং অদ্বিতীয় এ ধারণা আমাদের আছে এবং নেই। যখন দুঃখ এসে আঘাত করে, বিচ্ছেদ এসে বিভিন্ন করে এবং মৃত্যু এসে কেড়ে নিয়ে যায়, তখন আমরা ভুলি। তখন ভুলে যাই যে দুঃখ তাঁরই হাতের দান, ভুলে যাই যে বিচ্ছেদ তাঁরই অঙ্কে আমাদের স্থাপন করেছে, ভুলে যাই যে মৃতজন তাঁরই বুকে মিলিয়ে গেছে। সব কিছুকে যদি এক ক'রে তাঁরই মধ্যে দেখি, তাহলে সকল ছিদ্র বন্ধ হয়ে যায়, সকল অন্ধকার আলোয় ভাস্বর হয়ে ওঠে। কিন্তু তেমন ক'রে তো দেখি না। তাই মৃত্যুর মধ্যে মৃত্যুই দেখি, বিচ্ছেদের মধ্যে ছিদ্রই দেখি।

আবার আর এক প্রকারের খণ্ডিত দৃষ্টি আছে, তাহ'তেও আমাদের সাধারণ হতে হবে। তাঁকে এক জেনেও মনের মোহে খণ্ডিত ক'রে দেখি। আমাদের যেমন নিজস্ব একটি ঘর আছে, নিজস্ব আসবাবপত্র আছে, তেম্‌নি একটি মনগড়া ঠাকুর আছে। আমরা তাঁকে পূজা-নৈবেদ্য নিবেদন ক'রে দিয়ে বলি, "দেখো ঠাকুর আমার যেন কোনো বিপদাপদ্ না হয়, আমায় যেমন সুখৈশ্বর্যে রেখেছ তেমনি চিরদিন রেখো।" এই ঠাকুর আর অদ্বৈত ভগবান কি এক? যখন তাঁকে এই বিশ্বের অণুতে দেখব, যখন দেখব তিনি জনে জনে বিরাজমান, যখন সুখের মধ্যে এবং দুঃখের মধ্যে, শোকের মধ্যে, মৃত্যুর মধ্যে তাঁকে দেখব, যখন আমার সব অভিমান, সকল অহঙ্কার চূর্ণ ক'রে জীবনের সকল অবস্থায় একমাত্র তাঁকে শরণ নেব, তখন সেই দেখাই সত্য হবে। কিন্তু সে কি সুলভ?

সামান্য আঘাতেই আমরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠি। দুঃখ শোকের রাতে আমরা ক্ষিপ্ত হয়ে 'অরূপ রতনে'র রাণী সুদর্শনার মতো বলি, "ভয়ানক, সে ভয়ানক। সে আমার স্মরণ করতেও ভয় হয়। কালো, কালো। আমার মনে হয় ধূমকেতু যে আকাশে উঠেছে সেই আকাশের মতো কালো। ঝড়ের মেঘের মতো কালো, কূলশূন্য সমুদ্রের মতো কালো।"

মহাকবির এই বর্ণনার সঙ্গে গীতায় অর্জ্জুনের বিশ্বরূপ-দর্শন-বর্ণনা তুলনীয়। শ্রীকৃষ্ণের সেই ভয়ঙ্কর মূর্তি দেখে অর্জ্জুন ভীত প্রব্যথিত হয়ে বলেছিলেন, 'দিশো ন জানে, ন লভে চ শর্ম!' অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীভগবান যে উত্তর দিয়েছিলেন, তার ধ্বনি কী ভাস্বর—

"কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো
লোকান্ সমাহর্তুমিহ প্রবৃত্তঃ!"

কিন্তু যতই কালো হোন্ তিনি, আমাদের হৃদয়ে যথার্থ ভক্তি যদি থাকে সে 'অরূপরতনের' সুরঙ্গমার মতো আশ্বাস দেবে, "যে-কালো দেখে আজ তোমার বুক কেঁপে গেছে, সেই কালোতেই একদিন তোমার হৃদয় স্নিগ্ধ হ'য়ে যাবে। নইলে ভালবাসা কিসের!"

এ ভালবাসা সহসা কি জাগে! অতো দুর্লভ তিনি

নন। আমরা ক্ষিপ্ত হয়ে রাণী সুদর্শনার মতো ব'লে উঠি, "আমি তাঁর নাম করতেও চাইনে!"

কিন্তু বললে কি হবে, আমাদের প্রাণের তলে গোপন দূতী চুপি চুপি বলে, "আচ্ছা, নাম কোরো না। তাঁর সবুর সইবে।"

আমরা সাধু মহাত্মাকে জিগ্যেস করি, সুদর্শনা যেমন ঠাকুরদা'কে জিগ্যেস করেছিলেন, "সমস্ত বুক দিয়ে ঠেলেছি। বুক ফেটে গেল, কিন্তু নড়ল না। ঠাকুরদা, এমন বন্ধুকে নিয়ে তোমার চলে কি ক'রে?"

মহাত্মা বলেন, "চিনে নিয়েছি যে, সুখে দুঃখে তাকে চিনে নিয়েছি। এখন আর সে কাঁদাতে পারে না।"

আমরা সুদর্শনা-রাণীর মতো জিগ্যেস করি, "আমাকেও কি সে চিনতে দেবে না?"

মহাত্মা আমারের সুগভীর আশ্বাস দিয়ে বলেন, "দেবে বই কি, নইলে এত দুঃখ দিচ্ছে কেন? ভাল ক'রে চিনিয়ে তবে ছাড়বে। সে তো সহজ লোক নয়।"

এই যে ভাল করে চেনা, সে সহজ চেনাও নয়। মনসৈবেদং আপ্তব্যং—মনের দ্বারাই এঁকে পাওয়া যায়। আমাদের মনের দ্বারা সকল রকম সংশয় দূর ক'রে তাঁকে চরম চেনা চিনতে হবে। এর মধ্যে যেন কোনো ফাঁকি না থাকে।

তাঁকে চিনতে চাই কেন? তাঁকে ভালবাসলে কি সত্যি আনন্দ পাবো? তার আগে দেখা যাক—কাকে ভালবেসে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ পেয়েছি এ জীবনে। ধন চেয়েছিলাম। দুহাত ভরে উঠেছে ধন ধান্যে। কিন্তু তাতে কি জীবনের নিরানন্দময় সব ক'টা ছিদ্র ভ'রে গেছে? তাতো যায় নি। ধন আমাকে কি আনন্দ দিতে পেরেছে? আমি আবার ধনের বড়াই করি! সে আমার অহঙ্কারকে গগনস্পর্শী করেছে, আমার চিত্তকে কলুষিত করেছে। ধনী ব'লে, অহঙ্কারী ব'লে সে আমাকে সাধুমানুষের সাহচর্য্য হতে নির্বাসনদণ্ড দিয়েছে, সে আমায় কতকগুলা ইতর চাটুকার মোসাহেবে পরিবৃত ক'রে রেখেছে। সে আমার আত্মীয় বিয়োগের শোককে কি প্রতিহত করতে পেরেছে? সে কি আমায় মৃত্যুভয় হ'তে মুক্তি দিতে পেরেছে? তার রক্ষণাবেক্ষণে, আর তার ক্ষয়ের ভয়ে আমার চিত্ত সর্বদা সশঙ্কিত হয়ে আছে।

সম্মান ভালবাসি, তাই সম্মান চেয়েছি। মানুষের কাছে, সমাজের কাছে, রাজার কাছে সম্মান পাবার জন্য কতই না উমেদারি করেছি। কিন্তু খ্যাতি আমার কোন্ নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ এনেছে এ জীবনে? খ্যাতি-দেবতার দেউলে নিরন্তর ধূপধূনা জ্বালাতে হয়, নইলে নিন্দার দুর্গন্ধময় ঝটিকা তেড়ে আসে। সম্মানের বোঝা পিঠে বেঁধে যেমনি পিছন ফিরেছি, অমনি অজস্র নিন্দার ফিস্‌ফিসিনি ভেসে এসেছে কানে। যে সব থেকে বেশী ঋণী আমার কাছে, সেই সব থেকে বেশী নিন্দা করেছে আমার পিছনে। খ্যাতি আর নিন্দা—এই তো তার দাম! খ্যাতি আমাকে আনন্দ দেয়নি জীবনে।

সবার চেয়ে বড় ক'রে ভালবেসেছি প্রিয়জনকে। জীবনের কয়টা দিন ভরে উঠেছে অনুপম মাধুর্য্যে—এমন মাধুর্য্য যা হৃদয়ে ধরে না। কিন্তু সে ক'টা দিন? সেই প্রিয়জন বিমুখ হল, মৃত্যুর মধ্যে ডুবে গেল। সে আমার চোখের জলের বাধা মানলে না, সে আমার সকল বাঁধন উপেক্ষা ক'রে চলে গেল। শুধু শ্রীভগবান যে কত মধুর হতে পারেন, তারই একটু আভাস রেখে গেল মানুষের এই ক্ষণস্থায়ী ভালবাসা।

আমাদের জীবন এমনি ক'রে নানা দিক দিয়ে রিক্ততায়, ব্যর্থতায় দুঃসহ হয়ে উঠল। সেই সব রিক্ততার ছিদ্রগুলি আমরা ধন দিয়ে, সম্মান দিয়ে, আত্মীয় স্বজনের স্নেহ দিয়ে চিরদিনের জন্যে ভ'রে দেবার চেষ্টা ক'রে মরছি, কিন্তু কেবলি সে চেষ্টা ব্যর্থ হচ্ছে। কেবল কাঁটা, কেবলি কাঁটা। কাঁটায় কাঁটায় দেহমন ক্ষতবিক্ষত হল। এসব মিথ্যা দেবতার আরাধনায় জীবনে কোনোদিন চিরস্থায়ী আনন্দ এল না। ধন-সম্মান-প্রিয়জনের প্রতি প্রেম কেন আমায় চিরানন্দ দেয় না? তার কারণ, সব প্রেম প্রেম নয়। তবে কে আছে যাকে পেলে আমার সকল নিরানন্দ ঘুচে যাবে, যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ,—যাকে পেলে অপর লাভ আর তার চেয়ে বড় বলে মনে হবে না?

"কেহ কিরে আছে
যার প্রেম লভি
ঘুচে যাবে ব্যথা
আর দূরে দূরে

মরিব না ঘুরে,
পেয়ে বন্ধুরে ?
মৃত্যু না কাড়ে
শোক নাহি হানে,
এমন কি কেহ
আছে কোনোখানে ?
তখনি তোমারে
পড়ে মনে পড়ে
চোখে জল ঝরে
চোখে জল ঝরে।
আমরা দুজনা
বিলগ্ন কায়া
দ্বা সুপর্ণা
সযুজা সখায়া ॥"

(অরণ্যের অঞ্জলি, ৫৭।৫৮)

তিনি বলেন, 'আমিই সেই, আমিই সেই।' 'মামেব শরণং ব্রজ'—একমাত্র আমাতেই শরণ নাও। তিনি আমার শোকের অশ্রু নিজহাতে মুছিয়ে বলেন, 'মা শুচঃ'—শোক কোরো না। সেই দয়াল ঠাকুর আমার হৃদয়ের মধ্যে তাঁর হৃদয়ের স্পর্শ দিয়ে বলেন, "প্রিয়োঽসি মে"—তুমি আমার প্রিয়। সেই তিনিই হলেন এই নানা বিভিন্নতায় বিভক্ত বিশ্বসংসারে একমাত্র এক, এই জরামরণশীল সংসারে একমাত্র স্থির, আর সমস্তই তাঁর কাছ থেকে আসে, আবার তাঁতেই ফিরে যায়। শুধু তিনিই ধ্রুব, শুধু তিনিই সত্য। তিনি অদ্বিতীয়, তিনি পুরুষোত্তম, তিনি অদ্বৈতং।

জ্ঞানের দ্বারা, মননের দ্বারা যখন সমস্ত ভুল চেনার ভুল বিশ্লেষণ ক'রে দেখতে দেখতে, ভুল দেখার ভুল ভাঙতে ভাঙতে সত্যি চেনার পরম প্রার্থিততম মুহূর্তে এসে পৌছাতে পারি, যখন সেই অদ্বৈতংএর উপলব্ধি সত্য হয়, তখন কোনো প্রয়াস করতে হয় না, ভক্তি আপনি এসে দুনয়ন সিক্ত করতে থাকে। অদ্বৈতংএর উপলব্ধিই হ'ল যথার্থ ভক্তিযোগ। জ্ঞান-কর্মযোগের কথা শান্তং ও শিবং প্রবন্ধের মধ্যে বলা হয়েছে, অদ্বৈতং প্রবন্ধে ভক্তিযোগের আভাস রইল।

এতক্ষণ যা বলা হল সে শুধু মুখের কথা। কিন্তু মুখের কথায় কিই বা হবে—যদি হৃদয় দিয়ে, মণীষা দিয়ে না বুঝতে পারি, তুমি অদ্বৈতং। আমাদের প্রতি দিবসের প্রার্থনা হোক্ আবিরাবীর্মএধি—হে নিত্যপ্রকাশ স্বরূপ, তুমি আবির্ভূত হও আমার জীবনে, আমায় দেখা দাও, সকল বিভিন্নতার মধ্যে এক, হে বাসুদেব, হে অদ্বিতীয়, তুমি প্রকাশিত হও আমার নয়নে।

রবিবার

শ্রীসমরেশচন্দ্র রুদ্র এম-এ

রবিবার আমার ভাল লাগে না। সপ্তাহ শেষে যখন এ দিনটি আসে, আমার মন ছুটে পালাতে চায় এমন কোন দেশে, যেখানে রবিবার নেই।

শনিবারের সকাল হলেই আমার মন খারাপ হয়ে যায়, রবিবার আসছে। শনিবারের কাজ শেষ হলে যখন ছুটী হয়, তখন গুরুভার একটা সময়খণ্ড কে যেন আমার হাতে ঝুলিয়ে দেয়, সেটা টুকরো টুকরো করে শেষ করতে হবে ভাবলে কি ক্লান্তি ও অবসাদই না আসে আমার—জেলখানার কয়েদীর মত!

যেটা বিশ্রামের দিন বলে আমরা ধরে নিই, রহস্যের ব্যাপার এই, সেটা যে কত পীড়নকর দিন, তা আমরা তলিয়ে দেখি না। সেটা শরীরকে আপাতঃ বিশ্রাম কিছুটা দিলেও মনটাকে যেন পাগলা ঘোড়ার মত ছোটাতে থাকে. নিঃশ্বাস ফেলবার সময় পর্যন্ত দিতে চায় না। সপ্তাহের অন্ত কটা দিন কর্মশৃঙ্খলে বাঁধা থেকে যে মন—চিন্তা করবার অবসর পায় না, অবসর পেলেও অবসন্নতায় ঢুলে আসে সমস্ত দিনের কোলাহলের পর, সে মন শনিবারের অপরাহ্ণের আলো মিলাতে না মিলাতেই ঝাঁপির ঢাকনা

ঠেলে বিষাক্ত সর্পের মত মুখ বার করতে চায়। রবিবারের আলো চোখে পড়লেই ক্রূর ফণা বিস্তার করে দংশন করে, বিষের থলিটা সম্পূর্ণভাবে উজাড় করে দেয়; আবার রবিবারের রাত্রি শেষ হলে ঝাঁপির ভিতর ঢোকে—ছদিন ধরে বিষ সঞ্চয় করবে বলে।

এই রবিবারকে এড়াবার জন্যই কি আমরা সকলে ছুটি না? প্রবাসী যায় গৃহে, গৃহস্থ যায় প্রবাসে, যারা কোথাও যেতে পায় না, তারা দিগবিদিকে ছুটে বেড়ায়—কেউ যায় মজলিসে, কেউ খেলায়, কেউ প্রমোদাগারে।

অভাব অভিযোগের প্রধান সংবাদদাতা এই রবিবার। অভাব তো নিত্য লেগে আছে, এমন দিন যায় না, যেদিন কানে আসে না এই বস্তুটির অপ্রয়োজন। কর্মচক্রের দোহাই দিয়ে অন্য ছদিন যদিও বা ঐ বিষয়ে চক্ষুকে আলোহীন ও কর্ণকে ধ্বনিহীন করে দায় এড়ান যায়, রবিবারে আর তা সম্ভব হয় না; সেদিন ঘূর্ণায়মান চক্রের ডাক নেই বলে বাড়ী ছেড়ে পালাবার পথ নেই—দীর্ঘ সময় ধরে অন্ন, বস্ত্র ও গৃহ তাদের ছিদ্রগুলি দেখাতে থাকে তাদের প্রভুকে। তাদের সাঙ্গোপাঙ্গেরা উঁকি ঝুঁকি মারতে থাকে পাশ থেকে, বিরক্তিবিমুখ মানুষটিকে তাদের ভয় হয়। বড় তিনটির মুখরক্ষা হলে তবে তাঁরা কাঁচুমাচু করে সামনে এগোয়, এক এক দাপটে এক একজনকে নিশ্চিহ্ন না করে দেন তিনি, এই তাদের নিয়ত আশঙ্কা।

যৌবনের কল্পনা-উজ্জ্বল ও আশা-উচ্ছল দিনগুলির ব্যর্থ-স্মৃতিবাহী এই রবিবার। ছাত্রজীবনের কত আদর্শ, কত কামনা যে কি নিরাশা ও দীনতায় এসে নেমেছে, কি বিরাট উদারতা ও অসীম প্রাণময়তা যে কি নির্লজ্জ সঙ্কীর্ণতা ও অলস ঔদাসীন্যে পরিণত হয়েছে, তার কথা মনে করিয়ে দিয়ে এমন তিক্ততা রবিবার ছাড়া আর কে সৃষ্টি করবে। নিশ্চিন্ত হয়ে বসবার উপায় নেই, কর্মবিরতির দিনে কোথায় শ্রান্ত চোখদুটিকে কমনীয় দৃশ্য দেখিয়ে তৃপ্ত করব, না সে দুটিকে টেনে নিলে আমারই মানসপট। নির্বাক চিত্রাভিনয় সুরু হয়ে গেল। এল শৈশব। পিতামহ পিতামহীর ক্রোড়ে লালিত দুলালটিকে ঘিরে যে উদ্দাম প্রার্থনা চলে, সে প্রার্থনা পূর্ণ হলে তো প্রত্যেকে দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান। কৈশোর চলে যায়। আশার বীজ বপন সুরু হয়ে গেছে, পিতা-মাতার কামনা অজস্র বারিনিষেক করছে। যৌবন এল। এবার অজস্র সমারোহে সহস্র ফুল ফুটে উঠবে, দিকে দিকে মাথা দুলিয়ে বলবে, দেখ, নয়ন সার্থক কর। দিন যায়, ফুল তো ভাল ফুটল না। সহস্রের জায়গায় শতটি কি ফুটেছে? যৌবন শেষ হয়ে যে প্রৌঢ়ত্ব আসবার উপক্রম! কত কিছু করবার আশা ছিল, কিছুই তো হল না। আশা-অনুযায়ী কি চেষ্টা হল না, না ভাগ্য বাদী হল? তাইতো, কি ব্যর্থতা!

বহু অসুখের বিঘোষক এই রবিবার। শরীর যে অসুখের আগার, এ কথার যথার্থ আর কোন দিনে বেশী করে বুঝা যায়? কর্মময়তা যে কত শান্তিদায়ক, মনের ও শরীরের কত গ্লানির অপহারক, তা কর্মহীন দিনেই ভাল করে অনুভব করা যায়। শরীরের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রোগ যে এমনভাবে আসন পেতে বসে আছে, তাদের আর্তস্বর যে এত পীড়াদায়ক, তা তো অন্যদিন বুঝতে পারি না এত ভালভাবে। অন্যদিন কর্মের কোলাহল এত তীব্র যে তারা গুঞ্জরণ ছাড়া আর কিছু করতে পারে না, কিন্তু রবিবার দেখলেই তারা তারস্বরে চীৎকার সুরু করে দেয়; তখন সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ একসঙ্গে কাকুতি-মিনতি জানাতে থাকে, রক্ষা কর, রক্ষা কর। সমস্ত শক্তির আধার যে মন, সে বিভিন্ন দিক থেকে আক্রমণ সহ্য করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে, প্রচুর অসহায় মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকায়।

মিলনের পয়োমুখ বিরহের কুম্ভ এই রবিবার। প্রিয়জনের সঙ্গে মিলিত হবে বলে যে দিনটির জন্যে প্রবাসী অস্থির হয়, সে বুঝে না, মিলনের সুধা হাতে নিয়ে নয়, বিরহের বহ্নি জ্বালিয়ে রবিবার অপেক্ষা করছে তার জন্যে। একটি চক্ষু বাইরে পাঠিয়ে অপর চক্ষুটিকে নিত্য কর্তব্যে আবদ্ধ রেখে দিন কাটল, উদ্বেগকাতর অনতিসুপ্ত রাত্রিগুলি একে একে শেষ হল। দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে আবেগকম্পিত চিত্ত নিয়ে যখন গৃহে এসে উপস্থিত হল, তখনও সব মধু, মধু। তারপর ধীরে ধীরে রবিবার এল, জানালে, এবার যেতে হবে। হাঁ, যেতে হবে, অপরাহ্নেই হোক বা রাত্রিশেষেই হোক। পিপাসিত হৃদয়ের তৃষ্ণা তখনও কিছুমাত্র মেটেনি, এই তো সবেমাত্র আসা, এখনই বিদায়! দয়িতার এত প্রতীক্ষা, এত আশা, এত অনুরাগ কি শুধু এই ভগ্নাংশ সময়ের জন্যে? এইটুকু সময় তো শুধু নয়ন মিলে দেখার,

শ্রবণ দিয়ে শোনার পক্ষেই যথেষ্ট নয়, তাতে যে হৃদয় লাখ লাখ যুগকেও পর্যাপ্ত সময় মনে করে না, তার কাছে সেটুকু তাহলে কি? দুহুঁ কোরে দুহুঁ তখন আসন্ন বিচ্ছেদ-সম্ভাবনায় অশ্রু মোচন করতে থাকে, যেতে দিতে হবে।

জীবনের সমস্ত কাজের জবাবদিহির দিন এই রবিবার। ছ'দিন ধরে যে সব কাজ আমরা করি, রবিবার তার হিসেবনিকেশ নিয়ে বড় জবাবদিহি করায়। অর্থের অঙ্ক দিয়ে একদিকের হিসেব শেষ করে মনের খাতার হিসেবটা দেখি। কি পেলুম, কি পেলুম না, কি দিলুম, কি হারালুম। কোথায় কার কাছে আশা করেছিলুম কর্তব্য, কোথায় কৃতজ্ঞতা। কোথায় আমার যা করবার ছিল, তা করিনি, যা দেবার ছিল, তা দিইনি। কতটুকু সত্য দিয়ে কতটা অসত্যকে ঢাকা দেবার চেষ্টা করলুম, কি পরিমাণে স্বার্থ দেখতে গিয়ে কত সামান্য নিঃস্বার্থও হতে পারলুম না।

ঈশ্বরের প্রতি কর্তব্যের হিসেবনিকেশও আমরা রবিবারেই করি। সপ্তাহের অন্য ছ'দিন তাঁকে দৈনন্দিন কর্মের দোহাই দিয়ে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করলেও রবিবারে আর তা সম্ভব হয় না। তাই গির্জায়, মঠে, মন্দিরে রবিবারেই এত ভিড়। সমগ্র কাল যাঁর হাতে একটা গোলকখণ্ডের মত ঘূর্ণায়মান, তিনি পৃথিবীর মানুষের এই ব্যাপার দেখে হাসেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি বলে যাঁদের তিনি ভেবেছিলেন, যাঁদের হাতে ধরণী সুন্দরতর ও পরিপূর্ণতর হবে বলে আশা করেছিলেন, তারা শুধু সময়কেই দিন, ক্ষণ, বার হিসেবে খণ্ডিত করেনি, করেছে এই পৃথিবীকে সহস্রভাবে খণ্ডিত, তাদের জীবনও সেই সঙ্গে বহুভাবে খণ্ডিত হয়েছে। সমগ্রতার রূপ তাদের কাছে আজও সার্থক হয়ে দেখা দিল না।

ভগবানের সৃষ্টি কাল, মানুষের সৃষ্টি রবিবার। তাই বুঝি রবিবার ভাল লাগে না?

কলির সন্ধ্যা

শ্রীবিষ্ণু সরস্বতী

ধরণীতে আজ এল কি নামিয়া কলির সন্ধ্যাকাল?
পাপের পাত্র পূর্ণ কি একেবারে?
বীর্যশালীরে বদ্ধ করিছে মিথ্যার মায়া জাল!
সাধুতাসূর্য অস্ত কি একেবারে?
মহা মানবেরা ধর্ম-সম্মুখে ধরিল স্বর্গছায়া,
প্রেমের পুণ্য মধুর-চিত্র-ময়,
আজি তা কোথায় সুদূরে মিলায় যেন মরীচিকা মায়া,
মানুষের আশা নিঃশেষে হয় লয়!
বাঁধিতে যাহারা চাহিল পশুরে দিয়ে স্নেহ ভালবাসা,
রুধিবারে যারা চাহিল হিংসা-ধারা,
নিভিয়া কি গেল চিরতরে আজি তাদের পুণ্য-আশা,
মানুষের হিয়া হল' কি সর্বহারা?
শাণিত করিছে দন্তনখর শ্বাপদ-মানুষ আজ,
মানব সমাজ ঘোর অরণ্য-সম!
সম্বিৎ কবে আসিবে ফিরিয়া সভ্য নরের মাঝে?
নির্মল হবে মানব অমরোপম?
সত্য যে আজ সত্তা বিহীন, বসুধা তমস্বিনী
উল্লাসে নাচে পিশাচ প্রেতের দল
হোমাগ্নি-শিখা জ্বলিত যেথায় পবিত্র তেজস্বিনী
জ্বলিছে সেথায় মলিন শ্মশানল!

পাষাণ-মাতার স্তন্যপায়ী

ক্যাপ্টেন রামেন্দু দত্ত

শাল পিয়ালের নতুন পাতার মন ভোলানো শোভা
কচি খোকার গালের মতন নরম মনোলোভা!
কিন্তু তা'রা বন পাহাড়ের কঠিন শিলার বুকে,
পাষাণী মা'র স্তন্য পিয়ে উঠছে বেড়ে সুখে।
পাথর পিতার পুত্র তা'রা, পাষাণ মায়ের ছেলে,
চিহ্ন তাহার পাইনা খুঁজে উপর পানে এলে!

সেথায় কচি কিশলয়ে, ফাগুন মাসের ফুলে—
টবের চারার মতন তা'রা উঠচে শোভায় দুলে!
রবির আলো, বৃষ্টি, শিশির, জ্যোৎস্না, দখিন হাওয়া,
তাদের মুখে, তাদের বুকেও করছে আসা-যাওয়া!
কে বলিবে ভিন্ন তারা গোত্র, জনম, কুলে?
কে বলিবে পায়নি তা'রা নরম মাটি মূলে?

ধন্য তারা বন্য শিলার স্তন্যপায়ী বীর
নিগড় বাঁধা চরণ হ'লেও মুক্ত উঁচু শির!
জীবন ভ'রে এরাই আমার শ্রেষ্ঠ আদর্শ—
শতেক দুঃখ দুর্দশাতেও হয়নি বিমর্ষ—
পাহাড়তলীর পুত্র মোরা শাল পিয়ালের জাতি
কবি হলেও মিলিটারীর উপযুক্ত ছাতি!

যে ফুল না ফুটিতে—

শ্রীনীহাররঞ্জন চক্রবর্ত্তী

সেণ্ট পল্‌স্ কলেজের ছাত্র বলে সাহেবিয়ানার মোহ পেয়ে বসেছে প্রভাতকে। দু' তিনটে স্যুট্ তৈরী হয়ে গেছে, আর সিগারেটের বদলে চলেছে হাল-ফ্যাসানের পাইপ্। সাহেব প্রফেসারদের অনুকরণে ইংরেজী উচ্চারণ যথেষ্ট মার্জ্জিত। মোট কথা, স্যুট-পরিহিত, পাইপ্-মুখে প্রভাতকুমার যখন ট্রাউজারের পকেটে হাত রেখে ধর্ম্মতলার ফুট্‌পাথ্ দিয়ে গট্ গট্ করে চলে, তখন কার সাধ্য তাকে বাঙালী বলে ভুল করে? অন্ততঃ এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান্ বলে তাকে অনেকেই ভুল করেছেন। স্বাস্থ্য তার ভালই। কলেজ ছোট হোক্ আর যাই হোক্, ফুটবল টীমে মাঝে মাঝে স্থান পাওয়া নেহাৎ সোজা নয়। এ ধারণা শুধু প্রভাতের নয়, কলেজ-জীবনে অনেক ছেলেরই থাকে। তারপর, কলেজে থিয়েটারহলে প্রভাতের জন্য একটা পার্ট নির্দ্দিষ্ট থাক্‌বেই। এক কথায়, প্রভাত চৌকোস্ ছেলে।

সেবার পূজোর ছুটিতে মধুপুর যাওয়া ঠিক হলো। প্রভাতের বাবা মধুপুরে একটা প্রকাণ্ড বাড়ি কিনেছেন—সহরের এক প্রান্তে, বেশ ফাঁকা জায়গায়। বাড়ির সবাই আগে চলে গেছে, কলেজ বন্ধ হলে প্রভাত যাবে সবার শেষে।

পূজোর আগে থিয়েটার, প্রীতি-ভোজ ইত্যাদি শেষ করে প্রভাত মোগলসরাই প্যাসেঞ্জার ধরে মধুপুর রওয়ানা হলো। মধুপুর যাবার পক্ষে এই গাড়িটাই তার পছন্দ হলো বেশী। রাতের বেলা খাওয়া-দাওয়া সেরে গাড়িতে চাপতে পারলেই ব্যস্! সকাল বেলা পৌছে যাবে মধুপুর। সাঁওতাল পরগণায় ঢুকতেই ভোর হয়ে যায়। গাড়িটার তাড়াহুড়ো নেই, কাজেই দু'ধারে সুন্দর দৃশ্য দেখতে ভালই লাগে।

মধুপুর ষ্টেশনে তাকে নিতে এসেছিল ছোট বোন্ বুলা, তার এক নতুন বান্ধবী, আর বাড়ির চাকর। ষ্টেশনের গেট পার হতে প্রভাতের সঙ্গে তাদের দেখা হলো। বুলা বল্লে, 'এই যে ছোড়্‌দা! দেখ, সেই ভোর থেকে তোমার জন্য এসে আমরা বসে আছি। তোমার গাড়ি কিন্তু আজ লেট্।'

প্রতিবাদ করলে প্রভাত—'কক্ষণো নয়। গাড়ি ঠিক সময়ে এসে পৌচেছে। তোর ঐ ক্ষুদে ঘড়িটা যা টাইম্ দেয়—'

'ইস্, আমার ঘড়ি খারাপ। তা একটা ভাল ঘড়ি কিনে দাও না?'

'ঘড়ির তোর দরকার কি?'

'নাঃ, আমার দরকার কি? যত দরকার তোমার।'

এইবার বাধা দিলে বুলার বান্ধবী। 'বেশ তো বুলা, ভাই বোনে ষ্টেশনেই ঝগড়া সুরু করলে? পরে তো সময় পাবে। এবারে বাড়ি চল।'

চাকর ততক্ষণে মালপত্র গুছিয়ে দুটো টাঙ্গা ভাড়া করেছে। একটাতে মালপত্র নিয়ে সে উঠলো। অপর টাঙ্গাতে উঠলো বুলা, তার বান্ধবী, আর প্রভাত। মেয়েরা বস্‌লো পিছনদিকে, আর প্রভাতকে বসতে হলো সাম্‌নে গাড়োয়ানের গা ঘেঁষে। টাঙ্গা চলতে আরম্ভ করলে বুলা তার ছোড়দার বান্ধবীর পরিচয় করিয়ে দিলে। আধুনিক রীতি অনুযায়ী দু'জনকেই পিছন ফিরে নমস্কার করতে হলো। মেয়েটির নাম সুলেখা সান্যাল। আশুতোষ কলেজে আই-এ পড়ে। ভাল নাচিয়ে বলে তার নাম আছে কলিকাতার বন্ধু-মহলে। সুতরাং তার নাচ যে ভাল হবেই তাতে আশ্চর্য্যের কিছু নেই। এর আগে প্রভাত কখনো সুলেখার নাম শোনে নি। তবু ভদ্রতা করে বল্লে, 'আপনার নাম শুনেছি অনেকের মুখে। তবে নাচ দেখার সৌভাগ্য হয় নি আমার।'

স্তুতিবাদের উত্তরে সুলেখা বল্লে, 'আপনার নাম অবশ্য আগে শুনি নি। তবে আপনার আগমনের সঙ্গে নামের মিল কিন্তু চমৎকার।'

বুলা জিজ্ঞেস্ করলে, 'তার মানে?'

'তার মানে, প্রভাতকুমার প্রভাতেই মধুপুরে উদয় হলেন।' তারা তিনজনেই হেসে উঠলো। শাদা কাঁকর-বিছানো উঁচু নীচু পথের উপর দিয়ে টাঙ্গা চলতে লাগলো। আর ঘোড়ার গলায় বাঁধা ঘণ্টা তালে তালে বাজতে লাগলো, ঠুন্, ঠুন্, ঠুন্। প্রভাতের মনে হলো, জীবনে তারুণ্যের ছন্দ বুঝি এই।—

সুলেখারা পাশেই একটা বাড়িতে উঠেছে। সুতরাং টাঙ্গা ছুটো বুলাদের বাড়ির সাম্‌নেই থামলো। গেট পার হতে দেখা গেল, প্রভাতের ভগ্নীপতি শিশিরবাবু বাইরে রোয়াকের উপর বসে আছেন। ভদ্রলোক তাদের ঢুকতে দেখে সাদর-অভ্যর্থনা করলেন, 'আরে বানরজী, এসো, এসো।' ব্যানার্জ্জি উচ্চারণটা শিশিরবাবু ঐ রকমই করেন। প্রভাত কিছু 'মাইণ্ড্' করে না। কিন্তু তাই বলে একজন সদ্য-পরিচিতা তরুণীর সাম্‌নে এরকম পাড়া-গেঁয়ে ঠাট্টা সে কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারে না। প্রভাত পাশ কাটিয়ে ভিতরে চলে গেল। যেতে যেতে শুনলো, শিশিরবাবু বলছেন, 'আহা, বেচারী ভিড়ে কি কষ্টটাই না পেয়েছে। রাতে বোধ হয় ঘুমই হয় নি।'

বুলা বল্লে, 'কষ্ট না ছাই। বানরজী বলাতে আপনার উপর চটেছে।'

কৃত্রিম চাঞ্চল্যের ভাব দেখিয়ে শিশিরবাবু বল্লেন, 'তাই না কি? কি মুস্কিল, দেখ তো! তোমার দিদি যদি আবার ভায়ের পক্ষ নিয়ে কোমর বাঁধেন—'

তাঁর রকম-সকম দেখে বুলা ও সুলেখা দু'জনেই হেসে উঠলো। 'ভয় নেই দাদা, আমরা আপনার পক্ষে আছি।'

'তা তো ঠিকই, তুমি আমার দ্বিতীয় পক্ষ। আর সেই তো আমার একমাত্র ভরসা।'

'ইস্' বলে বুলা কোমরে হাত দিয়ে ছত্রিশ রাগের ভঙ্গীতে দাঁড়াল।

'ওরে বাবা, তুমিও চট্‌লে না কি? কি মুস্কিল—'

বুলা হেসে ফেল্লে। 'মুস্কিল কিছু নয়। জানেন না, দ্বিতীয় পক্ষ এম্‌নি হয়? তা ভাই সুলেখা, বিকেলে এসো কিন্তু। আমরা এক সঙ্গে বেরুবো, কেমন?'

'আচ্ছা' বলে সুলেখা চলে গেল।

বিকেল বেলা। প্রভাত, বুলা ও সুলেখা বেড়াতে বেরিয়েছে। পশ্চিম দিকে সূর্য্য তখন লাল হয়ে ডুবে যাচ্ছে। সেই দিকে তাকিয়ে সুলেখা বল্লে, 'মিঃ ব্যানার্জ্জি, এখন কিন্তু আর আপনার নামের তেমন সার্থকতা নেই।'

হাতজোড় করে প্রভাত উত্তর দিলে, 'মিস্ সান্ন্যাল, সত্যি বিশ্বেস করুন, ঐ নামকরণ ব্যাপারে আমার কোনই হাত ছিল না। আমার মত না নিয়েই ঐ নামের বোঝা আমার কাঁধের উপর চাপান হয়েছে। নামটা বদলে ফেলে প্রভাত-প্রদোষ বন্দ্যোপাধ্যায় রাখতে ইচ্ছে হয়।'

সুলেখা ও বুলা দু'জনেই হেসে উঠলো। প্রভাত বল্লে, 'না, না, হাসবেন না। আজকাল ওরকম নাম রাখা হচ্ছে। উদিত ভানু, অরুণোদয়, আরও কত কি! দেখবেন, আস্তে আস্তে এসব নাম গা-সওয়া হয়ে যাবে।'

আবার এক ঝলক হাসি। নাঃ, প্রভাত একজন সত্যিকারের অভিনেতা নিশ্চয়ই। লোক হাসাবার ক্ষমতা তার অসীম।

বুলা তার বান্ধবীকে জিজ্ঞেস্ করলে, 'আজ কোন্ দিকে যাবে?'

সুলেখা দিক্ নির্দ্দেশ করে উত্তর দেয়, 'বরাবাদ।'

এম্‌নি করে কাটে প্রবাসের দিনগুলি। সুলেখা প্রভাতদের বাড়ি আসে দিনে তিন চার বার। বুলা তার সমবয়সী। তা ছাড়া সেও আই-এ ক্লাশের ছাত্রী। দু'জনের বন্ধুত্ব দু'দিনেই অন্তরঙ্গ হয়ে উঠলো। প্রভাত প্রায়ই তাদের কথাবার্ত্তায় যোগ দেয়। পড়াশোনার কথা উঠলে সে তার বি-এ ক্লাশের বিদ্যে জাহির করে। সুলেখার চোখে ফুটে ওঠে প্রশংসা—যে প্রশংসা প্রভাতের কাম্য।

একটানা ছন্দ জীবনে কোথাও মেলে না, প্রভাতের বেলায়ও ব্যতিক্রম নেই। ছন্দ-পতন ঘটে শুধু ওই শিশির-বাবুর জন্য। একদিন দুপুরে তাস নিয়ে ব্রে খেলা হচ্ছে। বুলা, সুলেখা ও প্রভাতের অনুরোধে শিশিরবাবুকেও বস্‌তে হয়েছে। গোড়া থেকেই প্রভাত সুলেখাকে বাঁচিয়ে খেল্‌ছে। সুলেখাকে যাতে ইস্কাবনের বিবি পেতে না হয়, শুধু সে চেষ্টা। শিশিরবাবু সেটা বুঝ্‌তে পেরে হাস্‌ছেন। বুলা প্রণয়টা বুঝতে পারে নি। কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো বুলা, ছোড়দা, তুমি এবার বিবি নিলে যে? ইস্কাবনের ছোট তাস তো তোমার হাতে ছিল।'

মুখ ভেংচে প্রভাত বলে, 'যাঃ তোকে আর বাহাদুরী দেখাতে হবে না। তোর খেলা তুই খেল্। ছোট তাস হাতে থাক্‌লে ইচ্ছে করে যেন কেউ বিবি নেয়।'

বুলা ছাড়বার পাত্রী নয়। তাসের পিটগুলো উল্টে হাতে নাতে ধরিয়ে দিলে, প্রভাত শুধু সুলেখাকে বাঁচাবার জন্যই সেবারে বিবি নিয়েছে। এর পর শিশিরবাবুর খেলার ধরণই বদ্‌লে গেল। যত হরতনের ফোঁটা পড়তে লাগলো প্রভাতের পিটগুলোতে, আর কি বারেই ইস্কাবনের বিবিটি। প্রভাত রাগে গজ্ গজ্ করে বল্লে, 'এক-চোখো কোথাকার! কেন, ওদের দেখতে পান না?'

'আহা, চট কেন বানরজী? ওরা হচ্ছে অবলা, ওদের উপর কি অস্ত্র প্রয়োগ করা চলে? এই তো বেশ সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি। তা ছাড়া, এ তো তুমি শিভ্যাল্‌রির মূল্য দিচ্ছ।'

'যা তা বল্‌বেন না। শিভ্যাল্‌রির মানে কি? খেল্‌বো না আমি আপনার সঙ্গে।' রাগে দুঃখে প্রভাত উঠে যেতেই যেন একটা হাসির হল্লা উঠ্‌লো। হাসি থামলে পাশের কোঠা থেকে প্রভাত শুনতে পেলে সুলেখার কথা—'কেন আপনি ওকে ক্ষ্যাপান্, জামাইবাবু?'

অত দুঃখেও তাহলে প্রভাতের সান্ত্বনা আছে!

সেদিন বেড়াতে বেড়াতে প্রভাত বল্লে, 'সুলেখা দেবীর অত নাম, কিন্তু আমি একদিনও ওঁর নাচ দেখতে পেলুম না।'

বুলা উত্তর দিলে, 'কি করে দেখবে বল? খালি মাঠে তো আর সুলেখা নাচবে না। একটা আসর চাই।'

খানিকক্ষণ ভেবে প্রভাত বলে উঠলে, 'দি আইডিয়া! আচ্ছা, মিস্ সান্ন্যাল, এই কালী পুজোর সময় একটা নাচ-গানের ব্যবস্থা করলে হয় না? এই সব দেশে দেয়ালিই তো বড় উৎসব।'

সায় দিয়ে সুলেখা বলে, 'ভালই তো।'

তক্ষুণি ঠিক হয়ে গেল, দেয়ালি উপলক্ষে পাড়ার ছেলে-মেয়েদের নিয়ে নাচ, গান ও আবৃত্তি করা হবে। মেয়েদের নাচ শেখাবার ভার পড়লো সুলেখার উপর। প্রভাত নিজেই আবৃত্তির ভার নিলে। এখন সমস্যা হলো গান নিয়ে। সুলেখা অনুরোধ করলে বুলাকে। বুলা রাজী হয় না। বলে, 'না ভাই, গান ভালো জানি নে। তা ছাড়া, অসুখের জন্য ইদানীং একেবারেই ছেড়ে দিয়েছি।'

অধীর হয়ে প্রভাত বাধা দেয়, বেশ তো তুই না পারিস্, দিদিকে দলে নিলেই হবে।'

'দিদি ছেলে মেয়ে নিয়েই সময় পায় না, তার আবার গান।'

জোর গলায় প্রভাত বলে, 'আচ্ছা, দেখে নিস্।'

প্রভাতের দিদিকে অনেক কষ্টে রাজী করানো গেল। পাড়ার ছেলে মেয়েদের আর উৎসাহের অন্ত নেই। বুলাদের বাড়ি আর সুলেখাদের বাড়ি বৈঠক বসছে রোজই। একদিকে চলছে রিহার্স্যাল, আর অন্যদিকে এগুচ্ছে ষ্টেজ্ বাঁধার কাজ।

কালীপুজোর আর দু'দিন বাকী। প্রভাত আর রিহার্স্যালে যোগ দিতে পারে না—পাড়ার ছেলেরা টেনে নিয়ে যায় ষ্টেজ্ বাঁধার কাজে। কালী মন্দিরের সামনে মাঠটায় ষ্টেজ্ বাঁধা হচ্ছে। কাজও এগিয়েছে অনেক দূর। খেটে খেটে ক্লান্তি বোধ হচ্ছিল প্রভাতের। তাই দম নেবার জন্য একটু দূরে কৃষ্ণচূড়া গাছটার ছায়ায় গিয়ে সে বস্‌লো।

সকাল বেলাকার মত রিহার্স্যাল সেরে সুলেখা সেই পথ দিয়ে ফিরছিলো। প্রভাতকে দেখে সে বল্লে, 'কাজে ফাঁকি দিচ্ছেন নিশ্চয়ই।'

'ফাঁকি মোটেই দিই নি, মিস্ সান্ন্যাল। এই দেখুন না, খেটে খেটে এই কার্ত্তিক মাসের সকালেও ঘেমে উঠেছি।'

সুলেখা এসে ঘাসের উপর বস্‌লো।

'রিহার্স্যালের কাজ কেমন চল্‌ছে?'

'ভালই তো মনে হচ্ছে।'

'আমার কিন্তু একটা আফ্‌শোষ রয়ে গেল।'

'বলুন না।'

'রিহার্স্যালে আপনার নাচ একদিনও দেখতে পেলুম না। আর দশজনের মত আমাকেও ভিড়ের ভেতর থেকে দেখতে হবে।'

'দশজনের একজন হওয়াই তো ভাল।' প্রভাত চুপ করে রইলো। 'আচ্ছা, আপনি তো একজন নাম-করা স্পোর্টস্‌ম্যান্। আমি আপনার কি দেখতে পেলুম, বলুন? একটা লং-জাম্পও নয়।'

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে প্রভাত বল্লে, 'ঠাট্টা করুন আর যাই করুন, আপনার নাচ দেখবার জন্য লোকে পাগল না হয়ে পারে না। আপনার নামেই রয়েছে ছন্দের তরঙ্গ। সুলেখা সান্যাল—কী সুন্দর অনুপ্রাস!'

হেসে উঠে সুলেখা বলে, 'বাঃ, আপনি যে একজন কবি।'

'ঠাট্টা করছেন? করুন।'

হাস্‌তে হাস্‌তে সুলেখা বলে, 'চট্‌ছেন কেন! ঐ তো আপনার দোষ। দেখছি, আপনাকে ঘুষ দিতে হবে। আচ্ছা, আমার হাতে যে রুমালটা আছে, তার রং বলতে পারলে, রুমালটা আপনার হবে।'

আঙুলের ফাঁক দিয়ে সবুজ মত কি যেন দেখা যাচ্ছিল। খানিকটা সময় নিয়ে প্রভাত যেন কত কি ভাবলে। পরে উত্তর দিল, 'সবুজ।'

'আশ্চর্য্য! কি করে বল্লেন বলুন তো?'

খুশী হয়ে প্রভাত উত্তর দিলে, 'আপনি পরেছেন সবুজ শাড়ী আর সবুজ ব্লাউজ, বসে আছেন সবুজ ঘাসের উপর। অতএব—সবার রংয়ে রং মেশাতে হবে—'

হাতের মুঠো মেলে ধরে সুলেখা দেখালে, সবুজ রংয়ের জিনিষটা রুমাল নয়, একটা নগণ্য হ্যাণ্ডবিল মাত্র। হাস্‌তে হাস্‌তে সুলেখা বলে, 'কবি, আপনার হার হয়েছে।'

জোড়হাত করে প্রভাত জবাব দেয়, 'দেবি! আপনার কাছে হেরেই আমি সুখী!'

সুলেখা হেসে উঠতে প্রভাত সেই হাসিতে যোগ দিলে।

দেয়ালির রাতে ধুমধামের সঙ্গেই নাচ গানের জল্‌সা শেষ হলো। কার গান বা নাচ সবচেয়ে ভাল হয়েছে, তাই নিয়ে কিছুদিন চললো আলোচনা। প্রভাত বলে বেড়াতে লাগলো, 'সুলেখার নাচ যে শুধু ভাল হয়েছে, তা নয়, বাই ফার দি বেষ্ট্।' পাড়ার অন্য ছেলেরা সেটা মেনে নিতে রাজী নয়। মেয়েরা মুখ টিপে হাসে। প্রভাত এ সবে কাণ দেয় না।

ছুটি শেষ হতে শিশিরবাবু চলে গেছেন। বুলা সকাল-বেলাই বেরিয়েছে লালগড়ে এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে। প্রভাত বৈঠকখানায় বসে খবরের কাগজ পড়বার চেষ্টা করছে, আর ঘন ঘন সামনের দোর দিয়ে বাইরের দিকে তাকাচ্ছে। হঠাৎ পায়ের শব্দ শুনে মুখ তুলতেই সে দেখতে পেল, সুলেখা দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে।

'বুলা কোথায়?'

'লালগড়ে বেড়াতে গেছে।'

'শিশিরবাবু?

'তিনিও চলে গেছেন পিরোজপুরে।' তারপর একটু থেমে বল্লে, 'বাড়িতে আর যখন কেউ নেই, রমুকে ডেকে দেব?' রমু প্রভাতের ছোট ভাই, বছর দশেক বয়স।

'নাঃ, আপনিই তো রয়েছেন।'

'আপনার রকম সকম দেখে মনে হয়, আমি একটা অবান্তর লোক।'

একটা চেয়ার টেনে বস্‌লে সুলেখা। হাস্‌তে হাস্‌তে জিজ্ঞেস্ করলে—'অভিমান হলো বুঝি?' প্রভাত চুপ করে রইলো। সুর বদ্‌লে সুলেখা বল্লে, 'আপনার জন্য কিন্তু আমি বড্ড ছোট হয়ে যাচ্ছি। আমার নাচের প্রশংসা কেউ করে না এক আপনি ছাড়া। আমাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যই যেন আপনি ওসব বলে বেড়ান।'

'সত্যিকারের শিল্পী হিসেবেই আমি আপনার নাচের প্রশংসা করি। এতে লুকোচুরি কিছু নেই।' তারপর একটু ইতস্ততঃ করে প্রভাত জিজ্ঞেস্ করে, 'আচ্ছা, রাঢ়ী আর বারেন্দ্রে বিয়ে হয় না কেন?'

উদাস ভাবে সুলেখা উত্তর দেয়, 'কি জানি! বারেন্দ্র সমাজ মনে করে তারা বড়, রাঢ়ী ছোট। আর সেই কারণেই বোধ হয় দুই সমাজে বিয়ের প্রচলন হয়নি। আমার কিন্তু মনে হয়, রাঢ়ী ছোট হোক্ আর যাই হোক্, বামুন তো!'

'তার মানে আপনি বল্‌তে চান, বামুন হিসেবে রাঢ়ী বারেন্দ্রের চেয়ে ছোট?'

'তাই তো শুনে আস্‌ছি।'

'আমিও তো ছেলেবেলা থেকে শুনে আস্‌ছি, বারেন্দ্রের চেয়ে রাঢ়ী ঢের বড়।'

'বেশ তো, তবে আর তর্ক কিসের? যে যার সমাজে বড়ই থাক্ না।'

প্রভাতের মনে হলো, হঠাৎ যেন তাল কেটে গেল। সুলেখা গম্ভীর হয়ে বসে রইলো। প্রভাত ভাবছে কি করে আবার আলাপ সুরু করা যায়। এমন সময় বুলা এসে

ঘুরে ঢুকলো। 'আচ্ছা লোক যা হোক্। কাল্‌কে না তোমাকে বল্লুম, আজ সকালে লালগড়ে মাধবীদের বাড়ি বেড়াতে যাবো। তা অত সকালে তোমার ঘুমই ভাঙ্গে না।'

'সত্যি ভাই, আজ বড্ড দেরী হয়ে গেল উঠতে।'

'তা চল আমার ঘরে, তোমার সঙ্গে কথা আছে।' দুই বন্ধু সরে যেতে প্রভাত যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো।

নিয়ম মত তারা তিনজনে আজও বেড়াতে বেরিয়েছে। বুলা ও সুলেখার কথার বিরাম নেই। কিন্তু প্রভাত যেন কিছুতেই তাদের কথায় যোগ দিতে পারছে না। কেমন যেন বেসুরো ঠেক্‌ছে। কুস্‌মা ছাড়িয়ে তারা চলেছে ছোট নদীটার দিকে। পথে ছোট একটা খাল পার হতে হয়। খুব ছোট খাল। তার উপর কাদা-মাটি দিয়ে সরু একটা বাঁধ তৈরী করা হয়েছে। বুলা আর সুলেখা অতি সন্তর্পণে সেই বাঁধের উপর দিয়ে খাল পার হয়ে গেল। প্রভাত দিলে এক লাফ। কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারলে না, খানিকটা জল কাদা ছিটিয়ে এসে পড়লো সুলেখার সাম্‌নে। সুলেখার গায়ে ও শাড়ীতে কাদা লেগেছিল। বাহাদুরী দেখাতে গিয়ে উল্টে অপ্রস্তত হয়ে পড়লো প্রভাত। রেগে সুলেখা লাল হয়ে গেল। 'এ কি রকম পাড়াগাঁয়ে রসিকতা!'

হাস্‌বার চেষ্টা করে প্রভাত বলে—'আপনিই তো আমার লং-জাম্প দেখতে চেয়েছিলেন।'

'ওঃ, লং জাম্প দেখতে চেয়েছিলুম! সাধে কি আর শিশিরবাবু আপনাকে বানরজা বলেন?'

তরুণ হলেও এ অপমান প্রভাতের পক্ষে অসহ্য। 'মাপ করবেন, আর কখনো রসিকতা করবো না। আমি ফিরে চল্লুম বুলা।'

সুলেখার পক্ষ নিয়ে বুলা তিরস্কার করে, 'ছেলেমানুষী কোরো না, ছোড়্‌দা। ওর অমন সুন্দর জর্জ্জেটখানা কাদা ছিটিয়ে নষ্ট করেছো, আবার উল্টে তুমিই রাগ করছো?'

প্রভাত সে কথার উত্তর না দিয়ে ফিরে গেল।

তারপর দিন সুলেখারা কলিকাতায় চলে গেল। বুলা ষ্টেশনে গেল দেখা করতে, প্রভাত গেল না।

পুজোর ছুটি শেষ করে বুলাদের বাড়ির সবাই ফিরে এল কলিকাতায়। জীবন আগেকার মতই এক ঘেয়ে লাগছে। মাঝে মাঝে মধুপুরের স্মৃতি চঞ্চল করে দেয় প্রভাতের মনকে। সুলেখার সঙ্গে সে দুর্ব্ব্যবহারই করেছে। অতটা বাড়াবাড়ি না করলেই হতো।

বড়দিনের ছুটিতে কলেজে আবার থিয়েটার হচ্ছে। প্রভাতের ভাগ্যে একটা ভাল পার্ট জুটেছে। অনেক কষ্টে সে বুলার কাছ থেকে সুলেখাদের ফোন নম্বরটা যোগাড় করলে। তারপর একদিন সুযোগ বুঝে ফোনে সুলেখাকে ডাকলে। কোন রকম ভূমিকা না করেই প্রভাত বল্লে, 'আমাদের কলেজে চিরকুমার সভা প্লে হচ্ছে। আপনি দেখ্‌তে আস্‌বেন কি?'

'মাপ করবেন। একটা এন্‌গেজমেণ্ট্‌-এর জন্য যেতে পারবো না। ভুল বুঝবেন না যেন।'

ঠিক, প্রভাত আর ভুল করবে না।

প্রায় মাসখানেক পরে প্রভাতকে ফোনে ডাকলে সুলেখা। ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউট হলে একটা চ্যারিটি পারফরমেন্স্‌-এ সুলেখাকে নাচতে হবে। প্রভাত ইচ্ছে করলে একটা কম্‌প্লিমেণ্টারী কার্ড নিতে পারে।

'কিন্তু যাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব।' কথা ক'টা মুখ থেকে বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে সুলেখা ফোন দিয়েছে ছেড়ে। কৈফিয়ৎ দেবার সুযোগও পেলে না প্রভাত। সব কিছু আলো যেন নিভে গেল চোখের সামনে। সুলেখা নিশ্চয়ই অনুতপ্ত হয়ে আবার আলাপের সূত্র খুঁজছিলো, কিন্তু কি যে দুর্জ্জয় তার অভিমান!—অনেকক্ষণ অভিভূতের মত ফোনের কাছে বসে রইলো প্রভাত।

মাস দুই পরে শিশিরবাবুর একখানা চিঠি পেল বুলা। শিশিরবাবু লিখেছেন—

'স্নেহের বুলবুল,

তোমার ছোড়্‌দার প্রেম যে ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়েছে, তার জন্য দুঃখিত হলেও আশ্চর্য্য হই নি। আই-এ ক্লাশের ছাত্রী, আর বি-এ ক্লাশের ছাত্রের প্রেম নিয়ে নাটক, উপন্যাস তৈরী হয়, কিন্তু বাস্তবে এ প্রেম calf-love ছাড়া আর কিছু নয়। তোমার ছোড়্‌দাকে বিশ্বকবির ভাষায় সান্ত্বনা দিয়ো—

যে ফুল না ফুটিতে
ঝরেছে ধরণীতে,
যে নদী মরুপথে
হারালো ধারা।
জানি হে জানি, তাও
হয় নি হারা।

অর্থাৎ ভবিষ্যৎ প্রেমে এই অভিজ্ঞতা কাজে লাগবে। বিশেষ আর কি লিখবো? আশা করি তোমরা সকলে ভালই আছ। আশীর্ব্বাদ জান্‌বে। ইতি—'

প্রভাতকে সে চিঠি দেখাতে সাহস পেল না বুলা। শিশিরবাবুর সঙ্গে সে একমত নয়। সে নিজে তরুণী—প্রেম তার কাছে তুচ্ছ নয়।

বস্ত্রশিল্প ও ভারতবর্ষ

শ্রীসন্তোষকুমার রায় চৌধুরী

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতবর্ষের বস্ত্রশিল্প এখনো কত পশ্চাতে পড়িয়া আছে তাহার প্রমাণ অন্যান্য দেশের মাথা পিছু গড় বস্ত্র ব্যবহারের পরিমাণের সহিত এ দেশের মাথা পিছু গড় বস্ত্র পরিমাণের তুলনাতেই— অনেকখানি পাওয়া যায়। আমেরিকা যুক্তরাজ্যে যেখানে মাথা পিছু ৬৪ গজ, জার্মানীতে ৩৪ গজ ও সমগ্র পৃথিবীতে গড়ে ৪২ গজ বস্ত্র ব্যবহার করে, সেখানে ভারতবাসীদের মাথা পিছু গড় বস্ত্র ব্যবহারের পরিমাণ হইতেছে মাত্র ১৪ গজ। গত কয়েক বৎসরে এই হিসাব ১০ হইতে ১৫ গজের মধ্যে উঠা নামা করিয়াছে। প্রশ্ন উঠিতে পারে—যে, এদেশ গ্রীষ্ম প্রধান দেশ, কাজেই অন্যান্য দেশের তুলনায় এ দেশের গড় বস্ত্র ব্যবহারের পরিমাণ কম হওয়াই স্বাভাবিক। তাহার উত্তর দিয়াছেন ১৯৩৯ সালে ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিটি। তাঁহারা বলিয়াছেন— ভারতবাসীদের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বস্ত্রের গড় পরিমাণ হওয়া উচিৎ কমপক্ষে মাথা পিছু ৩০ গজ। কিন্তু এই অবস্থায় পৌঁছাইতে হইলে আমাদের প্রায় দ্বিগুণ পরিমাণ বস্ত্র উৎপাদনের প্রয়োজন। তাহা আজিও সম্ভব হয় নাই। উপরন্তু মুষ্টিমেয় শিল্পপতি আর ব্যবসায়ীদের অতিলাভ মুনাফাবাজীর ছলনায় ভারতের বস্ত্রশিল্প আজ যে অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে তাহা অত্যন্ত দুঃখজনক।

প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে ১৮৫১ সালে ভারতে প্রথম কাপড়ের কল স্থাপিত হয়, কিন্তু তাহার ও বহু পূর্ব্ব হইতে এই ভারতবর্ষের সূক্ষ্ম তাঁত বস্ত্র ও রেশমী বস্ত্রের খ্যাতি ছিল জগদ্বিখ্যাত। যাহা হউক, প্রথম কল স্থাপিত হওয়ার পর মাত্র ৫০ বৎসরের মধ্যে স্বদেশী আন্দোলনের ফলে কাপড়ের কলের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৯৩। তখন তাহাদের তাঁত ছিল ৪০ হাজার, আর মাকুর সংখ্যা ছিল প্রায় ৫০ লক্ষ। ১৯৪২ সালে কলের সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৯৬। নিম্নে ১৯৪২ সাল হইতে ১৯৪৬ সালের মধ্যে সমগ্র ভারতে বর্দ্ধিত কাপড়ের কলের সংখ্যা, মাকুর সংখ্যা ও তাঁতের সংখ্যা দেওয়া হইল। নিম্নোক্ত কলগুলির মধ্যে ভারতীয় ইউনিয়নে বর্ত্তমান [illegible]

কাপড়ের কলের হিসাব। (১)

বৎসর	কলের সংখ্যা	মাকুর সংখ্যা	তাঁতের সংখ্যা
		(হাজারের হিসাবে)	
১৯৪২	৩৯৬	১০০২৬	২০০
১৯৪৩	৪০১	১০১৩০	২০১
১৯৪৪	৪০৫	১০১৯৭	২০২
১৯৪৫	৪১৭	১০২৩৮	২০২
১৯৪৬	৪২১	১০৩০৫	২০৩

উপরোক্ত কলগুলি হইতে প্রতি বৎসর অর্থাৎ এপ্রিল হইতে মার্চ্চ মাসের মধ্যে কি পরিমাণ সূতা ও বস্ত্রাদি উৎপন্ন হইয়াছিল পরবর্ত্তী ছকে তাহারই বিগত দশ বৎসরের হিসাব দেওয়া হইল।

ভারতীয় কলগুলি হইতে উৎপন্ন সূতা ও বস্ত্রের পরিমাণ। (২)

বৎসর	সূতা	বস্ত্র
	হাজার পাউণ্ড	লক্ষ গজ
১৯৩৬ ৩৭	১০৫০	৩৫৭২০
১৯৩৭-৩৮	১১৬০	৪০৮৪৩
১৯৩৮-৩৯	১৩০৩	৪২৬৯৩
১৯৩৯-৪০	১২৩৫	৪০১২৩
১৯৪০-৪১	১৩৪৯	৪২৬৯৫
১৯৪১ ৪২	১৫৭৭	৪৪৯৩৬
১৯৪২-৪৩	১৫৬৪	৪১০৯৩
১৯৪৩-৪৪	১৬৮০	৪৮৭০৭
১৯৪৪ ৪৫	১৬৫০	৪৭২৬৫
১৯৪৫ ৪৬	১৬১৫	৪৬৭৫৬

ঐ উৎপন্ন বস্ত্র ছাড়া কিছু পরিমাণ তুলাজাত দ্রব্য বিদেশ হইতে আমদানী করা হয়। কিন্তু যাহা রপ্তানী করা হয় তাহা আমদানীর তুলনায় অনেক বেশী। পর পর দুইটা ছকে বিগত দশ বৎসরের সূতা ও বস্ত্রের আমদানী ও রপ্তানীর হিসাবই তাহার প্রমাণ দিবে। অবশ্য পূর্ব্বের তুলনায় আমদানীকৃত সূতা ও বস্ত্রের পরিমাণ ক্রমশঃই কমিয়েছে। বিশেষ করিয়া দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেই ঐ পরিমাণ অনেক কমাইয়া দিয়াছে।

তুলাজাত দ্রব্য আমদানীর হিসাব। (৩)

বৎসর	সূতা	বস্ত্র
	(হাজার পাউণ্ড)	(হাজার পাউণ্ড)
১৯৩৬-৩৭	২৮৫২০	৭৬৩৯৮৫
১৯৩৭-৩৮	২১৯৯৮	৫৯০৯৫০
১৯৩৮-৩৯	৩৬৪৫৯	৬৪৭২৬৪
১৯৩৯-৪০	৪১১৩২	৫৭৯০০২
১৯৪০-৪১	১৯৩৩৪	৪৪৬৯৭৬
১৯৪১-৪২	৮১৭৩	১৮১৫৩৯
১৯৪২-৪৩	৯৪৫	১৫৭৫৯
১৯৪৩ ৪৪	৬৩০	৩৭৩০
১৯৪৪-৪৫	১৯২	৪২০৫
১৯৪৫-৪৬	১২৩	৩১৮৪

তুলাজাত দ্রব্য রপ্তানীর হিসাব। (৪)

বৎসর	সূতা	বস্ত্র
		(হাজার গজের হিসাবে)
১৯৩৬-৩৭	১২১৩৭	১০১৬৩৬
১৯৩৭ ৩৮	৪০১২৪	২৪১২৫৫
১৯৩৮-৩৯	৩৭৯৬০	১৭৬৯৯২
১৯৩৯-৪০	৩৬৯৪৩	২২১৪০৪
১৯৪০ ৪১	৭৭৭২৩	৩৯০১৪৪
১৯৪১-৪২	৯০৫২৯	৭৭২৩৫৫
১৯৪২ ৪৩	৩৪২১০	৮১৭৯৯১
১৯৪৩-৪৪	১৮৯৩৭ পাউণ্ড	৪৬১৩৩৭
১৯৪৪-৪৫	১৬৯১৮ „	৪২৩০২১
১৯৪৫-৪৬	১৪৪৯৭ „	৪৪০৫১০

উপরোক্ত উৎপন্ন বস্ত্র ও আমদানী এবং রপ্তানী কৃত বস্ত্রের হিসাব, হস্ত চালিত তাঁতে কলের সূতায় উৎপন্ন বস্ত্রের আনুমানিক পরিমাণ ও খদ্দর জাতীয় বস্ত্রের তিন বৎসরের আনুমানিক পরিমাণ লইয়া দেখা যায় যে—গত ১৯৪৩-৪৪, ১৯৪৪-৪৫ ও ১৯৪৫-৪৬ সালে ভারতীয় কলগুলি হইতে উৎপন্ন বস্ত্রের পরিমাণ (রপ্তানী বাদে) ছিল যথাক্রমে ৪৪১, ৪৩০ ও ৪২৪ কোটী গজ; তাঁতে উৎপন্ন বস্ত্রের পরিমাণ ছিল ১৬০, ১৫০ ও ১৩৬ কোটী গজ; খদ্দর জাতীয় উৎপন্ন বস্ত্রের পরিমাণ ছিল ১৫, ১৪ ও ১৪ কোটী গজ—আর আমদানীকৃত বস্ত্রের পরিমাণ ছিল, ৩, ৫ ও ৩ কোটী গজ। অর্থাৎ উপরোক্ত পর পর তিনটী বৎসরে ভারতবাসীর দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্য যে পরিমাণ বস্ত্র পাওয়া গিয়াছিল তাহার মোট পরিমাণ হইতেছে যথাক্রমে ৬১৬, ৫৪৯, ও ৫৭৪ কোটী গজ। আর মাথা পিছু বস্ত্রের পরিমাণ হইতেছে ১৫, ১৫ ও ১৪ গজ মাত্র।

ভারতে বর্ত্তমানে হস্তচালিত তাঁতের সংখ্যা হইতেছে ২০ লক্ষ। এই তাঁতগুলি হইতে যে পরিমাণ বস্ত্র বর্ত্তমানে উৎপন্ন হইতেছে তাহার পরিমাণ মোট উৎপন্ন বস্ত্রের প্রায় শতকরা ২৪ ভাগ। মাত্র ৫০ বৎসর পূর্ব্বেও উৎপন্ন তাঁত বস্ত্রের পরিমাণ ছিল প্রায় ৫০ ভাগের মত। তখন ভারতীয় কলগুলির সহিত তাঁত শিল্পের ছিল বেশ এক সহযোগিতার ভাব। সূতার সরবরাহ ছিল প্রচুর। ১৯০১ সালে যেখানে কলগুলিতে মাত্র ৮৫০ লক্ষ পাউণ্ড সূতা ব্যবহৃত হইত, সেখানে তাঁতগুলিতে ব্যবহৃত হইত ২০০০ লক্ষ পাউণ্ড সূতা। ১৯১৩-১৪ সালে এই পরিমাণ আরো বৃদ্ধি পাইয়া হয় ২৭২০ লক্ষ পাউণ্ড। কিন্তু যুদ্ধ ও আমদানী রপ্তানীর গোলযোগের ফলে কলগুলিতে সূতা ব্যবহারের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, ফলে ১৯২০ সালে দেখা যায়—ভারতীয় কলগুলিতে সূতা ব্যবহারের পরিমাণ হইতেছে ৩৪১০ লক্ষ পাউণ্ড, আর তাঁতগুলিতে সূতা ব্যবহারের পরিমাণ হইতেছে ১২৭০ লক্ষ পাউণ্ড, অর্থাৎ ১৯১৩-১৪ সালের তুলনায় অর্দ্ধেক। এমনই অবস্থার মধ্যে কয়েক বৎসর অতিক্রান্ত হয়। পরে ১৯২৮ সালের খদ্দর আন্দোলনে ও স্বদেশী আন্দোলনে তাঁত বস্ত্রের এই ক্রম অবনতিকে অনেকাংশে রোধ করে। ১৯৪৬ সালে তাঁত হইতে উৎপন্ন বস্ত্রের পরিমাণ হইতেছে ১৩০০০ লক্ষ গজ।

উপরোক্ত কল ও তাঁতগুলিতে ব্যবহারের জন্য বৎসরে প্রায় ৫০ লক্ষ গাইট তুলা ব্যবহৃত হয়। ১৯৪৭-৪৮ সালে হায়দরাবাদ সহ ভারতীয় ইউনিয়নে ১ কোটী, ৯ লক্ষ ৩২ হাজার একর জমিতে ২১ লক্ষ ১৬ হাজার গাঁইট কার্পাস তুলা উৎপন্ন হইয়াছে। অবশ্য ভূমি ও উৎপাদনের পরিমাণ পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় ৬·৩ ও ০·৪ ভাগ কম হইয়াছে। ইহা ছাড়া মার্কিণ বার্ত্তায় প্রকাশ যে—১৯৪৮ সালের ১লা আগষ্ট হইতে যে বৎসর আরম্ভ হইয়াছে ঐ বৎসর ভারতবর্ষে ২৫ লক্ষ গাঁইট তুলা উৎপন্ন হইবে। ঐ খবরে আরও দেখা যায় যে ঐ বৎসর সমগ্র জগতে মোট ২ কোটী ৯৭ লক্ষ ৫০ হাজার গাঁইট তুলা উৎপন্ন হইবে। যুদ্ধোত্তর কালে তুলার ব্যবহারের চাইতে বেশী উৎপাদন হইয়াছে এই প্রথম। নিম্নে পর পর দুইটী ছকে ভারতবর্ষে মোট উৎপন্ন তুলার পরিমাণ, তুলাচাষের ভূমির পরিমাণ এবং আমদানী রপ্তানীকৃত তুলার পরিমাণ দেওয়া হইল। অবশ্য এখানে উল্লেখযোগ্য এই যে গত কয়েক বৎসরের চেষ্টায় এদেশের একর পিছু গড় তুলার ফলন প্রায় ২২ পাউণ্ড বৰ্দ্ধিত করা সম্ভব হইয়াছে। অন্যান্য দেশের তুলনায় এখনো এই ফলন অত্যন্ত কম। ভারতবর্ষে গড়ে একর পিছু তুলা উৎপন্ন হয় ১১২ পাউণ্ড, আর মিশর ও আমেরিকায় হয় যথাক্রমে ৫৩০ ও ২৭৫ পাউণ্ড।

ভারতবর্ষে উৎপন্ন তুলার হিসাব। (৫)

বৎসর	ভূমির পরিমাণ	উৎপাদন
	(হাজার একর)	(হাজার গাঁইট)
১৯৩৬-৩৭	২৪৭৫৯	৬২৩৪
১৯৩৭-৩৮	২৫৭৪৬	৫৭২২
১৯৩৮-৩৯	২৩৪৯০	৫০৫১
১৯৩৯-৪০	২১৫৮০	৪৯০৯
১৯৪০-৪১	২৩৩১১	৬০৮০
১৯৪১-৪২	২৪১৫১	৬২১৬
১৯৪২-৪৩	১৯২০৩	৪৭০২
১৯৪৩-৪৪	২১০৮৬	৫২৫৯
১৯৪৪ ৪৫	১৪৮৪৩	৩৫৮০
১৯৪৫ ৪৬	১৪৪৮০	৩৪৩৮

আমদানী ও রপ্তানীকৃত তুলার পরিমাণ। (৬)

বৎসর	আমদানী	রপ্তানী
	(টন)	(টন)
১৯৩৬ ৩৭	৬৪৯৮৮	৭৬২১৩৩
১৯৩৭-৩৮	১৩৪৪৫১	৪৮৭৭৬৪
১৯৩৮-৩৯	৯৬৩৭৪	৪৮২৬৫৮
১৯৩৯-৪০	৮৩৬৬৫	৫২৬৫১৬
১৯৪০-৪১	৮৯০৮২	৩৮৭৯৭৭
১৯৪১-৪২	১৩৭৫৪৮	২৫৬৮১১
১৯৪২-৪৩	৮৭৫৭৫	৫৩৭২০
১৯৪৩-৪৪	৭৬১০২	৫০২৮১
১৯৪৪-৪৫	৮৯৭১৭	৫৬৯১৮
১৯৪৫-৪৬	৮৬০০৯	১৩৫৯৪৫

এদেশে যে সব ধরণের তুলা উৎপন্ন হয় বা আমদানী করা হয় তাহার মধ্যে বেঙ্গল, আমেরিকান, উমরা, ব্রোচ, সুর্তি, খেলোয়া প্রভৃতি কয়েক ধরণের তুলাই প্রধান। গত ১৯৪৭-৪৮ সালে ভারতীয় ইউনিয়নে কোন প্রকার তুলা কত জমিতে কত পরিমাণ জন্মিয়াছিল তাহার হিসাব দিলাম।

১৯৪৭-৪৮ সালে উৎপন্ন তুলার
প্রকার ভেদে ভূমি ও উৎপাদনের পরিমাণ। (৭)

প্রকার ভেদ	ভূমি (হাজার একর)	উৎপাদন (হাজার গাঁইট)
বেঙ্গল	৮২৪	২১৫
আমেরিকান	২০৮	৩৩
উমরা	৩৯৩৯	৭২৭
ব্রোচ,	৫৫২	১৪৯
সুর্তি	৩৪৯	৭৭
খেলোয়া	৯৪৮	১৭৭
অন্যান্য	৪১১৮	৭৩৮

১৯৪৬ সালে যে মোট পরিমাণ বস্ত্র উৎপন্ন হইয়াছিল তাহার মধ্যে অতি সূক্ষ্ম (Super fine) বস্ত্রের উৎপাদনের হার ছিল শতকরা ৬'৫ ভাগ; সূক্ষ্ম (fine) বস্ত্র ছিল ১০'৫ ভাগ, মাঝারি (medium) বস্ত্র ছিল ৫৭ ভাগ, আর মোটা (coarse) বস্ত্রের হার ছিল শতকরা ২৩ ভাগ। এই স্থলে কোন শ্রেণীর বস্ত্রের কত গজের ওজন এক পাউণ্ড হয় তাহার উল্লেখ করিলে বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। অতি সূক্ষ্ম বস্ত্র এক পাউণ্ডে হয় ৮ গজ, সূক্ষ্ম বস্ত্র হয় ৬'৩ গজ, মাঝারি বস্ত্র হয় ৪'৩ গজ ও মোটা বস্ত্র হয় ২'৮ গজ মাত্র।

ভারতবর্ষের এই বস্ত্রশিল্প প্রথম সংরক্ষণ নীতির বা সুবিধার আওতায় আসে ১৯২৭ সালে। তখন কেবলমাত্র সুতার উপরই এই নীতি প্রযোজ্য হইত। ১৯৩০ সালে বস্ত্রের উপরও এই নীতি প্রযোজ্য হয়। ১৯২০ সাল হইতে এদেশে বস্ত্রশিল্পের উপর হইতে শুল্ক উঠাইয়া লইবার জন্য আন্দোলন আরম্ভ হয় এবং কলমালিকগণ জাপানী বস্ত্রের সহিত প্রতিযোগিতায় টিকিয়া না থাকিতে পারিবার আশঙ্কায় শ্রমিকদের মজুরী কমাইয়া বস্ত্রের মূল্য কমাইবার সিদ্ধান্ত করেন। ফলে এক সাধারণ ধর্ম্মঘটের আশঙ্কা দেখা দেয়। ১৯২৬ সালে সরকার দেশী বস্ত্রশিল্পের উপর হইতে শুল্ক উঠাইয়া দেন। ঐ সময়েই এদেশের বস্ত্রশিল্পের সংরক্ষণের কোন প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা দেখিবার জন্য প্রথম ট্যারিফ বোর্ড গঠিত হয়। তাঁহাদের মতানুসারেই সরকার সুতার উপর সংরক্ষণ নীতি প্রয়োগ করেন ১৯২৭ সালে। কিন্তু এই নীতিও জাপানীদের কম মূল্যে বস্ত্র সরবরাহ বন্ধ করিতে পারিল না। ফলে ১৯৩২ সালে বিশেষ ট্যারিফ বোর্ডের উপদেশানুসারে অ-বিলাতী বিদেশী বস্ত্রের উপর শতকরা ৫০ ভাগ সংরক্ষণ শুল্ক ধার্য্য হয়। ১৯৩৪ সালে ভারতীয় ট্যারিফ এ্যাক্টে ইহার আরও সংশোধন হয়। তাহার পর ভারতের বস্ত্রশিল্পকে রক্ষা করিবার জন্য সরকার বহুভাবে অনুসন্ধান চালাইয়া বিদেশী বস্ত্রের উপর নানা ভাবে সংরক্ষণ শুল্ক ধার্য্য করা হইয়াছে। ১৯৪৭ সালের ৩১শে মার্চ্চ এই সংরক্ষণ সুবিধার মেয়াদ শেষ হইবার কথা ছিল। সেই উদ্দেশ্যে অনুসন্ধান চালাইবার জন্য একটী ট্যারিফ বোর্ড গঠিত হয়। তাঁহাদের মতানুসারেই ভারত সরকার ১৯৪৭ সালের ২৯শে মার্চ্চ ঘোষণা করেন যে ১৯৪৭ সালের ৩১শে মার্চ্চ হইতে আমদানীকৃত সুতা ও বস্ত্রের উপর হইতে সংরক্ষণ শুল্ক উঠিয়া যাইবে। কারণ আমদানীকৃত সুতার শুল্ক ভারতীয় কলগুলির বিশেষ কোন উপকারে আসে না। বরঞ্চ হস্তচালিত তাঁত-শিল্পের উপর বাহ্যিকা হেতু যথেষ্ট চাপ দেয় ও ক্ষতিগ্রস্ত করে। ঐ নির্দ্দেশ ১৯৪৭ সালের ১লা এপ্রিল কিছু রূপান্তরিত হইয়া আইনে পরিবর্ত্তিত হয়। বস্ত্র পরিকল্পনা সমিতির নির্দ্দেশ অনুসারে বর্ত্তমানে কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন প্রদেশে নূতন কল স্থাপনের জন্য তাঁত ও মাকুর পরিমাণ নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছেন ও বস্ত্রের উৎপাদন বাড়াইবার জন্য একটী পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। বস্ত্র মূল্য নির্দ্ধারণ করিবার জন্য বিবেচনা করিতেছেন ট্যারিফ বোর্ড। আপাততঃ সংরক্ষণ সুবিধা দ্বারা ভারতীয় বস্ত্রশিল্পকে রক্ষা করিবার আর প্রয়োজন নাই, কারণ বস্ত্রশিল্পের দিক হইতে ভারতবাসীদের আর পরমুখাপেক্ষী হইবার প্রয়োজন নাই।

কিন্তু সত্যই কি আর চিন্তার কোন কারণ নাই? পূর্ব্বেই বলিয়াছি অন্যান্য দেশের তুলনায় আমরা কত কম বস্ত্র পাই মাথা পিছু ব্যবহারের হিসাবে। শুধু তাহাই নহে, মাত্র সাত বৎসর পূর্ব্বে বস্ত্রের যে মূল্য ছিল আজ তাহার অনেক গুণ বেশী হইয়াছে সেই মূল্য। তাহা ছাড়া যুদ্ধের সময়ে ও পরে নিয়ন্ত্রণ বি-নিয়ন্ত্রণের খোলা পথে শ্রমিক সমস্যা ও কাঁচা মালের চলাচল সমস্যার দোহাই দিয়া বস্ত্র শিল্পের মালিকগণ ও ব্যবসায়ীরা দেশবাসীদের যে ভাবে বঞ্চিত করিয়া কোটী কোটী টাকা উপার্জ্জন করিয়াছে তাহাতে তাঁহারা স্বদেশী শিল্প হিসাবে দেশবাসীর সহানুভূতি আকর্ষণ করিবার সমস্ত অধিকারই হারাইয়াছেন। ইঁহারা ভুলিয়া গিয়াছেন যে ভারতবর্ষে যন্ত্র চালিত বস্ত্র শিল্পের অভ্যুত্থানের মূলে যাঁহাদের দান অতুলনীয়, তাহা ঐ সংরক্ষণ সুবিধা মাত্র নহে, বা সরকারী কোন নীতিও নহে; তাহা হইতেছে এই অগণিত বঞ্চিত জনসাধারণের বিদেশী দ্রব্য বর্জ্জনের অসীম আগ্রহ ও মনোবল। সেই দিন যদি এই বিপুল জনসাধারণ বিদেশী দ্রব্য বর্জ্জন ও স্বদেশী শিল্পের পুনরুত্থানের মৃত্যুপণ সংকল্প লইয়া অগ্রসর হইয়া না আসিত তাহা হইলে অত্যন্ত অল্প মূল্যের জাপানী বস্ত্রের স্রোতে ভারতীয় বস্ত্র শিল্প কোথায় তলাইয়া যাইত। আপাততঃ পৃথিবীতে এমন কোন দেশ নাই, যাহারা তাহাদের উদ্বৃত্ত বস্ত্রে ভারতের প্রয়োজনীয় বস্ত্রের ও অধিক বস্ত্র এদেশে পাঠাইতে পারে। কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে তাহার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। সেই দিন হয়তো সরকারী আওতায় বস্ত্র বন্টনের এই প্রয়োজনীয়তাও থাকিবে না। কিন্তু শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের প্রয়োজন থাকিবে আত্মশক্তির উপর নির্ভর করিয়া বৈদেশিক

প্রতিযোগিতায় টিকিয়া থাকিবার। সেই দিন মুষ্টিমেয় চোরাকারবারী, অর্থলোভী অব্যবসায়ী বস্ত্র ব্যবসায়ীর ছলনায় জনসাধারণকে হইতে হইবে না বিব্রত আর লাঞ্ছিত। তবে তারও আগে চাই জাতীয় সরকারের সহযোগিতা। সরকার দৃঢ় হস্তে চোরাকারবারী ব্যবসায়ী আর শিল্পপতিদের অসাধুতাকে দমন করিয়া নিজ হস্তে বস্ত্রশিল্পের ভার গ্রহণ করিলে একাধারে দেশবাসী হইবে উপকৃত, স্বদেশী আন্দোলনের অন্যতম কর্ম্ম প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ বস্ত্র শিল্পকে দেওয়া হইবে যোগ্য আসন, আর যোগ্য উত্তর দেওয়া হইবে অসাধু, শঠ আর চোরাকারবারীদের।

(১) হইতে (৬) নং ছক পর্য্যন্ত মিঃ এম, পি গান্ধীর ইণ্ডিয়ান কটন্ টেক্সটাইল ইন্ডাষ্ট্রী (১৯৪৬-৪৭ এ্যানুয়াল) ও (৭) নং ছক ভারত সরকারের অর্থনৈতিক ও সংখ্যাতত্ত্ব বিভাগের বিজ্ঞপ্তি হইতে গৃহীত এবং অন্যান্য তথ্য বিভিন্ন পত্র পত্রিকা হইতে গৃহীত হইয়াছে। শ্রীস।

কলিকাতা ভারতের রাজধানী

অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ

অচির ভবিষ্যতে কলিকাতা ভারতের রাজধানী হইবে এই ভবিষ্যৎবাণী করা যাইতেছে।

ইহা কোনও যোগশক্তির প্রভাবে দৃষ্ট নহে; কিম্বা ফলিত জ্যোতিষের সাহায্যে গণিত নহে। ঐ ঐহিক দৃষ্টির সাহায্যে জাগতিক ঘটনাবলী পর্য্যবেক্ষণ করিয়া এই অনুমানে আসা যাইতে পারে।

আমরা স্বাধীন হইয়াছি। স্বাধীন দেশের লোকেরা নিজ নিজ দেশের হিতার্থ নানারূপ মত আভাস (Suggestion) দিয়া থাকে। এই প্রবন্ধ ও তদুদ্দেশ্যে লিখিত, কোনও দেশ-বিশেষের সহিত যুদ্ধ বাধাইয়া দিবার উদ্দেশ্যে লিখিত নহে।

এই রাজধানী পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইবে—রাজনীতিক-গণের মতানুসারে নহে—সমরবিদ্‌গণের পরামর্শ অনুসারে।

দিল্লীতে রাজধানী পরিবর্ত্তনের একটা কারণ ছিল—সমর ব্যবস্থাবিদ্‌গণের পরামর্শ। তৎকালীন সমর ব্যবস্থার (Strategy) মতে ঐ পরিবর্ত্তনই সঙ্গত ছিল। তৎকালে সামরিক জাতি সকলকে যুদ্ধ উপলক্ষে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান দেওয়া হইত। তখন ইংরাজের প্রিয় সৈন্য ছিল—গুর্খা, শিখ, পাঠান ও রাজপুত। দিল্লীতে অবস্থান উপলক্ষে তাহাদিগকে তুষ্ট করিয়া হাতে রাখা এবং দেশীয় রাজন্যগণকে নিজেদের সম্যক বশে রাখা সুবিধাজনক মনে করা হইত

প্রথম জগৎযুদ্ধের পর হইতে সমর-সংস্থান-বিদ্যার বিশেষ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সামরিক ও অসামরিক জাতির ভেদ উঠিয়া গিয়াছে। যুদ্ধে যন্ত্রের আধিপত্য স্বীকৃত হইয়াছে। যন্ত্রের তীক্ষ্ণ আক্রমণে ফরাসী পলাইয়াছে, ইংরাজ পলাইয়াছে, আমেরিকান পলাইয়াছে, রুশ পলাইয়াছে এবং পরে জাপানী ও জার্ম্মান যাহারা সামরিক জাতি বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিল, তাহারাও পলাইয়াছে।

ভারতকে স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে আমাদের এই যান্ত্রিক সমর-ব্যবস্থা-বিদ্যা শিক্ষা করিতে হইবে। রণযন্ত্র নির্ম্মাণ ও উহার প্রয়োগ করা শিক্ষা করিতে হইবে।

হায়দরাবাদ জয় উপলক্ষে এই রণযন্ত্রের মহিমা সম্প্রতি কীর্ত্তিত হইয়াছে। ভারত রাষ্ট্রনায়কগণ জ্ঞাত বা অজ্ঞাত-সারে এক ঢিলে দুই পাখী মারিয়াছেন। হায়দরাবাদ ও ভারতের অন্য মুসলমানদের লম্ফঝম্ফ বিদূরিত হইয়াছে। আর বিদূরিত হইয়াছে শিখ নেতৃবৃন্দের তরবারীর আস্ফালন। তাহাদের বর্ত্তমান বক্তৃতায় মনে হয় তাহাদের স্বাতন্ত্র্যস্পৃহা দমিত বা বিদূরিত হইয়াছে এবং সম্ভবত তাহারা এখন বুঝিয়াছেন যে, তরবারিটা প্রাগ-ঐতিহাসিক যুগের অস্ত্র-প্রতীক—রিভলভার সম্ভবত বর্ত্তমান যুগের অস্ত্রের প্রতীক। হায়দরাবাদে অসামরিক জাতির সৈন্যাধ্যক্ষ-ব্যবস্থা ভারতীয় রাষ্ট্রনায়কগণ কি একটা কিছু উদ্দেশ্য লইয়াই করিয়াছিলেন?

ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর অনেক ভীতাত্মা ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, ভারত ক্রমশঃ কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত হইয়া পড়িবে। তাহাদের কেহ কেহ স্বাধীন পৃথক বঙ্গের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। তাহারা যন্ত্র যুগের এবং যন্ত্র-সমর-সংস্থান-বিদ্যার মহিমা হৃদয়ঙ্গম করেন নাই। বর্ত্তমান যুগে ক্ষুদ্রদেশ ও যন্ত্র-শিক্ষাহীন দেশের স্থান নাই। সে দেশ চির-দুর্ব্বল ও চির-দরিদ্র থাকিয়া যাইবে। প্রেসিডেণ্ট আব্রাহাম লিঙ্কন আমেরিকার

খণ্ডত্বের বিপক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন বরং শতবর্ষব্যাপী গৃহযুদ্ধ সহ্য করিব, তবু আমেরিকাকে বিভক্ত হইতে দিব না। সে ভীষণ গৃহযুদ্ধে (American Civil War) আমেরিকান আমেরিকানকে গুলি করিয়া মারিয়াছিল। রক্তের স্রোত বহিয়াছিল। কয়েক বর্ষব্যাপী সমরের পর লিঙ্কন-দলই জয়ী হয়। আমেরিকা অবিভক্ত রহিল। তাই আমেরিকা আজ এত বড়। আমেরিকার যন্ত্রশক্তি দেখিয়া লোকে বিস্মিত হয়। আমেরিকার এক প্রকাণ্ড পর্ব্বতের একদিকে নদী বহিত—সে দেশ উর্ব্বরা, শস্যশ্যামলা। অন্যদিকে নদী ছিল না, সে দেশ মরুসদৃশ ছিল। বিস্তৃত পর্ব্বতকে ভেদ করিয়া এ'দিকে নদী আনাইয়া এ দেশকেও এখন উর্ব্বরা করা হইয়াছে। টেনিসিভ্যালির অনুকরণে দামোদরের বাঁধ নির্ম্মাণ করাইয়া বন্যা-নিবারণ, বিদ্যুৎ-নির্ম্মাণ এবং চাসভূমিতে জল-সঞ্চারণ প্রভৃতি নানা প্রয়োজন-সাধক বড় পূর্ত্তকর্ম্ম বড় দেশের পক্ষেই করা সম্ভব।

ভারত স্বাধীন হইয়াছে। স্বাধীনতা সংরক্ষণই দেশের সর্ব্বপ্রথম কার্য্য। অপর সকল কৃষ্টি তাহার পরে। রাষ্ট্রের যাহারা শত্রু—অর্থাৎ দেশকে দুর্ব্বল করিয়া যাহারা তাহার স্বাধীনতা লোপের কারণ হয়, কোন দেশই তাহাদিগকে ক্ষমা করে না—ইংলণ্ডও নয়, আমেরিকাও নয়, সোভিয়েট ইউনিয়নও নয়।

সমর-সংস্থান-বিস্তার নির্দ্দেশ অনুসারে অবিলম্বে ভারতের অনেক পরিবর্ত্তন হইবে। প্রাদেশিক বিভাগ ক্রমশঃ উঠিয়া যাইবে। প্রাদেশিক বিভাগ থাকিলে দুই প্রদেশের হিংসাদ্বেষের ফলে দেশ দুর্ব্বল হয়। দেশের নেতৃত্বের ভার দিতে হইবে সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত ব্যক্তিকে। প্রাদেশিকতা থাকিলে নিকৃষ্ট ব্যক্তিও নেতৃত্বের ভার পাইয়া দেশকে দুর্ব্বল করিতে পারে।

কলিকাতায় মসলেম-লীগের রাজত্বকালে কিরূপে আফিসসমূহের কর্ম্ম-ক্ষমতার হানি হইয়াছিল তাহা তৎকালীন কর্ম্মচারী মাত্রেই জানেন। একজন মুসলমান কর্ম্মচারী আসিল কাজের লোক বলিয়া নয়—মুসলমান বলিয়া। অন্য কর্ম্মচারীরা চটিল। লোকটা কাজ করিতে ভাল পারে না, দেরী হয়। সকল কর্ম্মচারীও কাজ ধীরে করিতে লাগিল। কিছুকাল পরে দেখা গেল—আরও লোক না হইলে অফিসের কাজ চলে না। মুসলমান কর্ম্মচারীর সংখ্যাও বাড়িতে লাগিল, বিশৃঙ্খলাও বাড়িতে লাগিল।

একটি মফঃস্বল সহরের হাস্পাতালের কথা জানি। একজন বাঙ্গালী হিন্দু ডাক্তার উহার অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি প্রত্যহ বহু অস্ত্র-চিকিৎসা ও রোগীর ঔষধ লিখিয়া দিতেন। তাহাকে স্থানান্তরিত করিয়া একজন মুসলমান ডাক্তার আনা হইল। তিনি বলিলেন—আমি প্রত্যহ এত অস্ত্রক্রিয়া করিতে পারিব না। কাজেই ডাক্তারের সংখ্যা দ্বিগুণ হইল। শাসন ব্যয় দ্বিগুণ হইল। সাধারণ প্রজাকেই তাহা বহন করিতে হয়—আর সুচিকিৎসকের দ্বারা চিকিৎসা না হইয়া আনাড়ির দ্বারা চিকিৎসায় তাহার কি লাভ হইল।

সমগ্র ভারতকে ক্রমশ এক জাতিতে পরিণত করিতে হইবে। আমেরিকায় ইহার দৃষ্টান্ত আছে। জার্ম্মাণ, ইটালিয়ান, আইরিশ, ফ্রেঞ্চ, পোল প্রভৃতি ইউরোপের নানা জাতি আমেরিকায় গিয়াছে এবং এক পুরুষের মধ্যেই আমেরিকানে পরিণত হইয়াছে। এই ঐক্য-বিধানের জন্য দেশে ভাষা, পরিচ্ছদ ও আচার ব্যবহার ক্রমশ এক হইয়া আসিবে। সম্ভবত সংস্কৃত-বহুল হিন্দিই ভারতের রাষ্ট্র ভাষা হইবে। বাঙ্গালীরা যদি হিন্দি অক্ষর-মালা গ্রহণ করে, তবে বাঙ্গালারও রাষ্ট্র ভাষা হইবার সম্ভাবনা। তিনটি কারণে—বাঙ্গালাভাষায় সংস্কৃত শব্দের সংখ্যা হিন্দি অপেক্ষা অধিক এবং বাঙ্গালায় ব্যাকরণ হিন্দি অপেক্ষা সোজা ; ক্রিয়া প্রভৃতির লিঙ্গ ভেদ করিতে হয় না। আর বাঙ্গালা ভাষায় সর্ব্বপ্রকারের পুস্তকাবলী অধিক ; বিশেষতঃ সংস্কৃত-বাঙ্গালা অনুবাদ-গ্রন্থ অত্যন্ত বেশী পরিমাণে আছে। ঐ সকল কারণে দক্ষিণ-ভারতীয়দিগের পক্ষে বাঙ্গালা শিক্ষা অনেক বেশী সহজ হইবে।

পূর্ব্বকথিত সমর-সংস্থান-বিস্তার নির্দ্দেশ অনুসারেই কলিকাতা ভারতের রাজধানী হইবে। কলিকাতা রাজধানী হইবার স্বপক্ষের কারণগুলি :—প্রায় দুই শত বর্ষকাল কলিকাতা ভারতের রাজধানী ছিল। ঐকালে এখান হইতে রাজ্য পরিচালনার কোন অসুবিধা অনুভূত হয় নাই বা হইলে তাহার প্রতিকারের ব্যবস্থা হইয়াছিল। কলিকাতা ইংরাজের পয়মন্ত রাজধানী ছিল। কলিকাতায় যতদিন

রাজধানী ছিল ততদিন ইংরাজের উত্তর উত্তর উন্নতি হইয়াছিল। লোকপ্রবাদ আছে ইংরাজের কলিকাতা ত্যাগ করিবার সময় দুর্লক্ষণ দেখা গিয়াছিল। দিল্লীকে বহু সাম্রাজ্যের গোরস্থান বলা হয়। দিল্লীতে যাওয়ার অচির কালেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়। উহাতে ইংরাজের বিশেষ শক্তিক্ষয় হয়। আমেরিকাই জগতের প্রধান শক্তিতে পরিণত হয়। তাহার কিছুকাল পরেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং উহার ফলে ইংরাজ সাম্রাজ্যের লোপ। দুর্লক্ষণের ব্যাপারটা কুসংস্কার বলিয়া উড়াইবার চেষ্টা হইতে পারে। কিন্তু ইতিহাসে জানা যায়, জাতীয় জীবনে কুসংস্কারের প্রভাব নিতান্ত কম নহে।

কলিকাতার অপর সুবিধা সকল—উহা এসিয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নগর, শিক্ষা ও বাণিজ্য ব্যাপারেও উহা খুব বড়, উহার নানা দিকে বৃদ্ধি পাইবার অশেষ সুবিধা। ডায়মণ্ড-হারবার পর্য্যন্ত, কৃষ্ণনগর পর্য্যন্ত, আসানসোল পর্য্যন্ত কলিকাতা বাড়িয়া যাইতে পারে।

এখন সমর-সংস্থান-বিদ্যার মতে কলিকাতার কি কি সুবিধা তাহা আলোচনা করা যাউক। বর্ত্তমান যুদ্ধের প্রধান প্রয়োজন লৌহ, কয়লা ও তৈল। লৌহ ও কয়লার কেন্দ্রসমূহ কলিকাতার অতি সন্নিকটে। তৈল ভারতে শুধু আসামে আছে, তাহাও দিল্লী বা বম্বে অপেক্ষা কলিকাতার অনেক সন্নিকটে। আর কয়লা হইতেও শীঘ্র দেশে কৃত্রিম তৈল প্রস্তুত হইবে।

ভবিষ্যতের যুদ্ধের প্রধান যন্ত্র বিমানযানসমূহ। রাজধানী এমন স্থানে সংস্থাপিত হইবে যাহাতে শত্রুর বিমান বাহিনী উহাকে ধ্বংশ করিতে না পারে।

ভারতের সম্ভাবিত শত্রু কে কে? পাকিস্থানের সহিতই ভারতের সংঘর্ষ বাধিবার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সম্ভাবনা। মসলেম-লীগ যে বিদ্বেষের বাণী প্রচার করিয়াছে এবং পাকিস্থান হইতে বিতাড়িত হিন্দুগণ পাকিস্থানের প্রতি যে বিশেষ উদার মনোভাব পোষণ করেনা, তাহা অস্বীকার করিলে সত্যকেই অস্বীকার করা হইবে। উপস্থিত প্রবন্ধ পাকিস্থান ও হিন্দুস্থানের যুদ্ধ বাধাইবার জন্য লিখিত নহে। দার্শনিক ভাবে যে সকল ঘটনা সম্ভাব্য তাহারই আলোচনা।

এই পাকিস্থানের মধ্যে আপাতত পূর্ব্ব-পাকিস্থানকে গুরুতর শত্রু ভাবিবার কারণ নাই। পূর্ব্ব-বাঙ্গালার সামরিক পূর্ব্ব-কথা (tradition) নাই। উহা শিক্ষায় ও যন্ত্র নির্ম্মাণ বিষয়ে হীন। পশ্চিম পাকিস্থান উহাকে কয়েক সহস্র মাইল ভারতীয় সমুদ্রের মধ্য দিয়া আসিয়া তবে সাহায্য করিতে পারে। ত্রিপুরা-রাজ্যে সজ্জিত ভারত-সৈন্যবাহিনী সহজেই চট্টগ্রামের বন্দর দখল করিতে পারে। তাহার ফলে উহার জল পথে সাহায্য আসিবার সম্ভাবনাও বিলুপ্ত হইবে। উহার রাজধানী ঢাকা ভারতীয় বিমান-বাহিনী হইতে কয়েক ঘণ্টা মাত্র দূরে অবস্থিত। অর্থাৎ পূর্ব্ববঙ্গ দখল করা ভারত-সৈন্যের পক্ষে বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে সহজসাধ্য ব্যাপার।

কিন্তু বিমান বাহিনী হইতে দিল্লীর বিপদ বেশী। উহা পশ্চিম পাকিস্থান হইতে সামান্য কয়েক ঘণ্টা আকাশ পথ দূরে স্থিত। পাঞ্জাবী মুসলমানরা সামরিক জাতি বলিয়া খ্যাতি অর্জন করিয়াছে। তাহারা শিক্ষায়ও উন্নতি করিয়াছে এবং সেখানে কল-কারখানাও অনেক। করাচি বন্দর বিদেশ হইতে দ্রব্যাদি আনিবার পক্ষে চালু বন্দর, চট্টগ্রামের মত ভবিষ্য বন্দর নহে। আর পরাক্রান্ত সামরিক মুসলমানজাতিসকল পশ্চিম পাকিস্থানের সন্নিকটে অবস্থিত। অতএব প্যান-ইসলামিজ্মের উৎপত্তির কথা চিন্তিতব্য।

রাশিয়া বর্ত্তমান কালে আমেরিকার পরই মহাশক্তিমান জাতি। কিন্তু বিশ্বরাষ্ট্রের হাঙ্গামায় পড়িয়া রাশিয়াও ভারতের শত্রু হইতে পারে। একারণ রাশিয়া হইতেও দিল্লীর বিপদের কথা বিচার্য্য। রাশিয়ার বিমান-যানের পক্ষে দিল্লী আক্রমণ করা সহজসাধ্য।

কলিকাতার প্রতিদ্বন্দী অপর নগর বম্বে। বম্বের অসুবিধাগুলি :—উহা দেশের এক প্রান্তে অবস্থিত। উহার চতুষ্পার্শ্বে বর্দ্ধিত হইবার মত স্থানাভাব। উহা সমুদ্রের উপরিস্থিত বলিয়া শক্তিমান নৌ-বহরের পক্ষে উহাকে ধ্বংশ করা সহজ। ভারতের নৌবহর প্রভৃত শক্তিশালী হইতে বহু বৎসর লাগিবে এবং কোনও কালে যে উহা ইংলণ্ডের সমকক্ষ হইতে পারিবে ইহার সম্ভাবনা কম। আর কোনও দেশের রাজধানীই সমুদ্রের উপর সংস্থিত নহে। লিসবন ও করাচি দুইই ক্ষুদ্র দেশের রাজধানী। বম্বের নিকট অবস্থিত সিংহল কোনও কালেই পরাক্রান্ত রাজ্য হইবে না। উহা বহুকাল ইংরাজেরই প্রভুত্বাধীন থাকিবে। সিংহল হইতে বম্বের উপর বিমান আক্রমণ সম্ভব।

পূর্ব্বোক্ত আলোচনা হইতে মনে হয় কলিকাতা অচির ভবিষ্যতে ভারতের রাজধানী হইবে।

মন্দাক্রান্তা

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

১

তোড়জোড় করিয়া ছবি আরম্ভ করিতে বর্ষা নামিল।

বোম্বাই বর্ষা—একেবারে চাতুর্মাস্য। জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষাশেষি হঠাৎ একদিন মেঘগুলা পশ্চিমের সমুদ্র হইতে আরব্য উপন্যাসের জিনের মতো উঠিয়া আসে এবং কয়েকদিন ঘোরাফেরা করিয়া বর্ষণের কিছু নমুনা দিয়া চলিয়া যায়। অতঃপর দিন দশেক পরে তাহারা দলে দলে পালে পালে ফিরিয়া আসিয়া সেই যে আসর জমকাইয়া বসে তখন তিন মাসের মধ্যে আর সূর্যের মুখ দেখিবার উপায় থাকে না। দিনগুলাকে তখন রাত্রির কনিষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া মনে হয় এবং জল ও স্থলের প্রভেদ এতই অকিঞ্চিৎকর হইয়া যায় যে মানুষগুলাকে জলচর জীব বলিয়া মানিয়া লইতে আর কোনই কষ্ট হয় না।

কবি বলিয়াছেন—এমন দিনে তারে বলা যায়। কবির কথা মিথ্যা নয়, উপযুক্ত পাত্রপাত্রী পাইলে নিশ্চয় বলা যায়; একবার নয়, বারবার বলা যায়, ঘুরিয়া ফিরিয়া মন্দাক্রান্তা ছন্দে ইনাইয়া বিনাইয়া বলা যায়। কিন্তু বলা ছাড়া আর কোনও উদ্যম সাপেক্ষ কাজ করিবার ইচ্ছা বোধকরি কাহারও মনে উদয় হয় না। দেহ মনের এমন একটি আলস্যমন্থর জড়তা উপস্থিত হয় যে কবির শরণাপন্ন না হইলেও বলিতে ইচ্ছা করে—সমাজ সংসার মিছে, সব মিছে এ জীবনের কলরব।

এই তো গেল আটপৌরে ব্যবস্থা। তার উপর মাঝে মাঝে যখন সাইক্লোন আসিয়া উপস্থিত হয় তখন বর্ষার ঢিমা আসর একমুহূর্তে জমাট বাঁধিয়া যায়। তখন মেঘের সঙ্গে পাল্লা দিয়া বাতাস চৌদলে ছুটিতে থাকে, দিগঙ্গনার নৃত্যে সভাতল আলোড়িত হইয়া ওঠে এবং আকাশের মৃদঙ্গ হইতে যে বোল্ উত্থিত হইতে থাকে তাহাকে কোনও মতেই ধামার বা দশকুশীর সঙ্গে তুলনা করা চলে না।

কিন্তু ইহা যেমন আকস্মিক তেমনি ক্ষণিক। আবার ধীরে ধীরে সভা ঝিমাইয়া পড়ে; ঝিল্লীরব শোনা যায়; কেতকীর গন্ধবিমূঢ় বাতাস নেশায় ঝিম্ হইয়া থাকে।

এদিকে পৃথিবী ঘুরিতেছে; জড় জগতে অণু পরমাণুও চুপ করিয়া বসিয়া নাই। সুতরাং মানুষকেও কিছু-না-কিছু করিতে হয়। কিন্তু সব কাজই মহাক্রান্তা ছন্দে বাঁধা, গুরুগম্ভীর মন্থরতায় আরম্ভ হইয়া কিছুক্ষণ অপেক্ষাকৃত দ্রুত লয়ে চলিবার পর আবার শিথিল হইয়া এলাইয়া পড়ে। পিঙ্গল বিহ্বল ব্যথিত নভতল—

যাহোক সোমনাথের কাজ একরকম ভালই চলিতেছিল। তাহার নূতন কাজে হাতেখড়ি, তাই সে আট ঘাট বাঁধিয়া কাজে নামিয়াছিল। পাণ্ডুরঙের সহিত সকল বিষয় পরামর্শ করিয়া সে কাজ করিত, পাণ্ডুরঙ্ ছিল তার দক্ষিণ হস্ত। তা ছাড়া ইন্দুবাবু প্রায়ই সেটে আসিয়া বসিতেন এবং কালোপযোগী উপদেশ দিয়া তাহাকে সাহায্য করিতেন। রুস্তমজিও কদাচিৎ আসিয়া বসিতেন এবং নীরবে তাহাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করিতেন। রুস্তমজির একটি মহৎ গুণ ছিল, একবার যাহার হাতে কার্যভার অর্পণ করিয়াছেন তাহার কার্যে আর হস্তক্ষেপ করিতেন না;

সোমনাথ মনে মনে একটা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, এবার ছবির খরচ সে কিছুতেই দেড় লক্ষ টাকার উপরে উঠিতে দিবে না। রুস্তমজি অবশ্য আড়াই লক্ষ পর্যন্ত খরচ করিতে প্রস্তুত ছিলেন; কিন্তু সোমনাথ লক্ষ্য করিয়াছিল, ছবি নির্মাণ ব্যাপারে অনেক অনাবশ্যক খরচ হয়, অনেক টাকা—ন দেবায় ন ধর্মায়—যায়। এবার সে কিছুতেই তাহা ঘটিতে দিবে না। তাহার ছবি ভাল হইবে এ বিশ্বাস তাহার ছিল; কিন্তু ভাল হইলেই ছবি চলিবে এমন কোনও কথা নাই। তাই খরচ যদি কম হয় তাহা হইলে লোকসানের সম্ভাবনা অনেক কমিয়া যায়; লাভ যদি না হয়, অন্তত খরচটা উঠিয়া আসিতে পারে!

অত্যন্ত সতর্কভাবে সদা শঙ্কিতচিত্তে সোমনাথ কাজ করিয়া চলিল। মাঝে মাঝে ভগবানের কাছে অতি সংগোপনে প্রার্থনা জানাইতে লাগিল—হে ভগবান, আমি অতি অধম, কিন্তু যদি এতবড় সুযোগটা দিয়াছ, মাথায় পা দিয়া ডুবাইয়া দিও না।

এদিকে সোমনাথের পারিবারিক পরিস্থিতিতেও কিছু পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। আষাঢ় মাসের শেষের দিকে জামাইবাবু হঠাৎ পুণায় বদলি হইলেন; ঘোর বর্ষার মধ্যে তিনি দিদিকে লইয়া চলিয়া গেলেন। কিন্তু বাড়ীখানা ছাড়া হইল না। কারণ জামাইবাবুর আবার শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবার সম্ভাবনা আছে, তাছাড়া সোমনাথেরও একটা আস্তানা চাই। সোমনাথ ভরা বাদরে শূন্য মন্দিরে পড়িয়া রহিল।

মাঝে মাঝে পাণ্ডুরঙ্ আসিয়া তাহার বাসায় রাত্রিবাস করিয়া যাইত। দুইবন্ধু একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করিয়া অনেক রাত্রি পর্যন্ত ছবির কথা আলোচনা করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িত। তারপর সকালবেলা আবার একসঙ্গে কাজে বাহির হইত। রুস্তমজি সোমনাথকে একটি দ্বিতীয় পক্ষের মোটর কিনাইয়া দিয়াছিলেন। পুরাতন হইলেও গাড়ীটি বেশ কর্মক্ষম, এই ভরা মরসুমে ভারি কাজে লাগিতেছিল।

এই সময় সোমনাথের আর একটি উপসর্গ জুটিয়াছিল। এতদিন তাহার জীবনে চিঠি লেখালেখির কোনও পাঠ ছিলনা; এখন চারিদিক হইতে তাহার কাছে চিঠি আসিতে আরম্ভ করিল। অধিকাংশ পত্রলেখকই অচেনা, কিন্তু দু'চারজন পরিচিত ব্যক্তিও আছেন।

সোমনাথ বুঝিল তাহার প্রথম চিত্র সাধারণে প্রকাশ হইবার সঙ্গে সঙ্গে আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষে তাহার কীর্তি ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে।

অপরিচিত পত্র লেখকগণ—তাঁহাদের মধ্যে তরুণীর সংখ্যা কম নয়—কেবল অনুরাগ ব্যক্ত করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। কিন্তু যাঁহারা পরিচিত তাঁহারা আবার আর একটু দূর গিয়াছেন। লক্ষ্ণৌ ও কলিকাতায় সোমনাথের পরিচিত ব্যক্তির অভাব ছিল না, এতদিন তাঁহারা তাহার খোঁজখবর লওয়া প্রয়োজন বোধ করেন নাই। কিন্তু এখন কোনও অলৌকিক উপায়ে তাহার ঠিকানা আবিষ্কার করিয়া তাঁহারা পত্রাঘাত করিতে শুরু করিলেন। তাঁহাদের সজ্জনতা চাপাইয়া একটি ইঙ্গিত কিন্তু খুবই স্পষ্ট হইয়া উঠিল: সুযোগ এবং সুবিধা পাইলে তাঁহারাও সিনেমায় যোগ দিয়া অবিনশ্বর কীর্তি অর্জন করিতে প্রস্তুত আছেন। একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোকের আগ্রহ সব চেয়ে বেশী। তিনি সোমনাথের কলিকাতায় ব্যাঙ্কের একজন প্রবীণ কেরাণী, শীঘ্রই কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিবেন; যৌবনকালে তিনি সখের থিয়েটার করিতেন; এই ওজুহাতে তিনি সোমনাথকে ধরিয়া পড়িয়াছেন, কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে যেন সোমনাথ তাঁহাকে সিনেমায় টানিয়া লয়। ভদ্রলোক একেবারে নাছোড়বান্দা।

এই সব অপ্রত্যাশিত পত্রবৃষ্টির ফলে সোমনাথ প্রথমটা কিছু সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিল, ক্রমে পাণ্ডুরঙের উপদেশ পাইয়া ধাতস্থ হইল। পাণ্ডুরঙ্ বলিল, সিনেমায় সিদ্ধিলাভের ইহা একটি অনিবার্য পরিণাম এবং মানসিক শান্তি বজায় রাখিতে হইলে পত্রগুলির উত্তর না দেওয়াই সমীচীন। চিঠি লেখার অভ্যাস সোমনাথের কোনও কালেই ছিলনা, সে পরম আগ্রহের সহিত পাণ্ডুরঙের সারগর্ভ উপদেশ গ্রহণ করিল।

কেবল একখানি চিঠি পড়িয়া সোমনাথ কিছু বিমনা হইল। কলিকাতা হইতে তাহার এক সমবয়স্ক বন্ধু লিখিয়াছে, বন্ধুটি আবার দূর সম্পর্কে জামাইবাবুর আত্মীয় হয়। বেচারা স্কুলের শিক্ষক, চিত্রাভিনেতা সাজিবার দুরভিসন্ধি তাহার নাই; নিতান্তই বন্ধু-প্রীতির বশবর্তী হইয়া চিঠি লিখিয়াছে। চিঠিখানি অংশতঃ এইরূপ—

'—ছবিটা চমৎকার হয়েছে; কলকাতার লোক হুমড়ি খেয়ে দেখছে। বন্দনা দেবীর ছবি অবশ্য জনপ্রিয় হয়, কিন্তু হিন্দী ছবি বাঙালীরা বেশী দেখেনা। এবার বাঙালীরাও দেখছে। তার কারণ বোধহয় এই যে, তুমি বাঙালী এবং তোমার অভিনয় সুন্দর হয়েছে। ছবিখানা বার তিনেক দেখেছি।

একটা খবর দিই। যে তিন দিন আমি তোমার ছবি দেখতে গিয়েছিলাম সেই তিনদিনই রত্নাকে সিনেমায় দেখলাম; সেও ছবি দেখতে গিয়েছিল। রত্না সিনেমা পছন্দ করে না জানতাম। ব্যাপার কি? শুনলাম কিছুদিন আগে সে বোম্বাই গিয়েছিল। এর ভেতরে কোনও নতুন তত্ত্ব আছে নাকি? যদি থাকে, ইতর জনের দাবী এখন থেকে জানিয়ে রাখছি—

বন্ধুসুলভ চটুলতা বাদ দিয়া খবরটা দাঁড়ায়—রত্না তিনবার তাহার ছবি দেখিতে গিয়াছিল; তিন বারের বেশীও হইতে পারে। এখন প্রশ্ন এই, কেন গিয়াছিল? খুব বেশী ভাল না লাগিলে একই ছবি কেহ তিনবার দেখে না। রত্না স্বভাবতই সিনেমার প্রতি বিরূপ; তার উপর সম্প্রতি বোম্বাইয়ে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহার ফলে সে সহসা সিনেমার অনুরাগিণী হইয়া পড়িবে এরূপ মনে করাও কঠিন। সোমনাথের প্রতিও তাহার মন সদয় নয়। তবে, যে ছবিতে সোমনাথ নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছে সেই ছবি বারবার দেখিবার অর্থ কি? ছবিতে এমন কী অনিবার্য আকর্ষণ আছে যে রত্না না দেখিয়া থাকিতে পারিতেছে না?

অনেক চিন্তা করিয়া সোমনাথ একটি সুদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিল। পরচিত্ত অন্ধকার; উপরন্তু রমণীর মন চিরদিনই গভীর রহস্যে আবৃত। সোমনাথ বিমর্ষচিত্তে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইল যে, রত্নার ছবি দেখার কার্য-কারণ সম্বন্ধ আবিষ্কার করা তাহার কর্ম নয়।

২

কয়েকদিন ধরিয়া কোলাবা'র আবহ-মন্দির হইতে ভবিষ্যদ্বাণী হইতেছিল—আরব সাগরের বায়ুমণ্ডলে সাম্য নষ্ট হইয়াছে, সুতরাং শীঘ্রই একটা ঝড়ঝাপটা আশা করা যাইতে পারে। এইরূপ ভবিষ্যদ্বাণী নিয়মিত আবহ-মন্দির হইতে বাহির হইয়া থাকে এবং সংবাদপত্রে ছাপা হয়; কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনও ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছে এরূপ নজির না থাকায় কেহই উহা গ্রাহ্য করে না।

যাহোক, ঝড়ে কাক মরে ফকিরের কেরামতি বাড়ে। আবহবার্তা তিন দিনের বাসি হইয়া যাইবার পর একদিন অপরাহ্ণের দিকে একটা এলোমেলো বাতাস উঠিল। বৃষ্টি সারাদিন ধরিয়াই পড়িতেছিল, এখন যেন আর একটু চাপিয়া আসিল। ক্রমে যতই সন্ধ্যা হইতে লাগিল ততই অলক্ষিতে বায়ুর বেগ বাড়িয়া চলিল।

সারা দিন ষ্টুডিওতে সোমনাথের শুটিং ছিল। সন্ধ্যা ছ'টায় সময় কাজ শেষ করিয়া সে বাহির হইল। পাণ্ডুরঙ্কে বলিল—'চল, আজ রাত্রে আমার বাসায় থাকবে।'

পাণ্ডুরঙ্ বলিল—উঁহু। আকাশের গতিক ভাল নয়, রাত্রে সাইক্লোন দাঁড়াতে পারে। আমার বৌটা খাণ্ডার; আজ রাত্রে যদি বাড়ি না ফিরি, কাল আর আমাকে আস্ত রাখবে না।

সোমনাথ বলিল,—'বেশ, চল তাহলে তোমাকে বাসায় পৌঁছে দিয়ে যাই।'

পাণ্ডুরঙ্কে বাসায় পৌঁছাইয়া সোমনাথ যখন নিজের বাসায় ফিরিল তখন দিনের আলো আর কিছুমাত্র অবশিষ্ট নাই। বায়ুর বেগ আর একটু বাড়িয়াছে। রাস্তার গাড়ী ও মানুষের চলাচল অনেক কমিয়া গিয়াছে। কেবল রাস্তার আলোকস্তম্ভগুলি অসহায় ভাবে দাঁড়াইয়া ধারাস্নান করিতেছে।

গারাজে মোটর বন্ধ করিয়া সোমনাথ তাড়াতাড়ি বাড়ীর বারান্দায় আসিয়া উঠিল। বারান্দা অন্ধকার; জলের ছাট আসিয়া মেঝে ভিজাইয়া দিতেছে। সদর দরজার তালা বন্ধ ছিল; সোমনাথ পকেট হইতে চাবি বাহির করিয়া সন্তর্পণে দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল।

তালা খুলিয়া সে ঘরে প্রবেশ করিতে যাইবে এমন সময় স্ত্রীকণ্ঠের আওয়াজ আসিল,—'সোমনাথবাবু !'

সোমনাথ চমকিয়া উঠিল। এতক্ষণে তাহার চক্ষু অন্ধকারে অভ্যস্ত হইয়াছিল ; রাস্তা হইতে আলোর একটা ক্ষীণ আভাও আসিতেছিল। সোমনাথ চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া দেখিল, দ্বারের অনতিদূরে বারান্দার দেয়াল ঘেঁষিয়া একটি স্ত্রীলোক সুটকেসের উপর বসিয়া আছে। তাহার পাশে বর্ষাতি হোল্‌ড্‌ অলের মতো একটা কিছু পড়িয়া রহিয়াছে।

সোমনাথ শঙ্কিত কণ্ঠে বলিল—'কে ?'

স্ত্রী মূর্তি উঠিয়া দাঁড়াইল—'আমি রত্না।'

মুহূর্তের জন্য সোমনাথের মাথাটা একেবারে খালি হইয়া গেল, তাহার মুখ দিয়া কেবল বাহির হইল—'রত্না !'

অন্ধকারে রত্নার মুখ দেখা গেল না, কিন্তু তাহার কণ্ঠের তীক্ষ্ণ অধীরতা গোপন রহিল না—'হ্যাঁ। ব্যাপার কি ? দাদা—বৌদি কোথায় ?'

সোমনাথের মস্তিষ্ক আবার ইঞ্জিনের বেগে কাজ করিতে আরম্ভ করিল। সে দ্বার ঠেলিয়া ভিতরে ঢুকিয়া তাড়াতাড়ি কয়েকটা সুইচ টিপিয়া ঘরের ও বারান্দার আলো জ্বালিয়া দিল। তারপর আবার বারান্দায় বাহির হইয়া আসিল।

রত্নার কাপড় চোপড় বৃষ্টির ছাটে ভিজিয়া গিয়াছে ; কিন্তু তাহার মুখ কঠিন, চোখের দৃষ্টিতে শুষ্ক বিরক্তি। ক্ষিপ্র চক্ষে একবার সোমনাথের আপাদ মস্তক দেখিয়া লইয়া সে বলিল,—'দাদা বৌদি কোথায় ?'

সোমনাথ দুই হাতে রত্নার সুটকেস ও বিছানা তুলিয়া লইয়া বলিল,—'বলছি, আগে ভেতরে এস ! একেবারে ভিজে গেছ যে। কতক্ষণ এসে বসে আছো ?

উভয়ে ঘরে প্রবেশ করিল। রত্না বলিল, তিনটের সময় ট্রেন এসেছে ; বাড়ী পৌঁছুতে চারটে বেজেছে। তারপর থেকেই বসে আছি।'

'কি সর্বনাশ ! তিন ঘণ্টা বাইরে বসে আছ ?'—সোমনাথ লটবহর এক পাশে নামাইয়া রাখিল।

'হ্যাঁ। কিন্তু দাদা বৌদি কি বোম্বায়ে নেই ?'

'জামাইবাবু আজ দশ দিন হল পুণায় বদলি হয়ে গেছেন। কেন, তোমরা খবর পাওনি ?'

রত্না কিছুক্ষণ উৎকণ্ঠা ভরা চোখে সোমনাথের মুখের পানে চাহিয়া রহিল, তারপর আস্তে আস্তে বলিল,—'না আমি খবর পাইনি। আমি কলকাতায় ছিলাম না, এলাহাবাদে এক বন্ধুর কাছে বেড়াতে এসেছিলাম। সেখান থেকে আসছি।—তাহলে এখন তুমি একা বাড়ীতে আছো ?'

সোমনাথ বলিল,—'হ্যাঁ।'

মুহূর্তেক চিন্তা করিয়া রত্না মুখ তুলিল,—'বাড়ীতে চাকর-বাকরও কি নেই ?'

সোমনাথ বলিল,—'চাকর বাকর ? হ্যাঁ আছে বৈকি। একটা চাকর আর বামুন আছে। আমি সকাল বেলাই বেরিয়ে যাই, তারাও খেয়ে দেয়ে দুপুর বেলা বেরোয়। কিন্তু সন্ধ্যের আগেই ফিরে আসে। আজ কি জানি এখনও ফেরেনি। ও:—মনে পড়েছে—'

'কী ?'

'আজ সকালে ওরা দু'জনে যোগেশ্বরীর গুহা দেখতে যাবে বলে ছুটি চেয়েছিল, সেখানে নাকি কোন্ সাধু এসেছেন। যোগেশ্বরী বেশী দূর নয়, কিন্তু ট্রেনে যেতে হয়। হয় তো ঝড় বাদলে আটকে পড়েছে।'

'বেশ যা হোক। এখন আমি কি করি ?' বলিয়া রত্না একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িল।

সোমনাথ একটু ইতস্তত করিয়া বলিল,—'আপাতত ভিজে কাপড় চোপড়গুলো ছেড়ে ফেলতে পারো।'

বিরক্তি-কণ্টকিত কণ্ঠে রত্না বলিল,—'তা যেন পারি। কিন্তু আজ রাত্রে আমি থাকব কোথায় ?'

সোমনাথ কিছুক্ষণ রত্নার পানে চাহিয়া রহিল, তারপর প্রশ্ন করিল—'এ বাড়ীতে থাকা কি চলবে না ?'

রত্না উত্তর দিল না, গালে হাত দিয়া বসিয়া রহিল। এমন মুস্কিলে সে জীবনে পড়ে নাই।

সদর দরজাটা এতক্ষণ খোলাই ছিল, হাওয়ার দাপটে কপাট দুটা বারবার আছাড় খাইতেছিল। সোমনাথ গিয়া কপাট বন্ধ করিয়া দিল। সে ফিরিয়া আসিয়া দাঁড়াইলে রত্না মুখ তুলিল—'আজ রাত্রে পুণার ট্রেন পাওয়া যায় না ? পুণা তো কাছেই।'

সোমনাথ ধীরে ধীরে একটা চেয়ারে বসিল, নীরস কণ্ঠে বলিল,—'পুণা এখান থেকে একশো কুড়ি মাইল। ট্রেন যদি বা পাওয়া যায়, পৌঁছুতে রাত দুপুর হবে। জামাইবাবুর ঠিকানা তোমায় দিতে পারি, কিন্তু এই ঝড়ের রাত্রে বাড়ী খুঁজে পাবে কিনা সন্দেহ। ষ্টেশনের ওয়েটিং রুমে রাত কাটাতে হবে। তোমার যদি তাতেই সুবিধে হয়—'

রত্না নিশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল,—'কাল সকালেই যাব তা হলে। কি শুভক্ষণে বোম্বাইয়ে পা দিয়েছিলাম।' বলিয়া নিজের সুটকেসটা তুলিয়া লইয়া স্নানঘরের অভিমুখে চলিয়া গেল।

সোমনাথ আরও কিছুক্ষণ বসিয়া রহিল। তারপর সেও একটা নিশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া পড়িল। বাড়ীতে অতিথি, চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না।

আজ বারান্দায় রত্নাকে চিনিতে পারিয়া ক্ষণকালের জন্য সোমনাথের মস্তিষ্কের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছিল ; তারপর বাঁধ-ভাঙা স্রোতের মতো তাহার মনের মধ্যে অহেতুক আনন্দের বন্যা বহিয়া গিয়াছিল। কিন্তু তাহাও ক্ষণকালের জন্য। রত্নার মুখের ভাব ও তাহার কথা বলার ভঙ্গী তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছিল যে সোমনাথ রত্নার দাদার শ্যালক এবং রত্না সোমনাথের দিদির ননদ ; ইহার অধিক সম্পর্ক তাহাদের মধ্যে নাই। মাঝে একটা নূতন সম্পর্কের সূত্রপাত হইয়াছিল বটে, কিন্তু রত্না তাহা এতই রূঢ়ভাবে ভাঙিয়া দিয়াছে যে তাহা স্মরণ করিতেও মন সঙ্কুচিত হয়। এরূপ অবস্থায়, কেবল লৌকিক ভদ্রতাটুকু বজায় রাখিয়া

হইয়া যে বিচিত্র পরিস্থিতির উদ্ভব করিয়াছে তাহা যথাসম্ভব সহজ ও মামুলি করিয়া আনাই সোমনাথের কর্তব্য। অতীত প্রত্যাখ্যানের কাঁটা বুকের মধ্যে খচ্ খচ্ করে করুক, বাহিরে কিছু প্রকাশ করা চলিবে না।

৬

আধ ঘণ্টা পরে বস্ত্রাদি পরিবর্তন করিয়া, রত্না স্নানঘর হইতে বাহির হইয়া দেখিল টেবিলের উপর এক পট্ চা এবং প্লেটের উপর রাশীকৃত পাঁউরুটি ও মাখন রহিয়াছে। রত্না একটু বিস্মিত হইয়া বলিল,—'এ কি, চাকর বামুন ফিরে এসেছে নাকি?'

সোমনাথ বলিল,—'না। কিন্তু তাদের ভরসায় থাকলে আজ আর কিছু জুটবে না। তোমার নিশ্চয় খুব খিদে পেয়েছে। নাও, আরম্ভ করে দাও।' বলিয়া পেয়ালায় চা ঢালিতে প্রবৃত্ত হইল।

রত্নার মুখে একটু হাসি ফুটিল।

'তুমি আজকাল ঘরকন্নার কাজ খুব শিখেছ দেখছি।'

সোমনাথ চায়ের পেয়ালা তাহাকে দিয়া হঠাৎ গর্বের সহিত বলিল,—'ঘরকন্নার কাজ আমি অনেক দিন থেকে জানি। খেয়ে ভাখো চা ঠিক হয়েছে কিনা।'

রত্না পেয়ালার প্রান্তে একবার ঠোঁট ঠেকাইয়া বলিল,—'মন্দ হয় নি।' তাহার স্বর নিরুৎসুক।

দু'জনেরই বিলক্ষণ পেট জ্বলিতেছিল, সেই দুপুর বেলার পর আর কিছু পেটে পড়ে নাই। অধিক বাক্যব্যয় না করিয়া উভয়ে চা ও মাখন-পাঁউরুটিতে মনোনিবেশ করিল। ক্ষুন্নিবৃত্তির ফাঁকে ফাঁকে দু'একটা কথা হইতে লাগিল—

'কলকাতার খবর কি?'

'ভালই।'

'তুমি কোন্ কলেজে ভর্তি হলে?'

'ভর্তি হইনি। তোমার কেমন চলছে?'

'মন্দ নয়। চন্দনাদের কোম্পানী ছেড়ে দিয়েছি, শুনেছ বোধহয়।'

'না—শুনিনি। এখন কোথায় কাজ করছ?'

'এখন নিজে ছবি তৈরি করছি।'

'ও!'......

'আর চা নেবে? এখনও অনেকখানি আছে।'

'দাও।'

বাহিরে ঝড়বৃষ্টির মাতামাতি ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে; কিন্তু ঘরের ভিতরটি শান্ত, কোনও চাঞ্চল্য নাই। দুইটি উদাসীন যুবক-যুবতী চা পান করিতেছে ও ছাড়া ছাড়া গল্প করিতেছে। তাহারা যেন এরোপ্লেনে চড়িয়া চলিয়াছে, বাহিরের প্রচণ্ড গতিবেগ ভিতরে অনুভব করা যায় না। যাত্রীদের মনে হয় তাহারা নিশ্চল হইয়া বসিয়া আছে।

'লেখাপড়া কি ছেড়ে দিলে?'

'না। এবার কলেজে যায়গা পেলাম না।'

'ও—তাই! তোমার স্বাস্থ্য তো ভালই দেখছি।'

'হ্যাঁ। খাটলে-খুটলে শরীর ভাল থাকে।'

'সত্যি। তার ওপর যদি মনের মতো কাজ হয়—'

সোমনাথ একটু ফিকা হাসিল। কাজ মনের মতো কিনা এ কথা লইয়া তর্ক করিয়া লাভ নাই।

চায়ের পর্ব শেষ হইলে রত্না বলিল—'এখনকার মতো তো হল। কিন্তু রাত্তিরের কি ব্যবস্থা হবে?'

সোমনাথ বলিল,—'সে তুমি ভেবো না। সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'ঠিক হবে কি করে? বামুনের তো দেখা নেই।'

'তা হোক, হয়ে যাবে।'

রত্না ভ্রূ তুলিল। 'তুমি রাঁধবে নাকি?'

'আমি কি রাঁধতে জানি না? খুব ভাল রাঁধতে জানি। খেয়ে দেখলে বুঝবে।'

'দরকার নেই আমার। বোম্বাই এসে অবধি অনেক দুর্গতি হয়েছে, তার ওপর তোমার রান্না সহ্য হবে না।' বলিয়া রত্না ভাঁড়ার ঘর তদারক করিতে গেল।

সোমনাথ ক্ষুণ্ণভাবে সিগারেট ধরাইল। কিছুক্ষণ পরে রত্না ফিরিয়া আসিয়া বলিল—'খিচুড়ি আর ডিম ভাজা ছাড়া আর কিছু হবে না। শুধু চাল ডাল আর ডিম আছে।'

সোমনাথ বলিল,—'আমার ভাঁড়ারের দৈন্য দেখে লজ্জা পেলাম। অবশ্য খিচুড়ি আর ডিম ভাজা আমার পক্ষে যথেষ্ট। তোমারই কষ্ট হবে।'

রত্না বলিল,—'তা হোক। আমি কিছু মনে করব না।'

'সে তোমার মহত্ব। কিন্তু রান্নাটা আমি করলেই ভাল হত। ভেবে ভাখো তুমি আমার অতিথি। তুমি রাঁধবে আর আমি খাব—এ যে বড় লজ্জার কথা।'

'আমি কাউকে বলব না।'

সোমনাথ বসিয়া রহিল; রত্না আঁচলটা গাছ-কোমর করিয়া কোমরে জড়াইয়া রান্নাঘরে চলিয়া গেল।

উনান ধরানোর কোনও হাঙ্গামা ছিল না, রান্নাঘরে গ্যাসের উনান। রত্না ক্ষিপ্রহস্তে যোগাড়যন্ত্র করিয়া রান্না চড়াইয়া দিল।

রাত্রি দশটার সময় বসিবার ঘরের একটা সোফায় যথাসম্ভব লম্বা হইয়া শুইয়া সোমনাথ মুদিত চক্ষে ঝড়ের শব্দ শুনিতেছিল। বাহিরে বাতাসের মত্ততা বাড়িয়াই চলিয়াছে; মাঝে মাঝে তাহার উদ্দাম পাকসাটে বাড়ীখানা মড়্ মড়্ করিয়া উঠিতেছে। পশ্চিম দিক হইতে একটা গভীর একটানা গর্জন বাড়ীর বন্ধ দরজা জানলা ভেদ করিয়া কানে আসিতেছে—

রত্না আসিয়া কাছে দাঁড়াইল।

'বাঃ বেশ মানুষ! ঘুমিয়ে পড়লে নাকি?'

সোমনাথ উঠিয়া বসিল।

'ঘুমোই নি। চোখ বুজে ঝড়ের মনের কথাটা শোনবার চেষ্টা করছিলাম।'

রত্নার চোখে বিদ্রূপ খেলিয়া গেল—'তাই নাকি? তা কী শুনলে?'

'এলোমেলো কথা, ভাল বুঝতে পারলাম না।'

'তাহলে এবার খাবে চল। খাবার তৈরি।'

দু'জনে গিয়া খাইতে বসিল। তপ্ত খিচুড়ির ঘ্রাণ নাকে যাইতেই সোমনাথের মন তৃপ্তিতে ভরিয়া উঠিল। কিন্তু সে তৃপ্তির ভাব গোপন করিয়া বিচারকের ভঙ্গীতে চামচের আগায় একটু খিচুড়ি তুলিয়া মুখে দিল।

রত্না জিজ্ঞাসা করিল,—'কেমন হয়েছে খিচুড়ি?'

সোমনাথের এবার জবাব দিবার পালা, তাহার অধরে একটি চকিত হাসি খেলিয়া গেল। সে আর এক চামচ খিচুড়ি মুখে দিয়া গম্ভীরভাবে বিবেচনাপূর্বক বলিল,—'মন্দ হয়নি।'

রত্না চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া চাহিল, তারপর হাসিয়া ফেলিল। তাহারই মুখের কথা এতক্ষণ পরে তাহার কাছে ফিরিয়া আসিয়াছে।

কিছুক্ষণ নীরবে আহার চলিল। সোমনাথ ভাবিতে লাগিল—রত্না এত ভাল রাঁধিতে শিখিল কেমন করিয়া? আজকালকার মেয়েরা তো লেখাপড়া লইয়া থাকে কিম্বা সিনেমা দেখে, রান্নাঘরের খোঁজ রাখে না। রত্না কোন ফাঁকে এমন রাঁধিতে শিখিল? অথবা মেয়েদের হাতে কোনও সহজাত ইন্দ্রজাল আছে, তাহারা স্পর্শ করিলেই অন্ন-ব্যঞ্জন সুস্বাদু হইয়া ওঠে? অথবা সোমনাথ দীর্ঘকাল ধরিয়া বামুন ঠাকুরের রান্না গলাধঃকরণ করিতেছে তাই আজ রত্নার নিরেস রান্নাও তাহার সরস মনে হইতেছে? কিম্বা—

'ঝড় আর কতক্ষণ চলবে?'

'ঠিক বলতে পারি না। শুনেছি পাঁচ-ছয় ঘণ্টার বেশী থাকে না।'

'ওটা কিসের শব্দ হচ্ছে—ঐ যে গোঁ গোঁ শব্দ?'

'ওটা সমুদ্রের গর্জন।'

'ও—' রত্না সোমনাথের পানে একটা তির্যক কটাক্ষপাত করিল—'তা—সমুদ্রের মনের কথা কিছু শুনতে পাচ্ছ নাকি?'

'পাচ্ছি।'

'সত্যি? কি শুনলে?'

সোমনাথ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল,—'রাগ আর ভালবাসা—ভালবাসা আর রাগ।'

ক্ষণেকের জন্য দু'জনের চোখে চোখে বিদ্যুৎ বিনিময় হইয়া গেল, তারপর দু'জনেই চক্ষু সরাইয়া লইল।

আহারান্তে বসিবার ঘরে আসিয়া সোমনাথ বলিল,—'তোমার জন্যে ওবেক শোবার ঘরে বিছানা পেতে দিয়েছি।'

রত্না চোখ মেলিয়া সোমনাথের মুখের পানে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল, তারপর ভ্রূকুটি করিল।

'তোমার বিছানা পাতবার দরকার ছিল না। আমি নিজেই পেতে নিতে পারতাম।'

সোমনাথ বলিল,—'তা পারতে জানি। কিন্তু আমারও তো কিছু করা চাই। যাহোক, সাড়ে দশটা বেজে গেছে, তুমি শুয়ে পড় গিয়ে। একে ট্রেনের ক্লান্তি, তার ওপরে রান্নার পরিশ্রম—'

রত্না আর কোনও কথা না বলিয়া শয়নকক্ষে গিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল। খাটের উপর বিছানা পাতা বিছানার পদপ্রান্তে একটি গায়ের চাদর সযত্নে পাট করা। রত্নার হোল্ড্-অলে একজোড়া বেড্-রুম স্লিপার ছিল, সে দুটি খাটের নীচে রাখা রহিয়াছে।

রত্না কিয়ৎকাল শয্যার পানে চাহিয়া রহিল, তারপর উষ্ণ-অধীর একটি নিশ্বাস ফেলিয়া ঘরময় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। বাহিরে সমুদ্রের রাগ-মিশ্রিত ভালবাসার দুরন্ত আক্‌সানি কিছুতেই শান্ত হইতেছে না—বাড়ীখানা থাকিয়া থাকিয়া শিহরিয়া উঠিতেছে—

ক্লান্ত হইয়া অবশেষে রত্না আলো নিভাইয়া শুইতে গেল। কিন্তু ঘর বড় অন্ধকার, অন্ধকারে বাহিরের শব্দগুলা যেন আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল। রত্না ফিরিয়া আসিয়া আবার আলো জ্বালিল, তারপর আলো জ্বালিয়া রাখিয়াই চাদর গায়ে দিয়া শুইয়া পড়িল।

সোমনাথও নিজের ঘরে আলো নিভাইয়া শুইয়া পড়িয়াছিল। বিছানাটি ভারি ঠাণ্ডা, একটা গায়ের কাপড় হইলে ভাল হইত। কিন্তু নিজের গায়ের কাপড়টি সে রত্নাকে দান করিয়াছে। যাহোক, যদি নিতান্তই প্রয়োজন হয়, বিছানার চাদর টানিয়া গায়ে দিলেই চলিবে।

রত্না না মনে করে—সোমনাথের কাছে সে অনাদৃতা হইয়াছে। সোমনাথ কোনও অবস্থাতেই রত্নাকে অনাদর করিতে পারিবে না। কিন্তু রত্না আসিয়া পর্যন্ত বারবার তাহাকে আঘাত করিতেছে কেন? পূর্বে যাহা ঘটিয়াছিল—এক সন্ধ্যের বর-বধূ অভিনয়—তাহার জন্য তো সোমনাথ দায়ী নয়। আর বর্তমানে জামাইবাবু পুণায় বদলি হইয়াছেন, ইহার জন্যই বা তাহাকে কি প্রকারে দোষী করা যাইতে পারে? কিন্তু সে যা-ই হোক, রত্না যে এই রাত্রে ইষ্টিশানে গিয়া বসিয়া থাকে নাই, সে যে এই শূন্য বাড়ীতে তাহার সহিত একাকী রাত্রি কাটাইতে সম্মত হইয়াছে ইহাই ভাগ্য বলিতে হইবে।

আজিকার রাত্রিটা সোমনাথের সুখের রাত্রি, না দুঃখের রাত্রি? ঝড়ের ঝাপ্‌টায় বাসা-ছাড়া পাখী যেমন অন্ধভাবে উড়িয়া আসিয়া ঘরের মধ্যে আশ্রয় লয়, রত্না তেমনি তাহার গৃহে আশ্রয় লইয়াছে; আবার কাল সকালে ভোরের আলো ফুটিতে না ফুটিতে উড়িয়া চলিয়া যাইবে। কিন্তু তবু, সুখের হোক বা দুঃখের হোক, আজিকার রাত্রিটা সোমনাথের চিরদিন মনে থাকিবে। রত্না যখন পরের ঘরণী হইয়া বহু দূরে চলিয়া যাইবে, আর তাহাকে বিরক্তভাবেও স্মরণ করিবে না, তখনও আজিকার রাত্রিটি সোমনাথের মনে জাগিয়া থাকিবে।

রাত্রি তখন একটা কি দেড়টা।

সোমনাথ ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, চমকিয়া ঘুম ভাঙিয়া গেল। অন্ধকার বিছানায় উঠিয়া বসিয়া সোমনাথ অনুভব করিল, চারিদিকে ভীষণ খট্‌খট্ ঝন্‌ঝন্ শব্দ হইতেছে; যেন একদল ডাকাত যুগপৎ বাড়ীর দরজা জানালাগুলোকে আক্রমণ করিয়া ভাঙিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে।

ঘুমের মধ্যে এই শব্দগুলা সে অনেকক্ষণ ধরিয়া শুনিতেছিল, সুতরাং তাহার ঘুম ভাঙার কারণ এই শব্দগুলা নয়। সোমনাথ কান পাতিয়া শুনিল, ঝড়ের শব্দের সহিত মিশিয়া আর একটা শব্দ হইতেছে—কেহ তাহার দরজায় ধাক্কা দিতেছে; ইহা ঝড়ের ধাক্কা নয়, মানুষের হাতের ধাক্কা।

এক লাফে বিছানা হইতে নামিয়া অন্ধকারেই সে দরজা খুলিয়া দিল।

'রত্না?'

জলে অনেকক্ষণ ডুবিয়া থাকিবার পর মাথা জাগাইয়া মানুষ যেমন হাঁপাইয়া নিঃশ্বাস টানে তেমনি ভাবে হাঁপাইয়া রত্না বলিল,—'হাঁ। আলো নিভে গেছে।'

'আলো নিভে গেছে?'

দ্বারের পাশেই আলোর সুইচ। সোমনাথ হাত বাড়াইয়া সুইচ টিপিল, কিন্তু আলো জ্বলিল না। সে বলিল,—'ইলেকট্রিক তার ছিঁড়ে গেছে।'

রত্নার ক্ষীণ কণ্ঠস্বর শোনা গেল,—'কী হবে? বাড়ী কি ভেঙে পড়বে?'

'না না, তুমি ভয় পেয়ো না। সাইক্লোনে বাড়ী ভাঙতে পারে না। রাস্তায় কোথাও গাছের ডাল ভেঙে ইলেকট্রিকের তার ছিঁড়ে দিয়েছে, তাই আলো নিভে গেছে।'

রত্না বলিল,—'তুমি কোথায়? কিছু দেখতে পাচ্ছি না।'

অন্ধকারে হাত বাড়াইয়া দু'জনে কিছুক্ষণ হাতড়াইল; তারপর হাতে হাত ঠেকিল। সোমনাথ হাত ধরিয়া রত্নাকে ঘরের ভিতরে আনিল। রত্না কতকটা যেন নিজ মনেই ভাঙা ভাঙা গলায় বলিল,—'আলো জ্বেলে ঘুমিয়েছিলাম, হঠাৎ চারদিকে মড়্‌মড়্ শব্দে ঘুম ভেঙে গেল—দেখি আলো নিভে গেছে—'

সোমনাথ অনুভব করিল রত্নার হাত বরফের মতো ঠাণ্ডা, অল্প অল্প কাঁপিতেছে। সে সাহস দিয়া বলিল,—'হঠাৎ অন্ধকারে ঘুম ভেঙেছে বলে ভয় পেয়েছ, নৈলে ভয়ের কিছু নেই। এবার আস্তে আস্তে ঝড়ের বেগ কমবে।'

'যদি বাড়ে?'

'আর বাড়তে পারে না।—তুমি দাঁড়াও, আমি দেশলাই আনি। আমার জামার পকেটেই আছে।'

অনিচ্ছা ভরে রত্না হাত ছাড়িয়া দিল। সোমনাথ শয়নের পূর্বে গায়ের জামা খুলিয়া আলনায় টাঙাইয়া রাখিয়াছিল, এখন ঠাহর করিয়া গিয়া জামাটা পাইয়া পরিয়া ফেলিল। তারপর পকেট হইতে দেশলাই বাহির করিয়া জ্বালিল।

অমনি রত্না ছুটিয়া আসিয়া তাহার কাছে দাঁড়াইল। দেশলায়ের আলোতে রত্নাকে দেখিয়া সোমনাথের বুকের ভিতরটা চমকিয়া উঠিল। তাহার চক্ষুদুটি বিস্ফারিত, মুখে রক্তের লেশমাত্র নাই; গায়ে বিস্রস্ত বসনের উপর চাদরটা কোনও মতে জড়ানো। এ রত্না যেন তাহার পরিচিত আত্মপ্রতিষ্ঠ অচপল রত্না নয়; প্রকৃতির ভয়ঙ্কর প্রলয় মূর্তির সম্মুখে একান্ত অসহায় এক মানবী। প্রকৃতির বিরাট শক্তি দেখিয়া মানুষ কেবল ভীতই হয়না, নিজের অকিঞ্চিৎকর ক্ষুদ্রতাও অনুভব করে। তখন তাহার সঙ্কুচিত সত্তার অঙ্গ হইতে দর্পের আভরণও খসিয়া পড়িয়া যায়।

সোমনাথের ইচ্ছা হইল রত্নাকে ভীত শিশুর মতো বুকে জড়াইয়া সান্ত্বনা দান করে। কিন্তু সে ইচ্ছা দমন করিয়া সে একটু আশ্বাসজনক হাসি হাসিবার চেষ্টা করিল।

'অন্য সময় মনে হয়না যে দেশলায়ের কাঠিতে এত আলো হয়। কাঠি কিন্তু বেশী নেই—'

'অ্যাঁ! কি হবে তাহলে?' বলিতে বলিতে কাঠি নিভিয়া গেল।

দ্বিতীয় কাঠি জ্বালিয়া সোমনাথ বলিল—'তুমি এখানে এসে বোসো'—বলিয়া তাহার হাত ধরিয়া আনিয়া খাটের উপর বসাইয়া দিল।

'মোমবাতি নেই?'

'যতদূর জানি নেই। তবে মনে হচ্চে একটা টর্চ আছে। তুমি যদি একটু একলা থাকো, আমি খুঁজে দেখতে পারি; বোধহয় ছিদ্দির ঘরে আছে।'

শঙ্কর বিলম্বিতকণ্ঠে রত্না বলিল,—'আচ্ছা—বেশী দেরী কোরো না।'

কয়েক মিনিট রত্না অন্ধকারে শক্ত হইয়া বসিয়া রহিল, তারপর সোমনাথের ফিরিয়া আসার পদশব্দ শুনিতে পাইল।

'পেলে?'

উত্তরে সোমনাথ দপ্ করিয়া রত্নার মুখের উপর টর্চ জ্বালিয়া ধরিল। টর্চের আলো খুব উজ্জ্বল, প্রায় সাধারণ বিদ্যুৎ-বাতির সমান। সোমনাথ হাসিয়া বলিল,—'এই নাও আলো। আর ভয় করছে না তো?'

রত্না আলোর দিক হইতে চোখ সরাইয়া লইয়া একবার ঘরের চারিদিকে তাকাইল। টর্চের ছটায় বাহিরেও ঘরটি আলোকিত হইয়াছে। রত্নার অধরোষ্ঠ একবার কাঁপিয়া উঠিল, সে অবরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল,—'না, ভয় আর করছে না—তবে—'

'তবে?' বলিয়া জ্বলন্ত টর্চটি শয্যার ওপর রাখিয়া সোমনাথ একপাশে বসিল।

রত্না একবার তাহার পানে তাকাইল, তারপর হঠাৎ বিছানায় উপুড় হইয়া পড়িয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

প্রাথমিক বিপর্যয় সম্বন্ধে সোমনাথের কোনও অভিজ্ঞতা ছিল না। কিন্তু সে বুঝিল, ইহা ভয়ের কান্না নয়, ভয়-ত্রাণের কান্না। হয়তো, সেই সঙ্গে নিবিড়তর কোনও মনস্তত্ত্ব মিশিয়াছিল, হয়তো লজ্জা বা পশ্চাত্তাপের আগুনে হৃদয়ের অবরুদ্ধ বাষ্প উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু তাহা নির্ণয় করিবার মতো বিশ্লেষণী শক্তি সোমনাথের ছিল না। তাহার হৃদয় স্নেহে ও করুণায় বিগলিত হইয়া গেল। সে রত্নার পিঠের উপর হাত রাখিয়া ডাকিল,—'রত্না—কেঁদোনা লক্ষ্মীটি—রত্না—'

রত্নার কান্না কিন্তু থামিল না।

মিনিট পনেরো পরে রত্নার ফোঁপানি যখন অনেকটা শান্ত হইয়া আসিয়াছে তখন সোমনাথ হঠাৎ উত্তেজিত ভাবে বলিয়া উঠিল,—'রত্না, এস এক কাজ করা যাক।'

রত্না চোখ মুছিয়া উঠিয়া বসিল। চোখের জলে ভিজিয়া মুখখানি আরও নরম হইয়াছে, সে ভাঙা গলায় জিজ্ঞাসা করিল,—'কী?'

সোমনাথ বলিল,—'এস চা তৈরি করে খাওয়া যাক। ভারি মজা হবে কিন্তু। খাবে?'

রত্না ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল। সোমনাথ খাট হইতে নামিয়া বলিল—'আচ্ছা তুমি খাটে বোসো আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যে চা তৈরি করে আনছি।'

রত্নাও খাট হইতে নামিল।

'না, আমি চা তৈরি করব।'

'বেশ, দু'জনেই তৈরি করি গে চল। একলা ঘরে বসে থাকার চেয়ে সে বরং ভাল হবে।'

দু'জনে রান্নাঘরে গিয়া চা-কেটলিতে চা তৈয়ার করিল, তারপর চায়ের বাটি হাতে আবার খাটে আসিয়া বসিল।

সোমনাথ এক চুমুক চা খাইয়া হর্ষধ্বনি করিয়া উঠিল,—'বাঃ, কি চমৎকার চা হয়েছে। তোমার ভাল লাগছে না?'

রত্না মৃদুস্বরে বলিল,—'খুব ভাল লাগছে।'

প্রতি চুমুকের সঙ্গে চায়ের অমৃত মাধুর্য তাহাদের স্নায়ুশিরায় সঞ্চারিত হইতে লাগিল।

সোমনাথ ভারি উৎসাহ অনুভব করিতে লাগিল। সে উঠিয়া টর্চটাকে খাটের ছত্রিতে ঝুলাইয়া দিল, টর্চের আলো শূন্য হইতে চন্দ্র কিরণের মতো শয্যার উপর ছড়াইয়া পড়িল।

রত্নার মুখখানি শান্ত। সে সহজ কণ্ঠে বলিল,—'তুমি চায়ের সঙ্গে সিগারেট খাও না?'

'খাই—চায়ের সঙ্গে সিগারেট জমে ভাল।'

'তবে খাচ্ছ না কেন?'

'খাবো?'

'খাও।'

সোমনাথের মনও মাধুর্যে ভরিয়া উঠিল। সে সিগারেট ধরাইল। চা খাওয়া শেষ হইলে রত্না খাটের শিয়রের দিকে গুটিসুটি হইয়া শুইয়া পড়িল। সোমনাথ বলিল,—'রত্না, শুনতে পাচ্ছ, ঝড়ের শব্দ ক্রমে কমে আসছে?'

রত্না বলিল,—'হুঁ।'

'এদিকে দুটো বেজে গেছে। দেখতে দেখতে ভোর হয়ে যাবে।'

রত্না চোখ বুজিয়া বলিল,—'হুঁ।'

'যাই বল, আজকের রাত্তিরটা মনে রাখবার মতো। মনে হচ্ছে যেন মস্ত একটা অ্যাডভেঞ্চার হয়ে গেল।—ঘুমিয়ে পড়লে নাকি?'

মুদিতচক্ষে রত্না বলিল,—'না, তুমি কথা বল আমি শুনি।'

সোমনাথ এতক্ষণ সহজ ভাবে কথা বলিতেছিল এখন আবার আত্মসচেতন হইয়া পড়িল। কথা বলিতে হইবে মনে হইলেই আর কথা যোগায় না। রত্নার শুনিতে ভাল লাগে এমন কী কথা সে বলিবে? রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করিবে? ওরে বিহঙ্গ ওরে বিহঙ্গ মোর, এখনি অন্ধ বন্ধ কোরো না পাখা? কিম্বা—শয়ন শিয়রে প্রদীপ নিভেছে সবে, জাগিয়া উঠেছি ভোরের কোকিল রবে? কিন্তু না, রত্নাকে কবিতা শোনানো বর্তমান ক্ষেত্রে উচিত হইবে না, রত্না এরূপ আচরণের কদর্থ করিতে পারে। তবে এখন সে কি কথা বলিবে?

একটা কথা বলা যাইতে পারে, রত্না নিশ্চয় কিছু মনে করিবে না। সোমনাথ মনে মনে একটু ভণিতা করিয়া লইয়া বলিল—'আমার প্রথম ছবিটা বাজারে বেরিয়েছে—বেশ নাম হয়েছে।'

রত্না নীরব রহিল। সোমনাথ তখন সাহস করিয়া বলিল,—'কলকাতাতেও ছবিটা চলছে। তুমি—তুমি দেখেছ নাকি?'

রত্না সাড়া দিল না। সোমনাথ উত্তরের জন্য কিয়ৎকাল অপেক্ষা করিয়া রত্নার মুখের দিকে ঝুঁকিয়া দেখিল, রত্নার চক্ষু পল্লব স্থির, শান্ত ভাবে নিশ্বাস পড়িতেছে। রত্না ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

সোমনাথ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, তারপর সন্তর্পণে বিছানা হইতে নামিল। ক্লান্ত হইয়া রত্না ঘুমাইয়াছে, তাহাকে জাগানো উচিত হইবে না। কিন্তু এ-ঘরে সোমনাথের থাকা কি ঠিক হইবে? বরং সে গিয়া রত্নার বিছানায় শুইয়া কোনও মতে রাত্রিটা কাটাইয়া দিবে।

কিন্তু দ্বার পর্যন্ত গিয়া সোমনাথ আবার ফিরিয়া আসিল। হঠাৎ ঘুম ভাঙিয়া রত্না যদি দেখে সোমনাথ নাই, সে হয়তো ভয় পাইবে—ঝড় কমিয়াছে বটে, কিন্তু থামে নাই—

সোমনাথ আবার সন্তর্পণে খাটের একপ্রান্তে উঠিয়া বসিল। রত্না নিশ্চিন্তভাবে ঘুমাইতেছে; তাহার একটি হাত গালের নীচে চাপা রহিয়াছে। সোমনাথ একবার সেইদিকে তাকাইল; তারপর বাহু দিয়া দুই হাঁটু জড়াইয়া লইয়া ঊর্ধ্বে আলোর দিকে চাহিয়া রহিল। এমনি ভাবে বসিয়াই সে বাকি রাতটা কাটাইয়া দিবে।

টর্চের ব্যাটারি দীর্ঘকাল জ্বলিয়া জ্বলিয়া নিস্তেজ হইয়া আসিতেছে। তাহারও চক্ষু যেন ঘুমে জড়াইয়া আসিতেছে—

পরদিন বেলা সাতটার সময় ঘুম ভাঙিয়া সোমনাথ ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দেখিল, রত্না কখন উঠিয়া গিয়াছে।

বাহিরে ঝড় স্তব্ধ হইয়াছে। বৃষ্টি পড়িতেছে না, আকাশ থমথম করিতেছে।

মুখ হাত ধুইয়া সোমনাথ যখন বসিবার ঘরে প্রবেশ করিল, তখন রত্না বাহিরে যাইবার সাজ পোষাক পরিয়া বসিয়া আছে। সে সোমনাথের মুখের পানে না তাকাইয়া বলিল—'আমি এখনি পুনা যাব।'

সোমনাথ নীরবে চাহিয়া রহিল। এ সেই পুরানো পরিচিত রত্না, কাল রাত্রে হঠাৎ যে-রত্নাকে দেখিয়াছিল সে-রত্না নয়। মুখের ডৌল দৃঢ় এবং নিঃসংশয়, কোথাও এতটুকু দুর্বলতার বহ্নিমাত্র নাই। এই রত্নাই কি তাহার বিছানায় শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল? কাল রাত্রে যে ঘটনাগুলি ঘটিয়াছিল তাহা কি সত্য, না স্বপ্নের মরীচিকা-বিভ্রম?

রত্না বলিল,—'টাইম টেব্‌ল্ দেখেছি, সাড়ে আটটার সময় একটা ট্রেণ আছে—'

সোমনাথ লক্ষ্য করিল, রত্না তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কথা বলিতেছে না; বোধ হয় চোখে চোখ মিলাইতে লজ্জা করিতেছে। কিন্তু লজ্জা করিবার কিছু আছে কি?

রত্না আবার বলিল—'আর দেরী করলে ট্রেণ পাবনা। একটা গাড়ী কি ট্যাক্সি—

সোমনাথ চোখের উপর দিয়া একবার হাত চালাইয়া বলিল,—'চল, আমি তোমাকে ষ্টেশনে পৌঁছে দিয়ে আসছি।'

মোটরে যাইতে যাইতে কেবল একবার কথা হইল; রত্না জিজ্ঞাসা করিল,—'এ মোটর কার?'

সোমনাথ কেবল বলিল,—'আমার।'

ট্রেণ ছাড়িবার আধ মিনিট আগে রত্না গাড়ীর জানালা হইতে মুখ বাড়াইয়া সোমনাথের জামার বুক-পকেটের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া বলিল—'তোমার আতিথ্যের জন্ম ধন্যবাদ।' বলিয়া ভিতর দিকে মুখ ফিরাইয়া বসিল।

কাল গভীর রাত্রে সোমনাথের অন্তর গহনে যে ভীরু ফুলটি সঙ্গোপনে ফুটিয়াছিল তাহা এতক্ষণে সম্পূর্ণ শুকাইয়া টুপ্ করিয়া ঝরিয়া পড়িল।

ট্রেণ চলিয়া গেল। আকাশে যে মেঘগুলা এতক্ষণ স্তম্ভিত হইয়াছিল, তাহারা আবার ধীরে ধীরে বর্ষণ সুরু করিল।

সোমনাথ ফিরিয়া গিয়া মোটরে ষ্টার্ট দিল; তারপর ক্লান্ত দেহমন লইয়া ষ্টুডিওর দিকে চলিল। আজও সারাদিন শুটিং আছে।

আধুনিক ব্যবহারে প্রাচীন সংজ্ঞার উপযোগ

অধ্যাপক শ্রীদুর্গামোহন ভট্টাচার্য

১। পরিসংখ্যান (Statistics)

এক ভাষার পারিভাষিক সংজ্ঞার সমগ্র আসয় অপর ভাষার শব্দ দিয়া প্রকাশ করা সহজ নয়। ইংরেজী Statisticsএর সম্পূর্ণ অর্থবোধক প্রতিশব্দ ভারতীয় ভাষায় দুর্ঘট। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে নবরচিত পরিভাষায় স্থিতি, সাংখ্যিকী, সমঙ্ক, সংখ্যাশাস্ত্র, লোকতথ্যবিদ্যা, রাশিতথ্য, রাশিবিজ্ঞান প্রভৃতি নাম প্রস্তাবিত হইয়াছে। দশ বৎসর পূর্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'পরিভাষাসমিতি' Statisticsএর সংজ্ঞা দিয়াছিলেন 'পরিসংখ্যান'। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'পরিভাষাসংসদ' নূতন পরিভাষায় এই সংজ্ঞাটি গ্রহণ করিয়াছেন।

পরিসংখ্যান শব্দের অক্ষরার্থ 'সর্বতোভাবে সম্যক্‌রূপে কথন' (পরি—সম্—খ্যা+অনট্)। সংস্কৃতগ্রন্থে গণনা করা—নির্দেশ করা, নিরূপণ করা এই সকল অর্থে শব্দটির প্রয়োগ আছে।

যাজ্ঞবল্ক্য-স্মৃতির (৩।১৫৮) টীকাকার অপরার্ক 'পরিসংখ্যানম্' পদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন 'সম্যঙ্‌নিরূপণম্'; অপর টীকাকার শূলপাণি অর্থ দিয়াছেন 'অনুসন্ধানম্'।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে (১০।২) 'পরিসংখ্যায়' (=পরিসংখ্যান করিয়া) কথাটি পাওয়া যায়। হস্ত্যশ্বাদি পশু এবং সৈন্যসামন্তাদি পরিজনসহ স্কন্ধাবারে যাত্রার পূর্বে রাজা পরিসংখ্যান করিয়া দেখিতেন—পথের গ্রাম ও অরণ্যে কতটা যবস (ঘাস) ইন্ধন ও উদক পাওয়া যাইবে। মহামহোপাধ্যায় ডক্টর শ্যামা শাস্ত্রী 'পরিসংখ্যায়' পদের অনুবাদ করিয়াছেন "having prepared a list", মহামহোপাধ্যায় গণপতি শাস্ত্রী টীকা করিয়াছেন 'ইয়ত্তয়া নির্ণীয়' অর্থাৎ 'বস্তুগুলি কি-পরিমাণ আছে তাহা নির্ণয় করিয়া'। Quantitative data" যদি Statistics হয়, তবে অর্থশাস্ত্রোক্ত এই 'পরিসংখ্যান' কতকটা Statistics সংগ্রহের মত কার্য বুঝিতে হইবে।

খৃষ্টীয় ১৭শ শতকে শিবাজী মহারাজের শাসনকার্যে ব্যবহারের জন্য 'রাজব্যবহারকোষ' নামে একখানি পরিভাষাগ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। তাহাতে ফারসী শুমার শব্দের প্রতিশব্দ আছে 'পরিসংখ্যা'—"শুমারং পরিসংখ্যা স্যাৎ" (৩৫৯ শ্লোক)। শুমার অর্থাৎ Census কার্যের সঙ্গে 'ষ্ট্যাটিষ্টিকস্' গ্রহণের খানিকটা মিল আছে, তাহা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই।

১৯৩১ সালে বরোদার রাজকার্যে প্রয়োগের জন্য 'শ্রীসয়াজীশাসন-

শব্দকল্পতরু' নামে এক শব্দকোষ সংকলিত হয়। ইঁহাতে প্রত্যেক ইংরেজী শব্দের সঙ্গে সংস্কৃত ও প্রাদেশিক ভাষায় নানারূপ প্রতিশব্দ প্রদত্ত হইয়াছে এবং তাহার মধ্য হইতে এক বা একাধিক শব্দ বরোদারাজ্যে ব্যবহারের জন্য নির্বাচিত হইয়াছে। এই কোষে Statistics শব্দের পাশে এইরূপ প্রতিশব্দ দেখা যায়—

Gujrati	Marathi	Sanskrit	Urdu	Persian
আংকড়া	আংকড়া	পরিসংখ্যানম্	তাদাদ	মসাল শনাসী
	সংখ্যানশাস্ত্র	সংখ্যাবিজ্ঞানম্		আদাদ
	গণতিশাস্ত্র	সংখ্যানশাস্ত্রম্		

দেখা যাইতেছে—পরিসংখ্যান শব্দ বহুদিন পূর্বে Statisticsএর প্রতিশব্দরূপে বরোদারাজ্যে গৃহীত হইয়াছে। শব্দার্থের বিশ্লেষণ আর প্রাচীন প্রয়োগের উদাহরণ উক্ত অর্থ সমর্থন করে তাহা পূর্বে দেখিয়াছি।

রাশি শব্দে পুঞ্জ, সমূহ, পরিমাণ ও সংখ্যা বুঝায়। শব্দটির এমন কোন বৈশিষ্ট্য নাই যাহাতে Statisticsএর সমগ্র অর্থ প্রকাশিত হইতে পারে। অর্থদ্যোতনায় পরিসংখ্যান অপেক্ষা রাশিবিজ্ঞান কোনক্রমেই উৎকৃষ্ট নয়। 'রাশিত্রয়ে'র অর্থ তিনটি সংখ্যা। 'রাশি-বিজ্ঞান' বলিলে Science of Number বুঝাইবে। সুতরাং ভারতীয় ভাষায় পরিসংখ্যান হইবে Statisticsএর যোগ্য প্রতিশব্দ।

ইংরেজী ভাষায় পরিসংখ্যান বিদ্যা (Science) ও পরিসংখ্যাত তথ্য (data) উভয়েরই নাম Statistics। আমাদের ভাষায় 'পরিসংখ্যান' ও 'পরিসংখ্যা' দুইটি পৃথক শব্দ ব্যবহার করিতে পারিব।

২। নিবন্ধন (Registration)

বাংলায় registration-এর কোন প্রতিশব্দ চলিত নাই। অনেক স্থলে বাংলা অক্ষরে রেজেষ্টারি বা রেজিষ্ট্রীকরণ লেখা হয়। উর্দুতে 'রজিষ্টারী' চলে। হিন্দী ভাষায় কিছুদিন যাবৎ 'পঞ্জীয়ন' চলিতেছে। পঞ্জী ও পঞ্জিকার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া এই নূতন শব্দটির প্রবর্তন করা হইয়াছে মনে হয়। কিন্তু পূর্বেও এদেশে নানা বিষয় খাতাপত্রে রেকর্ড বা রেজিষ্ট্রি করিয়া রাখার ব্যবস্থা ছিল।

ইংরেজী registration শব্দের অর্থ লিপিবদ্ধন। সংস্কৃত গ্রন্থে ও শিলালেখে এই অর্থে নিবন্ধন ও নি-পূর্বক বন্ধ ধাতু হইতে উৎপন্ন অপরাপর পদের প্রয়োগ আছে। গুজরাতী ও মরাঠী ভাষায় আজও নিবন্ধন শব্দের অপভ্রংশ রূপটি চলিত রহিয়াছে। 'শ্রীসয়াজী শাসন-শব্দকল্পতরু'র শব্দসারণীতে registration ও register শব্দের গুজরাতী প্রতিশব্দ আছে 'নোন্ধনী' ও 'নোন্ধ' এবং মারাঠী প্রতিশব্দ আছে 'নোন্দনী' ও 'নোন্দ'। এই সকল পদ 'নিবন্ধন' ও 'নিবন্ধ' শব্দের অপভ্রংশজ তাহাতে সন্দেহ নাই। ধাতুর অর্থ অনুসারে পত্রবদ্ধ লেখার নাম নিবন্ধ। নি-পূর্বক বন্ধ ধাতুর এক অর্থ গ্রন্থন, নিবেশন অর্থাৎ লিপিবদ্ধ করা, খাতাভুক্ত করা।

অর্থশাস্ত্রে (২।৭) কৌটিল্য উপদেশ দিয়াছেন—নিবন্ধপুস্তক রাখিবার স্থান সহ অক্ষপটল (দপ্তরখানা) নির্মাণ করিতে হইবে" (অক্ষপটলং ...নিবন্ধপুস্তকস্থানং কারয়েৎ) এবং প্রয়োজনীয় তথ্যসমূহ নিবন্ধপুস্তকে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে (নিবন্ধপুস্তকস্থং কারয়েৎ)। ডক্টর শ্যামা শাস্ত্রী শেষোক্ত বাক্যের অনুবাদ করিয়াছেন "shall be... entered in prescribed registers" (Arthasastra translated by R. Shamasastry, 3rd Edition, p. 62)।

Hindi	Bengali	Words	Word suggested
আংকড়া	সংখ্যানবিজ্ঞান	used	পরিসংখ্যান
পরিসংখ্যান		at present	সংখ্যান
		আংকড়া	আংকড়া

লেখন, পুস্তকে লেখন, পুস্তকে সমারোপণ প্রভৃতি অর্থে অর্থশাস্ত্রে বারংবার নিবন্ধ পদের প্রয়োগ আছে—

২.২—নিবন্ধেন বিদ্যুঃ (মঃ মঃ গণপতি শাস্ত্রীর শ্রীমূলা টীকা, ১ম খণ্ড, ১১৮ পৃঃ—গণনপুস্তকে সমারোপ্য তেন জানীয়ুঃ)।

২।৭—নিবন্ধেন প্রযচ্ছেৎ (শ্রীমূলা, ১খঃ, ১৪৫ পৃঃ—নিবন্ধপুস্তকে বিলিখ্য দদ্যাৎ)।

২।৭ } —"নিবন্ধক" (শ্রীমূলা, ১খঃ, ১৪৯ পৃঃ ; ২খঃ, ১৪৬ পৃঃ—
৪।৬ }
"লেখক")।

২।৮—নিবদ্ধম্ (শ্রীমূলা, ১খঃ, ১৫৪ পৃঃ—পুস্তকারোপিতম্)।

৩।১—নিবদ্ধম্ (শ্রীমূলা, ২খঃ, ৬ পৃঃ—পূর্বলিখিতম্)।

২।৩৫—নিবন্ধয়েৎ (শ্রীমূলা, ১খঃ, ৩৪৪ পৃঃ—লেখয়েৎ)।

২।৩৫—নিবন্ধান্ কারয়েৎ (শ্রীমূলা, ১খঃ, ৩৪৫ পৃঃ—পুস্তকেষু লেখয়েৎ)।

ইংরেজী registration শব্দের অর্থেই যে অর্থশাস্ত্রে নিবন্ধ পদ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা প্রদর্শিত প্রয়োগগুলি দ্বারা নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হয়।

উষবদাতের 'নাসিক-লিপি'র মধ্যে নগরের সভাগৃহে অবস্থিত 'নিবধ' বা নিবন্ধন-কার্যালয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়—"নিগমসভায় নিবধ চ ফলকবারে"। ফরাসী পণ্ডিত Senart এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকায় (Vol. VIII, p. 83) উদ্ধৃত বাক্যাংশের অনুবাদ করিয়াছেন "registered at the town's hall, at record office"। এই নাসিক লিপির আলোচনা প্রসঙ্গে Senart অনুমান করিয়াছিলেন যে, সম্ভবতঃ রাষ্ট্রের লেখ্যাগারে রক্ষিত একপ্রকার রাজকীয় শাসন-লেখের নাম ছিল নিবন্ধ—"nibandha was perhaps a kind of royal decision in the archives of the state"।

শ্রীযুত কে, গোপালাচারী তাঁহার Early History of the Andhra Country নামক গ্রন্থে (p. 88) 'নিবন্ধকার' শব্দের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন যে, নিবন্ধকারগণ ছিলেন লেখ্যসমূহের নিবন্ধন কার্যে আযুক্ত আধিকারিক—"officers in charge of registration of documents"।

আলোচিত প্রমাণ-প্রয়োগ হইতে জানা গেল—প্রাচীনকালে নিবদ্ধ, নিবন্ধ, নিবন্ধক, নিবন্ধকার ও নিবন্ধন শব্দে যথাক্রমে register, registered, registration officer ও registration বুঝাইত। গুজরাত ও মহারাষ্ট্রের প্রাদেশিক ভাষায় বর্তমান সময়েও নোন্ধনী, নোন্দনী, নোন্ধ, নোন্দ প্রভৃতি তদ্ভব শব্দের ব্যবহার আছে। সুতরাং registration-এর প্রতিশব্দরূপে নূতন পণ্ডীয়ন শব্দ অপেক্ষা প্রাচীন নিবন্ধন শব্দ অধিক উপযোগী হইবে।

একটি কথা উল্লেখ করিয়া বক্তব্য শেষ করিব। একই Registrar শব্দ ইংরেজী ভাষায় নানারূপ পদাধিকারীর নামে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। এ বিষয়ে ভারতীয় ভাষায় ইংরেজীর অনুকরণ না করিলেও চলিবে।

যিনি বিবাহে দম্পতির নাম ধাম খাতাভুক্ত করেন, সেই Registrar of Marriages এবং যিনি সম্পত্তির ক্রয়বিক্রয়ে দলিল লিপিবদ্ধ করেন, সেই Registrar of properties উভয়েই আমাদের ভাষায় হইবেন 'নিবন্ধক'। কিন্তু যিনি মহাকরণে মহাকরণে (secretariat) কোন এক বিভাগীয় করণের (office) উপর আধিপত্য করেন, সেই Registrar of the department হইবেন করণপাল, করণাধ্যক্ষ বা করণাধিপ। করণ শব্দের প্রাচীন অর্থ কার্যালয় এবং প্রাচীন কালে করণের প্রধান কর্মচারীকে করণাধিপ বলা হইত, সে সম্বন্ধে (প্রবাসী, আশ্বিন, ১৩৫৫) আলোচনা করিয়াছি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের Registrarকে লেখাসমূহের (records) রক্ষণ-ভার এবং করণসমূহের (offices) কর্তৃত্ব-ভার উভয়ই বহন করিতে হয়, সুতরাং তিনি নিবন্ধক বা করণাধিপ যে কোন নামে অভিহিত হইতে পারিবেন।

বড়বাবু

শ্রীক্ষেত্রগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ

প্রায় তিন বৎসর হইতে চলিল বৈকুণ্ঠবাবু রেলওয়ে থেকে রিটায়ার করিয়া এতদিন সপরিবারে কাশী বৃন্দাবন করিয়া বেড়াইতেছিলেন, আজ হঠাৎ বেলা সাড়ে দশটার গাড়ীতে ষ্টেশনে আসিয়া নামিলেন। শেষ জীবনে বছর পাঁচেকের জন্য বড়বাবু হইয়া তিনি এই ষ্টেশনে কাটাইয়া দিয়াছেন এবং এখান হইতে আর এক ষ্টেশন আগে নতুনগাঁয় চাকরী থাকিতে থাকিতে বাড়ী-ঘর তৈরী করিয়া ফেলিয়াছেন। বৈকুণ্ঠবাবু পূর্ব্ববঙ্গের লোক। পৈতৃক ভিটা ঢাকা জেলার কোন্ এক গ্রামে, তবুও তিনি সব ছাড়িয়া খুলনা জেলার এই অঞ্চলটায় বসবাস করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। চাকরী জীবনের শেষের পাঁচ বৎসর এখানে থাকিয়া স্থানটা তাঁর বড় ভাল লাগিয়াছিল, কেমন যেন এক মায়া পড়িয়া গিয়াছে এই তাল খেজুরের দেশটার প্রতি।

শ্রাবণের দুপুর। এ বৎসর বৃষ্টি হয় নাই বলিলেই চলে। ট্রেনে আসিতে আসিতে দু'ধারের মাঠের দিকে তাকাইয়া বৈকুণ্ঠবাবু লক্ষ্য করিয়াছেন, আমনের পাতায় সবুজ রং ধরে নাই, জমিতে যতটুকু জল দু'এক পশলা বর্ষায় জমিয়াছিল তাহাও শুকাইতে বসিয়াছে, রেললাইনের গায়ে ডোবা-নালা জলে টল্-টল্ করিতেছে না। বৈকুণ্ঠবাবু বৃদ্ধ মানুষ, হতশ্রী বাংলার রুগ্ন মূর্ত্তিতে তিনি ধ্যানস্থ হইয়া তাহারই পাণ্ডুলিপি আঁকিয়া শিল্পীর নিবিড় অনুভূতিতে শুধু অবাক হইয়া থাকেন না—দেশের আসন্ন সর্ব্বনাশা চেহারায় আতঙ্কিত হইয়া পড়েন। সেদিন মাত্র তিনি তীর্থভ্রমণ শেষ করিয়া আবার দেশে ফিরিয়াছেন, কিন্তু দেশের যে এত দুর্দ্দিন ঘনাইয়া আসিয়াছে কল্পনাও করিতে পারেন নাই।

মাথার উপর নীল আকাশ বিস্তৃত, জলভরা শরৎ মেঘের এতটুকু আনাগোনা নাই। চড়া শ্রাবণের রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে, প্ল্যাটফরমের আগাগোড়া ট্রেনের যাত্রী ছুটাছুটি করিতেছে, পরিচিত সেই তিন ব্যাটা খাবারওয়ালা পেটেন্ট গলায় চীৎকার ছাড়িতেছে—চাই, খাবা—র। শালপাতার তেমন আমদানি নাই, বিল থেকে সদ্য-তোলা পদ্মপাতায় খাবার পরিবেশন চলিতেছে। পাণিপাঁড়ে এক বালতি জলে মগটা ফেলিয়া জানলায় জানলায় ঘুরিতেছে, প্রসারিত বাটী-ঘটিতে জল ঢালিতেছে, আর যাহার কোন সম্বল নাই তাহার শূন্য অঞ্জলিতে এক মগ ঢালিয়া দিয়া আবার ঊর্দ্ধশ্বাসে অন্য জানালায় দৌড়াইতেছে। ব্রেকের কাছাকাছি কয়েকটা প্যাক-করা বাক্স ও বস্তা-আঁটা মাল নামান হইল,

প্ল্যাটফরমের বিশাল কাঁটাল গাছটার গোড়ায় তিন ঝুড়ি হাঁস-মুরগী পড়িয়া আছে, এগুলি বোধ করি গাড়ীতে উঠিবে। কুলীরা ভারী বস্তা মাথায় চাপাইয়া ছুটিতেছে—এই খবরদার। ইঞ্জিনটা এতক্ষণ জল ভরিতেছিল, চোঙের মাথা হইতে কাঁচা কয়লা পুড়িয়া এক একটা স্তব্ধ কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী বাতাসে ভাসিয়া ক্ষণিক ছায়া ফেলিতেছিল। গাড়ীটার লম্বা সরীসৃপ-দেহ, গার্ড সাহেবের সবুজ নিশানায় সহসা চঞ্চল হইয়া উঠিল, সন্ত্রস্ত যাত্রীর কলরব নিস্তেজ হইয় আসিতেছে, ষ্টেশনের ঘণ্টা বাজিয়া গিয়াছে অনেকক্ষণ। প্ল্যাটফরম কাঁপাইয়া ট্রেণ আস্তে আস্তে চলিয়া গেল। কানের কাছে চা-খাবারের ডাকাডাকিও আবার নিঝুম হইয়া আসিল।

বৈকুণ্ঠবাবু দেশ বিদেশ ঘুরিয়া কত নতুন পরিবেশের মধ্যে আসিলেন, কত অদ্ভুত প্রকৃতির মানুষের সঙ্গে আলাপ-ব্যবহার করিলেন, শেষ বয়সে তীর্থ-ধর্ম্মের জন্য দূর দেশের মন্দিরে পূজা দিয়া আসিলেন, তবু যেন সে সব কর্ম্মধারার মধ্যে তিনি কোন শান্তি পান নাই। আজ দীর্ঘ তিন বৎসর বিচ্ছেদের পর এই পুরাতন ছাড়িয়া-যাওয়া ষ্টেশনটায় নামিয়া প্ল্যাটফরমে যাত্রীর সেই চিরন্তন কলধ্বনি, পয়েন্টস্‌ম্যানের চাবি লইয়া সশব্দে দৌড়ান। খাবার-ওয়ালার পরিচিত সুরের হাঁকডাক—এমন কি ইঞ্জিনের ঐ কালো ধোঁয়া-উদ্গারের ঝাঁঝাল গন্ধের ভিতর বৈকুণ্ঠবাবু যেন তার হারান প্রিয়জীবনের নেশার আমেজ পাইয়া চমকাইয়া উঠিলেন। এই প্ল্যাটফরমের লাল সুরকিতে তার পদচিহ্ন আঁকা রহিয়াছে, কতদিনের কত তুচ্ছ ঘটনা একে একে ঘটিয়া গিয়াছে।

ষ্টেশনের পিছনে ছোট মাঠ ও তার পরেই ষ্টেশন-বাবুদের লাল ইঁটের কোয়ার্টার। বড়বাবুর বাড়ীটা একবারে একপ্রান্তে, অনেকটা বাংলো প্যাটার্ণের। তিনখানা ঘর সমেত মস্ত কম্পাউণ্ডওয়ালা বাড়ীখানায় খোলা মাঠের উড়ন্ত হাওয়া আসিয়া আছাড় খায়, কামিনী ও করবী ফুলের ছায়াঘন কুঞ্জের আশে-পাশে বৈকুণ্ঠবাবুর ছোট ছেলেটা পাতাবাহার ও গাঁদার চারা লাগাইয়া বাড়ীর কম্পাউণ্ডটা চমৎকার করিয়া তুলিয়াছিল। বৈকুণ্ঠবাবুর চাকরীর মেয়াদ তখনও আর বছর দুই বাকী। ছোট ছেলেটা তখনও মহা উৎসাহে বিচিত্র পাতাবাহারের ঝাড় আর বেল-ফুলের ঝাড় পুঁতিতেছিল। ঠিক এমনি দুপুরে বেলা সাড়ে দশটার গাড়ীর পর বৈকুণ্ঠবাবু বাড়ী ফিরিতেছেন, কম্পাউণ্ডের কাঁটা-তারের বেড়ার ফাঁকে ফাঁকে বেলের ঝাড় দেখিয়া চটিয়া গেলেন, চীৎকার ছাড়িয়া অন্দরবর্ত্তিনী গৃহিণীকে কহিলেন—তুমিও কি ছেলেটার মাথা খেয়ে বসলে? এমনি করে গাছ-গাছালি পুঁতে পুঁতে এ পরের বাড়ী সাজাচ্ছ কেন বাপু, এখানে কি চিরকাল থাকবে, না থাকতে পারবে?

গৃহিণী বড়বাবুর স্ত্রী, ষ্টেশনের কুলি-মেথরদের কাছে "মাইজী"। বড়বাবুর বাহ্যিক জীবনের সরোষ হুঙ্কার ও ষ্টেশন-ফাটানো সম্ভ্রমের ছোঁয়াচে তিনিও একটু মেজাজী ছাড়া শান্ত নতমুখী হইতে পারেন নাই। বড় কর্ত্তার হুঙ্কারে গৃহিণী কহিলেন—দুদিন পরে চাকরী যাবে সেদিকে ত জ্ঞান টনটনে, কিন্তু কোন্ চুলোয় ছেলেমেয়ে নিয়ে উঠবে তার কি ঠিক করেছ, শুনি? ছেলের মাথা ত দিনরাত্রি আমিই খাচ্ছি।

এই ঘটনার পর বৈকুণ্ঠবাবু একটু বেশী সচেষ্ট হইলেন এবং স্ত্রীর অনুরোধেই এই ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী নতুন গাঁয়ে জমি খরিদ করিয়া এককালীন পাওয়া টাকার বাড়ী-ঘর তৈরী করিয়া ফেলেন।

আজ ঝাঁ ঝাঁ দুপুরে তিন বৎসর পর ষ্টেশনে নামিয়া বৈকুণ্ঠবাবু সতৃষ্ণনয়নে চারিদিকে তাকাইলেন। প্ল্যাট-ফরমের সেই কাঁটালগাছটা তেমনি দাঁড়াইয়া আছে, লোহার রেলিঙের পাশে মেন্দি-ঝোপ ও আলোকলতার জাল বিছান। ষ্টেশন ঘরের টিনের শেডের ফাঁকে এক ঝাঁক বুনো পায়রা বহুদিন ধরিয়া বাস করিতেছিল, আজও সেগুলা ঝট্‌পট্ করিতেছে, উড়িতেছে, বসিতেছে,—ডাকিতেছে বক্ বক্—বকম্। মাল ওঠানামার সময় ফুটা ছালা গলাইয়া সর্ষে ও ধান মাটিতে পড়ে, জনবিরল অবসরে মুহূর্ত্তের মধ্যে সেগুলি উদরসাৎ করিতে পায়রাগুলা এত ওস্তাদ। বৈকুণ্ঠবাবু পাশ দিয়া হাঁটিয়া গেলেন, উড়ি উড়ি করিয়া শেষ পর্য্যন্ত অনিচ্ছায় পাখা তুলিয়া গোটা কয়েক পায়রা ষ্টেশনের চালে যাইয়া উড়িয়া বসিল। সরিয়া আসিয়া পিছনে তাকাইয়া বৈকুণ্ঠবাবু হাসিলেন, পায়রাগুলা আবার চোরের মত উড়িয়া পড়িয়া চাল-ডালের দানা খুঁটিতে আরম্ভ করিয়াছে। ষ্টেশন-পোষা পায়রা এরা, বংশানুক্রমে

এইখানে পরমসুখে পরের উপর খাইয়া বাঁচিবে—কোথাও নড়িবে না।

প্ল্যাটফরমের লাল কাঁকর রৌদ্রের তাপে আগুন হইয়া উড়িতেছে। স্তব্ধ প্ল্যাটফরমের গায়ে দালানের ত্রিকোণাকার ছায়া একটু একটু গড়াইয়া পড়িতেছে। সাড়ে দশটার গাড়ী এ অঞ্চলে সময়ের মাপকাটি, ট্রেণ চলিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অলস মধ্যাহ্ন নামিয়া আসে। আর গাড়ী নাই, বেলা দুইটায় একটা মালগাড়ী এখান দিয়া বরাবর উত্তর মুখে চলিয়া যাইবে, তারপর সাড়ে তিনটায় কলিকাতাগামী একটা প্যাসেঞ্জার আসিবে। এইটুকু অবসরে ছোটবাবু মালবাবুদের বাড়ী যাওয়া, আহার করা ও তাহারই মাঝে ঘণ্টাখানেকের দিবানিদ্রা সারিতে হইবে।

বৈকুণ্ঠবাবু ষ্টেশন ঘরের দরজায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। ঝাড়ু হাতে রঘু মেথর বাড়ী যাইতেছিল, থমকিয়া দাঁড়াইয়া সসম্ভ্রমে কহিল—সেলাম হাজুর।

রেলের গরমকালের সাদা কোটটা বৈকুণ্ঠবাবু এখনও ছাড়িতে পারেন নাই, শুধু মার্কা-মারা সরকারী বোতাম পাল্টাইয়া হাড়ের বোতাম লাগাইয়াছেন, পায়ে শাদা কেট্‌সের জুতা। আটান্ন বৎসরের বৃদ্ধ বৈকুণ্ঠবাবু আবার যেন পুরাতন পটভূমিকায় ফিরিয়া আসিয়াছেন, রঘুর আহ্বানে সচেতন হইয়া হাসিয়া কহিলেন—আচ্ছা হ্যায় ত?

—হাঁ জী। আপ ত বড়াবাবু থোড়া বুঢ়া বানায় গিয়া।

বৈকুণ্ঠবাবু আবার হাসিলেন, কহিলেন—বয়স হচ্চে, বুড়ো হব না?

তাঁহার কণ্ঠস্বরে এ, এস, এম হরেনবাবু বাহিরে ছুটিয়া আসিয়া কহিল, এই যে মাষ্টারমশায়—এই গাড়ীতে নামলেন নাকি?

হরেনবাবু বৈকুণ্ঠবাবুর সময়ের লোক। বৈকুণ্ঠবাবু সহাস্যে কহিলেন, হাঁ, এই ত নামছি। দিন চারেক হ'ল কাশী থেকে এসেছি, তা তোমাদের সঙ্গে একবার দেখা না করে থাকতে পারলাম না।

হরেন কৃতার্থ হইয়া উঠিল, তাই ত বলি মাষ্টারমশায়, আপনার মত লোক আর হবে না। আপনার যাবার পর কত কাণ্ডই ঘটল, সব বলছি একে একে—আসুন, ঘরে বসবেন চলুন।

ঘরে ঢুকিলেন, টেবিলের উপর টিকিট ছড়াইয়া বুকিং ক্লার্ক হিসাব মিলাইতেছে। বৃদ্ধ এক ভদ্রলোক, বোধ করি নূতন আসিয়াছেন। বৈকুণ্ঠবাবু বসিয়া কহিলেন, সতীনাথকে দেখ্‌ছি না যে।

হরেনবাবু নূতন বুকিং ক্লার্কের দিকে তাকাইয়া কহিল, সতীনাথ বদলী হয়ে গেছে তিস্তা, প্রায় মাস আষ্টেক হয়ে এল। এই ইনিই তার জায়গায় এসেছেন।

নূতন ভদ্রলোক বৈকুণ্ঠবাবুকে নমস্কার জানাইলেন, নমস্কার মাষ্টারমশায়। আপনি বুঝি এর আগে এখানে ছিলেন? এঁদের মুখে আপনার কথা রোজই শুনি।

বৈকুণ্ঠবাবু নীরবে হাসিলেন। হরেনবাবু হঠাৎ সচেতন হইয়া কহিলেন, আমার ওখানে আপনি এবেলা খাবেন কিন্তু মাষ্টারমশায়—বেলা দুপুর হয়ে এল, আপনার ফিরবার গাড়ী সেই ত বিকেল সাড়ে তিনটায়।

বৈকুণ্ঠবাবু হরেনকে শান্ত করিবার জন্য কহিলেন, আচ্ছা—আচ্ছা, হবে'খন। তোমাকে অত ব্যস্ত হতে হবে না হরেন। কিন্তু আর সব গেল কোথায় হরেন, তুমি ছাড়া সব বদলী নাকি?

হরেন শুষ্ক হাসি টানিয়া কহিল—আপনার সেই সব লোক এখানে থাকলে একজনও কি এতক্ষণ না এসে পারত। পুরোনর মধ্যে আমি মহাপাপী এখানে এখনও টিঁকে আছি, সব একে একে সরে পড়েছে। মিনিয়াল্‌সের মধ্যে ঐ দেখুন রঘু, শিবনাথ আর তেওয়ারী—ওরা বাইরে দাঁড়িয়ে আছে।

বৈকুণ্ঠবাবু বাহিরে তাকাইলেন, রঘুর সঙ্গে তেওয়ারী ও শিবনাথ কখন আসিয়া বাহিরে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে দেখিতেছে। বৈকুণ্ঠবাবুর মনে পুরান স্মৃতি জাগিয়া উঠিল, সেই স্ফূর্তিবাজ ছোক্‌রা সতীনাথ, টিকিট মাষ্টার কালীবাবু, টালিক্লার্ক হেমন্ত, জমাদার মুনিলাল—আজ তাহাদের কেহ নাই, শুধু পুরাতন সুখস্মৃতিঘেরা জীবনের সাক্ষীরূপে তাহার চারিপাশে কেবল তেওয়ারী, রঘু, শিবনাথ আর হরেন দাঁড়াইয়া আছে—ইহারাও হয়ত দুদিন বাদে সরিয়া পড়িবে।

হরেন একে একে নূতন ষ্টেশন মাষ্টারের কাহিনী বলিয়া চলিল। লোকটা অল্প বয়সে ছোট থেকে প্রমোশন পাইয়া হঠাৎ বড়বাবু হইয়াছে, দেমাকে মাটিতে পা ফেলিতে

চায় না। নতুন ছোক্‌রা হরেনবাবুর অর্দ্ধেক বয়স, তবুও সম্ভ্রম-সম্মান না বাঁচাইয়া যাহাকে তাহাকে যা-তা গালি দিতেছে, শাসাইতেছে। কথায় কথায় রিপোর্ট করিবে, এক্সপ্ল্যানেশন চাহিয়া পাঠাইবে। হাড়-কিপ্‌টে, আত্মা এত ছোটও হতে পারে মানুষের? ষ্টেশন ষ্টাফের ভিতর ষ্ট্রিক্ট ডিসিপ্লিন আনিতে সর্ব্বদা ব্যস্ত। তিনি কোনরূপ বে-আইনী সহ্য করিতে পারেন না। হরেন কথার মাঝে কহিল, আরে মাষ্টার মশায়, কি আর বলব ছাই। সেদিন গাড়ী থেকে মাছ নেমেছে—মালবাবু বলে কয়ে তিনটে রুই আদায় করলেন, সবাইকে ভাগ করে দেওয়া যাবে। নতুন মাষ্টার মশায় কোথা থেকে চিলের মত ছোঁ মেরে এসে বললেন—হরেনবাবু, চুপচাপ করে মাছ মুরগী রোজ রোজ ত খাচ্ছেন, আমার বাড়ীতে দয়া করে একটুকুরো কালে-ভদ্রে ছুঁড়ে ফেলেন, কেন বাপু? ভাগটা আমার মোটা হবে—না আপনাদের?—ছিঃ ছি—মাষ্টার মশায়, লজ্জায় মরে গেলাম সেদিন, তিনটে মাছই ওর বাড়ীতে পাঠিয়ে দিলাম। বিকেলে ষ্টেশনে এসে সে সম্বন্ধে একটি কথা নেই, এমন ছোটলোক কোথাও দেখিনি। আপনিও ত ষ্টেশন মাষ্টারী করেছেন, এ সব তুচ্ছ ভাগ-বাটোয়ারার মধ্যে একদিনও ত ঢোকেন নি। তারপর কাগজ-পেন্সিল একটুকুরো পাবার আর যো নেই, সব ষ্টক্ ওর বাড়ীতে জমা হচ্চে। ছেলেমেয়েরা লেখবার একটুকুরো কাগজ পায় না আজ। ষ্টেশনে কাজ করে বাজার থেকে কাগজ কলম কিনতে হচ্ছে মাষ্টার মশায়, যা জীবনে কোনদিন আমরা ভাবতেও পারিনি। কত কথা বলব মাষ্টার মশায়—শ্রীপতি বলে নতুন টালিক্লার্ক এসেছে আজ মাস কয়েক। চিনির একটা বস্তা ফুটো ছিল, কুলিরাই বোধ করি কিছু মাল সরিয়ে নিয়েছে—তা ষ্টেশন মাষ্টার শ্রীপতিকে তিন মাস সাসপেণ্ড করে এর বিহিত করে দিলেন। কথা আর শেষ হবে না মাষ্টার মশায়—কি অশান্তিতেই যে দিন কাটাচ্ছি। এখান থেকে এখন ট্রান্সফার হলেই বাঁচি।

শুধু কালের প্রবাহ, সময় বিশেষে একদিনের অতি প্রিয় পরিবেশও অসহ্য হইয়া ওঠে—বিগত সুখের দিন মনে পড়িয়া সেই স্থানে বসবাস আরও তিক্ত হইয়া আসে। শুধু পুরাতন সুখের স্মৃতিটুকু বাঁচাইবার জন্যই বোধ করি মানুষ অভিশপ্ত পুরাতন ভিটা ত্যাগ করিবার জন্য পাগল হয়। হরেনের মুখে বিস্তারিত কাহিনী শুনিয়া বৈকুণ্ঠবাবুও হতাশ হইয়া পড়িলেন।

অনেক রকম রান্নার আয়োজন। বৈকুণ্ঠবাবুর অলক্ষ্যে ইহার ভিতর তেওয়ারী তিনবার বাজারে ছুটিয়া মাছ তরকারী কিনিয়া আনিয়াছে, ছোটবাবুর স্ত্রী পরম নিষ্ঠায় রন্ধন করিয়া বৈকুণ্ঠবাবুকে খাওয়াইলেন। আহার্য্যের আয়োজন দেখিয়া খাইতে বসিয়া বৈকুণ্ঠবাবু কহিলেন, বুঝলে হরেন, রেলের ত্রিশ টাকার লোকটাও যা খেতে জানে, শহরের ধনীগৃহেও অনেক জায়গায় তারা তা চোখে দেখেনি। জিনিষ আলাদা না পেলে গোণা মাইনেতে কারও কখনও হাত বড় হয়? তাই ত বাজারের ঘুষো চিংড়ি দেখে গিন্নী সেদিন বলছিল—তুমিও দেখে দেখে কৃপণ হয়ে গেলে? মনে করে দেখ দেখি, রোজ রুইয়ের পেটি না হলে মুখে যে তোমার ভাত উঠত না—বলিয়া বৈকুণ্ঠবাবু হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

আহারের পর হরেনবাবু কহিল, আপনার ছোট মেয়ে মিনি এখন বড় হয়েছে না?

বৈকুণ্ঠবাবু কহিলেন, সেই জন্যই ত চলে এলাম দেশ-ঘরে। বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়ালে মেয়েটার ত বিয়ে দেওয়া হবে না, ওর বড় বোন ত চাকরী জীবনেই পার হয়ে গেল, এখন এই নিঃসম্বল অবস্থায় এটাকে পাত্রস্থ করতে পারলে একটু নিশ্চিন্ত হতে পারি।

সেই ছোট্ট মিনি এত বড় হয়েছে? হরেনবাবু মনে মনে হিসাব করিয়া দেখিল, মিনির বয়স এখন চৌদ্দ হইতে চলিল। সেদিনও সে তাহার কাছে এ বাড়ীতে ছুটিয়া আসিয়া কহিত—হরেন কাকা, ডিউটিতে যাবার আগে বাবা আপনাকে একবার ডেকেছেন।

কিছুক্ষণ স্তব্ধতার পর বৈকুণ্ঠবাবু আবার কহিলেন, ভাবছি কি জান হরেন? ভাবছি, রেলওয়েতে চাকরী করে এমন কোন ছেলের সঙ্গেই বিয়ে দেব মেয়েটার, যাক তবু দুটো ভাল-মন্দ খেতে পাবে। চিরকাল ভাল খেয়েছে, গাড়ীর শব্দ শুনেছে—আমাদের মত লোকের রেলওয়ের ভিতর থাকাই ভাল।

হরেনবাবু হাসিল, কহিল—কিন্তু মাষ্টার মশায়,

বাইরের লোক যে হাসে, বলে—ত্রিশ-তিন-বাট্ এই ত মাইনে, তার আবার রেলের বাবুর দেমাক কত!

বৈকুণ্ঠবাবু আরও আশ্বস্ত হইয়া কহিলেন, বলুক গে। কিন্তু ওরা ত জানে না যে আমাদের ত্রিশ টাকায় যে সুখ ও প্রতিপত্তি, ওদের একশ টাকার মাইনেতেও তা হয় না। রেলের ষ্টেশন মাষ্টার একটা পরগণার জমিদার বিশেষ। হাজার লোক—হোক্ সে কুলি, মেথর, মিনিয়াল্‌স—বড়বাবুর কথায় ওঠে, বসে, সেলাম ঠোকে। কোন জায়গাটায় এতখানি প্রতাপ ফলান যায় বল দেখি হরেন?

বৈকুণ্ঠবাবুর চোখে তার বিগত জীবনের বহু ঘটনার ছায়াছবি ভাসিয়া উঠিল। আজ তিনি বৃদ্ধ, বিদায়-ভোগী, নিরলঙ্কারা বিধবার মত বিগতশ্রী ও শূন্য, তবু অতীত কর্ম্মজীবনের সসম্মান পদমর্য্যাদা ও সুখ-সম্পদের স্মৃতি তাঁর মনে তীব্র হইয়া উঠিল। এক সময়ে তিনি আবার কহিলেন, বড় মেয়েটার বিয়ে দিয়েছিলাম চাকরে অবস্থায়, একটুও চিন্তা করিনি সেদিন। রেলের লাইট ঘরে জ্বলল, মালগুদামের প্রকাণ্ড ত্রিপল দিয়ে ছাউনি বাঁধা হ'ল, স্লিপারের কাঠে সমস্ত রাত ধরে তিনটে উনুন জ্বললো সমানে—কুলিগুলো ভূতের মত খাটল, বিনে পয়সায় এক রাজসূয় কাণ্ড হয়ে গেল। আজ তাই ভাবছি, মিনির বিয়েতে কতদূর কি করতে পারব।

সাড়ে তিনটা প্রায় বাজে, ক্যালকাটা প্যাসেঞ্জারের ঘণ্টা হয়ে গেছে। সিগ্‌ন্যাল ডাউন হবে-হবে, বৈকুণ্ঠবাবু ব্যস্ত হইয়া হরেনবাবুর সঙ্গে বাহির হইয়া পড়িলেন।

প্ল্যাটফরমে স্থানীয় যাত্রীদের ভীড় জমিয়া গিয়াছে। নোলক-পরা অবগুণ্ঠিতা বধূকে টানিতে টানিতে স্বামী পাখা-ঘটি হাতে একটু নিরালায় যাইয়া দাঁড়াইল, ওয়েটিং-রুমের দরজার ফাঁকে ঘোম্‌টা-টানা গ্রাম্য মেয়েছেলের দল। জীবনে কচিৎ এরা দেশ-যাত্রায় বাহির হয়, বাড়ীর পরিচিত আওতা ছাড়িয়া কোলাহল-মুখর ষ্টেশনে দাঁড়াইয়া ইহারা অবাক্ হইয়া পড়ে—ভাবে শহর বুঝি একেই বলে।

প্ল্যাটফরমের প্রাঙ্গণে আসন্ন শ্রাবণ অপরাহ্ণের ছায়া উঁকিঝুঁকি মারিতেছে। যাত্রী অপেক্ষা ষ্টেশন-বেড়ান দর্শকের দল সংখ্যায় ভারী, খাবারওয়ালা এতক্ষণ স্নানাহার শেষ করিয়া দিবানিদ্রার পর হলুদ রঙের ইউনিফরম পরিয়া আবার মিঠাইয়ের বাক্স কাঁধে করিয়া পায়চারি করিতেছে, আর হাঁকিতেছে—চাই খাবার। অনাবশ্যক দৌড়াদৌড়ি, ঠেলাঠেলি—উত্তরমুখী সর্পিল লাইনটার দিকে সকলের ক্ষিপ্র চঞ্চল দৃষ্টি। এই ঝাঁপাঝাপি হাঁক-ডাক, ঠেলাঠেলি ও সন্ত্রস্তভাব শুধু ঐ ট্রেণটার আসিবার প্রতীক্ষা-ব্যাকুল সময়টুকুতে, আবার যখন ধোঁয়া ছাড়িয়া হুশ্ হুশ্ শব্দে ট্রেণ চলিয়া যাইবে, তখন এখনকার এই চঞ্চলতা ও উত্তেজনা আবার শিথিল হইয়া আসিবে।

বৈকুণ্ঠবাবু কাঁটাল গাছটার ছায়ায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। এখানে দাঁড়াইয়া কতদিন কত মালপত্র বুক করিয়াছেন, বেয়াদপ কুলিকে গালি দিয়া শাসন করিয়াছেন। চারিদিকে সেলাম ঠুকিয়া সবাই তাঁহাকে পথ করিয়া দিয়াছে, তিনি সদর্প দৃষ্টিক্ষেপে চারিদিক পরীক্ষা করিয়া গাড়ী আসিবার প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া থাকিতেন, গার্ডসাহেবের ব্রেকের কাছে দৌড়াইয়া যাইতেন। আজ শুধু তিনি শত মাইল পরের ষ্টেশনের যাত্রী, এখানকার ট্রেণ আসা-যাওয়ার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ফুরাইয়া গিয়াছে।

আকাশের দিকে বৈকুণ্ঠবাবু তাকাইলেন, একটুকরো মেঘের চিহ্ন নাই। চারিদিকে উত্তপ্ত আমেজ, কাঁটাল গাছটা যেন রৌদ্রে পুড়িয়া যাইতেছে। বৈকুণ্ঠবাবু সহসা একটা পাতা ছিঁড়িয়া ফেলিলেন, অতি কষ্টে বোঁটা হইতে দুই বিন্দু শাদা কষ ঝরিয়া পড়িল। তবু তখন ট্রেণ আসিবার প্রতীক্ষায় প্ল্যাটফরমের এই কোলাহলে, শ্রাবণ শেষের এই ঝাঁঝাঁ রৌদ্রের তাপে, এই কাঁটাল গাছটার শীর্ণ ছায়ায় দাঁড়াইয়া হঠাৎ বৈকুণ্ঠবাবু বুঝিতে পারিলেন, পূজার আর দেরী নাই—শারদ আকাশ জলভরা মেঘের বদলে পরিষ্কার। ধু ধু নীল আকাশের গায়ে গায়ে যেন আগমনীর রঙের পরশ কে অলক্ষ্যে বুলাইয়া রাখিয়াছে।

গাড়ী হু-হু করিয়া আসিয়া পড়িল, হরেনবাবু দৌড়াইতে দৌড়াইতে আসিয়া কহিল—আসুন মাষ্টার মশায়, সেকেণ্ড ক্লাশে উঠে যান, খালি রয়েছে।

বৈকুণ্ঠবাবু নিজেকে ভুলিয়া গিয়াছেন, কামরায় উঠিতে উঠিতে একবার শুধু উদাসকণ্ঠে প্রতিবাদ করিলেন, সেকেণ্ড ক্লাশের আবার কি দরকার।

হরেনবাবু অভিবাদন জানাইয়া কহিল, আবার আসবেন মাষ্টার মশায়।

তাহার কথা ট্রেণ-চলার শব্দে ভাল করিয়া শোনা গেল

না, গাড়ী ছাড়িয়া দিয়াছে। বৈকুণ্ঠবাবু উদাস নয়নে দূরে অপস্রয়মান ষ্টেশন মাষ্টারের কোয়ার্টারের দিকে তাকাইলেন। কম্পাউণ্ড-ঘেরা পাতাবাহারের ঝাড় অনেক কাটিয়া ফেলা হইয়াছে, আগের সে ছায়া-কুঞ্জ বিশেষ চোখে পড়ে না। বাড়ীটার জানালায় নীল পর্দা ঝুলিতেছে, একটি জানালা ঈষৎ উম্মোচিত হইয়া ধীরে ধীরে খুলিয়া যাইতেছে। ছোট একটি মেয়ের হাতে হলুদ রঙের বেলুন। বৈকুণ্ঠবাবু হাসিলেন, তাহার সময়ে একটা জানালাও পর্দ্দা-ঢাকা ছিল না, এ নব্য-বিলাসী সভ্যতার আবরণ-প্রথা তাহার রেলের জীবনে আয়ত্ত হইয়া উঠে নাই। খড়খড়িটার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফেলিলেন, একটা জানালার এক ফালি পাতলা কাঠ ছোট ছেলেটার লোহার আঘাতে একদিন ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, সেটা ভগ্ন অবস্থায় আজও তেমনি রহিয়াছে। সরকারী বাড়ীতে মেরামত করিবার প্রবৃত্তি কার আবার হবে!

—সেলাম বড়বাবু!

বৈকুণ্ঠবাবু চমকাইয়া উঠিলেন। তেওয়ারী কাজ সারিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে ছুটিয়া আসিয়াছে—একবার বিদায়-বেলায় বৈকুণ্ঠবাবুকে দেখিয়া যাইবে। চলন্ত ট্রেণের ফুটবোর্ডে দাঁড়াইয়া তেওয়ারী নির্ণিমেষ চাহিয়া আছে, কি বলিবে খুঁজিয়া পাইতেছে না হয়ত। বৈকুণ্ঠবাবু সাবধানের সুরে কহিলেন, যা ব্যাটা নেমে যা—আবার হাম্ আয়গা।

—বহুৎ আচ্ছা, সেলাম বাবু। তেওয়ারী ঝপ করিয়া লাফাইয়া পড়িল।

গাড়ী হোম সিগন্যালের কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছে। দূরে এখনও অস্পষ্ট ছায়া-ঘেরা বড়বাবুর কোয়ার্টার দেখা যাইতেছে, কম্পাউণ্ডে ছায়া নামিতেছে—খড়খড়ির জানালায় কচি মেয়েটির হাতে হল্দে বেলুনটা হাওয়ায় এখনও নড়িতেছে যেন। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বৈকুণ্ঠবাবু জানালা হইতে মুখ সরাইয়া লইলেন।

জাহানারার আত্মকাহিনী

অধ্যাপক শ্রীমাখনলাল রায়চৌধুরী শাস্ত্রী

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

অন্য কেউ যা উপলব্ধি করতে পারে নি, সেই সত্য প্রস্তরোৎকীর্ণ অমলিন অক্ষরের মত সম্রাটের মনের উপর অঙ্কিত হয়ে উঠেছিল। পৃথিবীতে কতকগুলি শাশ্বত বিধান আছে—যা মানুষের অলঙ্ঘ্য এবং স্রষ্টা ও সৃষ্টজীবের মধ্যে এমন একটা অজ্ঞাত সম্বন্ধ আছে, মানুষের ভাষা তা প্রকাশ কর্ত্তে অক্ষম। সম্রাট উপলব্ধি করেছিলেন যা—আমিও আজ তাই উপলব্ধি করছি। সেই বিরাট এক, তারপর আর কিছু নাই।...

'একমেবাদ্বিতীয়ম্'

মুয়জ্জিনের সুর নীরব হয়ে গেছে—আমার চারিদিকে নীরবতা-একদা যেমন সেই প্রস্তর সমাসীন মহামানবের চারিপার্শ্বে ছিল। সম্রাট আকবরের অন্তরে ছিল এক বিরাট প্রশান্তি, আমি তাঁর ধর্ম্ম-বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে তাঁর সঙ্গ উপলব্ধি করলাম।

চারিটি স্তম্ভোপরি স্থাপিত—পঞ্চম স্তম্ভটি তাঁর সিংহাসনের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল, সেখানে সেই বিরাট পুরুষ সমাসীন হয়ে নগর পরিদর্শন কর্ত্তেন, যেন বিরাট শূন্যতার মধ্য দিয়ে তাঁর বহুদিনব্যাপী অনুসন্ধানের ফলে তিনি লক্ষ্যে উপনীত হয়েছেন।

আমাদের মোঘলবংশ বহুদিন ভ্রাম্যমান ছিল। আমার সম্মুখে বিরাট প্রান্তরের অপরপ্রান্তে আমি দেখলাম, অনন্ত বনপথ, চাঘ্‌তাই (১) পর্ব্বতের উপত্যকার মধ্য দিয়ে চলেছে পথরেখা; শিবিরের পর শিবির স্থাপন করে চলেছে চাঘতাই জাতি—দলবদ্ধ, সঙ্গীতমুখরিত। নির্জন গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করে করণার অধীশ্বর সমরখন্দের পুষ্প-শোভিত বনপথ অতিক্রম করে চলেছেন—যাযাবর জাতির মিলনকেন্দ্র তারিম সৈকত অতিক্রম করে তুহিন শীতল বায়ুর মধ্যদিয়ে মোঘল-জাতি যাত্রা করেছে—অবশেষে মোঘলজাতি ভারতবর্ষের সীমান্তদেশে পঁহুছিল। সমস্ত পৃথিবীজয়ের উদ্দেশ্যে সেই বিজয়ীদল পশ্চিমে ইউরোপ পূর্ব্বে চীন পর্য্যন্ত এসেছিল। সেই সোণালী শাখা (২) ভারতে এসে তাদের শেষ শিবির স্থাপন করল।

(১) চাঘ্‌তাই এশিয়ার বনানীশোভিত পর্ব্বত উপত্যকা পথ।

(২) মোঘল জাতির দুইটী শাখা। একটা "সোণালী শাখা" অপরটা "কৃষ্ণ শাখা" নামে ইতিহাসে পরিচিত। সোণালী শাখার সঙ্গে রক্তের মিশ্রণ হয় নি। কৃষ্ণ শাখা নানা জাতির সঙ্গে মিশে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নাম গ্রহণ করেছে।

দুর্দমনীয় তেজ দিয়ে মোগল বংশাবতংস বাবর এবং সম্রাট আকবর তাঁদের পূর্ব্বপুরুষের অনুকরণে উদ্বেল তরঙ্গিণী সন্তরণ করেছিলেন। প্রাচীন যুগে মানুষ অতি দূরাগত ধ্বনি শুনতে পেত, অতি দূরের ক্ষুদ্রতম জিনিষের সন্ধান পেত। সম্রাট আকবরের সূক্ষ্ম অনুভূতি দ্বারা চিত্রের অতি মৃদু রেখাসম্পাতের ছায়ার পার্থক্যও অনুভব কর্ত্তে পার্ত্তেন। বীণাঝঙ্কারে প্রতি সুরের ব্যঞ্জনাও অনুধাবন কর্ত্তে পার্ত্তেন, অবশ্য তাঁর সেই কঠিন হস্তে বন্য হস্তীও বশীভূত কর্ত্তে পার্ত্তেন।

সম্রাট আকবর বহির্জগতে ভারতের মহিমাপ্রচার করেছিলেন, ভারতের অভ্যন্তরে শান্তি স্থাপন করেছিলেন। সুবর্ণখচিত রাজবেশ, কৃষ্ণপ্রস্তর শোভিত কণ্ঠহার পরিধান করে সিংহাসনে আরোহণ কর্ত্তেন। তাতারদেশীয় রেশম ও চীনদেশীয় ঝালর সমন্বিত সতরঞ্চ তাঁর অভিষেক কক্ষে শোভা পেত, তাঁর একদিকে বিক্ষিপ্ত থাকত সুবর্ণ মুদ্রা, অন্যদিকে মুক্তারাশি, তাঁর কর্ণ থেকে বিভিন্ন ।দকে ঝরে পড়ত সুবর্ণখণ্ড এবং মুক্তা। দিল্লীশ্বরের মস্তকোপরি বিস্তৃত চন্দ্রাতপ, নিম্নে দৃশ্য আর অদৃশ্য জগতের সম্মিলন হত এবং সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে এক নূতন যুগের সূচনা হত।

গোলাপের পুষ্পদলের মত ফতেপুর সিক্রী ফুটে উঠেছিল—ধনে ধান্যে ভারতবর্ষ সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল, সেইরূপ সমৃদ্ধি ভারতবর্ষ বহু শতাব্দী উপভোগ করেনি।

অতীতের দিকে নিরীক্ষণ করে তিনি আদর্শ সন্ধান করেছিলেন, যদি তিনি তাঁর অপেক্ষা উপযুক্ত শাসকের সন্ধান পেতেন তবে তাঁর হাতে রাজ্যভার অর্পণ কর্ত্তে দ্বিধাবোধ কর্ত্তেন না। তিনি মুহূর্ত্তে ভবিষ্যৎ দর্শন কর্ত্তে পারতেন। চিত্রকর চিত্রাঙ্কনে রত, গায়ক আরও সুমিষ্ট সুর সৃষ্টি করে চলেছে। তাঁর মনশ্চক্ষুতে জগতের পর জগত প্রতিভাত হয়ে উঠ্‌ছিল।

অতীতের স্মৃতি ও কল্পনার ভবিষ্যতের মিলন স্থলে সম্রাট সমাসীন! আমি সুদূর অতীতে দৃষ্টিক্ষেপ করলাম দেখলাম সেই বিরাট পুরুষ তৈমুর বেগ—শক্তির প্রাচুর্য্যে যিনি পৃথিবীকে মনের মতন সৃষ্টি করতে চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর মনের অনুকরণে মানুষ গঠিত না হলে তিনি মানুষকে মানুষ বলে স্বীকার কর্ত্তেন না। অথচ তিনি নিজকে মহম্মদ প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মবিশ্বাসীদের অধিনায়ক বলে ধারণা করেছিলেন।

সম্রাট আকবর অর্থ দিয়ে অথবা তরবারি দিয়ে কোন লোককে তাঁর ধর্ম্মবিশ্বাসে প্রলুব্ধ করেন নি। তাঁর ধারণা ছিল—শুদ্ধবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি প্রত্যেক ধর্ম্মেই আছেন, প্রত্যেক দেশেই অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন মানুষ আছেন। যে ব্যক্তি মহাপুরুষকে অনুসরণ করেন—সে ব্যক্তি তাঁর সমতুল।

তৈমুরের পথ নরমুণ্ডের পাহাড়ের উপর দিয়ে রচিত হয়েছিল। কিন্তু সম্রাট আকবর যখন প্রজাদের সম্মুখে উপস্থিত হতেন—প্রজারা আনত তাদের অর্ঘ্য নিয়ে, তাদের মুখে ফুটে উঠত প্রার্থনার সুর।

আর একবার আমি নগরের কোলাহল শুনতে পেলাম,—মনে হল অতীত যেন নূতন জীবনের সন্ধান পেয়েছে। লোকজন বিরাট স্নান-প্রাসাদে অবগাহনান্তে নির্গত হচ্ছে। এই প্রাসাদের বহিরাবরণ খুবই সাধারণ, কিন্তু গম্বুজাকৃতি ছাদটী ছিল অপরূপ, শিলাতল ছিল মিনাশিল্পখচিত। আমি দেখেছি তারা সোপানশ্রেণী অতিক্রম করে আসছে কূপের পার্শ্বে শীতল বৃক্ষচ্ছায়ায় শান্তি আশ্রয় লাভ করবে……।

অনাথ আশ্রমের (১) চারিপার্শ্বে বহু বুভুক্ষু সমবেত—যোগীদের জন্য অন্য আশ্রম নির্দ্দিষ্ট ছিল। আমি কল্পনার নেত্রে অবলোকন করলাম—আমিও যেন তাঁদেরই একজন। বৎসরের একটী বিশেষ দিনে দেশের সমস্ত প্রান্ত থেকে এই আশ্রমে সাধুগণ সমবেত হতেন—সম্রাট বিশিষ্ট সাধুদের সঙ্গে একত্র ভোজন কর্ত্তেন।

একটী মৃদু বাতাসের দোলায় আমার অবগুণ্ঠন শ্লথ হয়ে গেল। ফোয়ারের বিচ্ছুরিত গোলাপজল সমীরণ সুগন্ধ করে দিল। আমার স্মৃতিপটে জেগে উঠ্‌ল মিরিয়ম জমানীর(২) গোলাপবীথির সুমধুর গন্ধ। আমি উদ্যানবেষ্টিত অন্তঃপুরের মহিলা প্রাসাদগুলির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলাম, বৃহত্তম প্রাসাদটী সম্রাট তাঁহার ভারতীয় মহিষীদের জন্য ভারতীয় স্থপতি রীতিতে নির্ম্মাণ করেছিলেন, উদ্দেশ্য—তাঁরা যেন সেই প্রাসাদকে নিজস্ব বলে গ্রহণ কর্ত্তে পারেন। তাঁর প্রবেশ পথের পার্শ্বেই ছিল একটী ক্ষুদ্র দেবমন্দির। এই প্রাসাদের অভ্যন্তরে আমি সূর্য্যাস্তে ভোজনকামী সম্রাটকে দেখলাম। চারণগণ অস্তায়মান সূর্য্যরশ্মিও সম্রাটের স্তবগান করছিলেন। স্বর্ণ রৌপ্য নির্ম্মিত দীপাধারে দ্বাদশ প্রদীপ জ্বলে উঠল—মধ্যস্থলে একটী অতি বৃহৎ শুভ্র প্রদীপ জ্বলছিল—প্রাসাদের প্রত্যেক ব্যক্তি দণ্ডায়মান—কারণ পৃথিবীতে অগ্নিই ভগবানের প্রতীক।

সুরা ও শোণিতে তার উগ্রতা জ্বালায়, প্রদীপশিখাই ভগবানের দৃষ্টির আলোক, সেই প্রাসাদগুলির মধ্যে আমি "স্বর্ণ মহল'ও দেখলাম—আর দেখলাম সুন্দর ক্ষুদ্র প্রাসাদ—আমি সেখানেই বিশ্রামের জন্য যাচ্ছি।

আমি একটী স্তম্ভের পার্শ্বে মস্তকবিন্যস্ত করে শূন্যের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলাম—সূর্য্যালোকে সমুদ্রের মতন প্রসারিত প্রান্তর আমার দৃষ্টির সম্মুখে। আমি দেখছি অশ্ব হস্তীযূথ প্রান্তর অতিক্রম করে চলেছে, শূন্যে ধূলিকণা উড়ছে। আজ বিরাট এক উৎসবের দিন।

---

(১) খয়রাতপুরা—অনাথ আশ্রম। আকবর সন্ন্যাসীদের জন্য যোগীপুরা, ভিক্ষুকদের জন্য অনাথ আশ্রম এবং বারাঙ্গনাদের জন্য শয়তানপুরা সৃষ্টি করে বিভিন্ন শ্রেণীর জন্য বিভিন্ন আবাসের ব্যবস্থা করেছিলেন।

(২) মিরিয়ম জমানী যুগের মেরী; আকবরের প্রধানা হিন্দু মহিষী বিহারীমলের কন্যা। এই মহিলা মুসলমানের স্ত্রী হ'য়েও হিন্দুর সমস্ত আচার নিষ্ঠার সঙ্গে পালন কর্ত্তেন,তাঁর গৃহে তুলসী, হোমকুণ্ড, গঙ্গাজলের ব্যবস্থা ছিল এবং ব্রাহ্মণ পাচক ছিল। তাঁর কিংকরী ছিল হিন্দু। উদার আকবর পত্নীর ধর্ম্মবিশ্বাসে আঘাত হানেন নি।

শিক্‌রীর পরিকল্পনা করেছিলেন। (১)

* * *

সংগ্রাম উৎসবে প্রেম ও ঘৃণায়

সুরা ও শোণিতের উদ্বেলিত জ্বালায়

* * *

তবে কেন, সম্রাট ফতেপুর পরিত্যাগ করেছিলেন? কেন তাঁর সমস্ত শ্রম বিস্মৃতির গহ্বরে ডুবিয়ে দিলেন? আজ কেন সেই মর্মরের হর্ম্যসৌধ ভিক্ষুক আর শ্বাপদের আবাস। বহুদূরে—সেকেন্দ্রার দিকে দেখলাম প্রস্তরের উপরে কুজ্‌ঝটিকা গাঢ়তর প্রতিভাত হচ্ছিল, সমাধি ও শহরের মধ্যবর্তী স্থানে বৃক্ষগুলি যেন প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে আছে। সম্রাটের সমাধি মন্দিরের পার্শে প্রজ্বলিত ধূপাধার থেকে উত্থিত ধূম্ররাজি কুজ্‌ঝটিকায় পরিণত হচ্ছে। সেই বিরাট পুরুষ আমার সম্মুখে অগ্রসর হলেন,—তিনি যে শাশ্বত পরিব্রাজক। কোন প্রাচীরই তাঁর অবাধগতি প্রতিরোধ করতে পারে নি। এমন কি সমাধিও তাঁকে সীমাবদ্ধ করতে পারে নি।

তাঁর সমস্ত উল্লাস কি শীতল হয়ে গেছে? মহাপুরুষ সেলিমের অনুগ্রহজাত সন্তান সেলিম ত আকবরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। সেই বিদ্রোহ জয় কি তাঁর কাছে খুব বৃহৎ উল্লাসের ছিল?…

আমি সেই প্রহেলিকা-জাল ছিন্ন করতে যতই চেষ্টা করলাম, ততই তিনি আমার নিকটতর হয়ে উঠছিলেন। আমি তাঁর নিকট শপথ করলাম, "যদি আমরা যুদ্ধে জয়লাভ করি, তবে আবার সম্রাট আকবরের স্বর্গের শ্রেষ্ঠাংশ ফতেপুরে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করব; জুম্মা মসজিদে পুনরায় প্রার্থনার ব্যবস্থা আরম্ভ করব, জ্ঞানপিপাসু তরুণদল পুনরায় ইবাদৎ-খানার গবেষণাগারে নক্ষত্রমণ্ডলীর পরীক্ষা করবে, রাজপ্রাসাদে পুনরায় প্রেমের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে।

সোনহারা প্রাসাদের(২) প্রবেশ তোরণে এসেছি, এইখানে আমি নবজীবন লাভ করব—এখানেই আমি একাকী প্রাসাদের প্রবেশদ্বারে আমার প্রিয়তমের সাক্ষাৎ পাব। মনে হচ্ছিল যেন শুভ্রতম ধাতুর সুমিষ্ট গন্ধ এই প্রাসাদ থেকে নির্গত হচ্ছে, স্বর্ণের উজ্জ্বলতা তার অন্তরে বাহিরে। এই প্রাসাদের অভ্যন্তরে ও বাহিরে সুবর্ণমণ্ডিত চিত্রাবলীর বিচিত্র বর্ণ সমাবেশ মানুষকে মুগ্ধ করে। নীল পটভূমিকায় অঙ্কিত বিভূতিবিভূষিত, ভক্তের কণ্ঠে উচ্চারিত সঙ্গীতে—পদ্মাসনে ভগবান বিষ্ণুর অবতার শ্রীরামচন্দ্র।

দরজার সম্মুখে একটী চিত্র অবলোকন করছিলাম। শৈশবে এই চিত্রটী আমার মনে একটী চিন্তার লহরী তুলত, সেই স্মৃতি আবার প্রলুব্ধ করল। একটী দেবদূত—তাঁর হাতে ছিল খড়্গাকৃতি একটী জিনিষ—তার ভিতর থেকে স্ফুরিত হচ্ছিল অভিনন্দনবাণী। সেই কি দেবদূত জিব্রাইল? আমি কক্ষের বহির্দেশে উপবেশন করলাম।

আমার চিন্তা অন্তঃপুরে মহিলামহল পর্য্যন্ত প্রসারিত হল, শুনেছিলাম সম্রাটের অন্তঃপুরে, পঞ্চ সহস্রাধিক মহিলা বাস করতেন। এখনো আমার কর্ণে ধ্বনিত হচ্ছে সেই ক্ষুদ্র প্রাসাদে ঘোষিত বাণী—"এক ঈশ্বর, এক স্ত্রী", এর বেশী যে কামনা করে—সে তার নিজের সর্বনাশের পথ রচনা করে"(১)—এই ছিল সম্রাটের শেষ জীবনের উপলব্ধি। যদি ফতেপুরে আবার আমাদের বিজয় লাভ করি, আমি সেই 'সোনহারা' প্রাসাদে একলিঙ্গের মন্দির স্থাপন করব।

আমি পুনরায় সেই রুদ্র প্রাসাদের দিকে অগ্রসর হলাম—যেখানে "কোয়েল" আমার জন্য অপেক্ষা করছিল। এই প্রাসাদের মূর্তি ও অলঙ্কার আমার একটী প্রাচীন হিন্দুমন্দিরের ব্যথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল, আমার মনে হচ্ছিল বালু-পাথরের একটী বিরাট ধ্বংসাবশেষের মধ্যে অপেক্ষা করে আছি। প্রাসাদের বিভিন্ন অংশ অপূর্ব্ব সুন্দর কারুকার্য্য শোভিত—মনে হয় যেন এশিয়ার কল্পনা-জগৎ সম্রাট আকবরের হিন্দু রাজ্যে এসে মূর্ত্ত হয়েছে; সে জগতে সমস্ত সৌন্দর্য্য যেন ভগবানের চরণে লীন হয়ে যায়—ভগবানের বাইরে অন্য কোন শঙ্কা নাই।

আমি সোপান শ্রেণী অতিক্রম করে উপরের তলে উঠলাম—এখানে দুইটী প্রকোষ্ঠ ছিল। প্রথম কক্ষে প্রবেশ করে মনে হল যেন আমি স্বর্গরাজ্যে এসেছি, সেই আশ্রয়টী আমার জন্যে বহুকাল অপেক্ষা করেছিল।

একটী পারস্য দেশীয় সতরঞ্চ মেঝের উপর বিস্তৃত ছিল, এককোণে সবুজ সোনালী কিংখাব মোড়া কুশন ছিল। একটী তাকের উপর রক্ষিত ছিল বহুকাল বিস্মৃত একটী চর্মনির্মিত চিত্রাধার, একটী বীণা এবং একখানি ছুরিকা, সম্ভবতঃ আমার ভ্রাতা দারাই বোধ হয় এখানে সর্বশেষ অতিথি ছিলেন। সে ছাড়া আর কে চিত্র অঙ্কন করতে পারে?

কোয়েল কতকগুলি শ্বেত-হরিদ্রাভ চম্পক পুষ্প একটী বৃহৎ মৃৎপাত্রে সংগ্রহ করেছিল। পুষ্পগন্ধে সমস্ত বাতাস আমোদিত হয়ে উঠল। আমি দেওয়ানের মধ্যে বিশ্রাম নিলাম। এখানেও প্রাচীরগুলি খুব চমৎকার খোদিত। এই ভাস্কর্য্য মানুষের মনে একটী প্রশান্তি

(১) ফকির সেলিম চিস্তীর আশীর্বাদে হিন্দুমহিষী যোধবাইএর গর্ভে আকবরের পুত্র জন্মগ্রহণ করেছিল! সেই ঘটনা স্মরণ করে ফকিরের নাম অনুকরণে আকবর তাঁর পুত্রের নাম রাখলেন সেলিম, এবং ফকিরের আবাস স্থলে নূতন নগর পরিকল্পনা করে নির্ম্মাণ করলেন ফতেপুর শিক্‌রী। "স্তম্ভ দিয়ে তৈরী স্মৃতি দিয়ে ঘেরা" নগর আজও অতীতের অনেক স্মৃতি স্মরণ করিয়ে দেয়।

(২) সুবর্ণ প্রাসাদ সত্যই বিভিন্ন বর্ণ দিয়ে তৈরী হয়েছিল। আজ তার চিহ্নও নেই।

(১) সম্রাট আকবরকে বিবাহ সম্বন্ধে এক স্ত্রী নির্দেশ করার জন্য বহু আঘাত সহ্য করতে হ'য়েছিল; কারণ কোরানে আছে ২, ৩, ৪ স্ত্রী পর্যন্ত একসঙ্গে বিবাহ করা যায়, মোট ১০টী (কুরান ৪:৩)।

বাস করে। আগ্রার প্রাসাদের সমস্ত জিনিষের মধ্যে স্বর্ণালঙ্কার, মখমলের সুচির কাজ, মূল্যবান প্রস্তরচ্ছটা কিন্তু এখানে সবই যেন পাথরের সমাবেশ।

আমার মনে হল, আমি যেন আমার জীবনব্যাপী অস্বস্তির পরে স্বস্তির জন্য একটা তক্তের উপরে শরীর এলিয়ে দিলাম।

কোয়েল আমার জন্য কিছু খাদ্য এনেছিল। আমি তাকে চিত্রটা এনে দিতে আদেশ করলাম। আমি দেখলাম চিত্রাধারের ছিন্ন পত্রগুলিতে সম্রাট আকবরের সময় উৎকীর্ণ ছিল। অবশ্য সে চিত্রগুলির মধ্যে ভারতের কোন মহাকাব্যের দৃশ্য কিংবা কোন রাজকীয় ঘটনা অঙ্কিত ছিল না। সেই চিত্রাধারের মধ্যে অধিকাংশ রঙ্গীণ নক্সা অঙ্কিত ছিল, ঐখানে চিত্রাধারে আছে পাল্কীবাহী চিত্রকর দশনাথ (১) অঙ্কিত একটা ক্ষুদ্র চিত্র। আমার মানসিক পরিস্থিতির মধ্যে এই চিত্রখানি যেন একটা মহান আশীর্ব্বাদের মতন। চিত্রটীর প্রচ্ছদপট ছিল উচ্চশির প্রাসাদ, তার চতুর্দ্দিকে রক্তিমাভ উজ্জ্বল পর্ব্বতমালা পরিবেষ্টিত প্রাচীর। এই ঔজ্জ্বল্য কি আরাবল্লী পর্ব্বতমালার গাত্রে হরিদ্রাভ স্ফটিকের জ্যোতি। সন্ধ্যাকাশের ঈষৎ স্বর্ণাভ জ্যোতির মধ্যে আরাবল্লীর প্রভা বিলীন হয়ে গেল। এক স্বল্প-পরিসর পথ সরীসৃপ গতি প্রাসাদের দিকে চলে গেছে। সম্মুখভাগে একটা নারীর চিত্র—বোধ হয় কোন নববিবাহিতা বধূ—ঊর্দ্ধদিকে নিবদ্ধতার দৃষ্টি, সেই নয়নের জ্যোতি আমি আজও বিস্মৃত হতে পারিনি। তার ঊর্দ্ধোত্তোলিত দক্ষিণ বাহু বামহস্তের তরবারীর দিকে প্রসারিত। তার পশ্চাতে পূর্ণ-পরিচ্ছদ সৈন্যদল একটা চিতা রচনা করছিল। আমি আমার কোয়েলকে জিজ্ঞাসা করলাম, কোয়েল! তুমি ত' হিন্দু নারী—বলতে পার চিত্রের বার্ত্তা কি?

সে মুহূর্ত্ত মাত্র চিত্রটা নিরীক্ষণ করে আমার দিকে দেখল, তার অশ্রুপূর্ণ নয়নে এক অপূর্ব্ব প্রভা, কম্পিত কণ্ঠে মৃদুস্বরে সে বলল :—

"এই চিত্রের নায়িকা কুমার দেবী (কুমাম্ দেবী)। প্রায় শতাধিক বৎসর পূর্ব্বের কথা। একদা কুমার দেবী মসডোরের রাজকুমারকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। তিনি রাজকুমারকে স্বামীত্বে বরণ করলেন কিন্তু তাঁর পিতা তাঁকে অন্য রাজকুমারের সঙ্গে বিবাহ দেবেন স্থির করেছিলেন। মসডোরের রাজা কুমার দেবীর বিবাহ যাত্রার পথে আক্রমণ করলেন কিন্তু তাঁর মৃত্যু হল। কুমার দেবী স্বয়ং তরবারি দিয়ে তাঁর দক্ষিণ হস্ত ছিন্ন করে বরের পিতার নিকট উপহার প্রেরণ করলেন।—বরের পিতাকে কখনো দেখেননি। উপহারে লেখা ছিল আপনার পুত্রবধূ" অবশিষ্ট সালঙ্কার দ্বিতীয় হস্ত [illegible] সৈন্য দিয়ে ছিন্ন করিয়ে নিজের পিতাকে প্রেরণ [illegible], তারপর কুমার দেবী চিতায় আত্মাহুতি দিলেন। রাজকুমারী ছিলেন হিন্দুস্থানের নারী।

কোয়েল চলে গেল।—আমি একাকিনী, আমার কুশানে মুখ অবনমিত করে রাখলাম—কুমার দেবীর তীক্ষ্ন দৃষ্টি আমাকে অনুসরণ করছিল। হঠাৎ আমার মনে পড়ল—সম্রাট আকবরের এই অন্তঃপুরে আমি একজন প্রবাসীমাত্র, মোঘল রক্তের সঙ্গে হিন্দুস্থানের রক্ত মিশাবার জন্য বৃথা চেষ্টা করেছিলেন। হিন্দুস্থান হিন্দুর রয়ে গেল—মোঘল ইাঁ মোঘল রয়ে গেল; নয় কি? এই ত হিন্দুস্থানের নারী। স্বামীর পাপের প্রায়শ্চিত্তের অগ্নিশিখার মধ্য দিয়ে—স্বামীর সঙ্গে চির মিলন লাভ করবে, এই আশায় অবহেলায় জ্বলন্ত চিতায় আরোহণ কর্ত্তে পারে। সে নিশ্চয় তার দুঃখের অংশ ভাগিনী বিদেশিনী নারীকে ঘৃণা কর্ত্তেও জানে এবং তার সঙ্গে কখনো এক চিতায় প্রাণ বিসর্জ্জন করবে না। সেই তার স্বামীর সন্তানের জননী—আমাকে সে ঘৃণা করবে—এটাত স্বাভাবিক। (ক্রমশঃ

(১) দশনাথ একজন অতি দরিদ্র হরিজন পুত্র। মথুরার মন্দির গাত্রে অঙ্গার দিয়ে একটী ছবি আঁকছিল। আকবর তাকে দেখে ভবিষ্যত প্রতিভার সন্ধান পেলেন, দশনাথকে রাজপ্রাসাদে এনে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করলেন, পরিশেষে দশনাথকে রাজশিল্পীর সম্মান দিলেন, আকবরের লোক চিনবার অপূর্ব্ব দক্ষতা ছিল।

জাগো

শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

জাগো ভারতের নরনারী, আজ
তরুণের অভিযান—
ছিন্ন হয়েছে বন্ধন যত
শৃঙ্খল অবসান!

ভুলে যাও যত হানাহানি, আর
রক্তের পথে গতি দুর্ব্বার—
ভুলে যাও যত জীবনের ভার,
দুর্ব্বহ অপমান!

মিলন-তীর্থ এ মহাভারতে
মৃত্যুর পরাজয়;
শুধু প্রেম, আর প্রেম দিয়ে শুধু
জিনিব শঙ্কাভয়!

শত শহীদের তপ্ত রুধির
রঞ্জিত বেদী দেশ জননীর;
প্রেম তর্পণে জাগে যেন সেথা
জীবনের জয়গান!

চীনে কম্যুনিষ্ট নেতা মাও সি-টাংগ্

শ্রীপ্রফুল্লরঞ্জন সেনগুপ্ত এম্-এ

চীনে কম্যুনিষ্ট পার্টির কর্মপদ্ধতি ও চীনের বর্তমান রাজনৈতিক সমস্যা বিদেশে সর্বলোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। চীন-কম্যুনিষ্ট বা কাংগ্চ্যান্টাংগ্ পার্টির এ অভিযান কতদূর সার্থক ও সাফল্যমণ্ডিত হবে—তা বিচারসাপেক্ষ। সে সম্বন্ধে মতামত ব্যক্ত করবার প্রয়াস এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। মাও সি-টাংগ্ (Mao Tse-Tung) কি ক'রে রাজ এতটা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন, কি ক'রে তাঁর দলের উপর এতটা প্রভাব বিস্তার করেছেন—এখানে তারই এতটুকু সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের ইঙ্গিত মাত্র। চীনের কম্যুনিষ্ট পার্টির ভবিষ্যৎ যাই হোক না কেন—মাও সি-টাংগ্ এর আসন চীনের ইতিহাসে শাশ্বত হ'য়ে থাকবে। চীন কম্যুনিষ্ট বা কাংগ্ট্যান্টাংগ্ নেতা মাও সি-টাংগ্ ৫৫ বছর বয়সে পদার্পণ করেছেন। দীর্ঘ দেহ আর করুণ দৃষ্টির মধ্যে ফুটে উঠেছে তাঁর অন্তরের সত্যকারের ছবি। তিনি হলেন যোদ্ধা, সমাজসেবী, দার্শনিক ও কবি—সর্বগুণসম্পন্ন এ মানুষটি বর্তমানে চীনের ভাগ্য-নিয়ন্তা হিসেবে দেশের একাংশ লোকের কাছে সুপ্রতিষ্ঠিত।

১৯২৯ সালে মাও সি-টাংগ্ এবং আরও কয়েকজন মেধাবী যুবক চীনের এই কাংগ্চ্যান্টাংগ্ পার্টি বা কম্যুনিষ্ট পার্টি গ'ড়ে তোলেন। মার্কস্ইজিম্ এর পূর্বে চীন দেশের উপর বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি।

বিগত ২৮ বছরের মধ্যে এই ছোট্ট দলটি সুন্দর ও শক্তিশালী হ'য়ে গ'ড়ে উঠেছে। সমস্ত চীন দেশে আজ তারা তাদের জয়ধ্বজা উড়িয়ে চীনের কোমিন্টাংগ্ শাসনের অবসান ঘটাতে বদ্ধপরিকর। যাঁর পরিচালনায় কম্যুনিষ্ট দলটি উত্তরোত্তর শক্তিশালী হ'য়ে এগিয়ে চলেছে—তিনি হ'লেন মাও সি-টাংগ্।

হানানের অন্তর্গত সাওসান্ গ্রামে এঁর জন্ম হয় ১৮৯৩ সালে। দেশে তখনো মধ্যযুগের আবহাওয়ার রীতি-নীতির আমেজ কাটেনি। পুরুষেরা তখনো দীর্ঘ কেশে বেণী দুলিয়ে চলে। কাঠের জুতো পরিয়ে মেয়েদের পা শক্তিহীন ও নষ্ট করার প্রথা তখনো সুন্দরভাবে প্রচলিত।

মাও সি-টাংগ্এর অভিভাবক বলতে ছিলেন মাত্র তাঁর পিতা। তিনি ছিলেন একটু কঠোর-ভাবাপন্ন। মাওর পিতা চীনের পুরাতন সংস্কারগুলির পক্ষপাতী ছিলেন না মোটেই। মাও সি-টাংগ্ আট বছর বয়সেই তাঁর পিতার খামারে কাজ করতে আরম্ভ করেন। গ্রামীয় স্কুলে তিনি ভর্তি হ'য়েছিলেন বটে, কিন্তু শিক্ষকদের কঠোর শাসনের জুলুম তাঁর অসহ্য হ'য়ে উঠ্লো। ১০ বছর বয়সে সহসা তিনি গৃহ থেকে অন্তর্ধান হ'লেন। তিনদিন পর তাঁর পিতার অনুসন্ধানের ফলে মাওর আবার সন্ধান মিল্লো। শহরে সিয়াংগ্ স্কুলে পড়বার প্রবেশ পাওয়ার উদ্দেশে মাওকে তাঁর পিতার সঙ্গে দীর্ঘ ছ' বছর ধরে সংগ্রাম করতে হয়েছিল। বহুবার তিনি গৃহ থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন। অবশেষে মাওর পিতা পরাজয় স্বীকার করলেন। পুত্রকে কৃষক ক'রে বা বড় ব্যবসায়ী ক'রে গড়ে তোলবার স্বপ্ন যেন তাঁর ব্যর্থ হ'লো। পুত্রকে পড়াশোনা করবার অনুমতি দিতে বাধ্য হ'লেন। ভাব্লেন—শিক্ষিত হ'য়ে হয় তো কৃষক বা ব্যবসায়ী থেকে বেশীই উপার্জন করবে মাও। ১৯১০ সালে মাও সি-টাংগ্ চাংগ্সা হাইস্কুলে ভর্তি হ'লেন। তাঁর পাঠ্য তালিকায় সন্নিবেশিত ছিল আধুনিক বিষয়বস্তু এবং প্রাচীন চীন সাহিত্য। কিন্তু সেখানে তাঁর আগ্রহ দেখা গেল—বিদেশী ও সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতার প্রতি।

১৯১১ সালে যখন বিদ্রোহ আরম্ভ হ'লো, মাও সি-টাংগ্ ডাঃ সান্ ইয়াৎ সেনের অধীনে বিদ্রোহী কোমিন্টাংগ্ দলে যোগদান করলেন। এই বিদ্রোহই মাঞ্চু শাসনের অবসান ঘটায়। এখানে যোগদান করেই মাও কার্লমার্কস্এর নীতি শিক্ষা সম্বন্ধে জ্ঞানোপার্জন করেন।

১৯১২ সালে বিদ্রোহ সাফল্যমণ্ডিত হ'লো। মাও তখন ১৯ বছরে পদার্পণ করেছেন। মাও সৈন্য বিভাগ থেকে বিদায় গ্রহণ করলেন এবং হানান্ নরম্যাল্ স্কুলে পড়াশোনা আরম্ভ করে দিলেন। ১৯১৮ সালে শিক্ষকতার ডিগ্রী নিয়ে বের হ'য়ে এলেন। গ্রাজুয়েট হ'বার পর পেকিং বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি সহকারী লাইব্রেরীয়ানের পদ গ্রহণ করেন। সেখানে ইয়াং কাই হু নাম্নী একটি শিক্ষয়িত্রীর সঙ্গে মাওর পরিচয় হয় এবং তাঁকেই তিনি বিয়ে করেন। মাও সি-টাংগের বয়স যখন ১৪ বছর তখন তাঁর পিতার ইচ্ছায় ২০ বছরের একটি মেয়ের সঙ্গে মাওর বিয়ে হয়। কিন্তু মাও যে বিয়ে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করতে পারেন নি।

লাইব্রেরীয়ানের পেশা মাওকে মোটেই আনন্দ দিতে সক্ষম হ'লো না। তিনি চাইলেন সত্যকারের একজন কর্মী হ'তে।

মাও ভাবলেন যে মার্কস্ লেনিন বাদী না হ'লে চীনদেশ বর্তমান জগতে নিজের স্থান ক'রে নিতে পারবে না। চীনের উন্নতি সাধনের পথে এ অপরিহার্য্য। তাই শীঘ্রই তিনি কতিপয় জ্ঞানী ও মেধাবী যুবক কর্তৃক গঠিত ছোট একটি সংঘে যোগদান করলেন। এ দলের সভ্যগণ প্রায় সকলেই মস্কো এশিয়াটিক্ ষ্টুডেন্টস্ অব্ মার্কসীয়ান্ থিওরির ছাত্র। সবেমাত্র সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করেছে। এ দলের নায়করা হ'লো—কাংগ্চ্যান্টাংগ্ (Kungchantang)। ১৯২০ সালে প্রথম এ দলটি সাংহাইতে গড়ে উঠ্লো।

চীনের কম্যুনিষ্ট পার্টি গড়ে তোলবার সময়টিও যেন অনুকূল ছিল। ডাঃ সান্-ইয়াৎ সেন Nationatist Kuomintang দলের নায়ক ছিলেন বটে—তবুও রাশিয়ার কম্যুনিষ্ট পার্টির কর্মপদ্ধতি তাঁর দৃষ্টি এড়ায় নি। কম্যুনিষ্ট না হ'য়েও—রাশিয়ার কম্যুনিষ্ট পার্টির নীতি ও কর্মপদ্ধতি

অনুসরণ ক'রে নিজের দলটিকে গড়ে তুলেছিলেন এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রতি তাঁর বেশ শ্রদ্ধাও ছিল।

কার্গ্‌চ্যানটাংক্‌ দলটি গড়ে ওঠবার পর মাও সি-টাংগ্‌ তাঁর দেশে হানান্‌এ ফিরে এলেন। ১৯২২ সালের মধ্যে তিনি ২০টি কম্যুনিষ্ট ট্রেড্‌ ইউনিয়ন গড়ে তুল্‌লেন—কয়লাখনি রেল ও মিউনিসিপ্যাল কর্মচারীদের ভেতর।

১৯২৩ সালে কম্যুনিষ্টরা Kuomintang দলে দলে যোগ দিলেন। মাও জাপানালিষ্ট পার্টির 'রেড্‌' ডেলিগেট্‌ভুক্ত হ'লেন। ১৯২৫ সালে ডাঃ সান্‌-ইয়াৎ সেনের মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর পর কম্যুনিষ্ট ও জাপানালিষ্ট দলের মধ্যে গভর্ণমেন্ট পরিচালনার ব্যাপারে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয় এবং এই দ্বন্দ্বই আরও তিক্ত হ'য়ে যুদ্ধে পরিণত হ'লো। ১৯২৭ সালে Kuomintang এর নোতুন নায়ক চিয়াং কাই-সেক্‌ (Chiang kai shek) কম্যুনিষ্টপার্টিকে নির্মূল করতে এর বিরুদ্ধে অভিযান আরম্ভ করেন। কম্যুনিষ্টদল তখনো ভালো ভাবে নিজেদের রণসজ্জায় সজ্জিত ক'রে তুলতে সক্ষম হয় নি, রণনীতি শিক্ষার অভাব ও যথেষ্ট পরিলক্ষিত হয়েছিল। ঠিক এ সময়ে যুদ্ধ পারদর্শী Chu Teh কম্যুনিষ্ট দলে যোগদান করলেন। Chu Teh চীনের সম্ভ্রান্তবংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি Yunnan Military Academy এবং জার্মাণীতে রণনীতি শিক্ষা লাভ করেন। রাজনীতি সম্বন্ধে প্রথম বয়সে তিনি বিশেষ মাথা ঘামাতেন না। প্রচুর আফিম্‌ সেবন ও গভীর অধ্যয়ন—এ দু'টোতেই তিনি ছিলেন পটু। কখন কি ভাবে সহসা তিনি মার্কস্‌ইজিমের প্রতি গভীর আকৃষ্ট হ'লেন—তা' বলা কঠিন। তবে ১৯২৭ সালে আফিমের নেশা পরিত্যাগ ক'রে—সম্পূর্ণভাবে তিনি কম্যুনিষ্ট দলে যোগদান করলেন।

Chu Teh ছিলেন লালফৌজ বা Red-armyর—উপদেষ্টা। তাঁর চারিটি উপদেশ ছিল—(১) শত্রুপক্ষ অগ্রসর করলে প্রত্যাবর্তন করবে, (২) নীরব হ'য়ে অপেক্ষা করলে পীড়ন করবে, (৩) যুদ্ধ এড়াতে চাইলে—আক্রমণ করবে আর (৪) যখন প্রত্যাবর্তন করবে তখন অনুসরণ করবে।

Chu Teh বর্তমানে কম্যুনিষ্ট লাল ফৌজের প্রধান সেনাপতি। এখনও তিনি তাঁর চারটি রণনীতির মূল কথা অনুসরণ করে থাকেন।

১৯৩৩ সাল পর্য্যন্ত মাও ও Chu Tehএর পরিচালনায় দক্ষিণ চীনে কম্যুনিষ্ট দল তাদের শক্তি অক্ষুণ্ণ রেখেছিল। কিন্তু এ বছরেই চিয়াং কাইসেক্‌ কম্যুনিষ্ট লাল ফৌজ কর্তৃক অধিকৃত স্থানগুলির চারিপাশে ব্যূহ রচনা করেন—ফলে কম্যুনিষ্ট দলকে ৬,০০০ মাইল ব্যাপী দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে যেতে হ'য়েছিল। এ দীর্ঘ পথ অতিক্রম করার ব্যাপার একটি অভিনব ঘটনা বলেও অত্যুক্তি হয় না। এ পথ অতিক্রমের কথা "Long march" নামে অভিহিত। কাশ্মীর থেকে কেপ কমোরিনের যে ব্যবধান—এ অভিযানের দূরত্ব তার চেয়েও অনেক বেশি। প্রায় এক লক্ষ লোক এ অভিযানে যোগদানকরেছিল। সৈন্য, জনসাধারণ, স্ত্রী, পুরুষ ও বালক কেউ বাদ পড়েনি। দীর্ঘ পথ অতিক্রম ক'রে যারা শেষ পর্য্যন্ত Shensiতে পৌঁছালো—তাদের সংখ্যা অতি বিরল। কম্যুনিষ্ট লাল ফৌজের এ বিদ্রোহের ফলে মাও সি-টাংগকে অনেক ব্যক্তিগত ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছিল। জাপানালিষ্টরা মাওর স্ত্রীকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করতেও ছাড়ে নি। জানা যায় এ দণ্ডাদেশ দিয়েছিলেন চিয়াং কাই-সেক্‌ স্বয়ং।

১৯২৯ সালে মাও পুনরায় হো সু-চেয়েন্‌ (Ho Tsu-Chien) নাম্নী একটি শিক্ষয়িত্রীকে বিয়ে করেন। এ বিয়ের সূত্রে মাও পাঁচটি সন্তান লাভ করেছিলেন কিন্তু দীর্ঘ মার্চের সময় অনাহারে সন্তানদের মৃত্যু আসন্ন দেখে—তিনি তাঁর সন্তানদের রক্ষার অভিপ্রায়ে দুর্গম পথ অতিক্রমের সময় তাদের পথিমধ্যেই কৃষকদের হাতে তুলে দেন।

১৯৩৫ থেকে কম্যুনিষ্টরা চিয়াং কাই-সেকের সঙ্গে শান্তি প্রতিষ্ঠা ক'রে জাপানীদের বিরুদ্ধে একটি সর্বদলীয় শক্তি গড়ে তোলবার চেষ্টা করে। ১৯৩৭ সালে যখন চীনের বিরুদ্ধে জাপানীরা যুদ্ধ আরম্ভ করে—তখন তাদের এ প্রচেষ্টা সার্থক হ'য়ে উঠ্‌লো।

Kuomintang দলের সঙ্গে চুক্তি ক'রে কম্যুনিষ্টরা Shensi-Kansu-Ningshia Frontier Government প্রতিষ্ঠা করে ১৯৩৭ সালে। এই সময় লাল ফৌজেরাও নতুন ভাবে তৈরী হ'য়ে Eighth route army নাম গ্রহণ করলো চু টের অধিনায়কত্বে। কিন্তু চিয়াংএর দল ও কম্যুনিষ্ট দলের মধ্যে বন্ধুত্ব বজায় রাখা সহজসাধ্য হ'য়ে উঠ্‌লো না। কম্যুনিষ্ট দল জনসাধারণের কাছে সুনাম অর্জন করতে আরম্ভ করলো। এতে চিয়াংএর Kuomintang দল একটু চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌লো এবং কম্যুনিষ্টদের অগ্রগতি প্রতিহত করার অভিপ্রায়ে চতুর্দিকে সৈন্য সমাবেশ করতে তৎপর হ'লো। জাপানীদের বিরুদ্ধে যে ভাবে চীন Kuomintang দল প্রস্তুত হ'য়েছিল—কম্যুনিষ্টদের বেলায়ও সেই ভাবে প্রস্তুত হ'য়ে গেল।

জাপানী যুদ্ধের সময় মাও সি-টাংগ্‌ কম্যুনিষ্টদের পরিচালনা করেছেন একটি চার কোঠাযুক্ত গুহার ভেতর থেকে। এ গুহাটি Yenanএ অবস্থিত। বই লিখে, প্যাম্‌ফ্লেট্‌ বিলি ক'রে—নানা প্রকার প্রচার কার্য্য দ্বারা কম্যুনিষ্ট দলের সংগঠন কার্য্যে তিনি ব্রতী ছিলেন। বিশেষ ক'রে চিয়াংএর দলের সঙ্গে শেষ সংঘর্ষের জন্যই প্রস্তুত হচ্ছিলেন। ১৯৩৯ সালে তিনি লান্‌ পিংগ্‌ (Lan Ping) নাম্নী এক সুন্দরী অভিনেত্রীকে বিয়ে করেন।

চীন কম্যুনিষ্ট দল রাশিয়ার সাহায্যে মান্‌চুরিয়া অধিকার করে এবং সেখানে জাপানীদের বহু অস্ত্রপাতি যা' রাশিয়ার অধিকারে আসে, সেগুলোর মালিক হ'য়ে দাঁড়ায়।

কিছুদিন পূর্বে কম্যুনিষ্ট দল মান্‌চুরিয়ার ঘাঁটি থেকে চিয়াং কাই-সেকের Kuomintang দলের বিরুদ্ধে বিরাট অভিযান আরম্ভ করে।

এখন প্রশ্ন জাগতে পারে যে চীন কম্যুনিষ্ট দল কি রাশিয়ার কম্যুনিষ্ট দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রয়েছে? চীন কম্যুনিষ্ট দলের (Central Executive committee of the King chantang) নীতি সম্বন্ধে মাও সি-টাংগ্‌ সভাপতি হিসেবে ১৯৪৫ সালে যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন তা' থেকে উক্ত প্রশ্নের জবাব হয় তো অনেকটা মিলবে। তিনি

বলেছেন : Our future of Ultimate programme is to advance China in the realm of socialism and communism. This has been settled and cannot be doubted. The very name of our party and our marxian world out-look definitely point to this boundlessly bright dirction of our highest ideal.

চিয়াং কাই-সেকের দল আজ দুর্বল হ'য়ে পড়েছে। চিয়াং কম্যুনিষ্ট দলের সঙ্গে শান্তির প্রস্তাবে তৎপর হ'য়েছেন। ন্যাশানালিষ্ট Kuomintang দল আজ বিক্ষিপ্ত; কম্যুনিষ্ট দলই আজ চীনের ভাগ্য নিয়ন্তা। মাও কিছুদিন পূর্বে যে শান্তি প্রতিষ্ঠার বাণী প্রচার করেছেন বেতার মারফৎ—সেখানেও তিনি চিয়াং কাই-সেকের দলকে তীব্রভাবে কটাক্ষ করেছেন। মাও বলেছেন, Kuomintang দলকে বিনষ্ট করতে যে শক্তির প্রয়োজন তা' কম্যুনিষ্ট দলের আছে। এমন কি চিয়াং কাই-সেককে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করতেও তিনি পশ্চাদপদ ন'ন। বিগত ১৪ই জানুয়ারী কম্যুনিষ্ট বেতার মারফৎ মাও সি-টাংগ্ ন্যাশানালিষ্ট গভর্ণমেণ্টের সহিত শান্তি প্রস্তাবের বাণী প্রচার করতে গিয়ে আটটি প্রস্তাব উপস্থিত করেছেন—যদি এই আটটি প্রস্তাব Kuomintang দল অকপটভাবে গ্রহণ করে—তবেই শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব হ'তে পারে। তাঁর আটটি প্রস্তাব হ'লো :—(১) যুদ্ধ পরিচালনায় অপরাধীদের শাস্তির ব্যবস্থা—চিয়াং কাই-সেক্‌কেও একই অপরাধে দণ্ডিত করা; (২) ন্যাশানাল এসেমব্লি কর্তৃক গৃহীত ১৯৪৭ সালের চীন নিয়মতন্ত্র শাসনের উচ্ছেদ করা; (৩) বর্তমান গভর্ণমেণ্টের শাসননীতির পরিসমাপ্তি করা; (৪) ডেমোক্রেটিক্ ভিত্তিতে ন্যাশানালিষ্ট আর্মির পুনর্গঠন করা; (৫) ব্যুরোক্রাটিক্ ক্যাপিটলের হস্তান্তরিত করা; (৬) ভূ-সম্পত্তির পুনঃ সংস্কার করা; (৭) বিদেশের সঙ্গে চীনের সকল চুক্তি (বিশেষ ক'রে যে সকল চুক্তি চীনকে বিদেশের কাছে বিক্রয় করার সমতুল্য) ছিন্ন করা; এবং (৮) ডেমোক্রেটিক ভিত্তিতে গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠান করা; (কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় শাসন ব্যবস্থা উভয়েই এর অন্তর্গত করা)।

মাও বলেছেন : Kuomintang এখন যুদ্ধ চালাতে অক্ষম তাই শান্তির প্রচেষ্টায় আগ্রহান্বিত। যদি Kuomintang দল সত্যকারের শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে চায় তবে তাদের উচিত প্রস্তাবিত আটটি সর্তকে মেনে নেওয়া।

প্রকৃতপক্ষে কম্যুনিষ্ট দলই আজ চীনের কর্তা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। বিদেশীয় শক্তিরও আজ Kuomintang দলকে সাহায্য করতে বিমুখ। চীনের সমস্যা এমন অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে যে যদি মাও প্রদত্ত উক্ত আটটি প্রস্তাব গৃহীত হয়—তবে চীনে সম্ভবতঃ একটি কোয়ালিসন্ গভর্ণমেণ্টের সৃষ্টি হ'তে পারে। কোয়ালিসন্ গভর্ণমেণ্ট সৃষ্টি হ'লেও কম্যুনিষ্ট দলই প্রাধান্য লাভ করবে এতে সন্দেহ নাই। Kuomintang দল এতে কতটুকু অংশ পাবে সে হ'চ্ছে চিন্তার বিষয়।

যাই হোক চীনের আভ্যন্তরিক পরিস্থিতি বর্তমানে অনেক সমস্যার সৃষ্টি ক'রে তুলেছে। ঘরের ও বাইরের যুদ্ধ চীনের অনেক ক্ষতি করেছে—বহু জীবন ও ধনসম্পত্তি নষ্ট হ'য়েছে। এখন প্রয়োজন সত্যকারের সর্ববিধ সংস্কার। চিয়াং কাই-সেকের গভর্ণমেণ্ট বহু দুর্নাম অর্জন করেছে। চীনের উন্নতিসাধন করতে পারলে Kuomintang দল হয় তো চীনবাসীর আস্থা হারাতো না। চীনবাসী এ ক' বছরে যে ক্ষতি স্বীকার করেছে, যে ধ্বংসের মুখে দিনের পর দিন নিজেদের এগিয়ে দিয়েছে—তা' গভীর নৈরাশ্যের ইতিহাস। এখন আশু প্রয়োজন এ সকল সমস্যার সমাধান ও শান্তি প্রতিষ্ঠার শুভ প্রচেষ্টা করা। যে গভর্ণমেণ্টই আজ চীনের ভবিষ্যৎ ভাগ্য নিয়ন্তা হো'ন না কেন—তাঁদের প্রধান ও প্রথম কর্তব্য হ'বে এ সকল সমস্যার সমাধান ও চীনবাসীর মনে সুশাসনের আস্থা স্থাপন করা। নয় তো চীনে শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রয়াস ব্যর্থ হ'বে।

গান

শ্রীমোহিনীমোহন বিশ্বাস

অন্তর মম, মন্দির তব, এস হে গোকুলচারী।
হৃদয় আমার, করেছি যমুনা
এস তীরে তার, করিয়া করুণা,
মোহন সুরে, বাজাও মুরলী, মোহন মুরলীধারী।
ভক্তির ফুলে, গেঁথেছি হে মালা,

কোথা আছ এস, এস নন্দলালা,
পরাণ রাধা যে, হয়েছে ব্যাকুলা, গোপিনী মনোহারী।
আছ তুমি জানি, জীবে জলে স্থলে,
দুর্জ্জয় মেরু, দূর নভোনীলে,
তবু চাহি শুধু, থাক অন্তরে, অন্তর দুখহারী।

পনেরোই আগস্ট

শচীন সেনগুপ্ত

(নাটক)

বালীগঞ্জের একটি আধুনিক ধরণে গঠিত দোতলা বাড়ীর সম্মুখের বাগান। বাড়ী ও বাগানের মাঝ দিয়া দুইদিকে দুইটি রাস্তা চলিয়া গিয়াছে পিছন দিকে। পিছন দিকে কয়েকটি রাণীগঞ্জ টালির চালাযুক্ত শেডের আভাস পাওয়া যাইতেছে। বাগানে একটা প্লাটফর্ম করা হইয়াছে। প্লাটফর্ম ভেদ করিয়া উঠিয়াছে ফ্লাগ-ষ্টাফ্,—প্লাটফর্মের তিন-দিকে কয়েকখানি চেয়ার বেঞ্চি। বাগানে,দুই পাশেই, মঞ্চের সম্মুখ দিকে পাম ও ঝাউ জাতীয় গাছের দুইটি ঝোপ। প্রত্যেকে ঝোপের মাঝে একখানি করিয়া বেঞ্চি। বাঁদিকের বেঞ্চিতে তিনটি নারী বসিয়া আছে—রাইমণি, কেতকী আর প্রভাবতী। রাইমণির বয়েস তেইশ, রোগা ময়লা, কপালে বড় সিন্দুরের ফোঁটা, হাতে শাঁখা, কাচের চুড়ি। লাল-পেড়ে ময়লা শাড়ীর আঁচলে মুখ চাপা দিয়া খুক্ খুক্ করিয়া কাসিতেছে। কেতকীর বয়েস পনেরো ষোলো। সে কুমারী। কানে দুল, গলায় সরু হার, হাতে দুগাছা করিয়া সোনার চুড়ি। নীলাম্বরী ডুরে শাড়ীতে তাহার তনুদেহ আবৃতা দর্শকদের দিকে পিছন রাখিয়া সে ঝুঁকিয়া পড়িয়া একখানি বই পড়িতেছে। প্রভাবতী স্থূলাঙ্গিনী। তাহার গলায় হাতে নানা রকমের অলঙ্কার, কিন্তু শাড়ী ময়লা। দর্শকদের দিকে মুখ করিয়া বসিয়া সে আন্তপানে চূণ মাখাইতেছে। মঞ্চের ডানদিকের ঝোপের কাছে দাঁড়াইয়া তিনটি লোক নিজেদের মাঝে কথা বার্ত্তা কহিতেছে। প্রমথ, অবনী, কার্ত্তিক। প্রমথ (৪০) রোগা, লম্বা, বাটার ফ্লাই গোঁফ। তাহার চোখে রোল্ড গোল্ডের চশমা, গায়ে টুইলের সার্ট, পায়ে অ্যালবার্ট স্লিপার, হাতে লাঠি। অবনী (৪৫) বেঁটে, টেকো মাথা, ঝোলা গোঁফ, হাফ সার্ট গায়ে। কার্ত্তিক (৩২) খেলোয়াড়ের মতো দেহ, তিন-চারদিন আগেকার কামানো দাড়ী গোঁফ, গলায় মালা, ফতুয়া গায়ে, গামছা কাঁধে। একটি তরুণ অস্থিরভাবে পিঞ্জরাবদ্ধ বাঘের মতো পায়চারি করিতেছে। খদ্দরের কাপড়, খদ্দরের পাঞ্জাবী। তাহার নাম দীপক। হঠাৎ থামিয়া দাঁড়াইয়া সে কহিল।

দীপক। দেখছেন, আমি যা বলেছিলাম তাই ঠিক কিনা!

পুরুষরা তাহার দিকে ঘুরিয়া দাঁড়াইল

বিবি এখনো দেখা দিলেন না!

প্রমথ। কালকার স্বাধীনতা দিনের উৎসব নিয়ে খুবই হয়ত ব্যস্ত আছেন।

দীপক। স্বাধীনতা!

কার্ত্তিক। সত্য ভাই দীপু। ছাখতে আছ না ঝাণ্ডা। তিনরঙা ঝাণ্ডা।

দীপক। ও দেখতে ত আমরা এখানে আসিনি!

প্রভাবতী। পাকিস্তানে এই তে-রঙা ঝাণ্ডার চলন নাই।

অবনী। পাকিস্তানের কথা এখানে বইস্তা কইওনা গিন্না।

কেতকী। ক্যান্? কমু না ক্যান্?

প্রভাবতী। জিগা লো কেতী, তোর জ্যাঠারে তাই জিগা।

দীপক। আমি শুনতে চাই ভিক্ষুকের মতো আর কতক্ষণ এখানে দাঁড়িয়ে থাকবেন আপনারা?

কার্ত্তিক। বাগ কইর‍্যা যাইতে পারি দীপু ভাই। কিন্তু কোথায় যামু কওচেন?

প্রমথ। ইংরেজের আমলে আমাদের শেখানো হোতো বেগার্স মাষ্ট নট বি চুজার্স। তারও আগে শোনা যেত, ভিক্ষার চালে কাঁড়-আকাঁড়া বিচার চলে না। ভিক্ষায় এসেচি, কতক্ষণ দাঁড়াতে হবে না হবে তা ভাবা আমাদের সাজে না!

দীপক। আপনি কি মনে করেন সত্যিই আপনারা ভিখিরী?

প্রমথ। আমি ত তাই ভাবি। বাড়ী গেল, ঘর গেল, এতদিনকার ওকালতী পেশা গেল।

দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বেঞ্চির উপর বসিল

কার্ত্তিক। হ কত্তা। বাস্ত নাই, বিত্ত নাই, রেস্ত নাই। ভিখারী হইতে আর বাকি আছে কি।

প্রমথ পায়ের কাছে বসিল

দীপক। কিন্তু কেন? কেন আমাদের বাড়ী গেল, ঘর গেল, বিত্ত গেল, পশার গ্যাল?

কার্ত্তিক। ভগারে জিগাও ভাই, ভগারে জিগাও।

প্রভাবতী। ক্যানরে দীপু, তোর বাপ নিষেধ করত স্বদেশী করতে, তুই তা কানে লইতিস্ না। অখন কি হইল? তোর স্বদেশীর লাইগ্যাইত আইজ সর্ব্বস্ব গ্যাল্।

অবনী। দীপুর বাপের কথায় আর কাজ কি! সে ত মইর্যা বাঁচছে।

দীপক। মানে?

অবনী। না মরলে এই বুইড়্যা বয়েসেও ভিক্ষার ভাণ্ড হাতে লইয়া দুয়ারে দুয়ারে ঘুইরা ব্যাড়াইতে হইত।

কেতকী। আমার বাবা আইত না ভিখ্ মাগ্‌তে।

অবনী। সাধ কইরা কি আইত মা, তোর লাইগ্যাই আইতে হইত।

কেতকী। ক্যান্ কওচে শুনি? আমার লাইগ্যা আইতে হইত ক্যান্?

অবনী। মাইয়া সব ভুইলা গ্যাল্! কমু নাকি রে কার্ত্তিক, কমু নাকি হাছেম আলির পোলাডার সেই পত্তরের কথা?

প্রভাবতী। তা কইবা না ক্যান্? মাইয়্যা লোকের মান রাখবার মুরোদ নাই, অপমানের কথা বড় গলা বাড়াইয়্যা কইবাই ত! পুরুষমানুষ তুমি!

কার্ত্তিক। হঃ সাইজ্যা কত্তা, সেই ঘিন্নার কথা তুমি আর কইয়ো না।

অবনী। হাছেম আলির পোলাডার কীর্ত্তি ভোলন যায় না কার্ত্তিক, ভোলন যায় না।

প্রমথ। যে নোংরামো পেছনে ফেলে এসেচি, তা নিয়ে আর কথা না বলাই ভালো, অবনী।

দীপক। আসবার সময় ভেবেছিলাম সীমান্ত পেরুলেই পরিচ্ছন্নতার পরিচয় পাব, মানবতার পরশ পাব। কিন্তু এখানেও সেই নোংরামো, সেই অমানুষিক ব্যবহার। স্বাধীনতা! পনেরোই আগষ্ট! মিথ্যা! মিথ্যা! কিছুই সত্য হয়ে উঠ্‌ল না!

কার্ত্তিক। চুপ দাও দীপু ভাই, চুপ দাও। ওই তিনি আইতাছেন।

বাড়ীর দরজা খুলিয়া একটি তরুণীকে বাহির হইয়া আসিতে দেখিয়া কার্ত্তিক ওই কথা বলিয়াছিল। সকলে তরুণীর দিকে চাহিয়া রহিল। তরুণীটি আগাইয়া আসিল। তাহার নাম সাধনা। বয়েস আঠারো-উনিশ। হাতে একটি পোর্টফোলিও ব্যাগ। খদ্দরের শাড়ী জামা আধুনিক ধরণে পরা। প্রমথ অগ্রসর হইয়া নমস্কার করিয়া কহিল :

প্রমথ। আসুন সাধনা দেবী। আসুন।

প্রতি-নমস্কার করিয়া সাধনা কহিল :

সাধনা। আসতে আমার বড্ড দেরী হয়ে গেছে।

দীপক। আমরা নিরাশ্রয়। আমাদের আর সময়ের মূল্য কি! এতক্ষণ এখানে ভিড় করে থাকাই আমাদের অপরাধ। ট্রেস্‌পাস।

সাধনা। আপনি খুব চটেছেন। অবশ্য তার যথেষ্ট কারণও রয়েচে। কিন্তু এসেই যখন ক্ষমা চেয়েচি, তখন……

প্রমথ। দীপকের কথা ধরবেন না। ও রগ-চটা ছেলে। কিন্তু হৃদয়বান। আমাদের সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করলেন, তাই বলুন।

সাধনা। দেখুন, পেছনের ওই শেড্‌গুলো বাবা করিয়েছিলেন একটা তাঁতশালা খোলবার জন্যে।

দীপক। তার আর দরকার হবে না।

বিস্মিত হইয়া তাহার দিকে ফিরিয়া সাধনা কহিল :

সাধনা। দরকার হবে না?

দীপক। না।

সাধনা। কেন?

দীপক। আপনাদের দেশ-শাসনের কর্ত্তারা যে ভাবে মিল-মালিকদের সঙ্গে গাটছড়া বেঁধে চলেছেন, তাতে তাঁতশালার কোন দরকারই দেশে থাকবে না।

সাধনা একটু শক্ত হইয়া কহিল :

সাধনা। আমি শাসন-কর্ত্তাদের কথা বলচি না, বলচি আমার বাবার সঙ্কল্পের কথা। বাবা চান আগামী কাল, পনেরোই আগষ্ট, তাঁর তাঁতশালার উদ্বোধন হয়।

দীপক। আপনার বাবাই কর্ত্তা। কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম যখন, তখন কালই তাঁতশালার উদ্বোধন হবে, আর আজ রাতেই আমাদের চলে যেতে হবে। এই ত?

প্রভাবতী। যাইতে কইলেই হইল! আমরা যামুনা! ধর্ম্মঘট করুম, অনশন ধর্ম্মঘট!

অবনী। আহা-হা গিন্নী, চুপ দাও, তুমি চুপ দাও!

প্রভাবতী। ক্যান্? চুপ দিমু ক্যান্? পরাণডা পুইড়্যা যায় না? দপ্ দপ্ কইয়্যা পুইড়্যা যায় না?

ইন্দিরপুরীর লাগান বাড়ী ছাইড়্যা চইলা আইলাম, পোলাপান গুলারে কুত্তার বাচ্চার লাগান বিলাইয়া দিয়া আইলাম, আমার সাজানো বাগানের মাচায় মাচায় লাউ সিম হাসতে আছে, বাতাসে দোলতে আছে বড় বড় বাইগোন……

ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। সাধনা তাহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্ত কহিল :

সাধনা। আপনি কাঁদবেন না। আপনাদের আমি চলে যেতে বলিনি।

প্রভাবতী। কও নাই ত?

সাধনা। না।

কার্ত্তিক। তুমি রাজরাণী হইবা মা, রাজরাণী হইবা।

অবনী। হাঙ্গামা-হুজ্জত আমরা করুম না।

প্রমথ। এই বাস্তুহারাদের যে উপকার আপনি করলেন, তা চিরদিন মনে থাকবে।

সাধনা দীপকের দিকে ঘুরিয়া কহিল

সাধনা। আপনি ত কিছু বল্লেন না। এখনো রেগে রইলেন?

দীপক। না। এই অপ্রত্যাশিত দয়া চিরদিন মনে রাখব।

মহিম বাড়ীর দুয়ারের কাছে দাঁড়াইয়া ডাকিল

মহিম। সাধনা।

সাধনা। দাঁড়াও বাবা, আমি তোমাকে নিয়ে আসচি।

সমবেত লোকদের কহিল

আমার বাবা অন্ধ। দয়া করে আপনাদের দুর্দ্দশার কথা আজ ওঁকে কিছু বলবেন না।

সাধনা বাড়ীর দিকে চলিয়া গেল। মহিম ততক্ষণ খানিকটা নামিয়া আসিয়াছে। কাঁচা-পাকা চুল ঘাড় পর্য্যন্ত পড়িয়াছে। দাড়ী গোঁফ কামানো। চোখে কালো চশমা। খদ্দরের ধুতি চাদর। সাধনা তাহার হাত ধরিয়া তাহাকে সামের দিকে আগাইয়া আনিতেছে।

কার্ত্তিক। দীপু ভাই, বুইড়্যা অন্ধরে কিছু কইওনা ভাই।

অবনী। মাইয়া আশ্রয় দিছে, বুইড়্যা আর তাড়াইয়া দিব না।

মহিম। অনেকের গলা পাচ্ছিলাম। কালকার উৎসবের আয়োজন হচ্ছে বুঝি! প্রভাত-ফেরী, সঙ্গীত পাঠ, পতাকা-উত্তোলন……

সাধনা। হ্যাঁ, বাবা, সবই হবে যেমন যেমন তুমি বলেছিলে।

মহিম। যে-সে উৎসব ত নয়, স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার উৎসব। জাতির পক্ষে কী যে শুভদিন, তা ভাষা দিয়ে বোঝানো যায় না।

প্রমথ। আপনি বসুন।

মহিম। আপনারা, মনে হচ্ছে, দাঁড়িয়ে আছেন।

সাধনা। তুমি বোস বাবা।

একখানি চেয়ারে তাহাকে বসাইয়া দিল

মহিম। উনিশ শ' সাতচল্লিশ সালের পনেরোই আগষ্ট পর্য্যন্ত ছিল অন্তহীন অমানিশা, বিরামবিহীন দুর্য্যোগ। সেই অন্ধকার ভেদ করে যে আলো ফুটে উঠেচে, আমি তা চোখে দেখতে পাচ্ছিনে, কিন্তু তার উষ্ণ পরশ অনুভব করচি, কানেও যেন শুনচি।

সুরলোকে বেজে ওঠে শঙ্খ
নরলোকে বাজে জয়ডঙ্ক
এল মহাজন্মের লগ্ন

এই মহাজন্ম লাভ করলেই এতদিনকার সাধনা সার্থক হবে। তাই স্বাধীনতা পাবার মুহূর্ত্তটি জাতির পরম মুহূর্ত্ত।

দীপক। আপনাদের সেই পরম মুহূর্ত্তের চরম পরিচয় হয়ে দাঁড়িয়েচি আমরা।

মহিম। তোমরা তরুণ, তোমরাইত হবে তার প্রত্যক্ষ পরিচয়। আমাদের আয়োজন শেষ, এবারে তোমাদের শুরু।

সাধনা। আপনাদের সঙ্গে যে-কথা ছিল, তা হয়ে গেছে। এখন সব ব্যবস্থা করে ফেলুন গে।

মহিম। তাঁতশালা প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা?

সাধনা। না বাবা, তাঁতশালা প্রতিষ্ঠা কাল হবে না।

মহিম। হবে না। কেন?

সাধনা। আকস্মিক একটা বিঘ্ন দেখা দিয়েচে।

মহিম। নানা বিঘ্ন অতিক্রম করে জাতি যেখানে পৌঁচেছে, সেখানে সংগঠন আর উৎপাদনই হওয়া উচিত শ্রেষ্ঠতম কাজ। কাল তারই একটা কিছু শুরু হলে

সভ্যিকারের উৎসব হোতো। ওটা বাদ দিলে থাকবে শুধু উচ্ছ্বাস আর আড়ম্বর।

সাধনা। আপনারা অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে আছেন। এখন গিয়ে......

মহিম। বসুন না ওঁরা একটু। একবছর পরে সেই শুভদিনটি কাল আবার ঘুরে আসচে। কতটা পেলাম, কতটুকু কি করলাম, কতখানি অসমাপ্ত রইল, তার আলোচনা খানিকটা করা যাক্। ওঁদের জন্য চা আনতে বলে দাও সাধনা।

দীপক। চা আমরা খাই না।

মহিম। কেউ খান না?

দীপক। আগে অনেকেই খেতাম, এখন খাই না।

কার্ত্তিক। প্যাটে খাইতে পাই না কত্তা, চা দিয়া গলা ভিজাইয়া করুম কি!

মহিম। সাধনা, এঁরা কারা মা?

সাধনা। আমি চিনিনা, বাবা।

দীপক। কাল আপনারা যে স্বাধীনতার উৎসব করচেন, সেই স্বাধীনতার বলি আমরা—পূব-বাঙ্গলার বাস্তুহারা কয়েকজন হিন্দু নর-নারী, আপনাদের রাজনৈতিক ভাষায় যাদেরকে বলা হয় মেম্বার্স অব্ দি মাইনরিটি কম্যুউনিটি।

মহিম। ও। তা এখানে কি মনে করে আসা হয়েচে?

দীপক। আপনার বাড়ীর পেছনের শেড্গুলিতে আমরা আশ্রয় নিয়েচি।

মহিম। কে আশ্রয় দিলে?

প্রমথ। আপনার মেয়ে।

কার্ত্তিক। মা আমার রাজরাণী হইব কত্তা।

মহিম। সাধনা!

সাধনা। বাবা?

মহিম। তুমি এঁদের আশ্রয় দিয়েচ?

সাধনা। ওঁরা কাউকে কিছু না বলে দখল করে নিয়েচেন।

মহিম। পুলিশে খবর দাওনি কেন?

সাধনা। তোমাকে না জিজ্ঞাসা করে তা উচিত হবে না জেনে।

মহিম। এ বিষয়ে আমার মত ত তুমি জান।

সাধনা। কাল স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার উৎসব, আজ একটা অপ্রিয় কাজ করতে আমার বাধল।

মহিম। আমি চাই না যে পূব-বাঙ্গলার হিন্দুরা তাদের রাষ্ট্র ছেড়ে চলে আসুক। আমাদের নায়করা, আমাদের শাসকরাও, তা চান না।

দীপক। আপনারা না চাইলেই যে আমরা নিবৃত্ত থাকব, তা ভাবচেন কেন?

মহিম। নিবৃত্ত রাখবার জন্যই ত পুলিশে খবর দেবার কথা বল্লাম।

প্রভাবতী। আরে বুইড়্যা, পুলিশ পুলিশ কইরা মরতে আছ কিসের লাইগ্যা শুনি? পুলিশ আমরা দেখি নাই? সত্যাগ্রহ আমরা করি নাই?

অবনী। আ-হা-হা গিন্নী, তুমি মাইয়া-ছ্যাইল্যা...

প্রভাবতী। তুমি রা কইরো না। মাইয়া-ছ্যাইল্যা আমিই ওই বুইড়্যারে জিগাইতে চাই—আমাগোরে পাকিস্তানে পইড়্যা থাকতে কয় ও কোন মুখে? চক্ষের দৃষ্টি গেছে, মুখেও রা থাকবো না। কাণা আছ, বোবা হইবা।

সাধনা। আপনারা এখানে থেকে আমার বাবার অসম্মান করবেন না।

প্রভাবতী। তুমি মাইয়া, বাপের মান গ্যালে তোমার বুক পুইড়্যা যায়। আর আমি মা, আমার মাইয়ার মান বাঁচাইবার লাইগ্যা যদি পাগলের লাগান ছুইট্যা আহি, আমার হইব অন্যায়?

সাধনা। আপনি কেন আশ্রয়ের জন্য এসেচেন? আপনার সারা গায়ে গয়না ঝলমল করচে।

প্রভাবতী। এই গয়নাই দ্যাখলা, বুকের জ্বালা বোঝলা না! নিবা এই গয়না? গয়না নিয়া দিবা ফিরাইয়া আমার সেই বাড়ীঘর সুখের সংসার?

সাধনা। চল বাবা, আমরা ঘরে যাই।

মহিম। না মা, আমি ওঁদের কথা শুনব। পূব-বাঙ্গালার বহু লোকের সঙ্গে এককালে আমার নিবিড় সম্বন্ধ ছিল। কথায় বার্ত্তায় ব্যবহারে, দানে ত্যাগে মহানুভবতায় তারা সত্যিই ছিল অনুপম। আমরা যা জানি, তার চেয়েও গভীর কোন পীড়া না পেলে তাদের চা

মাধুর্য্য এমন তিক্ত হতে পারে না। ওঁদের সবার সব কথাই আমি শুনব। কজনা এসেচেন?

সাধনা। এখানে আছেন তিনটি স্ত্রীলোক, আর চারটি পুরুষ। শেড্ দখল করে রয়েচেন আরো কয়েকজন।

প্রমথ। সব সমেত আমরা কুড়িজন এখানে এসেচি।

মহিম। খোলসা করে বলুন ত কেন আপনারা এসেচেন।

দীপক। হাওয়া খেতে আসিনি, মশাই।

মহিম। দেখুন, আকস্মিক কোন দুরবস্থা মানুষকে উত্তেজিত করে তোলে আমি জানি। কিন্তু উত্তেজনায় উন্মত্তের মতো আচরণ করলে লাভ কিছুই হয় না। আপনারা আমার বাড়ীতে এসেচেন আশ্রয়প্রার্থী হয়ে। কি দুঃসহ অবস্থায় পড়ে আপনারা এসেচেন, তা যদি জানতে চাই তা কি অন্যায় হবে?

প্রমথ। আজ্ঞে না। আপনাকে তা জানানোই হবে আমাদের কর্ত্তব্য। আগে আমার কথাই শুনুন। আমি জেলার সদর আদালতে ওকালতী করতাম। ওকালতী করেই বাড়ীঘর করেছিলাম, জমি-জমাও কিছু কিছু। হঠাৎ একদিন হুকুম হোলো আমার বাড়ীটা ছেড়ে দিতে হবে।

সাধনা। আপনি প্রতিবাদ করলেন না?

প্রমথ। করলাম। কিন্তু রাষ্ট্রের প্রয়োজন, তাই প্রতিবাদ টিকল না। বাড়ী ছেড়ে দিতেই হোলো। কিন্তু জিনিষ-পত্তর যখন নিয়ে আসবার আয়োজন করলাম তখন বাধা পড়ল।

সাধনা। কে বাধা দিল?

প্রমথ। বাধা রাষ্ট্র দিল না, দিল একদল গুণ্ডা। টেনে-টুনে সবই তারা নিয়ে গেল। থানায় গেলাম। থানা-অফিসার এজাহার নিলেন, সহানুভূতিও জানালেন। কিন্তু আসামীদের আর ধরা হোল না।

মহিম। কেন?

প্রমথ। কেন ধরা হোল না তা জান্তে চাইলাম, কিন্তু কোন সদুত্তর পেলাম না।

মহিম। প্রটেকশন নেই বলেই চলে এলেন বুঝি?

প্রমথ। না, তা বুঝেও সেইখানেই থাকবার ব্যবস্থা করলাম। একটা বাসা ভাড়া নিলাম। শুরু হলো পত্রাঘাত। প্রত্যহই উড়ো-চিঠি দিয়ে শাসানো হতে লাগল —গুণ্ডাদের নাম পুলিশকে বলে দিয়ে আমি যে অপরাধ করিচি তার শাস্তিস্বরূপ গুণ্ডারা অনতিবিলম্বে আমার মেয়েকে, আর মেয়ের মাকেও ছিনিয়ে নিয়ে যাবে। আমার মেয়েকে তারা করবে বিয়ে, আর মেয়ের মাকে নিকে!

মহিম। বলেন কি!

প্রমথ। চিঠিতে যা তারা লিখেছিল, কাজে তা পরিণত করলে জিনিষ-পত্তরের মতো মেয়েকে আর তার মাকেও কোনকালে ফিরে পাওয়া সম্ভব হবে না বুঝেই এক বাদলা রাতে চোখের জল মুছতে মুছতে পালিয়ে এলাম।

মহিম। তাইত!

কার্ত্তিক। কত্তা, সাধ কইর‍্যা আমরা কেউ আসি নাই কত্তা। অখন শোনেন আমার কথা। গাঁয়ের মানুষ, গাঁয়ে থাকি; তাঁতও চালাই, লাঙলও ঠেলি। হিন্দুস্থানও জানিনা পাকিস্থানও বুঝিনা। এক রাইতে হইল ডাকাতি। বাইছ্যা বাইছ্যা হিন্দুর বাড়ীতেই ডাকাতি, মোছলমান পাড়ায় কিচ্ছু না। দাউ দাউ কইর‍্যা হিন্দুর ঘর জ্বলে। পোলা কান্দে, মাইয়া কান্দে, কান্দে হিন্দুর বউ-ঝি। পাথর নামানুষ আমি? একখানা রাম-দা লইয়া ছুইট্যা বাইর হইলাম। পড়ল পিঠে ডাকাইতগোর এক ডাণ্ডা। কাতরাইয়া উঠলাম শুয়ারডার লাগান। সেই কাতরাণি তলাইয়া, কত্তা, ভাইস্যা আইল আমার ওই বউডার বুক-ফাটা কান্না। অসুরের লাগান তখন ছোটলাম কত্তা, বাড়ীর দিকে।

প্রভাবতী। বাড়ী তোমার তখন দাউ-দাউ জ্বলতেছে আছে।

কার্ত্তিক। হাচা কইছ ঠান্, বাড়ী তখন জ্বলতে আছে। আগুনের আলোয় দেখলাম ডাকাইতরা বউডারে টাইন্যা লইয়া যাইতা আছে। জ্ঞান ত ছিল না কত্তা, কেমন কইর‍্যা বউডারে যে ছিনাইয়া আনলাম কইতে পারি না। টানাটানিতে বউডার বুকে লাগল দরদ, কাসতে লাগল, রক্তও বার হইল পোয়া দেড়পোয়া।

রাইমণি কাসিল

সেই কাসি অর থামে নাই। ওই শোনেন কত্তা।

কেতকীর হাত ধরিয়া টানিয়া আনিতে আনিতে মোক্ষদা কহিল:

প্রভাবতী। মুখ বইজ্যা সব কথাই ত শোনলাম, অখন

এই মাইয়াডার দিকে চাইয়া ছাখ। আ-আ আমার পোড়া কপাল! কী যে কই আমি! ভগবান যার চক্ষু খাইছেন, সে আবার ছাখবে কি দিয়া!

মহিম। এইবার তুমি ভুল করলে মা। চোখের দৃষ্টি ভগবান নেন নি।

প্রমথ। শক্ত কোন অসুখ হয়েছিল বুঝি?

মহিম। হ্যাঁ, সময়টা অসুখেরই ছিল, ইংরেজ আমল। পুলিশ হাজতে পুরে একবার বেদম প্রহার দেয়। ওই কার্তিকের মতোই বলতে পারি—জ্ঞান ত ছিল না! হাসপাতাল থেকে বেরুলাম দৃষ্টিহীন হয়ে।

প্রভাবতী। এই মাইয়্যাডার ইজ্জৎ রাখবার লাইগ্যা পাকিস্তান ছাইড়্যা চইলা আইলাম কৃষ্টনগর। বড় মাইয়্যাডারে লইয়া জামাই ওঠল গিয়া তার কুটুম-বাড়ী। জামাইয়ের কুটুম আমাগো ডাইক্যাও জিগায় না। দুইদিন কাটাইলাম ইষ্টিশানে। তারপর গেলাম নবদ্বীপ। ভাসুর আগে আইস্যা জমাইয়া লইছেন, কিন্তু ভাই আর ভাই-বউরে থাকতে দিতে চান না।

অবনী। আহাহা! ঘরের কেচ্ছা কও কিসের লাইগ্যা।

প্রভাবতী। ক্যান্, তোমার ভালা-মানুষ ভাই! না? জা আমার বাজা, পোলা-পান প্যাটে ধরে নাই। তার গায়ে পিঠে হাত বুলাইয়া রাজী করাইয়া আমার কোলের মাইয়্যাডারে তার কাছে রাইখ্যা চইল্যা আইলাম এই কইলকাত্তায়। কইলকাত্তার তোমরাও চাও তাড়াইয়া দিতে। যামু কোন চুলায়, কও? যমের বাড়ী যাইতে কও যামু, কিন্তু তোমাগোরেও রাইখ্যা যামু না, লগে লগে টাইন্যা লইয়া যামু।

অবনী। লাজ-সরমের মাথা কি একেবারে খাইলা তুমি?

প্রভাবতী। তুমি বিশ বছর আমারে লইয়া ঘর করতে আছ, তোমারেই জিগাই, শ্বশুর-ভাশুরের মুখের দিকে চাইয়া কখনো কথা কইছি, না পর-পুরুষের সামে ঘুমটা কখনো খুলছি? তোমার লগেও কথা কইতাম ফিস্ ফিস্ কইর‍্যা, আড়ালে-আবডালে, ঘরের বাতী নিবাইয়া। সেই আমি আজ পথে পথে ঘুইর‍্যা বেড়াই, শিয়াল-কুত্তার লাগান এই ভাগ্যবান গেরস্তগোর তাড়া খাই, বে-আবরু দশজনের চক্ষের পর তোমার পাশে শুইয়া রাত কাটাই!

বলিতে বলিতে হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া বসিয়া পড়িল

মহিম। সাধনা ওঁকে শান্ত কর। দুঃখের এই বন্যায় ভেসে বেড়ানো সত্যই দুঃসহ।

সাধনা প্রভাতীর পিঠে হাত রাখিয়া কহিল

সাধনা। এমন করে কাঁদবেন না।

প্রভাবতী। কাঁদুম না ত করুম কি, কও? কাইন্দ্যা কাইন্দ্যা তোমার ওই বুইড়্যা বাপের লাগান অন্ধ হইয়া যামু। ওই মাইয়্যাডা, কেতকী, আয়না লো আমার কাছে।

কেতকী তাহার পাশে গিয়া দাঁড়াইল

এই কেতী, য্যারে আমি প্যাটে ধরি নাই, পড়শীর মাইয়্যা। অর ভাই ওই দীপু পড়াশুনা ছাইড়্যা স্বদেশী কইর‍্যা বেড়াইত, জেলে-জেলেই দিন কাটাইত। বুইড়্যা বাপ মইর‍্যা হাড্ডি জুড়াইল। মাইয়াডা পড়ল আমার ঘাড়ে। না পারি নামাইতে, না পারি তাড়াইতে। মানুষ করতে লাগলাম। ইস্কুলে পড়াই। মাইয়্যা আমার ম্যাট্রিক দিব। কিন্তু শত্তুররা লাগল পিছে। পথ আগলাইয়া দাঁড়াইত, চোখ মারত, মস্করা করত। ক'না কেতী, ক'না তুই!

কেতকী। না, আমি কিছু কমুনা।

প্রভাবতী। কস্ না লো, কস্ না; কেউ রা কাড়স্ না! সকলে থাক্ মুখ বুইজ্যা, আর আমি মাগী মরি চিল্লাইয়া।

দীপক। তুমিও আর কিছু বলোনা, খুড়িমা। ব্যথার কথা, লজ্জার কথা, শুনিয়ে পাষাণের দয়া পেতে চাও তুমি! চল পুলিশ আসবার আগেই আমরা চলে যাই। (ক্রমশঃ)

স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম

শ্রীগোকুলেশ্বর ভট্টাচার্য্য

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

১৯০৪ সালে বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ দাস জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম বঙ্কিমবিহারী দাস। শৈশবকালেই যতীন্দ্রনাথের মাতৃ-বিয়োগ হয়।

১৯২০ সালে তিনি ভবানীপুর মিত্র ইন্‌স্‌টিটিউসন হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। গান্ধীজীর নেতৃত্বে তখন অসহযোগ আন্দোলন সুরু হইয়াছে। যতীন্দ্রনাথ কলেজে ভর্ত্তি হইলেন বটে, কিন্তু পড়াশুনা বেশিদিন চালাইতে পারিলেন না। দেশসেবার আহ্বান তাঁহাকে চঞ্চল করিয়া তুলিল এবং দক্ষিণ কলিকাতা কংগ্রেস কমিটির অধীনে তিনি কর্ম্মে অবতীর্ণ হইলেন। ১৯২১ সালে পশ্চিম বঙ্গে বন্যার প্লাবন ঘটিলে যতীন্দ্রনাথ বন্যাপীড়িত এলাকায় সেবাকার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন।

১৯২১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে যতীন্দ্রনাথকে প্রথম কারাদণ্ড ভোগ করিতে হয়। এই বৎসরই জুলাই মাসে তিনি পুনরায় দ্বিতীয়বার তিন মাসের জন্য কারাবরণ করেন। তিনি যখন জেল হইতে মুক্তিলাভ করিলেন, তখন অসহযোগ-আন্দোলনের বেগ অনেকটা মন্দীভূত হইয়াছে। পুনরায় শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে যতীন্দ্রনাথ আশুতোষ কলেজে প্রবিষ্ট হইলেন। ১৯২৪ সালে তিনি সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইলেন দক্ষিণ কলিকাতা কংগ্রেস কমিটির এবং বিপ্লবী শচীন্দ্রনাথ সান্যালের সহিতও এই সময় তাঁহার যোগাযোগ ঘটিল। ইহার ফলে তিনি অন্যান্য সহকর্ম্মীদের সহায়তায় দক্ষিণ কলিকাতা তরুণ সমিতি নামে একটি সমিতি সংগঠিত করিলেন। এই সমিতির উদ্দেশ্য হইল দেশের তরুণ যুবকগণের শক্তিকে সংহত করিয়া তাহাদের মনে উৎসাহ ও প্রেরণা সঞ্চার দ্বারা বৈপ্লবিক ক্রিয়া-কলাপের উপযোগী করিয়া তুলা।

গণ-আন্দোলন বন্ধ হইয়া গেলে দেশে যখন বিপ্লববাদ আবার প্রসারলাভ করিতে লাগিল, তখন ১৯২৩ ও ১৯২৪ সালে যে বহু নেতাকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হইল, তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। ১৯২৪ সালের ৫ই নভেম্বর রাত্রিকালে যতীন্দ্রনাথকেও পুলিশ গ্রেপ্তার করিল। গ্রেপ্তার করিয়া প্রথমে তাঁহাকে আলিপুর প্রেসিডেন্সি জেলে রাখা হয়—পরে স্থানান্তরিত করা হয় মেদিনীপুর জেলে। মেদিনীপুর জেলে অবস্থানকালে তিনি পীড়িত হইয়া পড়িলে তাঁহাকে ঢাকা জেলে পাঠান হইল।

এই ঢাকা জেলে থাকিতে থাকিতেই যতীন্দ্রনাথ প্রথমবার অনশন অবলম্বন করিয়াছিলেন। জেল সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের গর্হিত আচরণের প্রতিবাদে এই সময় তিনি বিশ দিন উপবাস পালন করিয়াছিলেন। শেষ পর্য্যন্ত সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট তাঁহার অভিযোগের প্রতিকার করিবার প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় এবং ক্ষমা প্রার্থনা করায় তিনি প্রায়োপবেশন ভঙ্গ করেন। অতঃপর তিনি প্রেরিত হন পাঞ্জাবের এক জেলে এবং সেখান হইতে তাঁহাকে আনিয়া পরে আবার চট্টগ্রাম জেলার এক গ্রামে কিছুদিন অন্তরীণে আবদ্ধ করিয়া রাখা হয়। অবশেষে ১৯২৮ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর তারিখে তিনি মুক্তিলাভ করেন।

মুক্তি পাইয়া তিনি শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে ভর্ত্তি হইলেন বঙ্গবাসী কলেজে। এখানে তিনি বি-এ, পড়িতে লাগিলেন। ১৯২৮ সালে কলিকাতায় কংগ্রেসের যে গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশন হয়, তদুপলক্ষে গঠিত

যতীন্দ্রনাথ দাস

বিরাট স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সংগঠন ব্যাপারেও যতীন্দ্রনাথ বিশেষ অংশ গ্রহণ করেন। এই অধিবেশনের সময় ভারতের নানা স্থানের বিপ্লবীরা আসিয়া একত্রে যুক্তি-পরামর্শের সুযোগ পান এবং নূতন কর্ম্মোদ্যোগের সূচনা হয়। সম্মিলিত প্রধান বিপ্লবীদিগের সহিত যতীন্দ্রনাথও ছিলেন।

১৯২৯ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির রংপুর অধিবেশনের প্রাক্কালে বাংলার নেতৃস্থানীয় তরুণ বিপ্লবীরা সমবেত হইয়া তাঁহাদের ভবিষ্যৎ কার্য্যক্রম নিরূপিত করেন। স্থির হয় যে কয়েকটি জেলার অস্ত্রাগার প্রভৃতি আক্রমণ এবং ছোট ছোট ঘাঁটিগুলি অধিকার করার

চেষ্টা করা হইবে। চট্টগ্রামে যে সশস্ত্র অভ্যুত্থান পরবর্তীকালে ঘটিয়াছিল—তাহা ছিল এই পরিকল্পনারই অন্যতম অংশ।

অস্ত্র-শস্ত্র সংগ্রহ এবং উত্তর ভারতের বিপ্লবী-দলগুলির সহিত যোগাযোগ রক্ষার ভার পড়িয়াছিল যতীন্দ্রনাথের উপর। বোমা তৈয়ারীতেও যতীন্দ্রনাথের দক্ষতা ছিল। সাণ্ডার্স-হত্যার পর পলায়িত অবস্থায় গোপনে ভগৎ সিং কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হন এবং পাঞ্জাবে সন্ত্রাসবাদী ক্রিয়া-কলাপ চালাইবার জন্য বাংলার বিপ্লবীদিগের নিকট অস্ত্র-শস্ত্র প্রার্থনা করেন। দিল্লীর আইন-পরিষদ-ভবনে বোমা নিক্ষেপের প্রয়োজনীয়তার উপরও তিনি গুরুত্ব আরোপ করিলেন। প্রার্থনা মত কিছু পরিমাণ অস্ত্র-শস্ত্র বাংলার বিপ্লবীরা ভগৎ সিং-কে দিলেন—কিন্তু ভগৎ সিং-এর বোমা ও অস্ত্র-শস্ত্রের প্রয়োজন ছিল প্রচুর। এবিষয়ে ভগৎ সিং যতীন্দ্রনাথের সহায়তা প্রার্থনা করায় তিনি বোমা তৈয়ারী করিয়া দিয়া ভগৎ সিং-এর দলবলকে সাহায্য করিবার জন্য উত্তর ভারতে গিয়া কিছুদিন অবস্থান করিতে থাকেন। ইহার পর দিল্লীর আইন-পরিষদ-ভবনে বোমা নিক্ষিপ্ত হয় এবং পরে লাহোর ষড়্‌যন্ত্র মামলা উপলক্ষে অন্যান্য বিপ্লবীদের সহিত যতীন্দ্রনাথকেও পুলিশ গ্রেপ্তার করে।

অনশন অবলম্বনের যুক্তিযুক্ততা সম্বন্ধে যখন লাহোর ষড়্‌যন্ত্র মামলার বন্দীদিগের মধ্যে আলোচনা হয়—তখন এইরূপ অনশনের বিরুদ্ধেই যতীন্দ্রনাথ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি জানাইয়াছিলেন যে অস্ত্রের সাহায্যে অত্যাচারী বৃটিশ সাম্রাজ্যের অবসান সংঘটিত করা যে বিপ্লবীদিগের কার্য্য এবং উদ্দেশ্য, তাঁহাদের পক্ষে অহিংস প্রায়োপবেশন অবলম্বন করিয়া অভিযোগের প্রতিকারের উপায় অন্বেষণ করা ঠিক হইবে না; বরং সংগ্রামের পথে বৃটিশ সাম্রাজ্যের ধ্বংস সাধনের কার্য্যকরী পন্থা অনুসরণ করাই অধিকতর শ্রেয়ঃ হইবে। যতীন্দ্রনাথের এই অভিমত অনেকে সমর্থন করিলেন বটে, কিন্তু অনেকে আবার তাঁহাকে উপহাসও করিলেন। তাঁহারা ভাবিলেন যে অনশন অবলম্বনের ভয়েই বোধহয় যতীন্দ্রনাথ ঐরূপ যুক্তি দেখাইতেছেন।

সেদিন যাঁহারা যতীন্দ্রনাথকে চিনিতে ভুল করিয়াছিলেন—তাঁহাদের ভুল ভাঙ্গিয়াছিল ইহারই কয়েক মাস পরে—১৩ই সেপ্টেম্বর তারিখে।

পরামর্শের পর বিপ্লবীরা স্থির করিলেন যে অভাব-অভিযোগের প্রতিকারকল্পে তাঁহারা প্রায়োপবেশন সুরু করিবেন এবং এই উপলক্ষে তাঁহাদের প্রদত্ত বিবৃতিতে অভাব-অভিযোগের বিষয় থাকিবে বটে—কিন্তু বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গী লইয়াই বিবৃতি রচিত হইবে। ভগৎ সিং পরে এই বিবৃতি আদালতে পাঠ করিয়াছিলেন। অনশন ধর্ম্মঘট আরম্ভ করার সময় যতীন্দ্রনাথ সহকর্মীদিগকে এই প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ করিয়া লইলেন যে, দাবী পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত কেহ প্রায়োপবেশন ভঙ্গ করিতে পারিবেন না।

ইহার পরই সুরু হইল বন্দীদিগের অনশন ধর্ম্মঘট। কখনও ভয় দেখাইয়া, কখনও প্রলোভন দেখাইয়া কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদের উপবাস ভঙ্গ করাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন—কিন্তু তাহাতে কোনও ফল হইল না।

প্রায়োপবেশন আরম্ভের কয়েকদিন পরেই যতীন্দ্রনাথের শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িল। ১৮ই জুলাই যতীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কিরণ দাস এ বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিলেন—তাঁহারা কিন্তু অবিচলিত। অনশনের দ্বাদশ দিবসে চেষ্টা করা হইল জোর করিয়া খাওয়াইবার। নাক এবং মুখ দিয়া দুইটা নল প্রবিষ্ট করাইয়া সেই নলের সাহায্যে দুগ্ধ প্রভৃতি তরল খাদ্য যতীন্দ্রনাথের পাকস্থলীতে ঢালিয়া দিবার চেষ্টা করা হইল। ইহার ফল হইল অতিশয় মারাত্মক। গলার নলটি শ্বাসনলী দিয়া ফুসফুসের দিকে চলিয়া যাওয়ায় ঢালিয়া দেওয়া তরল পদার্থ উদরে না গিয়া ফুসফুসে গিয়া সঞ্চিত হইল এবং তাহার ফলে তাঁহার ফুসফুসে উপস্থিত হইল দারুণ যন্ত্রণা। তাঁহার শ্বাসক্রিয়া প্রায় বন্ধ হইয়া যাওয়ার উপক্রম হইল—নাক দিয়া পড়িতে লাগিল রক্ত। ডাক্তারের জোর-জবরদস্তির ফলে তাঁহার পাকস্থলীও জখম হইল। যতীন্দ্রনাথ শীঘ্রই সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িলেন। তাঁহাকে জেল হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইল।

তিন দিন যতীন্দ্রনাথ অচৈতন্য অবস্থায় রহিলেন। ইন্‌জেক্‌সন প্রভৃতি প্রয়োগ করিয়া তিন দিন পরে তাঁহার সংজ্ঞা ফিরাইয়া আনা গেল বটে, কিন্তু নিউমোনিয়ার লক্ষণ তাঁহার শরীরে পরিস্ফুট হইল। অসহ্য যন্ত্রণায় কাতর হইতে থাকিলেও তিনি ঔষধ বা পথ্য গ্রহণে সম্মত হইলেন না।

অনশনের অষ্টাদশ দিবসে যতীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ সহোদরকে তাঁহার নিকট থাকিবার জন্য কর্ত্তৃপক্ষ অনুরোধ জানাইলেন এবং তখন হইতে কনিষ্ঠ কিরণচন্দ্র তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার শয্যাপার্শ্বে থাকিয়া তাঁহার শুশ্রূষায় রত হইলেন। নিকটে থাকিতে দিবার পূর্ব্বে যতীন্দ্রনাথ কিন্তু কিরণচন্দ্রকে একটি কঠোর সর্ত্তে আবদ্ধ করিয়া লইলেন। কিরণচন্দ্রকে প্রতিশ্রুতি দিতে হইল যে, সজ্ঞান বা অজ্ঞান যে কোনও অবস্থায় যতীন্দ্রনাথ যদি কোনও সময় খাদ্য বা পানীয় চাহিয়া বসেন, তথাপি তিনি তাহা দিবেন না। কক্ষে জলের কুঁজা থাকিলে যদি কোনও সময় তাহা দেখিয়া তিনি জলপানের জন্য প্রলুব্ধ হন, সেইজন্য জলের কুঁজা যতীন্দ্রনাথ ইতিপূর্ব্বেই ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিলেন। যতীন্দ্রনাথের কঠোর সাধনা এইভাবেই সিদ্ধিলাভের পথে অগ্রসর হইতেছিল।

এদিকে তাঁহার শারীরিক অবস্থা দিনের পর দিন অতিশয় শোচনীয় হইয়া উঠিতে লাগিল। ওজন কমিয়া গেল ২৫ পাউণ্ড—৫ই আগষ্ট নাগাদ নাড়ীর গতিও নামিয়া গেল পঞ্চাশের নীচে। প্রসিদ্ধ জন-নায়কগণের কেহ বা তাঁহাকে অনশন ভঙ্গের অনুরোধ জানাইলেন, কেহ বা পত্র লিখিলেন কারা-কর্ত্তৃপক্ষের নিকট তাঁহার স্বাস্থ্যের অবস্থায় উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া—আবার কেহ বা বন্দীদিগের প্রতি সরকারী আচরণ ও ঔদাসীন্যের তীব্র নিন্দা করিয়া সংবাদপত্রে দিলেন বিবৃতি। ৩ই আগষ্ট রাত্রি ৮টা হইতে ১২টা পর্য্যন্ত যতীন্দ্রনাথ সংজ্ঞাহীন অবস্থায় কাটাইলেন। ২২শে আগষ্ট হইতে তাঁহার তিন দিন অতিবাহিত হইল অর্দ্ধচেতন অবস্থায়। তখনও পর্য্যন্ত যতীন্দ্রনাথ তাঁহার সঙ্কল্পে অটল। তাঁহার মুক্তির দাবীতে দেশের নানা স্থানে সভা-সমিতির অনুষ্ঠান হইতে লাগিল।

অনশনের ৫৫তম দিবসে যতীন্দ্রনাথের বাঁচিবার আর কোনও সম্ভাবনা রহিল না। পাঞ্জাবের ছোটলাট কিরণচন্দ্রকে ডাকিয়া যতীন্দ্রনাথকে জামিনে মুক্তি দিবার প্রস্তাব করিলেন। কিরণচন্দ্র জানাইলেন যে, তাঁহার ভ্রাতাকে বিনা সর্তে মুক্তি না দিলে তাঁহাকে তাঁহার সঙ্কল্প হইতে নিবৃত্ত করা যাইবে না এবং সেরূপ অবস্থায় যাহাই ঘটুক না কেন, তিনিও তাঁহার ভ্রাতাকে অনশন ত্যাগ করিবার মত পরামর্শ দিতে পারিবেন না। কর্তৃপক্ষ অতঃপর গোপনে যতীন্দ্রনাথকে জামিনে খালাস দিবার ব্যবস্থা করিলেন। যতীন্দ্রনাথ তাহা জানিতে পারিয়া মুমূর্ষু কণ্ঠেই জানাইলেন তাঁহার দৃঢ় প্রতিবাদ। তখন সশস্ত্র পুলিশদল আসিল জোর করিয়া তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দিতে। তিনি জানাইলেন, ঐরূপ করিতে গেলেও তাঁহার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী—জীবিত অবস্থায় সরকার তাঁহাকে জামিনে মুক্ত করিয়া দিতে পারিবেন না। অগত্যা সশস্ত্র পুলিশবাহিনী ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইল।

৫৮তম দিবসে যতীন্দ্রনাথের অন্তিম সময় যেন আরও নিকটবর্ত্তী হইল। এইবার আরম্ভ হইল হিক্কা এবং দমও যেন মধ্যে মধ্যে বন্ধ হইয়া আসিতে লাগিল। শেষ পর্য্যায় যে সুরু হইয়াছে, তাহা বুঝিতে কাহারও আর বাকি রহিল না। যতীন্দ্রনাথ কিন্তু ক্ষীণ হাসির রেখা তাঁহার অনশনক্লিষ্ট মুখের উপর ফুটাইয়া তুলিয়া ইঙ্গিতে জানাইলেন, তাঁহার জীবনদীপ নির্ব্বাপিত হইতে তখনও বিলম্ব আছে। ৬২তম দিবসে প্রাতঃকালে সকলকে নিকটে ডাকিয়া হৃষ্টচিত্তে তিনি ধীরে ধীরে কথা কহিতে লাগিলেন। গান শুনিতে চাহিলে তাঁহাকে গান শুনান হইল—গোলাপফুল পাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে জেল কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে গোলাপ ফুল পাঠাইয়া দিলেন। সকলের সহিত তিনি ধীরে ধীরে রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক নানা আলোচনা করিতে লাগিলেন। সহকর্ম্মিগণকে এক সময় বলিলেন,—"আমার তো সময় ঘনিয়ে এসেছে; বিপ্লবী-জীবনের মান-সম্ভ্রম বজায় রেখে তোমরা যেন সকলে বাঁচতে পারো।"

৬৩তম দিবসে প্রাতঃকাল হইতেই হিক্কার বেগ আরও বাড়িয়া উঠিল—অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ক্রমশঃই যেন হইয়া আসিতে লাগিল শিথিল ও নিস্তেজ; কথা বলিবারও আর শক্তি রহিল না। হৃৎপিণ্ড এতই দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল যে কয়দিন যাবতই উহার ক্রিয়া চলিতেছিল কিনা বুঝা যাইতেছিল না। ইঙ্গিতে যতীন্দ্রনাথ গান শুনিতে চাহিলে কনিষ্ঠ কিরণচন্দ্র গান গাহিয়া শুনাইলেন। তাঁহার মুখে তৃপ্তির ক্ষীণ হাস্যরেখা দেখা যাইতে লাগিল। মধ্যাহ্ন ১২টা ৫৫ মিনিটের সময় একবার তিনি সহসা "বন্দেমাতরম্" বলিয়াই একেবারে স্থির হইয়া গেলেন। সহকর্ম্মীরা তাড়াতাড়ি নীচু হইয়া পড়িয়া পরীক্ষা করিয়া বুঝিলেন যে, সবই শেষ হইয়া গিয়াছে। চক্ষু তাঁহাদের অশ্রুতে সিক্ত হইয়া উঠিল।

১৯২৯ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার যতীন্দ্রনাথ চির-বিদায় গ্রহণ করিলেন। তাঁহার দেশবাসী সেদিন বিমূঢ় হইয়া তাঁহার মৃত্যু সংবাদ শুনিল; শুনিল যে যতীন্দ্রনাথ দেশের জন্য ৬৩ দিন ধরিয়া তিলে তিলে মৃত্যুকে বরণ করিয়াছেন। পরলোকগত মহান্ আত্মার অনমনীয় দৃঢ়তার উদ্দেশে তাহারা শ্রদ্ধা নিবেদন করিল।

ঐ দিনই অপরাহ্নকালে জেল-কর্তৃপক্ষ যতীন্দ্রনাথের ভ্রাতার হস্তে যতীন্দ্রনাথের শবদেহ অর্পণ করিলেন। বিরাট জনতা ইতিমধ্যেই ব্যগ্র হইয়া কারাপ্রাচীরের বহির্ভাগে অপেক্ষা করিতেছিল। লাহোরের পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিঃ হ্যামিল্টন্ হার্ডিং সেই বিরাট্ জনতার সমক্ষেই তাঁহার টুপি খুলিয়া মহান্ বিপ্লবীর শবদেহের প্রতি তাঁহার শেষ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিলেন।

তাঁহার শবদেহের সৎকার যাহাতে কলিকাতাতেই সম্পাদিত হয়, জীবিত থাকিতেই এইরূপ ইচ্ছা যতীন্দ্রনাথ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তদনুযায়ী পাঞ্জাবের প্রসিদ্ধ জননেতাগণের দ্বারা পরিচালিত হইয়া শবদেহসহ সেই বিরাট্ জনতার শোকযাত্রা ষ্টেসনের দিকে চলিল। কলিকাতার পথে বহু ষ্টেসনে নরনারী সমবেত হইয়া যতীন্দ্রনাথের স্মৃতির উদ্দেশে তাহাদের অন্তরের শ্রদ্ধা-ভক্তি নিবেদন করিতে লাগিল। পণ্ডিত জওহরলাল শবাধারের নিকট গিয়া আত্মসম্বরণ করিতে না পারিয়া নীরবে অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন।

১৫ই সেপ্টেম্বর শবদেহ বহন করিয়া লাহোর এক্সপ্রেস আসিয়া পৌঁছিল হাওড়া ষ্টেসনে। সেখান হইতে শোকযাত্রা করিয়া শবদেহ হাওড়া টাউন হলে লইয়া যাওয়া হইল। সুভাষচন্দ্র তখন বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতি। শোকযাত্রা পরিচালনার সকল খুঁটিনাটি এবং হরতাল পালন সম্বন্ধে ১৪ই তারিখেই তিনি এক বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত করিয়াছিলেন। ১৫ই তারিখে সকাল আটটার সময় হাওড়া টাউন হল হইতে মৃতদেহ লইয়া এক সুদীর্ঘ শোকযাত্রা বাহির হইল—কেওড়াতলা শ্মশানঘাটে পৌঁছাইতে সেই শোকযাত্রার প্রায় ২টা বাজিয়া গেল। বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় তাঁহার শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও কেওড়াতলা শ্মশানঘাটে গিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। মৃতদেহ একটি উচ্চ বেদীর উপর স্থাপন করিয়া সুভাষচন্দ্র ও তাঁহার অধীন স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী যতীন্দ্রনাথের পার্থিব দেহের প্রতি তাঁহাদের শেষ অভিবাদন জ্ঞাপন করিলেন। তৎপরে চিতায় অগ্নিপ্রদান করিতেই অল্পক্ষণ মধ্যেই যতীন্দ্রনাথের নশ্বর দেহ ভস্মীভূত হইয়া গেল।

যতীন্দ্রনাথ চলিয়া গেলেন—কিন্তু পশ্চাতে রাখিয়া গেলেন তাঁহার অক্ষয় স্মৃতি। বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তি কম্পিত করিয়া তাঁহার দুর্জ্জয় সঙ্কল্প নিজের জয় ঘোষণা করিল।

এদিকে লাহোর ষড়্‌যন্ত্র মামলার অন্যান্য আসামীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহের যখন প্রাথমিক বিচার চলিতেছিল, তখন হইতেই তাঁহাদের উপর অত্যাচার-উৎপীড়ন সুরু হইল। বিচারকারী ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখেই সময় সময় আসামীদিগের উপর পুলিশ নির্য্যাতন চালাইত। আসামীগণ দায়রা-সোপর্দ্দ হইলে Lahore Conspiracy Case Ordinance নামে একটি আইন পাশ হয় এবং উক্ত আইনে ঘোষণা করা হয় যে লাহোর ষড়্‌যন্ত্র মামলার বিচার একটি স্পেশাল ট্রাইবুনালের নিকট হইবে। মৃত্যুদণ্ড পর্য্যন্ত দিবার ক্ষমতা ট্রাইবুনালের উপর ন্যস্ত করা হইল, কিন্তু আইনের মধ্যে এই অদ্ভুত বিধান রহিল যে ট্রাইবুনালের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল চলিবে না। আসামী বা আইন-

বন্দীদিগের অনুপস্থিতি সত্ত্বেও যাহাতে বিচারকার্য্য চলিতে পারে, সেইরূপ বিধানাবলীও আইনের মধ্যে রহিল।

ইহার পর লাহোর সেন্ট্রাল জেলে বিচারপতি কোল্ডষ্ট্রীম সাহেবকে চেয়ারম্যান করিয়া মোট তিনজন বিচারক লইয়া একটি বিশেষ আদালত গঠিত হইল, এবং তাহাতেই চলিতে লাগিল লাহোর ষড়্‌যন্ত্র মামলার বিচার। স্লোগান দেওয়ার ব্যাপার লইয়া মামলা আরম্ভের কিছুদিন পরেই একদিন আদালতের মধ্যেই পুলিশ ও বন্দীদিগের মধ্যে সংঘর্ষ বাধিয়া গেল। সেদিন বন্দীরা তাঁহাদের স্লোগান দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বহু পুলিশ একযোগে তাঁহাদের আক্রমণ করিয়া প্রহার করিতে লাগিল। নিরস্ত্র বিপ্লবীরা যতদূর সম্ভব তাহাদের সহিত লড়াই করিলেন এবং পুলিশের হস্তে জনকয়েক গুরুতররূপে আঘাতপ্রাপ্ত হইলেন। ট্রাইব্যুনালের একমাত্র ভারতীয় সদস্য জনাব আগা হায়দার পুলিশের এই নারকীয় নিষ্ঠুরতার নিন্দা করিয়া এক বিবৃতি দান করিলেন এবং তিনি ও কোল্ডষ্ট্রীম সাহেব এই অত্যাচারের প্রতিকার না হওয়ায় মামলার বিচার করিতে অস্বীকার করিলেন। ফলে ট্রাইব্যুনালের পুনর্গঠন আবশ্যক হইল। অবশিষ্ট বিচারপতি হিল্টন সাহেবকে চেয়ারম্যান করিয়া জনাব আগা হায়দার ও কোল্ডষ্ট্রীম সাহেবের স্থলে অপর দুইজন বিচারপতি নিযুক্ত করিয়া নূতন ট্রাইব্যুনাল গঠিত হইল।

আসামীগণ আর আদালতে উপস্থিত হইতে অস্বীকার করায় তাঁহাদের অনুপস্থিতিতেই বিচার-প্রহসন চলিতে লাগিল এবং রায় প্রদত্ত হইল ১৯৩০ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর তারিখে। রায় প্রদানের সময় সংবাদপত্র বা জনসাধারণের কোনও প্রতিনিধি আদালত-গৃহে উপস্থিত ছিলেন না।

স্পেশ্যাল ট্রাইব্যুনালের বিচারে ভগৎ সিং, শুকদেব, রাজগুরু এবং শিবরাম-এর প্রতি মৃত্যুদণ্ড প্রদত্ত হইল, সাতজনের হইল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড এবং একজনের সাত ও আর একজনের পাঁচ বৎসর হিসাবে কারাদণ্ড হইল। তিনজন আসামী নিরপরাধ সাব্যস্ত হইয়া মুক্তি পাইলেন।

রায়ের বিরুদ্ধে কোনও আসামীই আপিল করিলেন না। ভগৎ সিং ছিলেন আপিল করার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে। প্রদত্ত প্রাণদণ্ড যাহাতে অবিলম্বে কার্য্যকরী করা হয়, তজ্জন্যই বরং তিনি উদ্‌গ্রীব ছিলেন। ফাঁসি না দিয়া তাঁহাদিগকে গুলি করিয়া মারিবার জন্য প্রাণদণ্ড-প্রাপ্ত বিপ্লবীরা কর্তৃপক্ষের নিকট এক আবেদন করিলেন। কর্তৃপক্ষ অবশ্য তাঁহাদের এই আবেদন মঞ্জুর করেন নাই।

গভর্ণমেন্টের সহিত কংগ্রেসের একটা আপোষ রফার আলোচনা এই সময় চলিতেছিল বলিয়া দেশবাসী আশা করিয়াছিল যে প্রাণদণ্ড-প্রাপ্ত আসামীদের দণ্ড বোধ হয় আর কার্য্যকরী করা হইবে না। মহাত্মা গান্ধীও এই ব্যাপারে তাঁহার প্রভাব প্রয়োগ করিয়া মৃত্যুদণ্ডকে দ্বীপান্তর দণ্ডে পরিণত করার জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন। এই অবস্থায়ই সহসা ১৯৩১ সালের ২৩শে মার্চ্চ বেলা এগারটার সময় কর্তৃপক্ষ ভগৎ সিং-এর পিতাকে আত্মীয়-স্বজনসহ জেলে ভগৎ সিং-এর সহিত শেষ সাক্ষাৎ করিবার সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন এবং ঐদিনই সন্ধ্যা ৭টা ৪৫ মিনিটের সময় লাহোর সেন্ট্রাল জেলে ভগৎ সিং, শুকদেব ও রাজগুরুর ফাঁসি হইয়া গেল।

ফাঁসির পর জেল প্রাঙ্গণেই শবদেহের সৎকার সমাধা হয় এবং ভস্মাবশেষ শতদ্রু নদীতে নিক্ষেপের অনুমতি দেওয়া হয়। লাহোরে এই উপলক্ষে সমগ্রভাবে হরতাল প্রতিপালিত হইল এবং সহস্র সহস্র লোকের বিরাট্ শোকযাত্রা "ভগৎ সিং জিন্দাবাদ" ধ্বনিতে গগন-পবন মুখরিত করিয়া তুলিল।

ভগৎ সিং প্রভৃতির বিয়োগ-ব্যথা অন্তরে লইয়াই ইহার পরদিন করাচীতে আরম্ভ হইল কংগ্রেসের অধিবেশন। উক্ত অধিবেশনে যোগদান করিবার জন্য মহাত্মা গান্ধী ও সর্দ্দার প্যাটেল যখন করাচীর কয়েক মাইল দূরে গাড়ী হইতে অবতরণ করিলেন, তখন কৃষ্ণ পতাকা লইয়া একদল লোক ভগৎ সিং প্রভৃতির ফাঁসির জন্য বিক্ষোভ প্রকাশ করিতে লাগিল। মহাত্মা গান্ধী তাহাদের নিকটে ডাকিলেন—তাহাদের লইয়া আসা কালো ফুল দুই হাতে তুলিয়া লইয়া ধারণ করিলেন বক্ষে। দেখিয়া বোধ হইল যে নীলকণ্ঠ যেন পৃথিবীর যাবতীয় ক্ষোভ, গ্লানি ও বিষকে আপনারই কণ্ঠে ধারণ ও সংহৃত করিয়া পৃথিবীকে গ্লানিমুক্ত করিতে চান।

কংগ্রেসের করাচী অধিবেশনে ভগৎ সিং প্রভৃতির সাহস, দেশপ্রেম ও আত্মোৎসর্গের উচ্চ প্রশংসা করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং গভর্ণমেন্ট পক্ষ তাঁহাদের আচরণের দ্বারা জনসাধারণের সহযোগিতালাভের পথ রুদ্ধ করিতে থাকায় দুঃখ প্রকাশ করা হয়। কংগ্রেসের অধিবেশনের সময় যে যুব-সম্মিলনী হয়—তাহাতে সভাপতি হইয়া সুভাষচন্দ্র ভগৎ সিং-এর দেশপ্রেম ও কার্য্যাবলীর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়ার মতে এই সময় ভগৎ সিং-এর নাম মহাত্মা গান্ধীর নামের তুল্য জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করিয়াছিল।

(ক্রমশঃ)

আকাশ পথের যাত্রী

শ্রীসুষমা মিত্র

(কানাডা)

১৪ই জুন। সকালে উঠে জানলায় তাকিয়ে দেখি সামনে "মিচিগান হ্রদ" লাল নীল মোটর লঞ্চগুলি হ্রদে ভাসছে, হ্রদের এপার ওপার দেখা যায় না। আমরা প্রাতরাশ সেরে প্রথমেই এয়ার অফিসে খবর নিতে গেলাম—কাল কখন বিমান কানাডার অটোয়া অভিমুখে রওনা হবে।

সারাদিনটা বেড়িয়েই কাটলো। রাতে আবার সেই বাক্স-পেটি গোছানোর পালা, অল্প কিছু কাপড় কয়েকটা বাক্সে ভরে নিয়ে বাকি বাক্সগুলি হোটেলে জমা রেখে গেলাম। তার জন্য অবশ্য মাশুল দিতে হ'ল ভালোই।

১৫ই জুন। আজ বেলা ১০টায় Trans Canadian Airwaysএর

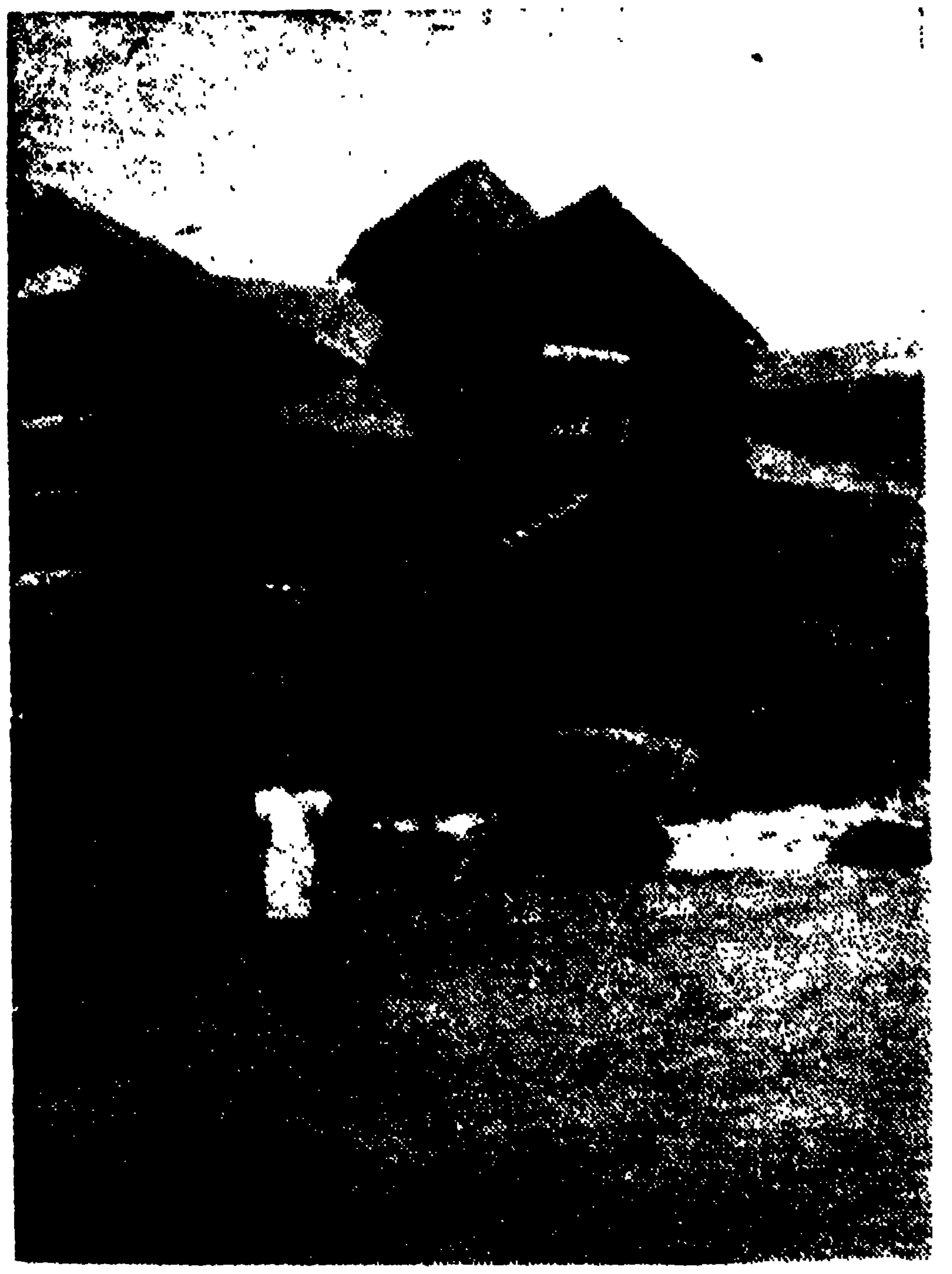

সিনোরি ক্লাবের 'লগ শ্যাটো' হোটেল, কানাডা।

একটি বিমানে করে আমরা অটোয়া যাত্রা করলাম। দুই ইঞ্জিনের ছোট বিমান, ২২ জন মোট যাত্রী। আমরা উত্তর দিকে উড়ে চলেছি, আকাশের অবস্থা সুবিধার নয়, বাতাসের আন্দোলনও খুব। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে দুরন্ত বায়ুখণ্ডলের মেঘ গহ্বরে পড়ে বুঝি আমরা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাব। থর্ থর্ করে বিমান কাঁপছে, ভয়ে সবাই চোখ বন্ধ করে চেয়ারে হেলান দিয়ে শুয়ে কাটাচ্ছি। ছোট বিমানগুলি সামান্য একটু বাতাসের আঘাতেই দুলে ওঠে। এত অধিক দোলে বলে বেশ একটু অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতে হয়। বিকেল ৪টার সময় Canadaর Windsor সহরে বিমানখানি নামল। ক্যানাডার এই প্রবেশ দ্বারে যাত্রীদের সব বাক্স পরীক্ষা, Passport দেখানোর হাঙ্গামা রয়েছে। এয়োড্রোমের মাঠে ব্রিটিশ পতাকা দেখে খুকু মহা কৌতুহলের সঙ্গে জিজ্ঞেসা করল "ইংরেজদের flag এখানে কেন পোঁতা? ক্যানাডার ফ্ল্যাগ্ কৈ?" Canadaর শাসন কর্তা ইংরেজ শুনে খুকু বল্লে "ও! এটা বুঝি আমাদের দেশের মতন?" তখন অবশ্য ভারতের জাতীয় পতাকা স্বাধীন দেশের সম্মান পায়নি।

বাইরে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি সুরু হল। আমরা এয়োড্রমের ঘরে গিয়ে

'লগ শ্যাটো' হোটেলের একদিকের প্রবেশ দ্বার।

নিয়ম কানুন সেরে আবার আকাশে উঠে পড়লাম। বিকেল ৫টায় অটোয়া পৌঁছে গেলাম। শিকাগো সময়ের সাথে এক ঘণ্টা যোগ করে অটোয়ার সময় ঠিক করা গেল। ঘড়ির কাঁটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়েই চলেছি।

আমরা ওয়েটিং রুমে ঢুকে দেখি Canadaর বিখ্যাত Radium ব্যবসায়ী Eldorado Corporation থেকে দু'জন ভদ্রলোক আমাদের নিতে এসেছেন। শুনলাম তাঁরা আমাদের অটোয়ায় থাকার জন্য একটি

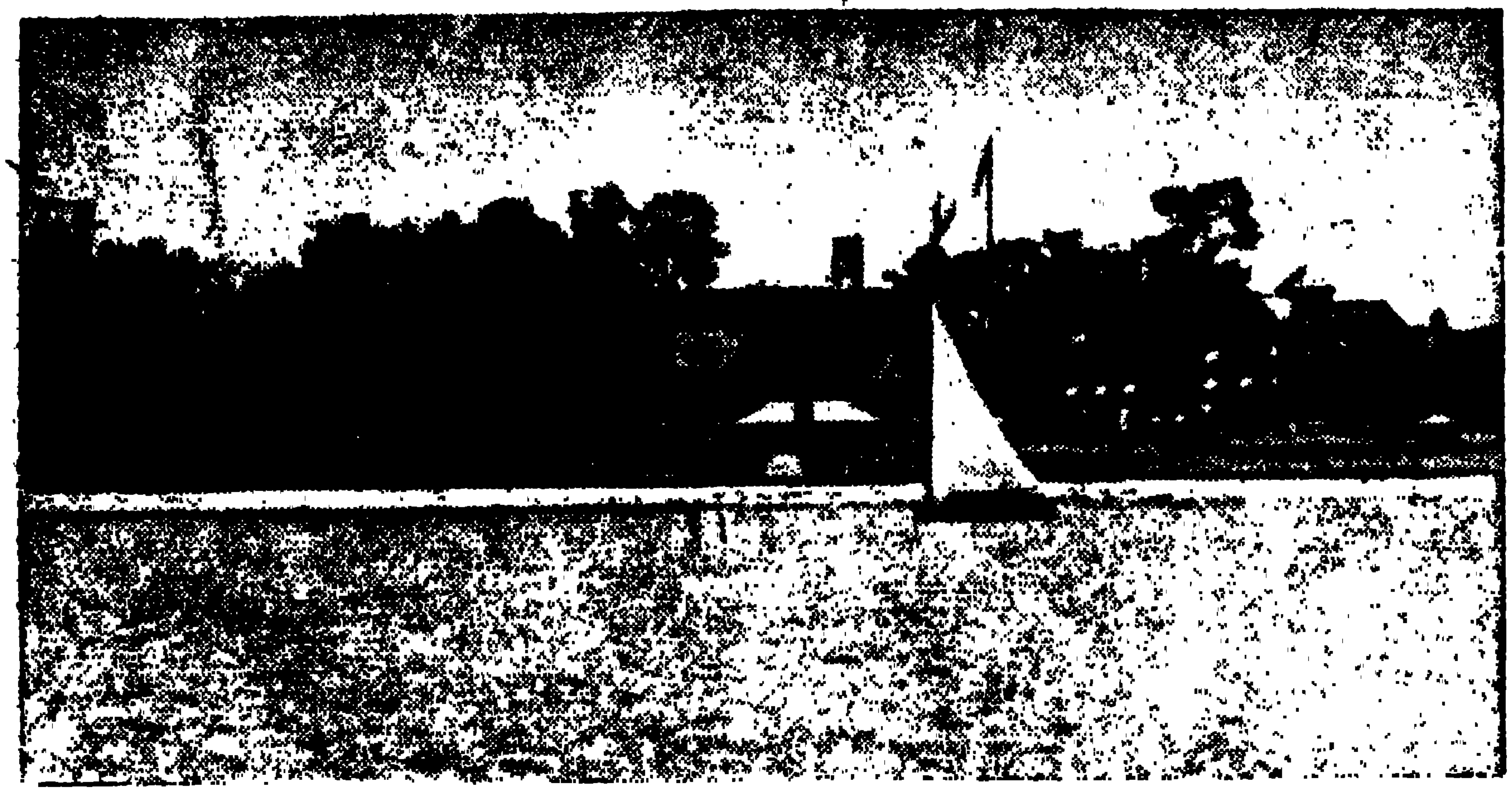

অটোয়া নদীর তীরে "লগ স্যাটু" দেখা যাচ্ছে।

হোটেলে ঘরের বন্দোবস্তও করে রেখেছেন। কিন্তু হোটেলটি এখান থেকে ৫০।৫৫ মাইল দূরে। Seignory club এর "Log chateau" হোটেল Dr Taylor তাঁর অতিথি স্বরূপ এই আমেরিকান ক্লাব হোটেলটিতে আমাদের থাকার সকল ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। সুতরাং Eldorado Co র ভদ্রলোকদের অশেষ ধন্যবাদ জানিয়ে একখানি ট্যাক্সি নিয়ে Seignory club এর দিকে রওনা হলাম। সহর ছেড়ে গ্রামের পথে চলেছি; কিন্তু ন্যে'ৎ-স্তেতে কাঁচা রাস্তা, উঁচু নীচু ও অসমান। পথের এক দিকে উঁচু জমিতে লোকের বসতি, অপর দিকে বন্যার জল সব ভাসিয়ে নিয়ে গেছে, অর্দ্ধজলমগ্ন গাছগুলি শুধু মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। শুনলাম এখানে বর্ষায় নাকি প্রতি বৎসর এই রকমই অবস্থা হয়। আমাদের বাংলা দেশের কথা মনে পড়তে লাগলো। প্রায় ২৫ মাইল এসে অটোয়া নদীর ধারে পৌঁছলাম। দেখলাম, নদীর বুকে তারে বাঁধা অসংখ্য কাঠের বোঝা ভেসে যাচ্ছে। স্রোতের মুখে কাঠ গুলি আপনা হতেই ভেসে ভেসে দূরে আপন গন্তব্য স্থলের দিকে চলেছে। স্বল্প খরচায় এই ভাবে অতি সহজ উপায়ে কাঠ চালান দেওয়া এখানকার একটি বিশেষ ব্যবসায়ী পদ্ধতি। মাঠ, ঘাট, বন, জঙ্গল পেরিয়ে গাড়ী চলেছে। হঠাৎ কানে এল জলপ্রপাতের গর্জ্জন, চেয়ে দেখি উঁচু শীলাখণ্ডের গা বেয়ে অটোয়া নদীর স্রোত ভীষণ তুফান তুলে গর্জ্জন করে ধাপে ধাপে গড়িয়ে পড়ছে, ঢেউয়ে ঢেউয়ে সারা নদী ফুলে ফেনা হয়ে উঠেছে।

Seignory club এর সদর দরজায় দ্বার রক্ষককে ছাড়পত্র দেখিয়ে গাড়ী ভিতরে প্রবেশ করল। একটি নূতন অদ্ভুত ধরণের কাঠের বাড়ীর সামনে আমরা নামলাম।

বাড়িটি আগাগোড়া কাঠের। লম্বা লম্বা গাছের গুঁড়িগুলি একটার পর একটা সাজিয়ে বাড়ীটি তৈরী করা হয়েছে। বাইরে ও ভিতরে সবটাই ঐ এক ধরণের তৈরী। আস্ত গাছগুলোকে অভিনব ভাবে পরিবর্তিত করে সিঁড়ি, বারাণ্ডা, ঘরের দেওয়াল—এমন কি ইলেকট্রিক লিফ্‌ট পর্যন্ত তৈরী হয়েছে। বাড়ীর ভিতরে প্রত্যেক ঘর মূল্যবান কারপেটে আগাগোড়া মোড়া, রকমারি আসবাবে ঘরগুলি সাজানো, সকল রকম সুখ সুবিধা ও আরামের চূড়ান্ত বন্দোবস্ত রয়েছে। বাইরে কনকনে শীত, অথচ ভিতরটা নিয়ন্ত্রিত তাপের দ্বারা বেশ আরামদায়ক গরম। বাড়ীটি তিনতলা, ঘর প্রায় ৫০০টি, তাছাড়া বড় বড় হলে খাবার, বসবার, মিটিংএর ও সিনেমার জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা রয়েছে। এই রকম গাছের গুঁড়িতে তৈরী প্রাচীন ধরণের বাড়ীর মডেল আমরা সুইডেনের মিউজিয়ামে দেখেছি বটে, কিন্তু প্রাচীনের আবরণে আধুনিক সর্ব্বপ্রকার সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের সমাবেশ—এইরূপ একটি বিরাট হোটেল না দেখলে ধারণা করতে পারতাম না।

আমরা আহার সেরে হল কামরায় গিয়ে বসলাম। আমেরিকার বহু খ্যাতনামা চিকিৎসক ও তাঁদের পত্নীদের সঙ্গে সেখানে দেখা হল। আগামীকাল থেকে এইখানে আমেরিকার ধাত্রীবিদ্যা বিশারদগণের

সিনোরি ক্লাবের 'লগ স্যাটু' হোটেলের প্রাঙ্গণে।

বাৎসরিক অধিবেশন বসবে। সেই উপলক্ষে প্রায় সকল বিশিষ্ট স্ত্রী রোগের চিকিৎসকগণই এখানে উপস্থিত হবেন। Dr Taylor এর

ইচ্ছায় উনি এই কন্‌ফারেন্সে যোগ দান করতে এসেছেন, আমরাও সেই সুযোগে নূতন দেশ বেড়াতে এসেছি।

এই ক্লাবের কতকগুলি বিশিষ্ট নিয়ম আছে,—নির্দিষ্টসংখ্যক ক্লাবের সভ্য ভিন্ন অথবা তাঁদের পরিচিত অতিথি ভিন্ন অন্য কারও সেখানে প্রবেশ-অধিকার নেই।

১৬ই জুন। প্রাতরাশ সেরে মাঠে বেড়াতে গেলাম। যানবাহনের প্রচণ্ড শব্দমুখর শিকাগো সহরের জনসমুদ্র হতে প্রকৃতির শোভামণ্ডিত এই নির্জ্জন নিরালায় এসে আমরা যেন নবজীবন লাভ করলাম, একদিনের বিশ্রামেই শরীর ও মন বেশ সুস্থ ও শান্ত হয়ে উঠল।

আমাদের এই ক্লাব প্রাঙ্গণের বহুদূর অবধি কোথাও কোন লোকের বসতি নেই। ক্লাবের কম্পাউণ্ডের ধারেই অটোয়া নদী প্রবাহিত। এ যেন শীতেও নদীবক্ষে নানা রঙের রঙীণ Canoeগুলি দাঁড়বেয়ে চলেছে। ঠাণ্ডা দমকা হাওয়ায় বড় বড় গাছগুলি থেকে থেকে মাতালের ন্যায় হেলে দুলে উঠছে। পাতার মর্ম্মরে দিক মুখরিত।

অপূর্ব্ব এই Canadaর আকাশ! পৃথিবীর সবুজ আবরণের উপর যেন একখানি ফিকে নীল রঙের চাঁদোয়া টাঙানো।

সারাদিন বেড়িয়ে ও ছবি তুলে কাটালাম। সন্ধ্যার সময় বইপত্তর নিয়ে হলঘরে বসা গেল। হলের চারিদিকে দেওয়ালের ধারে নানারকম কুটীর শিল্প ও Curioর দোকান রয়েছে, উপরে নানা আকারের কাঠের ঝাড়ে আলোবাতি জ্বলছে। পরস্পরের সঙ্গে যখন আমরা আলাপ পরিচয়ে ব্যস্ত তখন দেখি অনেকে খুকুকে ঘিরে বেশ গল্প জমিয়ে তুলেছেন। 'জয়শ্রী' নামটা উচ্চারণের পক্ষে সুবিধার নয় বলে তাঁরা খুকুকে "জয়" বলেই ডাকছেন। Mrs Praltএর (Detroitএর খ্যাতনামা স্ত্রী-ব্যাধি চিকিৎসকের পত্নী) কাছে এখানকার ছাত্র-ছাত্রীদের Camp lifeএর বিবরণ শুনে খুকু ধরে বসল ঐ রকম একটি ছোটদের Campএ অন্তত ৭ দিনের জন্যও থেকে আসতে হবে।

Mrs Praltএর কাছে শুনলাম শিশু শিক্ষার জন্য এদেশে এই রকম বিশেষ ব্যবস্থা আছে। স্কুলের ছুটী হলে ছাত্রছাত্রীরা দু'মাস এই Campএ কাটায়, সেখানে তারা পাঠ্যপুস্তকের তালিকা ভিন্ন শিক্ষকদের কাছে বহু নূতন বিষয় শিক্ষা করে। প্রত্যেকে নিজের কাজ নিজে করে, টাকাকড়ির হিসাব রাখা হতে আরম্ভ করে জীবনের প্রয়োজনীয় সব কিছুই তাদের শিখতে হয়।

শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রীর ঐকান্তিক চেষ্টায় ও স্নেহ যত্নে এই বাল্যজীবন হতেই তারা ধীরে ধীরে স্বাবলম্বনের পথে চলতে শেখে ও কালে মানুষ হয়ে দাঁড়ায়। আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতি হবে কবে কেজানে? (ক্রমশঃ)

তা'রা ও আমরা

শ্রীনীলরতন দাশ

যুগ যুগ ধরি' করিল যাহারা মুক্তির সন্ধান,—
মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত তা'রা বিদ্রোহী সন্তান।
সাবধানী মোরা সভয়ে যখন প্রচারি শান্তিবাদ,
অগ্নিমন্ত্রে তাহারা তখন নির্ভীক উন্মাদ।

মোরা যবে খুঁজি আরাম শয্যা, নিরাপদ গৃহকোণ,—
শান্তির নীড় স্নেহের কুটীর, পিতামাতা ভাই বোন,—
তাহারা তখন ছাড়ি' প্রিয়-জন পথে পথে বাঁধে ঘর,
দুর্গম পথে দুর্য্যোগ সাথে চলে যে নিরন্তর!

আমরা যখন মুক্ত আলোতে বিলাসে আত্মহারা,
তাহারা তখন বরে যে বরণ অন্ধকারের কারা।
আমরা আরামে ভোগের পাত্র ভরি নানা উপচারে,
তিলে তিলে প্রাণ তা'রা করে দান অনাহারে কারাগারে।
মোরা যবে পরি দাসত্ব-বেড়ী, তারা ভাঙ্গে শৃঙ্খল;
রুদ্ধ দুয়ারে থাকি যবে মোরা, খোলে তা'রা অর্গল।

মরণের ভয় যখন মোদের বিহ্বল করে প্রাণ,
ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে যায় তা'রা জীবনের জয় গান।
মোদের মুক্তি-পাত্রখানিকে ভ'রে দিতে সুধা-ভারে
সকল রকমে রিক্ত তাহারা করিয়াছে আপনারে।

আমাদের লাগি সোনার ফসল ফলাইতে তা'রা হায়,
বক্ষ শোণিতে সিক্ত করেছে উষর মৃত্তিকায়!
মোদের আকাশে দেখিবার আশে নূতন সূর্য্য-ভাতি
জাগিয়া তাহারা কাটায়েছে কত অমাবস্যার রাতি!

আমাদের ঘরে জ্বলেছে দীপালি, টুটিয়াছে বন্ধন;
অগ্নি-সাধক তা'রা সে আলোর জোগায়েছে ইন্ধন।
মোদের ভাগ্য-আকাশে আজিকে নূতন সূর্য্যোদয়,
যা'রা এনে দিল আলোর জোয়ার, গাহি তাহাদের জয়!

তখন

শিল্পী—শ্রীসৌমেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

এখন

শিল্পী—শ্রীসৌমেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

শিলালিপি

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

প্রায় তিনটা মাস দেখতে দেখতে মিলিয়ে গেল যেন।

কী করে যে এই সময়টা কেটে গেল ভাবতেও আশ্চর্য লাগে মন্তুর মতো। তিনমাস আগেকার ভীরু, সুখী মানুষটি আজ কোনোদিক থেকে নিজেকে চিনতে পারে না। কী অদ্ভুত ভাবে এক একটা দিন কেটে গেছে তার! জঙ্গল—সে তো আছেই, গাছের ডালে রাত্রিবাসও হয়েছে তার। এমন দিন গেছে যে নদীর জল খেয়েই খিদে মেটাতে হয়েছে তাকে। পোড়ো বাড়িতে রাত কাটিয়েছে, দিন কাটিয়েছে একটা উবুড় করা ভাঙা নৌকোর তলায়, একদিন রাত্রে চৌকীদারের তাড়া খেয়ে লুকিয়ে কাটাতে হয়েছিল রাস্তার একটা কালভার্টের নীচে। এক কোমর পচা দুর্গন্ধ জল সেখানে। সর্বাঙ্গে পাঁচ সাতশো জোঁক ধরেছিল সেদিন, মশায় নাক মুখ ফুলে দিয়েছিল মনে আছে। দুর্ভোগের চূড়ান্ত হয়েছিল বললেও যেন কথাটাকে কম বলা হয়।

আর মানুষ! কত রকমের মানুষ—কত আশ্চর্য মানুষ!

হাটের গাড়ির মানুষের সঙ্গে ভাব জমিয়ে তাদের গাড়িতে উঠে পথ পাড়ি দিয়েছে; হাটখোলার চালা ঘরে ছেঁড়া চট মুড়ি দিয়ে রাত কাটিয়েছে, সকলের সঙ্গে চিবিয়েছে মুড়ি আর ছোলা ভাজা। একদিন কয়েকটা লোক তাকে তাড়া করল, এক যাত্রার আসরে ভিড়ে গিয়ে রক্ষা পেল সে যাত্রা। দুপুর বেলায় ক্লান্ত পথ চলতে চলতে জল আর বাতাসা খেল জলসত্র থেকে, বাবুর বাড়ির নাট-মন্দিরের অন্ধকার কোণায় বসে খেল প্রসাদ। কত জায়গায়, কত রকম ভাবে আশ্রয় জুটল তার। দুবার ধরা পড়তে পড়তে বেঁচে গেছে, একবার যে রেহাই পেয়েছে সেটা নিতান্ত দৈব-ঘটনা বলেই মনে হয় যেন।

কিন্তু আর নয়—আর সে পারছে না।

কতদিন এমনভাবে চলবে লুকোচুরি—চলবে এমন করে সন্দেহ আর অবিশ্বাসের একটা ক্লান্ত কঠোর বোঝা বয়ে বেড়ানো? বিপ্লবী উল্কার এই ভাবেই কি পরিনির্বাণ ঘটল শেষে? দলের সব ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে, কারো সঙ্গে কোনো যোগাযোগ নেই। একমাত্র একটুখানি সংযোগসূত্র ছিল পরিমল, সেও ধরা পড়েছে। নিজের সম্পর্কে একটা নিরাসক্তি এসেছে আজকাল, ক্লান্তি এসেছে, এসেছে হতাশা।

সে একা। সে ছেলেমানুষ—অন্তত বেণুদা এই কথাই বলতেন। একটা রিভলভার দিয়ে কী করতে পারবে সে—করতে পারবে কোন্ মহৎ এবং বৃহৎ কাজ?

শুধু মনে হচ্ছে কিছুই হলনা, কিছুই হওয়া সম্ভব নয়। যেমন করে বারে বারে এত সৈনিকের সাধনা ব্যর্থ হয়েছে, তেমনি করে ওরাও তলিয়ে যাবে অর্থহীন ব্যর্থতার আড়ালে। দেশ কোনোদিন স্বাধীন হবেনা—কোনোদিনই না।

কোনো দিনই না?

এ কথা ভাবা অসম্ভব। ক্ষুদিরাম থেকে সূর্য সেন পর্যন্ত সকলেই কি ছুটেছিলেন একটা অবাস্তব আলেয়ার পেছনে! এ যদি সত্য হয় তা হলে জীবনের কোনো মূল থাকে না, থাকে না এতটুকুও মূল্য। 'বীরের এ রক্তস্রোত—মাতার এ অশ্রুধারা'—

কিন্তু অস্বস্তি লাগছে। আগের ষ্টেশনে একটা লোক তার কামরার সামনে দিয়ে পায়চারী করে গেছে বার কতক। লোকটার চোখের দৃষ্টি যেন কেমন কেমন, মনকে সংশয়ী করে তোলে। এই তিন মাসের মধ্যে যে নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতার পথ সে বয়ে এল, তাতে শিকারীর চোখ সে চিনতে পারে দেখলেই।

সুতরাং গাড়ি থেকে নেমে পড়তে হবে। সরে পড়তে হবে যত শীগ্‌গির সম্ভব। মন্তু গলা বার করলে চলন্ত গাড়ি থেকে। দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে মেল ট্রেন—চলেছে যেন ঝড়ের ছন্দে। মুখ বার করতেই রাত্রির বাতাস এসে উড়ন্ত একটা কালো বাদুড়ের ডানার মতো ঝাপ্‌টা মেরে দিলে গালে কপালে।

কতগুলো আলো উঠল ঝল-মলিয়ে। লাল সবুজ নানা রঙের আলো। একরাশ সিগন্যাল। খট্ খট্ করে একটা বিমিশ্র আওয়াজ পাওয়া গেল গাড়ির চাকায়, আর লাইনের জোড়ে জোড়ে। ষ্টেশন।

মেল্ ট্রেন এসে দাঁড়াল। ষ্টেশনের নামটা পড়া যাচ্ছে না, কিন্তু কুলির চীৎকার উঠেছে। নাটোর—নাটোর!

নাটোর! কী একটা স্মৃতি চেতনার মধ্যে নড়ে উঠল বৈদ্যুতিক প্রবাহের মতো। একটা চমক-লাগা দুর্বোধ্য প্রেরণায় মন্তু হঠাৎ নেমে পড়ল গাড়ি থেকে, তারপর অন্ধকার প্ল্যাটফর্মটার পাশ দিয়ে এগিয়ে চলল।

রাত খুব বেশি হয়নি। শহরের ভেতরে এসে যখন ঢুকল প্রায় তখন সাড়ে নটার মতো হবে। খুব কি দেরী হয়ে গেছে? বোধ হয় না। অন্তত করুণাদিকে বিরক্ত করবার পক্ষে নিশ্চয়ই যথেষ্ট বিলম্ব হয়ে যায়নি।

ঠিকানাটা জোগাড় করতে অসুবিধে হলনা বিশেষ। গোটা দুই মোড় ঘুরতেই একটা কাঁচা ড্রেনের পাশে একতলা পুরোনো বাড়িটা চোখে পড়ল। বাড়ির সামনেই একটা ল্যাম্প পোষ্ট, তার ম্লান আলোয়

দেখা গেল নেম-প্লেট, ক্ষয়ে যাওয়া কালো টিনের পাতের ওপর বিবর্ণ কতগুলো পুরোণো অক্ষর : এ, এন, ঘটক, বি-এল। উকিল, নাটোর।

একবার মাত্র দ্বিধা করল রঞ্জু। তারপর মনকে শক্ত করে চড়ায় ঝাঁকুনি দিলে।

দরজা খুলে গেল। উকিলের পুরোনো সেরেস্তা। ভাঙা চেয়ার, ময়লা টেবিল, কাঁচভাঙা আলমারিতে রাশীকৃত বই আর পুরোনো কাগজপত্র। চশমাচোখে পাকাচুল এক ভদ্রলোক দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছেন লণ্ঠন হাতে। ভ্রূকুঞ্চিত করে বললেন, কী চাই?

—আমি করুণাদির সঙ্গে দেখা করব।

—করুণাদি! মানে বৌমা? কোত্থেকে আসছেন আপনি?—ভদ্রলোকের ভ্রূরেখা আরো কুঞ্চিত হয়ে উঠল।

—আমি তাঁর দেশের লোক।

—আচ্ছা বসুন, খবর দিচ্ছি—

সামনেই একটা আধভাঙা বেঞ্চি, খুব সম্ভব মক্কেলদের জন্যে। তারই ওপর বসে পড়ল রঞ্জু। কী করে বসেছে নিজেই যেন ঠিক বুঝতে পারছে না। একি ভালো হল? ভালো হল এমন করে ঝোঁকের মাথায় এখানে চলে আসা? তাছাড়া, তাছাড়া—রঞ্জু হঠাৎ চমকে উঠল: বেণুদার মৃত্যুর কথা সে ভুলে গেল কী করে? সে শোকের আঘাত করুণাদির বুকে কী ভাবে বেজেছে তা তো কল্পনা করা অসম্ভব নয়। এর পরে কেমন করে সে করুণাদির সামনে গিয়ে দাঁড়াবে, কেমন করে সে—

মনে হল উঠে পালিয়ে যায়, এক মুহূর্ত এখানে তার আর বসা উচিত নয়। করুণাদি এপথ তাকে ছাড়তে বলেছিলেন। এই পথ সম্পর্কে অমানুষিক ভয় ছিল তাঁর, ছিল সীমাহীন আতঙ্ক। আর এর জন্যে তাঁকেই দিতে হল চরম মূল্য, পরিশোধ করতে হল এর সমস্ত ঋণ—

উঠে দাঁড়াতে যাবে, এমন সময় ওপাশের দরজার পরদা ঠেলে করুণাদি এসে দাঁড়ালেন।

—একি, একি রঞ্জন!

কাঁপা অনিশ্চিত গলায় রঞ্জু বললে, আমি ফেরারী করুণাদি, এখন আমার নাম প্রবোধ।

কেমন অদ্ভুত একটা শূন্য বেদনাময় দৃষ্টিতে তাকালেন করুণাদি। ঠোঁট দুটো অল্প অল্প নড়ে উঠল তাঁর, কয়েক মুহূর্ত একটা শব্দও বেরুল না। তারপর অস্পষ্ট স্বরে বললেন, এসো ভাই, ভেতরে এসো।

রঞ্জু দ্বিধা করতে লাগল।

—কোনো লজ্জা নেই, এসো প্রবোধ। লণ্ঠন হাতে সেই বৃদ্ধ ফিরে এসেছেন। চোখে তাঁর তেমনি ক্রূর সংশয়ীর দৃষ্টি। করুণাদি বললেন, এ আমার মামাতো ভাই প্রবোধ, ওঁকে প্রণাম করো।

যন্ত্রচালিতের মতো রঞ্জু বৃদ্ধকে প্রণাম করল।

এ. এন্. ঘটক তবু ভ্রূকুঞ্চিত করেই রইলেন। তারপর বিষাদ বিরক্ত গলায় বললেন, বসো।

* * *

লণ্ঠনের অস্পষ্ট আলোয় একটা টুলের ওপর স্থির হয়ে বসে আছে রঞ্জু। জানলা দিয়ে বাইরে অন্ধকারের মধ্যে তাকিয়ে আছেন করুণাদি, একটা কথা ফুটছে না কারো মুখে।

শুধু পাশের ঘর থেকে উঠছে অবিচ্ছিন্ন বিশৃঙ্খল চীৎকার: মেরে ফেললে আমাকে! অদ্ভুত, অমানুষিক চীৎকার। মানুষের গলা নয়, যেন প্রেতের কণ্ঠ। শব্দটা যেন পৃথিবী থেকে আসছে না, ঠেলে উঠছে পাতালের কোনো অতল গভীর অন্ধকার থেকে। এক একটা চীৎকারে যেন গায়ের ভেতরে হিম হয়ে আস—শুষে খেল, সব রক্ত শুষে খেল আমার—

অশ্রু-করুণ চোখ এতক্ষণে রঞ্জুর দিকে ফেরালেন করুণাদি: ওই শুনছ তো? উনি আমার স্বামী।

রঞ্জু অস্পষ্ট স্বরে বললেন, কিন্তু—

—কোনো কিন্তু নেই ভাই—করুণাদি বিকৃতভাবে হাসলেন: এইটেই সত্য, আর এর চাইতে বড় সত্য আমার আর কিছুই নেই।

—একবার দেখা করব?

—কী লাভ?—তেমনি হাসির রেখাটা করুণাদির মুখখানাকে বীভৎস করে রইল: পাগলকে দেখে কী করবে? ও একটা দুঃস্বপ্ন—শুধু মনকেই কালো করে দেবে তোমার, তার বেশি কিছুই নয়।

—কিন্তু কেন? কেন এমন হল?

দুহাতে মুখ ঢাকলেন করুণাদি। তারপর যখন হাত সরিয়ে নিলেন তখন দেখা গেল গালের পাশ দিয়ে তাঁর বড় বড় অশ্রুর ফোঁটা গড়িয়ে পড়ছে।

—ভেবেছিলাম অনেক দিন আগেই তোমাকে সেকথা বলব ভাই। কিন্তু বলতে পারিনি, মুখে আটকে আসত। আজ আর দ্বিধা নেই, আজ যখন তুমি এসে পড়েছ তখন তোমাকে সব কথা বলবার জন্যই নিজেকে তৈরী করে নিয়েছি। দাদার মৃত্যুকে আমি মেনে নিয়েছি, ও যে ঘটবে তা আমি জানতাম। কিন্তু মৃত্যুর চেয়ে এই যে ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা, তিলে তিলে এই যে আমার শাস্তি—

শেষ হল না কথাটা। পাশের ঘর থেকে তেমনি পৈশাচিক আকাশ কাটানো চীৎকার উঠল: ক্ষমা করো, আমায় ক্ষমা করো নীলকণ্ঠ। আমাকে হত্যা কোরোনা, আমাকে বাঁচাও, বাঁচাও নীলকণ্ঠ—

করুণাদি বললেন, শোনো।

আর একটা আশ্চর্য ভয়ঙ্কর কাহিনীর যবনিকা উঠল রঞ্জুর দৃষ্টির সামনে। বাইরের ঝাঁঝাঁ রাত্রির স্তব্ধতার সঙ্গে সঙ্গে সে কাহিনী ঘরের মধ্যে যেন বিস্তার করে দিলে একটা হিম আতঙ্কের জাল।

অমিয় ঘটক। যেমন শক্তিমান, তেমনি বেপরোয়া মানুষ। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনের ডিগ্রি নিয়ে এখানে বসেছিল ব্যবসা করতে। কিন্তু ওটা তাঁর খোলসমাত্র, তার সত্যিকারের পরিচয় ছিল একেবারেই আলাদা।

বিপ্লবী দলের নেতা সে। যেমন কঠোর, তেমনি জোর। তাঁর

কাছ থেকেই বেণু চৌধুরী প্রথম এ পথের দীক্ষা গ্রহণ করে। সেই বেণু চৌধুরীকে রিভলভার ছুঁড়তে শিখিয়েছিল নিজের হাতে।

করুণাদির কিছু উপায় ছিল না। অমন শক্তিমান স্বামীর ইচ্ছাকে বাধা দেবার মতো জোর কোথাও ছিল না তাঁর মধ্যে। বিপ্লবী নেতা অমিয় ঘটক। তার পথ নিশ্চিত, তার সংকল্প অটল।

দলের একটি ছেলে ছিল নীলকণ্ঠ। প্রিয়দর্শন তরুণ। গান গাইত, বাঁশি বাজাতে পারত। সকলেই ভালোবাসত তাকে, অমিয় ঘটক ভালোবাসত সব চাইতে বেশি। কবি, শিল্পী নীলকণ্ঠ। রঞ্জুর সঙ্গে সম্পূর্ণ সাদৃশ্য ছিল তার, তাই প্রথম দিন রঞ্জুকে দেখেই করুণাদি অমন করে শঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন।

কিন্তু কবি শিল্পীর দুর্বলতা একদিন প্রকাশ হয়ে পড়ল অপ্রত্যাশিত একটা ভূমিকম্পের মধ্য দিয়ে। যেন হুড়মুড় করে আকাশটা এসে ভেঙে পড়ল একদিন। নীলকণ্ঠদের পাশের বাড়িতে একটি মেয়ে পড়ত ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাশে, আর তাকে গান শেখাত নীলকণ্ঠ। একদিন খবর পাওয়া গেল সে আত্মহত্যা করেছে। আর—আর—মেয়েটি গর্ভবতী ছিল!

দিন তিনেক পালিয়ে পালিয়ে বেড়াবার চেষ্টা করল নীলকণ্ঠ। কিন্তু অমিয় ঘটকের আগ্নেয় চোখকে সে বেশিদিন ফাঁকি দিতে পারল না। সহরের বাইরে একটা পোড়ো বাগানের মধ্যে এক বর্ষার রাত্রে বিচার হল নীলকণ্ঠের।

সে বিচারের ফলাফল যা হওয়া উচিত তাই হল। অনেক চীৎকার করেছিল নীলকণ্ঠ—অনেক কেঁদেছিল। কিন্তু নির্জন বাগান আর বৃষ্টির শব্দে সে চীৎকার কারো কানে যায়নি; সে কান্নায় অমিয় ঘটকের পাথরে-গড়া মনে আঁচড় পড়েনি এতটুকুও।

কপালে রিভলভারের নল ঠেকিয়ে গুলি করা হল নীলকণ্ঠকে। নিঃশব্দে পড়ে গেল নীলকণ্ঠ। তারপর টুকরো টুকরো করে মাছ কোটার মতো করে কাটা হল তাকে—বস্তার মধ্যে ইঁটের টুকরো পুরে ফেলে দেওয়া হল বিলের মধ্যে। সারা রাত নিরবচ্ছিন্ন বৃষ্টিতে রক্তের একটা বিন্দুও অবশিষ্ট রইলনা কোনোখানে।

পরদিন থেকে নীলকণ্ঠ নিরুদ্দেশ। সঙ্গতভাবে যা মনে করা উচিত তাই মনে করল সকলে। এই কেলেঙ্কারীর পর স্বাভাবিক ভাবেই ভয়ে আর লজ্জায় সে দেশছাড়া হয়েছে। কয়েকদিন আলোচনা করল, বাপ মা কান্নাকাটি করে কাগজে বিজ্ঞাপন দিলে, "নীলু, ফিরে আয়"—তারপর তাকে ভুলেও গেল কিছুদিনের মধ্যেই।

কিন্তু একজন ভুলল না, ভুলতেও পারল না। সে অমিয় ঘটক।

পরের রাত থেকে সে আর ঘুমোতে পারল না।

ঘুম এলেই স্বপ্ন দেখে। দেখে অতি ভয়ঙ্কর, অতি পৈশাচিক একটা স্বপ্ন।

পাশে এসে দাঁড়ালো নীলকণ্ঠ। তার সর্বাঙ্গে রক্ত, তার চোখ দুটো জ্বলন্ত রক্তের পিণ্ড! কিছুক্ষণ সেই রক্তপিণ্ডের আগুন সে ছড়াতে লাগল অমিয় ঘটকের গায়ে। তারপর এক লাফে সোজা তার বুকের ওপর চেপে বসল।

সেইখানেই শেষ নয়। তারপরেই যা ঘটল তা সৃষ্টির পরমতম বিভীষিকা! অতি বড় বীভৎস কল্পনাতেও সে বিভীষিকা ফুটে ওঠে না।

আস্তে আস্তে নীলকণ্ঠের মুখটা লম্বা হতে লাগল। ক্রমে তা মশার হুলের মতো দীর্ঘ সূচালো হয়ে উঠল, তারপর সেই সূচালো মুখটা সে বিঁধিয়ে দিলে অমিয় ঘটকের গলায়। তার চোখের রক্তপিণ্ড থেকে রক্ত গলে পড়তে লাগল, সে শুষে খেতে লাগল অমিয় ঘটকের গলার রক্ত।

আতঙ্কে আর্তনাদ করে জেগে উঠল অমিয় ঘটক।

কিন্তু শুধু এক রাত্রিই নয়। একদিন, দুদিন, তিনদিন। প্রতি রাত্রে ওই একই স্বপ্ন, একই বিভীষিকার পুনরাবৃত্তি! বস্তুবাদী কঠোর অমিয় ঘটক মাদুলী তাবিজ নিলে, রোজা ডাকালো। ছুটে বেড়াল ভারতবর্ষের প্রান্তে প্রান্তে। কিন্তু নীলকণ্ঠ তাকে ছাড়ে না প্রতি রাত্রে, চোখে একটুখানি ঘুমের আমেজ নামলেই সে আসে, একটা গুরুভার পাথরের মতো চেপে বসে বুকের ওপর, তার মুখখানাকে ছুঁচালো দীর্ঘায়িত করে অমিয় ঘটকের রক্ত শুষে খায়—

অমিয় ঘটক পাগল হয়ে গেল।

পাঁচ বছর ছিল রাঁচীতে। ভারতবর্ষের সমস্ত বড় বড় ডাক্তারে চেষ্টা করেছে। কিন্তু কিছু হয়নি। ডাক্তারেরা বলেছে: Insanity Beyond Medical Science—

কাহিনী শেষ হল।

অনেক রাত হয়ে গেছে। লণ্ঠনের ক্ষীণ শিখাটা আরো অস্পষ্ট হয়ে গেছে, তেল নেই নিশ্চয়। বাইরে সীমাহীন স্তব্ধতায় পৃথিবী পড়ে আচ্ছন্ন হয়ে। করুণাদির মুখ দেখা যাচ্ছে না।

—নীলকণ্ঠ, ক্ষমা করো, ক্ষমা করো। বাঁচাও আমাকে—

অমানুষিক প্রেতায়িত চীৎকার। আতঙ্কে দাঁতে দাঁতে বাজতে লাগল রঞ্জুর। সে দেখতে পাচ্ছে—চোখের সামনে যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে রক্তাক্ত নীলকণ্ঠের দানবীয় মূর্তিটাকে। তার চোখ নেই, তা অগ্নিপিণ্ড আর তাই থেকে গলিত আগুনের মতো রক্ত ক্ষরিত হয়ে পড়ছে মুখটাকে ছুঁচালো প্রলম্বিত করে সে পিশাচমূর্তিটা রক্ত শুষে খাচ্ছে মেটাতে চাইছে তার দানবীয় পিপাসা!

—নীলকণ্ঠ, আর নয়—আর নয়—

না আর নয়। এ বাড়ি যেন ভূতে পাওয়া। করুণাদিও যে ভূতগ্রস্ত। কাল ভোর না হতেই এ অভিশপ্ত পরিবেশ ছেড়ে চলে যাবে, এক মুহূর্তও আর থাকবে না।…

…সকালে নাটোর ষ্টেশনের বুকিং অফিসের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে এমন সময় পেছন থেকে কাঁধে হাত পড়ল তার। বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো তাকালো রঞ্জু।

দুটো রিভলভার উদ্যত হয়ে আছে তার দিকে, আটদশজন পুলিশ এসে ঘেরাও করেছে। থাক, কিছুই আর করবার নেই!

ট্রেনের সেই লোকটা মিষ্টি করে হাসল: আজ সাতদিন বড় ভুগিয়েছেন আমাদের। এবারে চলুন।

—চলুন—প্রশান্ত স্বরেই রঞ্জু উত্তর দিলে।

—পনেরো—

জেল হাজতেই দেখা করতে এল ধনেশ্বর।

তীক্ষ্ণ চোখ দুটো বার কয়েক নেচে উঠল তার, তারপরেই কোঁৎ করে একটা মশা গিলে নিলে।

ধনেশ্বর হাসল: ফিরে এলে তা হলে! বেশ বেশ।

লোহার কপাটের মতো ঠোঁট দুটোকে শক্ত করে চেপে রইল রঞ্জু, উত্তর দিলে না।

—ভালো কথা তখন কানে গেল না—এবার ট্রান্সপোর্টেশন ফর্ লাইফ—সেইটেই সুখের হবে কী বলো? ওয়েল, উই উইল্ মিট্, ম্যাটার নব্—

তারপরে যে দেখা সাক্ষাৎগুলো ঘটেছিল তার মধ্যে নতুনত্ব কিছু নেই। প্রথম দিন যখন ধনেশ্বরের গান্টার গায়ে পড়েছিল, তার চাইতে অনেক শক্ত হয়ে গেছে শরীর, অনেক দৃঢ় হয়েছে মন। দাঁতের ওপর দাঁত রেখে অসহ্যতম যন্ত্রণাকে সহ্য করবার অভ্যাসটাও আয়ত্ত করতে পেরেছে। শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিলে ধনেশ্বর। চিনতে পেরেছে! বুঝেছে এভাবে সুবিধে হবে না। যতই ঘা পড়ছে ততই শক্ত হয়ে এঁটে বসছে কংক্রীটের ভিতের মতো। চাবুকটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে হিংস্রভাবে চুরুটের গোড়াটা কামড়ে ধরলে শেষ পর্যন্ত।

—কিছু বলবে না?

—জানিনা।

—কোনো স্টেট্‌মেন্ট দেবে না?

—যা বলেছি এই আমার স্টেট্‌মেন্ট্।

হঠাৎ ধনেশ্বর হা-হা করে হেসে উঠল। বুলডগের মতো ভারী মুখের পেশীগুলো হাসির ধমকে খেলে খেলে যেতে লাগল ঢেউয়ের মতো। অসহ্য শারীরিক যন্ত্রণার কথা ভুলে গিয়েও বিস্মিত ঝাপ্সা দৃষ্টিতে রঞ্জু তাকিয়ে রইল।

—তুমি বলবে না, কিন্তু সব খবর পৌঁছে গেছে আমাদের কাছে। ইয়েস, এভ্রি ডিটেল্ অব ইট্। রঞ্জু তেমনি অর্থহীন চোখে তাকিয়েই রইল।

—পরিমল লাহিড়ী সব কন্‌ফেস করেছে। হালদারের দোকানে ডাকাতি, বরদাবাবুর বন্দুক চুরি—

—পরিমল!

—হ্যাঁ—হ্যাঁ—পরিমল।—ধনেশ্বর এবার সামনে ঝুঁকে পড়ল: ইয়োর বুজ্‌ম্ ফ্রেণ্ড্। কে কে ছিল, কেমন করে প্ল্যান নেওয়া হয়েছিল—সব বলে দিয়েছে, এভ্‌রিথিং!

চুরুটে একটা লম্বা টান দিয়ে ধনেশ্বর উদার-ভঙ্গিতে ধোঁয়া ছড়িয়ে দিলে। তারপর মিট মিট বাঁকা দৃষ্টিতে রঞ্জুর ওপরে লক্ষ্য করতে লাগল কথাটার প্রতিক্রিয়া।

কয়েক মুহূর্তের জন্যে যেন সমস্ত ইন্দ্রিয়-বৃত্তিগুলো অসাড় হয়ে আসতে চাইল রঞ্জুর। নিজের কানকে বিশ্বাস করা যায় না, সমস্ত বুদ্ধিবৃত্তি যেন বিপর্যস্ত হয়ে যায়। এও সম্ভব? পরিমল বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, দলের সব কথা ফাঁস করে দিয়ে চরম সর্বনাশ করে বসেছে তার! রঞ্জুর মনে হল পায়ের তলা থেকে মেজেটা যেন কেউ টেনে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

ধনেশ্বরের চোখে জয়ের পূর্বাভাষ ঝিলিক দিয়ে উঠল। ওমুধ ধরেছে বলে মনে হয়। উৎসাহিতভাবে কাগজ-কলম টেনে নিয়ে বললেন, তা হলে সব বলেই ফেলো এবার। লুকোবার চেষ্টা করে আর কী ফল হবে?

রঞ্জুর ঠোঁট দুটো তার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই নড়ে উঠল একবার—কিন্তু কোনো জবাব দিল না।

—এখনো জবাব দিচ্ছ না? ভেবে দেখো, সব তো জেনেই ফেলেছি। তোমার একটা স্টেট্‌মেন্ট্ না পেলেও কেস্ দাঁড় করাতে আমার কোনো অসুবিধে হবে না। বরং তাতে তোমারই লাভ হত, কন্‌ভিক্‌শনটা হয়তো light হতে পারত।

মনের মধ্যে একটা প্রচণ্ড তোলাপাড়া চলেছে। শাস্তি কম হবে সেজন্যে নয়, পরিমলের কৃতঘ্নতায় সমস্ত মানবিকতার ভিত্তিটাতেই মস্ত একটা চিড় খেয়েছে তার। এমনিই কি সবাই, রোহিণীর সঙ্গে পরিমলের কি পার্থক্য নেই বিন্দুমাত্রও? তা হলে কিসের ভরসায় সে এই বিপ্লবের পথে নেমে এসেছিল, কোন্ প্রত্যয়ে, কোন্ শক্তিতে?

কথা বলতে যাচ্ছিল রঞ্জু, হয়তো কিছু একটা বলেও ফেলত, কিন্তু অত্যুৎসাহী ধনেশ্বর শেষ রক্ষা করতে পারল না।

টোকা দিয়ে চুরুটের ছাই ঝেড়ে ফেলে বললে, কিছুই আর লুকোতে পারবে না। এমন কি রূপসার পথে যে মেল ডবারিটা হয় তাতে তোমাদের দলের যারা ছিল তাদের নামও আমার জানা আছে।

চকিতে রঞ্জুর দৃষ্টি উজ্জ্বল হয়ে উঠল, চোখের পলকে সরে গেল রাহুর ছায়াটা। কৌতুকের এবং স্বস্তির এক ঝলক দক্ষিণা বাতাস এসে মনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল।

ধনেশ্বরের চালাকিটা ধরে ফেলেছে। সব মিথ্যে বলছে, বলছে খুশিমতো বানিয়ে বানিয়ে। রূপসায় মেল-ডাকাতিটা ওদের দল থেকে মোটেই করা হয়নি, করেছিল নিশ্চিন্তপুরের শঙ্কর-মঠ পার্টি। ওদের সঙ্গে তার বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই, পরিমলের পক্ষে সে দলের কারুর নাম জানা সম্ভব নয়। যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে গেল, কাঁধ থেকে ভূত নেমে গেল একটা। হাজার আঘাতেও যা টলেনি, মাত্র একটি উপর-চাতুরীতে তা আর একটু হলেই ভেঙে পড়ছিল!

পীড়িত মুখে রঞ্জু হাসল: তা হতে পারে।

—এর পরে তোমায় আমায় কোনো কথাই বলতে বাধা নেই নিশ্চয়?

—কিন্তু কোনো কথাই তো আমার জানা নেই।

—জানা নেই—না?—আশ্চর্য, এবার আর রাগ করলে না ধনেশ্বর।

অত্যন্ত রীতিতে সিংহের মতো গর্জনও নয়। নিঃশব্দে হাতের কলমটা টেবিলের ওপর সে নামিয়ে রাখল : মানে, বলবে না ?

রঞ্জু জবাব দিলে না।

—বেশ, ট্রান্সপোর্টেশন কর লাইফ তা হ-ল আর কেউ ঠেকাতে পারবে না—চেয়ারে শিথিলভাবে শরীরকে এলিয়ে দিলে ধনেশ্বর : ইয়াদ মিঞা ?

—জী ?

—নিয়ে যান একে—

*   *   *

হাজতে উৎপাত করেও যখন সুবিধে হল না, তখন নিরুপায় ধনেশ্বর তাকে পাঠালো জেলখানায়। এখন নিঃসঙ্গ রঞ্জু। তাকে সকলের চাইতে আলাদা ঘরে রাখা হয়েছে, রাখা হয়েছে 'সেলে।' একা নিঃসঙ্গ দিন কাটে—দিন কাটে তার ঘরটার সামনেই ফাঁসির 'সেলটা'র দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে। ফাঁসির সেল খালি। ওর শূন্যতার মধ্যে কেমন একটা অন্তরতা আছে, থেকে থেকে হঠাৎ যেন মনে হয় ওই ঘরটার ভেতর কী কতগুলো নড়ে নড়ে বেড়াচ্ছে। গা ছম ছম করে ওঠে—যেন বোধ হতে থাকে ওর মধ্যে প্রেতাত্মাদের পদ সঞ্চার শুনতে পাচ্ছে সে।

এ ঘরে যেদিন সে প্রথম এসে পৌঁছুল, সেদিন রাত হয়ে গিয়েছিল। ওই ঘরটার কী আছে না আছে তা তার নজরে পড়েনি, পড়বার মতো অবস্থাও তার ছিল না। কম্বলের বিছানায় শোবার সঙ্গে সঙ্গে অসহ্য আর অসীম শ্রান্তিতে চোখ দুটো তার জড়িয়ে এসেছিল।

ঘুম ভাঙল শেষ রাত্রিতে। ভাঙল একটা আর্তকান্নায়।

—এ ভগবান বাঁচায় দে—বাঁচায় দে—

ধড়মড় করে কম্বলের বিছানায় উঠে বসল সে।

—বাঁচায় দে রাম—জান বাঁচায় দে—

সে চীৎকারের তুলনা নেই—ভাষায় তার ব্যাখ্যা হয়না। সমস্ত শরীর হিম হয়ে গিয়েছিল, গায়ের রক্তে যেন তির তির করে বইতে শুরু করেছিল ঠাণ্ডা বরফের প্রবাহ।

ঘুমিয়ে দিল সেন্টি। টর্চের আলো রঞ্জুর ভীত-বিহ্বল মুখের ওপর ফেলে বললে, খুব খারাপ লাগছে, না বাবু ?

—ও কিসের কান্না সেন্টি ? কে কাঁদছে ?

—ফাঁসীর আসামী বাবু। ফাঁস দিতে নিয়ে গেল।

ফাঁস দিতে নিয়ে গেল ! পা থেকে মাথা পর্যন্ত শিউরে গেল রঞ্জুর।

—বাঁচায় দে রাম—জান বাঁচায় দে—

পৈশাচিক আর্তনাদে জেলখানার স্তব্ধ বাতাসটা শিউরে শিউরে উঠেছে—পাষাণপুরীর চারদিকে অন্ধ হতাশায় ওই কান্না মাথা ঠুকে মরছে। মানুষের কাছে আজ আর আবেদন জানিয়ে কোনো ফল নেই, তাই বাঁচবার শেষ আকুতি সীমাহীন অসহায়তায় পৌঁছে দিচ্ছে ভগবানের দরবারে।

বিভীষিকার মতো পাক খেয়ে বেড়াচ্ছে কান্নাটা—নিস্তব্ধ জেলখানাটার ওপর ছড়িয়ে পড়ছে বুককাটা অভিশাপের মতো। ও কান্না এখন আর মানুষের গলা থেকে বেরুচ্ছে না, যেন একটা পশু বলির আগে হাড়িকাঠ থেকে জানাচ্ছে তার অন্তিম প্রতিবাদ।

সেন্টি, শব্দ করে থুথু ফেললে মাটিতে। বললে, রাম, রাম, সীতারাম !—কথার শেষে গলাটা কেঁপে কেঁপে রেশ খেয়ে গেল। যেন ভয় পেয়েছে।

—হায় রাম—বাঁচায় দেরে—

অনেক দূর থেকে আসছে চীৎকার। সে যে কী ঠিক বোঝানো যায়না। মনে পড়ছে ছেলেবেলায় তার একটা বেড়ালের বাচ্চাকে শেয়ালে নিয়ে গিয়েছিল, বহুদূর থেকে তার কান্না এমনি করেই ভেসে এসেছিল অন্ধকারে। দু হাতে কান চেপে ধরল রঞ্জু, অর্ধমূর্ছিতের মতো কম্বলে মুখ ঢেকে পড়ে রইল মূর্ছিতের মতো। তারপর কখন মোম-মাখানো দড়ি লোকটার কণ্ঠনালীতে চেপে বসেছে তার আর্তনাদকে রুদ্ধ করে দিয়েছে, রঞ্জু তা টেরও পায়নি। যথাসময়ে ওয়ার্ডারের হাঁকে মূর্ছাভঙ্গ হয়েছে তার।

আপাতত ওই ফাঁসির সেল স্তব্ধতায় ঢাকা। কিন্তু ওর স্তব্ধতার আড়ালে কত মানুষের আকুল কান্না মিশে আছে কে জানে। ওর দেওয়ালের গায়ে শেষ চেষ্টায় তারা আঘাত করেছে, মাথা ঠুকে ঠুকে রক্তাক্ত করে দিয়েছে ওর লোহার গরাদে। অপঘাত আর অভিসম্পাত দিয়ে গুণ্ঠিত ওই ঘরটার দিকে তাকিয়ে ভাবতে ভাবতে রঞ্জুর কেমন ঝিম ধরে আসে, কেমন যেন নেশা লাগে।

জেলখানা। শুধু মানুষকে ফাঁসিই দেয়না। তার চাইতে আরো সাংঘাতিক, আরো ভয়ঙ্কর। তিলে তিলে গলা টিপে মারে মানুষের হৃদয়কে, বোধকে। অল্প অল্প বিষ খাইয়ে দিনের পর দিন হরণের একটা পৈশাচিক প্রক্রিয়া চলছে এখানে। বিচারের নামে নরমেধ।

শুধু কি ওই লোকটারই কান্না। ওই কি শুধু চীৎকার করে বলছে : বাঁচায় দে, বাঁচায় দে রাম ?

শুধু ওই ফাঁসির সেলটাই কি অভিশপ্ত ? না, তার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত জেলখানাতেই ওই আর্তনাদ গুমরে গুমরে উঠছে ?

হায় রাম জান বাঁচায়ে দে—

হঠাৎ রঞ্জুর ঠোঁট দুটো শক্ত হয়ে ওঠে। আর দুর্বলতা নেই। এক সঙ্গে অনেক কিছু বুঝতে পেরেছে, অনেক কিছুর অর্থ যেন জলের মতো সহজ হয়ে গেছে। বিপ্লবীর কাজ শেষ হয়নি—কিছুই শেষ হয়নি। সব নতুন করে শুরু করতে হবে। দেশ জোড়া এই জেলখানাটাকে ভেঙে ফেলতে না পারলে আর নিষ্কৃতি নেই। বাইরের জেলখানা, মনের জেলখানা।

সেন্টিটা বীরপদভরে চারদিক কাঁপিয়ে চলাফেরা করছিল—মাঝে মাঝে বক্র আর জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিল ওর দিকে। হঠাৎ সামনে এসে দাঁড়ালো—দাঁড়িয়ে ইতস্তত: করতে লাগল।

যেন কী একটা তার বলবার আছে।

রঞ্জু জিজ্ঞাসা করলে, কিছু বলবে ?

সেন্ট্রি অপ্রস্তুত ভাবে হাসল। হাসিটা শুধু নতুন নয়—অপরিচিত ঠেকল। এমন জায়গায় এ হাসি যেন প্রত্যাশা করা যায় না।

—না, কিছু নয়—খট্ খট্ করে ছু পা এগিয়ে গিয়েই সে আবার ফিরে এল। তারপর সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে বিস্মিত গলায় ফিস্ ফিস্ করে জিজ্ঞেস করলে, আপনারা সাঁচ ইংরেজ তাড়াতে পারবেন বাবু ?

রঞ্জুর মুখ মুহূর্তে কঠিন হয়ে উঠল : এসব কথা কেন জিজ্ঞাসা করছ ?

—না এম্নি—কয়েক সেকেণ্ড সেন্ট্রি অপরাধীর মতো দাঁড়িয়ে রইল। আস্তে আস্তে বললে, পারলে আপনারাই পারবেন বাবু। মেদিনীপুর জেলে একজন স্বদেশী বাবুর ফাঁস দেখেছি আমি। জোর গলায় পরে চেঁচিয়ে বলেছিল—'বান্দে মাতরম'—

বলেই, আবার সে অপরাধীর মতো দ্রুতবেগে এগিয়ে চলে গেল।

অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল রঞ্জু। এ স্বরে কৃত্রিমতা নেই, ফাঁকি নেই। নরকের দূত মাত্রেই নারকীয় নয়। তারও প্রাণের মধ্যে থেকে থেকে মনুষ্যত্বের আকুতি জেগে জেগে উঠছে। পাথরের আড়ালে চাপা পড়েছে বলেই অপঘাত ঘটেনি পাতাল-গঙ্গার।

সেন্ট্রি ফিরে এসেছে। রঞ্জুর মুখমুখি এবার চোখ তুলে দাঁড়িয়ে গেল সে।

তার দৃষ্টি এবার আলাদা। এবার তাতে নতুন একটা দীপ্তি বিদ্যুতের মতো ঝলকে উঠেছে।

চাপা দৃঢ়স্বরে বললে, আমার ঠাকুর্দা। কানপুরে লড়াই করেছিল মিউটিনিতে। ইংরেজ ধরে তাকে ফাঁস দিয়েছিল। কিন্তু—

—সরকার, সেলাম—

জেলখানার ও প্রান্তটা মুখর হয়ে উঠল। জেলার অথবা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ এগিয়ে আসছে কেউ। হঠাৎ সেন্ট্রির মুখের চেহারা বদলে গেল, ফিরে এল পাথরে গড়া নির্লিপ্ততা।

—ঠিক সে রহো—

পা দুটো জড়ো করে অ্যাটেন্‌শনের ভঙ্গিতে খটাস্ করে একটা জোর আওয়াজ তুলল সে। তারপর অত্যন্ত দ্রুতবেগে মার্চ করে চলে গেল জেলখানার লম্বা করিডোরটা দিয়ে।

রঞ্জুর চোখের তারা দুটো ঝলমল করে উঠল। আর ভয় নেই, আর দ্বিধা নেই। শক্ত বনিয়াদের নীচেই সংকেত করছে ভেঙে চুরমার করে দেবার চোরাবালি। আজ যাকে নিষ্প্রাণ পাথরের পিণ্ড বলে মনে হচ্ছে, তার ভেতরে প্রতীক্ষা করছে আগ্নেয়গিরি। মিউটিনিতে যে রক্ত একবার দপ দপ করে জ্বলে উঠেছিল, আজও তার দাহতা শেষ হয়নি। ইন্ধন পেলেই জ্বলে উঠবে।

না, আজ আর ধনেশ্বরকে তার ভয় নেই। সব ঠিক আছে। সব নির্ভুল। (ক্রমশঃ)

বর্ত্তমান চীন

শ্রীঅতুল দত্ত

বিংশ শতাব্দীর প্রথম উষায় চীনে যে মুক্তি আন্দোলনের উদ্ভব হয়, এতদিনে তাহার পরিসমাপ্তি ঘটিতেছে। চীনের জাতীয়তার জনক ডাঃ সান্ ইয়াৎ-সেন্ যে গণ-মুক্তির স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, তাহা আজ সফলতার দ্বারদেশে। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলের নাম "কুয়োমিণ্টাং" অর্থাৎ জনসাধারণের দল—Party of the People. নিদারুণ দারিদ্র্যে, ব্যাপক মহামারীতে, বহুবিধ প্রাকৃতিক দুর্দ্দৈবে ও সামরিক নেতার নির্ম্মম পীড়নে জর্জ্জরিত চীনের যে জনগণ, বৈদেশিক শক্তির সহিত অসম ও অন্যায় চুক্তির বন্ধনে অবনমিত চীনের যে কোটী কোটী নরনারী—তাহাদের মুক্তি সাধনই ছিল কুয়োমিণ্টাংএর লক্ষ্য। ডাঃ সান্ ইয়াৎ-সেন্ তিনটি সুনির্দ্দিষ্ট পর্য্যায়ের মধ্য দিয়া চীনে পূর্ণাঙ্গ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিলেন—(১) প্রতিক্রিয়াপন্থী সামরিক নেতাদের প্রভুত্বের অবসান ঘটাইয়া গণ-ফৌজের (People's Army) দ্বারা জরুরী শাসন-ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন ; (২) জনসাধারণকে স্বায়ত্ত শাসন সম্বন্ধে শিক্ষিত করিয়া তুলিবার জন্য কুয়োমিণ্টাংএর অস্থায়ী কর্ত্তৃত্ব ; (৩) গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার প্রবর্ত্তন।

রুশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব কুয়োমিণ্টাংকে বিশেষভাবে উদ্দীপিত করিয়াছিল। সোভিয়েট রুশিয়া যখন ফিনল্যাণ্ডের ও পোল্যাণ্ডের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকার করিয়া লয় এবং চীনে সাম্রাজ্যবাদী রুশ স্বার্থ বর্জ্জন করে, তখন ডাঃ সান্ ইয়াৎ-সেন্ এই নূতন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রটির প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। তিনি রুশ বিশেষজ্ঞদিগকে চীনে আমন্ত্রণ করেন। তাহারা চীনে আসিয়া শ্রমিক ইউনিয়ন গঠনে সহায়তা করে, কৃষকদিগকে আত্মসচেতন করিবার উপায় শিক্ষা দেয়, কুয়োমিণ্টাংএর সেনাবাহিনীকে আধুনিক বৈপ্লবিক রণকৌশলে সুদক্ষ করিয়া তোলে। এই সময় প্রধান পাশ্চাত্য শক্তিগুলি উত্তর চীনের সামরিক নেতাদের সহিত সহযোগিতা করিয়া নিজ নিজ স্বার্থ রক্ষার চেষ্টা করিতেছিল। আর দক্ষিণে ডাঃ সান্ ইয়াৎ-সেনের ক্যাণ্টন গভর্ণমেণ্ট রুশিয়ার সহযোগে সামরিক স্বৈরাচার-বিরোধী আদর্শ সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে থাকেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ডাঃ সান্ ইয়াৎ-সেনের তৎকালীন সুযোগ্য সহকারী চিয়াংকাই-শেক

তাঁহার সামরিক পরামর্শদাতা ছিলেন সোভিয়েট সেনাপতি মার্শাল ব্লুচার। হাঙ্কাওয়ে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইলে সে গভর্ণমেণ্টের পরামর্শদাতা হন একজন সোভিয়েট রাজনীতিক। আজিকার দিনে সাম্প্রতিক চীনের এই গোড়ার কথা বিস্ময়কর মনে হইবে। কুয়োমিণ্টাং গভর্ণমেণ্টের প্রধান—বলিতে গেলে একমাত্র—মিত্র সোভিয়েট রুশিয়া! চিয়াং-কাই-শেকের পরামর্শদাতা সোভিয়েট সমন্বয়ক!

বিভিন্ন মতাবলম্বী যুবকগণ ডাঃ সান্ ইয়াৎ-সেনের নেতৃত্বে কুয়োমিণ্টাং দলে মিলিত হইয়াছিল। পাশ্চাত্য ভাবধারায় অনুপ্রাণিত সঙ্গতিপন্ন ঘরের যুবকরাই ছিল প্রধানতঃ এই দলের সভ্য। আমেরিকার বা ফ্রান্সের মত রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রবর্তন ছিল ইহাদের অনেকের লক্ষ্য। চীন কৃষিপ্রধান; সঙ্গতিপন্ন ঘরের যুবক মাত্রেরই ভূমি-স্বার্থ ছিল। ইহারা অনেকে ভূমি-ব্যবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তন চাহে নাই। পক্ষান্তরে, ইহাদের মধ্যে যাহারা সমাজতান্ত্রিক ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিয়াছিল—মার্ক্স-লেনিন্ পড়িয়াছিল, তাহারা অবিলম্বে ভূমি-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন দাবী করিল। ইতিমধ্যে রুশ বিপ্লব তাহাদিগকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করে। কুয়োমিণ্টাংএর এই বামপন্থীরা গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগ দেয়, তাহাদের প্রচার ও রাজনৈতিক তৎপরতা চলে কৃষকদের মধ্যে। আর দক্ষিণপন্থীরা মনোযোগ দেয় সহরে; পুঁজিবাদী প্রথায় জাতীয় শিল্প গঠনের দিকে তাহাদের উৎসাহ।

ডাঃ সান্ ইয়াৎ-সেনের জীবিত কালে বামপন্থী ও দক্ষিণপন্থী কুয়োমিণ্টাংএ এই নীতিগত বিরোধ তীব্রভাবে দেখা দেয় নাই; হাঙ্কাও অভিযানের সময় উভয়পক্ষ মিলিতভাবেই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। হাঙ্কাওয়ে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইবার পর বিরোধ ক্রমে প্রবল হইয়া ওঠে। সেনাবাহিনীর পূর্ণ সমর্থন লাভ করেন চিয়াং কাই-শেক; দক্ষিণপন্থীরা ইহার নেতৃত্বে নান্‌কিংএ অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করে। ইহার পূর্ব্বেই ডাঃ সানের মৃত্যু হইয়াছিল। দক্ষিণপন্থী ও সুবিধাবাদী মধ্যপন্থী কর্তৃক সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হাঙ্কাও গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে তখন চলে সামরিক অভিযান। কয়েক হাজার সৈন্য তখনও এই গভর্ণমেণ্টের সমর্থক ছিল। প্রবল বিরোধী পক্ষের আক্রমণে অতিষ্ঠ হইয়া হাঙ্কাও কর্তৃপক্ষ পার্শ্ববর্ত্তী কিয়াংসি প্রদেশে আশ্রয় লন। ১৯২৬-২৭ সালে নান্‌কিংএ চিয়াংএর এই অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টের প্রতিষ্ঠা দ্বিতীয় চীন বিপ্লব বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। চিয়াং-এর পক্ষে যাহারা যোগ দিয়াছিল, তাহারা সহরের উচ্চ শ্রেণী এবং গ্রামাঞ্চলের জমিদার ও তালুকদার। কিন্তু তাহার শক্তির প্রধান ভিত্তি সেনাবাহিনী। গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠায় ডাঃ সান্ ইয়াৎ-সেন যে তিনটি পর্য্যায়ের কল্পনা করিয়াছিলেন, চিয়াং তাহার প্রথমটিতেই অর্থাৎ সেনাবিভাগের কর্তৃত্বেই সকল রাজনৈতিক তৎপরতা সীমাবদ্ধ রাখেন। ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের লেশমাত্র তাঁহার শাসনে ছিল না। সাংহাইয়ের যে শ্রমিকরা ধর্মঘট করিয়া ঐ নগর জয় করিতে তাঁহাকে সহায়তা করে এবং ইয়াংসী উপত্যকার যে সব কৃষক তাঁহার উত্তরাভিমুখী অভিযানে সাহায্য করিয়াছিল, নান্‌কিং গভর্ণমেণ্টে তাহাদের কোনও প্রতিনিধি স্থান পায় না। ১৯২৭ সালের চীন বিপ্লবকে জার্ম্মাণীর নাৎসী বিপ্লবের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। তবে, হিটলার আর চিয়াংএ পার্থক্য এই যে, হিটলারের ছিল একটি সুগঠিত রাজনৈতিক দল; আর চিয়াংএর শক্তির ভিত্তি তাঁহার সেনাবাহিনী। তবে, দুই একনায়কই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নেতা। বৈদেশিক প্রভুত্ব হইতে দেশকে মুক্ত করিবার প্রতিশ্রুতিতেই উভয়ের প্রতিষ্ঠা।

সম্প্রতি নান্‌কিং ত্যাগের সময় মার্শাল চিয়াং ডাঃ সান্ ইয়াৎ-সেনের সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে ডাঃ সানের স্মৃতিকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অমর্যাদা করিয়াছেন তাঁহার এই প্রধান সহকারীটি। ডাঃ সানের গণ-মুক্তির আদর্শ তিনি বর্জ্জন করেন, ক্রমে ক্রমে পূর্ণাঙ্গ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নীতি তিনি অনুসরণ করেন নাই, সামন্ততান্ত্রিক সামরিক প্রভুত্বের পরিবর্ত্তে তিনি আধুনিক সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠা করেন, সোভিয়েট রুশিয়ার সহিত যৌগাক্ষের নীতি তিনি ত্যাগ করেন, সোভিয়েট পরামর্শ-দাতার পরিবর্ত্তে প্রথমে জার্ম্মান ও পরে মার্কিণ পরামর্শদাতা তাঁহার জোটে; বৈদেশিক শক্তির সহিত অসম চুক্তির অবসান দূরে থাকুক, নূতন নূতন অসম চুক্তিতে তিনি আবদ্ধ হন। (অবশ্য দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জাপান পরাজিত হইবার পর হংকং ব্যতীত অন্যান্য জায়গায় বৃটেন তাহার অন্যায় প্রভুত্ব ত্যাগ করে; ফ্রান্সও ঐরূপ অধিকার বর্জ্জন করিয়াছে।) বর্ত্তমানে কম্যুনিষ্টরা সন্ধি সম্পর্কে যে সব সর্ত্ত উত্থাপন করিয়াছে, আমেরিকার সহিত অসম চুক্তির অবসান তাহার মধ্যে প্রধান। সে যাহা হউক, ডাঃ সান্ যদি বাঁচিয়া থাকিতেন, তাহা হইলে বামপন্থী কুয়োমিণ্টাংরাই যে তাঁহার অকুণ্ঠ সমর্থন লাভ করিত, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। ডাঃ সানের দ্বিতীয়া পত্নী ও সহকর্ম্মিণী সুং চিং-লিং (বর্ত্তমান প্রধান মন্ত্রী ডাঃ সুন্ ফোর জননী নহেন) বহু তথ্য সমাবেশ করিয়া এবং সানের নীতির ব্যাখ্যা করিয়া ইহা প্রমাণ করিয়াছেন।

১৯২৭ সালে তথাকথিত দ্বিতীয় বিপ্লবের পর হাঙ্কাওস্থিত মূল কুয়ো-মিণ্টাং গভর্ণমেণ্ট কিয়াংসি প্রদেশে আশ্রয় লয়; চিয়াংএর এইবিরোধী পক্ষই আজ মাও সে-তুংএর নেতৃত্বাধীনে কম্যুনিষ্ট বলিয়া পরিচিত। ১৯৩৬ সাল পর্য্যন্ত চিয়াং ইহাদিগকে কম্যুনিষ্ট আখ্যা দেন নাই—সামরিক বিদ্রোহী বলিয়া ইহাদিগকে অভিহিত করিতেন। বামপন্থী কুয়োমিণ্টাংরা কিয়াংসি প্রদেশে দীর্ঘ সাত বৎসর চিয়াংএর সেনাবাহিনীর সহিত বিরাম সংগ্রাম পরিচালনা করে। কৃষকরা ইহাদের প্রধান সমর্থক ছিল; দলে দলে কৃষক ইহাদের সেনাবিভাগে যোগ দান করে। কিয়াংসিতে অবস্থান সম্পর্কে জনৈক কম্যুনিষ্ট নেতা বলেন যে, জলরূপী জনসাধারণের মধ্যে মীনের মত তাঁহারা অবাধে বিচরণ করেন। ১৯৩৪ সালে চিয়াং কাই-শেক বিশাল সেনাবাহিনী সমাবেশ করেন কিয়াংসি প্রদেশে। চতুর্দ্দিক হইতে পরিবেষ্টিত হইয়া বামপন্থী বা কম্যুনিষ্টরা

বিচ্ছিন্ন হইবার উপক্রম হয়। কম্যুনিষ্ট নেতারা তখন একটি ক্ষেত্রে প্রচণ্ড আঘাতে পরিবেষ্টনব্যূহ ভেদ করিয়া কিয়াংসি প্রদেশ ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার সিদ্ধান্ত করেন। ১৯৩৪ সালের ১৬ই অক্টোবর এই ঐতিহাসিক অভিযান আরম্ভ হয়। চিয়াংএর পরিবেষ্টন ব্যূহ ভেদ করিয়া কম্যুনিষ্টরা প্রথমে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়; গভীর অরণ্য, অতি দুর্গম পার্ব্বত্য পথ ও নদী অতিক্রম করিয়া কম্যুনিষ্ট সেনাবাহিনী অগ্রসর হইতে থাকে, তাহাদিগকে অনুসরণ করে সহস্র সহস্র কম্যুনিষ্ট পরিবার। এই অভিযানের রাজনৈতিক নেতা ছিলেন মাও সে-তুং; চিয়াংএর সেনাবাহিনী কর্তৃক অবিরাম পশ্চাদনুসরণ ও পার্শ্ব আক্রমণ প্রতিরোধের ভার বহন করেন মার্শাল চু-তে। বস্তুতঃ, তিনিই এই অভিযানের প্রকৃত নেতা। পশ্চিম সীমান্তবর্ত্তী ইউনান্ প্রদেশে আসিয়া এই অভিযাত্রী বাহিনী ইয়াংসী অতিক্রম করিয়া উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকে। উত্তর-পশ্চিমে শানসি ও শেনসি প্রদেশে পৌঁছিয়া এই অভিযান শেষ হয়। ১৯৩৫ সালে নভেম্বর মাসে—পূর্ণ এক বৎসরে এই বিশাল অভিযান (Great March) শেষ হইয়াছিল। ঐতিহাসিকেরা চীনের কম্যুনিষ্টদের এই ৭ হাজার মাইলব্যাপী দুঃসাহসিক অভিযানকে পুরাকালে আলেকজাণ্ডারের এশিয়া আক্রমণের সময় জেনোফোনের ১০ হাজার সৈন্যের অভিযানের সহিত তুলনা করিয়া থাকেন। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে পৌঁছিবামাত্র কম্যুনিষ্টরা শানসি ও শেনসি প্রদেশে নূতন সোভিয়েট রাষ্ট্র গঠনে মনোযোগী হয়। শেনসি প্রদেশে য়েনানে কম্যুনিষ্টদের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

চিয়াং যখন কম্যুনিষ্টদের দমন করিতে ব্যস্ত, সেই সময় জাপান মাঞ্চুরিয়া অধিকার করে এবং চীনের আভ্যন্তরীণ বিভেদের সুযোগে নিজ প্রভুত্ব বিস্তার করিতে থাকে। উত্তর চীনে জাপানের প্রভুত্ব বিস্তৃত হইতে আরম্ভ করায় চীনে জাপ-বিরোধী মনোভাব ক্রমেই বৃদ্ধি পায়। কিন্তু চিয়াং জাপ সাম্রাজ্যবাদ অপেক্ষা কম্যুনিষ্টদিগকেই বৃহত্তর শত্রু মনে করেন। পক্ষান্তরে, কম্যুনিষ্টরা জাপানের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা প্রচার করিতে থাকে। কম্যুনিষ্টরা যাহাতে শানসি-শেনসির পার্ব্বত্য অঞ্চল হইতে অন্য দিকে আর প্রভাব বিস্তার করিতে না পারে, তাহার জন্য মার্শাল চ্যাং সু-লিয়াংকে চিয়াং কাইশেক্ ঐ অঞ্চলে প্রেরণ করেন। কিন্তু এই যুবক মার্শালটি অত্যন্ত জাপ-বিদ্বেষী ছিলেন; তাহার পিতাকে জাপানীরাই হত্যা করে বলিয়া সন্দেহ করিবার কারণ ছিল। মাঞ্চুরিয়ায় তাঁহার পরিবারের পুরুষানুক্রমিক প্রভুত্বের অবসান ঘটায় জাপানীরা। ইনি উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে যাইয়া জাপ-বিরোধী প্রচারে কম্যুনিষ্টদের সহিত সহযোগিতা করিতে আরম্ভ করেন। চিয়াং এই সংবাদ পাইয়া অত্যন্ত উত্তেজিত হন এবং স্বয়ং উত্তরাভিমুখে রওনা হন। সেখানে চ্যাং সু-লিয়াংএর মাঞ্চুরিয়া বাহিনী, কম্যুনিষ্ট ও শানসির প্রাদেশিক সেনা একত্র হইয়া প্রায় বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিল। চিয়াং সিয়ানফুতে পৌঁছিবামাত্র চ্যাং সু-লিয়াংএর হাতে বন্দী হন। ইহা ১৯৩৬ সালে ডিসেম্বর মাসের কথা। এই বন্দী অবস্থায় তিনি জাপানের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম পরিচালনের প্রতিশ্রুতি দিয়া আসেন। এই প্রতিশ্রুতি তিনি রক্ষা করিয়াছিলেন তদবধি জাপান সম্পর্কে তাঁহার তোষণ-নীতির পরিবর্ত্তন হয়। ইহা অনিবার্য্য ফলস্বরূপ ১৯৩৭ সালে জুন মাসে লুকোচিয়াওর এক ক্ষুদ্র ঘটনা অবলম্বন করিয়া জাপানের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ চীনের যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া যায়।

জাপ-বিরোধী সংগ্রামের সময় কম্যুনিষ্টরা চিয়াং-কাই-শেকে সর্ব্বাধিনায়কত্ব স্বীকার করিয়া লইলেও তাহাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বিনিষ্ট করে নাই। এই যুদ্ধে কম্যুনিষ্টরা অতি দ্রুত শক্তিশালী হইয়া উঠিতে থাকে। তাহাদের গেরিলা তৎপরতায় জাপানীরা বিশেষভাবে বিপর্য্যস্ত হয়; জাপানীদের বহু অস্ত্রশস্ত্র কম্যুনিষ্টদের হাতে আসিতে থাকে। এই শক্তি বৃদ্ধিতে চিয়াং প্রমাদ গণেন। যুদ্ধের শেষের দিকে তিনি ৫ লক্ষ সুশিক্ষিত সৈন্য কম্যুনিষ্টদের প্রভুত্বাধীন অঞ্চলে সন্নিবিষ্ট রাখিয়াছিলেন। যুদ্ধের অবস্থা যখন অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক হয়, তখনও তিনি এই সেনাবাহিনী সরাইয়া আনিয়া জাপানের বিরুদ্ধে নিয়োজিত করিতে সম্মত হন নাই। অবশেষে জাপ-বিরোধী যুদ্ধের শেষ অঙ্কে সোভিয়েট রুশিয়া যখন উত্তরাঞ্চলে অভিযান আরম্ভ করে, তখন পরাভূত জাপানীদের বিশাল অস্ত্রভাণ্ডার কম্যুনিষ্টদের হাতে পড়ে। ইহাতে কম্যুনিষ্টদের সামরিক শক্তি বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। সোভিয়েট রুশিয়া এইরূপ পরোক্ষভাবে কম্যুনিষ্টদিগকে সাহায্য করিয়াছে বটে কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে একটি সোভিয়েট রাইফেল বা মেসিন গান্ চীনে কম্যুনিষ্টদের নিকট পাওয়া যায় নাই; একজন সোভিয়েট বিশেষজ্ঞও কম্যুনিষ্টদের শিবিরে দেখা যায় নাই। এই সম্পর্কে যে অভিযোগ করা হয়, তাহা সর্ব্বৈব মিথ্যা। আর পরাজিত জাপানীদের অস্ত্রশস্ত্র কম্যুনিষ্টদিগকে অধিকার করিবার সুযোগ দেওয়ায় অন্যায় কিছুই নাই ইহারা তো জাপ-বিরোধী শিবিরেরই চীনা যোদ্ধা।

জাপান পরাজিত হইবার পর কম্যুনিষ্টদের সহিত একটা মীমাংসা চেষ্টা হইয়াছিল। এই মীমাংসার আলোচনার সময় চিয়াংএর প্রধান জিদ্ ছিল—কম্যুনিষ্টদের স্বতন্ত্র প্রভুত্ব ত্যাগ করিতে হইবে এবং স্বতন্ত্র সেনাবাহিনী ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে। কম্যুনিষ্টরা ইহাতে অসম্মত হয় নাই। এক রাষ্ট্রের মধ্যে আর একটি স্বাধীন রাষ্ট্র এবং একাধিক স্বাধীন সেনাবাহিনী যে থাকিতে পারে না, ইহা কম্যুনিষ্টরা বোঝে তাহারা এই সম্পর্কে অন্যায় আবদার করে নাই। তাহাদের যুক্তি— প্রকৃত গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের এবং গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে সেনা বিভাগ পুনর্গঠিত হইবার নিশ্চয়তা না পাওয়া পর্য্যন্ত নিজেদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব তাহারা বিলোপ করিতে পারে না। কিন্তু চিয়াং অন্য কোন বিষয়ে মীমাংসার পূর্ব্বে কম্যুনিষ্টদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বিলোপের জন্য জিদ্ ধরেন। তাঁহার অভিসন্ধি কম্যুনিষ্টদের বুঝিতে বিলম্ব হয় না। তাহারা মীমাংসার আলোচনা ত্যাগ করে।

ইহার পর আবার প্রবল আকারে গৃহ-যুদ্ধ আরম্ভ হয়। আড়াই বৎসর যুদ্ধের পর কম্যুনিষ্টরা গত নভেম্বর মাসে মাঞ্চুরিয়ায় নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছে। এই যুদ্ধের সময় চিয়াং কাই-শেক

আমেরিকার নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া প্রচুর সাহায্য লাভ করিয়াছেন। জাপান পরাজিত হইবার পর এখন পর্য্যন্ত আমেরিকার নিকট হইতে চিয়াংএর প্রাপ্ত সাহায্যের মূল্য ৪ শত কোটী ডলারেরও অধিক। কিন্তু চিয়াংএর শাসন ব্যবস্থায় এতদূর দুর্নীতি প্রবেশ করিয়াছে যে, এই সাহায্যের বিশাল অংশ দুর্নীতি পরায়ণ কর্ম্মচারীদের উদরস্থ হইয়াছে। বহু সামরিক কর্ম্মচারী মার্কিণ সমরোপকরণ কম্যুনিষ্টদের নিকট বেচিয়াছে; এক একটি যুদ্ধে জিতিয়া কম্যুনিষ্টরা প্রচুর অস্ত্র-শস্ত্র হস্তগত করিয়াছে। জনসাধারণের দুঃখ চরমে উঠিয়াছে, মুদ্রাস্ফীতি গগনস্পর্শী, পণ্য অগ্নিমূল্য, শাসন বিভাগের সর্ব্বাঙ্গে দুর্নীতির পূতিগন্ধ।

মার্কিণ সাহায্যপুষ্ট এই চিয়াং গভর্ণমেণ্ট আশা করিয়াছিলেন যে, আমেরিকার আরও সাহায্যে কিছুকাল যুদ্ধ চালানো সম্ভব হইবে। সেই আশায় মাঞ্চুরিয়া হস্তচ্যুত হইবার পর চিয়াং কম্যুনিষ্টদের বিরুদ্ধে আট বৎসরব্যাপী আপোষহীন সংগ্রাম পরিচালনের প্রতিশ্রুতি শোনান। কিন্তু আমেরিকা আর ভস্মে ঘৃতাহুতি দিতে সম্মত হয় নাই। মাদাম সাহায্যের জন্য আমেরিকায় যাইয়া ব্যর্থকাম হইয়াছেন। এদিকে কম্যুনিষ্ট সেনাবাহিনী প্রচণ্ডবেগে নান্‌কিংএর দ্বারদেশে আসিয়া উপনীত হয়। তাই শেষ পর্য্যন্ত গত ১লা জানুয়ারী মার্শাল চিয়াং কম্যুনিষ্টদের উদ্দেশে সন্ধির আবেদন জানান। এই আবেদন প্রকাশিত হইবা মাত্র চীনের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে কম্যুনিষ্টদের উদ্দেশে সন্ধির অনুরোধ জানান হইতে থাকে—চীনের জনসাধারণের মনোভাব যে কতদূর গৃহ-যুদ্ধ-বিরোধী হইয়া উঠিয়াছে, তাহা বিশেষভাবে প্রকাশ পায়। কিন্তু কম্যুনিষ্টরা কুয়োমিণ্টাং গভর্ণমেণ্টের এই সন্ধির আবেদনকে সময় লাভের উদ্দেশ্যে একটি চাল মাত্র মনে করে, তাহারা সন্ধির জন্য আট দফা সর্ত্ত উপস্থাপিত করিয়াছে। প্রথম ও প্রধান সর্ত্ত চিয়াং প্রমুখ ৪৫ জন কুয়োমিণ্টাংনেতাকে যুদ্ধাপরাধীরূপে শাস্তি দিতে হইবে। কম্যুনিষ্টরা এই সর্ত্ত উত্থাপন করিবামাত্র চিয়াং প্রেসিডেণ্টের পদ হইতে অবসর-গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার স্থলাভিষিক্ত লি স্তেং-জেন কম্যুনিষ্টদের সর্ত্তাবলী গ্রহণ করিয়া সন্ধির আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে সম্মত হন। এখন কম্যুনিষ্টরা "যুদ্ধাপরাধীদিগকে" গ্রেপ্তার করিবার দাবী জানাইয়াছে। নান্‌কিং অভিমুখে তাহাদের অগ্রগতি স্তব্ধ হয় নাই। অবসর গ্রহণের পরও চিয়াং কম্যুনিষ্টদের বিরুদ্ধে পরবর্ত্তী সংগ্রামের আয়োজন করিতেছেন বলিয়া কম্যুনিষ্ট নেতাদের ধারণা। যাহা হউক, চীনের সামরিক অবস্থা এখন যেরূপ অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে এবং চিয়াং গভর্ণমেণ্টের প্রতি জনসাধারণের অসন্তোষ যেরূপ প্রবল, তাহাতে চীনের বৃহত্তর অংশে কম্যুনিষ্টদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা অনিবার্য্য। বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ডাঃ সান্ ইয়াৎ-সেন্ যে গণ-মুক্তির কামনায় আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন, এতদিনে চীনের জনগণের সেই মুক্তি সত্যই আসন্ন।

আমেরিকায় কালীপূজা

শ্রীমতী লীলা রায় বি-এ, বি-টি

হলিউডের রামকৃষ্ণ মিশন মঠে স্বামী প্রভবানন্দ এবার মূর্ত্তি গড়ে কালীপূজো করলেন। আমেরিকায় মূর্ত্তি গড়ে কালীপূজো এই প্রথম।

আমি ২৭শে অক্টোবর রাত্রিতে সল্ট লেক (Salt Lake) থেকে রওয়ানা হই। আমার বন্ধু Mrs. Felt-এর অনেকদিন থেকে ইচ্ছে ছিল একবার আমার সঙ্গে কোন জায়গায় বেড়াতে যান। নিজের কাজে তাঁকে Los Angeles (লস্ এঞ্জেলস্) যেতে হচ্ছিল—আমি যাব শুনে আমার সঙ্গে যাবেন ঠিক করেন। শেষ পর্য্যন্ত ঠিক হ'ল যে উনি সানফ্রান্সিস্‌কো হয়ে লস্ এঞ্জেলস্ যাবেন। ষ্টানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে মিসেস ফেল্‌টের স্বামী বর্ত্তমানে পি এচ্-ডি পড়ছেন। সানফ্রান্সিস্‌কো থেকে ষ্টানফোর্ড পঁয়তাল্লিশ মিনিটের পথ। মিসেস্ ফেল্‌ট সে জন্যে ঠিক করেন যে সানফ্রান্সিস্‌কো হয়ে গেলে ওঁর স্বামীর সঙ্গে দেখা হয়। তাই আমরা বুধবার রাত্রি ৮-৩০টায় রওয়ানা হয়ে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬টায় সানফ্রান্সিকো পৌঁছি। মিঃ ফেল্‌ট সেই রাত্রেই ষ্টানফোর্ড থেকে আসেন—আমরা হোটেলে ছিলাম। শুক্রবার দিন মিঃ ও মিসেস্ ফেল্‌ট নানা জায়গায় কাজের জন্য ঘুরে বেড়ালেন। আমি সেদিন এখানকার ভারতীয় ছাত্র কালিদাস সেনগুপ্তের সঙ্গে মিউজিয়াম আর্ট গ্যালারী, গোল্‌ডেন গেট পার্ক ইত্যাদি ঘুরে বেড়ালাম। গতবার যখন বার্কলেতে ছিলাম, তখন সেনগুপ্তের সঙ্গে খুব আলাপ হয়েছিল। ছেলেটি আমাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করে। শনিবার ভোরে মিঃ ফেল্‌ট ষ্টানফোর্ড ফিরে গেলেন—আর আমি ও মিসেস্ ফেল্‌ট দু'জনে সকাল ন'টায় সানফ্রান্সিকো ছেড়ে লস্ এঞ্জেলসের দিকে রওয়ানা হলাম। হলিউডে বাস্ থেকে নামতেই Flash ! কি ব্যাপার ! একটি আমেরিকান তরুণ সন্ন্যাসী আমাদের ফটো নিচ্ছে ! সন্ন্যাস নিয়ে নাম হয়েছে কৃষ্ণ। শিশুর মত সরল—আনন্দের প্রতিমূর্ত্তি। যাক্ স্বামীজী গাড়ী পাঠিয়েছিলেন—আশ্রমে পৌঁছতেই আনন্দের বন্যা বয়ে গেল। মিসেস ফেল্‌ট একটি হোটেলে চলে গেলেন। আমার মনে হতে লাগল, আমি যেন নিজের ঘরে ফিরেছি। আমি এসেছি বলে স্বামীজীর খুব আনন্দ হয়েছে। কালী প্রতিমাটি চমৎকার হয়েছিল। রাত্রিতে জল্পনা কল্পনা হলো প্রতিমাটি কিভাবে কোথায় বসান হবে।

পরদিন হৈ হৈ ! আশ্রমের ছেলেমেয়েরা (সব আমেরিকান) সকলেই আমাকে খুবই ভালবাসে। স্বামীজীতো সকলকেই বলেন—উনি নাকি আমার গড্ ফাদার, আমি ওঁর ভারতীয় মেয়ে। যাক্,

দুপুরেও খুব খাওয়াদাওয়া হ'ল। মায়া বলে একটি আমেরিকান মেয়ে তন্ত্রধারকের কাজ করবেন। তিনি ও স্বামীজী উপবাস করলেন।

দুপুরে স্বামীজী মিসেস্ কেল্টকে বক্তৃতা, ভোজ এবং পুজো দেখবার নেমন্তন্ন করেছিলেন। মিসেস্ কেল্ট সকাল ১০-৩০টায় এলেন। সকাল থেকে ভক্তদের দেওয়া ফুলে-ফলে-মিষ্টিতে মন্দির ভরে উঠলো। আমেরিকান সন্ন্যাসিনী মেয়েরা ভারতীয় নানারকম রান্না করলেন। আমি পুজোর জন্য নিম্‌কী, সিঙাড়া, লুচি, পরটা, এলো-খেলো, জিভ্‌গজা করছিলাম। পুজোর সময় হঠাৎ অসীমাদি (চ্যাটার্জি) পুজো দেখতে এলেন—তিনি এখন কালটাকে থাকেন। হলিউড থেকে কালটাক বেশী দূরে নয়। স্বামীজী পুজোতে বাঙালীদের সকলকেই নেমন্তন্ন করেছিলেন। তাই ডাক্তার বিশ্বাসের সঙ্গে অসীমাদি পুজো দেখতে এসেছিলেন। শুধু অসীমাদি নয়—দীপক বলে স্কটিশ চার্চ কলেজের একজন পরিচিত ছাত্রও এসেছিল। ওরা আসাতে বেশ আনন্দ হয়েছিল। বিশেষ করে অসীমাদি আসাতে আমার খুব ভালো লাগছিল। অসীমাদি আমাকে দেখে বিস্ময়ে ভেঙে পড়লেন। জিজ্ঞেস করলেন—"লীলা, তুই কি করে এখানে এলি? তোর তো থাকবার কথা সল্ট লেকে!" স্বামীজী অসীমাদির এই কৌতূহলের জবাব দিলেন—"আমি যে ওর গড্ ফাদার, ওতো এখানকারই মেয়ে।"

মন্দিরের সম্মুখে স্বামী প্রভবানন্দ—এক পার্শ্বে লীলা, অপর পার্শ্বে মিসেস্ কেল্ট

অসীমাদি আনন্দে আত্মহারা হয়ে আমাকে আবার জিজ্ঞেস করলেন

কোথায়? এটাইতো ওর বাড়ীঘর!" স্বামীজী রাত ১০-৩০টায় কালী পুজোয় বসলেন। মন্দির ভর্তি হয়ে গেল অসংখ্য ভক্তদের আগমনে।

হলিউডে ৺মা কালী (একদিকে লীলা ও অপর দিকে মিসেস্ কেল্ট)

যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা রীতিমত বামকরা লোক। তবু ঠাকুরের প্রতি তাঁদের ভক্তি অটুট। চমৎকার পুজো হ'ল। ভোগের সময় স্বামীজী আমাকে গান করতে বলেন। আমি গাইলাম। সকলেই আমার গান বিশেষ ভাবে উপভোগ করেছিলেন। পুজোর পর হোম হল। স্বামীজী সকলকেই শান্তির জল বিতরণ করলেন। আমেরিকান যে মেয়েটি তন্ত্রধার হয়েছিলেন তাঁর এখনকার নাম সারদা—সে কথা আগেই লিখেছি। তিনি গরদের সাড়ী পরে চমৎকার সংস্কৃত মন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন। কি—চমৎকার তাঁকে মানিয়েছিল। হাঁটু অবধি লম্বা চুল। মনে হচ্ছিল সত্যই যোগিনী মূর্তি।

স্বামীজীর পাণ্ডিত্য অদ্ভুত। ভক্তি ও সাধনার সমন্বয়ে সেই পাণ্ডিত্য এদেশের জড়বাদীদেরও অভিভূত করেছে। এল্‌ডস হাক্সলির মতো বিশ্ববিখ্যাত মনীষীকে তাঁর সামনে যোড়াসনে বসে জীবন ও দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা করতে দেখেছি। স্বামীজী এত সহজ মানুষ অথচ তাঁর ব্যক্তিত্ব কি প্রগাঢ়। পুজো শেষ হবার পর স্বামীজীর ঘরে বসে আমরা বাঙালীরা আমেরিকাতে হিন্দুধর্ম প্রচার এবং বাংলার দেবদেবীর পুজো সম্বন্ধে গভীরভাবে আলোচনা করলাম। পরদিন স্বামীজী সান্টা বারবারাতে চলে গেলেন। আমি চলে আসবো বলে তাঁর সঙ্গে যেতে পারলাম না। স্বামীজীর সে জন্যে দুঃখ হল।

মঙ্গলবার দিন ভোর। তাই ফোঁটার দিন। মনে মনে আমার বাবার মঙ্গল কামনা করে আমি

নিজের ঘরে বসে তোমায় এই চিঠি লিখছি। একটা দিন শুধুই ভাবছি আমেরিকার ঐশ্বর্য্য ও বিলাসের কেন্দ্র হলিউড—সেই হলিউডে রামকৃষ্ণ মিশনের এই আধ্যাত্মিক প্রভাব ক্রমশই কেন বিস্তার লাভ করছে। জড়বাদীর বহির্মুখী মন অন্তর্মুখী হবে কি? আমেরিকার বুকে মা কালীর এই সর্ব প্রথম ষোড়শোপচার পূজা কি ভারতীয় সাধনার অব্যাহত জয়যাত্রা ঘোষণা করছে না? স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকায় যে সাধন-তরু রোপণ করেছিলেন আজ তা ফল পুষ্প শোভিত হয়ে অশান্ত আমেরিকানের চোখে ছায়া শীতল আশ্রয় বলে মনে হচ্ছে—তাই না দেখে এলাম কত শত আমেরিকান "কৃষ্ণ" আমেরিকান "সারদা" এবং স্বামী প্রভবানন্দের অদ্ভুত প্রভাব। এ যে দেখব এ কখনো ভাবিনি। বার বার মনে হচ্ছে—

"কত অজানারে জানাইলে তুমি
কত ঘরে দিলে ঠাঁই।
দূরকে করিলে নিকট বন্ধু
পরকে করিলে ভাই।

লীলা

(২)

আমি লস্ এঞ্জেলস্ থেকে একশ মাইল দূরে সান্টা বারবারায় মেয়েদের আশ্রমে আছি। এখানে রামকৃষ্ণ মিশনের আশ্রমে আছি। এ দেশী যে সব মেয়েরা আমাদের ধর্ম্ম গ্রহণ করে সন্ন্যাসিনী অথবা আধ্যাত্মিক জীবন যাপন করতে চায় আশ্রমটি তাদেরই জন্যে। পাহাড়ের উপরে অবস্থিত অপূর্ব্ব সুন্দর সে আশ্রমটি—দূরে প্রশান্ত মহাসাগর—আশ্রম থেকে পরিষ্কার দেখা যায়—কি অদ্ভুত সৌন্দর্য্য! আশ্রমে বর্ত্তমানে এগারো জন মেয়ে আছে—একুশ থেকে আটচল্লিশ বছর পর্য্যন্ত। পাঁচ বৎসর থাকার পর যোগ্য বিবেচিত হলে আশ্রমে মেয়েদের দীক্ষা দেওয়া হয়। এসব মার্কিণ মেয়েরা কি ভাবে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব, স্বামীজী এবং আমাদের ঠাকুর দেবতার সেবা করছে—দেখলে ভয়ানক আশ্চর্য্য লাগে। তাঁরা রীতিমত ব্রহ্মচর্য্য পালন করছেন। স্বামী প্রভবানন্দ হলিউডের আশ্রম থেকে স্বামীজী রোববার বিকেলে এখানে আসবেন এবং তিনদিন থাকবেন। আমি সান্টা বারবারাতে এসেছিলাম একরাত্রের জন্যে। কিন্তু স্বামীজীর সঙ্গে দেখা হবে না ভেবে মনে করলাম, রোববার ছুটির দিনটা সান্টা বারবারাতেই কাটিয়ে যাই। রোববার বিকেলে স্বামীজী এলেন। সঙ্গে স্বামী শান্তস্বরূপানন্দ। তাঁর সঙ্গে সানফ্রান্সিস্কোতে আমার দেখা হয়েছিল। স্বামী প্রভবানন্দ চমৎকার লোক—খুব ফূর্ত্তিবাজ। তাঁকে আমার খুবই ভাল লাগলো। স্বামীজী দেশ থেকে নানা রকম ফুল, ফল ও সব্জীর বীজ এনে আশ্রমে লাগিয়েছেন। বাগান দেখাতে নিয়ে গিয়ে বল্লেন—গাছে এই প্রথম লাউ ও ঝিঙে হয়েছে—আমি যদি এই লাউ আর ঝিঙে দিয়ে লাউঘন্ট আর ঝিঙে পোস্ত সোমবার ঠাকুরের ভোগের জন্য রাঁধি তবে 'ঠাকুর' খুব ভাল করে খেতে পারবেন। আমার প্রোগাম দেখে স্বামীজী বল্লেন—তুমিতো অসম্ভব ঘুরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছ—এখানে দু'দিন থেকে যাও। সত্যি আমিও অসম্ভব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। ভাবলাম দু'দিন থেকে যাই।

আমি পরদিন চিংড়ী মাছ দিয়ে লাউ ঘন্ট, মাছের কোর্ম্মা, কুমড়ো ডাঁটার চচ্চড়ী এবং ঝিঙে-পোস্ত রান্না করলাম। সবই নতুন রান্না। ঠাকুরের প্রথম ভোগ হ'ল এই দিয়ে এ দেশে। কাজেই সকলেরই বেশ তৃপ্তি লাগলো। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের এক আত্মীয়া কৃষ্ণা রায় বলে একটি মেয়েও ছুটি কাটাচ্ছে এ আশ্রমে। বেশ চমৎকার মেয়েটি। ওয়েলেসলি কলেজে বি, এ পড়ছে। খুব ভাব হয়েছে।

রাত্রিতে খাবার পর এ দেশী মেয়েরা রামনাম ও বাংলা ভজন গান গাইল—অপূর্ব্ব! আশ্চর্য্য এদের চেষ্টা। আমি ও কৃষ্ণাও গান করলাম। বলা বাহুল্য আমি কীর্ত্তন এবং কৃষ্ণা রবীন্দ্র সঙ্গীত। স্বামীজী আমার কীর্ত্তন শুনে ভয়ানক খুশী হলেন। সেই রাত্রে আমি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখি—যেন ঠাকুর আমার কাছে এসে বলছেন 'ওরে তোর গান শুনেছি—বড় ভাল লাগল'—সারারাত আর ঘুম হলো না—কেন এমন স্বপ্ন দেখলাম? কি পরিষ্কার স্বপ্ন। স্বপ্নের কথা পরদিন স্বামীজী এবং অন্য সকলকে বললুম। স্বামীজী শুনে বল্লেন—তোমার গান খুবই সুন্দর আর প্রাণ ঢালা—ঠাকুর শুনবেন বৈকি!

[কুমারী লীলা রায় বাঙলা সরকারের অধুনালুপ্ত College of Physical Education for women থেকে ডিপ্লোমা নিয়ে কলিকাতার উইমেনস কলেজ ও স্কটিশচার্চ কলেজে মেয়েদের স্বাস্থ্য ও শরীর চর্চার অধ্যাপিকা নিযুক্ত হন। তিনি Women's Inter Collegiate Sports Association এর সম্পাদিকা ছিলেন। স্বাস্থ্য ও শরীর চর্চা সম্পর্কে উচ্চশিক্ষার্থ সরকারী বৃত্তি পেয়ে তিনি ১৯৫৭ সালের জুলাই মাসে কানাডার টরোন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। সেখানে ছয়মাস শিক্ষালাভ করে ১৯৫৮এর জানুয়ারী মাসে আমেরিকার ইউটা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম-এ ক্লাসে ভর্ত্তি হন। আগামী এপ্রিল মাসে ওখানকার শিক্ষা শেষ হবে। তিনি ঐখানকার বিদেশী ছাত্র ছাত্রীদের আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান Cosmopoliton Club এর Vice President নির্বাচিত হয়েছেন। ইহার President ঘানাদেশের একজন ছাত্র।]

সন ১৩৫৬ সাল

জ্যোতি বাচস্পতি

গত ৬ই চৈত্র ইংরাজী ২০শে মার্চ ১৯৪৯ রবিবার (ইংরাজী মতে ২১শে মার্চ, সোমবার) ষ্ট্যাণ্ডার্ড রাত্রি ৪টা ১৯ মিনিট সময়ে সূর্য বিষুবরেখার উপর আসবেন। সেইদিন সেই সময়কার গ্রহ সংস্থান এক বছরের মত পৃথিবীর উপর প্রভাব স্থাপন করবে। সে সময়ের গ্রহসংস্থান নিচে দেওয়া হ'ল।

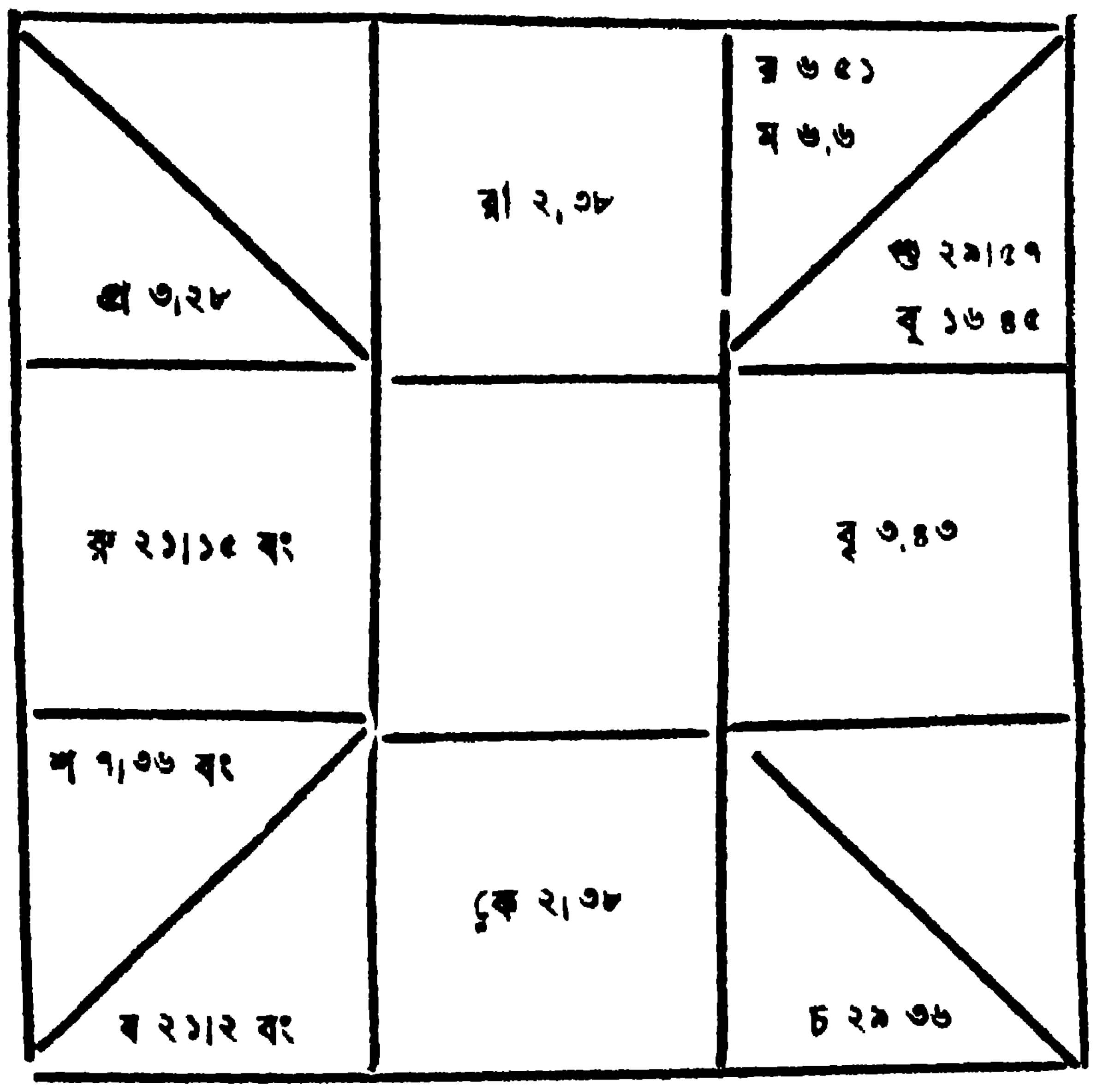

এ থেকে বোঝা যাবে সারা পৃথিবীর উপর গ্রহগুলি কী প্রভাব স্থাপন করবে এবং গোটা পৃথিবীর মানুষগুলি এ থেকে কী ধরণের ফলভোগ করবে।

রাশি চক্রটি লক্ষ্য করলেই নজরে পড়ে যে রবি মীন রাশিতে থেকে মঙ্গলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত এবং তা রাহুদৃষ্ট এবং প্রজাপতি ও রুদ্রের অশুভপ্রেক্ষায় পীড়িত। বৃহস্পতির সামান্য শুভপ্রেক্ষা রবি ও মঙ্গলের উপর আছে বটে কিন্তু বৃহস্পতি নিজে নীচ রাশিতে রাহু ও বুধের অশুভ প্রেক্ষায় পীড়িত। সুতরাং এ বৎসরও মানুষের শান্তি থাকবে না।

মীনরাশি রাশিচক্রের দ্বাদশ রাশি। ঐখানে মঙ্গল থেকে প্রজাপতি ও রুদ্রের দ্বারা পীড়িত হওয়ায় পৃথিবীর সর্বত্র সরকারের বিরুদ্ধে একটা আন্দোলন লক্ষিত হবে। সব দেশের মন্ত্রীসভাকে নানারকম বিরুদ্ধ সমালোচনা, ষড়যন্ত্র এবং বিরুদ্ধ পক্ষের কার্যকারিতার সম্মুখীন হ'তে হবে এবং সব দেশেই বিপ্লবাত্মক মতবাদ বেশ উত্তেজনার সঙ্গে প্রচারিত হবে, যাতে ক'রে শাসক ও শাসিত এবং মনিব ও ভৃত্যের সম্বন্ধ শান্তিপূর্ণ হ'তে পারবে না। অনেক সময় এ নিয়ে উত্তেজনাপূর্ণ দাঙ্গা হাঙ্গামাও হ'তে পারে।

পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের প্রজা সাধারণকে এ বছরও কম-বেশী দুর্দশা ভোগ করতে হবে এবং তাদের দুর্দশা যদিও কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে তাহ'লেও তার প্রতিকার সম্ভব হবে না। এ সম্বন্ধে সব দেশেই নানারকমের পরিকল্পনা হবে বটে, কিন্তু সে পরিকল্পনা কাজে পরিণত করার পক্ষে নানা বাধাবিঘ্ন উপস্থিত হবে। এই সকল কারণে অধিকাংশ দেশেই প্রজা সাধারণের একটা বিপ্লবী মনোভাব প্রকট হ'য়ে উঠবে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তারা গুপ্ত সমিতি সৃষ্টি ক'রে রাষ্ট্রকে বিপর্যস্ত করার চেষ্টাও করতে পারে। অনেক দেশে মন্ত্রীসভার পতন হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেবে। মোট কথা এ বছরও প্রজা-সাধারণ বিশেষ স্বস্তি পাবে না।

ইংলণ্ডের অবস্থা এ বছরও খুব ভাল যাবে না। তার বৈদেশিক নীতি সুপ্রযুক্ত হবে না। রাজনৈতিক বা বাণিজ্যিক যে কোন ব্যাপারেই হোক্ অন্য দেশের সঙ্গে কম-বেশী প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা অন্যরকম ঝঞ্ঝাট উপস্থিত হবে—যাতে ক'রে তার জনপ্রিয়তা হ্রাস হওয়া সম্ভব। এমন কি, কোন মিত্রশক্তির সঙ্গেও তার মন-কষাকষি হ'তে পারে। অনেক ক্ষেত্রে তার বিরুদ্ধে কোন রকম ষড়যন্ত্র হওয়াও অসম্ভব নয়। আর্থিক ব্যাপারেও ইংলণ্ডকে এবছর কম-বেশী বিব্রত হ'তে হবে এবং অর্থ সংগ্রহের জন্য তাকে এমন কোন কর বসাতে হবে অথবা এমন কোন পন্থা অবলম্বন করতে হবে যা মোটেই জনপ্রিয় হবে না। ইংলণ্ডের মন্ত্রীসভাকে এবছর বিশেষ সঙ্কটের সম্মুখীন হ'তে হবে। হয়ত চেষ্টা দ্বারা সে সঙ্কট এড়ান যেতে পারে, কিন্তু একটু অসতর্ক হ'লেই মন্ত্রী-সভার পতনও অসম্ভব নয়। মোটকথা ইংলণ্ডকে এবছর নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হবে এবং নানা অভাবিত দুর্বিপাকে তার সব রকমের ভাল পরিকল্পনা বাধাপ্রাপ্ত হবে।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের এ বৎসর বেশী ব্যস্ত থাকতে হবে তার শ্রম ও শিল্প এবং সামরিক আয়োজনের ব্যাপার নিয়ে। এই সব ব্যাপারে তার কর্মশীলতা প্রকট হবে বটে, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে শ্রমিক বিক্ষোভ, শ্রমিক নেতাদের বিরুদ্ধতা প্রভৃতি কারণে তাকে কম-বেশী বিব্রত হ'তে হবে। যুদ্ধসজ্জা যুদ্ধ উপকরণ নির্মাণ প্রভৃতিতে তার যথেষ্ট ব্যয়-বাহুল্য ঘটবে। এবছর তার বৈদেশিক নীতিতে সহসা এমন কোন পরিস্থিতির উদ্ভব হবে, যার জন্য তাকে বেশ বিব্রত হ'তে হবে। তার উপনিবেশ নিয়ে কোন গোলযোগের সৃষ্টি হ'তে পারে, তার যুদ্ধসজ্জা, বৈদেশিক বাণিজ্য, জলপথ, আকাশপথ প্রভৃতি ব্যাপার নিয়ে এবং দেনা পাওনার ব্যাপার নিয়ে অপর দেশের সঙ্গে মতান্তর বা বিরোধও উপস্থিত হ'তে পারে। তাছাড়া সমুদ্রে বা সমুদ্রকূলে ঝড়ঝঞ্ঝা, বন্যা প্রভৃতি প্রাকৃতিক উৎপাতের আশঙ্কা আছে এবং জাহাজের নাবিক বা কলকারখানায়

শ্রমিক প্রভৃতির জন্য নানারকম ঝঞ্ঝাট উপস্থিত হবে। তাদের দ্বারা বিদ্রোহ ধর্মঘট প্রভৃতিও হ'তে পারে, যা দমন করার জন্য হয়ত শক্তি প্রয়োগ আবশ্যক হ'বে। এবছরও নিজের সার্বভৌম কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার তার চেষ্টার অন্ত থাকবে না, কিন্তু এই অযথা আকাঙ্ক্ষার জন্য তার জনপ্রিয়তা ক্ষুণ্ণ হওয়ার আশঙ্কা আছে। অনেক ক্ষেত্রেই তাকে বিরুদ্ধ সমালোচনার সম্মুখীন হ'তে হবে।

রুশদেশের অবস্থা মোটের উপর অনেকটা ভাল যাবে; যদিও বৈদেশিক ব্যাপারে তার বিরুদ্ধে নানারকম প্রচারকার্য চলবে, তাহ'লেও বিদেশ সম্বন্ধে সে মোটের উপর একটা নিরপেক্ষ মনোভাবই অবলম্বন করবে। রুশের প্রধান চেষ্টা হবে তার আভ্যন্তরীণ ব্যাপারের শ্রীবৃদ্ধি সাধন। অপর রাষ্ট্রের সঙ্গে তার সম্বন্ধ এ বৎসরও বিশেষ প্রীতিজনক হবে না। অধিকাংশ প্রবল রাষ্ট্রের সঙ্গে তার দীর্ঘস্থায়ী মতবিরোধ—অবশ্য প্রকাশ্য বিবাদ সে বর্জন করেই চলবে, কিন্তু নিজের মতবাদে তার যথেষ্ট দৃঢ়তা প্রকাশ পাবে।

এ সব দেশ সম্বন্ধে আরও অনেক কিছু বলা যায়, কিন্তু তা জেনে আমাদের বিশেষ কিছু লাভ নেই। ভারতের অবস্থা গ্রহ নক্ষত্রের মধ্য দিয়ে কী বোঝা যায়, তারই বিচার করা যাক্।

এ বৎসর এই রাশিচক্রে ভারতীয় ইউনিয়নের লগ্ন হ'য়েছে মকর এবং ভাগ্যনিয়ন্তা গ্রহ হয়েছে মঙ্গল। পাকিস্থানেরও লগ্ন মকর, কিন্তু তার ভাগ্যনিয়ন্তা গ্রহ রাহু।

এ বৎসর ভারতীয় ইউনিয়নের রাশিচক্র যে মকর হ'য়েছে তা মোটেই আশাপ্রদ নয়। ভাগ্যনিয়ন্তা গ্রহ মঙ্গল অস্তগত রাহুদৃষ্ট এবং প্রজাপতি ও রুদ্রের অশুভপ্রেক্ষায় পীড়িত। লগ্নে বৃহস্পতি নীচস্থ এবং কেতু ও বুধের অশুভপ্রেক্ষায় পীড়িত। লগ্নপতি শনি অষ্টমে বক্রী এবং তা রাহুদৃষ্ট। এই সবগুলি বিচার করলে বোঝা যায় যে, ভারতীয় ইউনিয়নের আভ্যন্তরীণ অবস্থা এ বৎসর অত্যন্ত শোচনীয় হ'য়ে উঠবে।

ভাগ্যনিয়ন্তা গ্রহ মঙ্গল তৃতীয়ে থাকায় এ বৎসর দেশব্যাপী একটা উত্তেজনা পরিলক্ষিত হবে। কি জন সাধারণের মধ্যে, কি সরকারী মহলে কোথাও শান্ত সুবিবেচনার পরিচয় পাওয়া যাবে না। একদিকে সাধারণের তরফ থেকে খবরের কাগজে, সভা সমিতিতে, শোভাযাত্রায় সরকারের বিরুদ্ধে নানাভাবে বিক্ষোভ অভিব্যক্ত হবে, অপর দিকে সরকার পক্ষও শান্ত মীমাংসার চেষ্টা না ক'রে দমন নীতি অবলম্বন করবেন, যাতে ক'রে সরকারের জনপ্রিয়তা হ্রাস হওয়ার বিশেষ আশঙ্কা আছে। তৃতীয় স্থান সাধারণতঃ যান-বাহন, রেল, মোটর, ডাক, তার, টেলিফোন, রেডিও, খবরের কাগজ, গ্রন্থপ্রকাশ প্রভৃতি নির্দেশ করে। সুতরাং এইসকল ব্যাপারে অশান্তি, উত্তেজনা ও বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হবে। এই সকল ব্যাপারে গভর্ণমেণ্টের কোন হঠকারী নীতি জন-সাধারণের বিরুদ্ধ সমালোচনার বিষয় হবে। তাছাড়া সরকারী ঐ সকল বিভাগে গণ্ডগোল ও বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হওয়ার আশঙ্কাও আছে। ঐ সকল বিভাগের শ্রমিক বা কর্মচারীদের সঙ্গে কর্তৃপক্ষের বিরোধ এবং তার ফলে ধর্মঘট প্রভৃতির জন্য বিশেষ উত্তেজনাপূর্ণ অবস্থার সৃষ্টি হওয়া সম্ভব।

মঙ্গল ভাগ্যনিয়ন্তা হওয়ায় এবং লগ্নপতি শনি অষ্টমস্থ হওয়ায় এ বৎসর সবদিক দিয়েই এমন একটা বিশৃঙ্খল ও উত্তেজনাপূর্ণ অবস্থার উদ্ভব হবে যে সহস্র চেষ্টাতেও শৃঙ্খলা ফিরে আসা সম্ভব হবে না।

দ্বাদশপতি বৃহস্পতি লগ্নে থাকায় এবং লগ্নপতি শনি অষ্টমে থাকায় এ বছর দেশের জনসাধারণ নানাদিক দিয়ে দুর্দশা ভোগ করবে। অভাব অনটন মহামারী প্রভৃতিতে বিস্তর লোকক্ষয় হবে। সরকার পক্ষ থেকে কিছু কিছু প্রতিকারের ব্যবস্থা হ'লেও, কর্মচারীদের উপেক্ষা, অবহেলা অথবা দুর্নীতি পরায়ণতার জন্য সে ব্যবস্থা অনেক ক্ষেত্রে কাজে পরিণত হ'য়ে উঠবে না। মোটকথা এ বছরও ভারতের জন-সাধারণকে দারুণ দুর্দশা ভোগ করতে হবে, আগের বছরের মতই কিম্বা তারও চেয়ে বেশী।

১৩৫৪ সালে যেমন ভারতের লগ্নপতি অষ্টমে ছিল এবং সেজন্য যেমন তাকে বিভক্ত হতে হ'য়েছিল নেতাদের ভ্রান্ত ধারণার জন্য, এবারও তেমনি লগ্নপতি অষ্টমে আছে, যাতে মনে হয় যে, এবারেও নেতারা কাশ্মীরের ব্যাপারে সেই ভ্রান্ত নীতি অবলম্বন করবেন, যাতে ক'রে কাশ্মীরের কিছু অংশ তাঁদের ছেড়ে দিতে হবে।

বৃহস্পতি লগ্নে থাকায় বাইরের দিক দিয়ে, অবশ্য দেশের কিছু উৎপাদন বৃদ্ধি হ'তে পারে এবং ষ্টক, শেয়ার প্রভৃতির দাম বাড়তে পারে, কিন্তু জনসাধারণ তা থেকে কোন সুবিধাই পাবে না।

দ্বিতীয়ে শুক্র আছে বটে এবং তা বৃহস্পতির সামান্য শুভপ্রেক্ষাও পেয়েছে—কিন্তু তা চন্দ্র ও প্রজাপতির দ্বারা বিশেষভাবে পীড়িত হ'য়েছে। এতে বোঝা যায় সরকারের নানাভাবে অর্থক্ষয় হবে। নানারকম পরিকল্পনায় যে রকম অপব্যয় হবে কাজ সে তুলনায় কিছুই হবে না এবং গভর্ণমেণ্টকে ব্যয় সঙ্কুলনের জন্য এমন সকল কর বসাতে হবে যা মোটেই জন-প্রিয় হবে না। সরকারের গৃহীত অর্থ অনেক ক্ষেত্রেই অপব্যয়িত হবে। এবছরও মুদ্রাস্ফীতি যথেষ্ট থাকবে। বৃহস্পতির শুভপ্রেক্ষা থাকায় স্ফীতি প্রতিরোধের জন্য গভর্ণমেণ্ট ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারেন, কিন্তু সে ব্যবস্থা অনেকটা চুরি হ'য়ে যাবার পর বাক্স পেটরায় তালা দেওয়ার ব্যবস্থার মত হবে। অর্থাৎ তা বিশেষ কোন কাজে লাগবে না। সরকারী কার্য পরিচালনায় ব্যয় অতিরিক্ত হবে এবং গভর্ণমেণ্টকে কম-বেশী অর্থাভাব অনুভব করতে হবে। বুধ দ্বিতীয়ে থেকে কেতু ও বৃহস্পতির দ্বারা পীড়িত হওয়ায় ব্যাঙ্কের ব্যাপারে সময় সময় সঙ্কটপূর্ণ অবস্থার উদ্ভব হ'তে পারে।

তৃতীয় রবি মঙ্গল ও রাহুদৃষ্ট এবং প্রজাপতি ও রুদ্রের দ্বারা পীড়িত হওয়ায় দেশের মধ্যে উত্তেজনার প্রাবল্য ঘটবে একথা আগেই বলেছি। দেশের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও দলাদলি প্রকট হ'য়ে উঠবে এবং কাগজে কলমে ও বক্তৃতায় তা প্রকট হবে। প্রদেশে প্রদেশে স্বার্থ নিয়ে সংঘাত উপস্থিত হবে এবং সে ব্যাপারেও যথেষ্ট উত্তেজনা প্রকট হবে। পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রের সঙ্গে সদ্ভাব ক্ষুণ্ণ হওয়ার আশঙ্কা আছে। এই যোগ রাষ্ট্রপ্রধানের

ব্যাপার, রেলওয়ে মোটর এরোপ্লেন প্রভৃতির সংশ্রবে দুর্ঘটনা ও বিভ্রাট সূচনা করে। এই সকল বিভাগে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ শ্রমিক বিক্ষোভ বা ধর্মঘট উপস্থিত হবে এবং তা নিয়ে গভর্ণমেণ্টকে যথেষ্ট বিব্রত হতে হবে।

গণপরিষদে শাসনতন্ত্র প্রচারিত হবে, কিন্তু সে শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে যথেষ্ট আলোচনাও হবে।

চতুর্থে রাহু থাকায় এ বৎসর কৃষি ও শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধির যথেষ্ট চেষ্টা হবে এবং উৎপাদন বৃদ্ধিও হবে কিন্তু তাতে ব্যয় যে পরিমাণে হবে সে অনুপাতে কম হবে না। এ বৎসর খনির কাজ, গৃহভূমি নির্মাণ, পতিত জমির উদ্ধার প্রভৃতিতে কর্মতৎপরতা প্রকট হবে এবং আশ্রয়প্রার্থীদের পুণর্বসতির ব্যবস্থার চেষ্টা হবে। সেক্ষেত্রেও যথেষ্ট অপব্যয়ের আশঙ্কা আছে।

প্রজাপতি ষষ্ঠে থাকায় দেশের সাধারণ স্বাস্থ্য ভাল থাকবে না। ব্যাপকভাবে মহামারীর প্রাদুর্ভাব ঘটতে পারে যাতে সহসা বহু লোকক্ষয় হবে। তাছাড়া দুর্ঘটনা ও দাঙ্গাহাঙ্গামায় লোকক্ষয়ের ভয়ও আছে। এই যোগে শ্রমিক বিক্ষোভ প্রায়ই প্রবল হ'য়ে ওঠে এবং তার জন্য দেশে বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হয়। ডাক, তার, রেল, টেলিফোন প্রভৃতি বিভাগে শ্রমিক বিক্ষোভ বিশেষভাবে প্রকট হবে।

প্রজাপতির সঙ্গে শুক্র চন্দ্র ও রুদ্রের অশুভ প্রেক্ষা থাকায় স্ত্রীলোকের সম্বন্ধে বিবাহ, ডাইভোর্স, ইত্যাদির ব্যাপারে কোন নতুন আইন প্রবর্তিত হবে—যা জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ উত্তেজনার সঞ্চার করবে এবং যা মোটেই জনপ্রিয় হ'তে পারবে না।

প্রজাপতি বুধের সহিত বিনিময় যোগে থাকায় শিক্ষার ব্যাপারে সংস্কারমূলক কোন বিধি প্রবর্তিত হ'তে পারে, কিন্তু বুধ কেতু ও বৃহস্পতির দ্বারা পীড়িত হওয়ায় তা কর্তৃপক্ষের অবহেলায় ও অর্থাভাবে কাজে পরিণত হ'য়ে উঠবে না।

সপ্তমে রুদ্র থাকায় ব্যবসা বাণিজ্যের ব্যাপারে এ বছরও বিশেষ দুর্নীতি প্রকট হবে। চোরা-কারবার গোপনমজুদ প্রভৃতি পুরোদমে চলবে। বৈদেশিক বাণিজ্যের ব্যাপারে কিছু সুবিধা হওয়া সম্ভব কিন্তু ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধি হ'লেও তার লাভের অংশ অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুঁজিপতিদের কুক্ষীগত হবে, দেশের জনসাধারণ তা থেকে কোন সুবিধাই পাবে না। উৎপাদন বৃদ্ধি হলেও উচ্চমহলের ব্যবসায়ীদের ষড়যন্ত্রে মূল্যস্ফীতি হ্রাস হ'তে পারবে না। ব্যাঙ্ক, পৌরপ্রতিষ্ঠান ইত্যাদির সম্বন্ধে এমন কোন আইন হ'তে পারে যার বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা হওয়া সম্ভব। সবদিক দিয়েই দেশে দুর্নীতির প্রসার বাড়বে এবং দেশে অপরাধের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাবে।

অষ্টমে শনি থাকায় সরকারকে অর্থাভাব অনুভব করতে হবে এবং চেষ্টা ক'রেও মুদ্রাস্ফীতি কমান সম্ভব হবে না। অর্থাভাবের জন্য এমন ঋণ গ্রহণ করতে হবে যা দেশের স্বার্থের পক্ষে হানিকর। এই যোগে দেশের নিম্নশ্রেণীর মধ্যে অভাব অনটনের জন্য মৃত্যু-সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে, দুর্ভিক্ষে লোকক্ষয়ের আশঙ্কা আছে। অষ্টমে শনি নিয়ম ও শৃঙ্খলার অভাব নির্দেশ করে। সুতরাং দেশের সর্বত্রই একটা বিশৃঙ্খল ভাব লক্ষিত হবে এবং অনেক ক্ষেত্রে সরকারও জনসাধারণের মধ্যে সহযোগিতা লক্ষিত হওয়া সম্ভব হবে না।

নবমে বরুণ থাকায় বৈদেশিক ব্যাপারে বিচিত্র পরিস্থিতির উদ্ভব হবে। কোন দেশের সঙ্গে অদ্ভুত ধরণের এমন কোন চুক্তি হবে, যা প্রথম দৃষ্টিতে দেশের পক্ষে সুবিধাজনক মনে হ'লেও আসলে হানির সম্ভাবনাই বেশী। বিশেষত বাণিজ্য ব্যাপারে এমন কোন চুক্তি হ'তে পারে যা দেশের দু চারজন কোটিপতির পক্ষে লাভজনক হ'লেও সমস্ত দেশের পক্ষে ক্ষতিকর। এই যোগে জাহাজ নির্মাণ ইত্যাদিতে সরকারের বেশী কার্যকারিতা প্রকাশ পাবে এবং জাহাজ এরোপ্লেন ইত্যাদি নির্মাণের নতুন কারখানাও হওয়া সম্ভব।

দশমে কেতু থাকায় রাষ্ট্র পরিচালনা এ বছর কোনমতেই সুষ্ঠুভাবে হওয়া সম্ভব হবে না। কি সরকারী মহলে, কি বাইরে উপযুক্ত নেতার অভাব সর্বদাই অনুভূত হবে। উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের মধ্যে দুর্নীতি ও অক্ষমতার জন্য সরকারের প্রতিষ্ঠাহানি হ'তে পারে। বর্তমান সরকারের উচ্ছেদের জন্য অনেকস্থলে ষড়যন্ত্র হ'তে পারে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সরকারপক্ষীয় ব্যক্তির দ্বারাই বিশ্বাসঘাতকতা হওয়াও অসম্ভব নয়। নির্বাচনের ব্যাপারে ও আইনসভার সংশ্রবে এমন কোন কেলেঙ্কারী হ'তে পারে যাতে সরকারের মর্যাদাহানির কারণ ঘটবে। নূতন শাসনতন্ত্রের হিসাবে নির্বাচন এ বছরও বাধাপ্রাপ্ত হবে। আগামী বর্ষের পূর্বে তা কোনমতেই ঘটে উঠবে না।

একাদশে চন্দ্র কুপ্রেক্ষিত হ'য়ে থাকায় মন্ত্রীসভাগুলি কোনমতেই জনপ্রিয় হ'তে পারবে না। অনেক ক্ষেত্রে তাদের কার্যকলাপ জনসাধারণের বিরুদ্ধ সমালোচনার বিষয় হবে।

মোটকথা এ বছরও ভারতের জন-সাধারণের দুর্ভোগের অন্ত থাকবে না এবং দেশের কোন রকম অগ্রগতির কিছুমাত্র সম্ভাবনা নেই। দেশে সর্বত্র দলাদলি ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা লক্ষিত হবে এবং একত্ববোধ পদে পদে ব্যাহত হবে। দেশের হিতের চেয়ে ব্যক্তিগত বা দলগত স্বার্থসাধনই লক্ষিত হবে বেশী। এ বছরটি ভারতীয় ইউনিয়নের পক্ষে একটি সঙ্কটপূর্ণ বৎসর।

পশ্চিম বাংলার বাজেট

অধ্যাপক শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়

গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার পশ্চিমবঙ্গের অর্থসচিব শ্রীনলিনীরঞ্জন সরকার পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদে ১৯৪৯-৫০ খ্রীষ্টাব্দের বাজেট পেশ করিয়াছেন। এই বাজেট পেশ প্রসঙ্গে তিনি যে সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহাতে ভারতের আর্থিক অবস্থা সমগ্রভাবে বিশ্লেষিত হইয়াছে। মুদ্রাস্ফীতি, পণ্যমূল্যবৃদ্ধি, চোরা কারবার, শ্রমিক বিক্ষোভ, শিল্পবিশৃঙ্খলা প্রভৃতি নানা সমস্যার চাপে যুদ্ধোত্তর ভারতবর্ষ নিষ্পেষিত হইয়া যাইতেছে। এই অর্থনৈতিক বিপর্যায়ের বলি হইতেছে দেশের দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত জনসাধারণ। অর্থসচিব যদিও আশাবাদীর দৃষ্টিতে ভারতের অর্থনৈতিক পটভূমিকা বিশ্লেষণের চেষ্টা করিয়াছেন, তবু তাঁহার বক্তৃতা পাঠ করিয়া সকলেই এদেশের শোচনীয় আর্থিক অবস্থা সুস্পষ্টরূপে উপলব্ধি করিবার সুযোগ পাইবেন। সারা ভারতে বহুবিধ সমস্যা লইয়া এরূপ সুদীর্ঘ আলোচনা সাধারণতঃ প্রাদেশিক বাজেট বক্তৃতায় দেখা যায় না, তবে বর্তমান সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে এ সম্পর্কে শ্রীযুক্ত সরকারের ন্যায় একজন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদের আলোচনার নিজস্ব মূল্যটুকুও কেহই অস্বীকার করিবেন না। ১৯৪৯-৫০ খ্রীষ্টাব্দের বাজেটের সহিত অর্থসচিব পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ১৯৪৮-৪৯ খ্রীষ্টাব্দের আয় ব্যয়ের সংশোধিত হিসাবও পেশ করিয়াছেন। ১৯৪৮-৪৯ খ্রীষ্টাব্দ প্রকৃতপক্ষে দেশের স্বাধীনতালাভের পর প্রথম পূর্ণ বৎসর। এই প্রথম বৎসরটিতে জাতীয় অর্থনীতি বা অর্থব্যবস্থা কোনদিকে চলিয়াছে সরকার মহাশয় তাঁহার সুদীর্ঘ বাজেট বক্তৃতার অবতরণিকায় তাহার বর্ণনা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বর্তমান অবস্থায় বহু সমস্যাপীড়িত অসংখ্য দেশবাসীর কাছে এই বর্ণনার প্রয়োজন আছে।

১৯৪৮-৪৯ খ্রীষ্টাব্দের সংশোধিত হিসাব

গত বৎসর ফেব্রুয়ারী মাসে যখন পশ্চিমবঙ্গ পরিষদে ১৯৪৮-৪৯ খ্রীষ্টাব্দের বাজেট উপস্থাপিত হয়, তখন রাজস্বখাতে এই বৎসরের আয় ধরা হইয়াছিল ৩১ কোটি ৫৮ লক্ষ ৫২ হাজার টাকা এবং ব্যয় ধরা হইয়াছিল ৩১ কোটি ৯৬ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা, অর্থাৎ ৭৭ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা ঘাটতি অনুমিত হইয়াছিল। নানা কারণে বিভিন্ন খাতের হিসাবে অবশ্য এই অনুমান সঠিক হয় নাই, তবে অর্থসচিব পরিষদে যে সংশোধিত হিসাব পেশ করিয়াছেন, তাহার সহিত সমগ্রভাবে এই প্রাথমিক হিসাবের খুব বেশী তফাৎ নাই। সংশোধিত হিসাবে দেখা যায় ১৯৪৮-৪৯ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিমবাংলার রাজস্বখাতে আয় হইতেছে ৩০ কোটি ৫৮ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা এবং ব্যয় হইতেছে ৩০ কোটি ৮২ লক্ষ ২ হাজার টাকা অর্থাৎ গত বৎসরের প্রাথমিক হিসাব অপেক্ষা ঘাটতির পরিমাণ ৫৪ লক্ষ ৬৭ হাজার টাকা কমিয়া ২৩ লক্ষ ২৬ হাজার টাকায় নামিয়া আসিতেছে। যুদ্ধোত্তর কালে আয়ব্যয়ের হিসাবে ঘাটতি হওয়াই দুঃখের বিষয়, তবু প্রাথমিক হিসাব অপেক্ষা সংশোধিত হিসাবে ঘাটতির পরিমাণ কম হওয়ায় সকলেই কিছুটা খুসী হইবেন।

বিভিন্ন খাতের হিসাব পৃথক করিয়া ধরিলে অবশ্য বুঝিতে কষ্ট হয় না যে, পশ্চিম বাঙ্গলা সরকারকে গত ১০ মাস অনেক অসুবিধার ভিতর দিয়া প্রাথমিক বাজেটের ধারা রক্ষা করিতে হইয়াছে। আয়ের দিক হইতে তাঁহাদের হিসাব বিশেষভাবে আঘাত পায় কেন্দ্রীয় সরকারের উন্নয়নখাতে সাহায্যদানে কার্পণ্যপ্রকাশে। গত বৎসরের বাজেটে বিভিন্ন উন্নয়নখাতে কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে ৬ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন বলিয়া জানান হইয়াছিল। এই টাকা আয়ের দিকে ধরিয়াই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ১৯৪৮-৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ব্যয়বরাদ্দ করা হয়। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই কেন্দ্রীয় সরকার হঠাৎ মুদ্রাস্ফীতিরোধের অন্যতম উপায় হিসাবে বিভিন্ন প্রদেশের যুদ্ধোত্তর উন্নয়ন পরিকল্পনাখাতে অর্থসাহায্যের পরিমাণ কমাইবার সিদ্ধান্ত করেন এবং তদনুসারে তাঁহারা শেষ পর্য্যন্ত পশ্চিমবঙ্গকে ১৯৪৮-৪৯ খ্রীষ্টাব্দে এই খাতে মাত্র ১ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেন। এইভাবে রাজস্বখাতে একমাত্র উন্নয়ন পরিকল্পনার

হিসাবেই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আয় কমে ৪ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা। এছাড়াও পূর্ব্ববর্ত্তী হিসাবের তুলনায় এবৎসর পশ্চিমবঙ্গের ষ্টাম্প হইতে প্রাপ্য রাজস্বের খাতে ২০ লক্ষ টাকা ও রেজিষ্ট্রেশন হইতে প্রাপ্য রাজস্বের খাতে ২ লক্ষ টাকা একুনে ২২ লক্ষ টাকা রাজস্বহানি অনুমিত হয়েছে। এই দুই-খাতে আয় কমিবার প্রধান কারণ—কেন্দ্রীয় সরকার আয়-করের ফাঁকি ধরিতে ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে সম্পত্তি হস্তান্তর সম্পর্কে অডিন্যান্স জারী করিয়া যে বিধিনিষেধ আরোপ করিয়াছেন তজ্জন্য চলতি বৎসরে পশ্চিমবঙ্গে আশানুরূপ জমি কেনাবেচা হইতে পারে নাই।

এইভাবে উন্নয়নখাতে ও অন্য হিসাবে প্রচুর আয় কমিলেও সৌভাগ্যক্রমে পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনেকগুলি খাতে আয় বাড়াইয়া সম্ভাব্য ঘাটতির বহুলাংশই পূরণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এইসব আয় না বাড়িলে সরকারী অর্থব্যবস্থা যে শোচনীয় স্তরে পৌছিত, তাহা বলাই বাহুল্য। যে সকল খাতে আয় বাড়িয়াছে তন্মধ্যে বিক্রয় কর এবং কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে আয়করের হিসাবে প্রাপ্য অংশই প্রধান। এই দুইখাতে বাজেট অপেক্ষা ১৯৪৮-৪৯ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যথাক্রমে ১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা ও ১ কোটি ৪১ লক্ষ টাকা বাড়তি আয় হইবে বলিয়া অর্থসচিব আশা করিয়াছেন। এ ছাড়া অর্থসচিব অনুমান করিয়াছেন যে, গত বৎসরের অনুমান অপেক্ষা চলতি বৎসরে পশ্চিমবঙ্গের কাঁচা পাটের উপর ধার্য্য কর হইতে ২৮ লক্ষ টাকা, বিজলী শুল্ক হইতে ২২ লক্ষ টাকা, মোটরস্পিরিট বিক্রয়-কর হইতে ১৫ লক্ষ টাকা, বন বিভাগ হইতে ১৭ লক্ষ টাকা, পাট রপ্তানী শুল্কের দরুণ কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট প্রাপ্য অংশ হইতে ২৮ লক্ষ টাকা এবং প্রমোদকর হইতে ১৫ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত আয় হইবে। অর্থসচিব আরও জানাইয়াছেন যে বঙ্গবিভাগের অব্যবহিত পূর্ব্বে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল হইতে ১৪ই আগষ্ট পর্য্যন্ত অবিভক্ত বাঙ্গলার আয়করের প্রাপ্য অংশ হিসাবে কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে ৪২ লক্ষ টাকা প্রদান করিয়াছেন। মোটের উপর সব জড়াইয়া বাজেটের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের ১৯৪৮-৪৯ খ্রীষ্টাব্দের সংশোধিত হিসাবে রাজস্বখাতে আয় কমিয়াছে ৭০ লক্ষ টাকার মত।

আয়ের ন্যায় গত বৎসরের অনুমিত ১৯৪৮-৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ব্যয়ের পরিমাণও শেষ পর্য্যন্ত কম হইবে বলিয়া অর্থসচিব আশা করিয়াছেন। প্রথমতঃ কেন্দ্রীয় সরকার সাহায্যদানে পিছাইয়া যাওয়ায় উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সংকল্প অনুযায়ী হাত দিতে পারেন নাই। এই খাতে ৩ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা কম খরচ হইবে। অবশ্য বাজেট হইতে এতটাকা বাঁচিয়া গেলেও কতকগুলি খাতে পূর্ব্ববর্ত্তী হিসাব অপেক্ষা ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় সংশোধিত হিসাবে উদ্বৃত্তের পরিবর্ত্তে শেষ অবধি ঘাটতিই রক্ষিত হইয়াছে। ভারতে অস্বাভাবিক অবস্থাসম্পর্কিত ব্যয়বরাদ্দের হিসাবেই চলতি বৎসরে বেশী বাড়তি ব্যয় হইতেছে। এই অতিরিক্ত ব্যয়ের পরিমাণ ১ কোটি ১০ লক্ষ টাকা। সরকারী অপদার্থতার নিদর্শন অসামরিক সরবরাহ বিভাগের গম ও গমজাত দ্রব্য কেনাবেচায় ক্ষতি স্বীকারের জন্যই বলিতে গেলে এই অপব্যয় হইতেছে। কুখ্যাত পুলিস-খাতেও ১৯৪৮-৪৯ খ্রীষ্টাব্দে বাজেট অপেক্ষা বাড়তি ব্যয় হইতেছে ৩৪ লক্ষ টাকা।

যাহা হউক, উন্নয়ন পরিকল্পনার দিকটি বাদ দিলে সমগ্রভাবে গত বৎসরে উপস্থাপিত বাজেট অপেক্ষা এ বৎসর উপস্থাপিত অর্থ-সচিবের ১৯৪৮-৪৯ খ্রীষ্টাব্দের সংশোধিত হিসাব কিছুটা আশাপ্রদ। বঙ্গ-বিভাগের পূর্ব্ববর্ত্তীকালীন দায় মিটাইবার জন্য পশ্চিমবঙ্গসরকারকে এ বৎসর পূর্ব্ববঙ্গ সরকারকে ১ কোটি টাকা দিতে হইতেছে, ইহা দিতে না হইলে পশ্চিমবঙ্গে সংশোধিত হিসাবে ২৩ লক্ষ টাকা ঘাটতির পরিবর্ত্তে ৭৭ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত দেখা যাইত। পূর্ব্ববঙ্গের আশ্রয়প্রার্থীদের সমস্যাও পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে যথেষ্ট বিব্রত করিয়াছে। সংশোধিত হিসাবে দেখা যায়, ১৯৪৮-৪৯ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এইখাতে মোট সাড়ে তিন কোটি টাকার মত খরচ করিতেছেন (সাহায্য হিসাবে ২ কোটি ২১ লক্ষ টাকা, গৃহনির্ম্মাণ বাবদ ১১ লক্ষ টাকা এবং ঋণ হিসাবে ১ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা)। ১৯৪৯-৫০ খ্রীষ্টাব্দের বাজেটে এই আশ্রয়প্রার্থীদের পুনর্বসতির জটিলতর সমস্যার কথা বিবেচনা করিয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই খাতে দশ কোটি টাকার বেশী বরাদ্দ করিয়াছেন।

১৯৪৯-৫০ খ্রীষ্টাব্দের বাজেট

১৯৪৯-৫০ খ্রীষ্টাব্দের বাজেটে পশ্চিমবঙ্গের রাজস্ব খাতে

আয় ধরা হইয়াছে ৩১ কোটি ৮৩ লক্ষ ৪ হাজার টাকা এবং ব্যয় ধরা হইয়াছে ৩২ কোটি ৯৩ লক্ষ ৯৫ হাজার টাকা, অর্থাৎ ১ কোটি ১১ লক্ষ টাকার মত ঘাটতি হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। ১৯৪৮-৪৯ খ্রীষ্টাব্দের সংশোধিত হিসাব অপেক্ষাও ১৯৪৯-৫০ খ্রীষ্টাব্দে আয় ধরা হইয়াছে ১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা বেশী, কিন্তু নানা খাতে ব্যয়ের পরিমাণও বেশী ধরায় ঘাটতির পরিমাণ কোটির অঙ্কে পৌছাইয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৪৯-৫০ খ্রীষ্টাব্দে উন্নয়ন পরিকল্পনা খাতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে ২ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা দিবেন বলিয়া ধরা হইয়াছে, ইহা ১৯৪৮-৪৯ খ্রীষ্টাব্দে কেন্দ্রীয় সরকার কর্ত্তৃক দেয় অর্থ অপেক্ষা ৭০ লক্ষ টাকা বেশী। চলতি বৎসর অপেক্ষা আগামী বৎসর এই প্রদেশের আবগারী ও উৎপাদন শুল্ক হইতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ১৬ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত আয় হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে। অন্যান্য কর খাতেও সরকারের বাড়তি আয় ধরা হইয়াছে ৮ লক্ষ টাকা। কলিকাতায় যে সরকারী বাসগুলি চলিতেছে তাহাদের আয় ব্যয় ধরিয়া আগামী বৎসরের শেষে ৬ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইবে বলিয়া বাজেটে অনুমান করা হইয়াছে। তবে এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, এই ৬ লক্ষ টাকা হইতে বাসগুলির মূল্যাপকর্ষ ও বীমা বাবদ কিছু বাদ দেওয়া হয় নাই। অসামরিক সরবরাহ বিভাগ গ্রামাঞ্চলের রাস্তাঘাটের উন্নতিকল্পে অর্থ সংগ্রহের জন্য বিক্রীত প্রতি মণ চাউলের উপর দেড় আনা করিয়া আদায় করিয়া থাকেন। এইভাবে সংগৃহীত অর্থ মূলধন খাতে চলিয়া যায়। এবারের বাজেটে এই মূলধন হইতে ১৫ লক্ষ টাকা রাজস্বখাতে সরাইয়া আনা হইয়াছে। তাছাড়া এবার কেন্দ্রীয় রাস্তা তহবিল (সেণ্ট্রাল রোড ফাণ্ড) হইতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হাতে কিছু টাকা দেওয়া হইতেছে। এইভাবে পূর্ত্ত বাবদ এ বৎসর গত বৎসরের তুলনায় সরকারের মোট ৩২ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত আয় হইতেছে। ইহার পর সুদ, পুলিস প্রভৃতি বাবদ চলতি বৎসরের তুলনায় আগামী বৎসর সরকারের কয়েক লক্ষ টাকা বাঁচিবে বলিয়া ধরা হইয়াছে। যুদ্ধের পরে সাধারণ দেশবাসীর আয়ের অঙ্ক ক্রমেই হ্রাস পাইতেছে। পাটের জন্য ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র মুখ্যতঃ পাকিস্তানের উপর নির্ভরশীল বলিয়া পাট রপ্তানীখাতে আয়ের অঙ্ক কিছুটা অনিশ্চিত। এই সব বিবেচনা করিয়া অর্থসচিব অনুমান করিয়াছেন যে, ১৯৪৮-৪৯ খ্রীষ্টাব্দের তুলনায় ১৯৪৯-৫০ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গের কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে আয়কর ও পাটশুল্ক বাবদ প্রাপ্য অংশে ২২ লক্ষ টাকা কম হইবে।

সাধারণ ব্যয় ছাড়া পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে ১৯৪৯-৫০ খ্রীষ্টাব্দে বিশেষ দুইটি খাতে মোটা টাকা ব্যয় করিতে হইতেছে। এই খাত দুইটি হইল উন্নয়ন পরিকল্পনা ও আশ্রয়প্রার্থী সমস্যা। উন্নয়ন পরিকল্পনা খাতে ১৯৪৮-৪৯ খ্রীষ্টাব্দে সংশোধিত হিসাবে মোট ৩ কোটি ৩২ লক্ষ টাকা খরচ হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে, ১৯৪৯-৫০ খ্রীষ্টাব্দে এই খাতে মোট খরচ ধরা হইয়াছে ৪ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা। আশ্রয়প্রার্থী খাতে সাহায্য, ঋণ ও গৃহনির্ম্মাণ বাবদ ১৯৪৮-৪৯ খ্রীষ্টাব্দের সংশোধিত হিসাবে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সাড়ে তিন কোটি টাকা ব্যয় ধরিয়াছেন, ১৯৪৯-৫০ খ্রীষ্টাব্দে পুনর্বসতি প্রশ্ন অনেক বড় হইয়া দেখা দেওয়ায় এই খাতে বরাদ্দের পরিমাণও প্রায় তিনগুণ হইয়াছে। এবারের বাজেটে অর্থসচিব পূর্ব্ববঙ্গের আশ্রয়প্রার্থীদের সাহায্যদান খাতে ৪ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা, গৃহ-নির্ম্মাণ খাতে ১ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা এবং ঋণদান খাতে ৪ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করিয়াছেন। অবশ্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার উপস্থিত খরচের দায়িত্ব লইলেও অর্থসচিব আশা করিয়াছেন যে, আশ্রয়প্রার্থীদের জন্য বরাদ্দকৃত এই সওয়া দশ কোটি টাকার কিছুটা সরাসরি সাহায্য এবং কিছুটা ঋণ হিসাবে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে ফিরিয়া পাইবেন।

বাজেটে ১ কোটি ১১ লক্ষ টাকা ঘাটতি ধরা হইলেও অর্থ সচিব আশা করিয়াছেন যে, শেষ পর্য্যন্ত হয়তো আগামী বৎসর ঘাটতির পরিমাণ সত্যই উল্লেখযোগ্য হইবে না। এইরূপ আশাবাদী হইবার কারণ, তিনি ১৯৪৯-৫০ খ্রীষ্টাব্দে বাজেটের মধ্যে সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদে গৃহীত বিক্রয়কর (সংশোধন) বিল ও কৃষি আয়কর (সংশোধন) বিল বাবদ সম্ভাব্য বাড়তি আয় ধরেন নাই। এই দুই খাতে আগামী বৎসর ৮০ লক্ষ টাকার মত অতিরিক্ত আয় হইতে পারে। এ ছাড়া অর্থসচিব বাজেট বক্তৃতার মধ্যে বলিয়াছেন যে, তিনি আমোদকর বৃদ্ধি, ঘোড়দৌড় ইত্যাদি

জুয়াখেলা সম্পর্কে ট্যাক্স ও বিদ্যুৎ করের হার ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে মার্চ্চের পরও স্থায়ীভাবে উচ্চহারে বহাল রাখিবার উদ্দেশ্যে ব্যবস্থাপরিষদে দুটি বিল উত্থাপনের নোটিশ দিয়াছেন। নূতন বিল দুইটি গৃহীত হইলে এই সব খাতে যে ২০ লক্ষ টাকা আয় বাড়িবার সম্ভাবনা রহিয়াছে তাহাও বাজেটে ধরা হয় নাই।

উপসংহার

আগেই বলা হইয়াছে অর্থসচিব কিছুটা আশাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া এবার বাজেট উপস্থাপিত করিয়াছেন। যুদ্ধ শেষ হইয়াছে অনেক দিন, কিন্তু দেশে এখনও যুদ্ধকালীন অর্থনৈতিক অবস্থার লক্ষণীয় পরিবর্ত্তন হয় নাই বলিয়া সরকারী অর্থব্যবস্থা এখনও শোচনীয় হইয়া রহিয়াছে। অর্থসচিব অনুমান করিয়াছেন ১৯৪৮-৪৯ এবং ১৯৪৯-৫০— এই দুই বৎসরও পশ্চিম বঙ্গের বাজেটে ঘাটতি হইবে। তবে অবস্থা যে এখন কিছুটা ভালোর দিকে যাইতেছে তাহাও তাঁহার বক্তৃতা হইতে উপলব্ধি করা যায়। বঙ্গভঙ্গের দায় মিটাইতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৪৮-৪৯ খ্রীষ্টাব্দে পূর্ববঙ্গ সরকারকে ১ কোটি টাকা দিতেছেন, এই বাড়তি টাকা দিতে না হইলে পশ্চিমবঙ্গের এই বৎসর ২৩ লক্ষ টাকা ঘাটতির কোনই সম্ভাবনা থাকিত না। ১৯৪৯-৫০ খ্রীষ্টাব্দে বাজেটে ১ কোটি ১০ লক্ষ টাকা ঘাটতির সম্ভাবনা দেখান হইয়াছে, তবে ইতিমধ্যে গৃহীত বিক্রয়-কর (সংশোধন) ও কৃষি-আয়কর (সংশোধন) বিল এবং প্রস্তাবিত প্রমোদ কর বৃদ্ধি, বিদ্যুৎকর প্রভৃতি বিল গুলির খাতে যে আয় বাজেটে ধরা হয় নাই, তাহা সংগৃহীত হইলে হয়তো ঘাটতিই হইবে না। আয়ব্যয়ে এই সমতার কথা বাদ দিলেও এবারের বাজেটে নানা জনকল্যাণমূলক খাতে কিছু কিছু খরচ বাড়াইবার চেষ্টা হইয়াছে। দেশের বিপুল প্রয়োজনের হিসাবে অকিঞ্চিৎকর হইলেও এই ভাবে জনকল্যাণ খাতে বাড়তি ব্যয়বরাদ্দ সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্ত্তনের পরিচায়ক। উন্নয়ন পরিকল্পনা খাতে চলতি বৎসরে ৩ কোটি ৩২ লক্ষ টাকা এবং আগামী বৎসরে ৪ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা বরাদ্দের কথা আগেই বলা হইয়াছে। ১৯৪৮-৪৯ খ্রীষ্টাব্দের অধিক খাদ্য ফলাও পরিকল্পনায় (সেচ, কৃষি ও মৎস্য বিভাগে) ১ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকার স্থলে ১৯৪৯-৫০ খ্রীষ্টাব্দে ২ কোটি ৩ লক্ষ টাকা ধরা হইয়াছে। ১৯৪৮-৪৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের মাহিনা বৃদ্ধির জন্য ৩২½ লক্ষ টাকা, বুনিয়াদি শিক্ষা প্রবর্ত্তনের জন্য ২ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা এবং পল্লী ডিস্‌পেন্সারীর সংখ্যা বৃদ্ধি ও জনসাধারণের স্বাস্থ্য ইউনিট স্থাপনের জন্য ৩০ লক্ষ টাকা খরচ হইতেছে, ১৯৪৯-৫০ খ্রীষ্টাব্দে এই তিনটি কল্যাণকর খাতে বরাদ্দ করা হইয়াছে যথাক্রমে ৪০ লক্ষ, ১১½ লক্ষ ও ৮০ লক্ষ টাকা। বাস্তুহারাদের সমস্যা যেমন তীব্র, তেমনি করুণ। লক্ষ লক্ষ নিরুপায় হতভাগ্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উপর একান্ত নির্ভর করিয়া এই প্রদেশে শরণার্থী হইয়া আসিয়াছে। ইহাদের রক্ষা করিবার নৈতিক দায়িত্ব যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার নানা অসুবিধা সত্ত্বেও ক্রমশঃ অধিকতর লক্ষণীয়ভাবে স্বীকার করিয়া লইতেছেন এবং চলতি বৎসরের ৩ কোটি ৪৮ লক্ষ টাকার স্থলে আগামী বৎসর ইহাদিগের সাহায্য, গৃহনির্ম্মাণ ও ঋণ খাতে ১০ কোটি ২৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করিয়াছেন, ইহাতেও সকলেই আনন্দিত হইবে। কলিকাতার উপর চাপ কমাইবার জন্য কাঁচড়া পাড়া অঞ্চল উন্নয়ন পরিকল্পনা পশ্চিমবঙ্গ সরকার গ্রহণ করিয়াছেন; এই খাতে চলতি বৎসরের ১ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকার স্থলে আগামী বৎসর যে ২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ধরা হইয়াছে, পরিকল্পনা অনুযায়ী ভাল ভাবে কাজ হইলে ইহাতেও অনেক সুফল আশা করা যায়। বস্তিবাসীরা দরিদ্র ও অসহায়, ইহাদের গৃহচ্যুত করার প্রশ্ন সহর এলাকার উন্নতির প্রশ্নের সহিত বিজড়িত। আগামী বৎসর বাজেটে বস্তিবাসীদের পুনর্বসতি খাতে ১ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা ধরা হইয়াছে।*

লীগ আমলের অবিভক্ত বাঙ্গলার বাজেটের সহিত বিচার করিলে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার কর্ত্তৃক

---

* অবশ্য পশ্চিমবাংলার বাজেটে উন্নয়ন খাতে ব্যয়বরাদ্দ শুধুমাত্র কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্ত্তন সূচিত করিতেছে বলিয়া কিছুটা প্রশংসনীয়। এই চেষ্টা ১৯৪৮-৪৯ খ্রীষ্টাব্দের বাজেটেই দেখা গিয়াছে। বলিতে গেলে ১৯৪৯-৫০ খ্রীষ্টাব্দের বাজেটে ইহা আশানুরূপ প্রসারিত হয় নাই। এহিসাবে পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় যুক্তপ্রদেশ অনেক ভাগ্যবান। যুক্তপ্রদেশের ১৯৪৯-৫০ খ্রীষ্টাব্দের বাজেটের ৫৫ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকা ব্যয়বরাদ্দের মধ্যে ২৯ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকা বা শতকরা ৪৪ ভাগ উন্নয়ন খাতে ধরা হইয়াছে।

উপস্থাপিত ১৯৪৯-৫০ খ্রীষ্টাব্দের বাজেটে গুরুত্বপূর্ণ খাত-সমূহে ব্যয়বরাদ্দগুলি সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। অবশ্য এই সব জরুরী খাতে বরাদ্দের পরিমাণ আরও বাড়ান দরকার। ১৯৪৬-৪৭ খ্রীষ্টাব্দের বাজেট অবিভক্ত বাঙ্গলার শেষ পূর্ণ বৎসরের বাজেট। এই বৎসর মোট ব্যয় বরাদ্দের শতকরা ৬·২ ভাগ কৃষি খাতে, ৯ ভাগ শিক্ষা খাতে, ৩·৪ ভাগ রাস্তা ঘাট নির্ম্মাণ খাতে ও ৮ ভাগ চিকিৎসা খাতে ধরা হয়; পশ্চিম বাংলার ১৯৪৯-৫০ খ্রীষ্টাব্দের বাজেটে এই প্রয়োজনীয় চারটি খাতে যথাক্রমে মোট বরাদ্দের শতকরা ৮·৬ ভাগ, ১০·৮ ভাগ, ৬৪ ভাগ ও ১১·৪ ভাগ ধরা হইয়াছে।

শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতির হিসাবে পশ্চিমবঙ্গ অত্যন্ত পশ্চাৎপদ। এই সব দিক হইতে প্রদেশটিকে সমুন্নত করিতে হইলে বলিষ্ঠ পরিকল্পনা চাই এবং সেজন্য চাই পশ্চিম-বঙ্গ সরকারের আর্থিক স্বাচ্ছল্য। এই স্বাচ্ছল্য বর্ত্তমানে নাই, ভবিষ্যতে সৃষ্টি করিতে হইলে আয় বাড়াইতে এবং অপ্রয়োজনীয় খাতে ব্যয় কমাইতে হইবে। ব্যয় কমাইবার প্রশ্নে সবচেয়ে আগে মনে হয় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শাসন বিভাগের অবাঞ্ছিত ব্যয়বাহুল্যের কথা। অনেকেরই ধারণা সরকার একরূপ অপ্রয়োজনেই অনেক মোটা মাহিনার কর্ম্মচারী পুষিতেছেন, ইহাদের অনেককে ছাড়িয়া দিলেও সরকারের কাজ চলিতে পারে। পদস্থ সরকারী কর্ম্মচারীদের বেতনের হার যে এই দরিদ্র দেশের আর্থিক অবস্থার সহিত সুসমঞ্জস নয়, এরূপ অভিযোগও অনেকে করিয়া থাকেন। জনকল্যাণ খাতে খরচ বাড়াইবার সংকল্প লইলে সরকারকে এই সব বাড়তি ব্যয় সঙ্কোচের দিকে মনোযোগ দিতেই হইবে। পুলিস বিভাগের খরচ কমান বিশেষ দরকার। অবিভক্ত বাংলায় ১৯৪৪-৪৫ খ্রীষ্টাব্দে পুলিস বিভাগের জন্য ৪ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা ধরা হয়। এই ব্যয়বাহুল্যের প্রতিবাদে তখনই সারাদেশ মুখর হইয়া উঠিয়াছিল। এখন স্বাধীনতা পাইবার পর অখণ্ড বাংলার ১/৩ অংশ পশ্চিম বাংলায় পুলিস খাতে ব্যয় বেশী হইলে সকলেরই দুঃখিত হইবার কারণ আছে। কিন্তু ১৯৪৯-৫০ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিম বাংলার বাজেটে পুলিস বিভাগের ব্যয়বরাদ্দ হইয়াছে ৪ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা। জনকল্যাণমূলক পকিল্পনাগুলি যখন অর্থাভাবে স্থগিত, অচল, বাতিল হইতেছে, তখন পুলিস খাতে এই অপব্যয় কি করিয়া দেশবাসী সমর্থন করিবে? এ ছাড়া অসামরিক সরবরাহ বিভাগ প্রভৃতির হিসাবে সরকারী কোষাগার হইতে যে পর্ব্বতপ্রমাণ টাকা বাহির হইয়া যাইতেছে, তাহা সত্যই ন্যায্যভাবে ব্যয়িত হইতেছে কিনা সে বিষয়ে কঠোর দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। ১৯৪৮-৪৯ খ্রীষ্টাব্দে গম ও গমজাত দ্রব্য কেনা বেচায় অসামরিক সরবরাহ বিভাগ যে বিরাট লোকসান খাইয়াছেন, তৎসম্পর্কেও ব্যাপক অনুসন্ধান হওয়া আবশ্যক।

এই সব উন্নয়ন ব্যবস্থা ছাড়া সাধারণ অর্থনৈতিক ভারসাম্যের জন্যও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ব্যয় অপেক্ষা আয় বেশী হওয়া অর্থাৎ বাজেটে উদ্বৃত্ত হওয়া দরকার। জনসাধারণের নিকট ঋণ না থাকিলেও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে চলতি বৎসরের শেষে ৮ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা ঋণ দাঁড়াইবে। দামোদর পরিকল্পনা, আশ্রয়প্রার্থীদের ঋণ দান, সরকারী বাস বাড়ান ইত্যাদির জন্য আগামী বৎসরে এই ঋণের পরিমাণ বাড়িয়া ২৪ কোটি ৮৩ লক্ষ টাকা দাঁড়াইবে বলিয়া অর্থসচিব অনুমান করিয়াছেন। বলা নিষ্প্রয়োজন, এই ঋণ শোধ করিতে হইবে এবং তজ্জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বর্ত্তমান অর্থ ব্যবস্থার সংশোধন আবশ্যক। পশ্চিম বাংলার অধিবাসী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নানা করভারে এখন অত্যন্ত বিপন্ন। আর কর বাড়াইয়া আয় বাড়াইবার চেষ্টা হইলে সরকার নিঃসন্দেহে জনপ্রিয়তা হারাইবেন। বরং এবার বিক্রয়কর সংশোধন করিয়া সরিষার তৈল, দিয়াশালাই, জ্বালানীকাঠ, সংবাদপত্র, কুইনাইন প্রভৃতি যে ১৬টি নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্যের উপর কর ধার্য্য করা হইয়াছে এরূপ অন্যায় কর স্থাপন অবিলম্বে বন্ধ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গের আর্থিক অবস্থার উন্নতিসাধনে খরচ কমাইবার দিকেই সরকারকে অধিক নজর দিতে হইবে।

পশ্চিমবঙ্গ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সীমান্তবর্ত্তী প্রদেশ, এই প্রদেশ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের বিশেষ দায়িত্ব থাকা উচিত। ব্রিটিশ আমলে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ বা আসামের পার্ব্বত্য অঞ্চল ভারতসরকারের নিকট হইতে প্রচুর আর্থিক সাহায্য পাইত, পশ্চিমবাঙ্গলায় সর্ব্বপ্রকার শৃঙ্খলা বজায় রাখিবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের অনুরূপ কিছুটা সাহায্য করা দরকার। দুঃখের কথা, বিষয়টি

গুরুতর হইলেও পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার এখনও উপযুক্ত দৃষ্টি দিতেছেন না। পূর্ব্ববঙ্গের আশ্রয়প্রার্থীর সমস্যা সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় সরকার প্রথম হইতে আগ্রহ দেখাইলে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উপর এতটা চাপ পড়িত না এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আর্থিক দুরবস্থার দরুণ আংশিক ব্যর্থতার ফলে আশ্রয়প্রার্থীদেরও এখনকার তুলনায় অনেক কম বিপন্ন হইতে হইত। আয়কর ও পাটশুল্কের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গের সহিত এ পর্য্যন্ত খানিকটা দুর্ব্যবহারই করিয়াছেন বলা চলে। অবিভক্ত বাঙ্গলা ভারতসরকারের বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে বণ্টন-যোগ্য আয়করের অংশের শতকরা ২০ ভাগ পাইত; কলিকাতা পশ্চিমবঙ্গে পড়িয়াছে এবং সমগ্রভাবে পশ্চিমবঙ্গের আদায়ী আয়করের পরিমাণ অবিভক্ত বাঙ্গলার পরিমাণের চেয়ে বিশেষ কম নয়, তবু কেন্দ্রীয় সরকার জোর করিয়া পশ্চিমবঙ্গের ভাগে উপরিউক্ত অংশের শতকরা মাত্র ১২ ভাগ স্থির করিয়া দিয়াছেন। স্যার অটো নিমেয়ারের বাঁটোয়ারা অনুযায়ী আগে পাট-উৎপাদক প্রদেশগুলিকে ভারতসরকার পাটশুল্ক বাবদ সংগৃহীত অর্থের শতকরা ৬২½ ভাগ দিতেন, পাট উৎপাদনের সর্ব্বপ্রধান কেন্দ্র পূর্ব্ববঙ্গ পাকিস্তানে পড়ার পর কেন্দ্রীয় সরকার এই বণ্টনযোগ্য অংশ শতকরা ৬২½ ভাগ শতকরা মাত্র ২০ ভাগে নামাইয়া আনিয়াছেন এবং স্থির করিয়াছেন যে এই ২০ ভাগ উৎপন্ন পাটের পরিমাণ অনুযায়ী প্রদেশগুলির মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হইবে। পশ্চিম বাঙ্গলা বেশী পাট উৎপাদন করে না, কাজেই এই ব্যবস্থায় তাহার প্রচণ্ড আর্থিক ক্ষতি হইতেছে। পাট উৎপাদন না করিলেও ভারতের ১০৮টি পাটকলের ৯৯টি পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত। পাটশুল্ক হিসাবে ভারতসরকারের যাহা আয় হয়—তাহার বহুলাংশ পশ্চিমবঙ্গের জন্যই সম্ভব হইয়া থাকে, সুতরাং পাটশুল্কের দরুণ বণ্টনযোগ্য অংশ কমাইয়া পশ্চিমবঙ্গকে তাহার ন্যায্য প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করা কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে সঙ্গত ব্যবস্থা নয়। বাজেট বক্তৃতায় অর্থসচিব শ্রীযুক্ত সরকারও এ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যবহার উল্লেখ করিয়া দুঃখপ্রকাশ করিয়াছেন। তবে আশার কথা এই যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দাবী এখন কেন্দ্রীয় সরকারের কিছুটা মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে এবং তাঁহারা আয়কর ও পাটশুল্ক বাবদ সংগৃহীত অর্থ বাঁটোয়ারার প্রশ্নটি সমগ্রভাবে পুনর্বিবেচনার জন্য বিশেষজ্ঞদের দ্বারা একটি অনুসন্ধানের বন্দোবস্ত করিতে রাজী হইয়াছেন। আশা করা যায়, ১৯৫০-৫১ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ প্রদেশসমূহের মধ্যে সংশোধিত হারে উক্ত অর্থ ভাগ করিয়া দেওয়া সম্ভব হইবে। অবশ্য এই বাঁটোয়ারা-নীতি যে নূতন শাসনতন্ত্রের বিধিবিধানের উপর কিছুটা নির্ভর করিবে তাহা বলাই বাহুল্য।

কথার কথা

কুল্লূক ভট্ট

কিরণশঙ্কর রায়ের মৃত্যুর সহিত একটি অতীব করুণ ও বেদনার্দ্র কাহিনী চিরদিনের জন্য বিজড়িত রহিল। ভদ্রলোক পূর্ব্ববঙ্গের অধিবাসী হইয়াও সারা জীবন পশ্চিম বঙ্গে প্রবাসী। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা প্রাপ্তি ও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরে—প্রায় ছয় মাস পরে—কিরণশঙ্কর যখন পশ্চিম বাঙ্গলার শাসন-পরিষদে স্থান প্রাপ্ত হইলেন, তখন পূর্ব্ববঙ্গবাসী এবং তাঁহারই মত পশ্চিমবঙ্গপ্রবাসী 'বন্ধু সজ্জনগণ' তাঁহার মৃত্যু কামনা করিতেও বিরত হয়েন নাই। কিরণশঙ্করের অব্যবহিত পূর্ব্বে অপর একজন পূর্ব্ববঙ্গীয় ভদ্রলোক পশ্চিম বাঙ্গলায় মন্ত্রীত্ব করিতে-কামনাও শুনা যায় নাই; বরং মনে হইত, কেহই তাঁহাকে ধর্তব্যের মধ্যে গণ্য করিবার প্রয়োজন বোধ করে না। তিনি পূর্ব্ববঙ্গে থাকুন, অথবা পশ্চিমবঙ্গে থাকুন, তাহাতে ক্ষতি বা বৃদ্ধির কোন কথা ছিল না; কিন্তু কিরণশঙ্কর রায়ের কথা স্বতন্ত্র। কিরণশঙ্কর পূর্ব্বে পাকিস্তানে থাকিলে, তথাকার 'মিনরিটি' হিন্দুর বলবুদ্ধি ভরসা বৃদ্ধি পাইত। কিরণবাবু পাকাপাকিভাবে পূর্ব্ব পাকিস্তান ত্যাগ করিয়া পশ্চিমবঙ্গে স্থায়ী আসন গ্রহণ করায় সেইজন্যই পূর্ব্ববঙ্গীয় জনগণ বিক্ষুব্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন। মহাত্মা হত্যার কয়েক দিন পূর্ব্বে, দিল্লীতে

ছিলাম। কামনা পূর্ণ হইতে বিলম্ব হয় নাই। পশ্চিমবঙ্গেও কামনা পূর্ণ হইল।

কারাবাসের দৈর্ঘ্য ও সংখ্যাত্বের নিরিখে কিরণবাবুর স্থান কংগ্রেসীদিগের মধ্যে বিশেষ উচ্চ হইবে বলিয়া মনে হয় না; কিন্তু রাজনৈতিক জ্ঞান ও সংগঠন-কুশলতায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের পরে এবং কিরণশঙ্কর রায়ের মধ্যে নাম করিবার মতো একটি নামও খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। কাল ও ঘটনার উত্তাপের অবসানে, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের রাজনীতিক ইতিহাস যেদিন লিখিত হইবে, সেদিন দেখা যাইবে কুশাগ্রবুদ্ধি রাজনীতিজ্ঞ 'ত্রয়ীর' আসন সকলের পুরোভাগে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে এবং সেই ইতিবৃত্তের বঙ্গদেশীয় অধ্যায়ে সত্যব্রত কিরণশঙ্করের জন্যও একটি বিশিষ্ট আসন রক্ষিত। ভারতবর্ষের রাজনীতি ইংরাজের রাজনীতির খাদ ধরিয়া প্রবাহিত; আমাদের যে স্বদেশী ব্রত, তাহাও ইংরাজী অনুশাসনে প্রবর্তিত; আমাদের ন্যাশনালিজমও ইংরাজের দান। ইংরাজের রাজনীতিতে জিন্নার, অনন্যসাধারণ দক্ষতা তাঁহাকে সর্বাংশে জয়ী করিয়াছে; অপিচ আমরা স্বীকার করি আর নাই করি, প্রতি পদে আমাদিগকে পরাজয় বরণ করিতে হইয়াছে। জিন্নার নৃশংসতা বাদ দিলে যাহা থাকে তাহা উচ্চাঙ্গ রাজনীতি এবং তাহাতে জিন্না অপরাজেয় ও অপরাজিত। কিরণশঙ্কর ছিলেন, ইহারই ক্ষুদ্র সংস্করণ। পার্থক্য ছিল, কিরণশঙ্কর সজ্জন ও ভদ্র।

কংগ্রেস এক্ষণে রাজরাজেশ্বর, প্রচলিত নিয়ম অনুসারে এক্ষণে তাঁহাদিগকে গালিগালাজ শুনিতেই হইবে। রাজার মা'ও নিষ্কৃতি পান্ না, তাঁহারাই বা অব্যাহতি আশা করেন কিরূপে? নিন্দাভাজন কংগ্রেস সেবকগণের মধ্যে কিরণশঙ্কর রায়ের মত ভদ্র, সৎ, নিরহঙ্কার দুই দশজন লোক যদি না থাকিত, তাহা হইলে বোধ করি লোক ঢাকীশুদ্ধ ঢাক বিসর্জন দিয়া আসিতে চাহিত। পূজার দালানে প্রতিমা দেখিতে বেশ, ভক্তিও না হয়, তা নয়। কিন্তু সাজগোজ গর্জন তেল—রং মাটি কারুকার্য্যের আড়ালে সেই খড়। কিরণশঙ্করের মত নিপুণ পটুয়া ছিলেন বলিয়াই লোকে কংগ্রেসের সেই খড় দেখিতে পাইত না। রাজার রাজভোগ, পাত্র অমাত্যের যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিবার শক্তি সামর্থ্য একমাত্র কিরণশঙ্করেরই ছিল। অভাগা বঙ্গদেশের কংগ্রেসের বণি-জিনীর কোন্দল মিটাইয়া "ভদ্রলোকের পাতে দিবার" মত ক্ষমতা একমাত্র কিরণেরই ছিল। পালিশ করা লোহের মত সুচিক্কণ সজ্জন কিরণের জীবনটা বোধ হয় বন্ধু নেতৃবৃন্দের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিতেই অতিবাহিত হইয়াছে। আজ কিরণশঙ্কর নাই। নিত্য নূতন দক্ষ রাজার যজ্ঞস্থলে নিতুই নব; অজমুণ্ডের ছড়াছড়ি দেখিবার সম্ভাবনা যে উৎকট হইয়া উঠিতেছে, এই কথাটা গোপন করিয়া কোন লাভ নাই। মন্ত্রীসভা ভাঙ্গা-গড়ায় পশ্চিমবঙ্গ ইতিমধ্যেই যথেষ্ট সুযশঃ অর্জন করিয়াছে। অতঃপর সকাল সন্ধ্যা মেকিং ও ব্রেকিং দেখিতে হইলেও আমরা বিস্মিত হইব না। ঈশের মূল অদৃশ্য হইলে ঢোঁড়া সাপও কেউটের মত ফোঁস করিয়া ফণা ধরে।

কলিকাতা সহরে যাহারা ঘরবাড়ী নির্মাণ করিয়াছে, তাহারা যেন দাগী চোর বা দাগী বদমায়েস। দাগীদের তালিকা পুলিশের কাছে থাকে এবং যখনই কোথায়ও একটা 'ঘটনা' ঘটে, কর্তৃপক্ষ সর্বাগ্রে তাহাদের খবরদারী করেন। কলিকাতা কর্পোরেশনের কর্তৃপক্ষের অকর্ম, কুকর্ম ও অপকর্মের কল্যাণে যখনই অর্থাভাব ঘটে, তৎক্ষণাৎ ঐ ঘর-বাড়ীওয়ালা দাগীদিগের ধরিয়া টানা-পোড়েন শুরু হইয়া যায়। এ যেন সেই গল্পের বুড়ীর কুলগাছ বা মুনিঋষির কামধেনু। কুল গাছটা নাড়া দিবামাত্র লাল লাল টোপা কুলে রাঙা হইয়া যায় মাটি। আর, অতিথি আসুক, অভ্যাগত আসুক, কামধেনুর বাঁট টানিয়া ট্যাকচুঁক করিলেই কলসভরা অমৃত। কলিকাতার ঘরবাড়ীর মালিকদের দোহনে কষ্টও নাই, শ্রমও নাই; সকলে ফাঁকী দিলেও তাহাদের পক্ষে সেই পথও বন্ধ। লঙ্কার রাণী মন্দোদরীর মত কর্পোরেশনও অনেক পতির ঘর করিত, এক্ষণে সে অপযশঃ ঘুচিয়াছে, পতিত্ব নাশ হইয়া এখন কর্পোরেশন এক পতির এক স্ত্রী। পতিও আবার যেমন তেমন নহেন— আই-সি-এস পতির গরবিনী সতী। সুরেন্দ্র বন্দ্যো অতি কষ্টে আই-সি-এসী চক্রব্যূহ ভেদ করিয়া কলিকাতা কর্পোরেশনকে নাগরিকাধিকার দান করিয়া গিয়াছিলেন। বিধান রায়ের জয় হোক, তাঁহার আদেশে সূর্য্যমামা পুনরায় আই-সি-এসের বগলদাবায় উঠিয়াছেন। ঈশ্বর-জানিত, ওই ইংরাজ-নির্মিত সার্ভিসের কর্মকুশলতার প্রমাণ ত প্রতি পদেই পাওয়া যাইতেছে; কিন্তু তাহাই যথেষ্ট নহে। শুনা যাইতেছে, অর্থাভাব নিরসনকল্পে সমস্ত বাড়ীর ট্যাক্স "মুছে লেখ" করিয়া পাইকারী দরে বৃদ্ধির প্রস্তাব হইয়াছে। বড়লোকেরা, প্রভাবশালী ব্যক্তিরা "সাধু" ও "সজ্জন" ধনবানগণ নানা কলকৌশলে বাড়ীর ভ্যালুয়েশন কমাইয়া ট্যাক্স হ্রাস করাইয়া থাকেন, এই গোপন তথ্যটি সর্বসাধারণই জ্ঞাত আছে এবং শাস্তি দিতে হইলে তাহাদেরই দিতে হয়; কিন্তু তাহাতে বহু পরিশ্রম, অনেক কষ্ট স্বীকার করিতে হইবে, দক্ষ ও বিচক্ষণ সিভিল সার্ভিস তাহাতে নারাজ। "শর্ট কাট্" বাহির করিবার ক্ষমতা সার্ভিসের অসাধারণ। শর্ট কাটে স্থির হইয়াছে, বাছাবাছি নিষ্প্রয়োজন, মুড়ী-মিছরী একদর করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য। সহরের সমস্ত বাড়ীর ট্যাক্স বৃদ্ধি করিলে অর্থাভাবও ঘুচিবে, অসাধুতার দণ্ডও হইবে। ঠগ বাছিবার দরকার কি, গ্রামকে গ্রাম অগ্নিদগ্ধ করিলে, ঠগ নিশ্চয়ই মরিবে। এমন চুলচেরা সুবিচারের জন্য নোবেল্ প্রাইজের ব্যবস্থা নাই, এই বড় দুঃখ!

* * *

কর্পোরেশনের পিতৃপুরুষ গভর্ণমেন্ট। সেখানেও আই-সী-এসী ইন্দ্রসভা। তাঁহারা সাব্যস্ত করিয়া লইয়াছেন, এই দুর্দিনেও যাহারা সহরে ঘর, বাড়ী, দালান বা পায়খানা করিতে চাহে, তাহারা ডাকাত, জাঁহাবাজ বাটপাড়, অতএব শাস্তির যোগ্য। স্বাধীন দেশ, সিকিউলার বা ধর্মনিরপেক্ষ, লৌকিক রাষ্ট্র। পাঠকের স্মরণ আছে, ভারত সরকার বিজ্ঞাপন দিয়াছেন, হিন্দু মহাসভা, রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘ প্রভৃতি

লিখিলে, সে চিঠি পড়া হইবে (না পড়িলে জানা যাইবে কি করিয়া যে কে লিখিয়াছে) কিন্তু চিঠির জবাব দেওয়া হইবে না ; সাক্ষাৎ করিতে আসিলে, ধূলা পায়ে বিদায়, 'ইন্টারভিউ' দেওয়া হইবে না ; কোনরূপ সাহায্য যাচ্ঞা করিলে, 'ভেরী সরি', সাহায্য দেওয়া হইবে না, অর্থ ভিক্ষা করিলে, "হাত যোড়া"—ভিক্ষা দেওয়া হইবে না। তদ্রূপ, সিভিল সাপ্লাই বিভাগের অলিখিত বিজ্ঞাপনে নির্দ্দেশ দেওয়া আছে, পূর্ব্বোক্ত ডাকাত ও বাটপাড়গণ (১) টীন বা লোহা (২) সিমেন্ট চাহিয়া পত্র লিখিলে প্রথমতঃ জবাব দিবার প্রয়োজন নাই। পুনঃ পুনঃ উত্যক্ত করিলে এবং সাময়িকপত্রের 'কবিতে' ও 'গল্প' লিখিয়েদের দৃষ্টান্তে ডাকটিকিট সংযুক্ত সঠিকানা খাম পাঠাইলে "কঠিন প্রশ্ন" পত্র প্রেরণ করিবে। চৌদ্দ পুরুষের চৌহদ্দী দাখিল করিতে না পারিয়া অনেকগুলা কাটিয়া পড়িবে। যে সকল নাছোড়বান্দা তাহা সত্বেও টীন বা সিমেন্টের পারমিট্ পারমিট্ করিয়া তারকেশ্বর ভ্রমে, ক্লাইভ স্ট্রীটের চত্বরে 'হত্যা' বা ধর্ণা দিবে, তাহাদিগকে পারমিট দিতে হইবে বটে, কিন্তু পিনাল্ কোর্টের বিধানানুসারে সতর্কতার সহিত পারমিট বন্টন করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। যে বালীগঞ্জে বাড়ী করিতেছে, তাহাকে লিলুয়ার দোকানের, যে টালায় ঘর করিতে চাহে, তাহাকে উলুবেড়িয়ায়—যে টালীগঞ্জে থাকে, তাহাকে দমদমায় দোকানে পারমিট দিবে। পিনাল কোডের দণ্ডবিধিতে লেখে, যাহারা কারাগারে আসে, তাহাদিগকে সমঝাইয়া দিতে হইবে যে, সেই স্থানটা মাতুল অথবা শ্বশুরালয় নহে, কারাগার। সিভিল সাপ্লাই কোড বলিতেছে, এই বাজারে যাহারা ঘর বাড়ী করিতে চাহে, তাহাদিগকেও সমঝাইয়া দেওয়া উচিত, ত্রিশ সের দামে তিন মণ চাল ! রোজ রোজ জ্বালাতন না করে ! স্বাধীন দেশ, গভর্ণমেন্ট ও জনগণ এক ও অভিন্ন, হরি ও হর—একাত্মা ! দিল্ খুস্ করিয়া গালি দিব, তাহারও উপায় নাই, নিজের নিষ্ঠীবনে নিজেই স্নাত হইতে হইবে ! ততঃ কিম্ !

* * *

সম্প্রতি কতকগুলি ধর্ম্মঘট হইয়াছে, কতকগুলি ঘটি ঘটি করিতেছে এবং কতকগুলি কুম্ভকার গৃহে ঘট প্রস্তুত হইতেছে। আধে-বাধে বে-সরকারী ঘটগুলির কথা ছাড়িয়া সরকারী ধর্ম্মঘটগুলির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে দেখি, সালসা সেবনের পূর্ব্বে যে অবস্থা ছিল, সালসা সেবনের পরেও ঠিক সেই দশাই রহিয়া গিয়াছে। সংযুক্ত প্রদেশের শিক্ষকেরা ধর্ম্মঘট করিয়াছিল, সরকার বাহাদুরের সঙ্গে আলাপ আলোচনায় হতাশ হইয়া শেষ পন্থা গ্রহণে শিক্ষকগণ বাধ্য হইয়াছিলেন। ঘট ভাঙ্গিয়াছে ; বেতন বৃদ্ধির আশা হইয়াছে। রেল কর্ম্মচারীগণ ধর্ম্মঘটের করমায়েস্ দিয়াছিলেন। তাঁহারাও সরকার বাহাদুরের সহিত আলোচনা করিয়াছিলেন। দাবী অন্যায়, অসঙ্গত ইত্যাদি বিবেচ সরকার দৃঢ় পণ করিয়াছিলেন, আস্কারা দিবেন না। কিন্তু আস্কারা দিয়া ফেলিয়াছেন এবং ভরসা হইতেছে, আরও দিবেন। সরকার খেদ করেন, দেশের লোকের মনোভাব স্বাধীনতার পরেও বদলাইল না ! জিজ্ঞাসা করি, তাঁহাদেরই বা কতখানি বদলাইয়াছে ? ধর্ম্মঘট ঘটিলেই যখন সরকারী মল্ খসে, তখন একটু পূর্ব্বে খসাইলে কি লোকসান ?

* * *

৺লাট কেশি সাহেব কলিকাতার ছাত্রসমাজকে লালদীঘির মাটি মাড়াইতে দিবেন না, ধনুর্ভঙ্গ পণ। ধর্ম্মতলায় রক্তগঙ্গা প্রবাহিত দেখিয়াও কেশির পণ ভঙ্গ হয় নাই। পরের দিন কিন্তু ছেলেরা লালদীঘির পাড়ে নাচিল, কুঁদিল, বক্তৃতা করিল, লাট কেশির ধৈর্য্য নষ্ট হইল না। এ গেল সালসা সেবনের পূর্ব্বকালের কথা। সালসা সেবনের পরেও দেখিলাম, ছাত্রবর্গ জেদ ধরিল ১৪৪ ধারা গো-টু-হেল করিবেই, সরকার হুকার ছাড়িলেন, খবর্দার। গোলদীঘির জল রাঙ্গা হইয়া গেল। পুলিশ কমিশনার মল্লিনাথস্ত টীকা করিলেন, পুলিশ গুলি ছুঁড়ে মারিবার জন্ত নহে, খেলা করিবার জন্ত। ছেলেরাই বা পিছপা হইবে কেন ? তাহারা বিদেশী গুলি হজম করিয়া নীলকণ্ঠ, স্বদেশী গুলির আস্বাদ না লইবে কেন ? তাহারা কি ডরায় কভু ? ফুর্ত্তির পরেই ১৪৪ উঠিয়া গেল। ভাল হইল। কিন্তু প্রশ্ন রহিল, ফুর্ত্তির আগে উঠে নাই কেন ?

আমার এ তরুমূলে

শ্রীদেবপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

আমার এ তরুমূলে বিরহের শুভ্র মাল্যখানি
রেখে যাব রাণী,
রেখে যাব তব তরে জীবনের সর্ব্ব আশীর্ব্বাদ
সর্ব্বশেষ সাধ।
যদি কোন নিরুরূপ ব্যথাহীন সাঁঝে
ফেলে যাওয়া রিক্ততার মাঝে

আমার এ মাল্যখানি পলকের ভুলে
হাতে লও তুলে
সেদিন পাবে না খুঁজি অন্তরের সুতীব্র ব্যর্থতা,
চাওয়া আর না-পাওয়ার মাঝে যে পূর্ণতা,
তার স্পর্শ লভি',
আপন চিত্তের তলে পাবে এক অপূর্ব্ব সুরভি।

সাময়িকী

পরলোকে সরোজিনী নাইডু—

গত ১লা মার্চ্চ মঙ্গলবার রাত্রি সাড়ে ৩টার সময় যুক্তপ্রদেশের গভর্ণর শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু ৭১ বৎসর বয়সে লক্ষ্ণৌ লাটপ্রাসাদে সহসা পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার ৮১ বৎসর বয়স্ক স্বামী ডাঃ নাইডু সে সময়ে হায়দ্রাবাদে ছিলেন। পুত্রকন্যারাও কেহই নিকটে ছিলেন না। কুমারী পদ্মজা নাইডু (তাঁহার কন্যা) তাঁহার নিকট

সরোজিনী নাইডু

একল সময়েই থাকিতেন কিন্তু তিনিও ঐ দিন এলাহাবাদে উৎসবে যোগদান করিতে গিয়াছিলেন। সরোজিনী বাঙ্গালী অধ্যাপক ডাঃ অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা—তিনি শৈশব হইতেই অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দেন ও ১২ বৎসর বয়সে ম্যাট্রিক পাশ করিয়া ১৪ বৎসর বয়সে যে ইংরাজি কবিতার বই প্রকাশ করেন, তাহা সর্ব্বত্র সমাদৃত হইয়াছিল। তিনি গত ৩০ বৎসর কাল কংগ্রেস আন্দোলনের সহিত ঘনিষ্টভাবে যুক্ত থাকিয়া বহুবা কারাবরণ করিয়াছেন। ১৯২৫ সালে তিনি কানপুর কংগ্রেসের সভানেত্রী হইয়াছিলেন এবং ১৯৩১ সালে মহাত্মা গান্ধীর সহিত বিলাতে গোলটেবিল বৈঠকে ভারতের প্রতিনিধি ছিলেন। তাঁহার বক্তৃতাশক্তি ও রাজনীতিক জ্ঞান অসাধারণ ছিল। দেশ স্বাধীন হইলে তিনি যুক্তপ্রদেশে গভর্ণরের যে কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তাহা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক নিষ্ঠা ও বিচক্ষণতার সহিত সুসম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন। ভারতীয় মহিলার এরূপ অসামান্য কৃতিত্ব ও সম্মান প্রাপ্তি এ যুগে অতি বিরল। তাঁহার কথা দেশবাসী চিরদিন শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিবে।

ভারত সরকারের বাজেট—

গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী নয়া দিল্লীতে কেন্দ্রীয় ভারত সরকারের অর্থ-সচিব ডাঃ জন মাথাই ১৯৪৯-৫০ সালের বার্ষিক আয় ব্যয়ের যে আনুমানিক হিসাব বা বাজেট প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় যে ঐ বৎসরে আয় অপেক্ষা ব্যয় ১৫ কোটি টাকা অধিক হইবার সম্ভাবনা থাকায় বহু নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের উপর নূতন কর ধার্য্য করিয়া উক্ত ১৫ কোটি টাকার সংস্থান করা হইবে। উৎপাদন বৃদ্ধির অছিলায় শিল্পপতিদের বহু প্রকার সুবিধা দান করিয়া জনসাধারণের নিত্য প্রয়োজনীয় কতকগুলি দ্রব্যের উপর কর ধার্য্যের ব্যবস্থা হওয়ায় দেশের ধনী সম্প্রদায় ডাঃ মাথাইএর প্রশংসা করিয়াছেন বটে, কিন্তু দেশের চির-নিপীড়িত দরিদ্র জনগণ এ ব্যবস্থা অনুমোদন করিতে পারেন না। স্বাধীন ভারতেও সৈন্য বিভাগ তথা দেশরক্ষার জন্য মোট আয়ের শতকরা ৪৮ ভাগ ব্যয়ের ব্যবস্থা রহিয়াছে। পোষ্ট কার্ডের দাম আবার তিন পয়সা এবং খামের দাম দুই আনা করা হইয়াছে। চিনি, কাপড়, সুপারি, কাগজ, কাঁচের দ্রব্য প্রভৃতির উপর নূতন কর হওয়ায় প্রত্যেক দেশবাসীকেই বিব্রত হইতে হইবে। মাদক দ্রব্য, তামাক,

মোটর গাড়ী, সিল্ক প্রভৃতি সৌখীন দ্রব্যের উপর নূতন কর হওয়ায় কাহারও আপত্তি হইবে না বটে, কিন্তু মূলধনের উপর মুনাফা কর রদ করিয়া ধনী সম্প্রদায়কে সুবিধা দান ব্যবস্থা লোক কংগ্রেস গভর্ণমেণ্টের নিকট কোন দিনই প্রত্যাশা করে নাই। দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলি কার্য্যে পরিণত করার জন্য ৮৫ কোটি টাকা ঋণ গ্রহণ পূর্ব্বক ব্যয়ের ব্যবস্থায় লোক অবশ্যই সন্তোষ প্রকাশ করিবে। মোটর উপর জনসাধারণ যে সকল সুখ সুবিধার প্রত্যাশা করিয়াছিল, নূতন বাজেটে তাহার অভাব দেখিয়া হতাশ হইয়াছে।

বাঙ্গালার মিলের কাপড়—

প্রকাশ যে বঙ্গীয় মিলমালিক সমিতির সভাপতির অনুরোধে ভারত সরকারের শিল্প ও সরবরাহ সচিব ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় নির্দেশ দিয়াছেন যে, পশ্চিম বঙ্গ সরকারের হ্যাণ্ডলিং এজেণ্টগণ এ দেশের মিলের বস্ত্রাদি প্রস্তুত হইবার এক মাসের মধ্যে টাকা দিয়া উক্ত মাল গ্রহণ না করিলে, সে মাল মিল কর্ত্তৃপক্ষ সরাসরি বাজারে বিক্রয় করিতে পারিবেন। বাঙ্গালার সকল মিলে প্রচুর বস্ত্র প্রস্তুত হইয়া পড়িয়া আছে, সেগুলি সরকার গ্রহণের কোন ব্যবস্থা না করায় মিল-মালিকগণ বিব্রত হইয়াছেন—অনেক মিলে স্থানাভাবে কাজ বন্ধ করিতে হইতেছে। নূতন ব্যবস্থায় যদি সঙ্গে সঙ্গে হ্যাণ্ডলিং এজেণ্টের সংখ্যাও বৃদ্ধি করা হয়, তবে হয়ত সুফল ফলিতে পারে!

পরলোকে কিরণশঙ্কর রায়—

পশ্চিম বাঙ্গালার স্বরাষ্ট্র সচিব, তীক্ষ্ণধী রাজনীতিক কিরণশঙ্কর রায় মহাশয় গত ২০শে ফেব্রুয়ারী সকাল ৯টা ২০ মিনিটের সময় মাত্র ৫৮ বৎসর বয়সে কলিকাতা ৮নং থিয়েটার রোডে সরকারী বাসভবনে কয়েক মাস রোগ ভোগের পর পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি ঢাকা তেওতা জমীদার বংশে জন্মগ্রহণ করেন—শিক্ষা ও সংস্কৃতির জন্য তাঁহাদের পরিবার বাংলাদেশে সুপরিচিত। বিলাতী উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া আসিয়া ১৯১৬ সালে তিনি সরকারী শিক্ষাবিভাগে উচ্চপদলাভ করেন, পরে ১৯২০ সালে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন। পরে তিনি ব্যারিষ্টার হইয়াছিলেন। গত ৩০ বৎসর কাল তিনি বাঙ্গালাদেশের রাজনীতির সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রক্ষা করিয়াছিলেন এবং বহুবার সে জন্য তাঁহাকে কারাবরণ

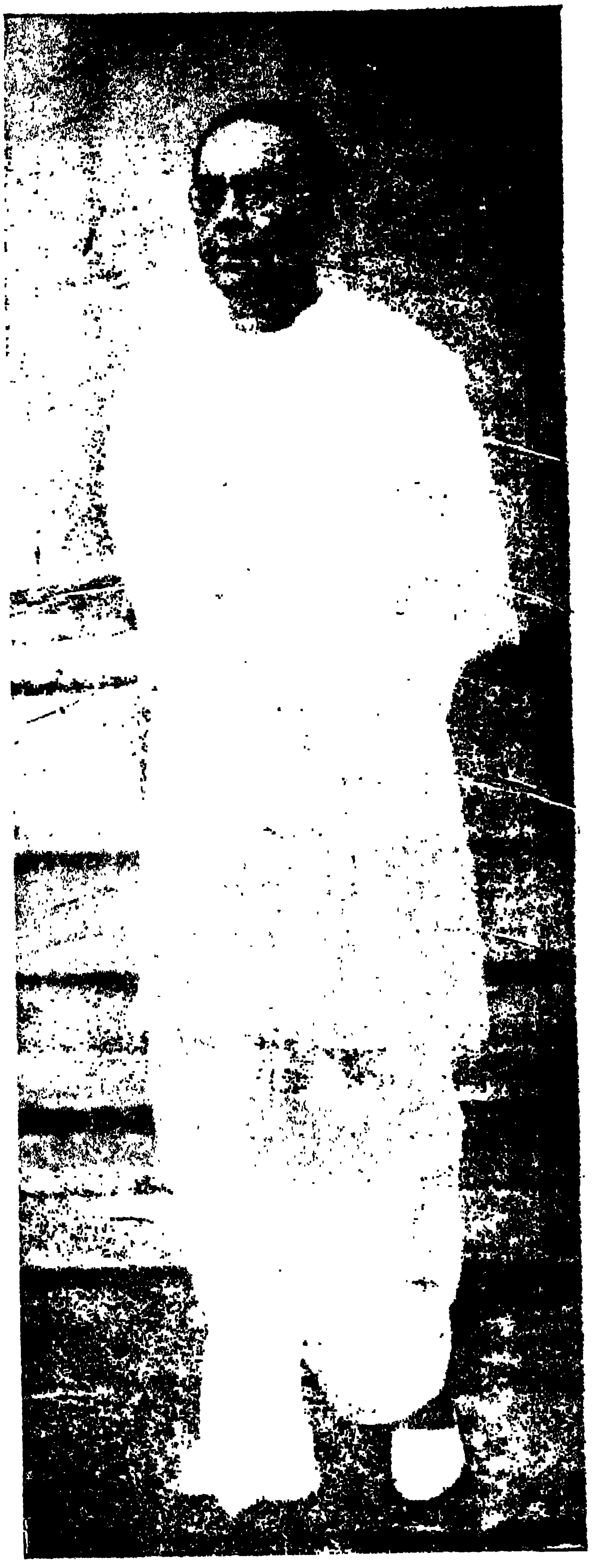

করিতে হয়। অসাধারণ বুদ্ধির জন্য সকলে তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিত ও সর্ব্বত্র লোক তাঁহার পরামর্শ ও উপদেশ গ্রহণের জন্য উদ্‌গ্রীব থাকিত। তিনি ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের মন্ত্রি-সভায় স্বরাষ্ট্র সচিবরূপে যোগদান করিয়া বেশীদিন কাজ করিতে পারেন নাই। দারুণ উদরাময় রোগ তাঁহাকে শয্যাশায়ী করিয়াছিল। বাঙ্গালার এই দুর্দ্দিনে তাঁহার মত নেতার অভাবে পশ্চিম বাংলা সত্যই বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

আড়িয়াদহ অনাথভাণ্ডারে শ্রীজ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী

দেশে অশান্তি বৃদ্ধি—

গত ২৬শে ফেব্রুয়ারী শনিবার এক দল বিপথগামী যুবক কলিকাতার নিকটে দমদমার জেশপ কোম্পানীর কারখানা, দমদম উড়োজাহাজ কেন্দ্র, বসিরহাট থানা প্রভৃতি স্থানে যে ভাবে অশান্তির সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহাতে সকল শান্তিকামী দেশবাসীই শঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছেন। জেশপ কারখানায় তিন জন শ্বেতাঙ্গ কর্ম্মচারীকে জীবন্ত অবস্থায় অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়া হত্যা করা হইয়াছে। ফলে সকল কারখানা পরিচালকদের মধ্যে ভীষণ আতঙ্ক সৃষ্ট হইয়াছে। সত্য কথা, দেশবাসী অন্ন ও বস্ত্রের অভাবে দারুণ কাতর, গভর্ণমেণ্ট সাধারণ দরিদ্র জনগণের জন্য অন্নবস্ত্রের সুব্যবস্থা করিতে পারিতেছেন না—কি কেন্দ্রীয় কি প্রাদেশিক সকল মন্ত্রীমণ্ডলীই ধনীর স্বার্থরক্ষায় যত অধিক মনোযোগী, দরিদ্রের জন্য ততটা সহানুভূতি সম্পন্ন নহেন—কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এভাবে দেশে অশান্তি সৃষ্টি করিলে দেশের শাসন ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়িবে, দেশে অরাজকতা সৃষ্ট হইবে এবং তাহার ফলে দরিদ্র জনগণের দুঃখকষ্ট না কমিয়া বরং আরও বহু পরিমাণে

রাখিয়া যাইবে। যাহাতে দেশে পুনরায় এরূপ অশান্তি সৃষ্টির চেষ্টা না হয়, সে জন্য দেশবাসী ও শাসন কর্তৃপক্ষ উভয়েরই সমবেত ভাবে ব্যবস্থা করা বিশেষ প্রয়োজন। দেশের যুবকগণের মধ্যে সত্বর এমন শিক্ষা প্রচার করা উচিত, যাহার ফলে তাহারা বিপথে পরিচালিত না হয়। সমাজতন্ত্রবাদ দেশবাসীর পক্ষে কল্যাণজনক—কিন্তু তাহা যে এ পথে আসিবে না, তাহা বিশেষ করিয়া আজ বুঝাইয়া দেওয়ার প্রয়োজন আসিয়াছে।

আড়িয়াদহ অনাথভাণ্ডারে কুমার শ্রীবিশ্বনাথ রায়

গান্ধীজির আদর্শে দেশগঠন—

সম্প্রতি আকোলায় এক সভায় রাষ্ট্রপতি ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়া বলিয়াছেন যে, আগামী ৫ বৎসরের মধ্যে ভারতের সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা গান্ধীজির আদর্শ অনুসারে পরিবর্ত্তিত হইবে, দেশে শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং প্রত্যেক ব্যক্তির দেশের সম্পদের উপর সমান অধিকার থাকিবে। এই আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠা ৫ বৎসরের মধ্যে কিরূপে সম্ভব হইবে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। এ বিষয়ে কোথায় কে বা কি কার্য্যক্রম স্থির করিয়াছেন, তাহা জানিতে পারিলে দেশের লোক আশ্বস্ত হইতে পারে। নচেৎ রাষ্ট্রপতির মত দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে এ কথা প্রকাশ করার কি কোন সার্থকতা আছে?

উদ্বাস্তুদের পুনর্ব্বসতি—

ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ সপ্তাহে পূর্ব্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের পুনর্ব্বসতি সম্পর্কে ভারত সরকারের সাহায্য ও পুনর্ব্বসতি বিভাগের উপদেষ্টা শ্রীমেহেরচাঁদ খান্না এবং পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের প্রতিনিধিগণ কলিকাতায়

ফলে ১৫ লক্ষ উদ্বাস্তুর পুনর্ব্বসতির ব্যবস্থা করিবার সিদ্ধান্ত হইয়াছে। কিন্তু এই ব্যবস্থা কার্য্যে পরিণত করিতে কত সময় লাগিবে কে জানে? এ বিষয়ে বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহকে সরকার উৎসাহ ও সাহায্য দান করিলে সত্বর ব্যবস্থাটি সম্পূর্ণ হইতে পারে। রামকৃষ্ণ মিশনের মত প্রতিষ্ঠান এ বিষয়ে কত দ্রুত ও সম্পূর্ণভাবে কাজ করেন, তাহা সরকারের অজ্ঞাত নহে।

নারু বসু—

কলিকাতা হাইকোর্টের আদিম-বিভাগের নবনিযুক্ত অস্থায়ী প্রথম ভারতীয় রেজিষ্ট্রার শ্রীপ্রদ্যোৎকুমার বসু (সলিসিটর এবং নোটারি পাব্লিক) বিগত ১৫ই নভেম্বর

শ্রীপ্রদ্যোৎকুমার বসু

হইতে স্থায়ীভাবে উক্তপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। ইনি বিখ্যাত রাসায়নিক রায় বাহাদুর স্বর্গত চুনীলাল বসুর ভ্রাতুষ্পুত্র এবং বিখ্যাত চিকিৎসক স্বর্গত যতীন্দ্রনাথ বসুর একমাত্র পুত্র। বিগত ৩রা জুন কলিকাতা গেজেটে এক বৎসরের জন্য অস্থায়ীভাবে তাঁহার পদপ্রাপ্তি সম্বন্ধে বিজ্ঞপ্তি বাহির হয়, কিন্তু তাঁহার কর্ত্তব্যপরায়ণতা ন্যায়নিষ্ঠা এবং অক্লান্ত কার্য্যকুশলতা সম্বন্ধে প্রধান বিচারপতি সম্যক রূপে পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে এক বৎসরকাল পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই স্থায়ীভাবে আদিম বিভাগের রেজিষ্ট্রার করিয়াছেন। ইনি বিশেষ নিয়মানুবর্ত্তিতা ও শৃঙ্খলার সহিত আদিম বিভাগের বিভিন্ন বিভাগ পরিচালিত করিতেছেন এবং একাধিক নূতন বিভাগ সৃষ্টি করিয়া জনসাধারণের বহু অসুবিধা ও অভিযোগ দূর করিয়া স্বাধীন রাষ্ট্রের কল্যাণ করিতেছেন।

পরলোকে চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—

গত ২৮শে পৌষ বুধবার হুগলী জেলার জনাই-আদান নিবাসী চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ৭৩ বৎসর বয়সে পরলোক

৺চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

গমন করিয়াছেন। চারুবাবু কলিকাতা পোর্ট কমিশনার্সের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন। কর্ম্মস্থল হইতে অবসর গ্রহণের কিছু পূর্ব্ব হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত তিনি তাঁহার আদান গ্রামস্থ পল্লীভবনে বাস করিতেছিলেন। এখানে তিনি হোমিও-প্যাথিক ঔষধ দাতব্য করিতেন। ঐ অঞ্চলে দাতা বলিয়া তাঁহার যথেষ্ট সুনাম আছে। চারুবাবু মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত জনাই উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের কর্ম্মপরিষদের প্রায় বিশ বৎসর যাবৎ সভ্য ছিলেন।

ডারবান দাঙ্গা ও ডাঃ দাদু—

ট্রান্সভাল ভারতীয় কংগ্রেসের সভাপতি ডাঃ দাদু এডিনবরায় যাইয়া ঘোষণা করিয়াছেন যে, ডারবান দাঙ্গার পূর্ণ দায়িত্ব শ্বেতাঙ্গদের। তাঁহার মতে দক্ষিণ আফ্রিকার মালান সরকার ভারতীয় উৎসাদনের জন্য বদ্ধপরিকর।

[illegible] কেনিয়ার পুলিস ও সৈন্যদল যে নিষ্ক্রিয় ছিল তাহা নহে, লরী লরী পেট্রোল প্রভৃতি সরবরাহ করিয়া হাঙ্গামাকারী আফ্রিকাবাসীদিগকে সাহায্য করা হয়। ইহার অন্ত পর্য্যন্ত সম্ভব হইল না। ইহার পরও কি ভারতীয় গভর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে কোন কঠোর কার্য্যপন্থা স্থির করিবেন না?

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

খ্যাতনামা অর্থনীতিজ্ঞ ও ভারতবর্ষের লেখক অধ্যাপক প্রকাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই বৎসর এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

হইতে অর্থনীতি বিজ্ঞানে 'ডক্টর অফ্ ফিলজফি' উপাধি লাভ করিয়াছেন। মিল-শ্রমিকদের গৃহ ও অন্যান্য নানাবিধ আর্থিক সমস্যা সম্বন্ধে তাঁহার গবেষণা খুব ভাল হইয়াছে। তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী ছাত্র ও গবেষক ছিলেন। তিনি ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত ঢেউখালী নিবাসী। ডক্টর বন্দ্যোপাধ্যায় কিছুদিন যুক্তপ্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের অর্থনৈতিক 'রিসার্চ ডেপুটেশনে' ছিলেন। সেই সময় গবর্ণমেণ্টের নিকট তিনি কাণপুরের মিল-শ্রমিকদের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে তাঁহার যে সুবৃহৎ রিপোর্ট দাখিল করেন, তাহা খুব আদৃত হইয়াছে।

নেতাজীর মহাজাতি সদন—

গত ২৪শে জানুয়ারী পশ্চিম বাঙ্গালার আইন-সচিব শ্রীনীহারেন্দু দত্ত মজুমদার মহাশয়ের চেষ্টায় বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে 'মহাজাতি সদন বিল' পাস হইয়াছে। ফলে ১১ জন সদস্য লইয়া গঠিত বোর্ড মহাজাতি সদন গৃহের ভার গ্রহণ করিয়া তাহা সম্পূর্ণ করিবেন ও তাহাকে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর উপযুক্ত স্মৃতি সৌধে পরিণত করিবেন। সে জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেণ্ট ও কলিকাতা কর্পোরেশন প্রদান করিবেন। গৃহটি সম্পূর্ণ হইলে তথায় প্রকাণ্ড বক্তৃতা হল, লাইব্রেরী, প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির কার্য্যালয় প্রভৃতি স্থাপিত হইবে। ১৯৪১ সালের ২৬শে জানুয়ারী সুভাষচন্দ্র কলিকাতা হইতে অদৃশ্য হইয়াছিলেন। ৮ বৎসর পরে পশ্চিম বঙ্গ সরকার তাঁহার আরব্ধ কার্য্য সম্পূর্ণ করার ব্যবস্থা করায় দেশবাসীমাত্রেই আনন্দিত হইবেন।

আচার্য্য শ্রীযদুনাথ সরকার—

খ্যাতনামা শিক্ষাব্রতী ও ঐতিহাসিক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব ভাইস-চ্যান্সেলার আচার্য্য শ্রীযদুনাথ সরকারের বয়স ৭৮ বৎসর পূর্ণ হওয়ায় গত ৬ই ফেব্রুয়ারী কলিকাতায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পক্ষ হইতে তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছে। পশ্চিম বঙ্গের শিক্ষা সচিব রায় শ্রীহরেন্দ্রনাথ চৌধুরী সে উৎসবে পৌরোহিত্য করেন। আচার্য্য যদুনাথ শেষ জীবনে দীর্ঘকাল ধরিয়া পরিষদের সেবা করিতেছেন ও পরিষদের উন্নতির জন্য বিবিধ চেষ্টা করিয়াছেন। আচার্য্য যদুনাথের দানে বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য সমৃদ্ধ হইয়াছে। তাঁহার এই সম্বর্দ্ধনা উপলক্ষে বঙ্গবাসী মাত্রই তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছে।

মূক ও বধিরদের শিক্ষা—

বাঙ্গালা দেশে অপ্রাপ্তবয়স্ক কালা ও বোবা বালক-বালিকার সংখ্যা প্রায় ৫ হাজার। তন্মধ্যে মাত্র ২৫০ জন কলিকাতা আপার সার্কুলার রোডস্থ মূক-বধির বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করিয়া থাকে। গত ৩১শে জানুয়ারী উক্ত বিদ্যালয়ের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ উৎসবে সভাপতির

করিতে যাইয়া মন্ত্রী শ্রীযুত ভূপতি মজুমদার মূক ও বধিরদের শিক্ষা বিস্তারের জন্য বাঙ্গালার ধনীদিগকে অকাতরে অর্থদান করিতে আবেদন করিয়াছেন। তাহারাও যে উপযুক্ত শিক্ষা পাইলে উপযুক্ত ও কার্য্যক্ষম নাগরিক হইতে পারে, তাহা বিদ্যালয়টি পরিদর্শন করিলেই বুঝিতে পারা যায়। আমরা এ বিষয়ে দেশের সহৃদয় ধনীবৃন্দের ও সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

ভাষা হিসাবে প্রদেশ বিভাগ—

ভারতীয় 'যুক্তরাষ্ট্রের ডেপুটী' প্রধান মন্ত্রী সর্দ্দার বল্লভভাই পেটেলের চেষ্টায় ভারতের সকল স্থানের দেশীয় রাজ্যগুলি যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। তাহার ফলে যুক্তরাষ্ট্র সকল দিক দিয়া লাভবান হইতেছে। রাষ্ট্রের আয়তন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে লোক সংখ্যা, কাঁচা মাল, খনিজ পদার্থ, সৈন্য সংখ্যা প্রভৃতি সকলই বাড়িয়া যাইতেছে। যুক্তরাষ্ট্রের কর্ত্তৃপক্ষ দেশীয় রাজ্যগুলি পাইয়া সে সকল স্থানের উন্নতি বিধানে সকল প্রকার চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছেন।—উড়িষ্যাপ্রদেশে বহু ছোট ছোট দেশীয় রাজ্য ছিল—সেগুলিতে এতকাল শিক্ষা বিস্তার, শিল্পপ্রতিষ্ঠা, কৃষি বা সেচের ব্যবস্থা প্রভৃতি ভাল ছিল না। সেগুলি পাইয়া উড়িষ্যা প্রদেশের মন্ত্রীরা ঐ সকল উন্নতি বিধানে বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটি দারুণ সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে। বিভিন্ন ভাষা-ভাষী বহু স্থান একত্র হওয়ার ফলে শাসনকার্য্যের অসুবিধা হওয়া স্বাভাবিক। এ সময়ে ভাষার হিসাবে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রদেশগুলির পুনর্গঠনের ব্যবস্থা করা বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। আমরা এই ব্যবস্থা যাহাতে সত্বর হয়, সে জন্য কেন্দ্রীয় কর্ত্তৃপক্ষকে অবহিত হইতে অনুরোধ করি। বাঙ্গালা-বিহার সীমান্ত-সমস্যার মত, বাঙ্গালা-আসাম ও বাঙ্গালা-উড়িষ্যা সীমান্ত-সমস্যাও আলোচিত হওয়া প্রয়োজন। জোর করিয়া সেরাইকেলা ও খরসোয়ান রাজ্য দুইটিকে বিহারের অন্তর্গত করা হইয়াছে এবং ময়ূরভঞ্জ রাজ্যকে উড়িষ্যার অন্তর্গত করা হইবে। ঐ সকল রাজ্যে বঙ্গভাষাভাষী লোকই অধিক বাস করে। ওদিকে কুচবিহার ও ত্রিপুরা রাজ্য যাহাতে পশ্চিম বাঙ্গালার অন্তর্ভুক্ত করা হয়, সে জন্য ব্যবস্থা ও প্রয়োজন। বাসগৃহের জন্য স্থান নাই—কৃষি প্রভৃতির জন্য ভূমি নাই-ই। এ অবস্থায় পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আগত বাস্তুহারাদের কথা কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টকে বিশেষ ভাবে বিবেচনা করিয়া তাহাদের সমস্যা সমাধানে অবহিত করা পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রীদের বিশেষ কর্ত্তব্য বলিয়া আমরা মনে করি।

আসাম গৌহাটী বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদের নব প্রতিষ্ঠিত বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রতীক চিহ্নের দরুণ সর্ব্বভারতীয় শিল্পীগণের নিকট একটি পরিকল্পনার আহ্বান জানান। আমেদাবাদ প্রবাসী চিত্র-শিল্পী শ্রীত্রিপুরেশ্বর মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক পরিকল্পিত এই নক্সাখানিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া কর্ত্তৃপক্ষগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইয়াছে।

শিল্পী শ্রীত্রিপুরেশ্বর মুখোপাধ্যায়

কলিকাতায় মৌলানা আজাদ—

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষামন্ত্রী

কলিকাতায় আসিয়া বহু প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ কার্য্যপন্থা স্থির করিয়া গিয়াছেন—তন্মধ্যে (১) ন্যাশানাল লাইব্রেরী—পূর্ব্বে ইহার নাম ছিল ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী (২) ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম (৩) ভিক্টোরিয়া স্মৃতি সৌধ (৪) নৃতত্ত্ব বিভাগ ও (৫) বাঙ্গালার রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটী অন্যতম। ন্যাশানাল লাইব্রেরী বর্ত্তমানে আলিপুরে বেল-ভেডিয়ার প্রাসাদে স্থানান্তরিত হওয়ায় তথায় স্থানাভাব নাই। ট্রাম ও বাসে পাঠকদের তথায় যাতায়াতের সুবিধা হইয়াছে। রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটী এক শত বৎসরের পুরাতন প্রতিষ্ঠান—অর্থাভাবে যাহাতে তাহার উন্নতি ব্যাহত না হয়, সে বিষয়ে চেষ্টা করা হইবে। ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম ও নৃতত্ত্ব বিভাগেও অর্থদান করিয়া তাহাদের উন্নতির ব্যবস্থা করা হইবে। ভিক্টোরিয়া স্মৃতিসৌধও যাহাতে জনহিতকর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয় মৌলানা আজাদ সে বিষয়ে নূতন পরিকল্পনার ব্যবস্থা করিবেন। এই প্রতিষ্ঠানগুলি কলিকাতার গৌরবের জিনিষ। আজাদ সাহেব এগুলির রক্ষায় মনোযোগী হইয়া বাঙ্গালীর প্রকৃত উপকারের চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বহু বৎসর নিজে কলিকাতার অধিবাসী ছিলেন। কাজেই কলিকাতার গৌরব বৃদ্ধিতে তাঁহার আগ্রহ স্বাভাবিক।

মহেন্দ্র জয়ন্তী—

অধ্যাপক ডক্টর শ্রীমহেন্দ্রনাথ সরকার আন্তর্জ্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন দার্শনিক। তাঁহার ৬১ তম জন্মদিন উপলক্ষে শীঘ্রই 'মহেন্দ্র জয়ন্তী' নামে এক উৎসব উদ্যাপিত হইবে। ঐ উপলক্ষে ৩ খানি গ্রন্থ প্রকাশ করা হইবে এবং ১৯৪৯ সালের জুন মাস হইতে ১৯৫০ সালের মে মাস পর্য্যন্ত ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন বিষয়ে ১২ মাসে ১২টি বক্তৃতা ভারতীয় খ্যাতিমান দার্শনিকদের দ্বারা প্রদত্ত হইবে। ঐ কার্য্যের জন্য ২০ হাজার টাকা প্রয়োজন। কলিকাতা ছোট আদালতের জজ ডক্টর শ্রীমতিলাল দাশ ও ব্যারিষ্টার শ্রীঅবনীকান্ত ভট্টাচার্য্যকে সম্পাদক করিয়া ঐ কার্য্যের জন্য একটি কমিটী গঠিত হইয়াছে। কলিকাতা ছোট আদালতের উকীল শ্রীযুক্ত চাঁদমোহন চক্রবর্ত্তী কমিটীর কোষাধ্যক্ষ। আমাদের বিশ্বাস জাতীয় সংস্কৃতির আলোচনা ও সঙ্গে সঙ্গে এক সুধী ব্যক্তির সম্বর্দ্ধনার জন্য অর্থের অভাব

শিল্পী শ্রীদেবীপ্রসাদ—

মাদ্রাজে নিখিল ভারত খাদি, স্বদেশী ও শিল্প প্রদর্শনীর ১৯৪৮-৪৯ সালের ললিত কলা-বিভাগের পুরস্কার বিতরণ উৎসবে সম্প্রতি মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলের প্রিন্সিপাল খ্যাতনামা শিল্পী শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী সভাপতি হইয়া পুরস্কার বিতরণ করিয়াছেন জানিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। শিল্পীর পক্ষে এই সম্মান লাভ অভিনব। এই উৎসবে সভাপতিরূপে শিল্পী দেবীপ্রসাদ যে অভিভাষণ পাঠ করিয়াছেন, তাহাতে তিনি স্বাধীন ভারতে শিল্প চর্চ্চার স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন। জাতির সমগ্র উন্নতি বিধান ও শিল্পীদিগকে উৎসাহ দান যে অবশ্য কর্ত্তব্য আজ রাষ্ট্র-পরিচালকগণকে তাহা বুঝিতে হইবে।

ভারতে শিক্ষার ব্যয়—

শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আবুল কালাম আজাদের মতে ভারতবর্ষে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার যে দারুণ অভাব আছে, তাহা দূর করিতে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হওয়া দরকার, প্রকৃতপক্ষে সে অনুপাতে কিছুই হয় না। গত বৎসর কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয়ের বরাদ্দ ছিল ৩৯৫ কোটী টাকা; শিক্ষা বাবদে খরচ হয় ৩৭৫ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ শতকরা মাত্র এক টাকা। সকল প্রাদেশিক সরকারের সম্মিলিত ব্যয়ের বরাদ্দ ছিল ২৪৭ কোটী টাকা, তন্মধ্যে শিক্ষাবিভাগগুলি পাইয়াছে ৩০৫ লক্ষ টাকা। সারা ভারতবর্ষে শিক্ষা বিষয়ক সমস্ত ব্যয় শতকরা পাঁচ টাকা মাত্র। শাসন-বিভাগের ব্যয় যে অনুপাতে বাড়িয়াছে সে অনুপাতে শিক্ষার ব্যয় কিছুই বাড়ে নাই।

ভারত সরকারের শিক্ষানীতি—

ভারতের শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আবুল কালাম আজাদ সম্প্রতি এক বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে অর্থাভাবের অজুহাতে সার্ব্বজনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষানীতি প্রয়োগ বিষয়ে, একান্ত অসম্ভব না হইলে একদিনও বিলম্ব করা হইবে না। সাধারণতন্ত্র হিসাবে সমস্ত জাতিকে দৃঢ়-ভিত্তির উপর গড়িয়া তুলিবার ইহাই একমাত্র পথ। সারা ভারতবর্ষে বাধ্যতামূলক শিক্ষানীতি প্রয়োগ করিতে ষোলো বৎসরের অধিক সময়ক্ষেপ হওয়া উচিত নয়। এ সকল সৎকথা শুনিতে শুনিতে আমরা এতই অভ্যস্ত হইয়া

ইচ্ছা হয় না। প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষকে জাতিসঙ্ঘের মধ্যে উপযুক্ত স্থান গ্রহণ করিতে হইলে সাধারণের মধ্যে শিক্ষার প্রবর্ত্তন হওয়া দরকার। কিন্তু কি কাজ পরিকল্পনামত ভবিষ্যতে সাধিত হইবে, তাহার বিবরণ অপেক্ষা, যাহা হইয়া গিয়াছে তাহার বিবরণ দিলে লোকে সুখী হয়। আশা করা শিক্ষামন্ত্রীর বাণী সফল হইবে।

শিক্ষার ব্যয়—ইংলণ্ড ও আমেরিকা—

ইংলণ্ডে গভর্ণমেণ্টের বাৎসরিক ২৯৭ কোটী ৫৬ লক্ষ ৭৯ হাজার পাউণ্ড ব্যয় ধরা হইয়া থাকে। তন্মধ্যে শিক্ষার জন্য ২১ কোটী ৪৮ লক্ষ ৯৬ হাজার টাকা খরচ হয়। ইহাতে খরচ শতকরা ৭ পাউণ্ড হিসাবে দাঁড়ায়। স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠানগুলি আরও শতকরা ৪ পাউণ্ড দেয়; অর্থাৎ দেশের সমস্ত ব্যয়ের শতকরা ১১ ভাগ শিক্ষা বিস্তারেখরচ হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে সেখানে ব্যয় শতকরা পাঁচভাগ মাত্র। আমেরিকায় শিক্ষা বিভাগের ব্যয় ১২০ কোটী ৫ লক্ষ ডলার (ডলার প্রায় ৩॥০ টাকা); সেখানে সকল খাতে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের খরচ ৪০০০ কোটী ডলার ধরা হয়। এই হিসাবে ইংলণ্ড তাহার পাঁচ কোটী অধিবাসীর জন্য ৩০ কোটী পাউণ্ড, আমেরিকা তাহার ১৪ কোটী অধিবাসীর জন্য ১২০ কোটী ডলার ব্যয় করিতেছে। এখন ধরিতে হয়, ঐ সকল দেশে শতকরা ৯৯ জন শিক্ষিত, আর আমাদের দেশে শতকরা ১৬ জন মাত্র লিখিতে পড়িতে পারে। এ দেশে শিক্ষার ব্যয় সেই অনুপাতে কিরূপ হওয়া দরকার তাহা দেশবাসী বিচার করিয়া দেখিবেন।

পাকিস্তানে মূর্ত্তি পূজার অবসান—

গত ৩০শে জানুয়ারী ভারতীয় ইউনিয়নের হাই কমিশনাররূপে শ্রী শ্রীপ্রকাশ করাচীতে মহাত্মা গান্ধীর মূর্ত্তির পাদমূলে শ্রদ্ধার্ঘ্য মাল্য প্রদান করিবার অনুমতি চাহিলে পাকিস্তান সরকার তাহা নামঞ্জুর করেন। ইহার কারণ হিসাবে বলা হইয়াছে, ইহা মূর্ত্তি পূজা সুতরাং পাকিস্ মুসলমান রাজ্যে তাহা চলিবে না। সম্প্রতি গুজব পৌ যাইতেছিল, পূর্ব্ব পাকিস্তানে ক্রমেই হিন্দুর পূজায় ধী ধীরে বাধা সৃষ্টি করা হইতেছে। সবটা বিশ্বাস হয় নাই কিন্তু ভারতীয় প্রতিনিধির দুর্দ্দশা দেখিয়া মনে হয়, আম যাহা শুনিয়াছি, তাহাতে সত্যতা আছে। প্রতিনিয় পত্রিকা মারফত দেখা যায় যে পাকিস্তানে সংখ্যা সম্প্রদায়ের প্রতি ব্যবহার কেবল ন্যায়ানুমোদিত (just) হইবে তাহা নহে, তাহা সদয় ব্যবহারের পর্য্যায়ভু (generous) হইবে। যে নমুনা পাওয়া যাইতে তাহাতে মনে হয় সকলে মুসলমান হইয়া গেলে 'jus অথবা "generous" ব্যবহার পাওয়া যাইবে। কিন্তু তখন আর সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সমস্যা থাকিবে না।

পাকিস্তানে বাঙ্গালা ভাষা সংস্কার—

পূর্ব্ব পাকিস্তানে সকল অধিবাসীর ভাষা এক সুতরাং সেখানে ভাষা সংস্কারের উদ্দেশ্য রাজনৈতিক, অ কিছু নয়। যাঁহারা মনে করেন, বাঙ্গালা ভাষায় অধি পরিমাণে উর্দ্দু শব্দ প্রচলিত করিলে পূর্ব্ব পাকিস্তানে বাঙ্গালী, পাঞ্জাবী, সিন্ধী, বালুচি বা পুস্তো ভাষায় অভ্য হইবে, তাঁহারা নিতান্ত ভ্রান্ত। এই প্রচেষ্টায় দুইটী ক্ষতি হইবে তাহার হিসাব লওয়া হইয়াছে কিনা জানি না সম্ভবতঃ হইয়াছে এবং সেই কারণেই এই অবস্থা অবলম্ব করা হইয়াছে। প্রথম, যাঁহারা বাধ্য হইয়া পূর্ব্ব পাকিস্তানে এখনও পড়িয়া আছেন, তাঁহারা এই ভাষা সংস্কারের চেষ্টায় চিরকালের বাসভূমি ত্যাগ করিয়া আসিবে। তা সংস্কারের জন্য নয়, ভবিষ্যৎ অনর্থের আশঙ্কায়। দ্বিতীয় সেখানে বাঙ্গালা ভাষা একটী "খিচুড়ী" অবস্থা প্রা হইবে। তাহা সাধারণ বাঙ্গালীতে বুঝিবে না, আর বুঝিবে না পাকিস্তানে অপরাপর অংশের অধিবাসীরা কিন্তু এ সকল বিচার করিবার লোক নাই।

খেলা ধুলা

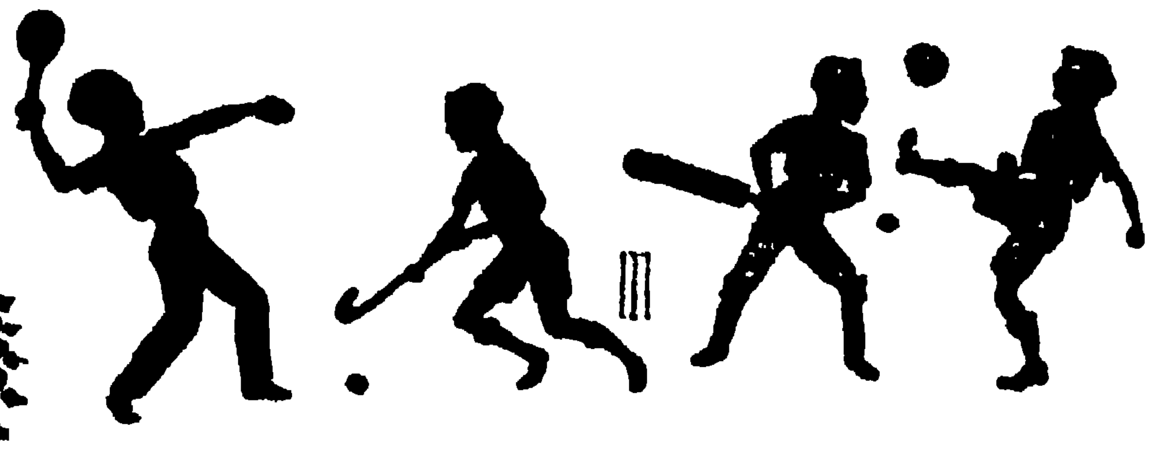

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

৺সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

মানব সভ্যতার প্রস্তর যুগে মানুষ পাথরের বিবিধ অস্ত্র আবিষ্কার ক'রে জীবজন্তু শিকার, পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ বিগ্রহ এবং শত্রুর আক্রমণে আত্মরক্ষার কাজে সেগুলি ব্যবহার করতো। এই সব অস্ত্রাদি চালনার মধ্যে বর্শা নিক্ষেপ একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল। পরবর্ত্তীকালে আগ্নেয়াস্ত্র আবিষ্কারের ফলে শিকার, যুদ্ধবিগ্রহ এবং আত্ম-রক্ষার ক্ষেত্রে পুরাতন অস্ত্রাদির ব্যবহার ক্রমশঃ কমে যায়। কিন্তু মানুষের জীবনে তাদের ব্যবহার একেবারে লোপ পায়নি। অতি প্রাচীন সময় থেকে বর্শার ব্যবহার খেলা-ধুলার মধ্যে ব্যাপকভাবে বিদ্যমান আছে। গ্রীসের প্রাচীন অলিম্পিক গেমসে বর্শা নিক্ষেপ অর্থাৎ 'জাভেলিন থ্রো' (Javeline Throw) একটি বিশেষ আকর্ষণীয় খেলা হিসাবে গণ্য হয়েছিল। দেশের যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে যাতে রাজকীয় সামরিক বাহিনীতে যোগদানের আগ্রহ বৃদ্ধি পায় সেই উদ্দেশ্যেই খেলাধুলায় তীর ও বর্শা নিক্ষেপ অনুষ্ঠানকে বিশেষ স্থান দেওয়া হয়েছিল। বিগত দিনের ইতিহাসে দেখা গেছে, যখনই অন্য কোন খেলার আকর্ষণ এবং জনপ্রিয়তা তীর নিক্ষেপ খেলাকে ম্লান ক'রে দিতে অগ্রসর হয়েছে তখনই রাজকীয় তীরন্দাজ বাহিনীর স্বার্থের খাতিরে সেই খেলাকে বে-আইনী ক'রে রাজাজ্ঞা ঘোষণা করা হয়েছে।

প্রাচীনকালের দেশরক্ষা বাহিনীতে তীর-ধনুক ঢাল তলোয়ার এবং বর্শাই ছিল অমোঘ অস্ত্র।

দেহের অঙ্গচালনায় মানুষ আনন্দ উপলব্ধি করে এবং সেই সঙ্গে শক্তি সঞ্চয় করে। পৃথিবীতে জীব জন্তু, প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং রোগের আক্রমণ থেকে বেঁচে থাকতে হ'লে মানুষের জীবনে প্রচুর নির্দোষ আনন্দ এবং দৈহিক শক্তির প্রয়োজন। খেলাধূলার মধ্যেই আমরা এই দু'টি লাভ করতে পারি এবং খেলাধূলায় সাফল্যলাভের উপায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে খেলাধুলার অনুশীলন করা। এলোমেলো খেলায় আনন্দ কম, দর্শক এবং খেলোয়াড়দের আকর্ষণ কম। সুতরাং

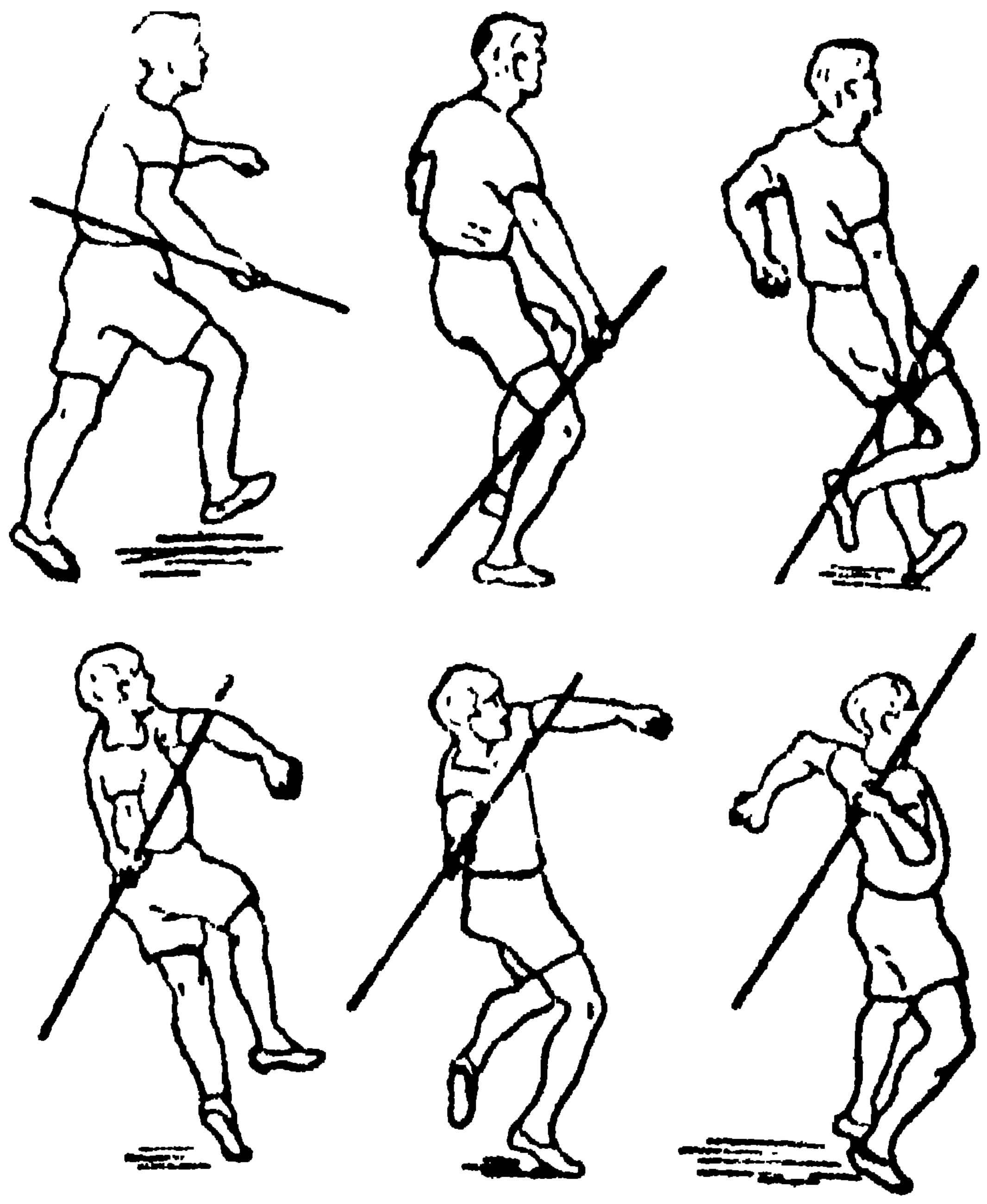

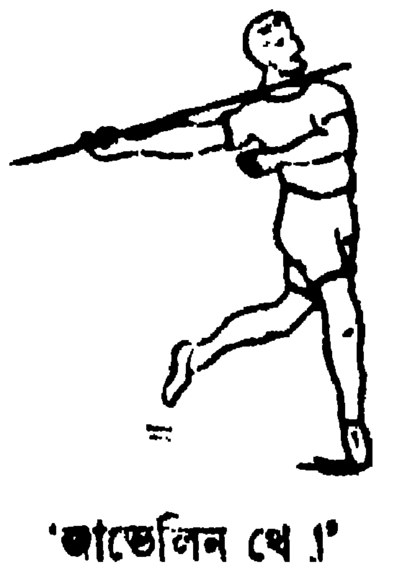

'জাভেলিন থ্রো'

খেলাধূলার উদ্দেশ্য এখানে ব্যর্থ হতে বাধ্য। আমাদের আলোচ্য বিষয় 'জাভেলিন থ্রো' অর্থাৎ বর্শা নিক্ষেপ আধুনিক কালের স্পোর্টসের একটি আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান। বর্শাটি

নিক্ষেপের উপরই খেলোয়াড়ের সাফল্য নির্ভর করে। এর জন্য হাতের জোর দরকার কিন্তু কেবলমাত্র খুব জোর দিয়ে বর্শাটি নিক্ষেপ করলেই বর্শাটি অধিক দূর পথ অতিক্রম করবে এমন কথা জোর করে বলা যায় না। যে হাত দিয়ে বর্শাটি নিক্ষেপ করা হবে সেই হাতটির চালনার উপর সমস্ত সাফল্য নির্ভর করছে। হাতটি খুব বেশী জোরে শূন্যে নিক্ষেপ করলে শক্তির অপব্যয় হবে, ফলে বর্শাটি বেশী দূরে পৌঁছবে না। এমন ভাবে হাতটি চালনা করতে হবে যাতে অযথা শক্তির অপব্যয় না হয়, সম্পূর্ণভাবে বর্শাটি দূরে নিক্ষেপের কাজে সাহায্য করে। দুই হাত-পা, কোমর, মাথা চালনার এবং দেহের ভারকেন্দ্রের উপরই বর্শা নিক্ষেপের সাফল্য নির্ভর করে, কেবলমাত্র হাতের জোরে নয়। বর্শাটি প্রকৃতপক্ষে যেখান থেকে নিক্ষেপ করতে হবে তার সীমানা নির্দিষ্ট করা থাকে। সেই সীমানায় স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে বর্শাটি নিক্ষেপ করলে বেশী দূর অতিক্রম করা যায় না। সেই স্থান থেকে বেশ দূরে গিয়ে দৌড় আরম্ভ করতে হবে এবং নির্দিষ্ট সীমানায় পৌঁছেই বর্শাটি নিক্ষেপ করলে বেশী পথ বর্শাটি অতিক্রম করে। দৌড় আরম্ভ এবং নির্দিষ্ট সীমানায় পৌঁছে বর্শাটি নিক্ষেপের পূর্ব্বে এবং পরে খেলোয়াড়ের দেহের ভঙ্গিমার যে বিবিধ পরিবর্ত্তন হয় সেগুলি লক্ষ্য রেখে খেলোয়াড়দের অনুশীলন করতে হবে। খেলোয়াড়দের লক্ষ্য রাখতে হবে, বর্শাটি যেন তার মাথার সোজাসুজি উপরে নিক্ষেপ না করা যায়। মনে রাখতে হবে উপরের উচ্চতা অতিক্রমের জন্য সে বর্শা নিক্ষেপ করছে না, মাটির দূর পথ অতিক্রমই তার উদ্দেশ্য। শূন্যে বর্শাটি ছুটে গিয়ে যে স্থানে প্রথম মাটি স্পর্শ করবে, —বর্শা নিক্ষেপের নির্দিষ্ট সীমানা থেকে সেই বর্শা বিদ্ধ স্থানই হবে তার সাফল্যের নিদর্শন। বর্শাটি হাত দিয়ে ধরা, বর্শাটি হাতে নিয়ে দৌড়ান এবং নির্দিষ্ট সীমানায় পৌঁছেই সঙ্গে সঙ্গে বর্শাটি নিক্ষেপ এবং নিক্ষেপের পর শরীরের অবস্থান বিশেষ লক্ষ্যণীয়। এই সঙ্গে জ্যাভেলিন নিক্ষেপের কয়েকটি দর্শনীয় চিত্র দেওয়া হ'ল খেলোয়াড়দের অনুশীলনের জন্য।

রোহিণ্টন বেরিয়া ট্রফি ঃ

এই বছরের আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ফাইনালে বোম্বাই দল এক ইনিংস ও ১২৬ রাণে ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে পরাজিত ক'রে রোহিণ্টন বেরিয়া ট্রফি বিজয়ী হয়েছে। এই নিয়ে বোম্বাই দল উপর্য্যুপরি ছয়বার উক্ত ট্রফি বিজয়ের সম্মান লাভ করলো।

ফলাফল ঃ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় : ৮৯ ও ১০১

বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় : ৩১৬

বোম্বাই দলের জি রাম চাঁদ উভয় দলের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ ১১০ রাণ করেন। এস পি গুপ্ত ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ম ইনিংসে ১৬ রাণে ৪টি উইকেট এবং ২য় ইনিংসে খেলায় ৪২ রাণে ৪টি উইকেট পান। এ ছাড়া ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ইনিংসের খেলায় বোম্বাই দলের (ইনামীর ৩৮ রাণে ৫টি উইকেট পাওয়া বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

পূর্ব্ববর্ত্তী বিজয়ী দল ঃ

১৯৩৫-৩৬—পাঞ্জাব	১৯৪৩-৪৪—পাঞ্জাব
১৯৩৬-৩৭— ঐ	১৯৪৪-৪৫—বোম্বাই
১৯৩৭-৩৮— ঐ	১৯৪৫-৪৬— ঐ
১৯৩৮-৩৯—বোম্বাই	১৯৪৬-৪৭— ঐ
১৯৩৯-৪০— ঐ	১৯৪৭-৪৮— ঐ
১৯৪০-৪১— ঐ	১৯৪৮-৪৯— ঐ
১৯৪১-৪২— ঐ	১৯৪৯— ঐ
১৯৪২-৪৩— ঐ	

রঞ্জি ট্রফি ঃ

বোম্বাই বনাম বাঙ্গলা ঃ

বোম্বাই : ৫৭৪ (৮ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। কে সি ইব্রাহিম ১১৩, এম মন্ত্রী ১১৭, পি উমিরগড় ১০০ নট আউট, ইউ মার্চ্চেণ্ট ৫৭, বি ইরাণী ৫৫। গিরিধারী ১৫০ এবং মানকড় ৩৩ রাণে যথাক্রমে ৩টি উইকেট পান) ও ১২৭ (২ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড)

বাঙ্গলা : ২৫১ (এন চাটার্জি ৮২ ; ফাদকার ৬৯ রাণে ৫টি, উমিরগড় ৬২ রাণে ৩টি উইকেট পান) ও ১৩১ (৪ উইকেটে)

বোম্বাই দল প্রথম ইনিংসের রাণে অগ্রগামী থাকায় বিজয়ী হয়।

দিল্লী বনাম বিহার ঃ

বিহার ১৫৩ (এস দাস ৪৯) ও ১৩৬

দিল্লী : ২১২ (ফুলজারাম ৬৭, কিসেন চাঁদ ৫১। বিমল বসু ৪২ রাণে ৭ উইকেট পান) ও ৪৮ (সুটে ব্যানার্জি ২২ রাণে ৬ ও বি বসু ২৫ রাণে ৪ উইকেটে)

বিহার দিল্লীদলকে পরাজিত করে।

বিহার বনাম হোলকার ঃ

বিহার : ১৮৮ (সুধীর দাস ৯৮ নট আউট, সারভাতে ৪২টি রাণে ৬টি উইকেট) ও ১২৮ (সারভাতে ৩৪ রাণে ৪ উইকেট)

হোলকার : ৩২৮ (গিকোয়াদ ১০৯, প্রফেসার কে ভাটনগর ৬৩। সুটে ব্যানার্জি ১১৪ রাণে ৩টি এবং বি বসু ১০৯ রাণে ৬টি উইকেট)

হোলকার ১ ইনিংস ও ১২ রাণে বিহারকে পরাজিত করে।

মহারাষ্ট্র বনাম ইউ পি :

মহারাষ্ট্র : ৩৯৬ (রেগে ৯৩, জোসী ৫৩, দেওধর ৮৩। ইন্দ্রজিৎ ও সিং যথাক্রমে ৩ উইকেট)

ইউ পি: ১৩১ (ধনওয়াদে ৪০ রাণে ৬ উইঃ) ও ৯১ রাণ

মহারাষ্ট্র এক ইনিংস ও ১৭৪রাণে ইউ পিকে পরাজিত করে।

মাদ্রাজ বনাম বোম্বাই :

বোম্বাই : ৪৩৩ (এম মন্ত্রী ১১৬, কারদার ১৩৪ নট আউট, বি ইরাণী ৮১) ও ৪৪ (কোন উইকেট না হারিয়ে)

মাদ্রাজ : ২২৭ (আল্‌ভা ৪৯ রাণ) ও ২৫০ (আল্‌ভা ৫০ নট আউট)

বোম্বাই ১০ উইকেটে মাদ্রাজকে পরাজিত করে।

অল্‌ ইণ্ডিয়া এ্যাথলেটিক্‌ঃ

১৪শ বার্ষিক নিখিল ভারত এ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতা দিল্লীতে মহা আড়ম্বরের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ফলাফলঃ

পুরুষদের : (১ম) পাতিয়ালা—৮৩ পয়েন্ট, (২য়) বোম্বাই—৫৩ (৩য়) দিল্লী—১৮, (৪র্থ) ইষ্ট পাঞ্জাব—১৬, (৫ম) বাঙ্গলা--১৫

মহিলাদের : (১ম) বোম্বাই—৭১, (২য়) দিল্লী—২৩, (৩য়) বাঙ্গলা—৩

পৃথিবীর রেকর্ডঃ

আমেরিকার Mr. Allan Stack সাঁতারের ব্যাক ষ্ট্রোকে ১০০ মিটার দূরত্ব ১মিঃ ৩.৬ সেঃ অতিক্রম ক'রে তাঁর পূর্ব্ব-প্রতিষ্ঠিত অলিম্পিক রেকর্ড ভেঙেছেন। তাঁর পূর্ব্বের রেকর্ড ছিল ১মিঃ ৪সেঃ।

ইংলণ্ডের এক নম্বর স্পোর্টসম্যানঃ

খ্যাতনামা ফুটবল ও ক্রিকেট খেলোয়াড় ডেনিস কম্পটন গত বছরের মত এ বছরও বিপুল ভোটাধিক্যে দ্বিতীয়বার ইংলণ্ডের এক নম্বর স্পোর্টসম্যানের সম্মান লাভ করেছেন। লণ্ডনের 'The Sporting Record' নামক পত্রিকা এই ভোট সংগ্রহের আয়োজন করে।

ফলাফলঃ

১ম—ডেনিস কম্পটন (ক্রিকেট ও ফুটবল খেলোয়াড়) —৩১, ২৯৫ ভোট। ২য়— ফ্রেডী মিলস্‌ (World cruiser weight champion)—২৬, ২১৬ ভোট। ৩য়—মাউরীন গার্ডনার (বৃটনের হার্ডল রেস বিজয়িনী)—৬, ২৫৭

চিত্র কথা

অরোরা ফিল্মের বাঙলা ছবি "বন্ধুর পথ" সম্প্রতি বিভিন্ন চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করিয়াছে। ছবিখানির কাহিনী রচনা করিয়াছেন বিখ্যাত কাহিনীকার শ্রীনিতাই ভট্টাচার্য্য। ছবি পরিচালনা করিয়াছেন শ্রীচিত্ত বসু ও সুর দিয়াছেন পরিতোষ শীল।

"ঘোষ বোষ" "প্রিয় বান্ধবী" প্রভৃতির যশস্বী তরুণ পরিচালক সৌমোন্দ্র মুখোপাধ্যায় নিজস্ব ইউনিট গড়িয়াছেন এবং এই ইউনিট লইয়া তিনি ছেলেমেয়েদের উপযোগী একখানি ফিল্ম তৈয়ারীর ব্যবস্থা করিয়াছেন। ফিল্মের নাম—"খেলাঘর"। খেলাঘরের কাহিনী তিনি নিজে লিখিয়াছেন। কাহিনীর সংলাপ রচনা করিয়াছেন কথাশিল্পী সৌরীন্দ্রমোহন। চিত্রখানিতে সুর সংযোজনা করিবেন তিমিরবরণের শিষ্য-সাথী ও শিশু ধ্রুব চক্রবর্ত্তী।

ফিল্ম ট্রাষ্ট অব ইণ্ডিয়ার নূতন বাঙলা ছবি '৪২'-এর মহরৎ উৎসব টালীগঞ্জ কালী ফিল্মস্‌ ষ্টুডিওতে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও বাঙলার জননায়কদের উপস্থিতিতে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। অনুষ্ঠানে মাননীয় মন্ত্রী শ্রীভূপতি মজুমদার সভাপতিত্ব করেন। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় মন্ত্রী শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ। ১৯৪২-এর আন্দোলনকে কেন্দ্র করিয়া উক্ত ছবিখানি তোলা হইতেছে। হেমন্ত গুপ্ত ছবিখানি পরিচালনা করিতেছেন।

রূপাঞ্জন চিত্র প্রতিষ্ঠানের 'দেবী চৌধুরাণী'র মুক্তি দিবস আসন্নপ্রায়। নাম ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছেন সুমিত্রা দেবী। গানগুলি রচনা করিয়াছেন শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ এবং শ্রীমোহিনী চৌধুরী। যশস্বী প্রয়োগশিল্পী শ্রীপ্রফুল্ল রায় মহাশয়ের নির্দেশে চিত্রখানি গৃহীত হইয়াছে। সুর সংযোজনা করিয়াছেন কালীপদ সেন।

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী প্রণীত উপন্যাস "যুগের হাওয়া"—২৲

মহর্ষি যোগানন্দ প্রণীত "রাজগুহ্যজ্ঞান"—

শ্রীনীলাপদ ভট্টাচার্য্য প্রণীত কাব্যগ্রন্থ "পূজারিণী চন্দ্রাবতী"—১৲

ব্রহ্মচারী পরিমলবন্ধু দাস প্রণীত "শ্রীশ্রীহরিকথা-সুধাকণা"—২৷৹

অশোক সেন প্রণীত উপন্যাস "দুর্গম হ

শ্রীরমেন্দ্রকুমার পাল প্রণীত "রোগীর

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী প্রণীত "রবীন্দ্র নাট্যপ্রবাহ"—৭৷৹

শ্রীক্ষেত্রপাল দাসঘোষ প্রণীত "আমাদের শিক্ষা"—৬৲

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্‌ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্‌ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

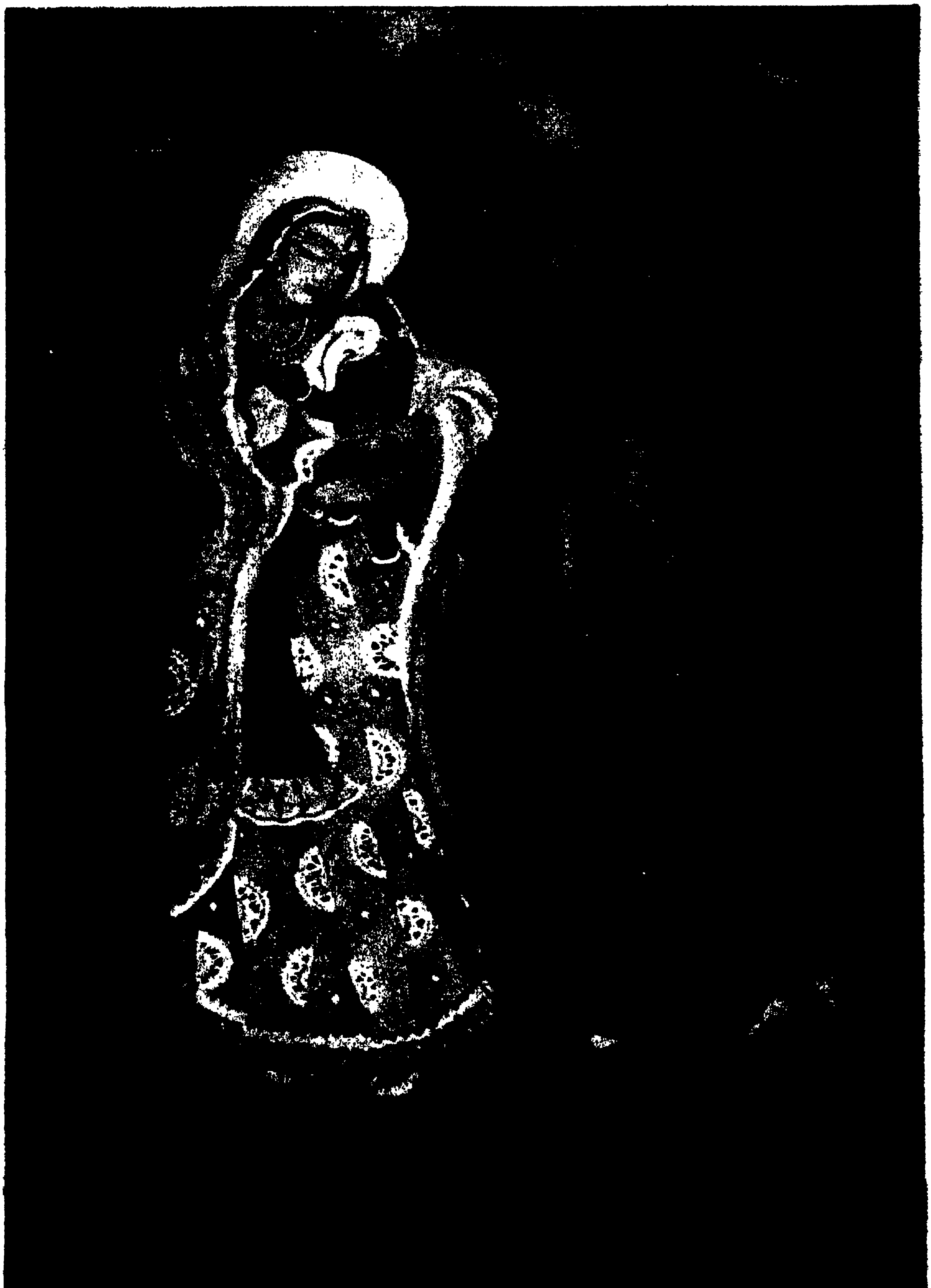

শিল্পী—সতীন্দ্রনাথ লাহা এম-এ. | গণেশ জননী | ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

আর্টের দাম কশাই

আত্ম-বণিক : প্রায় সমস্ত মূর্তি হয়েছে, শিল্পী খানিকটা মাটি চাঁচিয়া লওয়ায় — কর কি, কর কি! গালের দিকটাই যে নামিয়ে নিলে, বামের দিকটাও খেয়াল রেখো।

ভাস্কর :— তাকে চেঁচেই আমি গড়ি।

ভারতবর্ষ

বৈশাখ—১৩৫৬

দ্বিতীয় খণ্ড | ষট্‌ত্রিংশ বর্ষ | পঞ্চম সংখ্যা

গীতায় অহিংসার আদর্শ

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ

প্রথম মহাযুদ্ধের পর বিশ্বব্যাপী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধও যথাকালে শেষ হইয়াছে। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে বিবদমান রাষ্ট্রের অধিনায়কগণ উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছিলেন—জগতে ন্যায় ধর্ম শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য, মানবজাতির কল্যাণ বিধানের জন্যই তাঁহারা যুদ্ধে অবতীর্ণ। মুখে অনেক মহান আদর্শ লইয়া তাঁহারা যুদ্ধ করিলেন। মানুষের তপ্ত রক্তে বসুন্ধরা সিক্ত হইল, কোন দেশ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইল, কোন জাতি হীনবীর্য ও পঙ্গু হইল। যুদ্ধ শেষ হইয়াছে, কিন্তু যুদ্ধের পূর্বে জগতে যে পরিমাণ দুঃখদুর্দ্দশা ছিল এখন তাহা চতুর্গুণ বাড়িয়াছে। শুধু তাই নয়, আবার নূতন করিয়া আর এক ভাবণ সংগ্রামের আয়োজন পূর্ণোদমে চলিতেছে। যুদ্ধ যদি সত্যই আবার আসিয়া পড়ে তবে যুদ্ধক্লান্ত ঘূর্ণমান জগৎ দ্রুতগতিতে মহাধ্বংসের মধ্যে ডুবিয়া যাইবে।

বিশ্বরাজনীতিতে সর্ব্বত্রই স্বার্থপরতার প্রচেষ্টা, সর্ব্বত্রই power-politics। বিশ্বরাজনীতির এই ধ্বংসোন্মুখী গতি দেখিয়া মহাত্মা গান্ধী প্রেম ও অহিংসার মন্ত্র প্রচার করিয়াছিলেন। মহামানব গান্ধীজি গভীরভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে আধ্যাত্মিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত না হইলে মানবজীবনের কোন সমস্যারই সমাধান হইবে না। সমগ্র মানবজাতিকে প্রেমের আদর্শে রূপান্তরিত করিবার এইরূপ ব্যাপক প্রয়াস করিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি মহাপুরুষ। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল—বিশ্বশান্তি, বিশ্বসাম্য, মানবজাতির মধ্যে হিংসা দ্বন্দ্বের চিরাবসান। কিন্তু এই মহান লক্ষ্যে পৌছিবার যে পথ তিনি দেখাইয়াছিলেন, কার্যতঃ দেখা গেল জগতের বর্ত্তমান অবস্থায় সে পথ ধরিয়া সে লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হওয়া যায় না—প্রমাণ তাঁহার

লোকদের মৃত্যু, আততায়ীর হাতে মহামানবের মহা-পরিনির্বাণ।

মানুষ যতই সভ্যতার উচ্চস্তরে উঠিয়াছে ততই সে দেশের আদর্শ, সাম্য মৈত্রীর পথ গ্রহণ করিয়াছে। সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বর্বর প্রথাগুলির মত যুদ্ধও পৃথিবী হইতে লোপ পাওয়া উচিত। তাহা না হইলে আদিম মানুষ ও বিংশ শতাব্দীর মানুষের প্রভেদ কোথায়? কার্যতঃ দেখা যাইতেছে তাহা হয় নাই। বুদ্ধি ও মেধার দিক দিয়া মানুষ যেরূপ উন্নত হইয়াছে, ধর্ম ও নীতির দিক দিয়া তদনুপাতে উন্নত হয় নাই, বরং অসভ্য আদিম যুগের তুলনায় এখন মানুষের বুদ্ধি তীক্ষ্ণতর হওয়াতে তাহার নিষ্ঠুরতা সহস্রগুণে বাড়িয়াছে। মানুষের অতি উন্নত বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি যেভাবে ধ্বংসযজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছে তাহা দেখিয়া মানবজাতি বলির পশুর ন্যায় কাঁপিতেছে। সভ্য মানুষের প্রকৃতি যে কিরূপ ভয়ঙ্কর, তাহা হিরোশিমার মহা-ধ্বংসে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

পৃথিবী হইতে যুদ্ধ বিগ্রহ উঠিয়া যাক, হিংসার পরিবর্তে সাম্য মৈত্রীর রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হউক—এ সকল কথা আদর্শ হিসাবে অতি উচ্চ হইলেও বর্তমান বাস্তব জগতে অচল। এরূপ উচ্চ আদর্শ গ্রহণের জন্য এই [illegible] জগৎ এখনও প্রস্তুত হয় নাই। অহিংসা মহৎ জিনিষ, কিন্তু সত্য আরও মহান। হিংসার দ্বারা হিংসার প্রতিরোধ করা যায়, বলের দ্বারা বলের প্রতিরোধ করা যায়, অন্ততঃ সাময়িকভাবে—ইহা পরীক্ষিত সত্য। অহিংসার দ্বারা হিংস্র পশুবলের প্রতিরোধ করা যায়—তাহা ব্যাপকভাবে আজও প্রমাণিত হয় নাই। দুই চারিজন মহাপুরুষের জীবনে এই সত্য পরীক্ষিত হইলেও সাধারণ মানুষের পক্ষে, মনুষ্য সমাজ ও রাষ্ট্রের পক্ষে এখনও ইহা সত্য হইয়া উঠে নাই। প্রেম বা অহিংসার আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য একজন খৃষ্ট বা গান্ধী পশুবলের নিকট হাসিমুখে আত্মবলি দিতে পারেন, কিন্তু একটা জাতি বা রাষ্ট্র কিরূপে তাহা করিবে?

আত্মরক্ষার প্রধান উপায় বলপ্রয়োগ—এই সত্যকে অস্বীকার করিয়া লাভ নাই। শক্তিহীন অহিংসা ব্যর্থ। দুর্বল ও নির্বীর্যেরাই এইরূপ তামসিক অহিংসার আশ্রয় লয়। অহিংসা মন্ত্র জপ করিলে পিশাচের হৃদয় প্রেমে দ্রবীভূত হয় না। আততায়ীর অত্যাচারের সম্মুখে অস্ত্রত্যাগ করিলে ধ্বংস বা দানবের দাসত্ব স্বীকার অনিবার্য। প্রেম, অহিংসা—হৃদয়ের উচ্চতার এবং নীতির দিক দিয়া সমর্থনযোগ্য। আবার যে উচ্চভাবের প্রেরণায় মহাপ্রাণ মানব—সমাজস্থিতির জন্য, দেশের মঙ্গলের জন্য, দশজন আততায়ীকে বিনাশ করিয়া শতসহস্র লোকের প্রাণরক্ষা করে তাহাও ঠিক সমানভাবেই সমর্থন করা যায়। সাধ্য থাকিতে যে অসহায়কে আততায়ীর অত্যাচার হইতে রক্ষা না করে সে পাপই করে। সুতরাং নীতির বিচারে হিংসাও যেমন পাপ অহিংসাও তেমনি পাপ। প্রেম, তিতীক্ষা যেমন মানবপ্রকৃতির অংশ, কাম ক্রোধ হিংসা প্রভৃতি বৃত্তিগুলিও উহার অংশ। বংশ বিস্তার, আত্মরক্ষা, জাতির অভ্যুদয়ের জন্য উভয় প্রকার বৃত্তির প্রয়োজন—ইহাদের সুসঙ্গত সামঞ্জস্য সাধনই মানব সভ্যতার আদর্শ। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কি ভাবে এই উভয়প্রকার বৃত্তির সমন্বয় করিয়াছেন, তাহা আমরা যথাসাধ্য বুঝিবার চেষ্টা করিব।

প্রশ্ন এই—মানুষ কি সম্পূর্ণভাবে হিংসা ত্যাগ করিয়া সার্বভৌম অহিংসার আদর্শের দ্বারা জীবন গঠিত করিবে? বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে দেশরক্ষা, সমাজ রক্ষা—সমস্তই কি প্রেম মৈত্রী অহিংসার দ্বারা জগতের বর্তমান অবস্থায় সম্ভব? খৃষ্টান ধর্ম প্রেমের ধর্ম—তবে কেন খ্রীষ্টান ইউরোপ আজ হিংসার প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে? অহিংসা ও প্রেমের দ্বারা হায়দ্রাবাদে রাজাকারদের নিষ্ঠুর অত্যাচার কি থামিয়াছিল? মাসের পর মাস ধরিয়া নৃশংস রাজাকারদের প্রশ্রয়দাতা নিজামের সহিত অহিংস আপোষ আলোচনায় কি কোন সুফল হইয়াছিল? অহিংসার দ্বারা যদি দানবের হৃদয় জয় করা সম্ভব হইত তাহা হইলে হানাদারদের তাড়াইবার জন্য কাশ্মীরে ভারতীয় সৈন্য পাঠাইবার কি প্রয়োজন হইত? ১৯৪৬ সালের ১৬।১৭ই আগষ্ট কলিকাতার মত সহরের উপর প্রকাশ্য রাজপথে দিবালোকে দুর্বৃত্তেরা নিরপরাধ অসহায় নরনারীশিশুকে নির্বিচারে হত্যা করিল, দোকানপাট লুঠ করিল, গৃহস্থালী ধ্বংস করিল, বস্তীতে আগুন দিল, ছিন্ন নারীমুণ্ড লৌহশলাকায় গাঁথিয়া রাজপথে পৈশাচিক নৃত্য করিল—পুলিশ মিলিটারী দাঁড়াইয়া দেখিল, বাধা

দিল না—তখন নির্যাতিতের দল আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্র ধারণ করিল—ইহা কি অপরাধ? আততায়ীর অমানুষিক অত্যাচারে আক্রান্ত হইলেও অস্ত্র ধারণ করিবে না, প্রতিহিংসার আশ্রয় লইবে না, অত্যাচার সহ্য করিবে, বরং বিষ খাইয়া জীবন বিসর্জ্জন দিবে—এই শিক্ষা কি আমরা গীতায় পাই?

গীতা কোথায়ও হিংসার সমর্থন করেন নাই, স্পষ্টভাবেই সর্ব্বভূতের হিতসাধন করিবার উপদেশ দিয়া বলিয়াছেন—

নির্ব্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব।

সর্ব্বভূতের প্রতি যে দ্বেষ-রহিত সেই আমাকে পায়। অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এবচ—যে জীব হিংসা করে না, যে সকলের মিত্র, সকলের প্রতি দয়াবান সেই আমার প্রিয়। অপরদিকে মোহগ্রস্ত অর্জ্জুনের চিত্র দেখুন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে রথীন্দ্র অর্জ্জুন আততায়ীর অত্যাচার প্রতিরোধ করিতে বিমুখ হইয়া বলিলেন—আমি যুদ্ধ করিব না। এ যুদ্ধ সংঘটিত হইলে যাহাদের জন্য আমরা রাজ্য চাই তাহারা কেহই জীবিত থাকিবে না—আত্মীয়স্বজন—সকলেই যদি যুদ্ধে মরিয়া যায় কাহাকে লইয়া তবে রাজ্যভোগ করিব, যুদ্ধ করিব কিসের আশায়? হায়! আমি কি মহাপাপই না করিতে উদ্যত হইয়াছি—রাজ্যসুখের লোভে আমি স্বজন বান্ধবকে হত্যা করিতে যাইতেছি। নিরস্ত্র পাইয়া ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ এখনই যদি আমাকে বিনাশ করে তবে আমার সকল জ্বালা জুড়ায়। জীব-হিংসা পাপ—তাহার উপর রাজ্যলোভে গুরুজন হত্যা মহা পাপ। ভিক্ষা করিয়া জীবন যাপন করিতে হয় সেও ভাল তবুও আমি পিতামহ আর গুরু বধ করিয়া বিজয় চাহি না। নিষ্কণ্টক সমৃদ্ধ রাজ্য বা স্বর্গ রাজ্য পাইলেও যে আমার ইন্দ্রিয় শোষণকারী শোকের আগুন নিভিবে এমন আমার বোধ হইতেছে না। এ যুদ্ধের ফলে আত্মীয় স্বজন নিহত হইবে, কুলক্ষয় হইবে, কুলধর্ম লোপ পাইবে, বর্ণ সঙ্করের উদ্ভব হইবে, পিতৃপুরুষগণ লুপ্ত পিণ্ডোদকক্রিয় হইয়া নরকে যাইবেন। যে যুদ্ধের আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত কোথাও এতটুকু মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই, কেমন করিয়া আমি সে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব? অর্জ্জুনের দেহ অবশ, মন লক্ষ্যহারা, বুদ্ধি বিপর্য্যস্ত হইল, তিনি রথের উপর বসিয়া পড়িলেন—

অর্জ্জুনকে যুদ্ধ করিতে বিমুখ দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ কঠোর কণ্ঠে বলিলেন—অর্জ্জুন, এ তোমার মহত্ত্ব নয়—ক্লৈব্য। তুমি কাপুরুষ হইও না। তোমার মত ক্ষত্রিয়ের পক্ষে কাপুরুষতা নিতান্তই অশোভন। ইহা হৃদয়ের উচ্চভাব নহে—হৃদয়ের দুর্ব্বলতা। হৃদয়ের এই ক্ষুদ্র দুর্ব্বলতা পরিত্যাগ কর। দুর্ব্বল তুমি হইতেই পার না, কারণ তুমি যে পরন্তপ। অধর্ম্মের অত্যাচারে নিপীড়িত পাণ্ডবের দল তোমাকে ডাকিয়া বলিতেছে, তুমিই তাহাদের শক্তিমান পুরুষ, তাহাদের একমাত্র অবলম্বন। এ সঙ্কটে তাহাদিগকে নিরাশ্রয় করিও না। শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন—তোমার সিদ্ধান্ত অনার্য্যোচিত। ইহার ফলে তুমি স্বর্গলাভে বঞ্চিত হইবে, কলঙ্কভাগী হইবে। এ যুদ্ধ না করিলে তোমার এতকালের খ্যাতি কাপুরুষতার কলঙ্কে মলিন হইবে—তোমার মত বীরের পক্ষে সে যে মৃত্যুরও অধিক গ্লানিজনক। যে দুর্নীতিপরায়ণ রাজা ও তাহার সহকর্মিগণের অত্যাচারের ফলে পাণ্ডবগণের লাঞ্ছনা, সমাজের দুর্গতি, ধর্ম্মের গ্লানি, মহাভারতের জাতীয় জীবনে স্পষ্ট অধোগতি—তাহা তুমি কেমন করিয়া ভুলিলে? এই সঙ্কটকালে এমন মোহ কেমন করিয়া তোমাকে আচ্ছন্ন করিল? ক্ষত্রিয় তুমি, ধর্ম্মযুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের শাস্ত্রীয় কর্ত্তব্য। অতএব যুদ্ধ করিতে কৃতনিশ্চয় হওয়াই বর্ত্তমান অবস্থায় তোমার একমাত্র কর্ত্তব্য।

তস্মাৎ ত্বমুত্তিষ্ঠ যশোলভস্ব
জিত্বা শত্রূন্—ভুঙ্ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্।

হে রথীন্দ্র, হে মানব, তুমি উঠ, শত্রুগণকে পরাজিত করিয়া যশ লাভ কর, ধনধান্যে ভরা এই বসুন্ধরা ভোগ কর।

শুধু যে অর্জ্জুনকে বলা হইতেছে—আসুরিক মানবের অত্যাচার প্রতিরোধ কর, তাহাকে ধ্বংস কর, পাপের প্রশ্রয় দিলে মনুষ্য সমাজ বাসের অযোগ্য হয়, রাষ্ট্রে শৃঙ্খলা থাকে না, তাহা নয়, শ্রীভগবান নিজে বলিতেছেন—দুষ্টজনকে বিনাশ করিবার জন্যই যুগে যুগে মানুষের রূপ ধরিয়া আমি পৃথিবীতে অবতীর্ণ হই। বিশ্বরূপে দেখা যায় ছিন্ন নরমুণ্ড শ্রীভগবানের মুখবিবরে দন্তের প্রচণ্ড পেষণে চূর্ণিত হইতেছে। শ্রীভগবান বলিতেছেন—অর্জ্জুন, আমি এখন লোকক্ষয়কারী মহাকাল। আমার বজ্ররূপে

উল্লিখিত পরস্পরবিরোধী উক্তি দেখিয়া মনে হইতে পারে, গীতায় বুঝি আত্ম-বিরোধ রহিয়াছে। শ্রীভগবান একবার বলিতেছেন—অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং, আবার বলিতেছেন—ত্বং জহি—তুমি হত্যা কর, মা-ব্যথিষ্ঠা—ব্যথিত হইও না, যুধ্যস্ব জেতাসি রণে সপত্নান্—যুদ্ধ কর, যুদ্ধে শত্রুদিগকে জয় করিতে হইবে। এই দুই প্রকার উক্তির সামঞ্জস্য কোথায়? গীতার শিক্ষাকে বিচ্ছিন্ন ভাবে দেখিলেই মনে হয় কোন অংশের সহিত অপর অংশের বিরোধ আছে, কিন্তু সমগ্রভাবে দেখিলে বুঝা যায় গীতার শিক্ষায় কোথারও অসঙ্গতি নাই। গীতার মত মহাগ্রন্থে কোন অসামঞ্জস্য থাকিতে পারে না।

সংসারে খাইয়া পরিয়া বাঁচিয়া থাকিতে হইলে সম্পূর্ণ-রূপে অহিংস হওয়া কি সম্ভব? প্রতি নিঃশ্বাসে মানুষ অগণিত জীব ধ্বংস করিতেছে। নরদেহকে সবল কর্মক্ষম রাখিতে হইলে আমিষ খাদ্যের প্রয়োজন। নিরামিষ আহারেও প্রাণবধ হয়, কারণ বৃক্ষলতাগুল্মেরও প্রাণ আছে। বিশ্বপ্রকৃতির দিকে চাহিয়া দেখ—সেখানে ধ্বংসের ভিতর দিয়াই নিত্য নূতন সৃষ্টিপ্রবাহ চলিতেছে। আত্মরক্ষার জন্য বিষধর সর্প বিনাশ করাই বিধি। হিংস্র ব্যাঘ্র যখন গ্রামে আসিয়া উপদ্রব করে,সমাজরক্ষার জন্য তখন তাহাকে হত্যাই করিতে হয়। পার্থিব মানবজীবনকে সমৃদ্ধ করিতে যে হিংসার প্রয়োজন এমন হিংসাকে গীতা পাপ বলিয়া গণ্য করেন নাই। হিংসা অতিক্রম করা যখন অসম্ভব, নির্ব্বিশেষ অহিংসাকে সার্বভৌম ব্রতরূপে গ্রহণ করা মানুষের কর্ত্তব্য হইতে পারে না, সাধারণভাবে এই শিক্ষাই আমরা গীতা হইতে পাই।

হিংসা বা অহিংসা দেশকালপাত্র বিশেষে সমর্থনযোগ্য হইলেও এ সকল বাহ্যনীতির দ্বারা মূল সমস্যার সমাধান হয় না। গীতার সিদ্ধান্ত অতি গভীর এবং গীতা চরম সমাধানই দিয়াছেন। আততায়ীর অত্যাচার দমন করিতে গিয়া মানুষ অস্ত্রের অপব্যবহার করে এবং শেষে সংযম হারাইয়া অস্ত্রের অধীন যন্ত্র হয়; অত্যাচারীর প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষে মন বিষাক্ত হইয়া পড়ে। তাই আজ কি করিয়া ব্যক্তিগত বা জাতিগত স্বার্থের অভিসন্ধি না রাখিয়া একটা সামগ্রিক কল্যাণবোধের ইচ্ছা লইয়া পাশবিক অত্যাচার নিবারণের ... সেই কৌশল শিখিতে হইবে। গীতায় শ্রীভগবান কর্ম্মে সেই কৌশলের সন্ধান দিয়াছেন। হিংসা বা অহিংসা বলিতে গীতা বাহিরের কোন কর্ম বুঝেন নাই—মনের ভাব বুঝিয়াছেন। অহংভাবের প্রেরণায়, ব্যক্তিগত বাসনা কামনার বশে যে হিংসা তাহাই বর্জ্জন করিতে হইবে, কারণ এরূপ হিংসা মানুষের আত্ম-বিকাশে বিঘ্ন ঘটায়। সর্ব্বভূতের হিতসাধনই গীতার সুস্পষ্ট উপদেশ। কিন্তু ইহার অর্থ এই নহে যে প্রয়োজন হইলে অত্যাচারের প্রতিরোধ করিবে না, অন্যায়ের নিকট আত্মসমর্পণ করিবে। প্রতিকার করিবে ব্যক্তিগত বাসনা কামনা স্বার্থের বশে নহে, হিংসার প্রেরণায় নহে, বৈরভাবে নহে—বুদ্ধিবিচারের সহায়ে কর্ত্তব্যের প্রেরণায়। এ বিষয়ে গীতার ভাষা স্পষ্ট—

যস্য নাহংকৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাপি স ইমাঁল্লোকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে॥

কিন্তু ইহাতেও প্রশ্নের চরম সমাধান হয় না, কারণ কোন্ কর্ম আমার কর্তব্য এবং কোনটা অকর্তব্য তাহা বুঝিব কেমন করিয়া? হায়দ্রাবাদে রাজাকাররা হিন্দু নিধনকেই পরম কর্তব্য বলিয়া বুঝিয়াছিল। কর্তব্য-বোধেই মার্কিণরা হিরোশিমা ভস্মস্তূপে পরিণত করিয়াছিল। কর্তব্যবোধেই তৃতীয় পাণ্ডব স্বজন গুরু হত্যা করিতে বিমুখ হইয়াছিলেন। গীতাতে শেষের দৃষ্টান্তই লওয়া হইয়াছে। গীতার সমাধান বলা যাইতেছে। কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে প্রথম অবস্থায় আমাদের মন বুদ্ধির উপরই নির্ভর করিতে হয়, সমাজের প্রচলিত আদর্শ, বহুদর্শী স্বজন-বান্ধবের পরামর্শ, শাস্ত্রের বিধি নিষেধ মানিয়া কর্ত্তব্য নির্ণয় করিতে হয়; কিন্তু এই সকল বাহ্য বিধিনিষেধের দ্বারা কর্তব্যাকর্তব্যের চরম মীমাংসা হয় না। মন বুদ্ধির যুক্তিতর্ক করিয়া মানুষ কখনও চরমসত্যে পৌঁছিতে পারে না, কারণ মানবীয় মনবুদ্ধির শক্তি সীমাবদ্ধ। তাহার উপর আমাদের ব্যক্তিগত বাসনাকামনা সকল মনবুদ্ধিকে স্বপক্ষে, নিজের দিকে টানিয়া স্বীয় বাসনা তৃপ্তির পথে চালিত করে এবং যুক্তিতর্ক দেখাইয়া নিজের অজ্ঞ মনবুদ্ধির যুক্তিতর্ক দ্বারা কর্তব্যাকর্তব্য স্থির করিতে যাইলে সঙ্কট মুহূর্তে অর্জুনের ন্যায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইতে হয়।

সাধন, ক্রিয়ায় ভগবানের প্রেরণা লাভ করা। ভাগবত প্রেরণা কি করিয়া লাভ করা যায় তাঁহারই সাধনা গীতায় শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে উপদেশ করিয়াছেন।

অন্তরের মাঝে ভগবানের বাণী শুনিতে হইলে অন্তরকে শুদ্ধ করিতে হয়, কারণ কামনা-কলুষিত আধারে সে পবিত্র বাণী শোনা যায় না। অন্তর শুদ্ধ না হইলে অহংভাবের বাসনা-কামনার প্রেরণাকেই আমরা ভগবানের বাণী বলিয়া ভুল করিব। আধার শুদ্ধির প্রথম উপায়—কোন কর্ম অহংবুদ্ধিতে বাসনার বশে না করিয়া ভগবানের সেবার জন্ম ভগবানের উদ্দেশে যজ্ঞ হিসাবে সম্পাদন করা, কর্মের ফলাফলে বিচলিত না হওয়া এবং ভগবানের নিকট একান্তভাবে আত্মসমর্পণ করা। যতক্ষণ মানুষের মধ্যে অহংভাব আছে, কামনা বাসনা আসক্তি আছে ততক্ষণ কর্তব্যাকর্তব্যের চরম মীমাংসা হয় না। কিন্তু অজ্ঞান অহংকার, বাসনা অতিক্রম করা অতি কঠিন। অর্জ্জুনের ন্যায় যাহারা হৃদিস্থিত হৃষীকেশের শরণাগত কেবল তাহারাই এই দৈবী মায়া অতিক্রম করিতে পারে। অহংভাব বাসনা হইতে মুক্ত হইলে অন্তরে ভগবানের প্রেরণা অবাধে কার্য্য করিতে থাকে, ভাগবত শক্তি তখন সাধকের দেহ মন বুদ্ধিকে যন্ত্ররূপে ব্যবহার করিয়া সকল কর্তব্য নির্ণয় করিয়া দেয়। সে জন্ম শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্।

যখন আমরা বাসনা কামনার অধীনতা হইতে এবং এ সকলের মূল—অহংভাব হইতে মুক্ত হইব, মূল সত্তায় ভগবানের সহিত এবং সর্ব্বভূতের সহিত একত্ব উপলব্ধি করিব তখনই ভগবানের ইচ্ছার সহিত আমাদের ইচ্ছা এক হইবে, কেবল তখনই আমাদের দেহ মন বুদ্ধি ভগবানের ইচ্ছা সম্পাদনের নির্ম্মল যন্ত্র হইবে। কিন্তু ইহা সহজে হয় না, ইহা সময়-সাপেক্ষ, ইহার জন্ম অনেক সাধনার প্রয়োজন। যতদিন মানুষ এই চরম সত্যে না পৌছিবে, যতদিন মানুষ সাক্ষাৎভাবে ভগবানের সহিত যুক্ত না হইবে ততদিন তাহাকে কোন আংশিক সত্য স্বীকার করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে—অহংভাবের ক্ষুদ্র স্বার্থকে কোন প্রসারিত স্বার্থের, কোন মহত্তর বিষয়ের অধীন করিয়া দিতে হইবে। অভাবের তাড়না হইতে মুক্ত হইয়া আত্ম-বিকাশের সুযোগ পায় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে—আত্ম-প্রগতির পথে অগ্রসর হইবার জন্ম অনুকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি করিতে হইবে। কেবল উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার পরিবর্তন করিলেই আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্র গঠিত হইবে না। কল কারখানার সাহায্যে মানুষ যে মানুষকে শোষণ করিতেছে, বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষ যে মানুষকে নির্ম্মমভাবে হত্যা করিতেছে, ইহা কল-কারখানা বা বিজ্ঞানের দোষ নয়, ইহা মানব প্রকৃতির দোষ। মনুষ্য স্বভাবে যে অহংভাব, স্বার্থপরতা, লোভ, প্রাধান্য-লিপ্সা রহিয়াছে তাহাই বিজ্ঞানের অপব্যবহার করিতেছে। মানব প্রকৃতি উন্নত না হইলে, মনুষ্য স্বভাবের রূপান্তর না ঘটিলে আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন হইতেই পারে না।

দুষ্টের দমন করিবার জন্ম ভগবান যুগে যুগে অবতীর্ণ হন। দুষ্কৃতকে বিনাশ করিলেই যে তাহার অনিষ্ট করা হয় তাহা নহে। অত্যাচারীকে হত্যা করিয়া যদি তাহাকে পাপ হইতে নিবৃত্ত করা যায় তবে অধ্যাত্ম জীবন বিকাশের দিক দিয়া তাহার কল্যাণই করা হয়। ভগবান এই ভাব লইয়াই দুষ্কৃতগণের বিনাশ করেন। কোন জীবের প্রতি ভগবানের হিংসা নাই, পক্ষপাতিত্ব নাই, সকলের প্রতি তাঁহার সমভাব—সমোহহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ। একদিকে তিনি ধ্বংসরূপী মহাকাল, অন্যদিকে তিনিই আবার সর্ব্বভূতের সুহৃদ, সকলের আশ্রয়, গতি, ভর্ত্তা। পার্থ-সারথি সকলেরই দেহ-রথের চির-সারথি, আড়ালে লুকাইয়া থাকিয়া তিনিই মানুষকে জীবন পরিচালিত করিতেছেন। মানুষের সকল কর্মের দিয়া তাঁহারই ইচ্ছা পূর্ণ হইতেছে। তাঁহার দিকে অগ্রসর হইবার জন্ম ভগবান জন্মে জন্মে মানুষকে সুযোগ দিতেছেন। তাঁহার প্রবর্ত্তিত ব্যবস্থা কোন্ পথ দিয়া কাহাকে কোথায় লইয়া যায় আমরা তাহা জানি না। বাসনাসক্ত জীবকে কি ভাবে সংশোধন করিয়া উর্দ্ধের চৈতন্যে আনিতে হয় তাহা একমাত্র তিনিই জানেন। ধ্বংসের ভিতর দিয়া, শোক তাপ তীব্র দহনের ভিতর দিয়া, অগণিত জন্ম-মৃত্যু প্রবাহের মধ্য দিয়া তিনি সকলকেই অমৃতত্বের পরম শান্তি ও আনন্দের দিকে লইয়া যাইতেছেন। অপার করুণা

নুরুর মা

অধ্যাপক শ্রীমণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল

…দ্দীন মিঞার বয়েস কম হলেও রাজমিস্ত্রীর সূক্ষ্ম কাজে তার হাত খুব ভালো। জাফ্‌রী ঢালাই ও নক্সার কাজ সে খুব ভালোই পারে, বাড়ীর প্ল্যান দেখে সেই হিসেবে ভিত কাটা থেকে আরম্ভ করে মেঝে ও ছাত ঢালাইয়ের সেণ্টারিং করা পর্য্যন্ত সমস্ত কাজেই সে খুব দক্ষ, কেবল রোদ্দুরে ভারায় দাঁড়িয়ে কাজ করতে সে ভালো পারে না। লোকটির বয়েস মাত্র আঠারো কি উনিশ, পাৎলা চেহারা, কালো রঙ, কোঁকড়া চুল, মুখে তার সর্ব্বদাই অমায়িক হাসি লেগে আছে। হাত-পাগুলি বেশ পরিষ্কার করে রাখে, কথা বলে কম, চোখের দৃষ্টিতে বেশ গভীর অথচ উদার চাউনি। কাজে বেশ মন:আছে, ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা সে আদৌ করে না।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নরেনবাবুর বালিগঞ্জের নতুন বাড়ীতে সে কাজে লেগেছে। অধ্যাপক নরেন্দ্রনাথ গম্ভীর প্রকৃতির ধর্ম্মপ্রাণ লোক, নিজের মধ্যেই নিজে তিনি সর্ব্বদা মগ্ন হয়ে থাকেন, বেশী ভীড় ও গোলমাল তিনি মোটেই পছন্দ করেন না। প্রথম জীবনে তিনি ঢাকা ইণ্টারমিডিয়েট কলেজে অধ্যাপনা করতেন, তারপর জীবনের অনেক ঝড় ঝঞ্ঝা পার হয়ে কলকাতার এক কলেজে এসে সামান্য মাইনের অধ্যাপনা করতে সুরু করেন। দিন কতক পরে ডক্টরেট পাশ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপনা করবার সুযোগ পান। তদবধি তিনি শান্তিপূর্ণ ভাবেই দিন কাটাচ্ছেন, জীবনের অধিকাংশ দিন পার করে এবে তিনি বালিগঞ্জে কিছু জমি কিনে নিজের মত ছোট একটি বাড়ী করবার ব্যবস্থা করেছেন।

নরেনবাবুর পারিবারিক জীবন বড়ই দুঃখের। একদা …র স্ত্রী ও শিশুপুত্র নগেনকে নিয়ে তিনি ঢাকায় ছিলেন …ব আনন্দে। দিনগুলো পাঁজীর পাতার ওপোর দিয়ে …ন যে অজ্ঞাতে পার হয়ে যেত তার কোন সংবাদই …নি রাখতেন না। পঠন ও পাঠনের মধ্য দিয়ে, স্ত্রীর …বা ও প্রেমের অকৃত্রিম পরিবেশে অসংখ্য পরিচিত ও কর্ম্মীদের এড়িয়ে গিয়ে তিনি নিতান্তই 'ঘরকুনো'ভাবেই দিন কাটাতেন। দিনগুলো তিনি রেখেছিলেন শিক্ষার আনন্দে বিভোর করে, সন্ধ্যার পর থেকে সস্ত্রীক সঙ্গীত ও গল্পগুজবের বিমল আনন্দে পৃথিবীকে ভুলেই থাকতেন। এই আনন্দময় জীবনে কিন্তু এসেছিল এক প্রবল ঝড়। সে হোল আজ থেকে প্রায় বিশ বছর আগে।

সেটা ছিল শীতকাল। কলেজ থেকে যথারীতি বাড়ী ফিরে নরেনবাবু স্নান-আহ্নিক সেরে নিয়ে রান্নাঘরে পিঁড়ের ওপোর বসে চায়ের বাটীতে চুমুক দিচ্ছেন, এমন সময় স্ত্রী মনোরমা আস্তে আস্তে বল্লেন 'দেখ আজ একটা বড় মুস্কিল হয়েছে, আমার কিন্তু বড় ভয় করছে।'

চায়ের বাটী থেকে মুখ তুলে নরেনবাবু স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে বল্লেন, 'আজ আবার হোল' কি, কোন আরসুলা এসে গায়ে বসেছে না কি?'

গম্ভীরভাবে স্ত্রী বল্লেন, 'না ওসব তামাসা নয়, দুটো মুসলমান ছোক্‌রা আজ কদিন ধরে দুপুরে আমাদের বাড়ীর আশে পাশে ঘোরে, আর আমার দিকে চেয়ে চেয়ে হাসে, আজ ওদের মধ্যে একটা ছোঁড়া আমাকে দেখে বড় কুৎসিত একটা ইঙ্গিত করলে। আমি তাড়াতাড়ি জানালা বন্ধ করে দিলুম, কিন্তু সে দেখি দলা পাকিয়ে একটা কাগজ ফেলে দিয়ে গেল আমাদের উঠোনে, এই দেখ।'

একটা দলা পাকানো কাগজ নিয়ে মনোরমা নরেনবাবুর হাতে তুলে দিলেন। নরেনবাবু কাগজখানা সবটা পড়ে নিয়ে একটা অবজ্ঞার হাসি হেসে বল্লেন, ও কিছু নয়।

ভীত ও সঙ্কুচিত মনোরমা বল্লেন, 'কিন্তু আমার বড় ভয় হয়। ঐ দুবছরের ছোট একটা ছেলে নিয়ে দুপুরে একলা থাকি, রামের মাও—কে তার এক বোন আছে তার কাছে চলে যায়, আমি কিন্তু এ বড় ভালো বুঝি না, তার চেয়ে বরং কিছুদিনের জন্যে আমি চলে যাই।'

তাচ্ছিল্যের সুরে নরেনবাবু বল্লেন, 'পাগল নাকি? কাকে কান নিয়ে যাবে বলে ভয় দেখালে কানটা কেটে যদি বাক্সে বন্ধ করে রাখ্‌তে চাও ত রাখ্‌তে পারো, আমি কিন্তু পালিয়ে যাবার কোন যুক্তিই দেখি না'।

মনোরমা অবিশ্বাস করতে পারলে না, তবে সেদিন কিন্তু প্রাত্যহিক সঙ্গীতের চর্চা একেবারেই জমলো না।

রাত্রির আহার শেষ করে নরেনবাবু বুঝলেন, মনোরমা কিছুতেই শান্তি পাচ্ছে না, রামের মাকে ডেকে বল্লেন, 'রামের মা, দুপুর বেলা তুমি কি বাড়ী থাকো না?'

রামের মা এদেশী ঝি, এ বাড়ীতে তার রাতদিনই থাকবার কথা, কিন্তু সে দুপুরে মাঝে মাঝে পালায়। বল্লে, 'না বাবু, আমি ত রোজই থাকি, তবে আমার বোন্‌পোটা রোগে ভুগছে, তাই এক একদিন দুপুরে তাকে দেখতে যাই, এই যা।'

নরেনবাবু বল্লেন, 'দেখ রামের মা, এটা আমাদের বিদেশ, দুপুরে তোমার দিদিমণি একলা থাকেন সেজন্তে তুমি তার কাছে থাকবে, বুঝলে। তাকে একলা রেখে তুমি কোথাও যেও না। তবে আমি যেদিন বাড়ীতে থাকবো, সেদিন তুমি বেরুতে পারো।

মনোরমার ভয় কিন্তু তবুও কাটলো না। শোবার ঘরে দরজা বন্ধ করে শোবার আগে নরেনবাবু স্ত্রীর ভীত অবস্থা লক্ষ্য করে রসিকতা করে বল্লেন, 'তোমার আবার ভয় কিসের, দু দু'টো ছেলে রয়েছে তোমার, কে সে মুসলমান ছোকরা, যে তোমার অনিষ্ট করতে আসবে?'

'দুটো ছেলে।' মনোরমা প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে নরেনবাবুর মুখের দিকে চাইলেন।

'দুটোই ত, বড়ছেলে নগেন, আর ছোটছেলে নীরেন'।

'তার মানে?'

'মানে নগেন ত ঐ শুয়ে আছে তোমারই পাশে, আর তোমার পেটে যেটা আছে সেও ছেলেই হবে, আর ওর নাম রাখতে হবে নীরেন্দ্রনাথ।

সলজ্জ দৃষ্টিতে মনোরমা স্বামীর দিকে চেয়ে বল্লেন, 'এতদূর?'

নিশ্চয়, সব ভেবে কাজ করতে হয়। এই দেখ না কেন, আমার যে এত বই রয়েছে, সমস্ত বইয়ের ওপরে লেখা আছে এন্ এন্ ব্যানার্জী, এতে নরেন্দ্রনাথ, নগেন্দ্রনাথ এবং এর পরে যে ছেলে হবে তার নাম নীরেন্দ্রনাথ রাখলে সবই হবে এন্ এন্ ব্যানার্জী। তারপর বাড়ী একখানা করতেই হবে, তার দরজায় লেখা থাকবে এন্ এন্ ব্যানার্জী, আর টেলিফোন নিলে তাতেও নাম দেব এন্ এন্ ব্যানার্জী, এতে কত সুবিধে হবে তা জানো।

'তাহলে তোমাদের তিনজনকেই প্রফেসার হতে হবে, যাতে করে প্রফেসার এন্ এন্ ব্যানার্জী বল্লে তিনজনকেই বুঝায়।' বেশ একটু হাল্কা মনে মনোরমা উত্তর করলেন।

নরেনবাবু বল্লেন—না, আমি প্রফেসার, নগেন হবে ডাক্তার, আর তোমার সমাগত নীরেন হবে ইঞ্জিনীয়ার। তুমি জানো না, ওকে ইঞ্জিনীয়ার করতে চাই বলেই ত সে আসার সঙ্গে সঙ্গেই আমি ইঞ্জিনীয়ারিংএর বই পড়ে সেই সব গল্প তোমায় শোনাই, সেই সব ছবি তোমায় দেখাই।'

'হয়েছে হয়েছে, আগে থেকে অত হিসেবে আর দরকার নেই'।

কৃত্রিম কোপ দেখিয়ে মনোরমা স্বামীকে শাসিয়ে দিয়েছিলেন। সে আজ থেকে প্রায় বিশ বছর আগে।

কিন্তু মানুষের সব সুখ অমানুষে হরণ করে, দেবতার স্বর্গে দৈত্যরা দেয় হানা!

একদিন দুপুরে নরেনবাবু যখন বাড়ীতে ছিলেন না এবং রামের মা যখন বোনপোকে দেখবার নাম করে চলে গিয়েছিল, তখন হঠাৎ নরেনবাবুর বাসায় মোটর ডাকাতী হয়ে গেল। পাড়ায় লোক জড়ো হওয়ার পূর্ব্বেই ডাকাতরা নিজেদের কাজ সেরে সরে পড়ে। সামনের বাসায় পুরুষ কেউ ছিল না, মেয়েরা নাকি জানলার ফাঁক দিয়ে দেখেছে, দুজন মুসলমান ছোকরা মনোরমাকে জোর করে চেপে ধরে তার মুখে কাপড় গুঁজে দিয়ে মোটরে তুলে নিয়ে পালিয়ে গেল, গাড়ীর নম্বর তারা দেখেছিল, কিন্তু পরে দেখা গেল সেটা এক ভদ্রলোকের গাড়ী, রাস্তা থেকে সেই দিনই চুরী হয়েছে এবং সন্ধ্যের পর গাড়ীখানা ভাঙ্গা অবস্থায় নারায়ণগঞ্জের পথে এক ক্ষেতের ধারে পাওয়া গিয়েছিলো।

কলেজ থেকে বিপদের খবর পেয়ে ছুটতে ছুটতে বাড়ীতে ফিরে নরেনবাবু দেখলেন, বাড়ী ফাঁকা, দুবছরের নগেনকে সামনের বাড়ীতে ওরা নিয়ে গিয়েছিলো, নগেন এসে বাবার পাশে চুপটি করে দাঁড়ালো, যেন সে সমস্তই বুঝতে পেরেছে। চোখে তার জল নেই, মুখটি শুষ্ক।

রামের মা তখনও ফেরে নি এবং পরেও সে ফিরলো না। পুলিস এসে তাকে অনেক খোঁজাখুঁজি করলে, অনেকের ওপোর অনেক সন্দেহ করা হোল', অনেক অনুসন্ধান হোল', শেষে নরেনবাবু অতিষ্ঠ হয়ে পড়লেন, তিনমাসের ছুটী নিয়ে নগেনের হাত ধরে দেশে গেলেন মনোরমাকে ভুলতে।

তারপর তিনি আর ঢাকায় ফেরেন নি। কেবলই মনে হয় মনোরমাকে আগে থেকে পাঠিয়ে দিলেই ভালো হোত, কিন্তু যা হয় নি, তা নিয়ে আর দুঃখ করে লাভ কি। একে একে ছুটীর তিনমাস পার হয়ে গেল। নগেনকে মামার বাড়ী রেখে তিনি আবার ঢাকায় ফেরবার আয়োজন করলেন, কিন্তু রওনা হওয়ার দিন এলো তাঁর প্রবল জ্বর। যাওয়া হোল' না। জ্বরের ঘোরে কেবলই মনে হয় মনোরমা এসে তাঁকে অনুনয় করে বলছে, না না তুমি আর সেই রাক্ষুসে জায়গায় যাবে না, কিছুতেই না। আমি সে জায়গা ছেড়ে, দেশ ছেড়ে পৃথিবী ছেড়ে যেখানে এসেছি, সেখানে ভালোই আছি, আমি তোমায় দেখছি, তোমার কাছে এসে বস্‌ছি, তোমার নীরেন আমার কাছেই আছে, কিন্তু তুমি আমার নগেনকে নিয়ে অন্য যেখানে খুসি তা' থাকো, কিন্তু ঐ রাক্ষসদের দেশে আর যেও না, যেও না।

শেষে নরেনবাবু নিজে না গিয়ে কলেজের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিলেন এক চাকরীর ইস্তফাপত্র।

কুড়ি বছর পূর্ব্বে তাঁর জীবনের ওপোর এমনি এক প্রচণ্ড ঝড় এসে তাঁর সমস্ত ফুলবাগান মুচ্‌ড়ে ভেঙ্গে দিয়ে গিয়েছিলো।

দুই

নগেন বড় হয়েছে, ডাক্তারী পড়ে, নরেনবাবু পিএইচ-ডি দিয়ে শিক্ষিতমহলে নাম কিনেছেন, ছোট কলেজ ছেড়ে দিয়ে কলকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করছেন, ছাত্রমহলে সুনাম আছে, কিন্তু তিনি এখন আরও গম্ভীর, আরও উদাস হয়ে গেছেন। যে বাড়ীতে ভাড়া ছিলেন, সেখানে বাড়ীওয়ালার সঙ্গে সামান্য ঝগড়া হোল, সেইদিনই স্থির করলেন, জিনিষপত্তরের দাম যতই বেশী হোক, বাড়ী তাঁকে করতেই হবে। অনেক ভেবে চিন্তে জীবনের সমস্ত সঞ্চয় একত্র করে ছোট একটুকরা জমী কিনলেন, ঠিকাদার বন্দোবস্ত করে বাড়ীর ফরমাস দিলেন, একতলা বাড়ী, চারখানা ঘর, একটা বাইরের বসবার ঘর, একটা শোবার, সেই ঘরেই তাঁর লাইব্রেরী, শোবার ঘরের এক পাশে ছেলের ঘর, অন্য পাশে ঠাকুর ঘর, সাম্‌নে বারান্দা, বারান্দার পরে টালির ছাত দিয়ে রান্না ঘর। পিতাপুত্রে থাকার পক্ষে এই বাড়ীই যথেষ্ট।

কিন্তু ঠিকাদার দিয়ে কাজ ভালো হয় না। বাড়ীখানা মোটামুটি শেষ করে তিনি কণ্ট্রাক্টার ছাড়িয়ে দিয়ে বাড়ীর বাহারে কাজগুলো করবার জন্যে মিস্ত্রীদের ভেতর থেকে এই মুরুমিঞাকে পছন্দ করে ঠিক করলেন যে, মুরুদ্দীনই একা এসে এর ফিনিশিং কাজগুলো ধীরে ধীরে করবে, তাতে যতদিন লাগে লাগুক। প্রথমে তাঁর চেষ্টা ছিল হিন্দু মিস্ত্রী খুঁজে নেওয়ার, কিন্তু দুঃখের বিষয় ভালো হিন্দু মিস্ত্রী কল্‌কাতায় মিল্‌লো না, অতএব এই লোকটাই থাক্।

মুরু মিঞা প্রায় একমাসের ওপোর কাজ করছে। পাইখানার ছাতে খোলা জলের ট্যাঙ্ক সে নিজেই ঢালাই করেছে, রান্নাঘরের টালিখোলার ছাত সে নিজেই করেছে, এখন তার সব কাজ শেষ করে সে আরম্ভ করেছে বারাণ্ডায় জাফরী ঢালাই করতে। মুরু মিঞা বারাণ্ডায় বসে জাফরী ঢালাই ক'রে, তার ওপোর নক্সা কাটে। বুড়ো হিন্দুমজুর রামদান ভারার ওপোর বালি মাটী তুলে দিয়ে তলায় বসে খৈনা খায়। ঘড়িতে পাঁচটা বাজ্‌লে দুজনে মিলে হাত ধুয়ে বাড়ী ফেরে। কর্ণিক পাটা এ বাড়ীর সিঁড়ির নিচে তাকের ওপোর তোলা থাকে।

সেদিন মুরু মিঞার কেমন যেন হিসেবে ভুল হয়ে গেল। বারাণ্ডার ঢালাইটা করে ফেলে হঠাৎ সে বুঝতে পারলে যে জাফরীর মশলা বড় পাৎলা হয়ে গেছে, ভালো করে না শুকুলে নক্সা হবে না, অথচ বেলা খুব বেশী নেই।

কিন্তু উপায় নেই, জিনিষটা শুকিয়ে যাওয়ার পর তবেই না নক্সা হবে—তাহলে!

বাড়ীতে কেউই নেই, বড়বাবু দাদাবাবু দুজনেই বাইরে, কেবল বুড়ো একটা চাকর আছে, বাবুরা যখন কেউ না থাকে, তখন সে বসে বসে কেবলই তামাক খায়, আর সঙ্গী পেলে নানারকম গল্প করে। পঞ্চাশের মন্বন্তরে সবই তার গিয়েছে, জমী, বলদ, ছেলে, বউ, বউমা কেউই

নেই, কেবল সেই আছে একা, বাজ-পড়া গাছের শুকনো গুঁড়ির মতো। তাই তার কোন টানাটানি নেই, চুরী করার কোন চিহ্নই নেই, বাবুর বাড়ী চিরদিন এইভাবেই থাকবে, অসুখ করলে বাবু তাকে ফেলবে না, এই আশ্বাস পেয়ে হরিদাস মাইতি এখানেই স্থায়ীভাবে বাসা নিয়ে বসেছে।

মিস্ত্রীকে বসে থাকতে দেখে হরিদাস বল্লে—'কি গো মিস্ত্রীরপো, বসে কেন—বেশ চালাচ্ছো বাবা, কেউ দেখতে নেই, শুনতে নেই, অথচ দিন কাটলেই রোজমজুরী, বেশ আছ।'

বড় বড় চোখ দুটো হরিদাসের মুখের ওপোর ফেলে নুরু বল্লে, কি করবো, ঢালাইটা পাৎলা হয়ে গেছে, না আঁটলে নক্সা হবে কি করে।

উত্তরে হরিদাস খুসি হোল না, বল্লে, 'বেশ বেশ, আজ তাহ'লে ঢালাইটা আঁটুক, আর তুমি ঘুমোও, কাল তখন নতুন রোজ নিয়ে—'

নুরু এবার চটেছে, বল্লে, 'না গো মিঞা, সে হওয়াব যো নেই, আজই একটু পরেই ও'কে ঠিক করে না কাটতে পারলে, কাল জমে পাথর হয়ে যাবে, তখন—'

এই কথার উত্তরে হরিদাস বল্লে, 'খবরদার আমায় মিঞা বলবে না, আমি হিন্দুর ছেলে মিঞা হতে যাব কোন দুঃখে, আমি ত তোমাদের মত মোছলমান নই।'

বড় বড় চোখ দুটো হরিদাসের দিকে তুলে ধরে নুরু বল্লে', ভাই, অত চট কেন, মোছলমানের কি দোষ তাই বল ত শুনি!

'দোষ নেই, গরু খায় এই ঢের, এর ওপোর আরও কে দোষ থাকবে?'

হাসতে হাসতে নুরু বল্লে, 'সে কথা ভাই আমায় বলতে পাবে না, আমি ওসব জিনিস মোটেই খাই না।'

ছোট হুঁকাটা হাত থেকে সরিয়ে অবাক্ হয়ে হরিদাস তার মুখের দিকে চেয়ে বল্লে, 'সে কি হে, তুমি মোছলমানের ছেলে হয়ে গরু খাও না? তা হবেও বা, কিন্তু তুমি না খেলেও তোমার বাপ চৌদ্দপুরুষ ত সবাই খেয়েছে।'

উত্তরে নুরু কিছুই বল্লে না, পকেট থেকে বিড়ি বার করে ধরালে।

পাঁচটা বেজে গেছে। নগেন কলেজ থেকে বাড়ী ফিরে দেখে মিস্ত্রী বসে আছে। মজুরটা ওভারটাইম চাই বলে মিস্ত্রীকে চেপে ধরছে।

হরিদাস বল্লে, দাদাবাবু মিস্ত্রী তিনটে থেকে হাত গুটিয়ে বসে আছে।

শুনেই নগেন চটে উঠলো, বিরক্ত হয়ে বল্লে, 'মিস্ত্রী এ-সব কি ব্যাপার?'

নুরু ঐ জাফরী ঢালাইয়ের ইতিবৃত্তটা সংক্ষেপে সেরে নিয়ে বল্লে, 'দেখুন, এধারে এইটুকু বাকী আছে বলে আমি সবটাই আজ ঢেলে ফেল্লুম, কিন্তু নরম হয়ে গেছে তাই বসে বসে অপেক্ষা কর্ত্তে হচ্ছে, তা তাতে কিছু আসে যায় না, মজুর আমার চাই না। আমি এখুনি ও'কে ছেড়ে দিচ্ছি, আর আমায় একটা আলো দেবেন, আমি আজ রাত্তির অবধি থেকে কাজ শেষ করে তবে বেরুবো। আমার ওভারটাইম চাই না, কারণ দুপুরে আমি ত—'

'আচ্ছা আচ্ছা—'একটু বিরক্ত হয়ে নগেন চলে গেল। মুসলমানের ওপোর কেমন তার জাতক্রোধ, তাদের কোন কৈফিয়ৎই সে বিশ্বাস করে না।

যাহোক, প্লাগ থেকে একটা আলো তাকে বার করে দেওয়া হোল, নুরু গিয়ে আবার তার ভারায় উঠে কণিক আর ছুরী নিয়ে নক্সা কাটতে বসলো।

নরেনবাবু বাড়ী ফিরলেন। সেদিন ইউনিভারসিটিতে কি একটা মিটিং ছিল, ফিরতে তাঁর দেরীই হয়েছে। এখনও পর্য্যন্ত মিস্ত্রীকে দেখে তিনি একটু আশ্চর্য্য হয়ে বল্লেন, 'কি হে, এতক্ষণ রয়েছো।'

নুরুদ্দিন সংক্ষেপে তার কৈফিয়ৎ দিলে, ততক্ষণে নরেনবাবু তাঁর ঘরে গিয়ে ঢুকলেন, জামা-কাপড় ছেড়ে হাত-মুখ ধুয়ে স্নান সেরে যথারীতি ঠাকুর ঘরে এলেন।

পূজা আহ্নিকের পর এখন তিনি প্রত্যহ গীতা বা চণ্ডীপাঠ করেন। কোন কোন দিন বাল্মীকির রামায়ণ থেকে সীতাহরণের অংশটা পাঠ করেন, তখন তাঁর চোখ দিয়ে কখনও জল পড়ে, কখনও বা আগুন ঠিক্‌রে বেরোয়।

পূজোর শেষে গীতার বিশ্বরূপদর্শন পাঠ করতে

পশ্যামি দেবাংস্তবদেবদেহে
সর্ব্বাংস্তথা ভূতবিশেষ সঙ্ঘান্ ইত্যাদি।

ঠাকুরঘরের সামনের বারাণ্ডায় ভারার ওপরে বসে নুরু মিঞা অবাক্ হয়ে শুনছে। এর কোন অর্থই সে বোঝে না, তবু তার লাগে ভালো, বড় চমৎকার, অতি সুন্দর।

হাতের কাজ বন্ধ হয়ে গেল। সে শুনতেই লাগলো। কতক্ষণ পরে ঐ পাঠ শেষ হোল। নরেনবাবু আসন ছেড়ে উঠলেন। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে নুরুদ্দিন পুনরায় কাজে মন দিলে।

নরেনবাবু সকালে স্বপাক খান, রাত্রে পাউরুটী ও দুধ খান, ছেলেরও আহার অনুরূপ, কারণ বাড়ীতে রাঁধবার মত আত্মীয় কেউ নেই এবং রাধুনীর হাতে খাওয়াও এ বাড়ীর রীতি নয়। সকালে কুকারে হয় নিরামিষ ভাত-তরকারী, তাই থেকেই হরিদাসের বিকালের ভাত তোলা থাকে, আর সন্ধ্যার পর নগেন পাউরুটী টোষ্ট করে, নরেনবাবু মাখম মাখিয়ে ফল এবং দুধ যোগাড় করে খেতে বসেন। রান্নাঘরে বাইরের লোকের প্রবেশ নিষেধ।

গুছিয়ে নিয়ে খেতে বসবার পূর্ব্বে নরেনবাবু বল্লেন, 'নগেন, মিস্ত্রীকে দুটো টোষ্ট, দুটো কলা আর একটা সন্দেশ দিয়ে এসো।'

ছেলে বাপের কথার মোটেই অবাধ্য নয়, এ আদেশ তার কাছে অসহ্য হয়ে উঠলো। মিস্ত্রী হিন্দু হলে বোধ হয় তার এতটা অসহ্য হোত না।

পিতা বল্লেন, 'আহা সারাদিন খাটছে।'

ছেলে বল্লে, 'ছাই খাটছে, সারাদিন ফাঁকী মেরে রাত্রে কাজ দেখাতে এসেছে।'

তর্কে লাভ নেই বুঝে নরেনবাবু নিজেই খাবার নিয়ে উঠলেন, মিস্ত্রীকে দেওয়ার জন্য। তখন অগত্যা ছেলেকেই সেটা হাতে করে দিয়ে আসতে হোল।

নুরু বোধ হয় পিতাপুত্রের কথাগুলো শুনতে পেয়েছিল। বল্লে, 'কেন, কেন, আবার খাবার কেন।'

নরেনবাবু ঘর থেকেই বল্লেন, 'খেয়ে নাও মিস্ত্রী, রাত্তির হয়েছে।' নুরুদ্দীন আর কোন আপত্তি করে নি।

চার

রাজাবাজার বস্তীর এক পচা নোংরা গলির দরজায় নুরু যখন এসে পৌছাল তখন রাত্রি প্রায় সাড়ে নটা। নিজের ঘরের দরজা ঠেলে সে যখন ঢুকলো তখন দেখে তার মা তার চৌকীর পায়ায় ঠেস দিয়ে চুপ করে বসে আছে। হারিকেনের আলোটা খুব কম করে দেওয়া আছে, সেই আলোয় বুড়ীকে নিতান্ত বীভৎস দেখাচ্ছিল। কোন্ এক অতীত যুগে, হয়ত বা ছেলেবেলায়, আগুন লেগে বুড়ীর বাঁ দিকটা সমস্তই পুড়ে গিয়েছিল, সেইজন্যে বাঁ চোখটা পর্য্যন্ত নেই, মাথার বাঁ দিকটায় টাক পড়েছে আবার অল্প একটু খোঁড়া, সেটা দাঁড়ালেই স্পষ্ট বুঝা যায়। মানুষ যে এত কুৎসিত হতে পারে, তা নুরুর মাকে না দেখলে বোঝাই যায় না। বাড়ী ফিরতে নুরুর কখনও এত রাত হয় না, তাই সে অভিযোগের সুরে ছেলেকে জিজ্ঞাসা কল্লে—দেরী হওয়ার কারণ কি?

নুরু বাবুর বাড়ীর কথা বলতে বলতে জুতো খুললে, জামা খুলে দেলের গায়ে পেরেকে ঝুলিয়ে রাখলে, হারিকেনটা বাড়িয়ে দিয়ে সেটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে গেল, খানিক পরে ফিরে এসে দেখে—নুরুর মা ভাত, ডাল ও পিঁয়াজের তরকারী নিয়ে বসে আছে। নুরুকে খেতে দিয়ে নুরুর মাও মাটীর শানকীতে করে ভাত নিয়ে খেতে বসলো।

নুরুর আজ খেতে তেমন গা নেই, একেই সে খায় খুব কম, তার ওপরে আজ মোটেই খাচ্ছে না, নুরুর মা বল্লে, 'কি হয়েছে নিরু, সারাদিন পরে খাবি তাও তোর ক্ষিদে নেই কেন? বুড়ী তার ছেলেকে নিরু বলে ডাকে, তার মুখে নাকি নুরু কথা বেরোয় না।

ছেলে বল্লে, 'না মা সন্ধ্যের পর বাবুর বাড়ী টোষ্ট, কলা, সন্দেশ এই সব খেয়েছি কি না, তাই।'

খুসি হয়ে বুড়ি বল্লে, 'কেন, তোকে হঠাৎ যে এ সব দিলে, এর মানে কি?

নুরু বল্লে, 'বোধ হয় রাত হয়ে গেছে, বাবুরা খেতে বসছে, তাই ভাবলে একটা ত লোক এই আর কি?'

মা বল্লে, 'বাবুরা খুব বড় লোক, নয়?'

ছেলে বল্লে, এমন কি? একটা বুড়ো চাকর আছে

বামুন নেই, গাড়ী নেই, কিছু নেই, তবে হ্যাঁ আমার মজুরী-টজুরী নিয়ে কখনও কোন গোলমাল করে না।

তেঁতুলের আচার দিয়ে ভাত খেতে খেতে, মুকুর মা বল্লে, 'তাহলেই হোল।' একটু থেমে বল্লে, 'নিরু, তুই এত লোকের এত বাড়ী করছিস, আমাদের একটা ছোট-খাটো ঘর বেঁধে নে না, তোর বিয়ে দিয়ে আমি যদি একটু ছুটী নিতে পারি—'

ম্লান হেসে মুকু বল্লে, বাড়ী করা কি অম্নি হয়, তুই জানিস না, একখানা ঘর করতে জিনিষই লাগবে হাজার টাকার।

ম্লান হেসে মুকুর মা বল্লেন, 'না না অত কেন, ঐ হামিদদের ভাঙ্গা কুঁড়েটা বিক্রী হবে। জমীর খাজনাও কম আছে, আর যা হোক্ দুএকখানা টিনও পাওয়া যাবে, মেঝেটা তুই সকালে বা রাত্তিরে বসে সিমেন্ট করে নিবি—'

মুকু একটু ভেবে নিয়ে বল্লে, 'তুই ব্যস্ত হচ্ছিস্ কেন মা, আমি আগে যেখানে কাজ করতুম, সেই সাহেব ইঞ্জিনিয়ার আমাকে বলেছে এবারে এরোড্রামের কাজে আমায় নিয়ে যাবে, থোক হাজার টাকা পাইয়ে দেবে, তখন দেখ্‌বো যদি তোর মনের মত ঘর একটা করতে পারি।

বদ্‌নার নলটা থেকে আলগোছে জল খেয়ে মা বল্লে, ইঞ্জিনীয়ারের কাছে কাজ করবি, তা ভালো, কিন্তু কথায় তেমন উৎসাহ তার নেই, বোধ হয় ছেলের বিদেশে যাওয়ার নামেই সে ভয় পেয়েছিল।

খাওয়ার পর মুকু শুলো চৌকির ওপোর, মেঝেয় মাদুরের ওপোর চট পেতে মুকুর মা শুয়ে পড়লো। কিন্তু কথা তাদের বন্ধ হোল না।

মুকুর মা বলে,'হাঁরে তোর এ বাবুদের কে আছে রে?'

মুকু বলে, 'কেউ নেই মা, বাবু আর বাবুর ছেলে এই দুজনমাত্র আছে। বাবু কোন্ বড় কলেজে পড়ায়, আর বাবুর ছেলে নগেনবাবু ডাক্তারী পড়ে। ওদের চাকরের কাছে সব শুন্‌ছিলুম।'

নগেন—তা ভালো—তা হ্যাঁ রে নগেনবাবুর মা নেই।

'না মা, তার মা নাকি অনেক আগেই মরে গেছে। তা মা আজ একটা জিনিষ যা শুনেছি, কি বল্‌বো, আমার হিঁদু হতে ইচ্ছে হয়।'

'কেন?'

বাবু সন্ধ্যেবেলা কলেজ থেকে এসে চান্-টান্ সেরে পুজোর ঘরে বসে এমন সুর করে কি একটা বই পড়ছিলো মা, যেন কানে গুড় ঢেলে দিলে। আমি ত আমাদের আজান শুনেছি মা, কিন্তু এর কাছে সে লাগে না।'

অন্ধকারে বুড়ীর মুখটা দেখা গেল না, একটু থেমে বুড়ী বল্লে, 'বাবুরা কি বামুন বুঝি।'

'হ্যা মা, ব্যানার্জ্জী। বাবুর নাম নরেন ব্যানার্জ্জী, বাড়ীর সাম্‌নে সেদিন একটা পাথর লাগালুম, তাতে লেখা আছে এন্ ব্যানার্জ্জী।—কি হোল উঠ্‌লি কেন মা।

অন্ধকারে বুড়ী যে উঠে বসেছে ছেলে তা বুঝতে পেরেই এই প্রশ্ন করলে।

মা একটু থেমে বল্লে, 'না, বোধ হয় একটা তেলাপোকা।'

'আলো জাল্‌বো?'

'না।'

খানিকটা চুপচাপ থাকার পর বুড়ী বল্লে, 'হ্যারে নিরু তুই যে এত ভালো ভালো বাড়ী তৈরী করিস্ তা আমায় ত একদিনও দেখাস্ না, তোর এই বাবুর বাড়ীটা একদিন দেখাবি?'

উৎসাহিত হয়ে মুকু বল্লে, 'তুই দেখ্‌বি, তা চল্ না কালকেই চল্। বোধ হয় আর তিন চারদিন পরেই ও বাড়ীর কাজ শেষ হয়ে যাবে।'

মা বল্লে, 'যাবো, কাল সকালেই তোর সঙ্গে গিয়ে দেখে আস্‌বো।'

ছেলে বল্লে, 'আচ্ছা। একটু থেমে বল্লে, ফিরবি কি করে?'

'কেন রাজাবাজার ট্রামে তুলে দিবি।'

ছেলে বল্লে, 'একলা ফিরতে পারবি? তুই ত একলা আস্‌তে পারিস্ না।'

'মা বল্লে, সে যা হয় হবে'খন।'

পরের দিন সকাল আটটার সময় মুকুদিন তার মাকে নিয়ে বাবুর বাড়ী হাজির হোল। বাড়ীর দরজায় ইংরাজী অক্ষরে পাথরে লেখা আছে ডাঃ এন্ ব্যানার্জ্জী। বুড়ী যেন কেমন এক অধীর আগ্রহে পাথরের ওপোর দুবার হাত বুলিয়ে নিয়ে ছেলের সঙ্গে বাড়ীর ভেতর ঢুকলো

একটি সুন্দর ছেলে খালি গায়ে তেল মাখ্‌ছে। সে বল্লে, কি গো মিস্ত্রী, 'আজ তোমার সে মজুর কোথায় ?'

নুরু বল্লে, 'আস্‌ছে।'

খোঁড়া বুড়ীর দিকে চেয়ে ছেলেটি বল্লে, 'এ কে রে ?'

সঙ্কুচিত হয়ে নুরু বল্লে, 'ও আমার মা দাদাবাবু, আমার হাতের কাজ দেখবার জন্যে মা আজ এসেছে।'

বক্র দৃষ্টিপাত করে নগেন বল্লে, ও, তা বেশ। মুসলমানী দেখে সে মোটেই খুসি হোল না। বুড়ী কিন্তু নগেনকে তার একচক্ষু দিয়ে তীব্রভাবে দেখতে লাগলো।

বাইরের ঘরে বসেছিলেন নরেনবাবু। আপন মনে খবরের কাগজ পড়ছিলেন। মিস্ত্রী এসেছে বুঝতে পেরে কাগজ ফেলে বেরিয়ে এলেন। রোজ তারিখে এইটাই তিনি করেন। মিস্ত্রী এলে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে মিস্ত্রীকে সেইদিনের কাজ সম্বন্ধে উপদেশ দিয়ে আবার তিনি ঘরে ফিরে যান।

বাইরে এসে নরেনবাবু নুরুর মায়ের দিকে চেয়ে বল্লেন, 'এ কে রে ? আজ কি মজুরের বদলে একে এনেছিস নাকি ?'

নুরু বল্লে, 'না বাবু, ও আমার মা, আমার হাতের কাজ দেখতে এসেছে।'

নুরুর মা গিয়ে ভূমিষ্ঠ হয়ে বাবুকে প্রণাম করলে। আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করলে, 'পায়ে হাত দেব কি ?' তার গলার স্বরটা অস্বাভাবিক রকম কাঁপছিল।

নরেনবাবু ঘাবড়ে গিয়ে হ্যাঁ কিম্বা না কি বলবেন ঠিক না পেয়ে বল্লেন, 'না, পায়ে হাত—'

ততক্ষণে নুরুর মা তার পায়ের ধুলো নিয়ে নিলে। নরেনবাবু কেমন যেন শিউরে উঠলেন। বোধ হয় যবনীর স্পর্শেই তাঁর এই অবস্থা হোল।

কিছুক্ষণ সবাই চুপচাপ। তারপর নরেনবাবু বল্লেন, বেশ ত নুরু, তোর মাকে তোর হাতের কাজ দেখা গে।'

নুরু তার মাকে ডেকে নিয়ে জাফ্‌রীর কাছে গেল। তার মা ছিল একেই খোঁড়া, তার ওপোর কেমন যেন কাঁপছিল। জাফ্‌রী দেখিয়ে নুরু বল্লে, 'মা তুই ডিস্টেম্পারের কাজ দেখ্‌বি, আয়।'

বাবুর শোবার ঘরে নুরু তার মাকে নিয়ে গেল। আরসীর ওপোরে নগেনের মায়ের ফটো, বিয়ের বছরেই সেই ছবিটা তোলা হয়েছিল। নুরুর মা সেই আরসীর মধ্যে নিজের ছবি দেখ্‌লে, আর ওপোরে দেখলে ফটো।

পেছন পেছন নগেন এসে দাঁড়িয়েছে, মুসলমান মিস্ত্রীকে বিশ্বাস কি ?

কাঁধে গামছা ফেলে নরেনবাবুও দরজার কাছে এসেছেন। তিনি স্নানের আয়োজন করছিলেন। হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লেন, 'নুরুর মা, তোমার ছেলের হাত খুব ভালো, লেখাপড়া শিখলে ও বেশ ভালো ইঞ্জিনীয়ার হতে পারতো।'

হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে নুরুর মা তার ভালো চোখটা মুছ্‌ছিল। নুরু ভিজে নজর করে বল্লে, 'মা তোর চোখে কি হোল।'

মায়ের মনে তখন হাজার কথা উঠ্‌ছে! এই নুরুকে যে কেন সে নিরু বলে ডাকে, তা ত আর কেউই জানে না, সে যে তার স্বামীর আদেশ! ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগে থেকেই তার নাম যে নীরেন, অদৃষ্টের ফেরে পড়ে সে আজ নুরুদ্দিন। মনে হোল স্বামীর পা জড়িয়ে সে বলে, ওগো, একে যে তুমি ইঞ্জিনীয়ার করেই তৈরি করেছিলে, কিন্তু এ আজ হয়ে গেল তোমারই বাড়ীর মিস্ত্রি। সামনের দেওয়ালে সে বার বার করে দেখছে, ওপোরের ফ্রেমে বাঁধা কুড়ি বছর পূর্ব্বের সেই ছবি আর নিচে আয়নার কাঁচের মধ্যে বর্ত্তমানের প্রতিচ্ছবি, এ দুয়ের মধ্যে সেই একই মনোরমা যে বাস করছে, তা যে তার নিজেরই বিশ্বাস হয় না। এই বাড়ী, এই ঘর, এই দুই ছেলে, ডাক্তার ইঞ্জিনীয়ার, দেবতার মত স্বামী আর সে—সকলের মাঝখানেই সে দাঁড়িয়ে রয়েছে, অথচ সকলেরই অচেনা, এত কাছে থেকেও সে আজ কত—কত দূরে।

মনে পড়ে সেই বিশ বছর আগেকার অত্যাচার! স্বামীর ঘর থেকে ছিনিয়ে নিয়ে অত্যাচারীর দল তাকে কত লাঞ্ছনাই যে করেছে। সে পালাতে চেয়েছিল, পায়ে লাঠি মেরে তারা পা ভেঙে দিয়েছে, নিজের কাপড়ে কেরাসিন ঢেলে আগুনে আত্মহত্যা করতে চেয়েছিল, তারা তাকে বাঁচিয়েছে, তার দেহের ওপোর শয়তান কামুকদের লোভ যে কিছুতেই কমে নি। কয়েক বছর পরে সেই

ঝিকে করেছে, মুসলমানের বাড়ীতে ঝি খেটেছে, দশ বছরের ছেলে নীরেন জন-মজুরের কাজ করেছে, মিস্ত্রীর মজুর হয়ে মিস্ত্রীর দস্তুরী বাদ দিয়ে ছয় আনা রোজ নিয়ে বাড়ী ফিরেছে, এই গেল তার জীবনের কুড়ি বৎসরের ইতিহাস, আর অপরদিকে নরেনবাবুর সংসার জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। মধ্যবিত্ত ঘরের সমস্ত আরাম উপকরণের মধ্যেও সে সন্ন্যাসী, জীবনের ওপোর কোন স্পৃহাই নেই, শুধু এক নীরব অস্তিত্ব। ছেলে ডাক্তারী পাশ করলে, কিন্তু শিশু মনের ওপোর যে প্রচণ্ড আঘাত তার লেগেছিল তাতে সে কি রকম বদমেজাজী হয়েছে, আর রয়ে গেছে তার প্রচণ্ড মুসলিম-বিদ্বেষ. এ সবের জন্য দায়ী কে?—কাঁপতে কাঁপতে নুরুর মা সেইখানেই বসে পড়লো।

নুরু ডাকে, মা, মা। নগেন বলে, কি আপদ মৃগী রোগ আছে নাকি? নরেনবাবু মাথায় জল দিতে যান।'

নুরুর মা বলে—'কিছু না, মাথাটা ঘুরে গিয়েছিল। ছেলের দিকে চেয়ে বলে, 'চল নুরু আমায় বাড়ীতে রেখে আসবে চল। নগেন হাপ ছেড়ে বাঁচে, নরেনবাবু কি যেন ভাবতে থাকেন।

রাস্তায় কি একটা মিছিল খুব সোরগোল করে যাচ্ছিল। মামুলিভাবেই তীব্র চিৎকার কচ্ছিল, হিন্দু-মুসলিম এক হো, ইন্ক্লাব জিন্দাবাদ।

মোম্বাসায় চারদিন থাকিয়া আমাদের জাহাজ ডার্-এস্-সালাম্ অভিমুখে রওনা হইবে, তাই আমরা মোম্বাসায় মাত্র চারদিন থাকিবার সৌভাগ্যলাভ করিয়াছিলাম। দীর্ঘদিন সমুদ্রবক্ষে অতিবাহিত করায় অনেকেরই শরীর অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিল; সুতরাং এই চারদিনের বিশ্রাম সকলের স্বাস্থ্যের পক্ষেই বেশ অনুকূল হইয়াছিল। আমরা যখন মোম্বাসায় পরম আনন্দ ও নানারকম কার্য্যপদ্ধতির মধ্যদিয়া দিন কাটাইতেছিলাম সেই সময় মহাত্মা গান্ধীজির ভস্মাবশেষ বহন করিয়া দক্ষিণ আফ্রিকাগামী জাহাজ 'টেরিয়ার' মোম্বাসা বন্দরে উপস্থিত হয়। মোম্বাসার ভারতীয়গণের বিশেষ অনুরোধে ভস্ম লইয়া মোম্বাসা সহরে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। একটি রৌপ্যাধারে রক্ষিত ভস্মরাজি শোভাযাত্রা করিয়া জাহাজ হইতে সহরে আনা হইল। পূর্ব্ব আফ্রিকার সমস্ত সহর এবং রাজধানী নাইরোবি হইতে ভারতীয় নেতা এবং কর্ম্মীগণ পূর্ব্ব হইতেই মোম্বাসায় সমবেত হইয়াছিলেন। বিরাট মণ্ডপে অনুষ্ঠানের আয়োজন হইয়াছে। স্ত্রী পুরুষ নির্ব্বিশেষে সকলেই এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিল। "বন্দে মাতরম্" "জন-গণ-মন-অধিনায়ক" ইত্যাদি ভারতীয় রাষ্ট্রসঙ্গীত সন্ন্যাসী-গণের কণ্ঠে ভারত হইতে আড়াই হাজার মাইল দূরে গীত হইয়া সকলের মনে-প্রাণে এক অভূতপূর্ব্ব শিহরণ জাগাইয়া তুলিল। মিশনের নেতা স্বামী অদ্বৈতানন্দজী মহাত্মা গান্ধীজির জীবনী আলোচনা করিয়া বক্তৃতা করিলেন। তাহার পর অনারেবল্ মিঃ এ-বি প্যাটেল, এস্-জি-আমিন, দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় কংগ্রেসের সভাপতি মিঃ সোরাবজী রোস্তমজী, থিয়োসফিক্যাল সোসাইটির সভাপতি মিঃ পি-জি মাষ্টার এবং আরও অনেকে মহাত্মাজীর জীবনী আলোচনা করিয়া বক্তৃতা করেন।

একুশে জুন দুপুরে আমাদের বাহন 'খাণ্ডালা' ডার্-এস্-সালাম্ অভিমুখে যাত্রা করিবে। তাই সকাল সকাল আহারাদি শেষ করিয়া আমরা জাহাজে উঠিলাম। বেলা প্রায় দুইটায় জাহাজ ছাড়িল। অপূর্ব্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দর্শন করিতে করিতে আমরা পুনরায় নীলাম্বুরাশির উপর ভাসিয়া চলিলাম। সমস্ত রাত্রি অবিরামগতিতে চলিয়া জাহাজ পরদিন বেলা প্রায় বারটায় জাঞ্জিবার নামক একটি বিশাল দ্বীপে পৌঁছিল। এই বন্দরে জাহাজ একদিন থাকিবে। স্থানীয় হিন্দুমণ্ডলের সভাপতি শ্রীমণিলাল মুলজী ভালজী, আর্য্যসমাজের সভাপতি, ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের সেক্রেটারী এবং আরও অনেকেই আমাদের অভ্যর্থনা করিবার জন্য জাহাজে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের আবেদন এবং অনুনয়-বিনয়ের গভীর আন্তরিকতায় আমরা চারজন সন্ন্যাসী সহরে যাইতে বাধ্য হইলাম। সন্ধ্যায় স্থানীয় একটি হলে সম্বর্দ্ধনা সভার আয়োজন হইল। স্বামী অদ্বৈতানন্দজী বক্তৃতাপ্রসঙ্গে মিশনের আগমনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করিয়া বলেন—আফ্রিকার সহিত ভারতের সাংস্কৃতিক সম্বন্ধ নূতন নহে বহু প্রাচীনকালের। মধ্যে পরাধীন ভারতের সহিত আফ্রিকার সেই সাংস্কৃতিক সম্বন্ধ নষ্ট হইয়া কেবলমাত্র ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্বন্ধ হইয়াছিল। স্বাধীন ভারতের

পরদিন সকাল দশটার মধ্যেই আহারাদি শেষ করিয়া আমরা জাহাজে উঠিলাম। ডার্-এস্-সালাম্ এখান হইতে মাত্র চার ঘণ্টার পথ। প্রায় বারটায় জাহাজ ছাড়িল। চারঘণ্টা চলার পর জাহাজ ঠিক্‌ ঠিক্ অপরাহ্ন চার ঘটিকায় ডার্ এস্ সালাম্ বন্দরে পৌঁছিল। ঘণ্টাখানেক পরে মেডিক্যাল অফিসার এবং ইমিগ্রেসন অফিসার আসিলেন। বসন্তের প্রতিষেধক টিকা, Anti yellow feves ইন্‌জেকসন লওয়া হইয়াছে কিনা তাহা এবং আরও নানারকমে আমাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হইল। ইমিগ্রেসন পারমিট প্রস্তুত হইতে হইতেই সন্ধ্যা হইয়া আসিল। জাহাজে স্থানীয় হিন্দুমণ্ডলের প্রাক্তন সভাপতি মিঃ ডি এম্ আম্বারিয়া, বার এট ল, ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের সভাপতি অনারেবল্ মিঃ ডি কে প্যাটেল, এম্ এল্ সি, মিঃ ডি আর সিং, মিঃ টি আর বুচ, শ্রীযুক্ত রামজীকাবাসা, শ্রীযুক্ত কারসনদাশ নানজী এবং আরও অনেকে আমাদের অভ্যর্থনা করিতে আসিয়াছিলেন। ইমিগ্রেসন পারমিট প্রস্তুত করা হইলে আমরা জাহাজ হইতে নামিয়া মোটরযোগে সহরের দিকে রওনা হইলাম। কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমরা আমাদের অস্থায়ী বাসস্থানরূপে নির্দ্দিষ্ট প্যাটেল ব্রাদারহুড নামক নবনির্ম্মিত প্রাসাদোপম বাটিতে পৌঁছিলাম। পূর্ব্ব হইতেই বহু লোকজন আসিয়া আমাদের জন্ম অপেক্ষা করিতেছিল। পৌঁছিবামাত্রই তাড়াতাড়ি হস্ত পদ প্রক্ষালনের জল ইত্যাদি আনিয়া দিল। আহারাদির ব্যবস্থাও পূর্ব্ব হইতে করা ছিল, জাহাজে নানাপ্রকার অসুবিধা বা অন্ত নানা কারণে আমাদের সকলেরই শরীর খুব অবসন্ন-প্রায় হইতেছিল, তাই সংক্ষেপেই আহারাদি শেষ করিয়া শুইয়া পড়িলাম।

পরদিন সকালে শ্রীশ্রীনরুদেবতার পূজা আরতি এবং অন্যান্য নিত্যকর্ম্মাদি সমাপন করিয়া সহর পরিদর্শনের নিমিত্ত অপর কয়েকজন স্থানীয় ব্যক্তির সহিত বাহির হইলাম। আমাদের মোম্বাসায় পৌঁছিবার পূর্ব্বেই ডার্ এস্ সালাম ও পূর্ব্ব আফ্রিকায় অন্যান্য সহরের বিশিষ্ট ব্যক্তি ও নেতৃগণের নিকট আমাদের মিশনের আগমনবার্ত্তা এবং তাহার সৎকার ও সাহায্যের জন্য অনুরোধ করিয়া ভারতীয় কংগ্রেসের সভাপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ ভারতসরকারের আন্তঃরাষ্ট্রীয় বিভাগের যুগ্ম সম্পাদক মিঃ সি এস ঝা প্রভৃতির পত্র এবং তারবার্ত্তা আসিয়াছিল তাই আমাদের কর্ম্মক্ষেত্র আগে হইতেই প্রস্তুত ছিল। স্থানীয় হিন্দুমণ্ডলের পক্ষ হইতে আমাদের থাকা-খাওয়া ভ্রমণাদির সমস্ত ব্যবস্থাই করা হইয়াছিল। বাহিরে বেড়াইবার জন্য মোটর, কাজকর্ম্মাদি করিবার জন্য চাকর প্রভৃতি ব্যবস্থা পূর্ব্ব হইতেই করা ছিল। বাহিরে যাইবার জন্য যদিও মোটর ছিল তথাপি মোটরে গেলে দেখিবার বা নূতন দেশের লোকজনের সহিত আলাপ করার অসুবিধা হইবে ভাবিয়া পদব্রজেই বাহির হইলাম। কিন্তু বাহির হইলে কী হইবে—রাস্তায় ঘন ঘন মোটর আসে এবং তাহাতে উঠিবার জন্য 'নাছোড়বান্দা' ভাবে অনুরোধ করিতে থাকে। কয়েকখানি ফিরাইয়া দিয়া আর ফিরাইতে না পারিয়া তাহাতে উঠিয়া বসিলাম, সহরের ইউরোপীয়ান মার্কেট, ভারতীয় বাজার, প্রধান প্রধান রাস্তা, আদি অধিবাসীগণের বাজার, গভর্ণর হাউস, প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ ও পরিদর্শন করিয়া দুপুরে বাসায় ফিরিলাম।

ডার এস সালাম ট্যাঙ্গানিকা নামক একটি টেরিটারীর রাজধানী। এই টেরিটারী কতকগুলি প্রদেশ লইয়া গঠিত। বর্ত্তমানে ইহা বৃটিশ অধিকারে। কবে যে এই সহরের প্রতিষ্ঠা হয় তাহার হিসাব পাওয়া যায় না। তবে ডার এস সালাম নাম আরবীয়গণ কর্ত্তৃক দেওয়া হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। কারণ ডার-এস-সালাম কথাটি উর্দ্দু শব্দের দ্বারা গঠিত, অর্থ শান্তির স্বর্গরাজ্য। সহরটি খুব ছোট নহে—বেশ সমৃদ্ধিশালী। প্রধানতঃ ভারতীয়গণ কর্ত্তৃক গড়িয়া উঠিয়াছে। ভারতীয়ের সংখ্যা প্রায় পনের হাজার, তন্মধ্যে প্রায় পাঁচ হাজার হিন্দু। ভারতীয়গণের শতকরা আটানব্বই জনই গুজরাটি, কাথিয়াবাড় ও কচ্ছ প্রদেশের অধিবাসী। কিছু কিছু পাঞ্জাবী এবং মহারাষ্ট্রীয়ও আছে। স্থানীয় রেল কোম্পানীতে গার্ডের পদে নিযুক্ত শ্রীযুত সুধীরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী নামক জনৈক বাঙ্গালী ভদ্রলোক সপরিবারে এখানে কয়েক বৎসর যাবৎ বাস করিতেছেন।

ট্যাঙ্গানিকা প্রদেশ পূর্ব্বে জার্ম্মানীর অধিকারে ছিল। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে সমগ্র ইউরোপের দৃষ্টি এই পূর্ব্ব আফ্রিকার দিকে পড়ে। সেই সময় হইতে বেলজিয়াম, ফ্রান্স, জার্ম্মানি, ইতালি এবং ইংরাজগণ এদেশে বাণিজ্য কেন্দ্র এবং বসতি স্থাপনের চেষ্টা করিতে থাকে। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ব্যারণ-ভন-ডার ডেকেন নামক একজন জার্ম্মান-পর্য্যটক সরকার কর্ত্তৃক এই দেশে প্রেরিত হইয়া এদেশে জার্ম্মান বসতি স্থাপনের জন্য চেষ্টা করিতে থাকেন। ইহার কিছুদিন পরে ডাঃ কার্ল্ পিটার্স এবং আরও কয়েকজন মিলিয়া 'সোসাইটি অব্ জার্ম্মান কলোনাইজেশান' নামক একটি প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি পত্তন করেন এবং পূর্ব্ব আফ্রিকার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া স্থানীয় আদিবাসী প্রধানগণের সহিত সন্ধি করিয়া জার্ম্মান বসতি স্থাপন করিতে থাকে। কিন্তু এই সময় জার্ম্মানগণ এইদেশে বসতি স্থাপনে খুববেশী আগ্রহী ছিল না। পরে বিসমার্কের বিশেষ আগ্রহাতিশয্যে ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে জার্ম্মানগণ কর্ত্তৃক "জার্ম্মান ইষ্ট আফ্রিকা কোম্পানী" নামে একটি কোম্পানীর হস্তে পূর্ব্ব আফ্রিকায় জার্ম্মান বসতি ও বাণিজ্য-কেন্দ্র স্থাপনের যাবতীয় ভার অর্পণ করা হয়। প্রধানতঃ এই সময় হইতেই পূর্ব্ব আফ্রিকার ট্যাঙ্গানিকা প্রদেশে জার্ম্মানগণ বসতি স্থাপন করিতে থাকে।

এদিকে ইংরাজগণও এই সময় হইতে এই দেশে বাণিজ্য-কেন্দ্র ও বসতি-স্থাপনে তৎপর হইয়া উঠে। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে ক্রাপ্ ও রেবমান্ নামক দুইজন জার্ম্মান-পর্য্যটক যখন এই দেশের অভ্যন্তরে ভাগে পর্য্যটন করিয়া দেশে ফিরিয়া এদেশের সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বত কিলিমাঞ্জারোর

ও বৈজ্ঞানিকগণের পক্ষ হইতে তাহাদের তিরস্কার ও গালিই দেওয়া হইয়াছিল। বিষুব রেখার এত নিকটবর্ত্তী স্থানের পর্ব্বতশৃঙ্গে তুষার জমিতে পারে না, ঘন সবুজ জঙ্গল থাকিতে পারে—তাহা তখন পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিকগণের ধারণার অতীত ছিল। তাই নিতান্ত অবিশ্বাসভরে ইংরাজ সরকার স্পীক (Speake) ও বারুটন নামে দুই ব্যক্তিকে এই সমস্ত সংবাদ সত্য কিনা পরীক্ষা করিবার জন্ত এই দেশে প্রেরণ করেন।

ইহার কিছু পরেই লিভিংষ্টোন্, ষ্টেন্‌লী, প্রভৃতি আবিষ্কারকগণ এইদেশে আসিয়া বৃটিশ-বসতি স্থাপনের চেষ্টা করিতে থাকেন। এই সময় পূর্ব্ব আফ্রিকাকে কয়েকটি প্রদেশে বিভক্ত করা হয়। সেই সময় হইতে প্রথম মহাযুদ্ধের পর পর্য্যন্ত সমগ্র ট্যাঙ্গানিকা প্রদেশটি জার্ম্মান-অধিকারে ছিল। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে জার্ম্মানীর পরাজয়ের পর লীগ অব্ নেশনের মধ্যস্থতায় ট্যাঙ্গানিকা প্রদেশের রুয়াণ্ডা এবং উরিণ্ডি জেলা বেল্‌জিয়াম এবং বাকী সমগ্র প্রদেশটি বৃটিশের অধিকারে আসে।

ডার-এস-সালামএ হিন্দুগণ খুব বেশী দিন পূর্ব্বে আসিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। যতদূর হিসাব পাওয়া যায়, তদনুসারে ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে হিন্দু ব্যবসায়ী এখানে আসিয়া বাণিজ্য-কেন্দ্র স্থাপন করে বলিয়া মনে হয়, কিন্তু ইহার বহুপূর্ব্ব হইতেই আফ্রিকা মহাদেশে হিন্দুদের যাতায়াত ছিল। অনেক ঐতিহাসিকের মতে খৃষ্ট-পূর্ব্ব ৬০০ শতকে ও হিন্দুগণ এদেশের সহিত বাণিজ্য করিত। ভারত এবং চীনের বাণিজ্যজাহাজ বস্ত্র, চিনি, স্ফটিক ইত্যাদি বহন করিয়া এদেশে আসিত এবং বৎসরান্তে স্বর্ণ, রৌপ্য, মোম, হস্তীদন্ত, আবলুস কাষ্ঠের আসবাব্‌পত্র লইয়া ফিরিত—ইহা প্রাচীন ইতিহাসে পাওয়া যায়। মিশরের নাইল নদের পূর্ব্বতটে একদল যে সভ্যতার দীপ-বর্ত্তিকা প্রজ্বলিত হইয়া সমগ্র বিশ্বকে জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত করিয়াছিল—প্রধানতঃ ভারতীয় সংস্কৃতির করস্পর্শেই যে সে আলোক-বর্ত্তিকা জ্বলিয়া উঠিয়াছিল তাহাও অনেকের অভিমত।

১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে ভারত মহাসাগরে আবিষ্কারে বহির্ভূত হইয়া পর্ত্তুগীজ নাবিক ভাস্কো-ডা-গামা দক্ষিণ আফ্রিকার উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরিয়া কালিকুটে পৌঁছেন। সেখান হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে কচ্ছ-প্রদেশের কোন বন্দর হইতে কানু নামক জনৈক হিন্দু নাবিকের পরিচালনাধীনে চলিয়া তাঁহার জাহাজ পূর্ব্ব আফ্রিকার একটি বিশাল দ্বীপ জাঞ্জিবারে পৌঁছে। ভাস্কো-ডা-গামা সেখানে বহু ভারতীয় হিন্দু এবং আরবীয় মুসলমান ব্যবসায়ীর সহিত আলাপ আলোচনা করেন। আলাপ আলোচনার দ্বারা এই দেশের ঐশ্বর্য্যের সন্ধান পাইয়া দেশে ফিরিয়া তখন হইতেই যাহাতে পর্ত্তুগীজগণ এই দেশে বাণিজ্য করিতে পারে তাহার চেষ্টা করিতে থাকেন। তখন টাঙ্গানিকা বা অন্যান্য প্রদেশ ইউরোপের নিকট আবিষ্কৃত হয় নাই—কিন্তু ভারতীয়গণের যাতায়াত ছিল। এই সময় হইতে পর্ত্তুগীজগণ বাণিজ্য-ব্যপদেশে জাঞ্জিবারে আসিতে থাকে।

বর্ত্তমানে ডার-এস-সালামের হিন্দুর সমাজ-জীবন বড়ই উদারতাপূর্ণ। গুজরাটি প্যাটেল, বাণিয়া, ব্রাহ্মণ, লোহানা প্রভৃতি বহু সম্প্রদায় আছে। সেই সমস্ত শ্রেণীর হিন্দুগণই এদেশের প্রধান অধিবাসী. গুজরাটে হিন্দু সমাজে সম্প্রদায়গত বিভেদ খুব বেশী। সেখানে প্যাটেল কর্ত্তৃক নির্ম্মিত মন্দির শুধু প্যাটেল সমাজের জন্য বিশেষভাবে উন্মুক্ত; লোহানা সম্প্রদায়ের অর্থানুকুল্যে স্থাপিত ছাত্রাবাস শুধু লোহানার ছাত্রগণের সাহায্যার্থে, ব্রাহ্মণের প্রচেষ্টায় স্থাপিত পুস্তকাগার কেবল ব্রাহ্মণ-শ্রেণীর ব্যবহারের জন্যই। এদেশে যদিও প্যাটেল সম্প্রদায়ের অর্থ সাহায্যে স্থাপিত 'প্যাটেল—ব্রাদার হুড' ও 'প্যাটেল বোর্ডিং হাউস' শুধু প্যাটেল সমাজের জন্যই, লোহানা কলার কেবল লোহানার জন্যই, তবুও প্যাটেল, লোহানা, ব্রাহ্মণ, বাণিয়া প্রভৃতি সম্প্রদায়ের সমবেত চেষ্টায় হিন্দু মণ্ডল, হিন্দু দাতব্য-চিকিৎসালয়, সনাতন ধর্ম্মসভা, হিন্দু লাইব্রেরী, হিন্দু যুবক-সঙ্ঘ প্রভৃতি কতকগুলি প্রতিষ্ঠান সর্ব্বসাধারণ হিন্দুর জন্য গড়িয়া উঠিয়াছে। গুজরাটে অস্পৃশ্যতার যেরূপ আধিক্য দৃষ্ট হয়—যে অস্পৃশ্যতা-দূরীকরণে মহাত্মা গান্ধীজিও অকৃতকার্য্য হইয়া জীবনের শেষ সময় পর্য্যন্ত গুজরাট ও কাথিয়াবাড় প্রদেশে পদার্পণ করেন নাই—এই দেশে সেই অস্পৃশ্যতার চিহ্নমাত্র নাই। এখানে ধনী নির্ধন, ব্রাহ্মণ-মুচি, প্যাটেল-লোহানা সকলেই প্রথমে হিন্দুনামে পরিচয় দেন। যদিও সম্প্রদায়গত পার্থক্য কিছু কিছু বর্ত্তমান আছে এবং তাহা থাকিবেও, তথাপি অস্পৃশ্যতা-অনাচরণীয়তার লেশমাত্র নাই। গুজরাট ও কাথিয়াবাড়ের অধিবাসীগণের মধ্যেই যখন এই উদারতা দেখিতে পাই তখন হিন্দুসমাজের কুসংস্কাররাজি সঙ্ঘের হিন্দুসমাজ-সমন্বয়-আন্দোলনে ঝটিকা-উৎক্ষিপ্ত শুষ্ক পত্ররাজির ন্যায় মুহূর্তে উড়িয়া যাইবে—এরূপ বিশ্বাস স্বতঃই মনে জাগ্রত হয়। যাহা কিছু ত্রুটী বা কুসংস্কার এখানের হিন্দুসমাজে এখনও পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিল তাহাও আমাদের প্রচার, স্বামীজির বক্তৃতা ও নির্দ্দেশানুসারে সমস্তই দূরীভূত হইয়াছে। প্যাটেল ব্যাঙ্ক নামে একটি ব্যাঙ্ক ছিল—যাহাতে কেবলমাত্র প্যাটেলগণই অর্থ গচ্ছিত রাখিতে পারিত—তাহাও স্বামীজির নির্দ্দেশে সমগ্র হিন্দুসমাজের জন্য উন্মুক্ত হইয়া 'হিন্দু ব্যাঙ্ক' নাম রাখা হইয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এদেশের হিন্দুগণকে বিবাহ উপলক্ষে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইত। এমনও দেখা গিয়াছে যে একই জাহাজে পাত্র ও পাত্রী স্বীয় আত্মীয়-স্বজন সমভিব্যাহারে দেশে ফিরিয়াছে—তারপর বিবাহাদি সম্পন্ন হইয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমানে সে প্রথাও উঠিয়া গিয়াছে, এখন এদেশেই বিবাহাদি সম্পন্ন হইতেছে।

শিক্ষা ব্যবস্থায় পূর্ব্ব-আফ্রিকা বড়ই পশ্চাদ্‌পদ। সমগ্র পূর্ব্ব-আফ্রিকায় একটিও কলেজ নাই। অবশ্য ইহার মধ্যে বিদেশী শাসকশ্রেণীর রাজনীতি জড়িত আছে। সে যাহাই হোক, উচ্চশিক্ষা লাভেচ্ছু ছাত্রগণকে ভারত অথবা বিলাত যাইতে হয়। এখানের প্রত্যেক সহরেই কেম্ব্রিজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনাধীনে দুই একটি হাইস্কুল আছে। ডার-এস-সালামে ভারতীয় ছাত্র ছাত্রীদের জন্য একটি সরকারী হাইস্কুল আছে। একটি মিশনারী বালিকা বিদ্যালয়ে শিখ, মহারাষ্ট্রী ও পাঞ্জাবী হিন্দু ছাত্রীগণ অধ্যয়ন

করে। কারণ গুজরাট, কচ্ছ ও কাথিয়াবাড় প্রদেশের অধিবাসীই এতদঞ্চলে সংখ্যাগরিষ্ঠ। তাই এখানে সর্ব্বশ্রেণীর হিন্দু বালিকাগণের জন্য 'আর্য্যকন্যাশালা' নামে একটি বিদ্যালয় আছে, যেখানে গুজরাটি ভাষাই মাতৃভাষারূপে শিক্ষা দেওয়া হয়—ইংরাজী নামমাত্র কাজ চলা গোছের। কিন্তু পাঞ্জাবী, মহারাষ্ট্রীদের মাতৃভাষা গুজরাটী নহে তাই তাঁহারা ইংরাজী শিক্ষার জন্য তাঁহাদের কন্যাগণকে মিশনারী স্কুলে দিয়াছেন। যাহাতে এই সমস্ত সরকারী স্কুলে 'হিন্দুস্থানী ভাষা' দ্বিতীয় ভাষা (Second Language) রূপে শিক্ষা দেওয়া হয় তাহার জন্য এখানে ভারতীয়গণ বর্ত্তমানে সরকারী আইন পাশের চেষ্টা করিতেছেন।

মুসলিম সম্প্রদায়ের খোজা (ইস্‌মাইলী) শ্রেণীর বালক বালিকাগণের জন্য পৃথক পৃথক বিদ্যালয় আছে, সেখানে ইস্‌মাইলী খোজা ব্যতীত আর কোনো সম্প্রদায়ের প্রবেশাধিকার নাই। বোরা, স্নাসেরী প্রভৃতি মুস্‌লিম সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েরা সরকারী স্কুলেই বিদ্যাভ্যাস করে। আরবদের পৃথক স্কুল। আফ্রিকান্ আদিবাসীদের জন্য কোন্ স্কুল নাই। যদিও এখানে হিন্দু বা ভারতীয় অধিবাসীগণ খুব বেশী শিক্ষিত নয়—তথাপি ভারতের তুলনায় তাঁহারা ধনবান, অধিকতর পাশ্চাত্য সভ্যতার ভক্ত এবং পরিমার্জ্জিত রুচিসম্পন্ন।

ভারতের হিন্দুসমাজের রীত্যনুযায়ী আচার-বিচারের ধারা এখানে অসামান্য এখন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান আছে। কোনো কোনো পরিবারে নারীজাতির প্রচেষ্টায় শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবীর আসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—সন্ধ্যার প্রদীপও নিয়মিত প্রজ্বালিত হয়। পুণ্যভূমি ধর্ম্মভূমি হইতে এতদূরে আসিয়াও একমাত্র নারীজাতির প্রচেষ্টায় ব্যক্তিগত তথা পারিবারিক জীবনে এখন পর্য্যন্ত স্থানীয় হিন্দুগণের মনে প্রাণে হিন্দুত্বের ছাপ দিয়া গিয়াছে। স্থানীয় সনাতন ধর্ম্মসভার শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণজীর মন্দির, শঙ্করাশ্রমের শ্রীশ্রীশিব মন্দিরে নিয়মিত ত্রিসন্ধ্যা পূজারতি হইয়া থাকে—তাহাতেও বহু নরনারী অংশ গ্রহণ করিয়া হিন্দুত্ব ভাব বজায় রাখিবার চেষ্টা করে। নিষিদ্ধ খাদ্যাদি কেহ কখনও গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া শুনা যায় না, তবে মদিরার প্রভাব কিছু কিছু আছে, কিন্তু তাহাও নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে।

সর্ব্বত্র একটা বিষয় লক্ষ্য করিলাম যে, বর্ত্তমান সময় হইতে বালক বালিকা, যুবক ও যুবতীগণের অধিকাংশই যাহারা এদেশেই জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহারা কখনও সন্ন্যাসী দেখে নাই—এমন কি প্রণাম পর্য্যন্ত করিতে জানে না। জাঞ্জিবার নামক একটি দ্বীপে দেখিলাম—সেখানে কোনো মন্দির নাই। শত শত বালক যুবক আমাদের অনুষ্ঠিত পূজা-আরতিতে যোগ দেয়, কিন্তু প্রণাম করে না। কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে, তাহারা কোনোদিন কাহাকেও প্রণাম করে নাই বা প্রণামের তাৎপর্য্যও তাহাদের জানা নাই। কিন্তু পূজা-আরতি এবং সঙ্ঘের অনুষ্ঠানসমূহে যোগদানের আকাঙ্ক্ষা প্রচণ্ড। ত্রিসন্ধ্যা পূজা-আরতিতে প্রত্যেকেরই আসা চাই-ই। শত প্রকার কাজের মধ্যে ছিড়িয়া নারী আসিতেছে, বিভিন্ন প্রকার কর্ম্মব্যস্ততার মধ্য হইতে অবসর করিয়া পুরুষ আসিতেছে, স্কুলের ছুটির পর বাড়ী না গিয়া ছাত্রীগণ একেবারেই আমাদের পূজানুষ্ঠানে যোগদান করিতেছে, ইহা সত্যই এক অপূর্ব্ব ঘটনা। ভারতেও এত উৎসাহ-উদ্দীপনা ও আন্তরিকতা দেখি নাই। ভারতের যুবক-প্রাণ-স্বভাবতঃই ধর্ম্মানুষ্ঠানের বিরোধী,—বিরোধী হইলেও সমালোচনাতেই শান্তি পায়—কিন্তু এদেশের যুবক-যুবতী সিনেমা, ক্রিকেট, টেনিস প্রভৃতি বন্ধ রাখিয়া আমাদের ধার্ম্মিক অনুষ্ঠানসমূহে যোগদান করিয়াছে। প্রত্যহ রাত্রে স্বামীজির বক্তৃতা হইত—তাই রাত্রে সিনেমা প্রায় বন্ধ হইয়াই গিয়াছিল। ক্রমে বালক-যুবক সকলেই প্রণাম করিতে শিখিল। সমবেত প্রার্থনায় সমস্বরে মন্ত্রোচ্চারণ করিবার অভ্যাস করিল। ক্রমে কীর্ত্তন-গানেও অভ্যস্ত হইয়া উঠিল। যাই হোক, এই সমস্ত দৃষ্ট হইতে পূর্ব্ব আফ্রিকায় হিন্দু-সংস্কৃতির ধারা যে এখনও বর্ত্তমান আছে তাহাই প্রমাণিত হয়। যদিও কোনো উল্লেখযোগ্য ধর্ম্ম-প্রচারক বা সমাজ সংস্কারক ইতিপূর্ব্বে এদেশে আসেন নাই এবং দু' একজন যাঁহারা আসিয়াছিলেন তাঁহারাও নির্দ্দিষ্ট কোন সম্প্রদায়ভুক্ত—তাই জনসাধারণের মধ্যে তাঁহাদের প্রভাব খুব বেশী হয় নাই। জৈনধর্ম্ম প্রচারক আসিয়া কেবল জৈনধর্ম্মের প্রচার করিয়া গিয়াছেন, থিয়োসফিক্যাল সোসাইটির পক্ষ হইতে প্রচারক আসিয়া শুধু নির্দ্দিষ্ট কয়েকজন ব্যক্তির নিকট ব্রহ্মবিদ্যা বা তত্ত্ব-বিদ্যা বিষয়ক সুগভীর দার্শনিক মতবাদসমূহ প্রচার করিয়া গিয়াছেন, আর্য্যসমাজী প্রচারক আসিয়া শুধু সনাতন ধর্ম্মের নিন্দা ও সমালোচনাই করিয়া গিয়াছেন—সেই জন্য তাঁহাদের প্রচার কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। আমাদের নেতা স্বামী অদ্বৈতানন্দজীর কয়েকটি বক্তৃতার পর দেখিয়াছি—আর্য্যসমাজী গৃহস্থ গৃহে শ্রীশ্রীঠাকুরের আসন প্রতিষ্ঠা করিয়া ত্রিসন্ধ্যা নিয়মিত পূজা জপ-ধ্যান করিতেছেন। জৈনধর্ম্মের একনিষ্ঠ ভক্ত বলিয়া যে এতদিন জনসমাজে—"ম্যাঁয় জৈন হে, হিন্দু নহী"—(আমি জৈন হিন্দু নহি) বলিয়া আস্ফালন করিয়া আসিয়াছেন—হিন্দুর কোন অনুষ্ঠানে পর্য্যন্ত যিনি কোনোদিন যোগ দেন নাই—তাঁহার বাড়ীতে নিমন্ত্রণে গিয়া শ্রীশ্রীগুরু মহারাজ ও শ্রীশ্রীমহাদেবের আসন ও পূজার আড়ম্বর দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি, থিয়োসফিষ্ট হিন্দুর বাড়ীতে তো আমাদিগকে শ্রীশ্রীসঙ্ঘ নেতার মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া শ্রীমূর্ত্তির স্থাপনা করিতে হইয়াছে এবং তাহার পর হইতে নিয়মিত পূজারতিও চলিতেছে। স্বামীজির বক্তৃতার পর হিন্দুগণ সিগারেট ছাড়িয়াছে, সুরাপান করিবে না বলিয়া সর্ব্বসমক্ষে সংকল্প করিয়াছে—এরূপ দৃষ্টান্ত দুই চারিটা নহে অজস্র আছে। সংগঠনের বিষয়েও সেইরূপই ঘটিয়াছে। যেখানে যত বড়ই মনোমালিন্য থাকুক না কেন, সংগঠনের বক্তৃতার পর যাহারা সমাজে এতদিন সংগঠনের অন্তরায় ছিল তাহারা আসিয়া স্বামীজির চরণ প্রান্তে নিতান্ত অপরাধীর বেশে শিশুর মতো আত্মসমর্পণ করিয়াছে। পরে সেই হইয়াছে সংগঠনের সবচেয়ে উৎসাহী কর্ম্মী।

গতানুগতিকতার অবসান ঘটাইয়া এদেশের হিন্দুসমাজ বর্ত্তমানে

[illegible] প্রগতির পথে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে; কিন্তু তবুও প্রগতির নামে উচ্ছৃঙ্খলতাকে আশ্রয় করে নাই। যদিও পাশ্চাত্য প্রথা আসিয়া জাতির জীবনপথের সঙ্গী হইয়াছে, তথাপি ভারতীয় আদর্শই তাহার পথ নির্দ্দেষ্টারূপে বিরাজিত। যে হিন্দুজাতির ধমনীতে ধমনীতে সংস্কৃতি ও ধর্ম্মের প্রভাব রক্তের সহিত ওতঃপ্রোতভাবে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে—তাহার ধ্বংস সাধন করিয়া যাঁহারা হিন্দু জাতিকে পাশ্চাত্য আদর্শে ধর্ম্মহীন জাতিতে পরিণত করিতে আগ্রহশীল, তাঁহাদের বাতুল ব্যতীত আর কী বলা যাইতে পারে। আজও হিন্দুগণ ধর্ম্মের নামে যেরূপে একতাবদ্ধ হয়, ধর্ম্মের ভিত্তিতে যেরূপ দ্রুত সংগঠিত হইয়া উঠে, ধর্ম্মানুষ্ঠানে যেরূপ আগ্রহের সহিত অংশ গ্রহণ করে—সেরূপে আর কোন কিছুতেই দেখা যায় না। তাহাতেই মনে হয় যে ধর্ম্মের ভিত্তিতেই হিন্দু জাতির সমাজ তথা জীবনসৌধ নির্ম্মাণ সম্ভব। তবে প্রাচীনের সহিত নবীনের সমন্বয় যেখানে অপরিহার্য্য হইয়া উঠে—সে ক্ষেত্রে নবীনের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করিলে চলিবে না।

নানা রকম কর্ম্ম পদ্ধতির মধ্য দিয়া ডার-এস-সালামে আমাদের দিনগুলি কাটিতে লাগিল। প্রত্যহ ত্রিসন্ধ্যা পূজা ও বীরত্ব-ব্যঞ্জক আরতি দর্শনের জন্য লোকের ভিড় জমিতে লাগিল। যাহারা কোনদিন সাধু-সন্ন্যাসী দেখে নাই তাহারা—এমন কি ইউরোপীয়ানগণও আসিয়া আমাদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিতে লাগিল—পূজা আরতি সমবেত প্রার্থনাদিতে যোগ দিতে লাগিল। স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বৃদ্ধ, উকিল-ব্যারিষ্টার, ... দিনমজুর—সকলেই সমবেত প্রার্থনায় যোগদান করিতে লাগিল। সমবেত সিদ্ধনাথ 'ওঁ হরগুরু শঙ্কর শিব-শম্ভু,' ওঁ গুরু কৃপাহি কেবলম্' রামধুন প্রভৃতি কীর্ত্তন গান মাতোয়ারা হইয়া সকলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গাহিতে সুরু করিল। সে এক অপূর্ব্ব ভাবের জোয়ারা ছুটিল। হিন্দুস্থান হইতে এত দূর দেশে এত পাশ্চাত্য ভাবাদর্শের মধ্যে থাকিয়াও এই ধর্ম্মভাব সত্যই ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা ও আন্তরিকতার পরিচায়ক। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে প্রত্যহই সভার অনুষ্ঠান হইতে লাগিল। মিশনের নেতা স্বামী অদ্বৈতানন্দজী ইংরাজী, হিন্দুস্থানী এবং গুজরাটি ভাষায় 'ভারতীয় সংস্কৃতির আদর্শ,' 'হিন্দু ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য,' 'হিন্দু-সংগঠনের উপায়,' গীতা-ধর্ম্ম, 'যুগ-ধর্ম্ম', 'বর্ত্তমান সভ্যতা এবং ভারতীয় সভ্যতার পার্থক্য,' 'স্বাধীন ভারতের নাগরিকের দায়িত্ব,' 'বহির্ভারতে ভারতীয় যুবকের কর্ত্তব্য,' 'রাষ্ট্রগঠনে পুস্তকালয়ের দায়িত্ব ও প্রয়োজনীয়তা,' 'বর্ত্তমান যুগে জৈন ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা' 'ব্যায়াম ও ব্রহ্মচর্য্য,' 'আত্মজ্ঞান,' 'ব্রহ্মবিদ্যা' প্রভৃতি বিষয়ে এক একদিন বক্তৃতা করিতে লাগিলেন।

শারীপুত্র ও মৌদ্গাল্যায়ন

শ্রীসুবোধচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে একদিন মগধের রাজধানী রাজগৃহে একখানি সংস্কৃত পৌরাণিক নাটকের অভিনয় হচ্ছে। নান্দীপাঠ সমাপ্ত হ'ল। কুশলী অভিনেতৃবর্গের বচন-চাতুর্য্যে, পরম রমণীয় দৃশ্যাবলীর অপরূপ মাধুর্য্যে দর্শকবৃন্দ মুগ্ধ ও অভিভূত হয়ে অভিনয় দর্শন কচ্ছেন। প্রাণস্পর্শী দৃশ্যের পর দৃশ্য, সুললিত শব্দের অপূর্ব্ব বচনভঙ্গী, ভাবের মাধুর্য্যে দর্শকবৃন্দের অন্তর আলোড়িত কর্ত্তে লাগল। তাঁরা ভুলে গেলেন যে তাঁরা সম্মুখে অভিনয় দেখছেন। কখনও ভাবাবেগে তাঁদের হৃদয় কঠিন ও কঠোর হয়ে উঠছে, কখনও ভাবের আতিশয্যে তাঁরা অশ্রুবর্ষণ কচ্ছেন। অভিনয় শেষ হ'ল। নালক গ্রামবাসী বাল্যবন্ধু দুই ব্রাহ্মণ যুবক অভিনয় শেষে বাইরে এলেন। অভিনয় দর্শনে এই তরুণ তাপসদ্বয়ের প্রসুপ্ত বৈরাগী মন জাগ্রত হয়ে উঠল। অপস্রিয়মান এই জগতের অনিত্যতা তাঁরা হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি কর্লে'ন। নগরোপান্তে তাঁরা এক নদী তীরে গিয়ে বসলেন। স্থির করেন—অসার সংসার ত্যাগ করে তাঁরা সন্ন্যাস গ্রহণ কর্ব্বেন। উভয় বন্ধু প্রতিজ্ঞা কর্লে'ন—সত্যের উপলব্ধি একের হৃদয়ে উদয় হ'লে, অপরকে সেই পথের সন্ধান এঁদের একজনের নাম উপতিষ্য, অপরের নাম কোলিত।

পরিব্রাজক সঞ্জয় তখন সশিষ্য রাজগৃহে অবস্থান কচ্ছিলেন। ব্রাহ্মণ যুবকদ্বয় তাঁর নিকট শিক্ষায় ব্রতী হয়ে শিক্ষা সমাপ্ত করেন। কিন্তু সন্তুষ্ট হতে পারেন না। তখন স্থিরপ্রতিজ্ঞ সত্যানুসন্ধানী এই দুই তরুণ সন্ন্যাসী সত্যদর্শী প্রকৃত গুরুর সন্ধানে নানা দেশে ধাবিত হলেন; কিন্তু বিফল হ'য়ে ফিরে এলেন। এই সময় প্রভু বুদ্ধ তাঁর প্রথম ৬০ জন শিষ্যকে বিভিন্ন স্থানে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারে নিয়োজিত করেছিলেন। একদিন উপতিষ্য পরিব্রাজকারাম হ'তে আহার শেষ করে ফিরছেন। তখন দিবসের প্রথম ভাগ। রাজপথে দেখলেন ভিক্ষু অশ্বজিৎ পিণ্ড প্রার্থনা করে ফিরছেন। তাঁর শান্ত সমাহিত ভাব, তপস্যাপূত কান্তি, আয়ত তেজঃপূর্ণ মুখমণ্ডল, জ্যোতিপূর্ণ নয়নের স্নিগ্ধদৃষ্টি, মুণ্ডিত মস্তক, গৈরিক বেশ দেখে উপতিষ্য মুগ্ধ হ'লেন। মনে করেন—ইনি অতীন্দ্রিয় জগতের লোক, সত্যের দ্বার নিশ্চয়ই এঁর নিকট উন্মুক্ত। তখনও ভিক্ষুর আহার হয়নি। সুতরাং তিনি তখন অশ্বজিৎকে কোন প্রশ্ন করেন না। নীরবে তাঁর অনুসরণ করেন। ভিক্ষা গ্রহণ শেষ হ'লে উপতিষ্য তাঁর সঙ্গে আলাপ করে জানলেন, করুণা ও মৈত্রীর শিক্ষক, বিশ্বজনের বন্ধু, শাক্য সন্তান মহাশ্রমণ তথাগতই তাঁর গুরু। অশ্বজিতের বিবৃতি [illegible]

বলেছেন—জগতের যাবতীয় বস্তু 'হেতু' হ'তে সমুৎপন্ন। ভগবান বুদ্ধ সেই 'হেতু' অর্থাৎ মূল কারণ আবিষ্কার করেছেন এবং কিরূপে কার্যকারণ শৃঙ্খলার উপশম হয় তাহাও তিনি উপলব্ধি করেছেন।

"যে ধম্মা হেতুপ্পভবা
তেসং হেতুং তথাগতো আহ।
তেসং চ যো নিরোধো
এবং বাদী মহাসমণোতি।"

জিজ্ঞাসু উপতিষ্য এই সংক্ষিপ্ত আলাপের গভীর মর্ম উপলব্ধি করে ধর্মচক্ষু লাভ করলেন। বিরাট এক আত্মোপলব্ধির দীপশলাকার স্পর্শে সত্যসন্ধানীর মনে 'সোতাপত্তি' ভাবের উদয় হ'ল। বহু আকাঙ্ক্ষিত সত্যের অদ্ভুত সন্ধান পেয়ে সাধুর প্রতি ভক্তি ও কৃতজ্ঞতায় তাঁর মন আপ্লুত হয়ে উঠল। তিনি সন্ন্যাসীর নিকট ভগবান বুদ্ধের সন্ধান পেলেন। তখন বাল্যবন্ধুকে এই সংবাদ জানাবার জন্য নিজ গ্রামে উপস্থিত হলেন। কোলিত বন্ধুর মুখে সত্যের বাণী শুনে মুগ্ধ হলেন। তখন উভয়ে তাঁদের গুরু পরিব্রাজক সঞ্জয়ের নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকেও প্রভু বুদ্ধ দর্শনে যাবার জন্য অনুরোধ করলেন। কিন্তু বার্ধক্য হেতু তিনি অক্ষমতা জ্ঞাপন করলেন।

ভগবান তথাগত তখন রাজগৃহের বেণুবনে অবস্থান কচ্ছেন। তাঁদের মায়ামন্ত্রে চারিদিকে নবজীবনের সাড়া পড়েছে। বনানীর শ্যাম-শোভা, বিহগের কলগান ও মলয় হিল্লোলে যেন চারিদিক উছলে পড়ছে। উপতিষ্য ও কোলিত ভগবান তথাগতের নিকট অগ্রসর হতে লাগলেন। তথাগত অনুচরসহ তাঁদের দূর হ'তে দেখতে পেয়ে ভিক্ষুগণকে বল্লেন—অগ্রবর্তী এই দুইজন আমার অগ্রশ্রাবক-যুগলের পদ লাভ করবে। উপতিষ্য ও কোলিত প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা প্রার্থনা করে তাঁর চরণে লুটিয়ে পড়লেন। সেইদিন হতে তাঁদের নাম হ'ল শারীপুত্র ও মৌদ্গল্যায়ন। তাঁদের মাতা শারী ও মুদ্গলের নামে তাঁদের এই নাম হল।

শাক্যসিংহ বুদ্ধত্ব লাভ করেছেন—এই সংবাদ কপিলাবস্তুতে পৌঁছিতে দেরী হ'ল না। পিতা শুদ্ধোধন আনন্দে অধীর হ'য়ে পুত্রকে দেখবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। দূতের পর দূত পাঠালেন। ভগবান নীরবে সম্মতি প্রকাশ করলেন। ভিক্ষু সঙ্ঘে পরিবৃত হয়ে তিনি কপিলাবস্তুর দিকে অগ্রসর হলেন। পথ লোকে লোকারণ্য। চারিদিকে শুধু জনস্রোত। রাজধানীর ঘরে ঘরে বেজে উঠল শত শত শঙ্খ। যশোধরা গবাক্ষপথে দেখতে পেলেন—তাঁর দয়িত জনতার মধ্য দিয়ে আসছেন—পিছনে ভিক্ষুসঙ্ঘ। তাঁর দৃষ্টিতে ঝরে পড়ছে পরম শান্ত ও সমাহিত ভাব; তিনি ভাবে বিভোর। গতি তাঁর ধীর ও মন্থর, মুখ তাঁর উজ্জ্বল ও জ্যোতির্ময়, দেহ তাঁর এক অপরূপ ছন্দে লীলায়িত। যশোধরা সমগ্র প্রাণ দিয়ে এই দৃশ্য দেখলেন; হৃদয় তাঁর উদ্বেল হয়ে উঠল। চোখ তাঁর জলে ভরে এল। ছয় বৎসরের শিশু রাহুলকে বুকে জড়িয়ে ধরে সন্ন্যাসীকে দেখিয়ে বল্লেন—"বাবা!" রাহুল মুখ তুলে মায়ের মুখের দিকে তাকায়। যশোধরা বল্লেন—"ঐ বাবা!" তিনি তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন।

নির্ভীক সিংহশাবকের মত রাহুল পিতৃদর্শনে চলে। মা বলে দিলেন—"পিতার কাছে তোমার পিতৃধন চেয়ে নিও।" শিশু জনতার মধ্যে গিয়ে পিতার হাত ধরে দাঁড়াল। ভগবান তথাগত স্নিগ্ধ, করুণ ও স্নেহার্দ্র নেত্রে শিশুর দিকে তাকালেন। শিশু বলে,—"বাবা, আমাকে পিতৃধন দাও।" তিনি স্মিতহাস্যে বল্লেন—পিতৃধন? ধন-সম্পদ আমার ত কিছুই নেই। আমি যে সম্পদের অধিকারী, তুমি সেই সম্পদ নেবে? পুত্র সম্মত হ'ল। তখন তিনি প্রধান শিষ্য শারিপুত্রকে আদেশ দিলেন, "রাহুলকে ভিক্ষু মন্ত্রে দীক্ষিত কর।"

শারিপুত্র বিস্মিত হলেন। ভগবান তথাগত শিশুকে ভিক্ষুত্বে বরণ করবার পথ দেখিয়ে দিলেন। শারিপুত্র তাই করলেন। কিন্তু বৃদ্ধ রাজা শুদ্ধোধনের কানে যখন এই সংবাদ পৌঁছল তিনি শোকে দুঃখে অধীর হয়ে উঠলেন। তাঁর একমাত্র অবলম্বন, তাঁর শ্রেষ্ঠ সম্পদ তাঁর বুক থেকে খসে পড়ল। সেও ভিক্ষু হয়ে তাঁকে ত্যাগ করল! বুকফাটা ক্রন্দন তাঁর গলা দিয়ে বেরিয়ে আসবার মত হ'ল। রাহুলও তাঁকে ত্যাগ করে চলে গেল! সিদ্ধার্থ যখন তাঁকে ত্যাগ করেছিল সেও সহ্য হয়েছিল। কিন্তু তাঁর শেষ অবলম্বন, তাঁর চিরসহচর রাহুল! সে পিছনে ফেলে রেখে গেল বিশাল সম্পদ, জননী, পিতামহী ও বৃদ্ধ স্নেহাতুর পিতামহ! তথাগতকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—কোন অধিকারে, কিসের জন্য তুমি আমার শ্রেষ্ঠ সম্পদ, একমাত্র অবলম্বন, আমার অন্ধের যষ্ঠি তুমি আমার বুক থেকে ছিনিয়ে নিলে? ভগবান তথাগত স্তব্ধ হয়ে রইলেন; তিনি তখন স্থির করলেন, পিতামাতার বিনা অনুমতিতে আর কাউকেই তিনি বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করবেন না।

শারিপুত্র বুদ্ধদেবের প্রিয়তম শিষ্য ছিলেন। ভিক্ষুসঙ্ঘে তিনি দক্ষিণমুখী হয়ে ভগবান তথাগতের দক্ষিণে বসতেন, আর মৌদ্গল্যায়ন বামে বসতেন। দুইজনেই ছিলেন বাল্যবন্ধু। এক গ্রামবাসী একদিনে এক লগ্নে তাঁদের জন্ম।

শারিপুত্র তথাগতকে স্বয়ং ভগবান বলেই মনে কত্তেন। একদিন তিনি তথাগতকে বল্লেন, ভদন্ত, আমার এমনই দৃঢ় বিশ্বাস যে আপনার অপেক্ষা জ্ঞানী এবং মহত্তর ব্যক্তি পৃথিবীতে কখনও জন্মগ্রহণ করেন নি এবং করবেন না। বুদ্ধদেব উত্তর দিলেন—পূর্ব্বে যে সপ্তবুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেছেন এবং ভবিষ্যতে যাঁরা জন্মগ্রহণ করবেন শারিপুত্র ত তাঁদের কাউকেই জানতেন না এবং জানেন না। আর তাঁর অন্তর সম্বন্ধে শারিপুত্র সমস্ত বিষয় অবগত নন। তবে কেন তাঁর এ ভ্রান্ত ধারণা হ'ল যে তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা জ্ঞানী এবং মহত্তম ব্যক্তি?

বুদ্ধদেব বলতেন যে শারিপুত্রের ধৈর্য্য ও বিনয় জননী ধরিত্রীর মত অতুলনীয়। তিনিই একমাত্র বৌদ্ধধর্মের মর্ম সম্পূর্ণরূপে বুঝতেন; তিনিই ভগবান তথাগতের মত সুন্দরভাবে ও ভাষায় ও সুললিত ছন্দে বৌদ্ধধর্মের ব্যাখ্যা কত্তে পাত্তেন। আর মৌদ্গল্যায়ন অদ্ভুত

কঠোরতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে ধর্মপালন করতেন। সঙ্ঘের নিয়মানুবর্ত্তিতার ভার ছিল তাঁর ওপর।

অন্তিম দিন সমাগত বুঝে শারিপুত্র নালন্দায় (নালক) গমন করেন। সেখানে বৃদ্ধা জননীকে দীক্ষিত করে তাঁকে মুক্তিমার্গের প্রকৃত পথ বুঝিয়ে দেন। মাতার সহিত সাক্ষাতের পরদিন বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ লাভের কয়েক মাস পূর্ব্বে কার্ত্তিকী পূর্ণিমা তিথিতে শারিপুত্র আমাশয় রোগে পরিনির্ব্বাণ লাভ করেন। বৃদ্ধা শোকাতুরা মাতা তাঁর পদদ্বয় চুম্বন করে বল্লেন—অতি বিলম্বে তোমার মহত্ত্ব উপলব্ধি করলাম। মহাসমারোহে তাঁর অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন হল। বহু রাজা মহারাজা শ্রমণ ও দরিদ্র গ্রামবাসী এই শ্রদ্ধেয় মহাপ্রাণের চুলিতে সুগন্ধ চন্দন কাঠ দিল, সুবাসিত দ্রব্যের অর্ঘ্য দিল।

তখন ভগবান তথাগত কোশলের রাজধানী শ্রাবস্তী নগরে অবস্থান কচ্ছিলেন। শারিপুত্রের দেহাস্থি একটি কৌটায় করে তথাগতের নিকট আনা হ'ল। তিনি একটি স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়ে শ্রাবস্তীতে সেই দেহাস্থি তার ভিতর সমাহিত করবার ব্যবস্থা করেন। এই পূত অস্থি অশোকযুগে ভূপালে সাঁচিস্তূপে স্থানান্তরিত হয়ে সংরক্ষিত হয়েছিল।

দ্বিতীয় শ্রাবক মৌদ্গল্যায়ন ছিলেন ঋদ্ধির অধিকারী, মহাশক্তিশালী ব্যক্তি। তিনি আশ্চর্য্য ঘটনার সমাবেশ কত্তে পাত্তেন। এই জন্য ব্রাহ্মণরা তাঁকে অত্যন্ত হিংসা কত্তেন এবং তাঁকে হত্যা করবার সুযোগ খুঁজছিলেন। তিনি রাজগৃহের অন্তর্গত কালশিলা নামক স্থানে এক কুটীরে অবস্থান কচ্ছিলেন। পর পর তিনবার দুর্বৃত্তরা তাঁকে আক্রমণ করে। প্রথম ও দ্বিতীয় আক্রমণের সময় তিনি অলৌকিক শক্তিপ্রভাবে কুটীরের কোণ ভেদ করে আক্রমণ ব্যর্থ করেন। তৃতীয় বার আক্রমণের সময় তিনি বুঝতে পাল্লেন যে পূর্ব্ব জন্মের পিতৃমাতৃ হত্যার কর্ম্ম ফল তাঁকে ভোগ কত্তেই হবে। তখন দস্যুরা কঠিন লৌহদণ্ড দিয়ে নির্দ্দয় আঘাতে তাঁর মাথা ও দেহ মাংস পিণ্ডে পরিণত করল। তখন সেই মাংসপিণ্ড ঋদ্ধিবলে আকাশ মার্গে গমন করে তথাগতের পাদমূলে উপস্থিত হ'ল। সেই মাংসপিণ্ড মৌদ্গল্যায়নের স্বরে কালশিলায় পরিনির্ব্বাণ লাভের অনুমতি প্রার্থনা করল। তারপর সেই মাংসপিণ্ড আকাশ মার্গে কালশিলায় ফিরে গিয়ে পরম শান্তিময় লোকে প্রস্থান করল। এইরূপে শারীপুত্রের মৃত্যুর একপক্ষকাল পরে কার্ত্তিকী অমাবস্যাতে মৌদ্গল্যায়নের দেহাবসান হ'ল। রাজগৃহের এক স্তূপের অভ্যন্তরে তাঁর দেহাবশেষ সমাহিত হ'ল।

দু হাজার বৎসরেরও অধিককাল পরে ১৮৫১ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী জেনারেল কানিংহাম্ সাঁচির তৃতীয় স্তূপ হ'তে অতি অপূর্ব্ব দুটি অস্থি মঞ্জুষা আবিষ্কার করেন। স্তূপের মধ্যে একটি গহ্বরের মধ্যে দুটি আধার ছিল। প্রথমটিতে ব্রাহ্মী লিপিতে লেখা ছিল "সারিপুতস্" আর দ্বিতীয়টাতে লেখা ছিল "মহামোগ্গলানস্।" আবিষ্কৃত হওয়ার পর সে দুটি চলে যায় ইংলণ্ডের ভিক্টোরিয়া ও এলবার্ট মিউজিয়মে। সেখানে এই পূতাস্থি ৬০ বৎসর সেই অবস্থায় ছিল। বিগত ১৯৩৯ সালে ভারতীয় বৌদ্ধগণের পক্ষ হতে মহাবোধী সোসাইটীর সম্পাদক সে দুটি পূতাস্থি ভারতে প্রত্যর্পণের দাবী করেন। সেই দাবী স্বীকৃত হয়। কিন্তু হঠাৎ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের জন্য সেই অস্থি মঞ্জুষা এ দেশে আনা সম্ভব হয় নি। যুদ্ধ শেষে শান্ত পরিবেশের মধ্যে লণ্ডনে এক আড়ম্বর পূর্ণ অনুষ্ঠানে লর্ড পেথিক লরেন্স ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ২০শে ফেব্রুয়ারী সিংহলস্থ মহাবোধী সোসাইটির সম্পাদক শ্রীযুক্ত দয়া হেবাবিতারণেকের হাতে সমর্পণ করেন। সেই বৎসর ১৪ই মার্চ্চ এই দেহাস্থি সিংহলে আনীত হ'ল। ৩০ লক্ষ সিংহলবাসী দেড় মাইল দীর্ঘ এই শোভাযাত্রার অনুগমন করে। ১৯৪৮ সালের অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত এই দেহাস্থি সিংহলের কলম্বো মিউজিয়মে রাখবার ব্যবস্থা করা হয়। তারপর গত ১৩ই জানুয়ারী প্রায় এক শত বৎসর পরে সারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়নের পূতাস্থি আবার ভারতে ফিরে এসেছে। ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু গত ১৪ই জানুয়ারী ভারতের মহাবোধি সোসাইটির সভাপতি শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের হস্তে ভগবান বুদ্ধের প্রধান শিষ্যদ্বয়ের পূতাস্থি কলিকাতায় গড়ের মাঠে গম্ভীর ভাবোদ্দীপক এক প্রশান্ত পরিবেশের মধ্যে সমর্পণ করেন। ভূপালের নবাবের ইচ্ছানুসারে সাঁচীতে এক নব-পরিকল্পিত চৈত্যগিরি বিহারে এই চিতাভস্ম রাখা হ'বে। যাঁরা জীবনে ছিলেন অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ, মৃত্যুও তাঁদের পৃথক করতে পারে নি।

ধরা ও অধরা

শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ আই-সি-এস

হে প্রেয়সী ধরা, দিলে না ত ধরা,
চলে যাই তবে দূরে ;
মিতি আশাবাদী—কতো সাধাসাধি
করেছি পরাণ বধূরে ;
ব্যাকুল বাহুর বিজন বন্ধনে

দিলে না জ্বালায়ে প্রেমের প্রদীপটিরে,
অশান্ত মোর হিয়া ক্লান্তিতে ভরা,
তাই চলে যাই উন্মনা অধীরে
দূরে যাই তবে প্রেয়সী বসুন্ধরা।
আহ্বান করে ঘরে ঘরে ঘরে

ঢেকে ঢেকে যায় মুছে দিয়ে তার
উদাম চঞ্চল,
খর রৌদ্রের উত্তাপ তৃষার
মরুময় জ্বালা জ্যৈষ্ঠের হুতার
সব ডোবে সব বিস্মৃতি সরোবরে
অতল অপার নিকষ কৃষ্ণতার,
সুধীরে ব্যজনি' দক্ষিণ বায়ুভরে
স্নিগ্ধ শান্তি ছড়াবে সর্ব ঠাঁয়।
নীচে গিরিমালা শিরে বারি ঢালা
সমাপ্ত করি' যবে
মেঘমায়া মাঝে ঘন নীল সাজে
মাতিবে মহোৎসবে
কল্পলোকের আলোকে অন্ধকারে
বিলুপ্ত হ'য়ে মেঘমন্দ্রের ভারে
আরো দূরে গিয়ে মু'খানি লুকিয়ে রবে,
যাব চ'লে ল'য়ে দুঃখের পশরা ;
উদাসীনা তুমি নিশ্চল তুমি রবে
দূরে রবে দূরে, প্রেয়সী বসুন্ধরা।
পারি না ধরিতে তবুও বরিতে
সুদূর নীলাম্বরে
কত যে প্রয়াস কত উচ্ছ্বাস
তব প্রেম গুঞ্জনে ;
কত বিষাদে রচেছি স্বর্গমায়া,
প্রতি নিঃশ্বাসে স্বপ্নে করেছি কায়া,
তুমি কি জান না তুমি কি বোঝ না কিছু,
সুদূর স্বপ্নে রহিলে কি অধরা ?
বক্ষে পিপাসা পক্ষীর মত পিছু
ছুটিয়া চলেছি মৃগতৃষ্ণিকা ভরা।
বুকেতে তোমার মুকুতার হার
প্রেম পিপাসার জল,
মুখেতে আমার মরু হাহাকার
তৃষ্ণা জ্বলে অবিরল,—
হৃদয় যাহা লাঞ্ছনা শুধু লভে
নয়ন বাসনা মেঘদল সম যবে
খেলা করে যায় হিয়া পিপাসায় ভরি',
তৃষিত চাতক চাহনীর মত চাই,—
কেটে যায় হেরি দিবস শর্বরী ;
তবুও তোমারে ধরিতে ত নাহি পাই।
যত দূরে ধাই সমুখেতে চাই
শূন্য নিরখি শুধু,
ঘন গরজনে ব্যোমযান সনে
ঢেকে যায় ধরাবধু ;
উলটি' পালটি' সবলে সাপটি'
উদাম ঝড় ভয়ে ঝটাপটি,—

কত অসহায় কত দূরে হায় ঝড়ে
নীড় হারা পাখী অনন্ত সন্ধানে ;
সহসা হাসিয়া রুদ্ররোষের ঘোরে
চকিত চমকে বিদ্যুৎদাম হানে।
আঁধারে আঁধার সব একাকার
কুহেলী চন্দ্রাতপে ;
আলো উচ্ছ্বাস আরো উল্লাস,
হিয়া কি তন্দ্রা জপে ?
এমন জীবন সন্ধ্যার নবতীরে
পরাণ রজনীগন্ধার মত কি রে
উঠিল বিকশি, অসীমেতে পশি' হোথা
ভুলিয়া ধরার দুঃখ নিরাশা রাশি ?
যায় যদি যাক নাহি রবে ফাঁক কোথা
বেজে য'দি ওঠে বিসর্জনের বাঁশী।
আমি আছি রাজী অ'ভিসারে সাজি'
মরণ মহোৎসবে
পরাণের সাথে পরাণ মিলাতে
ডাক দিবে তুমি যবে ;
বাড়ায়ে রেখেছি উন্মুখ হাত
আহ্বান য'দি কখনো হঠাৎ
করো মোরে পাবে, গভীর আঁধারে কভু
হবে না ডাকিতে বিদ্যুৎ সম্ভারে ;
আঁখির চাহনি মৃদু হাতছানি তবু
দিলে না কখনো অলক্ষ্য ঝঙ্কারে।
আরো কতক্ষণ পরম লগন
আসিতে রহিবে বাকী ?
বুঝিনু আমায় কেহ নাহি চায়
আশা নিরাশায় থাকি।
অনন্ত লীলা অন্তের সাথে,
মৃত্যু মাধুরী জীবনের হাতে
রেখেছে মিশায়ে মিলন বিদায়ে মাখা
সুখ দুঃখেতে লাভ অলাভেতে ভরা,—
তাই বুঝি প্রিয়ে তব মধু হিয়ে আঁকা
রাগে অনুরাগে মোহিনী বসুন্ধরা।
দাও ঢেকে দাও, হইব উধাও
অনন্ত সন্ধানে,
ধরা ও অধরা সবি সুখহরা
শুধু অশান্তি হানে,—
যাহারে চেয়েছি মৃন্ময়ী প্রতিমায়
এড়ায়ে রহে সে চিন্ময় অসীমায় —
সীমার মাঝারে ধূলার ধরণী মাঝে
যদি সে এসেছে—পরম ভাগ্য মানি ;
হেরেছি তাহারে অনন্ত রূপসাজে
আমারি হৃদয়ে ধরার অধরা রাণী।

ভুজঙ্গ-প্রয়াত

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

১

দীপালী উৎসবের কিছুদিন পূর্বে সোমনাথের ছবি শেষ হইল। এই অপরান্ত প্রদেশে দীপালীই বৎসরের সর্বশ্রেষ্ঠ পর্ব ও নূতন খাতা। এই সময় শ্রেষ্ঠী সম্প্রদায় নূতন করিয়া ছুরি শানাইয়া ব্যবসা বাণিজ্য আরম্ভ করেন।

চলচ্চিত্রও ব্যবসা। ছবি তৈয়ার হইলে তাহাকে সম্প্রদান করার পালা। কন্যা বয়স্থা হইলে যেমন পাত্রের সন্ধানে বাহির হইতে হয়, ছবি তৈয়ার হইলেও অনুরূপ ব্যবস্থা। চিত্র-জনকেরা তখন ঘটকের দ্বারস্থ হন। চিত্র সমাজে এই ঘটকের অখণ্ড প্রতাপ।

ভবানীর ভ্রূকুটি ভঙ্গী যেমন শিবই বোঝেন, গিরিরাজ বোঝেন না। তেমনি ছবি যাহারা প্রস্তুত করে অতি পরিচয়ের ফলে ছবির সৌন্দর্য বুঝিবার ক্ষমতা আর তাহাদের থাকেনা। এই সূত্রে ছবির পরিবেশকেরা আসিয়া আসর জুড়িয়া বসেন। ইঁহারা ছবির জহুরী এবং দালাল। অর্থব্যয় করিয়া ছবি তৈয়ার করা ইঁহাদের কাজ নয়, আবার ছবিঘর প্রস্তুত করিয়া ছবি প্রদর্শন করাও ইঁহাদের কর্তব্যের মধ্যে গণ্য নয়। ইঁহারা কেবল একজনের প্রস্তুত ছবি অন্য একজনকে সাধারণে প্রদর্শন করিবার অধিকার দিয়া দালালিটুকু আত্মসাৎ করেন। ধনিকতন্ত্রের আমলে অধিক পরিশ্রম না করিয়া এবং সর্বপ্রকার লোকসানের ঝুকি বাদ দিয়া অর্থ উপার্জনের যতগুলি পন্থা আবিষ্কৃত হইয়াছে, ছবির ডিষ্ট্রিবিউশন তাহাদের মধ্যে একটি।

সোমনাথের ছবি দেড় লাখ টাকার মধ্যেই প্রস্তুত হইয়াছিল; কিন্তু সে কথা সোমনাথ, পাণ্ডুরঙ ও রুস্তমজি ছাড়া আর কেহ জানিত না। ছবির কাট-ছাট শেষ হইলে একদা রাত্রিকালে রুস্তমজি সোমনাথ পাণ্ডুরঙ ও ইন্দুবাবু নিভৃতে বসিয়া ছবিখানি আগাগোড়া দেখিলেন। দেখিয়া কিন্তু ছবির ভাল-মন্দ সম্বন্ধে কেহ কোনও মন্তব্য করিতে পারিলেন না। সোমনাথ গালে হাত দিয়া বসিল। ছবি যদি জনসাধারণের মুখরোচক না হয়? রুস্তমজির অন্য ছবিগুলি যে পথে গিয়াছে এটিও যদি সেই পথে যায়? যে আশা ভরসা ও উদ্যম লইয়া সে ছবি আরম্ভ করিয়াছিল এখন আর তাহার বিন্দুমাত্র অবশিষ্ট নাই। যে গল্প তাহার এত ভাল লাগিয়াছিল তাহাই এখন একেবারে আলুনি ও নিরামিষ মনে হইতেছে।

পাণ্ডুরঙ ও ইন্দুবাবুর অবস্থা তাহারই মতো। কেবল রুস্তমজি ভরসা দিলেন, 'তুমি ভেবোনা। আমি ব্যবস্থা করছি।'

পরদিন সন্ধ্যার পর রুস্তমজির গুটিকয় বন্ধু ষ্টুডিওতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রুস্তমজি তাঁহাদের নৈশ ভোজনের নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। সকলেই চিত্র-পরিবেশক। সোমনাথ, পাণ্ডুরঙ ও ইন্দুবাবু নিমন্ত্রিত [illegible]।

আহারের আয়োজন রাজকীয়; সঙ্গে তরল দ্রব্যেরও ব্যবস্থা আছে। সকলে লম্বা টেবিলে আহারে বসিলেন; নানাবিধ রঙ্গ পরিহাসের মধ্যে আহার চলিল। সকলেই জানিতেন এই নিমন্ত্রণের একটি বিশেষ উদ্দেশ্য আছে; কিন্তু কেহই সে কথার উল্লেখ করিলেন না।

পানাহার শেষ হইলে রুস্তমজি সকলকে আহ্বান করিয়া ষ্টুডিওর প্রোজেক্শান হলে লইয়া গেলেন। ছোট একটি প্রেক্ষা-গৃহ; ছবি তোলার সঙ্গে সঙ্গে ছবি কেমন হইতেছে তাহা পরীক্ষা করার জন্য প্রত্যেক ষ্টুডিওতেই এইরূপ একটি প্রেক্ষা-গৃহ থাকে।

লম্বাটে ধরণের একটি ঘর; তাহার একপ্রান্তে একটি পর্দা, অপর প্রান্তে কয়েকটি চেয়ার সাজানো। মাথার উপর টিম্ টিম্ করিয়া একটি ক্ষীণ আলো জ্বলিতেছে। সকলে গিয়া উপবিষ্ট হইতেই আলো নিভিয়া গেল, ছবি দেখানো আরম্ভ হইল।

দুই ঘণ্টা পরে ছবি শেষ হইলে সকলে আবার অফিস ঘরে আসিয়া সমবেত হইলেন। কেবল পাণ্ডুরঙ রুস্তমজির অনুমতি লইয়া বাড়ী চলিয়া গেল।

রুস্তমজি এবার অতিথিদের স্পষ্ট প্রশ্ন করিলেন, 'ছবি কেমন লাগল আপনাদের?'

সকলেই পরস্পরের পানে আড়চোখে চাহিয়া মুখ কাঁচুমাচু করিলেন। তাঁহাদের ভাবভঙ্গী দেখিয়া সোমনাথের বুক দমিয়া গেল। ইঁহারা অবশ্য ব্যবসাদার লোক; কোনও ছবিকে মন খুলিয়া ভাল বলেন না, পাছে ছবির দর বাড়িয়া যায়। কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে তাঁহাদের ভাব দেখিয়া মনে হইল, সত্যই তাঁহারা ছবি দেখিয়া নিরাশ হইয়াছেন।

বাপুভাই নামক একজন প্রবীণ পরিবেশক জিজ্ঞাসা করিলেন— 'ছবি কে ডিরেক্ট করেছে রুস্তি ভাই?'

সোমনাথকে দেখাইয়া রুস্তমজি বলিলেন,—'ইনি করেছেন।'

বাপুভাই তখন সোমনাথকে একটু আড়ালে লইয়া গিয়া উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন। লোকটি ঘোর অশিক্ষিত, কিন্তু মিষ্টভাষী। সোমনাথকে তিনি বুঝাইতে লাগিলেন যে প্রথম চেষ্টা হিসাবে ছবিটি মন্দ না হইলেও পাবলিকের চিত্তাকর্ষক ছবি তৈয়ার করা একদিনের কাজ নয়; অনেক অভিজ্ঞতার দরকার। ছবি কি ভাবে চিত্তাকর্ষক করিতে হয়, কি কি মালমশলা ভাল ছবির পক্ষে অপরিহার্য তাহা তিনি নানা উদাহরণ সহকারে সোমনাথের হৃদয়ঙ্গম করাইতে লাগিলেন। নিরুপায় সোমনাথ বিদ্রোহভরা অন্তর লইয়া নীরবে শুনিয়া চলিল।

সে একবার চোখ তুলিয়া দেখিল, ইন্দুবাবুকেও দুই তিন জন পরিবেশক ঘিরিয়া ধরিয়াছেন; ইন্দুবাবু প্যাঁচার মতো মুখ করিয়া তাঁহাদের কথা শুনিতেছেন। শেষে আর [illegible]

দাঁড়াইয়া তিনি রুস্তমজির নিকট বিদায় লইয়া বাড়ী চলিয়া গেলেন; গল্প রচনার সময় তাহাতে দুই একটি রিভলভার ও অন্তত একটি নারী-হরণ না থাকিলে যে সিনেমার গল্প একেবারেই অচল, একথা তিনি কোনক্রমে গলাধঃকরণ করিতে পারিলেন না।

ওদিকে রুস্তমজিকে যাঁহারা পরিবেষ্টন করিয়াছিলেন তাঁহারা তাঁহার প্রতি করুণামিশ্রিত সমবেদনা প্রকাশ করিতে ত্রুটি করিতেছিলেন না এবং ঘুরাইয়া ফিরাইয়া জানিবার চেষ্টা করিতেছিলেন যে ছবি তৈয়ার করিতে কত খরচ হইয়াছে। শেষে একজন অনেকটা স্পষ্ট করিয়াই প্রশ্ন করিলেন,—'ছবিতে নামজাদা আর্টিষ্ট কেউ নেই, নাচগানও না থাকার শামিল; খরচ নিশ্চয়ই খুব কম হয়েছে।'

রুস্তমজি অম্লান বদনে বলিলেন,—'আড়াই লাখ টাকা খরচ হয়েছে।'

সকলেই ঠোঁট উল্টাইলেন,—'বড় বেশী খরচ হয়েছে—নতুন লোকের হাতে কাজ দিলে ঐ হয়। অত টাকা ছবি থেকে উঠবে না রুস্তি-ভাই। আচ্ছা, আজ আমরা তাহলে উঠি।'

রুস্তমজি বলিলেন,—'আমার আড়াই লাখ খরচ হয়েছে। আমি বেশী লাভ চাই না; তিন লাখ পেলেই আমি ছবি ছেড়ে দেব।'

আর কেহ উচ্চবাচ্য করিলেন না—'সাহেবজি' বলিয়া রুস্তমজিকে অভিবাদন জানাইয়া বিদায় লইলেন।

অত্যন্ত বিষণ্ণ মনে সোমনাথ সে-রাত্রে বাড়ী ফিরিয়া আসিল।

পরদিন সকালবেলা সোমনাথ চা পান করিতে বসিয়াছে এমন সময় পাণ্ডুরঙ আসিল।

সে উপবেশন করিলে সোমনাথ তাহার দিকে টোষ্টের প্লেট আগাইয়া দিয়া বলিল,—'কি খবর? কাল অত তাড়াতাড়ি চলে গেলে যে?'

পাণ্ডুরঙ উত্তর দিল না, একটা খালি পেয়ালায় চা ঢালিয়া লইল; তারপর এক টুকরা টোষ্টে কামড় দিয়া আপন মনে চিবাইতে লাগিল। পাণ্ডুরঙের ভাবভঙ্গী সোমনাথের অনেকটা আয়ত্ত হইয়াছিল, সে বুঝিল পাণ্ডুরঙের পেটে কোনও কথা আছে। উৎসুক ভাবে চাহিয়া সে বলিল,—'কি, কথাটা কি?'

পাণ্ডুরঙ টোষ্ট গলাধঃকরণ করিয়া এক চুমুক চা খাইল, তারপর বলিল,—'ছবি ভাল হয়েছে।'

সোমনাথ উচ্চকিত হইয়া উঠিল,—'অ্যাঁ, কে বল্‌ল?'

পাণ্ডুরঙ একটু হাসিয়া বলিল,—'আমার বৌ বল্‌ল।'

'তোমার বৌ? সে কি! তিনি জানলেন কি করে?'

'কাল রাত্রে বৌকে এনে প্রজেকশান হলে লুকিয়ে রেখেছিলাম; তোমরা দেখতে পাওনি। সে ছবি দেখেছে।'

'তাই নাকি? তারপর?'

'বৌ কখনও কোনও ছবির প্রশংসা করে না। কিন্তু যে-ছবি তার ভাল লাগে সে-ছবির মার নেই।'

'এ ছবি তার ভাল লেগেছে?'

'শুধু ভাল লেগেছে? সারা রাত্রি আমাকে ঘুমোতে দেয়নি, কেবলই ছবির কথা বলেছে।'

সোমনাথ মনে মনে খুবই আনন্দিত হইল, কিন্তু তবু তাহার সংশয় ঘুচিল না। সে বলিল,—'তুমি আমাকে উৎসাহ দেবার জন্যে বাড়িয়ে বলছ না তো?'

পাণ্ডুরঙ সিগারেট ধরাইয়া বলিল,—'বিশ্বাস না হয় তুমি নিজেই তাকে প্রশ্ন করে দেখবে চল।'

সোমনাথ সোৎসাহে উঠিয়া বলিল—'তাই চল। তাঁর মুখে শুনলে তবু ভরসা হবে। হাজার হোক তিনি নিরপেক্ষ দর্শক। কিন্তু কথাটা তুমি খুব বার করেছিলে তো!'

পাণ্ডুরঙ বলিল—'মনটা ভারি উতলা হয়েছিল ভাই। ছবি কেমন হয়েছে কিছুই আন্দাজ করতে পারছিলাম না। অথচ বাইরের লোককেও দেখানো যায় না। তাই শেষ পর্যন্ত বৌকে পাকড়াও করেছিলাম। অবশ্য মনে ভয় ছিল, ও যদি খারাপ বলে তাহলে আর রক্ষে নেই। তাই আগে থাকতে তোমাদের কিছু বলিনি।'

সোমনাথ হাসিয়া বলিল,—'তিনি যদি খারাপ বলতেন তাহলে তুমি কি করতে?'

পাণ্ডুরঙ বলিল,—'চেপে যেতাম।'

দুই বন্ধু মোটর চড়িয়া বাহির হইল। পাণ্ডুরঙের বাসায় সোমনাথ পূর্বে কয়েকবার গিয়াছিল, তাহার স্ত্রীকেও দেখিয়াছিল। দোহারা মজবুত গোছের স্ত্রীলোক, মুখশ্রী গোলগালের উপর মন্দ নয়; বয়স ত্রিশের নীচেই। কাছা দিয়া শাড়ী পরা স্বল্পভাষিণী এই মারাঠী মহিলাকে সোমনাথের খুব রাশ ভারি বলিয়া মনে হইয়াছিল।

দু'জনে যখন পৌঁছিল তখন দুর্গাবাঈ ঝ্যাটা হস্তে ঘর ঝাঁট দিতেছিলেন। অত্যন্ত সপ্রতিভ ভাবে ঝাটা সরাইয়া রাখিয়া তিনি হাসিমুখে সোমনাথের অভ্যর্থনা করিলেন; নিজেই বলিলেন,—'আপনার ছবি কাল দেখে এসেছি। খুব ভাল হয়েছে।'

সোমনাথ বলিল,—'পাণ্ডুরঙের মুখে সেই কথা শুনে ছুটে এলাম। সত্যি ভাল হয়েছে?'

'সত্যি ভাল হয়েছে। এমন কি—পাণ্ডুরঙের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া দুর্গাবাঈ বলিলেন—'উনিও এবার ভদ্রলোকের মতো অভিনয় করেছেন।'

সোমনাথ হাসিয়া উঠিল,—'দেখলে, পাণ্ডুরঙ! ভদ্রলোকের সঙ্গ-গুণে তুমিও ভদ্রলোক হয়ে উঠেছ।'

পাণ্ডুরঙ বলিল,—'আমি যে স্বভাবতই ভদ্রলোক, অনুকূল অবস্থায় সেটা ফুটে উঠেছে মাত্র।'

সোমনাথ বলিল,—'যাহোক আমাদের হিরোইনকে আপনার কেমন লাগল?'

দুর্গাবাই বলিলেন,—'সুন্দরী নয়, তবে খাসা মেয়ে। আর, ভারি মিষ্টি অভিনয় করেছে।'

'আপনি তো সকলের মন কেড়ে নিয়েছেন।' বলিয়া স্বামীর প্রতি একটি স্নিগ্ধ অপাঙ্গ দৃষ্টিপাত করিয়া দুর্গাবাই চা তৈয়ার করিতে গেলেন।

অতঃপর তাহারা সহযোগে দ্বিতীয় প্রস্থ চা পান করিতে করিতে সোমনাথ আবার প্রশ্ন করিল,—'আচ্ছা, ছবির মধ্যে কোন্ জিনিষটা আপনার সব চেয়ে ভাল মনে হ'ল?'

দুর্গাবাই নিঃসংশয়ে বলিলেন,—'গল্প।'

'এ গল্প সকলের ভাল লাগবে?'

'লাগবে। আমি সাধারণ মানুষ, আমার যখন ভাল লেগেছে তখন সকলের ভাল লাগবে।'

'আপনাকে যদি আবার ছবি দেখতে অনুরোধ করি, আপনি খুশী হয়ে দেখতে যাবেন?'

'যাব। আবার কবে দেখাবেন বলুন।'

সোমনাথ টেবিলে এক চাপড় মারিয়া বলিল—'ব্যাস্ তাহলে আর ভাবনা নেই।'

পাণ্ডুরঙের বাসা হইতে ষ্টুডিও যাইতে যাইতে কিন্তু সোমনাথের মন আবার সংশয়াকুল হইয়া উঠিল। একটি স্ত্রীলোকের ভাল লাগার উপর কি নির্ভর করা চলে! সকলের রুচি সমান নয়—

ষ্টুডিও পৌঁছিয়া দু'জনে রুস্তমজির কাছে গিয়া বসিল। পাণ্ডুরঙ বলিল,—'হুজুর, একটা বেয়াদপি করে ফেলেছি, মাফ করতে হবে।' বলিয়া স্ত্রীকে ছবি দেখানোর কথা বলিল।

রুস্তমজি ধূর্ত চক্ষে হাসি ভরিয়া বলিলেন,—'তাতে কোনও দোষ হয়নি। তোমার বিবির ভাল লেগেছে তো?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

রুস্তমজি বলিলেন,—'আমারও মনে হচ্ছে ছবিটা ভাল হয়েছে।'

সোমনাথ সাগ্রহে প্রশ্ন করিল,—'কি করে জানলেন? ওরা কিছু বলেছে নাকি?'

রুস্তমজি নিজের বুকে টোকা মারিয়া বলিলেন,—'আমার মন বলছে ছবি ভাল হয়েছে। ওরা বরং উল্টো কথাই বলছে। আজ বাবুভাই ফোন করেছিল।'

'কি বললেন তিনি?'

'ছবির অনেক খুঁৎ কেড়ে শেষে বলল, অল্‌ইণ্ডিয়া রাইটসের জন্যে দেড় লাখ টাকা দিতে পারে।'

'মিনিমাম্ গ্যারাণ্টি?'

'না, একেবারে সরাসরি বিক্রী। কি বল তোমরা? ছেড়ে দেব?'

সোমনাথ ভাবিতে লাগিল, দেড় লাখ টাকায় ছবি ছাড়লে কিছুই লাভ থাকে না। কিন্তু লোকসানও হয়না। লোকসান না হওয়াটা কম কথা নয়—

সোমনাথ প্রশ্ন করিল,—আর অন্য ডিষ্ট্রিবিউটাররা কোনও অফার দেয়নি?'

জিনিষ আছে। তার লোভ হয়েছে। চাপ দিলে দু'লাখ পর্যন্ত উঠতে পারে।'

সোমনাথ বলিল,—'দু'লাখ যদি পাওয়া যায় তাহলে বোধ হয় ছেড়ে দেওয়াই উচিত।'

রুস্তমজি পাণ্ডুরঙের দিকে চক্ষু ফিরাইলেন,—'তুমি কি বল?'

পাণ্ডুরঙ দ্বিধাভরে বলিল,—'লাখ বেলাখের কথা আমি বুঝিনা হুজুর। আপনি কি বলেন?'

রুস্তমজি বলিলেন,—'ছবি যদি ভাল হয়ে থাকে, তাহলে অত সস্তায় ছেড়ে দেওয়া বোকামি; ব্যবসাদার হয়ে আমি ওদের কাছে ঠকে যেতে রাজি নই।'

'তাহলে কি করবেন?'

'আমি দর কমাব না। দেখি যদি ওরা রাজি হয়। যদি না হয়, তখন অন্য ব্যবস্থা করতে হবে।'

'অন্য ব্যবস্থা কী করবেন?'

রুস্তমজি উত্তর দিলেন না, শুধু একটু হাসিলেন।

তিন লাখ টাকা দিতে কিন্তু কেহই রাজি হইল না। বাবুভাই এক লাখ ষাট হাজার পর্যন্ত উঠিলেন; অন্য সকলে স্পষ্টই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল।

সোমনাথের মনের অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিল। ছবির যথার্থ মূল্য জানিবার কি কোনও উপায় নাই? অন্ধের মতো পরের নির্ধারিত মূল্যে নিজের জিনিষ পরের হাতে তুলিয়া দিতে হইবে? এত পরিশ্রম করিয়া শুধু দিনমজুরিটুকু লইয়া ঘরে ফিরিতে হইবে? আর কতকগুলা দালাল তাহার কৃতিত্বের সুফল ভোগ করিবে? ইহাই কি ব্যবসায়ের দুর্লঙ্ঘ্য রীতি?

বাণিজ্য নীতির সহিত সোমনাথের নূতন পরিচয় ঘটিতেছিল। বাণিজ্য লক্ষ্মী যে ভুজঙ্গ-প্রয়াত ছন্দে আঁকা বাঁকা পথে চলেন; তাঁহার মাথা হইতে মণি হরণ করিতে হইলে যে শুধু দুর্দম সাহস নয়, অপরিসীম চাতুরীরও প্রয়োজন, এ অভিজ্ঞতা তাহার হয় নাই।

রুস্তমজি একদিন সোমনাথকে বলিলেন,—'তুমি বড় ঘাবড়ে গেছ দেখছি; অত ঘাবড়ালে ব্যবসা চলে না। ব্যবসায় মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হয়। চল, আজ বাবুভাইয়ের সঙ্গে দেখা করে আসি।'

বাবুভাই নিজের অফিসে পরম সমাদরের সহিত তাহাদের অভ্যর্থনা করিলেন; রুস্তমজিকে পান ও সোমনাথকে সিগারেট খাইতে দিলেন। কিন্তু তাহার কথার নড়চড় হইল না। সবিনয়ে বলিলেন,—'রুস্তি ভাই, এ ছবির জন্যে আর বেশী দিলে আমার ছেলেপুলে খেতে পাবে না। তোমার খাতিরে দশ হাজার বেশী দিচ্ছি, আর পারব না।'

রুস্তমজি বলিলেন,—'বেশ, ঐ টাকাই মিনিমাম্ গ্যারান্টি দাও।'

যেন আমি চুরি করি। কাজ কি ওসব ঝামেলায়।' বলিয়া মুখে বৈরাগ্যভাব প্রকাশের চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

রুস্তমজি উঠিয়া পড়িলেন ;—'বেশ এখন দিচ্ছ না। এর পরে কিন্তু এত সস্তায় পাবে না।'

স্টুডিওতে ফিরিয়া আসিয়া রুস্তমজি বলিলেন,—'সোমনাথ, আজ তুমি বাড়ী যাও। আমি একটু ভেবে দেখি। কাল এর হেস্তনেস্ত করব।'

পরদিন সোমনাথ রুস্তমজির কাছে গিয়া বসিতেই তিনি বলিলেন,—ঠিক করে ফেলেছি। ছবি কাউকে দেবনা, আমি নিজেই হাউস ভাড়া নিয়ে ছবি দেখাব।'

সোমনাথ কিয়ৎকাল হতবাক্ হইয়া রহিল, তারপর বলিল—'কিন্তু —তাতে আরও অনেক খরচ—'

'পাবলিসিটিতে ত্রিশ হাজার টাকা খরচ করব ; তাছাড়া হাউসের ভাড়া আছে। সবশুদ্ধ বড় জোর পঞ্চাশ হাজার। যদি লেগে যায়—'

'যদি না লাগে ?'

রুস্তমজি সোমনাথের কাঁধে হাত রাখিয়া বলিলেন,—'তুমি ইয়ং ম্যান হয়ে ভয় পাচ্ছ ? এতটুকু সাহস নেই ?'

সোমনাথ বলিল,—'নিজের জন্যে ভয় পাচ্ছি না, রুবি বাবা। কিন্তু আপনার এই শেষ সম্বল, এ নিয়ে জুয়া খেলা উচিত নয়। বরং লাভ যদি নাও হয়—'

রুস্তমজি বলিলেন,—'আমি জুয়াড়ী, সারা জীবন জুয়া খেলেছি। তোমাকে যখন ছবি তৈরি করতে দিয়েছিলাম তখনও জুয়া খেলেছিলাম। আরও জুয়া খেলব ; লাগে তাক না লাগে তুক। বাপুভাই আজ আমাকে দমক দিচ্ছে ; যদি পাশার দান পড়ে—ছবি উৎরে যায়—তখন আমি বাপু ভাইকে দমক দেব। এই তো জীবন !'

ইহার পর আর কিছু বলা যায় না। বৃদ্ধ জুয়াড়ী যখন সর্বস্ব পণ করিয়া মাতিয়াছে তখন তাহাকে ঠেকানো অসম্ভব। সোমনাথ নিজের রক্তের মধ্যেও জুয়ার উত্তেজনা অনুভব করিল।

'বেশ, আপনি যা ভাল বোঝেন তাই করুন।'

রুস্তমজী তখন জিজ্ঞাসা করিলেন,—'দেয়ালী কবে ?'

সমনাথ বলিল,—'আর দিন দশেক আছে।'

'যথেষ্ট। দেয়ালীর দিন আমার ছবি রিলীজ করব।

দেয়ালীর দিন ছবি মুক্তিলাভ করিল।

প্রথম সপ্তাহে আয় হইল চৌদ্দ হাজার ; দ্বিতীয় সপ্তাহে ছাব্বিশ হাজার।

যে সকল পরিবেশক পূর্বে পা ঢাকা দিয়াছিলেন তাঁহারা পাগলের মতো রুস্তমজিকে খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কিন্তু রুস্তমজির এখন পোয়া বারো ; তিনি কাহারও সহিত দেখা করিলেন না।

পাণ্ডুরঙকে ডাকিয়া রুস্তমজি একটি বিশ ভরির সোনার হার তাহার হাতে দিলেন, 'এটি তোমার বিবিকে দিও। তার কথা শুনেই আমি এতবড় জুয়ার নেমেছিলাম।' তারপর সোমনাথকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন,—'তোমাকে আর কী দেব ? আমার যা কিছু সব তোমাকে দিয়ে ফেলতে ইচ্ছে হচ্ছে।'

বাপুভাই অবশেষে একদিন রুস্তমজিকে ধরিয়া ফেলিলেন। রুস্তমজি অফিস ঘরে বসিয়া ছিলেন, বাপুভাই এক রকম জোর করিয়াই ঘরে ঢুকিয়া পড়িলেন।

দুই বৃদ্ধ কিছুক্ষণ পরস্পরের পানে চাহিয়া রহিলেন ; শেষে বাপুভাই বলিলেন, 'রুবিভাই, তোমারই জিৎ। ছবির জন্যে কত টাকা চাও ?'

রুস্তমজির মুখে বিজয় গর্বিত হাসি ফুটিয়া উঠিল। কিন্তু তিনি উত্তর দিলেন না ; এই মুহূর্তের বিজয়ানন্দ যেন পূর্ণ মাত্রায় উপভোগ করিতে লাগিলেন।

বাপুভাই আবার বলিলেন,—'তুমি বলেছিলে তিন লাখ টাকায় ছবি বিক্রি করবে। আমি তিন লাখ দিতে রাজি আছি।'

রুস্তমজি ধীরে ধীরে মাথা নাড়িলেন।

'এখন আর তিন লাখে হবে না।'

'কত চাও ?'

'পাঁচ লাখ।'

বাপুভাই অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন।

'তার কমে হবে না ?'

'না।'

'আমাকে একটু ভাববার সময় দেবে ?'

রুস্তমজি বলিলেন,—'ভাববার সময় নিতে পারো। কিন্তু ইতিমধ্যে কেউ যদি বেশী দিতে রাজি হয়, তখন আর পাঁচ লাখে পাবে না।'

বাপুভাই আর দ্বিধা না করিয়া পকেট হইতে চেক্ বুক বাহির করিলেন।

হিসাব করিয়া সোমনাথের ভাগে লাভের অংশ এক লাখ ত্রিশ হাজার টাকা পড়িল। রুস্তমজি চেক্ লিখিয়া তাহার হাতে দিলেন এবং দুই হাতে তাহার করমর্দন করিলেন।

'যাও, কিছুদিন কোথাও বেড়িয়ে এস। তারপর নতুন ছবি আরম্ভ করবে।'

অফিস হইতে বাহিরে আসিয়া সোমনাথ চেকটি খুলিয়া দেখিল। এক লাখ ত্রিশ হাজার ! সে এক লাখ ত্রিশ হাজার টাকার মালিক !

হঠাৎ তাহার মনটা কেমন যেন বিকল হইয়া গেল। টাকা রোজগার করা এত সহজ ! শুধু একটু চাতুরী, আর একটু হঠকারিতা—ইহার বেশী প্রয়োজন নাই ? অথচ এই টাকার জন্য কোটি কোটি মানুষ মাথা খুঁড়িয়া মরিতেছে !

তারপরই তাহার মনে প্রতিক্রিয়া আসিল। আর তাহার অন্নচিন্তা নাই। সে স্বাধীন—স্বাধীন।

প্রমথনাথ রায়চৌধুরী

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ, এম্‌-এ, এফ্‌-আর্‌-এস্‌-এস্‌, এফ্‌-আর্‌-ই-এস্‌

অর্দ্ধ শতাব্দীর অধিককাল ব্যাপিয়া যে রত্নদীপ তাহার উজ্জ্বল জ্যোতিঃতে বঙ্গভারতীর মন্দিরের একাংশ উদ্ভাসিত ও আলোকিত করিয়া রাখিয়াছিল, নিষ্ঠুর কালের ফুৎকারে অকস্মাৎ তাহা নির্ব্বাপিত হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গলার প্রবীণ কবি ও নাট্যকার প্রমথনাথ রায়চৌধুরী গত ২২শে পৌষ (ইং ৬ই জানুয়ারী ১৯৪৯) ইহলোক হইতে অপসৃত হইয়াছেন!

মহারাজ প্রতাপাদিত্যের বংশসম্ভূত সন্তোষের প্রসিদ্ধ প্রজাবৎসল ভূম্যধিকারী বলিয়া তিনি খ্যাত নহেন; কারণ ঐশ্বর্য্যের গর্ব্ব, আভিজাত্যের অভিমান তাঁহার মধ্যে লেশমাত্র পরিলক্ষিত হইত না—তিনি, স্বর্গীয় জলধর সেন মহাশয়ের ভাষায়, ছিলেন 'হাড়ে হাড়ে ডিমোক্র্যাট।' কমলার বরপুত্র হইয়াও তিনি আজীবন একনিষ্ঠভাবে বীণাপাণির চরণ সেবা করিয়া ধন্য হইয়াছেন, সাধনায় সিদ্ধিলাভকরত বঙ্গভাষাকে অনুপম অলঙ্কারে বিভূষিতা ও সমৃদ্ধিশালিনী করিয়াছেন। 'মানবতার কবি' প্রমথনাথ তাঁহার রচনায় ও ব্যবহারে সর্ব্বত্র দীন, দরিদ্র, অত্যাচারিতের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন, যেখানেই তিনি দেখিয়াছেন, 'দুর্ব্বল হইছে চূর্ণ প্রবলের বিজয়-গৌরবে,' সেইখানেই তাঁহার লেখনীমুখে দুর্ব্বলের প্রতি সহানুভূতি এবং অন্যায়ের প্রতি ঘৃণা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। যাঁহারা তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছেন তাঁহারা তাঁহার সরলতা, অমায়িকতা, সৌজন্য, উদারতা, পরদুঃখকাতরতা ও চরিত্র-মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়াছেন। তিনি প্রেমময় স্বামী, অত্যন্ত স্নেহশীল পিতা, ও বন্ধুবৎসল সখা ছিলেন। একাদশ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার সাধ্বী পত্নীকে হারাইয়া তিনি তাঁহার শেষজীবন তাঁহার স্মৃতি লইয়া জীবনধারণ করিতেছিলেন।

১২৭৯ সালে ফাল্গুন মাসে ময়মনসিংহের অন্তঃপাতী সন্তোষ গ্রামে প্রমথনাথ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার শৈশবেই পিতা দ্বারকানাথ পরলোকগমন করায় তিনি ও তাঁহার ভ্রাতা (মহারাজ) মন্মথনাথকে 'মানুষ' করিবার ভার জননী বিন্দুবাসিনীর উপর পতিত হয়। বিন্দুবাসিনী অতি বুদ্ধিমতী, দানশীলা ও ধর্ম্মপরায়ণা রমণী ছিলেন। অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্রগণের অভিভাবিকারূপে তিনি কেবল তাঁহাদের বিশাল জমিদারী পরিচালনা ও উহার প্রভূত উন্নতিসাধন করেন নাই, তিনি টাঙ্গাইলে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়, বালিকা বিদ্যালয়, দেবমন্দির ও অতিথিশালা প্রভৃতি বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠান স্থাপিত করত অক্ষয়কীর্ত্তি ও পুণ্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন। বহু দরিদ্র ছাত্রকে তিনি মাসিক অর্থ-সাহায্য করিয়া তাহাদের শিক্ষার পথ সুগম করিয়া দিয়াছিলেন। ফল দেখিয়া বৃক্ষের বিচার হয়। পুত্রগণকে তিনি কি ভাবে 'মানুষ' করিয়াছিলেন, তাহা ভাবিলেই বুঝা যায় তিনি যথার্থই রত্নপ্রসবিনী ছিলেন। মাতৃদেবীর প্রেরণায় পুত্রগণও বহু সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা টাঙ্গাইলে (পরে ঢাকা জগন্নাথ কলেজে সংযুক্ত) প্রমথ-মন্মথ কলেজ স্থাপিত করিয়াছিলেন।

বাল্যকালে প্রমথনাথের শিক্ষার ভার একজন অতীব কর্ত্তব্যপরায়ণ পণ্ডিতের হস্তে ন্যস্ত হয়। পরে ভবানীচরণ ঘোষ নামক শিক্ষকের হস্তে তাঁহার শিক্ষার ভার অর্পিত হয়। ইনি সাহিত্যানুরাগী এবং সাহিত্য-সেবক ছিলেন এবং ইঁহার সংস্পর্শে আসিয়া প্রমথনাথের বঙ্গভাষাপ্রীতির সূত্রপাত হয়। এই সময় হইতেই তিনি কবিতারচনায় অভ্যাস করেন। বিদ্যালয়ে প্রমথনাথ সাহিত্যপ্রতিষ্ঠা লাভ করেন, কিন্তু 'গণিতের দেবতা' তাঁহার প্রতি প্রসন্ন দৃষ্টিপাত করেন নাই। নীরস গণিতের ঘণ্টায় তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী পাঠ করিতেন এবং বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলী তাঁহার উপর অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। তিনি স্বয়ং

৺প্রমথনাথ রায়চৌধুরী

লিখিয়াছেন, "কৈশোরে বঙ্কিমের আদর্শগুলি আমার কল্পনাজগতে ছবির পর ছবি আঁকিয়া আমাকে এক লোকাতীত মায়ারাজ্যে লইয়া যাইত, উহাতে আমার উন্নত বৃত্তিগুলিও বুঝি বিকশিত হইবার অবসর পাইয়াছিল। আমার স্মরণ আছে, বঙ্কিম পড়িয়াই আমার মনে স্বজাতি ও স্বদেশের প্রতি অনুরাগ জাগিয়া উঠে; সঙ্গে সঙ্গে বিজাতীয় বিলাসিতা ও আচার পদ্ধতির উপর বিরাগ জন্মে।" গণিতশাস্ত্রে বিরাগবশতঃ প্রমথনাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি লাভ করেন নাই বটে, কিন্তু ইংরাজী সাহিত্যে তিনি বিশেষ অধিকার লাভ করিয়াছিলেন,—দুইজন প্রসিদ্ধ ইংরাজী অধ্যাপকের সযত্ন অধ্যাপনায় ও উপদেশে। একজন [illegible] রাজনারায়ণ বসুর দৌহিত্র, শ্রীঅরবিন্দের সহোদর, Songs [illegible]

কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যাপক মনোমোহন ঘোষ। অপরজন সেকালের অতাবাবিদ্‌ প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের দৌহিত্র রেভারেণ্ড ই-এম্‌-হুইলার। মনোমোহন ইংলণ্ডে বাল্যকাল হইতে শিক্ষিত হইয়াছিলেন এবং ছাত্রাবস্থাতেই লরেন্স বিনিয়ন প্রভৃতি সতীর্থগণের সহযোগে 'প্রাইমাভেরা' নামক যে ইংরাজী কবিতাপুস্তক প্রকাশ করেন তাহা অস্কার ওয়াইল্ড প্রমুখ খ্যাতনামা সাহিত্যিকগণের উচ্চপ্রশংসা লাভ করিয়াছিল। হুইলার ইংরাজী ও ল্যাটিনে প্রথম শ্রেণীর সম্মানসহ বি-এ এবং প্রথম শ্রেণীতে ল্যাটিনে এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ পুরস্কার প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি ও মৌএট পদক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইনি কিছুকাল বঙ্গবাসী কলেজের ইংরাজী সাহিত্যাধ্যাপক ও পরে বহরমপুর কলেজের অধ্যক্ষ হন। ইঁহাদের উপদেশে প্রমথনাথ ইংরাজী কাব্যাদিতে যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি-লাভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার কোন কোন রচনা মনোযোগ সহকারে পাঠ করিলে ইংরাজী কাব্যে তাঁহার কতদূর অধিকার ছিল তাহা অনুমেয় হয়।

যৌবনেই প্রমথনাথ বঙ্গবাণীর আহ্বান শুনিতে পান :

"তোমার আহ্বান
কখন ধ্বনিয়া উঠে নাহি বুঝি কিছু,
তখন সকলি ভুলি ছুটি তা'রি পিছু,
অসীম অকূল পানে, নয়নের আগে
খুলে যায় শোভারাজ্য।"

অল্পকালের মধ্যে তিনি বঙ্গবাণীর চরণ কমলে নানা কাব্য অর্ঘ্যরূপে উপস্থিত করিলেন,—পদ্মা, যমুনা, গীতি, গীতিকা, দীপ্তি, দীপালী, আরতি, গৌরাঙ্গ, গল্প, গাথা, আখ্যায়িকা, চিত্র ও চরিত্র, কবিতা, পাথেয়, পাষাণ, পাথার, গৌরিক, গান, লীলা, তাজ। বাঙ্গালার সমস্ত প্রসিদ্ধ মাসিকপত্রে—প্রদীপ, সাহিত্য, প্রবাসী, মানসী, ভারতবর্ষ, প্রভৃতিতে তাঁহার অনবদ্য কবিতাগুলি বঙ্গীয় পাঠকগণের মনোরঞ্জন করিতে লাগিল। রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ, প্রিয়নাথ সেন, দ্বিজেন্দ্র-লাল, রজনীকান্ত, সুরেশ সমাজপতি প্রভৃতি সাহিত্যরথিগণ তাঁহার সহিত নিবিড় বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হইলেন। প্রমথনাথের অধিকাংশ কাব্যগ্রন্থ স্বর্গীয় জলধর সেন মহাশয় সুলিখিত ভূমিকাসহ তিন খণ্ডে গ্রন্থাবলীর আকারে সম্পাদিত করেন। ভূমিকায় প্রমথনাথের কাব্যের প্রধান বিশেষত্বগুলির পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাঁহার কাব্যসমালোচনার স্থান নাই। 'ভক্তি যার ভয়-ভিত্তি প্রেম যার প্রাণ' সেই 'গৌরাঙ্গ' পাঠ করিয়া দ্বিজেন্দ্রলাল মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং 'নব-প্রভায়' ধারাবাহিকভাবে উহার বিস্তৃত সমালোচনা করিয়াছিলেন। কবিবর নবীনচন্দ্র উহা পাঠ করিয়া একদা 'অমৃতাভ' রচনার সংকল্প ত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। 'আখ্যায়িকা'র প্রথম কাহিনীটি পাঠ করিয়া গল্পের যাদুকর প্রভাতকুমার উচ্চকণ্ঠে উহার প্রশংসা করিয়াছিলেন। প্রমথনাথ সুনিপুণ সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন এবং তাঁহার মাধুর্য্যে পরিপূর্ণ। স্বরচিত 'রূপসী পল্লীবাসিনী' নামক বিখ্যাত গানটি তিনি যখন নিজের সুরে গাহিতেছিলেন, অতর্কিতভাবে 'গানের রাজা' রবীন্দ্রনাথ তাঁহার পশ্চাতে আসিয়া গানটি শুনিয়া অত্যন্ত মুগ্ধ হন এবং সেইদিনই লজ্জিত সংগীতকারের নিকট হইতে ঐ গানটি এবং "তুমি এসেছ, তুমি এসেছ আজি কমলার বেশে সাজি" গানটি শিখিয়া লইয়া যান।

প্রমথনাথ শুধু কবি ছিলেন না। সন্তোষে তাঁহার কর্ম্মচারীবৃন্দের এক সখের থিয়েটারের পরিচালকরূপে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' ও 'রাজসিংহ' নাটকাকারে পরিবর্ত্তন করেন এবং পরে স্বয়ং নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হন। সন্তোষ ড্রামাটিক ক্লাবে অভিনীত 'ভাগ্যচক্র', মনোমোহন থিয়েটারে অভিনীত 'জয়-পরাজয়', মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত 'চিতোরোদ্ধার' নাটক ও 'আক্কেল সেলামী' প্রহসন, 'দিল্লী অধিকার' নাটক প্রভৃতি নাট্যজগতে তাঁহাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। তিনি লিখিয়াছেন,

"নাটকের প্রকৃত মর্ম্মকথা মানবপ্রকৃতি উদ্‌ঘাটন করিয়া মানব-প্রকৃতিতে অজ্ঞাতে সরস সদ্ভাবরাশি সঞ্চারিত করা। শুধু লোমহর্ষণ ঘটনা, কবিত্বছটা, ভাষার সমারোহ,—সাময়িক উত্তেজনা বা উন্মাদনার ইন্ধন যোগাইলেও সাহিত্যের জীবনযুদ্ধে টিঁকিতে পারে না। টিঁকিবে তাহাই—যাহা সুস্পষ্ট ইঙ্গিতে অন্তর্জ্জগতের কঠিন সমস্যাগুলির সমাধানে সক্ষম ; যাহা দেশকালপাত্র-সীমাবদ্ধ নয়,—সমগ্র মানবজাতির চিরন্তন মানবিকতাকে আশ্রয় করিয়া আছে।"

কিন্তু এ দেশে নাটকের এ উচ্চ আদর্শ অনুসৃত হইবে এ আশা হয়ত দুরাশামাত্র।

প্রমথনাথ কেবল সাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন না, তিনি সাহিত্যিকগণের অকৃত্রিম সুহৃৎ ছিলেন। সাহিত্যসাধনা তাঁহার সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া তিনি বিবেচনা করিতেন। তিনি এক-স্থানে লিখিয়াছেন,

"সাহিত্য ছাড়িলে আমার কিছুই থাকে না। জীবনের সহস্র জালে জড়িত হইয়াও আমার শুভ্র সমুন্নত সাধনা সেই এক মহান লক্ষ্যপানেই ছুটিয়াছে। আমি অনেক সময় সগর্ব্বে সাহ্লাদে স্মরণ করি,—আমি ধনী নই, মানী নই,—আমি শুধু কবি। কবিতা রচনায় আমার যত তৃপ্তি, অধ্যয়ন ও সাহিত্যালাপে আমার যত আনন্দ, এমন আর কিছুতে নয়।"

আমাদের ন্যায় যাঁহারা তাঁহার ব্যক্তিগত সংস্পর্শে আসিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন সাহিত্যালোচনায় তাঁহার কিরূপ অগাধ উৎসাহ ছিল। দীনদরিদ্র সাহিত্যিকগণ তাঁহার নিকট সর্ব্বত্র সম্মান ও সমাদর লাভ করিত। তাঁহার নিকট আমার ব্যক্তিগত স্নেহ ঋণের উল্লেখ এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে।

১৩১১ সালে কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল রায় সাহিত্যসেবী ও সাহিত্যানু-রাগীদিগকে একত্র করিয়া ভাববিনিময় ও [illegible] [illegible]

পূর্ণিমা মিলনের প্রতিষ্ঠা করেন। প্রমথনাথ সোৎসাহে এই সাধু প্রচেষ্টায় দ্বিজেন্দ্রলালের সহযোগিতা করিয়াছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল, ললিত মিত্র, স্যর কৈলাস বসু, দামোদর মুখোপাধ্যায়, রসরাজ অমৃতলাল বসু, সারদাচরণ মিত্র, গিরিশচন্দ্র বসু, দেবকুমার রায়চৌধুরী, ডাঃ জিতেন্দ্রনাথ মজুমদার, ব্যোমকেশ মুস্তফী, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, নন্দলাল দে, প্রমথনাথ রায়চৌধুরী, যতীশচন্দ্র মিত্র, রসময় লাহা, প্রমথনাথ গোস্বামী, প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতির আহ্বানে এই সকল সাহিত্যিক সম্মিলন আহূত হইত। কিছুদিন পরে উহা উঠিয়া যাওয়ায় দ্বিজেন্দ্রলাল ও প্রমথনাথ বিশেষ দুঃখিত হন। দ্বিজেন্দ্রলালের সহিত প্রমথনাথের বিশেষ সৌহার্দ্দ ছিল। দ্বিজেন্দ্রলাল "ভারতবর্ষ" প্রকাশের সংকল্পকালে প্রমথনাথকে উহাতে লিখিতে অনুরোধ করেন। প্রমথনাথ এই অনুরোধ রক্ষা করিয়াছিলেন। দেবকুমার রায়চৌধুরীর 'দ্বিজেন্দ্রলাল'এর পরিশিষ্টে প্রমথনাথ দ্বিজেন্দ্রলাল সম্বন্ধে যে স্মৃতিকথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা হইতে উভয়ের মধ্যে কিরূপ প্রগাঢ় প্রীতিসম্বন্ধ ছিল তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

পূর্ণিমা মিলন উঠিয়া যাইবার পর কয়েক বৎসর দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়ের পুত্র ললিতচন্দ্র পিতৃশ্রাদ্ধের পর রাসপূর্ণিমাতে পূর্ণিমা মিলন ডাকিয়াছিলেন, তাহাতে আমরা প্রমথনাথকে যোগদান করিতে দেখিয়াছি। পূর্ণিমা মিলনের উদ্দেশ্যের অনুরূপ উদ্দেশ্যে প্রমথনাথ পরে 'সাহিত্য-সঙ্গত'-এর সৃষ্টি করেন। বন্ধু নাটোরাধিপতি মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ রায় উহার প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা করিয়াছিলেন। জগদিন্দ্রনাথের স্বর্গারোহণের পর 'মানসী ও মর্ম্মবাণীতে' 'মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ স্মৃতি সংখ্যা'য় প্রমথনাথ যে স্মৃতিকথা লিপিবদ্ধ করেন তাহাতে ইহার উল্লেখ আছে। এই সাহিত্যিক-মিলন-সভাও অধিককাল স্থায়ী হয় নাই। শুনিয়াছি ইহার অন্যতম কারণ এই যে সাহিত্যিকগণের সমাদরের জন্য প্রথথনাথ ও জগদিন্দ্রনাথ যেরূপ বিরাট আয়োজন করিতেন তাহাতে অন্যের পক্ষে সঙ্গত আহ্বান করিতে সঙ্কোচ অনুভূত হইত।

প্রমথনাথ অকৃত্রিম স্বদেশপ্রেমিক ছিলেন। যে সময়ে 'স্বদেশী' সভায় যোগদান করা ভূম্যধিকারিগণের পক্ষে বিপজ্জনক ছিল সে সময়ে তিনি বিদেশীয় শাসকগণের ভ্রূকুটী উপেক্ষা করিয়া নির্ভীকভাবে দেশপক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদকল্পে আন্দোলনের সময় 'স্বদেশী' সভাসমূহে তাঁহার রচিত "তুই মা মোদের জগৎ-আলো" প্রভৃতি গান উদ্দীপনার বিদ্যুৎ-তরঙ্গ প্রবাহিত করাইয়া দিত। তাঁহার স্বাদেশিকতায় কোন প্রকার সঙ্কীর্ণতা বা সাম্প্রদায়িকতার স্থান ছিল না। তাঁহার গানে হিন্দু মুসলমানের মিলন মন্ত্র উচ্চারিত হইত, প্রবন্ধান্তরে তাহা প্রদর্শিত করিয়াছি। তাঁহার স্বদেশ সম্বন্ধীয় কবিতা ও সংগীতগুলির একটি চয়নিকা আজিকার দিনে প্রকাশিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। আধুনিক যুগেও উহার উপকারিতা ও উপযোগিতা নষ্ট হয় নাই। বাঙ্গালী যুবকগণকে যেদিন কবি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে দেখিয়া ছিলেন—

ভীরুতা ঋণ রণ স্থলে গিয়ে
শোধ করব বুকের রক্ত দিয়ে—

সেদিন তিনি আনন্দে বলিয়াছিলেন—

ও বাঙ্গালী আমি তোদের ভাই,
বাংলা আমার জনম মরণ ঠাঁই,
হয় যদি মোর এই দণ্ডে মরণ,
নিয়ে যাব জাতির কীর্ত্তি স্মরণ,
তোদের পায়ের ধূলা অঙ্গে মেখে
সুখে মরব তোদের বাঁচতে দেখে।

ভারতের স্বাধীনতা লাভে না জানি তাঁহার কত আনন্দ হইয়াছিল! কিন্তু এখনও যে তাঁহাকে চির বিদায় দিতে আমাদের প্রাণ কাঁদে; আমাদের দুর্দ্দশা ত' দূর হয় নাই, আমাদের ঈপ্সিত লক্ষ্য যে এখনও অনেক দূরে, তাই আমরা 'মানবিকতার কবি' প্রমথনাথের পুনরাবির্ভাব প্রার্থনা করি, তাঁহার মুখে দেশবাসী পুনরায় সেই গান শুনিতে চাহে,—

"যে গানে আপনা ভুলি নব প্রীতি ভরে
মানব আসিবে ছুটি' মানবের তরে!
থেমে যাবে হীন চর্চ্চা, কুটিল জল্পনা,
ঘুচিবে চক্রান্ত চক্র, কলুষ কল্পনা।
ধূলায় পড়িবে লুটি' জীর্ণ লোকাচার,
সিদ্ধ শিল্পী দৃঢ় হস্তে করিবে সংস্কার।
অন্তরে বৃহৎ লক্ষ্য, কর্ত্তব্য বাহিরে,
সে যুগের মনুষ্যত্ব আসিবে না ফিরে?"

ক্ষেতের মায়া

শ্রীসুধীরচন্দ্র রাহা

বেলা আর নাই। সূর্য্যের লাল আলো গাছের পাতায় চিক্‌মিক্‌ করছে। এর মধ্যেই সন্ধ্যার আঁধার জড়াজড়ি করে যেন গাঁয়ে ঢুকছে। একটু আগেই এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। গাঁয়ের রাস্তা কাদা, গোবর ও পচা পাতায় ভট্‌ভট্‌ করছে। রাস্তায় পা দেয় কার সাধ্য। তারপর আছে মশা, মাছি, বড় বড় জোঁক। পাগলা খেয়ো কুকুর, শেয়াল এ সবও আছে—আরও আছে চিতা বাঘ।

মাথায় দেবার তালের টোকাটা হাতে করে, পতিরাম এসে ছোট্ট উঠানে দাঁড়ালো। ভারী গলায় বল্লে, কেউ এসেছিল নাকি? মানদা তখন উনুন ধরাতে ব্যস্ত। ভিজে জলা কাঠ-ঘসি ধরবে কেন? রাজ্যের পাতা, আর পাট-কাঠি উনুনের মধ্যে দিয়ে, উবু হয়ে ফুঁ দিচ্ছিল। চোখ মুখ লাল—দর্‌দর্‌ করে চোখ দিয়ে জল ঝরছে। মুখ ফিরিয়ে বল্লে, মর পোড়ারমুখো উনুন, উঃ! জ্বালিয়ে খেল। তারপর পতিরামের কথার জবাব দিল, এসেছিল অনেকজনা। চৌকিদার এসে ট্যাক্সর তাগাদা দিয়ে গেল—কামার খুড়ো সুদ চেয়ে গেল—ওই ওরাই এসেছিল। পতিরাম কোন কথা না বলে, হুঁকো নিয়ে বসলো।

—বলি বসলে যে, চাল যে নেই। এক ফোঁটা নুন, কি তেল নেই। এসবের ব্যবস্থা করতে হ'বে না। সমস্তদিন পরিশ্রমের পর, পতিরামের পেট জলছিল। রুখে বলে উঠলো, তুই কি করছিস্‌ হারামজাদী, আনতে পারিস্‌ নে।

মানদা ভ্রূকুটী করে বললে, কী আমার পরিবার পুষবার ক্ষমতা পুরুষের। এই ন্যাকড়া পরে, রাস্তায় বেরুতে বলছ। বলতে লজ্জাও লাগে না—চাল কি দোকানে গেলেই পাওয়া যায়? তোমাদের পিসিডেন্ট-বাবুর কাছে যাও একবার, নইলে হাঁড়ি চড়বে না। তার হাতে পায়ে ধরে, একখানা কাপড়ের কথা বল গে—ভারি নিঃশ্বাস ছেড়ে পতিরাম বললো, কাপড়? কাপড় কি আমাদের সেবে? কবে এখনও সময় হয় নি। যাই দেখি একবার—সেই টাকা দুটো তবে যে—বহুকষ্টে কাঠ বিক্রী করে, মানদা দুটো টাকা জমিয়েছিল, মানদা বল্লে, ও টাকা দিলে, কাপড় কি করে হ'বে?

—আরে আগে পেটটা তো ভরুক—তারপর। মানদা তবুও বললে, ঘরটায় যে খড় না দিলে, আর থাকা যায় না। গোটা রাত না ঘুমিয়ে, কতদিন থাকবো।

পতিরাম ঘরের চালার দিকে তাকালে। চালের খড় কিছুই নেই—দিব্বী আকাশ দেখা যাচ্ছে।

পতিরাম বললে, আর খড়। দেখি দুটো তালপাতা চাপিয়ে দেবো'খন।

মানদা এবার রেগে বললে, তালপাতা—লজ্জা করে না, আবার তালপাতার কথা বলতে। মনে নেই, সেই ক'খানা তালপাতা কেটেছিলে বলে, ওরা কি মার না মারলে। দেব না—দেব না—আমি টাকা—

মানদার কথার মধ্যে, বিন্দুমাত্র মিথ্যা নেই। সবই সত্য, সবই অত্যন্ত কঠোর সত্য। সে মারের কথা পতিরাম ভোলে নাই, মাত্র ক'খানা তালপাতার জন্য, তাহার সে কি লাঞ্ছনা। কিন্তু চাই যে সব। চাল, নুন, তেল, কাপড় এ সবই যে চাই। কাপড় উপস্থিত পরে হলেও চলবে, কিন্তু সব ছাপিয়ে, পেটের তাগাদা আরও প্রখর, আরও সত্য। পতিরাম অসহায়ের মত, ভিখারীর মত, ড্যাবড্যেবে চোখে, তাকিয়ে রইল। মানদা ঘর হ'তে ছুটে এসে, তার হাতে টাকা দুটো ফেলে দিয়ে বললো, এই নাও হ'ল ত। তোমার আশা মিটল তো। একশবার বলছি, চাষ ছাড়, ক্ষেত ছাড়, এর চেয়ে ঐ চিনির কলে, মজুরী কর, কিংবা জন-মজুর খাট। তাতেও ভাত জুটবে। একশ'বার বলছি, ঐ পোড়া চাষবাস ছাড়—ছাড়—ছাড়—এই আমার শেষবার বলা। মানদা ঘর হ'তে বেরিয়ে যায়—পতিরাম মাথা নীচু করে চুপ করে বসে থাকে।

(২)

পতিরামের মাত্র তিন বিঘে জমি। সমস্ত জমিটায় সে আউশ ধান দিয়েছে। ক্ষেতের আলে বসে, পতিরাম

তামাক টানে, আর স্বপ্ন দেখে। এই জমির সঙ্গে, তার বাড়ীর বন্ধন তার রক্তের বন্ধন। বহুকষ্টে কত উদয়াস্ত পরিশ্রম করে, কত বর্ষার জল, কত চোত্ত বোশেখের রোদ সয়ে, এই জমিকে সে আবাদি জমি তৈরী করেছে। হিঃ হিঃ করে পতিরাম হাসে। বৌটা পাগলি—আরে ধান না হ'লে খাবি কি? মজাটা দেখছিস তো—কত লোক না খেয়ে, চোখের ওপর ম'ল। চকিতে মনে পড়লো, অনাহারে তার দু-দুটো ছেলে মরেছে, হালের গরু দুটোও শেষ হয়ে গেছে। মাত্র ঐ বকনা বাছুরটা আছে। ওটা বড় হ'বে—ওর বাচ্চা হ'বে—দুধ দেবে। দুধ—সত্যিকারের দুধ—উষ্ণ দুধের কথা ভেবে, পতিরামের জিহ্বা সজল হয়ে উঠল। বৌয়ের একটা ছেলে হ'বে—হাঁ নিশ্চয় ভগবান দেবেন। কিছু দুধ সে বিক্রী করবে—কিছুটা রাখবে। জমির মর্ম্ম মেয়েমানুষে কি বুঝবে? খালি বলে, জমি বিক্রী করে, মজুরী খাট। সে কি মজুরী খাটে না—খাটে। কিন্তু দেহ যে বয় না। পতিরাম চড় চড় করে তামাক টানতে থাকে। ধান পাকতে আর দেরী নেই। তিন বিঘেতে খুব কম করেও পঁচিশ ছাব্বিশ মণ ধান হবেই। ব্যস্—সারা বছরের খোরাক তো হয়ে যাবে—আর চাই কি? পতিরামের মুখ আনন্দে, চক্ চক্ করে ওঠে। কিন্তু গঙ্গার জল বাড়ছে—বাণ এসে গেলে সব যাবে। পতিরাম আবার চিন্তিত হয়ে পড়ে। একা তো সে ধান কেটে উঠতে পারবে না। বেন্দা আর কানাইকে নিতেই হবে। কিন্তু টাকা কোথায়? অন্ততঃ দশটা টাকা চাই—নতুবা সব ধান যে বানের জলে তলিয়ে যাবে। আবার কি সে কামার খুড়োর কাছে হাত পাতবে? ওদিকে ট্যাক্স—তারপর সুদের তাগাদা—তার ওপর সংসারের নানান্ খরচ—তেল, নুন, চাল, ডাল। পতিরাম করুণভাবে, করুণস্বরে, শূন্য চোখে আকাশের পানে চেয়ে থাকে। হঠাৎ তার মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে—কিন্তু পরক্ষণেই মুখের সেই উজ্জ্বলতা নিভে যায়। দৃঢ়সঙ্কল্পভরে বলে, না—না। ও বকনা বাছুর আমি কিছুতেই বিক্রী করব না। না খেতে পাই, তাও স্বীকার। ঘাস খেতে খেতে, বাছুরটা তার কাছে এগিয়ে আসে। পতিরাম আদরে, তার গায়ে হাত বুলিয়ে বলে, খা মা খা—পেটভরে খা। বোবা বুঝতে পারে। তাই লেজ নাড়তে নাড়তে, এসে, পতিরামের গায়ে গা ঘষতে থাকে। বাছুরটার নিশ্বাস পতিরামের গায়ে লাগে—উভয়ে সেই মাঠের মাঝে ক্ষেতের আলে চুপ করে থাকে। পতিরাম বলে, বাছুর, এরপর তোকে ছোলা আর খোল খেতে দেব। আমার সোনা, আমার লক্ষ্মী, বুঝলি এই হাটে তোর জন্য খোল কিনব। পেটভরে খাবি। আবার ঝর ঝর করে বৃষ্টি নেমে আসে—চারদিক অন্ধকার করে মেঘ ডেকে ওঠে—হু—হু—শব্দে, বাতাস আর বৃষ্টি এসে পতিরামের গায়ে বিঁধতে থাকে। বাছুরটাকে কোলে করে, পতিরাম বড় বটগাছটার তলার আশ্রয় খোঁজে। চারদিক আঁধার করে, বৃষ্টি নেমে আসে।

বৃষ্টি তখনও পড়ছে—বিরামহীন-বিশ্রামহীন ভাবে। চারিদিক আঁধার—হু-হু শব্দে বাতাস বইছে। হড়-হড় করে মাঠে বৃষ্টির জল নামছে—খাল, বিল, ডোবা সব ভেসে গেল। গঙ্গার জল ক্রমশঃ ফেঁপে ফুলে উঠছে—বুঝি সব যায়।

পতিরাম বাছুরটাকে ঘাড়ে করে বাড়ী এল। ঘাড় হ'তে বাছুরটাকে নামিয়ে দেখল, রান্নাঘরের একপাশে মানদা দাঁড়িয়ে। ঘরের চাল উড়ে গেছে—দেওয়াল পড়ে গেছে—ঘরের বাঁশ হেলে মাটির সঙ্গে মিশেছে। পতিরাম চারিদিকে তাকিয়ে চীৎকার করে উঠলো—একি হয়েছে—উঃ কী সর্ব্বনাশ।

মানদা বললে, তখনই তো বলেছিলাম। নাও চাষ কর। এখন গাছতলা সার হ'ল। ভেবেছ এই ঝড় জলে রান্নাঘরের এই চালাটুকু থাকবে? সব উড়িয়ে নিয়ে যাবে। পতিরাম সব দেখল। সত্যই তাই—বড় জোর আর কয়েক মিনিট। এর পর রান্নাঘরের চালাটুকুও থাকবে না। কিন্তু না, কোন উপায়ই নেই। ওদিকে বানের জল বাড়ছে—বান এসে গেলে সব আশা শেষ হ'য়ে যাবে। তার সর্ব্বনাশ হয়ে যাবে। পতিরাম কাঁদে, বান বাড়ছে। বান এলে, আর এক ছটাকও ধান থাকবে না—পাকা ধান আমার সব শেষ হ'বে বৌ। আগে বেন্দা আর কানাইকে দেখি,—ধান কটা কেটে ঘরে তুলি। তার পর অদেষ্টে যা আছে হ'বে—। পতিরাম সেই ঝড়

বাছুরটা মানদার পা ঘেষে কাঁপতে থাকে। কড় কড় করে মেঘ ডাকতে থাকে—বিরামহীন বৃষ্টি, আরও জোরে নেমে আসে। মানদা সেই ঝড়ে জলে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপতে থাকলো। গরীবের শেষ আশ্রয়টুকু এক সময় মাথার ওপর থেকে উড়ে যায়। মানদা বাছুরটাকে কোলে করে, রাস্তার ধারে, হাটতলার একটা চালা ঘরে এসে দাঁড়ায়। সে উদাস নয়নে, পথের দিকে তাকিয়ে থাকে—যে পথ দিয়ে পতিরাম গেছে—

(৩)

শ্রাবণ মাসের অন্ধকার রাত। চারদিক নিশুতি, কোথাও কোনও শব্দ নেই। মাথার ওপর একটাও তারা নেই। কালো কালো মেঘে সব লেপে একাকার হয়ে গেছে। হয়তো, আবার এখনই জল ঝড় নেমে আসবে। পতিরাম যেন কার কাছ থেকে একটা ভাঙ্গা গাড়ীর ছই এনে, জমির এক পাশে পেতেছে। রাত্রে ওখানে বসে ক্ষেত পাহারা দেবে। পাকা ফসল এখন কেটে ঘরে তুলতে পারলেই হ'ল। কাল ভোর হ'তে, বেন্দা আর কানাই ধান কাটতে সুরু করবে। আর সে তো আছেই—মাত্র এই রাত কাটলেই, কাল তার পাকা ধান ঘরে উঠবে।

পতিরাম অন্ধকার-ভরা ক্ষেতের দিকে তাকিয়ে থাকে। কিছু দেখা যাচ্ছে না—ঘুটঘুটে করছে কাল আলকাতরার মত আঁধার। অন্ধকার যেন দলা পাকিয়ে রয়েছে। অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না—তবুও সে প্রাণপণে অন্ধকারের মধ্যে, ক্ষেতের পানে তাকিয়ে থাকে—কান খাড়া করে থাকে, একটু কিছু শব্দ হলেই পতিরাম রে রে করে লাফিয়ে পড়বে। মাঝে মাঝে, ভাঙ্গা একটা টিনে, জোরে ঘা মারছে—শব্দ হচ্ছে ঠং-ঠং-ঠং। এই শব্দে গরু বাছুর বা বন্য জানোয়ার পালাবে। আকাশে আবার মেঘ উঠলো। সোঁ—সোঁ করে মাঠের ওপার হ'তে বাতাস আর ঝড় চলে আসছে। গাছ-লতা-পাতা কাঁপছে, ধানের শীষিতে সপ্ সপ্ করে শব্দ হচ্ছে।

পতিরাম টিনটাকে আবার পিটিয়ে, তামাক টানতে লাগল। সমস্ত শরীর জলে ভিজে গেছে। ওর সারা এবং ঝড়ের মাঝেও সেই ভাঙ্গা ছইয়ের ভেতর দুই হাঁটুর মাঝে মাথা গুঁজে কাঁপতে লাগল সে। সেই অবস্থায় পতিরাম ভাবল, মানদা না জানি এখন কি করছে। মাথার আচ্ছাদন সেই সামান্য চালাঘর আর নেই। এতক্ষণ মানদা নিশ্চয়ই বাছুরটা নিয়ে, এই ঝড় জল অন্ধকারের মাঝে, ঠিক তারই মত হাটের কোন তালপাতা-ছাওয়া ঘরে কেঁপে কেঁপে উঠছে। এই কাল রাত, একি ভোর হ'বে না! বিড় বিড় করে পতিরাম বললে, না শরীর হিম হয়ে কালিয়ে গেল—এ ঝড় জল কি থামবে না? দেখি আর এক কলকে। আগুনের হাঁড়িটা থেকে, আগুন নিয়ে সে তামাক টানতে লাগল। কিন্তু তামাক খেয়েও যেন শরীর গরম হ'তে চায় না। সব যেন জল—পান্সে। রাত গড়িয়ে গড়িয়ে চলছে—একঘেয়ে ঝড় আর বৃষ্টি সমানভাবে পড়ছে। ভোর হ'তে এখনও বহু দেরী—পতিরাম এক মনে মাঠের দিকে তাকিয়ে শুধু বৃষ্টির শব্দ ছাড়া আর কিছুই শুনতে পেল না। বিড় বিড় করেই বললে, হাঁ, এই ঝড় জলে আবার গরু বাছুর আসে। রাতটা পোয়ালেই ব্যস্। পতিরাম সেই ভাঙ্গা ছইয়ের তলায় ঘাস লতাপাতার মাঝে কুকুর কুণ্ডলী হয়ে শুয়ে পড়লো—

যখন ঘুম ভাঙ্গলো তখন রোদ উঠে গেছে। কাদের হাঁকাহাঁকিতে ও উঠে বসে চোখ রগড়াতে লাগল। দেখল বেন্দা আর কানাই।

ওরা দুজনই বললো—খুড়ো খুব যে আরাম করে ঘুমুচ্ছ—ওদিকে দেখ কি হয়েছে—

পতিরাম তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠে, ক্ষেত পানে তাকিয়ে দেখে চীৎকার করে উঠলো—হা ভগবান, একি করলে—! আমার সোণার ধান—আমার বুকের রক্ত কেড়ে নিলে। সে জলভরা চোখে চেয়ে দেখল—লাল ঘোলা-জল চারদিকে থৈ থৈ করছে। গঙ্গার জল আর বানের জল এক সঙ্গে রাতারাতি এসে পাকা ধানকে ডুবিয়ে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। ধানের ওপর দিয়ে কল কল করে স্রোত যাচ্ছে।

অনেক রাতে চুপি চুপি কখন বান এসেছে তা পতিরাম জানতেও পারেনি। ক্ষেত হ'তে অনেক ওপরে উঁচু

কানাইয়ের হাত চেপে ধরে পতিরাম বললে—হাঁরে ডুব দিয়ে দিয়ে কি কিছু কাটা যাবে না। ভেলা করে—নৌকো এনে—

বেন্দা বলল—খুড়ো ও পাকা ধান—ওই জলের তোড়ে কোথায় চলে গিয়েছে। আর দেখছ না কি স্রোত—ও আর কিচ্ছু নেই। দু মানুষ-ভর জল—ঐ দেখ আমাদের বাখলা গাছটাব কোথায় জল উঠেছে—দেখছ ?

পতিরাম ভাবল, মামলার কথাই শেষে ফলে গেল। টিনির কলে এবার সত্যই মজুরী করতে হ'বে। কিন্তু ট্যাক্স খাজনা পাওনাদারদের দেনা—তার ঘর নেই—একফোঁটা নূন-তেল বা চাল নেই। এ সব সে ঠেকাবে কি দিয়ে? পতিরাম আর ভাবতে পারল না। ধপ্ করে সেই কাদাজলের ওপরই বসে চীৎকার করে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল। আকাশ তখন পরিষ্কার—রৌদ্রালোকে চারদিক ঝলমল করছে।

ভারতবর্ষে 'ইষ্ট' প্রস্তুতের সম্ভাবনা

শ্রীমোহিনীমোহন বিশ্বাস

সভ্যজগতে 'ইষ্ট' (সুরাবীজ) ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া যায় প্রায় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে। ১৯১৪-১৯ সালের মহাসমরের সময় জার্ম্মাণীতে নিদারুণ খাদ্যসংকট দৃষ্ট হয়। বহির্জগৎ হইতে খাদ্য-সরবরাহ সম্পূর্ণ বন্ধ হওয়ায় জার্ম্মাণগণ 'ইষ্ট'এর সমতুল্য পুষ্টিকর খাদ্য প্রস্তুতে মন দেয়। তাঁহারা বিবিধ রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা প্রচুর পরিমাণে 'ইষ্ট' প্রস্তুত করিতে সক্ষম হয়। খাদ্যশস্য ছাড়াও অন্যান্য শ্বেতসার (বীটশর্করা) হইতেও তাঁহারা 'ইষ্ট' প্রস্তুত করিয়া দেশকে দুর্ভিক্ষের হাত হইতে রক্ষা করেন। মাংস প্রভৃতি প্রোটিন খাদ্যের অভাব পূরণ করিতে ইহা অদ্বিতীয় এবং আজ পৃথিবীর সমস্ত সভ্যদেশই 'ইষ্ট'এর খাদ্যমূল্য সম্যক উপলব্ধি করিয়া ব্যাপকভাবে ইহা প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়াছে। গত যুদ্ধের সময় জার্ম্মাণগণ আবার 'ইষ্ট' প্রস্তুতে মন দেয়। তাহারা প্রকৃতিজাত খাদ্য নষ্ট না করিয়া কাঠ হইতে এসিড সহযোগে কাঠশর্করা (Wood Sugar) প্রস্তুত করিয়া, পরে জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা উহা হইতে 'ইষ্ট' প্রস্তুত করিতে সক্ষম হয়।

সাধারণতঃ শর্করা প্রভৃতি শ্বেতসারের সহিত 'ইষ্ট' প্রস্তুতকারী জীবাণুসমূহের (Strains) জৈব রাসায়নিক সংযোগে এই প্রোটিন খাদ্য প্রস্তুত হয়। টরুলা ইউটিলিস (Torula utilis) এই শ্রেণীর একটি শক্তিশালী জীবাণু এবং ইহার সহযোগে শ্বেতসারের প্রায় সমস্তটাই ইষ্টে পরিণত হয় ও সুরা প্রস্তুত আদৌ হয় না। আধুনিক কারখানা-সমূহে মাতগুড় (molasses), খাদ, ভুট্টা, গম প্রভৃতি শ্বেতসার পদার্থ এবং ক্যালসিয়াম সুপারফস্ফেট, এমোনিয়াম সালফেট, এমোনিয়া ও সালফিউরিক এসিড প্রভৃতি রাসায়নিক 'ইষ্ট' প্রস্তুতের জন্য ব্যবহৃত হয়। বিগত মহাযুদ্ধের সময় ভারত সরকারকে বহুসংখ্যক বৃটিশ ও আমেরিকান সৈন্যের ভরণপোষণ করিতে হয়। তখন জাহাজের অসুবিধার জন্য বিদেশ হইতে খাদ্যদ্রব্য আমদানী করা সুকঠিন হইয়া উঠে। পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব পরিপূরণের জন্য নয়া দিল্লীর ভারত সরকারের সরবরাহ বিভাগ ১৯৪১ সালে 'ফুড ইষ্ট কমিটি' নামক একটি সমিতি স্থাপিত করেন। ভারতীয় মাতগুড় হইতে ইষ্ট প্রস্তুত করিবার সম্ভাব্যতা আলোচিত হয়; উক্ত সমিতির মতে ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর ১০,০০০ টন ইষ্ট প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা করা সম্ভব। যুদ্ধের পরে উক্ত পরিকল্পনা সাময়িকভাবে বন্ধ থাকে। ইদানীং বার্ষিক ২০০০ টন ইষ্ট প্রস্তুতের উপযোগী একটি সরকারী কারখানা নির্ম্মাণের পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে। ভারতবর্ষে খাদ্যসমস্যা চরম সীমায় পৌঁছিয়াছে। দ্রব্যমূল্য বহুগুণ বৃদ্ধি পাওয়ায় জীবনযাত্রার ব্যয়ও বহুগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। উপযুক্ত পরিমাণ প্রোটিন ও শ্বেতসার, ভিটামিন প্রভৃতি না পাওয়ায় সাধারণ লোকের স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। মাছ মাংসের মধ্যে উচ্চ খাদ্যমূল্যবিশিষ্ট প্রোটিন আছে এবং যাঁহারা মাছ মাংস খান তাঁহাদের জীবনীশক্তি বা রোগপ্রতিরোধ-শক্তি বেশী। নিরামিষ-ভোজীরা তাঁহাদের প্রোটিন খাদ্যের ঘাটতির পরিমাণ পূরণ করিতে দুধ, ছানা প্রভৃতি খাইতে পারেন। কিন্তু বর্ত্তমানে অর্থসংকটের দিনে সাধারণ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে দুধ ও ছানা খাইতে বলা বাতুলতা মাত্র। যাঁহারা প্রয়োজনীয় চাউল, গম প্রভৃতি খাদ্য (Cereals) যোগাড় করিতেই অক্ষম, তাঁহাদের কাছে উচ্চ জৈবশক্তিসম্পন্ন প্রোটিনের (Proteins of high Biological value) বক্তৃতা কেবলই নিষ্প্রয়োজন। সুতরাং নিরামিষ-ভোজীদের পুষ্টিমান রক্ষা করা একটা সমস্যা। এই সমস্যার কিঞ্চিৎ সমাধান হইতে পারে 'ইষ্ট'এর ব্যবহার প্রচলন করায়—কারণ ইহার মধ্যে অতি উচ্চজৈবশক্তিসম্পন্ন প্রোটিন বর্ত্তমান আছে। যুদ্ধকালে যে পরিমাণ গো-মহিষাদি প্রাণীর নিধন হইয়াছে আজ পর্য্যন্ত তাহার সম্পূরণ হয় নাই এবং মানুষ আজ নিজের জীবনই বাঁচাতে অক্ষম—সুতরাং প্রাণীজগতের উন্নতিসাধন করার আশু সম্ভাবনা দেখা যায় না। এ কারণ ব্যাপকভাবে ইষ্টের প্রচলন সর্বদেশের সর্বজাতির মধ্যেই দরকার। নিরামিষ-ভোজীদের মাছ মাংস

[illegible] করা হয়। জার্মানীবাসীদের শতকরা ৭০জন [illegible], সৈনিক প্রভৃতির পক্ষেই এই খাদ্য (Yeast) গ্রহণ অভ্যাস করা একান্ত প্রয়োজনীয়। মাছ মাংসের উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করা সময়সাপেক্ষ। সে স্থলে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই আক, বীট, যব, ভুট্টা প্রভৃতি হইতে ইষ্ট প্রস্তুত করা সম্ভবপর। সুতরাং কৃষিকার্য্যের প্রতি আরও বেশী মনোযোগ দিয়া এই সকল শ্বেতসার-প্রধান দ্রব্যের উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে হইবে। তাহাতে দেশের পক্ষে প্রয়োজনীয় শ্বেতসার পৃথক রাখিয়াও বহুপরিমাণ উদ্বৃত্ত থাকিবে। এই অতিরিক্ত শ্বেতসার হইতে ইষ্ট প্রস্তুত করিলে বর্ত্তমান প্রোটিনসমস্যার সমাধান বহুলাংশে সম্ভব হইবে। ভারতবর্ষে ইষ্টএর প্রচলন বিশেষ নাই। কেবলমাত্র ঔষধ প্রস্তুতের জন্য সামান্য পরিমাণ আমদানী হয়। দেশে প্রস্তুত করিলে ইহার দামও অনেক কমিয়া যাইবে। তৈয়ারী করিলে এক পাউণ্ড ইষ্টএর দাম ছয় আনার বেশী হইবে না।

অধুনা পৃথিবীব্যাপী খাদ্যসংকটের ফলে সকল দেশের লোকেরা অধিক পরিমাণে ইষ্ট প্রস্তুতে মন দিয়াছে। গত যুদ্ধের সময় প্রতি বৎসর জার্মাণীতে ৪০০,০০০ টন, আমেরিকায় ১১৫,০০০ টন এবং ইংলণ্ডে ২,২০০ টন ইষ্ট প্রস্তুত হইত এবং বর্ত্তমানেও ঐ সমস্ত দেশে প্রচুর পরিমাণে এই খাদ্য তৈয়ারী হইতেছে। ভারতবর্ষে কয়েকটি মদ্য-প্রস্তুতের কারখানা হইতে কয়েক টন মাত্র ইষ্ট পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে এই খাদ্য প্রস্তুত করিলে পৃথিবীর অপরাপর দেশ হইতে আমদানী ইষ্ট হইতে মূল্য কম পড়িবে এবং এই দেশে প্রয়োজনীয় শ্বেতসার (মাতগুড় [illegible] করা। [illegible] আউন্স ইষ্টের মধ্যে যে পরিমাণ জৈবশক্তিসম্পন্ন প্রোটিন আছে তাহার সমতুল্য প্রোটিন পাইতে ৫ আউন্স ডিম, তিন আউন্স ভেড়ার মাংস, ষোল আউন্স দুধ এবং চার আউন্স গম খাইতে হইবে। অধিকন্তু গ্লিসারিণ, চর্ব্বি, প্লাস্টিকস প্রভৃতের জন্যও ইষ্টের চাহিদা আছে।

ইষ্টের মধ্যে প্রোটিন ছাড়াও প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন আছে। শরীর রক্ষার জন্য যে সমস্ত ভিটামিন প্রয়োজন তাহার সমস্তগুলিই এই একটিমাত্র খাদ্যে বিদ্যমান। ইহাতে প্রচুর পরিমাণে থিয়ামিন (ভিটামিন বি১), রিবোফ্লাভিন (ভিটামিন বি২), নিকোটিনিক এসিড, প্রোভিটামিন ডি, প্যান্টোথেনিক এসিড, বাইয়োটিন এবং প্যারাএ্যামিনো বেনজয়িক এ্যাসিড আছে—যেগুলি আধুনিক খাদ্য বিজ্ঞানের মতে শরীর গঠনের পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয়।

ভারতবর্ষে ইষ্ট প্রস্তুতের উপাদানগুলি অন্যান্য দেশ অপেক্ষা সুলভে পাওয়া যায়। যব (Barley) সাধারণতঃ মণ প্রতি চার টাকা আট আনা এবং মাতগুড় মণ প্রতি মাত্র আট আনা দরে পাওয়া যায়। প্রতি বৎসর ভারতবর্ষের উৎপন্ন মাতগুড়ের পরিমাণ ৬৮৩,০০০ টন এবং যবের পরিমাণ ২,৩১৩,০০০ টন। সুতরাং সহজেই কল্পনা করা যায় ইষ্ট প্রস্তুতের মূল উপাদানদ্বয়ের কোন অভাবই এখানে হইবে না। এক্ষণে জাতীয় সরকারের কর্ম্মপ্রচেষ্টা ও জনসাধারণের ঐকান্তিক সহযোগিতার উপরই এই বিরাট শিল্প-সম্ভাবনা নির্ভর করিতেছে।

ঝরিবে না আঁখিনীর

শ্রীগোবিন্দপদ মুখোপাধ্যায় এম্-এ

সন্ধ্যা তখন ঘন হ'য়ে আসে নীরব ধরণী বুকে,
পাতলা-মেঘের-কালো আবরণ আকাশ ক'রেছে কালো,
মৌনপ্রকৃতি রয়েছে দাঁড়ায়ে কি জানি কোন সে দুখে
পৃথিবীর কোলে হিমপাণ্ডুর আবছা চাঁদের আলো।

ঝিল্লীর তানে নীরব বনানী আরো যেন ব্যথাতুর ;
না-বলা কথার নীরব বেদনা গুমরি উঠিছে হায় ;
বাতাসের শ্বাসে বাজিতেছে যেন তারি অশান্ত সুর,
সন্ধ্যায় পৃথিবী কাজল ছায়ায় নিজেরে লুকোতে চায়।

পাতার আড়ালে জোনাকির আলো আলেয়া জ্বলিছে যেন
কানে ভেসে আসে অজানাপাখীর শিহরিত চীৎকার,
আঁধারে আলোকে প্রকৃতির রূপ এ কি দেখি আজি হেন,
বেদনা-বিধুরা আভরণ-হীনা রিক্তা শ্যামলতার।

বসুন্ধরার উদাসিনীরূপ এবার হেরিব আমি,
অবসিত হায় চির যৌবন শ্যামল উর্ব্বশীর ;
সাহারার মরু জাগিবে হেথায় অবিরত দিবাযামী
শুষ্ক নীরস চোখেতে আমার ঝরিবে না আঁখিনীর।

জাহানারার আত্মকাহিনী

অধ্যাপক শ্রীমাখনলাল রায় চৌধুরী শাস্ত্রী

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

যেমন বিপরীত গতি হয়, দুঃখ পীড়িত অবলুপ্ত গৌরবে, আমার মনও তেমনি আমার অভ্যন্তরে সঙ্কুচিত হয়ে গেল। আজকে তৈমুরের সেই বাবারের সৈন্য বাহিনী কোথায়? আমার আত্মবিশ্বাসই বা কোথায়?

আমি ক্রন্দন করলাম—আমার মাতার মৃত্যুর পর আর আমি অমন ক্রন্দন করিনি। আমার মনে হল আমার পদনিম্নে পৃথিবী অপসৃত হচ্ছে, সমস্ত পৃথিবী যেন কোন ভীষণ আদেশের অপেক্ষা করছে।

ভারতের ভবিষ্যৎ এবং আমার সমস্ত ভরসা আমার রাখীবন্দ ভাইয়ের উপর নির্ভর করছে।

আমি ক্রন্দন করতে করতে নিদ্রার কোলে এলিয়ে পড়লাম—হঠাৎ অশ্বপদ-ধ্বনিতে জেগে উঠলাম, আগ্রার পথের দিক থেকে সেই ধ্বনি ক্রমশঃ নিকটতর হচ্ছিল, তারপর অকস্মাৎ সে ধ্বনি নীরব হয়ে গেল।

আবার আমি সম্রাট আকবরের জীবন্ত নগরে নূতন জীবন অনুভব করলাম। আমি আশা করছিলাম, আমার কক্ষের প্রস্তরের ঘূর্ণ্যমান দরজা আমাকে পাশের প্রকোষ্ঠে নিয়ে যাবে—আমার চক্ষের সম্মুখে সম্রাটকে দেখতে পাব।----

দ্রুতগামী অশ্বপদ ধ্বনি আমার শিরার রক্তকে চঞ্চল করে দিল—ক্ষিপ্র রাজপুত বাহিনী আবার ছুটে আসছে ভারতবর্ষকে রক্ষা করবার জন্য। রাজস্থানের নারীরাই বীরপুত্রপ্রসবিনী হয়। কোয়েল বলেছিল, "আমি এখনো সুন্দরী রয়েছি, যেমন আমি ছিলাম আমার যৌবনে। সত্যি কি তাই?"

আমি চিত্রাধারের জন্য হস্ত প্রসারিত করলাম। আমাকে সেইটা চুম্বকের মত আকর্ষণ করছিল। আমি চিত্রাধার খুললাম—আর একটী চিত্র আমার দৃষ্টি পথে এল। সেই চিত্রে ছিল—শ্রীকৃষ্ণ একই সময়ে একাকী তাঁহার সহস্র গোপিনীর সম্মুখে উপস্থিত, রুক্মিণী শ্রীকৃষ্ণের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত, কালিন্দীর উপরে শায়িত শ্রীকৃষ্ণ, সত্যভামার সাথে ক্রীড়ারত শ্রীকৃষ্ণ, যে তাঁকে আকাঙ্ক্ষা করে শ্রীকৃষ্ণ তার কাছে সেরূপেই উপস্থিত,(১) চিত্রের নিম্নে ক্ষোদিত রয়েছে,—"তোমার দাসকে তুমি দরিদ্রতর কর। কারণ দরিদ্র যে তোমাকে নিত্য স্মরণ করে।"

কোয়েল আমার জন্য একখানি মুকুর, গুগগুল এবং নখের জন্য রক্তচন্দন রেখে গিয়েছিল—যেন আমি বিবাহ উৎসবের আমন্ত্রণে যাব। অবশ্য ফতেপুরের সমাধিতে গিয়ে সেলিম চিশতীর সঙ্গে দেখা করব। আমি আমার সমস্ত মণিমুক্তা রেখে গিয়েছিলাম; আমার সঙ্গে ছিল মাত্র একটী মুক্তাহার, হার মধ্যে রক্ষিত ছিল কবচ, কবচের মধ্যে ছিল সেই পত্রখানি। আমি অতি দীনের মত তাঁর কাছে যাব, সেই মহাপুরুষের না ছিল মণি, না ছিল পার্থিব সম্পদ—কিন্তু তাঁর ছিল অলৌকিক ক্ষমতা—বন্য পশুকে তিনি দূরে সরিয়ে রাখতেন, মানুষকে তিনি আকর্ষণ করতেন।

"ভগবান্! তোমার দাসকে তুমি দরিদ্রতর কর" সেলিম চিশতীর দারিদ্র্যই কি সম্রাটকে ফতেপুর শিক্রী নির্ম্মাণ করবার প্রেরণা দিয়েছিল? দারিদ্র্যের অন্তর্নিহিত শক্তি—তা কি সৌন্দর্য্যের পরিপন্থী! আমি আমার চতুষ্পার্শে নিরীক্ষণ করে দেখলাম, এখানে এখনো সেই অলৌকিক শক্তির প্রভাব বিদ্যমান।

আমার ভ্রাতা ঔরঙ্গজেব টুপী তৈরী করতেন; ফকীরের মতন সে টুপী বিক্রয় করতেন, তার ক্ষমতার প্রতি লোভ ছিল, কিন্তু সৌন্দর্য্য দেখলে ঔরংজেব অতিষ্ঠ হয়ে উঠতেন? আমার পিতার ছিল আড়ম্বর প্রীতি; তিনি সম্রাট আকবরের চেয়েও ঐশ্বর্য্যশালী ছিলেন; আজ যদি তাঁর সেই পূর্ব্বের ক্ষমতা থাকত! আমি আগ্রায় প্রত্যাবর্তন করে রুগ্ন মানুষের মধ্যে বহু হস্তী অশ্ব বিলিয়ে দেব—তারা মসজিদে মন্দিরে প্রার্থনার জন্য আসবে। আমি ক্রীতদাস দাসীদের মুক্তি দেব, দশ সহস্র "দিনার" দরিদ্রদের মধ্যে বিলিয়ে দেব, আমার দানে পিতার পাপের কিঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্ত হবে।

আমি জুম্মা মসজিদের দিকে গেলাম। তারপর উজীর আবুল ফজল ও তাঁর ভ্রাতা ফৈজীর অনাড়ম্বর গৃহ বাটিকাতে উপস্থিত হলাম। সম্রাট আকবরের সাম্রাজ্য ও তাঁর দীন্-ই-ইলাহী এই ভ্রাতৃদ্বয়ের নিকট কত ঋণী। আমি মৃদু চরণে চলেছি, আমার মস্তক শ্রদ্ধায় অবনত হয়ে গেছে, আমি ফৈজীর ক্ষুদ্র গৃহের সোপানশ্রেণী আরোহণ করলাম, মনে হল যে সেই রাজকবি তাঁর সম্রাটের সম্মুখে আবৃত্তি করছেন—শ্রীকৃষ্ণের কোন কাহিনী, নাজির-ই-খসরুর কোন কবিতা:—

সমুদ্রের মত সুবিশাল শাস্ত্রের বিধান;
মুক্তার মত ঋষির অন্তর-দৃষ্টি সুমহান।
সমুদ্রের গহ্বরে নিহিত রয়েছে মুক্তাশত;
ত্যজ তীর, দাও ডুব; গুরুর সন্ধানে হও রত।

ফৈজীর সম্বন্ধে একটা কথা আমার মনে পড়ছে, তিনি যদিও অদ্বিতীয় কবি ছিলেন—নিজের প্রয়োজনে ফৈজী কখনো কোন জিনিষ যাচ্ঞা করেন নি। তবু তিনি অন্য একজনের জন্য সম্রাটের অনুগ্রহ যাচ্ঞা করে পত্র দিয়েছিলেন, অবশ্য সেই লোকটী ফৈজীকে [illegible]

(১) জাহানারার হিন্দু শাস্ত্র ও উপাখ্যানের জ্ঞান অতি গভীর [illegible]।

শুধু আত্মা পরিভ্রমণ করে বেড়ায় যে সমস্ত সাধুপুরুষ প্রত্যহ প্রত্যুষে আল্লা হুয়াকবরের স্তুতি গান করে—তাঁদের নামে আমি সম্রাটকে আমার নিবেদন জানাচ্ছি।" এই বলে সম্রাটের কাছে শত্রুর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন।

তারপর আমি আবুল ফজলকে তাঁরই আবাসে অভিনন্দন জ্ঞাপন করতে গেলাম। এখানে আবুল ফজল গবেষণা-নিমগ্ন থাকতেন, তাঁর অপূর্ব্ব গ্রন্থ রচনা করতেন। তিনি প্রচার করেছিলেন—"ভারতের বহু ঈশ্বরের উপরে স্থাপিত রয়েছেন পরমেশ্বর। সেই এক ঈশ্বরই সমস্ত দেবতার মিলিত প্রতীক্, সুতরাং বৎসরের বিশেষ বিশেষ দিনে ভারতবর্ষে মানুষের রক্তপাত করা হবে না, বিবাদের অঙ্কুর নষ্ট করে শান্তির পুষ্পোদ্যান রচনা করা হবে।

ভগবন্!

মন্দিরে মন্দিরে ফিরি তোমারে খুঁজিয়া,
তোমারি স্তব সকল ভাষায় উঠিছে ধ্বনিয়া।
মূর্তিপূজক আর মুসলিম তোমারই বারতা বহে,—
তুমি এক, তুমি অদ্বিতীয় সর্ব্বধর্ম্ম কহে।
নীরবে তোমারে করে স্মরণ মসজিদে মুসলমান
গির্জ্জাতে তোমারি প্রেমে ঘণ্টাধ্বনি করিছে খৃষ্টান।

এই ত ছিল আবুলফজলের বাণী—তাঁর বাসনা ছিল তিনি মঙ্গোলিয়ার সাধু মহাজনদের দর্শন করবেন—লেবাননের(৩) সন্ন্যাসীদের দর্শন করবেন। তার পরিবর্ত্তে তিনি তাঁর প্রভুকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি পদে বরণ করলেন। ঈর্ষান্বিত রাজকুমার সেলিম বিশ্বাসঘাতকতা করে তাঁর মুণ্ডচ্ছেদের ব্যবস্থা করেছিলেন। শোকে অভিভূত হয়ে আকবর আহার-নিদ্রা ত্যাগ করলেন, বন্ধু আবুলফজলের জীবনের বিনিময়ে তিনি নিজের জীবন উৎসর্গ কর্ত্তে কুণ্ঠিত ছিলেন না।

আমার পদতলে শিলাখণ্ড আমাদের বংশের বহু পাপের মূর্ত্ত প্রতীক্ হয়ে উঠল, আমাকে কি সমস্ত জীবন এই পথেই চলতে হবে? অকস্মাৎ আমার পদনিম্নে একখণ্ড প্রস্তরে বৃহৎ রক্তচিহ্ন দেখলাম। আমি শিউরে উঠলাম—সম্রাট আকবরকে কি পাপ স্পর্শ করেছিল?

রাজ-তোরণের মধ্য দিয়ে আমি জুম্মা মসজিদের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করলাম। অস্তায়মান সূর্য্যের শেষ রশ্মি পদতলের প্রস্তর খণ্ডগুলিকে সমাধি মুক্তাশুভ্র উজ্জ্বল্যোদ্ভাষিত হয়ে উঠেছিল। এখন দেখছি সেখানে তত্তনিয়ে আর কোন ইলাহী শিষ্য উপস্থিত নেই। পুণ্যাদিবসোচিত পরিচ্ছদভূষিত কোন মানুষ আর হোমকুণ্ডে উপস্থিত নেই। আমিই একা সেই মহাপুরুষের পুণ্যসমাধিক্ষেত্রে তীর্থযাত্রী।

এই ক্ষুদ্র পবিত্র তীর্থক্ষেত্রটী সম্রাট আকবরের সমাধির অনুরূপ—শ্রেণীবদ্ধ স-ছিদ্র শ্বেত মর্ম্মর গবাক্ষ-সমাধি প্রদক্ষিণ করে চলে গেছে। সেগুলি ইউরোপীয় মঠে বালর উৎসর্গের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল।(৪) সমগ্র হিন্দুস্থানে এমন আর কোন সমাধি মন্দির পরিকল্পিত হয়েছে? এই অর্ঘ্য সম্রাট স্বয়ং চিশতীকে উৎসর্গ করেছিলেন। আমি প্রবেশ পথের দিকে অগ্রসর হলাম সোপান অতিক্রম করে। সম্রাট আকবরের দরজার উপর একটী রৌপ্য নির্ম্মিত অশ্বক্ষুর স্থাপন করেছিলেন। এই মাত্র যে অশ্বক্ষুরধ্বনি শুনছিলাম, তাই স্মরণ করলাম—আমি কল্পনায় নেত্রে দেখলাম সহস্র রাজপুত অশ্বারোহী দ্রুতগতিতে চলেছে আমার পিতাকে উদ্ধার করবার জন্য। সঙ্গে সঙ্গে আমি দেখলাম প্রাচীর গাত্রে স্বর্ণাক্ষরে উৎকীর্ণ রয়েছে,—"ভগবান্, পৌত্তলিক শত্রুদের শাস্তিবিধান কর"। কিন্তু ঐ বিধর্মীদের মধ্যে রয়েছে ঈশ্বরে বিশ্বাসী, তারা আমাদের সাম্রাজ্যের প্রহরী···

অনন্তের সঙ্গে কালের যে সম্বন্ধ, অসীমের সঙ্গে স্থানের সেই একই সম্বন্ধ। এবার সমস্ত পৃথিবীর বিরোধিতার বিরুদ্ধে আমি আমার শৈশবের অন্তরালে আশ্রয় পেলাম। সেখানে একটী দেবদূত আমার কাছে গোপনবার্ত্তা নিয়ে আসছিল—একমাত্র আমার কাছে। ভগবান পক্ষপুটে যেমন বিশ্ববীজকে রক্ষা করেন(৫) তেমনি আল্লাহের সিংহাসন থেকে নেমে এসেছে একটী দেবদূত—সেলিম চিশতীর গম্বুজকে রক্ষা করবার জন্য।

শুদ্ধতমের সান্নিধ্য লাভ করা মানুষের পক্ষে সহজ নয়। সমাধি কক্ষের স্তম্ভের চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করে চলে গেছে একটী চতুষ্কোণ দল। প্রাচীরের সছিদ্র জানালার মধ্য দিয়ে দিনের আলো কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করে। অভ্যন্তরের শ্বেত মর্ম্মর প্রাচীর গাত্রে চিত্রিত পুষ্পাধারে রক্ষিত স্থলপদ্ম ও অহিফেন পুষ্প স্বর্ণাভ ক্ষীণ আলোক সম্পাতে উদ্ভাসিত। আমার মনে হল যেন আমি চন্দন বনের বহির্দ্দেশে অপেক্ষা করছি। আমার অন্তর্দৃষ্টিতে অতীত জীবনের বহু স্মৃতি ভেসে আসছিল,—আমি স্বর্গের শান্তি সদনে চলেছি, সেখানে আলোক বয়ে যায় শৃঙ্খলের মত চিরপ্রবহমান।

অতি সন্তর্পণে আমি গুপ্ত প্রকোষ্ঠের দ্বার খুলে ফেললাম, এ যেন

---

(২) বাদায়ুনী ছিলেন উদারপন্থী ফৈজ ও আবুলফজলের শত্রু। একথা রাজদরবারে সকলেই জানত, বাদায়ুনী মিথ্যা কথা বলার রাজ-রোষে কর্ম্মচ্যুত হলেন, ফৈজী তাঁর জন্য সম্রাটের নিকট—সুপারিশ করে তাকে কার্য্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এই ঘটনার কথাই জাহানারা উল্লেখ করেছেন এখানে।

(৩) লেবানন দেশে বালবেকের মন্দিরে এখনো ভারতীয় সন্ন্যাসীর অনুকরণে ভগবানের অর্চ্চনা করা হয়। ধূপ, প্রদীপ ও ঘণ্টাধ্বনি প্রতি সন্ধ্যায় দেবতার আরাধনা করে।

(৪) ক্যাথলিক মঠে এখনো ভক্ত-খৃষ্টানগণ বালর উৎসর্গ করা পুণ্য কর্ম্ম বলে বিবেচনা করে। আকবরের সমাধিতে প্রস্তর নির্ম্মিত আলয়-গুলি খৃষ্টান মঠের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

(৫) প্রলয়ের দিনে সৃষ্টির বীজ ভগবান পক্ষীরূপে তাঁর পক্ষপুটতলে রক্ষা করেছিলেন। সেমিটিক ধর্ম্মমত এই সৃষ্টিরকাহিনী বিশ্বাস করেন।

সূর্য্যের তেজের আলোয় রূপ-পরিবর্তন। এখানে গবাক্ষঘারই আলোক প্রবেশের একমাত্র পথ। গবাক্ষের উভয় পার্শ্বেই অনির্বাণ প্রদীপ মালা জ্বলছে।

অনন্তের সুবিশাল ক্ষেত্রেই আমি পুষ্প-সম্পদ চয়ন কচ্ছি; সমস্ত প্রাচীর গাত্রে ও গবাক্ষের অন্তরদেশের চিত্রিত পুষ্পগুলি দেখে আমার এই কথাগুলি মনে আসছিল; এই কুসুমদাম যেন স্বর্গের নন্দনকানন থেকে চয়নিত। সে কাননে অপ্সরাকুল পুষ্পের সুবাসেই জীবন ধারণ করে থাকে।

এই কক্ষের সর্ব্বোত্তম দর্শনীয় জিনিস স্তম্ভের উপরে স্থাপিত চন্দ্রাতপ, শুক্তিমুক্তা ও আবলুশ কাঠের উপর অপূর্ব্ব সুন্দর এই ভাস্কর্য্য। সমাধির গাত্রে শুক্তি মুক্তাগুলি যেন মনুষ্য চক্ষু নিঃসৃত অশ্রুকণা। আমার হৃদয় উদ্বেল হয়ে উঠল—কিন্তু আমি নতজানু হয়ে মস্তক অবনত করলাম।

সমগ্র জগৎ কি কতগুলি সম্ভাব্যের সমাধি ক্ষেত্র নয়? বীজ অঙ্কুরিত হয়ে উঠে, আবার ধূলিতে পরিণত হয়। একটা মত্ত হস্তী প্রত্যেক জীবন্ত প্রাণীকে পদতলে দলিত কচ্ছে, এই ত পরম্পরের প্রতি মানবের নৃশংসতার রূপ। তরঙ্গের উপর তরঙ্গের মতন মানবের দুঃখরাশি সঞ্চিত হচ্ছে—আকাশের গায়ে রক্তমেঘের মত—মেঘাবৃত সূর্য্যের মত। কিন্তু অকস্মাৎ একটী স্বর্ণাভ উজ্জ্বল আলোর রেখা সমস্ত স্থানটী উজ্জ্বল করে দেয়—দুঃখের তরঙ্গ তত দূর স্পর্শ করতে পারে না———

মহম্মদের মতন (৬) স্বর্গে আরোহণ কর, আল্লাহর বিরাট কর্ম্মক্ষেত্র নিরীক্ষণ কর; শৈশবে যেমন দেখেছিলাম, আজও দেখছি সেই মহম্মদের শুভ্র পশম বস্ত্র ধুলায় অবলুণ্ঠিত। (৭) বহুকম্পিত হস্ত সেই বস্ত্রের দিকে প্রসারিত—সহস্র মানুষ তাকে স্পর্শ কর্ত্তে চেষ্টা করেছে—জ্ঞান শিখরে মহম্মদকে অনুসরণ কর্ত্তে প্রয়াস করে——

আমি আমার মস্তক উত্তোলন করলাম—দেখলাম শুক্তি মুক্তা সন্ধ্যার অন্ধকারে আর্দ্র ভারাক্রান্ত মানব চক্ষুর মতন উজ্জ্বল। যে সমস্ত মহাপুরুষ এই হতভাগ্য মানবদের দুঃখ সাগর থেকে উদ্ধার করবার জন্য প্রয়াস করেছিলেন, শুক্তি মুক্তাগুলি যেন তাঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছিল। নীরবে আমার অধর প্রার্থনা জানাচ্ছিল—

"হে ঈশ্বর, পৃথিবীতে যে আনন্দ লুপ্ত হয়ে গেছে, তুমি সেই আনন্দ কণাগুলিকে স্বর্গে সংগ্রহ কর। আবার সেই আনন্দকে পরিশোধিত করে নূতন জগতে মানুষকে ফিরিয়ে দাও।" আমি কি আমার কক্ষের পাশে পদধ্বনি শুনলাম? না, আবার নীরবতা। কিন্তু এখানে আবার কোন মানুষের স্পষ্ট পদধ্বনি! আমি উঠে দেখলাম সেই মুহূর্ত্তে দ্বার উন্মুক্ত হচ্ছে। উন্মুক্ত দ্বারের মধ্য দিয়ে একটা আলোর শিখা—সেই আলোতে দেখলাম, দণ্ডায়মান এক উন্নতশির দীর্ঘদেহ শুভ্র উষ্ণীষধারী বীর সৈনিক পুরুষ—আমার রাখীবন্ধ ভাই!—আমি অকস্মাৎ পূর্ণবিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেলাম—তারপর বিস্ময় পরিণত হল পূর্ণ প্রশান্তিতে। এইরূপ ঘটনা সম্ভব! দিব্যধাম থেকে আমার কাছে প্রতিভাত হল যেন। আমি পূর্ব্বে আরও বহু জন্ম এই পৃথিবীতে বাস করেছিলাম। আমার যা' কিছু প্রাক্তন সৎকর্ম্ম তা এই মুহূর্ত্তে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। আমি এখন আর জাহানারা নই, আমি অনন্ত রাজ্যের একটী সত্তামাত্র।

তারপর আমার মুখের অবগুণ্ঠন উন্মোচন করে ফেল্লাম—তার চক্ষের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলাম। তৎক্ষণাৎ আমি অনুভব করলাম, আমি যে পত্র পেয়েছিলাম তা তিনি লেখেন নি, আমার পত্রও তিনি পান নি, ঔরঙ্গজেব একখানি পত্র জাল করেছিলেন, তাঁর লিখিত পত্রখানি নষ্ট করেছিলে,—প্রশান্ত দৃষ্টি নিয়ে তিনি আমার দিকে দেখলেন, তার নয়নের ভাষায় ছিল—"হে দোষলেশ-হীনা" নারী——তারপর মুহূর্ত্তেই তাঁর আকৃতিতে পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম। তাঁর সম্পূর্ণ দেহ কম্পিত হচ্ছিল, তাঁর রক্ত দ্রুত সঞ্চালিত হচ্ছিল, তাঁর চক্ষুর বর্ণ প্রতি মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তিত হচ্ছিল। মুহূর্ত্তের জন্য আমরা দৈনন্দিন জগতের ঊর্দ্ধ লোকে উন্নীত হলাম। তারপর আমার অবসন্নতা এল, কে যেন বলে দিল আমাদের আরো সুদৃঢ় ভিত্তির উপর অবস্থান করা প্রয়োজন। আমি আমার মুখ অবগুণ্ঠনে আবৃত করলাম। আমি মৃদুকণ্ঠে উচ্চারণ করলাম "আমার রাখীবন্ধ ভাই!" নিস্তব্ধতা অপসৃত হল।

তিনি আমাকে সম্ভাষণ করলেন, যেমন দরবার প্রবেশের প্রথম দিন করেছিলেন। আমি দেখলাম তিনি তাঁর ললাট নিবদ্ধ করপুট উত্তোলন করলেন—কম্পিত করপুট; তারপর হস্তদ্বয় বক্ষদেশ স্পর্শ করল, তখন তাঁর দৃষ্টিশুক্তিমুক্তাখচিত চন্দ্রাতপে নিবদ্ধ।——

কখনো কোন নারী এই শুভ্রতম ধামে প্রবেশের অধিকার লাভ করবে? কিন্তু জাহানারা বেগম সেই অধিকার পেয়েছিল। এখন মনে হল কক্ষটী যেন দিব্যত্ব লাভ করেছে।

সেই স্তম্ভবেষ্টিত কক্ষের মধ্যখানে শেখদের জন্য একখানি সতরঞ্চ বিস্তৃত ছিল। সেখানে বসে তারা অসংখ্য তীর্থযাত্রীদের উদ্দেশ্যে নিরন্তর কোরাণ আবৃত্তি করতেন। আজ আমরা মাত্র দুজন তীর্থযাত্রী। আমি 'রাও'কে সতরঞ্চের উপর উপবেশন করতে অনুরোধ করলাম—আমি একটু দূরে উপবেশন করলাম। আমি নিঃসন্দেহ ছিলাম যে তার গভীর বক্তব্য বিষয় প্রকাশের জন্য সমাধির নির্জ্জনতার প্রয়োজন।

'রাও' আমাকে স্পর্শ করে বল্লেন—"আমাদের এই সাক্ষাতের জন্য আমি অশ্বারোহণে ছুটে এসেছি" এইবার আমি বুঝতে পারলাম—অশ্বখুর ধ্বনির উৎস। আজকেই আমার পিতা স্থির করেছেন যে তিনি আর তাঁর বিদ্রোহী পুত্রের বিরুদ্ধে অভিযান করবেন। কিন্তু শায়েস্তাখান

(৬) অনেক মুসলমান বিশ্বাস করে যে মহম্মদ জেরুশালেম মসজিদ থেকে সশরীরে স্বর্গে গিয়েছিলেন এবং আল্লাহর সঙ্গে কথা বলেছিলেন। এবং মহম্মদ স্বর্গ ও নরক দেখেছিলেন এবং আল্লাহর বিরাট সৃষ্টির রূপ দেখেছিলেন। এই ঘটনা "মেরাজ" বলে ইসলামের ইতিহাসে বিখ্যাত।

(৭) মহম্মদের গাত্রবস্ত্র মুসলমানগণ অতি পবিত্র বলে বিবেচনা করে এবং সেই বস্ত্র দিয়ে পোষাক করে।

এবং খলিলুল্লাখানের (৮) প্ররোচনায় রাজকুমার দারা যে প্রভাবে অনুপ্রাণিত হয় নি। এই দুই বিশ্বাসঘাতক দারাকে বুঝিয়েছিল যে, "সম্রাট যদি স্বয়ং সৈন্য পরিচালনা করেন, তবে জয়ের গৌরব সম্রাটেরই প্রাপ্য—সম্রাট পুত্রের হবে না, ভাগ্যদেবতা রাজকুমারকে সৈন্যাধ্যক্ষের কৃতিত্ব প্রদর্শনের যে সুযোগ দিয়েছেন তা ব্যর্থ হয়ে যাবে।"

কি দুর্ভাগ্য, সহস্র দুর্ভাগ্য ! দারা, তুমি অতি সহজে প্রতারিত হয়েছ—রাও উত্তর দিলেন—"সমস্ত ভারতবর্ষে একমাত্র আমি যুবরাজ দারার চক্ষু উন্মেলন করে দিতে পারি। সে কাজ আমাকে কালই কর্ত্তে হবে।"

মাথার উপরে মুক্ত আকাশ দেখবার জন্য আমার তীব্র আকাঙ্ক্ষা হল। মুক্ত বাতাসে বসবার জন্য আকুল আগ্রহ হল। এখন প্রত্যেক মুহূর্ত্ত আমার কাছে অতিশয় মূল্যবান। ফতেপুরের পরিত্যক্ত উদ্যানে ক্ষুদ্র প্রাসাদের সন্ধান করে নেব, সেখানে আমাদের গুপ্ত মন্ত্রণা চলবে।

আমি প্রথমে শকটারোহণে অগ্রসর হলাম, মুহূর্ত্তেই একটী প্রাসাদের সন্ধান পেলাম। পূর্ব্বে সেখানে উদ্যান ছিল—আজ সেখানে প্রান্তর। কিন্তু এখন পথপার্শ্বের পরিখা, স্তূপ-শীর্ষোপরি প্রাসাদ, সবই চলে গেছে। স্তূপের পদচুম্বন করে দুইটী আম্র বৃক্ষ পরস্পর মিলে রয়েছে। এই বৃক্ষযুগল রোপিত হয়েছিল একটা ধর্ম্ম উৎসবের অনুষ্ঠানে। ভারতবর্ষের উদ্যানে—কৃষির সাফল্য কামনা করে দুইটী সজীব বৃক্ষশিশুর কূপের পার্শ্বে বিবাহ দেওয়া হয়, এই যুগল বৃক্ষ ছায়ায় আমি আমার রাখীবন্ধ ভাইয়ের জন্য অপেক্ষা করছিলাম।

তিনি এসেছিলেন। প্রবেশ পথে দ্বার উন্মোচনের সঙ্গেই আমি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। তিনি মুহূর্ত্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে রইলেন, আমার মুখের উপর নিবদ্ধ দৃষ্টি, সেই দৃষ্টির উজ্জ্বলতায় আমার চতুষ্পার্শ্বের বায়ুমণ্ডল আলোক উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। আমি হাসি দিয়ে তাঁকে অভিনন্দিত করলাম—আমার স্মৃতিতে ভেসে উঠল, প্রাচীন হিন্দু কাব্যের একটী নায়কের কাহিনী—ঐ আসছে মদনদেবের অগ্রদূত ; চন্দ্রালোকে আনন্দের আধারে নূতন রাজ্যসৃষ্টি করবে——হৃদয়ও আত্মার মিলনে সৃষ্টি হবে অন্তহীন একটী প্রেমের দিবস।" (৯) বসন্ত সমাগমে বৃক্ষে যেমন নবপল্লব সঞ্চারিত হয়ে উঠে, তেমনি আমার হৃদয়ে সঞ্চারিত হল প্রেম। (ক্রমশঃ)

(৮) শায়েস্তাখান ও খলিলুল্লাখানের স্ত্রীদের সুনাম ছিল না ; শাহজাহানের সম্মান ও অনেক কুৎসাও জনসমাজে প্রচারিত ছিল, সুতরাং দুই জনে আমীর শাহজাহানের বিরুদ্ধে অনেক কাজ করেছিলেন।

(৯) এইখানে বাণ রচিত হর্ষচরিত নাটকের উপমা উদ্ধৃত করেছেন জাহানারা।

মহারাজ প্রতাপাদিত্য

অধ্যাপক শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার এম-এ, পিএচ্-ডি

গত পৌষ মাসের ভারতবর্ষে মহারাজ প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম, ফাল্গুন সংখ্যায় শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সে সম্বন্ধে সুদীর্ঘ আলোচনা করিয়াছেন। আলোচনার সুবিধার জন্য আমার প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়টি চারিটি মন্তব্যের আকারে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলাম। সুধাংশুবাবু প্রসঙ্গক্রমে এইগুলি সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন প্রথমে তাহারই উত্তর দিব।

(১) সুধাংশুবাবু লিখিয়াছেন : "প্রতাপাদিত্য যে বাংলা বিহার উড়িষ্যা আসামের একচ্ছত্র অধিপতি ছিলেন একথা প্রতাপাদিত্যের অতি-ভক্তেরাও হয়ত বলিবেন না।" সুধাংশুবাবু যদি মনোযোগ সহকারে আমার প্রবন্ধ পড়িতেন তবে দেখিতেন যে এরূপ ভক্তেরও অভাব নাই। আনন্দবাজার সম্পাদকীয় স্তম্ভে যে এইরূপ মত উদ্ধৃত হইয়াছিল তাহা আমার প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছি। সুধাংশুবাবুর বিশ্বাস না হইলে উক্ত পত্রিকার পুরাতন ফাইল (২৩শে মে ১৯৪৮) দেখিতে পারেন। সুধাংশুবাবু লিখিয়াছেন : "তখনকার দিনে ১৫ লক্ষ টাকা আয়ের রাজ্যকে ক্ষুদ্র খণ্ড বলা যায় না, আইন-ই-আকবরীর মতে সমগ্র সুবে বাংলারই যখন আয় মোট দেড় কোটি টাকার কাছাকাছি।" আমি বলিয়াছি "প্রতাপাদিত্যের রাজ্য অবিভক্ত বঙ্গদেশের যশোর খুলনা ও চব্বিশ পরগণার কতক অংশে সীমাবদ্ধ ছিল।" ইহার সহিত তাঁহার উক্তির অসামঞ্জস্য কোথায় ?

(৩-৪) সুধাংশুবাবু প্রশ্ন করিয়াছেন : "অধ্যাপক মহাশয় কি বলিতে চান যে প্রতাপের সঙ্গে মানসিংহের বা মুঘলদের সংঘর্ষই হয় নাই।" জনশ্রুতি অনুসারে প্রতাপাদিত্য মুঘলদের ২৫ জন সেনাপতিকে পরাস্ত করেন। ইহার উল্লেখ করিয়া আমি বলিয়াছি যে [illegible]

যুদ্ধের কথা, প্রতাপাদিত্য একবারও কোন মুঘল সেনাপতিকে পরাস্ত করিয়াছিলেন ইহার কোন প্রমাণ নাই।" সুধাংশুবাবুও ইহার কোন প্রমাণ উপস্থিত করেন নাই। তাঁহার মতে বহারিস্তানে বর্ণিত ঘটনার পূর্ব্বে হয়ত প্রতাপাদিত্য যুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং "বিজিত হইয়া নামে মুঘল বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।" ইহা অসম্ভব নহে, কিন্তু ইহার কোন প্রমাণ নাই। জয়পুরে যশোরেশ্বরী প্রতিষ্ঠার প্রবাদ মানসিংহ কর্তৃক প্রতাপাদিত্যের পরাজয়ের সমর্থন করে—কিন্তু ইহা অনুমান মাত্র—প্রতিষ্ঠিত সত্য নহে। সত্য হইলেও ইহাতে প্রতাপাদিত্যের পরাজয় কলঙ্কই সূচিত করে—তাহার মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত হয় না—এবং ২৫ জন মুঘল সেনাপতিকে পরাস্ত করার সমর্থন করে না।

সুধাংশুবাবু লিখিয়াছেন, প্রতাপকে "খাঁচায় বন্দী ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া লইয়া যাওয়া অসম্ভব নহে এবং তিনি যে পথে কাশীতে মারা যাইতে পারেন তাহাও মিথ্যা না হইতে পারে"। পৃথিবীতে অনেক জিনিসই সম্ভব—কিন্তু তাহার মধ্যে যেটি প্রকৃত হইয়াছিল এরূপ মনে করিবার যুক্তিযুক্ত কারণ আছে, কেবল তাহাই ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। কিন্তু সুধাংশুবাবু ভুলিয়া গিয়াছেন যে উক্ত জনশ্রুতি অনুসারে মানসিংহই তাঁহাকে খাঁচায় ভরিয়া লইয়া যান এবং পথে কাশীতে তাঁহার মৃত্যু হয়। এই প্রবাদটি যে সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং ইহাকে যে 'অসম্ভব নহে'র কোঠায়ও ফেলা যায় না, বহারিস্তান গ্রন্থ তাহা সপ্রমাণ করে। কারণ প্রতাপাদিত্যের পরাজয় ও মৃত্যু যখন ঘটে তাহার বহু পূর্ব্বেই মানসিংহ বঙ্গদেশ ত্যাগ করিয়াছিলেন।

আমার দ্বিতীয় মন্তব্য ও প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল এই যে "প্রতাপ স্বাধীন রাজা ছিলেন না, প্রকাশ্যে মুঘলের বশ্যতা স্বীকার করিতেন।" সুধাংশুবাবু ইহার প্রতিবাদ করেন নাই, বরং ইহা মানিয়াই লইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি প্রশ্ন করিয়াছেন—"ইহাতে প্রতাপের হীনতা প্রকাশ পায় কিরূপে? এখানে হীনতার কোন কথা নাই। প্রবল মুঘল শক্তির বিরুদ্ধে বাংলার অনেক জমিদারই ঈশা খাঁ বা কেদার রায়ের ন্যায় স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যুদ্ধ করিতে পারেন নাই। প্রতাপের ন্যায় আরও বহু জমিদার মুঘলের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছেন—কখনও বা পরাজয় না দেখিয়া যুদ্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছেন এবং হারিয়া আত্ম-সমর্পণ করিয়াছেন। ইহাদিগকে হীন বলার কোন কারণ নাই এবং আমিও তাহা বলি নাই। ব্রিটিশ রাজত্বের শেষ ভাগে বাংলায় ছয় কোটি লোকের মধ্যে হয়ত চারি পাঁচ হাজার লোক স্বাধীনতার জন্য লড়িয়াছে। তাহার মধ্যেও সুভাষ বসু বা চিত্তরঞ্জন দাশের মত নেতা এবং বাঘা যতীন, সূর্য্য সেন প্রভৃতি মাত্র চারি পাঁচ শত বিপ্লববাদী বীরের ন্যায় আত্মাহুতি দিয়াছেন। বাকী সাড়ে তিন হাজার এবং কি অবশিষ্ট পাঁচ কোটি নিরানব্বই লক্ষের উপর লোক যে হীন ছিল একথা কেহই বলে নাই। কিন্তু আজ দেশে তাহাদের জন্য বিশেষভাবে জয়ন্তীও হয় না। আজ সুভাষ বোসের জয়ন্তী হয় এবং বাঘা যতীন, সূর্য্যসেন, ক্ষুদিরাম প্রভৃতিরও হওয়া উচিত। তাহা না হইয়া যদি ইংরেজ আমলের ধনী, বিচক্ষণ ও প্রতিভাপন্ন কোন ব্যক্তির অন্ধ স্তাবকদের উৎসাহে তাঁহার জন্য বিরাট জয়ন্তী সভা হয় তাহা হইলে কি বাংলার মুখে কলঙ্কের লেপন হয় না?

সুধাংশুবাবু প্রশ্ন করিয়াছেন: "কিন্তু শুধু বহারিস্তানের কাহিনী অবলম্বন করিয়া বলা যায় কি যে প্রতাপাদিত্য মুঘলের বিরুদ্ধে বীরের ন্যায় যুদ্ধ করেন নাই এবং যাঁহারা তাঁহাকে সম্মান দিতেছেন তাঁহারা বাংলার মুখে কলঙ্ক লেপন করিতেছেন।" ঐতিহাসিক আলোচনার একটি মূল নীতি এই যে কোন বিষয় প্রতিপাদন করিতে হইলে তাহার সপক্ষে প্রমাণ উপস্থিত করিতে হইবে অর্থাৎ যাঁহারা বলিতে চান যে প্রতাপাদিত্য বীরের ন্যায় যুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং স্বাধীনতা পতাকা উড়াইয়াছিলেন তাঁহাকেই ইহার প্রমাণ উপস্থিত করিতে হইবে। বহারিস্তানে যাহা আছে তাহাতে প্রমাণিত হয় যে প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে জনশ্রুতি অধিকাংশই মিথ্যা। সুতরাং বহারিস্তান বা আইন-ই-আকবরী প্রভৃতি সমসাময়িক প্রামাণিক কোন গ্রন্থে যে বিষয়ের উল্লেখ নাই—উপযুক্ত প্রমাণ ব্যতীত তাহা ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। প্রতাপাদিত্য খুব বারত্বের সহিত বহুকাল প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াছিলেন—অথবা (একটি উদ্ভট শ্লোক অনুসারে) মানসিংহকে ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া তাহার বুকের উপর পা দিয়া খড়্গ লইয়া মাথা কাটিতে

উদ্ধত হইয়াছিলেন (পরে দেবীর কৃপায় মানসিংহ কোন মতে রক্ষা পান)—এ সমস্তই সত্য হইতে পারে—কিন্তু যতক্ষণ সন্তোষজনক প্রমাণ পাওয়া না যায়, ততক্ষণ সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না এবং তদনুসারে মালা চন্দন লইয়া প্রতাপাদিত্যের পূজা করিলে—কেদার রায় ও ঈশা খাঁর জননী বঙ্গভূমির মুখ আনন্দে ও গৌরবে উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে বলিয়া আমি বিশ্বাস করি না।

কিসে মাতৃভূমির কলঙ্ক হয় এবং কিসে হয় না এ বিষয়ে মতভেদ থাকিতে পারে—সুতরাং তাহা লইয়া তর্ক করা বৃথা। মূল প্রতিপাদ্য বিষয়—প্রতাপাদিত্যের সম্বন্ধে প্রচলিত কাহিনী কতদূর ঐতিহাসিক তাহা নির্ণয় করা। এ সম্বন্ধে সুধাংশুবাবু একাধিকবার স্যার যদুনাথের মতের উল্লেখ করিয়াছেন। বাংলার এই বরেণ্য ও সর্ব্বজনমান্য ঐতিহাসিকের সম্পাদনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সম্প্রতি ইংরেজীতে লিখিত যে বাংলার ইতিহাস দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হইয়াছে, প্রতাপাদিত্যের যুগ সম্বন্ধে তাহাই যে সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক ও প্রামাণিক গ্রন্থ, আশা করি সকলেই তাহা স্বীকার করিবেন। আমি যখন আমার প্রবন্ধ লিখি তখনও এই গ্রন্থ বাহির হয় নাই—হইলে আমার উক্ত প্রবন্ধ লিখিবার প্রয়োজন হইত না। কিন্তু সুধাংশুবাবুর আলোচনা লিখিবার পূর্ব্বেই ইহা প্রকাশিত হইয়াছে—অথচ সুধাংশুবাবু ইহার কোন উল্লেখ করেন নাই। সুতরাং মনে হয় এই গ্রন্থ এখনও সর্ব্বসাধারণে তেমন সুপরিচিত হয় নাই। সাধারণের অবগতির জন্য এই গ্রন্থে প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে—তাহার কিয়দংশের মূল ও মর্ম্মানুবাদ দিতেছি।

"A false provincial patriotism has led modern Bengali writers to glorify the Bara Bhuiyas of Bengal as the champions of national independence against foreign invaders. They were nothing of the sort······

The height of absurdity is reached when our dramatists call Pratapaditya of Jessor as the counter part of Maharana Pratap Singh of Mewar. It is therefore necessary to light of history on him······Pratapaditya never once defeated any Mughal army in pitched battle, his son and general Udayaditya took to flight at the first sign of a losing naval battle (at salka), and Pratapaditya himself tamely submitted to the Mughal general without holding out till he was assured of safety to life and honours." (পৃঃ ২২৫—২৬)।

"বাঙ্গালী লেখকগণ জন্মভূমির গৌরব বাড়াইবার অপচেষ্টায় বার ভূইয়াদিগকে বিদেশীয় আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার যুদ্ধের নায়ক রূপে উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন। কিন্তু এই চিত্র সর্ব্বৈব মিথ্যা।···আমাদের নাট্যকারগণ যশোরের প্রতাপাদিত্যকে মেবারের প্রতাপ সিংহের সহিত একই পর্য্যায়ে ফেলিয়া এই অদ্ভুত ও অসঙ্গত ধারণার পরাকাষ্ঠায় পৌছিয়াছেন। সুতরাং প্রকৃত ইতিহাসের আলোকপাত করিয়া এই "বঙ্গবীরকে" পূজার বেদী হইতে অপসারিত করা প্রয়োজন।

"প্রতাপাদিত্য একবারও সম্মুখ যুদ্ধে মুঘল সৈন্যকে পরাস্ত করেন নাই। তাঁহার পুত্র ও সেনাপতি উদয়াদিত্য (সালকার) নৌযুদ্ধে হারিবার সম্ভাবনা দেখিয়াই পলায়ন করেন। প্রতাপাদিত্যও সহজেই আত্মসমর্পণ করেন এবং শত্রুপক্ষের নিকট হইতে নিজের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও সম্মান রক্ষার প্রতিশ্রুতি পাওয়া পর্য্যন্তও যুদ্ধ চালান নাই।"

এই প্রসঙ্গে স্যার যদুনাথ বলিয়াছেন যে কেদার রায় ঈশা খাঁর সহিত একযোগে বীরের ন্যায় যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করেন ("fought well and died in action")।

আমি এই কেদার রায় ও ঈশা খাঁর উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলাম :—"ইঁহারা বীরত্ব ও স্বাধীনতা-প্রীতির জন্য পূজা পাইবার যোগ্য। কিন্তু ইঁহাদের কথা বিস্মৃত হইয়া উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে চাপাইয়া যাঁহারা প্রতাপাদিত্যের জয়ন্তী উৎসব করিতেছেন তাঁহারা বাংলার মুখে কলঙ্কের কালিমা লেপন করিতেছেন।" আমার এই মন্তব্য যুক্তিযুক্ত কিনা তাহার বিচারের ভার পাঠকবর্গের উপর দিয়া আমি

কোন সার্থকতা আছে বলিয়া মনে করি না। সুধাংশুবাবু অন্য যে সমুদয় বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন বর্তমান আলোচনার পক্ষে তাহা অবান্তর মাত্র—এবং সেই সমুদয় বিষয়ে তর্কবিতর্ক করিলে মূল প্রসঙ্গের সত্যাসত্য নির্ণয়ে রহিলাম। উপসংহারে শ্রীযুক্ত সুধাংশুবাবু আমার সম্বন্ধে যেরূপ সশ্রদ্ধভাবে উল্লেখ করিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ জানাইতেছি। কারণ আজকাল মৌখিক বা লিখিত বাদানুবাদে এইরূপ সৌজন্য অতিশয় দুর্লভ।

বাংলার গৌরব

অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র এম-এ

বিদেশীর শক্তি ভারতবর্ষকে একেবারে গ্রাস করিয়াছিল। পরাধীনতার নাগপাশে ভারতলক্ষ্মী যখন মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়াছিলেন, তখন জনকতক লোক ভগবৎ প্রেরিত হইয়া আমাদের মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহারা একদিকে যেমন গণচৈতন্যকে জাগ্রত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন, তেমনি আমাদের ঐতিহ্যের মৃতসঞ্জীবনী সুধা জাতির কর্ণকুহরে ঢালিয়া দিয়া প্রাণশক্তির সঞ্চারে অগ্রসর হইয়াছিলেন। বিজয়ী শত্রুকে উৎসাদন করিতে হইলে যে পশুবলের প্রয়োজন, যে সশস্ত্র গণ-আন্দোলনের উদ্বোধন আবশ্যক, তাহার সম্ভাবনা ছিল না। কাজেই মুষ্টিমেয় যে সকল বঙ্গবীর ভবিষ্যতের অন্ধকার যবনিকা ভেদ করিয়া ভারতবাসীর আসন্ন মৃত্যুর করালরূপ দেখিতে পাইয়াছিলেন, তাঁহারা মৃত্যুভয়, বন্ধনভয়, সর্বপ্রকার লাঞ্ছনা নির্যাতন উপেক্ষা করিয়া পরাধীনতার নিগড় ভগ্ন করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। সেই সকল ভগবৎ প্রেরিত মনীষীদের মধ্যে শিশিরকুমার ঘোষ অন্যতম। 'ভগবৎ প্রেরিত' বলিতেছি এই জন্য যে, যে শক্তির বিদ্যুৎ বিকাশ তাঁহারা মানবলীলায় দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহা অলৌকিক, অভূতপূর্ব এবং অদ্ভুত দূরদৃষ্টিপ্রসূত।

শিশিরকুমারের জীবনে আমরা যে তেজ, যে স্বদেশ প্রেম, যে নির্ভীক বীরত্ব দেখিতে পাই, তাহার সহিত তাঁহার শারীরিক সামর্থ্যের কোনও সামঞ্জস্য ছিল না। আমি তাঁহাকে দেখিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম। আমার পিতৃদেবের সহিত শিশিরবাবু ও মতিবাবু এক সঙ্গে কৃষ্ণনগর কলেজে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। সেই সূত্রে উভয়েই আমাকে স্নেহ করিতেন। আমি নিঃসন্দেহে এ কথা বলিতে পারি যে শারীরিক সামর্থ্যে ভারতের এই অতুলনীয় ভ্রাতৃযুগল সাধারণ হইলেও আধ্যাত্মিক শক্তিতে ছিলেন অত্যন্ত অ-সাধারণ। তেজের দিব্যি লাভাস্রব ছিল তাঁহাদের বহিরাবরণের অন্তরালে। বৈষ্ণবোচিত বিনয় নম্র ভাবের সঙ্গে সম্মিলিত হইয়াছিল এক অপার্থিব আধ্যাত্মিক বহ্নি।

শিশিরবাবুর অদম্য উৎসাহ ও ব্যক্তিসত্তা সংক্রামিত হইয়া ভারতে সেদিনে এক তুমুল বৈপ্লবিক শক্তির প্রেরণা যোগাইয়াছিল এবং তাৎকালীন সমস্ত রাষ্ট্র-নেতাকে দেশসেবা মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছিল। বাংলার এ গৌরব অবিস্মরণীয়। শুধু এই দিক্ দিয়া দেখিলেও শিশির-কুমারের অবদান স্বর্ণাক্ষরে উৎকীর্ণ হইবার যোগ্য। 'অমৃতবাজার পত্রিকা' যেমন ব্রিটিশ শাসনের অব্যাহত স্মারকলিপি, তেমনি শিশির-কুমারের জীবন রঙ্গের মর্মর নির্মিত মঞ্চ।

অপর দিকে তিনি বাঙালীর স্পন্দহীন জড় জীবনে আনিয়া দিয়াছিলেন এক সোনার কাঠির স্পর্শ। দেশ যখন বিদেশী সংস্কৃতির সর্বগ্রাসী মোহে আত্ম-বিস্মৃত হইতে বসিয়াছিল, তখন শিশিরকুমারের অমিয় নিমাই চরিত ঘরের ডাকে বাঙালীর মন সবলে ফিরাইয়া আনিয়াছিল। অপূর্ব গ্রন্থ, অপূর্ব ছন্দ, অপূর্ব প্রেম। প্রেমের ঠাকুর নিজে প্রেরণা না দিলে এই প্রেমের পরশ-পাথর লাভ করা যায় না ইহাই আমার অনুমান। কুটীরে পল্লী ভবনেও ইহার অমিয়ধারা ছুটিল। বাঙালী যেন হঠাৎ প্রাণের স্পন্দন অনুভব করিল। বাল্য জীবনে এই অদ্ভুত গ্রন্থ পড়িয়া কত আনন্দ পাইয়াছি। কত কাঁদিয়াছি, কত ভাবিয়াছি। এমন আর হয় না। অমিয়-নিমাই-চরিত আর হয় না। তাই ভাবিতেছিলাম ইঁহারা ভগবানের শক্তিতে শক্তিমান্ হইয়া আমাদের উদ্ধারের জন্য বাঙালীর পরিত্রাণের জন্য, ভারতের মুক্তির জন্য আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে আমরা মহাত্মা বলি, মহাপুরুষ বলি বা আর কিছুই বলি, বুঝাইতে পারা যাইবে না যে সেই সঙ্কটময় সময়ে কিরূপে তাঁহাদের আবির্ভাব সম্ভবপর হইল? শিশিরকুমার বৈষ্ণব ধর্মে নূতন জোয়ার বহাইয়াছেন, বাঙালীর প্রাণ শীতল করিয়াছেন। বঙ্গভাষাকে অনুপম ছন্দোময় সরল লালিত্যে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার "কালাচাঁদ গীতা" এক অভিনব অমর সৃষ্টি। তাঁহার বৈষ্ণব কবিতাগুলি জ্ঞানদাস গোবিন্দ দাসের উত্তরাধিকারী। ভাব প্রবণতায়, মাধুর্যে ও আন্তরিকতায় আধুনিক পদকর্তা বলরাম দাস বৈষ্ণব কবিতার পতিত-পাবনী গঙ্গা পুনরায় বাংলার বুকে বহাইয়া ছিলেন ইহা যখন মনে করি, তখন আনন্দে সম্ভ্রমে ও বিস্ময়ে চিত্ত পুলকিত হইয়া উঠে।

[illegible]

শচীন সেনগুপ্ত

(নাটক)

তাহার কথা শেষ হইবার আগেই একজন পুলিশ ইন্‌সপেক্টার কয়েকটি পাহারাওয়ালা লইয়া প্রবেশ করিল।

প্রভাবতী। আসুক পুলিশ! আমরা যামু না!

ইন্‌সপেক্টার। যাবেন না বলে জবরদস্তি করলে চলবে কেন? চলুন সবাই, চলুন।

দীপক। কোথায় যেতে বলচেন?

ইন্‌সপেক্টার। রেফিউজি ক্যাম্পে!

মহিম। আপনি কে কথা কইচেন?

ইন্‌সপেক্টার। আপনাদেরই থানা অফিসার আমি মহিমবাবু। আপনার বাড়ীতে সারাদিন এই হাঙ্গামা চলচে, আর আগে একটা খবর পাঠিয়ে দেননি! কখন জঞ্জাল সাফ করে দিতাম।

সাধনা। আপনাদের এ খবর কে দিলে?

ইন্‌সপেক্টর। মিঃ লাহিড়ী।

মহিম। কে, অনিমেষ?

সাধনা। দুপুরে সে এসেছিল। কিন্তু আমি ত তাকে বলিনি থানায় খবর দিতে।

ইন্‌সপেক্টার। তিনি ঠিক কাজই করেচেন। দে ক্যারি ইন্‌ফেকশন্।

মহিম। হাঁ, হাঁ, আপনি ঠিক কথাই বলেচেন—দে ক্যারি ইন্‌ফেকশন্, ঠিক! আমি তার প্রমাণ পেয়েচি।

ইন্‌সপেক্টার। পেয়েচেন ত!

মহিম। হ্যাঁ। মাথাটা ঘুরে পড়তে চাইচে। হৃৎপিণ্ডটা পাঁজর ভেঙে বেরিয়ে আসবার জন্যে লাফালাফি করচে। ইচ্ছে করচে ওদেরই মত ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠি।

সাধনা। বাবা!

মহিম। মানুষের ব্যথা এখনো মানুষকে সংক্রামিত করে। রাজ-নৈতিক প্রয়োজন বোধ ত প্রিভেণ্টিভের কাজ করে না, মা।

ইন্‌সপেক্টার। আপনারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনচেন কি? চলুন আমার সঙ্গে।

দীপক। যদি না যাই?

ইন্‌সপেক্টার। ওই সেপাইরা টেনে নিয়ে যাবে।

দীপক। তাই ঠিক। কেতকী এই দিকে আয়। আপনিও আসুন, খুড়িমা।

কেতকী আর প্রভাবতী দীপকের পাশে গিয়া দাঁড়াইল। কার্তিক রাইমণির দিকে আগাইয়া যাইতে যাইতে কহিল:

কার্তিক। তুমিও উইঠ্যা আইস, গো! আইস, আমরাও গিয়া দাঁড়াই দীপু ভাইয়ের পাশে।

রাইমণিকে টানিয়া লইয়া গিয়া কার্তিকও দীপকের পাশে দাঁড়াইল

প্রমথ। অবনী, এস।

প্রমথ ও অবনীও তাহাদের পাশে স্থান লইল

দীপক। শুনুন, সকলের হয়ে আমি বলচি আমরা যাব না। আপনার সেপাইদের বলুন আমাদের টেনে নিয়ে যেতে।

সকলেই স্তব্ধ রহিল। স্তব্ধতা ভাঙ্গিলেন ইন্‌সপেক্টার

ইন্‌সপেক্টার। মনের এই জোর যদি পাকিস্তানে দেখাতেন, তাহলে ত সর্বস্ব ফেলে চলে আসতে হোত না।

দীপক। ভাবলেন, খুবই রসিকতা করলেন! কিন্তু জানেন না যে, এই মনের জোর একমাত্র ভারত ইউনিয়নে সার্থক হবার অবসর পাবে জেনেই ভারত ইউনিয়নের প্রতি আমাদের যেমন আকর্ষণ তেমন বিশ্বাস। পাকিস্তান এর মূল্য দিতে পারবে না বলেই ত আমরা তাকে স্বরাষ্ট্র বলে মেনে নিতে পারলাম না।

ইন্‌সপেক্টার। যে রাষ্ট্রকে স্বরাষ্ট্র বলে মানুন বা নাই মানুন, এ রাষ্ট্রের বিধানকে ত মেনে নিতেই হবে।

দীপক। আপনি আপনার কাজ করুন। আমি আবার বলচি, এখান থেকে এক পা'ও নড়ব না আমরা।

ইন্‌সপেক্টার। হোতো আগেকার দিন!

মহিম। আগেকার দিন হলে আপনারা কি করতেন তা আমি বিলক্ষণ জানি। ছেলেটির কথা শুনে বোঝা যাচ্ছে ওরও তা জানা আছে।

ইন্‌সপেক্টার। যাই বলুন মহিমবাবু, দেশের লোকের ইমোশন যদি অ্যাডমিনিস্ট্রেশনকে বিকল করে দেবার সুযোগ পায়, তাহলে রাষ্ট্রের বা দেশের লোকের কোন কল্যাণই হতে পারে না।

মহিম। কিন্তু এ কথাও মিথ্যে নয় যে, রাষ্ট্র যখন মানুষের ইমোশনকে পাথর চাপা দিয়ে রাখতে চায়, মানুষের ইমোশন তখনই দুর্বার শক্তি নিয়ে রাষ্ট্রকে আঘাত করে। সকল রাষ্ট্রবিপ্লবের গোড়ার কথাই তাই।

ইন্‌সপেক্টার। তাই ত সকল রাষ্ট্রই বিপ্লবকে ব্যর্থ করবার জন্য অ্যাডমিনিস্ট্রেশনকে শক্ত করে তোলে।

মানুষের ইমোশনকে শাসন করছে।

মহিম। ইমোশনকে শাসন করা নয়, তাকে রূপান্তরিত করে রাষ্ট্রীয় হিতে নিয়োগ করাই হচ্ছে রাষ্ট্রনায়কদের কাজ। ইংলণ্ড এই রূপান্তর সম্বন্ধে অবহিত। কিন্তু ইংলণ্ডের ফেলে-যাওয়া শাসন দণ্ড হাতে তুলে নিয়ে আমরা যদি পীড়নকেই য়্যাডমিনিষ্ট্রেশনের প্রধান কাজ বলে ভুল করি, তাহলে যত দাপটেই না আজ শাসনদণ্ড পরিচালনা করি, আমাদের বজ্রমুঠো থেকে একদিন তা খসে পড়বেই পড়বে।

ইন্‌স্‌পেক্টার। আপনাদের এসব কথা আমার, অর্থাৎ একজন পুলিশ অফিসারের, ভাববার কথা নয়।

সাধনা। কিন্তু একজন য়্যাডমিনিষ্ট্রেটারের ভাববার কথা।

দীপক। আর আপনি আমাদের য়্যাডমিনিষ্ট্রেশন-তত্ত্বই বোঝাতে চেয়েছিলেন।

ইন্‌স্‌পেক্টার। তাতে যদিওবা বিফল হয়ে থাকি, আপনাদের বেঁধে নিয়ে যাবার কাজে সফল নিশ্চিতই হব।

মহিম। শুনুন ইন্‌স্‌পেক্টার বাবু।

ইন্‌স্‌পেক্টার। বলুন।

মহিম। আপনি আপনার সেপাইদের নিয়ে থানায় ফিরে যান।

ইন্‌স্‌পেক্টার। এই রেফিউজিরা ?

মহিম। এঁরা এখন, হয়ত কিছুদিনের জন্যই, এইখানেই থাকবেন।

ইন্‌স্‌পেক্টার। আপনি একজন কংগ্রেস-নায়ক হয়ে এই কথা বলছেন !

মহিম। হ্যাঁ, তাই বলচি।

ইন্‌স্‌পেক্টার। কিন্তু আমি যে ওপর থেকে অর্ডার পেয়ে এসেচি।

মহিম। কার অর্ডার ?

ইন্‌স্‌পেক্টার। হোম ডিপার্টমেন্টের।

মহিম। সরকারের হোম ডিপার্টমেন্ট আমার হোম-এফেয়ার্স সম্বন্ধে তেমন ওয়াকেবহাল নন বলেই ওই অর্ডার দিয়েচেন। আপনি রিপোর্ট করুন, আমার বাড়ীতে কোন রেফিউজী নেই।

ইন্‌স্‌পেক্টার। সে কি ! এরা ?

মহিম। অতিথি। আমার আত্মীয়।

ইন্‌স্‌পেক্টার। আপনার আত্মীয় !

মহিম। পরম আত্মীয়। এককালে এঁদেরকে আমাদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছিল বলে আমরা প্রবল আন্দোলন করেছিলাম। সেই আন্দোলন থেকেই শুরু হয় স্বাধীনতার সাধনা—যার সার্থক পরিণতি এই ভারত-ইউনিয়ান।

ইন্‌স্‌পেক্টার। আপনি কিন্তু একটা ব্যাড এক্‌জাম্‌পল্ সেট করচেন।

মহিম। ইন্ দিজ ডেএজ অব কনফিউসান ওয়ান ক্যান হার্ডলি সে হোয়াট ইজ গুড, য়্যাণ্ড হোয়াট ইজ নট। দিন কত এঁরা এখানেই থাকুন। নিচ্ছি বৈকি। আমার বাড়ীতে থাকবেন, তার দায়িত্ব আমার ছাড়া আর কার হবে ?

ইন্‌স্‌পেক্টার। বেশ। আমার কোন দায়িত্বই আর রইল না। চললাম।

কিছুদূর গিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল

কিন্তু স্যার, আগেকার দিন হলে——

মহিম হাসিতে হাসিতে কহিলেন

মহিম। জানি ইন্‌স্‌পেক্টার বাবু, আগেকার দিন হলে আমাকে আপনি বেঁধে নিয়ে যেতেন। কিন্তু একেবারে হতাশ হবেন না। যদি কোনদিন দুর্দ্দৈবক্রমে স্বাধীন ভারতের শাসকদের তেমন অধঃপতন হয়, তাহলে য়্যাডমিনিষ্ট্রেশনের তাল-বেতাল হয়ে স্বৈরাচারের অবাধ সুযোগ আবার আপনারা পাবেন। ভয় কি !

ইন্‌স্‌পেক্টার। আপনার মুখে এরকম কথা শুনব, আশা করিনি।

মহিম। কথাটা ব্যক্তিগতভাবে নেবেন না। আপনি শুধু উপলক্ষ্য, লক্ষ্য নন।

ইন্‌স্‌পেক্টার। বেশ ! যা দেখে শুনে গেলাম, তাই আমি রিপোর্ট করব।

ইঙ্গিতে পাহারাওয়ালাদিগকে অনুসরণ করিতে বলিয়া ইন্‌স্‌পেক্টার অগ্রসর হইল

মহিম। সাধনা !

সাধনা। আমি খুব খুসি হয়েচি, বাবা।

মহিম। তা'হলে খোস-মেজাজে ওঁদের থাকবার ব্যবস্থা করে দাও।

প্রমথ। কি বলে যে আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাব, তা ভেবে ঠিক করতে পারচি না।

মহিম। কোন প্রয়োজন নেই। আপনারা দিন কয়েক থাকলে আমাদের তেমন কোন অসুবিধে হবে বলে আমি মনে করি না। কি বল সাধনা ?

সাধনা। না বাবা। শুধু তাঁতশালাটা—

মহিম। না-ই বা হোলো তাঁতশালা। মানুষের কথা, তার পরনের কাপড়ের চেয়ে বড় কথা।

দীপক। আমাকে আপনারা ক্ষমা করবেন। দিন কয়েক জেল খেটেছিলাম। তারই অহেতুক অভিমান আমাকে মাঝে মাঝে উদ্ধত করে তোলে ; অপ্রয়োজনে অকারণে অভদ্র ব্যবহারও করে ফেলি।

মহিম। বুঝেচ যখন, তখন আর ক্ষোভ কেন ভাই ? এ অভিমানও যাবে, এ উদ্ধতাও আর থাকবে না। দিন কত যাক কে জেলে গিয়েছিল আর কে যায় নি, তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামাবে না। সকলেই উৎকর্ণ হয়ে শুনতে চাইবে কোন বিধানসভায় কোন্ মুখপাত্র কি বক্তৃতা ... রাজপেয়ী অথবা কোন মেনন কি বলে আসর জমিয়েচেন।

প্রভাবতী ঘোমটায় মুখ ঢাকিয়া গলার আঁচল জড়াইয়া কহিল—

মহিম। লজ্জা তোমার পাবার কথা নয় মা, লজ্জা পাবার কথা আমাদেরই। এখন যাও মা, নিজের ভেবে যা-হোক্ করে ওই ঘর গুলোতেই দিন কয়েকের জন্যে সংসার গুছিয়ে নাও। তারপর দেখা যাবে কত দূর কি করা যায়।

রাইমণি আবার খুক্ খুক্ কাসিতে লাগিল

সেই মেয়েটাই বুঝি কাসচে ?

কার্তিক। হ কত্তা, আমারই সে বউডা ; লোচ্চা ডাকাইতের গরাস থইতে যারে ছিনাইয়া আনছি। অর কাসি আর যায় না !

মহিম। সাধনা, কাল ডাক্তারবাবুকে ডেকে পাঠিয়ো। উকিলবাবু !

প্রমথ। বলুন।

মহিম। কাল একবার আসবেন। আপনাদের অবস্থাটা বিশদভাবে আলোচনা করা যাবে। তুমিও এসো ভাই, জেলাভিমানী !

কার্তিক। আমরাও আমু কত্তা।

মহিম। হ্যা, হ্যা, কাল ত সবাইকেই আসতে হবে, সূর্যোদয়ের আগে, ব্রাহ্ম মুহূর্তে সঙ্কল্প গ্রহণ করতে হবে।

প্রভাবতী। আয় লো কেতী, আয় লো রাইমণি !—নয়া সংসার সাজাইয়া লওয়া সহজ কম্ম মনে করস না।

তাহারা চলিয়া গেল

মহিম। সাধনা !

সাধনা। বাবা।

মহিম। ওরা বাস্তহারা নয়, বস্তুত্যাগী। তাই বলে ওদের দুঃখ কিছু কম হবার কথা নয়। পুব-বাঙলার পল্লীগুলো আমার অজানা নয়। জীবনরসে তা পরিপূর্ণ ছিল, অথচ রাষ্ট্রের সঙ্গে খুব যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল তাও নয়। যে পল্লী-কেন্দ্রিক জাতীয়-জীবন গান্ধীজি গড়তে চেয়েছিলেন, তার কাঠামো পুব-বাঙলা, ব্রিটিশের ধকল সত্ত্বেও, কতকটা বজায় করে রেখেছিল। এদের কথা শুনে মনে হচ্ছে এই ভারত বিভাগের ধাক্কায় তাও টুকরো টুকরো হয়ে গ্যাল। ট্রাজেডিটা কেবল পুব-বাঙলারই নয় মা, সমগ্র বাঙলার, সমগ্র ভারতের—বর্তমানের এবং ভবিষ্যতেরও।

সাধনা। কিন্তু পুব-বাঙলা থেকে হিন্দুরা যদি লাখে লাখে চলে আসে, তাহলে এই শিশু-রাষ্ট্র তাদের ভার বইতে পারবে কেন, বাবা ?

মহিম। শিশুরাষ্ট্রটি কি, মা ?

সাধনা। এই পশ্চিম বাঙলা।

মহিম। পশ্চিম বাঙলা ত একটা রাষ্ট্র নয়। রাষ্ট্র হচ্ছে ভারত-ইউনিয়ান। বিশাল তার আয়তন, অসীম তার শক্তি; অতুল সম্পদ, সুপ্রাচীন ঐতিহ্য। এই ভারত-ইউনিয়ান যদি তিরিশ কোটি মানুষকে

অনিমেষ প্রবেশ করিল। সুট-পরা সুদর্শন তরুণ।

অনিমেষ। এই যে সাধনা ! আমাকে এমন করে অপ্রস্তুত করলে কেন, বল ত !

সাধনা। আমি আবার কখন কি করলাম ?

অনিমেষ। হোম ডিপার্টমেন্ট থেকে অর্ডার বার করে এনে থানা থেকে ইন্স্পেক্টার পাঠিয়ে দিলাম, আর তোমরা তাদের ফেরত দিলে !

মহিম। ইন্স্পেক্টারকে সাধনা ফিরিয়ে দেয়নি অনিমেষ, ফিরিয়ে দিয়েচি আমি।

সাধনা। আর তোমাকে ত ও-সব কিছু করতে আমরা বলিনি !

অনিমেষ। আমি কি খুবই একটা অন্যায় কাজ করিচি ?

মহিম। না অনিমেষ, অন্যায় তুমিও করনি, আমরাও করিনি।

অনিমেষ। এই বাস্তত্যাগীরা আমাদের মন্ত্রিদের দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে উঠেচে।

মহিম। ওঠবারই কথা। আমাদেরও দুশ্চিন্তা কিছু কম নয়। দেখতেই ত পাচ্ছ, জোর করে শেডগুলো দখল করে নিলে তাও সইতে পারচিনা, আবার তাড়িয়েও দিতে পারচিনা। পুলিশকেও বলতে পারচিনা—নিয়ে যাও ওদের ধরে।

অনিমেষ। দেশের সকল লোকের অন্ন-বস্ত্র যোগাবার দায়িত্ব যাদের কাঁধে রয়েচে, এই আকস্মিক লোকবৃদ্ধির জন্যে তারা যদি সে দায়িত্ব পালন করতে না পারেন, তাহলে অবস্থাটা কি দাঁড়াবে বলুন ত।

মহিম। তখন একটা বিশৃঙ্খলাই দেখা দেবে।

সাধনা। তখন হয়ত এখনকার মন্ত্রিরা মন্ত্রীত্ব রাখতে পারবেন না, হয়ত মন্ত্রীত্ব রাখবার দুরাশায় অর্ডিনান্স-শাসন প্রয়োজন মনে করবেন, হয়ত তারই ফলে এখন যারা ক্ষুব্ধ রয়েচে, তারা হয়ে উঠবে বিক্ষুব্ধ।

অনিমেষ। কথাগুলো ত বলে খুব সহজভাবে, কিন্তু কি অস্বাভাবিক অবস্থা সৃষ্টি হবে তা বোঝ কি ?

সাধনা। সমস্যাটাই যে উদ্ভূত হয়েচে—অস্বাভাবিক ব্যবস্থা মেনে নেবার ফলে।

অনিমেষ। মানে ?

সাধনা। মানে ধর্মের ভিত্তিতে ভারত-বিভাগ অস্বাভাবিক জেনেও নায়কেরা তা মেনে নিয়ে এই সমস্যাটাকে এমন জটিল করে তুলেছেন ! কেন এমন করলেন ?

অনিমেষ। করলেন, উপায়ান্তর ছিল না বলে।

সাধনা। মানলাম। কিন্তু বাঙলা বিভাগ ?

অনিমেষ। বেশ বলচ ! বাঙলা ভাগ করে না নিলে গোটা বাঙলাই যে পাকিস্তান হোত।

সাধনা। তুমি যখন মনে কর পুব-বাঙলা পাকিস্তানে গেলেও পুব-

। [illegible] আজও [illegible] হিন্দুদের [illegible] হোত, এ-কথা [illegible] [illegible] জোরে ?

মহিম। কথাটা স্বীকার করেই নেওয়া ভালো অনিমেষ যে, ধর্মের ভিত্তিতে মুসলিমলীগ যেমন পাকিস্তান ছিনিয়ে নিয়েছে, আমরাও তেমন সেই ধর্মের ভিত্তিতেই পুব-পাঞ্জাব আর পশ্চিম-বাঙলা আদায় করিনি। সাম্প্রদায়িক মিলনটা আসলে ছিল আমাদের কল্পনা—কিন্তু বিরোধটা ঐতিহাসিক সত্য। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ তা বুঝেছিল। আর বুঝেছিল বলেই ডিভাইড এণ্ড রুল নীতিকে সফল করে তুলতে পেরেছিল।

অনিমেষ। কিন্তু ইংরেজ আমলেই কি মিলনের একটা প্রয়াস দেখা যায়নি ?

মহিম। আমাদের কল্পনায় মিলনকে আমরা কামনার বিষয় করে তুলেছিলাম, ইংরেজের সঙ্গে সংগ্রামে আমাদের শক্তি বৃদ্ধি পাবে ভেবে। কিন্তু আমাদের কল্পনা কামনা কোন কাজেই লাগলনা। মুসলমান কোনদিনই সমরক্ষেত্রে আমাদের পাশে এসে দাঁড়ালনা। অবশেষে একদিন প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ঘোষণা করল আমাদেরই বিরুদ্ধে, ইংরেজ আমলেই। মিলন সম্বন্ধে হতাশ হয়ে পড়েই ধর্মের ভিত্তিতে দুটো পৃথক রাষ্ট্র গঠনে আমরা সম্মতি দিয়েছিলাম। সেই হতাশার কারণ এখনো রয়েছে। অথচ আমরা পুব বাঙলার হিন্দুদেরকে এখনো আশায় আশায় থাকতে বলছি। এইটেই বিসদৃশ।

বাড়ীর পিছন দিকে একটা কলরব উঠিল।

মহিম। ওকি! ওরা অমন করে চেঁচাচ্ছে কেন ?

অনিমেষ। দিন-রাত এই-ই চলবে।

সাধনা। তুমি বাবাকে নিয়ে ঘরে যাও অনিমেষ, আমি দেখে আসি কি হয়েছে ওখানে।

অনিমেষ। কেন মিছে ছুটোছুটি করবে। আশ্রয় দিয়েচ যখন, তখন উপদ্রব সইতেই হবে।

নেপথ্য হইতে প্রভাবতী চেঁচাইতে চেঁচাইতে আসিল

প্রভাবতী। অ কেতী! কেতী লো! ওগো, আমাগো কেতীরে দ্যাখছ ?

সাধনা। কি হয়েছে ওখানে বলুন ত!

প্রভাবতী। আমাগো কেতীরে খুঁইজ্যা পাওন যাইতেছে না।

সাধনা। কেতকীর কথা বলচেন ?

প্রভাবতী। হ। হ। লোমড় মাইয়্যা কোথায় গ্যাল্ কাউরে কিছু না কইয়া! মনে লইল তোমার কাছে আইল বা।

সাধনা। এখানে ত আসেনি।

প্রভাবতী। কওচে, এখন কি করি আমি। আমার যে ডাক ছাইড়্যা [illegible] হইতে আছে।

। [illegible]

যে মানে না!

কাঁদিয়া উঠিল

অনিমেষ। চলুন, আমরা ঘরে যাই।

মহিম। কিন্তু মেয়েটিকে যদি খুঁজে না পাওয়া যায়, পুলিশে একটা খবর দিতে হবে ত।

অনিমেষ। একটু আগে যে পুলিশকে কর্তব্য পালন করতে দেন নি ?

মহিম। সেটা তাদের কর্তব্য ছিল না, কর্তব্য হচ্ছে এইটে।

সাধনা। তুমি ঘরেই যাও, বাবা। আমি দেখচি কি করা যায়।

অনিমেষ। কিন্তু তোমার সঙ্গে আমার কতগুলো কথা আছে, সাধনা।

সাধনা। আমি আসচি এখুনি।

মহিম। চোখে দেখতে পাইনা। তাই আমাকে দিয়ে ত কোন কাজই হবে না। অনিমেষ, আমাকে ঘরে নিয়ে চল। সাধনা দেখুক কি করতে পারে।

অনিমেষ মহিমকে লইয়া বাড়ীর দিকে চলিয়া গেল

সাধনা। এখুনি কান্নাকাটি করবেন না। হয়ত কাছে কোথাও আছে। তার দাদা কোথায় ?

প্রভাবতী। তার কথা আর কইযোনা। কোথায় থাকে, কি করে, পোলা কি কয় কাউরে। তুমিই কওচেন মা, কী জালায় আমি পড়চি! প্যাটে যাদের ধরলাম, তাদের দিয়া আইলাম ছড়াইয়া ছিটাইয়া, আর পড়শীর মাইয়ার লাইগ্যা আমার একটুকু কালও ঘোষাস্তি নাই!

অবনী আগাইয়া আসিল

অবনী। ও গিন্নী! শোনচনি!

প্রভাবতী তাহার দিকে ঘুরিয়া জিজ্ঞাসা করিল

প্রভাবতী। পাইছো খুঁইজ্যা ? কেতীরে পাইছনি ?

অবনী। পাইছি! রাজকন্যা ফিইর্যা আইছেন।

সাধনা। দেখুন ত, মিছেমিছিই কান্নাকাটি করছিলেন। আমি বাবাকে বলি গিয়ে কেতকীকে পাওয়া গেছে।

সাধনা বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইল

প্রভাবতী। ও মাইয়্যা! শোনচে একবার।

সাধনা তাহার কাছে ফিরিয়া আসিল

সাধনা। কিছু বলবেন আমাকে ?

প্রভাবতী। হ। দয়া ত করলা। আমাগোরে আশ্রয় দিলা। কিন্তু ওই কেতী মাইয়াড্যারে চক্ষে চক্ষে রাখা ত আমার দায় হইয়া উঠল। তারে রাখবা তোমার কাছে? ন্যাখন পড়ন জানে। তোমার কাজ-কম্ম কইর্যা দিতে পারব।

সাধনা। দেখি, ভেবে দেখি।

সাধনা। আমরার একটা অনে রাখলাম। বাবার যদি অবস্থ না থাকে, কেতকীকে আমাদের কাছেই রাখব।

বলিয়া সাধনা চলিয়া গেল

প্রভাবতী। কোথায় গেছিল হারামজাদী, কও ত শুনি!

অবনী। শোন গিন্নী, তোমারে একটা কথা কইয়া লই। কেতী কেতী কইয়া আর তুমি চিল্লাইয়ো না।

প্রভাবতী। ক্যান্, কেতী আছে নাই?

অবনী। অখন ফিইর‍্যা আইছে। কিন্তু আবার যে যাইব, আর ফিইর‍্যা আইব না।

প্রভাবতী। আরে কি ছালি-পাশ কও তুমি, আমি বুঝি না।

অবনী। দিতে আছি বুঝাইয়া তোমারে। চল, ওই বেঞ্চিডায় বইয়া লই। দশজনের সামে ত এসব কথা কওন যায় না।

একটা বেঞ্চিতে গিয়া বসিল

প্রভাবতী। কান্নাও পায়, হাসিও লাগে। সায়েব মেমের লাগান বাগানের বেঞ্চিতে বইয়া আমাগোরে কথা কইতে হইতে আছে।

অবনী। তুমি ভাইবো না গিন্নী, বাড়ীঘর আমরা করুম।

প্রভাবতী। আর করচি বাড়ী-ঘর!

অবনী। সেই কথাই ত কইতে আইলাম, দশজনের সামে ত কওন যায় না। জমির তল্লাস পাইছি।

প্রভাবতী। কোথায়?

অবনী। এই কইলকাতারই কাছে, রাণাঘাটে।

প্রভাবতী। সেই মস্তবড় ইষ্টিশনে?

অবনী। হ। আট কাঠা জমি। আম গাছ আছে, জাম গাছ আছে। দুইহাজার টাকা হইলেই কেনন যায়।

প্রভাবতী। নগদ দু'হাজার টাকা ত হইব না।

অবনী। নগদ নাই, অঙ্গে আছে ত। তোমার অঙ্গে!

প্রভাবতী। জানি আমার এই গয়নাগুলা গিলবার লাইগ্যা তুমি হাঁ কইর‍্যা বইস্যা আছ। আমি দিমু না এই গয়না।

অবনী। বাড়ী যদি হয়, গয়নাও আবার হইব।

প্রভাবতী। ক্যাম্‌নে?

অবনী। ও-গুলা ক্যাম্‌নে করছিলাম। আর সরবস ছাইড়্যা যখন বাইচ্যা আছ, তখন গয়না ছাইড়্যাও বাইচ্যা থাকবা।

প্রভাবতী। না গো, না। গয়না আমি ছাড়ুম না। কখন কি হয় কওন যায় না। তখন টাকা পামু কোথায়?

অবনী। কিন্তু এই গয়নার লাইগ্যা কি পরাণডা দিবা?

প্রভাবতী। ক্যান্ পরাণ যাইব ক্যান্?

অবনী। কইলকাতার গুণ্ডাগোর কথা শোনচ ত। ছিনাইয়া লয়, দিনে-দুইপরেও ছিনাইয়া লয়, ছোরা মাইর‍্যা কাইড়্যা লয়।

প্রভাবতী। খুইল্যা রাখুম।

অবনী। অত সব হামলা-হাঙ্গামার মধ্যে আছি, তুমি কইর‍্যা লইয়া

প্রভাবতী।

অবনী। তাই কইর‍্যাই কি যখনতখন মরণ ঘ্যানাইতে পারবা? আমত তাদের চক্ষের দৃষ্টি থাকে ওই দিকেই।

প্রভাবতী। গয়নার কথা ভাবুম আমি। তুমি কেতীর কথা কি কইবা কও।

অবনী। কেতী মাইয়্যা ভালা না।

প্রভাবতী। ক্যান, মন্দটা তার কি দ্যাখলা?

অবনী। কেতী মরছে—হাসেম আলির সেই পোলাডার লাগে।

প্রভাবতী উঠিয়া দাঁড়াইল

প্রভাবতী। তোমার মুখ পইচা যাইব, আর সেই পচনে পোকা ধরব।

অবনী। সব কথা আগে শুইন্যা লও।

প্রভাবতী। চাই না শুনতে সেই ছালির কথা।

অবনী। হাসেম আলির পোলাডা আমাগোরে লুকাইয়া কেতীর পিছে পিছে আসছে এই কইলকাতায়।

প্রভাবতী। কইলকাতায় ত সগলেই আইতে পারে।

অবনী। কেতী তার লগে ভাবও করছে।

প্রভাবতী। তুমি দ্যাখচ?

অবনী। দেখচি। তোমার চিল্লানি শুইন্যা আমি ত গ্যালাম কেতীরে খোঁজতে। কিছুদূর গিয়া এই কাক-জোছনায় দেখি কিনা একটা গাছের নীচে বইস্যা দুইজনে কথা কইতে আছে। কেতী কেতী কইর‍্যা ডাকলাম। পোড়ারমুখী কাছে আইয়া দাঁড়াইল। জিগাইলাম তোর লগে ওটা কে ছিল রে। মাইয়্যা রা কাটল না।

প্রভাবতী। তাই হইতেই তুমি বুইঝ্যা লইলা সেই মানুষটা হাসেম আলির পোলা?

অবনী। কইলকাতায় আর কার লগে কেতী কথা কইব, তাই কও!

প্রভাবতী। আমি জিগাই গিয়া। হাচা কথা যদি তুমি কইয়া থাক, ওই মাইয়্যার এক দিন, কি আমারি এক দিন। হারামজাদী! ছেনালী মাগী!

বলিতে বলিতে প্রভাবতী চলিয়া গেল

অবনী। গয়না আমি রাখতে দিমু না তোমার গায়ে। কখন কি হয় কওন যায় না। আমার ট্যাকায় গড়াইছি যা, তা আমারই কাছে রাখুম। এই ভাবনে পোলা মাইয়্যা কখন কোথায় যাইয়া যায় কওন যায় না কিছু! আপনে বাঁচলে বাপের নাম।

অবনী যখন এই চিন্তা করিতেছিল, তখন একটু একটু কাশিতে কাশিতে রাইমণি আগাইয়া আসিল। অবনী উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল

অবনী। মাই!

রাইমণি ঘোমটা আরো টানিয়া দিল। অবনী তাহার কাছে আগাইয়া গিয়া কহিল

[illegible] আর কয়দিন? [[illegible] বসি গিয়া বেঞ্চিতার সামনে-
জোর [illegible]।

অবনী বেঞ্চির দিকে অগ্রসর হইল। রাইমণি একটু দাঁড়াইয়া
এদিক-ওদিক দেখিয়া বেঞ্চির কাছে গিয়া দাঁড়াইল

রাইমণি। বইস, এই বেঞ্চিতায়।

রাইমণি বসিল। অবনী তাহার ঘোমটা সরাইয়া দিবার জন্ম
হাত বাড়াইয়া কহিল

অবনী। ওই চাঁদ-মুখ আর ঢাইক্যা রাইখ্যো না, রাইমণি।

রাই একটু সরিয়া গিয়া কহিল

রাইমণি। গলি-পাপ কইতে আছেন ক্যান্?

অবনী। আমার পরাণ মানে না, রাইমণি, আমার পরাণ মানে না! বুকের ভিতর আছাড় পাড়ে, দাপাইয়া তোমার পায়ে পড়তে চায়!

রাইমণি। কি ঘিন্না! আপনেরে যে ভাশুর বইল্যা জানি!

অবনী। ভাশুর হইলাম ক্যাম্নে কওচেন! ভিন্-জাতের মানুষ না? আমি কায়স্থ, তুমি তাঁতীর ঘরের বউ। তোমার ভাশুর ত হইতে পারি না, রাই।

রাইমণি। আপনেরে সে দাদা কইয়া ডাকে না?

অবনী। ডাকে। হতা ডাকে। কাত্তিক আমারে দাদা কইয়াই ডাকে। কিন্তু সে ত মুখের ডাক রাইমণি! মুখের কথার দাম কি তাই কও। আইজ দায়ে পড়চ, তাই তাঁতীর পোলারেও ভাই কইল্যা ডাকি, তারে পাশে লইয়্যা ভাত খাই! কিন্তু সম্বন্ধ খোয়াইবার আগে ওই তাঁতীর-পোরে কি কাছে আইতে দিতাম? দশহাত দূরে দাঁড়াইয়া কত্তা কত্তা কইর‍্যা অরা ডাকতনা আমাগোরে, খাইতে দিতাম না বারান্দায় এক কোণে কলার-পাতায় ভাত বাইড়্যা?

রাইমণি। হ তা ত দেখছি।

অবনী। তা হইলে?

রাইমণি। তার লাইগ্যাই ত আইজ আপনেরে একটা কথা জিগাইতে চাই, কত্তা।

অবনী। জিগাও, রাইমণি, জিগাও। পরাণ খুইল্যা জবাব দিমু।

রাইমণি। জিগাইতে চাই কত্তা, তাঁরা তাঁতীর পোলারে মানুষের আসন মনে করেন না, তাঁতীর ঘরের বৌয়ের পায়ে পরাণ ঢাইল্যা দিবার এ বদলগানি ক্যান্?

অবনী। ওই যে কইলাম রাইমণি, সে দিন আর নাই। সমাজ সামাজ সবই যখন গেল, তখন পরাণ যা চায় তা করম না ক্যান্?

রাইমণি। সবই গ্যাছে জানি। কিন্তু চন্দর সুর্যি ত যায় নাই। ভগবান ত উপরে থাইক্যা সবই দেখতে আছেন! আপনেরে ভাশুর বলিয়া জানতাম, ভক্তি-ছেদ্দা করতাম, জানতামনা আপনে এমন লোভী-শয়তান!

বলিতে বলিতে রাইমণি কাসিতে লাগিল

রাইমণি বসিয়া পড়িয়া কাসিতে কাসিতেই কহিল

রাইমণি। চুপ যান, চুপ যান কই! নইলে চিল্লিয়ে জল দিমু!

অবনী। ভাগ, তোমার দিদির প্যাটে কথা বাসি হয়। শোনলেই চিল্লাইতে লাগব, দশে-পাঁচে জানাজানি হইব। তখন তুমি কলঙ্ক লইয়া যাইবা কোথায়? আমি পুরুষ মানুষ, আমারে ডুবব না, কিন্তু তোমার কলঙ্ক মোছবা কি দিয়া?

রাইমণি। ক্যান্ গঙ্গা নাই? গঙ্গায় জল নাই?

অবনী। গঙ্গাও আছে, জলও আছে। মনে হইলে তুমি মরতেও পার। কিন্তু মরবা ক্যান্? শোন রাই। কথাটা কই। তোমার দিদির গায়ে যত গয়না দ্যাখ, সব খুইল্যা তোমার গায়ে পরাইয়া দিমু। কিকিরও একটা কইর‍্যা বাড়ীও একটা কইর‍্যা লমু। সেই বাড়ীতে তুমি হইয়া থাকবা ঘরের লক্ষ্মী।

রাইমণি। আপনে কত্তা কায়স্থ হইয়া তাঁতীর বউরে ঘরের লক্ষ্মী?

অবনী। করমই ত! বাড়ী-ঘর-সমাজের লগে লগে জাত যখন জাহান্নামে গেছে। অখন কখন আছি, কখন নাই। পরাণের সাধ মিটাইয়া লমু না ক্যান্, কও?

রাইমণি। আমারে ত কাইস্তা কাইস্তাই মরতে হইব।

অবনী। তাই ভাইব্যাইত কাইন্দা মরি। আরো ভাবি—কাত্তিক তোমার চিকিৎসা করাইতে?

রাইমণি। খাওনেরটাই জোটাইতে পারে না, ডাক্তার কেমন কইরা!

অবনী। কাত্তিকের টাকা নাই, আমার আছে। আমি ত চিকিৎসা করাইতে। তোমার বুকের লাগান আমারও বুক ফাইট্যা যায়, রাইমণি। তোমার কাসি সারাইয়া ওই বুকে লাগাইয়্যা আমি পইড়্যা থাকুম, রাই।

রাইমণি। এই সব ছালির কথা কইবার লাইগ্যাই কি এইখানে ডাইক্যা আনছেন?

অবনী। ছালির কথা কও কি রাইমণি, পরাণ খাজি রস ঢাইল্যা দিলাম না! ভাইস্তা পড়, রাইমণি, ভাইস্তা সুখও পাইবা, শান্তিও পাইবা।

রাইমণি। শোনেন। তাঁতীর ঘরের বউ আমি [illegible] যাই। আমার খোয়ামী গরীব, কিন্তু দুবলা না। গরাস হইতে একা আমারে ছিনাইয়া আনবার জাগত তার তারে যদি কইয়া দি আপনের এই অ-কথা, কু-কথা, তা আপনের হাড্ডি সে চুর কইর‍্যা দিবনা?

রাইমণি। হাচা, এই বিয়ার কথা কাউরে কইতেও মন চায় না।

অবনী। কইয়োনা। কাউরে কিছু কইয়োনা তুমি। মনে মনে চিন্তা কর আমি যা কইলাম। চিন্তা করলেই বোঝতে পারবা আমার কথা আইজকার দিনে অ-কথাও না, কু কথাও না, সুখে শান্তিতে বাইচ্যা থাকবার কথা।

কার্তিক আড়াল হইতে ডাকিল

কার্তিক। অবনীদা, আছ নাকি ওই দিকে। অ অবনীদা, শোনচ নি!

অবনী। লুকাও! লুকাও রাইমণি। ওই ঝোপড়ার আড়ালে লুকাইয়া পড।

কার্তিক। অবনী দা গো!

অবনী। থাইছে রে! তোমারেও আস্ত রাখব না। লুকাও না তুমি!

রাইমণি। না। লুকামু কিসের লাইগ্যা?

অবনী। তা হইলে আমিই পালাইলাম। কিন্তু রাইমণি, ও'রে তুমি কিছু কইয়ো না। তোমারেও আস্তা রাখব না, আমারেও না। গুণ্ডা বণ্ডা ওই কার্তিকডা কা ত জান।

বলিয়া দ্রুত ঝোপের দিকে চলিয়া গেল

রাইমণি। হাচা কথা। শোনলে কাউরে আস্ত রাখব না।

কার্তিক আগাইয়া আসিল

কার্তিক। কে ও! রাই না?

রাইমণির কাছে আসিয়া কহিল

আরে, তুমি এইখানে কি করতে আছ এত রাইতে?

রাইমণি। মরণ আছে কিনা তাই ভাপতে আছিলাম।

কার্তিক। কইওনা! ও কথা তুমি কইও না, রাই!

রাইমণি। এমন কইর‍্যা বাইচ্যা থাকবার চাইয়া মরণই ভালা।

রাইমণি বসিয়া পড়িল

কার্তিক। আর কয়ডা দিন দুখ আছে রাইমণি, তারপর আবার আমরা সুখের মুখ দেখুম।

রাইমণি। কপালে আর সুখ নাই। সুখ নাই জাইন্যাইত দিবা রাত্র অখন মরণেরে ডাকি। কিন্তু মরতেও পারিনা তোমার মুখের দিকে চাইয়া।

কার্তিক। মরতে আমারে দিবো না, রাইমণি। হাত চালাইতে জানি, লাঙলও ঠ্যালতে পারি। বিঘা খানেক জমি পাইলেই সব ফলাইয়া দিমু!

রাইমণি। ঝিকিমিকি ঝিছিল করা সংসার ছাইড়্যা চইল্যা আইলাম।

কার্তিক। আইলামই না। পদ্মার ভাঙনে যদি বাড়ী যাইত, তা হইলে করতাম কি? মনে ভাব না পদ্মার গর্ভেই সব দিয়া আইছি। তুমিও দেহের ভাগদ ত রইছে এখনো। অন্তরের লাগাম খাটতে খাটতে অসাড়, অবশ। না আইয়া খাইয়া খাইয়া শইলের শ্যামলা রূপ শুকাইয়া দগ-বগ করতে আছে। তোমার দিকে চাইতেও পারি না।

কার্তিক। মুইচ্যা যাইতে আছি না!

বলিয়া হাসিতে হাসিতে মাটিতে বসিয়া পড়িল। রাইমণি উঠিয়া দাঁড়াইল।

কার্তিক। ওঠলা ক্যান্।

রাইমণি। তুমি বইবা জমির উপর, আর আমি বিবির লাগান বেঞ্চিতে বইয়া থাকুম?

মাটিতে তাহার পাশে বসিল

কার্তিক। বইস! গায়ে গা লাগাইয়া বইস।

রাইমণি। হঃ। দশজনে দেইখ্যা মস্করা করুক!

রাইমণি সরিয়া বসিল

কার্তিক। পাথর মানুষ হইয়া পড়লাম রাইমণি! আশা ভরসা আর রাখিনা, টাকা চাকরির কথাও আর ভাবি না। চাইয়া ভাখ রাই কইলকাতার চাঁদও জোছনা ঢাইলা যায়।

রাইমণি। এই জোছনা ভাখলে আমার পরাণডা কাইন্দা ওঠে।

কার্তিক। ক্যান্ রাই, পরাণ কাঁদে ক্যান্?

রাইমণি। বাড়ীর লাগে। জোছনা রাইতে খালের ঘাটে যাইতাম সকড়ি বাসন লইয়া। বাসন থাকত জলে পইড়্যা, আমি চাইয়া চাইয়া দেখতাম শাপলা ফুলগুলা চাঁদের লগে কথা কয়।

কার্তিক। কইলকাতায় খাল দেখচি, কিন্তু খালে শাপলা দেখি নাই।

রাইমণি। কইলকাতায় শাপলা নাই, বাতাবী লেবুর গাছের ফুল নাই, নুইয়া পড়া বাঁশ গাছের চিকন পাতায় ভরা ডগা নাই, অশথবট গাছ নাই, চাঁদেরও নাই খেলা।

কার্তিক। কইলকাতায় চাঁদও হ্যাসতে জানে, রাইমণি। আমি ভাখতে আছি তোমার মুখে তার আলোর খ্যালন।

রাইমণি। কইলকাতার চাঁদের হাসি রাঁড়ী-বিধবার পোড়ার মুখের হাসির লাগান আমার পরাণ কাঁদাইয়া যায়।

কার্তিক। আমি পাশে থাকলেও?

রাইমণি তুমি পাশে বইস্যা আছ বইল্যাইত আরো মনে হয় চইল্যা যাই ভাশে ফিইর‍্যা তোমারে লইয়া। এই জোছনায় আইজও সেইখানেও হাসতে আছে, হাসতে আছে শাপলা। খালের জলে দুইল্যা দুইল্যা।

বাড়ীর ভিতর হইতে অনিমেষ ও সাধনা বাহির হইয়া আসিল

কার্তিক। চুপ দাও! সাধনা দেবী আইত্যাছেন।

রাইমণি ঘোমটা টানিয়া কহিল

রাইমণি। সইর‍্যা যাও তুমি! অরা যদি ভাখে, লাজ রাখবার ঠাঁই রাখু না।

রাইমণি। জড়াইয়া ধইর্যা ব্যাড়াইতাছে, কিন্তু বিয়া হয় নাই।

সাধনা ও অনিমেষ আগাইয়া আসিল

অনিমেষ। বিয়ের কথা তোমার বাবাকে বল্লাম।

সাধনা। তাহলে আমাকে যা বলবার আছে তাই বল।

অনিমেষ। তোমার বাবা বল্লেন, তোমার মত জানা দরকার।

সাধনা। সেই অবসর তাঁকে দাও।

বলিয়া সাধনা প্লাটফর্মের উপর বসিল। অনিমেষ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল

কার্তিক। শোন, ওরা বিয়ার কথাই কইতাছে!

রাইমণি। কি যিন্না গো! নিজেগোর বিয়ার কথা কয় নিজেরা।

কার্তিক। আরে না, না। জানতে আছ না সাধনা দেবী সরমে মইর্যা গিয়া বইস্তা পড়চে!

রাইমণি। তাইতেই কি পুরুষটা ওনারে ছাইড়্যা দিব? ওই ভাখ, পায়ে পায়ে আগাইয়া যায়!

অনিমেষ সাধনার পিছনে গিয়া দাঁড়াইল

কার্তিক। মরছে রাইমণি, মরদটা মরছে!

অনিমেষ সাধনার পিছনে দাঁড়াইয়া বাঁ হাত দিয়া তাহাকে বেড়িয়া ধরিয়া কহিল

অনিমেষ। সাধনা, এমন করে দূরে দূরে আমি আর থাকতে পারি না।

সাধনা ঘাড় ঘুরাইয়া তাহার দিকে চাহিল

সাধনা। হাত দিয়ে বেড়ে ধরেও বলচ তুমি দূরে!

কার্তিক। চাইয়ো না। ওইদিকে আর চাইয়া দেইখ্যো না, রাইমণি এখনই হইব জড়াজড়ি!

রাইমণি। না গো! এখনো না।

বলিয়া কার্তিকের হাত জড়াইয়া ধরিল

অনিমেষ। আমার স্পর্শও তোমাকে উতলা করে তুলচে না, সাধনা।

সাধনা। বুঝতে পারচ?

অনিমেষ। বোঝা শক্ত নয়!

কার্তিক। মিছা দুইজনে দেরী করতে আছে। আমরা হইলে পারতাম না গো!

অনিমেষ। আমার সারা দেহ কেমন করে কাঁপচে তা অনুভব করচ ত!

সাধনা। যে কোন তরুণীর স্পর্শেই হয়ত ও-দেহ কেঁপে ওঠে। কিন্তু সেইটেই সর্বত্র বিয়ের দাবী হয়ে দাঁড়ায় না।

অনিমেষ। কোন তরুণী এমন করে আমাকে তার স্পর্শ দেয়নি।

সাধনা। জানতে চাইছ হাত দিয়ে যখন তুমি আমাকে বেড়ে ধরলে, তখন আমি চেঁচিয়ে উঠলাম না কেন?

বলিয়া সাধনা উঠিয়া সরিয়া গেল

রাইমণি। মিলাইয়া লও আমার কথা। ধরল জড়াইয়া?

কার্তিক। কইলকাত্তার মাইয়্যা, খ্যালাইয়া লইতাছে গো!

সাধনা ডানদিকের বেঞ্চিতে বসিল

রাইমণি। এখন পুরুষটা যাইব অর কাছে।

সাধনা যে বেঞ্চিতে বসিয়াছিল, অনিমেষ সেই বেঞ্চির দিকে অগ্রসর হইল

কার্তিক। হাচা কইছ ত রাইমণি। কুত্তার লাগানই ত যাইতাছে। তুমি জানলা ক্যামন কইর্যা?

রাইমণি। পুরুষ ওই মতোনই হয়।

কার্তিক। কইলকাত্তার পুরুষ তুমি চিনলা কেমন কইর্যা, রাই?

রাইমণি। হাঁড়ীর একটা ভাত টিইপ্যা দেইখ্যা আমরা বুইঝ্যা লই সব চাউল সিদ্ধ হইল কিনা? এক পুরুষের লগে ঘর কইর্যা জেনি, আমরা জানতে পারি সব পুরুষ ক্যামন হয়।

কার্তিক। আর মাইয়্যারা? মাইয়্যারা হয় কেমন?

রাইমণি। দেইখ্যা লও। মাইয়্যারা গাই, বলদ হয় না।

অনিমেষ সাধনার কাছে দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর কহিল

অনিমেষ। বসতে পারি?

সাধনা। পার বৈকি! বেঞ্চির কোথাও ত লেখা নেই, ফর লেডীজ ওন্লী!

অনিমেষ তাহার পাশে বসিয়া কহিল

অনিমেষ। আজ তুমি আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করচ কেন বলত?

সাধনা। বিয়ের দিন ঠিক করবার জন্যে আজ যে তুমি বে-পরোয়া হয়ে উঠেচ।

অনিমেষ। তাই হয়েচি। কিন্তু তা দোষের কথা নয়। আমার সারা দেহ মন—

সাধনা। তোমার দেহের বা মনের দিকে আমার কোন টান নেই অনিমেষ!

অনিমেষ উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল

অনিমেষ। আজ তুমি এই কথা বলচ!

কার্তিক। ভাখ, ভাখ। ফণা তোলছে! এখন মারব ছোবল।

রাইমণি। দুর্! পুরুষটা ঢ্যামনা সাপ; বিষ নাই।

সাধনা। রাগ করলে, না দুঃখ পেলে?

অনিমেষ। দুঃখ যে পেতে পারি তাও কি তুমি বোঝ?

সাধনা উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল

সাধনা। বুঝি।

অনিমেষ। তবে?

সাধনা। দুঃখের বাণ ডেকেচে দিকে দিকে। তা রোধ করবার শক্তি আমার নেই। তাই আমার অক্ষমতাকে তোমার দুঃখের বাড়তি

কার্তিক। মুরগার্ পাইয়াছ লাগছে যে!

অনিমেষ সাধনার কাছে গিয়া কহিল

অনিমেষ। একটা কারণও কি দেবেনা তুমি?

সাধনা। আর যাই হই, আমরা ইন্টেলেকচুয়াল। অকারণ কাজ কেউ পছন্দ করি না। ব্যথা যদি তোমাকে দিয়ে থাকি, তুমি জানতে চাইতে পার কেন ব্যথা দিলাম। আর তুমি যদি রাগ করে থাক, আমিও বলতে পারি—অকারণে রাগ কোরো না। বোস। বসে বসেই আমার কথাগুলো শোন।

রাইমণি। আবার যে কাছে বসতে কয়!

কার্তিক। মাইয়্যাছাইলার খ্যালনই ত ওই। বলদ না, পাই!

অনিমেষ সাধনার পাশে বসিয়া কহিল:

অনিমেষ। বল, তোমার কথাগুলো শুনে চলে যাই।

সাধনা। চলে যাই বলে এই ভয়ই কি দেখাতে চাও যে, আমাদের বাড়ী আর কখনো আসবে না?

অনিমেষ। রেফিউজীদের বরাভয়দাত্রী তুমি। তোমাকে ভয় দেখাবার ধৃষ্টতা আমার নেই।

সাধনা। যা-ই কর, আমার ওপর রাগ করে বাবাকে তুমি ব্যথা দিয়োনা। তুমি আর না এলে বাবা ব্যথা পাবেন। তিনি তোমাকে কী স্নেহ করেন, তা ত তুমি জান।

অনিমেষ। তোমাতে-আমাতে মিলে তাঁর জীবনের শেষ কটা দিন তাকে একটুখানি আরামে রাখব এই ছিল আমার কামনা।

সাধনা। সেই জন্যেই কি আমাকে বিয়ে করতে চাও?

অনিমেষ। তুমি ত বিশ্বাস করবে না।

সাধনা। তা'হলে আমার জন্যে আমাকে বিয়ে করতে চাও না?

অনিমেষ। তোমাকে বিয়ে করলে তোমার বাবাকে সুখী করা হবে না, এমন কথা ত হতে পারে না।

সাধনা। কিন্তু বাবাকে সুখী করবার জন্যে আমাকে বিয়েই করতে হবে, তাওত মেনে নেওয়া চলে না।

কার্তিক। কেমন মিঠা মিঠা কথা কইতাছে।

রাইমণি। মধু যা ঢালতে আছে, ওঠে তা ধরতে আছে না। পরাণ যাইতাছে।

সাধনা। শোন অনিমেষ, বিয়ের যে রোমান্টিক গ্ল্যামার সাধারণত আমার বয়সের মেয়েদের উতলা করে থাকে, আমার মনকে তা এখনো দোলা দিতে পারেনি। রোমান্সের উপদ্রব থেকে আমি এখনো মুক্ত রয়েছি।

অনিমেষ। রোমান্সই বিয়ের সব চেয়ে বড় আবেদন, এ-কথা আমি স্বীকার করি না।

সাধনা। তুমি বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলে।

তুমি আলোচনা করে দেখবে।

অনিমেষ। তোমার কথা শুনি আগে।

সাধনা। বলছি, শোন।

উঠিয়া দাঁড়াইয়া পায়চারী করিতে লাগিল

কার্তিক। অখন যা কইতাছে, তা ছালি বোঝতে পারতাছি না।

রাইমণি। হ জানতে আছি কইলকাতার মাইয়া-পুরুষরা আমার তোমার লাগান কথাও কয়না, কাজও করে না

সাধনা অনিমেষের সামনে দাঁড়াইয়া কহিল

সাধনা। বিয়ের আবেদন থেকে রোমান্সকে বাহুল্য মনে করে বাদ দিলে বাকি থাকে নর-নারীর পরস্পরের দৈহিক আর মানসিক আকর্ষণ। আগে দৈহিক আকর্ষণের কথাই বলি।

অনিমেষ। বলবে, তুমি কামকেও জয় করেচ?

সাধনা। না, তা বলব না। বলব কেবল দেহই দেহকে আকর্ষণ করে না। দৈহিক আকর্ষণের পিছনেও থাকে মন। সেই মন যদি কোন দেহকে আকর্ষণ না করে, তাহলে এক দেহ অপর দেহের আকর্ষণে সাড়া দেয় না।

অনিমেষ। প্রতিরোধ করে?

সাধনা। কখনো তাই করে, কখনো নিষ্পন্দ থাকে।

অনিমেষ। তখন আমার সারা দেহ কাঁপছিল...

সাধনা হাসিয়া কহিল

সাধনা। কবির ভাষায় বল, বেতস-পত্রের মতোই কাঁপছিল।

অনিমেষ। তা বলেও কিছু এগুবে না, কেননা তুমি ছিলে স্থির-নিষ্পন্দ।

সাধনা। তার কারণ তোমার দেহের কম্পন আমার দেহে স্পন্দন এনে দিতে পারে নি।

অনিমেষ। আমি দুর্বল নই।

অনিমেষ উঠিয়া দাঁড়াইল

সাধনা। জানি, তুমি ক্রিকেটে নাম করেছিলে।

অনিমেষ সাধনার পাশে গিয়া দাঁড়াইল

অনিমেষ। দেহ আমার কুশ্রী নয়।

সাধনা। তাও শুনি।

অনিমেষ। শোন? স্বীকার কর না?

সাধনা। করি।

অনিমেষ। তবে, সাধনা, তবে?

সাধনাকে টানিয়া লইল, সাধনা বাধা দিল না, তাহার দেহের উপর দিয়া হাত বুলাইতে লাগিল

কার্তিক। হইল ফয়সালা!

রাইমণি। আর চাইয়ো না ওই দিকে।

অনিমেষ। সাধনা।

হয় তুমি আত্ম-সমর্পণ কর, আর না হয় সরে যাও আমার কাছ থেকে।

সাধনা। তোমার পরিপুষ্ট মাংস-পেশী আমার মুঠোর মাঝে ফুলে ফুলে উঠচে, তোমার শিরায় শিরায় তরল আগুন নেচে বেড়াচ্ছে তাও আমি বুঝতে পারচি……

অনিমেষ। কেবল বুঝতে পারচ না—নিজেকে সংযত রাখবার যে চেষ্টা আমি করচি, তাতে আমার হৃৎপিণ্ডটা পাঁজরের বাঁধ ভেঙ্গে বেরিয়ে আসবার জন্য ঠক্ ঠক্ করে হাতুড়ীর মত বুকের দেয়ালে আঘাত হানচে!

সাধনা। তবুও দেখচ আমার দেহে বা মনে প্রতিক্রিয়া জেগে আমাকে এতটুকু বিচলিত করেনি।

অনিমেষ। তুমি পাষাণী।

বলিয়া সাধনাকে সরাইয়া দিয়া অনিমেষ এক পাশে সরিয়া গিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ফুঁসিতে লাগিল।

কার্তিক। তাঁতের মাকুর লাগান যাইতাছে আর আইতাছে।

রাইমণি। নইলে বুনট পাকা হইব ক্যামনে?

সাধনা। বুঝতে পারলে তোমার ওই সুপুষ্ট ও সুশ্রী দেহের কোন আবেদনই আমার কাছে নেই?

অনিমেষ। হ্যাঁ, হ্যাঁ, বুঝতে পারচি তুমি পাষাণী। বেশী খুসি হও যদি, দেবীও বলতে পারি। বাসনা কামনা সবই তুমি জয় করেচ!

সাধনা। না অনিমেষ, আমি পাষাণী নই। দেবী বল্লেও আমি খুসি হব না। বাসনা কামনা জয় করিনি; মানুষ আমি। দেহের প্রতি আসক্তি আমারো আছে। কিন্তু তোমার দেহের প্রতি নেই।

অনিমেষ। সেই ভাগ্যবানটি কে, যার দেহের জন্য তুমি লালায়িত?

সাধনা। মূর্ত্তি ধরে আজও দেখা দেয়নি। কিন্তু এ-কথা সত্যি যে, অকারণে কখনো কখনো আমারো সারা দেহ মন পুরুষের পরশ পাবার জন্য থর্ থর্ করে কেঁপে ওঠে।

অনিমেষ। শুধু আমার স্পর্শই তোমাকে পাথর করে দেয়!

সাধনা। মুস্কিল এই অনিমেষ, আমি তোমাকে সহজ মনে আপনও করে নিতে পারি না, আমার বলতেও পারি না তুমি আমাদের কেউ নও।

অনিমেষ। কোন আকর্ষণই যখন নেই, তখন তাই-ই বা পার না কেন?

সাধনা। তুমি দুইবার দেশের জন্য জেল খেটেছিলে, তা ভুলতে পারি না। দেশ মুক্তি পাবার পর তুমি চোরাকারবারে পসার জমাচ্ছ, তাও ভুলতে পারি না। দেশ-সেবায় আত্ম-নিয়োগ করেছিলে বলে বাবা তোমাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন। সে স্নেহ তাঁর থাকবে না, যদি তিনি জানতে পারেন কী উপায়ে তুমি টাকা উপার্জ্জন কর।

অনিমেষ। টাকা উপার্জ্জনকে তুমি অন্যায় মনে কর?

[illegible]। যেভাবে উপার্জ্জন কর, তা-ই অন্যায় মনে করি। অপরাধ এই যে, তুমি অবিরাম অতীতের কারাবাসকে আর বাবার স্নেহকে কাজে লাগিয়ে চোরাকারবার নিরোধক আইনকে ফাঁকি দেবার সুযোগ করে নিচ্ছ।

অনিমেষ। খোলসা করে বলইনা কেন, তুমি আমাকে ঘৃণা কর।

সাধনা। ঘৃণা করি না, আঘাত পাই; প্রীতি দিতে গিয়ে প্রতিহত হই। সেই জন্যেই আমার মন, আর সেই কারণেই আমার দেহও, তোমার প্রতি আকৃষ্ট হয় না।

অনিমেষ। কাজেই আমাকে বিয়ে করা তোমার পক্ষে সম্ভব নয়?

সাধনা। এক সময় ছিল যখন মেয়েরা বিয়ের আগে হবু-বরের চরিত্র ও কাজ নিয়ে এমন আলোচনা করত না।

অনিমেষ। এখনো বেশির ভাগ মেয়েই তা করে না।

সাধনা। রোমান্স আর দৈহিক মিলনের লালসা যাদেরকে বিহ্বল করে তোলে, তারাই তা করে না।

অনিমেষ। বোঝাতে চাও তুমি ও দুয়েরই ঊর্দ্ধে?

সাধনা। উঁচু নীচুর কথা নয়। শুনেচত, রূপকথার রাজকন্যা সোনার কাঠির স্পর্শ পেলে তবে জেগে ওঠে। পরশ কাঠিটি সোনার হওয়া চাই।

অনিমেষ। আর কন্যাটিও হওয়া চাই রাজকন্যা।

সাধনা। অব কোর্স! সুস্থ মন, সূক্ষ্ম অনুভূতি, সুষমা-ভরা আবেগ না থাকলে মিলন সুন্দরও হয় না, সার্থক হয় না।

অনিমেষ। হুঁ! অনেক কথাই বল্লে তুমি। কিন্তু এ-কথা কি মান যে, পরশ কাঠিটি যদি সোনার না হয়ে লোহারই হয়, তা হলেও তা ঘুম ভাঙ্গাবার কাজে লাগানো যেতে পারে?

সাধনা। বলাৎকারের কথা বলচ?

অনিমেষ। সেই আদিম প্রবৃত্তি এখনো মানুষের বুকে জাগ্রত রয়েচে।

সাধনা। বিজ্ঞানের ছাত্র তুমি।

অনিমেষ। বিজ্ঞান বলাৎকারকে কখনো কখনো অপরিহার্য্য করে। তার প্রমাণ হিরোসিমা, নাগাসাকি!

সাধনা। অনিমেষ!

অনিমেষ। বল।

সাধনা। তুমি বলচ এক, কিন্তু ভাবচ আর।

অনিমেষ। বুঝেচ!

সাধনা। তোমার নাকের ডগা ফুলে উঠচে, তোমার চোখে কামনার আগুন……

অনিমেষ। হ্যাঁ হ্যাঁ, অনবরত খোঁচা খেয়ে খেয়ে আমার পশু রুখে উঠেচে।

বলিতে বলিতে অনিমেষ পায়ে পায়ে অগ্রসর হইতে সাধনাও পায়ে পায়ে পিছাইতে পিছাইতে যে কোণের দিকে

সাধনা। অনিমেষ ভুলোনা আমরা শিক্ষিত, আমরা ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল, আমরা কালচারড......

অনিমেষ। সব আবরণের নীচে রয়েচে আদিম মানুষ, যার সঙ্গে পশুর কোন পার্থক্য নেই।

রাইমণি : ওমা! ছাখ, ছাখ, চাইয়া ছাখ, পুরুষভার মুখ-চোখ সেই লোচ্চা-ডাকাইতগোর মুখ-চোখের লাগান দেখাইতাছে।

কার্তিক। তোমারে যারা ছিনাইয়া লইতাছিল ?

রাইমণি। হ। অরেও ছিনাইয়া লইব।

অনিমেষ সাধনার হাত চাপিয়া ধরিয়া তাহাকে কাছে টানিয়া লইতে লইতে কহিল

সাধনা। অনিমেষ !

রাইমণি। কিন্তু পশু যখন শিকারের ঘাড় ভাঙবার অবসর পায়না, তখন কি করে জান ?

সাধনা। অনিমেষ !

রাইমণি। তখন তাকে আঁচড়ে কামড়ে ক্ষত বিক্ষত ফেলে রেখে যায়। মনের বলই সব নয় সাধনা, দেহের বলও......

কার্তিক ঝোপের ভিতর হইতে বাঘের মত লাফাইয়া বাহির হইয়া কহিল

কার্তিক। ছাইড়্যা দাও ! ছাইড়্যা দাও, যদি বাঁচতে চাও !

অনিমেষ। চুপ কর্‌ ভিক্ষুক।

কার্তিক। ভিখারী হইতে পারি ; কিন্তু লোচ্চা না রে, দুর্মুখ !

বলিয়াই অনিমেষকে ধাক্কা দিল। অনিমেষ ছিটকাইয়া পড়িল প্লাটফর্মের উপর। প্লাটফর্মের উপর একটা কাঠের হাতুড়ি ছিল। তাহাই তুলিয়া লইয়া কার্তিককে আঘাত করিতে উদ্যত হইল।

সাধনা। অনিমেষ !

রাইমণি। মাইরা ফ্যালে গো, মাইরা ফ্যালে।

অনিমেষ আঘাত করিল

কার্তিক। মারছে রে শালা, মোক্ষম মার মারছে গো !

বলিতে বলিতে দুই হাতে মাথা চাপিয়া ধরিয়া কার্তিক প্লাটফর্মের উপর বসিয়া পড়িল।

রাইমণি। আমার কি হইল গো !

বলিয়া রাইমণি ছুটিয়া গিয়া কার্তিককে পিছন হইতে ধরিয়া কহিল

পাকিস্তানের লোচ্চাগোরে মাইরা তুমি আমারে ছিনাইয়া আনলা, আর পরাণে মারল ওই কইলকাতার লোচ্চা ! তবে আমরা কেন আইলাম সব ছাইড়্যা কাইট্যা গো, কেন, আইলাম এই হিন্দুস্থানে !

কার্তিক। চুপ দে মাগী, চুপ দে অখন।

রাইমণি। চুপ দিমু ক্যামনে ! রক্ত-গা সইয়া যায় না। চক্ষে দেইখ্যা চুপ কইর‍্যা থাকুম ক্যামনে ? আমার কি হইল গো ! আমার কি হইল !

কার্তিক। [illegible] চুপ দে [illegible]।

অনিমেষ হাতুড়ীটা ফেলিয়া দিয়া কহিল

অনিমেষ। পশুকে খুঁচিয়ে ক্ষেপিয়ে তুলেছিলে তুমি।

সাধনা কার্তিকের কাছে গিয়া কহিল

সাধনা। দেখি, কোথায় লেগেছে ?

কার্তিক। মারছে মোক্ষম মার।

বলিতে বলিতে কার্তিক প্লাটফর্মের উপর শুইয়া পড়িল।

সাধনা। অনিমেষ, দৌড়ে গিয়ে অ্যাম্বুলেন্সকে ফোন কর। একে এখুনি হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে।

অনিমেষ। হ্যাঁ ফোন করব, কিন্তু অ্যাম্বুলেন্সকে নয়, পুলিশকে।

সাধনা। পুলিশ ত তোমাকেই ধরে নিয়ে যাবে।

অনিমেষ। কিন্তু পরে যাতে ছেড়ে দ্যায়, তার জন্যে আমাকেই আগে খবর দিতে হবে। বলতে হবে বাস্তুত্যাগী আশ্রয়প্রাপ্ত ওই লোকটা আশ্রয়দাত্রী দেবীর রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে আক্রমণ করেছিল। তাই দেবীর দীন এই ভক্ত আমি অনন্যোপায় হয়ে আততায়াকে আঘাত করে তরুণীর সম্ভ্রম রক্ষা করেচি।

সাধনা। অনিমেষ !

অনিমেষ। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই হবে আমার ডিফেন্স !

সাধনা শুনিয়া স্তব্ধ রহিল। যবনিকা পড়িল। সেই যবনিকা যখন উঠিল তখন চাঁদের আলো আরো শুভ্র হইয়াছে। দূরে কোথাও কেহ গান গাহিতেছে। মহিম স্তব্ধ হইয়া একখানি চেয়ারে বসিয়া আছেন। সাধনা চঞ্চল ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

মহিম। সাধনা।

সাধনা দূরে ছিল। ফিরিয়া দাঁড়াইল। কাছে গিয়া কহিল—

সাধনা। আমাকে ডাকছিলে বাবা ?

মহিম। অনিমেষের ব্যবহারে মনে খুবই আঘাত পেয়েচ ?

সাধনা। তার কথা আমি ভাবচিনা, বাবা। ভাবচি আহত লোকটির কথা।

মহিম। লোকটি খাঁটি ধাতু দিয়ে গড়া। প্রাণের মায়া নেই, সৎ কাজে সংশয় নেই ! ওর মত লোককেও বাস্তু ছেড়ে চলে আসতে হোলো। কাপুরুষ বলেই যে এল, তা মেনে নিতে মন চাইছে না।

দীপক আগাইয়া আসিল

সাধনা। এই যে দীপকবাবু ! হাসপাতালের খবর কি ?

দীপক। ড্রেস করে ছেড়ে দিলে। বল্লে আঘাত গুরুতর নয়। শিগগীরই সেরে যাবে। ওর মতো লোক সহজে ঘায়েল হয় না।

মহিম। ওর সম্বন্ধে তা হলে ভয় করবার কিছু নেই ?

দীপক। আজ্ঞে, না।

মহিম। একটা দুর্ভাবনা গেল।

দীপক। ফিরে এসে নিশ্চিন্ত বসে গল্প জমিয়েচে।

মহিম। হাসপাতালে ওকে একটা ডিক্লারেশন দিতে হয়েচে ত।

দীপক। [illegible]।

সাধনা। অনিমেষ যে ওর মাথায় হাতুড়ীর ঘা মেরেচে, তা ও বলেনি?

দীপক। না। ও বলেচে আপনাদের একটা শেডের একটা মাচার ওপর কতকগুলো লোহার গোলা ছিল, তারই একটা গড়িয়ে ওর মাথায় পড়েচে।

দীপক। লোহার গোলা?

সাধনা। হ্যাঁ, বাবা, বাড়ী তৈরির সময় লোহার সরঞ্জামের সঙ্গে সেগুলো কেন যেন আনা হয়েছিল। কোন কাজে লাগেনি বলে সেগুলি লোহা-লক্কড়ের সাথে মাচায় তুলে রাখা হয়েছিল।

মহিম। ও তা জানল কি করে?

দীপক। ওই ঘরটাই ও থাকবার জন্যে বেছে নিয়েছিল। হয়ত দেখে রেখেছিল ঘরের কোথায় কি আছে। হাসপাতাল থেকে ফিরেই সেই মাচায় উঠে লোহা-লক্কড়গুলো এলোমেলো করে রেখেচে, গোটা দুই লোহার গোলাও নীচে ফেলে রেখেচে।

মহিম। কেন, এত সব ও করতে গেল কেন?

দীপক। হাসপাতালে যাবার সময় পথেই আমাকে বলেছিল যে, সত্য ঘটনা ও কিছুতেই প্রকাশ করবে না।

মহিম। কেন?

দীপক। ও বলে তাতে সাধনা দেবীর সম্বন্ধে দশজনকে দশকথা বলবার সুযোগ দেওয়া হবে। ও তা দিতে চায় না।

মহিম। শুধু সেই কারণেই অকারণে যে ওকে জখম করলে, তার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ ও করলে না!

দীপক। ও বলে, সাধনা দেবী আমাদের আশ্রয় দিয়েচেন, তাই তাঁর অমর্য্যাদা হতে পারে যাতে, তা আমাদের করা উচিত নয়।

সাধনা। সাধারণ ওই মানুষটি এতখানি মহত্বের অধিকারী, বাবা?

মহিম। আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের মন একদিন এমনি উঁচু তারেই বাঁধা ছিল, মা। কয়েক শত বছরের অবহেলা আর উপেক্ষা তাতে মরচে ধরিয়ে দিয়েচে। স্বাধীনতার স্পর্শে আবার তা উজ্জ্বল হয়ে উঠবে, এ ভরসা আমার আছে।

সাধনা। অনিমেষ বলেছিল সে-ই পুলিশকে খবর দেবে নিজের সাফাই তৈরী রাখবার জন্যে।

মহিম। অনিমেষ আজকাল পুলিশের সঙ্গে খুবই ঘনিষ্ঠতা করে নিয়েচে।

সাধনা। তোমার স্নেহকে সে তার স্বার্থসিদ্ধির কাজে লাগাচ্ছে বাবা।

মহিম। কিন্তু পুলিশ অফিসাররা ত আমাকে প্রীতির চোখে দেখতেন না। এখনো তা দেখবার কোন কারণ নেই।

সাধনা। এখন তাঁরা জানেন মিনিষ্টাররা তোমার বন্ধু। তাই আগে যে দৃষ্টি দিয়ে তোমাকে দেখতেন, এখন সে দৃষ্টি দিয়ে দেখেন না।

মহিম। আমাকে এখন তাঁরা কী মনে করেন?

মতো একজন দেশসেবক বলে তোমাকে তাঁরা শ্রদ্ধাই করেন।

মহিম। তাদেরই মতো একজন দেশসেবক!

সাধনা। তাদের কথা এখন থাক্। তুমি চল তোমাকে ঘরে রেখে আসি। অনেক রাত হয়েচে।

মহিম। কিন্তু আহত লোকটির সঙ্গে একবার ত আমাদের দেখা করা দরকার।

সাধনা। সে আমি যাব এখন।

মহিম। এত রাতে একা তুমি যাবে?

সাধনা। দীপকবাবুর সঙ্গে। যাব, আবার তিনিই আমাকে পৌঁছে দিয়ে যাবেন।

মহিম। অনিমেষ যে ব্যবহার করলে, তারপর আর……

সাধনা। আর কাউকেও তুমি বিশ্বাস করতে পার না, না?

মহিম। কিন্তু অনিমেষের কুৎসিত ব্যবহারের ফলে একটুখানি আলোক প্রকাশ পেয়েচে।

সাধনা। আলো!

মহিম। হাঁ, মা। নারী নিগ্রহ, নারীর ওপর উৎপাতের বিশেষ কোন একটা রাষ্ট্রেরই কেবল কলঙ্ক নয়, সকল রাষ্ট্রের সকল অসংযত উচ্ছৃঙ্খল মানুষই ওই পাপ আচরণ করে। ও পাপ রাষ্ট্রের নয়, মানুষের মনের পাপ। পাকিস্তান ত্যাগ করলেও ও পাপ থেকে নিষ্কৃতি নেই; নিষ্কৃতি আছে কেবল সমাজ সংস্কারে, মানুষের মানসিক বিশুদ্ধতায়। এক স্থান থেকে অপর স্থানে পালিয়ে নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে না। পলায়ন নয় সংস্কৃতি, পলায়ন না, সংস্কৃতিই হচ্ছে নিষ্কৃতির একমাত্র উপায়।

প্রভাবতীর গলা শোনা গেল

প্রভাব… আমার সর্ব্বনাশ হইল! অখন আমি কি করুম কও! ক্যান্ তুমি আনলা আমারে!

অবনী। চল দীপুরে কই, দশজনারে কই, থানা পুলিশ করি।

সাধনা। আবার কি হোলো! আপনারা, পূব-বাঙলার লোকেরা, সবেতেই বড় গোলমাল করেন। থাকবার ঠাঁই ছিল না, যা-হোক একটা পেয়েচেন। পেয়েচেন যখন, থাকুনই না চুপচাপ। তা নয়, অবিরাম হট্টগোল। ডিজগাষ্টিং!

দীপক। ভুল করচেন সাধনা দেবী। একটু আগে এখানে যে গোলমাল হয়ে গেল, যার জন্যে একটি লোককে হাসপাতালে যেতে হোলো, সে গোলমাল পূব-বাঙ্গালার লোকেদের জন্যে হয়নি।

সাধনা। আমি বলচি তাই-ই হয়েচে। কী দরকার ছিল কার্ত্তিকের অমন গোয়ার্ত্তুমি করবার?

দীপক। ও!

সাধনা। মানে? আপনি অমন ঠোঁট-বাঁকানো শব্দ করলেন কেন?

দীপক। পূব-বাঙ্গালার লোকদের বদনই বেঁকে গেছে, ঠোঁটই সিধে থাকবে কেন।

আগামী বারে সমাপ্য

শিশুমঙ্গল

শ্রীসন্তোষকুমার রায়চৌধুরী

কলিকাতা মহানগরীর বুকে অনুষ্ঠিত নিত্য নতুন প্রদর্শনীর ভিড়ে বিভ্রান্ত আর দ্বিধাজড়িত মন নিয়ে কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রচার বিভাগ কর্তৃক অনুষ্ঠিত শিশুমঙ্গল প্রদর্শনী দেখতে গিয়ে—যে নৈরাশ্য আর ব্যর্থতাকে আশা করিয়াছিলাম প্রকাণ্ড ভাবে, তার বদলে পেয়েছি এক অভূতপূর্ব্ব অনুভূতি, আনন্দ আর তৃপ্তি। প্রদর্শনী দেখতে গিয়ে সবচেয়ে আগে যে কথাটা মনকে নাড়া দেয়—সেটা হচ্ছে এই যে—আমাদের এই ভারতবাসীদের দৈনন্দিন জীবনে দুঃখই আছে, কষ্ট আছে, দারিদ্র্য আছে সত্য, কিন্তু সবার উপরে আছে আমাদের জাতি গঠনের অন্যতম সহায় শিশুদিগের পালন সম্বন্ধে অজ্ঞতা। পৃথিবীর প্রত্যেকটা সভ্য জাতিই সুস্থ ও সবল শিশুলাভের জন্য মাতার স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য যত্ন করে, শিশুর অকালমৃত্যু ও মাতার প্রসবকালীন মৃত্যু রোধ করবার জন্য তাদের প্রয়াসের শেষ নাই। আর তাদের এই প্রয়াসও হয়েছে অনেকাংশে ফলবতী। আমাদের দেশে এই প্রচেষ্টা সুরু হয়েছে অল্পদিন পূর্ব্বে। এই অল্পদিনের মধ্যে যতটুকু ফল পাওয়া গেছে তাতে মনে হয় এদেশেরও জনসাধারণ যদি শুধু মাত্র নিজের বা পরিবারের দিকে না তাকিয়ে জাতি গঠনের সংকল্প নিয়ে শিশুপালন ও শিশুমঙ্গল সম্বন্ধীয় অজ্ঞতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম সুরু করতে পারেন, তাহলে আমরা আশা করতে পারি যে—অদূর ভবিষ্যতে আমরা এবিষয়ে পৃথিবীর যে কোন সভ্য দেশের সমকক্ষ হতে পারবো। অবশ্য তার জন্য দরকার ব্যাপক প্রচার ও শিক্ষা। আর এবিষয়ে অগ্রণী হতে হবে মায়েদের। কারণ শিশু জন্মগ্রহণ করার পর প্রশ্ন আসে শিশুপালনের। কিন্তু তারও পূর্ব্বে শিশুমৃত্যু, প্রসূতি মৃত্যু রোধ করার জন্য ও সেই সঙ্গে সুস্থ ও সবল শিশুলাভের জন্য যা কিছু অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম আছে, তা শুধু মেয়েদের পক্ষেই অবশ্য করণীয় ও অবশ্য জ্ঞাতব্য। অভাব, অনটন, বাসস্থানের শোচনীয় সঙ্কীর্ণতা, সাংসারিক অস্বচ্ছলতার মধ্যেও যতটা সম্ভব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থেকে, যতদূর সম্ভব পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করে এবং স্বাস্থ্য রক্ষার প্রাথমিক কাজগুলো করে যাওয়া বেশীরভাগ লোকের বা মায়েদের পক্ষে বোধ হয় অসম্ভব নয়; কিন্তু তা হয়ে উঠে না। তাছাড়া যে সন্তানের জন্মের পর হতেই তার সম্ভাবনাময়, উজ্জ্বল ভবিষ্যতের উপর নির্ভর করে থাকে একটা গোটা সংসার, তারই অকালমৃত্যু রোধ করবার জন্য, তাকে সুস্থ ও সবল করে গড়ে তোলবার জন্য, তার মাতাকে আরও একটা উজ্জ্বল সম্ভাবনাকে জন্ম দেবার মত স্বাস্থ্যবতী করে তোলবার জন্য আমরা কোন চেষ্টাই করি না। আর শুধু তাই না, আমাদের অজ্ঞতা আমাদিগকে কুসংস্কারের গণ্ডীতে এমনভাবে আবদ্ধ করে রেখেছে যে তার মোহ ত্যাগ করে বেরিয়ে আসা অথচ এই 'লক্ষ্মণের গণ্ডী'কে অতিক্রম করে আসতে একমাত্র মায়েরাই পারেন।

একথা ভাবলে অত্যন্ত বিস্মিত হতে হয় যে—ভারতবর্ষ যখন শিক্ষা, দীক্ষা, শিল্প, কৃষি, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যে পৃথিবীর অন্যান্য সভ্য দেশের সঙ্গে তালে তালে পা ফেলে এগিয়ে যাবার সাধনায় মগ্ন, ঠিক তখনই আগামী কালের ইতিহাসে এই ভারতের জয়বিজয় বহন করবে যে ভবিষ্যতের নাগরিকেরা—তাদের অকালমৃত্যুর সংখ্যা ও তাদের গর্ভধারিণীদের মৃত্যু সংখ্যা অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক ও সেই সঙ্গে লজ্জাজনকও বটে। ১৯৪৪ সালে নিউজিল্যাণ্ডে যেখানে প্রতি হাজারটা শিশুর মধ্যে জন্মের এক বৎসরের মধ্যে মারা গেছে মাত্র ৩০টা শিশু, অষ্ট্রেলিয়ায় মারা গেছে ৩১টা শিশু, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে মারা গেছে ৪০টা ও সুইজারল্যাণ্ড, যুক্তসাম্রাজ্য ও ক্যানাডায় মারা গেছে যথাক্রমে ৪২, ৪৬ ও ৫৫টা শিশু, সেখানে ভারতবর্ষে মারা গেছে ১৬২টা। ১৯৪৫ সালে ঐ সংখ্যা কমিয়া যদিও ভারতবর্ষের শিশু মৃত্যুর হার দাঁড়িয়েছে হাজার করা ১৫১টী, তবুও অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে একথা স্বীকার করতে আমরা বাধ্য যে—এদিক দিয়ে আমরা এখনও বহু পেছনে পড়ে আছি। অবশ্য এতে ভয় পাবার কিছু নাই, মাত্র পঞ্চাশ বছর পূর্ব্বে ১৯০১ সালে যুক্তসাম্রাজ্যের শিশু মৃত্যুর হার ছিল হাজার করা ১৫১টা। শুধু মাত্র আন্তরিকতা, শিক্ষা ও ব্যাপক আন্দোলনের ফলে পঞ্চাশ বছরের মধ্যে ১৯৪৮ সালে ঐ সংখ্যা দাঁড়িয়েছে মাত্র চৌত্রিশে। এতে বিস্মিত হবারও কিছু নাই, আছে তাদের অভিজ্ঞতা হতে, তাদের শিক্ষা হতে কিছু শিক্ষালাভ করার সুযোগ। আর শুধু শিশু মৃত্যুই শেষ নয়, ভারতবর্ষের প্রসূতির মৃত্যু সংখ্যাও যথেষ্ট বেশী। যেখানে প্রতি হাজার প্রসূতির মধ্যে আমেরিকা যুক্তরাজ্যে মারা গেছে ২জন, যুক্তসাম্রাজ্যে মারা গেছে ৪জন, সেখানে ভারতবর্ষে মারা যায় ২০জন। আর এ দুর্ভাগ্য তো শুধু শিশু প্রসূতি বা তাদের পরিজনদের নয়, এ অপমৃত্যু যে সমগ্র জাতির—আর এর মূলে আছে কুসংস্কার ও অজ্ঞতা।

জন্মের সঙ্গে সঙ্গে অথবা এক বৎসরের মধ্যে শিশুর অকালমৃত্যু রোধ করার জন্য শুধু নয়, ব্যাধি, বিকার বৈকল্যগ্রস্ত শিশুকে সুস্থ করে তোলা, সুস্থ সবল শিশুকে আকস্মিক বিপদ, নানারূপ ব্যাধি, বিবিধ আপৎ হতে দূরে রাখার জন্য এদেশে এখনো অনেক শিক্ষার প্রয়োজন আছে। অত্যধিক স্নেহ অথবা একেবারে অযত্ন, দুটোই আমাদের দেশে দুর্লভ নয়। কারো ঘরে অত্যধিক আদর যত্ন, আর স্নেহের আতিশয্যে—যে শিশু গড়ে উঠে, তাকে আর যাই হোক, অনেক ক্ষেত্রে সহজ ও সরল ভাবে নেওয়া চলে না, তেমনি এখানে অনেক জায়গা

বাড়ী—বাইরের ব্যবহার শিশুর, আর তারই ফলে একান্ত অনাদর, অথচ ও অপরিসীম উদাসীতে ঐ সমস্ত শিশুরা গড়ে উঠে এক বিকৃত মনোভাব নিয়ে, উভয় ফলেরই প্রয়োজন আছে শিক্ষার।

মানসিক বিকারগ্রস্ত অথবা দৈহিক বিকল শিশু উভয়কেই বৈজ্ঞানিক প্রথার উপযুক্ত শিক্ষার সাহায্যে বর্ত্তমানে স্বাভাবিক মানুষকে সুস্থ সহজ ও সরল জীবনযাপনে অভ্যস্ত করান যায় ও তাদেরকে শিক্ষা দিয়ে তাদের স্বাবলম্বী করেও তোলা যায়। আমাদের দেশে মূকবধিরের সংখ্যা প্রায় ২লক্ষ, অথচ মাত্র ২৫টী বিদ্যালয়ে মাত্র ... মূকবধিরকে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থা যে নিতান্ত অব্যবস্থা, তা অন্যান্য দেশের হিসাব দেখলেই বোঝা যায়। আমেরিকায় মূকবধিরের সংখ্যা হচ্ছে—৯০ হাজার, সেখানে ২০৯টী বিদ্যালয়ে ২০ হাজার মূক ও বধিরকে শিক্ষা দেওয়া হয়। ইংলণ্ডে মূক বধিরের সংখ্যা হচ্ছে ৮০ হাজার—সেক্ষেত্রে ৬ হাজারকে শিক্ষা দেওয়া হয়—৬২টী বিদ্যালয়ে। কাজেই আমাদের দেশের হিসাব যে অত্যন্ত শোচনীয় সেকথা বলা বাহুল্য। সমগ্র ভারতবর্ষে অন্ধের সংখ্যা হচ্ছে ২০ লক্ষ, আর বাংলায় অন্ধের সংখ্যা হচ্ছে ৪০ হাজার। এ সংখ্যাগুলিও আতঙ্কজনক।

ইহা ছাড়া, শিশুমনের বিকাশ সাধের জন্যও উপযুক্ত পারিপার্শ্বিক এবং শিক্ষার প্রয়োজন আছে। সাধারণতঃ শতকরা ৭০জন শিশুর বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধি বাড়ে না নানা কারণে। আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা নানাভাবে শিশুদের পরীক্ষা করে নির্দ্দেশ দিতে পারেন যে ঐ শিশুর ভবিষ্যতে কি ভাবে আর্ত্তকে সাহায্য করতে পারবে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা পরীক্ষা করে বলে দিতে পারেন যে ঐ শিশু ভবিষ্যতে কি হবেন। শিশু যথাযথ পথে চালন করবার জন্য অনেকেই হয়তো ঐ ধরণের প্রয়োজন অনুভব করেছেন, কিন্তু শিশু-মনের ভাব কি ভাবে বা কোন বিষয়ে আকৃষ্ট হয়, সেদিকে লক্ষ্য রেখে শিশুকে শিক্ষা দিয়েছেন খুব কম লোকই। যে শিশু হয়তো ভবিষ্যতে হতে পারতো শ্রেষ্ঠ শিল্পী অথবা বৈজ্ঞানিক অথবা কারিগর, তাকে আমরা বাধ্য করি শিখতে কেরাণীগিরির বিদ্যা—হয় তার মনের গতি কোনদিকে বুঝতে পারি না বলে, আর না হয় শিশুর ভবিষ্যৎ চাইতে শিশুর উপার্জ্জিত অর্থ আমাদের কাছে অপরিহার্য্য বলে।

শিশু শিক্ষার দিকেও আমাদের যে খুব বেশী দৃষ্টি আছে- তা নয়। বয়স্ক শিক্ষার চাইতে অপশিক্ষার দিকেই ঝোঁক আমাদের বেশী। শিখে বা পড়ে জ্ঞান লাভ করার চাইতে মুখস্থ করে বা নকল করে পাশ করাই আমাদের কাছে বড় কথা। পূর্ব্বেই বলেছি—যে শিশু-মনের বিকাশের দিকে লক্ষ্য রেখে এদেশে শিক্ষা দেওয়ার পদ্ধতি নাই। আর নাই বলেই এদেশে ব্যবস্থা আছে একই সঙ্গে ইতিহাস, বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য, শিল্প, সাহিত্য ও গণিতে পারদর্শী করে তোলবার অপপ্রয়াস। 'মন্তেসরী শিক্ষাপদ্ধতি' তাই শিশুশিক্ষার জগতে এনেছে এক নতুন আলোক। 'কিণ্ডারগার্টেন' বা বুনিয়াদি শিক্ষাপদ্ধতিও শিশু মনের বিকাশের দিকে লক্ষ্য রেখেই গঠিত হয়েছে। ঐ সম্বন্ধেও চাই ব্যাপক প্রচার, আর সেই সঙ্গে বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিশুশিক্ষার প্রবর্ত্তন।

উপরোক্ত তথ্যগুলিই নানাভাবে ছবি ও লেখার মধ্য দিয়ে, মডেলের মধ্য দিয়ে প্রদর্শিত হয়েছে শিশুমঙ্গল প্রদর্শনীতে। মাতৃমঙ্গল ও শিশু-পালনের বিস্তৃত অনুষ্ঠান প্রদর্শন সম্বন্ধে রেডক্রস সোসাইটী, মন্তেসরী পদ্ধতিতে শিশু শিক্ষাদান সম্বন্ধে বালিকা বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ, শিশুমনের বিকাশ হচ্ছে কোন পথে বা কি ভাবে ঐ শিশুকে ভবিষ্যতে চালনা করলে সে তার সত্যকার পথ পাবে সে বিষয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের মনোবিজ্ঞান বিভাগ নানা পথ প্রদর্শন করেছিলেন। ইংলণ্ড ও আমেরিকার প্রচার বিভাগ শিশু-পালন ও শিক্ষা সম্বন্ধে অনেক প্রচার পত্র দিয়ে প্রদর্শনীর মাধুর্য্য অনেকখানি বাড়িয়ে দিয়েছিলেন তাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তারি পাশে আমাদের দেশের প্রচার বিভাগের প্রাচীর পত্রগুলি শুধু মাত্র বার বার স্মরণ করিয়ে দিয়েছে তাদের ব্যর্থতা, অবশ্য সে ব্যর্থতা শিক্ষার দিক দিয়ে নয়,—মাধুর্য্যের দিক দিয়ে। ইহা ছাড়া প্রতিদিন সন্ধ্যায় বহু বক্তা ও বিশেষজ্ঞ মাতৃমঙ্গল ও শিশু মঙ্গল সম্বন্ধে বিভিন্নভাবে বক্তৃতা দিয়ে প্রদর্শনীর আকর্ষণ আরো বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। তবে একটা কথা শুনে বিস্মিত না হয়ে পারলাম না—ব্রিটিশ প্রচার বিভাগ শিশু-পালন ও শিক্ষা সম্বন্ধীয় যে সমস্ত ফিল্ম সাধারণকে দেখাইবার জন্য ব্যবস্থা করেছিলেন, সেগুলি নাকি কেবল স্থানাভাববশতঃ প্রদর্শিত হয় নি। মনে হয় কর্পোরেশন কর্ত্তৃপক্ষ ইচ্ছা করিলে ঐ ফিল্মগুলি বিভিন্ন চিত্রগৃহে অবসর সময়ে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করতে পারতেন অনায়াসে। তাতে তাঁদের এই প্রদর্শনীর মূল উদ্দেশ্য আরো ব্যক্ত হতো এবং সেই সঙ্গে দেশবাসী হতো উপকৃত, যথার্থ পথের সন্ধান পেতো। এখনো সেগুলি প্রদর্শন করা যেতে পারে। কারণ মাত্র কয়দিনের প্রদর্শনী, কয়েকটা বক্তৃতা আর কয়েকটা ছবিও দেখা আমাদের দীর্ঘ দিনের সঞ্চিত কুসংস্কারের গণ্ডীকে ভাঙ্গবার পক্ষে মোটেই যথেষ্ট নয়। এর প্রয়োজন বার বার বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন স্থানে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা। কলিকাতা কর্পোরেশনের যে সুযোগ ও সুবিধা আছে, আমাদের দেশের স্বাস্থ্যবিভাগগুলিও পল্লীগ্রামে এই প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করতে পারেন অনায়াসে। এতে একদিকে যেমন জনসাধারণের সঙ্গে সরকার অথবা কর্পোরেশনের কর্ত্তৃপক্ষের মধ্যে মনের যোগাযোগ আসবে, তেমনি অন্যদিকে শিশুপালন, শিশুশিক্ষা, মাতৃমঙ্গল ও ঐ সম্পর্কীয় অন্যান্য অবশ্য জ্ঞাতব্য ও করণীয় বিষয়ের সন্ধান ও সুযোগ দিয়ে দেশবাসীকে করা হবে উপকৃত ও সেই সঙ্গে সাহায্য করা হবে জাতি গঠনের অন্যতম উপকরণ শিশুমনের বিকাশের সহায়তা করা।

বেলওয়ার তাম্রশাসনের দেশে

শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত বি-এসসি

[দ্বিতীয় প্রস্তাব]

দ্বিতীয় প্রস্তাবের উপজীব্য—

ভারতবর্ষের ফাল্গুন (১৩৫৫) সংখ্যায় প্রকাশিত প্রথম প্রস্তাবে পাঠক-পাঠিকাদিগকে বেলওয়ার তাম্রশাসনের দেশে লইয়া গিয়াছিলাম। সেখানকার কতক বিবরণ ঐ প্রবন্ধে দিয়াছি। বর্তমান প্রবন্ধে ঐ অঞ্চলের আরও প্রাচীন চিহ্নের বিবরণ প্রদান করিব এবং তাহার সহিত ঐতিহাসিক ঘটনার সম্পর্ক বিচারের চেষ্টা করিব এবং সেই সঙ্গে বেলওয়ার মহীপাল লিপির দত্ত ২৯ পংক্তি—"সন্নকৈবর্ত্তবৃত্তি। পুণ্ড্রিকা মণ্ডলান্তঃপাতি···।"র পুণ্ড্রিকামণ্ডলটির অবস্থান নির্দ্দেশের প্রয়াস করিব। বরেন্দ্রভূমিতে কৈবর্ত্তবিদ্রোহের সঙ্গে এই মণ্ডলের বিশেষ সম্পর্ক আছে বলিয়া আমাদের ধারণা। এই ধারণার কারণও বিশদ করার চেষ্টা করিব।

আরও ঐতিহাসিক চিহ্ন—

(১) বেলওয়ার পার্শ্বে রঘুনাথপুর, তাহার পার্শ্বে বলগাড়ী গ্রাম। এই বলগাড়ী গ্রামের মধ্য দিয়াই কাণা নদী বা মহল নদী প্রবাহিত। "এই রঘুনাথপুরে প্রায় ২০০ বিঘা জমির চতুর্দ্দিকে উচু পাহাড়ের মত আছে। গ্রামবাসী একব্যক্তি ঐ স্থানে জঙ্গলে একটি স্থান সন্দেহ করিয়া রাত্রিতে খুঁড়িয়া ইটের গাথনীযুক্ত স্থান দেখিতে পায় এবং পরে সাপ দেখিয়া পলাইয়া আসে।" [শ্রীবছির সরকার প্রদত্ত সংবাদ]

(২) বেলওয়ার নয়ান দীঘিতে (এই গ্রামে বহুসংখ্যক দীঘি বিদ্যমান) ৩০ বৎসর আগে এক বিরাট্ দেবীমূর্ত্তি সাঁওতালেরা পাইয়াছিল। তাহা এখন ঘোড়াঘাটে এক গৃহে পূজিত হয়। বামন দীঘিতে মস্ত মস্ত শঙ্খ, ঘণ্টা, রেকাবী, পঞ্চপ্রদীপ ইত্যাদি পূজার জিনিষ পাওয়া গিয়াছিল। (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ৩, ৪ সংখ্যা ৪৪ পৃষ্ঠা, ১৩৫৪)

(৩) প্রথম প্রস্তাবে যে বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে তাহাতে দেখা যাইবে যে ভীমের জাঙ্গালের বাহেবাটি জাঙ্গাল যেন এই বেলওয়া অঞ্চলে আসিয়া মিলিত হইয়াছে (এই লেখকের 'Belwa where the ramparts of Bhim Converge,' Modern Review : December, 1947 দ্রষ্টব্য)। এই বিষয় Some Historical Aspects of Inscriptions of Bengal (Dr. Benoy Chandra Sen) Page 135, এ আছে—The old rampart called Bhimer Jangal, which still extends alongside of the western Bank of the Karatoya, points to the area which received the special attention of Bhima, the leader of the revolt. —অর্থাৎ 'করতোয়া নদীর পশ্চিম তীর দিয়া ভীমের জাঙ্গালের চিহ্ন এখনও বর্ত্তমান আছে—বিদ্রোহের নেতা ভীমের যে এই অঞ্চল সম্বন্ধে বিশেষ দৃষ্টি ছিল, ইহা সূচিত হইতেছে।'

(৪) বেলওয়ার সন্নিকটে বহু গ্রামের নামের অন্তে গাড়ী পাওয়া যায়। যথা—পুণ্ড্রাগাড়ী, বলগাড়ী, কেশরী-গাড়ী ইত্যাদি। আমরা এইরূপ ২২টি গ্রামের নাম সংগ্রহ করিয়াছি। গ্রামের নাম, বেলওয়া হইতে ঐ গ্রামের দূরত্ব ইত্যাদি প্রদর্শন করিয়া একটি নক্সা অঙ্কন করিয়া এতদসহ প্রদত্ত হইল। আমাদের ধারণা এই যে এই সব 'গাড়ী' গড় নাম হইতে সৃষ্ট—অর্থাৎ এই সব 'গাড়ী' বা গড় একটি মণ্ডলা (circle)ন্তর্গত ছিল।

(৫) আমাদের নিকট 1840-75 মধ্যকালে রচিত সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার ম্যাপ আছে। তাহাতে ঘোড়াঘাটের সঙ্গে তাহার নাম দেওয়া আছে 'চৌধণ্ডী' এবং দিনাজপুর জেলা গেজেটিয়ারে আছে—'কাটাদুয়ারের রাজা নিলাম্বরের অরণ্য বেষ্টিত দুর্গ ছিল—ইসমাইল গাজী নামক পুণ্যাত্মাকে যুদ্ধে নিযুক্ত করিয়া গৌড়ের রাজা নজরৎখান ইহা এবং এই অঞ্চল দখল করেন। ইহারা পার্শ্ববর্ত্তী জঙ্গল পরিষ্কার করেন, ঘোড়াঘাট একটি সহরে পরিণত হয়। (১৩৫ পৃঃ)

জাতীয় প্রবাদ এই যে ঘোড়াঘাট ··· পরিচিত ···

বিরাটের জেলা নামক স্থানে বিরাট রাজার প্রাসাদের অবশেষ আছে (এই লেখক এইটি দেখিয়াছেন) ইনি যুধিষ্ঠিরকে ভারত-যুদ্ধে সাহায্য করিয়াছিলেন এবং ঘোড়াঘাটে ইহার ঘোড়াশাল ছিল বলিয়াই উহার নাম ঘোড়াঘাট হইয়াছে। (১৮ পৃঃ)

(৬) ঘোড়াঘাটের সন্নিকটে, দক্ষিণে করতোয়ার তীরে সাহেবগঞ্জ নামক একটি বিস্তীর্ণ জঙ্গলাকীর্ণ স্থান আছে! উহাতে প্রাচীন বসতির ইষ্টকও প্রস্তরময় ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। এবং তাহারই কিয়দ্দূরে 'পালরাজ' বলিয়া আর একটি প্রাচীন চিহ্নযুক্ত বিরাট জঙ্গল স্থানীয় লোকেরা দেখাইয়া থাকে। (শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ দাস প্রদত্ত সংবাদ)

(৭) 'সন্ন কৈবর্ত্তবৃত্তি'—এই কথাটির অর্থ 'কৈবর্ত্তদের যে বৃত্তি প্রদত্ত ছিল তাহার নিকটবর্ত্তী।' কৈবর্ত্তদের এই বৃত্তি কে দিয়াছিল, কি কারণে দিয়াছিল? রামচরিতে আছে (১,৩৮) যে এই কৈবর্ত্তেরা রাজসরকারে পূর্ব্বে সৈনিকের বৃত্তি ধারণ করিত। এই জন্যই অঞ্চলটি (নিশ্চিতই তাহার সীমা নির্দ্দিষ্ট ছিল) দেশের রাজা কর্ত্তৃক কৈবর্ত্তদিগকে বৃত্তি প্রদত্ত ছিল। ইহাদের নেতা বা প্রধান ব্যক্তি এই অঞ্চলে আধিপত্য করিতেন এবং যুদ্ধকালে সৈন্য লইয়া যাইয়া রাজাকে সাহায্য করিতেন। সেকালে যখন রাজায় রাজায় যুদ্ধ হইত, রাজা ও রাজ্যব্যাপারের সংস্পর্শ বিশেষ থাকিত না। যাহারা প্রধান ব্যক্তি হইতেন তাহারা বিজেতা রাজাকে মানিয়া লইলে স্ব অঞ্চলে স্বাধীনভাবে আধিপত্য করিতে পারিতেন। আলোচ্য "সন্ন কৈবর্ত্তবৃত্তি। পুণ্ড্রিকামণ্ডল…" এইরূপ প্রদত্ত একটি জায়গার এবং গাড়ী অন্ত যে ২২টী গ্রামের

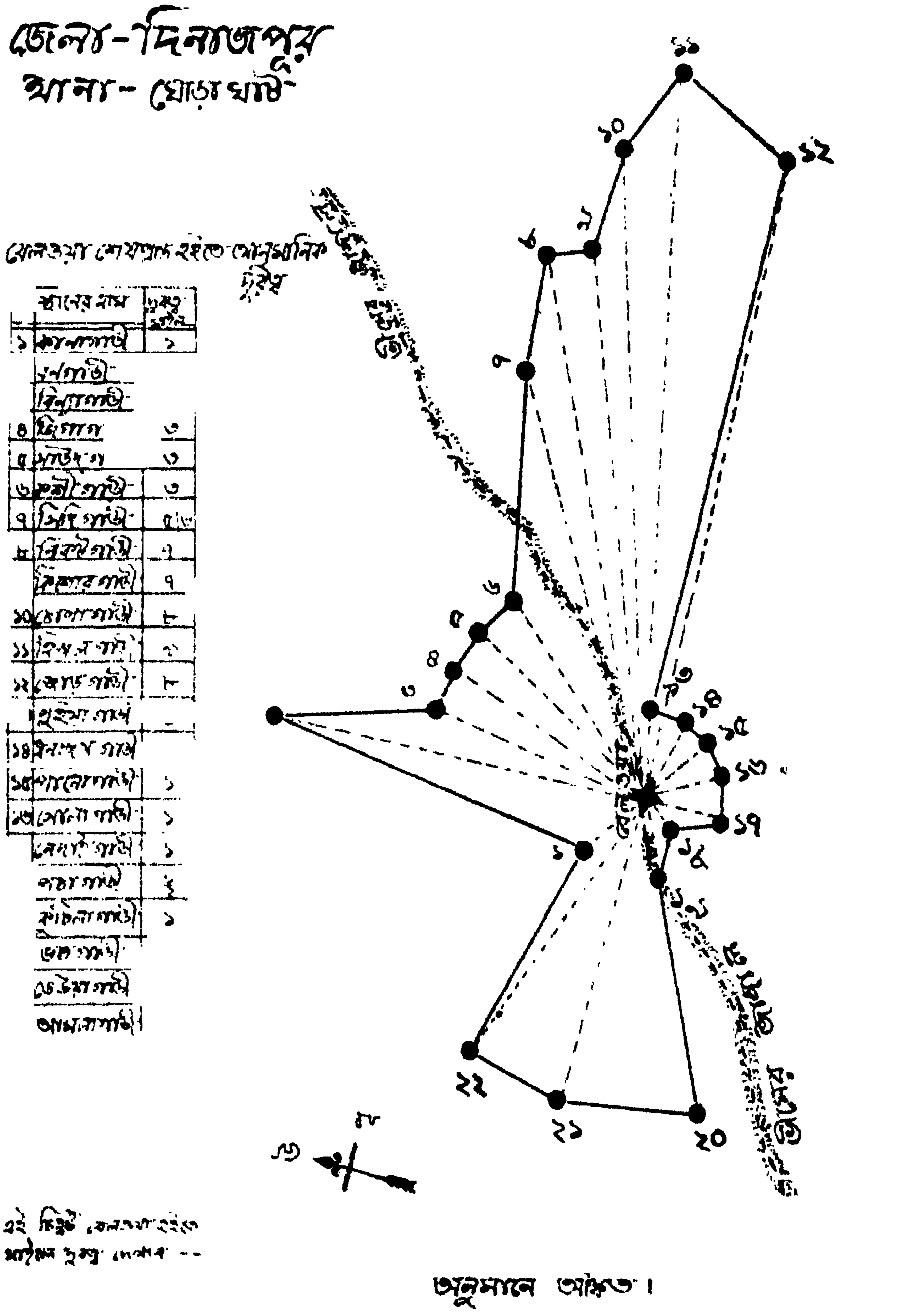

ছবি এখানে প্রদত্ত হইয়াছে তাহার 'পুণ্ড্র' হইল পুণ্ড্রিকা এবং সব 'গাড়ী'গুলি লইয়াই এই মণ্ডল।

নানাস্থানে হইয়াছে (যে সকল স্থানে বিজিত রাজার প্রতিষ্ঠা ছিল সে সকল স্থানে এই বিজয়ী রাজার বিজয়স্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করাই তো স্বাভাবিক) কৈবর্তরাজ ভীম তাহাদের (সম্ভবত ইহাই কৈবর্তনেতা দিব্বোকের আদি স্থান ছিল) নিজের আদি এলাকাকে বিস্তৃত হইতে পারেন নাই—বরং অধিকতর বিশিষ্টতা দান আবশ্যক বলিয়া বোধ করিয়াছিলেন। তাই তাহার জাঙ্গাল এদিকে চলিয়া আসিয়াছে। এবং একটি ছোট জমিদারীর অধিষ্ঠানে যেমন সেকালে গড়, পরিখা, মন্দির, দীঘি, নদী ইত্যাদি থাকিত তেমনি সবারই চিহ্ন এই অঞ্চলে সবই রহিয়াছে।

পৌণ্ড্র—পুণ্ড—পুণ্ডরিকা—তাহার মণ্ডল। সুতরাং ইহাই পৌণ্ড্র (এ দেশের আদিবাসী)দের দেশ? [পুণ্ড হইতে পদ্মও সূচিত হয়]

কৈবর্তদের আদি ও বসতি—এই প্রসঙ্গে কিছু আলোচনা হওয়া এখানে সঙ্গত বলিয়া বোধ হইতেছে।

(ক) কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সমকালে এই দেশে অনার্য্য নরপতি রাজত্ব করিতেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন এবং আপনাকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া বিষ্ণুর চিহ্নসকল ধারণ করিয়াছিলেন। এই অনার্য্য নরপতি পৌণ্ড্রক বাসুদেব নামে খ্যাত হন। (রামপ্রাণ গুপ্ত প্রণীত 'প্রাচীন রাজমালা' ৪০৭ পৃঃ)

(খ) ঐ বাসুদেব বঙ্গ, পুণ্ড্র ও কিরাতের রাজা। ইহাকে ভীম পরাস্ত করেন।

(গ) পুণ্ড্রদেশের উত্তরে কিরাত নামক পার্বত্য জাতির আবাস, পূর্ব-দক্ষিণে বঙ্গদেশ, পশ্চিমে অঙ্গ, কৌশিকী ও জলাদেশ এবং পশ্চিম-দক্ষিণে সুহ্ম ও তাম্রলিপ্তি।

(ঘ) বৌধায়ন সূত্র আলোচনা করিয়া রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় নির্দেশ করিয়াছেন, যে বঙ্গদেশের অনার্যগণ খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দীতে সম্পূর্ণ পরাভূত হন এবং আর্যগণ বঙ্গদেশে উপনিবেশ স্থাপন সমাপ্ত করেন। এই উপনিবেশ স্থাপন-কালে বঙ্গদেশ চারিচক্রে বিভক্ত ছিল। (১) মহানন্দা ও করতোয়ার মধ্যবর্তী স্থান। (২) রূপনারায়ণ নদের উত্তর

মহানন্দা ও করতোয়ার মধ্যবর্তী ভূভাগের আদিম অধিবাসীরা হইল পুণ্ড্র, চাণ্ডাল, পোদ ও কৈবর্ত। কোচ, মেচ ও লেপচা প্রভৃতি পার্বত্য জাতির (ইহারাই কিরাত?—লেখক) তাণ্ডবে এই চক্র বিধ্বস্ত হইত। একালে পুণ্ড্র জাতির অনেকে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। এখন পুণ্ড্র = পুঁড়ো জাতি দেখিতে পাওয়া যায় (উমেশচন্দ্র বটব্যাল)।

(চ) দিনাজপুর জেলার অধিবাসীদের বিষয় গেজেটিয়ার (১৯১২) হইতে অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করিতেছি—

এই জেলায় ৮,২৪,৩৪৫ জন মুসলমান ও ৭,৫৯,৩০৯ জন হিন্দু—মুসলমানরা অধিকাংশই রাজবংশীদের হইতে ধর্মান্তরিত…। চাষী মুসলমানদের নামের অন্তে পদবী সাধারণত থাকে 'সেক'…কিন্তু এ অঞ্চলে অধিকাংশের পদবী 'নস্য'—অর্থাৎ যাহার জাতি মারা গিয়াছে। তবু কালে কালে অনেক 'নস্য' সম্মান বৃদ্ধি ও কলঙ্কঢাকার জন্য শেখ উপাধী নিয়াছে।…ইদানিং পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে অভিযানে কিছু মোড় ঘুরিয়াছে, কিন্তু সেদিনেও এই মুসলমানেরা হিন্দুর দুর্গাপূজা ইত্যাদিতে যোগ দিত এবং এখনও বিবাহ ইত্যাদি ব্যাপারে ব্রাহ্মণ দিয়া পঞ্জিকা দেখায়। (৩৬, ৩৭ পৃঃ)। উল্লিখিত ৭,৫৯,৩০৯ জন হিন্দুর মধ্যে আবার ৪,৪২,৯৯০ জন রাজবংশীর বংশধর। …ইহারা ব্রাত্যক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিতে ইচ্ছা করে।… ইহারা তিয়রদের ন্যায় আদিম অধিবাসী বলিয়া বোধ হয়। (৩৪, ৩৫ পৃঃ)। এই জেলায় চাষী কৈবর্তের সংখ্যা ৩৩,০০০। কৈবর্তেরা আর্য রক্ত পাইয়াছিল বলিয়া শ্লাঘা করে। (পৃঃ ৪০)।

পুণ্ড্র হইতে পুঁড়ো হইয়াছে। পুঁড়ো হইতে কি দিনাজপুরের পলিয়া হইয়াছে? অন্তত এই জেলায় এই বহুসংখ্যক হিন্দু যে আদিম অধিবাসীদের হইতে উদ্ভূত এবং ইহাদের সঙ্গে যে উত্তরাঞ্চলের পার্বত্য জাতির (কিরাত?) কিছু সংমিশ্রণ আছে তাহা ধরিয়া লওয়া যায়। (দীনেশ সেনের বৃহৎবঙ্গ, পৃঃ ২৬১)।

উপরে বর্ণিত বিবরণের আরও সমর্থন পাওয়া যাইবে—

(১) ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ৭ম অধ্যায়, ১৮

(৪) সুরেন্দ্র মজুমদার শাস্ত্রী সম্পাদিত কানিংহামের Ancient Geography of India, p. 723 & 724

(৫) সাহিত্য ১৩০৯

(৬) বিভা পত্রিকায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ১২৯৫

নির্দ্ধারণ—এই বেলওয়ার মহীপালের তাম্রশাসনের দত্তভূমির দেশ যে এক কৈবর্ত্তদের দেশ তাহা এই প্রস্তাবে আমরা এইভাবে বলিয়া রাখিলাম। ইহারই সাহায্যে তৃতীয় প্রস্তাবে টলেমীর Pentapolis (পেণ্টাপোলিস) যে পঞ্চনগরী (বিষয়: যাহার অন্তর্গত মহীপালের লেখ লিপির দানের কিয়দংশ) তাহাই প্রতিপাদন করি। এই পঞ্চনগরীর কেন্দ্রস্থল যে বর্ত্তমানকালের রে ষ্টেশন পাচবিবির সন্নিহিত 'পাথুরেঘাটা' নামক স্থান তাহা উপস্থিত করিব। বাকী রহিবে এই শাসনোক্ত কাশি বীথির অবস্থান নির্ণয়। আমরা অনুসন্ধান করিতেছি ইহাও তৃতীয় স্তবকে নির্দ্ধারণ করার আশা করিতেছি কিন্তু জয়স্কন্ধাবার সাহসগণ্ড কোথায়?

ক্রন্দন

শ্রীলতিকা ঘোষ ডি-লিট্ (অক্সন)

শুনিতে এই ক্রন্দন কি তোমরা শুনিতে পাইতেছ না? গ্রহমণ্ডলী হইতে গ্রহমণ্ডলীতে, পৃথিবী হইতে আকাশে, আকাশ হইতে পৃথিবীতে সে ক্রন্দন ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হইতেছে। কে কাঁদিতেছে, কেন কাঁদিতেছে? দেখ সুনীল আকাশ সূর্য্যের আলোকে হাসিতেছে।

চাঁদিমাতে পৃথিবী উজ্জ্বল। তবু আমি সেই ক্রন্দন শুনিতেছি, ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কে যেন কাঁদিতেছে। রূপকথার এক রাজকুমারীকে কোন রাক্ষস যেন অন্ধ গুহাকূপে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, আর সে কাঁদিতেছে। দেহহীন প্রেতাত্মা যেন তাহার দেহ খুঁজিতেছে, আর গোলাপ-ভূষিত গোরস্থানে আপন কবরের পার্শ্বে ক্রন্দন করিতেছে। আহা কি নৈরাশ্যপূর্ণ, কি করুণ সে ক্রন্দন!

আবার ঐ ক্রন্দন আমারই মধ্যে ধ্বনিত হইতেছে। আমার দেহের প্রতি অণুপরমাণু তাহাতে ভরিয়া উঠিয়াছে। আমার শিরায় শিরায় তাহার মর্ম্মান্তিক অশ্রুনীর বাহিত হইতেছে। আমার হৃদয় কাঁপিতেছে। আমার মন তাহার বাষ্পপূর্ণ কুহেলিকায় অন্ধ দিশাহারা—আমার চেতনা তাহাতে অন্ধ উপঃস্থিত।

বাণীহীন মূক এই ক্রন্দন কি থামিবে না? জন্ম জন্ম কি তাহা শুনিব? মানব-মনের বৈরাগ্য কি সে সদা মূর্ত্ত থাকিবে। যুগে যুগে কি সে মানব-চেতনাকে ত্যাগের পথে লইয়া যাইবে? এই ক্রন্দন শুনিয়া রাজা তাঁহার রাজাসন ছাড়িয়া ভিক্ষাপাত্র হস্তে পথে নামিয়া আসিয়াছেন। এই ক্রন্দন শুনিয়া পৃথিবীর অতি-মানব অন্নহীন, তৃণহীন কন্টকারণ্যে উপবাসী থাকিয়া পবিত্র চিত্তে অসত্যের সহিত সংগ্রাম করিয়া, সর্ব্বশেষে মানব মনের হিংসা-দ্বেষ রচিত কণ্টক মুকুট মাথায় পরিধান করিয়া মানব আত্মার উদ্ধারের জন্য আত্মবলি দিয়াছেন। ক্রন্দন শুনিয়া প্রেমাশ্রু বিগলিত নয়নে গৌরবাসী চিত্ত হরণকারী স সন্ন্যাসী গৃহহীন হইয়া পরম প্রেমিকের তপস্যা করিয়াছেন। কি সে ক্রন্দন তো আজিও থামিয়া যায় নাই। আজিও সে আকাশ বাতাসে দেহহীন গৃহহীন চিরবিরহীর বিরহের ন্যায় ক্রন্দন করি বেড়াইতেছে।

কাহার এ ক্রন্দন? কোথা হইতে আসিতেছে?

ঐ দেখ সৃষ্টির অমিয়-ধারা বাহিয়া যে আলোক-রশ্মি নামি আসিয়া, মানব-মনে বিখণ্ডিত হইয়া, প্রাণের কামনা জালে আ থাকিয়া পৃথিবী বক্ষে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিল, সে আজ আত্ম তীর্থযাত্রী আত্মার আহ্বানে সংজ্ঞালাভ করিয়াছে। সংজ্ঞালাভ ক সে আজ ক্রন্দন করিতেছে, সুকঠিন বিরহ জ্বালায় ক্রন্দন করিতে সেই পরম সূর্য্য-লোকে ফিরিয়া যাইবার জন্য। যুগে যুগে কত কত সম্প্রদায় ভগবৎ-শক্তিযুক্ত আত্মা তাহার উদ্ধার প্রয়াসী হইয়াছে। বি বিফল সে প্রয়াস। পরম ঐন্দ্রজালিকের ইন্দ্রজাল অন্ত না হই তাহার উদ্ধার কোথায়? পরম-প্রেমিকের মিলন-লীলা সমাপ্ত ন হইবে, কে বলিবে? পরম শিব সতী-দেহ স্কন্ধে লইয়া তাঁহার প্র তাণ্ডব নৃত্যে অশিবকে ধ্বংস করিয়া সৃষ্টিকে শিবময় করে কর তাহা কে জানে? সেই দিনই বন্দিনী বিরহিণীর ক্রন্দন থামি সেই দিনই সৃষ্টি তাহার আনন্দময় চিৎ-সত্তায় ফিরিয়া যাইবে।

[illegible]

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

(পূর্বানুবৃত্তি)

…া সত্যিই নেই।

পরের দিন যখন ধনেশ্বর জেলখানায় এসে আবার তাকে ডেকে …ালো, তখন সে শিউরে উঠল তার মুখের চেহারা দেখে। আশ্চর্য, …দিনেই কেমন যেন বদলে গেছে ধনেশ্বর। হঠাৎ যেন কেমন বুড়ো …য় গেছে, চোখের কোণে কালির পোচড়া পড়েছে, কুঞ্চন লেগেছে …মের চামড়ায়। অসম্ভব ক্লান্ত লাগছে ধনেশ্বরকে, মনে হচ্ছে …ন অসুস্থ।

দুজন সশস্ত্র রক্ষী সঙ্গে এসেছিল। ধনেশ্বর বললে, বাইরে …াও তোমরা।

সেলাম করে তারা ঘরের বাইরে চলে গেল।

—বোসো রঞ্জন—একটা চেয়ার দেখিয়ে দিলে ধনেশ্বর।

—বসব ?—রঞ্জু আশ্চর্য হয়ে গেল।

—হ্যাঁ—বোসো।—অন্যমনস্কভাবে ধনেশ্বর জবাব দিলে।

রঞ্জু বসল না। চাপাঠোঁটে উদ্ধত ভঙ্গিতে বললে, কেন মিথ্যে …শীড়ি করছেন ? স্টেটমেন্ট আমি দেবনা।

—দরকার নেই—তেমনি অন্যমনস্ক স্বরে ধনেশ্বর বললে, বোসো, …া আছে।

কথার ভঙ্গিটা এত নতুন রকমের ঠেকল যে বিস্ময়ের সীমা রইল …। এও কি একটা নতুন কায়দা, স্বীকারোক্তি সংগ্রহ করবার …নব পদ্ধতি কোনো ? কিন্তু তা সত্ত্বেও সে বসল—প্রতীক্ষা …তে লাগল।

হঠাৎ ধনেশ্বর হাসল। অত্যন্ত করুণ, অত্যন্ত বিষণ্ণ হাসি। ম্লান- …র বললে, হয় না—হবার নয়।

—কী হবার নয় ?—ঝোঁকের মাথায় এগিয়ে আসা প্রশ্নের বেগটা …সামলাতে পারল না।

—কিছুই হয় না—ধনেশ্বরের হাসিটা যেন কান্নায় রূপ পেল এবার। …েকে একটা হলদে রঙের লেফাফা বাড়িয়ে দিলে সে রঞ্জুর …। বললে, পড়ো।

রঞ্জুর বুক ছাঁৎ করে উঠল : পরিমলের স্বীকারোক্তি ?

—না, পড়ো।

…বিহ্বলতরে ধনেশ্বরের দিকে তাকিয়ে রঞ্জু খামটা তুলে …

আবছা গলায় ধনেশ্বর বললে, পড়তেই তো দিলাম !

টেলিগ্রামটা খুলল রঞ্জু। সংক্ষিপ্ত কয়েকটি শব্দ : "Ajit died of explosion while making bombs, come sharp—Dhiren"

—এর মানে ?—সন্দেহে ভ্রুকুঞ্চিত করে রঞ্জু বললে, আমাকে এ টেলিগ্রাম দেখাবার অর্থ কী ? কোনো অজিতকে তো আমি চিনিনে।

—না, তুমি চিনবে না। তেমনি কান্নাভরা বিচিত্র হাসি হাসল ধনেশ্বর : আমার ভাগ্নে। নিজের ছেলের চাইতেও বেশি ভালোবাসতাম !

রঞ্জু প্রায় আর্তনাদ করে উঠল।

নিষ্প্রাণ ধরা গলায় ধনেশ্বর বললে, কে জানত, অজিতকে পর্যন্ত আমি ঠেকাতে পারব না ? কিছুই হয় না—কিছুই করবার জো নেই। জানো, অজিতকে আমি নিজের হাতে মানুষ করতে চেয়েছিলাম ! ধনেশ্বরের কথার শেষ দিকটা থর থর করে কেঁপে উঠল। স্তব্ধ হয়ে বসে রইল রঞ্জু।

—তোমার দোষ নেই, কারুর দোষ নেই। যে দিন এসেছে, এমনিই হবে। কেউ কিছু করতে পারবে না, কেউ ঠেকাতে পারবে না। —হঠাৎ ধনেশ্বর বললে, আচ্ছা, তুমি যাও—আর তোমাকে দরকার নেই।

পুলিশ দুটো এগিয়ে এল, এসকর্ট করে নিয়ে চলল তাকে জেলের দিকে। যেতে যেতে পেছন ফিরে রঞ্জু দেখল—টেবিলের ওপর দুহাতে মুখ গুঁজে পড়ে আছে ধনেশ্বর।

হায় রাম, বাঁচায় যে—যারা ফাঁসি দেয়, আজ এ কান্না তাদেরও।

আট বছর। আট বছর পরে রঞ্জন চট্টোপাধ্যায় তার দৃষ্টিকে ফিরিয়ে আনে বর্তমানের মধ্যে।

অনেকখানি সরে গেছে পদ্মা—এখান থেকে তার মূল ধারাটা অনেক দূরে। তিমির পেটের মতো ধবধবে শাদা আর উজ্জ্বল বালুচর ছড়িয়ে আছে অনেক দূর পর্যন্ত—নৌকার পাল আর স্টিমারের কালো কালো চোঙা বয়ে আনে নদীর সংকেত। এদিকটাতে এলোমেলো ভাবে দুলছে বন ঝাউ, টুকরো টুকরো ভাবে সবুজ হয়ে আছে ফুটি আর তরমুজের ক্ষেত। বাংলাদেশের বড় একখানা মানচিত্রে গঙ্গার বদ্বীপের মতো বালুচরের ভেতর দিয়ে এসে পড়েছে এলোমেলো জলরেখা। জলের … নাচে হাঁটু অবধি ডুবিয়ে প্রতীক্ষা করে আছে … ছোট শাদা জাতের বক—চোখে সন্ধানী দৃষ্টি, মাছের নিশানা পেলেই …

তক্তপোষের মেঝে আসবাব, ভাঙা চেয়ার, আর নেংটি ইঁদুরের আস্তানা। আলমারির জীর্ণ মলাটের পাণ্ডুলিপির বাক্সগুলো রয়েছে স্তুপাকার হয়ে।

হাতে যখন কোনো কাজ থাকে না, আর পড়তে পড়তে মাথা যখন ঝিম ঝিম করে ওঠে, তখন বই বন্ধ করে সে শূন্য দৃষ্টি মেলে তাকায় সম্মুখের দিকে। পদ্মার চরে দিনান্ত। বাঁ দিকে অনেক দূরে একটা পুরোনো মঠের চূড়ো কালো হয়ে আসছে রাত্রির রঙে। তার পেছনে সুপুরীর বন ক্রমেই একাকার আর অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে, ভাঙা পাড়ের গায়ে কোলাহল তুলেছে ঘরমুখো গাং শালিক। একটির পর একটি বক পদ্মার চর ছেড়ে উঠছে আকাশে, তীক্ষ্ণ কর্কশ চীৎকার করে ডানা মেলে দিচ্ছে ম্লানায়মান দিগন্তের দিকে।

উঁচু মঠটার নীরব নিঃসঙ্গ গম্ভীরতার দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে থাকে রঞ্জন। সেই পুরোনো গল্প। কোন্ ধনগর্বিত সন্তান নাকি মায়ের চিতায় মঠ তুলে দিয়ে দম্ভ করেছিল : মাতৃঋণ শোধ করলাম। এতবড় স্পর্ধা ক্ষমা করেন নি আকাশের দেবতারা—মঠের চূড়ো কথার সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে পড়ল মাটিতে। মাতৃঋণ শোধ হয় না—কেউ শোধ করতে পারেনি কোনোদিন।

ওটার দিকে তাকিয়ে কেমন অদ্ভুত লাগে। ঘনিয়ে-আসা অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে কাহিনীটাও যেন ওর চারদিকে ঘুরে ঘুরে পাক খায়—হঠাৎ ছুটে আসা একটা দমকা বাতাসে যেন কোনো অশরীরী প্রেত শ্বাস ফেলে চলে যায়।

চাকর এসে আলো রেখেছে ডেক চেয়ারের হাতলে, রেখেছে খবরের কাগজ আর একখানা খাম। হলদে রঙের লেফাফা—মিতার চিঠি। ওই কোনাকুনি করে ঠিকানা লেখবার একটা বিশিষ্ট ভঙ্গি—এটা একান্তই মিতার নিজস্ব ধরণ।

—ডাক এল বুঝি?

—হাঁ বাবু, এই এল।

অতি যত্নে খামের কোনা ছিঁড়ে সে বার করলে চিঠিটা :

"কাল রাত্রে ঝোড়ো হাওয়া দিচ্ছিল। মনে হচ্ছিল দরজার কড়া নড়ছে, তুমি বুঝি এলে। আমি তখন কতগুলো জরুরি চিঠি নিয়ে ব্যস্ত, শব্দটা শুনে চমকে উঠলাম। যদিও জানি সবটাই মনের ভুল, তবু উঠে গিয়ে দরজাটা খুললাম। একরাশ বৃষ্টির ছাট এসে চোখেমুখে পড়ল, বিদ্যুৎ চমকে উঠল—হঠাৎ মনে পড়ে গেল অনেকদিন আগেকার এমনি একটা ঝোড়ো সন্ধ্যার কথা। হয়তো তোমার মনে নেই—কিন্তু সেদিনটাকে আমি কখনো ভুলতে পারব না।

বাস্তবিক তোমাকে না হলে যেন চলছে না। মাঝে মাঝে এক একটা এমন সমস্যায় পড়ি। ভাবি, তুমি পাশে থাকলে সব কত সহজ হয়ে যেত। আচ্ছা, এত কঠিন বাস্তবতা নিয়ে তো চলি,* তবু বলতে পারো, মনটাকে কিছুতেই বোঝাতে পারি না কেন?——

আজ একজন কংগ্রেস নেতা—একটা মস্ত মোটরে চড়ে 'হরিজন মন্দির' উদ্বোধন করতে যাচ্ছিলেন। আমাকে দেখেই মুখটা ঘুরিয়ে নিলেন, ভয়ঙ্কর চটে আছেন আমাদের ওপর।

সে সব পরে জানাব। কিন্তু তুমি কবে আসবে, সত্যি বলো তো। মাঝে মাঝে এমন খারাপ লাগে। ধানকল ইউনিয়নের সেক্রেটারী আর তোমার মিতা জানতে চাইছে, কবে আসবে তুমি?"

একটা নিশ্বাস ফেলে চিঠিটা বন্ধ করল রঞ্জন, খুলল খবরের কাগজটা। একটা বিরাট হাটের হট্টগোলের মতো সমস্ত কাগজটা যেন অর্থহীন কোলাহল ছাড়া আর কিছুই নয়। বাংলা দেশে অশান্তি। বাংলা দেশে অশান্তি। রাজনৈতিক দরকষাকষি। পার্লিয়ামেন্টে হোম সেক্রেটারীর অপভাষণে চাঞ্চল্যকর অবস্থার সৃষ্টি। ব্যবস্থাপক সভায় সরকারী ও বিরোধীদলের মধ্যে হাতাহাতির উপক্রম। মোহনবাগানের অপ্রত্যাশিত পরাজয়—গোলরক্ষকের নির্বুদ্ধিতাতেই শেষ মুহূর্তে এই বিপর্যয় ঘটে গেল। জাতীয়তাবাদী সংবাদ-পত্রের লীডারে পাট-সম্পর্কে সরকারী নীতির সুতীব্র সমালোচনা—কচুরিপানা সম্বন্ধে নির্বোধ গবেষণা, বসিরহাটের বার লাইব্রেরী গৃহে একটি বৃহদ্ধর সর্প নিহত। আসানসোলে বেকার যুবকের আত্মহত্যা। কাটোয়া লাইনের কোন্ এক স্টেশনে আলোর যথোচিত সুবন্দোবস্ত না থাকায় যাত্রীদের ধনপ্রাণে বিপন্ন—পত্র প্রেরকের সোচ্ছ্বাস ক্রন্দন, যদিও "মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।"

চোখ বুলিয়ে কাগজটা নামিয়ে রাখল রঞ্জন। মন ভরেনা। এই কি বাংলা দেশের খবর? বিপ্লবী রঞ্জন আজ নানা বিচিত্র অবস্থা বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে সত্যিকারের বাংলাদেশকে দেখতে পেয়েছে। সে দেশটা রুধিরাপ্লুতা ছিন্নমস্তা নয়, তা বিপ্লবীর কল্প-স্বর্গও নয়। যে লেনিনের নাম প্রথম শৈশবে ক্ষুদিরামের মতো একটা রূপকথা হয়েই তার সামনে এসে দেখা দিয়েছিল, আজ সেই লেনিনকে জেনেছে সে, জেনেছে তাঁর আদর্শের স্বরূপকে, চিনেছে তাঁর হাতে গড়া দেশটাকেও। আর দেশের সঙ্গে তুলনা করেই এই খবরের কাগজগুলোকে একেবারে ফলে মনে হয়। মনে হয়, এ সব শুধু আত্মবঞ্চনা ছাড়া আর কিছু নয় হয়তো।

"স্বদেশ স্বদেশ করিস কারে এ দেশ তোদের নয়—"

সেই ছেলেবেলায় অবিনাশবাবুর গান। কিন্তু গানটা যে আজো সমান সত্য, এই খবরের কাগজগুলো যেন চোখে আঙুল দিয়ে সেইটেই দেখিয়ে দেয়।

জেল জীবনটা মনে পড়ে। আত্মদর্শনটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল সেখানেই। চোখে পড়েছিল বন্যা কেটে গেলে কী কর্দমাক্ত খানিকটা ঘোলা জল পড়ে থাকে—না থাকে স্রোত, না থাকে প্রাণ।

দাদারা কেউ কেউ গীতার মধ্যে তলিয়ে গেলেন। কেউ বোঝালেন 'অহিংসা পরমো ধর্ম'—খদ্দরের সুতো দিয়েই স্বাধীনতা আনবে

আমদানি করতে।

কয়েকজন আবার জেলেই গৃহস্থালী পাতিয়ে বসলেন। মাসোহারার মোটা টাকায় তারা জীবনের অতৃপ্ত ভোগাকাঙ্ক্ষা মেটাবার সাধনায় উঠলেন তৎপর হয়ে। স্নো, পাউডার, সেন্ট, সিল্কের পাঞ্জাবী তো আছেই—দশ আঙুলে দশ দশটা আংটিও কারো কারো শোভা পেতে লাগল। তাঁদের দিন কাটত সিল্কের পাঞ্জাবী পাট করতে, ফাঁক পেলে প্রেস্কিডের জুতো পালিশ করতে। রাজনীতির চাইতে মুরগীর কাটলেট-সংক্রান্ত আলোচনাটাই তারা পছন্দ করতেন বেশি।

এদেরই একজন—অনুরূপ মুখুয্যে যখন গলায় একটা সোনার হার পরে দর্শন দিলেন, সেদিন আর সহ্য হয়নি রঞ্জনের।

—অনুরূপদা, শেষে গলায় একটা হার অবধি ঝোলালেন। লোকে বলবে কী।

প্রচুর ঘি, মাখন আর মাংসে সমৃদ্ধ চর্বিচিক্কণ গাল দুলিয়ে দুলিয়ে হাসলেন অনুরূপদা। একবিন্দু অপ্রতিভত নেই, নেই একটি কণা সংকোচ।

হা-হা করে হেসে অনুরূপদা বললেন, আরে ভায়া, বাড়িতে মেয়ে বড় হয়ে উঠেছে। জেল থেকে বেরিয়েই তার বিয়ে দিতে হবে। এ হার কি আর নিজের জন্যে পড়িয়েছি—তখন কাজে লাগবে। তা ছাড়া তোমাদের বৌদি এতকাল বিরহ যন্ত্রণা সইছেন, তাঁকেও দুটো একটা আংটি উপহার দিতে হবে তো!

এর ওপর আর কোনো কথা বলা চলে না। শুধু সমস্ত মন যেন কালো হয়ে গেছে অশুচিতার গ্লানিতে। যাদের অনির্দিষ্ট মশালের শিখার মতো অনির্বাণ বলে বিশ্বাস হয়েছিল, দেখা গেল তারা শুধুই ছাই—পাবিকটা ছাইয়ের কালো শিখা ছাড়া কিছুই তাদের আর অবশিষ্ট নেই।

কিন্তু সবাই নয়।

বাংলা থেকে বহুদূরে সেই ক্যাম্প মনে পড়ে। চার বছর ছিল, ওখানে থেকেই বি-এ পাশ করে সে।

খাড়া উঁচু প্রাচীরের ওপর আকাশ দেখা যায়। কিন্তু বাংলার আকাশের মতো চোখ জুড়োনো নীল সে নয়; কেমন পিঙ্গল আর রৌদ্রদগ্ধ—রুক্ষ, অনুর্বর পৃথিবীর দিকে যেন কুপিত দৃষ্টিতে সে আকাশ চেয়ে আছে।

ক্যাম্পের বাইরে সুপারিন্টেন্ডেন্ট-এর অফিসে দু একবার যাওয়ার সময় দেখেছে চারদিকের প্রকৃতিকে। ধু ধু করা রিক্ততা। বহুদূরে আবছাভাবে এক আধটা দারিদ্র্যজীর্ণ গ্রামের ক্ষীণ আভাস, গাছপালার বিরলতা। আরো দূরে শীর্ণধারা নদীর একটা সংকেতও যেন পাওয়া যায়। এই বন্দীজীবনের সঙ্গে একটা আশ্চর্য মিল আছে তাদের।

শুধু এক আধদিন যখন রৌদ্র-পিঙ্গল আকাশে পড়ত মেঘের ছায়া, বয়ে আনত তাদের কাছে। মরু-মৃত্তিকা যেন রূপ আর প্রাণের অভিনন্দন পাঠিয়ে দিত।

সেই রকম এক একটা সময় ভারী খারাপ লাগত—হঠাৎ যেন অসহ্য হয়ে উঠত বন্দিত্বের এই বন্ধন যন্ত্রণা। বিষাদ একটা তিক্ততায় চুপ করে বসে থাকতে ইচ্ছে করত—স্নায়ুগুলো যেন অবশ হয়ে যেত। ঘরে গিয়ে দু চার লাইন কবিতা মেলাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে শুয়ে পড়ত বিছানায়।

কিন্তু এই অবসাদগুলো বড় খারাপ, বড় ভয়ঙ্কর। এই চুপ করে থাকা, এই একা একা বিষাদ ভাবনার মধ্যে তলিয়ে থাকা—এ লক্ষণগুলো মারাত্মক। এর ফলে একজনের মস্তিষ্ক-বিকার ঘটতে দেখেছে সে। বক্সার ক্যাম্পে আর একজন কী ভাবে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছিল সে কথাও সে ভোলেনি।

হঠাৎ কেউ হয়তো বিকট বেসুরো গলায় একটা গান ধরে বসত—কেটে যেত ঘোরটা। চোখে পড়ত, ক্যাম্পের নানা ঘরে ছোট ছোট দলে হয়তো ক্লাস বসে গেছে, উত্তেজিত আলোচনা চলেছে—যুক্তিতে আর দীপ্ত সংকল্পে জ্বল জ্বল করে উঠেছে চোখগুলো। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎশক্তির মতো কী একটা সঞ্চারিত হয়ে যেত শরীরে—শিথিল শিরাগুলোর মধ্যে দ্রুত তালে রক্ত প্রবাহিত হতে শুরু করত।

সেও এসে বসত দলের মধ্যে। শুধু কাব্য নয়, জীবন কাব্য। নিরাশ হলে চলবে না। যারা ভুল পেয়ে সরে দাঁড়িয়েছে, যারা কাজের দায়িত্ব বইতে না পেরে যোগ-সাধনায় আত্মনিয়োগ করেছে—তারা থামলেও আমরা তো থামব না। সেদিনেই তো আমাদের সত্যিকারের যাত্রা শুরু হয়েছে। নতুন করে খোলো পথ আলোয়। বাংলা দেশে ফিরে গিয়ে সেই পথই ধরব আমরা। মধ্যবিত্ত বিলাস বিলাস আর ক্যাপামির চাইতে ওড়াবো না, প্রাণবন্ত করে তুলব ঘুমন্ত অগ্নিশিখাকে। সৈয়দ মোস্তার যে প্রশ্নের জবাব দেখে দিতে পারেন নি—সে জবাব পৌঁছে দেব সারা মানুষের দরবারে।

রাতে শুয়ে শুয়ে কত কথা ভেবেছে রঞ্জন। রাজপুতানার মরুপ্রান্তরে বিস্তীর্ণ তমসা—বাংলা দেশের মতো ঝিঁঝিঁর ডাক নেই, নেই শেয়ালের প্রহর ঘোষণা। নিয়মিত তালে সেন্ট্রির বুটের শব্দ কানে আসে—মনে পড়ে যায় তার বাংলা দেশ এখান থেকে স্বপ্নের মতো সুদূর। কিন্তু একদিন সেখানে ফিরে যাবে সে। কাজ করবে, ঝাঁপ দিয়ে পড়বে তার সত্যিকারের সমস্যাগুলোর মধ্যে। মুষ্টিমেয়র সার্থকতাকে সার্থকতার বীজে রূপায়িত করতে সবাইর ক্ষেত্রে।

ফিরে তো এসেছে। এসেছে সেই ছায়াবীথি আর নদীর উচ্ছ্বাসে ভরা তার 'সার্থক জনমের' পুণ্যপীঠে। কিন্তু চোখের সামনে আপাতত কী রূপ দেখতে পাচ্ছে সেই বাংলা দেশের? ব্যবহারিক সত্তায় যে বাংলা দেশের মধ্যবিত্ত-সংকট আজ চরমে উঠেছে, পড়েছে অনাহার অভাবের

আকাশের আলো ঝিকি ঝিকি করছে, তার পাশেই নমঃশূদ্র পাড়া। এই দুবছরের ভেতরেই পাড়া দুটোর কী সুস্পষ্ট রূপান্তরই না চোখে পড়ল। প্রতি বছর বর্ষায় বান ডাকে পদ্মার জলে—চর ডুবিয়ে হা হা করে ঘোলা-জল ছুটে আসে, ভয় করে থানাটাকে ভেঙে নামিয়ে না নেয়। পদ্মায় বান ডাকে, কিন্তু কই, ওদের জীবনে তো বান ডাকল না! এই পদ্মার বাতাসেও কোথা থেকে আসে ম্যালেরিয়ার বীজ—কোথা থেকে আসে মারীর বিষস্পর্শ—কে বলতে পারে সে কথা? ওই গ্রামটার অতীত সমৃদ্ধি এখনো বোঝা যায়—রাশি রাশি পোড়ো ভিটে থেকে, জীর্ণ শীর্ণ আটচালা ঘর দেখে। কিন্তু যে ভিটে একবার মানুষ ছাড়া হল তা আর ভরে উঠল না, যে টিনের চাল বাতাসে একবার উড়ে গেল সে আর ফিরে এল না নিজের জায়গাতে। শ্রাবণ মাসে 'মনসার গান' এবার আর সমারোহ করে হয়নি ওখানে, নিকারীপাড়া থেকে শোনা যায়নি সম্মিলিত দেশী কাওয়ালী:

"আওরতেরা ডাবা বাজাইয়ে গান করে সুরে,
একদিন হজরতের দরে, একদিন নবীজীর দরে।
আছিল জয়নাল বিবি, আর ছিল সিদ্দিকা বিবি,
আর ছিল কুন্ছুন বিবি, নবীজীর দরে।"

কিছুই নেই, কিছুই বেঁচে নেই। শুধু আশ্বিন কার্তিক আর ফাল্গুন চৈত্রে ওদিকের শ্মশানঘাটটায় চিতা জ্বলেছে অনেক বেশি; গোরস্থানের দিক থেকে রাত্রে অনেক প্রবল হয়ে উঠেছে শেয়ালের কলস্বর।

এই বাংলা দেশ। মন্ত্রীসভায় ও সরকারের সংকট [illegible] পায়নি, কচুরিপানার সমস্যাও ... চূড়ায় ... চারদিকে শুধু বাদুড়ের কালো কালো ডানার মতো নেমে পড়ছে অপমৃত্যুর কৃষ্ণচ্ছায়া। এ দেশের সন্ধান পায়নি 'বন্দরে অন্ধকার' 'সাঁচির ডাক'-এর লেখক। আজ চড়া বিদ্যুতের আলোয় কড়া পাওয়ারের চশমা চোখে যারা এ.পি., ইউ.পি-র সংবাদ ঘেঁটে বাংলা দেশের অবস্থা নিয়ে নিবন্ধ লেখে চলেছে, এই মৃত্যুজর্জর বাংলা দেশ তাদের কাছে পাচ্ছে কোন্ সঞ্জীবনীর মন্ত্র, অভাবপক্ষে কতটুকু সান্ত্বনার বাণী?

কৈবর্ত মোল্লার প্রশ্ন। এই নিকারীদের প্রশ্ন—নমঃশূদ্রের প্রশ্ন। সমস্ত দেশের উত্তরোল প্রশ্ন। কতকাল সে প্রশ্নকে এড়িয়ে চলব আমরা; কতকাল মাইক্রোফোন ফাটানো বক্তৃতা দিয়ে ঢেকে রাখব সমষ্টির—সমগ্রের এই সমুদ্র-কল্লোলিত জিজ্ঞাসাকে?

সমস্ত শরীর জ্বালা করছে, টিপ টিপ করছে কপালটা। ভেতরে কেউ যেন পেরেক ঠুকে চলেছে একটার পর একটা। চোখের কাছেই একটা ... হচ্ছে বোধ হয়। হঠাৎ যেন কেমন একটা দুর্বলতা এসে পড়ে—এখান থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে গিয়ে দাঁড়াতে ইচ্ছে করে বিছানার পাশটিতে।

কয়েকটা নরম আঙুলের ছাপ বুলিয়ে দিত আস্তে আস্তে, কপালটা টিপে দিলে বেশ হত। কিন্তু না—এসব যা তা ভাববার

কিন্তু বাংলা দেশ। ডেকে উঠেছে শেয়াল—যেন সমস্ত দেশের শবযাত্রার পথে তুলেছে উল্লসিত হরিধ্বনি। আজ যদি সে বাইরে থাকত—কত কাজ করবার ছিল তার। বিপ্লবের অগ্নিদীক্ষার মন্ত্র দিয়ে মন তৈরী হয়ে গেছে, কিন্তু অকারণ অপচয় আর সংশয়ের পথে নয়, অমিয় মটক, মেলা, কমলাদি কিংবা সুতপার ট্র্যাজেডি সৃষ্টি করেও নয়,—সমস্ত মানুষের ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে, সাধারণ মানুষের সৌধ শক্তিতে গড়া নিশ্চয়তার কঠিন বনিয়াদের ওপরে পা দিয়ে। বাস্তবিক, কত কাজ করবার আছে। বিপ্লবের জন্যে মেলা আছে, মিতার স্নেহকুঞ্জ, আর সেই সঙ্গে আছে কাজ—সীমাহীন, অজস্র!

—'তুমি কবে আসবে?' ... প্রশ্ন ... তারও মন মুক্তির জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে আজকে। ... নয়, এ আর সহ্য হয় না। আর ভালো লাগে না নির্বাসিত ডুলকার মা... এই অপমৃত্যুর শাস্তি। কত কাজ, কত কাজ! ঠিক মিতাও তাকে ... কত এগিয়ে গেল!

—পড়ুন কাগজ।

থানার দারোগা এসে দাঁড়ালেন। মুসলমান ভদ্রলোক, অমায়িক, অল্পভাষী। সব সময়ে মুখে একটু করে বিনয় হাসি লেগেই আছে তার। রঞ্জনের এই বন্দিত্বের জন্যে যেন তিনিই অপরাধী—এই জাতীয় একটা আত্মনিগ্রহ সব সময়ে তাকে কেমন সংকুচিত করে রাখে।

সামনের চেয়ারটা দেখিয়ে দিয়ে রঞ্জন বললে, বসুন।

দারোগা বসলেন। খড়-চড়ে ছাড়া কেবল লুঙ্গি আর সিল্কের শার্ট পরে এসেছেন। আরাম করে হাত ... জড়িয়ে একটা বললেন,

তার আজকের কাগজে নতুন খবর ... আছে বলুন

রঞ্জন হাসল:

নতুন খবর আর কী থাকবে ... পুরোনোর কপচানি।

ঠিক—যা বলেছেন ... একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন দারোগা। খবরের কাগজে পড়বার মতো কিছুই থাকে না আজকাল। সব সেই ধাড়বাড়ি ... আর ... বিরক্তি ধরে যায়, বুঝলেন?

দারোগার মনের ভাবটা বুঝতে পারে রঞ্জন। খবরের কাগজে বিশেষ কিছু না থাকলেই খুশি হন তিনি। এত খবর, এত কোলাহল—মানুষের মস্তিষ্ক আর স্মৃতির ওপরে খানিকটা অহেতুক অত্যাচার ছাড়া তো আর কিছুই নয়। কী হবে এত খবর দিয়ে, কোন্ প্রয়োজন এইসব রাশীকৃত সংবাদে? দৈনন্দিন জীবনে কোলাহলের অন্ত নেই, অভাব নেই সমস্যার। চুরির এজাহার লিখতে হয়, ফেরারীর খবর রাখতে হয়, দাগীদের ওপরে রাখতে হয় সারাক্ষণের সজাগ দৃষ্টি; ডাকাতির সংবাদ এলেই ঘোড়া ছুটিয়ে দিতে হয় হন্তদন্ত হয়ে। তার ওপর আবার যদি জাতীয় আর আন্তর্জাতীয় সমস্যা এসে ভিড় করে, তা হলে জীবনধারণ রীতিমতো দুর্বিষহ হয়ে ওঠে নিশ্চয়ই।

রঞ্জন বললে, আপনার খবরই খবর কী ?

—আমার খবর ?—দারোগা এতক্ষণে খাড়া হয়ে বসলেন : আমার খবরের আর অভাব আছে কবে ? যে সুখের চাকরী মশাই আমাদের ! এই তো সকালে কাশিমপুরে মস্ত একটা দাঙ্গা হয়ে গেছে। আইন ভেঙে লাঙল দিয়েছিল, তাইতে মস্ত হাঙ্গামা হয়ে গেল। দুটো জোর চোট গেয়েছে, তাদের একটা বোধ হয় বাঁচবেনা।

—ধরলেন আসামী ?

একটা বড় গোঁফের হাই তুলে উদাসকণ্ঠে দারোগা বললেন, হ্যাঁ, দুপক্ষের গোটা দশবারোকে ধরে চালান করে দিলাম। আর বলেন কেন মশাই, যত বকমারীর কাজ। শত জন্মের পাপ না থাকলে দারোগা হয় না কেউ।

রঞ্জন আবার অন্যমনস্ক হয়ে গেল। এই রকম দাঙ্গাহাঙ্গামার কথা শুনলে মনে পড়ে সেই খুনী নিশিকান্তকে, মনে পড়ে সেই রাত্রে দুই ভাইয়ের মধ্যে দাঙ্গার কথা—সেই আর্তনাদ আর লাঠির শব্দ। কত দিন চলবে এই আত্মঘাতের পাপ, এই অপবুদ্ধির বিষাক্ত বিদ্বেষ ? নিজেদের মর্মজ্বালায় যে অগ্নিপুত্তলিকা আজ জ্বলে মরছে তারা কবে আগুন জ্বালিয়ে দিতে পারবে তাদের দুর্গচূড়ায় ?

বিষণ্ণভাবে অল্প একটু হাসল সে। বললে, কেন, ইংরেজ রাজত্বে আপনারাই তো সত্যিকারের লাটসায়েব বলে শুনি। এমন সম্মান আর এমন প্রাপ্তিযোগ—

—সম্মান আর প্রাপ্তিযোগ !—দারোগা ভ্রূকুটি করলেন : সে সব এখন নাই সেপুরির মিথ মশাই। সম্মান মানে তো দিনরাত্র শালা বলছে। আর প্রাপ্তিযোগ !—দারোগা বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটি আন্দোলিত করলেন : লোকে দুর্দান্ত চালাক হয়ে গেছে আজকাল। ঘুসতো দূরে থাক, পাঁচটা টাকা সেলামী নিলেই চাকরী রাখা দায় হয়ে ওঠে।

—তা হলে খুব দুঃসময় যাচ্ছে আপনাদের ?

—সে আর বলতে ! কী যে দিনকাল পড়েছে মশাই। গাধার মতো খাটনি, আর ইন্‌সপেক্টার থেকে সুরু করে তিনশো তেত্রিশ দেবতার পুজো। জানপ্রাণ বেরিয়ে গেল একেবারে।

দূরে একটা লণ্ঠনের আলো দেখা গেল। চ্যারিটেবল ডিসপেনসারীর সরকারী ডাক্তারবাবুর বাসা ওখানে। পাশা খেলায় দুর্দান্ত ঝোঁক ডাক্তার বাবুর। যেদিন সন্ধ্যায় 'কল' থাকে না, সেদিন পাশার ছক আর ঘুঁটি নিয়ে এসে দর্শন দেন।

দারোগা বললেন, ডাক্তার আসছে।

কিন্তু যে এল সে ডাক্তার নয়। সামনে লণ্ঠন হাতে ডাক্তারের চাকর মধু, পেছনে একটি ষোড়শী—ডাক্তার বাবুর বড় মেয়ে সীতা। একখানা থালার ওপর পারিপাটি করে তিন চারটি বাটি সাজিয়ে এনেছে। লজ্জিত মৃদুকণ্ঠে বললে, মা পাঠিয়ে দিলেন।

হেসে বললেন, যে রকম ব্যাপার দেখছি, তাতে আমার এখান-

[illegible] সীতা বললে, বেশ তো।

ঘরে ঢুকল সীতা। রঞ্জন জানে এর পরে কী কী করবে ও—এক কাজগুলো রুটিনের মতো মুখস্থ হয়ে গেছে তার। প্রথমেই টেবিলের ওপর খাবারটা ঢেকে রাখবে, একটা কাচের গ্লাসে গড়িয়ে দেবে এক গ্লাস জল। তারপর তাকিয়ে দেখবে তার বিছানাটার দিকে—দেখবে তার চূড়ান্ত বিশৃঙ্খল রূপ। বেডকভারটা অর্ধেক লুটিয়ে আছে মাটিতে, বিছানার ওপরে স্তূপাকারে বই ছড়ানো। ফাউণ্টেন পেনটা পড়ে আছে খোলা অবস্থায়, বালিশের ওপরে খানিকটা কালি ছিটোনো। সুটকেশের ডালাটা আধ হাত ফাঁক হয়ে আছে—হয়তো দুটো চারটে ইঁদুর এরই মধ্যে নিশ্চিন্তে ঢুকে বসে আছে ওর ভেতরে। এক মুহূর্ত বিস্ময় ইতস্তত করবে সীতা, তারপর যত্ন করে বিছানাটাকে ঝেড়ে দেবে। বই আর কলম তুলে রাখবে, আটকে দেবে সুটকেসের কল দুটো। এ কাজ সীতার নিত্যদিনের—এ তার অভ্যস্ত হয়ে গেছে। নিজের অজ্ঞাতেই একটা নিশ্বাস পড়ল রঞ্জনের। সীতার এই স্নিগ্ধ সেবার দাক্ষিণ্যটুকুর মধ্যে মিতা যেন প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে—সীতার উপস্থিতি যেন আর একজনকে সঞ্চার করে দেয়।

সীতা বেরিয়ে এল। যাওয়ার সময় বললে, একটু লক্ষ্য রাখবেন, বেড়ালে খেয়ে না যায়।

রঞ্জন মাথা নেড়ে বললে, আচ্ছা।

দারোগা জিজ্ঞাসা করলেন, তোর বাবা কোথায় রে সীতু ?

—বাবা ?—সীতা থেমে দাঁড়ালো। নতমুখে আঁচলের খুঁট আঙুলে জড়াতে জড়াতে তেমনি শান্ত কোমল গলায় বললে, 'কলে' গেছেন। ফিরতে রাত হবে।

লণ্ঠনের আলোটা মিলিয়ে গেল ক্রমশ।

—ওঃ, তাহলে আর পাশা জমবেনা আজকে। ওঠা যাক, কী বলেন ?

—আসুন।

তিন পা এগিয়ে গিয়ে দারোগা ফিরে তাকালেন একবার : ভালো কথা, কোনোরকম অসুবিধে হচ্ছে না তো আপনার ?

কোনো কমপ্লেন—

—না, না, কমপ্লেন নেই কিছু।

—আচ্ছা,—দারোগা চলে গেলেন।

রঞ্জন তেমনি ভাবেই বসে রইল নীরব হয়ে। পদ্মার বুক থেকে আসছে ভিজে বাতাস, একটু একটু নিভিয়ে উঠছে লণ্ঠনের শিখাটা। অভিশপ্ত ঘরটা অন্ধকারে নিমগ্ন। বালুচর আর জলধারাগুলো যেন তামার তৈরী—অস্পষ্ট আর অনুজ্জ্বল, তাহার আলোর লালাভ। গাংশালিকের কোলাহল স্তব্ধ হয়ে গেছে—এতক্ষণে নিকুঞ্জ কোটরে ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে ওরা। ওধারে নিকারী পাড়ায় একটা আগুনের কুণ্ড জ্বলছে, বোধ হয় জ্বাল দিচ্ছে খাবের রস।

কাজ থেকে ছেলেকে রেখেছে সযত্নে করে। পাঁচ বছর জেল, দু বছর অন্তরীণ আর অন্তরীণ-বন্দীর জীবন চলছে এই দ্বিতীয় বৎসর। সবুজ পুকুরপাড় এখন একটা অলীক ছায়াবাজির মতো চোখের সামনে ভেসে ভেসে চলে যায়। কবে একদিন বুকের মধ্যে আগুন জ্বলে উঠেছিল, দীপান্তরের পার থেকে একদিন কার কান্না এসে স্বপ্নাতুর নিশ্চিন্ত জীবনকে জোয়ারের তরঙ্গে দুলিয়ে দিয়েছিল। পরিমল, বেণুদা, তরুণ সমিতি। বর্ণচোরা ক্ষিতীশ চক্রবর্তী। কর্তব্যের কঠোর সংকল্প। এই মৃত্যুকে ছেদন করতে হবে, দূর করতে হবে এই ভয় আর অন্যায়ের শাসনকে। ওরে ভীরু, ওরে মূঢ়, তোমার নিঃসঙ্কোচ মস্তক তোলো আকাশে। মনে রেখো দেবতার দীপ হাতে নিয়ে রুদ্র দূতের মতো আবির্ভূত হয়েছ তুমি। যত শৃঙ্খল, যত বন্ধন, সবাই তোমার চরণ বন্দনা করে নমস্কার জানাচ্ছে। সত্যের মৃত্যু নেই।

সেই সব উন্মত্ত দিন। অগ্নিদীক্ষা। আদর্শের পায়ে নিঃসঙ্কোচ প্রাণ-বলি। আজ প্রসারিত এই পদ্মার চরে, শান্ত সন্ধ্যায়, তারায় সমুজ্জ্বল এই বিস্তীর্ণ আকাশের নীচে সে চঞ্চলতা কোথায়? এখন শুধু অবকাশ আছে, অখণ্ড আর অনন্ত অবকাশ। কবিতা লেখা চলে, রাশি রাশি কবিতা। কিন্তু ভালো লাগেনা। এই নিঃসঙ্গতা আর নির্জনতা সৃষ্টিকে উৎসাহ দেয়না, ভাবনা-বিলাসকে নিয়ে গুঞ্জন করে।

মরে যাওয়া নদীর মতো মন্থর—গতিহীন সময়। তাড়া নেই, তাগিদ নেই কিছু। বৃহৎ বাংলা—বৃহত্তর ভারত—কাজের রূপই মনের সামনে দেখা দেয়না বিবরূপ হয়ে: এখানে বাংলা দেশ বলতে ওই মৃতকল্প গ্রাম, ওদের নির্বিরোধ অপ্রসন্ন জীবন—চিন্তা ভাবনা সব কিছু যেন ওদের সঙ্গেই একাকার হয়ে গেছে। বিপ্লবের বহ্নিময় প্রেরণা নেই, আছে খানিকটা গভীর বেদনা আর নিবিড় সহানুভূতি।

কিন্তু এতো স্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়। এই শান্তি, মনের স্তিমিত মন্থরতা—এর জাল থেকে নিজেকে মুক্ত করা দরকার। এই কয়েক বছরে অনেক পড়েছে সে, অনেক জেনেছে। মনের কাছে আর্ত্ত পৃথিবীর জবাব এসেছে, সেই রাত্রে কৈলাস মোল্লার সেই ব্যথিত প্রশ্নগুলোর। আজ জানে ওই শিকারীদের জীবনেও সেই প্রশ্নগুলোই সত্য হয়ে আছে এবং তাদের জবাব দিতে পারাই আজকের একমাত্র কাজ।

বাইরের পৃথিবী ডাক দিচ্ছে—ডাক দিচ্ছে সেই কাজের দায়িত্ব। এরই মধ্যে মনকে ঝিমিয়ে পড়তে দিলে চলবে কেন তার। এবার আর বেণুদা, সুতপা কিংবা ওদের মতো আরো অনেকের অবক্ষয় নয়, একটা ব্যাধিগ্রস্ত উন্মত্ততার সংক্রামকতার করুণাদির জীবন কান্না দিয়ে ভরিয়ে তোলাও নয়। সে ছিল প্রস্তুতির পর্ব, এখন সত্যিকারের কাজ এসেছে। অজস্র কাজ, বিশ্রামহীন সংগঠন, আমিন মুন্সীদের বিরুদ্ধে কৈলাস মোল্লাদের জাগিয়ে তোলা, নিশিকান্তদের অপমানকে আগুনের মতো দিকে দিকে ছড়িয়ে দেওয়া। যাদের জন্যে তিরিশ সালের বন্যায় অবিনাশ বাবু নিজেকে বিসর্জন দিয়েছিলেন, যাদের জন্য এসেছিল উনিশ শো তিরিশ সালের অহিংস-আন্দোলনের প্রাণ বন্যা; আর যাদের প্রায় ভুলে গিয়েই রক্তের বন্যায় যাদের মুক্তি দেবার স্বপ্ন দেখেছিলেন ক্ষুদিরাম থেকে সূর্যসেন, এমন কি বেণুদা পর্যন্ত।

শুধু বেদনা আর সহানুভূতি নয়। এবারে কঠোরতর কাজ, তিলে তিলে গড়ে তোলার কাজ।

চাকর এল। ধ্যান ভাঙিয়ে দিলে এসে।

—বাবু, খেয়ে নিলে হত না? রাত হয়ে গেছে।

দূর সমষ্টি জীবনের পরিক্রমা থেকে রঞ্জন ফিরে এল তার ইন্টার্ণমেন্ট ক্যাম্পের ডেকচেয়ারে। নড়ে চড়ে সোজা হয়ে উঠে বসল সে।

—আজ তোর ভাত নষ্ট হল কৈলাস; বলতে ভুলে গিয়েছিলাম, ডাক্তার বাবুর বাড়ি থেকে খাবার দিয়ে গেছে।

কৈলাস জবাবে একগাল হাসল।

—সে আমি আগেই জানতুম বাবু। তাই আজ আর রান্না করিনি।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

'বুদ্ধ-পূর্ণিমা"

শ্রীরমা অধিকারী

রক্তাপ্লুতা বসুধার রক্তাম্বর তলে,
তব শুভ্র-শুচিতার পূণ্য দীপ জ্বলে;
হিংসা শত্রুতার কালো কলঙ্কের লিখা,
তারি ঊর্দ্ধে বিরাজিছে জ্যোতির্ম্ময়ী শিখা—
হে সুন্দর, সৌম্যকান্তি, তরুণ সন্ন্যাসী!
আর্ত্ত অনাথী আজি শরণ প্রয়াসী।
চিন্তাকুল জীবনের বিক্ষুব্ধ প্রান্তরে—
শান্ত আশ্বাস বাণী ধ্বনিছে অন্তরে।

ধ্বনিছে ও স্নেহসিক্ত প্রসন্ন নয়নে!
রাজ্যসুখ পরিহরি, কামনা, বাসনা,
নবরূপে প্রচারিলে বিধাতৃ বন্দনা।
জীবনের তুচ্ছ করি মহিমা হেলায়;
অমর জ্ঞানের জ্যোতি বিতরি ধরায়—
করিলে স্মরণ যোগ্য চির পূণ্য দিনে,
জন্মসিদ্ধি মোক্ষরূপা ত্রয়ীর বন্ধনে!
সে পূণ্য বৈশাখী তিথি আজি সমাগত,

স্বাধীনতার সংগ্রাম

শ্রীগোকুলেশ্বর ভট্টাচার্য

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ভারতের কম্যুনিষ্টদিগকেও দমন করিবার জন্য ভারত-গভর্ণমেণ্ট এই সময় উদ্যোগী হইয়াছিলেন। কম্যুনিজম প্রচার এবং সোভিয়েট রাশিয়ার আদর্শে ভারতে রাষ্ট্রতন্ত্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টার অভিযোগে ১৯২৯ সালের ২০শে মার্চ্চ বহু শ্রমিক নেতাকে গ্রেপ্তার করিয়া তাঁহাদের বিরুদ্ধে এক মামলা রুজু করা হয়। ইহাই মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা নামে পরিচিত।

১৯২৯ সালের ১৮ই ডিসেম্বর শেষ রাত্রে কলিকাতার মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটে কলাবাগান বস্তীতে একটি বাড়ীতে হঠাৎ খানাতল্লাস হইল এবং তাহার ফলে পুলিশ কতকগুলি লাল ইস্তাহার, বোমা তৈয়ারীর সরঞ্জাম ইত্যাদি প্রাপ্ত হইল। নিরঞ্জন সেন, সতীশচন্দ্র পাকড়াশী, রমেশচন্দ্র বিশ্বাস প্রভৃতি কয়েকজন বিপ্লবী ঐ বাড়ীতেই গ্রেপ্তার হইলেন। সুধাংশু দাশগুপ্ত নামে একটি যুবক ভোরবেলা একটি সুটকেসে করিয়া বোমা ও রিভলবার লইয়া ঐ বাটীতে উপস্থিত হইলে পুলিশ তাঁহাকেও গ্রেপ্তার করিল। আশপাশের আরও কয়েকটি বাড়ী তল্লাস করিয়া পাওয়া গেল নানা রকমের বিস্ফোরক পদার্থ ও বোমা তৈয়ারীর সাজ-সরঞ্জাম প্রভৃতি। ইহা লইয়া সুরু হইল মেছুয়াবাজার বোমার মামলা।

ঢাকা, খুলনা, বরিশাল ইত্যাদি নানা স্থানের বহু বিপ্লবী এই মামলায় আসামী হইলেন। মিঃ গার্লিক, রায় বাহাদুর সুরেশচন্দ্র সিংহ এবং এস, কে, বসুকে লইয়া গঠিত একটি স্পেশ্যাল ট্রাইবুন্যালে ১৯৩০ সালের এপ্রিল মাস হইতে আলিপুরে এই মামলার শুনানী আরম্ভ হইল। মিঃ গার্লিক প্রথমতঃ ট্রাইবুন্যালের প্রেসিডেণ্ট নিযুক্ত হইলেন, কিন্তু তিনি চলিয়া গেলে তাঁহার স্থলে প্রেসিডেণ্ট নিযুক্ত হইলেন মিঃ এইচ, বি, মেথুয়িন।

বিচার শেষে দণ্ডপ্রাপ্ত হইলেন ষোলজন বিপ্লবী। নিরঞ্জন সেন ও সতীশচন্দ্র পাকড়াশীর হইল সাত বৎসর হিসাবে দ্বীপান্তর দণ্ড। সুধাংশু দাশগুপ্ত ও রমেশচন্দ্র বিশ্বাস যথাক্রমে সাত ও পাঁচ বৎসর হিসাবে সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। দণ্ডিত আর সকলের বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ড হইল। অবশিষ্ট সকলে মুক্তি পাইলেন।

১৯২৯ সালের ডিসেম্বর মাসে বড়লাট লর্ড আরউইনের প্রাণনাশের চেষ্টা করা হইল। নূতন দিল্লীর প্রায় মাইলখানেক দূরে পুরাতন কেল্লার নিকটে লাইনের নীচে বোমা রাখিয়া বৈদ্যুতিক তারের সাহায্যে দূর হইতে বিস্ফোরণ ঘটাইয়া বড়লাটের ট্রেণ ধ্বংস করিয়া দিবার চেষ্টা হয়। বড়লাট অক্ষত শরীরে রক্ষা পাইলেন—তাঁহার ডাইনিং কারখানি

এদিকে এই বৎসরের ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে ভারতবর্ষকে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন দানের জন্য কংগ্রেসের দাবীর মেয়াদ ফুরাইয়া আসিতেছিল। বড়লাট লর্ড আরউইন ইংলণ্ডে গিয়া বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের সহিত পরামর্শ করিয়া আসিয়া ১৯২৯ সালের ৩১শে অক্টোবর তারিখে ভারত-শাসনে বৃটেনের লক্ষ্য সম্বন্ধে এক ঘোষণা প্রচার করিলেন; কিন্তু সে ঘোষণায় কোনও নূতনত্ব রহিল না—অতীত ঘোষণারই তাহা পুনরাবৃত্তি মাত্র। বৃটিশ-সাম্রাজ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে সম-মর্য্যাদাসম্পন্ন অংশীদার হিসাবে ভারতবর্ষ যাহাতে ধাপে ধাপে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসনশীল রাষ্ট্রে পরিণত হয়—ভারত-শাসনে যে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের তাহাই একমাত্র লক্ষ্য ইহাই বলা হইল বড়লাটের ঘোষণায়; কিন্তু এই ধাপে ধাপে অগ্রসর হওয়ার পর্য্যায় যে কতদিনে সমাপ্ত হইবে, সে সম্বন্ধে নির্দ্দিষ্ট করিয়া কিছুই বলা হইল না। দুই-চারি বৎসরেও তাহা হইতে পারে—আবার অনন্তকাল ধরিয়াও বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ভারতবাসী-দিগকে ধাপে ধাপে অগ্রসর করাইয়া দেওয়ার পুণ্যকার্য্যে লিপ্ত থাকিতে পারেন। যাহা হউক, ঐ বৎসরই ২৩শে ডিসেম্বর তারিখে বড়লাটের সহিত কয়েকজন নেতার একটি আলোচনা বৈঠকের ব্যবস্থা হইল এবং সকলে আশা করিলেন যে, বড়লাটের সহিত সাক্ষাৎ আলোচনার দ্বারা হয় তো কোন সুফল লাভ হইতে পারে; কিন্তু পূর্ণ তিন ঘণ্টা ধরিয়া আলোচনার পর শেষ পর্য্যন্ত আপোষ-প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইল।

সুতরাং ইহার পরই দারুণ উত্তেজনাপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে সুরু হইল কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশন। এই অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু। তিনি তাঁহার সভাপতির বক্তৃতায় ওজস্বিনী ভাষায় জাতির আশা আকাঙ্ক্ষা এবং চরম দাবীর কথাই ব্যক্ত করিলেন। পূর্ব্ব বৎসর কলিকাতা অধিবেশনের প্রাক্কালে বামপন্থীদের দ্বারা যে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী উত্থাপিত হইয়াছিল—লাহোর অধিবেশনে তাহাই হইল গৃহীত। বর্ত্তমান অবস্থায় কংগ্রেসের পক্ষে প্রস্তাবিত গোল টেবিল বৈঠকে যোগদানের দ্বারা যে কোনও ফল লাভের সম্ভাবনা নাই—প্রস্তাবে এইরূপ অভিমত ব্যক্ত করিয়া স্বয়ং মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসের এই ঐতিহাসিক অধিবেশনে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি উত্থাপন করিলেন—

"* * And in pursuance of the resolution passed at the Calcutta Congress last year this Congress now declares that Swaraj in the Congress creed shall mean

exclusive attention to the attainment of complete Independence and hopes also that those whom the tentative solution of the communal problem suggested in the Nehru constitution has prevented from joining the Congress or actuated them to abstain from it, will now join or rejoin the Congress and zealously prosecute the common goal."

এভাবে আইন-পরিষদের সদস্যগণকে আইন-সভা বর্জ্জন করিতে অনুরোধ জানান হইল এবং কংগ্রেসের গঠনমূলক কার্য্যসূচী অনুসরণ করিতে জাতিকে আহ্বান জানান হইল। প্রয়োজন এবং অবস্থা অনুযায়ী করবন্ধ সহ আইন-অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করার অধিকারও এই প্রস্তাবের দ্বারা নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির উপর ন্যস্ত হইল।

বিপুল উত্তেজনা ও উদ্দীপনার মধ্যে গান্ধীজীর প্রস্তাব গৃহীত হইল। প্রতি বৎসর স্বাধীনতার সঙ্কল্প-বাক্য পাঠের সিদ্ধান্তও এই অধিবেশনেই গৃহীত হয় এবং তদনুযায়ী সর্ব্বপ্রথম এই সঙ্কল্প বাক্য পঠিত হয় ১৯৩০ সালের ২৬শে জানুয়ারি।

তাহার পর আসিল ১৯৩০ সাল। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এই বৎসরটি যেমন ঘটনাবহুল—তেমনই গুরুত্বপূর্ণ।

ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে লর্ড আরউইন এই সময় পুনরায় আইন-পরিষদে এক বক্তৃতা দিলেন। বড়লাটের বক্তৃতার উত্তরে গান্ধীজী—"Young India" পত্রে গভর্ণমেণ্টের সহিত আপোষ-আলোচনা চালাইবার ভিত্তিরূপে ১১টি সর্ত্তের উল্লেখ করিলেন,—যথা লবণ-কর তুলিয়া দেওয়া, সেনা-বিভাগের ব্যয়-সঙ্কোচসাধন, উচ্চ বেতনের সরকারী কর্ম্মচারিগণের বেতন হ্রাস করা, রাজনৈতিক বন্দীদিগকে মুক্তিদান, গোয়েন্দা বিভাগ তুলিয়া দেওয়া, বিদেশী বস্ত্রের উপর রক্ষণ-শুল্ক ধার্য্যকরণ ইত্যাদি। উপরোক্ত দাবীগুলি যদি পূর্ণ করা হয়, তাহা হইলে আইন-অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করা হইবে না বলিয়াও তিনি জানাইলেন। অন্যথায় অসহযোগ আন্দোলন শুরু করা হইবে। বড়লাটের নিকট হইতে কিন্তু আর কোনও সাড়া আসিল না।

১৯৩০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সবরমতী আশ্রমে অধিবেশন বসিল কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির। এই অধিবেশনে মহাত্মাজীর প্রস্তাব পরিপূর্ণরূপে অনুমোদিত হইল এবং আইন-অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করিবার জন্য পরিপূর্ণ কর্ত্তৃত্বও তাঁহাকে দেওয়া হইল। কংগ্রেস কর্ম্মিগণের নিকট আবেদন জানান হইল, যাহাতে তাঁহারা আন্তরিকভাবে যোগদান করিয়া এই আন্দোলনকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তুলেন। আলোচনার পর স্থির হইল যে, লবণ-আইন ভঙ্গ করা হইবে।

ভারতের সুবিস্তৃত সৈকতভূমি থাকিলেও এবং সমুদ্র হইতে লবণ তৈয়ার করিতে সমর্থ করিলেন। অন্যান্য কংগ্রেসসেবিগণ তাঁহার গ্রেপ্তারের পর আন্দোলনে অবতীর্ণ হইবেন বলিয়া স্থির হইল।

আন্দোলন আরম্ভ করার পূর্ব্বে আর একবার শেষ চেষ্টা হিসাবে মহাত্মা গান্ধী একজন ইংরাজ যুবকের মারফত বড়লাটের নিকট পুনরায় একখানি পত্র প্রেরণ করিলেন; কিন্তু সে পত্রেরও উত্তর আসিল হতাশাব্যঞ্জক। আইনভঙ্গকর এবং জনসাধারণের শান্তির বিঘ্নকর কার্য্যপন্থা গান্ধীজী অনুসরণ করিতে সঙ্কল্প প্রকাশ করায় বড়লাট তাঁহার পত্রে দুঃখ প্রকাশ করিলেন।

মহাত্মাজী ইহার প্রত্যুত্তর দিলেন "Young India" পত্রিকায়। তিনি লিখিলেন,—"**On bended knees I asked for bread and I received stone instead. * * The Viceregal reply does not surprise me. But I know that the salt-tax has to go and many other things with it, if my letter means what it says. * * I contemplate a course of action which is clearly bound to involve violation of law and danger to public peace. In spite of the books containing rules and regulations the only law that the nation knows is the will of the British administrators. The only public peace the nation knows is the peace of the public prison. India is one vast prison house. I repudiate this law and regard it as my sacred duty to break the mournful monotony of compulsory peace that is choking the heart of the nation for want of free vent.**"

ডাণ্ডিতে লবণ প্রস্তুত করিয়া লবণ-আইন ভঙ্গ করিবার জন্য গান্ধীজী প্রস্তুত হইলেন। ডাণ্ডি সমুদ্র-তীরবর্ত্তী একখানি গ্রাম। সবরমতী আশ্রমের একদল মনোনীত কর্ম্মী লইয়া দুই শত মাইল পথ পদব্রজে অতিক্রম করিয়া ডাণ্ডি যাওয়া স্থির হইল। ১৯৩০ সালের ১২ই মার্চ্চ সকাল ৬টা ৩০ মিনিটে এই ঐতিহাসিক অভিযান শুরু হইল। সহস্র সহস্র লোক সমবেত হইয়া প্রত্যক্ষ করিল গান্ধীজীর এই অদ্ভুত অভিযান। "গান্ধীজী-কি-জয়" ধ্বনিতে তাঁহার যাত্রাপথ হইয়া উঠিল মুখর ও প্রাণবন্ত।

যে সকল গ্রাম অতিক্রম করিয়া গান্ধীজীর যাওয়ার কথা ছিল—কিছুকাল যাবৎ সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল সেগুলিতে পর্য্যটন করিয়া বেড়াইতেছিলেন। ঘুমন্ত গ্রামগুলিকে গান্ধীজীর অভিযান সম্বন্ধে সচেতন করিয়া তোলাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। ইহার ফলে তিনি গ্রেপ্তার হইলেন। যাহা হউক, গান্ধীজী যেখানেই গিয়া উপস্থিত হইতে লাগিলেন, সেখানেই লাভ করিতে লাগিলেন জনগণের বিপুল সম্বর্দ্ধনা।

দুঃখ-কষ্ট বরণ করিতে পারার জন্য মহাত্মাজী জনগণকে প্রস্তুত থাকিতে বলিলেন।

গ্রামবাসিগণের উপর পুলিশের অত্যাচার এইবার আরম্ভ হইল। তাহাতেও কিন্তু তাহাদের অটুট মনোবল ভাঙিয়া পড়িল না। কটিবস্ত্র-পরিহিত বৃদ্ধ সেনাপতি জাতিকে মুক্তির পথ দেখাইয়া দৃপ্তপদবিক্ষেপে ডাণ্ডির দিকে অগ্রসর হইয়াই চলিলেন—লবণ-আইন প্রত্যাহৃত না হওয়া পর্যন্ত তিনি আর সবরমতীতে ফিরিবেন না—ইহাই তাঁহার দুর্জয় সংকল্প।

৫ই এপ্রিল প্রাতঃকালে গান্ধীজী দলবলসহ ডাণ্ডিতে উপনীত হইলেন। পরদিন আইন ভঙ্গ করা স্থির হইল। ৬ই এপ্রিল সকাল ৬টার সময় পরম গাম্ভীর্যময় পরিবেশের মধ্যে সত্যাগ্রহী সহকর্মীদের সঙ্গে লইয়া তিনি প্রথমতঃ সমুদ্র-স্নান সমাধা করিলেন। হাজার হাজার দর্শক তাঁহার এই লবণ-আইন-ভঙ্গ অনুষ্ঠান দেখিবার জন্য সমবেত হইয়াছিল। বেলা ৮টা ৩০ মিনিটের সময় একটি ক্ষুদ্র স্তূপ হইতে এক তাল লবণ তুলিয়া লইয়া তিনি ইংরাজের রচিত আইন ভঙ্গ করিলেন। ইহার পর তিনি এক বিবৃতি দিলেন। তাহাতে তিনি জানাইলেন যে, আইন-অমান্য করিয়া যাহারা দুঃখ-বরণ করিতে অথবা অভিযুক্ত হইবার ঝুঁকি লইতে প্রস্তুত আছে—তাহারাই সম্ভবমত যেখানে খুসি সুযোগ-সুবিধা অনুযায়ী লবণ প্রস্তুত করিতে এবং উহা ব্যবহার বা বিক্রয় করিতে পারে।

ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত গান্ধীজীর এই আহ্বানে যেন চঞ্চল হইয়া উঠিল। সকল প্রদেশেই লবণ-আইন ভঙ্গ করা শুরু হইয়া গেল। বৃটিশ গভর্ণমেন্টও এই ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া রহিলেন না। এই আন্দোলন দমন করিতে তাঁহারাও তাঁহাদের সর্বশক্তি নিয়োজিত করিলেন। দলে দলে দেশের লোক কারারুদ্ধ হইতে লাগিল—আহত হইতে লাগিল পুলিশের লাঠিতে—অথবা বন্দুকের গুলিতে তাহারা জীবন বিসর্জন দিতে লাগিল অকাতরে।

জনসাধারণের উপর এই নিষ্ঠুর পীড়নে মহাত্মা গান্ধী ব্যথিত হইলেন। ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইয়া তিনি বড়লাটের নিকট পুনরায় পত্রও লিখিলেন। গভর্ণমেন্টের অবলম্বিত এই দমন-নীতিই যে তাঁহাকে ক্রমশঃ আরও দুঃসাহসিক অভিযানে প্রবৃত্ত হইবার প্রেরণা যোগাইতেছে—ইহা লিখিয়া তিনি বড়লাটকে আরও জানাইলেন যে, তিনি তাঁহার সত্যাগ্রহী দল লইয়া ইহার পর ধারসানার লবণের গোলা দখল করিতে মনস্থ করিয়াছেন।

গান্ধীজীকে আর বাহিরে রাখিতে ভারত-সরকার সাহস করিলেন না। সুতরাং ইহার অব্যবহিত পরেই ৫ই মে তারিখে রাত্রি ১টা ১০ মিনিটের সময় তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হইল। গণ্ডগোলের আশঙ্কায় প্রকাশ্য দিবালোকে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিতে ইংরাজ-কর্তৃপক্ষ ভীত

হইয়াছিলেন। গ্রেপ্তারের পূর্বে গান্ধীজী দেশবাসীর প্রতি বাণী দিয়া গেলেন—তাঁহারা যেন অহিংসা পালন করেন, দেশের ঘরে ঘরে চরকা চালাইয়া খদ্দর প্রস্তুত করেন, বিদেশী বস্ত্র ও মদ্যের দোকানে পিকেটিং করিয়া দেশের কর্তা, যুবক ও নারীগণ যেন বিলাতী বস্ত্র বর্জন করেন এবং ছাত্রগণকে স্কুল-কলেজ ও সরকারী চাকুরীয়াদিগকে তাহাদের কর্ম ত্যাগ করিতে আহ্বান জানাইয়া গেলেন।

দেশবাসীর দৃষ্টি এইবার ধারসানা লবণের গোলার প্রতি আকৃষ্ট হইল। ২১শে মে তারিখে প্রায় ২৫,০০০ সত্যাগ্রহী বিভিন্ন দিক হইতে ধারসানা লবণের গোলা লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইলেন উহা দখল ও লুঠ করিবার জন্য। পুলিশ উক্ত স্থানে যাইবার সকল পথ বন্ধ করিয়া দিয়া উহার চতুর্দিকে রচনা করিল এক সুদৃঢ় বেষ্টনী এবং আগন্তুক সত্যাগ্রহীদের উপর নির্মমভাবে লাঠি চালাইতে লাগিল। শত শত স্বেচ্ছাসেবক প্রহারে হইলেন জর্জরিত—কিন্তু পুলিশের বিরুদ্ধে কেহ একটিও আঙুল তুলিলেন না। গান্ধীজীর অহিংসাদর্শের মূর্ত প্রতীকরূপে সর্বাপেক্ষা উত্তেজক মুহূর্তেও তাঁহারা সকলে শান্ত হইয়া রহিলেন। এই ধারসানা লবণের গোলায় সত্যাগ্রহীদের অভিযান এবং তাহার জন্য তাঁহাদের উপর পুলিশের পীড়ন সম্পর্কে মিঃ ওয়েব মিলার তাঁহার "New Freeman" পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন,— "I have never witnessed such harrowing scenes as at Dharsana. Sometimes the scenes were so painful that I had to turn away momentarily. One surprising feature was the discipline of the volunteers. It seemed they were imbued with Gandhi's non-violence creed."

ওয়াদালা, শিরোদা, শানে-কত্তা প্রভৃতি স্থানের লবণের গোলা অধিকারেরও একই প্রকারের চেষ্টা চলিল—সে সকল স্থানেও অনুষ্ঠিত হইল ঐ একই ধরণের অত্যাচার। ভারতের বাজারে বিদেশী বস্ত্র ও অন্যান্য পণ্য অচল হইয়া গেল—ইহার বিরুদ্ধে চতুর্দিকে পিকেটিং ও বর্জন-আন্দোলন চলিতে লাগিল। কোথাও কোথাও কর-বন্ধ আন্দোলন বা বন-আইন ভঙ্গ আন্দোলনও চালান হইল। ছাত্ররা করিল স্কুল-কলেজ ত্যাগ। গভর্ণমেন্ট ক্ষিপ্ত হইয়া আন্দোলন দমন-কল্পে একের পর আর এক অর্ডিন্যান্স জারি করিতে লাগিলেন; কিন্তু তৎসত্ত্বেও ইহা সমগ্র ভারতে বিস্তারলাভ করিল।

সোলাপুরে স্বেচ্ছাসেবকগণ পুলিশের হস্ত হইতে ক্ষমতা কাড়িয়া লইলেন। এই উপলক্ষে পুলিশের সহিত তাঁহাদের যে সংঘর্ষ হইল, তাহাতে জনকয়েক পুলিশ হইল নিহত। ইহার ফলে সেখানে জারি করা হইল সামরিক আইন এবং জনসাধারণের উপর অশেষ নির্যাতন চালান হইতে লাগিল। একদল গাড়োয়ালী সৈন্যকে দিয়া উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে একটি নিরস্ত্র শান্ত জনতার উপর গুলি বর্ষণের ব্যবস্থা হইলে—সৈন্যগণ গুলি চালাইতে সম্মত না হইয়া কর্তৃপক্ষের আদেশ অমান্য করিল। ইহার ফলে তাহাদিগকে সামরিক আদালতে অভিযুক্ত করা হয় এবং বিচারে তাহাদের প্রতি প্রত্যেককে ১৬ বৎসরের দণ্ড হইতে

অন্য সরকারী বিবরণ হইতে জানা যায় যে, ১৯৩০ সালের ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত বিভিন্ন প্রদেশে মোট ৫৪,০৫৯ জনকে এই আন্দোলন উপলক্ষে দণ্ডিত করা হয়—তন্মধ্যে বাংলা দেশেই দণ্ডিতের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক—প্রায় ১১,৪৫০ জন। এপ্রিল হইতে জুলাই পর্য্যন্ত চারি মাসে পুলিশের গুলিতে ১০১ জন নিহত এবং ৪২৭ জন আহত হয়।

প্রায় মাস পাঁচেক ধরিয়া আন্দোলন চলিবার পর একটা সম্মানজনক আপোষ-রফায় পৌঁছাইবার জন্য পুনরায় আলোচনা আরম্ভ হইল। নেতৃবৃন্দের সহিত জেলে সাক্ষাৎ করিয়া মিটমাটের আলোচনা চালাইবার জন্য স্যার তেজবাহাদুর সপ্রু ও এম. আর. জয়াকর যে প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন—বড়লাট তাহাতে সম্মত হইলেন। অন্যান্য জেল হইতে তখন পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু ও ডাঃ মামুদ প্রভৃতিকে আলোচনার জন্য গান্ধীজীর নিকট যারবেদা জেলে আনা হইল এবং সপ্রু ও জয়াকরও আলোচনায় যোগদান করিলেন; কিন্তু সপ্রু-জয়াকর দৌত্যও সফল হইল না। আলোচনা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইল।

এদিকে শিবহীন যজ্ঞের মত কংগ্রেসকে বাদ দিয়াই বিলাতে ভারতীয় সমস্যার সমাধানকল্পে প্রথম গোল টেবিল বৈঠক বসিল ১৯৩০ সালের ১২ই নভেম্বর। উহার প্রতিবাদে বৃটিশ ভারতের সর্ব্বত্র হরতাল প্রতিপালিত হইল এবং সরকারী আইন অমান্য করিয়া নানাস্থানে বিক্ষোভ-শোভাযাত্রা বাহির ও প্রতিবাদ-সভার হইল। এই উপলক্ষেও অত্যাচার উৎপীড়ন চালাইতে পুলিশ কসুর করিল না। নয় সপ্তাহ যাবৎ অধিবেশন চালাইয়া নানা মত-বৈষম্যের মধ্যে ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতান্ত্রিক অগ্রগতি সম্বন্ধে কোনও সিদ্ধান্তে না পৌঁছাইয়াই প্রথম গোল টেবিল বৈঠক সমাপ্ত হইল।

প্রকাশ্য রাজনৈতিক আন্দোলনের এই পট-ভূমিকাতেই ১৯৩০ সালে বহু দুঃসাহসিক হত্যাকাণ্ড ও লুণ্ঠনকার্য্য অনুষ্ঠিত হয়। ১৯২০-২১ সালের অসহযোগ আন্দোলনের সময় যেমন গুপ্ত বিপ্লবান্দোলন স্থগিত ছিল—এবারে আর তদ্রূপ রহিল না। প্রকাশ্য অহিংস রাজনৈতিক আন্দোলনের সহিত সন্ত্রাসবাদও পুরাদমে চলিতে লাগিল। দেশের অনিশ্চিত রাজনৈতিক অবস্থায় কিছু করিবার জন্য বিপ্লবীরা যেন অধীর হইয়া উঠিয়াছিলেন। এই পরিস্থিতির মধ্যেই ১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠিত হইল। এই অস্ত্রাগার লুণ্ঠন যেমনই অভিনব—তেমনই চাঞ্চল্যকর। (ক্রমশঃ)

আশ্রয়প্রার্থী ও পশ্চিমবাংলা

অধ্যাপক শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গ বিভাগের পর পশ্চিমবঙ্গের সমৃদ্ধি ও সুযোগ সুবিধা লক্ষ্য করিয়া অনেকেই ইহার বিপুল ভবিষ্যত সম্পর্কে আশান্বিত হইয়াছিলেন। বন্দর ও বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে কলিকাতা বরাবরই ভারতবর্ষের প্রাণকেন্দ্র-স্বরূপ। এই কলিকাতা পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় স্বভাবতঃই প্রদেশটির মর্য্যাদা এবং আর্থিক স্বাতন্ত্র্য বহু পরিমাণে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আয়তনে পশ্চিমবাংলা অখণ্ড বাঙলার শতকরা মাত্র ৩৫·৬ ভাগ, আয়ের দিক হইতে কিন্তু কলিকাতা সমন্বিত পশ্চিমবাংলার অবস্থা অখণ্ড বাংলার এক-তৃতীয়াংশের তুলনায় অনেক ভাল। ১৯৩৮-৩৯ খ্রীষ্টাব্দে অখণ্ড বাংলার আয় হইয়াছিল ১২ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা, ১৯৪৮-৪৯ খ্রীষ্টাব্দের প্রস্তাবিত হিসাবে শুধু মাত্র পশ্চিমবাংলার ৩০ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকা আয় হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। শিল্পের দিক হইতে পশ্চিমবঙ্গ অসামান্য অগ্রগতি লাভ করিয়াছে। যতদিন যাইবে শিল্পপ্রসার আরও বেশী হইবে বলিয়াই মনে হয়। অখণ্ড বাংলার শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির অধিকাংশই পড়িয়াছে পশ্চিমবঙ্গে। এইসব শিল্প-মত। বিশেষজ্ঞদের মতে বাঙলায় তথা ভারতের কৃষিব্যবস্থা সেকেলে, আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক প্রথায় কৃষিকার্য্য চালান হইলে অল্পদিনের মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যঘাটতি বহুলাংশে পূরণ হইবে বলিয়া আশা করা হইয়াছিল। তাছাড়া পশ্চিম বাঙলার যে ২৭।৫৮ লক্ষ বিঘা কর্ষণ-যোগ্য অনাবাদী জমি আছে, তাহার একাংশে চাষ হইলেও অবস্থার কিছুটা সুরাহা হওয়া অসম্ভব নয়। মোটের উপর সব জড়াইয়া সকলেই আশা করিয়াছিলেন যে, শাসনব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইলে অদূর ভবিষ্যতে সার্ব্বজনীন কর্ম্মসংস্থানের ব্যবস্থা হইয়া পশ্চিমবঙ্গে বেকার সমস্যার পূর্ণ সমাধান হয়তো অসম্ভব হইবে না।

দুঃখের বিষয়, বাস্তব অভিজ্ঞতায় প্রমাণ হইতেছে যতটা আশা করা গিয়াছিল, অবস্থা সত্যই ততটা আশাপ্রদ নয়। অবশ্য বর্ত্তমানে এই প্রদেশে নানাপ্রকার বিশৃঙ্খলা দেখা যাইতেছে বলিয়া কেহ কেহ হয়তো এখনও স্বাভাবিক সময়ের প্রতীক্ষা করিতেছেন, হয়তো স্বাভাবিক সময় আসিলে পুনর্গঠনের ব্যাপারে পশ্চিমবাঙলা লক্ষণীয়ভাবে অগ্রসর হইতেও

অবস্থা জটিল, কলিকাতা জাপযুদ্ধের অন্যতম প্রধান ঘাঁটি হওয়ায় যুদ্ধের চাপ কলিকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গের উপর অত্যধিক পরিমাণে পড়িয়াছিল। মুদ্রাস্ফীতি, পণ্যাভাব, চোরাকারবার প্রভৃতি যুদ্ধোত্তর অনিবার্য সমস্যাগুলির সহিত বঙ্গবিভাগের আনুষঙ্গিক কতকগুলি বিচিত্র সমস্যাও পশ্চিমবঙ্গের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে। এইসব সমস্যার চাপে আর্থিক পুনর্গঠনের পরিকল্পনায় যথাযথভাবে হাত দেওয়া এখন একরূপ অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। বঙ্গবিভাগের দরুণ পশ্চিমবঙ্গকে সবচেয়ে কঠোরভাবে সম্মুখীন হইতে হইয়াছে পূর্ববঙ্গের আশ্রয়প্রার্থী সমস্যার। সমস্যাটি যেমন জটিল, তেমনি বিরাট।

প্রকৃতপক্ষে পূর্ববঙ্গ হইতে পশ্চিমবঙ্গে এত বেশী শরণার্থী আসিয়াছে যে, ইহাদের অন্নবস্ত্রের সংস্থান করা পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে একরূপ অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ শিল্পের উপর অধিকতর নির্ভরশীল বলিয়া এখানকার শিল্পাঞ্চলগুলিতে বা সহর এলাকায় আর্থিক সমৃদ্ধিও যেমন বেশী, লোকের ভিড়ও তেমনি। পূর্ববঙ্গ হইতে ১৮।২০ লক্ষ আশ্রয়প্রার্থী আসিয়াছে এবং ইহাদের অধিকাংশই এই সহর অঞ্চলে ভিড় জমাইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ জনবহুল, তবু পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে এখনও বহুলোকের জায়গা হইতে পারে। কিন্তু গ্রামে জীবিকা সম্পর্কে নিশ্চয়তা না থাকার জন্য আশ্রয়প্রার্থীদের মধ্যে গ্রামাঞ্চলে যাইতে চাহিতেছে খুব কম লোক। পশ্চিম বাংলার জনসংখ্যার শতকরা ২২ ভাগের মত সহর এলাকায় বাস করে, পূর্ববঙ্গের আশ্রয়প্রার্থীরা সহরে আসিয়া ভিড় বাড়াইতেছেন বলিয়া সহরাঞ্চলের স্বাস্থ্য ও খাদ্য-পরিস্থিতি এবং পণ্যমূল্যস্তর ক্রমেই শোচনীয় হইয়া উঠিতেছে। নূতন যন্ত্রপাতির অভাবে কলকারখানা বাড়িতেছে না, সরকারী সাহায্যের পরিমাণও সীমাবদ্ধ, কাজেই নবাগতদের লইয়া পশ্চিম বাঙলা অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া পড়িতেছে। ভারতবর্ষের অন্যান্য সমস্ত প্রদেশের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে জনবাহুল্য বেশী। প্রতি বর্গমাইলে যখন বোম্বাইয়ে ২১৩ জন, যুক্তপ্রদেশে ৫১৮ জন, মাদ্রাজে ৩৯১ জন, আসামে ১৮৭ জন, উড়িষ্যায় ২৭১ জন এবং মধ্যপ্রদেশ ও বেহারে ১৭২ জন লোক বাস করে তখন পশ্চিমবঙ্গে বাস করে প্রতি বর্গমাইলে ৭৫২ জন লোক। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের আদমসুমারী অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের লোকসংখ্যা ২ কোটি ১২ লক্ষের কাছাকাছি, ইহার সহিত পূর্ববঙ্গ হইতে আগত প্রায় ২০ লক্ষ লোক যুক্ত হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ হইতে কিছু মুসলমান অবশ্য পূর্ববঙ্গে চলিয়া গিয়াছে, তবে এইরূপ বাস্তুত্যাগীদের সংখ্যা ততটা উল্লেখযোগ্য নয়। ইহার উপর পশ্চিমবঙ্গে প্রতি বৎসর অন্তত: ৩ লক্ষ করিয়া লোক বাড়িতেছে। কাজেই এই ক্রমবর্দ্ধমান জনসংখ্যার জীবিকা সংস্থানের ব্যবস্থার জন্য প্রয়োজন পশ্চিমবঙ্গের নিজস্ব কৃষিশিল্পের ক্রমোন্নতি। এ পর্য্যন্ত বলিতে গেলে সেইরূপ উন্নতি কিছুই লক্ষ্য করা যায় নাই। পশ্চিমবঙ্গের শিল্পপতিদের অনেকেই অবাঙালী, এই সব কলকারখানায় শ্রমিক হিসাবে যাহারা কাজ করে তাহাদের মধ্যে বাঙালীর সংখ্যা গিয়াছিল, তাহা এখনও অপ্রতিহতভাবে চলিতেছে মাত্র [illegible] পরিমাণ তো সীমাবদ্ধ। বঙ্গ-বিভাগের সময় পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীদের মাথাপিছু চাষের জমির পরিমাণ ছিল প্রায় ·৪৩ একর। কৃষি জমির এই হার দেশের প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয়। ইহার উপর জনসংখ্যা অনিয়ন্ত্রিতভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে বলিয়া অবস্থা ক্রমেই আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যাইতেছে।

পশ্চিম বাঙলার নিজস্ব অধিবাসীদের অবস্থা যাহাই হউক, উপস্থিত পূর্ববঙ্গের আশ্রয়প্রার্থীরা এই প্রদেশের, বিশেষ করিয়া কলিকাতা, নবদ্বীপ প্রভৃতি সহর অঞ্চলের পক্ষে ভয়াবহ সমস্যা হইয়া উঠিয়াছেন। এই সব আশ্রয়প্রার্থীর একটা সুবন্দোবস্ত হওয়া অবিলম্বে দরকার। আয় বেশী হওয়া সত্ত্বেও শাসনযন্ত্র পরিচালনায় ও অন্যান্য নানাভাবে ব্যয় অনেক বাড়িয়া যাওয়ায় পশ্চিমবঙ্গ এখনও অর্থনীতির হিসাবে আত্মনির্ভরশীল হইতে পারে নাই। যুদ্ধের মধ্যে এবং যুদ্ধোত্তরকালে এখনও পর্যন্ত বাংলার (পশ্চিমবঙ্গের) বাজেটে ঘাটতি চলিতেছে। ইহার উপর বহিরাগত ১৮।২০ লক্ষ লোকের ভার লওয়া এই প্রদেশের আর্থিক কাঠামোর পক্ষে অসম্ভব। ১৯৪৯-৫০ খ্রীষ্টাব্দে যখন কেন্দ্রীয় সরকার এবং ভারতের অধিকাংশ প্রাদেশিক সরকারের বাজেটে জনকল্যাণখাতে কিছু কিছু টাকা ধরিয়াও উদ্বৃত্ত হইয়াছে, তখন পশ্চিম বাঙলা সরকারের এ বৎসরের বাজেটে হইয়াছে ১ কোটি ১১ লক্ষ টাকা ঘাটতি। আশ্রয়প্রার্থী খাতে পশ্চিমবাঙলার সরকারি তহবিলের প্রায় এক তৃতীয়াংশ টাকা আটকাইয়া যাইতেছে। সম্প্রতি ভারতসরকারের সাহায্য ও পুনর্বসতি বিভাগের মন্ত্রী শ্রীযুক্ত মোহনলাল সাকসেনা কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টে প্রদত্ত একটি হিসাবে বলিয়াছেন যে আশ্রয়প্রার্থী খাতে সরকারের প্রত্যহ ৮ লক্ষ টাকা করিয়া খরচ হইতেছে। পূর্ববঙ্গের আশ্রয়প্রার্থীদের ভাগে কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের কৃপাবৃষ্টির দুচার ফোঁটার বেশী পড়িতেছে না। কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে আশ্রয়প্রার্থীদের পুনর্বসতির জন্য ৫ কোটি টাকা ঋণ দিতেছেন। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু যথার্থই বলিয়াছেন পূর্ববঙ্গের আশ্রয়প্রার্থীদের বাঁচাইবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে সরাসরি সাহায্য না করিয়া এই ভাবে ঋণদানের ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় সরকারের সমস্যার গুরুত্ব ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অসহায় অবস্থা সম্পর্কে যথেষ্ট মনোযোগের পরিচায়ক নয়। যাহা হউক, বিগত ২৩শে ফেব্রুয়ারী বাজেট বক্তৃতা প্রসঙ্গে পশ্চিমবাঙলার অর্থসচিব শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার আশা প্রকাশ করেন যে, পূর্ববাংলার আশ্রয়প্রার্থীদের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যে খরচ হইতেছে তাহা কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে কিছু সরাসরি সাহায্য ও কিছুটা ঋণ পাওয়া যাইবে। শ্রীযুক্ত সরকারের এই আশা পূর্ণ হইলেই মঙ্গল, না হইলে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে একরূপ নিরুপায় হইয়াই আশ্রয়প্রার্থীদের রক্ষা ব্যবস্থা আশ্রয়প্রার্থীদের তাহাদের উপর ছাড়িয়া দিতে হইবে।

লোক অন্যের তুলনায় উড়িষ্যা, আসাম, বিহার প্রভৃতি প্রদেশের অধিবাসীদের অনেক বেশী সহানুভূতি আশা করিতেছেন। ইহা সত্য হইলে আনন্দের বিষয়। তবে এই প্রসঙ্গে একটি কথা অবশ্যই স্মরণ রাখিতে হইবে। আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে কয়েক সহস্র আশ্রয়প্রার্থীর স্থান হইলে বা বিহার, আসাম বা উড়িষ্যায় কিছু লোক চলিয়া গেলেই ২০ লক্ষ আশ্রয়প্রার্থীর পুনর্বসতি হইল না। ইহাদের জন্য যেখানে যতটুকু ব্যবস্থা হওয়া সম্ভব, কেন্দ্রীয় সরকারের মারফৎ তাহার সবটুকু সুবিধা পাইলে তবেই সমস্যার সমাধান হইতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ আসামের কথা ধরা যাক। আসাম সরকার পূর্ববঙ্গের বাস্তুত্যাগীদের আসামে পুনর্বসতি সম্পর্কে বিশেষ উৎসাহ দেখাইতেছেন না। আসামে বাড়তি জমি নাই, এই ধরণের কথাও তাঁহাদের মুখে শোনা যায়। কিন্তু শিলং জেলা কংগ্রেসের ডাঃ এস সি ঘোষ মন্ত্রী শ্রীযুক্ত মোহনলাল সাকসেনার নিকট প্রেরিত এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে, আসাম প্রদেশে পূর্ববঙ্গের ৬০ লক্ষ আশ্রয়প্রার্থীর বসবাসের মত জমি আছে। তাঁহার মতে কাছাড়ে ৫ লক্ষ, গোয়ালপাড়ায় ১০ লক্ষ, গারো পাহাড়ে ৩ লক্ষ, খাসিয়া ও জয়ন্তিয়া পাহাড়ে ৩ লক্ষ, শিবসাগরে ১৫ লক্ষ লক্ষীপুরে ৫ লক্ষ, দরং জেলায় ২ লক্ষ এবং কামরূপে ৫ লক্ষ লোকের বসতি হইতে পারে। বলা নিষ্প্রয়োজন ডাঃ ঘোষের এই হিসাব সঠিক হইলে শুধু আসামই পূর্ববঙ্গ আশ্রয়প্রার্থী সমস্যার সমাধান করিতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় পূর্ববঙ্গের আশ্রয়প্রার্থীদের আশ্রয় দানের নৈতিক যে দায়িত্ব পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্বীকার করিয়া লইয়াছেন এবং ফলে পশ্চিমবঙ্গের অভাব অসুবিধা বৃদ্ধি পাইয়াছে প্রচণ্ডভাবে, আসামের সেই দায়িত্বের একাংশ গ্রহণে অস্বীকৃতির কোনই কারণ নাই। পশ্চিম বাংলার প্রতিবেশী আসাম যদি এই দায়িত্ব ভার গ্রহণে অস্বীকার করে এবং তজ্জন্য কেন্দ্রীয় সরকার যদি চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন, তাহা হইলে প্রাদেশিক আত্মকেন্দ্রিকতার রন্ধ্র পথে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সমগ্র কাঠামোতেই ভাঙন ধরিবে। আসাম সম্পর্কে যে কথা, পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য প্রতিবেশী বিহার বা উড়িষ্যা সম্পর্কে বিশেষভাবে এবং ভারতের অন্যান্য প্রদেশগুলি সম্পর্কে সাধারণভাবে সেই একই কথা।

এতো গেল একদিক। আর একদিকে আশ্রয়প্রার্থীদের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণে এবং তাহাদের জন্য অনাড়ম্বরভাবে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে মনোযোগী হইতে হইবে। সমস্যাটি দীর্ঘমেয়াদী, কাজেই তাহা যতটা কম হয় তজ্জন্য চেষ্টা করা দরকার। আশ্রয়প্রার্থীদের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ বলিতে আমরা প্রকৃত আশ্রয়প্রার্থী ছাড়া আর কাহারও দায়িত্ব গ্রহণে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অক্ষমতার কথা বলিতেছি। পূর্ববঙ্গের সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি এখন আর ভয়াবহ নয়। এখনও পূর্ববঙ্গে এককোটি হিন্দু সম্ভ্রমবোধ এবং অন্নবস্ত্র-সমস্যা লইয়া বাস করিতেছে। কাজেই যাহাদের উপায় আছে তাহাদের পূর্ববঙ্গে ফিরিতে উৎসাহিত করা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আশু কর্তব্য। এজন্য পূর্ববঙ্গ সরকারের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিলেও অনেক কাজ হইতে পারে। অনেকে এখানে সরকারী সাহায্য ও সুবিধা লইয়া বর্ডারে হুকোয়ায় পা দিয়া। অর্থাৎ এই সব লোক এখানেও সুবিধা পান তজ্জন্য চেষ্টা করিতেছেন এবং পূর্ববঙ্গেও বাড়ী ঘর রাখিয়া অপেক্ষা করিতেছেন ভবিষ্যতের জন্য। বাস্তবিক পূর্ববঙ্গে যাহাদের বিষয় সম্পত্তি রহিল এবং যাহাদের পরিবারের একাংশ পূর্ববঙ্গে আগলাইতেছে, তাহাদের পশ্চিমবঙ্গে অস্থায়ী ভাবে থাকিবার দরকার হইতে পারে, কিন্তু তাহাদের খাওয়া থাকা বা কাজকর্ম সম্পর্কে দায়িত্ব লইতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কোনমতেই বাধ্য নন। এই সব লোককে সাহায্য করিতে গিয়া যদি সত্যই নিরাশ্রয় এবং একজনকেও পশ্চিমবঙ্গ সরকার আর্থিক অসচ্ছলতার জন্য ফিরাইয়া দেন, তাহা মারাত্মক দুঃখের কথা হইবে। যাহারা ভারত যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক অধিকার চাহিতেছেন, তাহাদের এই দাবী আন্তরিক এবং স্থায়িত্বের ভিত্তিতে কিনা তাহাও বর্তমান মুহূর্তে অবশ্যই বিবেচনা করা দরকার। পশ্চিমবঙ্গের আর্থিক অবস্থা ভাল হইলে এসব কথা উঠিত না, কিন্তু এই জনবহুল প্রদেশের দুঃসময়ে যে নৈতিক দায়িত্ব তাহাকে স্কন্ধে লইতে হইতেছে, তাহার যৌক্তিকতা এবং ন্যায়সঙ্গতি সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হইবার অধিকার তাহার আছে। শুধুমাত্র অর্থনৈতিক কারণে পূর্ববঙ্গ হইতে লোক পশ্চিমবঙ্গে আসিয়াছে। মানুষের দুর্ভাগ্যে মানুষের দুঃখ স্বাভাবিক, কিন্তু যাহার নিজের বাঁচিবার সংস্থান নাই, দুঃখে সক্রিয় সহানুভূতি দেখাইবার অর্থ তাহার নিজের মৃত্যু। কথাটা একটু রূঢ় বটে, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গকে দীর্ঘদিনের জন্য যে সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইতেছে, তাহার হিসাবে এইরূপ চিন্তার প্রয়োজনও যথেষ্ট। কথাটা বলা হইতেছে—যাহারা সাময়িক লাভের জন্য পশ্চিমবঙ্গে ভিড় বাড়াইতেছে শুধু মাত্র তাহাদের উদ্দেশ্যে। এ সম্পর্কে স্বার্থবাদীদের সমালোচনা গ্রাহ্য না করিয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দৃঢ়তার সহিত কর্তব্য স্থির করা উচিত। এই সুবিধাবাদী আশ্রয়প্রার্থীর পরিচয় সংগ্রহ করা এখন আর মোটেই কঠিন নয়। অনেক আশ্রয়প্রার্থীকেই এখন সপ্তাহে, মাসে বা বছরে দেশে গিয়া জমিজমা দেখাশোনা করিয়া আসিতে দেখা যায়। যাহাদের জমিজমা নাই, অথচ শুধু অর্থনৈতিক কারণে আসিতেছে, তাহাদের আসাও নিয়ন্ত্রণ হওয়া দরকার। গত ১লা কলিকাতা হইতে একশত আশ্রয়প্রার্থী পরিবারের একটি দল আন্দামান যাত্রা করিয়াছে। এই দলে অনন্তকুমার জৈথা নামক ৩৬ বৎসর বয়স্ক যুবক ও তাহার স্ত্রীপুত্র ছিল। ফরিদপুরের লোকটি নিজেই স্বীকার করিয়াছে যে গ্রামে তাহার আগে কিছু জমি ছিল এবং সেই জমিতে সে চাষ করিত। মামলা মোকর্দমায় জমি সে খোয়াইয়াছে এবং এখন সে বাহির হইয়াছে জীবিকা অর্জনের পথ সন্ধানে। হরকুমার মণ্ডল নামক আর এক ব্যক্তি সপরিবারে দলে আন্দামান গিয়াছে। ইহাদের চারবিঘা জমি এখনও খুলনা সাকখোলা গ্রামে রহিয়াছে। হরকুমারের জ্যেঠা সপরিবারে

গিয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দু শ্রমিক বা হিন্দু ফেরিওয়ালা শ্রেণীর ছোটখাট ব্যবসাদারের আগের মত সুযোগ সুবিধা নাই, থাকিলে ইহাদের অনেকেই হয় তো পশ্চিমবঙ্গে আসিবার কথা কল্পনাও করিত না।

'আশ্রয়প্রার্থী' শব্দটির সহিত পশ্চিমবঙ্গের আর্থিক স্বার্থ যখন বিশেষ ভাবে জড়িত, তখন আমরা আশ্রয়প্রার্থী বলিতে ... কারণে পূর্ব্ববঙ্গে বাসে অনিচ্ছুক পশ্চিমবঙ্গে আগমনকারীদের ... সাম্প্রদায়িক পীড়নে সত্যকার গৃহচ্যুতদেরই বুঝি। এ সব ক্ষেত্রে ... ফিরিয়া আর ফিরিয়া যাইবার প্রশ্ন উঠে না। ইহাদের জন্য পশ্চিমবঙ্গ বা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের যত অসুবিধাই হউক, সে অসুবিধা ভোগের ... আছে। কিন্তু যাহারা শুধু সাময়িক আর্থিক অসুবিধার হাত ... এড়াইবার জন্য পশ্চিমবঙ্গে আসিয়াছেন এবং কিছুদিন পশ্চিমবঙ্গে নিশ্চিন্তে কাটাইয়া যাইবার জন্য এই প্রদেশে ভিড় বাড়াইয়াছেন, পূর্ব্ববঙ্গে বাড়ী ঘর যাহাদের হস্তচ্যুত হয় নাই, তাদের জন্য পশ্চিমবঙ্গের সরকারী তহবিলের অর্থব্যয় অপব্যয় ছাড়া আর কিছু নয়। ইহাদের সাহায্য করার আর একটা অসুবিধা আছে। পূর্ব্ববঙ্গে এখনও বেশ কিছুদিন হিন্দুদের আর্থিক অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে। এখন এই সব সুবিধাবাদী যদি পশ্চিমবঙ্গে গুছাইয়া লয় এবং সেই কথা পূর্ব্ববঙ্গে প্রচার হয়, তাহা হইলে পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয়প্রার্থীর ভিড় ক্রমেই বাড়িয়া যাইবে। এইভাবে হিন্দুরা পূর্ব্ববঙ্গ ত্যাগ করিলে শুধু পশ্চিমবঙ্গের উপর নিদারুণ আর্থিক চাপই পড়িবে না, সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্ববঙ্গের লক্ষ লক্ষ হিন্দুর মনোবল ক্ষুণ্ণ হইবে এবং পশ্চিমবঙ্গে নানা আজগুবি রটনার ফলে অশান্তি দেখা দেওয়াও বিচিত্র নয়।

আকাশ পথের যাত্রী

শ্রীসুষমা মিত্র

... জুন। ৮টার সময় উনি মিটিংএ গেলেন। আমরা মাঠে বেড়াতে ...। মেঘের ঘোর ঘটায় আকাশ আচ্ছন্ন, এই বৃষ্টি, এই রোদ, ... করেই দিনটা কাটছে। মাঠের মাঝে ছেলেমেয়েরা 'সি, স' ও ... খেলছে, পাশেই রয়েছে টেনিস খেলার মাঠ। বাগানের

আমেরিকায় রেড-ইণ্ডিয়ানদের বসতি

Poolএ আবালবৃদ্ধবনিতা সাঁতার দিচ্ছে, ঘরটি গরম করা, জলও গরম, সুতরাং ঠাণ্ডা লাগার কোন ভয় নেই।

১৮ই জুন। হঠাৎ ভোরে ঘুম ভেঙেছে। জানলার ধারে গিয়ে দেখি সূর্য্যোদয়ের ঠিক মুহূর্তে লাল আলোয় দিক উদ্ভাসিত। সকলকে ঘুম

বিশ্রাম রয়েছে। এই বাড়ীটির নাম—"Manor House"। Manor House কোন এক ফরাসী ডিউকের বাসগৃহ ছিল। কথিত আছে Louis XIV ঐ ডিউককে উপহার স্বরূপ এই গৃহটি দান করেন। তখন কানাডায় ইংরাজ ও ফরাসীর আধিপত্য বিস্তার চলেছে। Manor House এখন এই ক্লাবের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বাড়ীটি ফরাসী দেশের আসবাবে ও শিল্পে সাজানো। বহু বিশিষ্ট ডাক্তার ও তাঁদের পত্নীদের সাথে এখানে আলাপ পরিচয় হল। সন্ধ্যায় হোটেলে ফিরলাম।

ডিনারের পর ডাক্তাররা সবাই আবার মিটিংএ যোগদান করতে গেলেন, কেবলমাত্র তাঁদের স্ত্রীরাই হল ঘরে বসে কথাবার্তায় ও গল্পে সল্পে আসর জমিয়ে তুললেন। রাত প্রায় ১১টার সময় আমি খুকুকে নিয়ে ঘরে শুতে গেলাম। তাঁরা কিন্তু স্বামীদের অপেক্ষায় তখনও ক্লান্ত হয়ে বসে রয়েছেন।

১৯শে জুন। আজ মিটিংএর শেষ দিন। হোটেলের ম্যানেজার মহাশয় আজ এই বিদায়ের দিনে বড়রকমের একটি সান্ধ্যভোজের ব্যবস্থা করেছেন। আমরা সবাই অর্থাৎ ডাক্তারদের পত্নী ও সঙ্গীরাও নিমন্ত্রিত। হোটেলেরই মাটির নীচে (underground) একটি সাজানো ঘরে আমরা যথাসময়ে উপস্থিত হলাম। আমাদের প্রধান অতিথি হলেন একজন চীন দেশীয় ডাক্তার। খাওয়া শেষে প্রধান অতিথির বক্তৃতা হল। তারপর নানা প্রকার হাস্যরসে সকলকে খুশী করে সভা ভঙ্গ হল।

২০শে জুন। আজ ভোর থেকেই ডাক্তাররা স্বস্থানে ফিরে চলেছেন, হোটেল প্রায় খালি হয়ে গেল। আমরা প্রাতরাশ সেরে নদীর ধারে চুপচাপ বিশ্রামেই কাটালাম। বিকেলবেলা ডাক্তার পত্নীদের কাছে বেড়ানোর গল্প শোনা গেল। কথা প্রসঙ্গে শুনলাম, কিছুদূরে একটি Red Indianদের ঘাঁটিও নাকি তাঁরা দেখে এসেছেন। এই Red

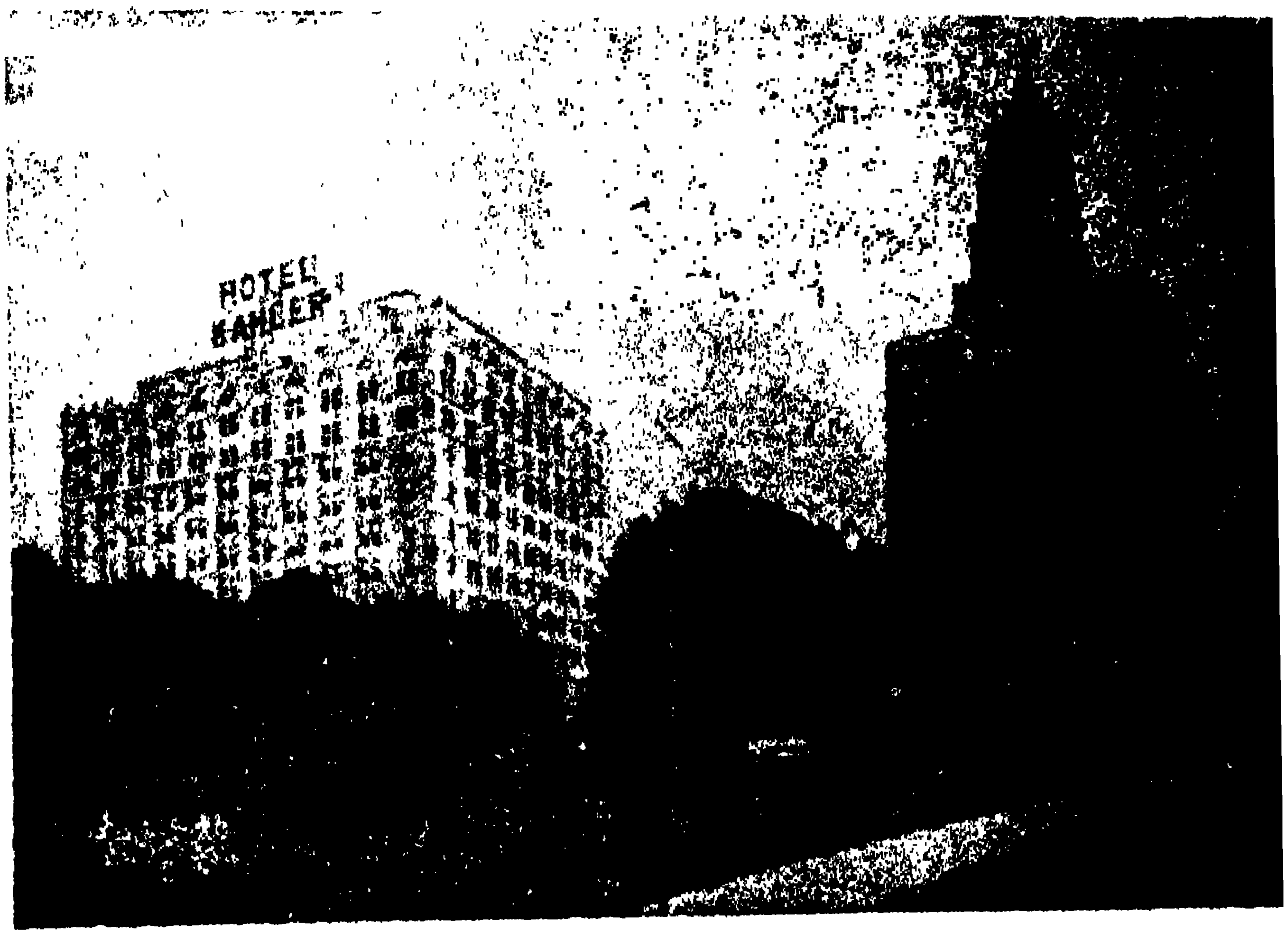

মেয়ো ক্লিনিক ও হোটেল কেলার

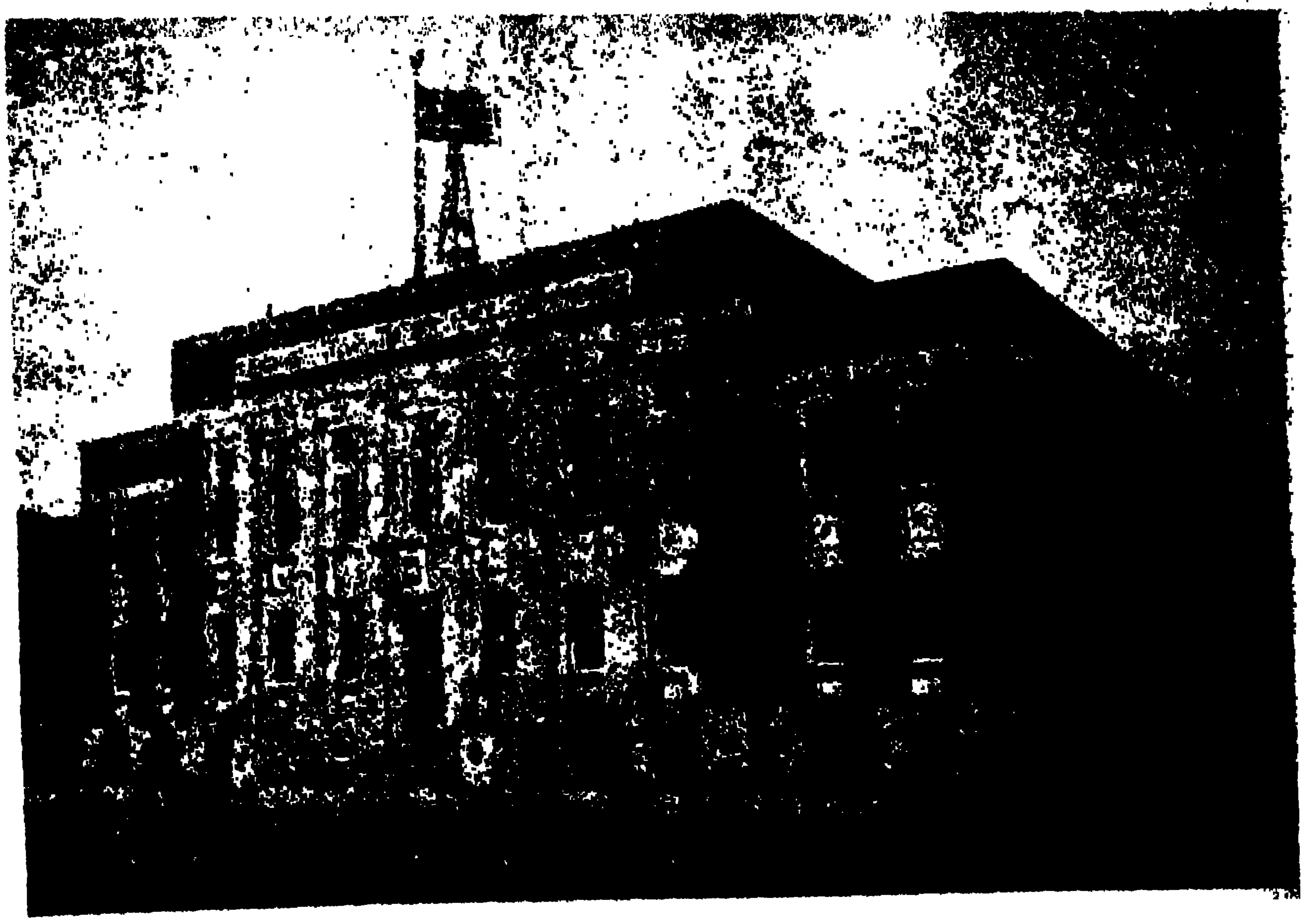
রচেষ্টার টাউনহল

Indianদের জীবন-যাত্রা শুনতে আমি খুবই উৎসাহিত হয়ে উঠলাম। স্থির হ'ল, আমরাও অটোয় যাব। আমেরিকায় অনেকগুলি ছোট Red Indianদের ঘাঁটিগুলি (Reservation

...এতেই অধিক সংখ্যক Red Indianদের বাস। ঘাঁটিগুলি ...ভাবে আমেরিকান গভর্ণমেন্টের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত। Red Indianদের Reservation সম্বন্ধে আমার একটা ভুল ধারণা ... যে—এটা বুঝি একটি কাঁটা তারের বেড়ায় ঘেরা কোন এক ...খানা, যেখানে Red Indianদের আটক করে রাখা হয় ; বস্তুতঃ ...আদপেই নয়। Red Indianদের একত্রে বসবাস করার সুযোগ ও ...বিধা দিবার জন্য Federal Government কতকগুলি নির্দিষ্ট স্থান ...দের মধ্যে বন্টন করে দিয়েছেন ; এই সকল জমির মালিক হয়েও

রচেষ্টার শহরের রাজপথ

... সরকারকে কর দিতে হয় না। বরং সরকার হতেই এদের ... ও ভরণপোষণের ভার বহন করা হয়। তবে এই নির্দিষ্ট ...র মধ্যে কতকগুলি বিশিষ্ট নিয়মকানুন তাদের মেনে চলতে হয়। ... করলেই কিন্তু তারা এই সীমানা (Reservation) চিরদিনের ... ত্যাগ করে চলে যেতে পারে ; প্রকৃতপক্ষে এখন হচ্ছেও তাই— ...শত Red Indian তাদের Reservation ছেড়ে দিয়ে অন্যস্থানে ...ভাবে নিজেদের জীবিকা অর্জন করছে এবং অন্য নাগরিকদের ...রূপে বাস করছে।

তারা যদি Reservation ত্যাগ করে তবে তাদের বৃত্তি ... হয় এবং জমির মালিকী-স্বত্বও হারায়। Oklahomaতে Red Indianদের মধ্যে একদল আছে যারা বেদের ন্যায় ভ্রাম্যমান জীবন যাপন করে ; তাদের পরিধানে কম্বল দেখা যায় বলে তাদের "Blanket" Indian বলা হয়।

সারা আমেরিকায় মোটামুটি এখন এই Red Indianদের সংখ্যা হল প্রায় চারি লক্ষ। Columbus যখন আমেরিকায় পদার্পণ করেন তখন এদের সংখ্যা ছিল প্রায় সাড়ে আট লক্ষ। ১৬০০ সাল থেকে লোক সংখ্যা কমতে দেখা যায়, তারপর ৩০০ বৎসরের মধ্যে এত অধিক লোকক্ষয় হয় যে এর মাত্র দুই লক্ষ সত্তর হাজারে দাঁড়ায়। Californiaয় এক সময় প্রায় এক লক্ষ দশ হাজার Red Indian বাস করত ; অনশনে, রোগে ও শ্বেতপ্রভুদের নৃশংস হত্যায় ক্রমে ক্রমে এরা দাঁড়ায় শেষে মাত্র বিশ হাজারে ; যদিও এখন আবার কিছু বৃদ্ধি পেয়েছে। এই লোক বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকায় সাদায়-কালোয় বর্ণশঙ্কর দেখা দিয়েছে। শতকরা ৫০ জন এখন মিশ্রজাতীয়। ১৯২৪ সালে Congress থেকে Red Indianদের নাগরিকের অধিকার দেওয়া হয়, সেই হতে তারা সকল ষ্টেটেই ভোটাধিকার পেয়েছে। শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে এদের সামাজিক জীবনও উন্নত হচ্ছে। নানা কাজে এদের বেশ যোগ্যতা ও দক্ষতা দেখা গেছে। এবার এই যুদ্ধে প্রায় পঁচিশ হাজার Red Indian খুব কৃতিত্বের সঙ্গে সৈন্যের কাজ করেছে এবং আরও প্রায় চল্লিশ হাজার Indian যুদ্ধসংক্রান্ত রকমারি কাজে সহায়তা করেছে। ব্যবসাক্ষেত্রে এদের খুব তীক্ষবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। পূর্ব্বে শ্বেতপ্রভুরা নামমাত্র মূল্যে এদের জমি ক্রয় করে নিত, এখন এরা এ বিষয় খুবই সতর্ক ও সচেতন। জমি বিক্রয় করলেও এরা ভূগর্ভস্থ খনিজদ্রব্যের স্বত্বাধিকার ছাড়ে না বা বিক্রয় করে না। Oklahomaতে রেড্ ইণ্ডিয়ানদের Osage উপজাতি তাদের জমির নীচে তেলের খনির সন্ধান পায় এবং সেই খনির তেল বিক্রয় করে এখন কোটি কোটি টাকার মালিক হয়ে বসেছে।

২১শে জুন। ভোর ৭টায় ট্যাক্সি করে আমরা 'অটোয়া' রওনা হলাম। আমরা যে পথ দিয়ে এসেছি সে পথে না গিয়ে সুন্দর চওড়া রাস্তা দিয়ে চলেছি, সামনেই 'অটোয়া' শহর। অটোয়া শহরটি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, খুব বড় নয়। শহর ঘুরে আমরা বিমানঘাঁটির দিকে চলেছি। চোখে পড়ল মাঠের মাঝে একটি প্রকাণ্ড মঞ্চ বাঁধা। মঞ্চটি ঘিরে হাজার হাজার চেয়ার পাতা। সামনেই একেবারে ক্রশবিদ্ধ যীশুখৃষ্টের একটি বিরাট মূর্ত্তি স্থাপিত। রাস্তার দুধারে দলে দলে Nun ও Fatherরা চলেছেন। একরকম পোষাক-পরা ... পুরোহিতের দল দেখতে বেশ মনোরম লাগছিল। ... একটি বিরাট খৃষ্টীয় ধর্ম্মসভার অধিবেশন এখন ... চলেছে, তাই

আমরা ১ কেলায় ডিতে পেীছে T. W. A.এর বিমানে উঠলাম। বিমান চলতে সুরু করল। মাঠের শেষ প্রান্তে এসে ভর্জন গর্জন করে শূন্যে ওঠার জন্য প্রস্তুত। কিন্তু ১৫ মিনিট ধরে বিমান হুঙ্কারধ্বনি করেই চলেছে, আকাশে আর ওড়ে না। এমন সময় ষ্টুয়ার্ডেশ এসে খবর দিল যে বিমানের যন্ত্র বিকল হবার সম্ভাবনায় চালকগণ এখুনি বিমানখানি ঘুরিয়ে ঘরের দিকে নিয়ে যাবেন। এ বিমান পরিত্যাগ করে আমাদের অপর একটিতে যাত্রা করতে হবে।

আমরা নেমে বিমানঘাঁটির বসবার ঘরে ঢুকলাম। ঘণ্টা তোক পরে আরেকটি বিমানে আমাদের তোলা হ'ল। বিমান আকাশে সোঁ সোঁ শব্দে উড়ে চলল। আমরা নিশ্চিন্ত মনে বসেছি। একটু পরেই অনুভব করলাম—ছোট ছোট Air Pocketএ পড়ে বিমান ভীষণ উঠছে নামছে; জানলায় উঁকিয়ে দেখি—কালো মেঘের ঘন ঘোর ঘটায় আকাশ ছেয়ে গেছে। তারপরই সুরু হল ভীষণ ঝড় জল বিদ্যুৎ চমকানি।

আমরা ঝড়ের মধ্যে পড়ে হাবুডুবু খেতে সুরু করলাম; আমি তো স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে এ যাত্রায় আর আমাদের রক্ষা নেই!

আমাদের লাঞ্চ খাওয়া তো দূরের কথা, চেয়ার থেকে আর মাথাই তুলতে পারলাম না।

বেলা ৫টায় শিকাগোর মাটিতে বিমান নেমে দাঁড়াল। আমরা Hotel Palmer Houseএ গিয়ে একটি ঘরে বিশ্রাম নিলাম। আজই আবার রাত ৯টার ট্রেনে Minnesota Stateএর Rochesterএ যাবার কথা। সারারাত ট্রেনে কাটিয়ে সকালে আটটায় রচেষ্টারে পৌঁছে গেলাম। Hotel Khalerএ উপস্থিত হয়ে আবার সেই Sky-scraperএর মাথায় উঠলাম। পুরো একটি ব্লক জুড়ে চারটি রাস্তার উপরে এই হোটেল। আমরা আজ সারাদিন বেড়িয়ে কাটালাম। এই Rochester সহর বিশ্ব বিখ্যাত Mayo Clinicএর জন্য প্রসিদ্ধ। সারা আমেরিকাবাসী এই Clinicএ রোগনির্ণয় ও চিকিৎসার জন্য আসে। সহর কেবল রোগীর ভিড়ে ভর্ত্তি—মাঠে, পথে, দোকানে, রাস্তায়, ট্রামে, বাসে, হোটেলে সর্ব্বত্রই কেবল রোগী আর রোগী। এই সহরে রোগীদের জন্য কি অদ্ভুত বন্দোবস্তই না রয়েছে। এরোড্রম থেকে আরম্ভ করে সহরের ভিতরে সর্ব্বত্রই রোগীদের জন্য যথাযথ প্রয়োজনীয় জিনিষ ও ষ্ট্রেচারের বন্দোবস্ত সকল সময় রয়েছে। মাটির তলায় রোগীদের নিয়ে যাবার জন্য সুন্দর বাঁধানো চওড়া সুড়ঙ্গপথ রয়েছে। পথের দুধারে আবার রোগীদের জন্য ছোটখাট দোকানও কিছু কিছু চোখে পড়ে। বড় বড় হোটেলের বাড়ীর ভিতর দিয়ে মাটির নীচে এই রকম সুড়ঙ্গপথ সোজা Clinic অবধি চলে গেছে। হোটেলে ডাক্তার ও নার্স রোগীদের জন্য সদাই থাকে; যে কোন রোগী ঘর থেকে অফিসে খবর দিলেই নার্স সেখানে উপস্থিত হয় এবং প্রয়োজন হলে রোগীকে ঠেলা গাড়ীতে ঠেলে সোজা সুড়ঙ্গপথ দিয়ে Clinicএ নিয়ে যায়।

সহর ঘুরে রোগী দেখে দেখে আমার মনে হচ্ছে যেন এ কোন হাসপাতালের রাজত্বে এসে পড়েছি। আমাদের মত সুস্থ দেহীর পক্ষে এ রকম স্থান যেমন নিরানন্দের, তেমনি অসহ্য কষ্টকর। চারিদিকে কেবল বিরস ও বিকৃত মুখাবয়ব ও রোগের দৃশ্য দেখে দেখে মনে হচ্ছে যেন আমি নিজেও রোগী হয়ে পড়ছি!

(ক্রমশঃ)

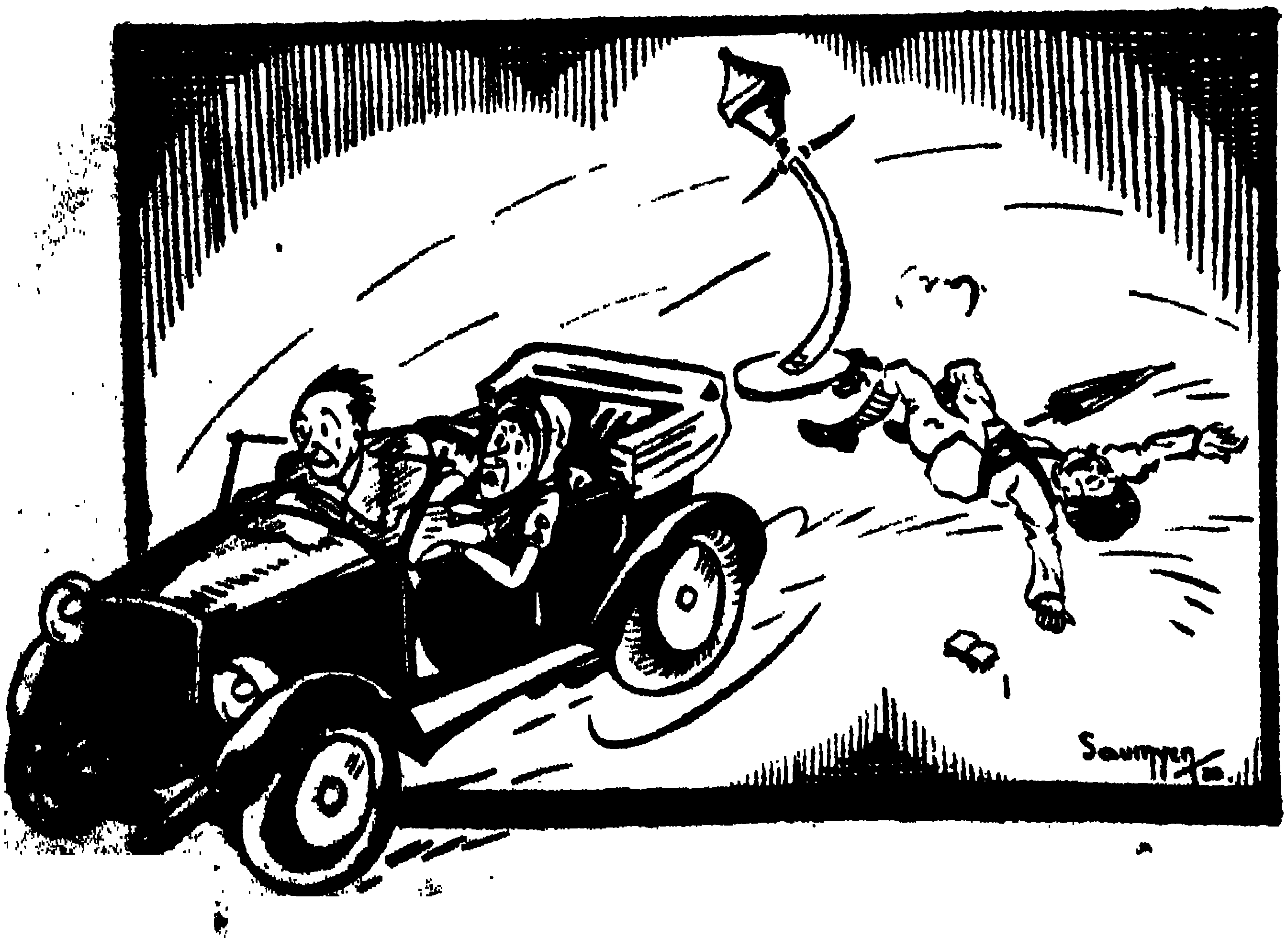

স্ত্রী: হ্যাগো, এত জোরে মোটর চালাচ্ছ—পুলিসে ধরি না নেয়!

স্বামী: হুঁ, সেইজন্যে সবার আগে পুলিশটাকেই চাপা দিয়ে এলুম।

শিল্পী: সৌম্যেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

সাময়িকী

মানভূমে সত্যাগ্রহ—

মানভূম জেলা পশ্চিম বাঙ্গালার সন্নিহিত এবং ঐ জেলার অধিকাংশ অধিবাসী বাঙ্গালী ও বাঙ্গালা ভাষা-ভাষী। ঐ অঞ্চল এক সময় অরণ্য ও পতিত ছিল—বাঙ্গালা হইতে লোক যাইয়া বিভিন্ন স্থানে সহর নির্ম্মাণ করিয়াছে ও মানভূম জেলাকে সর্ব্ব বিষয়ে উন্নত করিয়াছে। ঐ স্থানের আদিম অধিবাসীদের নিজস্ব কোন ভাষা ছিল কি না এখন আর জানা যায় না—তাহারা সকলেই বাঙ্গালী কৃষ্টি ও সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করিয়াছে ও বাঙ্গালার মতই জীবনযাত্রা প্রণালী গ্রহণ করিয়াছে। গত 'পৌষ' মাসের ভারতবর্ষে 'মানভূমের কথা' প্রবন্ধে সেখানকার অবস্থার বিষয় বিশদভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। গত ১৯২১ সাল হইতে মানভূমে যে স্বাধীনতার আন্দোলন পরিচালিত হইয়াছিল, তাহার পুরোভাগে ছিলেন ঋষিকল্প স্বর্গত নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয়। বর্ত্তমানে তাঁহারই সহকর্ম্মী ও বন্ধু শ্রীযুত অতুলচন্দ্র ঘোষ মানভূমের সকল আন্দোলনের নেতারূপে কাজ করিতেছেন।

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট ভারত-বিভাগ তথা স্বাধীনতা লাভের পূর্ব্ব হইতেই মানভূম জেলা যাহাতে বাঙ্গালা দেশের অন্তর্ভুক্ত করা হয়, সেজন্য আন্দোলন চলিতেছিল। যে মানভূমের শতকরা প্রায় ৮০জন বঙ্গ-ভাষা ব্যবহার করে, তাহা যে বাঙ্গালার সহিত সংযুক্ত হওয়া উচিত, এ বিষয়ে মতভেদ থাকা সম্ভব নহে। বহুবার বহু কংগ্রেস ও কনফারেন্সে এই কথা স্বীকার করা হইয়াছে ও সকল চিন্তাশীল ব্যক্তিই মানভূমকে বাঙ্গালার সহিত একত্র করিবার পক্ষে মত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু কিছুদিন হইতে বিহারের খ্যাতনামা নেতা ভূতপূর্ব্ব রাষ্ট্রপতি ডাক্তার রাজেন্দ্রপ্রসাদ এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করিতেছিলেন। স্বাধীনতা লাভের পর ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াই বিহার মন্ত্রিসভার সদস্যগণ, বিশেষ করিয়া বিহারের সকল বিতাড়নের জন্য আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহারা সেখানকার বাঙ্গালীদিগকে বলিয়াছেন—হয় তোমরা বিহারী ভাষা শিক্ষা করিয়া বিহারী হইয়া এখানে বাস করিতে থাকো, না হয় মানভূম ছাড়িয়া বাঙ্গালা দেশে চলিয়া যাও। কিন্তু মানভূমে এতদিন সকল আন্দোলনের নেতৃত্ব করিয়াছেন বাঙ্গালীরা। কাজেই মানভূম হইতে বাঙ্গালী বিতাড়নের আন্দোলন পরিচালন নেতৃবৃন্দের পক্ষে সহজ হয় নাই। কিন্তু শাসনযন্ত্র তাহাদের অর্থাৎ বিহারীদের হাতে থাকায় তাঁহারা সে সুযোগ ত্যাগ করিলেন না। মানভূমে যে সকল বাঙ্গালী সরকারী কর্ম্মচারী ছিলেন, তাঁহাদিগকে অন্য জেলায় বদলী করিয়া তাঁহাদের স্থানে অবাঙ্গালী সরকারী কর্ম্মচারী আনিলেন। আদালতে বাঙ্গাল ভাষা ব্যবহার বন্ধ করিয়া দিলেন, প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যম বাঙ্গালা না হইয়া বিহারী ভাষা হইবে বলিয়া ঘোষণা করিলেন। এ ব্যবস্থা যে সকল বিদ্যালয় মানিয়া না লইল, তাহাদের সরকারী সাহায্য বন্ধ করিয়া দিলেন। সকল বেসরকারী প্রতিষ্ঠান বা সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত নির্ব্বাচিত সমিতি প্রভৃতি হইতে বাঙ্গালীদিগকে ছলে বলে কৌশলে তাড়াইয়া দেওয়া হইতে লাগিল। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুত অতুলচন্দ্র ঘোষ মহাশয় গত প্রায় ৩০ বৎসর কাল মানভূমে কংগ্রেস আন্দোলনের নেতা ছিলেন, জেলা কংগ্রেস কমিটীর তিনিই ছিলেন সভাপতি। কমিটীর সভায় এমন ব্যবহার করা হইল যে প্রায় ৫০জন সদস্যের সহিত একদিন তিনি জেলা-কংগ্রেস কমিটীর সংস্রব ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিতে বাধ্য হইলেন। যে সকল বাঙ্গালী মানভূমকে বাঙ্গালার সহিত মিলিত করিবার আন্দোলন করিতেছিলেন, তাঁহাদের সরকারী কর্ম্মচারীরা নানাভাবে নির্য্যাতন ও লাঞ্ছনা করিতে লাগিলেন। অতুলবাবু এ বিষয়ে বার বার কংগ্রেস-কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিয়াও কোন ফল হইল না। সহসা সকল স্থানের সকল সরকারী বিজ্ঞাপন প্রভৃতির ইংরাজী বা বাঙ্গালা ভাষা

বাঙ্গালীর দ্বারা নির্ম্মিত, গঠিত ও সমৃদ্ধ—তাহার রাজপথে বাঙ্গালীদের নানাভাবে অপমান করা হইতে লাগিল।

গত ১৪ই ও ১৫ই মার্চ্চ অত্যাচারের মাত্রা সীমা অতিক্রম করিল। হিন্দুস্থানীরা দোলযাত্রা উপলক্ষে বাঙ্গালীদের বাড়ীতে অনধিকার প্রবেশ করিয়া রং, কাদা প্রভৃতির দ্বারা বাড়ীর জিনিষপত্র নষ্ট করিয়া দিতে লাগিল; যাহারা ইহার প্রতিবাদ করিল, তাহারা প্রহৃত ও নিগৃহীত হইল। বহু ভদ্রলোক এইভাবে ঐ দিন ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। বিহারী পুলিস সাদা পোষাক পরিয়া দুষ্কৃতদের সর্ব্বপ্রকার সাহায্য করিয়াছে। অনেক স্থলে পুলিসের বড়কর্ত্তা ও পদস্থ সরকারী কর্ম্মচারীদের সম্মুখে স্ত্রীপুরুষনির্ব্বিশেষে সকল বাঙ্গালী নির্য্যাতীত হইয়াছে—এই দুষ্কৃতির প্রতিবাদ করা পর্য্যন্ত কেহ প্রয়োজন মনে করে নাই। হোলী উৎসব লইয়া যে পুরুলিয়া সহরে এরূপ বীভৎস কাণ্ড ঘটিতে পারে, তাহা কেহ কল্পনাও করিতে পারে নাই। নোয়াখালিতে যেভাবে মুসলমানরা হিন্দুদিগকে নিগৃহীত করিয়াছিল, পুরুলিয়ায় বিহারীদের হাতে বাঙ্গালীরাও দুই দিন সেইভাবে নির্য্যাতীত হইয়াছে। সরকারী কর্ম্মচারীরা তাহা দেখিয়াও কিছুই করেন নাই। বিহারের মন্ত্রীমণ্ডলী পরোক্ষভাবে এই সকল ব্যবস্থা সমর্থন করিতেছেন। কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট হয় ত শ্রীযুত রাজেন্দ্রপ্রসাদের প্ররোচনায় এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে সাহস করিতেছেন না। আজ মানভূমে লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালী অধিবাসীর জীবন ও সম্ভ্রম বিপন্ন হইয়াছে। সমগ্র বাঙ্গালী জাতিকে আজ এই অন্যায়ের প্রতিবাদে দণ্ডায়মান হইয়া ইহার প্রতীকার ব্যবস্থা করিতে হইবে। নচেৎ মানভূম বাঙ্গালার অন্তর্ভুক্ত হওয়া দূরে থাকুক—মানভূমের সকল বাঙ্গালী নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে—তাহাদের বিহারী বনিয়া যাইতে হইবে।

মানভূমের নেতা শ্রীযুত অতুলচন্দ্র ঘোষের নেতৃত্বে গত ৬ই এপ্রিল হইতে ইহার প্রতিবাদে মানভূমের সর্ব্বত্র সত্যাগ্রহ আরম্ভ হইয়াছে। অতুলবাবু ও তাঁহার পত্নী দলে দলে সেবক সঙ্গে লইয়া গ্রামে গ্রামে সত্যাগ্রহ করিতেছেন। বিহার-সরকারের এই অনাচার দূর করার জন্য কোন পথ না থাকায় মানভূমবাসীরা শেষ পথ সত্যাগ্রহ আরম্ভ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। সত্যাগ্রহ পরিচালকরূপে শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘোষ যে বিবৃতি প্রচার করেন—তাহার শেষাংশ আমরা এখানে উদ্ধৃত করিলাম। ইহা হইতেই তাঁহাদের কার্য্যের উদ্দেশ্য বুঝা যাইবে।

"দুঃখের জীবনে মানুষ ব্যাকুল হয়। দমন-পীড়নে মানুষ অধীর হয়—ইহা স্বাভাবিক। কিন্তু মানভূম জেলার জনজীবন অন্য এক আদর্শের পথে সংগঠিত হইতে চলিয়াছে। পশু বলের কাছে আত্ম সংযমের ও অহিংস জীবনের মর্য্যাদা সহনীয় হইয়া দেখা দিবে—ইহাই আমাদের জয়। আমরা জনগণ সর্ব্বপ্রকার প্ররোচনা, উত্তেজনা, দমন, পীড়ন ও লাঞ্ছনার মধ্যে যেন স্থির, সংযত, শৃঙ্খলাপূর্ণ ও অহিংসা মনোভাবাপন্ন থাকিতে পারি—ইহাই আমাদের কর্ত্তব্য হইবে। এবং এই অনুকূল পরিস্থিতির বিপুল বলের উপরই আমাদের সাফল্য বিরাটরূপে দেখা দিবে—এই কথা স্মরণ রাখিয়া যেন আমরা প্রত্যেকে নিজের দায়িত্ব পালন করি—ইহাই প্রার্থনা।"

মহাত্মা গান্ধীও দেশবাসীকে এই শিক্ষাই দিয়া গিয়াছেন। মানভূমের অবস্থার কথা অবগত হইয়া দেহাবসানের অল্পদিন পূর্ব্বে মহাত্মা গান্ধী অতুলবাবুকে এক পত্রে এই কথাই লিখিয়াছিলেন—"ভাই অতুলবাবু, আমি কি করিতে পারি? চিরকাল যুবক থাকিতে পারি না। সে জন্য যে সেবা আমি একস্থানে বসিয়া করিতে পারি, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকুন। মানভূমবাসীদিগকে বলিবেন যে, অহিংসা দ্বারা আমি সব কিছুই করিতে পারি এবং উহার প্রতীক চরখা।—বাপুর আশীর্ব্বাদ।"

মানভূমবাসীও আজ বুঝিয়াছেন, একমাত্র এই পথেই অন্যায়, অত্যাচার ও স্বৈরতন্ত্রের অবসান হইবে। তাই সকল বিপদ তুচ্ছ করিয়া ৬ই আগষ্ট জীবনপণ করিয়া মানভূমবাসীরা সত্যাগ্রহ সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

লোক মনে করিতে পারে, পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনের জন্য মহাত্মা গান্ধী সত্যাগ্রহ করিয়াছিলেন, আজ স্বাধীন ভারতে আর সত্যাগ্রহের প্রয়োজন নাই। যাঁহারা মহাত্মা গান্ধীর জীবন পাঠ ও অনুধাবন করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, জীবনের সকল ক্ষেত্রে ও সকল কার্য্যে অন্যায়ের প্রতীকারের জন্য গান্ধীজি সত্যাগ্রহ করার পক্ষপাতী ছিলেন। সেই জন্যই তাঁহার অন্তরঙ্গ সহকর্মী ও শিষ্য

সেই পথে তাঁহারা জয়যুক্ত হউন, আমরা সকলে আজ ইহাই প্রার্থনা করিব। এ সংগ্রামে আসুরিক শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন নাই; আত্মিক শক্তি দ্বারা সংগ্রাম জয়যুক্ত হইবে। পুলিসের লাঠি, বেয়নেট, বন্দুকের গুলী কিছুই এই পথে বাধা সৃষ্টি করিতে পারিবে না। আমরা প্রথম দুই দিন সত্যাগ্রহের বিবরণ পাঠ করিয়াছি। শ্রদ্ধেয় অতুলবাবু লাঠি দ্বারা আহত হইয়া শয্যাশায়ী হইয়াছেন। বহু কর্মী আহত হইয়াছেন। অতুলবাবুর পত্নী, মানভূমবাসী সকলের মাতৃস্বরূপা শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা ঘোষও আহত হইয়াছেন। পুলিস দাঁড়াইয়া সকল অনাচার দেখিতেছে—একদল গুণ্ডা সর্ব্বত্র সত্যাগ্রহীদের উপর লাঠি মারিতেছে। সাংবাদিকদের উপর বিষাক্ত ভেষজ রস নিক্ষিপ্ত হইতেছে।

দোলের সময় পুরুলিয়ার জাতীয়তাবাদী সাপ্তাহিক সংবাদপত্র 'মুক্তি'র ছাপাখানা দুর্ব্বৃত্তরা নষ্ট করিয়া দিয়াছিল। বলা বাহুল্য নিবারণবাবুর জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীবিভূতিভূষণ দাশগুপ্ত মুক্তির সম্পাদক। কলিকাতা হইতে বহু বাঙ্গালী সত্যাগ্রহ পরিচালনার জন্য মানভূমে গমন করিয়াছেন। আমরা আশা করি, কেন্দ্রীয় কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ ও শাসকবর্গ এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়া এই অপ্রত্যাশিত, অসন্তোষজনক ঘটনার শান্তির ব্যবস্থা করিয়া ভারতবাসী মাত্রেরই ধন্যবাদ ভাজন হইবেন। নচেৎ মানভূমে যে আগুন জ্বলিয়াছে, তাহা ভারতের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িবে ও স্বাধীন ভারতের মর্য্যাদা ও শান্তি ক্ষুণ্ণ করিবে।

দার্জ্জিলিং-এর শিক্ষা—

দার্জ্জিলিংয়ে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের একটি সদস্যপদের জন্য উপ-নির্ব্বাচনে কংগ্রেস পক্ষ পরাজিত হওয়ায় দেশবাসী শঙ্কিত হইয়াছেন। তথায় কংগ্রেস-প্রার্থী মাত্র ২ হাজার ও বিরুদ্ধ পক্ষ ৭ হাজার ভোট পাইয়াছে। তাহার পর টিটাগড় মিউনিসিপালিটী ও জয়নগর-মজিলপুর মিউনিসিপালিটীর কমিশনার নির্ব্বাচনেও কংগ্রেস পক্ষের ফল ভাল হয় নাই। দক্ষিণ কলিকাতা হইতে নির্ব্বাচিত বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য সতীশচন্দ্র বসুর মৃত্যুর পর তথায় উপ-নির্ব্বাচনের কোন ব্যবস্থা হয় নাই। মন্ত্রী কিরণশঙ্কর রায় সাবধানতার সহিত কাজ করিতে হইবে। বাঙ্গলার কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে জনগণের অসন্তোষের পরিমাণ দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে। তাহা কি ভাবে কমানো যায়, সে জন্য কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষ তথা মন্ত্রিমণ্ডলীকে বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া নূতন ব্যবস্থা অবলম্বনে অগ্রসর হইতে হইবে। একদল স্বার্থপর লোক যে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানগুলি কৌশলে দখল করিয়া তথায় প্রভুত্ব স্থাপনের চেষ্টা করিতেছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। তাহাদিগকে দূর করিয়া দিয়া প্রকৃত দেশ সেবকগণকে যোগ্য স্থান দান না করিলে অচিরে দেশবাসী কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের উপর আস্থা হারাইতে বাধ্য হইবে।

সশিষ্য শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মন্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ—

শ্রীযুত নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার মহাশয়ের বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহা লইয়া দেশে সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। বিলাতে মিঃ বেলচারের ব্যাপারের যে ভাবে মীমাংসা হইয়াছে, এখানেও সেইরূপ হওয়া প্রয়োজন। পরিষদে শ্রীযুত দত্ত মজুমদার কৈফিয়ৎ দিলেও সাধারণ লোক তাহাতে সন্তুষ্ট হইবে না। প্রধান মন্ত্রী ডক্টর শ্রীবিধানচন্দ্র রায় বলিয়াছেন যে তিনি কোনরূপ অনাচার সহ্য করিবেন না। কাজেই শ্রীযুত দত্ত মজুমদারের বিরুদ্ধে

বুদ্ধশিষ্যদ্বয়ের পূতাস্থির আধারসহ বিহারের প্রধান মন্ত্রী

আনীত অভিযোগগুলির নিরপেক্ষ তদন্ত দ্বারা তাহার সত্যতা প্রমাণের ব্যবস্থা করিলেই লোক সন্তুষ্ট হইবে। তদন্তের সময় যাহাতে কোন পক্ষ প্রভাবিত না হয়, তাহারও উপযুক্ত বন্দোবস্ত থাকা প্রয়োজন। এই সকল অভিযোগ শুধু বাঙ্গালার মন্ত্রিসভার পক্ষে অশুভ ফলদায়ক নহে, বর্ত্তমান মন্ত্রিসভা যে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান দ্বারা গঠিত, তাহার ভবিষ্যৎ [illegible] অনিষ্টজনক হইবে। কাজেই দেশবাসী

আসামে বাঙ্গালী-বিদ্বেষ—

গত ৩০শে মার্চ্চ তারিখের 'অসমীয়া' নামক বিখ্যাত দৈনিক পত্রে আসাম প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদক শ্রীঅম্বিকাগিরি রায়চৌধুরী এক পত্র প্রকাশ করিয়া জানাইয়াছেন—"আসামে কাহারও বাঙ্গালা ভাষায় কথা বলা উচিত নহে। বাঙ্গালী প্রণীত কোন পুস্তকই অসমীয়াদের পড়া উচিত নয়, বরং অবাঙ্গালী প্রণীত যে কোন হিন্দী বা ইংরাজি পুস্তক অসমীয়াদের পড়া কর্ত্তব্য। আসামের বাঙ্গালীরা অসমীয়া ভাষা শিখিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া আমাদের শত্রুতা করিয়াছে, এ কারণ এরূপ [illegible] দিগকে আসামে থাকিতে দেওয়া বিপজ্জনক। আসামের অধিবাসীগণের বাংলা গান শুনা বা বাংলা সিনেমা দেখা উচিত নয়। যে সমস্ত দোকানে বাংলা সাইনবোর্ড আছে, সেগুলি পরিবর্ত্তন করিয়া অসমীয়া ভাষায় লিপিবদ্ধ করা দরকার।" এই পত্র সম্বন্ধে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। একদিকে বিহার

আসিতে হইবে, না হয় ঐ দুই প্রদেশের ভাষা ও কৃষ্টি গ্রহণ করিয়া তথায় বাস করিতে হইবে। ইহার প্রতীকার ব্যবস্থা কে করিবে? যে বাঙ্গালা দেশ প্রথম স্বাধীনতার সংগ্রাম আরম্ভ করিয়াছিল, স্বাধীনতা লাভের পর সেই বাঙ্গালার অধিবাসীদিগকেই আজ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিপন্ন ও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইতেছে

সবই সুরক্ষিত হইতেছে। দেশবন্ধুর নিজ বাসভবন ভাঙ্গিয়া সেখানে নূতন করিয়া ইমারত গঠনে কাহারও অধিকার ছিল না। দেশবন্ধু বাটী দান করিয়াছিলেন, দেশবাসীর কর্ত্তব্য ছিল তাহা রক্ষা করা, তাহা হয় নাই। আরও একটী বিসদৃশ ঘটনা লক্ষ্য করিবার বিষয়। দেশবন্ধুর অট্টালিকা ভাঙ্গিয়া সেই স্থানে যে নূতন বাড়ী হইয়াছে, তাহাতে

প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের দিল্লী অধিবেশনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মাননীয় ডাঃ শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, মূল-সভাপতি শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত, বিজ্ঞান শাখার সভাপতি স্যার জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ।

চিত্তরঞ্জন সেবাসদন—

পশ্চিম বাঙ্গালা সরকার সেবাসদনকে এ বৎসর সাড়ে লক্ষ টাকা সাহায্য দান করিতেছেন বলিয়া প্রকাশ। দেশের একটা বড় অভাব দূর করিতেছে এবং দেশবন্ধুর নামের সহিত জড়িত প্রতিষ্ঠানের মঙ্গল সকলেরই কাম্য। কিন্তু দেশবন্ধুর স্মৃতিরক্ষার যে কি ব্যবস্থা হইতেছে তাহা ঠিক বুঝিতে পারি না। প্রত্যেক দেশই মহাপুরুষদের বাস বাটী প্রভৃতি বিনা পরিবর্ত্তনে যথাযথ-ভাবে রক্ষা করিবার চেষ্টা করে। সেক্সপিয়রের বাড়ী,

বাঙ্গালা সরকার দুই লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছে, আর এক ভদ্রলোক ৬২,০০০৲ টাকা দিয়াছেন এবং দেশবন্ধুর বাড়ীর ভিতের উপর সেই দাতার নামে বাড়ী নির্ম্মিত হইয়াছে। আমাদের প্রশ্ন, বাঙ্গলা সরকার যদি দুই লক্ষ টাকা খরচ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আর ৬২,০০০৲ অর্থাৎ শতকরা ২৩·৭ টাকা খরচ করিয়া সমগ্র বাড়ীটী নির্ম্মাণ করিতে পারিলেন না? যিনি ৬২,০০০৲ খরচ করিয়া ২,৬২,০০০৲ সম্পত্তি নিজ নামে প্রচারিত করিতে পারেন, তিনি খুব হিসাবী লোক, সন্দেহ নাই। [illegible]

উপর কেহ ৫০,০০০ দিলে তাহার নামেই আবার হাসপাতালের বিভাগ খোলা হইবে।

পুরুষের বদনাম নারী—

চিরকাল জানিয়া আসিতেছি নারী জাতি স্বভাবতঃ দুর্ব্বল; ইংরাজি ভাষায় ইঁহাদিগকে বলিয়াছে "weaker sex" "fair sex" প্রভৃতি। সম্প্রতি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন চিকিৎসা-বৈজ্ঞানিক গবেষণা সাহায্যে স্থির করিয়াছেন, এ ধারণা নিতান্ত অমূলক। তাঁহারা বলেন যে পুরুষজাতি যে কেবল দুর্ব্বলতর তাহা নহে, উপরন্তু তাহাদের মধ্যে ক্ষয়ের বীজ বর্ত্তমান। আমেরিকায় পুরুষ ক্রমশঃ দুষ্প্রাপ্য বস্তু হইয়া উঠিতেছে। ১৯১৮ সালে আমেরিকায় নারী অপেক্ষা পুরুষ বেশী ছিল ২৭ লক্ষ; বর্ত্তমানে তাহা উল্টাইয়া গিয়া নারী অধিক হইয়াছে ৪,৯৮,০০০ এবং ১৯৭০ সালে তাহা ১৭,৬৮,০০০ দাঁড়াইবে। ভারতবর্ষ হইতে কিছু পুরুষ মাঝে মাঝে চালান দিলে এ সমস্যা অচিরকালেই দূরীভূত হইবে।

অভিভাবকের সমস্যা—

শিক্ষকেরা বলিতেছেন 'মাহিনা বাড়াও'। ইহা লইয়া ধর্ম্মঘট শোভাযাত্রা হইল। ছাত্রকে বলা হইল, "ইহাতে তোমাদের মাহিনা বাড়িবে।" তাহার উত্তর হইল, "গভর্ণমেণ্ট দিবে"। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রদের বেতন বৃদ্ধি হইল। এবার ছাত্ররা বলিল "মাহিনা কমাও।" কেহ সে কথা কানে তুলিল না, ছাত্ররা ধর্ম্মঘট করিল, স্কুল কলেজ বন্ধ করিয়া পথে পথে ঘুরিয়া "ছাত্র দাবী মানতে হবে" নীতি প্রচার করিল। টাকা যাহারা যোগাইবার তাহারা যোগাইল. ব্যয় বৃদ্ধি হইল, যাহাদের পড়িবার জন্য ব্যয়, তাহারা লেখাপড়া করিল না। বর্দ্ধিত ব্যয় অকারণে গেল। কেহ কেহ রৌদ্রে জলে ঘুরিয়া অসুস্থ হইল, কেহ গুলি খাইল, কেহ হাজতে গেল, কেহ বা জরিমানা দিয়া রেহাই পাইল। অভিভাবকের অর্থব্যয়ের সঙ্গে দুশ্চিন্তার অংশ যোগ হইল। সব স্থানে সঙ্ঘ হইয়াছে, স্কুলের পাঠ্য-পুস্তক লেখকের সঙ্ঘ হইল। যেমন বইই হউক তাহার গুণাগুণ বিচার কে করিবে; লেখকরাই পাঠ্য পুস্তক নির্ব্বাচক এবং এ উহার বই নিজ স্কুলে পাঠ্য করিল। সেই ভাবে পারস্পরিক সাহায্যের ব্যবস্থা হইল। পাঠ্য পুস্তকের যে দর নির্দ্ধারিত হইল, অনেক ক্ষেত্রে না উঠিলেও বদল করা হইল। অভিভাবক তাহার দাম দিয়া মরিল। বাস্তবিকই যাহাদের শিক্ষার জন্য এত ব্যয়, এত দুশ্চিন্তা তাহারা ত কখনও রাজনীতির দলের, কখনও শিক্ষকের প্ররোচনায়—কখনও দেশ-বিদেশের ঘটনায় বিক্ষুব্ধ হইয়া পাঠের ক্ষতি করিল। এখন অভিভাবক নানা স্থানে জবাই হইতেছে। ছাত্রদের বেতন, শিক্ষকদের বেতন, পাঠ্য পুস্তকের দর, গভর্ণমেণ্টের ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তব্য—সবই অভিভাবকদের আলোচ্য বিষয়। পড়ুয়াগণ এ সকলের মীমাংসার ভার অভিভাবকদের উপর ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত মনে লেখাপড়া করিয়া কৃতিত্বের পরিচয় দিলে যাঁহাদের স্বার্থে এই বিক্ষোভ, সেই অভিভাবকমণ্ডলীর প্রকৃত স্বার্থ সংরক্ষিত হয়, তাহা ছাত্ররা বুঝিতে পারিলে অভিভাবকরা ধন্য হন।

নিখিল বঙ্গ বৈষ্ণব সাহিত্য সম্মেলন—চেতলা, আলিপুর

প্রশ্ন পত্র বিক্রয়—

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের হাই স্কুল ও ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষার সমস্ত প্রশ্ন পত্র পরীক্ষা আরম্ভ হইবার পূর্বে প্রকাশ্য ভাবে দশ টাকা হইতে পঞ্চাশ টাকায় বিক্রী হইয়াছে। আজকাল পরীক্ষা পরিচালনায় নানা ব্যাধি উপস্থিত হইতেছে এবং ইহার পরিসমাপ্তি কোথায় তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন। পরীক্ষা কেন্দ্রে ছাত্রেরা নানা প্রকার অসদুপায় অবলম্বন করিতেছে, প্রশ্ন পত্র বাহিরে

চীৎকারে উত্তর দেওয়া হইতেছে। পরীক্ষা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে প্রশ্নপত্র প্রস্তুতকারকের নাম প্রকাশিত হয়, পরীক্ষা শেষ হইতে না হইতেই পরীক্ষকদিগের নাম সংগ্রহ করিয়া ছাত্রেরা পরীক্ষকের জীবন দুর্বিষহ করিয়া তুলে। গার্ডকে ভীতি প্রদর্শন হইতে আরম্ভ করিয়া হত্যা পর্যন্ত করা হইতেছে। দিনে দিনে শিক্ষা, বিশেষতঃ পরীক্ষা ব্যবস্থায় যে সকল সমস্যা আসিয়া দেখা দিতেছে তাহার মীমাংসা যে কি, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। কিন্তু এ সম্পর্কে বয়স্কের যে দায়িত্ব আছে তাহা অস্বীকার করিলে চলে না। বিশেষতঃ তদ্বির করিয়া ছাত্র "পাশ" করার ব্যাপারে যদি অভিভাবক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উৎসাহ না দেন বা ছাত্রদের কার্য্যের সমর্থন না করেন, তাহা হইলে এই পাপ অনেকাংশে দূরীভূত হয়। যে সকল ছাত্র পরীক্ষা কেন্দ্রে অপকর্ম করিয়া ধরা পড়ে এবং তাহার উত্তর স্বরূপ প্রতিহিংসা গ্রহণে প্রস্তুত হয়, বাড়ীতে তাহাদের অনেকেরই আচরণ লক্ষ্য করিলে পরবর্ত্তী ঘটনার আভাস পাওয়া যায়। কেবল ছাত্রেরা করে বলিয়া উপেক্ষা না করিয়া ছাত্র মহলের যত অনাচার বন্ধ করিবার জন্য শিক্ষক ও অভিভাবক সকলেরই দায়িত্ব আছে বলিয়া মনে করা নিতান্ত অসঙ্গত নয়।

সরকারী বেতনের বহর—

পশ্চিম বাঙ্গালা সরকারের প্রধান মন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ব্যবস্থা পরিষদে বলিয়াছেন, গভর্ণমেণ্টের উপরওয়ালাদের মাহিনা বাড়িয়াছে বলিয়া যাহারা আলোচনা করে তাহাদের উক্তি ভিত্তিহীন ও আহাম্মুকী (moonshine and nonsense)। বড় বড় কর্ম্মকর্ত্তাদের যে ভীষণ ক্ষতি হইয়াছে তাহা তিনি প্রকাশ করেন। ১৯৩৯ সালে টাকার অর্থের মূল্য ১০০৲ ছিল এখন ভারতীয় পুলিশ সার্ভিস প্রতি ১০০৲তে সেখানে ৯৯·১, ভারতীয় সিভিল সার্ভিস থাকিলে ৮৮·৩ টাকা এবং বিভাগীয় কমিশনার ৭২·৫ টাকা পাইতেছেন। সম্ভবতঃ উচ্চতর বেতনের উপর ইনকম্ ট্যাক্সের হার কিছু বেশী বলিয়া শাসক সম্প্রদায়ের এই ভীষণ ক্ষতি হইয়াছে। কিছুদিন যাবত সংবাদপত্রের দপ্তর হইতে আরম্ভ করিয়া পত্রিকাগুলি পর্য্যন্ত প্রকাশ করিতেছে যে অনেকেই যাঁহারা ১০০০৲ মাসিক পাইতেছেন; সুতরাং তাহাদের "বুকে হাত পড়ে না।" ডাক্তার রায় এ সম্বন্ধে কোনও উক্তি করেন নাই। এক সরকারী কর্ম্মচারীর আসল মাহিনা ৭০০৲; তিনি বর্ত্তমানে অপরের অনুপস্থিতিতে কাজ চালাইয়া দেন সেই জন্য পান (officiating pay) অধিকন্তু ৩০০৲, ব্যক্তিগত মাহিনা (personal pay) ২৭৫৲, বিশেষ মাহিনা (Special pay) পান ১৫০৲। অধিকন্তু মাহিনা (additional pay) ১৮৫৲ এবং মাগগী ভাতা ১৫০৲ অর্থাৎ ৭০০৲ টাকা মাহিনার লোক মাসিক ১৭৬০৲ পাইয়া থাকেন। এই সকল কর্ম্মচারীর দুঃখে ডাঃ রায় নিশ্চয়ই কাঁদিয়া আকুল হইবেন। বর্ত্তমানে জনসাধারণের আর্থিক অবস্থার একটু পরিচয় দিলে আমরা সুখী হইতাম।

শ্রীকেশব দেব জালান—

প্রসিদ্ধ ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান মেসার্স সুরজমল নাগরমলের অংশীদার স্বর্গত শেঠ বংশীধর জালানের তৃতীয় পুত্র

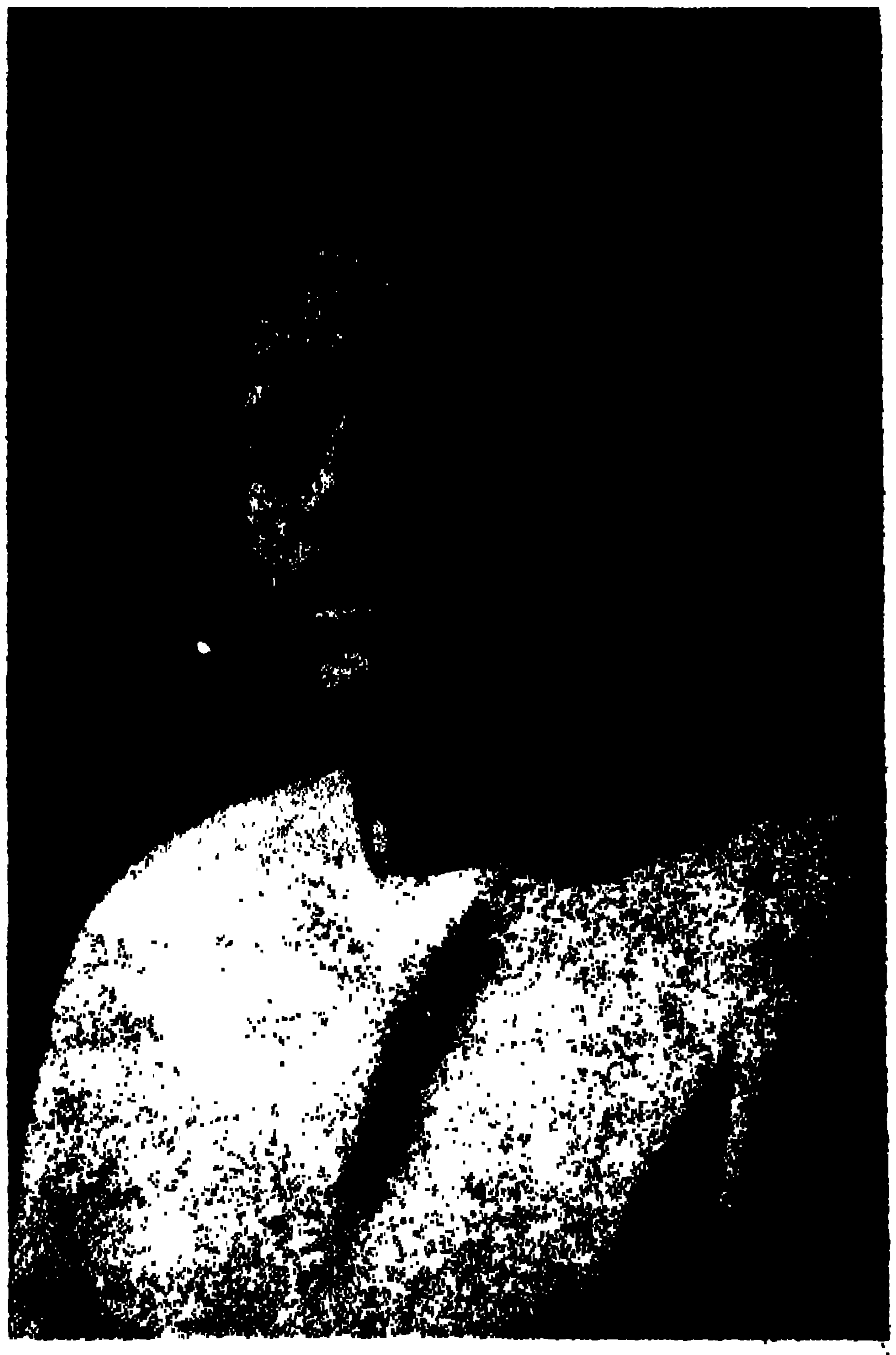

শ্রীকেশবদেব জালান

শ্রীকেশব দেব জালান ১৯৪৯-৫০ সালের জন্য কর্পোরেশন

এত অল্প বয়সে কেহ এ সম্মান লাভ করেন নাই। কেশবদেববাবু বহু ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ও জনহিতকর কার্য্যের সহিত সংশ্লিষ্ট।

শ্রীঅমল হোম—

খ্যাতনামা সাংবাদিক, কলিকাতা মিউনিসিপাল গেজেটের সম্পাদক শ্রীঅমল হোম পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেণ্টের প্রচার বিভাগের ডাইরেক্টার নিযুক্ত হইয়া গত ১লা মার্চ্চ কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি ১৯১৬ সাল হইতে

শ্রীঅমল হোম

সাংবাদিকের কাজ করিতেছেন এবং লাহোরের 'পাঞ্জাবী' ও 'ট্রিবিউন', এলাহাবাদের 'ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট', কলিকাতার 'ইণ্ডিয়ান ডেলী নিউজ' প্রভৃতি পত্রে কাজ করার পর গত ১৯২৪ সাল হইতে কলিকাতা মিউনিসিপাল গেজেটের সম্পাদকের কার্য্য কৃতিত্বের সহিত সম্পাদন করিয়াছেন।

মন্ত্রিসভা বদল—

মাদ্রাজ ও পূর্ব্ব পাঞ্জাব দুইটি প্রদেশেই মন্ত্রিসভা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। মাদ্রাজে শ্রীকুমার স্বামী রাজার নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছে। কোন প্রদেশেই মন্ত্রীরা জনগণের স্বার্থরক্ষার উপযুক্ত ভাল কাজ করিতে সমর্থ হন নাই। সেজন্য চারিদিকে অসন্তোষ বাড়িয়া গিয়াছে। মাদ্রাজ ও পূর্ব্ব-পাঞ্জাবে মন্ত্রিসভা পরিবর্ত্তনের তাহাই একমাত্র কারণ। পশ্চিম বাঙ্গালার অবস্থাও আশাপ্রদ নহে। এখানেও ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য দলের বিষম মতভেদ দেখা যাইতেছে।

শ্রীহরগোপাল বিশ্বাস—

বেঙ্গল কেমিকেল এণ্ড ফার্মাসিটিকাল ওয়ার্কস লিমিটেডের চিফ কেমিষ্ট ডক্টর শ্রীহরগোপাল বিশ্বাস ভারত গভর্ণমেণ্টের বাণিজ্য দপ্তরের আহ্বানে সম্প্রতি জার্ম্মাণী গমন করিয়াছিলেন। জার্ম্মাণী, সুইজারল্যাণ্ড ও ইংলণ্ডের শিল্পাঞ্চলগুলি পরিদর্শনের পর তিনি স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন। ঐ সকল দেশে কি ভাবে রাসায়নিক দ্রব্যাদি উৎপন্ন হয়, সে সকল দ্রব্য উৎপাদনের যন্ত্রাদি কোথায় কি

শ্রীহরগোপাল বিশ্বাস

ভাবে পাওয়া যায় এবং সে সকল যন্ত্র কি ভারতে আনয়ন করা যায়—প্রভৃতি বিষয়ে শিল্পগুলিকে সুযোগ সুবিধাদানের ব্যবস্থা করাই ওঁ প্রেরণের উদ্দেশ্য ছিল। তিনি বেঙ্গল কেমিকেলের কারখানায় কাজ করিতে করিতে বহু গ্রন্থ রচনা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডকটরেট উপাধি লাভ করিয়া সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন। ভারতবর্ষে তাঁহার লিখিত প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

কুমারী আদরিণী সেন—

নাগপুর ন্যাশনাল কলেজের ইংরাজি সাহিত্যের অধ্যাপিকা শ্রীমতী সুহাসিনী সেনের কনিষ্ঠা নাগপুর এস-বি-সিটি কলেজের ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপিকা কুমারী আদরিণী সেন এ বৎসর নাগ

পুরে বাঙালী মহিলাদের এই সম্মান লাভে সকল বাঙালীই গৌরব বোধ করিবেন।

করা হইয়াছে। প্রকৃত কি অবস্থা দাঁড়াইবে, তাহা বছরের শেষের দিকে বোঝা যাইবে। সম্ভাবিত আয়ের উপর নির্ভর

ব্যারাকপুর গান্ধীঘাটে সরোজিনী নাইডুর ভস্ম নিরঞ্জন উপলক্ষে বিরাট জনতা—ভস্মাধার হস্তে ধুতি ও পাঞ্জাবী পরিহিত পশ্চিম বঙ্গের প্রদেশপাল ডাঃ কৈলাশনাথ কাটজু।

ফটো—অসিতকুমার মুখোপাধ্যায়

গঙ্গাবক্ষে সরোজিনী নাইডুর ভস্ম নিক্ষেপ

ফটো—অসিতকুমার মুখোপাধ্যায়

করিয়া যে বাজেট প্রস্তুত হয় তাহাতে ভুল থাকার সম্ভাবনা বেশী। কর্পোরেশনের আয় বাড়িয়াছে বলিয়া সম্প্রতি এক রব উঠিয়াছে এবং ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় কর্পোরেশনের বর্ত্তমান পরিচালন ব্যবস্থার সুখ্যাতি করিয়াছেন। আমরা অন্যান্য বিষয় আলোচনা করিব না। আয় বৃদ্ধি সম্বন্ধে মনে হয়, কাউন্সিলরগণ বিদায় গ্রহণের পূর্ব্বে নিজেদের জনপ্রিয়তা ক্ষুণ্ণ করিয়া শতকরা দুই টাকা ট্যাক্স বৃদ্ধি করিয়াছিলেন, তাহার ফল তাঁহারা ভোগ করেন নাই; সেই বর্দ্ধিত হারে ট্যাক্স আদায় হইতেছে। তাহার পর ষষ্ঠ বার্ষিক ট্যাক্স বৃদ্ধির দরুণ বহু টাকা বর্দ্ধিত হারে ট্যাক্স আদায় হইতেছে। দাঙ্গার সময় যে সকল টাকা আদায় হয় নাই, তাহা ধীরে ধীরে আদায় হইতেছে। তাহা ছাড়া দাঙ্গার বৎসরের আয়ের তুলনায় এ বৎসরের ট্যাক্স আদায় বাড়িয়াছে। এই সকল বিষয় একসঙ্গে আলোচনা করিলে বলা যায় শাসন পরিচালনার ব্যবস্থা করিলে বর্ত্তমানের ট্যাক্সের পরিমাণ সহজেই আদায় হইত।

পরিষদে নির্ব্বাচন—

দক্ষিণ কলিকাতা কেন্দ্র হইতে স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র বসু পশ্চিমবঙ্গ পরিষদে নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি ছিলেন। তিনি গত জুলাই মাসে মৃত্যুমুখে পতিত হন। সে আজ আট মাসের কথা। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় ঐ কেন্দ্রে আজ পর্য্যন্ত নূতন নির্ব্বাচনের কোনও ব্যবস্থা হয় নাই। দক্ষিণ কলিকাতায় বহু শিক্ষিত লোকের বাস; সেইরূপ কেন্দ্রের কোনও প্রতিনিধি না থাকায় পরিষদের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হইতেছে। আমাদের বিশ্বাস ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় অনতিবিলম্বে সতীশ চন্দ্রের শূন্য স্থান পূর্ণ করিবার ব্যবস্থা করিবেন।

আন্দামান যাত্রা—

গুরুতর অপরাধে দণ্ডিত ব্যক্তিকে আন্দামান পাঠাইবার জন্য বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের ব্যবস্থা ছিল। আজ সে দিন নাই, আজ সেখানে বাস্তুত্যাগী পূর্ব্ব বঙ্গের অধিবাসীদিগের বাসভূমি করিবার চেষ্টা হইতেছে। পশ্চিম বঙ্গ সরকার হইতে আন্দামান বাসের সুবিধা অসুবিধার অনুসন্ধান হইবার পর উহা বাসের উপযোগী বিবেচিত হওয়ায় সরকারী সাহায্যে বাঙ্গালীর নূতন উপনিবেশ স্থাপন। এ কার্য্যে বাঙ্গালীর পূর্ব্ব পরিচয় আছে। পূর্ব্ব এসিয়া দ্বীপপুঞ্জে, সিংহলে বহুকাল পূর্ব্বে বাঙ্গালী উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল, আজ অবস্থার গতিকে বাঙ্গালী বিশাল সমুদ্রে পাড়ি জমাইতে বাধ্য হইয়াছে। আন্দামান বহু বীর শহীদের অস্থি ধারণ করিয়া আছে; নেতাজীও ইংরাজ সাম্রাজ্যের মধ্যে অবস্থিত আন্দামানে তাঁহার বিজয়ী পতাকা স্থাপন করিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। সুতরাং দেশের মাটী ছাড়িয়া যাওয়ার যে বেদনা আছে, পূতস্মৃতিবিজড়িত আন্দামানে নূতন আবাস স্থাপনে অতীতের গৌরব স্মরণ করিয়া আনন্দ লাভ করিবার বিষয়ও বর্ত্তমান। আন্দামান বাঙ্গালী শক্তির পরিচয় দিয়া গৌরবান্বিত হউক।

কেন্দ্রীয় বাজেটের আলোচনা—

নয়া দিল্লীতে পার্লামেণ্টে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের বার্ষিক আয় ব্যয় সম্বন্ধে আলোচনার সময় কংগ্রেস দলের সদস্যগণ যে ভাবে মন্ত্রীদের কার্য্যের সমালোচনা করিয়াছেন, তাহাতে সকলেই বিস্মিত হইয়াছেন। কংগ্রেস দল হইতেই বর্ত্তমান কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা গঠন করা হইলেও বাজেট আলোচনার সময় কংগ্রেস দলের সদস্যগণই বাজেটের অধিক তীব্রভাবে নিন্দা করিয়াছেন। কংগ্রেসের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি আচার্য্য কৃপালানী ঐ আলোচনায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক তৎপর ছিলেন এবং কংগ্রেস দলের কার্য্যে যে সকল ত্রুটি ও অন্যায় লক্ষিত হইতেছে, সেগুলি স্পষ্টভাবে জানাইয়া দিতে তিনি সঙ্কোচ বা দ্বিধা বোধ করেন নাই। রাষ্ট্রপতি ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়াও এ বিষয়ে স্পষ্ট কথা বলিয়াছিলেন। প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু কংগ্রেস দলের সদস্যদিগকে এই আলোচনার স্বাধীনতা দান করিয়া ভাল কাজই করিয়াছেন, দেশের জনগণের যে সকল অসুবিধা ভোগ করিতে হয়, একদল কংগ্রেস নেতা যে সে বিষয়ে ওয়াকিবহাল তাহাই প্রমাণিত হইয়াছে এবং ইহার ফলে কংগ্রেস পক্ষের দোষ ত্রুটি সত্বর সংশোধিত হইবার আশা করা যায়।

হাওড়ায় তিব্বতী বাবার উৎসব—

গত ১৩ই মার্চ্চ হাওড়ায় তিব্বতী বাবা বেদান্ত আশ্রমে

এবং পশ্চিম বঙ্গের প্রদেশপাল ডাঃ কাটজু প্রধান অতিথি-রূপে সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভায় শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীজ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী, ডাঃ যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী প্রভৃতি বক্তৃতা করিয়া তিব্বতী বাবার জীবন ও প্রচারিত শিক্ষার আলোচনা করেন।

যুক্তপ্রদেশের নূতন গভর্ণর—

শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর মৃত্যুর পর হইতে এলাহাবাদ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি শ্রীযুত বিধুভূষণ মল্লিক যুক্ত-প্রদেশের গভর্ণরের কাজ করিতেছিলেন। গত ৬ই এপ্রিল নয়া দিল্লী হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে শ্রীযুত এচ-পি মোদী যুক্তপ্রদেশের স্থায়ী গভর্ণর নিযুক্ত হইয়াছেন। এই নিয়োগে কোন ভারতবাসীই সন্তুষ্ট হইবে না। একজন কংগ্রেস নেতার ঐ পদলাভ করা উচিত ছিল। শ্রীযুত মোদী ধনী ও ব্যবসায়ী। তিনি সারা জীবন কংগ্রেস জন্য এই পুরস্কার লাভ করিলেন ?

পরলোকে ক্যাপ্টেন নরেন্দ্রনাথ—

কলিকাতার বেঙ্গল ইমিউনিটী কোম্পানীর প্রাণস্বরূপ ম্যানেজিং ডিরেকটার ক্যাপ্টেন নরেন্দ্রনাথ দত্ত গত ৬ই এপ্রিল বুধবার রাত্রিতে সহসা ৮৩ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি অবিবাহিত ছিলেন এবং সারা-জীবন কংগ্রেস ও সাংবাদিকতার সহিত নিজেকে যুক্ত রাখিয়াছিলেন। তিনি 'যুগান্তর' পত্রিকার পরিচালক-বোর্ডের সভাপতি ছিলেন। বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়া তিনি তাহা সৎকার্য্যে ব্যয় করিতেন। জন্মভূমি ত্রিপুরা জেলার শ্রীকাইল গ্রামে কলেজ প্রতিষ্ঠায় তিনি ৫ লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কুমিল্লার শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার দত্তও বাঙ্গালার খ্যাতনামা কংগ্রেস নেতা। জনগণের দুঃখ নিবারণে তিনি কিরূপ মুক্তহস্ত ছিলেন, তাহা প্রায় সর্ব্বজনবিদিত।

পাটনায় শারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়ন

বুদ্ধ-শিষ্যদ্বয়ের অস্থিসহ

শোভাযাত্রা

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

৺সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

রঞ্জি ট্রফি ঃ

আন্তঃপ্রাদেশিক ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ফাইনালে বোম্বাই ৪৬৮ রাণে বরদাকে হারিয়ে ১৯৪৮-৪৯ সালের রঞ্জি ট্রফি বিজয়ী হয়েছে।

বোম্বাই ঃ ৬২০ ও ৩৬১

বরদা ঃ ২৬৮ ও ২৪৫

প্রতিযোগিতার সেমি-ফাইনালে বোম্বাই দল মহারাষ্ট্রকে প্রথম ইনিংসের রাণে পরাজিত ক'রে ফাইনালে উঠে। অপরদিকের সেমি-ফাইনাল থেকে বরদা ফাইনালে উঠে হোলকার দলকে ৯ উইকেটে হারিয়ে।

বোম্বাইয়ের ব্রাবোর্ণ ষ্টেডিয়ামে ১৮ই মার্চ্চ বোম্বাই বনাম বরদা দলের মধ্যে রঞ্জি ট্রফির ফাইনাল খেলা আরম্ভ হয়। বোম্বাই দল টসে জয়লাভ ক'রে প্রথম ব্যাটিং করে। প্রথম দিনের খেলার নির্দ্দিষ্ট সময়ে ৩ উইকেটে বোম্বাই ২১৮ রান তুলে। কে সি ইব্রাহিম ১০২ রাণ এবং ফাদকার শূন্য রাণে নট আউট থাকেন। এস মন্ত্রী ৭০ এবং ইরাণী ৪০ রাণ করেন।

১৯শে মার্চ্চ ফাইনাল খেলার দ্বিতীয় দিনের নির্দ্দিষ্ট সময়ে বোম্বাই দলের ৬ উইকেটে ৪৬৭ রাণ উঠে। ইব্রাহিম ২০৯ রাণ ক'রে নট আউট থাকেন। ফাদকার ৫৩ রাণে আউট হন। ইব্রাহিমের দু'শ রাণ তুলতে ৫৭০ মিনিট সময় লেগেছিলো, তিনি ২২টা বাউণ্ডারী করেন। ১৯৪ রাণের মাথায় নিজ মাথার উপর একটা বল তুলে আউট হ'তে গিয়ে বেঁচে যান। নিম্বলকার এবং সোহনীর সামনে বলটি ভূমি স্পর্শ করে, তাঁদের কেউ ধরতে পারেন নি। তিনি ৯ রাণে একটা চান্স দিয়েছিলেন, তাছাড়া তাঁর

২০শে মার্চ্চ, প্রথম ইনিংসের খেলা ৬২০ রাণে শেষ হয়ে যায়। কে সি ইব্রাহিম ২১৯ রাণে আউট হন। এই রাণ তুলতে তাঁর সময় লেগেছিলো ১০ ঘণ্টা ৪৫ মিনিট। দালভি ১১০ রাণ করেন, ৯টি বাউণ্ডারী ছিল। তিনি কোন চান্স দেন নি।

ঐদিন বরদা দলের প্রথম ইনিংসে কোন উইকেট না পড়ে নির্দ্দিষ্ট সময়ে ৬৪ রাণ উঠে।

২১শে মার্চ্চ, চতুর্থ দিনে বরদা দলের ৮ উইকেটে ২৫৮ রাণ উঠে। উল্লেখযোগ্য রাণ—সোহনী ৬৩, বিচার ৫৬, বিজয় হাজারে ৯৮। বোলিংয়ে সাফল্য লাভ করেন ফাদকার ৩৪ ওভার বলে, ১৬ মেডেন, ৪৯ রাণে উইকেট পান ৬টা। লাঞ্চের পর কোন রাণ না দিয়ে তিনি ৪টা উইকেট পান ১০টা বলে। এবং এই চারজনকে শূন্য রাণে প্যাভিলিয়নে ফিরে যেতে হয়। ফলো-অনের হাত থেকে রেহাই পেতে বরদার তখন ৩৬২ রাণ প্রয়োজন, হাতে আর মাত্র ২টো উইকেট।

২২শে মার্চ্চ, খেলার পঞ্চম দিনে বরদা দলের প্রথম ইনিংস ২৬৮ রাণে শেষ হয়। বোম্বাই দল বরদা দলকে ফলো-অন না করিয়ে ২য় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে। পঞ্চম দিনের খেলায় বোম্বাই দলের ৭ উইকেটে ২০৯ রাণ উঠে। ভি এম মার্চ্চেণ্ট ৭০ রাণ করেন। সোহনী ৪৩ রাণে ৪ এবং গুল মহম্মদ ২৫ রাণে ৩টে উইকেট পান।

২৩শে মার্চ্চ, ৬ষ্ঠ দিনে বোম্বাই দলের ২য় ইনিংস লাঞ্চের কিছু পরই ৩৬১ রাণে শেষ হয়। উল্লেখযোগ্য রাণ—উদয় মার্চ্চেণ্ট ৭০, ফাদকার ৬৩, রামচাঁদ নটআউট

পিছনে থেকে বরদা ২য় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে। নির্দিষ্ট সময়ে বরদা দলের ২ উইকেটে ৯৩ রাণ উঠে।

২৩শে মার্চ্চ, সপ্তম দিনে বরদা দলের ২য় ইনিংসের খেলা ২৪৫ রাণে শেষ হ'লে বোম্বাই দল ৪৬৮ রাণে রঞ্জি ট্রফি বিজয়ী হয়। বরদা দলের ২য় ইনিংসে হাজারে ১৫৫ রাণ করেন।

উগ্রাগড় ৪ এবং ফাদকার ৩ উইকেট পান।

রঞ্জি ট্রফিতে নূতন রেকর্ড ঃ

১৯৪৮-৪৯ সালের রঞ্জি ট্রফি প্রতিযোগিতার সেমি-ফাইনালে বোম্বাই বনাম মহারাষ্ট্রদলের খেলায় ৪টি নূতন রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তার মধ্যে একটি পৃথিবীর রেকর্ড এবং অপর তিনটি ভারতীর রেকর্ড।

(১) ২,৩৭৬ রাণ (৩১ উইকেট)—বোম্বাই-মহারাষ্ট্র, রঞ্জিট্রফি সেমি-ফাইনাল, পুণা, ১৯৪৮-৪৯। একটি ম্যাচে এত অধিক রাণ ইতিপূর্ব্বে পৃথিবীর কোন: খেলায় উঠে নি। সুতরাং ইহা পৃথিবীর রেকর্ড রাণ। পূর্ব্ববর্ত্তী পৃথিবীর রেকর্ড—২০৭৮ রাণ (৪০ উইঃ)—বোম্বাই-হোলকার, রঞ্জিট্রফি ফাইনাল, ১৯৪৫।

(২) ৯টি ব্যক্তিগত সেঞ্চুরী একই ম্যাচে: বোম্বাই-মহারাষ্ট্র, রঞ্জিট্রফি সেমি-ফাইনাল, পুণা, ১৯৪৮-৪৯।

পূর্ব্ববর্ত্তী রেকর্ড—৭টি সেঞ্চুরী (হোলকার-মহীশূর ১৯৪৬)

(৩) একই ম্যাচে তিনজন খেলোয়াড়ের প্রত্যেক ইনিংসে সেঞ্চুরী: (বোম্বাই—উদয় মার্চ্চেণ্ট ১৪৩ ও ১৫৬; ভি জি ফাদকার ১৩১ ও ১৬০। মহারাষ্ট্র—ম্বেগে ১৩৩ ও ১০০ রাণ)

(৪) দীর্ঘতম ভারতীয় ক্রিকেট খেলা—৭ দিন: বোম্বাই-মহারাষ্ট্র, সেমি-ফাইনাল, রঞ্জিট্রফি ১৯৪৮-৪৯।

অপরাপর রঞ্জি ট্রফির রেকর্ড ঃ

৩০০ শতাধিক রাণ:

৩৫৯ নট আউট—ভি এম মার্চ্চেণ্ট (বোম্বাই-মহারাষ্ট্র; বোম্বাই, ১৯৪৩-৪৪); ৩১৬—ভি এস হাজারে (মহারাষ্ট্র—বোম্বাই, পুণা, ১৯৪০-৪১)

সর্ব্বাপেক্ষা দলগত অধিক রাণ: ৯১২ (৮ উইঃ)—হোলকার (মহীশূরের বিপক্ষে ১৯৪৫)

সর্ব্বাপেক্ষা দলগত কম রাণ: ২২ দক্ষিণ পাঞ্জাব

সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ জয়: ১ ইনিংস ও ৪০৫ রাণে: এন আই সি এ; ১৯৪১-৪২ সালে এন ডব্লুই এফ পিকে লাহোরে পরাজিত করে।

সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র জয়: প্রথম ইনিংসের এক রাণে। ১৯৪১-৪২ সালে বাঙলা দেশ বিহারকে জামসেদপুরে পরাজিত করে।

সর্ব্বাপেক্ষা দলগত অধিক রাণ এক ইনিংসে: ১৩২৫ রাণ, মহারাষ্ট্র (বোম্বাইয়ের বিপক্ষে, পুণা ১৯৩১-৪২)

হ্যাটট্রিক: ১৯৪৩-৪৪ সালে জাহাঙ্গীর খাঁ উপর্য্যুপরি তিন বলে বরোদার তিনজনকে (ভি হাজারে, সি এস নাইডু এবং হিন্দেলকার) আউট করেন।

ব্যক্তিগত অধিক রাণ: ৪৪৩ নট আউট, বি বি নিম্বলকার (মহারাষ্ট্র), পশ্চিমভারত রাজ্যের বিপক্ষে ১৯৪৮-৪৯।

পূর্ব্ববর্ত্তী বিজয়ী দল ও রাণার্স-আপ:

বিজয়ী		রাণার্স-আপ
১৯৩৪-৩৫	বোম্বাই	উত্তর ভারত
১৯৩৫-৩৬	ঐ	মাদ্রাজ
১৯৩৬-৩৭	নবনগর	বাঙলা
১৯৩৭-৩৮	হায়দ্রাবাদ	নবনগর
১৯৩৮-৩৯	বাঙলা	দক্ষিণ পাঞ্জাব
১৯৩৯-৪০	মহারাষ্ট্র	যুক্তপ্রদেশ
১৯৪০-৪১	ঐ	মাদ্রাজ
১৯৪১-৪২	বোম্বাই	মহীশূর
১৯৪২-৪৩	বরদা	হায়দ্রাবাদ
১৯৪৩-৪৪	পশ্চিম ভারত	বাঙলা
১৯৪৪-৪৫	বোম্বাই	হোলকার
১৯৪৫-৪৬	হোলকার	বরদা
১৯৪৬-৪৭	বরদা	হোলকার
১৯৪৭-৪৮	হোলকার	বোম্বাই

অধিকবার বিজয়ী বোম্বাই ৪

জাতীয় হকি খেলা ঃ

আন্তঃপ্রাদেশিক জাতীয় হকি খেলার ফাইনালে পূর্ব্ব-পাঞ্জাব ২-০ গোলে পশ্চিম বাঙলা দলকে পরাজিত করেছে। পশ্চিম বাঙলা প্রতিযোগিতার সেমি-ফাইনালে

ফাইনালে উঠে।

অক্সফোর্ড-কেম্ব্রিজ বোট রেস :

আজ ১২২ বছর ধরে অক্সফোর্ড বনাম কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে বোট রেস মহা সমারোহের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই বাৎসরিক বোট রেসের প্রথম সূচনা হয় ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে। এ পর্য্যন্ত এই দুই দলের মধ্যে সরকারী ভাবে ৯৪টি বোট রেস হয়েছে। কেম্ব্রিজ জয়লাভ করেছে ৫০টি, অক্সফোর্ড ৪৩টি। মাত্র ১টী 'dead-heat' হয়েছে। ইংলণ্ডের টমাস নদীর জলে পুটনে ব্রীজ থেকে বোট-রেসের সূচনা এবং শেষ মর্টলেকের চীসউইক ব্রীজ, দূরত্ব ৪¼ মাইল।

১৯৪৯ সালের বোট রেসে কেম্ব্রিজ ¼ লেংথে অক্সফোর্ডকে হারিয়ে এ বছরের 'ব্লু' পেয়েছে। বি বি সি কর্তৃপক্ষ টেলিভিশন যন্ত্র সাহায্যে এ-বছরের বোট রেস জনসাধারণের নিকট পরিবেশন করেন। অক্সফোর্ড বনাম কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বোট রেসে এ ঘটনা প্রথম। যুদ্ধের পর কেম্ব্রিজের উপর্যুপরি এই তৃতীয় জয়। ১২ বছরের ইতিহাসে এবারের মত প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা কখনও দেখা যায়নি।

ইংলণ্ড ও দঃ আফ্রিকা টেষ্ট ম্যাচ ঃ

১৯৪৮-৪৯ সালের ইংলণ্ড বনাম দক্ষিণ আফ্রিকার ৫টি টেষ্ট খেলার মধ্যে প্রথম টেষ্ট ম্যাচে ইংলণ্ড ২ উইকেটে এবং পঞ্চম টেষ্ট ৩ উইকেটে জয়ী হয়। ২য়, ৩য় ও ৪র্থ টেষ্ট ম্যাচ ড্র যায়। সুতরাং ১৯৪৮-৪৯ সালের 'টেষ্ট রবার' ইংলণ্ড পেল। ইংলণ্ড : দঃ আফ্রিকার এ পর্য্যন্ত টেষ্টের ফলাফল—

ইংলণ্ড—দঃ আফ্রিকা

(১৯২৪-১৯৪৮-৪৯)

	প্রথম খেলা	ইংলণ্ড জয়ী	দঃ আঃ জয়ী	ড্র	মোট
ইংলণ্ডে	১৯২৪	১২	১	১৩	২৬
দঃ আফ্রিকায়	১৯২৭	২২	১১	১৫	৪৮
মোট :			১২	২৮	৭৪

ইংলণ্ডের বিখ্যাত এফ এ কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে এবার উঠেছে লিসেষ্টার সিটি এবং উলভার হ্যাম্পটোন ওয়াণ্ডার্স। লিসেষ্টার সিটি দ্বিতীয় বিভাগের টিম, এফ এ কাপের ফাইনালে খেলা এই তাদের প্রথম। গত বছরের এফ এ কাপ বিজয়ী ম্যাঞ্চেষ্টার ইউনাইটেড ০—১ গোলে উলভার হ্যাম্পটোন দলের কাছে সেমি-ফাইনলে হেরে যায়। ফাইনাল খেলা হবে এপ্রিলের ৩০শে।

হকি লীগ খেলা ঃ

ক্যালকাটা হকি লীগের প্রথম বিভাগে লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপ নিয়ে প্রবল প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়েছে মোহনবাগান এবং পোর্টকমিশনার দলের মধ্যে। আজ পর্য্যন্ত (১৪-৪-৪৯) উভয়ের খেলার ফলাফল এই দাঁড়িয়েছে—

	খেলা	জয়	ড্র	প:	পক্ষে	বি:	পয়েন্ট
মোহনবাগান	১৮	১৬	২	০	৫০	৫	৩৪
পোর্টকমিশনার	১৮	১৭	০	১	৬১	৫	৩৪

অল্-ইংলণ্ড ব্যাডমিণ্টন

চ্যাম্পিয়ানসীপ ঃ

পুরুষদের সিঙ্গলসে—ডি ফ্রিম্যান (ইউ এস এ) ১৫-১, ১৫-৬ পয়েন্টে ডোয়ি টিক হককে (মালয়) পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডবলসে—ডোয়ি টিক হক এবং টেচ সং খোন (মালয়) ১৫-৫, ১৫-৬ পয়েন্টে ডি ফ্রিম্যান এবং ডবলউ রোগার্সকে পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিঙ্গলসে—মিস জ্যাকোবসেন ৮-১১, ১১-৮, ১১-৪ পয়েন্টে মিস এ সভেগুসেনকে (ডেনমার্ক) পরাজিত করেন।

মহিলাদের ডবলসে—মিসেস এইচ ওবের এবং মিস এ্যালেন (বৃটেন) ১৫-৮, ১৫-১০ পয়েন্টে মিসেস এ্যাহো এবং মিস থর্ণডাইলকে পরাজিত করেন।

মিক্সড ডবলসে— সি ষ্টিফেন্স এবং মিসেস ষ্টিফেন্স (ইউ এস এ) ১৫-২, ১৫-১২ পয়েন্টে মিস এ্যালেন ও রোগার্সকে (বৃটেন) পরাজিত করেন। ইউ এস এ ৩ মালয় ১ এবং বৃটেন ১টি বিষয়ে জয়লাভ করেছে।

ভারতবর্ষের প্রতিনিধি [illegible] এবং [illegible] দুইটি উভয়েই তিন গেমে মালয়ের খেলোয়াড়দের কাছে পরাজিত হন।

অল্-ইংলণ্ড [illegible] প্রতিযোগিতার সূচনা—
পুরুষদের ডবলস—১৮৯৯; সিঙ্গলস—১৯০০।
মহিলাদের ডবলস—১৮৯৮; সিঙ্গলস—১৯০০।

চিত্র-কথা

ইণ্ডিয়া ন্যাশনাল টকীজের "অনুরাধা"র কাজ সমাপ্ত হইয়াছে। কানন দেবী ও জহর গাঙ্গুলী প্রধানাংশে অবতীর্ণ হইয়াছেন। কানন দেবী এই প্রথম শরৎচন্দ্রের বইয়ে অভিনয় করিলেন। ছবিখানি পরিচালনা করিয়াছেন—প্রণব রায়। সুরশিল্পী কমল দাশগুপ্ত ও চিত্রশিল্পী অজয় কর।

* * * * *

এসোসিয়েটেড ডিষ্ট্রিবিউটর্স "চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন" চিত্রের পরিবেশন ভার গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীনির্মল চৌধুরীর পরিচালনায় বেঙ্গল ন্যাশন্যাল ই্ডিওতে উক্ত চিত্রের কাজ অগ্রসর হইতেছে। ১৯৩০ সালে চট্টগ্রামে যে অস্ত্রাগার লুণ্ঠন হয়, তাহার নায়ক বিপ্লবী সূর্য সেনের জীবনকাহিনী এই চিত্রে রূপায়িত হইতেছে।

* * * * *

এস এম কারমানী প্রযোজিত ইণ্ডিয়া ইউনাইটেড পিকচার্সের দ্বিতীয় চিত্র "নিরুদ্দেশ" এর চিত্রগ্রহণ শ্রীনীরেন লাহিড়ীর পরিচালনায় সমাপ্ত হইয়াছে। দুইজন বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী রবীন মজুমদার ও অসিতবরণ (এম টি) এই প্রথম একসঙ্গে চিত্রাবতরণ করিয়াছেন। প্রণব রায় কাহিনী ও সংলাপ রচনা করিয়াছেন।

* * * * *

নিউ ইণ্ডিয়া থিয়েটার্সের "অভিমান"-এর চিত্রগ্রহণ বিনয় ব্যানার্জির পরিচালনায় সমাপ্তপ্রায়। প্রকাশ, বোম্বে টকীজের বিখ্যাত সঙ্গীত পরিচালক রামচন্দ্র পাল এই চিত্রে নূতন ধরণের সুরযোজনা করিয়াছেন।

* * * * *

মহাভারতী লিমিটেডের প্রথম চিত্র নিবেদন, 'কুয়াশা'-র পরেই প্রেমেন্দ্র মিত্র রচিত 'কালো ছায়া' রহস্য চিত্রের সিকুয়েল হিসেবে "আবার কালো-ছায়া", তাঁহারই পরিচালনাধীনে সবাকচিত্রে রূপায়িত হইবার জন্য নির্বাচিত হইয়াছে। প্রকাশ যে, এই নবলিখিত কাহিনীটি কালো-ছায়া অপেক্ষা বহুলাংশে চিত্তচমকপ্রদ ও চিত্তাকর্ষক। 'কুয়াশা' ছবির কাজ প্রায় অর্ধাংশ সমাপ্ত হইয়াছে।

* * * * *

কানন দেবী অভিনীত ও প্রযোজিত শ্রীমতী পিকচার্সের 'অনন্যা' ৮ই এপ্রিল হইতে একযোগে রূপবাণী, ইন্দিরা ও ছায়া এবং সহরতলীর আরও কতকগুলি চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করিয়াছে। ছবিখানি পরিচালনা করিয়াছেন সব্যসাচী এবং আলোকচিত্র গ্রহণ করিয়াছেন অজয় কর; সুরযোজনা করিয়াছেন উমাপতি শীল।

* * *

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীগোকুলেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রণীত "স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম" (১ম খণ্ড)—৩৲

ডাঃ মতিলাল দাশ প্রণীত উপন্যাস "মন্দার-পর্ব্বত"—৪৲

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ পালচৌধুরী প্রণীত "গান্ধী-হত্যার কাহিনী"—৪৷৹

শ্রীরবীন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত "দুর্গম পথের যাত্রী"—১৷৹

শ্রীমৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "যক্ষ্মা চিকিৎসা" ১ম খণ্ড—২৷৹, ২য় খণ্ড—৫৲

শ্রীরবীন্দ্রকুমার বসু প্রণীত "আমাদের বাপুজী"—১৷৹, "ছোটদের তুরস্কের গল্প"—১৷৹

শ্রীহেমন্তকুমার সরকার প্রণীত "সুভাষের সঙ্গে বারো বছর"—৩৷৹

শ্রীরাখালদাস সেন প্রণীত "স্বাধীন ভারতের জাতীয় পতাকা"—৩৲

শ্রীনারায়ণচন্দ্র পণ্ডিত প্রণীত নাটক "মহাপ্রভু"—১৷৹

শ্রীআশালতা সিংহ প্রণীত গল্প-গ্রন্থ "মধুচন্দ্রিকা"—২৷৹

শ্রীহেমেন্দ্র রায় প্রণীত "কৃষ্ণ সাগরের কিশোর নাবিক"—১৷৹

শ্রীতারাপদ লাহিড়ী প্রণীত "পশ্চিমবঙ্গ বাড়ী ভাড়া নিয়ন্ত্রণ আইন (১৯৪৮)"—২

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা প্রণীত নাটক "দিল্লী চলো"—১৷৹, "গোলকুণ্ডা"—১৷

স্বামী বিশুদ্ধানন্দ গিরি-সম্পাদিত "মাণ্ডুক্যোপনিষৎ"—১৷৹, "মুণ্ডকোপনিষৎ"—২৷৹, "কঠোপনিষৎ"—৩

শ্রীশিবনাথ বসু প্রণীত "গীতায় নূতন আলোক"—১৷৹

ডক্টর যামিনীরঞ্জন মজুমদার প্রণীত "প্রাথমিক কৃষিপাঠ"—৷৵৹, "সচিত্র সরল কৃষি-কথা"—৸৹

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মল্লিক প্রণীত "প্রতিবেশী"—২৷৹

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

মীন মোদক

কডলিভার অয়েল (Codliver oil) ব্যক্তি বিশেষের নিকট যে মারাত্মক নেশার বস্তু হইতে পারে, এ খবর চিকিৎসকের জানা ছিল না। ঔষধের মাত্রাধিক্যে নিরামিষভোজী গোসাইঠাকুর স্থাবর মাংসপিণ্ড হইয়া গিয়াছেন।

ভারতবর্ষ

জ্যৈষ্ঠ—১৩৫৬

দ্বিতীয় খণ্ড | ষট্‌ত্রিংশ বর্ষ | ষষ্ঠ সংখ্যা

মার্কস ও কৃষক

শ্রীতরুণচন্দ্র গুহ

মার্কস তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ capital বা মূলধন সুরু করেছেন মূল্যের শ্রম-সংজ্ঞা (labour theory of value) দিয়ে। যদিও তাঁর পূর্বগ আ্যাডাম স্মিথ (Adam Smith), রিকার্ডো (Ricardo) প্রভৃতি বনেদি অর্থবিদদের (classical economics) লেখার মধ্যেও এই সংজ্ঞার উল্লেখ আছে। অর্থনীতির ভিত্তি হিসাবে একে দাঁড় করানো মার্কসেরই কৃতিত্ব। অ্যাডাম স্মিথের নিকট শ্রমটা ঠিক বস্তুগতরূপ পরিগ্রহ করতে পারেনি; একে তিনি রেখেছেন বস্তুগত ও মনোগত রাজ্যের কতকটা সঙ্গম স্থলে। মূল্য নির্ণয় করতে যে শ্রমের পরিমাপ করতে হয়, তাকে তিনি শ্রমের মানদণ্ডস্বরূপ ধরেছেন—শ্রমকারী ব্যক্তি কতটা কষ্ট বা ত্যাগ স্বীকার করল (sacrifice বা dis-utility তার যা হ'ল) তা দেখাননি। রিকার্ডো অবশ্য একে অনেকটা বস্তুগত—অর্থাৎ শ্রম-সময়ের পরিমাপগত মানদণ্ড দিয়ে মেপেছেন। কিন্তু তাতেও সবটা পরিষ্কার হল না। একজন দক্ষ ব্যক্তি যে কাজ করবে এক-ঘণ্টায় একজন আনাড়ী হয়ত তার জন্য নেবে দু'ঘণ্টা। এর জন্য ত উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্যের তারতম্য হ'তে পারে না।

মার্কস এটা সুনির্দিষ্ট ক'রে বলেছেন—"কোন দ্রব্য উৎপাদন করতে যতটা সমাজ-প্রচলিত শ্রমের প্রয়োজন হবে, সেই শ্রমের সাময়িক পরিমাপ দিয়েই ওর মূল্য নির্ণয় করা হবে।" * অভিজ্ঞ ও আনাড়ী শ্রমিকের প্রশ্ন এতে

---

* 'We see then that which determines the magnitude of the value of an article is the amount of labour socially necessary or the labour-time socially necessary for its production."—Capital - p. 5.

আসবে না; কারণ শ্রমের একটা বিশেষ পরিমাপ (standard) যান্ত্রিকযুগে চলতি হচ্ছে। সেই পরিমাপ দিয়েই কোন বিশেষ দ্রব্য উৎপাদনে প্রয়োজনীয় শ্রমের হিসাব করা হবে এবং তা দিয়েই উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য নির্ণয় করা হবে। সমাজ-প্রচলিত শ্রম (socially necessary labour) ব'লে মার্কস যে পরিমাপ ধরেছেন, তার পিছনে রয়েছে যান্ত্রিক-যুগের কারখানা শ্রম-পদ্ধতি—যেখানে শ্রমের মূল্য বা শ্রমিকের তলব (wages) নির্দ্ধারিত হয় তার শ্রম-শক্তির হিসাবে, সময়ের হিসাবে নয়। দক্ষ ও আনাড়ী শ্রমিকের জাত-নির্ণয় কারখানা ঘরেই উৎপন্ন হয়েছে। অবশ্য যান্ত্রিক যুগের পূর্বে হস্ত-উৎপাদনের যুগেও তৎকালীন ছোট ছোট কারখানায় শ্রমের ঐ প্রকার জাত-বিচার প্রচলিত ছিল। শ্রমের আদিম রূপ যেখানে পাই—অর্থাৎ কৃষি কার্যে শ্রমের এই জাত-বিচার সেখানে তেমন প্রচলিত ছিল না—হয়ত একেবারেই ছিল না, তেমন দাবী হয়ত অতিশয়োক্তিও হতে পারে।

মার্কসের মনে সব সময়ই কারখানা ঘরের শ্রমের চিত্র প্রবল ছিল। তিনি দেখেছেন, গ্রামের পর গ্রাম উজাড় হ'য়ে জমি-চ্যুত, বৃত্তিচ্যুত গ্রাম্য কৃষকের দল সহরের দিকে ছুটেছে। ইংল্যাণ্ডের কৃষি-ক্ষেত্র দখল করল মেষ-চারণ; —কৃষির পরিবর্ত্তে মেষ-পালন ও মেষের লোম-জাত উল বেশী লাভজনক হ'য়ে উঠল। এমন কি শিকারের উপযুক্ত পশুপালনের জন্য কৃষি ক্ষেত্রকে বনেও পরিণত করা হয়েছিল। তার পরিবর্ত্তে গ'ড়ে উঠছিল কারখানার ইণ্ডাষ্ট্রি (factory industry) ও বিদেশী বাণিজ্য। মার্কস সে সব দেশকে বলেছেন colony বা * উপনিবেশ। সেই দেশ থেকে ইংল্যাণ্ডের খাদ্য সরবরাহ হত—তাই ইংল্যাণ্ডের নিজের কৃষি করার প্রয়োজন হ'ত না। সমগ্র ইউরোপেই কতকটা এই ব্যবস্থা অল্পে অল্পে প্রবর্ত্তিত হচ্ছিল।

ইণ্ডাষ্ট্রীর সভ্যতার এই রূপ মার্কসের মনকে এমন ভাবে আকর্ষণ করেছিল যে তিনি কৃষির ও কৃষিজীবীর সামাজিক মূল্য ও প্রয়োজনীয়তা বহুলাংশে উপেক্ষা করেছেন। সমস্ত জোর দিলেন তিনি কারখানার শ্রমজীবীর উপর। তাই তাঁর কল্পিত ভবিষ্যত সমাজ ব্যবস্থায় সর্ব কর্তৃত্ব ন্যস্ত হয়েছে শ্রমজীবী বা কারখানা শ্রমিকদের উপর। মার্কস ছিলেন বিশেষভাবে ভাব-প্রবণ। প্রধানত ইংল্যাণ্ডের এবং সমগ্র ইউরোপের সদ্য-প্রবর্তিত ইণ্ডাষ্ট্রীর ব্যবস্থায় শ্রমজীবীদের উপর যে অমানুষিক অত্যাচার হয়েছে, তা তাঁর ভাব-প্রবণ ও দরদী মনকে অত্যন্ত বিচলিত করেছিল। তিনি দেখেছেন, গ্রামের কৃষির ভবিষ্যৎ নষ্ট হচ্ছে;—আর গ্রামের কৃষিজীবীরা নিজেদের আবাস ও বৃত্তি থেকে বিচ্যুত হ'য়ে নগরের উপকণ্ঠে বা রাস্তার পাশে আশ্রয় নিচ্ছে। পরিত্যক্ত গ্রাম্য কৃষি-জীবনে ফিরে যাবার কোন পথই এদের রইল না। একমাত্র পথ এদের সামনে খোলা ছিল কারখানার শ্রমজীবী হওয়া—তাই এদের সম্বন্ধে মার্কস বলেছেন—"নিজ শ্রম-শক্তি বিক্রয় করতে এরা স্বাধীন।" * এদের এই স্বাধীন জীবনের অর্থ হ'ল—সম্পত্তির বন্ধন মুক্ত—নিঃস্বের স্বাধীনতা। কৃষক তার শ্রম-শক্তিকে এমনি ভাবে বাজারের পণ্যদ্রব্য করতে পারত না;—কারণ নিজেরই প্রয়োজন ছিল ঐ শ্রম-শক্তির। কিন্তু ঐ বৃত্তিচ্যুত জনতার ঐরূপ কোন বন্ধনের বালাই নেই। ঐ শ্রম-শক্তি বিক্রয় করা ছাড়া তাদের জীবিকার অন্য কোন উপায় ছিল না। শ্রমের একমাত্র রূপ মার্কসের সামনে তখন রইল—এবং সেটা হ'ল কারখানার শ্রম। তাই তিনি ডাক দিয়েছেন কেবল ঐ কারখানার শ্রমিকদের; এবং তিনি ভবিষ্যৎ সমাজের রূপ এঁকেছেন "শ্রমজীবীর সর্বকর্তৃত্ব" (Dictatorship of the Proletariat.)

তাঁর এই আহ্বান—এই স্লোগান (slogan) এই বুলি বা জিকির ইউরোপকে মাতিয়ে তুলেছিল। মার্কসের সময় থেকে ইউরোপ উঠে প'ড়ে লেগেছে—তাদের ইণ্ডাষ্ট্রীজাত পণ্য দিয়ে বিশ্বকে শোষণ করতে। ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্মেনী, ইটালী এমন কি ক্ষুদ্র বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড, সুইজারল্যাণ্ড, স্কান্দেনেভীয় দেশত্রয় সবাই ইণ্ডাষ্ট্রীর দিকে ঝুঁকে পড়ল। ঐ সব দেশে বহু লোক কৃষিজীবীর সারি

* মার্কসের ভাষায় colony বা উপনিবেশের সংজ্ঞা হ'ল অকর্ষিত নূতন আবিষ্কৃত দেশ, যেখানে লোক গিয়ে নূতন বসতি স্থাপন করেছে।—

দিল। এই সর্বহারা শ্রমজীবীদের মনে নূতন আশার সঞ্চার করা হ'ল বিশ্বকর্তৃত্বের স্বপ্ন দিয়ে। তাদের আহ্বান ক'রে মার্কসের ভাষায় বলা হ'ল—"শৃঙ্খল ব্যতীত তোমাদের হারাবার মতো কোন সঞ্চয় নেই;—তাই হে বিশ্বের শ্রমজীবিগণ—সংঘবদ্ধ হও, শ্রমজীবীর সর্বকর্তৃত্ব স্থাপন কর।"

ইউরোপের বিংশ শতাব্দীর সামাজিক ইতিহাস হ'ল এই শ্রমজীবীদের উত্থান ও সংঘবদ্ধ হবার ইতিহাস। এর চূড়ান্ত হ'ল ১৯১৭ সালের রুশিয়ার নভেম্বর বিপ্লব। এর পর হ'তে সকল রাজনৈতিক দলই শ্রমজীবীদের প্রতি একটু বিশেষ নেকনজর দেয়;—সাম্যবাদী হ'তে ফ্যাসীবাদী পর্যন্ত সবাই শ্রমজীবীদের কল্যাণের কথা বলে। এটা আজ একটা নির্বিচার ফ্যাসনে পরিণত হয়েছে। কিন্তু এইরূপ নির্বিচার ভাবধারা বেশী দিন চললে, সমাজের অকল্যাণই হয়। তাই আজ নূতন অবস্থার পটভূমিকায় ও নূতন অভিজ্ঞতার আলোকসম্পাতে সবটা বিচার ক'রে দেখা দরকার।

মার্কস্ বলেছেন দ্রব্য-মূল্য নির্ণয় করা হয় শ্রম দিয়ে। যে দ্রব্যের মধ্যে মনুষ্য শ্রমের স্পর্শ নেই, তার কোন মূল্য নেই। মাটির নীচের খনি, স্বচ্ছন্দজাত বন, নদীর জল প্রভৃতির মূল্য তখনই মাত্র হয় যখন ওর সঙ্গে মানুষের শ্রমের যোগ হয়। শ্রমের সম-ভিত্তিতে সব দ্রব্যের বিনিময় হয়। একখানা কাপড়ের সঙ্গে যে ৭ সের গমের বা ৩ সের তেলের বা কয়েক টুকরা রূপোর বিনিময় হয়, তা ঐ শ্রমের পরিমাপে। শ্রমই হ'ল মূল্য-স্রষ্টা (Value-creating)। কিন্তু এখানে বিচার করা দরকার—সমাজ-জীবনে কোন শ্রেণীর শ্রম সব চেয়ে দরকারী ও সব চেয়ে মৌলিক। মূল্য হ'ল মানবের ঐশ্বর্যের বা সম্পত্তির সামাজিক স্বীকৃতি। সব চেয়ে আদিম ও মৌলিক সম্পত্তি আমরা পেয়েছি ভূমি হতে। ভূমির বক্ষে উৎপাদন করি কৃষিজ শস্য, শাক, সব্জী, ফল, মূল; ভূমির পৃষ্ঠে জন্মে বিরাট বন; আর ভূমির উদরে আছে খনি। এই ত হ'ল মানুষের আদিম সম্পত্তি। যে মূলধন বা পুঁজি নিয়ে আজকার কারখানা ও পাওয়া সম্পদও সম্পত্তিই হ'ল মানুষের আদিম ও মৌলিক সম্পদ ও সম্পত্তি।

জমি থেকে চার প্রকার সম্পত্তির কথা উপরে বলা হ'ল—কৃষিজ, বনজ, খনিজ এবং খাজনা। এর মধ্যে খাজনা (rent) হ'ল অত্যন্ত গৌণ এবং শ্রমের সাথে এর যোগও পরোক্ষ। শ্রমের প্রত্যক্ষ ফল হিসাবে খাজনা আসে না; শ্রমের পরিণতি যখন সমাজের বিকাশে প্রতিফলিত হয়, তখন সমাজ পরিস্থিতি ও সামাজিক বিবর্তনের ফল হিসাবে খাজনা আসে। সামাজিক বিকাশের একটা বিশেষ স্তরে—বেশ একটু উঁচু স্তরেই এটা সম্ভব হয়। বনজ সম্পদও মানুষের শ্রমের প্রত্যক্ষ ফল নয়;—বন জন্মেছে মানুষের শ্রম-নিরপেক্ষ ভাবে। তার পর তাকে কেটে-কুটে কাজে লাগাতে মানুষের শ্রমের প্রয়োজন এবং কেবল তখনই তা হয় মানুষের সম্পদ। দ্বিতীয়ত বনজ-সম্পদ মানুষের সভ্য অবস্থার পূর্বেও ছিল। মানুষ যখন নগ্ন অবস্থায় বনে জঙ্গলে বা পাহাড়ে পর্বতে ঘুরে বেড়াত, তখনও সে বনের ফল মূল খেত, বনের পশু-পাখী শিকার করত। অর্থাৎ যখন মানুষের কোন সম্পদ বা সম্পত্তি-বোধ জাগে নি, তখনও বন থেকে সে তার পরিপোষক অশন ও বসন আহরণ করত। কিন্তু তখন সে ঠিক বনকে নিজের সম্পদ বা সম্পত্তি হিসাবে ভাবতে শেখেনি।

খনিজ সম্পদের মধ্যেও মানুষের শ্রমের সৃষ্টি-শক্তি এসেছে অনেক পরে—যখন স্বতঃসৃষ্ট খনির মালকে সে কাজে লাগাতে গেল। এই সম্পত্তি এল মানুষের কাজে লাগাবার বুদ্ধি থেকে। খনিজ সম্পদের ব্যবহার সমাজ জীবনে এসেছে বেশ কিছুটা পরে। কিন্তু কৃষির সঙ্গে মানুষের শ্রমের ও মানবের সভ্য ও সমাজবদ্ধ জীবনের যোগ বা সম্পর্ক খুব মুখ্য ও প্রত্যক্ষ।

এঙ্গেলস ও মার্কস সামাজিক বিকাশের চারটি স্তর নির্দেশ করেছেন। (১) আদিম যৌথ সম্পত্তি (primitive communism) (২) দাসপ্রথা (slavery) (৩) সামন্ত-প্রথা (feudal system) এবং (৪) পুঁজীবাদী (capitalism) এবং এর পর আসবে সাম্যবাদ (socialism)।

ছেড়ে দিয়েই আমাদের বিচার করতে হবে। প্রথমতঃ আমরা দেখতে পাই মানবের ইতিহাস সুরু হয়—তার সম্পত্তিবোধ আসে, তার কৃষিলব্ধ সম্পদ থেকে। এর পূর্বে সে ছিল শিকারী ও বনচারী যাযাবর। তখনকার কথা বাদ দিয়েই আমরা আলোচনা করছি। মানব যখন উদ্দেশ্যমূলক সৃজনী-শ্রম (purposive creative labour) করতে সুরু করে, তখন হতেই তার সমাজবদ্ধ সভ্য জীবনের সূত্রপাত। কৃষি নিয়োজিত শ্রমই হ'ল সমাজের ও সামাজিক সম্পত্তির মূল। কারণ এটাই হ'ল মানুষের সর্বপ্রথম উদ্দেশ্যমূলক সৃজনীশ্রম।

দ্বিতীয়তঃ কারখানা গৃহে শ্রমের প্রথম পরিচয় যে আমরা পাই, তা প্রধানত কৃষিলব্ধ কাঁচামাল নিয়ে। আজও কৃষি ও তৎসংশ্লিষ্ট উপজীবিকা (যথা পশুপালন, বনে পশু শিকার, নদীতে, বিলে, খালে বা পুকুরে মৎস্য শিকার প্রভৃতি) হাতে লব্ধ কাঁচামাল নিয়েই বর্তমানের বহু কারখানা চলছে। বড় বড় যান্ত্রিক কারখানায় খনিজদ্রব্য ও কৃষিজ ও তৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য উপজীবিকা-লব্ধ দ্রব্যই কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হয়। কাজেই কৃষি-নিয়োজিত শ্রমকে কোন রকমেই উপেক্ষা করা যায় না। সমাজের বিকাশে এর ঐতিহাসিক মূল্য এবং সমাজের আদিম সৃজনী শ্রম হিসাবে এর উপযোগিতার কথা ভুলে যাওয়া অসঙ্গত। বর্তমানের ইণ্ডাষ্ট্রিতেও বা কারখানা উৎপাদনেও কৃষি ও কৃষকের স্থান অত্যন্ত উঁচু; একে বাদ দিলে বহু ইণ্ডাষ্ট্রীর কারখানা আজও অচল হ'য়ে যাবে।

তৃতীয়তঃ—সমাজের মৌলিক ও অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজন আজও মিটাচ্ছে কৃষি ও কৃষক। মানুষের জীবনে ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য আহার গ্রহণই হ'ল মৌলিক ও আদিম প্রয়োজন। এই অভাববোধ মেটাবার পর, মানুষের মনে অন্যান্য পণ্যদ্রব্য (commodity) ও প্রয়োজন দ্রব্যের (utility goods) অভাববোধ আসে।

সামাজিক বিকাশেও ক্ষুধার আহার সংগ্রহই ছিল আদিম মানবের প্রথম ও প্রধান ধান্দা। এই অভাব

"ঋতং সতং তপো রাষ্ট্রং শ্রমো ধর্মশ্চ কর্ম চ।
ভূতং ভবিষ্যদুচ্ছিষ্টে বীর্য্যং লক্ষ্মীর্বলং বলে ॥"

—ঋত, সত্য, তপ, রাষ্ট্র, শ্রম, ধর্ম, কর্ম, অতীত, ভবিষ্যত, বীর্য, লক্ষ্মী—সবই উচ্ছিষ্ট শক্তি হ'তে উদ্ভূত অর্থাৎ অতিরিক্ত যে শক্তি তা দিয়েই মানুষ এই সব ভিতরের ও বাহিরের সম্পদ গড়ে তুলেছে।

কাজেই আহার সংগ্রহই হ'ল মানুষের প্রথম ও প্রধান কাজ। এই আহার সংগ্রহ করে কৃষি নিয়োজিত শ্রম এই শ্রমই হ'ল মানুষের মৌলিক শ্রম—আদিম ত নিশ্চয়ই। তা ছাড়া কৃষি-নিয়োজিত শ্রমই হ'ল মানুষের প্রথম উদ্দেশ্যমূলক সৃজনা শ্রম (first purposeful creative labour)। ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে, ভবিষ্যতের সংস্থানের জন্য ও ভবিষ্যতের প্রয়োজন মেটাতে কৃষিই হল তার প্রথম শ্রম। এর পূর্বে মানুষ বনজাত ফলমূল কুড়িয়ে খেয়েছে, বনের পশুপক্ষী শিকার করেছে। সে সবই ছিল প্রত্যক্ষ ও সাময়িক অভাব পূরণের জন্য;— ভবিষ্যতের সংস্থানের কথা তার মধ্যে বিশেষ থাকত না যতদিন পর্যন্ত ভবিষ্যত ভেবে শ্রম করার প্রবৃত্তি ও অভ্যাস তার না হয়েছে, ততদিন পর্যন্ত মানুষ ছিল সহজ ও বর্বর অবস্থায়; সভ্যসমাজবদ্ধ জীবনের পত্তন তখনও তার হয় নি।

আমরা দেখছি সামাজিক বিকাশে কৃষি-নিয়োজিত শ্রমের একটা বিশেষ মূল্য আছে—বর্তমানেও সমাজের আহার সংগ্রহের প্রধান পন্থা হিসাবে আজও এর মর্যাদা আছে।

চতুর্থত—এখনকার যান্ত্রিক ইণ্ডাষ্ট্রীর শ্রমের উপকরণ বা কাঁচামাল যোগাচ্ছে প্রধানত কৃষি-নিয়োজিত শ্রম; সে জন্যও কৃষি এবং কৃষিজীবী এক শ্রেষ্ঠ আসন পাবার যোগ্য। কারখানার ইণ্ডাষ্ট্রীর শ্রম হল গৌণ,—অর্থাৎ অপরের শ্রম-সাপেক্ষ। ভূমি হ'তে—কৃষিজ, বনজ ও খনিজ কাঁচামাল পেলে তবেই কারখানার ইণ্ডাষ্ট্রী চলতে পারে। একটা আদিম শ্রমের ফল না পেলে শ্রমজীবীর শ্রম অচল। অথচ মার্কস ভবিষ্যত সমাজ গড়তে চেয়েছেন

"শ্রমজীবীর সর্বকর্তৃত্ব"—তখন তাঁর মনে ছিল কেবল কারখানার শ্রমিক বা শ্রমজীবী, কৃষিজীবী নয়।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথাও বিস্তার করার দরকার আছে। মার্কসের সমস্ত মনকে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছিল ইংলণ্ডের ভূমিহীন, বৃত্তিচ্যুত, কৃষিক্ষেত্র হ'তে বিতাড়িত শ্রম-সর্বস্ব শ্রমজীবীর দল। এদের কতক ইতিমধ্যেই শ্রমজীবী হয়েছে এবং আর কতক শ্রমজীবী হবার জন্য তৈরী হয়ে ঘুরছে। এদের দুঃখ দুর্দশায় অত্যন্ত বিচলিত হ'য়ে তিনি ভুলে গিয়েছিলেন যে ইংল্যাণ্ড বা ইউরোপই সমগ্র পৃথিবী নয়, শ্রম-সর্বস্ব শ্রমজীবীই শ্রমিকদের একমাত্র বা প্রধান রূপ নয়।

ইংল্যাণ্ডে কৃষক বা কৃষিজীবীর ভবিষ্যৎ ছিল না; তাদের সংখ্যাও ক্রমেই কমছিল। এই সংখ্যা কমে কমে শেষ পর্যন্ত গিয়ে দাঁড়িয়েছিল মোট জনসংখ্যার অনুপাতে শতকরা তিনজনের সামান্য উপরে। ১৯৩৯ সালের আদম সুমারি অনুসারেই এই হিসাব পাওয়া যায়। সমগ্র পশ্চিম ইউরোপ সম্বন্ধেই সাধারণভাবে কৃষি ও কৃষকের বিষয়ে এই কথা খাটে। কিন্তু সমগ্র দুনিয়াতে কৃষিজীবীর সংখ্যা এমন নগণ্য নয়। বরং শ্রমজীবী বা কারখানা শ্রমিকের সংখ্যার অনুপাতে কৃষিজীবী বা চাষী শ্রমিকের সংখ্যা অনেক বেশী। এই মহাযুদ্ধের পূর্বে ব্রিটেন, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ও জার্মেণী ভিন্ন অন্য সব দেশেই শ্রমজীবীর সংখ্যার চেয়ে কৃষিজীবীর সংখ্যা অনেক বেশী ছিল। ব্রিটেনেই লোকসংখ্যার অনুপাতে শ্রমজীবীর সংখ্যা সব চেয়ে বেশী—কৃষিজীবীর চেয়ে প্রায় ৭ গুণ। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ও জার্মেণীতে আনুপাতিক হিসাবে কৃষিজীবীর প্রায় দেড় গুণ হল । কিন্তু অন্যান্য সব দেশে কৃষিজীবীর সংখ্যা শ্রমজীবীর চেয়ে বহুগুণ বেশী। জাপানে ৮ গুণের উপরে, ফ্রান্সে আড়াই গুণ, সোভিয়েট রাষ্ট্রে প্রায় ৫ গুণ, ভারতে প্রায় ৭ গুণ, কেনাডাতে ৫ গুণ, চীনে হয়ত ১০।১২ গুণ বেশী হবে। কাজেই সমস্ত বিশ্বের লোক সংখ্যার অনুপাতে বা শ্রমশীল জনতার অনুপাতে কৃষিজীবীর সংখ্যা

আজ ইণ্ডাষ্ট্রীর উৎপাদন এমন অবস্থায় এসেছে যে এর শ্রমে নিয়োজিত লোকের সংখ্যা আর বাড়বার বিশেষ সম্ভাবনা নেই। এই যুদ্ধের ফলে কৃষির প্রতি নূতন করে লোকের দৃষ্টি পড়েছে; ইংল্যাণ্ড পর্য্যন্ত নিজের খাদ্য উৎপাদন বাড়াবার চেষ্টা করছে এবং যুদ্ধের পরও তা' সে করবে, কাজেই অনেক ইণ্ডাষ্ট্রীতে দেশের কৃষিজীবীর সংখ্যা কিছুটা বাড়াবার সম্ভাবনা আছে,—অন্ততঃ না কমাবার সম্ভাবনাই বেশী। নূতন উন্নত যন্ত্র বের হচ্ছে ও হবে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্র পরিচালনায় নিয়োজিত লোক সংখ্যার প্রয়োজন কমবে। আজও যে যন্ত্র পরিচালনায় যে কাজে মানুষের প্রয়োজন হয়, তার অনেক কাজ ক্রমে যন্ত্রেই সাধিত হবে। শেষ পর্যান্ত হয়ত এক একটা বিরাট যন্ত্র চলবে রবোটের (Robot) বা কলের মানুষের সাহায্যে :—রক্তমাংসের মানুষের প্রয়োজন প্রায় ঘুচে যাবে। তৃতীয়ত, যান্ত্রিক উন্নতির ফলে উৎপাদন এত বেড়ে যাবে যে অল্প সময়ে ও অল্প যন্ত্রেই লোকের অভাব মিটে যাবে। তার ফলে শ্রমজীবীর সংখ্যাও হয়ত কমবে—অন্ততঃ বাড়বে কিনা সন্দেহ। চতুর্থতঃ—এই যুদ্ধে যান্ত্রিক সভ্যতার যে রূপ দেখা গিয়েছে, তাতে বিশ্বমানবের কল্যাণের জন্যই যান্ত্রিক উৎপাদন নিয়ন্ত্রিত ও সংযত হবে কিনা—ভাববার কথা। প্রথম তিনটা আপত্তির খণ্ডনের জন্য যুক্তি আসবে, শ্রমের সংখ্যা কমিয়ে লোক সংখ্যা বাড়ান যেতে পারে। আজকার সমাজ ব্যবস্থায় এই মত কতটা গৃহীত হ'বে বলা যায়না। এটা ঠিক, একথা উঠ্‌বে এবং একে কাজে পরিণত করার জন্যে কিছু চেষ্টাও হবে। কিন্তু এদিকে বিশেষ কিছু হবে, এমন আশা করা যায়না। মোটের উপর ঐদিকে যত চেষ্টাই হক্ তাতে কৃষিজীবী ও শ্রমজীবীর বর্তমান আনুপাতিক সংখ্যার বিশেষ কোন তারতম্য হবে এমন মনে করার কোন কারণ নেই। কৃষিতেও যান্ত্রিক উৎপাদন আস্‌ছে ও আসবে; কিন্তু তাতেও ঐ আনুপাতিক সংখ্যার ব্যতিক্রম হ'বে বলে মনে হয়না।

অতএব সমগ্র বিশ্বে শ্রমজীবী হ'তে কৃষিজীবীর সংখ্যা অনেক বেশী এখনও আছে, ভবিষ্যতেও বহুদিন পর্য্যন্ত

unite—বিশ্বের শ্রমজীবীর দল—তোমরা সম্মিলিত হও। তা' কতকটা সঙ্গত ও কতকটা কার্য্যোপযোগী একথা বিচার করা দরকার। ভারতেও শ্রমজীবীর সর্বকর্তৃত্বের বুলি বা শ্লোগান (Slogan) শোনা যায়। অথচ ভারতে প্রতি ১০ জন শ্রমজীবীর স্থলে ৬৭ জন কৃষিজীবী আছে। এই যুদ্ধের ফলে হয়ত এই অনুপাত শ্রমজীবীদের দিকে ভারী হ'য়েছে। ভারতের অনেক শ্রমজীবী আংশিকভাবে শ্রমজীবী এবং আংশিকভাবে কৃষিজীবী। এই আংশিক শ্রমজীবীদের অন্তরের টান চাষের খেতের দিকে, কি কারখানার দিকে, তাও বলা কঠিন। যাই হক্, ৬৭ জনের কর্তৃত্ব ১০ জনের হাতে দিতে হ'বে—এটাত সঙ্গত কথা মোটেই নয়;—বিশেষ যখন ঐ ৬৭ জনও শ্রমশীল— সমাজের সবচেয়ে মৌলিক প্রয়োজন যাদের শ্রমে চলে এবং যাদের শ্রম বন্ধ হ'লে কারখানাগুলি কাঁচামালের অভাবে অর্দ্ধেকের মতো বন্ধ হ'য়ে যাবে। কোন দাবীতে কারখানার শ্রমিকরা কৃষিক্ষেত্রের শ্রমিকদের চেয়ে বেশী দাবীদার হ'ল যে সমস্ত সামাজিক কর্তৃত্ব ঐ মুষ্টিমেয় কারখানা শ্রমিক বা শ্রমজীবীদের উপর ন্যস্ত হবে—তার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ মার্কস্ দেখান নি। *

* এই প্রবন্ধে industry শব্দের বাংলা ইণ্ডাষ্ট্রি করা হয়েছে। বাংলায় সাধারণত শিল্প দিয়ে এর অনুবাদ করা হয়;— industrial area শব্দের বাংলা করা হয়—শিল্পাঞ্চল। এটা ভাষার দৈন্য সূচনা করে;—art ও industry একই শব্দ দ্বারা অনুদিত হওয়া অন্যায়।

ফেলারামবাবুর জল ও অগ্নি-সমস্যা

শ্রীশ্যামাপদ চট্টোপাধ্যায়

জল আর আগুন নিয়েই জগৎ। জল আর আগুন যদি পৃথিবীতে না থাকত তাহলে পৃথিবীর যে কি দুর্দশা হত, তা ভাবতে গেলে প্রাণ আতঙ্কে শিউরে উঠে। কোন্ এক ভদ্রলোক নাকি আগুনটা স্বর্গ থেকে চুরি করে এনেছিলেন। এনেছিলেন ভালই করেছিলেন। যদি না আনতেন তাহলে কি ব্যাপারটা হত ভাবুন ত। মনে করুন, গিন্নী ভাত রাঁধবেন বলে উনুনে হাঁড়ি চাপিয়েছেন, পৃথিবীতে আগুন নাই ত উনন জ্বলবে কি করে? আপনার আপিস যাবার সময় হয়ে এসেছে—দিলেন তিনি আপনার সামনে চালের থালা বাড়িয়ে। আপনাকে এখনি আপিস যেতে হবে, তা ছাড়া ক্ষুধারও উদ্রেক হয়েছে, আপনি আর করবেন কি, লাগলেন সেই চালগুলা কড়মড় করে চিবাতে। তার ফল হল কি? না, উদরাময়, আপিস কামাই, মাহিনা কাটা, মাসের শেষে খরচের টনাটানি, আর কিইবা নয়? এ ত একটা সামান্য উদাহরণ। আগুন না থাকলে আরও

আপনি হয়ত বলবেন—মশায়, সব ত বুঝলাম। কিন্তু যুদ্ধের বাজারে যে আগুন থেকেও নাই হয়েছে। একটা দেশালাইএর দাম চোরাবাজারে নগদ এক আনা। দেশালাইয়ে কটি কাঠিই বা থাকে। সবগুলো জ্বাললেও সামান্য একটু জল গরমও হবে না। আগুন জ্বালতে হলে কাঠ চাই, কয়লা চাই। কিন্তু কাঠ কয়লা মেলাই যে দায়। শুনেছি, যুদ্ধে যারা মরেছে তাদের শবদাহ আর শ্রাদ্ধ করবার জন্য প্রচুর কাঠ-কয়লার দরকার। তাই সদাশয় সরকার বাহাদুর বেসামরিক অধিবাসীদের জন্য কাঠ-কয়লা বেশি সরবরাহ করতে পারছেন না। কেউ কেউ আবার বলে, আগুন অতি ভীষণ জিনিস, একবার লাগলে দেশকে দেশ পুড়িয়ে দিতে পারে। জনসাধারণের উপকারের জন্য তাই সরকার বাহাদুর কাঠ-কয়লার দাম বাড়িয়ে তার ব্যবহার সীমাবদ্ধ করে দিয়েছেন। যারা এখনও স্বায়ত্তশাসনের উপযুক্ত হয় নাই, আগুন নিয়ে

কিন্তু উদরের পক্ষে চালে আর আধসেদ্ধ ভাতে যে কোন প্রভেদ নাই, তা ভুক্তভোগী মাত্রেই অবগত আছেন।

আপনার কথাটা আমি বিনা প্রতিবাদে স্বীকার করে নিলাম। কারণ সেদিন কালুগোয়ালার সঙ্গে দুধের দর নিয়ে একটু বচসা হয়ে গেল। সে বলল, "ফেলুবাবু, দুধে জল দিতে গেলে আপনারা ধরে ফেলেন। জল না-হয় না দিলাম, কিন্তু আগুন কোথায় পাই বলুন ত? আগুন শস্তা না হলে দুধের দর কমাতে পারব না, এই আপনাকে শেষ কথা বলে দিলাম।"

বুঝুন ব্যাপার! আগুন না হলে গিন্নী ভাত দিতে পারেন না, এই শুনেছিলেন। কিন্তু গাই-এ দুধ দেয় না কেমন কথা? তবে স্ত্রীজাতির পক্ষে সবই সম্ভব, এই মনে করে চুপ মেরে গেলাম।

কিন্তু গয়লার-পোর বুদ্ধি আছে, বলল, "বাবু, বুঝলেন না বোধহয় কিছু। আগুন মানে এখানে ধুঁয়া গো বাবু, ধুঁয়া। মশা আর মাছি গায়ে বসলে গাইএ দুধ দেয় না, তার জন্ত ধুঁয়া দিতে হয়। কিন্তু বাবু, কাঠ কোথায়? বেশি দাম দিয়ে কাঠ কিনে ধুঁয়া দিতে গেলে দুধের দর আরো বাড়াতে হয়। তার মানেটা কি তা'ত আপনি বুঝতেই পারছেন।"

অতএব আপনার কথাটা আমি বিনা প্রতিবাদে মেনে নিলাম। তারপর ধরুন জল। এই পরম রমণীয় তরল পদার্থটি যে সকলের পক্ষে কত প্রয়োজনীয়, তা আপনার মত বিজ্ঞ ব্যক্তিকে নিশ্চয় বলতে হবে না। হিন্দুদের প্রলয়ের সময় বিষ্ণুকে জলের উপরেই ভাসতে হয়, দুরাত্মাদের শাস্তি দিবার জন্ত ক্রিশ্চানদেরও প্রলয় হয়—জলপ্লাবনে পৃথিবী ভেসে যায়। আর ভগবদ্ভক্ত নোয়াকে জলের উপরেই অবস্থিতি করতে হয়। এ ত গেল দেবতা আর ভক্তদের কথা। আপনার আমারই কি জলের অভাবে চলে? আপনাকে এসে যদি কেউ বলে, এই নাও আগুন, জল পাবে না। নেবেন আপনি তা? আমি ত মশায় নিতে পারব না। মানে, আমি উনুনে চাপান ভাতের হাঁড়ির কথা ভেবে বলছি। উনুনে আগুন খেতে বসলেন ভাত—এল চাল ভাজা! চিবুতে চিবুতেই আপিসের সময় বয়ে গেল। ফল, পূর্ববৎ।

তা হলেই স্বীকার করতে হচ্ছে যে, জল আর আগুন ছাড়া আমাদের চলতে পারে না। যদি কারও চলে, তাঁর চলুক, তিনি আপনার আমার দলে নন।

কে নাকি একজন নারীকে আগুন বলেছেন। পুরুষ ঘি হোক আর যাই হোক—তাতে অবশ্য বলবার কিছু নাই। কিন্তু নারীকে মাত্র আগুন বললে তাকে খাটো করা হয়, তার মধ্যে কেবলমাত্র আগুন থাকলে, সে সংসার ক্ষেত্রে অচল হয়ে পড়ত। তা যখন পড়ে না তখনই বুঝতে হবে তার মধ্যে জলও আছে।

আমার একজন কবি-বন্ধু নারীকে লক্ষ্য করে বলেছেন, —"বহ্নি জ্বালা বক্ষে তব চক্ষে ভরা জল।" নারীর বুকে আগুন, চোখে জল—কবি কি গভীর সত্য উপলব্ধি করেছেন বলুন ত! নারীর বুকে আগুন, চোখে জল—অর্থাৎ কিনা সে একটি ষ্টীম ইঞ্জিন। সংসার যানের আগে তাকে জুড়ে দাও—সংসার অমনি গড়গড় করে এগিয়ে চলবে। সেই জন্তই শাস্ত্রে বলেছে—গৃহিণীম্ গৃহমুচ্যতে। ইঞ্জিন মানেই গাড়ী। ইঞ্জিনবিহীন গাড়ীতে হয়ত আপনি চাপতে পারেন; কিন্তু ঐ পর্যন্ত, এগোতে পারবেন না একটুও।

কথাটা আর একটু সোজা করে বলি। মনে করুন, আমি শ্রীকেবলরাম শর্মা, দশটা-পাঁচটা খেটেখুটে ঠাণ্ডা মেরে বাড়ি ফিরেছি। ইচ্ছা, গিন্নীর হাতের চা জলখাবারটা খেয়ে বিছানায় একটু গড়িয়ে নেব। কিন্তু পারব আমি গড়াতে? গিন্নীর বুকের আগুন চোখের জলকে এমনি উত্তপ্ত করে তুলবে যে সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর বাষ্পের সৃষ্টি হবে, যার ধাক্কায় আমাকে তৎক্ষণাৎ জুতো না খুলেই বাজারে গিয়ে ছিটকে পড়তে হবে। তারপর এ দোকানীর খোসামুদি করে, ও দোকানির পায়ে তেল দিয়ে, এর ধমক খেয়ে, ওর চোখরাঙানি সয়ে সর্বাঙ্গে মাল বোঝাই করণ, তারপর গৃহে প্রত্যাবর্তন। আমি ফিরলে পর উনুনে আঁচ হবে, আঁচে কেটলি চড়বে, কেটলিতে জল গরম হবে, গরম জলে চা পড়বে, চায়ে যদি আপনি চিনি জুটাতে পেরে থাকেন,

বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছি যে, মশায় আপনাকে সত্যি বলছি, সংসারে থাকবার আর আমার আদৌ ইচ্ছা নাই। মনে হয়, যেদিকে দু'চোখ যায়, সেইদিকে চলে যাই। এখনো যাইনে, কিন্তু যে যাবনা, সে ভরসা আমি কাউকে দিতে পাচ্ছি না।

আপনিই বলুন, জল আর আগুন ঠিক সময়ে না পেলে কেউ সংসারে থাকতে চায়, না থাকতে পারে? মানে, আমি চা সিগারেটের কথা বলছি। জল আর আগুন—চা আর সিগারেট (আগুন মানে এখানে ধোঁয়া, উপরে কালু গোয়ালার উক্তি দ্রষ্টব্য)। বিলাসিতাই বলুন আর নেশাই বলুন, এ দুটো ছাড়া আমার আর কিছু নাই। ফিনফিনে ধুতি পরি না, একবার কোন রকমে এক জোড়া জুতো কিনতে পারলে একটা বছর রাজার হালে হেঁটে চলি, মুখে স্নো পাউডার ঘসি না, মাথায় সুগন্ধি তেল মাখি না, গিন্নী মনে না করিয়ে দিলে দাড়ি কামাই না, আর কত নায়ের কথা বলব, সংক্ষেপে, আমি কিছুই করি না। করি কেবল ধূমপান আর চা পান। আমার কবি-বন্ধু একটা মর্মস্পর্শী কবিতা লিখেছিলেন, (বেরসিক সম্পাদকরা কোন পত্রিকায় অবশ্য সেটা ছাপান নাই)—

দু-বেলা দু-থালা ভাত, দুটি কাপ চা
দু-চারিটা সিগারেট, পাতা বিছানা;
এরো পরে প্রিয়া যদি হেসে কথা কন
সংসার বিষ গাছে অমৃত ফলন।

মশায়, কেনারামের সংসার বৃক্ষে অমৃতই ফলত। দু-বেলা দু-থালা পুরা সেদ্ধ ভাত পেতাম, দু-কাপ চায়ের জায়গায় ছ কাপও হয়ে যেত, সিগারেটের পর সিগারেট পুড়াতাম পাতা বিছানায় শুয়ে বসে। ধূম উদ্গারণ দেখে প্রিয়া হেসে বলতেন, বৈঠকখানাকে যে রান্নাঘরের সমান করে তুললে ধোঁয়ায় ধোঁয়ায়। আমিও হেসে বলতাম, এটা সাম্যের যুগ। তুমি রান্নাঘরে ধোঁয়ায় বসে থাকবে, আর আমি এখানে অ-ধূম অবস্থায় থাকব, তা হতে পারে না।

কল্পনা করুন ত কি সুখের দিনই না চলে গেছে! সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই। যুদ্ধ এসে তুলাধুনা করতে লাগল, আর আমাদের সংসার গাছের শাখা হতে যে দু-চারটা অমৃত ফল ফলত সব বিদেশী সৈন্যদের উদরে গিয়ে প্রবেশ করল; আমাদের ভাগ্যে শুধু ঝরতে লাগল বিষ। চাখতে না চাখতেই কেউ কেউ চারদিক অন্ধকার দেখে মানে মানে পৃথিবী থেকে সরে পড়ল। যাদের নীলকণ্ঠ হবার সাধ তারা দিগম্বর হয়ে অল্পে অল্পে বিষটাকে হজম করবার চেষ্টা করে আজও দেশের বুকে চলা-ফেরা করছে।

অথচ, এই চা-তামাকই বিংশ শতাব্দীতে বাঙালীর মান সম্মান বজায় রেখে আসছিল। বাড়িতে কুটুম্ব বন্ধু আসুক, আপনি সঙ্গে সঙ্গে আদেশ দিলেন, ওরে হরে, একটু তামাক সেজে নিয়ে আয়, আর ঐ পথে গিন্নীকে চায়ের জল বসাতে বলে আসবি—

তিন আনা চোদ্দ পয়সা সের চিনি, ছ-আনা আট আনা সের তামাক, মুদ্রাস্ফীতি হয়ে আপনার টাকার দাম কমে যায়নি, স্ফীত বুকে আপনার তাই আদেশ দিতে বাধল না। হরীশ নিমেষের মধ্যেই তামাক সেজে কল্কে আগুন ফুঁকতে ফুঁকতে জলভরা হুঁকোর উপর কল্কে বসিয়ে দিয়ে গেল, কুটুম্ব বন্ধুরা ভুড়ুক ভুড়ুক করে ততক্ষণ হুঁকো টানতে লাগলেন, আপনি একটু চায়ের তদ্বিরে ভিতরে গেলেন। দেখলেন গিয়ে, গিন্নী ঝকঝকে কাপের মধ্যে চাঁপা ফুলের মত চমৎকার রঙের তরল পানীয় ঢেলে রেখেছেন। হরেকে আদেশ দিলেই সে তক্ষুণি চায়ের কাপ বৈঠকখানায় পৌছে দেবে।

আপনি ফিরে এসে বন্ধুদের কাছে বসলেন, হরে চা দিয়ে গেল। মুহূর্ত মধ্যে আপনার সম্মান রক্ষা হয়ে গেল। এর পর যদি আর একটু ভদ্রতা করতে ইচ্ছা হয় ত মুখে বলুন (যদি সহরে বাড়ি হয়) বাজারের জিনিস মশায় বিষ, ও আমি আমাদের বাড়ির ত্রিসীমানায় ঘেঁসতে দি-ই না। তাই খালি চা-ই দিলাম। কিছু মনে করবেন না। (যদি পাড়াগাঁয়ে বাড়ি হয়) আমরা মশায়, পাণ্ডব-বর্জিত জায়গায় বাস করি। বাড়িতে এসেছেন, একটু যে মিষ্টিমুখ করাব তার পর্যন্ত উপায় নাই। তাই ইত্যাদি—

চা পান করেই অভ্যাগতেরা চাঙ্গা হয়ে পড়েছেন—আপনার কথার চাতুর্যে মুগ্ধ হয়ে অবাক হয়ে তাঁরা আপনার

আপ্যায়িত হয়েছেন এ রকম ভাব দেখিয়ে 'হে হে' করে হেসে বললেন—তা যা বলেছেন মশায়, বাজারের জিনিস আবার মানুষে খায়? কি ভাগ্যি চা-টা আছে, তাই আমরা এখনো বেঁচে আছি—

কিন্তু আর বুঝি আমরা বাঁচিনা। মান সম্মানটা ত অনেক দিনই গেছে, পৈতৃক প্রাণটাও বুঝি আর টিকে না।

বন্ধুবান্ধব যদি কেউ বাড়ির মধ্যে দেখা করতে আসে অমনি গিন্নীর মুখ আঁধার হয়ে যায়। আগে থেকেই তিনি আমাকে সাবধান করে দেন "দেখো, চা করতে বলো না কিন্তু।"

গাঁয়ে গাঁয়ে ফুড্ কমিটি হয়েছে—জনপ্রতি চিনির বরাদ্দ সপ্তাহে এক ছটাক। কার্ডে লেখা থাকে সাপ্তাহিক বরাদ্দ, পাওয়া যায় তিন মাস অন্তর একবার। চোরাবাজারে দু-টাকা সের মেলে। কিন্তু যুদ্ধ বেধেছে বলে যে, জগৎ শুদ্ধ লোক চোর, ঘুষখোর, ব্যবসায়ী, কণ্ট্রাক্টার, রেশন পাওয়া চাকুরে হয়ে উঠেছে, তা ত নয়। আপনার আমার মত হতভাগা জীবনও আছে—যুদ্ধ বেধেও যাদের আয় বাড়াতে পারিনি, বাড়িয়েছে কেবল হাজার গুণ খরচ।

সময় মত চা না পেয়ে ত আমার বিদ্যাবুদ্ধি লোপ পেয়ে গেছে। দু' চার পাতা লেখা অভ্যাস ছিল। আশা করেছিলাম, ফেলারাম শর্ম্মার নাম একদিন দেশবিখ্যাত হয়ে উঠবে। কিন্তু মশায়, চা-ই আমার সর্বনাশ করে দিয়েছে। চা না পেয়ে আমার সাহিত্যিক প্রতিভা পর্যন্ত লুপ্ত হতে বসেছে। মুখ গোঁজ করে, মনকে শাসন করে যদি বা কখনো লিখতে বসি তাহলে এমনি সব লেখা বেরবে, যার না আছে আগা, না আছে গোড়া। লিখতে বসেছিলাম, জল আর আগুন নিয়ে একটা গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ, না লিখে বসলাম চা আর তামাকের কথা!

তামাক মানে, হুঁকোতে তামাক কিন্তু আমি খাই না। কলেজে পড়তে বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে সিগারেট ধরেছিলাম। তখন কে জানত যে, এমন একদিন আসবে যেদিন গোটা একটা বিড়ি পর্যন্ত জুটবে না। নেশার খেয়াল হলে উচ্ছিষ্ট অর্দ্ধ-দগ্ধ বিড়ির সন্ধানে কক্ষের মধ্যে ইতস্তত দৃষ্টি সঞ্চালন করতে হবে; সন্ধান পাওয়া গেলে গিন্নীকে হেঁকে বলতে হ'বে, "ওগো একটু আগুন দিয়ে যাও ত?" গিন্নী অমনি ঝংকার দিয়ে উঠবেন, "দশবার করে আমি আগুন দিতে যেতে পারবনা। দরকার হয় রান্নাঘরে এসে ধরিয়ে নিয়ে যাও—"

দুধে আলতায় গোলা যার রঙ ছিল, তার রঙ হয়ে দাঁড়িয়েছে এখন সার-ডোবার জলের মত। অভ্যাসের খাতিরে তবু যদি বিনীত কণ্ঠে বলি, "ওগো, বড্ড মাথাটা ধরেছে, দাও আরেকটু গুড়েরই চা করে।" অমনি গৃহিণীর কণ্ঠ থেকে ঝংকৃত হ'বে—"দশবার করে গুড়ের চা খেতে আমি দেবনা। গুড়ের চা খেয়ে অসুখ বাধিয়ে তোল—তারপর ..."

না জল, না আগুন। বলুন, এর পরও সংসারে থাকতে মন যায়?

আমরা

শ্রীসুধাংশুকুমার হালদার

সবাই বলছে—

স্বাধীনতা হ'ল, আর চিন্তা নেই,
দেশ এবার সমৃদ্ধিতে ভরে উঠবে।
শুধু দুচারটে বছর ধৈর্য ধ'রে অপেক্ষা মাত্র।
ইচ্ছা গেল
কোনো ছুটির দিনে কোনো গ্রামাঞ্চলে গিয়ে
রেলের টিকিট কেটে
একটা পাড়াগাঁয়ের ইষ্টেসন দেখে
নেমে পড়া গেল।
মাঠের রাস্তা ধরেছি—
ধূসর ধূ ধূ মাঠ।
কোনকালে ধান কেটে নিয়েছে

এদিকে শুনি খাদ্য-অনাটন,
বিদেশ থেকে আমদানি করা হাজার হাজার টন,
তার হিসেব পড়ি কাগজে।
ভাব্‌তে ভাব্‌তে চলেছি
তরি-তরকারি, রবিশস্য কি হয় না ?
কিন্তু বাধা যে বিস্তর।
মজুরের রোজ-মজুরি চতুর্গুণ
খরচে ঢাকের দায়ে
মনসা বিক্রয়।
কিন্তু কলের চাষ, ট্র্যাক্টর ?—
হায় রে, ঘন-জটিল প্রজাস্বত্ব আইনে
আর ঘন-সন্নিবিষ্ট আইলে
ট্র্যাক্টর-যন্ত্র অচল।
তার ওপর জলকষ্ট,—
মাঠের ধারে নদী নেই, খাল নেই,
সেচ নেই।
বাধা, কেবলি বাধা।
সব দিকেই মাথা ঠুকে যায়
বন্ধ দেওয়ালে।

জলকষ্টের কথা ভাবতে গিয়ে
দেখি অন্ততঃ নিজের ক্ষেত্রে
সে কষ্টটা আপাততঃ খুবই পীড়াদায়ক,
কোথায় পাই পিপাসার বারি!

শুধালাম একজনকে,
সে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে—
দূরের গাছপালার দিকে।
"ঐই হাই লি-লি করছে"
ঐখানে রাস্তার ধারে
"টিপকল"
টিপলেই জল বেরবে।
পাওয়া গেল জল অবশেষে।

[illegible]

এমন সময়
একটি জীর্ণ রুগ্ন ছেলে কাঁধে নিয়ে
এল এক স্ত্রীলোক।
ছেলেটির গায়ের হাড়কখানা
অনায়াসে গোনা যায়,
হাত পা সরু দড়ির মতো,
মাথাটা মস্ত,
ড্যাবডেবে চোখ দুটা মিলে
বিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে আছে,
কি দেখছে কে জানে।
মায়ের মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ,
বয়েস অনুমান করা শক্ত
চব্বিশ অথবা চল্লিশ দুইই হ'তে পারে।
পরণের কাপড়খানি
তেলকলের এঞ্জিন-মোছা স্থাকড়ার মতো ময়লা।
শ্মশানঘাটে ফেলে দেওয়া
মড়ার কাঁথার মতো শতছিন্ন।
হাতে একটি দাগকাটা ওষুধের শিশি
তাতে ফিকে লাল রঙের পদার্থ।
মেয়েটি বললে, "বাবু একটুন্ জল তুলে দাও।"
জল নিয়ে রুগ্ন ছেলের মুখে দিতে গেল,
ছেলেটা দুবার খাবি খেয়েই
চোখ বুজিয়ে নেতিয়ে পড়ল।
"ওরে খোকা, তোর হ'ল কি ?"
মেয়েটি কান্নার স্বরে জিগেস করল।
তৃষ্ণা ওর মিটে গেছে জন্মের মতো
কিন্তু মায়ের মন সে কথা ভাবতেই চায় না।
বললুম, বাছা তোমার ছেলে ঘুমিয়ে পড়েছে,
ওকে মিছে আর ডাকাডাকি কোরো না।
বরং আমার কোলে দাও,
এগিয়ে চলো তুমি পথ দেখিয়ে,
কোথায় তোমার বাড়ী।
মেয়েটি কেমন হকচকিয়ে গেল,
বুঝতে যেন পারছে, কিন্তু চাইছে না।

[illegible]

অলক্ষে দু এক ফোঁটা চোখের জল
মুছে ফেললাম—সামান্য চোখের-জল।
কতকটা আপন মনেই বক্‌তে বক্‌তে চলেছে মেয়েটি-
খোকা সেই জন্মে ইস্তক্ই ভুগছে,
কেবল ভুগছে।
তার আর দোষ কি, দারুণ আকাল যে গো!
গেল চারদিন ধরে তার বেজায় জ্বর,
চার কোশ দূরে সরকারি হাঁসপাতাল
রুগ্ন ছেলে কোলে ক'রে অভাগিনী মা
রাত থাকতে উঠে গিয়েছে সেখানে,
সেই চার কোশ দূরের হাঁসপাতালে।
ব'সে আছে ঠায়,
কত রুগী গেল এল,
বেলা গড়িয়ে যায়,
ছেলেটা কোলে ছটফট্ করে
ডাক্তারবাবু অবশেষে এলেন,
নলঘুরিয়ে এক নজর দেখেই
মুখ বেঁকিয়ে শিশিতে দাগ কাটা ওষুধ দেন,
ছেলেটার গা তখন পুড়ে যাচ্ছে।
পথে আসতে আসতে
খোকা বার কয়েক বলে—
'জল দে মা, জল দে গো,
জল খাবো।'
"দেখ দিকি বাবু"—মেয়েটি বলে,
"এত যার জল-পিপেসা
তার জল দেখেই ঘুম এল!"
আমি নিঃশব্দে অশ্রু-ঝাপ্‌সা চোখে
চলেছি পশ্চাতে।

পথের বাঁক ঘুরে দেখি
একজন কঙ্কালসার বৃদ্ধ
ততোধিক কঙ্কালসার গোরু নিয়ে আসছে।
বললুম, স্ত্রীলোকটিকে চেন?
"চিন্‌বনি কেন? ও তো আমাদের
ছিদামের পরিবার।"

কোলের মৃত শিশুকে দেখিয়ে
ইসারায় জানালাম
মারা গেছে।
বুড়ো আঁতকে উঠে বলল, "আহাহা!
মারা গেছে!"
শুনে শিশুকে আমার কোল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে
মেয়েটি ধপ্ ক'রে বসে পড়ল
পথের ধুলায়।
কাঁদল না, হায় হায় করল না,
অনেকক্ষণ মৃত শিশুর মুখের দিকে
চোখ মেলে চেয়ে থেকে
শুধু বললে—
"খোকা রে, মিনি পয়সার
এক আঁজলা জল,
মরবার কালে তাও তোর মুখে গেল না!"

ঘটনা এতই তুচ্ছ,
এদেশে এতই সাধারণ,
এমনি অনিবার্য
যে, একথা নিশ্চিত
যারা খেয়ে উঠে ঘুমায়
আর ঘুমিয়ে উঠে খায়
তারা তেমনি খাবে আর ঘুমাবে।
এতটুকু বৈলক্ষণ্য ঘটবে না তাতে।

কিন্তু ধিক্!
ধিক্ এই স্বাধীনতার ভড়ংকে
ধিক্ তোমাদের বুলিকে।
সবার চেয়ে ঘৃণ্য
সবার চেয়ে পাষণ্ড
সবার চেয়ে অকর্মণ্য
অমানুষ—
এই আমরাই।

ভারতের মর্ম্মবাণী ও গান্ধীজী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ রায়

"আমি কি করিয়া তাহার কথা প্রচার করিব? তাঁহার ভাস্বর আত্মার তুলনায় আমি কিছুই নই। সমগ্র প্রাচ্যের আত্মা আজ গান্ধীতে মূর্ত্তিমান হইয়া উঠিয়াছে।"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ঐতিহাসিক সত্যের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া হৃদয়ের সবটুকু শ্রদ্ধা ঢালিয়া আমি বলিতে পারি যীশু খ্রীষ্টের সঙ্গে গান্ধীজী একাসনে বসিবার যোগ্য। এই দুইটী মানুষের জীবনকাহিনী পাশাপাশি লিখিত হইলে দেখিতাম উভয়ের জীবন ধারায় কি আশ্চর্য্য ঐক্য। প্রভু যীশুখ্রীষ্টের দ্বিতীয় বার জন্ম পরিগ্রহের বিষয় বিশ্বাস করিলে বলিতাম, প্রভু যীশুই মহাত্মা গান্ধীরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

রেজারেণ্ড হোমস্।

ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা হয়তো বিশ্বাস করিতে চাহিবে না যে তাহার মত ব্যক্তি কখনও রক্ত মাংসের দেহ লইয়া এই পৃথিবীতে বিচরণ করিয়াছিলেন।

অধ্যাপক আইনষ্টাইন।

স্বদেশের মুক্তি কিম্বা স্বাস্থ্যের জন্য কেহ কেহ অনশন করিয়া থাকেন কেহবা অন্যায় কার্য্যের প্রায়শ্চিত্ত হিসাবে অনশন অবলম্বন করেন। এই শ্রেণীর অনশনে অনশনকারীর অহিংসায় আস্থাবান না হইলেও চলিতে পারে, কিন্তু অহিংসার উপাসককে অনেক সময় সমাজের অন্যায় আচরণের প্রতিবাদে অনন্যোপায় হইয়া অনশন অবলম্বন করিতে হয়, এইরূপ অবস্থায় আমি পতিত হইয়াছি। * * * মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতনের সঙ্কল্প আমি গ্রহণ করিয়াছিলাম, (পুলিশ ও সেনাবাহিনী কর্ত্তৃক অস্বাভাবিক শান্তির প্রতি ইঙ্গিত করিয়া) এই অবস্থায় আমার বত উদ্যাপিত হইয়াছে বলা চলে না। একমাত্র 'মন্ত্রের সাধনই' আমাকে আমার অতুলনীয় বান্ধব মৃত্যু হইতে দূরে রাখিতে পারে। হিন্দু, মুসলমান ও শিখ—পরস্পরের মধ্যে যে বন্ধুত্ব ছিল তাহা বিলুপ্ত হইয়াছে। স্বদেশহিতৈষী কোন ভারতীয়ই এই অবস্থা মানিয়া লইতে পারে না। বহুদিন হইতেই আমি আমার অন্তরের আহ্বান শুনিতেছিলাম, উহা আমার দুর্ব্বলতাস্বরূপ সয়তানের আহ্বান কিনা নিশ্চিত হইবার জন্য এতদিন উপেক্ষা করিয়াছিলাম। আমি কখনই আপনাকে একান্ত অসহায় মনে করিতে চাহি নাই, একজন সত্যাগ্রহীর ঐরূপ মনে করা উচিতও নহে, তরবারীর স্থলে অনশনই তাহার শেষ অবলম্বন। * * * গত তিন দিন ধরিয়া এই বিষয়ে চিন্তা করিবার পরে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিয়া আমি সুখী হইয়াছি। যদি কোনও ব্যক্তি সাধু হন তবে তাহার যে পথ অবলম্বন করিয়াছি তাহা যে ন্যায়সঙ্গত ইহা প্রমাণ করিবার জন্য আমার অন্তঃকরণ যেন পবিত্র থাকে, অহরহ এই প্রার্থনাই আমি করিতেছি। আমার এই শান্তি প্রচেষ্টাকে আশীর্ব্বাদ করিবার জন্য আপনাদের অনুরোধ জানাইতেছি।

গত বৎসর ১২ই জানুয়ারীর প্রার্থনা সভায় অনির্দ্দিষ্টকাল অনশনব্রত গ্রহণের অভিপ্রায় জানাইয়া গান্ধীজী উপরোক্ত ভাষণ দেন। জাতির বিভিন্ন অংশের মর্ম্মস্থানে হিংসা, সন্দেহ ও ঈর্ষাকালকূটের যে বাসা বাঁধিয়াছে তাহা হইতে কংগ্রেস ও ভারতবর্ষকে, চরম ধ্বংস হইতে, রক্ষা করিবার জন্য গান্ধিজী তাঁহার জীবনকে ভগবানের দয়ার নিকটে সমর্পণ করিয়া দিয়াছেন।

স্বাধীনতা মহাযুদ্ধে তিনি ছিলেন মন্ত্রগুরু ও সেনাপতি। তাঁহারই উদ্ভাবিত অহিংস প্রতিরোধ যুদ্ধে ইংরাজ বিতাড়িত হইয়াছে, কামান বন্দুক প্রেমের নিকটে পরাভব স্বীকার করিয়াছে, কিন্তু দুই শত বৎসরের রুদ্ধ শক্তি হঠাৎ পাষাণ মুক্ত হওয়ায় উচ্ছল তরঙ্গে, ঊর্ম্মিমালায় বেলাভূমি বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিয়াছে। পুরাকালে সুরাসুরের সংগ্রামে হলাহল উত্থিত হইয়াছিল, ঠিক অবিকল বিভিন্ন স্বার্থের বিপরীতমুখীন আত্মীয়কলহে ভারত বেলাভূমি আজ তীব্র আসবে পরিপূর্ণ, স্বাধীনতা অমৃত পান করিয়া জাতি নির্ব্বিশেষে সকলকেই পূর্ণ মানুষ হওয়ার সুযোগ দেওয়ার জন্য নবযুগের মহাদেব গেলিল ঐ আসব আকণ্ঠ পান করিয়াছেন, আত্মনিপীড়ন, আত্মনিগ্রহ ও আত্মস্বার্থ বিসর্জ্জনের ভিতর দিয়া প্রেম, মৈত্রী ও উদারতার প্রতিষ্ঠা যদি সম্ভবপর না হয় তবে নিছক ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব দেখিবার জন্য তিনি দেহধারণ করিতে রাজী নহেন।

গান্ধীজী জীবনে কখনও পরাজয় স্বীকার করেন নাই, পরাজয়ের মুহূর্ত্ত আসিলেই তিনি তখন হইয়াছেন সবচেয়ে ভয়ঙ্কর। পরাজয় সম্ভাবনা তাহাকে লইয়া গিয়াছে জনতা থেকে দূরে। জাতির চিত্তে সম্বিত ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত প্রায়োপবেশন ও আত্মশুদ্ধির ভিতর দিয়া বিক্ষুব্ধ জনগণের তীব্র দাবদাহ নীরবে হজম করিয়াছেন এবং অন্তরের আলোকের অপেক্ষায় সময়ক্ষেপন করিয়াছেন। সুদক্ষ চিকিৎসকের ন্যায় জাতির নাড়ী ধরিয়াই শুভবুদ্ধি জাগ্রত হইয়াছে কিনা তিনি বুঝিতে পারিতেন এবং তারপর যখন কর্ম্মক্ষেত্রে আবির্ভূত হইতেন তখন জলদগম্ভীর বাণী তাঁহার কণ্ঠ হইতে উৎসারিত হইত। চৌরিচোরা লবণ সত্যাগ্রহ, "করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে" এবং আর কত ঘটনায় একই সত্য প্রকাশিত হইয়াছে।

গান্ধীজীর বিশ্বাস, আত্মবলিদান কক্ষনও নিরর্থক হয় না। জাতির

মৃত্যু-বরণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। তাঁহার এই প্রয়াস ইতিপূর্ব্বে কখনও ব্যর্থ হয় নাই। সত্যানুসন্ধানী, নির্ভীক ও অহিংসক না হইলে বিপন্নের রক্ষায় আত্মবলিদান করিতে কেহ সমর্থ হয় না। তাহার নিকটে সার্থকতার প্রশ্ন উঠিলে তিনি বলিতেন, নশ্বর দেহ ভস্মীভূত হওয়ার পূর্ব্বে কাহারও কাজের বিচার করা সম্ভব নহে। তাঁহার আমৃত্যু প্রায়োপবেশনে জাতির নিকটে সেই মুহূর্ত্ত সমুপস্থিত হইল। ভারতবাসী আজ সত্যই বড় বিপন্ন।

আপনাকে আপনি বলি দেওয়ার অপূর্ব্ব প্রেরণায় সমগ্র ভারতজনপদ তখন উদ্বেলিত। জাতির শ্রেষ্ঠ নেতৃবৃন্দ ও প্রতিনিধি কর্ম্মীরা এই মহামানবের জীবন সায়াহ্নে, ইন্দ্রপ্রস্থের মহাতীর্থে, সমাগত হইয়াছেন। আত্মীয় দ্বন্দ্বে বিগলিতপ্রাণ মহাত্মার জীবন নাট্যের পরিণতি দেখিয়া আজ অনুরূপ পুরাতন ঘটনাসকল স্মরণে আসে। হাজার হাজার বৎসরের ব্যবধান হইলেও ঘটনাগুলির সাদৃশ্য অনেক। সকলের একই পরিচয়, নিজের অস্থিপঞ্জর জ্বালাইয়া অপরের হৃদয়ে প্রেমের আলো প্রজ্বলিত করা ; যুগে যুগে ঐ আলো অনুসরণ করিয়াই জাতির জীবনে যৌবন জল-তরঙ্গের তুফান উঠে। জাতির জয়রথ ব্রহ্মাণ্ড প্রদক্ষিণ করিয়া চলে ;

মোর মরণে তোমার হবে জয়
মোর জীবনে তোমার পরিচয়
মোর দীনতা তোমার জয়রথ
তোমারই পতাকাশিরে বয়।

কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধ শেষ হইয়াছে। অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা ও সেনানীর রাঙা রক্তে কুরুক্ষেত্রের প্রান্তর এখনও সিক্ত। ধৃতরাষ্ট্রের শতপুত্রদের মধ্যে তাঁহারা একমাত্র যুযুৎসু কুরুনারীদের সমভিব্যাহারে হস্তিনাপুর রাজধানীতে আশ্রয় পাইয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ এবং গান্ধারীর অনুমোদনে যুধিষ্ঠির রাজপদে অভিষিক্ত হইয়াছেন, তথাপি মানসিক প্রশান্তি তাঁহার আসিল না. গুরু, শিক্ষক, আত্মীয় ও জ্ঞাতি বধে এবং রাজ্য বীরশূন্য দেখিয়া তিনি মর্ম্মান্তিক শোকমগ্ন হইয়া পড়িলেন, রাজপাট তিক্ত বোধ হইতে লাগিল, তিনি পুনরায় কুরুক্ষেত্রে ফিরিয়া আসিলেন.। হত্যার বিভীষিকায় স্তব্ধ এই মহাপ্রান্তরে কুরুবৃদ্ধ শান্তনুনন্দন যোগক্ষেম অবস্থায় এখনও শরশয্যায় শায়িত। বিষণ্নবদনে যুধিষ্ঠির আদি পঞ্চ ভ্রাতা মাধব সমভিব্যাহারে ধীরে ধীরে ভীষ্মের পাদমূলে উপস্থিত হইলেন। কুরুবৃদ্ধ যুধিষ্ঠিরকে দীনবেশে ম্লানমূর্তিতে অবলোকন করিয়া দয়ার্দ্রচিত্তে মায়াবিষ্ট যুধিষ্ঠিরের খিন্নতা বিদূরিত করিবার জন্য উপদেশ সংযোগে সত্যধর্ম্ম ও মৃত্যুর রহস্য ব্যাখ্যা করিলেন। অপার কালসাগরের ব্যবধান দূরীভূত হইয়া তাঁহার উপদেশ আজও আদর্শবাদীর আশ্রয় স্থল।

সর্ব্বভূতে সমভাব করে যেইজন
সর্ব্ব ধর্ম্ম ত্যজি লয় গোবিন্দ স্মরণ
অন্তে তনু ত্যজি যায় বৈকুণ্ঠ ভুবন,
অনিত্য সংসার নিত্য নহে ধন জন,
নিত্য বস্তু নারায়ণ এক সনাতন।

ভীষ্মদেবের সাধুসঙ্গ ও উপদেশে যুধিষ্ঠিরের বৈরাগ্য দূরীভূত হইল। মায়াময় আকুল সংসারে তিনি কাণ্ডারীর আশ্রয় পাইলেন, তারপর চিরদিন সংসারে ছিলেন ধর্ম্মের অনুশাসনে প্রাণ বক্ষপাদে, হস্ত কার্য্যে সদা নিযুক্ত রাখিলেন। কামনাবর্জ্জিত হইয়া শুদ্ধাচারে জনসাধারণের নিষ্কাম সেবায় তিনি পূর্ণাহুতি দেন। যুধিষ্ঠির ভগবানের ক্রোড়ে বিলয় পাইয়াছেন বহু হাজার বছর আগে কিন্তু সমগ্র ভারত সশ্রদ্ধমনে আজও তাহার পূর্ণাহুতি, ব্রতউদ্যাপন স্মরণ করিয়া দেহ মন পবিত্র করিয়া থাকে।

যুগে যুগে ইতিহাসের আবর্ত্তন হয়, প্রকাশের রকমফের ও থাকিতে পারে, কিন্তু সত্য চিরকালই এক ও অভিন্ন। অন্ধকারের উৎস হইতে যে আলো নির্গত হয় তাহা শব শুভ নহে, আনন্দময়। তিমির রাত্রে ধূলিধূসরিত ও ক্ষুৎপিপাসায় কাতর দুর্গম যাত্রীর সম্মুখে এই আলো নব জীবনের "ফুল্ল কুসুম মধুর পবন" বহন করিয়া আনে, সংগ্রামের মধ্যে, দুঃখের অভিসারে, দুর্গম যাত্রীর সম্মুখে সাহার যে পথ পরিচয় লাভ করা যায় ঐশ্বর্য্য, স্বাচ্ছন্দ্য কিম্বা তামসিকতার আবিলতায় সুপ্তিজড়িত চিত্তে তাহা কল্পনার অতীত।

কুরুক্ষেত্র ধ্বংস, হত্যা ও মৃত্যুর শেষে পাঞ্চজন্য নির্ঘোষে শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কিন্তু এই অমূল্য প্রতিষ্ঠার মহামূল্য মাধবকেই দিতে হইয়াছিল. সাম্রাজ্যের প্রশান্তির গোপনপথে সুরা সুড়ঙ্গ খনন করিয়া চলিল. যদুকুল শক্তি মহিমার মাদকতায় সত্য শিব সুন্দরের পূজা ভুলিয়া গেল, এমনকি শিষ্য এবং সহকারী সাত্যকি মদমত্ততায় কৃষ্ণ নিন্দায় মুখর হইয়া উঠিল, আত্মকলহপরায়ণ যদুকুল অবশেষে প্রভাসের তীরে [illegible] ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল। স্বয়ং রক্ষাকর্ত্তা শ্রীকৃষ্ণ যোগারূঢ় অবস্থায় ব্যাধ নিক্ষিপ্ত শরে দেহত্যাগ করিলেন। তৃতীয় পাণ্ডব গাণ্ডিবী যদুকুল রমণীগণকে দস্যু হস্ত হইতে রক্ষা করিতে অসমর্থ হইলেন। মহাভারতের শান্তি অস্থায়ী হইল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিবদমান ভূখণ্ডে ভারত পুনরায় বিভক্ত হইয়া গেল। তারপর দীর্ঘদিন উল্লেখযোগ্য কোন নূতন ইতিহাস রচিত হয় নাই। তুহিন শান্তির মধ্যে জড়ভরত অবস্থায় কিছুদিন অতিবাহিত হয় ; নিরীহ বিপন্ন বোবা পশুর আর্ত্তস্বর কখনও যজ্ঞবেদী ছাপাইয়া শান্তির নিবিড়তাকে মাঝে মাঝে আর ভয়ঙ্কর করিয়া তুলিত মাত্র। যাগ যজ্ঞের বাহ্যাড়ম্বর তীব্রতর হইবার সাথে সাথে বিপন্নের ভগবান কপিলবাস্তুর লুম্বিনী উদ্যান আলোকিত করিয়া শান্তিধর্ম্ম প্রচারের জন্য অবতীর্ণ হইলেন। ভারতের ইতিহাসে পুনরায় গৌরবময় অধ্যায় সংযুক্ত হইল। বিক্ষুব্ধভারত শ্রীবুদ্ধের ত্রিশরণ পতাকা শিরে ধারণ করিয়া নবজীবন

সাধারণ মানুষে শীলধর্ম্মের পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে সক্ষম না হওয়ায় সংঘ যথেচ্ছাচারে পূর্ণ হয়। ভারতীয় সংস্কৃতির মরমী মন শঙ্করাচার্য্যকে কেন্দ্র করিয়া পুনরায় জাগ্রত ও মুখর হইয়া উঠে। যে বৌদ্ধ সংঘকে ভারত এতদিন আপন রুধিরে পরিপুষ্ট রাখিয়াছিল দুষ্টব্যাধিগ্রস্ত সেই সঙ্ঘারামকে নিঃশেষে নীরবে ভারত আপন অঙ্গ হইতে ধুইয়া মুছিয়া নিশ্চিহ্ন করিয়া ছাড়িল। ভারতের আধ্যাত্মিক প্রাণ যুগে যুগে এইরূপেই হিংসা-পঙ্কিল-লালসাময় জীবন ঘৃণায় দূরে নিক্ষেপ করিয়া মহিমোজ্জ্বল প্রভায় সার্ব্বজনীন সত্যে দিগন্ত উদ্ভাসিত করিয়াছে। কিন্তু আকাশে আলোছায়ার খেলা ত সকল সময়। ভারতও পুনরায় ঘুমাইয়া পড়ে। বহুশতাব্দীর বিভিন্ন মনীষীর ঘাত প্রতিঘাতে বর্ত্তমান হিংসা-কুটিল পটভূমিকায় আত্মঘাতী ভ্রাতৃবিরোধের মধ্যে মহাত্মা গান্ধীর বিকাশ নিছক ভারতীয় সংস্কৃতির আত্মিক প্রকাশ।

অনশনের তৃতীয় দিবসের ভাষণে গান্ধীজী বলিতেছেন, আমার যৌবনকালে যখন রাজনীতি সম্পর্কে কিছুই জানিতাম না তখন হইতেই আমি সাম্প্রদায়িক ঐক্যের স্বপ্ন দেখিতাম। এই জীবনেই স্বপ্নের সার্থকতা দেখিতে পাইলে জীবন সায়াহ্নেও আমি শিশুর মতন নৃত্য করিব। অতীতের ঋষিদের বর্ণনা অনুযায়ী জীবনের পূর্ণ সীমা, ১২৫ বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকিবার বাসনা তখনই জাগিয়া উঠিবে। স্বপ্ন সার্থক করিবার জন্য এমন কে আছে যে তাহার জীবনোৎসর্গ করিবার ঝুঁকি লইবে না? এই স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত না হওয়া পর্য্যন্ত প্রকৃত স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। আইনতঃ ও ভৌগলিক দিক হইতে আমরা হয়তো দুইটী রাষ্ট্রে বিভক্ত থাকিতে পারি কিন্তু প্রাত্যহিক জীবনে আমাদের পৃথক রাষ্ট্রের কথা কেহ চিন্তাও করিবে না। আমার চোখের সামনে প্রতিনিয়ত যে আলেখ্য মহিমান্বিতরূপে ভাসিয়া উঠে তাহা লাভ না করা পর্য্যন্ত আমি সুখী হইতে পারি না, ইহার চেয়ে ছোট কোন লক্ষ্যের জন্য আমি বাঁচিয়া থাকিতেও চাহি না। * * *

১৮৯৬ সালে দিল্লী অথবা আগ্রা দুর্গ দেখিবার সময় উহার একটী তোরণে আমি এই শ্লোক খোদিত দেখিয়াছিলাম, 'বিশ্বের যদি কোথাও স্বর্গ থাকে তাহা এখানে, তাহা এখানে, তাহা এখানে," আমার নিকটে সেই বিরাট দুর্গ, স্বর্গ বলিয়া প্রতিভাত হয় নাই। পাকিস্তানের প্রতি তোরণে ঐ শ্লোকটী লিখিত হউক ইহাই আমি দেখিতে চাহি। এই স্বর্গ ভারত ও পাকিস্তানের যে কোন স্থানেই প্রতিষ্ঠিত হউক না কেন, নিঃস্ব ও ভিক্ষুক সেখানে থাকিবে না, উচ্চ অথবা নীচ থাকিবে না, লক্ষপতি মালিক অথবা অর্দ্ধভুক্ত শ্রমিক থাকিবে না। এখানে মদ্য অথবা মাদকদ্রব্যের অস্তিত্ব রহিবে না। পুরুষ যেরূপ সম্মান পায় নারীও সেইরূপ সম্মান লাভ করিবে। নারী ও পুরুষের পবিত্র সম্পর্ক এখানে আগ্রহ সহকারে রক্ষিত হইবে। নিজের পত্নী ব্যতীত প্রত্যেকেই এখানে অপর রমণীকে বয়স বিবেচনায় ভগিনী কিম্বা কন্যার ন্যায় বিবেচনা করিবে। অস্পৃশ্যতা থাকিবে না এবং প্রত্যেক ধর্ম্মই

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামার প্রতিকার প্রার্থনা করিয়া তিনি যে সকল ভাষণ দিয়াছেন তাহাতে তাঁহার অপূর্ব্ব ঋষিসুলভ দৃষ্টিই পরিস্ফুট হয়। পৈশাচিক উল্লাস, নরহত্যা, গৃহদাহ, লুটতরাজ, নারী হরণ, জবরদস্ত ধর্ম্মান্তরিতকরণ এবং অপরাপর কদর্য্য অসামাজিক কাজ দেখিয়া মহাভারতের ভীষ্মের মতন তাঁহার জীবনে ধিক্কার আসিয়াছে; তিনি পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন ভারত ও পাকিস্তানে শান্তি ফিরিয়া না আসিলে তাঁহার আর বাঁচিবার ইচ্ছা নাই। ভবিষ্যৎদ্রষ্টার ন্যায় তিনি উপলব্ধি করিয়াছেন যে, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা না থামিলে স্বাধীনতার অবসান ঘটিবে। তাঁহার অনশন গ্রহণের কারণ এই নিশ্চিত ভাবী বিপর্যায় রোধ। তাঁহার মতে সামরিক শক্তি ক্ষণস্থায়ী এবং মহৎ লক্ষ্য সাধনে অনুপযোগী; আধ্যাত্মিক শক্তির মধ্যেই দেশের অগ্রগতির মূল কারণ নিহিত, তাঁহার মতে সাম্প্রদায়িকতার মূলে আছে পারস্পরিক ভয় ও ভীরুতা, ভয়ার্ত্ত জীবমাত্রেই নিজের ছায়া দেখিয়া সন্দেহ করে ও হঠাৎ দেখিলে আঁতকাইয়া উঠে।

গুরগাঁয়ে এক সভায় তিনি মসজিদ, মন্দির, গুরুদ্বার ধ্বংস ও অপবিত্রকরণ উল্লেখ করিয়া ক্ষোভের সহিত বলেন, প্রতিকার কি? অস্ত্রের শক্তিতে আমার আস্থা নাই, আমি শুধু অহিংসার অস্ত্রই সকলের হাতে দিতে পারি, এই অস্ত্র অপরাজেয় এবং সকলপ্রকার অবস্থায় কার্য্যকরী, কি খ্রীষ্টধর্ম্মে, কি হিন্দু বা অন্য কোন ধর্ম্মে * * * সকল মহৎ ধর্ম্মেই ইহার স্থান আছে। কিন্তু ধর্ম্মের উপাসকদের নিকট ইহা এখন পাঠ্য পুস্তকের সদুপদেশে পরিণত হইয়াছে। কার্য্যকালে সকলেই বন্য পশুর মত আচরণ করিয়া থাকে। * * * কিন্তু অহিংসার বাণী, আত্মিক শক্তি দ্বারা পশুশক্তির সম্মুখীন হইবার বাণী ব্যতীত দিবার মত অন্য কোন বাণী আমার নাই।

অন্যত্র বলিতেছেন, দুইটী নদীর জলধারা যখন একত্র আসিয়া সম্মিলিত হয় তখন উচ্ছল তরঙ্গাঘাতে জলের উপরিভাগে ফেনময় আবর্জ্জনা ভাসিয়া উঠে, উপর হইতে মনে হয় সকল কিছুই ঘোলাটে এবং আবর্জ্জনাময়; কিন্তু তলদেশ যিনি দেখিতে পান তিনি দেখেন স্বচ্ছ ও স্থির জল, উপরের আবর্জ্জনা ও ফেনময় পদার্থ আপনি সমুদ্রে গিয়া পড়ে কিন্তু নদী নদীর সহিত মিলিত হইয়া স্বচ্ছ নির্ম্মলধারায় প্রবাহিত হয়। উন্মত্ত হিন্দু মুসলমানের স্বজন হত্যায় ব্যথিত হওয়া সত্ত্বেও গান্ধীজী আশা হারান নাই, তাঁহার মতে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ উচ্ছল ফেনপুঞ্জ ব্যতীত আর কিছুই নহে।

গান্ধীজীর সাম্প্রতিক ভাষণের মধ্যে নিরাশা ও সংশয়ের ভাব দেখিয়া জনৈক য়ুরোপীয় বন্ধু দুঃখ করিয়া পত্র দেওয়ায় গান্ধীজী সপ্রতিভ ভাবে অহিংসার ব্যর্থতা স্বীকার করিয়া উত্তর দেন। এই উত্তর তাঁহার স্বীকৃতির অপূর্ব্ব নিদর্শন, তাঁহার মতে নিরুপদ্রব প্রতিরোধ ও অহিংসা এক জিনিষ নহে। দুর্ব্বল জাতির ত্রিশ বৎসরব্যাপী নিরুপদ্রব প্রতিরোধ চেষ্টায় দেশে স্বাধীনতা আসিয়াছে। হঠাৎ এই অবরুদ্ধ শক্তি মুক্তি

শক্তিমান জাতির মধ্যে অপরাজেয় অহিংসার প্রয়োগ পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয় নাই, ইহা বলাই সঙ্গত। বরং আপনার বেলায় বীরোচিত, স্পষ্ট এবং সহজগ্রাহ্য অহিংসার পরিচয় দিতে তিনি এখনও সক্ষম হন নাই, তাহার দাবী এই যে মুহূর্ত্তকাল বিশ্রাম না করিয়া তিনি লক্ষ্যের দিকে যাইতেছেন মাত্র, ত্রিশ বৎসর অনন্যসাধারণ পরিশ্রম, দুঃখভোগ ও ত্যাগের পরেও যিনি সরল বিশ্বাসে স্পষ্ট বলিতে পারেন লক্ষ্য এখনও দূরে, বেলাসমুদ্রে উপলখণ্ড সংগ্রহ করিতেছি মাত্র, তিনি সত্যই অসাধারণ।

গান্ধীজীর দুর্লভ মানবপ্রেম ও অনায়াসলব্ধ দেবোপম চরিত্রের সহিত ইসমাইলী সম্প্রদায়ে জাত দুই জাতিতত্ত্বের উদ্ভাবক মহম্মদ আলী জিন্না সাহেবের চরিত্র আলোচনা করিলে পুরাতন দুইজন মনীষীর কথা মনে আসে, ঠিক অনুরূপ না হইলেও একটা উদাহরণ খাড়া করা যায়। একজন ইক্ষাকু বংশের কুলপুরোহিত বশিষ্ঠ, অপর একজন বিশ্বামিত্র। জীবন আলেখ্যের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীতে দুজনেই বড়, কিন্তু বশিষ্ঠ ছিলেন মহত্তোমহীয়ান। রাজা বিশ্বামিত্র ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠকে বরাবরই ঈর্ষা করিতেন, নানা ছলচাতুরীতে শতপুত্র বলিদান সত্ত্বেও বশিষ্ঠ স্বাভাবিক ঔদার্য্য দয়া, ক্ষমা, প্রেম প্রভৃতি ব্রহ্মণ্য গুণ ক্ষণেকের জন্যও বিস্মৃত হন নাই। কিন্তু শস্ত্রবিৎ বিশ্বামিত্র শক্তিশালী হইয়াও ক্রোধী, হিংস্র, লোভী ও ষড়রিপু বশীভূত, বারংবার পরাভূত হইয়াও সহায় সম্পদহীন ব্রাহ্মণের কৃপাপ্রার্থী, কিন্তু ঈর্ষাপরায়ণ। অবশেষে রাজ্য, রাজপাট ও পরিজনবর্গ পরিত্যাগ করিয়া কিসে ব্রহ্মণ্য লাভ করা যায় সেই তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইলেন। বহুবর্ষব্যাপী কঠিন আরাধনায় মনোরথ সিদ্ধ হইল, অপার আনন্দ সাগরের সন্ধান পাওয়ার সহিত ব্রহ্মর্ষি বিশ্বামিত্রের ঈর্ষা ও অভিমান দূরীভূত হইল, চরিত্রের ঔদার্য্য প্রস্ফুটিত হইল। গললগ্নীকৃতবাসে নতজানু বিশ্বামিত্রকে উপস্থিত দেখিয়া বশিষ্ঠ তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকার করিলেন এবং আলিঙ্গন দিলেন।

ব্রহ্মর্ষি হওয়ার পূর্ব্বে ত্রিশঙ্কুর স্বর্গারোহণ লইয়া দেবতাদের সহিত বিশ্বামিত্রের বিরোধ হয়। ত্রিশঙ্কুকে পিতৃহত্যা পাতকের জন্য দেবতারা স্বর্গে স্থান দিতে অনিচ্ছুক দেখিয়া নিজ তপোবলে নবসৃষ্ট নক্ষত্রপুঞ্জের মধ্যে ত্রিশঙ্কুর অবস্থান নির্ম্মাণ করিয়া দেন, পাকিস্তানের অবস্থা কি ত্রিশঙ্কুর ন্যায় হইবে? ভবিষ্যৎ এই প্রশ্নের উত্তর দিবে।

গান্ধীজীর প্রায়োপবেশন ও আত্মশুদ্ধির জন্য আত্মনিগ্রহ সুখে দুঃখে অকম্পিত এমন কি আততায়ার বোমা বর্ষণেও স্থিতপ্রজ্ঞ অবিচলিত অবস্থা দেখিয়া মনে আসা স্বাভাবিক যে গান্ধীবাদ আজ চুলচেরা বিতর্কের প্রান্তে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, অত্যুচ্চ পর্ব্বতের শিখরদেশের একপ্রান্তে এই নবীন আদর্শবাদের বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীয়মান, অপরদিকে অতলস্পর্শী গহ্বর। পথিক সাবধান, ক্ষণেকের ভয়ভীতি ও ত্রুটীর জন্য, ক্ষণিক চাঞ্চল্যের জন্য ব্যথিত বিশ্বামিত্রের বাঁধনহারা পূজা অস্তমিত রবির দিকে ঊর্দ্ধশ্বাসে, চকিতে জ্বলিয়া না উঠিয়া দিগন্তে পথ হারাইয়া জানাইল যে বাপুজী আর নাই, আততায়ার নির্ম্মম গুলিতে তাঁহার তিরোভাব হইয়াছে। স্থিতপ্রজ্ঞ ঋষির শেষ আত্মদান বশিষ্ঠের মহান ত্যাগকেও ম্লান করিয়া তুলিল, নাজারাতের মরুভূমির বুক ফাটিয়া দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে শান্তির যে প্রস্রবণ উঠিয়াছিল, পৃথিবীর আর্তপরিক্লিষ্ট জনসাধারণ সেই শান্তিজল পান করিয়া পবিত্র হইয়াছিল, কিন্তু যাহারা ঐ পবিত্রদেহ ক্রুশবিদ্ধ করিয়াছিল তাহাদের অবস্থা কি করুণ! ঘরছাড়া বেদুইনের মতন আজ তাহারা সারা পৃথিবী পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে, ধরণীর প্রশান্ত কোল সকলকেই আশ্রয় দিয়াছে, আশ্রয় পায় নাই কেবল ঐ বিশ্বাসঘাতকের স্বজন পরিজন। ভারতীয় সাধনার সিদ্ধমূর্ত্তি—ভারতীয় আদর্শে পরিপূর্ণ বিগ্রহ ছিলেন গান্ধীজী। অহিংসা, সত্য ও মৈত্রী ভারতের এই শাশ্বত বাণী তাঁহার শ্রীমুখ হইতে পুনঃ বিগলিত হইয়া চিরঞ্জীব হইয়াছে। বিশৃঙ্খল ও পতিত ভারতবর্ষকে উদ্ধার করিয়াছেন বলিয়া তিনি সমগ্র জাতির পিতৃপদে অভিষিক্ত হইয়াছেন। তাই মহাগুরুহত্যাপাপে নিমগ্ন জাতির ভবিষ্যৎ স্মরণ করিয়া দেহমন দৌর্ব্বল্যে বেপথুমান হইয়া উঠিতেছে, ক্ষমা ভিক্ষার সাহস ও যোগ্যতা যেন নিঃশেষিত হইয়াছে।

বিজলী চমকে স্মরণে আসে রাম, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, শঙ্কর ও চৈতন্য প্রভৃতি মহামানবগণের কথা। আকস্মিকভাবে অন্তর্হিত না হইলে এত বড় মহান সাধনা হয়তো সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়া উঠিত না। সত্য ও প্রেমে গান্ধীজীর বহু বিজয়লাভ হইয়াছে কিন্তু যিনি চিরকাল 'মরণরে তুঁহু মম শ্যাম সমান' বিচার করিয়াছিলেন, জীবনের এই দুয়ারটুকু পার হওয়ার সংশয় যাঁহার কোনকালে ছিল না তিনি হিংসাকে বরণ করিয়া মৃত্যুকেই পরাজিত করিয়াছেন। গান্ধীজীর জীবনী ও বাণী দৈহিক সীমার ক্ষুদ্রতা হইতে মুক্ত হওয়ায় আজ বিরাট ঐতিহ্যে পরিণত হইয়াছে।

মরণ সাগরের ওপার থেকে আলো ও আশার প্রদীপ হাতে নিয়ে যাঁরা ধরায় আসেন, রোগতাপক্লিষ্ট সংসারে নূতন আলোকের প্রতিষ্ঠা হইলেই আকস্মিক ভাবেই তাঁহারা চলিয়া যান। জীবন মৃত্যু সকল সময়েই তাঁহাদের ইচ্ছাধীন পায়ের ভৃত্য। মরণ কি ভয় দেখাও আমায়? প্রকৃতপক্ষে মৃত্যু মিত্রের মতন দুঃখ যন্ত্রণা হইতে মুক্তি প্রদান করে! জীবনের বিশেষ প্রকাশই মৃত্যু, কখনও ইহা জীবনের শেষ কথা নহে। ঠিক গীতার বাণী—আত্মা অজর অমর।

গান্ধীজীর প্রায়োপবেশন ও সাধনার মধ্যে এই একই সত্য প্রতিভাত হইয়াছে, নচিকেতার মতন তিনি বহুবার মৃত্যুর সম্মুখীন হইয়াছিলেন, মৃত্যুই সত্যাশ্রয়ীর ভ্রূকুটী সহ্য করিতে না পারিয়া সরিয়া গিয়াছে, প্রায়োপবেশনের সময় তাঁহার আত্মিক জয় ও মৃত্যুর পরাজয় দেখিয়া চিকিৎসক ও বৈজ্ঞরাজগণ বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছেন। তাঁহার স্বপ্ন ছিল ১২৫ বৎসর জীবিত থাকিয়া জাতির সেবা করিয়া যাইবেন, ভ্রাতৃ জিঘাংসা পরিপূর্ণ হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীতে তিনি থাকিতে চাহেন নাই। আঁধারে তাঁহার মন পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল, সংশয় সঙ্কোচে বিতৃষ্ণায়

তথাপি তিনি মানবের শাশ্বত প্রেমের উন্মুক্তি অপেক্ষায় মনো-সরোজে আঘাত দিতে কার্পণ্য করেন নাই। তিনি বলিতেন একজন যদি সৎ হিন্দু হয় তবে তিনি সৎ মুসলমান ও সৎ খ্রীষ্টান। ইসলামের যিনি সেবা করেন পরোক্ষে তিনি হিন্দুরও সেবা করেন। ঠিক এই হিসাবে তিনি বিশ্বাস করিতেন যে একজন সাধু হিন্দু হিসাবে তিনি ইসলামেরও সেবক। স্বদেশ ও স্বাধীনতা বিপর্য্যয়ের চরম মুহূর্ত্তে গান্ধীজীর প্রেম ও মৈত্রী সাধনা আমাদিগকে উদ্বুদ্ধ করুক। ক্লীবত্ব ও দীনতা দূরে ঠেলিয়া "ভাই ভাই" মিলিত হইবার উদ্দেশ্যে প্রাণমন পরিপূর্ণ হউক। পুরাকালে ব্যাধের শরাঘাতে ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমাধবের জীবনাবসান হয়, এখানেও ঘাতকের নিষ্ঠুর আঘাত সার্থকতায় পূর্ণ হইয়া উঠিবে সেইদিন, কলঙ্কের পসরা মৃত্যুর প্রায়শ্চিত্তে নিষ্কলঙ্ক শান্তিবারিতে পরিণত হইবে সেইদিন—যেদিন বাপুজীও তাহার রামরাজ্য পরিকল্পনা আমরা বরণ করিয়া লইব। তাহার বাণী পৃথিবীর সকল জাতির মন্ত্রবাণী হউক, "এটম" বোমা পৃথিবীর শেষদান হইতে পারে না, অতীত কালের মতন বিশ্বপ্লাবন বন্ধ করিতে হইবে বিশ্বরাষ্ট্র সংঘকে দলীয় ক্লিন্নতায় আচ্ছন্ন রাজনীতির কুহেলিকা হইতে উদ্ধার করিয়া পবিত্রতা ও শুভ্রতায় দীপ্তিময় করিয়া তুলিতে হইবে। ইহা সম্ভব একমাত্র প্রেমের পথে এটম বোমায় 'নাগাসিকি' উৎসন্ন করিয়া নহে।

সম্মুখ যুদ্ধে পতাকা সমুন্নত রাখিয়া তুমি আজ অক্ষয় স্বর্গের অধিকারী। তোমার সীমাহীন প্রেম নাগরিকার দিব্যজ্যোতি লাভে আজ ভাস্বর ও জ্যোতিষ্ময়। নশ্বরদেহ পঞ্চভূতে বিলীন হওয়ায় তোমার মৈত্রী সাধন দিক্‌প্রান্ত পরিব্যাপ্ত করিয়াছে, আমাদের উচ্চকণ্ঠের এই জয়ধ্বনি নিষ্প্রাণতার পরপারে জ্যোতির্ম্ময় দেশে, তোমার পবিত্র পদরেণু স্পর্শে কৃতার্থ হউক। লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে পাঞ্চজন্য নির্ঘোষে ধ্বনিত হউক জয় জয়তু মহাত্মাজী, জয় হউক বৈচিত্র্যময় ভারতবর্ষের।

আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে
এ জীবন পুণ্য কর দহনদানে,
আমার এই দেহখানি তুলে ধর,
তোমার ঐ দেবালয়ের প্রদীপ কর।

মাটির মায়া

শ্রীহরিরঞ্জন দাশগুপ্ত এম-এ

সুদীর্ঘ সাতটি বছর অন্তরীণ থাকার পর অমিয় মুক্তি পেলো এক অপ্রত্যাশিত শুভ মুহূর্তে। অনেকবার, সে জেলে কাটিয়েছে, আবার পেয়েছে ছাড়া। কিন্তু এবারকার মুক্তির মধ্যে সে এতটুকুও তৃপ্তির স্বাদ পেলো না, মনে জাগলো না লেশমাত্র আনন্দ-উৎকণ্ঠা।

কারাপ্রাচীরের ভিতরে বসে সে ভাবতো—বাইরের লোকগুলো নির্মম নিষ্পেষণে নিষ্ক্রিয় হতোদ্যম হ'য়ে পড়েছে এই ক'বছরে। দেশের প্রাণগতি হ'য়ে গেছে মন্থর। পথের অগণিত জনতা আজ আর নেই, বাঙ্গালী জাতি এবার হারিয়েছে জীবনের শেষ স্পন্দনটুকুও। বাঙ্গালা দেশ বিগত দুর্ভিক্ষের ফলে শ্মশানে পরিণত হয়েছে।…

বাইরে এসে সে দেখতে পেলো—অকালমৃত্যুর ছায়া কোথাও নেই—মানুষের জীবনযাত্রার কোন ব্যতিক্রম ঘটেনি। পথ বেয়ে সারি বেঁধে এখনও লোকজন চলাফেরা করে ঠিক আগেকারই মতো। অমিয় নিজের দৃষ্টিশক্তিকে নইলে এতগুলো লোকের অকালমৃত্যুর পরও রাস্তায় এত জনসমাগম কেমন করে সম্ভব হয়?

অমিয় লক্ষ্য করলো—পথচারীদের মধ্যে স্ফূর্তির কোন লক্ষণই নেই। এর কারণ সে ভাবলো—বিশ্বব্যাপী মহা-সংগ্রামের ফলে লোকের মনের স্বাভাবিক আতঙ্ক। দুর্ভিক্ষের ছাপ আরো স্পষ্ট, অধিকতর দৃষ্টি আকর্ষণকারী।

পরক্ষণে তার মনে হ'লো—এটা শহর। শহরের জীবনযাত্রায় সহজে কোন পরিবর্তন আসেনা। তাকে যেতে হবে পল্লীতে। তাহ'লে সে দেখতে পাবে, ধারণা করে নিতে পারবে দেশের প্রকৃত অবস্থা। নিখুঁত একটা ছবি সে এঁকে নিতে পারবে মনের পটে। তবেই সে বুঝবে—সংবাদপত্রের প্রচার কতদূর সত্য। তা'ছাড়া সংবাদপত্রগুলোকে আইন মেনে চলতে হয়।

তার কজন অন্তরঙ্গ বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে দেখা করে সে সোজা নিজের পল্লীর দিকে রওনা হলো। পল্লীর

পথে-ঘাটে গোরু ছাগল কচিৎ চোখে পড়ছে, বাড়ি-ঘর শূন্য, পরিত্যক্ত। গ্রামের নীরব শান্তি আজ যেন অন্তর্হিত হয়েছে।

গাড়ি থেকে নেমে বাড়ি যাবার পথে পরিচিত কারো সঙ্গে অমিয়র দেখা হলো না, কেউ এলো না তাকে প্রশ্ন করতে, অন্যান্য বারে যেমন আসতো। চারদিকে একটা বিরাট শূন্যতা যেন জাল পেতে বসে আছে।···

তার পাশের বাড়িটি খালি পড়ে আছে। জুগীপাড়ায় কটি অনাথা বিধবা আর অপোগণ্ড শিশু ছাড়া আর কেউ বেঁচে নেই, আচার্যিদের বাড়িগুলো প্রায় ধূলিসাৎ হয়ে পড়েছে, হাড়িপাড়ায় আগেকার মতো ছেলেপিলের কোলাহল নেই, ধোপাদের পাট বন্ধ। গ্রামের পশুপাখীগুলোও যেন কোথায় পালিয়ে গেছে। যে-মাঠে একদিন শস্যের প্রাচুর্য দেখা যেতো, সেই মাঠ আজ খালি পড়ে আছে, পুকুরগুলো ভরে আছে পানায়, রাস্তাঘাটের শ্রী আর নেই। শ্মশানে, পুকুর-পাড়ে, মাঠে, জঙ্গলে মরা-মানুষের হাড়।···

গ্রামবাসীদের কাছ থেকে খবর নিয়ে অমিয় দুর্ভিক্ষের যে কাহিনী সংগ্রহ করলো তা' মর্মান্তিক। খবরের কাগজ পড়ে সে যা ধারণা করেছিল, তার চেয়েও বীভৎস ঘটনা দেশের বুকের উপর ঘটেছে।··

দেশকে আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাবার জন্য বন্দীরা সবাই মিলে তাদের কারামুক্তির আবেদন ঠিক সময়েই করেছিল, কিন্তু তাদের দাবী মঞ্জুর করা হয়নি। সেই সঙ্কটের দিনে তার মতো একজন কর্মীও যদি দেশে উপস্থিত থাকতো, তাহ'লে হয়তো এতগুলো লোক অনাহারে অকালমৃত্যু-কবলিত হতো না—একথা ভেবে তার অন্তরখানি ব্যথায় দুলে উঠলো।

অমিয় শুনলে—দুর্ভিক্ষের সময় দেশের ভয়ঙ্কর সেই দিনে দেশে কর্মীর অভাব ছিল না। নানান যায়গা থেকে তখন এসেছিল সাহায্য। দেশসেবকেরা সেই সাহায্য করেছিলেন,তাঁদের আপ্রাণ চেষ্টার ফলে দেশ একটুকু টিকে আছে। কৃষকসমিতি, শ্রমিক-সঙ্ঘ গঠিত না হলে দেশের কৃষক-মজুর সম্প্রদায় তাদের অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলতো। আজ তারা সবাই এক জোট হয়ে দেশের দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করে, সভাসমিতি করে, বক্তৃতা দেয়। এই গণ-সেই বিগত দিনের দুঃখের কাহিনী তারা ভুলে গেছে। উজ্জ্বল, মধুময়, স্বপ্নময় একটা ভবিষ্যতের পানে আজ তারা সবাই বিভোর হয়ে চেয়ে আছে।

এই কথা শুনে অমিয়র অন্তরখানি আনন্দে আশায় ভরে উঠলো। ভাবলে—দেশ বুঝি এবার সত্যসত্যই স্বাধীনতার দিকে এগিয়ে চলেছে।······সেদিন কংগ্রেসের হীরক-জুবিলি সভায় যারা গেল, তাদের দেখে অমিয়র বিস্ময়ের সীমা রইলো না। দেশের ভদ্রসম্প্রদায় ছাড়া আর কেউ সভায় যোগদান করে নি। শ্রমিক, কৃষক একটিও আসে নি, কারণ অনুসন্ধান করে জানলে—কংগ্রেসের নীতি সর্বজনগ্রাহ্য নয়। দেশের জনসাধারণ চায়—সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা। কংগ্রেসের মধ্যে সাম্য নেই, সেখানে এখনো বিশ্বমৈত্রীর বাণী প্রচারিত হয় না। যে প্রতিষ্ঠান দশের দাবী মেটাতে পারে না তার সঙ্গে দেশবাসী সম্পর্ক রাখতে নারাজ। আজ দেশের মনোভাব বদলে গেছে।

সে অনুসন্ধান করতে লাগলো দেশের এই পরিবর্তিত মনোভাবের কারণ। সঙ্গে সঙ্গে তার কাজেও সে ক্ষান্ত হলো না। তবে, দেশের এই অনুন্নত অশিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে গণ-সংগীত প্রচার করার মতো কণ্ঠ তার নেই, পাড়ায় পাড়ায় চাষী-নৃত্যের আয়োজন করবার সময় সে পায় না। তার কথা শুনবে কে? এ যুগ যে চায় কাজের বাহ্যিক ব্যস্ততা, কাজ নয়। কিন্তু অমিয় তার আদর্শ থেকে কোনদিন বিচ্যুত হবে না। সে একরকম চুপ করে বসে রইলো সেই দিনের আশায়—যেদিন সবাই কংগ্রেসের জাতীয় পতাকাতলে দলে দলে সমবেত হবে, বাধ্য হয়ে। সর্বজাতির, সকল প্রতিষ্ঠানের মিলনে দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে।······অমিয় মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে হলেও তাদের বিস্তর জায়গা জমি আছে। তার অনুপস্থিতিতে তারই প্রতিনিধি হিসাবে তাদের বৃদ্ধ নায়েব কমলাকান্ত জায়গা জমির তদারক করতেন। প্রজারা জমি দখল করে, কিন্তু খাজনা দেয় না—এ খবর তিনি তাকে দিয়েছিলেন, কিন্তু অন্তরীণ অবস্থায় থাকা-কালে সে তাঁকে কোন উপদেশ দিতে পারে নি এবং সমস্যার সমাধান করতে পারে নি।···অমিয় ঘরে বসে একখানি সংবাদপত্র পাঠ করছিল। হঠাৎ একটা বিরাট জনতার কোলাহল

যাত্রা রাস্তা বেয়ে চলেছে। শোভাযাত্রাকারীরা সমস্বরে চিৎকার করছে—"জমিদারের খাজনা—দিয়ো না।" "জমিদার সম্প্রদায়—ধ্বংস হোক্।" "গণ-রাষ্ট্র সংগঠিত হোক্।" "কৃষকসঙ্ঘ—বেঁচে থাক্।"

জনতার আগে আগে চলেছে—চশমা-আঁটা, নানান্ রকমের ধুতি-পাঞ্জাবী-পরা ক'টি ভদ্রলোকের ছেলে, যাদের সবাইকে না হলেও ক'জনকে সে চেনে। কিন্তু কোন রকমের প্রশ্ন সে তাদের করলে না, প্রতিবাদ জানালে না তাদের এ কাজের। সম্মিলিত জনসঙ্ঘের বিরুদ্ধে সে যে শক্তিহীন।······

পল্লীর আবহাওয়া বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। চারিদিকে নৈতিক অধঃপতন সে লক্ষ্য করেছে এই ক'দিনের মধ্যেই। তা'ছাড়া অনুন্নত সম্প্রদায় আজ মধ্যবিত্তদের বিরুদ্ধে, জমিদারের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধভাবে আন্দোলন শুরু করেছে। তারা আজ মান্‌তে চায় না কারো প্রভুত্ব। এই পথভ্রষ্ট অগণিত লোককে ন্যায়পথে, সত্যপথে পরিচালিত করতে হ'লে তাকে বেগ পেতে হবে ভয়ানক। তাছাড়া যে অমিয় একদিন গ্রামের সকলের শ্রদ্ধাভাজন ছিল, আজ সে একরকম পরিচয়হীন অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে বাধ্য হয়ে। আন্দোলনকারীদের সঙ্গে তার মতের মিল নেই। অমিয় ভাবলে—গাঁয়ে আর বেশিদিন থাক্‌লে তার দম্ আটকে যাবে।······

কমলাকান্ত এসে অমিয়কে খবর দিল—তার সমস্ত সম্পত্তি খাজনার দায়ে নিলামে চড়েছে। বহু চেষ্টা করেও তিনি একটি পয়সাও খাজনা আদায় করতে পারেননি। দেড় হাজার টাকা অবিলম্বে না দিলে সম্পত্তি রক্ষা করা যাবে না। অমিয় প্রমাদ গুণলে এ খবর পেয়ে। এ যে সম্পূর্ণ অচিন্তনীয় সংবাদ, কিন্তু এর সত্যতা অবিসংবাদী। সে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লো। শশধর এসে অমিয়কে বললে—সে যদি তার মালিকী জমিগুলো প্রজাদের নামে দানপত্র করে দেয় তবে সে একবার তার বাড়ি ভিটে রক্ষা করবার চেষ্টা করতে পারে। উপায়ান্তর না দেখে সে তাই করতে রাজি হলো। শুধু তাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে দানপত্র হয়ে গেল। হাতে একটি টাকাও এলোনা, অথচ সম্পত্তি সব গেল। তবু, অন্ততঃ থাকবার যায়গাটি তো থাকবে কৃষিজীবী না হ'লেও সে কৃষক। অবস্থা বৈগুণ্যে শশধর আজ কৃষক সেজেছে। কৃষকের দাবীই আজ তার দাবী।

······নির্লিপ্তভাবে সে বসে আছে। কিন্তু শশধর তার প্রতিশ্রুত টাকা জমা দিয়ে অমিয়র ভিটে মুক্ত করেনি; তাই তার বাড়ি-ঘর নিলামে বিক্রয় হয়ে গেছে। এই সংবাদে বিচলিত হ'য়ে সে শশধরকে ডেকে পাঠালে। শশধর নির্লজ্জের হাসি হেসে বল্‌লে, আপনার তো শহরে বাড়ি রয়েছে। সেখানে তো আপনি অনায়াসে নির্ঝঞ্ঝাটে থাকতে পারেন। এখানে আমরা গরীবরা থাকবো আর কি।

তার কথায় অমিয়র ধৈর্যচ্যুতি ঘটলো। বললে; আমার বাড়িতে আপনি থাক্‌বেন কোন্ দুঃখে। আপনি প্রতিশ্রুত টাকা দেননি বলেই তো আজ আমাকে বাড়ি ছাড়তে হবে; তবে, এটুকু জানবেন—আবার আমি ফিরে পাবো আমার সম্পত্তি। তখন দেখবেন কি আমি করি।

: তখন যুদ্ধ কর্‌বেন বুঝি ?

: তা' নয়, তবু—

: ওঃ—সেটাও সম্ভব হবে না এ যুগে। এটা হচ্ছে—গণ-জাগরণের যুগ। আপনারা—যারা যুগযুগান্ত ধরে কৃষকদের, দরিদ্রদের শোষণ করছেন, আজ তারা, সেই উপদ্রুত সম্প্রদায় মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। এ যুগের দাবী হচ্ছে—lands for the peasants, চাষীরাই হবে জমির মালিক। পুরুষানুক্রমে মজুরদের চাষীদের উপর জমিদার শ্রেণী যে জুলুম চালিয়েছে—আমরা চাই তার অবসান।

অমিয় বল্‌লে: যুগের দাবী স্বীকার করি। কিন্তু আপনাদের মতো স্বার্থপর যারা তাদের আমি অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করি। আপনি নিজে তো শুধু স্বার্থপর নন্, প্রতারকও। যা'হোক, আমি আজ চল্‌লাম। যাবার সময় আপনাকে আবার বলে দিয়ে যাচ্ছি—আমি আস্‌বো ফিরে আসবো আমার ঘরে, আপনারা তখন, সেইদিন পথে পথে ঘুরে বেড়াতে বাধ্য হবেন।

অমিয় বেরিয়ে এলো—খালি হাতে, খালি পায়ে। গ্রামে সে আর থাকবে না। এখানে থেকে তার আর লাভ কি ? তার পিতৃপিতামহের ভিটে সে হারিয়েছে, কান্নায় তার অন্তরখানি ভরে আছে।

উৎসাহ নেই। এমন সময় একদিন তার কাছে এলো কংগ্রেসের আহ্বান। মিলিটারীর লোক তাদেরই গ্রামখানি জ্বালিয়ে দিয়েছে। সেখানে তাকে যেতে হবে—দেশের নেতাদের সঙ্গে। তার গ্রামে লোকের দুর্দশার আজ অন্ত নেই।. অথচ নির্লিপ্ত হ'য়ে সে শহরে বসে আছে। দেশ-সেবক হয়ে এর চেয়ে অনুচিত কাজ আর কি থাকতে পারে?

সেদিন সে যাত্রা করলো তার গ্রামের উদ্দেশ্যে। ব্যবস্থা হয়ে গেল সব, বিদেশ থেকে যারা আসবেন তাঁদের ঘটনাস্থলে নিয়ে যাবার।

গ্রামে এসে অমিয় দিশেহারা হয়ে পড়লো। চারদিকে বিপদের ছায়া। বাড়িঘর নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে—গাছ-পালাগুলো যেন নীরবে কাঁদছে। বাতাস গায়ের মাথার উপর দিয়ে বয়ে চলে যাচ্ছে। এখানে থাক্‌বার যায়গা নেই তার—কোথাও নেই আশ্রয়।···

আন্দোলন চললো তুমুলভাবে। সারা বাঙ্গালা এই ঘটনায় সরগরম হয়ে উঠলো। রিলিফ কমিটি গঠিত হলো। দুঃস্থদের মধ্যে টাকা বিলিয়ে দেবার ভার পড়লো অমিয়র উপর। চারদিক থেকে টাকা এলো অজস্র। যারা গৃহহীন হয়েছিল তারা আবার তাদের গৃহ পত্তন করলে।

অমিয় অপরিসীম একাগ্রতার সঙ্গে কাজে লেগে গেছে। গ্রামে তার নিজের বাড়িখানির চিহ্নমাত্রও নেই। সে শুন্‌লে গ্রামবাসীদের কাছে—শশধর সেই বাড়িতেই আশ্রয় নিয়েছিল স্ত্রীপুত্রাদি নিয়ে, কিন্তু ক'দিন সেখানে বাস করবার পর কি একটা অজ্ঞাত কারণে সে সেখান থেকে চলে যেতে বাধ্য হয়। ঘটনার দু'দিন আগে সে আবার সেখানে ফিরে এসেছিল। এই অশুভ অতর্কিত অগ্নিকাণ্ডের ফলে তার দু'টি অপোগণ্ড শিশুর জীবনান্ত ঘটেছে। সে নিজে অর্ধদগ্ধ হয়ে হাসপাতালে পড়ে আছে। অমিয়র মনে দুঃখ জাগলো একথা শুনে। সুখে থাকবার প্রবল আগ্রহে যে শশধর তাকে গৃহভ্রষ্ট করেছে—তার এমনি পরিণাম হয়তো স্বাভাবিক, তবু, আবার অন্তরখানি সমবেদনায় পূর্ণ হলো। সে হাসপাতালে শশধরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে। শশধরের ফুসফুস্ ফেটে গেছে। তার আর বাঁচবার আশা নেই। অমিয়কে দেখে তার দু' চোখ বেয়ে অবিরাম অশ্রু নেমে এলো। ক্ষীণকণ্ঠে অমিয়কে বললে: আমায় ক্ষমা করুন। আমি জীবনে যে ভুল

সে তার মাথার বালিশের নিচে থেকে দানপত্রখানি বের করে অমিয়র হাতে দিল। অমিয় বললে: শশধরবাবু, আপনি—আপনি এমন পাগলামো করছেন কেন। আপনি সুস্থ হয়ে উঠুন। আমি আমার দান ফিরিয়ে নিতে চাই না।

এতো দান নয়, এটা হচ্ছে প্রবঞ্চনা। আমি আপনাকে প্রতারিত করেছি। প্রজাদের নাম দিয়ে আমি আমার স্বার্থসিদ্ধি করতে চেয়েছিলাম। আমি আজ অনুতপ্ত, আমায় ক্ষমা করুন।

অমিয় একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে হাসপাতাল পরিত্যাগ করলে।

পরদিন সে দেখলে—তার বাড়ির আশেপাশে নোতুন নোতুন বাড়ি উঠছে—সারি বেঁধে। সুধু তার নিজের ভিটেটি খালি প'ড়ে আছে। আবার গ্রামখানির রূপ ফিরে এলো। দেশের সকলের সহানুভূতির ফলে বিনষ্ট পল্লীর শোভা আগের চেয়েও বাড়লো। এই গ্রামটিকে পুনর্গঠিত করতে যারা প্রাণপণ চেষ্টা করেছে—অমিয় তাদের অন্যতম রূপে গ্রামের কাছে পরিচিত হলো। চাষা মজুর ভদ্রলোক সবাই দলে দলে যোগ দিল—অমিয়র সম্বর্ধনায়।

অমিয় তার ভিটেটি দেখতে গেল। সেখানে থাকবার ঘর নেই, বিশ্রাম করবার উপায় নেই। যখন সে অপরের ঘরবাড়ি তোলবার জন্য নিজের হাতে অর্থ সাহায্য করেছে, তখন তার নিজের কথা একটিবারও চিন্তা করেনি। ইচ্ছে করলেই সে তার নিজের ভিটেয় ঘর করে নিতে পারতো বিনা পয়সায়। কিন্তু পরের অর্থ, যা তার কাছে গচ্ছিত রয়েছে, সে তো তা' নিজের জন্য খরচ করতে পারে না। বিশ্বাসঘাতক সে হবে কেমন করে?

শূন্য ভিটাটির দিকে চেয়ে তার মনে হল—তার প্রতিটি ধূলিকণা যেন তাকে ডাকছে—বারে বারে ডাকছে। তার চোখ দুটি জলে ভরে এল। এ মাটির মায়া সে যে কাটাতে পারবে না কিছুতেই। এখানে সে আবার ছোট্ট একটি নীড় বেঁধে থাকবে স্থির করলে।

খবর এল—শশধর আর ইহজগতে নেই। এ সম্বাদ শুনে অমিয় অন্যমনস্ক হয়ে কি যেন ভাবলে। তারপর সে তার শূন্য বাস্তুভিটার উদ্দেশ্যে জানালে একটি নমস্কার।

জাহানারার আত্মকাহিনী

অধ্যাপক শ্রীমাখনলাল রায় চৌধুরী শাস্ত্রী

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

আমি আমার রাখিবন্ধ ভাইকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করলাম—আল্লাহো আকবর। "জাল্লা জালালুল্লাহ" (১) তিনিও প্রত্যুত্তর দিলেন।

সেই প্রাসাদে তখনও মর্ম্মর আসনগুলি পূর্ব্বের স্থানে নির্দ্দিষ্ট ছিল. "রাও" কতগুলি পত্র আসনে রেখে দিলেন। আমরা আমাদের নূতন দেওয়ান-ই-খাসে উপবেশন করলাম। প্রথমেই পত্রগুলির যথার্থ সংবাদ জানতে আমার বাসনা জ্ঞাপন করলাম। আমি যেমন ধারণা করেছিলাম —সত্যিই তিনি আমার কোন পত্র পান নি। আমায় কোন পত্রও লেখেন নি। আমরা যেন ঘটনার শৃঙ্খল পর্য্যবেক্ষণ করলাম। এই ব্যাপারে উভয়েই লজ্জায় সঙ্কুচিত হয়ে পড়লাম।

তারপর রাখাবন্ধ ভাই আমার নিকট ঔরঙ্গজেবের শিবির থেকে তার পলায়ন কাহিনী বিবৃত করে গেলেন: রাজদরবারে উপস্থিত হবার আদেশ পত্র তখন "রাও"এর কাছে উপস্থিত হল। ঔরঙ্গজেব তাঁর দক্ষিণাত্য ত্যাগ বন্ধ করবার জন্য বহু চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু হরবংশের কুমার তার বিশ্বস্ত রাজপুত অনুচর নিয়ে উদ্বেলিত নর্ম্মদা অতিক্রম করে এসেছেন। ঔরঙ্গজেবের সৈন্যগণ তাঁকে অনুসরণ করেছিল, কিন্তু আক্রমণ কর্ত্তে সাহস করে নি।

তারপর সংবাদ এলো ঔরঙ্গজেব আমার ভ্রাতা মুরাদকে তাঁর পক্ষে টেনে এনেছেন ষড়যন্ত্র করে। "রাও" বিদ্রোহের প্রারম্ভে ঔরঙ্গজেব কর্তৃক মুরাদকে লিখিত পত্রের প্রতিলিপি পাঠ করবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করলেন। কনিষ্ঠ সহোদর মুরাদ তাঁর সৈন্যাধ্যক্ষদিগকে উৎসাহিত করবার জন্য গর্ব্বের সহিত এই পত্রখানি প্রত্যেক সেনানায়কদের দেখিয়েছিলেন এবং অর্থ সংগ্রহের জন্য ধনবান বণিকদিগকেও দেখিয়েছিলেন। এই পত্রের প্রতিলিপি আজও আমার নিকটে রয়েছে :—

"বীর শাহজাদা মুরাদ বক্স, তোমাকে জানাচ্ছি—আমি সংবাদ পেয়েছি যে, শাহজাদা দারা বিষ প্রয়োগে পিতাকে হত্যা করেছেন এবং সাম্রাজ্যভার গ্রহণ করেছেন—উদ্দেশ্য, সম্রাট পদবী গ্রহণ করবেন। এই কারণে শাহজাদা শাহসুজা একটী প্রবল বলশালী সৈন্যদল নিয়ে সিংহাসন অধিকার করবার জন্য এবং দাদার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেবার জন্য অগ্রসর হয়েছিলেন। এই সংবাদ শুনে তোমায় পত্র লিখে জানাতে বাধ্য হচ্ছি যে, তুমি ভিন্ন অন্য কোন রাজকুমার সম্রাট হওয়ার উপযুক্ত নয়। দারা বিধর্ম্মী, দারা পৌত্তলিক, দারা ইসলাম ধর্ম্ম বিনাশক; শাহজাদা শাহসুজা ধর্ম্মচ্যুত, শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত এবং সে আমাদের ধর্ম্ম-বিরোধী। আমার কোরাণের প্রতি আসক্তি তোমাকে সমস্ত ভারতবর্ষের সম্রাটপদে অভিষিক্ত করবার জন্য উৎসাহিত করছে। কারণ, ইহা সর্ব্বজনবিদিত যে আমি বহুদিন পূর্ব্বেই সংসার ত্যাগ করেছি এবং মক্কায় গিয়ে আমার শেষ জীবন অতিবাহিত করব এই ব্রত গ্রহণ করেছি। আমি তোমার নিকট আবেদন জানাচ্ছি—তুমি কোরাণ স্পর্শ ক'রে শপথ করো যে, আল্লাহর অনুগ্রহে আমি তোমাকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী সম্রাটপদে অভিষিক্ত করবার পরে তুমি আমার পরিবারের প্রতি সদয় ব্যবহার ক'রবে। যদি তুমি আমাকে কোরাণ স্পর্শ ক'রে এইরূপ কাজের প্রতিশ্রুতি দাও, তবে আমিও শপথ করছি যে, আমার সমস্ত শক্তি, কৌশল ও বুদ্ধি তোমার অনুকূলে ব্যবহৃত হবে এবং তোমাকে দিল্লীর সিংহাসনে বসাবার জন্য সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা করা হবে। আমার এই শপথের প্রতিভূস্বরূপ আমি তোমার নিকট এক লক্ষ রৌপ্য মুদ্রা প্রেরণ করছি। এই অর্থ দ্বারা আমাদের মধ্যে সুদৃঢ় এবং চিরন্তন ঐক্য ও বান্ধবতা স্থাপিত হবে—আমরা সহোদর ভ্রাতা, এক পিতার সন্তান, এক ধর্ম্মে বিশ্বাসী এবং উভয়েই কোরাণের রক্ষক। এই খানেই পত্র শেষ হোক। তোমার আগমন প্রত্যাশা করি। ইতি—

তোমার বিশ্বাসী ভ্রাতা

"ঔরঙ্গজেব"

আমি লজ্জায় আমার মস্তক অবনত করলাম এবং হৃদয়বিদারক শোকে আর্ত্তনাদ ক'রে উঠলাম।—ওঃ, কি শঠতা! আমাদের পরিবারের কি ভীষণ অবমাননা। এই শাসকের নিকট প্রাচীন ভারতের বীর বংশ তাদের রাজ্যভার অর্পণ ক'রতে বাধ্য হবে! ঔরঙ্গজেবের হৃদয়ে একটী ব্যাঘ্র লুকিয়ে আছে—যেমন ছিল তৈমুরের হৃদয়ে। কিন্তু তৈমুরের নামের মহিমা কখনও ঔরঙ্গজেবের মুকুটকে শোভিত করবে না।

"রাও" আমার কথার তাৎপর্য্য বুঝতে পারলেন। সমস্ত প্রাসাদ নির্জ্জনতা। তিনি আবার যখন কথা ব'লতে আরম্ভ করলেন, তাঁর সুর পূর্ব্বাপেক্ষা গম্ভীর হয়ে উঠলো। তিনি আসন পরিত্যাগ করে উঠলেন এবং ইতস্ততঃ পদ সঞ্চালন করছিলেন। আমাদের শাসকগণ আমাদের দেশকে সাম্রাজ্যে পরিণত করেছিলেন। যখন রাজ পরিবারের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হ'ত রাজস্থানের নায়কগণ তাঁকেই সাহায্য করতেন—যিনি সাম্রাজ্যের ঐক্য ব্যবস্থা করতে পারেন। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্য বা

(১) মুসলমানগণ সাধারণতঃ প্রথম দর্শনে সম্ভাষণ করে "আলেকুম্-উস্-সেলাম", প্রত্যুত্তর দেয় "সেলাম আলেকুম্"। আকবরের সময় এই প্রথা পরিবর্ত্তন করে দিলেন, সম্ভাষণের রীতি নূতন করলেন "আল্লাহো

শাসক-সম্রাট আকবরের সমতুল হয়নি। সুলতান বাবর ও হুমায়ুনের মত সম্রাট আকবর সমরকন্দ কিংবা বোখারা দেশে প্রত্যাবর্তন প্রয়াসী ছিলেন না। তিনি অভিলাষ করেছিলেন ভারত ভূমিতে একটী সাম্রাজ্য স্থাপন করবেন—যার ভেতরে সর্ব্ব দেশের সর্ব্বোত্তম পদার্থের সমাবেশ থাকবে। তিনি ভারতবাসীকে বিশ্বাস করতেন, ভারতবাসীর উপর নির্ভর করতেন এবং তিনি ভারতবর্ষেরই একজন হয়েছিলেন। সেই স্বর্গবাসী সম্রাট আকবরের সমতুল হয়ত কেহ হয় নাই। কিন্তু ঔরঙ্গজেব রাজ্যভার পেলে যা হবে—তার মতও কেহ হয় নাই। ঔরঙ্গজেব ভারতবাসীকে ঘৃণা করে……।

আমি সাহস করে "রাওয়ে"র দিকে দৃষ্টিপাত করলাম। তাঁর সহজ, সরল, শান্ত নয়ন অকস্মাৎ পিঞ্জর-মুক্ত ঈগল চক্ষুর মত তীব্রোজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌লো। তাঁর সঞ্চরমান চক্ষুর মণি বিদ্যুৎশিখার মত দ্রুতগতিতে ভ্রমণ করছিল। তিনি আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছেন,—এক অপূর্ব্ব রাজোচিত মূর্ত্তি—মেরু শিখরে অগ্নিগর্ভ বিক্ষুব্ধ প্রতীক।

তিনি মৃদুকণ্ঠে বল্লেন—"ঔরঙ্গজেব হিন্দুকে ঘৃণা করেন—তাঁর উদ্দেশ্য সাধনের উপযুক্ত শক্তি আমাদের আছে, একথা ঔরঙ্গজেব জানেন। তিনি আমাদের নির্ভীকতাকে সন্দেহ করেন না, কিন্তু আমাদের পূর্ব্বপুরুষের ধর্ম্ম বিশ্বাসকে ঘৃণা করেন। ঔরঙ্গজেব স্বর্গকে নিজস্ব সম্পত্তি বলে বিবেচনা করেন। কোরাণের দুই মলাটের অভ্যন্তরে যারা এই পৃথিবীকে আবদ্ধ রাখতে চায়, তাদের সঙ্গে ঔরঙ্গজেব স্বর্গের একচ্ছত্র অধিকার দাবী করেন। সম্রাট জাহাঙ্গীর এবং শাহজাহান কোরাণকে শ্রদ্ধা করতেন, কিন্তু তাঁদের শাসনতলে হিন্দু প্রজাগণ নিজেদের নিরাপদ মনে করতেন। শাহজাদা ঔরঙ্গজেব আপনাকে ঈশ্বরের মত নির্ভুল মনে করেন। সুতরাং বংশধরদের দ্বারা তাঁর রাজ্যের সতরঞ্চ-খেলা-খুলে বসেছেন। রাজ্যের সিংহাসন খেলায় জয়লাভ ক'রবার জন্য কোন কাজই তিনি অন্যায় মনে করেন না। যদি তিনি জয়লাভ করেন তবে সম্রাট আকবরের মহানুভব রাজ্যে যা কিছু ভাল ছিল, সবই নষ্ট হয়ে যাবে। হিন্দুস্থান আবার সেই অন্ধকারে ডুবে যাবে। সম্ভবতঃ শত শত বৎসর ব্যাপী……।"

আমি চীৎকার করে বলে উঠলাম, "সে কখনও জয়ী হতে পারে না।" সেলিম চিশতির সমাধি মন্দিরে শোকের যে তীব্রতা হ্রাস হয়েছিল, তা' আবার "রাও"এর উপস্থিতিতে নূতন করে আমাকে আহত করল। আমরা ক্ষয়মান ভিত্তির উপর, ইতস্ততঃ বাত্যাবিক্ষুব্ধ প্রাসাদের উপরে দাঁড়িয়ে আছি। মনে হ'ল—পদ নিম্নে এক তলহীন সমুদ্রগহ্বর মুখ-ব্যাদন করে অপেক্ষা করছে।

তারপর আমি "রাও"কে অতীতের ঘটনা বর্ণনা করে বল্লাম, শাহজাদা দারা তাঁর যৌবনে আমাদের পিতা ঔরঙ্গজেব, সুজা এবং মুরাদকে আমন্ত্রণ করেছিলেন। সে কক্ষের সঙ্গে পার্শ্ববর্ত্তী একটী নদী সংযোজিত ছিল, এলেপ্পো দেশে নির্ম্মিত বহু মুকুর ছিল সেখানে। শাহজাদা দারা এই [illegible]

প্রবেশ করেন নি। অবশেষে তিনি উঠে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। সম্রাট তাঁর ব্যবহারে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়েছেন জেনে ঔরঙ্গজেব উত্তর দিয়েছিলেন যে, তাঁর সন্দেহ হয়েছিল—শাহজাদা দারা হয়ত সম্রাটকে ও সম্রাট পুত্র-ত্রয়কে আবদ্ধ করবার জন্যই এই ব্যবস্থা করেছিলেন। আমি চিৎকার ক'রে বল্লাম—ঔরঙ্গজেবই আমাদের সকলকে আবদ্ধ ক'রে রাখবে। একমাত্র রোশেন্‌ আরাই মুক্ত থাকবে।

"রাও" পুনরায় আসন গ্রহণ করলেন এবং বল্লেন, "সম্রাটের একজন গুপ্তচর সন্ধান পেয়েছিল যে রোশেন্‌-আরা সর্ব্বদাই ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে পত্রালাপ ক'রতেন। এই সমস্ত পত্রের উপর নির্ভর করেই ঔরঙ্গজেব এত শীঘ্র এই ষড়যন্ত্রের ব্যবস্থা ক'রতে পেরেছিলেন। অন্তঃপুরের আবরণ অন্তঃপুরিকাকে পুরুষের দৃষ্টি থেকে দূরে সরিয়ে রাখে; কিন্তু অবগুণ্ঠনের অন্তরালে নারীর অস্ত্র পুরুষের অস্ত্র অপেক্ষা ভীষণতর।"

চতুর্দ্দিকের শঠতায় বিক্ষুব্ধ হয়ে আমি ব'লে উঠলাম, "আমি যদি সমর্থ হ'তাম তবে চাঁদবিবির মত যুদ্ধে যোগ দিতাম! তাঁরা সম্রাট আকবরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেছিলেন। আমারই বংশের নূরজাহান বেগম তাঁর কারাবদ্ধ স্বামী জাহাঙ্গীরকে মুক্ত করবার জন্য হস্তী পৃষ্ঠে নদী অতিক্রম করেছিলেন……। (১)

তারপর "রাও" গাত্রোত্থান করলেন। দৃঢ় মুষ্টি দ্বারা তিনি সম্মুখের আসনে আঘাত করলেন। আমি ভাবলাম, বুঝি মর্ম্মর প্রস্তর খণ্ড বিখণ্ড হয়ে যাবে। শাহজাদা ঔরঙ্গজেব ঘোষণা করেছিল—যদি তৈমুর বংশের সমস্ত সন্তানও তাঁর বিরুদ্ধে অভিযান করে, তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত হবেন না। আমিও ব'লছি যে, সম্রাটের ভারতীয় অনুচরগণ যদি দলবদ্ধভাবে ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে সিংহাসনের পথে অগ্রসর হয় তবে সম্রাট কখনও বশ্যতা স্বীকার করবেন না। হরিদ্রাভ ও রক্তবর্ণের আস্তরণ তাঁর পদ নিম্নে বিস্তৃত হয়ে যাবে……।

আমার মনে হচ্ছে যেন আমি আমার সম্মুখে দেখছি ইসলামের প্রথম অভিযানের পর থেকেই আমার বংশের পূর্ব্ব পুরুষগণ ইসলামের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা ক'রে এসেছেন। সেই বীর পুরুষগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন মাণিক রায়। মহম্মদের অব্যবহিত পরেই তিনি সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তাঁর বীরত্বের কাহিনী আজও বুঁদি রাজ্যে শ্রদ্ধার সঙ্গে গীত হয়। তারপর গোগা চৌহান মামুদ গজনীর বিরুদ্ধে অভিযান করেছিলেন—তাঁর চুয়াল্লিশটী পুত্রসহ।"

আমি বল্লাম, চৌহান চারণ কবি চাঁদ বরদাই এই ভাব অনুকরণ করে শত্রুর উন্মুক্ত তরবারির বিরুদ্ধে তীর্থ যাত্রীর মতনই অভিযান করেছিলেন। আমি মামুদ গজনীকে ঘৃণা করি।"

"রাও" বোধ হয় আমার কথার শক্তি অনুভব করতে পেরেছিলেন। তাঁর মুখমণ্ডল আমার কথায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। তিনি বলে চল্লেন,

(১) মহব্বৎখান জাহাঙ্গীরকে আবদ্ধ করেছিলেন।

"এই বীর সন্তানদের মৃত্যু নিষ্ফল হয়নি। আমরা ভারতবাসী যোদ্ধারা কি কখনও দেশান্তরে অভিযান ক'রে কোন মস্‌জিদ নষ্ট করেছি? কিন্তু পবিত্র আল্লাহর নামে রাজস্থানের পথে যুগ যুগ ধরে রক্তের নদী বয়ে গেছে। মন্দিরের পর মন্দির এই ভারত ভূমিতেই লুণ্ঠিত হয়েছে, ধ্বংস হয়েছে। নাগর-কোটের পবিত্র মন্দিরের অনির্ব্বাণ অগ্নিশিখা মামুদ নির্ব্বাপিত করেছিলেন। বিরাট সোমনাথ মন্দিরের ধনরত্নরাজি তিনি লুণ্ঠন করেছিলেন। বহু শতাব্দী সঞ্চিত হিন্দুরাজন্যবর্গের ধনসম্পত্তি অপহরণ করেছিলেন তিনি। ভারতের দেবতার মর্ম্মর মূর্ত্তি মন্দির থেকে নিক্ষিপ্ত হয়ে নদী-সমুদ্রগর্ভে আজও সমস্ত জাতির পাণ্ডুর শবদেহের মত ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়ে রয়েছে।"

"রাও" আবার শূন্য পানে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন,—যেন তিনি বহু দূরে কোন কিছুর সন্ধান করছিলেন। আমি অত্যন্ত দুঃখ অনুভব করলাম। কিছুক্ষণ পরে তাঁর রাজোচিত আভিজাত্য ফুটে উঠল,—তিনি বল্লেন, "আজমীরের চৌহান রাজ বংশের সন্তান সুলতান মামুদকে তাঁর রাজধানী অবরোধ পরিত্যাগ করে পলায়ন করতে বাধ্য করেছিলেন। সেই হল সুলতান মামুদের শেষ ভারত অভিযান। কিন্তু চৌহানরাজা মৃত্যু বরণ করেছিলেন। শতাব্দী অতিক্রান্ত হল,—আবার সেই দুর্দ্দশার পুনরাবৃত্তি—ভারতের চিরন্তন অবমাননা। সেইদিন কনৌজের রাজা আজমীর— দিল্লীর অধিপতি ভারতবাসীর শেষ রাজা পৃথিরাজকে ধ্বংসের জন্য মহম্মদ ঘোরীকে আহ্বান করছিলেন। কিন্তু কনৌজ রাজও সেই বিপদ থেকে অব্যাহত পান নি। এই দুটী রাজ্যের পতনের পর ভারতবর্ষের মুখে যে পরাধীনতার চিহ্ন অঙ্কিত করেছিল, তা আজও নির্মূল হয়ে যায় নি।"

আমি মৃদুস্বরে বল্লাম—'সংযুক্তা'—সে স্বর একমাত্র আমিই—শুনলাম। অবগুণ্ঠনের নিম্নে আমার কপাল রক্তিম হয়ে উঠল। কিন্তু সে শব্দ তিনিও শুনলেন। তিনি চঞ্চল হয়ে উঠলেন—তাঁর মুখমণ্ডল রক্তহীন হ'ল, কিন্তু পাংশু না হয়ে কৃষ্ণবর্ণ হয়ে উঠল। আমি পূর্ব্বে সেই পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করেছিলাম। তাঁর মুখমণ্ডলে যেন একটা ছায়া সম্পাত হ'ল, কিন্তু তাঁর চক্ষুদ্বয়ে ফুটে উঠলো ঔজ্জ্বল্য। তিনি বল্লেন,—পৃথ্বীরাজের নিকট সংযুক্তার স্থান পার্থিব সম্পদের বহু উর্দ্ধে। সুতরাং সংযুক্তার আকর্ষণে পৃথ্বীরাজ তাঁর সিংহাসন এবং জীবন বিসর্জ্জন দিলেন। কতবার রাজপুত প্রেমের জন্য, সম্মানের জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়েছে! হে রাজকুমারি, তোমার মুখমণ্ডলের অবগুণ্ঠন ছিন্ন করে আমার মণিবন্ধে বন্ধন করে দাও। আমি যুদ্ধক্ষেত্রে তাই নিয়ে অবতীর্ণ হব। ঐ দেখ, দূরে ঐ প্রান্তরে আজও সম্রাট আকবরের আকাশ প্রদীপ জ্বলছে। সে আকাশ-প্রদীপ সম্রাট তাঁর সৈন্যদের রাত্রির অন্ধকারে যুদ্ধান্তে ফতেপুর শিকরী প্রত্যাবর্ত্তনের পথ আলোকিত করবার জন্য নির্ম্মাণ করেছিলেন। বেগম সাহেবার রাখীবন্ধ ভাইরূপে আমি আমার পূর্ব্ব পুরুষদের মত ইসলামের সম্মান রক্ষার জন্য এই কথা স্মরণ করব এবং সর্ব্বস্বপণ করব, বেগম সাহেবের সম্মান—আমারই সম্মান।"

"রাও" আমাকে পূর্ব্বের মতই সম্মান করতেন। এক্ষণে আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস নিলাম। আমি আমার অবগুণ্ঠনের ছিন্ন অংশ তাঁর মণিবন্ধে বেঁধে দিলাম। প্রথমে আমার অধর সেই ছিন্ন অবগুণ্ঠন স্পর্শ করেছিল।

সময় বয়ে যাচ্ছিল। বোধ হয়, আজকের এই অর্দ্ধদিবস আমার সমস্ত জীবনকে অতিক্রম করে যাবে। সুতরাং আমি আজ আমার রাখী বন্ধ ভাইয়ের সাথে প্রকৃতির এই সৌন্দর্য্যকে পরিপূর্ণ উপভোগ করব।

(ক্রমশঃ)

প্রাগজ্যোতিষ

শ্রীবিমলাচরণ লাহা এম্‌-এ, বি-এল, ডি-লিট্‌, পি-এইচ্‌-ডি

পুরাকালে প্রাগজ্যোতিষের অপর একটী নাম ছিল কামরূপ। প্রাগজ্যোতিষ কামরূপ অপেক্ষা বৃহত্তর ছিল। ইহা পূর্ব জ্যোতিষশাস্ত্রের একটী কেন্দ্র। শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণেরা কামরূপে আসিয়াছিলেন। বঙ্গদেশে ইঁহারা আচার্য্য বলিয়া বিদিত এবং আসামে দৈবজ্ঞ বলিয়া পরিচিত। ইঁহাদের পূর্বপুরুষেরা জ্যোতিষশাস্ত্র অধ্যয়ন জ্যোতিষের উল্লেখ আছে। এই দুইটী গ্রন্থের মতে ইহারা সুবিখ্যাত জাতি। মহাভারতে প্রাগজ্যোতিষ একটী ম্লেচ্ছ রাজ্য বলিয়া বর্ণিত আছে। ইহার রাজা ছিল ভগদত্ত। মহাভারত হইতে আরও আমরা জানিতে পারি যে প্রাগজ্যোতিষ নামে একটী অসুররাজ্যে নরক এবং মুর নামে দুইটী অসুর রাজত্ব করিত। কিরাত এবং চীনদিগের

সমগ্র উত্তর এবং পূর্ব বঙ্গদেশ প্রাগজ্যোতিষ রাজ্যের অধীনে ছিল। পূর্বদিকস্থ যে সকল দেশের বরাহমিহির উল্লেখ করেন, তাহাদের মধ্যে প্রাগজ্যোতিষ একটী। রঘুবংশের মতে ব্রহ্মপুত্র নদের উত্তরদিকে প্রাগজ্যোতিষ দেশ অবস্থিত; সেইজন্য আমাদের মনে হয় উত্তর বঙ্গ এবং উত্তর বিহারের অনেক অংশ ইহার অন্তর্গত ছিল। যোগিনী-তন্ত্র হইতে জানা যায় যে, রংপুর ও কুচবিহার সমেত সমস্ত ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা কামরূপের অন্তর্ভুক্ত। হেমচন্দ্রের অভিধান-চিন্তামণিতে প্রাগজ্যোতিষ-কামরূপের উল্লেখ আছে। রঘুবংশে ইহারা দুইটী বিভিন্ন জাতি বলিয়া বর্ণিত। মহাভারতে গৌহাটীর নিকটস্থ কামাখ্যার উল্লেখ পাওয়া যায়। কামাখ্যার মন্দির শাক্ত হিন্দুদিগের একটী পবিত্র স্থান। পুরাকালে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা তিনভাগে বিভক্ত ছিল: (১) সাদিয় (পূর্ব জিলা), (২) আসাম (মধ্য জিলা), এবং (৩) কামরূপ (পশ্চিম জিলা)। কামরূপের পশ্চিম বিভাগের অপর একটী নাম ছিল কুশবিহার। এখানে রাজাদিগের প্রাসাদ ছিল এবং ইহার রাজধানী কামাতিপুর হইতে সমগ্র দেশের নামকরণ করা হইয়াছে। ব্রহ্মপুত্র নদের দক্ষিণ তীরে অবস্থিত গৌহাটী কামরূপের প্রাচীন রাজধানী। কুশবিহারের রাজধানী কামাতিপুর পাবনা হইতে ১৫০ মাইল দূরে অবস্থিত। গৌহাটী পাবনা হইতে ইহার দ্বিগুণ দূরে অবস্থিত। পূর্বদিকে চীনদিগের সু নামে একটী দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম বর্বর জাতির সীমান্তদেশগুলি পর্য্যন্ত কামরূপ বিস্তৃত। দক্ষিণ পূর্বদিকে জঙ্গলগুলিতে হাতীর বাস ছিল। কামরূপে একটী ব্রাহ্মণ রাজা ছিলেন। যদিও তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন, অন্তরে তিনি বৌদ্ধধর্মের প্রগাঢ় ভক্ত ছিলেন এবং কনৌজের রাজা হর্ষবর্দ্ধনের সহিত তিনি তাঁহার ধর্মযাত্রায় মিলিত হন। পুরাকালে কামরূপ পশ্চিমদিকে করতোয়া নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত। সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ স্তম্ভ শিলালিপিতে গুপ্তসাম্রাজ্যের বাহিরে একটী সীমান্ত দেশ বলিয়া কামরূপের উল্লেখ আছে। পুরাণের মতে রংপুরের অন্তর্ভুক্ত করতোয়া নদী হইতে পূর্বদিকে প্রাগ-জ্যোতিষের রাজধানী কামরূপ বিস্তৃত। মণিপুর, জৈন্তিয়া, কাচার, পশ্চিম আসাম এবং মৈমনসিংহ ও শ্রীহট্টের গোয়ালপাড়া হইতে গৌহাটী পর্য্যন্ত কামরূপ বিস্তৃত। পুরাকালে কামরূপ দেশ প্রায় ১০,০০০ বিঘা বিস্তৃত ছিল। ইহার ভূমিগুলি উর্বর এবং চাষের সুবিধার জন্য প্রচুর জল পাওয়া যাইত। উত্তরে ভুটান কামরূপের অন্তর্গত। দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্র এবং লখ্যার সঙ্গম পর্য্যন্ত কামরূপ দেশের সীমা। কালিকাপুরাণের মতে প্রাগজ্যোতিষ এবং কামাখ্যা কিম্বা গৌহাটী অভিন্ন। কামাখ্যার নীলকূট পর্বতে কামাখ্যাদেবীর মন্দির আছে। তাম্রেশ্বরীদেবীর মন্দির প্রাচীন কামরূপের উত্তর পূর্ব সীমার নিকটে অবস্থিত। রাজশেখরের কাব্যমীমাংসায় প্রাগজ্যোতিষের স্থান পূর্বদিকে নির্ণীত হইয়াছে।

প্রাগজ্যোতিষ রাজ্যে আম্র, বেল, বট প্রভৃতি অনেক ফল ও বৃক্ষ ছিল। প্রজাদের নিকট হইতে কর আদায়ের কোন ব্যবস্থা ছিল না। দোষের জন্য দণ্ডপ্রদানও বিরল ছিল। কামরূপে অনেকপ্রকার চন্দনধূপ ও ধুনা পাওয়া যাইত। যখন চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েন সাং কামরূপে আসেন তখন এখানে তিনি দেখেন যে জাম এবং নারিকেল প্রচুর। এখানকার জল-হাওয়া ভাল ছিল। লোকেরা সৎ, ধর্মভীরু এবং ধৈর্য্যশীল। তাহারা দেবতার পূজা করিত কিন্তু বৌদ্ধধর্মে তাহাদের আস্থা ছিল না। চৈনিক পরিব্রাজক এখানে কোন বৌদ্ধবিহার দেখেন নাই। এখানে অনেক দেবমন্দির ছিল, রাজা বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। বহুদূর হইতে ছাত্ররা এখানে অধ্যয়ন করিতে আসিত। যদিও রাজা বৌদ্ধ ছিলেন না, তিনি ধীশক্তিসম্পন্ন বৌদ্ধ-শ্রমণদিগকে যথেষ্ট সম্মান করিতেন। কামরূপের পূর্বদিকে অনেক পর্বত ছিল। ইহার দক্ষিণ-পূর্বদিকে বন্যহস্তী পাওয়া যাইত এবং যুদ্ধের জন্য হস্তী পাঠান হইত। চৈনিক পরিব্রাজকের মতে বর্তমান কামরূপ এবং ক-মো-লু-পো অভিন্ন। বর্তমান কামরূপের রাজধানী গৌহাটী। উচ্চ ব্রহ্মদেশের পশ্চিমদিকে কামরূপ ১৬০০ লি বিস্তৃত। আলবেরুনির মতে কামরূপ কনৌজ রাজ্যের পূর্বদিক পর্য্যন্ত বিস্তৃত। উত্তর পূর্বদিকে কামরূপ রাজ্য স্বাধীন বলিয়া মনে হয়। কামরূপের রাজা গুপ্তসম্রাট সমুদ্রগুপ্তকে কর দিত। বহুদিন ধরিয়া কামরূপে ব্রাহ্মণের প্রাধান্য ছিল। যদিও এই রাজ্য গুপ্ত রাজাদিগকে কর দিত, আভ্যন্তরিক

পিতা সুস্থিতবর্মণ মৃগাঙ্ক মহাসেন গুপ্তের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। এই সন্ধিতে গৌড়দিগের ক্ষতি হইয়াছিল। গৌড়ের রাজা শশাঙ্কের রাজধানী কর্ণসুবর্ণ ভাস্করবর্মণের আয়ত্বাধীনে আসে।

হর্ষচরিত হইতে জানা যায় যে প্রাগজ্যোতিষের যুবরাজ ভাস্করদ্যুতি নামে এক দূতকে হর্ষের নিকটে পাঠান। হর্ষবর্দ্ধন যখন শশাঙ্কের সহিত যুদ্ধ করিতে যান, কামরূপের যুবরাজ ভাস্করবর্মণ কর্তৃক প্রেরিত হংসবেগ নামে একজন দূতের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। ভাস্করবর্মণ হর্ষের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইবার জন্য অনেক উপঢৌকন পাঠান। হর্ষ এবং ভাস্করবর্মণ কর্তৃক শশাঙ্ক পরাজিত হন। কামরূপের রাজা হর্ষের আদেশ মানিতেন। ইহার আর একটী রাজকুমার হর্ষের মিত্র ছিলেন। শ্রীহর্ষের উৎসবে ভাস্করবর্মণ যোগদান করেন। কামরূপ পরে হর্ষের হস্তগত হয়। কামরূপের রাজা সুস্থিরবর্মণকে পরাজিত করিয়া মহাসেনগুপ্ত সুযশ অর্জন করেন। সুস্থিরবর্মণ বাস্তবিক একজন মৌখরি ছিলেন এবং তিনি কনৌজের গ্রহবর্মণ এবং অবন্তিবর্মণের পূর্বপুরুষ।

যখন চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েন সাং নালন্দায় আসেন, কামরূপের রাজা ভাস্করবর্মণ তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করেন। সর্ব প্রথমে এই নিমন্ত্রণ তিনি গ্রহণ করেন নাই, কিন্তু তাঁহার শিক্ষক শীলভদ্রের অনুরোধে তিনি কামরূপে আসেন এবং ইহার রাজা ভাস্করবর্মণ তাঁহাকে সাদরে আহ্বান করেন। যখন ভাস্কর বর্মণ তাঁহার জন্মভূমি সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন, তিনি উত্তরে বলেন যে তিনি তাঙ্গ দেশের লোক।

যদিও ভাস্করবর্মণ জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন, তিনি নিজেকে ক্ষত্রিয় কিংবা রাজপুত বলিয়া মনে করিতেন। ভাস্করবর্মণ বর্বর সলস্তম্ভ কর্তৃক পরাজিত হইলে কাশ্মীরের রাজা ললিতাদিত্য কামরূপ জয় করেন।

নরক কামরূপ দেশ জয় করিয়া প্রাগজ্যোতিষে বাস করেন। এখানে তিনি বিচারালয় স্থাপন করেন। তাঁহার পুত্র ভগদত্ত পিতার সকল সদ্গুণ পাইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র বজ্রদত্ত কৌত্র বংশের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখেন। পুত্র ইন্দ্রপাল ধার্মিক ও ন্যায়পরায়ণ। ইন্দ্রপালের মোহর হইতে জানা যায় যে তিনি প্রাগজ্যোতিষের রাজা ছিলেন এবং মহারাজাধিরাজ উপাধিধারী ছিলেন। কামরূপের রাজা বজ্রদত্ত শিবের উপাসক। রাজা বনমালদেবও শিবপূজা করিতেন। রাজা বীরবাহু যুদ্ধে সুযশ অর্জন করেন এবং অম্বা নাম্নী একটী স্ত্রীলোকের পাণিগ্রহণ করেন। নেপালের লিচ্ছবী বংশজাত বৎসদেবী এবং শিবদেবের পুত্র জয়দেব কামরূপের রাজা শ্রীহর্ষদেবের কন্যা রাজ্যমতীকে বিবাহ করেন। রাজ্যমতী "ভগদত্ত-রাজকুলজা" নামে খ্যাত ছিলেন। কামরূপের রাজা ভাস্করবর্মণের নিধনপুরে আবিষ্কৃত তাম্রলিপি হইতে কামরূপের রাজার একটী বংশ পরিচয় পাওয়া যায়। তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

পুষ্যবর্মা
|
সমুদ্রবর্মা
|
বলবর্মা
|
কল্যাণবর্মা
|
গণপতিবর্মা
|
মহেন্দ্রবর্মা
|
নারায়ণবর্মা
|
মহাভূতবর্মা
|
চন্দ্রমুখবর্মা
|
স্থিতবর্মা
|
সুস্থিতবর্মা (অপর নাম মৃগাঙ্ক)

| |
সুপ্রতিষ্ঠিতবর্মা — ভাস্করবর্মা

পালবংশীয় রাজা ধর্মপালের পুত্র দেবপাল কামরূপ জয় করেন। রামচরিতের মতে রামপাল নামে একজন সীমান্ত নৃপতি কামরূপ জয় করিয়াছিলেন। গৌড়ের রাজারা উপর্যুপরি এ দেশ জয় করেন। কামরূপ বাংলার পালরাজাদিগের রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। খৃষ্টীয় দ্বাদশ

বৈদ্যদেবকে যথেষ্ট ক্ষমতা দেন। বাংলার পালরাজারা আসামের অন্তর্গত প্রাগজ্যোতিষ ভুক্তিকে শাসন করিত। রামপালের পুত্র ধর্মপাল কামরূপ জয় করেন। কামরূপের রাজা জয়পাল বরেন্দ্রির একজন ব্রাহ্মণকে নয়শত স্বর্ণমুদ্রা দান করেন। বৈদ্যদেবের কমৌলি দানপত্র হইতে জানা যায় যে প্রদত্ত গ্রামটী কামরূপমণ্ডল এবং প্রাগজ্যোতিষ-ভুক্তিতে অবস্থিত। প্রাগজ্যোতিষের রাজা দেবপালের বশ্যতা স্বীকার করেন। লক্ষ্মণসেন কামরূপ জয় করেন। লক্ষ্মণসেনের সভাকবি উমাপতি ধর প্রাগজ্যোতিষ জয় সম্বন্ধে একটী কবিতা লেখেন। শরণ নামে লক্ষ্মণসেনের আর একজন সভাকবি কামরূপ জয় বর্ণনা করেন। চন্দ্র রাজা ধর্মচন্দ্রের পুত্র বিমলচন্দ্র কামরূপ শাসন করেন। তিনি মালবরাজবংশীয় রাজা ভর্তৃহরির ভগ্নীকে বিবাহ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র গোবিন্দচন্দ্র এবং পরে ললিতচন্দ্র কামরূপ শাসন করেন।

খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বাংলা এবং বিহারের বিজেতা বখ্‌তিয়ারের পুত্র মহম্মদ কামরূপ আক্রমণ করেন। করতোয়া নদীর তীর দিয়া উত্তরদিকে তিনি ধাবিত হন, কিন্তু পরে পরাজিত হইয়া প্রত্যাবর্তন করেন। ১৮১৬ সাল পর্যন্ত কামরূপ নিজের স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রাখিয়াছিল।

এই প্রবন্ধ প্রণয়ন কালে যে সকল পুস্তক হইতে আমি সাহায্য পাইয়াছি তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১ মহাভারত
২ রামায়ণ
৩ পুরাণ—বিষ্ণু, কালিকা
৪ হরিবংশ
৫ বৃহৎ সংহিতা
৬ আইন-ই-আকবরী
৭ কাব্যমীমাংসা
৮ বাংলার ইতিহাস (রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়)
৯ *Cambridge History of India*, I.
১০ Pargiter, *Ancient Indian Historical Tradition.*
১১ Cunningam, *Ancient Geography of India* (ed. S. N. Majumder).
১২ JRAS
১৩ Martin, *East Ind.*
১৪ Beal, *Records of the Western world.*
১৫ Buchanon, *Account of Rangpur, JASB*).
১৬ *B. C. Law Volume*, pt. I.
১৭ Arthasastra Commentary
১৮ K. L. Barua, *Early History of Kamarupa.*
১৯ Watters, *On Yuan Chwang.*
২০ Alberuni, *India*
২১ V. A. Smith, *Asoka* (3rd. Ed.)
২২ V. A. Smith, *Early History of India* (4. Ed.).
২৩ Fleet, *Corpus Inscriptionum Indicarum.*
২৪ *Epigraphia Indica.*
২৫ H. C. Roy Choudhuri, *Political History of Ancient India* (4th Ed.)
২৬ R. K. Mookerji, *Harsha.*
২৭ Fleet, *Gupta Inscriptions.*
২৮ Beal, *Life of Hiuen Tsiang.*
২৯ *Journal Asiatique.*
৩০ Hoernle, *Gauhati Copperplate grant of Indrapala of Pragjyotisa in Assam.*
৩১ Hoernle, *Nowgong Copperplate grant of Jalavarman of Pragjyotisa in Assam.*
৩২ Allan, *The Coinage of Assam.*
৩৩ *Numismatic Chronicle, 4th.* Series.

পনেরোই আগস্ট

শচীন সেনগুপ্ত

(নাটক)

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

সাধনা। আপনি এখনো বিদ্রূপ করচেন!

দীপক। বাঁকা ঠোঁট যেমন ট্র্যাজিক, তেমনই কমিক; তাই বাঁকা ঠোঁটের ব্যথার কথা অনেক সময় পরিহাস বলে মনে হয়। কিন্তু আমি পরিহাস করিনি। বুঝতে পারচি কার্তিকই অন্যায় করেছিল। আপনি অনিমেষ লাহিড়ীকে খেলাচ্ছিলেন, বাঙ্গাল কার্তিক তা বুঝতে পারেনি!

সাধনা। আপনি চলে যান এখান থেকে।

প্রভাবতী। অখন ত চইলা যাইতেই কইবা। একজনের মাথা কাটাইলা, চুরি করাইলা আমার গয়না, অখন বিদায় করতে চাইবা না?

সাধনা। কী বলচেন আপনি!

অবনী। তুমি কিছু কইয়োনা গিন্নী, আমারে কইতে দাও।

প্রভাবতী। ক্যান্ আমি কমু না ক্যান? পরথম আইয়া যখন দাঁড়াইলাম, আমার গা-ভরতি গয়না দেইখ্যা তোমার চক্ষে আগুন জ্বইলা উঠছিল, পরাণ পুইড়া ছাই হইতাছিল। অখন সব ঠাণ্ডা হইল ত! পাইলা ত শান্তি!

দীপক। ও-রকম করে না বলে সহজভাবে বলুন না খুড়িমা কী হয়েচে।

প্রভাবতী। হইব আর কি! আমার কপাল পোড়চে সর্বস্ব গ্যাছে চোরের গর্ভে। কী হইল আমার গয়না? গা-ভরতি গয়না?

দীপক। গয়না ত আপনার গায়েই ছিল।

প্রভাবতী। গায়েই ত ছিল। সেই গয়না দেইখ্যা সগ্গোলের চোখ জ্বইল্যা যায়, পরাণ পুইড়া যায় বইল্যাই ত তোমার খুড়া কইল গায়ের গয়না খুইল্যা রাখতে। কাত্তিকডার কীর্তি শোনলাম। শোনলাম সে সাধনা দেবীর গয়না ছিনাইয়া লইতে গেছিল বইল্যাই মার খাইল।

দীপক। এ-কথা কার কাছে শুনলেন?

প্রভাবতী। তোমার খুড়া কইল না!

দীপক। আপনি বলেচেন এই কথা?

অবনী। যা শুনচি, তাই কইছি! হাচা-মিছা জানিনা। চক্ষে ত দেখি নাই।

প্রভাবতী। অখন, শোন্ দীপু, আমার সর্বনাশের কথা অখন শোন্। কার্তিকের ডরে গয়না খুইল্যা রাখলাম পোর্টোমান্টে। খুইল্যা রাইখ্যা চাবীডা আঁচলে বাইন্ধ্যা লইয়া গ্যালাম পাকসাক করতে। চুলার আগুন জ্বইল্যা ওঠতেই মনে হইল সতী-লক্ষ্মীর গায়ে একদানা সোনা রাখতে দেখি আমার পোর্টোমান্টো ভাঙ্গা। হাতড়াইয়া দেখিরে দীপু, পোর্টোমান্টো ভাঙ্গে নাই, আমার কপাল ভাঙ্গছে। আমার সব গয়না চুরি কইর‍্যা লইছরে দীপু, সর্বস্ব চুরি কইর‍্যা লইছে। আইজ হইলাম আমি পাকা পথের ভিখারী, পাকা ভিখারী হইলাম রে!

প্রভাবতী কাঁদিতে লাগিল

অবনী। এ কাজ কার্তিক ছাড়া কেউ করে নাই, যা তোমারে আমি কইলাম দীপু।

রাইমণি পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। সে কহিল

রাইমণি। মিছা কথা।

অবনী। মিছা কি হাচা থানা পুলিশে গ্যালেই তা বোঝোন যাইব।

রাইমণি। আর বোঝন যাইব যদি আমি কইয়্যা দি, ভাশুর হইয়া আপনে যে ছানির কথা কইয়া আমার মন ভাঙ্গাইতে চাইলেন, ঘর ভাঙ্গাইতে চাইলেন।

প্রভাবতী। ও কি কথা তুই কইতাছিসরে রাইমণি।

রাইমণি প্রভাবতীকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল

রাইমণি। তুমি সতী লক্ষ্মী দিদি, তোমারে ছুঁইয়্যা, আকাশের ওই চাঁদ তারারে সাক্ষী রাইখ্যা আমি কইতাছি, আমার কথা মিছা নয়। ভাশুর আইস্যা যার মুখের দিকে চাই নাই, যারে আমার দেহ নাই আমার মুখ, সেই আমারে ইসারায় ডাইক্যা……

অবনী। চুপ দে! চুপ দে ছিনাল মাগী।

রাইমণি। আমি কইতাছি দিদি, তোমার গহনা চুরি যায় নাই, ভাশুরের কাছেই আছে।

সাধনা। এ সব কী দীপকবাবু?

দীপক। যান, আপনারা এখন থেকে চলে যান।

অবনী। যাইতেই ত হইব। থানায় যাইতে হইব না। অত টাকার গয়না।

প্রভাবতী। রাইমণি যা কইল, তা হাচা না মিছা?

অবনী। ওই ছিনাল মাগীর কথা তুমি কানে নিয়ো না।

রাইমণি। আমি চাষীর বউ মিছা কথা কইনা, দিদি। তুমি আইস আমার লগে। সব কথা তোমায় আমি কমু অখন। খিটকালের কথা সগ্গোলের সামে ত কইতে পারি না।

প্রভাবতী। চল, আগে শুইন্যা লই। তারপর দেখুম ওই বুইড়া মিন্সারে।

অবনী। দীপু! তুমি বাবা ওই ছিনাল মাগীর কথা......

দীপক। থামুন! যা তা বলবেন না।

অবনী। আচ্ছা কমুনা, কিছু আর কমুনা। তুমি বাবা আমার লগে চল থানায়।

দীপক। না, থানায় যেতে আমি পারব না।

অবনী। তোমার ভরসায় দেশ ছাইড়্যা আইলাম। এখন তুমি আমাগোরে ত্যাগ করবা?

দীপক। আমি কাউকে ভরসা দিইনি, কাউকে বলিনি আমার সঙ্গে আসতে। আপনি এখন যান এখান থেকে। আমাকে পাগল করে দেবেন না।

অবনী। আচ্ছা, যাইত্যাছি এখন। কিন্তু তোমার বোনের বোঝা আর বইতে পারুমনা, তাও কইয়া যাইত্যাছি।

বলিয়া চলিয়া গেল

দীপক। উঃ! কী নিদারুণ অভিশাপ! সাধনা দেবী আমি অপরাধ স্বীকার করচি, ক্ষমা চাইছি। আপনাদের বাড়ীতে ওদের এনে আমি অন্যায় করিচি। সবাই মিলে এমন উপদ্রব যে করবে, তা আমি ভাবতেও পারিনি।

সাধনা। আপনিই বা কি করবেন। ওরা, দেখচি, কোন শৃঙ্খলাই আর মেনে চলতে পারে না!

দীপক। বাস্তু না থাকবার সমাজ ভাঙবার কুফলই ত এই। ছয় মাস ওরা ভেসে বেড়াচ্ছে। বর্তমান ওদের শঙ্কায় সঙ্কটে লাঞ্ছনায় কেটে যায়, ভবিষ্যতের দিকে চেয়েও অন্ধকার ছাড়া কিছুই দেখতে পায় না। মনের সৎ প্রবৃত্তি সব একে একে শুকিয়ে যায়। আত্মরক্ষার আকুলতায় ওরা হয়ে ওঠে একান্ত স্বার্থপর।

বলিতে বলিতে প্লান্টফর্মে গিয়া বসিল। সাধনা তাহার কাছে গিয়া কহিল

সাধনা। ওদের ফিরিয়ে নিয়ে যাবার কি কোন উপায়ই নেই?

দীপক। বন্যা যে-গাছকে শিকড়-সমেত উপড়ে ভাসিয়া নেয়, কোনক্রমে তা জল থেকে উদ্ধার করা গেলেও তাকে আর জিইয়ে রাখা যায় না, বড় জোর জ্বালানি-কাঠ করে কাজে লাগানো যায়। শিকড়-ছেঁড়া মানুষের পরিণাম অঙ্গার ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না, সাধনা দেবী!

সাধনা তাহার আরো কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

সাধনা। আপনার ব্যথা আমি বুঝতে পারি।

দীপক তাহার দিকে চাহিয়া কহিল

দীপক। বিশ্বাস করি। নইলে আপনি আমাদের আশ্রয় দিতেন না। কিন্তু আমার ব্যথার আর আপনার সহানুভূতির কোন মূল্যই ত নেই।

সাধনা। আছে দীপকবাবু। এই বেদনার অনুভূতি, এই সমানুভূতি, মানুষের মন থেকে যাতে না লোপ পায়, তাই হোক্ আমাদের প্রার্থনা।

দীপক। যুদ্ধের পরও পৃথিবীটা যে শ্মশান হয়েই রয়েচে, স্বপন-বিলাসিনী আপনি দেখচি তা ভুলেই গেছেন।

সাধনা। ভুলি নাই দীপকবাবু, শুধু জানতে চাই যুদ্ধোত্তর কালের যুবজন আমরা, আমরাও কি শেয়াল শকুনি হয়ে শব-গন্ধ উপভোগ করব?

দীপক। কি করতে চান, আপনি?

সাধনা। এই শ্মশানেই নন্দন-কানন রচনার দায়িত্ব গ্রহণ করব।

দীপক। বল্লেন বেশ কাব্য করে, কিন্তু কাজটা যে কঠোর বাস্তব।

সাধনা। হিংসা দ্বেষ সংশয় সন্দেহ অবিশ্বাস মানুষের মনে মনে ক্রমশঃই বৃদ্ধি পেয়ে পৃথিবীকে এই মহাশ্মশানে পরিণত করেচে। তারই জন্য বিরোধের বিরতি নেই; তারই জন্য তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ সম্ভাবনার বিষয় হয়ে রয়েচে—যা মানুষের অবশিষ্ট সুখ শান্তি মানবতা সবই ধ্বংস করে দেবে।

দীপক। পারবেন তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ অসম্ভব করে এই শ্মশানকে নন্দন কাননে পরিণত করতে?

সাধনা। আমরা যুদ্ধোত্তর কালের যুবক যুবতীরা এখনো যদি কেবলমাত্র দর্শক হয়ে দাঁড়িয়ে না থেকে দৃঢ় হয়ে দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে দেশে দেশে মানুষের হিংসার বিরুদ্ধে, অবিশ্বাসের বিরুদ্ধে, লোভের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করি—সকল মানুষকে সমান অধিকার দিতেই হবে, তাহলেই দেখতে পাবেন এই মহাশ্মশানের দগ্ধ বক্ষ শ্যাম-তৃণে ছেয়ে যাবে, হিংসার বলি যত সব কঙ্কাল ফুল হয়ে ফুটে উঠবে।

দীপক। কিন্তু হিংসার বিরুদ্ধে, সন্দেহের বিরুদ্ধে, মানুষের দুর্বার লোভের বিরুদ্ধে কোন্ কোন্ দেশের যুবজন বুক ফুলিয়ে দাঁড়াবে বলে আপনি আশা করেন?

সাধনা। সবার আগে আমাদেরই দাঁড়াতে হবে, কেননা ভাগ্যক্রমে আমরাই ভারতের মহান ঐতিহ্যের অধিকারী হয়েছি, আর পেয়েছি মহাত্মাজীর উপদেশ আর নেতৃত্ব।

দীপক। আমাদের কথা শুনবে কে?

সাধনা। যারা কুইট ইণ্ডিয়া দাবীপূর্ণ করেচে, তাদেরই বংশধরেরা শুনবে আমাদের কথা; শুনবে শৃঙ্খলমুক্ত নব-জীবন-প্রাপ্ত বিশাল এসিয়া। পায়ে পায়ে সকলেই মহামিলনের পথে এগিয়ে যাবে।

দীপক। আপনি এ-কথা ভাবতে পারেন, কিন্তু আমি পারি না।

সাধনা। কেন? আপনি আর আমি কংগ্রেসের আদর্শ নিয়ে, কংগ্রেসের কাজে, একই পথ ধরে এগিয়ে এসেচি।

দীপক। যাত্রা করেছিলাম একই পথে, কিন্তু ফল পেলাম পৃথক।

সাধনা। পৃথক হবে কেন দীপকবাবু, একই স্বাধীনতা আমরা পেয়েচি। সে স্বাধীনতা আমার কাছে পরম সত্য, আপনার কাছেও তা মিথ্যা নয়।

সাধনা। বাস্তু আপনাকে হারাতে হয়নি, বাস্তু আপনি ত্যাগ করেচেন। আর সব চেয়ে দুঃখের কথা এই যে, জন্মভূমির ওপর জন্মগত অধিকার প্রতিষ্ঠা করবার সময় সত্যি করে যখনই এল, তখনই সেই অধিকার হেলায় ত্যাগ করে আপনি চলে এলেন। মাতৃভূমির মাটিতে দাঁড়িয়ে আজ আর একথা বলতে পারলেন না 'এই দেশেতেই জন্ম, যেন এই দেশেতেই মরি।' অথচ ইংরেজ আমলে দেশ-সেবকরা ও-কথা শুধু মুখেই বলতেন না, জন্মগত অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁরা প্রাণও দিতেন।

দীপক। পূব-বাঙ্গালার মাইনরিটির পক্ষে স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রাণ দিতেও প্রস্তুত থাকবার অনিবার্য পরিণাম কি, তা আপনি ভাবতে পারেন না।

সাধনা। আপনি এখনো ভাবচেন সেই প্রত্যক্ষ-সংগ্রামের কথা।

দীপক। ভোলবার মতো তুচ্ছ কথা কি?

সাধনা। তাহলে এ-কথাও ভুলবেন না যে, প্রত্যক্ষ সংগ্রামের প্ররোচনা দিয়েছিল তারাই, যারা সিপাহী-বিদ্রোহের পর বিদ্রোহীদের সাজা দেবার জন্য ব্যাপক নর-হত্যা করেছিল; যারা শাসনের নামে পশ্চিম সীমান্তে নিয়মিত হত্যার উৎসব জমিয়ে রাখা প্রয়োজন মনে করেছিল; যারা জালিনওয়ালাবাগকে নিরস্ত্র নিরীহ নরনারীর শব দিয়ে ছেয়ে রেখেছিল! তারাই চাইত ব্যাপক হত্যা। আজ তারাও নেই, তাদের সে স্বার্থও নেই।

দীপক। শুধু প্রবল হয়ে উঠেচে শরিয়ত-শাসনের দাবী।

সাধনা। একটা দাবী মুখর হয়ে উঠলেই যে অপর দাবী নীরব থাকবে তা মনে করবেন না। ভুলবেন না যে, আধুনিক এশিয়ায় সর্বপ্রথম ধর্ম-নিরপেক্ষ রিপাবলিক প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল খলিফদেরই তুর্কীতে।

দীপক। তার ছিল সম্পূর্ণ পৃথক এক রাগিনী।

সাধনা। মানুষের মনে কখন কোন্ রাগিনী কী প্রতিক্রিয়া সঞ্চার করে, তা তার একটু আগেও কেউ বলতে পারে না। আমাদের যন্ত্র বেঁধে সুর ভাজতে হবে, আমাদেরই বাঞ্ছিত সুর, মানুষে মানুষে মিলনের সুর।

দীপক। যা বার বার ব্যর্থ হয়েচে।

সাধনা। পরবশ ভারতে যা ব্যর্থ হয়েছিল, স্বাধীন ভারত তাকে ব্যর্থ হতে দেবে না। ভারতের স্বাধীনতার সেই হবে সবচেয়ে বড় অবদান। স্বাধীনতার জন্য আপনি সর্বস্ব পণ রেখেছিলেন, স্বাধীনতাকে সার্থক করে তোলবার জন্য আবার কেন আপনি অগ্রসর হবেন না?

দীপক। আবার বন্ধুর পথে যাত্রা!

সাধনা। পথের দাবী যে এখনো অপূর্ণ।

দীপক। সেই দুঃসাধ্য দুষ্প্রাপ্য দাবী কি?

সাধনা। সকল মানুষের সর্ববিধ কল্যাণ। ইংরেজ দু'শ বছর নিমজ্জিত। যেখানে যে মানবতা-বিরোধী মতবাদ শুনতে পাচ্ছেন যে সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক স্বার্থের আস্ফালন দেখচেন, জানবেন তা সব পরবশ-আমলের আতঙ্কগ্রস্ত মনের পরিচয়। সেই মনের দুয়ার জানালা আজ আমাদের সবলে খুলে দিতে হবে, যাতে করে নূতন আলো এসে আমাদের মনকে আলোকিত করে তুলতে পারে।

দীপক। যে অপরিসীম দুঃখ আমি সঞ্চয় করে এনেচি, তা শত সূর্যের আলো পেলেও গলে যাবে না।

সাধনা। ওই দুঃখবাদও পরবশতার ফল। শাসকদের পীড়ন আর আমাদের অবিরাম আত্ম-নিগ্রহ দুঃখকে যে মর্যাদা দিয়েচে, দুঃখ অবসানের প্রয়াসকে সে মর্যাদা দেয়নি। আজ তা দিতে হবে।

দীপক। দিতে ত চাই, কিন্তু পারি কোথায়? সাধনা দেবী! 'সম সিন্ধু অপার অগাধ বাধা।'

সাধনা। মনের দুয়ার জানালা খুলে দিন; তাতে আলো পড়ুক!

দীপক। আলো! আলো কোথায়!

সাধনা। আমার মুখের দিকে চেয়ে দেখুন।

দীপক। দেখচি। আকাশের ওই চাঁদের মতোই রূপালী রূপ।

সাধনা। আমার হাত ধরুন

হাত ধরিয়া দীপক কহিল

দীপক। তেমনই ঠাণ্ডা, হিম-শীতল।

সাধনা। কিন্তু দেহ আপনার কাঁপচে।

দীপক। হাঁ, হিমের স্পর্শে।

সাধনা। না।

দীপক। তবে?

সাধনা। সুখ দুঃখের সংঘাতে।

দীপক। মানে?

সাধনা। যে দুঃখকে মধুর করে ভাবতেন, বুঝতে পারচেন তার চেয়েও মধু পাওয়া যায় সুখের স্বাদে। যা অনুভব করচেন, তা মেনে নিতে চাইচেন না। তারই সংঘাত।

দীপক। আপনি কি আমাকে হিপনোটাইজ করতে চাইছেন, সাধনা দেবী?

সাধনা। মেয়েদের একটা কাজ তাই, আপনাদের মুখে শুনি। কিন্তু আপাতত বশীকরণ আমার অনভিপ্রেত।

দীপক। তবে?

সাধনা। বলুন ত তবে আমার অভিপ্রায় কি।

দীপক। আমি জানিনা, আমি বলতে পারি না।

সাধনা। আমিও জানি না, বলতে পারি না—কেন আপনাকে বল্লাম আমার দিকে চেয়ে দেখুন, কেন বল্লাম আমার হাত ধরুন।

দীপক। সে কি! অকারণে?

সাধনা। হাঁ কোন কারণই [illegible]

দীপক। চাঁদের এই মধুর আলো কি কারণ হতে পারে?

সাধনা। চাঁদ আজই প্রথম দেখা গেল না।

দীপক। রাত শেষ হতেই যে স্বাধীনতার উৎসব শুরু হবে, তাই কি কারণ হতে পারে?

সাধনা। সে উৎসবের বাঁশী আমার মনে সব সময়েই বাজে।

দীপক। কোনটাই কারণ নয়?

সাধনা। সত্যি, ওর কোনটাই সত্যিকারের কারণ নয়।

দীপক। কিন্তু আমাদের দুজনার দেহই যে থেকে থেকে কেঁপে উঠ্‌চে, একথা ত মিথ্যে নয়।

সাধনা। সন্ধ্যাবেলায় অনিমেষ আমার দেহ স্পর্শ করে কেঁপে উঠেছিল, আমি ছিলাম নিথর নিস্পন্দ।

দীপক। সন্ধ্যাবেলায় আপনার মুখের দিকে যখন চেয়ে দেখে-ছিলাম……

সাধনা। তখন? বলুন, থামলেন?

দীপক। তখন…বল্লে আপনি রাগ করবেন।

সাধনা। না। আমার সম্বন্ধে আপনার ধারণা কি তাই স্পষ্ট জানতে পারলে খুসি হব।

দীপক। তখন মনে হয়েছিল আপনি যেন পাথরের মূর্ত্তি।

সাধনা। আশ্রয় পাবার পরও?

দীপক। পাথরে খোদা দেব-দেবীর পাথরে-গড়া মন্দিরেও ত মানুষ আশ্রয় পায়।

সাধনা। তারপর…বলুন…

দীপক। আশ্রয় পাবার পর আশ্রয়টা আর বড় কথা থাকে না, আশ্রিত তখন প্রার্থনা করে, পাথরের দেব-দেবী তার প্রতি প্রসন্ন হৌন।

সাধনা। কিন্তু সন্ধ্যায় যাকে পাথরের মূর্ত্তি মনে হয়েছিল, চাঁদের আলোয় তাকে অপর কিছু মনে করচেন কি?

দীপক। হ্যাঁ।

সাধনা। কাজেই আমি প্রসন্ন হই, সে কামনা আপনার নেই এখন?

দীপক। এখন আপনাকে দেখে, আপনাকে স্পর্শ করে, মনে হচ্ছে, দেব-দেবীর কাছে প্রার্থনা করতে হয় তাঁরা প্রসন্ন হৌন, কিন্তু আপনি কেবল প্রসন্ন থাকলেই আমার সবখানি পূর্ণ হবে না।

সাধনা। আমার কাছে অতিরিক্ত কি পেলে আপনার অভাব পূর্ণ হয়?

দীপক। প্রীতি।

সাধনা। শুধু তাই!

দীপক। তাই যে আশাতীত।

সাধনা। এই নিশুতি রাতে, এই জোছনার আলোয়, আমি যদি শুধু মুখে বলি আমার প্রীতি আপনি পাবেন, তাহলেই আপনার সকল কামনা পরিতৃপ্ত থাকবে কি?

সাধনা। আপনি ত অপরিচিত নন!

দীপক। আজকার আগে আমাকে আপনি জানতেন না।

সাধনা। কিন্তু আজই ত আপনাকে সম্পূর্ণরূপে, সমগ্রভাবে, জেনে ফেলেচি।

দীপক। কি জেনেছেন?

সাধনা। জেনেছি, পূর্ব-বাঙ্গলা থেকে আপনি, আর পশ্চিম বাঙ্গলা থেকে আমি প্রায় একই সময়ে একই পথে যাত্রা সুরু করেচি—জাতির মুক্তি পথে।

দীপক। একথা সত্য।

সাধনা। জেনেছি জাতির মুক্তির পরও মানুষের দুঃখ আর লাঞ্ছনা আপনাকে পীড়া দিচ্ছে, যেমন পীড়া দিচ্ছে আমাকে।

দীপক। আপনাকেও!

সাধনা। জোর করে আপনারা আমাদের বাড়ীর শেডগুলো দখল করে নিলেন পুলিশ এলো আপনাদের তাড়িয়ে দিতে, আমরা পুলিশকে ফিরিয়ে দিলাম এই বলে যে, আপনারা বাস্তুত্যাগী আশ্রয়প্রার্থী নন, আপনারা আমাদের আত্মীয়, অতিথি। আপনাদের লাঞ্ছনা যদি না আমাদের পীড়া দিত, তাহলে কি ওই কথা বলে পুলিশকে ফিরিয়ে দিতাম?

দীপক। না, তা দিতেন না।

সাধনা। তারপর জেনেছি, নিজের কোন স্বার্থের জন্য নয়, কয়েকটি ভাগ্য-তাড়িত নর-নারীকে স্থিতু করবার আশা নিয়ে আপনি দেশ ছেড়ে এসে শান্তি পাচ্ছেন না।

দীপক। কিন্তু যে দেশ ছেড়ে এসেচি, সে দেশেও দারুণ অশান্তিতে দিন কাটাতে হচ্ছিল। সে-কথা আর এখন ভাবতেও পারি না।

সাধনা। আপনার চোখের দৃষ্টি, আপনার দেহের উষ্ণ পরশ, আপনার মনের মানবতা——

দীপক যেন আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল

দীপক। সাধনা দেবী!

সাধনা তাহার দিকে একটুকাল স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া থাকিয়া কহিল

সাধনা। বলুন।

দীপক। এইবার আমার মনে হচ্ছে আপনি আমাকে সত্যি সত্যিই হিপনোটাইজ করতে চাইছেন।

সাধনা। না। আত্ম-নিগ্রহের ফলে, অপ্রত্যাশিত ঘটনার আঘাতে, যে-মানুষ আপনার দেহের মাঝে আড়ষ্ট হয়ে রয়েচে, আত্ম-প্রসারণের আকাঙ্ক্ষা আর যার নেই, তাকেই আমি উদ্বুদ্ধ করতে চাইছি। কামরূপ কামাক্ষার কুহকিনীদের যে বশী-করণ বিদ্যার কথা শোনা যায়, সে বিদ্যা আমার নাই। মানুষকে আমি ভেড়া করে রাখতে চাই না।

দীপক। আপনি কি চান?

সাধনা। মানুষ যেখানে যেখানে লাঞ্ছনায়, অবমাননায়, ক্ষুব্ধ হয়ে রয়েচে, আড়ষ্ট হয়ে রয়েচে।

দীপক। যদি বলি সেইচ্ছে পূর্ব-বাঙ্গলা, সেইখানেই আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে হবে ?

সাধনা। তাই যাব।

দীপক। পারবেন ?

সাধনা। কেন পারব না !

দীপক। লাঞ্ছনার ভয় রয়েচে জেনেও সঙ্কোচ অনুভব করচেন না ?

সাধনা। একদিন বিদেশীর দেওয়া লাঞ্ছনাকে অঙ্গের ভূষণ করে নিতে পেরেছিলাম। আজ স্বদেশীর দেওয়া লাঞ্ছনাকে তার চেয়ে কদর্য্য মনে করব কেন ? মানুষে-মানুষে মিলনে যে গৌরব রয়েচে, তার দীপ্তি সকল লাঞ্ছনাকে একদিন ম্লান করে দেবে।

দীপক। কিন্তু সে লাঞ্ছনা আপনি কল্পনাও করতে পারেন না।

সাধনা। কুৎসিত কিছু কল্পনায় এনে স্তব্ধ হয়ে থাকা জাগ্রত যৌবনের ধর্ম্ম নয়। জাগ্রত যৌবন বন্যা-প্রবাহের মতো সব আবর্জ্জনা ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। সে যৌবন আমার দেহে মনে, আপনারও দেহে মনে, আবদ্ধ রাখা দায় হয়ে উঠেচে ! তাই আমাদের দুজনারই দেহ থেকে থেকে কেঁপে উঠচে, মন উঠচে দুলে, ফুলে। কারণ জানতে চেয়েছিলেন, কারণ নিশুতি রাতও নয়, চাঁদের আলোও নয়, কারণ স্বাধীনতার নব-বসন্তে যৌবনের জাগরণ।

দীপক। আমার যৌবন যদি আপনার দেহ দাবী করে ?

সাধনা। করবে কিনা তাইত ভাবচি !

দীপক। যদি করে, পারবেন সে দাবী পূর্ণ করতে ?

সাধনা। মনে মনে যাদের মিলন ঘটে, তাদের দেহের মিলন লজ্জার কারণ হয় না। সৃষ্টির দাবী মেটায় বলেই তা হয় নর-নারীর পক্ষে প্রয়োজনীয়।

দীপক। কিন্তু বিয়ের কথা এখন আমি কল্পনাতেও আনতে পারি না।

সাধনা। বিয়ে এমনই একটি অনুষ্ঠান, যা কেবল ঘটকদের আর অভিভাবকদের কল্পনাতেই অপরিহার্য্য থাকে। একের মন যখন অপরের মনকে টানে, দৈহিক মিলন তখন আর তিথি নক্ষত্র পুরুতের মন্ত্রের অপেক্ষায় থাকে না। কিন্তু আপনার ভয় নেই।

দীপক। কেন ?

সাধনা। দৈহিক মিলনের দাবী নিয়ে আপনি সহজে দাঁড়াতে পারবেন না।

দীপক। জানলেন কেমন করে ?

সাধনা। জানিনা, অনুমান করি। এতদিন আত্ম-নিগ্রহ করে এসেচেন, এখনও অতীতের কারাবাসের গৌরব করেন। সহজে কি তা ছাড়তে পারবেন ?

কিছু ছেড়ে এগিয়ে যেতে হয়, আবার সৃষ্টির বোধনে বাহু মেলে কি জনকে বুকে টেনে নিতে হয়। ত্যাগ সত্য, কিন্তু চরম সত্য নয় ; ভোগ পরম সত্য না হলেও ত্যাগ করবার মতো তুচ্ছ নয়। প্রয়ো শুধু প্রয়োজন, মানুষের অগ্রগতির পথে যখন যেমন প্রয়োজন। এত প্রয়োজন ছিল বাড়ী-ঘর ছেড়ে পথে পথে অভিযান, প্রয়োজন ছিল স বলা রাজা মিথ্যা, রাষ্ট্র মিথ্যা, মিথ্যা রাষ্ট্রীয় আইন-কানুন। অপরিসীম দুঃখ ছিল, অনিবার্য্য পীড়ন সইবার প্রস্তুতির প্রয়োজন ছিল কৃচ্ছ্রতার অভ্যাস। কিন্তু আজকার প্রয়োজন একেবা পৃথক। আজ বিদেশী রাজা তাঁর রাজপাট গুটিয়ে নিয়েচেন। র হয়েচে আজ স্বরাষ্ট্র। আজ প্রয়োজন মায়া, মার্জ্জনা, প্রীতি ; রা প্রতি মায়া, রাষ্ট্রের মানুষের প্রতি মায়া, সকল রূঢ়তার মূঢ়তার মার্জ্জ সকল দ্বন্দ্ব বাদ বিসম্বাদ তলিয়ে দেওয়া প্রীতির বন্যা। মনকে দিকে ফিরিয়ে আনবার জন্যই চাই সংসার, সন্তান, পিতৃত্ব, মাতৃ মানুষের আত্মীয়তা। পারবেন না মনের এই পরিবর্ত্তন আনতে আমি প্রস্তুত, আপনি পারবেন কিনা তাই বলুন।

দীপক। নিঃসম্বল নিরাশ্রয় আমি কোন দুঃসাহস নিয়ে বলব পা আপনারও দায়িত্ব নিতে ?

সাধনা। বধূরূপে বোঝা হয়ে আমি পরগৃহ হতে চাই না। আ হতে চাই নব জীবনের নতুন পথের সচেতন সঙ্গিনী। বলুন আপ রাজী ?

দীপক। একি ! চারটে বেজে গেল।

সাধনা। হাঁ। আর একটু পরেই দিনের আলো ফুটে উঠবে নতুন দিনের আলো, নতুন সঙ্কল্প নেবার আলো। বলুন ! বলুন !

দীপক। সাধনা দেবী ! আমি এখন কিছুই বলতে পারব না।

সাধনা। ভাবচেন শাঁখ সানাই যতক্ষণ না বাজবে, বাসর জাগবার জন্য পাড়ার মেয়েরা যতক্ষণ না ভিড় জমাবে, ততক্ষণ মিলন বাস্তব হয়ে উঠবে না। সঙ্কোচের কারণ যদি তাই হয়, খুলে বলুন। সে-সব ব্যবস্থাতেও ত্রুটি থাকবে না। আমার বাবা ব্যস্ত হয়েই রয়েচেন আমার এই সঙ্কল্প তাঁর কানে গেলেই তিনি মেতে উঠবেন। বলুন।

দীপক। বলবার ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না, সাধনা দেবী।

সাধনা। ভাবচেন কোথায় ছিলেন আপনি, আর কোথায় ছিলাম আমি। সহসা দুয়ে দেখা হোলো। কথা যা হোলো, তাতে বোঝাই গেল না—রাগ কি অনুরাগ আমাদের উত্তেজিত করেচে। এমন অবস্থায় মনের মিলনের অবাস্তব কথা বলা গেলেও দেহের মিলনের বাস্তবতাকে আলোচনার বিষয় করে তোলা সঙ্গতও হয় না, শোভনও হয় না। কেমন, এই ভাবচেন ত ?

দীপক। কতকটা ওই রকমই।

সাধনা। কিন্তু আপনার সনাতন স্বদেশী ব্যবস্থা যে এর চেয়ে

মিলনের অধিকার ! এই অব্যবস্থা সুব্যবস্থা বলে চলে যাচ্ছে, আর আমরা দুজন একই দেশের দুই প্রান্তে থেকে একই উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করিচি, একই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়িচি, একই কারণে জেল খেটেচি, একই উপায়ে স্বাধীনতা অর্জ্জন করেচি—আর সেই স্বাধীনতার একই আনন্দ ও বেদনা নিয়ে আজ নব সৃষ্টির প্রয়োজন অনুভব করচি। আমাদের চার চোখের মিলন ঘটেচে, মনের গরমিলও তেমন নেই, শুধু আকস্মিক দেহের দাবী পূর্ণ করবার সম্মতিটুকু আগাম নিয়ে রেখে অগ্রগামী হওয়া আমাদের অপরাধ হবে ?

বাগানের এক পাশে মুখে আঙুল দিয়া কে যেন শব্দের মতো বাজাইল

দীপক। ও আবার কি।

পুনরায় সেই শব্দ হইল। সাধনা যেদিক হইতে শব্দ হইতেছিল, সেইদিকে চাহিয়া হাসিয়া কহিল

সাধনা। ভাব কে, হয় আর !

দীপক। কি ভেবেছিলেন আপনি ?

সাধনা। ভেবেছিলাম পাপিয়াই বুঝবা মিলনের সানাই বাজিয়ে দিলে। দ্বিতীয়বার শুনে বুঝলাম, কে যেন আপনাদের কাউকে ইসারায় ডাকচে।

দীপক। আমাদের কাউকে ডাকচে জানলেন কেমন করে ?

সাধনা। ও-রকম ইসারায় সাড়া দেবার মতো লোক আমাদের বাড়ীতে নেই।

দীপক। আমাদের ওখানেই যে আছে, তা আপনাকে বল্লে কে ?

সাধনা। দেখতেই পাবেন। ওই দেখুন, কে যেন নিঃশব্দে এগিয়ে আসচে দেখুন, আসচে আর ফিরে ফিরে পেছন পানে চেয়ে দেখচে।

দীপক। কি সব্বনাশ ! ও যে কেতকী !

সাধনা। আপনার বোন ?

দীপক। হ্যাঁ !

সাধনা। হয়ত আপনাকে খুঁজতে আসচে।

দীপক। গাছের পাশ থেকে একটা ছোকরা বেরিয়ে এল না ?

সাধনা। ওই হয়ত ইসারায় ডাকছিল। কিন্তু তা শুনে আপনার বোন কেন এগিয়ে এল ?

দীপক। সাধনা দেবী !

সাধনা। কি হোলো ? দীপকবাবু ?

দীপক। আপনাদের বাড়ীতে রিভলবার কি বন্দুক আছে ?

সাধনা। সে কি ! বৈষ্ণবের বাড়ীতে মুর্গীর প্রত্যাশা ?

দীপক। ছোরা, সাবল, নিদেন একগাছা মোটা লাঠি ?

সাধনা। কি দরকার বলুন ত।

দীপক। ওই ছোকরাকে আমি চিনি।

সাধনা। ওই ফুট ফুটে ছেলেটি ?

দীপক। ও মুসলমান।

সাধনা। তার জন্যেই কি বলচেন ও আপনাদের শত্রু।

দীপক। ওরই উপদ্রবে আমাদের দেশ ছেড়ে চলে আসতে হয়েচে।

সাধনা। কিন্তু আপনার বোন কেতকীর হাব ভাব দেখে ত বোঝা যাচ্ছে না—সে ওকে শত্রু মনে করে।

দীপক। তবে আর বলছিলাম কি !

সাধনা। ওরা এই দিকেই আসচে। চলুন আমরা ওই গাছগুলোর পাশে গিয়ে বসি, শুনি—ওরা কেন এমন গোপনে মেলা-মেশা করচে।

দীপক। নিজের কানে তাই শুনতে হবে ?

সাধনা। পরের কানে যারা শোনে, পরের চোখে দেখে, তাদের ঠকতে হয়।

দীপক। কিন্তু ও যে আমার বোন।

সাধনা। আমারও। ছেলেটিও আমার ভাই। শোনাই যাক্ ওরা কি বলতে চায়। আসুন। ভাববেন না। আড়িপাতায় মেয়েদের অভ্যেস আছে, সরে পড়বার ঠিক সময়টি তারা বোঝে।

দীপককে টানিয়া লইয়া বাঁ দিকের ঝোপের বেঞ্চিতে বসিল। কেতকী জাহাঙ্গীরকে লইয়া অগ্রসর হইল

কেতকী। কইবার যা আছে ফিস্ ফিস্ কইর‍্যা কও, চিল্লাইয়োনা।

জাহাঙ্গীর। কইতে চাই একটি মাত্র কথা।

কেতকী। তাই কও।

জাহাঙ্গীর। চল আমার সঙ্গে।

কেতকী। পাকিস্তানে ?

জাহাঙ্গীর। সেখানে যেতে না চাও, আর কোথায় যাবে তাই বল।

কেতকী। তোমার লগে ক্যাম্নে যাই !

জাহাঙ্গীর। কেন যেতে পারবে না ?

কেতকী। তুমি যে মোছলমান।

কেতকী প্লাটফর্মের উপর বসিল

জাহাঙ্গীর। সে কথা কি আজ নতুন করে জানলে ?

কেতকী। না।

জাহাঙ্গীর। তবে ?

জাহাঙ্গীর কেতকীর পাশে বসিল

কেতকী। অরা সগগোলে কয় মোছলমান আর হিন্দু এক হইতে পারে না।

জাহাঙ্গীর। ওরা ত বলবেই। ওরা ত আমাকে ভালোবাসে না। ভাল যারা বাসে না, ভালোবাসতে যারা জানে না তারা কোন মানুষের সঙ্গে কোন মানুষের মিলন সইতে পারে না। আগে বল, তুমি আমাকে ভালোবাস কিনা ?

কেতকী। ভালোবাসি।

জাহাঙ্গীর। আর একবার।

কেতকী। ভালোবাসি! ভালোবাসি!

জাহাঙ্গীর। দুবার বল্লে কেন?

কেতকী। একশ'বার কমু।

জাহাঙ্গীর হাসিয়া উঠিল

বাঃ রে! হাসতে আছে ক্যান্?

জাহাঙ্গীর। একটু আগে বলেছিলে - এক কথা কতবার কমু? এখন বলচ, একশবার কমু ভালোবাসি! এরপর হাজার বার বলেও তৃপ্তি পাবেনা।

কেতকী। ও। তুমি মস্করা করতে আছ!

জাহাঙ্গীর। না, ঠাট্টা করচি না, যা হয়ে থাকে তাই বলচি। ভালোবাসা এমনই তাজ্জব ব্যাপার কেতকী, যাকে ভালোবাসা যায়, অবিরাম তার কানে কানে বলতে ইচ্ছে করে, ওগো, আমি তোমায় ভালোবাসি, ভালোবাসি, ভালোবাসি।

বলিতে বলিতে তাহাকে বাহু পাশে টানিয়া লইল

দীপক। এখনো এখানে বসে ওই দেখতে হবে?

সাধনা। না, আর এখানে থাকা উচিত নয়।

তাহারা উঠিয়া দাঁড়াইল

জাহাঙ্গীর। কি ভাবচ কেতকী?

কেতকী। শতেকবারে না শোনলেও বোঝন যায়—ভালোবাসা সাচা কি মিছা।

জাহাঙ্গীর। কেমন করে?

কেতকী। চক্ষের দিকে চাইলেই তা বোঝন যায়।

জাহাঙ্গীর। আমার চোখের দিকে চেয়ে চেয়ে বলত—আমি তোমাকে কতখানি ভালোবাসি?

কেতকী। দুর! লাজ লাগে না?

নিজেকে মুক্ত করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল

সাধনা। বসুন দীপকবাবু, একটা সুযোগ কেটে গেল।

দীপক। এখুনি কি ছেড়ে দেবে?

সাধনা। টেনে নিয়ে যেতে চাইলে বাধা দেবেন। বসুন।

তাহারা আবার বসিল। জাহাঙ্গীর কেতকীর কাছে গিয়া কহিল

জাহাঙ্গীর। আমার বুকে মাথা রেখে একটুকাল না হয় আমার চোখের দিকে চেয়েই থাকতে।

কেতকী। এই খোলা মাঠে?

জাহাঙ্গীর। এখানে ত কেউ নাই।

কেতকী। ক্যান্, আকাশের ওই চাঁদ?

জাহাঙ্গীর। ভালোবাসার কথা তবে থাক্। প্রমাণ হয়ে গে তুমি আমাকে ভালোবাস। এখন বাকী কথাগুলো......

কেতকী। যা কইবা, ওই ঝোপের ভিতরে যে বেঞ্চি আছে, তাই বইয়া কইবা, চল।

জাহাঙ্গীর। বেশ তাই চল।

তাহারা ঝোপের দিকে অগ্রসর হইল

সাধনা। উঠুন! এবার ওরা বিপজ্জনক এলাকায় পা বাড়াচ্ছে।

দীপক। কিন্তু আমার হাতে যে কোন রকম একটা অস্ত্রও নেই।

সাধনা। আপনি আসুন আমার সঙ্গে।

তাহারা ঝোপ হইতে বাহির হইল

কেতকী!

দীপক। জাহাঙ্গীর!

কেতকী ও জাহাঙ্গীর ফিরিয়া দাঁড়াইল। কেতকী দুই হাতে ঢাকিল।

জাহাঙ্গীর। দীপকদা।

দীপক। তুমি আমাকে আর দাদা বলোনা।

জাহাঙ্গীর। ছেলেবেলা থেকে তাই যে বলে আসচি, দীপকদা।

সাধনা। এস কেতকী, আমার কাছে এস।

কেতকী। দাদা মারবে।

সাধনা। না, না মারবেন কেন? তুমি এস।

বলিয়া নিজেই গিয়া তাহাকে কাছে টানিয়া লইল

আগে ওদের বলবার কথা ওরা বলে ফেলুক, তারপর হবে আমা আলাপ। কেমন?

কেতকী মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইল, সাধনা তাহাকে লইয়া প্লা ফর্মে বসিল, প্লাটফর্ম হইতে দূরে একদিকে রহিল দীপক—অপর দি জাহাঙ্গীর।

দীপক। তুমি এখানে চোরের মত লুকিয়ে কেন এসেচ, জাহাঙ্গী

জাহাঙ্গীর। লুকিয়ে আসিনি।

দীপক। লুকিয়ে আসনি! এত রাতে, সবার যখন ঘুমোবার ক তখন তুমি এসেচ। চুপি চুপি কেতকীকে ডেকে এনেচ এইখানে ভেবেছিলে আর কেউ এখানে নেই।

জাহাঙ্গীর। কেতকীকে যে কথা বলতে চাই, তা বলবার সু কিছুতেই পাচ্ছিলাম না।

দীপক। কেতকীকে যা বলেচ, তা আমি শুনিচি।

জাহাঙ্গীর। আমি এখনো কেতকীর কাছ থেকে তার কোন জবা পাইনি।

দীপক। সেই কুৎসিত প্রস্তাবের জবাব কেতকী দেবে না, দে আমরা।

উপদ্রবে আমরা পাকিস্তান ছেড়ে চলে এলাম। তুমি পিছু-পিছু এলে। কেন এলে?

জাহাঙ্গীর। আপনিই বলুন দীপক-দা, আপনারা অপ্রসন্ন হবেন জেনেও কেন আমি এতদূর ছুটে এলাম; আসতে পারলাম?

দীপক। তোমার পাপ-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করবার জন্য।

জাহাঙ্গীর। পাপ! ভালোবাসা পাপ দীপক-দা?

দীপক। ভালোবাসার কথা তুমি বোলো না।

জাহাঙ্গীর। আপনি ত শুনেছেন কেতকী আমাকে ভালবাসে, আমি কেতকীকে ভালোবাসি।

দীপক। কেতকীর কথা তোমার মুখ থেকে শুনে চাই না।

জাহাঙ্গীর। বেশ, কেতকীই বলুক।

সাধনা। কেতকী বলছে দীপক বাবু, সে জাহাঙ্গীরকে ভালোবাসে।

দীপক। তবে পাকিস্তানে থাকতে কেতকী কেন বলত—জাহাঙ্গীর পথের মোড়ে, ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে থেকে নিত্য উপদ্রব করে:

জাহাঙ্গীর। তা বলতে আমিই শিখিয়ে দিয়েছিলাম, দীপক-দা।

দীপক। কেন?

জাহাঙ্গীর। নইলে আপনারা ওর ওপর উপদ্রব করতেন।

সাধনা। কেতকী বলছে দীপকবাবু, জাহাঙ্গীরের এ-কথা মিথ্যে নয়।

দীপক। এত মিছে বলতে শিখেছে কেতকী।

কেতকী উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল

কেতকী। মিছা কথা আমি কই নাই।

দীপক। তবে যাস্‌নি কেন চলে জাহাঙ্গীরের সঙ্গে?

কেতকী। যাইতাম…যদি—

দীপক। যদি যেতিস্, জানতাম মুসলমান জাহাঙ্গীর তোকে জোর করে ধরে নিয়ে গেছে!

সাধনা। সেইটেই কি সান্ত্বনার বিষয় হোতো, দীপকবাবু?

দীপক। সান্ত্বনা পেতাম না, শুব্ধ হয়ে থাকতাম—যেমন শুব্ধ হয়ে আছি অসংখ্য নারী-হরণের খবর পেয়ে।

জাহাঙ্গীর। হরণ যদি করতে চাইতাম, কেতকীকে নিয়ে পাকিস্তান ত্যাগ করে চলে আসবার সুযোগ আপনারা পেতেন না। আর আমাকেও আজ দেখতে পেতেন না আপনাদের এই হিন্দুস্থানে।

দীপক। এটা হিন্দুস্থান নয়।

জাহাঙ্গীর। তাই শুনতাম। কিন্তু যে কারণে আপনি আমাকে দূরে ঠেলে দিতে চাইচেন, তা ত নিছক হিন্দুয়ানি। কেতকী না-বালিকা নয়। স্বামী নির্ব্বাচনের স্বাধীনতা তার আছে। আমিও প্রাপ্ত-বয়স্ক। আমি কেতকীকে বিয়ে করতে চাই। কোন্ যুক্তির জোরে আপনি বাধা দিতে পারেন?

দীপক। তুমি মুসলমান।

দীপক। তখন সমস্যাটা এ-ভাবে দেখা দেয়নি; তাই তা উপেক্ষা কর হোতো।

সাধনা। আজ সমস্যা সমাধানের সময় যখন এসেচে, তখনো যে জবরদস্তি করতে চাইছেন দীপক বাবু?

দীপক। জবরদস্তি!

সাধনা। জাহাঙ্গীর তা বলেনি; কিন্তু বলতে পারে।

দীপক। কি বলতে পারে জাহাঙ্গীর।

সাধনা। জাহাঙ্গীর বলতে পারে—একজন হিন্দু যুবক যদি কেতকীর ভালোবাসা পেত, তাহলে তার সঙ্গে কেতকীর বিয়েতে আপনি আপত্তি করতেন না; কিন্তু মুসলমান জাহাঙ্গীর সে ভালোবাসা পেয়েচে বলে বিয়েতে আপত্তি করচেন, ওদের ভালোবাসার কোন মূল্যই দিতে চাইচেন না। এতে কোন যুক্তি নাই, দীপক বাবু।

দীপক। জাহাঙ্গীরের সঙ্গে কেতকীর বিয়ে হতে পারে না।

জাহাঙ্গীর। কেন দীপক-দা? আমি মূর্খ নই, এম-এ পাশ করিচি; আমি কুৎসিত নই আপনি দেখতে পাচ্ছেন; আমি গরিব নই তাও আপনার জানা আছে। তবে বিয়েতে বাধা কি?

দীপক। বাধা তোমার ধর্ম্ম। কেতকী তার ধর্ম্ম ত্যাগ করতে পারে না।

জাহাঙ্গীর। ধর্ম্ম আমি ত্যাগ করব, কি কেতকী ত্যাগ করবে, সে বোঝা-পড়া হবে আমাতে-কেতকীতে, আপনাতে আমাতে নয়।

দীপক। কেতকী আমার বোন, আমি তার অভিভাবক, আমি তাকে তার ধর্ম্ম ত্যাগ করতে দোব না।

জাহাঙ্গীর। কেতকী যদি নিজের ইচ্ছায় তার ধর্ম্ম ত্যাগ করে?

দীপক। তোমাকে দূরে তাড়িয়ে দিলে ও আর কোন কারণে ধর্ম্ম ত্যাগ করবার কল্পনাও মনে ঠাঁই দেবে না।

জাহাঙ্গীর। কিন্তু আমি যখন ওকে ভালোবাসি, তখন আমি দূরে থাকব কেন? আর একজন হিন্দু যুবকের মতো সকল রকমে যোগ্য হয়েও আমি যদি না ওকে বিয়ে করবার বৈধ অধিকার পাই, তাহলে বাধ্য হয়েই আমাকে অবৈধ উপায় অবলম্বন করবার কথা ভাবতে হবে।

দীপক। এইত তোমার স্বরূপ বেরিয়ে পড়ল। অবৈধ কাজের প্রতি, বল-প্রয়োগের প্রতি, তোমাদের একটা অসঙ্গত ঝোঁক রয়েচে বলেই ত আমাদের সমাজ অঙ্গনে তোমাদের ঠাঁই দেওয়া যায় না।

জাহাঙ্গীর। যা বৈধ ভাবে, সহজ ভাবে, পাওয়া যায় না, অথচ যা না পেলে জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবে, মানুষ তা অবৈধ ভাবে, বল-প্রয়োগ করেও, পেতে চায়। আপনিই ভেবে দেখুন, স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়ে আপনি কি একদিনও ভেবেছিলেন কোন কাজটা বৈধ, কোনটা অবৈধ। সিভিল ডিসওবিডিয়েন্স যে অবৈধ ছিল, ডিসওবিডিয়েন্স কথাটাই তার প্রমাণ। আর বিয়াল্লিশের বিপ্লব যে অহিংস

জাহাঙ্গীর। আপনি যেমন সারা মন দিয়ে স্বাধীনতা চেয়েছিলেন, আমিও তেমন সারা মন দিয়ে কেতকীকে কামনা করি। আপনি আপনার কামনার জিনিষ পাবার জন্য বৈধ অধিকারে বঞ্চিত হয়ে অবৈধ কাজ করতেও সঙ্কুচিত হন নি। আমিই বা তা হব কেন?

দীপক। স্বেচ্ছায় না হও, তোমাকে মেরে সঙ্কুচিত করতে হবে।

জাহাঙ্গীর। একা আমি যে অধিকার চাইছি, আপনারা অনেকে মিলে আমাকে মেরে তা থেকে বঞ্চিত রাখতে পারেন, আমি জানি। কিন্তু অনেকে যখন এই অধিকার পেতে চাইবে তখন?

দীপক। তখনকার কথা তখন ভাবব।

জাহাঙ্গীর। তখন ভাববার অবসর পাবেন না। নোয়াখালির ঘটনার সময় ভাবতে পারেন নি, পাঞ্জাবের হত্যাকাণ্ডের সময় পারেন নি, আবারও পারবেন না। ভারত ইউনিয়নে মুসলমান নগণ্য মাইনরিটি বলে ভাবচেন আর বিপদের ভয় নেই। কিন্তু বৈধ-অধিকার থেকে কেবল ত মুসলমানকেই বঞ্চিত রাখেন নি আপনারা। আপনাদের সম্প্রদায়ে যাদের অবনত রাখা হয়েচে, উন্নতির সুযোগ যাদের দেওয়া হয় নি, তারা যেদিন এই সামাজিক সাম্যের দাবী নিয়ে দাঁড়াবে, সেদিন কি সে দাবী উপেক্ষা করতে পারবেন?

দীপক। তারা তা দাঁড়াবে না। যদি দাঁড়ায় জানব তোমাদেরই ষড়যন্ত্রের ফলে তা দাঁড়িয়েচে।

সাধনা। না, না, দীপকবাবু ষড়যন্ত্রের অপেক্ষা তা করে না। অনেক আগে যদুকুল-পুরাঙ্গনাদের পাবার দাবী নিয়ে দাঁড়িয়েছিল আভীররা। তারা বলপূর্ব্বক তাদের কেড়ে নিয়েছিল।

জাহাঙ্গীর। এক দেশে, এক সমাজে, বস-বাস করব; একই অর্থনৈতিক নিয়মে নিয়ন্ত্রিত হব; অথচ সামাজিক সকল অধিকার সমানে পাব না, এ ত হতে পারে না দীপক-দা। মুসলমান যখন সমতার দাবী তোলে, আপনারা তখন বলেন তৃতীয় পক্ষের উস্কানার ফলেই সে তা করে; অনুন্নতরা যখন দাবী তোলে, তখন বলেন— আপনাদের সমাজে ভাঙ্গন ধরাবার জন্য মুসলমান তাদের উস্কে দেয়। একবারও এ-কথাটি ভেবে দেখেন না যে, তৃতীয় পক্ষ কেন মুসলমানকে উত্তেজিত করবার সুযোগ পায়, কেন মুসলমান আপনাদের সম্প্রদায়ের অনুন্নতদের দলে টানবার কথা ভেবে কাজ করতে পারে? আজ তৃতীয় পক্ষ চলে গেছে বলে মনে ভাববেন না—সামাজিক সমতার দাবী চাপা পড়ে গেছে। আজ বরঞ্চ এ কথা বোঝবার সময় এসেচে যে, নতুন রাষ্ট্র যত উন্নত হবে, ততই প্রবল হয়ে উঠবে এই দাবী, যা অপূর্ণ রাখলে রাষ্ট্র ভেঙে পড়বে।

সাধনা। জাহাঙ্গীর!

জাহাঙ্গীর। বলুন।

সাধনা। তর্কে প্রতিপক্ষকে স্তব্ধ রাখবার জন্য এ-সব কথা বলচ, কিন্তু এ-সব কথা ত তোমাদের সম্প্রদায়ের সকল শিক্ষিতের মুখে শুনতে পাই না।

জাহাঙ্গীর। শিক্ষার যদি কোন মূল্য থাকে, স্বাধীনতার যদি কোন মূল্য থাকে, তাহলে একদিন অবশ্যই শুনতে পাবেন—যদি না আপনারা কানে তুলো দিয়ে কালা হয়ে বসে থাকেন।

দীপক। তুমি এখান থেকে চলে যাবে কিনা বল।

জাহাঙ্গীর। তা নির্ভর করচে কেতকীর জবাবের উপর।

সাধনা। কেতকী, তুমি কি জাহাঙ্গীরকে বিয়ে করতে চাও।

কেতকী। তা ক্যামনে করুম!

দীপক। পেলে কেতকীর জবাব?

জাহাঙ্গীর। তুমি আমাকে বিয়ে করতে পার না, কেতকী?

কেতকী। হিন্দুর মাইয়া আমি মোছলমানকে ক্যামনে বিয়া করুম।

দীপক। বাস! জাহাঙ্গীর, আর তোমার এখানে থাকবার অধিকার নেই। তুমি চলে যাও। এখুনি।

সাধনা। দাঁড়ান দীপকবাবু, একটা কথা আমি জানতে চাই। কেতকী, আমি শুনেচি তুমি বলেচ জাহাঙ্গীরকে তুমি ভালোবাস।

কেতকী। ভালোবাসিনা তা ত এখনও কই নাই।

সাধনা। ভালোবেসে লাভ কি হবে যদি না বিয়ে কর?

কেতকী। মোছলমানকে যখন ভালোবাইস্যা ফেলছি, তখনই লাভের আশা ছাইড়্যা দিছি; কাইন্দা মরছি কাইন্দ্যা কাইন্দ্যাই মরতে হইব।

সাধনা। কেঁদে কেঁদে মরতেও রাজী আছ, তবু বিয়ে করতে রাজী নও?

কেতকী। না।

সাধনা। কেন?

কেতকী। শিবঠাকুরের মাথায় জল ঢালতে পারুম না, তুলসীতলায় দীপ দিতে পারুম না, মা-ভগ্নীরে বরণ করতে পারুম না।

সাধনা। ও সব নাই বা করলে।

কেতকী। ও সব ছাড়ুম যদি মাইয়াছাইলা হইয়া জন্মাইলাম ক্যান্

সাধনা। বিয়ে যদি না করতে চাও, তাহলে জাহাঙ্গীর তোমার সঙ্গে আর দেখা করবে না।

কেতকী। দেখা কইর্যা আর লাভ কি হইব?

সাধনা। তুমি ওকে ভুলতে পারবে?

কেতকী। পাকিস্তান ছাইড়্যা আইস্যাও আর ভুলতে পারি নাই।

দীপক। কেন মিছে আর যুক্তির জালে ওকে জড়াতে চাইছেন? হিন্দুর মেয়ে ও, হিন্দুর সংস্কার ছাড়তে পারবে না।

সাধনা। আমিও ত হিন্দুর মেয়ে।

দীপক। আপনি যদি সংস্কারমুক্ত হয়ে থাকেন, আপনিই কেন

দীপক। জাহাঙ্গীর, আমার বোনের ওপর ভর না করে চেষ্টা করেই ভাখনা কেন, এই বিদূষীকে ভালবাসতে পার কিনা।

জাহাঙ্গীর। ওঁর অপমান করবেন না, দীপকবাবু।

সাধনা। দীপকবাবু মনে করেন—দেশ-সেবক উনি যখন দেশ-ত্যাগ করেচেন, তখন দেশের সকলেরই অপমান করবার অধিকার উনি অর্জ্জন করেচেন।

দীপক। আপনিও মনে করেন দিনকয়েকের জন্য যখন আমাদের আশ্রয় দিয়েচেন, তখন আমাদের নিয়ে পরিহাস করবার, আমাদের পারিবারিক ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবার অধিকারও আপনি পেয়েচেন।

সাধনা। ঘর ছেড়ে বাইরে আসবার ফলে আপনার পারিবারিক সমস্যাটি সামাজিক সমস্যা হয়ে উঠেচে দীপকবাবু। ঘরে থেকে আপনি যা ইচ্ছে তাই করতে পারতেন, আমরা কেউ কথা কইতে যেতাম না কিন্তু ঘরের বাইরে এসে আপনি যা করবেন, তা নিয়ে কথা বলবার অধিকার আমাদের আছে বৈকি!

দীপক। তা হলে মনের সাধ মিটিয়ে জাহাঙ্গীরের সঙ্গে কথা বলুন। চলে আয় কেতকী!

দীপক খানিকটা আগাইয়া গেল। কেতকী পায়ে পায়ে

জাহাঙ্গীরের কাছে গিয়া দাঁড়াইল

কেতকী। কি করুম, কওনা তুমি।

জাহাঙ্গীর। দাদা যা বলেন, তাই কর।

কেতকী। তুমি আমারে জোর কইরা লইয়া যাইতে পারনা?

জাহাঙ্গীর। না। যদি পারতাম, অনেক আগেই নিতাম জোরের দরকার আমার নয়, তোমার। তোমার মনে জোর নেই। তাই তোমাকে, আর তোমাকে ভালোবেসেচি বলে আমাকেও, দুঃখই পেতে হবে। অবশ্য তুমি যদি ভালোবেসে থাক।

দীপক। কেতকী!

জাহাঙ্গীর। যাও, তোমার দাদা ডাকচেন

কেতকী। দাদাও ডাকতে আছে, যমও ডাকতে আছে। যমের ডাকই মানতে হইব। গঙ্গায় ডোবন ছাড়া আমার আর গতি নাই।

জাহাঙ্গীর। ডোববার মতো মেয়ে যদি তাহলে ভালোবাসার অগাধ জলেই ডুব দিতে। তুমি পুঁটি মাছ, ওপরে ভেসে ভেসে চোখে চমক লাগাতে চাও, গভীরে ডুবতে জাননা।

সাধনা। কেতকীকে তুমি ভুল বুঝো না, জাহাঙ্গীর। ওর ভালোবাসা মিথ্যে নয়। কিন্তু তা যতখানি সত্য তার চেয়ে অনেক বেশী সত্য ওর কাছে ওর সংস্কার, নিজের ধর্ম্মের ওপর ওর মায়া। ভালোবাসার তাগিদে ও সংস্কার বর্জ্জন করতে চাইলে না, ধর্ম্মত্যাগের কল্পনাকেও মনে স্থান দিতে পারল না। অধিকাংশ মানুষই তা চায় না,

সাধনা। একাকার আর সামাজিক সমতা এক কথা নয়। হিন্দু জানত—একাকার যে সমতা আনে, তা বেশী মানুষের স্বাধীনতাকে বলপূর্ব্বক খর্ব্ব করে। কি করে বেশী মানুষকে বেশী স্বাধীনতা দিয়ে সামাজিক সাম্য আনা যায়, তাই ছিল হিন্দুর বিচার্য্য।

জাহাঙ্গীর। তাই কি মুসলমানকে সে পীড়ন করতে চেয়েছে, অবহেলা করেচে, উপেক্ষা করেচে?

সাধনা। মুসলমানকে পীড়ন করবার অবসর বা সুযোগ হিন্দু ত কখনো পায়নি, জাহাঙ্গীর। মুসলমান এলো দেশ জয় করতে। দেশ জয় করে সে রাজ্য গড়ল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করল। হিন্দু কোথাও কোথাও কখনো কখনো স্বাধীনতা ফিরে পাবার চেষ্টা করলেও মোটের ওপর মুসলিম-রাজকে মেনেই নিল। তারপর এলো ইংরেজ। ইংরেজ আমলে দেশের রাজনীতিক আর আর্থনীতিক কর্ত্তৃত্ব হিন্দুর হাতেও গেল না, মুসলমানের হাতেও রইল না। দু'পক্ষই দাসত্ব বরণ করে নিল। ইংরেজ কখনো হিন্দুকে মাতিয়ে, কখনো মুসলমানকে তাতিয়ে, আর সব সময়েই সাধারণ মানুষকে দাবিয়ে রেখে শাসন ও শোষণের সুবিধে করে নিয়েছিল। তোমাদের দুর্দ্দশার দায়িত্ব হিন্দুর ত কোনদিনই ছিল না, জাহাঙ্গীর।

দীপক আগাইয়া আসিয়া কহিল

দীপক। তুই এখনো এখানে দাঁড়িয়ে রইলি, কেতকী!

সাধনা। ওদের একটু সময় দিতে হবে না। চলুন, আপনি আমার সঙ্গে আমাদের বৈঠকখানায় গিয়ে কিছুক্ষণ বসবেন।

দীপক। না, আপনি জাহাঙ্গীরকেই নিয়ে যান। ওকেই বলবার অনেক কথা হয়ত আপনার মনে জমে উঠেচে।

সাধনা। আর কারু মুখ দিয়ে এমন কথা বেরুলে ভাবতাম তা অভিমানের প্রকাশ।

দীপক। আমি বাস্তুহারা বলেই বোধ করি মনে করেন আমার যখন মান নেই, তখন অভিমানও থাকতে নেই।

সাধনা। আছে নাকি? বাঁচালেন!

দীপক। কেন?

সাধনা। দেশ-সেবকের উচ্চতর স্তর থেকে সাধারণ মানুষের পর্য্যায়ে নেমে এলেন দেখে। জীবনে দুঃখ থাকে, দায়িত্বও থাকে, কিন্তু তার জন্য দিবারাত্র দেহ-মন-প্রাণ শুকনো নীরস রাখা কোন কাজের কথা নয়, দীপকবাবু। অবিচার হচ্ছে, অত্যাচার হচ্ছে মনে করে করে সমস্ত মানুষের ওপর যদি সর্ব্বক্ষণ রাগ করেই থাকবেন, তাহলে মানুষের সমাজে বাস করবেন কেমন করে? অত্যাচার মানুষেই করে, মানুষেই করে তার প্রতিকার। প্রতিকার করতে হলে সব সময়ে কঠোরই হতে হয় না, প্রীতিও ঢেলে দিতে হয়।

দীপক। সেইজন্যেই কি হিন্দুর মেয়ে কেতকীকে উৎসাহিত

সাধনা। আমাকে জানবার অনেক আগে, আমার উৎসাহের অপেক্ষা না রেখে, কেতকী জাহাঙ্গীরকে ভালোবেসেছিল। আপনিই বলেছেন, সেই ভালোবাসাকে উপদ্রব মনে করে আপনারা পাকিস্তান ত্যাগ করেছেন। আমি শুধু জেনে নিলাম—কেতকী জাহাঙ্গীরকে ভালোবাসে কিনা।

দীপক। যখন বুঝলেন কেতকী জাহাঙ্গীরকে ভালোবাসে, তখন চাইলেন যে কেতকী জাহাঙ্গীরকে বিয়েই করুক।

সাধনা। ভেবেছিলাম তাই করাই উচিত। কিন্তু দেখলাম তা করতে কেতকীর সংস্কারে বাধে।

দীপক। সংস্কারও বর্জ্জন করতে উপদেশ দিলেন?

সাধনা। না, তা দিইনি; ও পারবে না বুঝেই সে উপদেশ দিইনি। জাহাঙ্গীর জানতে চাইল, হিন্দু যদি সংস্কার ছাড়াতে না পারে, তাহলে সামাজিক সাম্য কেমন করে প্রতিষ্ঠা পেতে পারে? আমি তাকে বোঝাচ্ছিলাম, কেবল হিন্দুই নয়,—হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, জৈন, পার্সী, শিখ কেউ সহজে সংস্কার ছাড়তে চাইবে না। সকলে একদেশে বাস করে বলেই যে পরস্পরের বৈবাহিক সম্বন্ধ ছাড়া সাম্য প্রতিষ্ঠা পাবে না, পেতে পারে না, হিন্দু তা মনে করে না।

জাহাঙ্গীর। হিন্দু কি মনে করে, তাই যে আজও পর্য্যন্ত বোঝা গেল না।

সাধনা। অবিরাম রেগে থাকলে বুঝবে কি করে, ভাই? তুমি আর দীপকবাবু, দুজনাই সমস্যার জালে জড়িয়ে পড়েছ। তোমরা দুজনাই নবীন, দুজনাই শিক্ষিত। সমস্যা সমাধানের দায়িত্বও তোমাদেরই। কিন্তু কি করে তা করা যায়, স্থির হয়ে তোমরা তা ভেবে দেখবে না। তুমি বলবে—এই-ই আমি চাই, দীপকবাবু বলবেন—খবরদার, এদিকে হাত বাড়িয়ো না! তোমার পেছনেও লোক আছে, দীপকবাবুও একক নন। অনিবার্য্য ফল মারামারি কাটাকাটি। একদেশে বাস করে অনন্তকাল আমরা মারামারি কাটাকাটিই করব? যদি তাই করি, তাহলে আমাদের স্বরাষ্ট্র গৌরবের বস্তু হয়ে ওঠবার অবকাশ পাবে না, স্বাধীনতাও হবে বিপন্ন।

জাহাঙ্গীর। বলতে চান, আমাদের সাম্যের অধিকার ত্যাগ করেও স্বরাষ্ট্রকে আমরা গৌরবের বস্তু করে তুলব?

দীপক। কোন মানুষই তা তোলে না।

সাধনা। সেই কথাই ত বলছিলাম। বলছিলাম সম-অধিকার আর একাকার এক নয়। একাকার কেবল হতে পারে অনেক মানুষের অনেক অধিকার খর্ব্ব করে। যাদের ধর্ম্ম প্রচারমূলক, যারা সাম্রাজ্যবাদী, তারাই মানুষের অধিকার খর্ব্ব করতে চায়; বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ছল-চাতুরী করে যেখানে তা পারে না, সেখানে তারা বল-প্রয়োগ করে। তাই ত মানুষের ইতিহাসে ধর্ম্ম আর সাম্রাজ্য মানুষকে যুগে থাকতে দেওয়া। ধর্ম্ম চাইবে না বল প্রয়োগে ধর্ম্মান্তরিত করতে, রাষ্ট্র চাইবে না মানুষকে জোর করে একই ছাঁদে গড়ে তুলতে। ধর্ম্ম আর রাষ্ট্রের চেয়ে মানুষ বড়। মানুষই ধর্ম্ম আর রাষ্ট্রকে নিজের প্রয়োজনে ভাঙে, গড়ে, আবাহন জানায়, বিসর্জ্জন দেয়। হিন্দু কখনো ধর্ম্মান্তরিত করবার দিকে ঝোঁক দেয়নি, সাম্রাজ্যবাদকে কামনার বিষয় করে নেয়নি। বৈষম্যের ভিতরেও যাতে সাম্য প্রতিষ্ঠা পায়, তারই জন্য নিজের সমাজকে বর্ণাশ্রমের ভিত্তিতে গড়ে তুলতে চেয়েছে, সমাজকে চেয়েছে যতদূর সম্ভব রাষ্ট্র-নিরপেক্ষ রাখতে। মানুষে মানুষে বিরোধ যাতে না বৃদ্ধি পায়, মানুষের স্বাধীনতা যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, তারই দিকে লক্ষ্য রেখে হিন্দু মানুষের চলবার পথ রচনা করতে চেয়েছে।

জাহাঙ্গীর। হয়ত চেয়েছে, কিন্তু পারেনি।

সাধনা। পারেনি বল-প্রয়োগের প্রতি আস্থাবান, একাকারে বদ্ধপরিকর, ধর্ম্ম-প্রচারক আর সাম্রাজ্যবাদীদের উপদ্রবে। আজ যখন সাম্রাজ্যবাদ হীনবল হয়ে পড়ছে, ধর্ম্মান্ধতা থেকে মানুষ যখন মুক্তিলাভ করছে, তখন বল-প্রয়োগে একাকারের কল্পনা কেন আমরা ত্যাগ করব না? প্রণয়াসক্ত কোন হিন্দু-মুসলমান ছেলে-মেয়ের বিয়ে এক কথা, আর সামাজিক-সমতার দাবী তুলে বল-প্রয়োগে নারী সংগ্রহের কল্পনা ভিন্ন কথা। প্রথমটা কোন সম্প্রদায়ের অস্তিত্বকে বিপর্য্যস্ত করে না, দ্বিতীয়টা করে। তাই তাকে বিরোধের সঙ্গত কারণ বলা হয়। সামাজিক সাম্য চাই বলে হিন্দু বা মুসলমান তার হিন্দুত্ব কি ইসলামকে তার ট্র্যাডিশন, তার কালচার তার জীবন-দর্শন ত্যাগ করে আর সবার কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলতে চাইলে—না হবে তার কল্যাণ, না হবে মানুষের কল্যাণ

জাহাঙ্গীর। হিন্দুর এই জীবন-দর্শনের জন্যই ত আমাদের পাকিস্তানের পরিকল্পনা করতে হয়েছে।

সাধনা। না, জাহাঙ্গীর, তা হয়নি। পাকিস্তান পরিকল্পনার পিছনে রয়েছে একাকারের প্রবৃত্তি। তারও পিছনে রয়েছে প্রচারধর্ম্মী মন, সাম্রাজ্যবাদী মন, নিজের প্রভুত্ব দিয়ে অপরের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করবার মন। হিন্দু কিন্তু হিন্দুস্থান চায় নাই। হিন্দু চেয়েছে মুসলমান সম-অধিকার নিয়ে তারই সঙ্গে বস-বাস করুক, তার জন্মগত অধিকার ভোগ করুক। সাড়ে চার কোটী মাইনরিটি উপেক্ষার নয়। মুস্লিম লীগের শক্তি তারাই বৃদ্ধি করেছিল। বৈষম্যের মাঝেও সাম্য সম্ভব, এ অভিজ্ঞতা তাদের নেই। তারা গোলযোগ সৃষ্টি করবার সামর্থ্যও রাখে। হিন্দু এ-সব জানে। তবুও হিন্দু একাকার চায় না বলে এই মাইনরিটিকে অগ্রাহ্য করেনি, একে পাকিস্তানে পাঠিয়ে দিতে চায়নি। সে জানে এই বৈষম্যের মাঝে সাম্যের প্রতিষ্ঠা এনে যদি কোনদিন সে শান্তি স্থাপন করতে পারে, তাহলে পৃথিবীব্যাপী মানুষে

কল্যাণের সম্ভাবনা রয়েচে। দেশের প্রদীপ্ত দীপকরা, জাহাঙ্গীররা, সাধনা কেন তা আজ বুঝবে না ?

অবনী প্রভাবতীকে আনিয়া কেতকীকে দেখাইয়া কহিল

অবনী। এইবার চাইয়া ভাখ। বিশ্বাস ত করতা না।

প্রভাবতী। হাচা কইছ ত! ওই ত আমাগোর কেতী। বলি ও পোড়ারমুখী কেতী!

বলিতে বলিতে প্রভাবতী আগাইয়া আসিল

সারা রাইত ধইরা এই বাগানে কি করতে আছিলিরে? ওমা! হাছেম আলির পোলাডা না?

অবনী। তবে আর কইতাছিলাম কি!

দীপক। খুড়িমা, কেতকীকে তুমি এখান থেকে নিয়ে যাও।

প্রভাবতী। ক্যান্? আমি নিয়া যামু কিসের লাইগ্যা? তুই অর মায়ের প্যাটের ভাই। তুই সামে থাইক্যা বোনেরে আসনাই করতে দিতাছিস মোছলমানের লগে, আর আমারে দেইখ্যা কইতাছিস, খুড়িমা কেতীরে লইয়া যাও! ক্যান্, আমি লইয়া যামু ক্যান্? আমার কি দায় পড়চে!

অবনী। তুমি কি কইতাছ গিন্নী! দীপু যদি তার বোনেরে মোছলমানের হাতে তুইল্যাই দিতে চায়, আমরা কি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তাই দেখুম? কেতীরে তুমি লইয়া যাও, চুলের গোছা ধইর্যা টানতে টানতে লইয়া যাও। দীপুরে আমরা পঞ্চায়েত বসাইয়া শাসন করুম। আর ওই মোছলমানের পোরেও, হঃ, অর সামে দাঁড়াইয়া অর মুখের উপরই কইয়া দিতাছি, অরেও আমরা ছাড়ুম না। আগোর লাইগ্যা দেশ-ভুঁই খোয়াইলাম, অখন জাত-ধর্ম্মও খোয়ামু না কি? লও অরে টাইনা। প্যাটে ধর নাই, মানুষ করছ ত!

প্রভাবতী আগাইয়া গিয়া কেতকীর গালে ঠোনা মারিতে মারিতে কহিল

প্রভাবতী। চল্, চল্ মুখপুড়ী, ঢেম্নী-মাগী, চল্ আমার লগে, চল্।

সাধনা। ও কি করচেন আপনি! অমন করে ওকে মারচেন কেন?

প্রভাবতী। বেশ করতাছি গো, বেশ করতাছি। তুমি রা কাইড়ো না। চল্, চল্ হারামজাদী। তুমি সংয়ের মতোন পাড়া আছ ক্যান্। দিয়া দাও ছু-বা ওই মোছলমানের পোরে। নিজে না পার অগোরে ডাক।

অবনী। অ কার্ত্তিক! কার্ত্তিক রে ভাই। কাণ্ডটা একবার দেইখ্যা যা।

প্রভাবতী। যাইয়া অখনো দাঁড়াইয়া। চল্, চল্ আমার লগে!

তাহাকে ঠেলিতে ঠেলিতে লইয়া চলিল

অবনী। আমি কাত্তিকরে, মোহইন্তারে, পরাইণ্যারে ডাইক্যা লইয়া

অবনী। ডাকুম না! মোছলমান আইয়্যা ঘরের মাইয়্যা বাইর কইয়া লইয়া যাইব, আর আমি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তাই দেখুম? অরে কার্ত্তিক, মোহইন্তারে! আগাইয়া আয়রে, দেইখ্যা যা!

বলিতে বলিতে অবনী চলিয়া গেল

সাধনা। দীপক বাবু, ওদের গিয়ে শান্ত করুন। একি অকারণ হট্টগোল!

দীপক। আমি যাচ্ছি। আপনি জাহাঙ্গীরকে আপনার বৈঠকখানায় নিয়ে যান।

দীপক চলিয়া গেল

সাধনা। জাহাঙ্গীর, তুমি ভাই এস আমার সঙ্গে। এমন অকারণে ওরা উত্তেজিত হয়ে ওঠে!

জাহাঙ্গীর। তবুও আপনারা বলবেন—সম্প্রদায় হিসেবে হিন্দু মুসলমানের চেয়ে উর্দ্ধতর স্তরে উঠেচে।

সাধনা। সে আলোচনা পরে করব জাহাঙ্গীর। তুমি এখন এস আমার সঙ্গে।

অনেকে। মার! মার ব্যাটারে!

আরো কয়েকজন। কুকুর ঠ্যাঙ্গান ঠ্যাঙ্গা অরে!

লাঠী, লোহার ডাণ্ডা, কুড়ুল লইয়া কার্ত্তিকের দল প্রবেশ করিল

সকলে। মার! মার!

কার্ত্তিক জাহাঙ্গীরকে মারিবার জন্য আঘাত হানিল

সাধনা। না, না!

লাঠীর আঘাত সাধনার মাথায় পড়িল

আ-আ!

আর্ত্তনাদ করিয়া সাধনা মাটিতে পড়িয়া গেল। দীপক ছুটিয়া আসিল

দীপক। কি করলে কার্ত্তিক দা! কাকে মারলে তুমি!

ভিড় ঠেলিয়া দীপক সাধনার কাছে বসিয়া পড়িল

সাধনা দেবী। সাধনা দেবী। কি সর্ব্বনাশ করলে তুমি, কার্ত্তিকদা!

কার্ত্তিক হাতের লাঠী ফেলিয়া দিল

অনেকে। অরে পালা, সব পালা। দাঁড়াইয়া থাকলে হাতে দড়ি পড়ব।

যেমন বেগে আসিয়াছিল, তেমন বেগেই চলিয়া গেল।

কার্ত্তিক। তাইত এ আমি কি করলাম!

ঝোপের ভিতর হইতে অবনী কহিল

অবনী। ঠিকই করচ। এইবারে তোমারে পুলিশে ধরাইয়া দিমু। তারপর দেখুম রাইমণি কোথায় যায়।

ঝোপ হইতে চুপি চুপি বাহির হইয়া চলিয়া গেল

কার্ত্তিক। আমি আনতাছি।

দীপক। থাক্! তোমাকে কিছু করতে হবে না!

কার্ত্তিক। পালামু না দীপু. আমি কইতাছি আমি পালামু না। তুমি কও আমি জল আনি, কও যদি বুক চিইরা রক্ত ঢাইল্যা দি!

দীপক। তুমি চুপ কর কার্ত্তিক দা।

জাহাঙ্গীর। হাসপাতালে নিয়ে চলুন দীপকদা।

দীপক। ওর বাবাকে যে খবর দিতে হবে।

কার্ত্তিক। আমি পারুম না। সেই বুইরা অন্ধরে কইতে পারুম না তার যে—মাইয়্যা আমাগোরে আশ্রয় দিল্. সেই মাইয়্যার মাথায় আমি লাঠী মারছি।

জাহাঙ্গীর। চোট হয়ত বেশী লাগেনি দীপক দা।

দূরে প্রভাত-ফেরীর গান শোনা গেল

দীপক। একি ভোর হয়ে গেল! এখুনি সবাই এসে পড়বে। ওর বাবাকে ডেকে আন জাহাঙ্গীর! ওই বাড়ী। মহিমবাবু বলে ডাকবে!

জাহাঙ্গীর উঠিল

কার্ত্তিক। ভাখ দীপু ভাই. চাইয়া ভাখ চোখ মেইল্যা চাইতা আছেন।

জাহাঙ্গীর পুনরায় বসিল

দীপক। না, না, ওঠবার চেষ্টা করবেন না।

সাধনা উঠিতে উঠিতে কহিতে লাগিল

সাধনা। প্রভাত ফেরীর দল এগিয়ে আসচে, বাবাকে হাত ধরে নিয়ে আসতে হবে। আমাকে ধরে দাঁড় করিয়ে দিন।

দীপক। আপনি আহত।

সাধনা। ও কিছু নয়। আমার এই হাতখানা ধর জাহাঙ্গীর।

দীপক। আপনাকে হাসপাতালে যেতে হবে।

সাধনা। এই পরম মুহূর্ত্তে?

দুইজনের সাহায্যে উঠিয়া দাঁড়াইল

এই পরম মুহূর্ত্তে এই শুভ অনুষ্ঠান ত্যাগ করে আমি স্বর্গেও যেতে চাইনা, দীপকবাবু। আমাকে ওই মঞ্চে বসিয়ে দিন। ওই ওরা এসে পড়ল। বাবাও আর বেশীক্ষণ ঘরে থাকতে পারবেন না। দাশু ব্যায়রাকে নিয়ে তিনিও এখুনি এসে পড়বেন। আমাকে বসিয়ে দিন···বসিয়ে দিন।

দীপক। এ যে আমাদের দিয়ে অমানুষিক কাজ করিয়ে নিচ্ছেন আপনি।

সাধনা। অনেক অমানুষিক কাজ করেচেন আপনারা। আজই তার শেষ হোক্, শেষ হয়ে যাক, আজকার এই শুভ প্রভাতে। এই পরম মুহূর্ত্তে ওই পতাকা না তুলে কোন কারণেই এখান থেকে এক পা নড়ব না আমি। অনেক হৈ-চৈ করেছেন আপনারা। একটুকাল দাঁড়াইয়া থাকিতে না পারিয়া বাড়ীর দিকে যাইতে যাইতে ডাকিতে লাগিল:

দীপক। মহিমবাবু! মহিম বাবু!

সাধনা। জাহাঙ্গীর ভাই, দীপকবাবুকে চুপ করে থাকতে বলো।

জাহাঙ্গীর বাড়ীর দিকে গেল।

কার্ত্তিক। আমি কি করুম। এই পাপের প্রাচিত্তির করুম ক্যামনে?

কার্ত্তিকের গায়ে হাত রাখিয়া সাধনা কহিল:

সাধনা। চুপ করে বসে থেকো।

কার্ত্তিক। যখন দেখলাম লাঠীর আগায় হাচেম আলির পোলাডা নাই, আপনে তারে আগলাইয়া দাঁড়াইয়া আছেন, তখন আমি হাত ঘুরাইয়া লইতে চাইছিলাম।

সাধনা। তাই তুমি নিয়েছিলে কার্ত্তিক, নইলে আমার মাথাটা দু ফাঁক হয়ে যেত। খুব বেশী লাগেনি।

দীপক দুয়ারে আঘাত দিতে দিতে ডাকিতে লাগিল।

দীপক। মহিমবাবু! মহিমবাবু!

দুয়ার খুলিয়া মহিমবাবু দাশু বেয়ারাকে আশ্রয় করিয়া বাহির হইলেন।

মহিম। এই যে ভাই আমি এসেচি। সাধনা!

দাশু। তিনি ওই যে বসে আছেন।

মহিম। নিয়ে চল আমাকে তার কাছে।

দাশু তাহাকে লইয়া অগ্রসর হইল

দীপক। মহিমবাবু!

মহিম। সাধনার কথা বলবে ত!

দপীক। হ্যাঁ। তিনি—

মহিম। রাত থাকতে থাকতেই এসে বসে আছে?

দীপক। না, না, তা নয় মহিমবাবু। তাঁর শরীরটা—

মহিম। আজকার এই উৎসবটা শেষ না হলে শরীরের দিকে দৃষ্টি দেবার কথা ও কানে নেবে না। রাত শেষ হবার আগে এসে বসে আছে। থাকবেই ত। অন্ধ না হলে আমিও এসে বসে থাকতাম। একটু একটু করে অন্ধকার সরে যাচ্ছে, আর একটু একটু করে আলো ফুটে উঠচে, নব-যুগের আলো, নব-জীবনের আলো, নব-সৃষ্টি সূচনার আলো। দেখতে পাচ্ছিনা, বুঝতে পারছি।

দাশু। এই যে দিদিমণি এইখানে।

মহিম। সব আয়োজন ঠিক্-ঠিক্ হয়েচে, মা?

সাধনা। হয়েচে, বাবা।

দীপক। ব্যর্থ! ব্যর্থ সব আয়োজন।

সাধনা। তাই যদি মনে করেন দীপক বাবু

মহিম। পতাকাটি এমনই সময় তুলতে হবে মা, যাতে করে সূর্য্যের প্রথম রশ্মিটি তাতে পড়তে পারে।

সাধনা। তাই হবে বাবা।

প্রভাত ফেরীর দল প্রবেশ করিল।

মহিম। ওদের বলে দাও মা, ঠিক কখন জাতীয়-সঙ্গীত গাইতে হবে।

সাধনা। ওরা তা জানে, বাবা।

মহিম। প্রার্থনা করতে হবে স্বাধীনতা দিবসের এই নতুন আলো আমাদের মনের সব অন্ধকার দূর করুক, সব কলুষ নাশ করুক।

সাধনা। হ্যাঁ, বাবা, তাই হবে আজকার একমাত্র প্রার্থনা।

মহিম। কি হয়েচে মা? মনে হচ্ছে তোর কথা যেন অনেক দূর থেকে ভেসে আসচে। মন বুঝি ছুটে গেছে অনাগত ভবিষ্যতের পানে।

হাত বাড়াইয়া সাধনাকে স্পর্শ করিলেন।

এই ত কাছেই রয়েচিস, মা। কখনো দূরে থাকিসনি। আমি কাজে নেমেছি, তুই পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিস; আমি জেলে গিয়েচি, তুই আমার কাজের ভার কাঁধে তুলে নিয়েছিস, তারপর তুইও জেলে গিয়েছিস। একি মা! তুই কাঁদচিস্! তোর চোখের জলে আমার হাত ভিজে যাচ্ছে।

দীপক। চোখের জল নয় মহিমবাবু, ও রক্ত, রক্ত!

মহিম। রক্ত! গাল বেয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়চে!

কার্ত্তিক। আমারে মাইর‍্যা ফেলেন কত্তা, আমিই লাঠী মারছি।

মহিম। তুমি! লাঠী মেরেচ! লাঠী মেরেচ আমার মায়ের মাথায়, যে তোমাদের আশ্রয় দিয়েছিল। দীপক! এসব কি দীপক! তোমাদের তখন পুলিশে না দিয়ে আশ্রয় দিয়েচি—

অনিমেষ অগ্রসর হইয়া কহিল

অনিমেষ। পুলিশ আমি নিয়ে এসেচি।

মহিম। অনিমেষ! দাও এদের সব ধরিয়ে। আমার মেয়ের মাথায় লাঠী মেরেচে! ওদের পুলিশে ধরিয়ে দিয়ে চল সাধনাকে নিয়ে আমরা হাসপাতালে যাই।

অনিমেষ। ওই যে ইন্‌সপেক্টার রায় তার লোকজন নিয়ে এসে পড়েচেন।

মহিম। সব কটাকে বেঁধে ফ্যাল ইন্‌সপেক্টার। কাউকে ছেড় না, কাউকে না।

ইন্‌সপেক্টার। দেখুন ত তখন আত্মীয় বলে কাছে রেখে দিয়ে কী কাণ্ড বাধালেন।

মহিম। ভুল করেছিলাম ইন্‌সপেক্টর, আমি স্বীকার করচি আমি ভুল করেছিলাম। এখন তুমি তোমার কাজ কর। অনিমেষ, সাধনাকে নিয়ে চল।

অবনী। ওই খুনে কাত্তিকডা করল হুজুর, আমি হাচা কথা কইতাছি হুজুর।

অনিমেষ। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওই লোকটা, পাকা ক্রিমিন্যাল ও।

অবনী। আর হাছেম আলির ওই পোলাডা হুজুর। অরেও বাইধ্যা ফেলুন হুজুর। আমাগোর মাইয়্যা ছিনাইয়া লইবার লাইগ্যা পাকিস্তান হইতে পিছু লইছে হুজুর।

ইন্‌সপেক্টার। বল কি!

অবনী। হাচা কথা কইতাছি হুজুর।

মহিম। অনিমেষ চল আমরা সাধনাকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে যাই, হাসপাতালে যাই। সাধনা!

সাধনা। তুমিও বাবা, এই পরম মুহূর্ত্তটিও, তুমিও বিফলে যেতে দেবে বাবা!

মহিম। ওরে তোকে যে বাঁচাতে হবে।

সাধনা। এখুনি সূর্য্য উঠবে। তুমি অনুমতি দাও আমি পতাকা তুলি। গাও তোমরা মুক্তির গান।

প্রভাত-ফেরীর দল জাতীয় সঙ্গীত গাহিল

মহিম। না, না গান তোমরা গেয়োনা। অনিমেষ, ওকে জোর করে ধরে নিয়ে চল।

অনিমেষ। সাধনা, এ পাগলামো তুমি করো না সাধনা।

দীপক। যা সত্যিই সার্থক হয়নি তাকে সার্থক বলে প্রমাণ করবার এ দুশ্চেষ্টা আপনি করবেন না, সাধনা দেবী।

মহিম। ব্যর্থ! সবই ব্যর্থ হয়ে গেল যখন, তখন আর এ উৎসব কেন, সাধনা?

সাধনা। কি ব্যর্থ হলো বাবা? স্বাধীনতা? তা কখনো ব্যর্থ হয়?

মহিম। বিভক্ত ভারত এই স্বাধীনতাকেও ব্যর্থ করে দিল, মা। পারলাম না ত শান্তিতে এই উৎসব পালন করতে। এল বাস্তুত্যাগীরা তাদের দুঃখ নিয়ে, তাদের অভিযোগ নিয়ে...এল অহেতুক হিংসা তীক্ষ্ণ নখর বিস্তার করে।

অনিমেষ। সঙ্গে সঙ্গে এলো এক লম্পট মুসলমান তার দুর্ব্বার লালসা নিয়ে হিন্দুর মেয়েকে তাড়া করে।

সাধনা। তবু এই পনেরোই আগষ্ট তারিখের এই পরম মুহূর্ত্তটিতে আমি জাতীয় পতাকা উত্তোলন করচি এই বিশ্বাস নিয়েই যে, নব-লব্ধ স্বাধীনতা আমাদের যে শক্তি দেবে, তার জোরে সকল অকল্যাণকে আমরা দূর করতে পারব। আজ সকলের সব অবিশ্বাস দূর করবার জন্য পূর্ণ প্রত্যয় নিয়ে কবি-গুরুর এই বাণীই কণ্ঠে তুলে নোব যে,—"মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্য্যন্ত রক্ষা করব। আশা করব মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘ-মুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্ম্মল আত্মপ্রকাশ হয়ত আরম্ভ হবে এই পূর্ব্বাচলের সূর্য্যোদয়ের দিগন্ত থেকে। আর একদিন অপরাজিত মানুষ নিজের

উদয়শিখরে জাগে মাভৈঃ মাভৈ রব

নবজীবনের আশ্বাসে।

জয় জয় জয় রে মানব-অভ্যুদয়

মন্দ্রি উঠিল মহাকাশে।

জয় জয় জয় রে মানব-অভ্যুদয়, জয়…জয়—জয়রে—

বলিতে বলিতে সাধনা ঘুরিয়া লুটাইয়া পড়িল

অনিমেষ। সাধনা!

ছুটিয়া গিয়া তাহাকে ধরিল

দীপক। সাধনা দেবী!

ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখিতে লাগিল

মহিম। কি হোলো অনিমেষ? আমার মা—আমার সাধনা—

দীপক। শেষ। সব শেষ।

মহিম। শেষ? কী শেষ বলচ তুমি! শেষ? আমার সাধনা—শেষ! না, না; শেষ নয়! শেষ নয়! শেষ হতে পারে না। এইমাত্র আমার মা—আমার সাধনা—আমাদের সকলকে শুনিয়ে বল্লে

জয় জয় জয়রে মানব অভ্যুদয়!

জাহাঙ্গীর। না,—না, সবই হয়ত শেষ হয়নি…ওঁর ঠোঁট নড়চে, চোখের পাতা দুটি কাঁপচে…

কার্ত্তিক। ওই চোখ মেইল্যা চাইতাছেন দেবী!

ইন্‌স্‌পেক্টার। মহিম বাবু!

মহিম। কে?

ইন্‌স্‌পেক্টার। আসামীদের আমি এখন থানায় নিয়ে যেতে চাই।

মহিম। তুচ্ছ! তুচ্ছ কথা ইন্‌স্‌পেক্টার। হিংসা, দ্বেষ, হত্যা হানাহানি সবই এখন তুচ্ছ, তুচ্ছ। এই পরম মুহূর্ত্তের চরম কথা—মানব-অভ্যুদয়, মানব-অভ্যুদয়!

যবনিকা

মনুসংহিতা

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ

মনুসংহিতা হিন্দুর একটি সুপ্রসিদ্ধ ধর্মগ্রন্থ। মনুসংহিতার সমর্থনে বেদ বলিয়াছেন যে মনু যাহা কিছু বলিয়াছেন তাহা ঔষধের ন্যায় হিতকারী (১)। এই বাক্য বেদে চার স্থলে উল্লিখিত হইয়াছে (২)। শঙ্কর ও রামানুজ উভয়েই তাঁহাদের প্রণীত ব্রহ্মসূত্র ভাষ্যে এই বেদবাক্য উল্লেখ করিয়া মনুর মাহাত্ম্য খ্যাপন করিয়াছেন (৩)। রামানুজ বলিয়াছেন মনু নিজযোগ মহিমার দ্বারা ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার করিয়াছিলেন, জগতের যাবতীয় বস্তুর প্রকৃত-স্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং তাঁহার বাক্য নিখিল জগতের ভেষজস্বরূপ। মহাভারত বলিয়াছেন যে বেদ, পুরাণ, মনুপ্রণীত ধর্মশাস্ত্র এবং আয়ুর্বেদ শাস্ত্র অভ্রান্ত সত্য, যুক্তির দ্বারা ইহাদিগকে আঘাত করা উচিত নহে (৪)। মহাভারতে মনুসংহিতার বহু শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, মনুসংহিতা মহাভারতের পূর্বে রচিত, ইহা সর্ববাদিসম্মত। সুতরাং গীতায় যখন শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন যে কর্ত্তব্যবিষয়ে শাস্ত্রই প্রমাণ, তখন এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না যে গীতায় মনুসংহিতাকে প্রামাণিক বলা হইয়াছে। শ্রীরামচন্দ্র মনুসংহিতার দুইটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন যে তিনি ধর্ম অনুসারে কার্য্য করিতে বাধ্য, নিজের ইচ্ছামত কার্য্য করিতে পারেন না (৫)। বৃহস্পতি বলিয়াছেন মনুসংহিতার বিরুদ্ধ বাক্য থাকিলে অন্য স্মৃতিগ্রন্থের প্রশংসা করা যায় না, মনুসংহিতা স্মৃতির মধ্যে প্রধান; কারণ ইহাতে বেদের আদেশ উপনিবদ্ধ হইয়াছে (৬)। মনুসংহিতায় বলা হইয়াছে যে মনুর যাবতীয় বিধান

(১) যদ্ বৈ কিঞ্চ মনুঃ অবদৎ তৎ ভেষজম্।

(২) কাঠকসংহিতা ১১—৫৫; মৈত্রায়ণীয় সংহিতা ১—১-তৈত্তিরীয় সংহিতা ২—২—১০—২; তাণ্ড্য ব্রাহ্মণ ২৩—১৬—৭।

(৩) শঙ্কর ভাষ্য ২—১—১। রামানুজ ভাষ্য ২—১—২।

(৪) পুরাণং মানবো ধর্মঃ সাঙ্গোবেদশ্চিকিৎসিতং।
আজ্ঞাসিদ্ধানি চত্বারি ন হন্তব্যানি হেতুভিঃ॥

(৫) বাল্মীকি রামায়ণ, কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড ১৮ সর্গ ৩০, ৩১, ৩২, ৩৫ শ্লোক।

(৬) বেদার্থোপনিবদ্ধত্বাৎ প্রাধান্যং হি মনোঃ স্মৃতম্।
মন্বর্থবিপরীতা তু যা স্মৃতিঃ সা ন শস্যতে॥
তাবৎ শাস্ত্রাণি শোভন্তে তর্ক ব্যাকরণানি চ।

বেদানুযায়ী (৭)। এই সকল কথা আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে যাঁহারা বেদ মানেন, বা গীতা মানেন তাঁহাদিগকে মনুসংহিতাও মানিতে হইবে।

কিন্তু আধুনিক কালে অনেক হিন্দুর মনে মনুর বিধানগুলি ভাল কিনা এ বিষয়ে সন্দেহ হইতেছে। অনেকের মনে হইতেছে তাঁহার নিয়ম পক্ষপাতদুষ্ট এবং কর্কশ। যাহা বড়ই আশ্চর্য্য এবং হৃদয়হীন বলিয়া মনে হয়, যে ব্যক্তি দুঃখপ্রাপ্ত বা বিপদগ্রস্ত, মনু তাহার জন্য বিশেষরূপে কঠোর ব্যবস্থা দিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বিধবাদের সম্বন্ধে মনুর ব্যবস্থা আলোচনা করা যাউক। স্বামীর মৃত্যুতে যে রমণী অতিশয় কাতর, প্রত্যেক সহৃদয় ব্যক্তির তাহার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করা উচিত। সে যদি অন্য স্বামী লাভ করিয়া তাহার দুঃখ কথঞ্চিৎ বিস্মৃত হইতে পারে তাহা হইলে এ বিষয়ে তাহাকে সাহায্য করা উচিত। কিন্তু এইরূপ দুঃখক্লিষ্ট রমণীর জন্য মনু কি কঠোর ব্যবস্থা দিয়াছেন দেখুন। তিনি বলিয়াছেন যে বিধবা পুনরায় বিবাহ করা দূরে থাকুক, অন্য পুরুষের নাম পর্য্যন্ত গ্রহণ করিবে না (৮)। কেবল তাহাই নহে। সে আহার বিহারে সকলপ্রকার বিলাস বর্জন করিবে। এমন কি অল্প আহার করিয়া দেহ শুষ্ক করিবে। এ যেন মৃতের উপর খড়্গ প্রহার। মনু যদি যথার্থই জ্ঞানী ও উদারচেতা হন, তাহা হইলে তাঁহার ব্যবস্থায় এই অশোভন কঠোরতা কেন ?

আমার মনে হয় বেদ যে মনুর ব্যবস্থা সম্বন্ধে 'ভেষজ' শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন তাহা হইতে এই সমস্যার মীমাংসা পাওয়া যাইবে। কোনও ব্যক্তি রোগের কষ্টে ভুগিতেছে, চিকিৎসক তাহাকে তিক্ত বা অতিশয় বিস্বাদ ঔষধ প্রদান করেন, কষ্টকর ইঞ্জেক্‌শন্ প্রদান করেন, হয়ত অতিশয় ক্লেশদায়ক অঙ্গচ্ছেদ করেন। যে ব্যক্তি রোগের কষ্টেই কাতর, তাহাকে অনাবশ্যক অধিক কষ্ট প্রদান করা কখনই চিকিৎসকের উদ্দেশ্য নহে। তিনি জ্ঞানী। তিনি জানেন যে রোগ সারাইবার জন্য এই সকল কষ্টকর ব্যবস্থা প্রয়োজন। সেইরূপ মনু তাঁহার পরিপূর্ণ জ্ঞানময় দৃষ্টিতে দেখিলেন,—কেন এই রমণী বৈধব্য দুঃখে ক্লিষ্ট হইয়াছে ? সর্বশক্তিমান ভগবানের ন্যায় বিচারে কেহ অহেতুক দুঃখ পাইতে পারে না। এই রমণী পূর্ব জন্মে অন্যায় কর্ম করিয়া বৈধব্য লাভ করিয়াছে। অন্যায় কর্ম করিলে তাহার ফলে দুঃখভোগ অবশ্যই করিতে হয়। সেই অবশ্যম্ভাবী দুঃখভোগ যাহাতে শীঘ্র এবং সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ হয় এজন্য মনু ব্যবস্থা দিলেন যে রমণীটি স্বেচ্ছায় ব্রহ্মচর্য্য-ক্লেশ বরণ করিয়া লইবে। তাহাতে ইহজীবনে তাহার কিছু বেশী দুঃখভোগ হইতে পারে কিন্তু মৃত্যুর পর যে অনন্ত জীবন তাহা সুখময় হইবে। বিধবা পত্যন্তর গ্রহণ করিলে ইহজীবনে কিছু বেশী সুখ পাইতে পারে, কিন্তু রোগীর কুপথ্যের ন্যায় ইহাতে পরিণামে অধিক দুঃখ হইবে। এই কারণেই মনু বিধবার পত্যন্তর গ্রহণ নিষেধ করিয়াছেন। তিনি পুরুষ ছিলেন অতএব রমণীর দুঃখে তাঁহার সহানুভূতি ছিলনা, ইহা হইতেই পারে না। সাধারণ সাংসারিক ব্যক্তি ভগিনী বা দুহিতার দুঃখে কাতর হয়। মনু কি সাধারণ ব্যক্তি অপেক্ষা নিষ্ঠুর হইতে পারেন ? তাঁহার দৃষ্টি কত উদার তাহা তিনি মানব জীবনের যে লক্ষ্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা হইতেই বুঝিতে পারা যায়। তিনি বলিয়াছেন—সকল প্রাণীর মধ্যে আত্মাকে অনুভব করিতে হইবে, আত্মার মধ্যে সকল প্রাণীকে অনুভব করিতে হইবে (৯)। ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে জীবনের আদর্শ তিনি যে ভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছেন গীতা ও উপনিষদে সেই ভাবেই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে (১০)। বস্তুতঃ আধ্যাত্মিক সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া সকল প্রাণীর মধ্যে নিজ আত্মা অনুভব করিতে হইলে কিরূপ কর্ত্তব্য পালন করা উচিত, আচার কিরূপ হওয়া উচিত এই সকলের বিস্তারিত বিবরণ মনুসংহিতাতে পাওয়া যায়, গীতা বা উপনিষদে সে সকল বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় না, সংক্ষেপে উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন গীতায়

(৭) যঃ কশ্চিৎ কস্যচিৎ ধর্মো মনুনা পরিকীর্ত্তিতঃ।
স সর্বোঽভিহিতো বেদে সর্বজ্ঞানময়োহিসঃ ॥ মনুসংহিতা ২।৭

(৯) সর্বভূতেষু চাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি।
সমংপশ্যন্নাত্মযাজী স্বারাজ্যমধিগচ্ছতি ॥ মনু ১২।৯১

(১০) সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগ যুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ ॥ গীতা ৬।২৯

বর্ণাশ্রম ধর্মের সংক্ষেপে উল্লেখ আছে। মনু সদাচারের এবং সমাজ ব্যবস্থার যে বিস্তারিত বিবরণ দিয়াছেন তাহাও মনুর কল্পিত ব্যবস্থা নহে। বেদ হইতেই তিনি সেই সকল ব্যবস্থা সঙ্কলন করিয়াছিলেন। যিনি মনুর ব্যবস্থা মান্য করিবেন না তাঁহাকে বেদ বাহ্য বলিতে হইবে—তিনি বৈদিক বা সনাতন ধর্মের অন্তর্গত নহেন।

মনু বলিয়াছেন যে যেখানে রমণীর পূজা হয় সেখানে দেবগণ আনন্দিত হন, যেখানে রমণীর পূজা হয় না সেখানে সকল কর্ম নিষ্ফল হয়। (১১) পুনশ্চ তিনি বলিয়াছেন যে যেখানে রমণীগণ শোক করেন সেই কুল শীঘ্র বিনষ্ট হয়, যেখানে রমণীগণ শোক করেন না, সেই কুল শীঘ্র বর্দ্ধিত হয় (১২)। যাহারা ঐশ্বর্য্য কামনা করে তাহারা উৎসবের সময় রমণীদিগকে ভূষণ, বস্ত্র এবং খাদ্যের দ্বারা পূজা করিবে। স্ত্রীকে গৃহের লক্ষ্মীস্বরূপিণী বলা হইয়াছে। দুশ্চরিত্র রমণীর নিন্দা আছে।

(১১) যত্রনার্য্যস্তুপূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্বাস্তত্রা ফলাঃ ক্রিয়াঃ ॥ মনু ৩।৫৬
(১২) শোচন্তি জাময়ো যত্র বিনশ্যত্যাশু তৎ কুলম্।
ন শোচন্তি তু যত্রৈতা বর্দ্ধতে তদ্ধি সর্বদা ॥ মনু ৩।৫৭

বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক নীট্সে (Niet & sche) মনু সংহিতার প্রভূত প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন "জগৎকে মানুষ করতে হইলে হিন্দুদের নিকট উপায় শিক্ষা করা উচিত। বাইবেল বন্ধ কর, মনু সংহিতা খোল। * * মনু সংহিতার তুলনায় বাইবেল কত বিশ্রী! (Twilight of Idols p 46) "জীবনকে সমৃদ্ধিশালী করিবার শ্রেষ্ঠ উপায় মনু নির্দেশ করিয়াছেন। * * মনু সংহিতা মহত্ত্বপূর্ণ পদার্থ দ্বারা পরিপূর্ণ; ইহাকে শ্রেষ্ঠ ও নির্দোষ বলিয়া বোধহয়; ইহাতে জীবনকে পূর্ণ ভাবে স্বীকার করা হইয়াছে; সমগ্র পুস্তকটি যেন সূর্য্যকিরণে সমুজ্জ্বল। * * মনুসংহিতায় নারী সম্বন্ধে এত বেশী ভাল কথা বলা হইয়াছে, আর কোনও পুস্তকে বলা হইয়াছে বলিয়া আমার জানা নাই (Anti chsiet pp 214-15)।

পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে অনেকে মনুসংহিতার প্রতি বিদ্বেষ ভাব পোষণ করেন। পূর্বজন্মের মন্দ কর্মফল ক্ষালনের জন্য মনু বিভিন্ন স্থলে যে সকল কষ্টকর ব্যবস্থা দিয়াছেন তাহার তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া অনেকে মনুর অযথা নিন্দা করেন—বালক যেমন চিকিৎসকের উপর রাগ করে।

মা নিষাদ

শ্রীকালীপদ চট্টোপাধ্যায়

সম্প্রতি বিবাহ করিয়াছি। বিবাহ করার ইচ্ছা ছিল না। অভিভাবকের জুলুম আর নিজের একটা আশার দুর্বলতা মিলিয়া বিবাহ আমাকে করাইয়া ছাড়িয়াছে।

সুরমাকে কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছি না। আশা করিয়াছিলাম যে, বিবাহ করিলে তাহাকে অনেকটা—এমন কি, নববধূ ভাগ্যক্রমে নারীরত্ন হইলে, একেবারেই ভুলিয়া যাইতে পারি। নিজে দেখিয়া-শুনিয়া কন্যা পছন্দ করিয়াছি। বধূ রূপসী, নানাগুণে গুণবতী, বিদুষী। তিনি গাহিতে জানেন, নাচাইবার আয়োজন করিতে পারিলে নাচিতেও নাকি পারেন। প্রতি-হার মানিবে সন্দেহ নাই; তবু সুরমাকে ভুলিতে তো পারিতেছি না।

সুরমার সঙ্গে আমার প্রেম ঘটিয়াছিল। সে প্রেম এমন গাঢ় হইয়া উঠিয়াছিল যে, আমি তাহাকে বিবাহ করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম এবং আমার সহিত তাহার বিবাহ না হইলে সে বিষ খাইবে বলিয়া গোপনে আফিঙ সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিল।

কিন্তু, কুলে শীলে উপার্জনে এবং নাকি রূপে-গুণেও আমার চেয়ে যোগ্যতর অন্য এক পাত্রের সহিত পিতামাতা তাহার বিবাহ দিয়াছেন। ইহাতে তাহার নিজের মত,

নাই। স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাহাতে আপত্তি জানাইতে সুরমার নাকি লজ্জা করিয়াছে! পত্রে সে লিখিয়াছে, আপত্তি জানাইলেও নাকি কোন ফল হইত না। আরও সে লিখিয়াছে, আফিঙ খাইতে তাহার ইচ্ছা থাকিলেও সাহসের অভাবে তাহা অভুক্ত অবস্থায় কৌটাবন্দী ভাবে তাহার নিজের বাক্সেই পড়িয়া আছে। সর্বব্যথাহারী সেই অমৃত ভক্ষণ করিতে পারার মানসিক শক্তি সে নাকি ভগবানের কাছে নিরন্তর প্রার্থনা করিতেছে।

বিবাহের পরেও সুরমা নিয়মিতভাবে আমার নিকট পত্র লিখিতেছে; আমিও তাহার নিকট লিখিতেছি, সেই সব পত্রে আমি এমন ভাষা ব্যবহার করিতেছি যাহাতে তাহার স্বামী দেখিলে সহজেই মনে করিতে পারেন যে, ওসব তাহার কোন সখীর চিঠি। চিঠির শেষে একটি ছদ্ম নারীনাম ব্যবহার করিতেছি।

সুরমা আমার কাছে 'সরল' ভাষায় নিজ নামেই পত্র লিখিতেছিল। আমার বিবাহের পর হইতে ভ্রান্তিকরী ভাষায়, ছদ্ম পুরুষনামে লিখিতেছে—যাহাতে আমার বধূ অনায়াসে মনে করিতে পারে যে—পত্রগুলি আমার কোন বন্ধুর লিখিত।

বধূর নাম মাধুরী। কিন্তু তাহার অভ্যুদয় আমাকে মধুসিঞ্চনে অভিভূত করিতেছে কই! মাধুর্য তাহার যথেষ্টই আছে, কিন্তু তাহাতে অন্তরের যে দেখা মিলিতেছে না। অপরিচয়ের দিনে তাহার আমার মধ্যে যে সাগর প্রমাণ ব্যবধান ছিল, আজ মুখামুখী মিলিয়াও তো সেই দূরত্বের তিলমাত্র ঘুচিল বলিয়া মনে হইতেছে না। বুঝিলাম, আমার অন্তরের সংকীর্ণতাবশেই তাহা ঘুচিতে পাইতেছে না। সে নববধূ, তাহার সংকোচ সহসা কাটিবার নহে, সে নারী, কুহেলী তাহার আভরণ, কিন্তু 'মুদিত কমলকলিকাটি'র উপরে উদারতার সূর্যালোক-নিষেক করিতে আমি কি পারিতেছি? আমি তাহার কাছে অভিনয় করিয়া চলিয়াছি। অভিনয়ে বাহবা পাওয়া যাইতে পারে, অন্তর পাওয়া যাইতে পারে না। অতএব অপরাধ আমার। কিন্তু, কি করিব। আমি নিরুপায়—আমি সুরমাকে ভুলিতে পারিতেছি না

কেদারায় গা ঢালিয়া দিয়াছি। ডাকহরকরা আসিয়া মাধুরী দেবীর নামীয় একখানি পত্র দিয়া গেল। গোটা গোটা সুন্দর হরপে ঠিকানা লেখা। দেখিবামাত্র মনে হইল—মাধুরীর কোন বান্ধবীর চিঠি। কৌতূহল হইল। বান্ধবীর কাছে বান্ধবীর চিঠির স্বাদ কখনও পাই নাই—দেখাই যাক্‌না কি লিখিয়াছে। হয়তো চিঠিতে এমন দুইচারিটি মজার কথা পাওয়া যাইবে যাহা লইয়া মাধুরীর সঙ্গে কৌতুক করিয়া ছুটির দিনটি মধুর করিয়া তুলিতে পারিব। স্ত্রীর চিঠি স্বামী খুলিবে—তাহাতে কি আর শাস্ত্রে অপরাধ লেখা আছে?

খুলিলাম। চিঠিতো নয়—রহস্যের দ্বার! 'খুলিলাম' নয় তো—উদ্‌ঘাটন করিলাম! পরিষ্কারই জানিতে পারা গেল যে, মাধুরীও এক যুবককে ভালোবাসে, কিন্তু সেই যুবকের সহিত তাহার বিবাহ হইতে পারে নাই—কেননা, আমার সহিত হইয়াছে।

অভীক-নামক সেই তরুণ নিজের নাম গোপন করে নাই, ভাষায় কপটতার আশ্রয় গ্রহণ করে নাই, নিজ নামেই আপন মনের আবেগ ব্যক্ত করিয়াছে। লিখিয়াছে, মাধুরীকে সে যে ভালোবাসে এ সত্য নির্ভীক কণ্ঠে সে সারা পৃথিবীর আকাশে বাতাসে ঘোষণা করিতে পারে।

অনেকক্ষণ নিঝুম হইয়া বসিয়া রহিলাম। মনে খানিকটা জ্বালা অনুভব করিতে লাগিলাম, কিন্তু তাহার চেয়ে ঢের বেশি পরিমাণ স্বস্তিতে চিত্ত প্রশান্ত হইয়া উঠিল। মাধুরীর অপ্রকাশের ক্ষোভ আর আমার মনে রহিল না, তাহার নিকটে আমি আর অপরাধী রহিলাম না। জীবনের নাটমঞ্চে অপরিহার্য ভাগ্যক্রমে আমরা দুইজনে স্বামিস্ত্রীর ভূমিকা অভিনয় করিতেছি; রঙ্গমঞ্চের বাহিরে আমি অমুকচন্দ্র তমুক—সুরমা দেবীর প্রেমিক, আর, সে মাধুরী দেবী—অভীক-নামক যুবকের প্রেমিকা। ব্যস্‌, নিশ্চিন্ত হওয়া গেল, ভুলের পসরায় দাবির বেসাতি বহিয়া দুনিয়ার পথে পথে আর হাঁক পাড়িয়া গলায় রক্ত উঠাইতে হইবে না।

কি ভাগ্য যে চিঠির খামটি ছিঁড়িতে হয় নাই, অল্প আঠায় জোড়া খামের মুখ টান দিতেই খুলিয়া গিয়াছিল;

পরে হঠাৎ যেন মনে পড়িয়াছে এমনভাবে চিঠিখানি মাধুরীকে দিলাম। চিঠিখানা যথাসময়ে দিতে ভুলিয়া যাওয়ার অভিনয়টা আমি নিখুঁতভাবে করিতে পারিলাম।

চিঠি পাইয়া মাধুরীর কি অবস্থা হইল তাহা দেখিবার জন্য আমি আড়াল খুঁজিয়া উদ্‌ব্যস্ত হইলাম না; কাগজ কলম নিয়া বাহিরের ঘরে সুরমাকে চিঠি লিখিতে বসিলাম।

সুরমার চিঠি বরাবরই আমার অফিসের ঠিকানায় আসে। পরদিন অফিসে গিয়া তাহার পত্র পাইলাম। লিখিয়াছে, ঘটনাক্রমে নাকি জানিতে পারা গিয়াছে যে, তাহার স্বামীও অন্য একটি তরুণীকে ভালোবাসেন, সেই মেয়েকে বিবাহ করিতে না পারায় তিনি নিতান্তই অসুখী। তাঁহার এবং সুরমার অবাঞ্ছিত মিলনে নাকি অন্তরঙ্গতা ঘনাইতেছে না—ঘনাইবে এমন সম্ভাবনাও নাই।

সুরমা, তাহার স্বামী, মাধুরী, অভীক, আমি—আমরা যেন দেশজোড়া এক বিশৃঙ্খলগ্রন্থন শৃঙ্খলের এক জায়গায় কয়টি অমিল আংটা। তাহার এক দিকে—সুরমার স্বামী যে-যুবতীকে ভালোবাসেন, তাহার সহিত যে-যুবকের বিবাহ হইবে, সেই যুবক যে-তরুণীকে ভালোবাসে, তাহার সহিত হইবে আবার অন্য এক তরুণের বিবাহ, এবং সেই অন্য তরুণ আবার অন্য যে-মেয়েকে ভালোবাসে, সেই মেয়ে ভালোবাসে যে-ছেলেকে⋯। আর একদিকে অভীক বিবাহ করিবে এমন একটি মেয়েকে যে ভালোবাসে আর একটি তরুণকে এবং সেই তরুণের বিবাহ হইবে যে-যুবতীর সহিত, সেই যুবতী⋯⋯।

এই বিরূপগ্রথনে শৃঙ্খলটা যে শুধু কুরূপদর্শন হইয়াছে তাহাই নহে, অমিল আংটার অপরিহার্য সংঘর্ষে সারা শৃঙ্খল জুড়িয়া যে কর্কশ ধ্বনি উঠিয়াছে, দেশের আকাশ তাহাতে বধির, বাতাস বিধুর হইয়া উঠিল যে!

অধীনতায়, অবিচারে, অত্যাচারে জর্জরিত দেশের দাম্পত্য জীবনে তবু একটা শান্তি ছিল, তাহাও আজ তিরোহিত। সারা দিবসের কর্মক্লান্ত মনে রাতের নিঃশব্দ শান্ত গভীরতায় প্রিয়াকে বক্ষে পাইতে চাহিয়া যে মাধুরীকে [illegible]

করিয়া প্রাণহীন যান্ত্রিক দেহটাকেই সে শুধু আমার পাশে ফেলিয়া রাখিতেছে এবং প্রিয়কে বক্ষে পাইতে চাহিয়া যে-আমাকে মাধুরী কাছে পাইতেছে, সুরমার চিন্তায় নিয়োজিতপ্রাণ আমার যান্ত্রিক দেহটাই শুধু তাহার পাশে পড়িয়া থাকে।—পাশাপাশি পড়িয়া থাকে প্রাণময় দুইটি নরনারীর শয্যা জুড়িয়া নিষ্প্রাণ দুইটি দেহ। নরনারীর সংসারে কাজের বদলযন্ত্র চালায় প্রাণহীন দুইটি কলের যন্ত্রী। এই তো দশা ঘরে ঘরে।

জীবন-যুদ্ধ প্রতিষ্ঠার সাধনা। সে সাধনা মানুষের সাধনা—দেহের নয়—যন্ত্রের নয়। আফিঙের কৌটা বাক্সে রাখিয়াও সুরমা যেমন মরিতে পারিতেছে না, আমরাও তেমনি মরিতে না পারায় জীবনধারণ করিতে বাধ্য হইয়া যে সাধনা করিয়া চলিয়াছি, সে অপ্রতিষ্ঠার সাধনা। এদেশে আদি-কবির অভিশাপ লাগিয়াছে। ক্রৌঞ্চমিথুনের একটিকে হত্যা করার অপরাধে ব্যাধকে তিনি অপ্রতিষ্ঠার অভিশাপ দিয়াছিলেন। ক্রৌঞ্চমিথুনের মিলন ভঙ্গের বেদনায় তিনি মহাকাব্য রামায়ণ রচনা করিয়াছেন। রাম সেখানে ক্রৌঞ্চ, রাবণ ব্যাধ। রামায়ণের দেশে আজ কিন্তু প্রতিটি যুবক ক্রৌঞ্চ এবং অপর পক্ষে সে-ই ব্যাধ। আমি ক্রৌঞ্চ—সুরমা-ক্রৌঞ্চীকে হারাইয়া পাখা-ঝটপটাইয়া মরিতেছি, আবার আমি ব্যাধ—আমি অভীকের ক্রৌঞ্চীকে হরণ করিয়া আনিয়াছি। আমি রাম, সীতাহারা হইয়া সংসারের দণ্ডকারণ্যময় কাঁদিয়া বেড়াইতেছি, রাজারামের যান্ত্রিকতায় নিষ্প্রাণ স্বর্ণ-সীতাকে পাশে লইয়া অশান্তির ধূমাচ্ছন্ন যজ্ঞভূমে দুঃখের অনলে কর্তব্যের হোম করিতেছি; আবার আমিই রাবণ, সীতাহরণ করিয়া সবংশে মজিবার জো করিয়াছি। বিফল মিলনে যে বংশ বাড়িয়া উঠে, সার্থকতার আশীর্বাদ সে পাইবে কি করিয়া? মজিবার জন্যই তাহার বৃদ্ধি।

মজিব। না মজিয়া রক্ষা নাই। মেলামেশার আর প্রেম করার অবাধ অধিকার তরুণ তরুণীদের হাতে দিয়া, তাহাদের বিবাহ দেওয়ার অধিকার যে-দেশের অভিভাবকেরা পরম কার্পণ্যে লোহার সিন্দুকে তুলিয়া রাখিয়াছেন, সে-দেশের উপর সঞ্জীবনীর স্বর্ণকুম্ভ উপুড় করিয়া ধরিলেন

রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা কবিতা

শ্রীঅনিল বিশ্বাস

বড় কবি মাত্রেই যুগধর্মী। দান্তে নিজে না জানলেও ত্রয়োদশ শতকের প্রতিভূ, যেমন সেক্সপীয়র ষোড়শ শতাব্দীর। এঁরা নিজেদের সম্বন্ধে লিখতে কালের প্রভাব এড়াতে পারেন নি। রবীন্দ্রনাথেরও একই দশা। উনিশ ও বিশ শতকের ঘাত-প্রতিঘাতে তাঁর কাব্যের জমি তৈরি হয়েছে। প্রত্যেক যুগই যুগিয়েছে তার পলিমাটির উর্বরতা, যাতে সম্ভব হয়েছে বিচিত্ররঙা কাব্যের ফসল। Vitgeistএর এই প্রভাব তাঁর কাব্যে তাই অনস্বীকার্য। কাজেই 'আধুনিক' কবিতার জন্মদাতা হিসেবে রবীন্দ্রনাথের দানও স্মর্তব্য। 'আধুনিক কবিতা'র জন্ম পৃথিবীর সব জায়গায় প্রায় একই সময়ে। মার্কিণ দেশে হার্ট ক্রেণের সঙ্গে সঙ্গেই এর অভ্যুদয় ১৯২৭ সালে; ইংলণ্ডে ও বাংলাদেশে ১৯৩০এ। এর কারণ অবিশ্যি বিশ্ব-চিন্তাবিপ্লবের সমসাময়িকতা। এ তারিখগুলি কাব্যবিবর্তনের এক একটি উত্তুঙ্গ বিন্দু, যা দিগ্‌দর্শনের কাজ করে। কাব্যের নাড়ীতে যে স্পন্দন চলছিলো এ তারি সুধু প্রকাশ।

যুগে যুগে নতুন ভাবের আমদানি গ'ড়ে তোলে নতুন কবিতা। যে কবি এ গুলিকে রসমূর্তি দিতে পারেন, তিনিই সে-যুগের আধুনিক কবি। কাজেই মন ও সাম্প্রতিকে মিলেই কাব্যের কাল। রবিক কাব্য আলোচনা করলে দেখা যাবে তাঁর প্রভাব আধুনিক বাংলা কাব্যে কতটা। রবীন্দ্রনাথ মধ্যবিত্তমানসের সচ্ছলতার কবি। তাঁর বিশ্বাসের ম্যাজিনো লাইন উনিশ শতকের আবহাওয়ায় বেশ নির্বিঘ্নেই ছিল। বিশ শতকের প্রথম মহাযুদ্ধের বিস্ফোরণে এ উবে গেল—আর দেখা দিলো মধ্যবিত্ত সমাজের ভাঙন ধারা ও সংশয়ের অবকাশ। 'গীতাঞ্জলি'র সুরে তাই বেজে উঠলো—

জড়িয়ে গেছে সরু মোটা
দুটো তারে
জীবনবীণা ঠিক সুরে তাই
বাজে নারে।

এখানে জীবনবীণাই স্তব্ধ হ'য়ে গেছে। এতকাল সব পেয়েছির দেশে গজমোতি মিনারে কবি বিহার কচ্ছিলেন। কিন্তু বাস্তবের আঘাতে দুর্গের কাচের জানলা ভেঙে গেলো, আর কবি বাইরে তাকালেন। সেখানে "বন্ধহীন প্রবাহের প্রচণ্ড আঘাত লেগে, পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুফেনা উঠে জেগে।" এরি প্রতিধ্বনিতে বলাকা, পলাতকা ও শিশু ভোলানাথ মুখর। জগত ও জীবন নিয়ে সত্যিকার মুখোমুখি পরিচয় এখান থেকে সুরু হ'ল রবীন্দ্রনাথের।

আধুনিক কবিতায় লক্ষণীয় নতুন যুগের দৃষ্টিভঙ্গি। যন্ত্রের প্রসারে বিরাট ওলটপালট। মানুষও তার গণ্ডি ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে মানুষ হিসেবে। কিন্তু এই বিকাশের পেছনে আছে শত শত প্রশ্নের সমাধান। পরিশেষের প্রশ্নটি দেখা দিচ্ছে বিদ্রোহের ঝঙ্কারে—

যাহারা তোমার বিষায়েছে বায়ু, নিভায়েছে তব আলো,
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালো।

এই মানবিক স্বীকৃতিতেই আছে নতুনের ছাপ। এখানে রবীন্দ্রনাথ আর কোন আস্থায় জড়িয়ে থাকতে পাচ্ছেন না। বিশ্বাসের দুর্গ আজ চুরমার, আলোর জায়গায় সংশয়ের অন্ধকার। এই সুতীব্র ব্যথার দ্রাবকরসে তাই তার কাব্য হয়েচে সিক্ত। তিনি খুঁজেছেন তাদের—যারা "টানে দাঁড়, ধ'রে থাকে হাল, মাঠে মাঠে বীজ বোনে, পাকা ধান কাটে।" এই মাটির মানুষের প্রতি যে টান, তার মূলে আছে অবিশ্যি দরদী মনের বিহ্বলতা।

রাষ্ট্র ও সমাজের বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বাস রাখা খুবই কষ্টকর। তাই রবীন্দ্রনাথ আশ্রয় খুঁজেছেন মনঃসমীক্ষণের দুরূহ জটিলতায়। এর সার্থকতার দিকও আছে। যে কোন যুগে কাব্য রচনা একরকম অসম্ভব, যদি না কোন স্থায়ী বিশ্বাসের উপর এর কাঠামো রাখা যায়। বিশ্বাস হারানো যুগে কবিরা তাই খোঁজে মনস্তত্ব ও ধর্তাই বুলির তার কাটার বেড়া, যার আওতায় তাদের কাব্য গ'ড়ে উঠতে পারে। রবিক কাব্যে তাই দেখা যায় এদের বিচিত্র সমাবেশ। কথাগুলো কি ক'রে অবচেতন থেকে চেতনে পৌছায়, তারি প্রক্রিয়া মূর্ত হ'য়ে উঠেছে—

ছেড়ে আসে কোথা থেকে
দিনের বেলায় গর্ত
কারো আছে ভাবের আভাস
কারো বা নেই অর্থ।

মনঃসমীক্ষণের 'অবাধ অনুষঙ্গ' ও আধুনিক কবিরা তাদের কাব্যে ব্যবহার করেছেন। ইংরেজী সাহিত্যে এর অনেক নজির আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ টি, এস্, এলিয়টের Waste Landএর প্রথম কয়েক লাইন নেওয়া যেতে পারে। এর মজা হচ্চে এলোমেলো কতগুলো ফিল্মের চিত্র—একটার পর একটা সাজিয়ে রাখা হয় এখানে। মনে হয় যেন সিনেমা। উদ্দেশ্য অর্থাৎ ভাবের রস-রূপকে আরও গাঢ় করে তোলা। বস্তুতান্ত্রিক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও আছে এর। মানুষের জীবন কতগুলি আপাত বিসদৃশ চিত্রের সমষ্টি। কাজেই তাকে রূপ দিতে হলে চাই অনুরূপ চিত্রবিন্যাস। কাব্যের ভেতর তাই এসেছে বৈজ্ঞানিক সত্যপ্রিয়তা। রবীন্দ্রনাথ 'ছড়ায়' যখন বলেন—

নদীর পাড়ে কিচির-মিচির লাগাল গাঙশালিথ যে,
অকারণে ঢোলক বাজায় মূলা খেতের মালিক সে।
কাঁকুড় খেতে মাচা বাঁধে পিলেওয়ালা ছোকরা,
বাঁশের বনে কঞ্চি কাটে মুচি পাড়ার লোকরা।

আমরা ভাবি মুলো উপড়ানর সাথে পিলেওয়ালা ছোকরার বা মুচিপাড়ার লোকদের কি সম্বন্ধ। এ সত্যি পদ্ধের কিস্ম।

ওলটপালটের ধাক্কায় কোনো সুস্থ-সমাজ ব্যবস্থা বা রাষ্ট্রপরিকল্পনা গড়ে উঠতে পারে না। তার ফলে আধুনিক কবিতায় ব্যঙ্গের স্থান অল্পই। ব্যঙ্গ ঈশ্বর গুপ্তের রচনায় যতটা সার্থক হতে পেরেছিল, আধুনিক যুগে ততটা নয়। রবীন্দ্রনাথকে বাদ না দিলেও একটা কথা খাটে। রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁর বিশ্বাস তিনি শেষ পর্য্যন্ত রক্ষা করেছিলেন অতি কষ্টে, কারণ তাঁর মনে মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ। এরি ফলে ব্যাঙ্গের ছিটে ফেঁটা এখানে ওখানে তাঁর কাব্যে মিলে। গির্জ্জার পাদ্রিদের ব্যঙ্গ করে বলেছেন—

ঐ দলে দলে ধার্ম্মিক ভীরু
কারা চলে গির্জ্জায়
চাটুবাণী দিয়ে ভুলাইতে দেবতায়।
স্তূপাকার লোভ
বক্ষে রাখিয়া জমা।
কেবল শাস্ত্রমন্ত্র পড়িয়া
লবে বিধাতার ক্ষমা।

কিন্তু এ রকম ব্যঙ্গ খুব কমই। ঘৃণায় পরিণতি লাভ করেছে এ ব্যঙ্গ যখনি "রক্তমাখা দন্তপংক্তি, হিংস্র সংগ্রামের" কথা বলা হয়েছে—

সে লোভ রিপুরে
লয়ে গেছে যুগে যুগে দূরে দূরে
সভ্য শিকারীর দল পোষমানা শ্বাপদের মতো,
দেশ বিদেশের মাংস করেছে বিক্ষত।

কিন্তু আধুনিক পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথের কাব্যে ফুটে উঠেছে আত্মজিজ্ঞাসার প্রশ্নচিহ্ন—"আমার কীর্ত্তিরে আমি করি না বিশ্বাস।" কাজেই ব্যঙ্গ সার্থক হতে পারেনি।

আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির জন্য রবীন্দ্রলিরিকের হয়েছে এক নতুন পরিণতি। এত কাল তিনি যে আমিময় কাব্য লিখেছেন, তাতে নেই সংগ্রামের চিহ্ন। তিনি বলতে পেরেছিলেন,—

হৃদয় আমার নাচেরে
ময়ূরের মত নাচেরে।

কিন্তু সময়োত্তর যুগে এ গেলো একদম বদলে। তাঁর কবিতা হ'য়ে উঠলো বহির্মুখী। 'বলাকা' থেকে পরবর্তী সব কবিতাই প্রায় এই সাক্ষ্য বহন করছে। এর কারণ অবিশ্যি সুস্পষ্ট। লিরিকে চাই আত্মভোলা দায়িত্বহীনতা। কিন্তু আধুনিক যুগে সেটা সম্ভবপর নয়—ছিলেন ঐশী প্রেরণার কবি, কিন্তু "প্রান্তিকের" কবি আত্মসচেতন। তার কাছে কাব্য ভাব-রূপ রসকে মননের অবচেতনখানি থেকে উপরে আনার প্রয়োগ কৌশল। কাজেই এখানে হৃদয় আর ময়ূরের মত নাচতে পারে না। যে উর্ব্বশী দেখে এককালে রবীন্দ্রনাথ তার পদে তপস্যার ফল মেলে দিয়েছিলেন, তিনি আজ 'ক্লান্ত উর্ব্বশীর তালভঙ্গের' কথা মনে আনতে একটুও দ্বিধা বোধ করেননি। এর ফলে তার কাব্য হয়েছে অতিমাত্রায় মাংসল ও বহির্মুখী। এ যেন ঠিকরে পড়েছে গায়ে তার বিচিত্র ধনসম্ভার নিয়ে—

গঞ্জের টিনের চালা ঘরে
গুড়ের কলস সারি সারি,
চেটে খায় ঘ্রাণলুব্ধ পাড়ার কুকুর—
ভিড় করে মাছি।
রাস্তায় উপুড়মুখো গাড়ি;
পাটের বোঝাই ভরা,
একে একে বস্তা টেনে উচ্চস্বরে চলেছে ওজন
আড়তের আঙিনায়।

যে কাব্য সরস্বতী এতকাল বদ্ধ ছিল কুলতটিনীর আঙিনায় সে আজ ঘোমটা খুলে বেরিয়ে পড়েছে গ্রামের রাস্তায়।

বর্ত্তমান ব্যবস্থার অসুস্থতা দেখে কবিরা এর জন্যে ওষুধের ব্যবস্থা করেছেন। ইংরেজী সাহিত্যে W. H. Auden এদের অগ্রণী। রবীন্দ্রনাথেও আমরা এটা দেখতে পাই। চিতাভস্মের ভেতর দিয়েই নতুন যুগের সম্ভাবনা সম্ভব—

বীভৎস তাণ্ডবে
এ পাপ যুগের অন্ত হবে
মানব তপস্বী বেশে
চিতাভস্ম শয্যাতলে এসে
নবসৃষ্টির ধ্যানের আসনে
স্থান লবে নিরাসক্ত মনে
আজ সেই সৃষ্টির আহ্বান
ঘোষিছে কামান।

অথবা—
ভীষণ যজ্ঞে প্রায়শ্চিত্ত
পূর্ণ করিয়া শেষে।
নূতন জীবন নূতন আলোক
জাগিবে নূতন দেশে।

বৈদ্যের এই প্রেসক্রিপসন দরকার হ'য়ে প'ড়েছে। সমাজ বা রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় এর উপযোগিতা স্বীকৃত হোক বা না হোক—কাব্য যে এ নিয়েও সার্থক হয়েছে এইটাই বড় কথা কবির তরফ থেকে।

নতুন যুগের কাব্যে শুধু যে দৃষ্টিভঙ্গি থাকে তা নয়, তাতে দেখা যায় নতুন আঙ্গিকও। রবীন্দ্রনাথের 'পুনশ্চ' তাই খুলে দিয়েছে এক

সঙ্গে সঙ্গে দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি ও কাব্যের উপাদান হিসাবে গ্রাহ্য হয়েছে। তাকে রূপ দেওয়া ও সৃষ্টি করাতে চাই অনুরূপ ভাষা ও ছন্দ। এটা গতানুগতিক ছন্দোবন্ধে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তাই রবীন্দ্রনাথ বের করলেন এই গদ্যকবিতা। গদ্যও বটে, আবার আছে এতে পদ্যের সন্ধান। এক কথায় এটা গদ্য, কিন্তু রূপকল্পের দিক থেকে এ পদ্য। পদ্যে যেমন আছে পর্বপর্বাঙ্গ, এতে তেমনি আছে বাক্য ও বাক্যবিন্যাস। এদিক থেকে রবীন্দ্রনাথকে আধুনিক কবিতার পথিকৃৎ বলা চলে। এই গদ্য কবিতার জের চলেছে 'শেষসপ্তক', 'পত্রপুট', ও 'শ্যামলীতে'। গদ্য বা পদ্যের মাঝখানে আরও একটি ছাঁচ গড়ে উঠেছে, যাকে বলা যায় 'মুক্তক' (free verse) এগুলো পদ্যই বটে, তবে পদ্যের বন্ধন থেকে এরা মুক্ত। প্রত্যেক পংক্তি ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় পর্ব নিয়ে গঠিত। 'রোগশয্যায়, আরোগ্য জন্মদিনে, শেষবেলায়—এর অনেক পরিচয় মেলে। আধুনিক কাব্য গদ্যকবিতা ও মুক্তকে সংক্রামিত হয়েছে। এ উপলক্ষে তাই রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে স্মরণীয়। এই ছন্দোমুক্তির আলোড়ন সুরু হয়েছিল বলাকার যুগে, যা শেষ পরিণতি লাভ করলো শেষবেলায়।

শুধু যে ছন্দোমুক্তিই বড় কথা আধুনিক কবিতায় তা নয়। সুরমুক্তিও লক্ষণীয়। আগেকার কবিতায় সুরই জুড়ে আছে অনেকখানি যায়গায়, কিন্তু আধুনিক কবিতায় এর স্থান সঙ্কীর্ণ। আধুনিক কবি বুঝতে পেরেছেন যে সুর হলো গানের অঙ্গ; আর কবিতা হলো সঙ্গীত থেকে আলাদা জিনিষ। কাজেই কবিতায় সুর থাকাটা বাঞ্ছনীয় নয়। এর মূলে অবিশ্যি আছে কবিতার রাজবেশ ত্যাগ ও পথচলার আটপৌরে নির্ভরতা। কাব্যকথার উচ্চারণেই আছে এর গৌরব ও কৌলিন্য—

রৌদ্রতাপ ঝাঁ ঝাঁ করে
জনহীন বেলা দু-প্রহর।

এর চেয়ে বিরল সাজ কবিতার আর কি হতে পারে। এইতো আধুনিক কবিতা। এতে আছে ক্রিয়াপদের মৌখিক রীতি ও আটপৌরে ভাষার স্বচ্ছলতা। কবিতাকে সুরশূন্য করার জন্যে, কবিকে ও গাদ্যিক ভঙ্গির আমদানিও করা হয়—একই পংক্তিতে।

আমার কবিতা জানি আমি
গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সে সর্বত্রগামী।

এখানে সর্বত্রগামী গদ্য থেকে নেওয়া হয়েছে আনকোরা অবস্থায়। ফলে সুরের গতি ব্যাহত হয়েছে—যেন উপল ব্যথিত গতি কবিতার।

আধুনিক জীবনের জটিলতার জন্যে এসেছে ট্রামবাসের দ্রুততা জীবনে ও কাব্যে। ফলে সংহতি ও সংক্ষিপ্তি এসেছে ভাষায়। এর শরীর অবিশ্যি উপমা ও উৎপ্রেক্ষা, যাতে ঢুকেছে বৈজ্ঞানিক সভ্যতা। আমরা সেজন্য বড় নভেল ত্যাগ করে ছোট গল্প পড়তে শিখছি, এর মূলেও আছে ওই একই কথা। আমাদের "সময় তো নাই", তাই যত অল্প

ধরার বক্ষ চিরিয়া চলুক
বিজ্ঞানী হাড়গিলা,

অথবা, গোধূলির সিঁদুর ছায়ায় ঝরে পড়ে
পাগলা আবেগের
হাউ-ই কাটা আগুনঝুরি।

অথবা, চারিদিকে তার হঠাৎ এসে
কথার ফড়ি ঝাঁপায়—

অথবা মিলের চুমকি গাঁথি ছন্দের পাড়ের মাঝে মাঝে—উপমা উৎপ্রেক্ষার এই সংক্ষিপ্ত স্মরণ করিয়ে দেয় যে রবীন্দ্রনাথ এখানে সৃষ্টি করেছেন basic বাংলা, যা আধুনিক কবিকে প্রভাবান্বিত করেছে। পদ্মার উচ্ছলতা এখানে নেই, কোপাইয়ের গৈরিক বিভূতি নিয়ে যোগীর মূর্তিতে দেখা দিয়েচে এ বাংলা। কখনো বা বিশেষণে, কখনো বা বিশেষ্যে, কখনো বা সুক্ষ্মকথা নানারঙের ব্যঞ্জনায় আল্পনা দিয়ে চলতি অর্থের মোড় ফিরিয়ে দিয়েছেন। জীবনের ইতিহাসকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে কটাকটি কথায় কিন্তু রহস্যরূপোলী—

প্রথম দিনের সূর্য
প্রশ্ন করেছিল
সত্তার নতুন আবির্ভাবে
কে তুমি,
মেলেনি উত্তর।
বৎসর বৎসর চলে গেল
দিবসের শেষ সূর্য
শেষ প্রশ্ন উচ্চারিল পশ্চিম সাগরতীরে
নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়—
কে তুমি,
পেল না উত্তর।

এখানে লক্ষ্য করবার বিষয় সূর্য, পশ্চিমসাগর তীরে, প্রথমদিনের প্রভৃতি শব্দ। এগুলো ব্যঞ্জনায় বলার চেয়ে বেশী প্রকাশ করচে। সূর্য্য কর্তৃকারকের আসনে বসে রথ হাঁকাচ্চে, তবে দিন বৎসর সব চাকায় পিষ্ট হয়ে ডুবে যাচ্ছে। সে যে সাগরতীরে, সব নিস্তব্ধ হয়ে গেছে অনুত্তরের রহস্যে।

এসব আলোচনা মনে হতে পারে যে রবীন্দ্রনাথ আধুনিক বলেই স্মর্তব্য। বস্তুতঃ যিনি ক্লাসিক তিনি চিরকেলে আধুনিক। এর ভেতর যেমন আছে চিরন্তন ভাবের সমাবেশ, তেমনি সাম্প্রতিকতাও। এ দুটোর মিলন হ'লেই চিরকেলে আধুনিক কবির সৃষ্টি হয়। কাব্যের উপাদান আমাদের অনুভূতিগুলো—এর কোনো পরিবর্তন নেই যুগে যুগান্তরে। তবে বিষয়বস্তু বদলায় আর বদলায় আঙ্গিক। এটা হতে বাধ্য, কারণ কাল যখন নিরবধি আর পৃথিবী বিপুলা। কাজেই ভবিষ্যতে কোন কবি টিকে থাকবেন কিনা, তা নির্ভর করচে প্রধানত

আজি নব-বসন্তের প্রভাতের আনন্দের
লেশমাত্র ভাগ—
আজিকার কোনো ফুল, বিহঙ্গের কোনো গান
আজিকার কোন রক্তরাগ—

আজি হতে শতবর্ষ পরে।

রবীন্দ্রনাথের এই আধুনিকত্ব ভবিষ্যতে তুল্য অনুরাগ সঞ্চার করতে পারবে কিনা তার বিচারের ভার ভবিষ্যতের পাঠকের উপরে চাপিয়ে দিয়ে আজ ছুটি নি।

প্রাচীন ভারতে গোমাংস ভক্ষণ ও পরবর্ত্তী কালে তাহার প্রতিষেধ

অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ

...মূলর রমেশ দত্ত প্রভৃতি নব্য বেদজ্ঞ ...দিগের মধ্যে গোমাংস ভক্ষণ প্রথা প্রচলিত ছিল।

উমেশ চন্দ্র বটব্যাল মহাশয় একটি প্রবন্ধে ঐ মত নিরাশ করিবার ...াস করিয়াছেন। তিনি বলেন, সায়ন প্রভৃতি টীকাকারগণের মতে ...গো শব্দের অর্থ—পশু। বটব্যাল মহাশয় আরও বলেন, ঋকবেদে ... সম্বন্ধে অবধ্যা এই কথাটি প্রযুক্ত হইয়াছে।

কিন্তু প্রাচীন পণ্ডিতগণ বিশ্বাস করিতেন যে অতি প্রাচীন কালে ...াংস ভক্ষণ প্রথা প্রচলিত ছিল। ভবভূতির উত্তরচরিত হইতে ...পূর উদ্ধৃত "বৎসতরী মড় মড়ায়তে" এই বাক্য হইতে ভবভূতির ... যে ঐ বিশ্বাস প্রচলিত ছিল তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কালিদাসের ...দূতে (পূর্ব্ব মেঘ ৪৫ শ্লো) গোবধ যজ্ঞের উল্লেখ আছে। (স্রোতো-...লম্ভজাং...রন্তিদেবস্য কীর্ত্তিম্)।

চরকে (চরক চিকিৎসিত স্থান দশম অধ্যায়) আছে পৃষধ্রারাজার ...র্ঘ কালব্যাপী যজ্ঞ করিবার ফলে যজ্ঞে পশুর অভাব ঘটে; এজন্য তিনি ...গোমেধ যজ্ঞের প্রবর্ত্তনা করেন। উক্ত বীর্য্য গোমাংস ভোজনের ফলেই ...ই সময়ে অতীসার রোগের উৎপত্তি হয়। কয়েকটি স্মৃতিতে ও কলিযুগে ...গবালম্ভ নিষিদ্ধ হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও বিশ্বাস করিতেন যে প্রাচীন ঋষিগণ গোমাংস ...ভক্ষণ করিতেন। মহাপ্রভুর সহিত মুসলমান কাজির যে বিচার হয় ...তাহার বর্ণনায় এই বিশ্বাস-দ্যোতক কথা বার্ত্তা আছে (চৈতন্যচরিতামৃত ...আদিলীলা ১৭ পরিচ্ছেদ)।

গোবধ যে ভারতে বহু পূর্ব্বে বন্ধ হইয়াছিল তাহার সন্দেহ নাই। ...ণ মহাভারতের নায়কগণ কেহই গবালম্ভ যজ্ঞ করেন নাই। ...দেবের প্রণাম মন্ত্রে "গোব্রাহ্মণ হিতায় জগদ্ধিতায়" উল্লিখিত ...। এই মন্ত্রের প্রচারের সময় হিন্দুদিগের ধারণা হইয়াছে যে ...রক্ষণের দ্বারা জগতের হিত সম্পাদিত হয়।

করিত। পৃথুই কৃষি কার্য্যের প্রবর্ত্তন করেন। ভূমি সমতল করিয়া চাষের দ্বারা শস্য উৎপাদন সেই সময় হইতে চলিত হয়।

দুগ্ধ প্রদান ব্যতীত কৃষি কার্য্যে গরুর উপযোগিতা সহজেই উপলব্ধি হয়। হল কর্ষণ, ও বিবিধ প্রকারের বহন কার্য্যে গরুর প্রয়োজন।

কিন্তু যে সকল গরু বৃদ্ধ বা অক্ষম হইয়াছে, দুগ্ধ দেয় না, হল কর্ষণ করে না শকট আকর্ষণ বা অন্য বিধ বহন কার্য্যে অক্ষম তাহাদিগকে জীবিত রাখা কি সমাজের ক্ষতিকর নহে?

হিন্দুগণ গরুর পূজা করে অথচ তাহাদের গরুর অত্যন্ত দুর্দ্দশা—এই সকল কথা বাল্যকাল হইতে মিশনরী, মিস মেয়ো, ও অন্য পাশ্চাত্যগণ হইতে শুনিয়া শুনিয়া কাণ ঝালাপালা হইয়াছে। সম্প্রতি আমাদের দেশের ও অনেক পণ্ডিতকে এই সুরে কথা কহিতে দেখিয়া আহত হইয়াছি। এই দুর্দ্দশার সবচেয়ে সোজা কারণটা কেন যে তাহাদের দৃষ্টি পথে পতিত হয় না তাহা বুঝিনা। ত্রিরিশ কোটি দাসকে শোষণ করিয়া যাহাদের সমৃদ্ধি হইয়াছিল তাহাদের পক্ষে গরুকে পোষাও খাওয়াইয়া এবং তদনুরূপ শুশ্রূষা করিয়া উহার বংশোন্নতি বিধান (improvement of breed) করা সহজ সাধ্য ব্যাপার। কিন্তু দারিদ্র্যের কঠোর নিষ্পেষণে যাহাদের নিজেদের ও পরিজনদের অন্নবস্ত্র জুটে না তাহাদের গরুর অবস্থাও যে তদনুরূপ হইবে তাহা আর আশ্চর্য্য কি?

অক্ষম গুলিকেও বাঁচাইয়া রাখিলে সমাজের ক্ষতি নাই। এই কথা এ প্রবন্ধের প্রধান প্রতিপাদ্য। গরু সার নির্ম্মাণকারী সর্ব্বোত্তম যন্ত্র—(Cow as a Manure-making Animal) এই তথ্যটি আমাদের বুঝিতে হইবে। গরুর গোবর ও মূত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সার। প্রত্যেক গরু—অক্ষমরাও দিন ৬।৫ সের এই শ্রেষ্ঠ সার নির্ম্মাণ করে।

উদ্ভিদের পত্র ও অঙ্কুর, তৃণ ও খড়গুলি গ্রহণ করিয়া গরু উহাদের চর্ব্বণ করিয়া ও পাক যন্ত্রের সাহায্যে অতি সূক্ষ্ম অংশে বিভক্ত গোবরে

পরে একবারে অকর্মণ্যপ্রায় হইয়া যায়। কিন্তু গোবর দিবার পর জমি উত্তর উত্তর উন্নতই হইতে থাকে। উহা বেলে ভূমিকে জলধারণ করিয়া রাখিবার ক্ষমতা দেয়। আবার এটেল মাটিকে ফোঁকড়া করিয়া উদ্ভিদের মূল চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত করিবার ব্যবস্থা করে। একই জমিতে যদি উপযুক্ত সার দিবার ব্যবস্থা করা যায় তাহা হইলে ফসল দুই তিন গুণ অধিক হইতে পারে।

অর্থাৎ ভূমিতে উপযুক্ত মাত্রায় সার দিতে পারিলে ভারতবর্ষে যে জমি চাষ হয় তাহার অপেক্ষা কম জমি চাষ করিয়াও দেশের লোককে খাওয়াইবার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। গোবরই এই উপযুক্ত সার।

আর এই অতিরিক্ত খাদ্য হইলে শুধু যে মানুষের খাবার প্রস্তুত হইবে তাহা নয়, প্রচুর গরুর খাদ্যও প্রস্তুত হইবে। তখন অনশনগ্রস্ত দুর্ব্বল গরুর দৃশ্য বা উপদ্রব থাকিবে না। প্রচুর খড় ও অন্য শস্যের ডাটা খাইয়া গরু সকল সবল ও কর্ম্মক্ষম হইবে এবং অধিক দুগ্ধ দিতে পারিবে।

কোটী কোটী টাকা খরচ করিয়া দেশে অনেক সারের কারখানা খোলা হইতেছে। উহার সঙ্গে যদি দেশের গোবধ একবারে বন্ধ করা যায় (অথবা পরীক্ষার জন্য ৫ বা দশ বৎসর বন্ধ করা যায়) তাহা হইলে তাহার ফলও দেশের পক্ষে অতি উপকারজনক হইবে।

ফার্মিঙ্গারের (Firminger's Manual of Indian Gardening) উদ্যান সম্বন্ধীয় গ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন লোকে গোবরের ব্যবহার করিয়া গোলাপ চাষে কিরূপ সুফল পাইয়াছে তাহার বিবরণ আছে। একখানি অনূদিত জার্ম্মাণগ্রন্থে পড়িয়াছি এক সঙ্গতিপন্ন কৃষিজীবী তাহার এক পুত্রের বন্ধুকে চাষ ভূমি সকল দেখাইবার কালে এক স্থানে স্তূপীকৃত গোময় দেখাইয়া তাহাকে বলিলেন, সহরের লোক এইরূপ গোবরের স্তূপ দেখিয়া বীভৎস দৃশ্য ভাবে। কিন্তু যাহারা অভিজ্ঞ চাষী তাহারা জানে গোবরই চাষীর সোনার ভাণ্ডার। একটি সীমান্ত প্রদেশীয় পাঠান আমাকে গোবরের নুতনরূপ প্রয়োগ প্রণালী দেখাইয়াছিল। লোকটি হিং ও মেওয়া, ফল আদি বিক্রয় করিত এবং লগ্নি কারবার করিত। অবস্থাপন্ন লোক। বৃদ্ধ হইয়াছিল। সে আমাকে একদিন বাগানে কার্য্য করিতে দেখিয়া বলিল—এদেশের লোক গাছপালার কাজ ভাল জানে না, আমি আপনাকে এক কৌশল দেখাইতেছি। লোকটা কোদাল লইয়া দু হাত ব্যাসের ও ঐরূপ গভীর একটি গর্ত্ত রচনা করিল। তার পর ঝুড়ি দুই গোবর লইয়া উপরি উদ্ধৃত মাটির সহিত প্রথম কোদাল দিয়া মিশাইল। পরে হাত দিয়া উত্তমরূপে ময়দা মাখার মত করিয়া গোবর ও মাটি মিশাইল। তার পর সেই মিশ্রদ্রব্য গর্ত্তে ফেলিল, বলিল সপ্তাহে একবার করিয়া জল দিবেন এবং কয়েক সপ্তাহ পরে গাছ পুঁতিবেন। সেখানে একটা জুঁই গাছ পুঁতিয়াছিলাম। তাহাতে অসম্ভব ফুল ফুটিত। লোকে দেখিয়া বিস্মিত হইত।

আমি এখন গোবর খুব বেশী ব্যবহার করিয়া সুফল পাইতেছি গাছের একফুট দূরে গোবর দিয়া উহা দু তিন দিনের মধ্যে মাটির সহিত উত্তমরূপে মিলাইয়া দি। খুব ভাল ফসল ও ফুল হয়।

মাটিতে ভাল করিয়া গোবর মিশাইতে পারিলে উহা উর্ব্বর হইবে। দেশে এখন যে সকল জমি চাষ হয় উৎকৃষ্টরূপে গোবর মাটিতে মিশাইলে দুই তিন গুণ অধিক ফসল হইবে। দেশের অভাবই দূর হইবে।

সম্প্রতি একটি সংবাদপত্রে একখানি চিঠি পড়িলাম। উহাতে লেখক আক্ষেপ করিতেছেন যে গরুর উৎপাতে অনেক ফসল নষ্ট হয়। যদি উপরি উক্ত মতানুসারে জমিতে প্রচুর গোবর মিশান হয় তাহা হইলে ধান, গম, কলাই প্রভৃতি মানুষের খাদ্যর সঙ্গে খড়, ডাটা ভুষি প্রভৃতি গরুর খাদ্যও দেশে যথেষ্ট মাত্রায় প্রস্তুত হইবে। তখন বুভুক্ষু গরুর উপদ্রবও কমিবে।

সম্প্রতি যে দ্রুত সার নির্ম্মাণ পদ্ধতি (compost manure making) চলতি হইয়াছে তাহাতে উদ্ভিজ্জের ভগ্নাবশেষের সহিত মাঝে মাঝে প্রচুর গোবর জল মিশাইয়া উল্টাইয়া দেওয়া হয়।

হে দেবী মানসী

শ্রীরাইহরণ চক্রবর্ত্তী

জীবনের শেষ রেখা হারাল সীমায়
নমি দেবী তাই আমি অসীম তোমায়
নাহি জানি কোথা তুমি। তবু তুমি মোর
একি হতে পারে কভু? কেন রবে দূর
এক আলোয় থাকি। সজল নয়নে ফিরি

নাহি জানি ধর্মনীতি—পথ তাই সোজা!
আপন জনের সাথে কেন হবে পর
কেন নাহি রবে খোলা বাহির ভিতর
যেথা পূর্ণ ভালবাসা। মানসী হে দেবী
চিরকাল মানুষেরে সুখে দুখে সেবি

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

হাত মুখ ধুয়ে রঞ্জন খেতে বসল। মাছ মাংস, ডিম ভাজা, ঘি ভাত, এক বাটি পায়েস। এ সব সীতার নিজের হাতেরই রান্না। সীতার মা কিছু-দিন থেকে ম্যালেরিয়ায় শয্যাগত, ওইটুকু মেয়ের ওপরেই সংসারের সমস্ত ভার পড়েছে। বাপ, মা, ভাই, বোন, সকলের পরিচর্যা মিটিয়ে এত রান্না সে করে কখন, আর করেই বা কী করে! চমৎকার এই মেয়েটি। যেমন লক্ষ্মীর মতো চেহারা, তেমনি মিষ্টি স্বভাবটি।

খেতে খেতে চোখ পড়ল বিছানাটার ওপর, তারপর শেল্‌ফের দিকে, সুটকেসটার দিকে। একটি কল্যাণী নিপুণ হাতের ছোঁয়া যেন তাদের ওপরে জ্বলজ্বল করছে সোনার লেখার মতো। এই রকম একটি কল্যাণ হাতের স্পর্শ কবে যে জীবনে এসে সমস্ত ক্লান্তিকে মধুময় করে দেবে।

মিতার চিঠি মনে পড়ছে: "তুমি এসো, তোমার জন্যে প্রতীক্ষা করে আছি। তুমি না এলে আমার কাজে জোর পাবোনা।" পদ্মার ঘূর্ণির মতো চুরমার করে টেনে নিয়ে যেতে চায় ওই ডাক। জোর তো শুধু দেবে না—জোর নিজেও পাবে।

ছেলেবেলায় অবন্তি বাগানো: ফুলে ফুলে আলো করা সেই বাড়িটা কি এখনো আছে সেই রকম? শাদা পাথরের টেবিলের ওপর অগ্নি-বলয়িত নটরাজের মূর্তিটা এখনো কি রয়েছে সেইখানটিতেই? সেই মহীশূর ধূপের গন্ধের সঙ্গে মিশেছে কি বাগানের রাশি রাশি সেই সব শাদা ফিকে লাল আর আশ্চর্য নিবিড় রক্ত রঙের ব্ল্যাক্ প্রিন্স গোলাপের গন্ধ? এখনো কি সেখানে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়—পাখায় ইন্দ্রধনু-আঁকা বড় বড় পাহাড়ী প্রজাপতি?

আর হরিণটা? টলটলে নীল চোখ? ঘাসের জমিটুকুর ভেতরে বড় বড় কান তুলে উদগ্রীবভাবে প্রতীক্ষা করছে মিতার পায়ের শব্দের জন্যে? না, সব মরে গেছে। ওই পরগাছার রঙীণ জেল্লা মিশিয়ে গেছে ধুলোয়। আজকের মিতা ওর থেকে একেবারেই আলাদা। তার ঘুম-ভরা চোখ এখন বুদ্ধিতে প্রখর, শরীরে এখন সূর্য-তপস্বিনীর দীপ্তি। রাজকন্যা আজ হয়ে দাঁড়িয়েছে মাটির কন্যা। সুতপাদি যা হারিয়েছেন, হয়তো আজ মিতা তাই-ই পেয়েছে। বেণুদা যাকে ভেবে-ছিলেন আদর্শচ্যুতি—ওদের কাছে তা অর্থহীন মনে হয় এখন। প্রেমকে ওঁরা প্রতিবন্ধক ভেবেছিলেন, কিন্তু নতুন কালের আলোতে আজতো তা পাথেয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আত্ম-সর্বস্বতা ওরা চায়না, কিন্তু কেন স্বীকার করবে আত্মবঞ্চনাকে?

ফিরে পাওয়ায়। আজকের নায়িকা শ্মশানে বাসর রচনা করে কপালে বিভূতির টীকা পরিয়ে দেয় না—শ্মশান থেকে সে ডাক দিয়ে আনে পুষ্পিত জীবনের উত্তরণে। একার নয়, সমগ্রের। তাই দুজনের প্রেম দিয়ে আজ আর নীড় রচনা নয়, দুজনের শক্তি দিয়ে সমস্ত মানুষের সংসার গড়বার কাজ। জৈব জীবনের অন্ধকূপ থেকে বেরিয়ে এসে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে নির্ভয়ে বলতে পারা:

"Spring through death's iron guard
Her million blades shall thurst;
Love that was sleeping, not extinct,
Throw off the nightmare crust—"

আর নতুন প্রেমের এই মুক্ত দৃষ্টি নিয়ে দেখতে পাওয়া:

"Sky-high a signal flame,
The sun returned to power above
A world, but not the same!"

কিন্তু সীতা?

কেমন খটকা লাগল, কেমন বেদনার্ত হয়ে উঠল মন। একটুখানি সন্দেহ দেখা দিয়েছে যেন। আজকাল যেন অকারণে কেমন লজ্জায় হয়ে ওঠে, কেমন আড়ষ্ট হয়ে ওঠে চোখের পাতা। মাঝে মাঝে কেমন গভীর আর সুদূর দৃষ্টি মেলে তার দিকে তাকায় মেয়েটা। কোনো রকম দুর্বলতা জেগেছে নাকি ওর!

খচ্ করে একটা কাঁটা বিঁধে গেল বুকের মধ্যে। অসম্ভব নয়, একেবারেই অসম্ভব নয়। তাই কি তার সম্পর্কে এত যত্ন-... পরিচর্যা? তাই কি এই ঘর গুছিয়ে দেওয়াটা শুধু গুছিয়ে দেওয়াই নয়, গভীর একটা মমতার মতো আরো কিছু জড়িয়ে থাকে তার সঙ্গে?

কী সর্বনাশ, কী ভয়ঙ্কর কথা!

রঞ্জন উঠে পড়ল। মুহূর্তে খাওয়ার স্পৃহাটা মিটে গেছে, মুছে গেছে খিদের রেশমাত্রও। মাথার মধ্যে কেমন করতে লাগল তার, যেন কতগুলো লোহার পেরেকের ওপর হাতুড়ির ঘা পড়তে লাগল ক্রমাগত। কপালের রগগুলো যেন ছিঁড়ে যেতে চাইল টুকরো টুকরো হয়ে।

না-না, এসব বাজে চিন্তাকে মোটেই প্রশ্রয় দেওয়া চলবে না। এ... আর কিছুই না—একান্তভাবে তারই উইশফুল থিঙ্কিং। বড় ভালো মেয়ে সীতা, ভারী ভালো মেয়ে। কেন তার এমন দুর্ভাগ্য ঘটবে, কেন...

জোর করে ঠেলে সরিয়ে দিলে বিকৃত এই ভাবনাটাকে। তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে বিছানায় এসে বসল রঞ্জন। হ্যাঁ—নিরাশ হলে চলবে না, কোনো রকম অন্য শিথিলতাকেও আর আমল দেওয়া যাবে না। কত কাজ আছে, কত কী করবার আছে তার। বাইরের জগৎ ডাকছে হাতছানি দিয়ে। সমস্ত দেশ রাত্রির কালো আকাশের মতো যেন গভীর বেদনাতুর চোখ মেলে তাকিয়ে আছে তার দিকে। অসহায় বন্দিত্ব, কঠিন শৃঙ্খল। এই বন্দিত্বের হাত থেকে তুমি মুক্ত করো আমাকে, এই শৃঙ্খল দূর করে দাও তুমি। তুমি এসো। রঞ্জনের বুকের মধ্যে বাজতে লাগল একটা আর্ত কলধ্বনি।

বালুচরে শন শন করে কাঁদছে বন-ঝাউয়ের দল।

রাত কেটে যায়, আসে সকাল। দিনের পর দিন। সময়ের সমুদ্র ঢেউ ওঠে, ঢেউ ভাঙে। বৈশাখের শেষাশেষি একদিন নামে অশ্রান্ত ধারাবর্ষণ ; পদ্মার জল বেড়ে ওঠে, বন-ঝাউয়ের দল অর্ধমগ্ন দেহ তুলে জেগে থাকে গেরুয়ারাঙা স্রোতের ওপর। নাগিনীর গর্জন লাগে মরা পদ্মার ধারায়। চড়াগুলো তলিয়ে গিয়ে তিন চারটি ধারা একটি ধারাতে রূপান্তরিত হয়। উঁচু ডাঙা জলের ঘায়ে ঝুপঝাপ ক'রে ভাঙতে শুরু করে।

সব সহজ আর স্বাভাবিক হয়ে আসে। রুটিনে বাঁধা জীবন, কাল কী হবে, পরশু কী হবে, কী হবে তারও পরের দিন—সব আঙুলে গুণে বলবার মতো জীবন। দারোগা আসেন, পাশার ছক পেতে বসেন ডাক্তার, কম্পাউণ্ডার গালে হাত দিয়ে চাল ভাবেন। বারো পাঞ্জা সতেরো পড়তে থানার মুহুরীবাবু আনন্দে লাফিয়ে ওঠেন বিকচ্ছ হয়ে।

দারোগা মাঝে মাঝে অত্যন্ত উদার ভঙ্গিতে বলেন, কত ভাগ্যে যে আপনাদের মতো লোককে আমাদের মধ্যে পেয়েছিলাম রঞ্জনবাবু। পুলিশে চাকরী করতে এসে তো আর ভদ্রলোকের মুখ দেখি না।

রঞ্জন হাসে : চিরদিনই আমাকে আপনাদের মধ্যে এইভাবে আটকে রাখতে চান নাকি ?

দারোগা জিভ কাটেন : ছি, ছি, কী যে বলেন ! পুলিশের চাকরী কী যে লজ্জা আর ধিক্কারের ব্যাপার, সেটা তখনই বুঝি—যখন আপনাদের মতো লোককেও আমাদের পাহারা দিয়ে আটকে রাখতে হয়।

রঞ্জন কৌতুক করে বলে, বেশ তো, ছেড়ে দিন না, চলে যাই।

দারোগা ম্লান হয়ে যান। মাথা নীচু করে বলেন, কেন লজ্জা দিচ্ছেন। সবাই তো জানেন, আমাদের ক্ষমতার দৌড়ও জানেন। নেহাৎ পেটের দায় বলেই গোলামী করি, নইলে—

তা সত্যি। আন্তরিকতার স্পষ্ট উত্তাপ পাওয়া যায়। আইন আর পোশাকের মানুষকে আষ্টে পৃষ্ঠে বেঁধে ফেলতে পারে, স্বাধীন সত্তা হরণ করতে পারে তার, কিন্তু মনকে তো মেরে ফেলতে না, নিঃস্বার্থভাবে নিজেকে মিলিয়ে দেবার মতো যোগ্যতাও তো থাকে না সকলের। এই সমস্ত মুহূর্তে, দারোগার এই অনুতাপ-স্নিগ্ধ কণ্ঠস্বরে যেন সেই অপমানিত মানুষটি নিজেকে অতি দুর্বলভাবে ব্যক্ত করবার চেষ্টা করে।

বাস্তবিক, রঞ্জনের এখন ভালো লাগে দারোগা সাহেবকে। রাগ হয় না, অভিযোগ করতে ইচ্ছেও হয় না। সবাই দেবতা নয়, হলে পৃথিবীটার চেহারাটা অসহ্য হয়ে উঠত। সামগ্রিক দেশকে ভালবাসার পরে কবি রঞ্জন এখন মানুষকে ভালোবাসতে শিখেছে। ত্রুটি বিস্তর রয়েছে মানুষের, আছে স্বার্থবুদ্ধি, আছে প্রচুর সংকীর্ণতা। তবুও মানুষ—মানুষ। সে নিত্যকালের, তাই হৃদয়ের মৃত্যু নেই কখনো। হয়তো এমনি একটা হৃদয় ধনেশ্বরেরও ছিল। ছিল কি ?

ডাক্তারবাবু বলেন, আজ একটু দেরী করে চা খাবেন রঞ্জনবাবু। সীতা বোধ হয় দু চারটে মিষ্টি তৈরী করেছে, নিশ্চয় পাঠিয়ে দেবে আপনাকে।

রঞ্জন বলে, সীতা তো রোজই খাওয়াচ্ছে। আজ বরং কিছু এক্স-চেঞ্জ করা যাক। আমার ঘরে দু টিন ভালো ক্রীম-ক্র্যাকার পড়ে আছে, নষ্ট হচ্ছে। নিয়ে যান না, ছেলেপুলেদের—

ডাক্তারবাবু সস্নেহে হাসেন।

—আমি আপনার বাবার বয়সী। ভদ্রতাটা আমার সঙ্গে নাইই করলেন। বাড়িতে ছেলেপুলের কি খাওয়ার ত্রুটি আছে এক বিন্দু ? ওসব বরং আপনারই থাক, একদিন নয় দল বেঁধে সবাই এসে ওগুলোকে শেষ করে দিয়ে যাব।

এর ওপর আর কথা চলে না।

দিন কাটে। আকাশে নববর্ষার নীল মেঘ দেখা দেয়। প্রেতায়িত মাঠকে কুয়াশায় আচ্ছন্ন করে দিয়ে প্রবল ঘন ধারার বর্ষণ নামে। পদ্মার পাড় ভাঙে, তার সঙ্গে ভেঙে পড়ে গাং-শালিকের বাসা। রাক্ষসী নদীর জল দুলে ওঠে, ফুলে ওঠে, গর্জন করে। বন-ঝাউয়ের দল কোথায় গেছে তলিয়ে, সেখানে এখন পনেরো হাত লগিরও থই মেলে না। জেলেদের গ্রামগুলো বৃষ্টিতে অস্পষ্ট হয়ে যায়, 'ফটিক-জল' পাখী ঝাঁক বেঁধে নাচতে শুরু করে বর্ষণ-ক্ষরিত কালো আকাশে।

আকাশ, বাতাস, হঠাৎ ক্ষেপে-ওঠা পদ্মা—সকলের সঙ্গে একটা সহজ প্রীতির সম্পর্ক। বই পড়তে পড়তে ক্লান্তি বোধ করলেই বাইরের জগৎটা এসে যেন মিতালি পাতিয়ে নেয় রঞ্জনের মনের সঙ্গে+ ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে বসে থাকতে পারে এদের ভেতরে নিমগ্ন হয়ে ; তা ছাড়া দারোগা আছেন, কম্পাউণ্ডার আছেন, ডাক্তার আছেন। একটা বিচিত্র নিশ্চিন্ত পরিবেষ্টনী।

তবুও বন্দী জীবন পীড়িত করে মনকে। খবরের কাগজ বিক্ষুব্ধ ভারতবর্ষের সংবাদ বয়ে আনে। আমেদাবাদ আর কানপুরের মিলে মিলে

আছে মনে। একথা সত্যি যে কিছুদিন থেকে দেশের নতুন কাজের পদ্ধতির সঙ্গে তার সংযোগ নেই। দেশ যে কতটা এগিয়ে গেছে তা ঝাপসা ঝাপসা ভাবে খানিকটা অনুমান করতে পারে মাত্র, বুঝতে পারে না সঠিক ভাবে। আজকের কর্মীদের সঙ্গে পা মিলিয়ে নিতে, চিন্তা মিলিয়ে নিতে হয়তো তার সময়ও লাগবে খানিকটা। তা লাগুক, তবু সময়ের দাবী এসে পৌঁছে গেছে, ব্যক্তি মানুষ, আত্মকেন্দ্রিক রঞ্জুকে আজ নিজের জীবন রচনা করতে হবে সমগ্রের মধ্যে. আর দেরী করা চলবে না।

পরিমল তো আছেই। তার ভিলেজ-অর্গ্যানাইজেশন আছে, আরো কত কাজ বাধিয়ে বসে আছে সে কে জানে। আর আছে মিতা। অবকাশ দিয়ে গড়া কাজ, ভালোবাসা দিয়ে বেষ্টিত কর্তব্য। কর্মক্লান্ত মুহূর্তগুলোর সঙ্গে সঙ্গে পাদপাদপ। কাজকে মধুর করবে, চলাকে গতি দেবে। নতুন পৃথিবী গড়বার পথে মূর্তিময়ী সহযাত্রিণী।

—"আমি তোমার জন্যে প্রতীক্ষা করে আছি, কবে আসবে তুমি?"

কবে আসবে তুমি? সারা শরীরে কথাটার রেশ বয়ে নিয়ে রঞ্জন পায়চারী করতে লাগল ঘরময়। হঠাৎ টিনের চালের ওপর ঝম্ ঝম্ করে শব্দ বেজে উঠল। অনেকক্ষণ ধরে গুমোট করে ছিল আকাশটা, বৃষ্টি নামল এইবারে। ক্যাম্পের সামনে নিমগাছটায় সাড়া পড়ে গেল ধারাস্নানের আনন্দে।

এমনি সময় বাইরে থেকে একটি মেয়ে ছুটতে ছুটতে একেবারে রঞ্জনের দাওয়ায় এসে উঠল।

—আরে সীতা যে!—আশ্চর্য হয়ে বললে, এই দুপুরবেলায় কী মনে করে? এসো, এসো, ঘরে এসো।

ভিজে আঁচলটা ভালো করে জড়িয়ে নিলে সীতা। লজ্জারুণ মুখে বললে, মা একটা বই চাইছিলেন, তাই—

—বই? তা বোসো, বোসো। দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

ভীরুর মতো যেন ছোঁয়া বাঁচিয়ে সীতা চেয়ারটার একপাশে বসল। রঞ্জন বললে, বাংলা বই তো বেশি আমার কাছে নেই, দু একটা পত্রিকা আছে। তাই দিতে পারি।

—দিন—

পত্রিকা নিয়ে সীতা উঠে দাঁড়াবার উপক্রম করল। কিন্তু বাইরে তখন মুষলধারায় বৃষ্টি নেমেছে। নাগিনী পদ্মার জল ফুটে উঠছে টগবগ করে, ঝুপঝাপ শব্দে ভেঙে পড়ছে পাড়। রঞ্জন বললে, এই বিষ্টির ভেতর যাবে কী করে? একটু দাঁড়িয়ে যাও।

চেয়ারের হাতলটা ধরে সীতা দাঁড়িয়ে রইল সসংকোচে। কপালের ওপর নেমে আসা চুলে জলের বিন্দু। লজ্জিত মুখখানাতে যেন পূর্ব-রাগের রক্তিম স্পর্শ। গভীর কালো চোখের দৃষ্টি একবার ওর মুখের ওপর ফেলেই মাথা নামাল সীতা। আকাশে বিদ্যুৎ চমকালো, সে আর একজনের দৃষ্টিই তার সমস্ত জীবনকে আলো করে দিয়েছে। সে মিতা। আজ সাত বছরের ওপার থেকে আবার কার চোখে তা ফিরে এল, ফিরে এল কোন্ অর্থহীন শূন্যতায়!

অবাঞ্ছিতরা আতঙ্কে যেন অসাড় হয়ে গেল সে। একটা আকস্মিক প্রবল আঘাত লাগবার মতো তার স্নায়ুগুলো যেন সমস্ত অনুভূতি হারিয়ে বসেছে। বাইরে বৃষ্টির শব্দ—নিমগাছটার পাতায় তেমনি সমানে চলেছে ক্যাপামির উল্লাস। দ্রুত পদধ্বনির মতো হৃৎপিণ্ডে শব্দ উঠছে অবিশ্রাম। আর কেমন অপূর্ব স্নিগ্ধ ভঙ্গিতে আবার চোখ তুলেই সঙ্গে সঙ্গে নামিয়ে নিয়েছে সীতা। তার গালের লালিমা আরো ঘন হয়ে এসেছে, অপরাধীর মতো আঙুলে জড়িয়ে চলেছে আঁচলটাকে।

এ অসম্ভব, এ অসহ্য। অঙ্কুরেই বিনাশ ঘটাতে হবে এর। এই শান্ত লক্ষ্মীর মতো মেয়েটির মনকে একবিন্দু কালিমার হাত থেকেও বাঁচাতে হবে তাকে।

—আর কিছু বলবে সীতা?

সীতা বললে, হুঁ।

—কী বলবে?—এবার চেষ্টা করেই যেন সহজ হওয়ার ভাবটা আনতে হল গলায়।

প্রায় অস্ফুট স্বরে সীতা বললে, আমি আপনার কাছে পড়ব।

—আমার কাছে?

—হাঁ—সীতার লজ্জিত চোখে এবার অনুনয়ের আকুতি রূপ পেল: আমাকে একটু ইংরেজি পড়িয়ে দেবেন। যদি আপনার খুব অসুবিধে না হয় তা হলে কাল দুপুর বেলায়—

কাল দুপুর বেলায়! সমস্ত অনুভূতি চমকে উঠল। ফাঁস পড়ছে, এসেছে প্রথম পাক। এখনি একে ছিন্ন করা উচিত, এখনি রূঢ়ভাবে বলে দেওয়া উচিত তার সময় নেই, দুপুর বেলা তার নির্জন ক্যাম্পে একটি কুমারী মেয়েকে পড়াবার বিপজ্জনক দায়িত্ব সে নিতে পারবে না।

কিন্তু সীতার চোখের দিকে তাকিয়ে একটা কথাও বলতে পারল না সে। নিজের মধ্যে যে প্রবল প্রতিবাদ উঠেছিল। নিজের অজ্ঞাতেই তা আশ্চর্য স্তিমিত হয়ে গেল।

—আচ্ছা এসো।

বৃষ্টির জোরটা কমে গেছে, কিন্তু ঝিরঝির করে পড়ছে তখনো। সীতা আর দাঁড়ালো না, দ্রুত বেরিয়ে চলে গেল ঘর থেকে।

বৃষ্টি থামল। বিকেল এল, এল সন্ধ্যা। রঞ্জনের যেন বিছানা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করছে না আজ। সমস্ত দেহমন যেমন ক্লান্তি, তেমনি গ্লানিতে আচ্ছন্ন হয়ে আছে তার। এ কী হচ্ছে—এ কোন্ দুর্বলতার বীজ বপন করতে যাচ্ছে সে। জানে এর কোনো পরিণাম নেই, নেই এর কোনো সার্থক পরিণতির দ্যোতনা। অনর্থক জীবনে জেগে থাকবে

ছি, ছি, এ হতেই পারে না। মন নিয়ে দোলা খাওয়ার কাঁচা বয়েস তার কেটে গেছে। কাজ, অনেক কাজ। দরকার হলে কঠিনভাবে ঘা দিয়ে মোহভঙ্গ ঘটিয়ে দিতে হবে মেয়েটার।

কী করবে কাল? এলে বলবে, তুমি চলে যাও? অথবা বলবে—

কিন্তু কিছুই বলবার দরকার হল না আর।

ছপ ছপ করে একরাশ জলকাদা ভেঙে শশব্যস্তে প্রবেশ করলেন দারোগা। আনন্দউচ্ছল স্বরে জানালেন, রঞ্জনবাবু, কনগ্র্যাচুলেশনস্।

—কনগ্র্যাচুলেশনস্!—রঞ্জন চমকে বিছানার ওপর উঠে বসল: ব্যাপার কী?

—স্বার্থপরের মতো আপনাকে আটকে রাখতে পারলেই খুশি হতাম আমরা। কিন্তু তার উপায় নেই আর।

—হেতু?

—আপনার রিলিজের অর্ডার এসেছে।

—রিলিজ! চমক আর অবিশ্বাসে উচ্চকিত চোখে চেয়ে রইল রঞ্জন।

—তিন ঘণ্টার মধ্যেই—You are to start! তারপর সকালের ট্রেনে কলকাতা। আলিপুর সেণ্ট্রাল জেল থেকে আপনাকে খালাস দেওয়া হবে। এমার্জেন্সি অর্ডার।

—কিন্তু এত শর্ট নোটিশে? আমার জিনিসপত্র—

—সব ব্যবস্থা করব, কিচ্ছু ভাববেন না। Congratulations again! কিন্তু আমাদের ভুলে যাবেন না রঞ্জনবাবু। অপরাধ অনেক করেছি, যোগ্য মর্যাদাও দিতে পারিনি। সেজন্যে দায়ী আমরা নই দায়ী আমাদের—যাক, মনে রাখবেন দয়া করে।

লণ্ঠনের আলোয় পুলিশের দারোগার নিষ্ঠুর কঠিন চোখও চকচক করে উঠল নাকি?

* * *

পদ্মার স্রোতে নৌকো ভাসল রাত এগারোটায়।

আবার বাইরের পৃথিবীতে তার বিস্তৃত উদার আমন্ত্রণ। এই মুক্তি। বুকভরা অশ্রান্ত জোলো বাতাস সে টেনে নিতে পারছে। নৌকো ভেসে চলেছে পদ্মার বন্ধনহীন স্রোত-প্রবাহে। এপাশে আফিঙের বিষাক্ত নেশার মতো তন্দ্রাচ্ছন্ন বাংলা দেশে প্রসারিত তার নতুন কর্মক্ষেত্র; ওপারে সীমাহীন জলের বিস্তারে যেন তারই দুরধিগম্যতার ব্যঞ্জনা।

সীতা কাল দুপুরে আসবে বলে গিয়েছিল।

ও কিছুনা। পথ চলতে চলতে অমন দু চারটে লতা পায়ে জড়িয়ে ধরেই; তাদের ছিঁড়ে ফেলে এগিয়ে যাওয়াই তো জীবন। মুক্তি! ডাকছে জনবহুল, কর্মবিপুল পৃথিবী। কতদিন সে দেশের রাজনৈতিক জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে! সে ক্ষতি পূরণ করে নিতে হবে—সময় নেই তার। ফিরতে পারবে না, পারবে না পেছনে তাকাতে। দেশ জুড়ে চলেছে জন-জগন্নাথের রথ। কালের যাত্রা। সেই রথযাত্রার পেছনের ভিড় তাকে ঠেলে নিয়ে যাবে; নিয়ে যাবে তার আদর্শ, আর ব্রতচর্যার নির্ভুল লক্ষ্যে।

কিন্তু—

ও কিন্তু থাক। সীতা ভুলে যাবে। হয়তো কালই। কিন্তু প্রতীক্ষা করে আছে। রজনীগন্ধার মৃত্যু হয়েছে আত্মবিলাসের রাত্রে, নিশার দৃষ্টি-প্রদীপে আজ সূর্যমুখীর তপস্যা। দুরূহ পথে নিত্য সহচারিণী সে:

"This is our day; So turn my Camrade turn,
Like infant eyes, like sunflower to the light!"

স্রোতের টানে নৌকা চলেছে সম্মুখে। পেছনে থানার আলোটা মিলিয়ে এল—অন্ধকারে তলিয়ে গেল ভাঙা মঠের নির্বাক মূর্তিটা। তমসাবৃত জনপদে বিস্তীর্ণ বিপুল ভারতবর্ষ—তার নতুন কর্মক্ষেত্র; খড়্গাধার জল তরঙ্গে গণ-সমুদ্রের ডাক।

এরপরে একা রঞ্জন আর কোথাও নেই। আর নয় ব্যক্তিসত্তার কাহিনী। এতক্ষণের রঙীন বুদ্বুদটা এইবারে মিলিয়ে গেল অনিশ্চিত স্রোতের প্রবাহে। এরপর সে সকলের। তার ইতিহাস দেখা দেবে লক্ষ লক্ষ সংগ্রামী মানুষের সঙ্গে, তার পরিচয় সর্বজনীন প্রাণবিক্ষোভে। ব্যক্তি-মানসের এই কাহিনীটুকু তারই প্রস্তুতি-পর্ব।

আকাশে জ্বলজ্বল করছে যেন সত্যের স্বাক্ষর—লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি নক্ষত্রের শিলালিপি॥

—সমাপ্ত—

রাতের মেয়ে

শ্রীভোলানাথ ঘোষাল

রাতের কন্যা ঘুমায় দিনের কোলে সাঁঝের বেলায় ঘুম ভেঙে যায় তার।
গন্ধ-বিভোল সন্ধ্যার মায়ালোকে রাতের মেয়ের চলে নিতি অভিসার।
কখন আবার রাতের মেয়েটী অতি ফুল নিয়ে শুধু মালা গাঁথে আনমনে।

গেঁয়ো নদীটীর নির্জ্জন বালুচরে রাতের কন্যা একাকী বসিয়া রয়।
সারাটি রজনী দিনের প্রতীক্ষায় রাতের মেয়ের নয়ন তন্দ্রাহারা।
বক্ষে জ্বালায়ে প্রেমের প্রদীপখানি প্রভাত স্বপ্নে থাকে সে মত্ত পারা।

আকাশ পথের যাত্রী

শ্রীসুষমা মিত্র

২৩শে জুন। আজ সকালে আমরা Mayo Clinicএ গেলাম। উনি সেখানে সমব্যবসায়ীদের পেয়ে কথাবার্তায় বেশ জমে গেলেন। অগত্যা আমরা একজন নার্সের সাহায্যে সারা হাসপাতালটি ঘুরে দেখতে গেলাম। এই Clinicএর চিকিৎসা-পদ্ধতি বেশ একটু নূতন ধরণের—সাধারণ হাসপাতালের তুলনায় এর স্বাতন্ত্র্য রয়েছে।

এখানকার বিশেষত্ব হল এই যে রোগী ভর্ত্তি হ'লেই, তার সব রকম প্রাথমিক পরীক্ষা, যায় বুকের এক্সরে প্লেট পর্য্যন্ত করিয়ে নেওয়া হয়। তারপর, রোগীর কোনও বিশেষ অসুখ আছে সন্দেহ হলে তাকে সেই বিভাগে পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয় এবং প্রয়োজন হলে আরো অন্যান্য বিভাগে পাঠিয়ে তার দেহে ব্যাধির আক্রমণের প্রকোপ কতটা তা যথাযথ পরীক্ষা করে দেখে নেওয়া হয়। তারপর ক্লিনিকের সমস্ত ডাক্তারেরা একত্র মিলিত হয়ে এই সকল পরীক্ষার ফল বিচার করে রোগীর রোগ নির্ণয় ও উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। এছাড়া জরুরী রোগীর চিকিৎসা এবং অস্ত্রোপচারের ব্যবস্থা তো সর্ব্বদাই মজুত আছে। Clinicএ দৈনিক প্রায় দেড়শ' থেকে দু'শ' রোগীর দেহে অস্ত্রোপচার করা হয়। দৈনিক প্রায় দুই হাজার রোগীকে বিভিন্ন বিভাগে পরীক্ষা করা হয়। Clinicএর এই আকাশস্পর্শী অট্টালিকার মধ্যে অসংখ্য Elevatorএ করে রোগীর দল ক্রমাগত ওঠানামা করছে।

মেয়ো-ক্লিনিকের অন্তর্গত মেয়ো সিভিক অডিটোরিয়ম

দেখলাম। প্রত্যেক তলায় রোগীরা একটি হলঘর জুড়ে বসে অপেক্ষা করছে। তাদের সামনেই রয়েছে নার্সের Desk, সেখানে নার্সরা রোগীদের কাগজপত্তর ও তালিকা নিয়ে তাদের তত্ত্বাবধানে ব্যস্ত। Clinicএর বাড়ীটি যেন একটি বড় শহর। এত কাজ চলেছে সেখানে, অথচ অতি নিঃশব্দে ও নীরবে।

Mayo Clinicএর নামের সাথে ছোট্ট একটি স্মৃতি জড়িয়ে আছে। Dr. William Mayoর নামেই এই Clinicএর নাম। Dr. William Mayo একজন অতি সাধারণ চিকিৎসক ছিলেন। তিনি এক সময় এই রচেষ্টারে এসে চিকিৎসা প্রসারের জন্য বসবাস করতে সুরু করেন, তখন রচেষ্টার সামান্য একটি পল্লী মাত্র।

সেই সময় একদিন হটাৎ এক প্রবল বন্যা এসে দেশ ভাসিয়ে দিল। দরিদ্র পল্লীবাসীরা গৃহহারা হ'য়ে অনাহারে, রোগে ও বিনা চিকিৎসায় প্রাণ হারাতে লাগল। দেশের এই দুর্দ্দিনে Dr. William Mayoর মহৎ প্রাণ সাড়া দিল বিশ্বমানবের কল্যাণের ডাকে। তিনি সেই বন্যাপীড়িত দুঃস্থ নরনারীদের আশ্রয় দিলেন নিজের ছোট্ট কুটীরখানিতে। সযত্নে তাদের সেবা, যত্ন ও চিকিৎসা করে পুনর্জীবিত করে তুললেন। সেই হতে তাঁর বাসগৃহেই সুরু হল তাঁর ছোট্ট একটি Clinicএর কাজ। মানব সেবায় তিনি জীবন উৎসর্গ করে শেষের দিনে দিয়ে গেলেন তাঁর জীবনের সমুদয় স্বোপার্জ্জিত অর্থ এই Clinicএর উদ্দেশ্যে। পরবর্ত্তীকালে তাঁর দুই সুযোগ্য পুত্রও চিকিৎসা-বিদ্যা আয়ত্ত করে পিতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে এই Clinicএর কাজেই আত্মোৎসর্গ করেন। তাঁদের জীবনের যাবতীয় অর্থ যায় বসত-বাটীটিও তাঁরা পিতার এই Clinicএ দান করে গেছেন।

যে আমেরিকাকে আমরা 'ভোগী'র চক্ষে দেখেছি, সেই আমেরিকাতেই এমনি কত ত্যাগী মহামানবের জন্ম হয়েছে। রক-ফেলার,

এই Clinicএ এসে আজ পৃথিবীর কত শত পীড়িত ও ব্যাধিগ্রস্ত নরনারী রোগমুক্ত হয়ে—Mayo পরিবারের নামে মাথা নত করে বিদায় নিচ্ছে।

২৪শে জুন। সকালে আমরা বেড়াতে বেড়াতে ছোট্ট একটি পার্কের মধ্যে একটি মিউজিয়মে দেখে ভিতরে ঢুকে পড়লাম। দেখলাম

রচেষ্টার শহরের রাজপথে

মিউজিয়ামটির ভিতরে কাঁচের শোকেসে সাজানো রয়েছে—আগাগোড়া প্লাসটিকের তৈরী অস্ত্রোপচারিত মানব দেহ।

অস্ত্রোপচার বিদ্যা শিক্ষার নিমিত্ত দেহের প্রতি অঙ্গের অপারেশনটি এখানে প্রথম ছুরীবসানো হতে শেষ সেলাই করা পর্য্যন্ত পরিষ্কার করে দেখানো হয়েছে; দেখে মনে হচ্ছিল—ঠিক যেন জীবিত মানবদেহের অস্ত্রোপচার দেখছি। একটি মানুষ প্রমাণ প্লাসটিকের মূর্ত্তি দেখলাম,—স্বচ্ছ দেহের ভিতরের সকল রকম যন্ত্রগুলি ও তাদের ক্রিয়াপ্রক্রিয়া দেখানো হয়েছে। দেখে ভারী আশ্চর্য্য ও অদ্ভুত লাগল।

আজ দুপুরে Dr. Mussyর বাড়ী নিমন্ত্রণ সেরে বাক্স গুছিয়ে Madison যাত্রার জন্য প্রস্তুত হলাম।

Minnesota Stateএর রাজধানী Madison। রাত প্রায় ১১টায় Madisonএর বিমান ঘাঁটিতে নামলাম, সামনেই দেখি Dr ও Mrs Campbell (স্থানীয় ডাক্তার) আমাদের নিতে এসেছেন। এঁদের সাথে আলাপ হয়েছিল Canadaর Seignory Clubএ। বিমান ঘাঁটিতে বাক্স তোলার লোক নেই দেখে আমরা নিজেরাই বাক্স বয়ে গাড়ীতে তুলতে লাগলাম। ফিরে দেখি ডাক্তার ও ডাক্তারপত্নীও

২৫শে জুন। সকালে উঠে Mrs Campbellএর তৈরী Breakfast খেয়ে বাগানে বেড়াতে গেলাম। Dr. Campbell ওঁকে নিয়ে হাসপাতালে গেলেন। এই হাসপাতালে একটি cancer রোগীকে অপারেশন করবার জন্যই Dr. Campbell ওঁকে এখানে নিমন্ত্রণ করে এনেছেন।

Mrs Campbellএর নিজের হাতে তৈরী করা এই বাগানখানি ফুলে ফুলে ভরে আছে। বাড়ীখানি ছবির মতন; ঘরগুলি অতি মনোরমভাবে সাজানো। Mrs Campbellএর শিল্পজ্ঞান ও সৌন্দর্য্যবোধ সত্যই প্রশংসনীয়। এ দেশে গৃহস্থের বাড়ীতে দাসদাসী নেই, তাই স্বামীপুত্রের কাজ ও যাবতীয় গৃহস্থালীর কাজ গৃহিণীকেই করে নিতে হয়। আমি বাড়ীর ভিতরে গিয়ে Mrs Campbellএর ঘরকন্নার কাজ দেখতে লাগলাম। ছোট্ট একটি সংসার পাতা; কি সুন্দর সাজানো ও শৃঙ্খলাপূর্ণ! সংসারের কাজের সুবিধার জন্য কত রকম যন্ত্রের ব্যবস্থা রয়েছে। মাটীর নীচে বাড়ীর ভিতের তলায় ঘরগুলি গৃহস্থের যাবতীয় কাজের জন্য ব্যবহার করা হয়,—সেখানে রয়েছে ঠাণ্ডাগরম জল সরবরাহের যন্ত্রটি, কাপড় কাচার জন্য বৈদ্যুতিক

রচেষ্টারের অপারেশন-মিউজিয়ম

কল, ইস্ত্রিকরার যন্ত্র ও সুন্দর সাজানো ভাঁড়ার ঘরে Deep Freeze

কয়েক মাসের খাবারের জিনিষ একেবারে কিনে এর ভিতরে নিশ্চিন্ত মনে রেখে দেন। বাড়ীর ব্যবস্থা এত উৎকৃষ্ট ও সুবিধাজনক বলেই একা গৃহকর্ত্রীর পক্ষে সকল দিকের কাজ করে ওঠা সম্ভব হয়েছে।

বেলা প্রায় ১টার সময় Dr Campbell এবং উনি ফিরে এলে আমরা বাইরে লাঞ্চ খেতে গেলাম। Dr Campbell আমার স্বামীর সকল অপারেশনের জন্য আমাকেই অশেষ ধন্যবাদ জানিয়ে দিলেন; এখানকার ডাক্তাররা নাকি সেই অস্ত্রোপচার কৌশল দেখে কত উৎসাহিত হয়েছিলেন সে সকল সবিস্তারে গল্প করলেন। শুনে খুশী ও গর্বিত যে হইনি এ কথা বললে সত্যের অপলাপ করা হবে। এখানে সতীর পুণ্যে পতির পুণ্য না হ'য়ে, পতির গুণে সতীই ধন্য হলেন! লাঞ্চের পর আমরা Madison সহর ঘুরতে বেরোলাম। এখানে

শিকাগো শহর

ছোট ছোট অনেকগুলি হ্রদ রয়েছে; সহরটা যেন অর্দ্ধেক জল ও অর্দ্ধেক স্থল।

আজ রাতে Dr Campbell একটি বড় রকমের ভোজের আয়োজন করে সহরের সকল ডাক্তারদের নিমন্ত্রণ করেছেন, উদ্দেশ্য ডাক্তার ও ডাক্তার-পত্নীগণের সাথে আমাদের আলাপ পরিচয় করিয়ে দেবেন।

ভোজের টেবিলে কিন্তু আমাদের মত বেরসিকদের জন্য আজ রাত্রে সুরাসজাত পানীয় নিষিদ্ধ করে শুধু মিষ্টি সরবৎ পরিবেশন করেই অতিথিদের তৃপ্তিকরা হল। রাত প্রায় ১১টা অবধি খাওয়া দাওয়া ও

শিকাগো ফিরে যাবার জন্য প্রস্তুত হলাম। Dr ও Mrs Campbell ষ্টেশনে এসে আমাদের ট্রেণে তুলে দিয়ে গেলেন। কৃতজ্ঞতা সহকারে ধন্যবাদ জানিয়ে আমরা বিদায় নিলাম; ট্রেণ ছেড়ে দিল। বেলা প্রায় আড়াইটার সময় আমরা শিকাগো পৌঁছলাম। আবার সেই Palmer House Hotelএ ওঠা।

আজ বিকেলে Grant Parkএ হেঁটে বেড়াতে গেলাম। পার্কটি বেশ বড়, দেখে কলিকাতার ময়দানের কথা আমার মনে পড়তে লাগল। পার্কের মাঝে প্রকাণ্ড একটি ফোয়ারা রয়েছে। ফোয়ারা হতে ঝরণার জল বহু উর্দ্ধে শূন্যে উঠে যেন আকাশে মিলিয়ে যাচ্ছে। সন্ধ্যার সময় যখন রঙ্গীণ আলো তার ভিতরে জ্বলে ওঠে, তখন জলের ফোয়ারা যেন এক রঙের ফোয়ারায় রূপান্তরিত হয়।

শিকাগোর রাজপথ

অনেকক্ষণ ধরে রঙের খেলা দেখে আমরা হোটেলে ফিরে এলাম। ফেরার পথে আমরা একটি ভারী মজার প্রশেসন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে দেখলাম।

প্রশেসনের সামনের লোকেরা কাঠবেড়ালির গলায় সুতো বেঁধে টানতে টানতে নিয়ে চলেছে, তার পিছনের দল এক গোছা কাঁকড়া হাতে নিয়ে নাচাতে নাচাতে যাচ্ছে। আর তার পিছনে চলেছে মূল্যবান পোষাকপরা বাজনদারের দল। সব চেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এই প্রশেসনের লোকেরা হাসি খুশীর পরিবর্ত্তে অত্যন্ত গুরু-

দেশের মানুষেরা কি অদ্ভুত বিকৃত সাজে সেজে রাস্তা দিয়ে চলেছে। দেখে আমাদের হাসি পায়, অথচ তারা নিজেরা কিন্তু ফ্যাশানের এই নূতনত্বের বাহাদুরিতে এবং তার সৌন্দর্য্যের গর্ব্বে মহা গর্ব্বিত।

বর্ষীয়সী স্ত্রীলোকের মাথায় অদ্ভুত আকারের টুপী ও হাতে অদ্ভুত চেহারার Vanity bag—দেখে মনে হল নারীর মুখের শোভা ও হাতের কোমল সৌন্দর্য্যকে ব্যঙ্গ করে এদের সাজ পোষাকের বিকৃত রুচিটাই সব চেয়ে বেশী প্রকাশ পাচ্ছে।

রাতের আহার সেরে আবার আমরা Grant Park এর খোলা মাঠে বসে কনসার্ট শুনতে গেলাম। মাঠ জুড়ে পঁচিশ হাজারের অধিক লোকের জন্য চেয়ার পাতা। প্রকাণ্ড একটি ষ্টেজের ভিতরে কনসার্ট বাজছে, আর বড় বড় লাউডস্পীকারের ভিতর দিয়ে সারা মাঠে সেই সুর ছড়িয়ে পড়ছে।

দেখলাম সারা দিনের পরিশ্রমের পর লোকেরা সব মাঠে বসে, শুয়ে, আরাম করে সঙ্গীত উপভোগ করছে। কনসার্ট শোনার পর হোটেলে ফিরে হল ঘরে ঢুকেই দেখি সামনেই এক ভদ্রলোকের গলার দু'দিকে দুটি লাল ও সবুজ আলো জ্বলছে। কৌতূহল বশতঃ তাকিয়ে রইলাম; শেষে তিনি আরো নিকটে এলে দেখি যে তাঁর গলায় বাঁধা নীল রংএর একটি বো'তে একদিকে লাল আলো ও অপরদিকে সবুজ আলো জ্বলছে। ফ্যাশানের চরম উৎকর্ষ এরা দেখাচ্ছে বটে!

(ক্রমশঃ)

ললিত-লতা

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

ইন্দুবাবুর সঙ্গে সোমনাথের আন্তরিক ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল। তিনি মাঝে মাঝে তাহাকে নিজের বাসায় নৈশ ভোজনের নিমন্ত্রণ করিতেন। ইন্দুবাবুর স্ত্রী রন্ধনে সুনিপুণা, তাহার হাতের চিংড়িমাছের মালাই-কারি ও কাঁকড়ার ঝাল খাইয়া সোমনাথ পরম তৃপ্তি লাভ করিত।

আহারের পর ইন্দুবাবু গড়গড়ার মাথায় বাঁধিয়া তামাকুর ধোঁয়া ছাড়াইয়া নল হাতে লইয়া বসিতেন, তখন তাঁহার মুখ দিয়া নানা প্রকার মজার গল্প বাহির হইত। নিম্নোক্ত কাহিনীটি তিনি একদিন সোমনাথকে শুনাইয়াছিলেন। কাহিনীর মধ্যে কোনও প্রচ্ছন্ন হিত-উপদেশ ছিল কিনা তাহা বলা যায় না; সম্ভবতঃ অভিজ্ঞতার বিবৃতি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। আমরা গল্পটি ইন্দুবাবুর জবানিতে প্রকাশ করিলাম।

ছয় বছর আগে এ গল্পের আরম্ভ হয়েছিল। তখন আমি কলকাতায় থাকি। সাহিত্য-চর্চার ফাঁকে ফাঁকে গান গাইতাম। গলাটা তখন মন্দ ছিল না; রবিবাবুর গান গাইতে পারতাম।

সাহিত্যিক হিসেবে যত না হোক, রবীন্দ্র-সঙ্গীতের অবৈতনিক শিক্ষক রূপে কলকাতার অভিজাত সমাজে আমার বেশ মেলামেশা ছিল; খাওয়া পার্টি বা জলসা হলেই আমার নেমন্তন্ন থাকত। সেই সূত্রেই ধনশালী ব্যারিষ্টারের মেয়ে লতার সঙ্গে পরিচয় হয়। লতা কিছুদিন আমার কাছে রবীন্দ্র-সঙ্গীত শেখবার জন্যে খুব ঝুঁকেছিল; আমিও শেখাবার চেষ্টা করেছিলাম। লতার প্রাণে দুরন্ত আবেগ ছিল—কিন্তু আমি দর্শক মাত্র। লতাকে তুমি চিনবে না: বড়লোকের মেয়ে এবং কলকাতার বিশিষ্ট অতি-আধুনিক সমাজের মুকুটমণি হলেও সাধারণের কাছে সে অপরিচিতা। কিন্তু ললিতের নাম নিশ্চয় শুনেছ; পর্দায় তার চেহারাও দেখেছ বোধহয়—বাংলা চিত্রাকাশের উজ্জ্বল পুং তারকা।

আগে লতার কথাই বলি। এমন আশ্চর্য মেয়ে আমি দেখিনি। তখন তার বয়স সতেরো কি আঠারো; একটু পুরন্ত গড়ন—দেখলে মনে হয় রজনীগন্ধার বোঁটায় একটি চন্দ্রমল্লিকা ফুটে আছে। কিন্তু কী তার মনের তেজ, যেন আগুনের ফুলকি। আর তেমনি কি সরলতা! মনের কথা লুকোতে জানত না; মাঝে মাঝে হঠাৎ এমন কথা বলে বসতো যে শ্রোতাদের কাণ লাল হয়ে উঠতো, তার বাবা লজ্জিত হয়ে পড়তেন। কিন্তু লতার সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই।

মেয়েটাকে আমার বড় ভাল লাগত; ঠিক যেন শেক্সপীয়ারের মিরাণ্ডার সঙ্গে ক্লিওপেট্রা মিশেছে। সরলতা আর তেজ। মাঝে মাঝে ভাবতাম, এ মেয়ের জীবনের ধারা শেষ পর্যন্ত কোন্ বিচিত্র খাতে বইবে কে জানে! সাধারণ গতানুগতিক খাতে যে বইবে না তা অনেকটা অনুমান করেছিলাম।

তাকে দু'চার দিন গান শেখাতে গিয়েই বুঝতে পারলাম, গান গাওয়া তার কর্ম নয়। গলায় সুর নেই; ভগবান মেরেছেন। কিন্তু কথাটা তাকে বলতে সঙ্কোচ হতে লাগল; হয়তো মনে কষ্ট পাবে। একদিন সে নিজেই বলল—মাষ্টার মশাই, আমার গলায় সুর নেই—না? আমি গাইতে শিখব না?'

লতার চোখ জলে ভরে উঠল—'বাজনা বাজাতে আমার ভাল লাগে না। এত দুঃখু হচ্ছে যে আমি গান গাইতে পারব না।'

বললাম—'আমারও দুঃখু হচ্ছে লতা!'

লতা চোখ মুছে হাসবার চেষ্টা করল—'যাক গে, উপায় নেই যখন, তখন আর কেঁদে কি হবে। আপনি কিন্তু আসা বন্ধ করতে পারবেন না। অন্তত হপ্তায় একদিন আসতে হবে। গাইতে না পারি আপনার গান শুনতে তো পাব। বলুন আসবেন।'

খুশী হয়েই কথা দিলাম। না যাবার কোনও কারণ ছিল না; লতা ভারি যত্ন ক'রে খাওয়াতো। তাছাড়া ব্যারিষ্টার সায়েবও খুব খাতির করতেন। ভদ্রলোক কম বয়সে বিলেত থেকে ফিরে কিছু মাতামাতি করেছিলেন, শোর-গরু খেয়েছিলেন; তারপর পঞ্চাশোর্ধে আবার ঠাণ্ডা হয়ে জপতপ সন্ধ্যা আহ্নিক আরম্ভ করেছেন।

যাহোক, তারপর মাঝে মাঝে যাতায়াত করি। ক্রমে লতা গান শিখতে না পাবার শোক ভুলে গেল; তবে আমি গেলে প্রত্যেকবারই দু' একটা গান না শুনে ছাড়ত না। সে সময় আমি বন্ধু-বান্ধবের পাল্লায় প'ড়ে মাঝে-মধ্যে সিনেমার গান প্লে-ব্যাক করতাম। বাংলা দেশের পুরুষ অভিনেতাদের যে গানের গলা নেই একথা অনেকেই জানে না, দর্শকেরা মনে করে অভিনেতাই বুঝি গান গাইছে। সিনেমার এইসব অজানা নতুন গান শুনতে লতা ভারি ভালবাসত।

একদিন তাকে একটা নতুন গান শুনিয়ে আমি বললাম—শিগগির এই গানটা সিনেমায় শুনতে পাবে, একটি নতুন ছেলের মুখে।'

লতা জিগ্যেস করল—'নতুন ছেলেটি কে?'

বললাম—'তার নাম ললিত, এই প্রথম ছবিতে হিরোর পার্ট পেয়েছে। ভারি ভাল ছেলে, আমি তাকে ছেলেবেলা থেকে চিনি। তার বড় ইচ্ছে শিক্ষিত ভদ্রসমাজে মেলামেশা করে।'

লতা বলল—'তবে তাঁকে নিয়ে আসেন না কেন?'

আমি বললাম—'সে সিনেমার অভিনেতা—তাকে তোমরা ভদ্র-সমাজে মেশবার অযোগ্য মনে করতে পার তাই সাহস ক'রে আনিনি।'

লতা বলল—'কিন্তু তিনি যদি ভদ্রলোক হন তাহলে অযোগ্য মনে করব কেন?'

বললাম—'তুমি মনে না করলেও তোমার বাবা মনে করতে পারেন। বাজারে সিনেমার লোকের সুনাম নেই।'

লতার বাবা ঘরেই ছিলেন, আমি তাঁর পানে তাকালাম। কিন্তু তিনি হাঁ না কিছুই বললেন না; তাঁর নির্বিকার মুখ দেখেও বুঝতে পারলাম না তাঁর মনের ভাবটা কি। কারণ লতা যাই বলুক, গৃহস্বামীর অমতে একজন আগন্তুককে তাঁর বাড়ীতে নিয়ে যেতে পারি না।

কিন্তু লতার চোখ একটু খর হয়ে উঠল। সে বলল—'সিনেমার লোক সবাই মন্দ হয়? তবে যে বললেন ইনি ভদ্রলোক।'

আমি বললাম—'ললিত যে ভদ্রলোক আমি তার জামিন হ'তে

লতা বলল—'তবে কেন বাবা আপত্তি করবেন? উনি আপত্তি করলেও আমি শুনব না।'

লতার বাবা একটু হাসলেন, বললেন—'শুনলেন তো আধুনিকা মেয়ের কথা!' তারপর ঘড়িরদিকে চেয়ে উঠে দাঁড়ালেন। সহজ স্বরে বললেন—'আপনি তাকে নিয়ে আসবেন, আমার কোনও আপত্তি নেই।'

ললিতকে ভাল ছেলে বলেছিলাম, এ কথার মধ্যে এতটুকু অত্যুক্তি ছিলনা। আমার গাঁয়ের ছেলে, আমি তাকে একরত্তি বেলা থেকে দেখেছি—যেমন শান্তশিষ্ট তেমনি বুদ্ধিমান। তার বাপ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মানুষ ছিলেন, তাই বাড়ীর শিক্ষা দীক্ষা ভালই হয়েছিল। আজকাল বেশীর ভাগ ছেলেরই মনে আদর্শ বিভ্রাট ঘটছে দেখা যায়; বিলিতি কালচার আর দেশী সংস্কৃতির ভেজালে এক কিম্ভূতকিমাকার চরিত্র তৈরি হয়; তারা হাত তুলে নমস্কার করবার বিদ্যেটাও ভুলে গেছে, আবার শেকহ্যাণ্ড করবার কায়দাটাও আয়ত্ত করতে পারেনি। ললিতের চরিত্রে কিন্তু দেশি বিলিতি সংস্কারের গঙ্গা যমুনা সঙ্গম হয়েছিল। তার মনটা যেমন ছিল খাঁটি দেশী, তেমনি আচার ব্যবহার দেখে তাকে সেকেলে ব'লে মনে হত না, বরং একটু বেশী মাত্রায় আধুনিক ব'লে মনে হত। প্রাচ্য এবং প্রতীচ্যের একাল ও সেকালের সুন্দর সমন্বয় হয়েছিল তার মনে।

ললিত কলকাতায় বি-এ পড়ছিল, হঠাৎ তার বাবা মারা গেলেন, আর্থিক অবস্থা ভাল ছিলনা, ললিতকে লেখাপড়া ছেড়ে দিতে হল। চাকরির সন্ধানে আমার কাছে এল। তখন আমিই চেষ্টা চরিত্র ক'রে তাকে সিনেমায় ঢুকিয়ে দিলাম। তার চেহারা ভাল; একেবারে নব কার্তিক না হলেও পরিপূর্ণ স্বাস্থ্যের সঙ্গে এমন একটি মিষ্টি কমনীয়তা ছিল যে দেখলেই ভাল লাগে। তাকে সিনেমায় ঢোকাতে বেশী বেগ পেতে হয়নি, যদিও সে গান গাইতে জানত না।

প্রথম বছর খানেক শিক্ষানবিশীতে কেটে গেল, দু' একটা ছোট ভূমিকায় অভিনয় করল। তারপর সে হিরোর পার্ট পেল।

এই সময় আমাদের গল্পের আরম্ভ। ললিত তখন ওয়েলেসলি অঞ্চলে ছোট্ট একটি ফ্ল্যাট ভাড়া ক'রে থাকে। ভারি ছিমছাম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ফ্ল্যাট; ললিতের সৌখীন স্বভাবের ছাপ তার প্রত্যেকটি টুকিটাকিতে পরিস্ফুট। একলা মানুষ, তাই মাইনে তখন খুব বেশী না পেলেও বেশ ষ্টাইলে থাকতো।

কিন্তু তার মনে একটা দুঃখ ছিল, সিনেমার লোকের সঙ্গে সে প্রাণ খুলে মেলামেশা করতে পারত না। কাজের সময় সে সকলের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করত, কিন্তু একটু ছুটি পেলেই আমার কাছে পালিয়ে আসত। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে আমার সঙ্গে গল্প করত, গিন্নীর সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করত। ক্রমে আমি তার মনের অবস্থা বুঝতে পারলাম। জল বিনে মীন—তার শিক্ষা এবং রুচি যে পরিবেশ কামনা করে, সে-পরিবেশ তার কর্মক্ষেত্রে নেই। তাই তার প্রাণটা হাঁপিয়ে

কিন্তু আমাকেও কাজকর্ম করতে হয়, ঘণ্টার পর ঘণ্টা তার সঙ্গে গল্প করলে আমারই বা চলে কি ক'রে? বুদ্ধিটা প্রথমে আমারই মাথায় এসেছিল, ললিত মুখ ফুটে কোনও দিন কিছু বলেনি। আমি ভাবলাম, লতাদের সমাজে একবার যদি তাকে জুটিয়ে দিতে পারি তাহলে আর তার কোনও দুঃখ থাকবে না, নিজের মনের মতন বন্ধু-বান্ধবী ও নিজেই যোগাড় করে নিতে পারবে। ও যে নিজেকে অভিজাত সমাজে বেশ ভাল ভাবেই মানিয়ে নিতে পারবে সে বিষয়ে আমার মনে কোনও সন্দেহই ছিল না। ওর মতন সুমার্জিত ব্যবহার অতি-বড় সভ্য সমাজেও খুব বেশী পাওয়া যায় না।

কথাটা তুলতেই সে আহ্লাদে লাফিয়ে উঠল। তারপর একদিন বিকেলবেলা তাকে লতাদের বাড়ী নিয়ে গেলাম।

লতা তার গোলাপ বাগানে একটা ঝারি নিয়ে ফুলগাছের গোড়ায় জল দিচ্ছিল; আমরা গিয়ে দাঁড়াতেই সে একদৃষ্টে ললিতের মুখের পানে চেয়ে রইল। ললিত হাত তুলে নমস্কার করল। আমি দেখলাম, লতার হাতের ঝারিটা থেকে জল ঝ'রে তার পা ভিজিয়ে দিচ্ছে। আমি সাহিত্যিক মানুষ, আমার মনে একটা কবিত্বময় প্রশ্ন উদয় হ'ল—লতার পদমূলে অজ্ঞাতে যে জল ঝরে পড়ছে তার ফলে লতায় ফুল ধরবে নাকি?

সেদিন বেশীক্ষণ রইলাম না, লতা আর ললিতের পরিচয় করিয়ে দিয়ে চলে এলাম। তাড়াতাড়ি চ'লে আসার কারণ, আমার মনের মধ্যে হঠাৎ একটা ব্যাপার ঘটেছিল। কিছুদিন থেকে একটা উপন্যাসের প্লট আবছায়া ভাবে আমার মাথার মধ্যে ঘুরছিল; আজ লতার বাগানে, কি ক'রে জানিনা, গল্পটাকে হঠাৎ আগাগোড়া চোখের সামনে দেখতে পেলাম। এমন আমার মাঝে মাঝে হয়; অবচেতন মন থেকে পরিপূর্ণ গল্পটি সমুদ্রোদ্ভবা উর্বশীর মতো উঠে আসে। তখন, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'সহসা এ জগৎ ছায়াবৎ হ'য়ে যায়'। আর কিছু ভাল লাগেনা; আমার বাসার ছোট ঘরে কাগজ-কলম সাজানো একটি টেবিল আমাকে টানতে থাকে।

সেদিন চলে এলাম। তারপর কিছুদিন আর লতাদের ওদিকে যাওয়া ঘ'টে ওঠেনি। নিজের উপন্যাসে মগ্ন হয়ে আছি। ললিত মাঝে একবার এসেছিল; তার কাছে শুনলাম সে এখন ওদের সমাজে মিশে গেছে। এইভাবে কয়েক মাস কেটে গেল।

মাস চারেক পরে হঠাৎ একদিন বিকেলবেলা ললিত এসে হাজির; মুখে উত্তেজনা-ভরা হাসি। বলল,—'আপনি বোধহয় ভুলে গেছেন, আজ আমাদের ছবির উদ্বোধন। চলুন ইন্দুদা, আপনাকে দেখিয়ে আনি। বৌদি, আপনিও চলুন না।'

গিন্নী যেতে পারলেন না, কোলের ছেলেটা বায়না ধরেছে; আমি একাই ললিতের সঙ্গে গেলাম। তার মুখে আমার গানগুলো কেমন ওৎরালো জানবার ইচ্ছে হল।

বেরুবার সময় ললিত গিন্নীকে ব'লে গেল—'ইন্দুদা ছবি দেখে

ছবিঘরে খুব ভিড়; উদ্বোধন রজনীতে যেমন হয়ে থাকে। তখনও ছবি আরম্ভ হয়নি; ললিত আমাকে ওপরে নিয়ে গিয়ে একটা বক্সে বসিয়ে দিলে। দেখলাম, বক্স আর ব্যাল্‌কনি অভিজাত সমাজের স্ত্রীপুরুষে ভরা। ললিত তাদের মধ্যে ঘুরে ঘুরে গল্পগাছা করতে লাগল। সে বেশ জমিয়ে নিয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। আশ্চর্য হলাম না; ললিত যে রকম মিষ্ট স্বভাবের ছেলে তাতে যে-কোনও সমাজে সে জনপ্রিয় হতে পারে।

ছবি আরম্ভ হল। দেখলাম ছবিটি ভালই হয়েছে। গানগুলি ললিতের মুখে বেশ মানিয়েছে। আর সব চেয়ে ভাল লাগল ললিতের সহজ সাবলীল অভিনয়। তার চেহারায় বোধহয় একটা জিনিষ আছে, যাকে ইংরেজিতে বলে **sex appeal**; সেটা এক্ষেত্রে মেয়েদের কাছেই বেশী ধরা পড়বার কথা, আমার আন্দাজ মাত্র। মোট কথা মেয়েরা যে তাকে খুবই পছন্দ করেছিলেন তার পরিচয় সে-রাত্রে পেলাম। কিন্তু সে পরের কথা। ছবি দেখে বুঝতে বাকি রইল না যে ললিতের কপাল খুলেছে, এবার তাকে নিয়ে পরিচালক মহলে কাড়াকাড়ি পড়ে যাবে।

ছবি শেষ হলে ললিত আমাকে তার বাসায় নিয়ে গেল। ললিতের বাসায় মাত্র একটি চাকর; সে-ই রান্নাবান্না করে। বাসায় পৌঁছে ললিত চাকরকে ছুটি দিয়ে দিলে; চাকর রাত্রির শো'তে মালিকের ছবি দেখতে যাবে।

টেবিলের ওপর খাবার সাজানো ছিল; আমরা খেতে বসলাম। ললিতের বাসায় তিনটি ঘর—শোবার ঘর, বসবার ঘর, আর ডাইনিং রুম। ঘরগুলি ভারি সুরুচির সঙ্গে সাজানো। একটু বিলিতী-ঘেঁষা, কিন্তু উৎকট সাহেবিয়ানা নেই; দেশী আরামের সঙ্গে বিলিতী পরিচ্ছন্নতা মিশেছে। ভারি ভাল লাগল।

খেতে বসে ললিত খুব উৎসাহ আর উত্তেজনার সঙ্গে কথা কইতে লাগল। নবলব্ধ সিদ্ধি আর খ্যাতি মানুষকে আনন্দে অধীর করে তোলে। কিন্তু লক্ষ্য করলাম, সে তার উদ্দীপ্ত আনন্দের মধ্যেও মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছে; থেকে থেকে একটা অস্বস্তির ভাব তার মুখে ফুটে উঠছে। কিছু বুঝতে পারলাম না; ভাবলাম, ললিত ভারি বিনয়ী ছেলে, অহঙ্কারের লেশমাত্র তার শরীরে নেই; তাই সে এই হঠাৎ পাওয়া গৌরব হজম করতে পারছে না। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'জয় ক'রে তবু ভয় কেন তোর যায়না'; ললিতের মনের অবস্থাও বোধহয় অনেকটা সেই রকম।

খাওয়া শেষ করে উঠতে পৌনে এগারোটা বাজল। ভাবলাম, আর দেরি নয়, এবার উঠে পড়ি। কিন্তু ললিত কোথা থেকে এক গড়গড়া যোগাড় করেছিল; খাম্বিরা তামাক সেজে যখন গড়গড়ার মাথায় বসিয়ে দিলে তখন আর উঠতে পারলাম না। বসবার ঘরে কৌচের ওপর আড় হয়ে আবার গল্প আরম্ভ হল।

তারপর কখন এগারোটা বেজে গেছে; আমাদের আগড়ম বাগড়ম

আমি বললাম—'লতাকে ? কৈ না। সে এসেছিল নাকি ?'

ললিত বলল—'হুঁ। আমার বড় ভয় করছে, ইন্দুদা। সে হয়তো একটা কাণ্ড ক'রে বসবে।'

উঠে বসে বললাম—'কী কাণ্ড ক'রে বসবে ? তোমাদের ব্যাপার তো আমি কিছুই জানিনা। সব খুলে বল।'

ললিত একটা ঢোক গিলে বলল—'আপনি তো লতার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়ে সেই চ'লে এলেন। তারপর—তারপর অনেক ব্যাপার ঘটেছে।'

ললিতকে জেরা করে সব কথা বার করতে হল। প্রথম সাক্ষাতের সঙ্গে সঙ্গেই লতার সমস্ত মন ললিতের ওপর গিয়ে পড়ে; যেন এতদিন ললিতের জন্যই সে পথ চেয়ে ছিল। লতা মনের কথা গোপন করতে পারেনা, চেষ্টাও নেই। অল্পদিনের মধ্যেই ললিত বুঝতে পারল লতা তাকে পাবার জন্যে ক্ষেপে উঠেছে। ললিতের অবস্থা শোচনীয়। ললিত-লতাকে খুবই পছন্দ করে; কিন্তু লতার দুরন্ত হৃদয়াবেগ দেখে তার ভয় করে—সে লতাকে এড়িয়ে চলে। আজ সিনেমায় ছবি শেষ হবার পর ক্ষণেকের জন্য তাদের দেখা হয়েছিল; লতা এমনভাবে একদৃষ্টে তার মুখের পানে তাকিয়েছিল যে ললিতের ভয় হয়েছিল বুঝি শহরসুদ্ধ লোকের সামনে একটা কেলেঙ্কারী কাণ্ড ক'রে বসে। প্রবল নেশায় মানুষের যেমন হিতাহিত জ্ঞান থাকেনা লতার চোখে সেই দৃষ্টি। দু'একটা কথা বলেই ললিত পালিয়ে এসেছে।

ভালবাসার পাত্রকে নাটকের নায়করূপে দেখলে বোধহয় অনুরাগ আরও বেড়ে যায়। সব শুনে আমি বললাম,—'কিন্তু তোমার পালিয়ে বেড়াবার কী দরকার বুঝতে পারছি না। লতা যখন তোমাকে বিয়ে করতে চায় তখন তাকে বিয়ে করলেই তো ল্যাটা চুকে যায়। তাকে তো তোমার অপছন্দ নয় ?'

ললিত বলল,—'আপনি বুঝছেন না ইন্দুদা। লতা খুব ভাল মেয়ে, তার মনে ছলা কলা নেই—তাকে আমার বড্ড ভাল লাগে। কিন্তু ভাল লাগলেই তো চলেনা। লতা বড় ঘরের মেয়ে, বড় মানুষের মেয়ে; আর আমি সিনেমা অ্যাক্টর। আমি কোন মুখে লতার বাবার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করব ? তিনি বোধ হয় লতার মনের ভাব বুঝতে পেরেছেন, আজকাল আমাকে দেখলেই সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠেন। তা থেকেই বুঝতে পারি আমাকে তিনি লতার উপযুক্ত পাত্র মনে করেন না, হয় তো লতাকে আমার সঙ্গে মিশতে দিয়ে মনে মনে পস্তাচ্ছেন—'

এই সময় ঘড়ির ওপর নজর পড়ল, দেখি সাড়ে এগারোটা। লতা এবং ললিতের প্রসঙ্গ খুবই জটিল হয়ে উঠেছে বটে, কিন্তু আর দেরী করা চলে না। আমি উঠে পড়লাম, বললাম—'দিব্যি জট পাকিয়েছ দেখছি। রাতারাতি এ জট ছাড়ানো যাবে না, একটু ভেবে চিন্তে দেখতে হবে। আজ উঠি।'

ললিত আমার হাত ধ'রে মিনতি করে বলল—'আজ রাত্তিরটা বেচারা বড়ই বিব্রত হয়ে পড়েছে; কিন্তু আমাকে মাথা নেড়ে বলতে হল—'না ভাই, তোমার বৌদি ভীতু মানুষ, আমি না ফিরলে সারারাত্রি ছেলে কোলে ক'রে বসে থাকবে। আজ ফিরতেই হবে।'

কিন্তু এত সহজে ফেরা হল না। চাদরটি গলায় দিয়ে বেরুবার উপক্রম করছি এমন সময় সদর দরজায় খুট্ খুট্ করে টোকা পড়ল।

ললিত চমকে উঠে বলল—'কে ?'

দরজার ওপারে থেকে কিছুক্ষণ জবাব নেই; তারপর চাপা গলায় আওয়াজ এল—'দোর খোল—আমি লতা।'

ঘরের মাঝখানে বজ্রপাত হলেও এমন স্তম্ভিত হতাম না। লতা! এই রাত্রে লতা এসেছে ললিতের নির্জন বাসায় ? ফ্যাল ফ্যাল ক'রে তাকালাম ললিতের মুখের পানে; সেও ফ্যাল ফ্যাল ক'রে আমার পানে তাকালো। তারপর আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে বলল—'কী করি আমি এখন ?' তার ভাব দেখে মনে হল যেন সে চোর, কোণ ঠাসা হয়েছে।

আমি বললাম—'দোর খুলে দাও—আর উপায় নেই। আমি পাশের ঘরে লুকোচ্ছি। আমাকে দেখলে লতা লজ্জা পাবে।'

আমি ললিতের শোবার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ ক'রে দিলাম। ওঘর থেকে শব্দ পেলাম, ললিত সদর দরজা খুলে দিলে; তারপর দরজা আবার বন্ধ হল। তারপর আর সাড়াশব্দ নেই।

আমি অন্ধকারে দাঁড়িয়ে বোকার মতো এদিক ওদিক তাকাচ্ছি, হঠাৎ নজরে পড়ল দরজার চাবির ফুটো দিয়ে আলো আসছে।

লোভ সামলাতে পারলাম না।

ললিত দাঁড়িয়ে আছে ঘরের মাঝখানে, আর তার পানে চেয়ে লতা সদর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে; তার মুখের ওপর পড়েছে বিদ্যুৎ বাতির লজ্জাবিদারী আলো। লতার সে মুখ আমি জীবনে ভুলব না। আমি সাহিত্যিক, প্রেম নিয়েই আমার কারবার; কিন্তু এমন তীব্র সর্বগ্রাসী প্রেম যে মানুষ অনুভব করতে পারে তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। আমি আড়াল থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখছি, তবু আমারই যেন দম বন্ধ হয়ে আসবার উপক্রম হল।

তারপর লতা ছুটে গিয়ে ললিতের বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আর তারপর—সে কী চুম্বন! বিলিতী সিনেমাতেও এমন চুম্বন কখনও দেখিনি; যেমন দীর্ঘ তেমনি জ্বালাময়। অভিনয়ে ও-জিনিষ হয় না; একটি চুম্বনে নিজেকে সর্বস্বান্ত ক'রে বিলিয়ে দেওয়া বাস্তবেও কদাচিৎ হয়।

ফুটো থেকে চোখ সরিয়ে নিতে হল।

কিছুক্ষণ কাটবার পর দু'জনের গলার আওয়াজ শুনতে পেলাম। খুব স্পষ্ট নয়—ছাড়া-ছাড়া ভাঙা-ভাঙা—লতাই বেশী কথা বলছে...তুমি আমাকে চাও না ?...একটুও ভালবাসো না ? কিন্তু আমি যে তোমাকে ললিত বলছে...লতা, আমি তোমাকে ভালবাসি...তোমাকে বিয়ে

দিয়ে ললিতের গলা জড়িয়ে ধরেছে, ললিতও একটা বাহু দিয়ে তার কাঁধ বেষ্টন ক'রে ধরেছে ; মুখোমুখি কথা হচ্ছে—লতা বলছে…আমি আজ সারা রাত্রি তোমার কাছে থাকব…তাহলে তো বাবা আর আপত্তি করতে পারবেন না…আমার লজ্জা নেই, কিছু নেই, আমি তোমার কাছে থাকব—

ললিত একবার চকিতে শোবার ঘরের দোরের দিকে তাকালো। তারপর লতার কানে কানে কি বললো। লতাও বিস্ফারিত চোখে দোরের দিকে তাকালো, তারপর জোরে দাঁত দিয়ে নিজের ঠোঁট কামড়ে ধরল। বুঝলাম, আমার কথা হচ্ছে—

ফুটো থেকে সরে গিয়ে ললিতের বিছানার ওপর বসলাম। যুবক, যুবতীর দুর্বার হৃদয়াবেগ বেশী বয়সে সহ্য হয়না, স্নায়ু ক্লান্ত হয়ে পড়ে। যা হোক, মিনিট পাঁচেক বসে থাকবার পর সদর দরজা খোলার শব্দ পেলাম। তার কিছুক্ষণ পরে ললিতের ভাঙা গলার আওয়াজ এল—'ইন্দুদা, বেরিয়ে আসুন, লতা চলে গেছে।'

তখন বারোটা বেজে গেছে। বেরিয়ে এসে দেখলাম ললিতের মুখখানা ফ্যাকাসে। সে কৌচের ওপর বসে পড়ল, কিছুক্ষণ মুখ ঢেকে বসে রইল। তারপর মুখ তুলে বলল—'এই ভয়ই আমি করেছিলাম ইন্দুদা। কিন্তু এখন উপায় কি বলুন।

বললাম—'বিয়ে করা ছাড়া আর উপায় নেই।'

'লতার বাবা আমার সঙ্গে বিয়ে দেবেন না।'

'চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি ?'

'চেষ্টা করব। কিন্তু আমি জানি তিনি রাজি হবেন না। তারপর কি করব ?'

আমি একটু অধীর হয়ে পড়লাম। মনে মনে আদর্শবাদী হলেও আদর্শ নিয়ে মাতামাতি করা আমার সহ্য হয়না। বললাম—'লতা তোমাকে যে সুযোগ দিয়েছিল তা যদি তুমি নিতে তাহলে সব সমস্যাই সহজ হয়ে যেত। এখনও সে-পথ খোলা আছে—'

ললিতের ফ্যাকাসে মুখ হঠাৎ লাল হয়ে উঠল। সে আমাকে ধিক্কার দিয়ে বলল—'ছি ইন্দুদা, আমাকে এমন ছোটলোক মনে করেন আপনি ? বাপ-পিতাম'র রক্ত নেই আমার শরীরে ? ম'রে গেলেও আমি তা পারব না।'

'তবে আর কোনও উপায় নেই।' ব'লে আমি চলে এলাম।

ললিত সে রাত্রে যে ব্যবহার করেছিল তার জন্যে তাকে নিন্দে করবার কথা বোধ হয় কারুর মনে উদয় হবেনা ; তার রক্তে বহু পূর্ব-পুরুষের সঞ্চিত শুচিতা তাকে যে শক্তি দিয়েছিল সে শক্তি সকলের নেই তা আমি জানি। কিন্তু তবু আমার মনটা সন্তুষ্ট হ'তে পারল না। লতা আর ললিতকে আমিই একত্র করেছিলাম ; তাদের মন নিয়ে আজ যে জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে তার জন্যে খানিকটা দায়িত্ব আমার নেই। তার ঐকান্তিক আত্ম-বিস্মৃতি একটি সুখময় সৌরভের মতো চিরদিন আমার মনে গাঁথা হয়ে থাকবে। কিন্তু ওদের মিলন মিটাবার জন্যে আমি কি করতে পারি ? লতার বাবাকে আমার কোনও কথা বলতে যাওয়া ধৃষ্টতা। মাঝে মাঝে মনে হতে লাগল, যদি আমি ললিতের বাসায় এত রাত্রি পর্যন্ত না থাকতাম তাহলে হয়তো দৈবের নিয়মে সমস্যার সমাধান আপনিই হয়ে যেত—বিধাতার ঘূর্ণি হাওয়া যেমন নিজের প্রচণ্ডতার বলেই পৃথিবীর বদ্ধ কলুষভরা আবহাওয়াকে পরিষ্কার ক'রে দেয়, তেমনি ওদের জীবনের গুমটও কেটে যেত। কিন্তু বিধাতার বোধ হয় তা ইচ্ছে নয়।

এদিকে আমার ভাগ্যেও যে বিধাতার ঘূর্ণি হাওয়া ঘনিয়ে এসেছে তা তখনও টের পাইনি। দু'চার দিন কেটে গেল ; ললিত বা লতার আর দেখা নাই। এদিকে উপন্যাসখানা শেষ করে ফেলেছি, এমন সময় বোম্বাই থেকে ডাক এল। ঘূর্ণি হাওয়ায় গাছের পাতা যেমন বোঁটা থেকে ছিঁড়ে উড়ে যায়, আমি তেমনি উড়ে এসে বোম্বাইয়ে পড়লাম। সেই থেকে বোম্বাইয়ে আছি। ইতিমধ্যে লতা বা ললিতের আর কোনও খবর পাইনি। তাদের জীবনের পরম সমস্যা কি করে সমাধান হল, অথবা সমাধান হল কিনা তার কিছুই জানিনা।

কয়েক মাস আগে একবার কলকাতা যেতে হয়েছিল ; গিয়ে দিন দশেক ছিলাম।

একদিন সকালবেলা ললিতের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। ললিত এখন মস্ত আর্টিষ্ট, অনেক টাকা রোজগার করে ; কিন্তু সেই পুরোণো বাসাতেই আছে।

আমি গিয়ে দেখি, ললিত সবে ঘুমিয়ে উঠেছে ; চুল উস্ক খুস্ক, দাড়ি কামায় নি, বসবার ঘরে একলা চা খাচ্ছে। আমাকে দেখে ভূত দেখার মতো চমকে উঠল। তারপর সামলে নিয়ে তাড়াতাড়ি আমার পায়ের ধুলো নিলে।

ললিতের ঘরের আর সে ছিমছাম ভাব নেই। ললিতও এই পাঁচ বছরে অনেক বদলে গেছে। চেহারা যে খুব খারাপ হয়েছে তা নয়, কিন্তু সে কান্তি নেই। সব চেয়ে বেশী পরিবর্তন হয়েছে তার মনে ; আগে যা তালশাঁসের মতো কচি ছিল তাই যেন আঁটির মতো শক্ত হয়ে উঠেছে। এই পরিবর্তনটাই আগে চোখে পড়ে।

ললিত প্রথমে আমার চোখে ধুলো দেবার চেষ্টা করল, অভিনয় করতে লাগল যেন সে আগের মতোই আছে। কিন্তু অভিনয় বেশীক্ষণ টিকল না, হঠাৎ এক সময় ভেঙে পড়ল। সে বলল—ইন্দুদা, আপনি বোধ হয় বুঝতে পেরেছেন। আমি বয়ে গেছি—মদ ধরেছি।' এই বলে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল।

বুঝতে আমি পেরেছিলাম। শুধু মদ নয়, সব রকম দোষই তার হয়েছে। কিন্তু তবু সে বেপরোয়া বেলেল্লা হয়ে যায়নি। আদর্শ ভ্রষ্ট

তারপর হঠাৎ একদিন লতাকে নিয়ে তিনি বিলেত যাত্রা করেছিলেন। মাস ছয়েক আর তাঁদের কোনও খোঁজ খবর ললিত পায়নি। ছ'মাস পরে একেবারে মেয়ে-জামাই নিয়ে লতার বাবা দেশে ফিরে এলেন। জামাই একজন নবীন বার-অ্যাট্-ল।

লতার বাবার বিচিত্র চরিত্রের কথা ভাবতে লাগলাম। বিপদে পড়লেই মানুষের প্রকৃত স্বরূপ ধরা পড়ে। তিনি কম বয়সে সাহেবিয়ানা করেছিলেন; মাঝে রক্তের জোর কমবার পর দেশের পুরোনো সংস্কৃতি তাঁকে টেনেছিল। কিন্তু যেই তিনি বিপদে পড়লেন অমনি ছুটে গেলেন যৌবনের পরিচিত ক্ষেত্রে। দলের পাখী একটু শঙ্কিত হলেই নিজের দলে ফিরে যেতে চায়।

লতার সঙ্গে তারপর আর ললিতের দেখা হয়নি। সমাজে মেশা ললিত ছেড়ে দিয়েছে। প্রথম কিছুদিন সে বেশ শক্ত হয়ে ছিল। তারপর একদিন কখন্ তার মনের মধ্যে একটা সুতো ছিঁড়ে গেল, সংস্কার আর তাকে তার আদর্শের কোলে ধরে রাখতে পারল না; বাপ-পিতামহের রক্ত ভেসে গেল। মন যতই শক্ত হোক, প্রত্যেক মানুষের জীবনেই এমন সময় আসে যখন মনে হয়—বুঝেছি ভাই দুঃখের মধ্যেই সুখ, মাতাল হয়ে পাতাল পানে ধাওয়া।

যেদিন ললিত লতাকে মুঠোর মধ্যে পেয়ে ছেড়ে দিয়েছিল সেদিন তার বিচার করিনি, আজও তাকে বিচার করবার স্পর্দ্ধা হলনা।

তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে আসছি, ললিত হঠাৎ বলল—'আচ্ছা ইনুদা, সে-রাত্রে যদি লতার কথা শুনতাম তাহলেই বোধ হয় ভাল হত—না? অন্তত বয়ে যেতাম না।'

আমি বললাম—'ভাই, এ দুনিয়ায় কিসে যে ভাল হয় আর কিসে মন্দ হয় তা আমি আজ পর্য্যন্ত বুঝে উঠতে পারিনি। তবে দেখেছি, বেশীর ভাগ সময়েই ভাল করলে মন্দ হয়। কিন্তু তা বলে সবাই মিলে মন্দ করলেই যে মানবজাতি উদ্ধার হয়ে যাবে এ বিশ্বাসও আমার নেই। গীতায় শ্রীভগবানই খাঁটি কথা বলেছেন—মা ফলেষু।'

দোর পর্য্যন্ত এসে জিগ্যেস করলাম—'লতারা কোথায় আছে জানো?'

ললিত বলল—'শুনেছি ল্যান্সডাউন রোডের বাড়ীতেই আছে। লতার বাবা বিলেত থেকে ফিরে আসবার কিছুদিন পরেই মারা গেছেন।' এই বলে সে একটু তিক্ত হাসল।

সেদিন সন্ধ্যেবেলা ল্যান্সডাউন রোডের বাড়ীতে লতাকে দেখতে গেলাম।

বাড়ী বাগান ঠিক আগের মতোই আছে, কিছু বদলায় নি। লতাও ঠিক তেমনি আছে, তার স্বভাবে কোনও পরিবর্ত্তন হয়নি। শুধু এই কয় বছরে তার দেহ-মন আরও পরিণত হয়েছে, পরিপূর্ণ হয়েছে।

আমাকে আগের চেয়েও বেশী আদর যত্ন করল। কত কথা জিজ্ঞাসা করল—বোম্বাইয়ে কেমন আছি—কি করছি—কত টাকা রোজগার করি—এই সব। আমাকে অনেকদিন পরে পেয়ে তার যেন আনন্দ ধরে না। সরল প্রাণের অকুণ্ঠ আনন্দ।

কিছুক্ষণ পরে একটি বছর তিনেকের মেয়ে ছুটে এসে তার হাঁটু জড়িয়ে দাঁড়ালো। ফুটফুটে সুন্দর মেয়েটি, লতার মতো নির্ভীক স্বচ্ছ দুটি চোখ। লতা বলল—'আমার মেয়ে। ওর নাম ললিতা।'

আমি চমকে লতার মুখের পানে তাকালাম। লতা আমার চোখের চকিত প্রশ্ন বুঝতে পারল; একটু হেসে মাথা নেড়ে বলল—'আপনি যা ভাবছেন তা নয়—ও আমার স্বামীর মেয়ে।'

আমার কান লাল হয়ে উঠল। লতা তখন মেয়েকে বলল—'যাও ললি, খেলা করগে।'

ললিতা চলে গেল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আমি সঙ্কুচিতভাবে বললাম—'লতা, যা হতে পারত তার জন্যে তোমার মনে কি কোনও দুঃখ নেই?'

লতা সরল ভাবে বলল—'আগে ছিল, এখন আর নেই। যা পাব না তার জন্যে কেঁদে কি হবে, মাষ্টার মশাই? কিন্তু ভুলিনি; ভুলতে চাইও না। তাই মেয়ের নাম রেখেছি ললিতা।'

তবু আবার জিগ্যেস করলাম—'তুমি মনের সুখে আছ?'

সে একটু যেন অবাক হয়ে বলল—'মনের সুখে থাকব না কেন?'

তারপর লতার স্বামী এলেন। ঢিলা পায়জামা ও ড্রেসিং গাউন পরা সুপুরুষ যুবক। লতা পরিচয় করিয়ে দিল—'ইনি আমার মাষ্টার মশাই—এঁর কথা তোমাকে বলেছি—' ব'লে এমন ভাবে স্বামীর মুখের পানে তাকালো যে বুঝতে পারলাম, সেই রাত্রির কথাও লতা স্বামীর কাছে গোপন রাখেনি।

লতার স্বামী হাসিমুখে আমার অভ্যর্থনা করলেন। শেষে স্ত্রীকে বললেন—'লতা, ওঁকে সহজে ছেড় না, রাত্রে ডিনার খেয়ে যাবেন। আমার এখন থাকবার উপায় নেই, বাইরের ঘরে মক্কেল বসে আছে। কিন্তু ওঁকে যদি গান গাইতে রাজি করতে পার তাহলে আমি যেন বঞ্চিত না হই। বাইরে খবর পাঠিও।

সে-রাত্রে ডিনার খেয়ে তবে ওদের হাত থেকে ছাড়া পেলাম। লতা রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইবার জন্যে ঝুলোঝুলি করেছিল, কিন্তু রবীন্দ্র সঙ্গীত সেদিন আমার গলা দিয়ে বেরুল না। রামপ্রসাদের 'বল্ মা তারা দাঁড়াই কোথা' গেয়ে ফিরে এলাম।

ধর্মানুষ্ঠানে মহাকাব্যের নারী

শ্রীসুনীতিকুমার পাঠক

রামায়ণে আছে,

ধর্মার্থকামা খলু জীবলোকে, সমীক্ষিতো ধর্মফলোদয়েষু
যে তত্র সর্বেস্যুরসংশয়ং মে ভার্যেব বশ্যাভিমতা সপুত্রা[1]

২।৭১।

অর্থাৎ, যেরূপ ভার্যা বশীভূত হইয়া ধর্ম, অভিমতা হইয়া কাম ও পুত্রবতী হইয়া অর্থ উৎপাদন করে, সেইরূপ ধর্ম অর্থ ও কাম লৌকিক সুখসমূহের হেতু ধর্ম। ইহা অসংশয়ে বলা চলে যে, ধর্ম হইতেই ধর্ম অর্থ ও কাম উৎপাদিত হয়। মহাভারতে অনুরূপ বলা হইয়াছে,

যদা ধর্মশ্চ ভার্যা চ পরস্পর বশানুগৌ।
তদা ধর্মার্থকামানাং ত্রয়াণামপি সংগমঃ ॥[2]

অর্থাৎ, যেখানে ধর্ম ও ভার্যা পরস্পর বশবর্তী সেখানে ধর্ম অর্থ ও কাম এই তিনেরই মিলন ঘটে।

উভয় শাস্ত্রেই একই কথা। ধর্ম ও ভার্যার পরস্পর সংমিলনে মানুষের প্রেয় ও শ্রেয়ো লাভ।

মহাকাব্যে ধর্ম শব্দটী বহু ব্যাপক। সমগ্র ধর্মকে কেন্দ্র করিয়া ব্যষ্টি ও সমষ্টি মানবজীবনের পূর্ণতা লাভের পথে অগ্রসর হয়।[3] ধর্ম একাধারে ঐহিক অর্থকামাদিভূতি লাভ ও পারত্রিক মোক্ষ ও স্বর্গপ্রাপ্তির হেতু।[4] সমগ্র ধর্ম ব্যাপকভাবে সার্বজনীন, সার্বভৌমিক, শাশ্বতিক ও ছুজ্ঞেয়[5] হইলেও সংকীর্ণভাবে নীতিধর্ম, দেশধর্ম, জাতিধর্ম, কুলধর্ম ও একক বা ব্যক্তিধর্মে আসিয়া সীমার গণ্ডীকে ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্রতর করিয়াছে। এই ব্যক্তিধর্ম প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিমূলক পন্থার মধ্য দিয়া আনুষ্ঠানিক ও চারিত্রিক ধর্মসাধনের সহায়ক। বেদাদি শাস্ত্রচর্চা, প্রামাণ্য গ্রন্থাদির অনুশীলন ও আচার পালনাদির দ্বারাই আনুষ্ঠানিক ধর্ম চারিত্রিক উন্নতি ও চিত্তশুদ্ধির ফলে ঐহিক শ্রী ও পারলৌকিক কল্যাণ আনয়ন করে। এইগুলি অন্যোন্যসাপেক্ষ। মহাভারতে স্পষ্টই বলা হইয়াছে, যজ্ঞাদি শাস্ত্রীয় কর্ম, অধ্যয়ন, দান, তপস্যা, সত্য, ক্ষমা, সংযম ও অলোভ এই অষ্টবিধ মার্গ ধর্মলাভের সহায়ক।[6]

১। রামায়ণ অযোধ্যা ২১।৫৭ শ্লোক

২। মহাভারত বন ৩১২।১০২

৩। লোকযাত্রার্থমেবেহ ধর্মস্য নিয়মঃ কৃতঃ। মহাভারত শা ২৫৮।৪

৪। উভয়ত্র সুখোদর্ক ইহ চৈব পরত্র চ। (ঐ শা ২৫৮।৫)

৫। দুজ্ঞেয় শাশ্বতোধর্মঃ স চ সত্যে প্রতিষ্ঠিত (ঐ বন ২০৫।৪১)

৬। ইজ্যা ধ্যয়ন দানানি তপঃ সত্য ক্ষমা দমঃ

মহাকাব্যের যুগে নারীরা ধর্মানুষ্ঠান কার্যে পুরুষদের সহিত বা কখনও স্বতন্ত্রভাবে[7] নিত্য ও নৈমিত্তিক অংশগ্রহণ করিতেন, এরূপ উল্লেখ মহাকাব্যে বহু মিলে।

নৈমিত্তিক যজ্ঞাদি ধর্মানুষ্ঠান কার্যে মেয়েরা স্বামীর সহিত অংশ গ্রহণে অধিকারিণী ছিলেন। 'সহধর্মচারিণী', সহধর্মিণী প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগে তাহা সহজেই অনুমিত হয়। রামায়ণে অশ্বমেধ-যজ্ঞে ও অগ্নিষ্টোমযাগাদি কার্যে কৌশল্যা ধর্মপত্নী হিসাবে অংশ গ্রহণ করিতেন। অন্যান্য দশরথ মহিষীরাও সহযোগিতা করেন[8]। রাজ্ঞী কৌশল্যা স্বহস্তে সেই অশ্বের পরিচর্যাপূর্বক শিরশ্ছেদন করিলেন। মহাভারতেও রাজ্ঞীরা স্বহস্তে বধ করিলেন না কিন্তু তাঁহাদের সমক্ষেই এই কার্য অনুষ্ঠিত হয়, তাঁহারা ঐ যজ্ঞকার্যে স্বামীর সহিত অংশগ্রহণ করেন।[9] রাজসূয় যজ্ঞে দ্রৌপদী বিশিষ্টস্থান অধিকার করেন।

অভিষেক কার্য সস্ত্রীক করাই বিধি ছিল। আরও বহু কুলরমণী সেই পূতকর্মে মাংগলিক আচরণের দ্বারা ধর্মানুষ্ঠানকে সার্থক ও পূর্ণ করিয়া তুলিলেন। বিবাহ, পুংসবনা স্নাত সংস্কারগুলিকে আনুষ্ঠানিক ধর্ম বলিয়াই গ্রহণ করা হইত। ঐ সকল কার্যে নারীর বিশেষ আসন স্বীকৃত হইয়াছে। এমন কি শ্রাদ্ধতর্পণাদি প্রেত্যকর্মেও নারীরা পুরুষের অংশগ্রহণ করিয়া দেবকুল ও পিতৃকুলের তৃপ্তিবিধান করিয়াছেন। দশরথ, দুর্যোধন, পাণ্ডু, প্রভৃতির মহাপ্রয়াণের পর তাঁহাদের পত্নীরাই সশ্রদ্ধভাবে প্রেতের উদ্দেশে শাস্ত্রীয় ধর্মানুষ্ঠানেরত।[10]

তাঁহারা নিত্যকৃত্যের মধ্যে পুরুষদের মতই পৃথকভাবে যজ্ঞাগ্নি রক্ষা

৭। অবিবাহিত বা বিধবাদের স্বতন্ত্রভাবে ধর্মাচরণের জন্য বিশেষ ভাবে উল্লেখ নাই। এমন কি, অসংস্কৃতায়াঃ কন্যায়াঃ কুতো লোকাস্তবানঘে (শল্য ৫২।১০) এবং নাস্তি ত্রিলোকে স্ত্রী কাচিৎ যা বৈ স্বাতন্ত্র-মর্হতি (অনু ২০।১০) প্রভৃতির উল্লেখ পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু যোগিনী সুলভা (শান্তি ৩২০ অধ্যায়) শাণ্ডিল্য দুহিতা (শল্য ৫৪।৫৬ অধ্যায়) সিদ্ধা শিবা (উদ্যোগ ১০৯।১৯ শ্লোক) ও হরিবংশে প্রভাসকাণ্ড (প ৩।১৬০) ও রামায়ণে বেদবতীর (উত্তরকাণ্ড ১৭ অধ্যায়) প্রভৃতি কাহিনী হইতে সেযুগে মেয়েরা যে স্বতন্ত্রভাবে ধর্মানুষ্ঠান করিতেন তাহার প্রমাণ মিলে।

৮। শ্রীমাংশ্চ সহ পত্নীভিঃ রাজা দীক্ষামুপাবিশত (আদিকাণ্ড ১৪।৩২) ও বিশেষ বিবরণের জন্য ১৪ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

৯। মহাভারত অশ্বমেধ ৮৯

করিয়াছেন।১১

বেদাদি অধ্যয়ন ও চর্চা সে যুগের অনেকেরই অনুষ্ঠের কর্ম ছিল। কুন্তলা (মহা আদি ৭১-৭৪ অধ্যায়) সাবিত্রী (বন ২৯২-২৯৬) শিবা উদ্যোগ ১০৯।১৯) বিদুলা (উদ্যোগ ১৩৩ অধ্যায়) সুলভা (শান্তি ৩২০) প্রভাসভার্যা (হরিবংশ) ব্রহ্মজা গৌতমী (অনুশাসন ১ম অধ্যায়) আচার্যা অরুন্ধতী (অনু ১৩০ অধ্যায়) শাণ্ডিলী (অনু ১২৩ অধ্যায়) সত্যবতী (আদি ১০৫।৩৯) গান্ধারী (আদি ১১০ অধ্যায়) কুন্তী ১১১।৪ আদি) দ্রৌপদী, বেদবতী (রামা উত্তর) অহল্যা (আদি ৮-৪৯ সর্গ) প্রভৃতি নারীরা প্রত্যেকেই বর্ণাশ্রমধর্মচর্চার মধ্যে বেদাদি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তবে বেদ অধ্যয়নের অধিকার ক্রমেই কমিয়া আসিতেছিল।১১ক

স্নানাদি ক্রিয়াতে মন্দোদরী, কুন্তী, দ্রৌপদী, সীতা, গান্ধারী প্রভৃতি মহাকাব্যের রমণীরা অংশগ্রহণ করিয়া ইহজগতে ও পরজগতে কল্যাণলাভের অধিকারিণী হন।

সুলভা, শিবা, প্রভৃতি ব্রহ্মচারিণী ছাড়াও অনেকে স্বীয় ইষ্ট-সিদ্ধির জন্য তপস্যা ও যোগাদিতে নিরত হইতেন। বেদবতী, অম্বা (উদ্যোগ ১৮৬-১৯০) উল্লেখযোগ্য। বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস গ্রহণও করিতেন। সত্যবতী (আদি ১২৮।১২) কুন্তী (আশ্রম ১৭।২০) গান্ধারী (আশ্রম ৩২) সত্যভামা (মৌষ ৭।৭৪)।

ধর্মানুষ্ঠানের অন্য উপায়গুলি নৈতিক ও চারিত্রিক। সেই দিক দিয়া সত্য, ক্ষমা, সংযম, ও অলোভ প্রভৃতি সহনীয় ও পবিত্র গুণাবলীতে ভূষিত হইয়া সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, কৌশল্যা, গান্ধারী, দ্রৌপদী কেবল সে যুগের নয় অদ্যাবধিও পৃথিবীর আদর্শস্থানীয়া, পূজনীয়া ও বরণীয়া। নারীর স্বভাবজাত গুণ মৃদুতা, মধুরতা, বিরুবতা ও তনুতা, কিন্তু যে মহান গুণের জন্য মহাকাব্যের নারী স্বীয় তেজস্বিতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণকেও অভিসম্পাত করিয়াছেন, যাহার ফলে স্বর্গলাভের অধিকারিণী তাহা সতীত্ব ও পাতিব্রত্য বা একচারিতা। তাই বলিয়াছেন, "স্বামী বিনা সুখ, স্বর্গ, শ্রী কিছুই চাহি না, এমন কি বাঁচিতে "তপস্বিনী বলিয়া সম্মান প্রদর্শন করা হইয়াছে।১৩

এই দুই মহাকাব্যের নারীগণের ধর্ম বোধের ধারা ঈশ্বরবাদের দিক দিয়া স্বতন্ত্র। রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্রের বনগমন কালে অযোধ্যার রাজ্ঞী-কুল বহু দেবতাকে১৪ স্মরণ করিয়া কল্যাণ যাচ্ঞা করিতেন। সীতা, মন্দোদরী, শবরী, তারার মধ্যে অদ্বৈত ঈশ্বর ভক্তি বর্তমান ছিল বলিয়া মনে হয় না, তাহারা বহুদেবতার উপাসিকা। কিন্তু মহাভারতে শকুন্তলা, গান্ধারী, দ্রৌপদী ও কুন্তীর মধ্যে একেশ্বরবাদের আভাষ কোথাও অস্পষ্ট ও কোথাও স্পষ্টভাবে বিদ্যমান। মহাভারতে প্রথম দিক হইতেই পরম পুরুষ ব্রহ্মই একমাত্র দেবতা। কৌশল্যা ব্রহ্মার উল্লেখ করিলেও তাহাতে ব্রহ্মবাদের আভাষ মিলে না।

প্রসংগত ইহা বলা চলে যে, রামায়ণের মধ্যে বৈদিক কর্মকাণ্ডের প্রাবল্য অধিক ও বহুল—যজ্ঞ, দান, তপস্যা, ব্রহ্মচর্যপালন, আতিথেয়তা, পূজা ও আরাধনাই চতুর্বর্গ প্রাপ্তির সহায়ক। কিন্তু মহাভারতে সত্যসাধনা আচার পালন অপেক্ষা শ্রেয়। যেখানে কর্মকে জ্ঞান, বিতর্ক ও বিচারকে নিষ্কাম ভক্তি অতিক্রম করিয়াছে।

উভয় গ্রন্থেই, স্বামিসেবা নারীর সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মাচরণ ও উহার পরমার্থ-লাভের সহায়ক ইহা স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে। উহা ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণপ্রদ।

বলা প্রয়োজন, একদিকে নারী যেমন পুরুষের সহধর্মচারিণী আখ্যা-লাভ করিয়া ধর্মানুষ্ঠানে সহচারিণী ও অংশভাগিনী হইয়া সংসার ও সমাজকে সুখকর ও কল্যাণময় করিয়াছে, পরলোকের পথ সুগম করিয়াছে, তেমনই নারীর চপল কটাক্ষ ঘাতে বহু কৃচ্ছ্রসাধন, ও দুশ্চর তপস্যার বিঘ্ন ঘটিয়াছে, বিশ্বামিত্রের তপোভংগের কাহিনী, চ্যবন শর্যাতি, রুরু প্রমদ্বরা কচ দেবযানীর ইন্দ্র ও অহল্যার উপাখ্যান এবিষয়ে উল্লেখযোগ্য।

১১। আদি রামা আ ৭৭।১২, অযোধ্যা ৪।৩০-৩৩

১১ক। অনু ৪০।১২

১১খ। অনু ১২।১৪

১২। ন কাময়ে ভর্তৃবিনা কৃতা সুখং
ন কাময়ে ভর্তৃবিনাকৃতা দিবম্
ন কাময়ে ভর্তৃবিনা কৃতা শ্রিয়ং
ন ভর্তৃহীনা ব্যবসামি জীবিতুম্। (মহা, বন, ২৯৭ অধ্যায় ৫৩ শ্লোক)

১৩। অনু ১৪৬।৪৮-৫১

১৪। অযোধ্যা ২৫ সর্গ

মৃত্যুর পারে

শ্রীতারকচন্দ্র রায়

(৫)

ঘটবিচ্ছিন্ন আকাশ ঘটের বিনাশের সঙ্গে যেমন অনন্ত আকাশে মিশিয়া যায়, তেমনি দেহবিচ্ছিন্ন প্রাণবায়ুও দেহের বিনাশের সঙ্গে বহিস্থ বায়ুর সহিত মিলিত হয়, তাহার স্বতন্ত্র সত্তা থাকে না, এইরূপ একটা ধারণা দ্বারা অনেকের চিন্তা প্রভাবিত। কিন্তু চৈতন্য ও প্রাণ, বায়ুর মত জড়-পদার্থ নহে (যদিও প্রাণকে অনেক স্থলে বায়ু বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে)। সুতরাং ঘটাকাশের উপমা তাহাদের পক্ষে একেবারেই প্রযোজ্য নহে। জড় জগতের প্রত্যেক দ্রব্যই প্রকৃতির অংশ; কোনও অংশ যতক্ষণ দেহবিচ্ছিন্ন চৈতন্যের অধীন থাকে, ততক্ষণই প্রকৃতি হইতে কথঞ্চিৎ ভিন্ন, কিন্তু চৈতন্যের প্রভাব অন্তর্হিত হইলেই তাহা প্রকৃতির অঙ্কে ফিরিয়া যায়। প্রকৃতির কোনও অংশেরই স্বতন্ত্র কর্তৃত্ব নাই; কিন্তু ব্যষ্টিচৈতন্য স্বতন্ত্র পদার্থ; তাহার স্বাধীন ইচ্ছা আছে এবং তাহা নিরন্তর প্রাকৃতিক শক্তির বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হইতেছে। সর্ব্বচৈতন্য (Universal mind) হইতেও তাহার সত্তা পৃথক এবং তাহার পাশেই স্বতন্ত্রভাবে তাহা প্রতিষ্ঠিত। অদ্বৈতমতে জীবাত্মা সর্ব্বের অনিত্য প্রকাশ (accident), সর্ব্বে বিলীন হওয়াই তাহার নিয়তি; এই বিলয়ই পরম পুরুষার্থ। কিন্তু জ্ঞানহীন, প্রেমহীন, শ্রদ্ধাহীন, উদ্দেশ্যবিহীন যে জীবন, তাহা জীবনপদ-বাচ্য হইলেও শূন্যগর্ভ। মানুষের নিয়তি যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে তাহার পরম দুর্ভাগ্য। পশু ব্যষ্টি জীবন ভোগ করে, কিন্তু তাহার মাহাত্ম্য জানে না। মানুষ ব্যষ্টি জীবনের শিখরে অধিষ্ঠিত হইয়াও যদি তাহা হইতে বঞ্চিত হয়, তাহা হইলে অভিব্যক্তি একটা নিদারুণ পরিহাসে পরিণত হয়। আমরা দেখাইতে করিতেছি, এই দুঃখবাদের পক্ষে সঙ্গত যুক্তি নাই।

এ পর্য্যন্ত যাহা আলোচনা করিয়াছি, তাহাতে দেখিতে পাইয়াছি, মৃত্যুর পরে জীবাত্মার অস্তিত্বের বিরুদ্ধে যে সমস্ত তর্ক উত্থাপিত হয়, তাহা দ্বারা দেহের বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে যে জীবাত্মাও বিনষ্ট হইতে বাধ্য, তাহা প্রমাণিত হয় না। কিন্তু বিরুদ্ধ যুক্তি খণ্ডিত হইলেও আমাদের যুক্তি দ্বারাও জীবাত্মার নিঃসন্দিগ্ধ স্থিতি প্রমাণিত হয় নাই---স্থিতি অসম্ভব নহে ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে। এখন আমরা জীবাত্মার বিনাশ ও স্থিতি, ইহাদের মধ্যে কোন্‌টা অধিক সম্ভবপর, তাহার আলোচনা করিব।

মানুষের পরমায়ু সাধারণতঃ ৭০।৮০ বৎসরের অধিক নহে। তাহার দেহ এমনভাবে গঠিত যে, ৭০।৮০ বৎসরের অধিককাল টিকিয়া থাকার সাধ্য তাহার নাই। ৭০।৮০ বৎসরের উপযোগী করিয়াই মানুষের দেহ সৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু তাহার মন? তাহাও কি শুধু এই স্বল্পমাত্র কালেরই উপযোগী? কোনও দ্রব্য গৃহের সন্নিকটবর্ত্তী করি, দূরবর্ত্তী স্থানে পাঠাইতে হইলে, তাহা অপেক্ষা অনেক ভাল ভাবেই প্যাক করি। সপ্তাহ কালের জন্য ভ্রমণে বাহির হইবার সময় আমরা সঙ্গে তাঁবু লইয়া যাই। কিন্তু যেখানে স্থায়ীভাবে বাস করিতে চাই, তথায় পাকা বাড়ী নির্ম্মাণ করি। ৭০।৮০ বৎসরস্থায়ী জীবনের প্রয়োজনের সঙ্গে মানুষের মানসিক সম্পদের যখন আমরা তুলনা করি, তখন সেই সম্পদ প্রয়োজনের তুলনায় যে অত্যধিক, তাহাতে আমাদের সন্দেহ থাকে না। আহার, নিদ্রা, ভয় ও বংশরক্ষা ভিন্ন অন্য কোনও বিষয়ের ভাবনা যাহাদের নাই, সেই সকল লোককে দেখিয়া মানব মনের অপূর্ব্ব সম্পদের ধারণা সম্ভব হয় না। কিন্তু উন্নত কৃষ্টি-সম্পন্ন লোকের মানসিক সম্পদও আমাদের অপরিচিত নহে। এই উন্নত কৃষ্টি লাভ সকলেরই সাধ্যায়ত্ত। কিন্তু ইহা দ্বারা মানুষের কোন্ প্রয়োজন সিদ্ধ হয়? পারিবারিক জীবনে তাহার প্রয়োজন সামান্য, রাষ্ট্রীয় জীবনেও তাহার প্রয়োজন অধিক নহে। সাধারণ লোকে এই উন্নত মানসিক কৃষ্টির কোনও মূল্য আছে বলিয়া মনে করে না। তবু তাহা লাভের জন্য কেন আমরা লালায়িত হই? কেন "সাধারণ জীবন" আমাদিগকে তৃপ্তি দিতে পারে না? আমাদের প্রীতি ও শ্রদ্ধা যে Plato, Aristotlo, Newton গৌতম শঙ্কর প্রকৃতির দিকে ধাবিত হয়, তাহার কারণ ইহা নয়, যে তাঁহারা আমাদের কঠোর প্রাত্যহিক জীবন সহজতর করিয়া দিয়াছেন। মানব জীবনের সম্ভাবনার যে উজ্জ্বল তাঁহাদের জীবনে বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল, তাহাই স্বমহিমায় দীপ্ত হইয়া আমাদের মন অভিভূত করে, এবং তাহার স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রীতি কর্তৃক অভিষিক্ত হয়। মানবজীবনও ইতর জীবনের সম্ভাবনার মধ্যে প্রভেদ বিপুল। ইতর জীব বাস করে বর্ত্তমান কালে; অতীত ও ভবিষ্যতের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধের কথা সে জানে না। ভবিষ্যতের প্রয়োজনসাধনের জন্য তাহাদের যে সমস্ত সহজাত বৃত্তি (instinct) আছে (যেমন পক্ষীর বাসা নির্ম্মাণ ও পিপীলিকার সঞ্চয় প্রবৃত্তি), তাহারাও বর্ত্তমান অভাবের প্রেরণা দ্বারাই সক্রিয় হয়। প্রত্যক্ষ জগতের বাহিরে কোনো কিছুর সহিত তাহাদের সম্পর্ক নাই; সেই ক্ষুদ্র জগতের মধ্যে আবদ্ধ তাহা-দিগের নিকট বাহিরের জগৎ কার্য্যতঃ অস্তিত্বহীন। কিন্তু মানুষের সহিত সম্বন্ধ কেবল তাহার গত জীবনের নয়, জন্মপূর্ব্ব অতীত ও ভবিষ্যতের চিন্তা ও তাহার স্বভাবগত। পৃথিবীর বহু লক্ষবর্ষব্যাপী অতীত ইতিহাস জানিবার জন্য তাহার মনে অদম্য কৌতূহল, ভবিষ্যতের জন্যও তাহার কৌতূহলের অন্ত নাই। কেন মানুষের মন এইভাবে গঠিত হইল? অতীত ও ভবিষ্যতের সঙ্গে যদি তাহার কোনও সম্বন্ধই না থাকে, তাহা হইলে কেন তাহাদের জন্য তাহার মনে কৌতূহল ও সহানুভূতির সৃষ্টি

বিশ্বনাথ মন্দিরের ধ্বংস এবং প্রতাপ সিংহ ও গোবিন্দ সিংহের অসীম দুঃখবরণের কথা যখন স্মৃতিপথে উদিত হয়, তখন কেন গভীর বিষাদ ও প্রচণ্ড রোষের আবির্ভাব হয়? বর্ত্তমান জীবনের সুখ ও শান্তির জন্ত তো তাহার প্রয়োজন ছিল না। কালের বাধা অতিক্রম করিয়া আমাদের মন যে অতীতের দিকে ছুটিয়া যায়, এবং অতীতের বেদনাকে নিজের বলিয়া স্বীকার করিয়া লয়, ইহা হইতে কি মনে হয় না, যে কালের বাধা অতিক্রম করিবার প্রয়োজন আমাদের আছে? সহস্র বৎসর পূর্ব্বে আমাদের পূর্ব্বজগণ তাহাদের যে চিন্তা সাহিত্যের পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, কেন তাহা আমাদের মনে প্রতিধ্বনির সৃষ্টি করে? কেন তাহা পাঠে তাঁহাদের সঙ্গে আত্মীয়তাবোধ জাগরিত হয়, এবং সমবেদনার অশ্রুজলে আমাদের নয়ন বিগলিত হইয়া ওঠে? আমাদের স্বার্থ যদি শুধু বর্ত্তমান কালেই সীমাবদ্ধ হইত, তাহা হইলে যুগে যুগে দলে দলে লোক কেন ধর্ম্মপ্রচারকদের অনুসরণ করিয়াছে? কেন ভবিষ্যতের অন্ধকার যবনিকা ভেদ করিবার জন্ত তাহাদের দৃষ্টি ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে? মানবমনের প্রকৃতি হইতে মনে হয়—ভূত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ সর্ব্বকালের সঙ্গেই মানবের জীবন্ত সম্বন্ধ আছে এবং কেবল বর্ত্তমান কালেই যে তাহার স্বার্থ সীমাবদ্ধ তাহা নয়। তাহা অতীত ও ভবিষ্যতেও প্রসারিত।

এখন দেশের (Space) সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধের আলোচনা করা যাউক। পৃথিবীর পথিক মানুষের সাজসরঞ্জাম কি শুধু সামান্ত কয়েক বৎসরের জন্ত ধরাতলে ভ্রমণের পক্ষেই পর্য্যাপ্ত, অথবা তাহা ধরাতলের প্রয়োজনের অতিরিক্ত? এক ঘণ্টার জন্ত নিকটবর্ত্তী গ্রামে যাইবার সময় কেহ অতিরিক্ত পরিধেয় অথবা শয্যাদ্রব্যাদি সঙ্গে লইয়া বাহির হয় না। কিন্তু দেশান্তরে যাইবার সময় দীর্ঘপ্রবাসের জন্ত প্রয়োজনীয় সমস্ত দ্রব্য তাহার সঙ্গে থাকে। পৃথিবীতে আসিবার সময় মানুষ যাহা সঙ্গে আনিয়াছে, তাহা দেখিয়া কি মনে হয় না যে তাহার পথ বহু দীর্ঘ, গন্তব্যস্থান বহু দূরে? নক্ষত্রখচিত আকাশ ইতর জীবেরও নয়নগোচর হয়, কিন্তু তাহা আলোক-কণার অনুভূতিভিন্ন অন্ত কোনও বেদনার (Emotion) উদ্রেক করে না। মানুষের মন কিন্তু বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া সেই জ্যোতিষ্কমালার রহস্ত আবিষ্কারের জন্ত ব্যাকুল হইয়া ওঠে, রাত্রির পর রাত্রি আকাশে দূরবীক্ষণ পাতিয়া জ্যোতির্বিদ নিঃশব্দে বসিয়া থাকে, শ্রান্তি নাই, ক্লান্তি নাই। ক্ষুদ্র পৃথিবীতেই যদি মানুষের নিয়তি সীমাবদ্ধ হইত, তাহা হইলে অসীমের প্রান্তদেশে অবস্থিত জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর তত্ত্ব অবগত হইবার জন্ত এই ব্যাকুলতা তাহার কেন? নূতন দেশে ভ্রমণে বাহির হইবার পূর্ব্বে তাহার বিবরণ আমরা সংগ্রহ করি। নক্ষত্রজগতের রহস্ত আবিষ্কারের চেষ্টা কি সেই প্রকারের স্বার্থপ্রণোদিত? আমাদের দৈহিক অবস্থান এবং অসীম কৌতূহল, উভয়ের মধ্যে এই অসমতা অনেকের কৌতূহল উদ্রিক্ত করিয়াছে। সেইরূপ আদানপ্রদান যে অসম্ভব, তাহা অনুমান করা যায়। দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে তাহাদের সম্বন্ধে যাহা জানিতে পারা যায়, তাহাতে আমাদের কৌতূহল উদ্রিক্ত হয়, কিন্তু পরিতৃপ্ত হয় না। বর্ত্তমান জীবনের পরে যদি আমরা এমন অবস্থা প্রাপ্ত না হই, যাহাতে প্রকৃতি ও তাহার স্রষ্টা সম্বন্ধে সুস্পষ্ট জ্ঞানলাভ সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে আমাদের বর্ত্তমান অবস্থাকে নিতান্তই অসম্পূর্ণ বলিতে হয়। সমগ্র প্রকৃতির মধ্যে যে জ্ঞান দীপ্যমান, তাহার সঙ্গে এ অনুমান সঙ্গত হয় না, যে আমাদের কৌতূহল উদ্দীপ্ত হইবে, কিন্তু তাহার পরিতৃপ্তি হইতে পারিবে না। মানুষের পক্ষে ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে অন্তান্ত গ্রহ নক্ষত্রের অধিবাসীদিগের পক্ষেও তাহা সত্য হইবার সম্ভাবনা। প্রকৃতির রহস্ত তাহা হইলে নিতান্ত অসম্পূর্ণরূপে ভিন্ন কাহারও নিকট উন্মুক্ত হইবে না, ইহাই অনুমান করিতে হয়। * * * মানবপ্রকৃতি ও তাহার আকাঙ্ক্ষা ও উদ্দাম হৃদয়াবেগের (Passion) বিষয় যিনিই গভীর ভাবে চিন্তা করিবেন তাঁহারই মনে হইবে যে মানবের আকাঙ্ক্ষা ও বেদনা বর্ত্তমান জীবনের প্রয়োজনের অতিরিক্ত, এবং বর্ত্তমান জীবনে যাহা সম্ভবপর, তাহা অপেক্ষাও পূর্ণতর জ্ঞানলাভের জন্ত মানুষের সৃষ্টি হইয়াছে। উপযুক্ত সময়ে সৃষ্টিকর্তা পার্থিবজীবনে অনধিগত জ্ঞানের দ্বারও তাহার সম্মুখে উন্মুক্ত করিয়া দিয়া তাহার কৌতূহল পরিতৃপ্ত করিবেন।"

যে মানসিক শক্তি সঙ্গে লইয়া মানুষ পৃথিবীতে আসিয়াছে, তাহার স্বল্পপরিসর জীবনে সেই শক্তি যাহা সম্পন্ন করিবার সময় পায়, তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক সম্পন্ন করিবার সামর্থ্য তাহার আছে। ক্ষুরধারা নিশিত দুরত্যয় জ্ঞানপথে, বিঘ্নের পরে বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইতে হইতে, বৈজ্ঞানিক জীবন-সায়াহ্নে উপনীত হন। সমগ্র জীবনের সাধনার ফলে জ্ঞানরাজ্যের সীমা প্রসারিত করিবার জন্ত তখন তিনি প্রস্তুত, প্রকৃতির রহস্তের মণিকোঠা হইতে স্ফুরিত রশ্মি বিজয়যাত্রায় অগ্রসর হইতে যখন তাহাকে আহ্বান করিতেছে, ঠিক এমনি সময়ে মৃত্যু আসিয়া বলিল "আর নয় চল ছেড়ে তোমার কর্ম্মক্ষেত্র। সময় ফুরাইয়া গিয়াছে।" মৃত্যুর এই কথাই যদি শেষ কথা হয়, মৃত্যুতেই যদি সব শেষ হইয়া যায়, তাহা হইলে ইহা অপেক্ষা শোচনীয় অপচয় আর কি হইতে পারে? জীবনব্যাপী সাধনার ফল, পরিণত বুদ্ধি, সত্যাবিষ্কারের কৌশল—কিছুই সন্তানে সংক্রামিত হয় না, কিন্তু মৃত্যুর পরে যদি কিছু না থাকে, তাহা হইলে এ সমস্ত হইতেই জগৎ চিরকালের জন্ত বঞ্চিত হয়। প্রকৃতিতে অপচয়ের বহু দৃষ্টান্ত আছে, কিন্তু এমনটি আর নাই।

চিন্তাশক্তি সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, প্রেমের শক্তি-সম্বন্ধেও তাহা প্রযোজ্য। প্রেম মানুষের প্রকৃতিতে যে গভীরতা ও প্রগাঢ়তা লাভে সমর্থ, পার্থিব জীবনের প্রয়োজনের তুলনায় তাহা অত্যধিক। সাধারণতঃ

গভীরতা ও গাঢ়তা লাভ করিতে সমর্থ, তাহা আমরা দেখিয়াছি। দধীচি, বশিষ্ঠ, বুদ্ধ, খৃষ্ট, চৈতন্য ও গান্ধীর মধ্যে যে প্রেমের বিকাশ হইয়াছিল, অমানুষিক বলিয়া আমরা যদি তাহা গণনার মধ্যে নাও আনি, তথাপি সাধারণ মানুষের মধ্যেও প্রেমের যে গভীরতার-পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাও বিস্ময়কর। মাতৃস্নেহ সহজাত বৃত্তি। জীবরক্ষার জন্য তাহার প্রয়োজন আছে। কিন্তু দাম্পত্যপ্রেম যখন কামের কলুষতা হইতে মুক্ত হইয়া স্বর্গীয় দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হয়, তখন তাহার জ্যোতিতে মৃত্যুর পরপারও আলোকিত হইয়া উঠে। পুরীষ পয়োনালায় নিপতিত মেথরকে রক্ষা করিবার জন্য সেই নরককুণ্ডে যখন নফরকুণ্ডু স্বীয় জীবন বিসর্জন দেয়, তখন মানবীয় প্রেমের পরিসর পরিস্ফুট হইয়া উঠে। ভ্রাতা ও ভগিনীর স্নেহের বন্ধন বিচ্ছেদে ছিন্ন হয় না ; মৃত্যুর পরেও তাহার শীতল স্পর্শ অনুভূত হয়। বুদ্ধ, খৃষ্ট, চৈতন্য প্রভৃতি মহাপুরুষ, যুগযুগান্তর পূর্ব্বে যাঁহারা ধরাপৃষ্ঠ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছেন, তাঁহাদের কথা স্মৃতিপথে উদিত হইলে চিত্ত এক অপূর্ব্ব রসে অভিসিঞ্চিত হইয়া ওঠে ; যে কবিকে জীবনে দেখি নাই, তাঁহার কাব্যপাঠে গভীর প্রীতি ও আত্মীয়তা বোধ সঞ্জাত হয়, বিদেশী বিধর্ম্মী লেখকের রচনা পাঠ করিয়া যে প্রীতির সম্বন্ধ সৃষ্ট হয়, মৃত্যু পর্য্যন্ত তাহা অক্ষুণ্ণ থাকে ; ইহার কারণ কি ? প্রেমের সম্বন্ধ পারস্পরিক, দুই পক্ষের ব্যাপার। এক পক্ষের অবর্ত্তমানতায় যে তাহা বিলুপ্ত হয় না, ইহা হইতে এ অনুমান কি অসঙ্গত, যে, সে অবর্ত্তমানতা সত্য নহে। দৃষ্টির বহির্ভূত হইলেও প্রেমের পাত্রের বিনাশ হয় না ? আমার প্রীতি লোকান্তরস্থিত আমার দয়িতের চিত্তকে স্পর্শ করে, এবং তাহার প্রীতি দ্বারা আমার চিত্ত অভিষিক্ত হয় ?

Conservation of Energyর কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। জড় জগতে শক্তির বিনাশ নাই। প্রকৃত পক্ষে যাহার সত্য অস্তিত্ব আছে, এমন পদার্থের ধ্বংস হয় না। জগৎ পরিবর্ত্তনশীল কিছুই স্থির হইয়া নাই ; সকলই গতিশীল। কিন্তু পরিবর্ত্তন ও বিনাশ এক নহে। এক খণ্ড কয়লায় অগ্নিসংযোগ করিলে তাহা পুড়িয়া যায়, কিন্তু তাহার একটি পরমাণুরও ধ্বংস হয় না, অবস্থান্তর হয় মাত্র। সাধারণতঃ যাহাকে আমরা বিনাশ বলি, তাহা অবস্থান্তরপ্রাপ্তি মাত্র। কিন্তু একখানা চিত্র যখন অগ্নিতে দগ্ধ হয়, তখন ব্যাপারটি কিছু স্বতন্ত্র হইয়া দাঁড়ায়। চিত্রের ক্যানভাস ও ফ্রেম ভস্মসাৎ হইলেও, তাহাদের একটি পরমাণুও বিনষ্ট হয় না। কিন্তু ক্যানভাসের উপর যে চিত্রটি অঙ্কিত ছিল, তাহার কি হয় ? সমগ্র দ্রব্যটির মধ্যে যে অংশের মূল্য সামান্য, অগ্নিতে তাহার বিনাশ হয় না, ইহা আমরা জানি, কিন্তু তাহার মূল্যবান অংশের বিনাশ হয় বলিয়া বিশ্বাস করি। বিনাশ বলিতে যাহা বোঝায়, চিত্রের পরিণাম দৃশ্যতঃ তাহার সন্নিকটবর্ত্তী হইলেও কিন্তু প্রকৃতপক্ষে চিত্রের বিনাশ হয় না। চিত্রে যে রূপ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা ক্যানভাসে ছিল না। তাহা ছিল চিত্রকরের মনে। চিত্রকর তুলিকার দ্বারা ক্যানভাসে রংএর সাহায্যে যাহার সৃষ্টি করিয়াছিল তাহা সঙ্কেত মাত্র, সেই সঙ্কেত দ্বারা দর্শকের মনে চিত্রকরের কল্পিত মানসিক মূর্ত্তি প্রতিবিম্বিত হইত, যেমন অক্ষরের সাহায্যে লেখকের চিন্তা পাঠকের মনে সংক্রামিত হয়। অগ্নিতে চিত্রকরের অঙ্কিত সঙ্কেত বিনষ্ট হয়, কিন্তু সেই সঙ্কেতের সহিত সংযুক্ত ভাবের (Idea) বিনাশ হয় না। তাহা থাকে চিত্রকরের ও দর্শকের মনে এবং মনোজগতে।

যাহার অস্তিত্ব আছে, তাহার বিনাশ কল্পনা করা অসম্ভব। শূন্য হইতে পদার্থের উদ্ভব যেমন অসম্ভব, অস্তিত্ব হইতে শূন্যে বিলীন হওয়াও তেমনি অসম্ভব। জীবাত্মা প্রকৃত সত্তাবান পদার্থ, জড় হইতে অধিক সত্তাবান। জড়ের অস্তিত্ব অবগত হওয়া যায় যে শক্তির দ্বারা, সেই শক্তির আধার জীবাত্মা সৎ পদার্থ তাহার ধ্বংস অসম্ভব।

সোমনাথের কবির প্রতি

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

স্মরিতে বেদনা জাগে—
প্রায় সহস্র বৎসর কাল আগে,
ধ্বংস করিল যেই মন্দির দস্যুবাহিনী ঘিরে,
হে কবি, তুমি কি ভক্তপূজারী ছিলে সেই মন্দিরে ?
নিরস্ত্র তুমি ছুড়ি শাঁখ কোশাকুশী
দস্যুর দলে আঘাত হানিলে রুষি',
তাহাদের খঞ্জরে
প্রাণ দিলে শেষে শিবের বেদীর 'পরে।

অনেক জন্ম অতীত হয়েছে, কবি,
বহুকাল পরে কবি জন্মটি লভি',
তাহারি কথাটি করিয়া স্মরণ হইয়াছ উচাটন ?
কোথা গুজরাট কোথায় বঙ্গ ? যোগডোরী প্রাক্তন ?
ভারত আজিকে মুক্ত হয়েছে নয় আর পরাধীন,
তাই চাহিতেছে সোমনাথ মন্দির
গগন ভেদিয়া আবার তুলিবে শির।

হায় কবি তব স্বপ্নবিভোর আঁখি,
কোন অরণ্যে করিছ রোদন ভাবিয়া দেখেছ তাকি ?
তুমি ভাবিতেছ হিন্দুভারত ফিরিয়া পেয়েছ বুঝি !
যাহাদেরে চাও তাদেরে পাবে না খুঁজি',
পাঁচশো বছর রাজ্য শাসিল এদেশে মুসলমান
হিন্দুত্বেরে করিতে পারেনি ম্লান।
দেড়শো বছর ইংরাজরাজ এদেশে করেছে বাস,
হিন্দুমনের করেছে সর্বনাশ।

স্বাধীনতা দেশে ফিরিয়া আসিল, ফিরিল কি শূলপাণি ?
শৈব কোথায় যে গড়িবে পুন তাঁর মন্দিরখানি ?

রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম

শ্রীগোরক্ষণেশ্বর ভট্টাচার্য্য

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

চট্টগ্রাম অঞ্চলের বহু বৈপ্লবিক ক্রিয়া-কলাপের মহানায়ক ছিলেন বিপ্লবী সূর্য্য সেন। সহকর্মী ও অনুগামীদের নিকট তিনি পরিচিত ছিলেন প্রিয় "মাষ্টার-দা" নামে। বিপ্লবী দল সংগঠনের ব্যাপারে তাঁহার দক্ষতা ছিল অসাধারণ এবং সকলের উপর তাঁহার প্রভাব ছিল অপরিসীম। কি প্রচণ্ড তেজ যে তাঁহার মধ্যে সংগুপ্ত ছিল, তাহা তাঁহার মত স্বল্পভাষী, গম্ভীরপ্রকৃতি ও খর্ব্বাকৃতি লোককে বাহির হইতে দেখিয়া কেহই বুঝিতে পারিত না।

চট্টগ্রাম অঞ্চলের নোয়াপাড়া গ্রামের অধিবাসী শ্রীযুক্ত রাজমণি সেনের পুত্র ছিলেন সূর্য্য সেন। শৈশবাবস্থায় তিনি ছিলেন একজন একনিষ্ঠ ছাত্র। বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপ্ত হইলে তিনি প্রথমে চট্টগ্রাম কলেজে ও পরে বহরমপুর কলেজে অধ্যয়ন করেন এবং শেষোক্ত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান হইতেই তিনি ১৯১৮ সালে বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বহরমপুর কলেজে অধ্যয়নের সময় হইতেই তিনি "যুগান্তর' দলের সহিত সংশ্লিষ্ট হন এবং তাঁহার মন বিপ্লবের পথে ধাবিত হয়।

বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর তিনি চট্টগ্রাম ন্যাশন্যাল হাইস্কুলে গণিতের শিক্ষক হিসাবে জীবন আরম্ভ করেন। তাঁহার আশা ছিল যে এই শিক্ষাদানের কার্য্যে ব্রতী থাকিয়াই তিনি দেশের তরুণদের উপযুক্তভাবে গড়িয়া তুলিতে পারিবেন। শিক্ষকতার যে সামান্য বেতন—তাহার দ্বারা তাঁহার খরচ চলিত না; তথাপি কিন্তু তিনি নিরুৎসাহিত হন নাই। স্বতন্ত্রভাবে ছাত্র পড়াইয়া তিনি যতদূর সম্ভব ব্যয় সঙ্কুলনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

১৯২০-২১ সালের অসহযোগ-আন্দোলনের সময় সূর্য্য সেন চট্টগ্রাম জেলা কংগ্রেসের সম্পাদকরূপে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। নিজ বাসগৃহেই তিনি "সাম্যাশ্রম" নামে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহার এই আশ্রম-প্রতিষ্ঠার মূল অভিপ্রায় ছিল কর্ম্মী-গঠন। অসহযোগ-আন্দোলন চট্টগ্রামে পুরা দমেই চলিতে লাগিল। অবশেষে যখন এই আন্দোলন ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইল, তখন চট্টগ্রামের বহু কর্ম্মীর পক্ষে পুনরায় স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সাধারণ জীবন-যাপন করা আর সম্ভব হইল না। বহু ছাত্রের পক্ষে স্কুল-কলেজে পুনরায় যোগদান করাও অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল। তাঁহারা তখন দেশ-সেবার কার্য্যে এতদূর অগ্রসর হইয়াছেন যে, ফিরিয়া যাইবার আর উপায় নাই এবং ব্যর্থতার গ্লানি বহন করিয়া ফিরিয়া যাইবার জন্যও তাঁহারা দেশের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন নাই। এই অবস্থায় চট্টগ্রামের তরুণ বিপ্লবী-সমাজের উৎসাহ-তুলিবার গুরুদায়িত্ব আসিয়া পড়িল নেতা সূর্য্য সেন এবং কর্ম্মী নির্ম্মল সেনের উপর। অনন্ত সিংহ, গণেশ ঘোষ, লোকনাথ বল, অম্বিকা চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি বিপ্লবীগণ তাঁহাদের দলের শক্তি ও কর্ম্মক্ষমতা বর্দ্ধিত করিলেন।

এইভাবে নেতা সূর্য্য সেনের দক্ষ পরিচালনায় চট্টগ্রামের তরুণ বিপ্লবীরা জেলার নানা স্থানে তাঁহাদের কর্ম্মকেন্দ্র স্থাপন করিতে লাগিলেন এবং পরম উৎসাহে কর্ম্মী, অর্থ ও অস্ত্র-শস্ত্র সংগ্রহে মনোনিবেশ করিলেন। দলের কর্ম্মীরা নিজেরাই সাধ্যমত দলের অর্থ-ভাণ্ডারে অর্থ সাহায্য করিতেন; কিন্তু গোপনে অস্ত্র-শস্ত্র সংগ্রহের যে বিপুল ব্যয়—তাহা এইভাবে সংগৃহীত সামান্য অর্থের দ্বারা নির্ব্বাহিত হওয়া সম্ভব ছিল না। এদিকে আবার ডাকাতির দ্বারা অর্থ-সংগ্রহের সূর্য্য সেন ছিলেন সম্পূর্ণ বিরোধী। তিনি তাঁহার পূর্ব্ব-অভিজ্ঞতায় ইহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে, ডাকাতি করিয়া পুলিশের দৃষ্টিকে এড়াইয়া চলা বিপ্লবী দলগুলির পক্ষে সম্ভব হইত না এবং নিজেদের কার্য্যের দ্বারা বিপ্লবীরা জনসাধারণের নিকটও আপনাদিগকে অপ্রিয়-ভাজন করিয়া তুলিতেন, উপরন্তু কোনও স্থানে ডাকাতি করিবার পর উহার জের মিটাইতেই বিপ্লবীদলকে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিতে হইত, যাহার ফলে আসল কাজ করা তাঁহাদের পক্ষে আর বিশেষ হইয়া উঠিত না। ডাকাতি করিতে গিয়া এইভাবেই অনেক সময় মূল উদ্দেশ্যটাই ব্যর্থ হইয়া যাইত।

এদিকে অস্ত্র-শস্ত্র সংগ্রহের ভার যাঁহাদিগের উপর ন্যস্ত ছিল—টাকার অভাবে তাঁহারাও আশানুরূপ সাফল্য লাভ করিতে পারিতেছিলেন না। বিদেশী জাহাজের নাবিকগণের নিকট হইতেই সাধারণতঃ উচ্চ মূল্যে আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহ করা খানিকটা সম্ভব ছিল—ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি স্থান হইতেও প্রচুর অর্থব্যয়ে কিছু কিছু অস্ত্র-শস্ত্র গোপনে আমদানী করান যাইত; কিন্তু অর্থের অভাবে কোন কিছুই সম্ভব নহে। শেষ পর্য্যন্ত এবিষয়ে ইতিকর্ত্তব্য নিরূপণ করিবার জন্য বিপ্লবীদলের উচ্চ-স্তরের কর্ম্মিগণের এক আলোচনা বৈঠক বসিল এবং দেশের লোকের উপর ডাকাতি না করিয়া যদি সরকারী অর্থ লুণ্ঠন প্রভৃতি সম্ভব হয়—তবে একমাত্র সেইরূপ ডাকাতিতে অবশেষে সূর্য্য সেন সম্মতি দান করিলেন।

তরুণ বিপ্লবী-নেতা সন্তোষ মিত্রের দল কলিকাতার শাঁখারী-টোলায় ও উল্টাডিঙ্গির পোষ্ট অফিসে হানা দিয়া অর্থ-লুণ্ঠনের চেষ্টা করায় ফলে পুলিশ সন্দেহক্রমে বহু বিপ্লবীকে গ্রেপ্তার করিয়া যে মামলা

এবার পুলিশকে ফাঁকি দিয়া গুপ্ত-জীবনও যাপন করিতে আরম্ভ করেন। এইভাবে তৎকালে যাঁহারা আত্মগোপন করেন, তাঁহাদের মধ্যে দেবেন দে ছিলেন অন্যতম। তাঁহাকে পাইলে কার্য্যের অনেক সুবিধা হইবে বুঝিয়া চট্টগ্রামের বিপ্লবীরা তাঁহাকে চট্টগ্রামে যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। দেবেনবাবুও তাঁহাদের আহ্বান উপেক্ষা করিতে না পারিয়া সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

ইহার পর ১৯২৩ সালের ২৩শে ডিসেম্বর চট্টগ্রাম পাহাড়তলীর পথে প্রকাশ্য দিবালোকে বেলা প্রায় সাড়ে দশটার সময় এক দুঃসাহসিক ডাকাতি সংঘটিত হইল। পাহাড়তলী অঞ্চলের রেলকর্ম্মচারীদের বেতন দিবার জন্য চট্টগ্রামের রেল-অফিস হইতে প্রায় ১৭,০০০৲ টাকা লইয়া জনকয়েক কর্ম্মচারী এই সময় একখানি ঘোড়ার গাড়ীতে চড়িয়া ঐ পথ অতিক্রম করিতেছিল। পথিমধ্যে সহসা একস্থানে দেবেন দে, অনন্ত সিংহ, উপেন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও রাজেন্দ্র দাস অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া তাহাদের গতিরোধ করিলেন। দেবেন দে ও অনন্ত সিংহের হস্তে রিভলবার দেখিয়া ভীত হইয়া চালক গাড়ী থামাইয়া ফেলিল। বিপ্লবীরা তখন গাড়ীর আরোহীদিগকে গাড়ী হইতে নামাইয়া দিলেন এবং টাকার থলিসহ গাড়ীটি লইয়া হাজির হইলেন গিয়া আপনাদের গুপ্ত আস্তানায়। দেবেনবাবুই নিপুণ চালকের মত ঘোড়ার গাড়ীটি চালাইয়া লইয়া গেলেন।

এই ঘটনার পরই চট্টগ্রামে অতিরিক্ত মাত্রায় পুলিশী-কর্ম্মতৎপরতা আরম্ভ হইল। কিন্তু বিপ্লবীরা তাঁহাদের পরবর্ত্তী কর্ম্মপন্থা স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। সূর্য্য সেন তখন অম্বিকা চক্রবর্ত্তী ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিপ্লবীদের লইয়া সহরের উপকণ্ঠে একটি মাটির কুঁড়ে ঘরে গিয়া ছদ্ম-জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। কিছুদিন নিরুদ্বেগেই কাটিয়া গেল। কয়েকদিন পরে সহসা কিন্তু একদিন অতি প্রত্যূষেই জনৈক ব্যক্তি গিয়া তাঁহাদিগকে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। বিপ্লবীরাও তাঁহাদের মিথ্যা পরিচয় দিলেন। আগন্তুক ব্যক্তিটি আর কেহই নন, তিনি ছিলেন সেই এলাকারই থানার ভারপ্রাপ্ত দারোগা স্বয়ং।

আগন্তুক প্রস্থান করিলে তাঁহারা বুঝিলেন যে, ব্যাপার বিশেষ সুবিধার নয়। তখনই তাঁহারা পলায়নের জন্য প্রস্তুত হইলেন। গৃহ ত্যাগ করিয়া তাঁহারা কিয়দ্দূর অগ্রসর হইতে না হইতেই দেখিতে পাইলেন যে, পূর্ব্বোক্ত দারোগাটি তাঁহার দলবল লইয়া তাঁহাদের অনুসরণ করিতেছেন। পুলিশদল তাঁহাদিগকে ডাকাত বলিয়া পরিচয় দেওয়ায় একদল লোকও কৌতুহলী হইয়া তাঁহাদের অনুসরণ করিতে লাগিল। বিপ্লবীরা দৌড়াইতে আরম্ভ করিলেন, আর তাঁহাদের পিছনে ধাবিত হইল পুলিশ-দল ও জনতা। জনতাকে পশ্চাদ্ধাবন হইতে ক্ষান্ত করিবার জন্য বিপ্লবীরা তখন এক কৌশল অবলম্বন করিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে যে টাকা ছিল, পথের উপর তাঁহারা তাহা ছড়াইয়া দিতে লাগিলেন, যাহাতে পশ্চাদ্ধাবনরত জনতা অনুসরণে বিরত হইয়া টাকা কুড়াইতেই মনো-ছড়াইয়া দিয়াও বিপ্লবীরা দেখিলেন যে জনতা তখনও পুলিশের সমানে তাঁহাদের অনুসরণ করিতেছে। বেলা তখন প্রায় অপরাহ্ণ।

টাকা ফুরাইয়া গেল। জনতাকে সাবধান করিয়া বিপ্লবীরা তাহাদের ফিরিয়া যাইতে বলিলেন—নতুবা তাহাদের গুলি করা হইবে বলিয়া ভয়ও দেখাইলেন। লোকেরা কিন্তু সে কথা শুনিল না। বিপ্লবীগণ তখন তাহাদের দিকে দুইটি বোমা নিক্ষেপ সশব্দে বোমার বিস্ফোরণ ঘটিল এবং নিক্ষিপ্ত টুকরায় আহতও হইল। এই সময় বিপ্লবীরা সুযোগ পাইলেন খানিকটা অগ্রসর হইয়া যাইবার। তখন সন্ধ্যা হয় হয়। পুলিশদলকে পিছনে পিছনে আসিতে দেখিয়া বিপ্লবীরা এইবার তাহাদের দিকে চালাইতে লাগিলেন। পুলিশও গুলি চালাইয়া তাহার প্রত্যুত্তর এই ভাবে কিয়ৎকাল ধরিয়া লড়াই চলিবার পর পুলিশদলের যেন খানিকটা হ্রাসপ্রাপ্ত হইল।

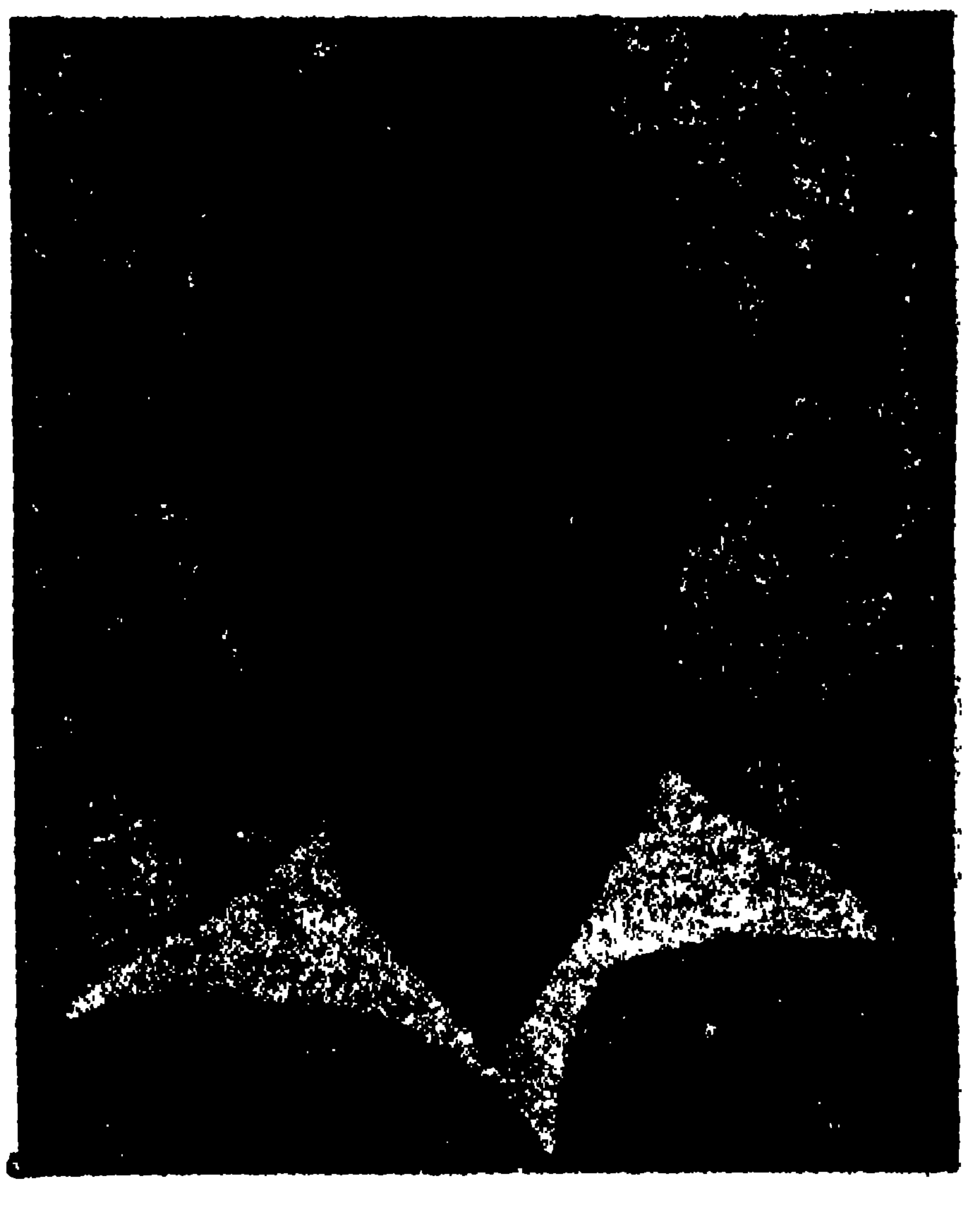

সূর্য্য সেন

সন্ধ্যার অন্ধকার নামিয়া আসিল পৃথিবীর বুকে। নিকটে পাহাড়ে আশ্রয় লইবার জন্য তাঁহারা চেষ্টা করিতে লাগিলেন পাহাড়টিতে তাঁহারা আশ্রয় লইবার জন্য অগ্রসর হইলেন—তাহার ছিল মিঃ রেল্লার নামক ফরেষ্ট-ডিপার্টমেণ্টের জনৈক সাহেবের তিনি তাঁহার বাংলো হইতে বিপ্লবীদের লক্ষ্য করিয়া সহসা শুরু করিলেন। বিপ্লবীরাও বৃক্ষ-লতাদির অন্তরাল হইতে বাংলোর দিকে গুলি চালাইতে লাগিলেন। মিঃ রেল্লারের একটি গুলিতে দেবেন দে সামান্য আঘাত পাইলেন। রাত্রির গাঢ় হইলে পারস্পরিক গুলি-বিনিময় বন্ধ হইল।

অগ্নি-সংযোগ। তাহারা যখন এই কার্য্যে ব্যস্ত—তখন সেই পাহাড়টিরই একাংশে বিপ্লবীরা বিশ্রাম গ্রহণ করিতে লাগিলেন। সারাদিনের ক্লান্তিতে তাঁহাদের দেহ তখন অবসন্ন—কেহ কেহ একেবারেই চলচ্ছক্তি-হীন। কিয়ৎকাল এইভাবে বিশ্রাম করিয়া আবার তাঁহাদিগকে পলায়নের বিষয় চিন্তা করিতে হইল। না করিয়াই বা উপায় কি? সকাল পর্য্যন্ত এইখানে অপেক্ষা করা মাত্রেই পুলিশের হাতে ধরা দেওয়া। আট-দশ মাইল ব্যাপিয়া যে পাহাড়ের শ্রেণী চলিয়া গিয়াছে—তাহা অতিক্রম করিতে পারিলে হয়ত পুলিশের নজর এড়াইয়া লোকালয়ে পৌঁছান যাইতে পারে। সূর্য্য সেন, অম্বিকা চক্রবর্ত্তী ও রাজেন্দ্র দাস সারাদিনের পরিশ্রমে কিন্তু এতই দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তাঁহাদের আর নড়িবারও সামর্থ্য ছিল না। দলের অবশিষ্ট তিন জনকে পলায়নের জন্য সূর্য্য সেন তখন পরামর্শ দিলেন; কারণ সকলে মিলিয়া ধরা পড়ায় কোনও লাভ হইবে না। তিনি আরও জানাইলেন যে, একটুখানি শক্তি-সামর্থ্য ফিরিয়া পাইলেই তাঁহারাও পলায়নের চেষ্টা করিবেন। তাঁহার নির্দ্দেশ মত অনন্ত সিংহ, দেবেন দে ও উপেন্দ্র ভট্টাচার্য্য অগত্যা তাঁহাদের সেখানে রাখিয়াই পুনরায় যাত্রা সুরু করিলেন। সূর্য্য সেন, অম্বিকা চক্রবর্ত্তী ও রাজেন্দ্র দাস সেইখানেই অবসন্ন হইয়া পড়িয়া রহিলেন।

রাজেন্দ্র দাসের যখন সম্বিৎ ফিরিয়া আসিল—তখন রাত্রি গভীর হইয়াছে। তাঁহার পার্শ্বেই সূর্য্য সেন ও অম্বিকা চক্রবর্ত্তীর শায়িত দেহ—অসাড় এবং নিঃস্পন্দ। শীঘ্র যে তাঁহাদের সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিবে না—তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। রাজেন্দ্র দাস তাঁহার মাষ্টারদার পূর্ব্ব-নির্দ্দেশ অনুযায়ী একাকীই স্থানত্যাগ করিতে উদ্যোগী হইলেন এবং অবিলম্বে সে স্থান ত্যাগ করিয়া গেলেন।

পরদিন অতি প্রত্যূষেই পুলিশ ও মিলিটারী-বাহিনী আসিল এবং পাহাড়ে উঠিয়া চতুর্দ্দিকে বিপ্লবীদের অনুসন্ধান করিতে লাগিল। বেশি খোঁজাখুঁজিও তাহাদিগকে করিতে হইল না—অল্প আয়াসেই অর্দ্ধচেতন অবস্থায় সূর্য্য সেন ও অম্বিকা চক্রবর্ত্তীর দেহ পর্ব্বতগাত্রে তাহারা আবিষ্কার করিল। ইহাতে তাহাদের আনন্দের আর সীমা রহিল না। সেই অবস্থাতেই তাঁহাদিগকে রজ্জুবদ্ধ করিয়া গোরুর গাড়ীতে তুলিয়া তাহারা সহরে লইয়া চলিল।

পুলিশের সহিত বিপ্লবীদিগের সশস্ত্র সংঘর্ষের কাহিনী ইতিমধ্যেই চট্টগ্রাম সহরে পল্লবিত হইয়া প্রচারিত হইয়া যথেষ্ট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছিল। সকলের মুখেই তখন এই একই বিষয়ের আলোচনা। দলের দুইজন বিপ্লবী ধৃত হইয়াছেন শুনিয়া সকলেরই কৌতূহল আরও প্রবল হইয়া উঠিল। তাঁহাদের নাম শুনিয়াও তাহারা কম বিস্ময়বোধ করিল না। সূর্য্য সেন ও অম্বিকা চক্রবর্ত্তী তাঁহাদের প্রদত্ত জবানবন্দীতে জানাইলেন যে, তাঁহারা সম্পূর্ণ নিরপরাধ; দুইজনে মিলিয়া পাহাড়ে তাঁহাদিগকে দুর্দ্দান্ত বিপ্লবী বলিয়া সন্দেহ করাও শক্ত হইল। উপরন্তু পুলিশও তাঁহাদিগকে গ্রেপ্তারের সময় তাঁহাদের নিকট হইতে কোনও অস্ত্র-শস্ত্র উদ্ধার করিতে পারে নাই। চট্টগ্রাম ন্যাশন্যাল হাই স্কুলের গণিতের নিরীহ শিক্ষক সূর্য্য সেনকে বিপ্লবী বলিয়াই বা কি করিয়া বিশ্বাস করা যায়? যাহা হউক, সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা এবং রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে তাঁহাদিগকে অভিযুক্ত করিয়া জামিন না দিয়া জেল-হাজতে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইল। মামলা চলিতে থাকার সময়ই অনন্ত সিংহও কলিকাতায় গ্রেপ্তার হইলেন এবং তাঁহাকেও বিচারের জন্য চট্টগ্রামে পাঠাইয়া দেওয়া হইল।

ইতিমধ্যে পুলিশের জবরদস্ত দারোগা আব্দুল আজিজ সাহেব বহদ্দার হাটে বিপ্লবীদের যে আড্ডা ছিল—তাহা আবিষ্কার করিয়া ফেলিলেন। জনসাধারণের উপর কিন্তু বিপ্লবীগণের প্রভাব এতই বিস্তৃত হইয়াছিল যে, আসামীদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত সাক্ষী সংগ্রহ করা সরকারপক্ষে প্রায় অসম্ভব হইয়া পড়িল। সূর্য্য সেন প্রভৃতির মামলা পরিচালনার ভার গ্রহণ করিলেন দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত। তাঁহার অসাধারণ দক্ষতায় শেষ পর্য্যন্ত অভিযুক্ত তিনজন বিপ্লবীই নিরপরাধ সাব্যস্ত হইয়া মুক্তি পাইলেন।

১৯২৩ সালেই বাংলার বহু নেতাকে ৩নং আইনে গ্রেপ্তার করিয়া বিনা বিচারে কারাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল। ১৯২৪ সালে তাহার উপর আবার পাশ হইল "বেঙ্গল অর্ডিনান্স" এবং বাংলার নানা স্থানের বহু বিপ্লবীকে ব্যাপকভাবে গ্রেপ্তার করিবার জন্য একটা বড় রকমের আয়োজন চলিতে লাগিল। সরকার তরফে এই নূতন আয়োজনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন দলের বিপ্লবীরাও একযোগে কার্য্য চালাইয়া বিদেশী সরকারকে আঘাত হানিবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিলেন। ১৯২৫ সালের শেষভাগে চট্টগ্রামে ধর-পাকড় চলিতে থাকার সময় গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ প্রভৃতি কর্ম্মীরাও গ্রেপ্তার হইলেন। বহু অনুসন্ধান করিয়াও পুলিশ কিন্তু সূর্য্য সেন, নির্ম্মল সেন, চারুবিকাশ দত্ত প্রভৃতি কয়েকজন বিপ্লবীর কোনও পাত্তা পাইল না।

যুগান্তর ও অনুশীলনদলের চট্টগ্রাম শাখার মধ্যে এই সময় মিলন সংঘটিত হয়। ইহা সম্ভব হইয়াছিল সূর্য্য সেন, নির্ম্মল সেন, নগেন সেন, চারুবিকাশ দত্ত, প্রমোদরঞ্জন চৌধুরী (যিনি রায় বাহাদুর ভূপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়কে হত্যার অভিযোগে পরবর্ত্তীকালে প্রাণদণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছিলেন) প্রভৃতির আন্তরিক চেষ্টার ফলে। এই নবগঠিত বিপ্লবী দল নূতন উৎসাহ লইয়া কর্ম্মে অবতীর্ণ হইল এবং বাংলার নানাস্থানে ইহার বহু শাখা-প্রশাখাও প্রতিষ্ঠিত হইল। সূর্য্য সেন পরে আসামের কোনও এক চা-বাগানে আত্মগোপন করিয়া থাকিয়া অন্যান্য কর্ম্মীদের সহায়তায় আসামেরও নানাস্থানে বিপ্লবী-কেন্দ্র স্থাপনে মনোনিবেশ করেন। শোভাবাজার ও দক্ষিণেশ্বরের বিপ্লবী-কেন্দ্রও এই নূতন

নূতন গঠিত এই বিপ্লবী-সংস্থার সহিত শচীন্দ্র সান্যাল, রাজেন্দ্রনাথ লাহিড়ী, যোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি প্রসিদ্ধ নেতাগণের যোগাযোগ স্থাপিত হয় ১৯২৪ সালেই। বাংলা ও আসামে বিপ্লবের প্রস্তুতি উপযুক্তভাবে চালাইবার জন্য এবং ভারতের অন্যান্য স্থানের বিপ্লবী দলগুলির কার্য্যকলাপের সহিত এই অঞ্চলের কর্ম্মিগণের কার্য্যের সামঞ্জস্য বিধানের জন্য এই সময় শচীন্দ্র সান্যালকে সভাপতি করিয়া সূর্য্য সেন, রাজেন্দ্র লাহিড়ী, অনন্তহরি মিত্র, চারুবিকাশ দত্ত প্রভৃতি বিপ্লবীদিগকে লইয়া একটি পরিচালক-সংসদও গঠিত হয়। বাংলা ও আসামের প্রায় দুটি দশেক জেলায় ইংরাজের অস্ত্রাগার আক্রমণ এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করা প্রভৃতির পরিকল্পনা এই সময়ই অনেকটা রচিত হইয়াছিল। এই পরিকল্পনা অনুযায়ীই পরবর্ত্তীকালে চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুন্ঠিত হয়। আসাম ও বাংলা ব্যতীত ভারতের অন্যান্য স্থানের বিপ্লবীদিগের কার্য্যক্রম নির্ণয়ের ভার অর্পিত হয় বিপ্লবী যোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির উপর।

কিন্তু নূতন কর্ম্মোদ্দীপনার মধ্যে বিপ্লবের প্রস্তুতি যখন পূর্ণ উদ্যমে অগ্রসর হইতেছিল, তখন এমন কতকগুলি ঘটনা ঘটিল, যাহাতে উহা বাধাপ্রাপ্ত হইল। শচীন্দ্র সান্যাল, যোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি অল্পদিনের মধ্যেই গ্রেপ্তার হইলেন। কাকোরী, শোভাবাজার ও দক্ষিণেশ্বর ষড়যন্ত্র মামলায় প্রধান প্রধান বহু বিপ্লবী জড়িত হইয়া পড়ায় বহু পরিকল্পনাই গেল নষ্ট হইয়া এবং তখনকার মত বিপ্লবের প্রস্তুতি সেইখানেই অনেকটা স্থগিত হইয়া গেল।

একে একে অনেকেই গ্রেপ্তার হইলেন—কিন্তু পুলিশের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিলেন নেতা সূর্য্য সেন। শোভাবাজারের বাটিতে যেদিন খানাতল্লাস হয়, সেদিন সে সময় সূর্য্য সেনও উক্ত বাটিতে অবস্থান করিতেছিলেন। অতি প্রত্যূষেই পুলিশ আসিয়া বাটিতে হানা দিল। উক্ত বাটীর দুতলার এক কক্ষে ছিল বিপ্লবীগণের আস্তানা। রুদ্ধ দ্বারে পুলিশ আসিয়া আকস্মিকভাবে আঘাত করিতে থাকায় অভ্যন্তরে বিপ্লবীরা বিব্রত হইয়া পড়িলেন। প্রমোদরঞ্জন দ্বারদেশে পৃষ্ঠস্থাপন করিয়া পুলিশের ভিতরে প্রবেশে বাধা দিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ ধাক্কা ধাক্কির পর দ্বার উন্মুক্ত হইল এবং সদলে পুলিশদল কক্ষের ভিতরে প্রবেশ করিল। প্রতিটি জিনিষ তাহারা তন্ন তন্ন করিয়া খানাতল্লাস করিল—কোনও স্থান খুঁজিতে তাহারা বাকি রাখিল না; কিন্তু যাঁহার জন্য সারা বাংলার গোয়েন্দা-বিভাগ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত—কোথায় গেলেন সেই সূর্য্য সেন?

সূর্য্য সেন ততক্ষণে কক্ষের পশ্চাৎদ্বার দিয়া দেওয়ালের পা-জল বাহিয়া কোনও মতে নীচে নামিয়াছেন এবং একটি নোংরা সরু গলি অতিক্রম করিয়া রাজপথে পড়িয়া দ্রুতবেগে পথ চলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। প্রমোদরঞ্জনের পরামর্শেই তিনি এইরূপ করিয়াছিলেন এবং প্রমোদরঞ্জনও এই কারণেই দরজা চাপিয়া ধরিয়া পুলিশের ভিতরে প্রবেশে এতক্ষণ বাধা দিতেছিলেন। অন্যান্য বিপ্লবীরা ধরা পড়িলেন বটে—কিন্তু তবুও তাঁহারা হতাশ হইলেন না; কারণ তাঁহারা জানিতেন যে, একমাত্র সূর্য্য সেন জেলের বাহিরে থাকিলেই বিপ্লবের প্রস্তুতিও চলিতে থাকিবে।

(ক্রমশঃ)

পশ্চিম বাঙ্গলার আর্থিক পুনর্গঠন

অধ্যাপক শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ

ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রদেশ হিসাবে বাঙ্গলা অনেক দিন হইতেই প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। শিক্ষায় সংস্কৃতিতে বাঙ্গালী অনেকদিন যাবৎই ভারতের অধিকাংশ প্রদেশের অধিবাসীদের ঈর্ষার পাত্র। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে বাঙ্গলা প্রথম হইতেই গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়া আসিয়াছে। বাঙ্গলার লোক সংখ্যাও অবিরাম বাড়িয়াছে। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের তুলনায় ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গলার লোক সংখ্যা বাড়িয়াছে শতকরা ৪৩·১ ভাগ। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের তুলনায়ও ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে এই প্রদেশের লোক সংখ্যা বাড়িয়াছে শতকরা ২০·৩ ভাগ। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের গণনানুযায়ী অনুযায়ী অখণ্ড বাঙ্গলার লোক সংখ্যা ছিল ৬,০৩,০৬,৫২৫। লোক সংখ্যা হইল ২ কোটি ১২ লক্ষ। তাহার পর নানা কারণে পূর্ব্ববঙ্গ হইতে ২০ লক্ষ আন্দাজ লোক পশ্চিমবঙ্গে চলিয়া আসিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ হইতেও কিছু লোক পূর্ব্ববঙ্গে গিয়াছে বটে, তবে এই প্রদেশের আশ্রয়প্রার্থীদের সংখ্যার অনুপাতে তাহাদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য নয়। যাহা হউক এখন সব জড়াইয়া অন্ততঃ ২ কোটি ৩৫ লক্ষ লোক পশ্চিম বাঙ্গলায় বাস করিতেছে।

ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক কাঠামো এখনও কৃষি-কেন্দ্রিক, কাজেই ভারতের আর্থিক পুনর্গঠনের সকল প্রশ্নেই আগে কৃষির কথা মনে পড়ে। পশ্চিমবঙ্গ কৃষির হিসাবে মোটেই উন্নত নয়। পশ্চিম বাঙ্গলায় মোট-

কাজে লাগে না, ইহার শতকরা প্রায় ১০ ভাগ যায় বীজ ও অপচয়ের হিসাবে। শেষ পর্য্যন্ত যে খাদ্যশস্য অবশিষ্ট থাকে তাহাতে উপরিউক্ত ২ কোটি ৩৫ লক্ষ লোকের চলে না। অথচ বাঙ্গলায়ও শতকরা ৮ ভাগের মত খাদ্য ঘাটতি ছিল। কৃষিসমৃদ্ধ পূর্ব্ববঙ্গ বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। কাজেই পশ্চিম বঙ্গের খাদ্য পরিস্থিতি এখন খুবই শোচনীয়। ইহার উপর পশ্চিম বঙ্গকে বিরাট আশ্রয়প্রার্থী সমস্যার দায়িত্ব লইতে হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে এখন চাউলের ঘাটতি বৎসরে সাড়ে পাঁচ লক্ষ টনের মত। চাউল ছাড়া গম, ডাল, গোল আলু, গুড়, সরিষার তৈল, দুগ্ধ, ঘৃত ও মাখম প্রভৃতি খাদ্য দ্রব্যের দিক হইতেও পশ্চিম বাঙ্গলা স্বয়ং-সম্পূর্ণ নয়।

পশ্চিম বঙ্গের খাদ্য পরিস্থিতির উন্নতি হওয়া দরকার এবং এই জন্য সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন কৃষি ব্যবস্থার আমূল সংস্কারের। পশ্চিম বাঙ্গলায় প্রতি বিঘায় গড়ে যখন মাত্র ৫।৬ মণ ধান হয়, তখন শ্যাম, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশে হয় বিঘা প্রতি গড়ে ১২ মণ ধান এবং স্পেনে হয় ১৭ মণ। কৃষি ব্যবস্থায় আধুনিক যন্ত্রপাতির ও বৈজ্ঞানিক সারের ব্যবহার সুরু হইলে পশ্চিম বাঙ্গলার জমিতে গড়পড়তা ফসল উৎপাদন অবশ্যই অনেক বাড়িয়া যাইবে এবং সে ক্ষেত্রে পশ্চিম বাঙ্গলা অনায়াসেই খাদ্যের দিক হইতে স্বাবলম্বী হইয়া উঠিবে। বিহারের সিন্দ্রির রাসায়নিক সার উৎপাদনের কারখানাটি ভালভাবে চালু হইলে পশ্চিমবঙ্গে রাসায়নিক সার সুলভ হইবে বলিয়া আশা করা যায়। তা ছাড়া পশ্চিমবঙ্গে ১৬ লক্ষ ৭১ হাজার একর কর্ষণ-যোগ্য পতিত জমি আছে এবং এই জমি যথাসম্ভব কর্ষিত হইলে বহু পরিমাণ খাদ্যশস্য পাওয়া যাইতে পারে। বাঙ্গলা সরকার ময়ূরাক্ষী নদী সংস্কারের পূর্ণ দায়িত্ব (৭ কোটি টাকা) এবং দামোদর পরিকল্পনার আংশিক দায়িত্ব (মোট ব্যয় ৫৫ কোটি টাকার মধ্যে ২৮ কোটি টাকা) গ্রহণ করিয়াছেন। এই দুইটি পরিকল্পনা কার্য্যকরী হইলে এই প্রদেশে সেচ ব্যবস্থার প্রসার হইবে এবং ফলে শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে। এখন পশ্চিমবঙ্গে জল-সেচের ব্যবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। পশ্চিম বাঙ্গলায় মোট ১৬ হাজার বর্গমাইল স্থানে চাষ আবাদ হয়, ইহার মধ্যে সরকারী খালের সাহায্যে জলসেচ হয় মাত্র ২ লক্ষ ৭৫ হাজার একর জমিতে (শতকরা ·০২৫ ভাগ)। পরিকল্পনাকারদের হিসাব অনুসারে ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনার ফলে পশ্চিমবঙ্গের ৬ লক্ষ একর ধান-জমি ও ১ লক্ষ একর রবি শস্যের জমিতে জল সেচের ব্যবস্থা হইবে এবং দামোদর পরিকল্পনা অনুসারে জল সেচের ব্যবস্থা হইবে সাড়ে সাত লক্ষ একর জমিতে। ইহা সত্য হইলে শুধু এই দুইটি পরিকল্পনার জোরেই পশ্চিম বাঙ্গলা খাদ্য শস্যের দিক হইতে উদ্বৃত্ত প্রদেশ হইয়া উঠিবে বলিয়া আশা করা যায়। ঐ ছাড়া 'কলিকাতা-গঙ্গা সেচ কার্য্য' নামে গঙ্গা নদী সংস্কারের যে ৬০ কোটি টাকা ব্যয়ের পরিকল্পনা রচিত হইয়াছে, তাহা কার্য্যে পরিণত হইলেও পশ্চিমবঙ্গে খাদ্য শস্যের উৎপাদন অনেকাংশে বিভিন্ন প্রকারের যে ১৩,৩০০টি সমিতি পরিচালিত হইতেছে, তন্মধ্যে ৯৮১৪টি ঋণদান সমিতি বাঙ্গলার কৃষকদিগকে কৃষি কার্য্যে সহায়তা করিতেছে। চাষীদের সন্তুষ্ট করিয়া তাহাদের কর্ম্মোৎসাহ বৃদ্ধির জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার বর্গাদার ও জমির মালিকের মধ্যে জমির ফসল বণ্টনের হার সম্পর্কে একটি নূতন নীতি নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে নভেম্বর সরকারী দপ্তরখানায় প্রধান মন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এই নীতি ঘোষণা প্রসঙ্গে বলেন যে, এই নীতি অনুসারে প্রথমে জমির মোট উৎপন্ন ফসল হইতে বীজের জন্য বরাদ্দ ফসল পৃথক করিয়া রাখিতে হইবে। এই পৃথক করণের পর অবশিষ্টাংশ তিন ভাগে বিভক্ত হইবে এবং জমির মালিক তন্মধ্যে পাইবে এক ভাগ, চাষী পাইবে এক ভাগ এবং বাকী এক ভাগ পুনরায় তিন ভাগে ভাগ করিয়া তাহার দু ভাগ চাষের বলদ ও লাঙ্গল সরবরাহের এবং এক ভাগ জমির সার ও যানবাহন প্রভৃতির ব্যয় বহনের হিসাবে বণ্টিত হইবে।

তবে কৃষির উন্নতির প্রয়োজন থাকিলেও শিল্প প্রসার ছাড়া পশ্চিম বাঙ্গলার মত জনবহুল দেশে কর্ম্ম সংস্থান সমস্যার সমাধান অসম্ভব। বর্ত্তমানে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে পশ্চিম বঙ্গেই জনবাহুল্য সর্ব্বাধিক। এখানে প্রতি বর্গ মাইলে গড়ে ৭৫১ জন বাস করে। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অপর চারটি গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশ বোম্বাই, মাদ্রাজ, যুক্তপ্রদেশ ও বিহারে বর্গমাইল পিছু জনসংখ্যার ঘনত্ব যথাক্রমে ২৭৩, ২৯১, ৫১৮ ও ৫২১। ইহার উপর আবার পশ্চিমবঙ্গে বহিরাগতের চাপ ক্রমেই বাড়িতেছে। এই ক্রমবর্দ্ধমান জনসংখ্যার জীবিকা সংস্থানের জন্য পশ্চিমবঙ্গে কৃষির উন্নতির সহিত কুটির শিল্পের ব্যাপক সম্প্রসারণ অত্যাবশ্যক। পশ্চিম বাঙ্গলায় যন্ত্র শিল্পের প্রসারেরও অনেক সুযোগ আছে, তবে লোক বিনিয়োগ সমস্যার সমাধানে যন্ত্র শিল্প অপেক্ষা কুটির শিল্প অধিকতর ফলপ্রসূ। পশ্চিম বাঙ্গলায় ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের হিসাবে ইতিমধ্যেই লক্ষ্যণীয় শিল্প প্রসার হইয়াছে। সারা ভারতে যখন যন্ত্র শিল্পের শ্রমিক সংখ্যা ৩১ লক্ষ, তখন পশ্চিম বাঙ্গলায় এইরূপ দশ লক্ষের বেশী শ্রমিক আছে! বোম্বাই প্রদেশ শিল্প সমৃদ্ধির হিসাবে প্রসিদ্ধ, কিন্তু বোম্বাইয়ে যন্ত্র শিল্পের শ্রমিক সংখ্যা ৭ লক্ষের সামান্য বেশী হইবে। ১৯৪৯-৫০ খ্রীষ্টাব্দের বাজেট অধিবেশনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে অর্থ সচিব শ্রীযুত নলিনীরঞ্জন সরকার পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদে পশ্চিম বঙ্গের যন্ত্র শিল্পের একটি হিসাব দিয়াছেন। এই হিসাবে দেখা যায়, সারা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অনুপাতে পশ্চিমবঙ্গে কাগজ শিল্প শতকরা ৫০ ভাগ, পাট শিল্প শতকরা ৯৫ ভাগ, রং ও বার্ণিস শিল্প শতকরা ৫০ ভাগ, কাঁচ শিল্প শতকরা ৪০ ভাগ, লৌহ ও ইস্পাত শিল্প শতকরা ৩০ ভাগ, হোসিয়ারি শিল্প শতকরা ৮০ ভাগ, এনামেল শিল্প শতকরা ৫০ ভাগ, চা শিল্প শতকরা ২৮ ভাগ ও বৃহৎ শিল্প শতকরা ৬০ ভাগ রহিয়াছে। আপাত দৃষ্টিতে এই শিল্প পরিস্থিতি খুবই আশাপ্রদ। কিন্তু

[illegible] বার

ক্রমেই পশ্চিম বাঙ্গলার কলকারখানায় অধিকতরসংখ্যক বাঙ্গালীর কর্ম্ম সংস্থান লক্ষ্য করা যাইতেছে। পশ্চিমবঙ্গে নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠারও লক্ষণীয় প্রচেষ্টা দেখা যাইতেছে। ১৯৪৩-৪৪ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষে সবচেয়ে বেশী যৌথ কোম্পানী রেজেষ্ট্রীকৃত হয়, এই বৎসর অবিভক্ত বাঙ্গলায় ২৭ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা মূলধন লইয়া ৩৫০টি যৌথ কোম্পানী রেজেষ্ট্রী হইয়াছিল। বঙ্গ বিভাগের পর ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাস হইতে ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত এই মাত্র এক বৎসরে পশ্চিমবঙ্গে মোট ৬২ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা মূলধন সংগ্রহের অনুমতিসহ ১১৯৭টি যৌথ কোম্পানী রেজেষ্ট্রীকৃত হইয়াছে। পশ্চিম বাঙ্গলার পাট শিল্প অত্যন্ত সমৃদ্ধ, কিন্তু অবিভক্ত বাঙ্গলার শতকরা ৮২ ভাগ পাট চাষের জমি পূর্ব্ববঙ্গে পড়ায় কাঁচা পাটের জন্য পশ্চিমবঙ্গকে পূর্ব্ববঙ্গের উপর নির্ভর করিতে হইতেছে। আশার কথা, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের কর্ত্তৃপক্ষ এখন নিজ এলাকায় এই গুরুত্বপূর্ণ অর্থকরী ফসলটি অধিক পরিমাণে ফলাইবার চেষ্টা করিতেছেন এবং পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিবাঙ্কুর, মাদ্রাজ, বিহার, যুক্তপ্রদেশ, আসাম ও নেপালে পাট চাষ বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার সমবায় ব্যবস্থা প্রসারের সাহায্যে কুটীর শিল্পের সম্প্রসারণেও আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। পশ্চিমবঙ্গের সমবায় সমিতিগুলি যে লক্ষণীয় সাফল্যের সহিত কাজ করিয়া যাইতেছে, সে কথা আগেই বলা হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে তাঁত শিল্প সর্ব্বপ্রধান কুটীর শিল্পরূপে পরিগণিত হইতে পারে, এখানে ৮৬ হাজার তাঁতী ছিল, বঙ্গ বিভাগের পর পূর্ব্ববঙ্গ হইতে ১৩ হাজার তাঁতী পশ্চিমবঙ্গে আসিয়াছে। সমবায়ের ভিত্তিতে পরিচালিত হইলে এই শিল্পের সুযোগ সম্ভাবনা প্রচুর। বঙ্গ-বিভাগের পর মাত্র দেড় বৎসরের হিসাবে দেখা যায়, পশ্চিম বঙ্গে ৭০ হাজার তাঁতী লইয়া ৪ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা মূলধন সমন্বিত যে 'সংগ্রহ ও বিতরণ সমিতি' গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা এই সময়ের মধ্যেই প্রায় ১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকার কারবার করিয়াছে।

কৃষি শিল্পের প্রসারের উপর দেশের আর্থিক সমৃদ্ধি নির্ভর করে এবং পশ্চিম বঙ্গের কর্ম্ম সংস্থান সমস্যার সমাধানের জন্য অবিলম্বে কৃষি শিল্প বাণিজ্যের প্রভূত প্রসার আবশ্যক। তবে আর্থিক সমৃদ্ধিই কোন দেশের উন্নতির সব নয়, ইহার সহিত শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যের উন্নতি হইলে তবেই এই উন্নতি সম্পূর্ণ হইতে পারে। পশ্চিম বঙ্গের জনস্বাস্থ্য খুবই শোচনীয়। ম্যালেরিয়া ও কলেরায় গ্রামাঞ্চলে এবং যক্ষ্মা, টাইফয়েড প্রভৃতি মারাত্মক ব্যাধিতে সহর অঞ্চলে প্রতি বৎসর বহুলোক মারা যায়। সহর অঞ্চলে তবু সরকারী ব্যবস্থায় সাধারণ দেশবাসী কিছুটা চিকিৎসা লাভের সুযোগ পায়। কিন্তু পশ্চিম বঙ্গের ৩৫,৪৩৬টি গ্রামের প্রায় সবগুলিতেই চিকিৎসা ব্যবস্থা অত্যন্ত নিম্ন শ্রেণীর। বিনা খরচে বা অল্প খরচে চিকিৎসার সুযোগ না পাইলে এখনকার ব্যয়বহুল চিকিৎসার ব্যবস্থা করা এই দরিদ্র প্রদেশের অনেকের পক্ষেই সম্ভব নয়। আশার কথা, ইউনিয়ন বোর্ডের প্রত্যেকটিতে ৩টি করিয়া এবং প্রদেশের ৬০টি থানার প্রত্যেকটিতে ৫০টি বেডসহ হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা আছে। এই হাসপাতালগুলিতে ইনডোর ও আউটডোর উভয় প্রকার রোগীরই চিকিৎসার ব্যবস্থা হইয়াছে। প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট না হইলেও গ্রামাঞ্চলের স্বাস্থ্য সংরক্ষণে কর্ত্তৃপক্ষের আগ্রহের পরিচায়ক বলিয়া এই চিকিৎসা পরিকল্পনায় সকলেরই আনন্দিত হইবার কথা।

শিক্ষার দিক হইতেও বাঙ্গলা দেশ আশানুরূপ উন্নত নয়। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার হিসাবে পশ্চিমবঙ্গ অপেক্ষা পূর্ব্ববঙ্গ অধিকতর সমৃদ্ধ। পূর্ব্ববঙ্গে ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় ছিল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকা ছাড়িয়া দিলেও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত বিদ্যালয়গুলির ½ অংশ ছিল পূর্ব্ববঙ্গে। তবু সমগ্রভাবে বাঙ্গলার শিক্ষার প্রসার হয় নাই বলা হইত। অখণ্ড বাঙ্গলার লোকসংখ্যা ছিল ৬ কোটির উপর, বয়সের হিসাব ধরিলে ইহার মধ্যে বিদ্যালয়ে গমনযোগ্য বালকবালিকার সংখ্যা অন্ততঃ এক কোটি হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে সব জড়াইয়া বাঙ্গলায় ৬১,২৪৯টি বিদ্যালয়ের খাতায় নাম ছিল মাত্র ৩৯,৩৫,২৬৭ জন ছাত্র ছাত্রীর। অভিজ্ঞতা হইতে দেখা গিয়াছে, বাঙ্গলার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যে সব ছাত্র-ছাত্রী পড়িতে আসে, তাহাদের অন্ততঃ ½ অংশ পাঠক্রম শেষ না করিয়াই লেখাপড়া ছাড়িয়া দেয়। এই অখণ্ড বাঙ্গলার হিসাবেই পশ্চিম বঙ্গের শিক্ষার অবস্থা উপলব্ধি করা যাইবে। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের আদমসুমারী অনুসারে পশ্চিম বঙ্গে শতকরা ১৮ জন লেখাপড়া জানা লোক ছিল। পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আশ্রয়প্রার্থীদের আগমন ইত্যাদি কারণে এখন অবশ্য এই সংখ্যা কিছু বাড়িয়াছে এবং বর্ত্তমানে এই প্রদেশে শিক্ষিতের হার শতকরা ২২ জন বলিয়া মনে করা যায়। কিন্তু বাহুল্য ২২ জন হইলেও ইহা যথেষ্ট নয়। এই প্রদেশের শিক্ষা সম্পর্কে আর্থিক ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদারতা আরও বেশী প্রত্যক্ষ না হইলে এতবড় সমস্যা সমাধান সত্যই আশা করা যায় না। স্বাধীন দেশে অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন রাষ্ট্রের প্রাথমিক কর্ত্তব্য বলিয়া স্বীকার করা উচিত। গ্রামাঞ্চলে নিরক্ষরতা দূরীকরণে ব্যাপকভাবে নৈশ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাও একান্ত আবশ্যক। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে ছাত্র-ছাত্রীদের সাধারণ বিদ্যাদানের সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যতে জীবিকা সংস্থানের উপযোগী কিছু কিছু কৃষি শিক্ষার ব্যবস্থা করাও দরকার। ইহাতে কুটীর শিল্প সমুন্নত হইয়া বহু লোকের কর্ম্ম সংস্থান হইবে এবং দেশের পণ্যাভাবও অনেকাংশে কমিয়া যাইবে। এই প্রসঙ্গে মহাত্মা গান্ধী পরিকল্পিত ওয়ার্দ্ধা শিক্ষা পরিকল্পনার ন্যায় শিক্ষাপদ্ধতির প্রতি কর্ত্তৃপক্ষের মনোযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য।

পশ্চিম বাঙ্গলা সরকারের আর্থিক অবস্থা এখন মন্দ নয়। বঙ্গ

পূর্ববঙ্গ হাতছাড়া হওয়ায় আয়কর হিসাবে ভারতসরকারের কমিয়াছে মাত্র ৮০ লক্ষ টাকা এবং পাট যদিও পশ্চিমবঙ্গে বেশী হয় না, ভারতের ১০৭টি পাটকলের মধ্যে ৯৯টি পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত হওয়ায় পাটশুল্ক বাবদ ভারতসরকার যাহা কিছু পাইতেছেন, তাহার অধিকাংশই পাইতেছেন পশ্চিমবঙ্গ মারফৎ। এই সব যুক্তি থাকা সত্ত্বেও বঙ্গ বিভাগের নাম করিয়া ভারতসরকারের পশ্চিমবাঙ্গলার পাটশুল্ক ও আয়করের হিসাবে অংশ কমাইয়া দেওয়া সমীচীন নয়। অবিভক্ত বাঙ্গলা ভারত সরকারের আয়করের বণ্টনযোগ্য অংশের শতকরা ২০ ভাগ ও পাটশুল্ক বাবদ আদায়ী টাকার শতকরা ৬২ ভাগ পাইত। বঙ্গ বিভাগের পর পশ্চিম বাঙ্গলা এ হিসাবে পাইতেছে যথাক্রমে মাত্র শতকরা ১২ ভাগ ও শতকরা ২০ ভাগ। এই দুই খাতে অখণ্ড বাঙ্গলার হিসাবে পশ্চিমবঙ্গ কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে ৪ কোটি ৫০ লক্ষ (১৯৪৮-৪৯ খ্রীষ্টাব্দে) টাকার মত কম পাইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার দামোদর ময়ূরাক্ষী প্রভৃতি ব্যয়বহুল নদী সংস্কার পরিকল্পনায় হাত দিয়াছেন, তাছাড়া শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিস্থিতির উন্নতির সাধনে তাহারা অনেকটা অগ্রসর হইয়াছেন, এ সময় স্বাভাবিক ভাবে আয়বৃদ্ধির মত ব্যবস্থা হয় ততই মঙ্গল। উন্নয়ন পরিকল্পনায় কেন্দ্রীয় সরকার প্রদেশগুলিকে বর্ত্তমানে আশানুরূপ সাহায্য করিতেছেন না, এই সাহায্যে ন্যায়সঙ্গতভাবে বাড়িলে পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলি অপেক্ষাকৃত দ্রুততার সহিত কার্য্যকরী হইতে পারে।

বঙ্গবিভাগের আগে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় বাঙ্গলার আর্থিক পুনর্গঠনের (ইহার মধ্যে কৃষিকার্য্য, পশুপালন ও পশু চিকিৎসা, বন সংরক্ষণ, মৎস্য চাষ, সমবায় ব্যবস্থা, গ্রামোন্নয়ন, শিল্প, শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, রাস্তাঘাট, সেচব্যবস্থা প্রভৃতি ছিল। এজন্য ১৫৯ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ের একটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রচিত হইয়াছিল এবং কেন্দ্রীয় সরকার ইহার মধ্যে ৬৯ কোটি টাকা সাহায্য করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। এই পরিকল্পনার ভিত্তিতেই পশ্চিমবাঙ্গলায় আর্থিক পুনর্গঠনের ব্যবস্থা হইতেছে। প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতালাভের পর আর্থিক পুনর্গঠনের এই পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিতে সরকারী কর্ত্তৃপক্ষের সাগ্রহে অগ্রসর হওয়াই স্বাভাবিক। এতদিন বিদেশী শাসনের আমলে কর্ত্তৃপক্ষ দেশের সামগ্রিক কল্যাণসাধন সম্পর্কে মোটেই আগ্রহান্বিত ছিলেন না। ১৯৩৮—৩৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯৪৮—৪৯ খৃষ্টাব্দ,—এই দশবৎসরে সমগ্র ভাবে ভারতীয় প্রদেশগুলির আয় বাড়িয়াছে ১৭৭ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা, কিন্তু ইহার মাত্র ৪৭ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকা (শতকরা ২৬.৭ ভাগ) জনকল্যাণ বা সমাজ কল্যাণ মূলক উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হইয়াছে। স্বাধীন দেশে এইরূপ ব্যবস্থা অবশ্যই নিন্দনীয়।

পশ্চিম বাঙ্গলায় কাঁচামাল ও শিল্প-শ্রমের অভাব নাই, সরকার এবং জনসাধারণ সমবেত ভাবে চেষ্টা করিলে এই প্রদেশের আর্থিক স্বাতন্ত্র্য সাধন খুব বেশী কঠিন বলিয়া মনে হয় না। কৃষির উন্নতির সহিত কুটীরশিল্প ও যন্ত্রশিল্প দুয়েরই উন্নতির উপর এই স্বাতন্ত্র্য নির্ভর করিতেছে। অবশ্য জাতীয় সরকারের নিকট এদিক হইতে পূর্ণ সহযোগিতা স্বাভাবিক ভাবেই আশা করা যায়, তাছাড়া জনমত সক্রিয় এবং জাগ্রত হইলে আত্মরক্ষার জন্যই সরকারকে জনকল্যাণে অধিকতর দৃষ্টি দিতে হইবে। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গের আর্থিক পুনর্গঠনের জন্য সর্ব্বাগ্রে চাই বাঙ্গালীর কর্ম্মোৎসাহ বৃদ্ধি।

মেঘ মুক্তি

শ্রীশান্তশীল দাশ

অমা রজনীর ঘন কুহেলিকা দিকে দিকে জাগে ওই :
দিগন্ত-জোড়া আঁধারের বুকে শ্মশানের বিভীষিকা ;
পথিকের প্রাণে হতাশার মেঘ, মরণের হাতছানি—
প্রাণ ধারণের সকল বাসনা বেদনায় অবসান।
ক্লান্তির গ্লানি সারাটি অংগে কোন মতে পথচলা,
দীর্ঘ পথের সীমা রেখা কই আলো পড়ে না'ক চোখে ;
জীবন-মৃত্যু ভেদাভেদ নেই, এক হ'য়ে গেছে সব,
পশ্চিম কোনে ঝড়ের আভাস, সূচনা কী প্রলয়ের ?
নীরব চরণে মহা-মৃত্যুর সমারোহ আয়োজন ?
মাঝে মাঝে জ্বলে বিদ্যুৎ শিখা আঁধারের বুক চিরে,
স্তব্ধ পথিক, পথচলা তার অকারণে নেমে যায়।
ধ্বংস অথবা নূতন সৃষ্টি—মৃত্যু জড়ত্বের ?
ঝড়ের আঘাতে ঝরা পাতা সব নিরমূল, নিঃশেষ ;
রাতের আঁধার দূরে সরে যাবে ভোরের স্পর্শ পেয়ে ;

সাময়িকী

অরাজকতা সৃষ্টির চেষ্টা—

কিছুদিন হইতে এদেশে এক দল লোক বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্টের আদেশ অমান্য করিয়া সর্ব্বত্র অরাজকতার সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করিতেছে। কিছুদিন পূর্ব্বে দমদমে জেসপ কোম্পানীর কারখানা, বিমান-ঘাঁটি প্রভৃতি স্থানে ও বসিরহাটে তাহাদের চেষ্টায় যে মর্ম্মন্তুদ ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা শান্তিপ্রিয় ব্যক্তি মাত্রকেই চিন্তিত করিয়াছিল। একদল স্বার্থান্ধ লোক দেশের যুবক সম্প্রদায়কে বিভ্রান্ত করিয়া ও নানা প্রলোভনে বিপথে পরিচালিত করিয়া এ কার্য্য যে করিতেছে, তাহা সর্ব্বজনবিদিত। জেসপ কোম্পানীর কারখানায় সহসা বহু লোক এক সঙ্গে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া কয়েকজন শ্বেতাঙ্গ কর্ম্মচারীকে জলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়া পুড়াইয়া মারিয়াছিল। সে ঘটনায় বহু তরুণ ধৃত হইয়াছে ও তাহাদের বিচার চলিতেছে। বসিরহাটেও গ্রামবাসীদিগকে অর্থের লোভ

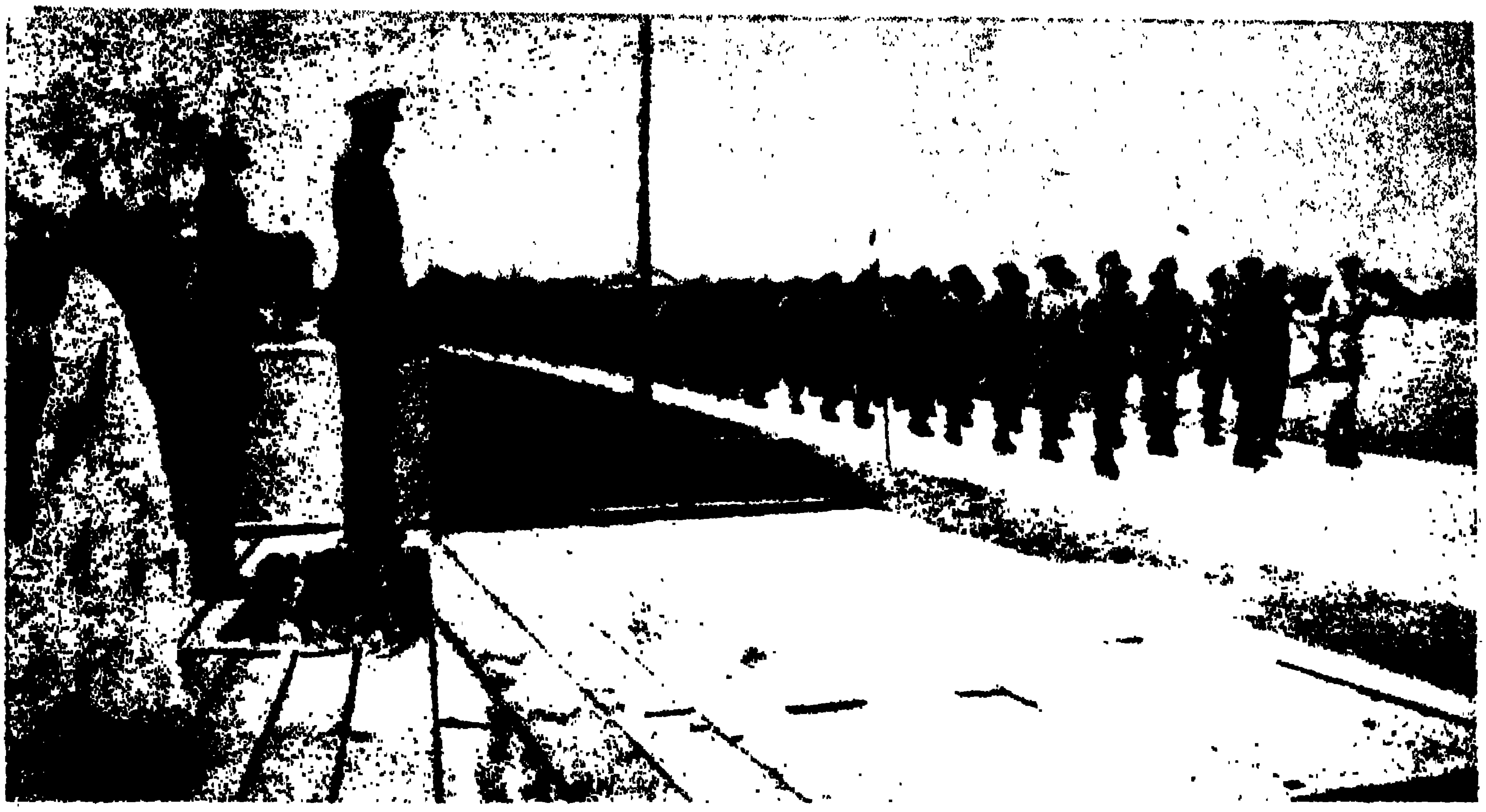

কাঁচড়াপাড়া শিক্ষা-কেন্দ্রে বঙ্গীয় রক্ষিদলের কুচকাওয়াজ পরিদর্শন রত ভারতের প্রধান সেনাপতি জেনারেল কারিআপ্পা ফটো—শ্রীপান্না সেন

ঘোষিত হওয়ার পরও একদল 'কম্যুনিষ্ট' এই সকল কার্য্য করিয়া বেড়াইতেছে।

* * *

দেশে জনগণের অভাব অভিযোগের অন্ত নাই। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর প্রায় দুই বৎসর অতীত হইলেও দেশবাসীর অন্নবস্ত্র সমস্যা সমাধানের কোন উপযুক্ত ব্যবস্থা ত হয় নাই—অধিকন্তু খাদ্যসামগ্রীর দাম দিন দিন এত অধিক বাড়িয়া যাইতেছে, যে কোন লোক পেট ভরিয়া খাইতে পায় না। এ বিষয়ে আমরা একাধিকবার আলোচনা করিয়াছি এবং বলিয়াছি, ইহার জন্য শাসক সম্প্রদায় আংশিক ভাবে দায়ী হইলেও জনগণ ইহার জন্য কম দায়ী নহেন। সহসা বাংলা দেশ দুই ভাগে বিভক্ত হওয়ায় পূর্ব্ববঙ্গ হইতে বহু লক্ষ লোক পশ্চিমবঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। তাহাদের বাসস্থান সমস্যা যেমন সঙ্গীন —আহার্য্য সমস্যা তদপেক্ষা অধিক সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে;

হইয়াছে—জমি পতিত অবস্থায় থাকিলেও কেহ কৃষি দ্বারা তথায় শস্য উৎপাদনের কোন চেষ্টা করে না। পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আগত জনগণ গ্রামাঞ্চলে যাইয়া কৃষি কার্য্যে আত্মনিয়োগ না করিয়া কারখানায় কাজ পাইবার আশায় সহরে ও কারখানাবহুল অঞ্চলে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। সে জন্য তরিতরকারীর অভাব সর্ব্বত্র বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হইতেছে। এ সকল ঘটনা এত দ্রুত ঘটিতেছে, ইহার প্রতিকার চেষ্টা করা শাসকদের পক্ষে আদৌ সম্ভব নহে। শাসকগণও বড় বড় দীর্ঘকালব্যাপী পরিকল্পনার আতপ চাউল খাইতে অভ্যস্ত ছিল না। বিদেশে সিদ্ধ চাউল প্রস্তুত হয় না—কাজেই শাসকগণ আতপ চাউল আমদানী করিতে বাধ্য হন—তাহা খাইতে বাধ্য হইয়া বাঙ্গালা দেশে রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পাইতেছে। কবে যে আমাদের দেশ-জাত চাউলের দ্বারা দেশবাসীর অন্ন সংস্থানের ব্যবস্থা করা সম্ভব হইবে, তাহারও কোন স্থিরতা নাই। তাড়াতাড়ি বহু পরিমাণ চাউল বিদেশ হইতে সংগ্রহ করিতে হয়, সে জন্য কাঁকর ও ধান-শুদ্ধ চাউলও আমদানী হইতেছে—তাহা গ্রহণ করা সাধারণ মানুষের পক্ষে কষ্টকর

কলিকাতা অন্ধ-বিদ্যালয়ে পশ্চিম বঙ্গের প্রদেশ পাল ডাঃ কৈলাশনাথ কাটজু এবং বিদ্যালয়ের পরিচালকবৃন্দ ও ছাত্র-ছাত্রীগণ

কথা লইয়া এত ব্যস্ত যে—আপাতত কি ভাবে এ সমস্যার সমাধান করা যায়, তাহার চিন্তাও করিতেছেন না। এদেশের প্রধান খাদ্য চালের জন্য এখন আমাদের সম্পূর্ণরূপে পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইতেছে। অষ্ট্রেলিয়া, ব্রেজিল প্রভৃতি দেশ হইতে শাসকগণ যে বিদেশী চাউল অধিক মূল্যে ক্রয় করিয়া এদেশে আমদানী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই ভাবে দেশের সর্ব্বত্র দারুণ অসন্তোষ ঘনীভূত হইয়াছে। এই অবস্থায় অসন্তুষ্ট জনগণকে অতি অল্প কারণে উত্তেজিত করিয়া তোলা আদৌ কষ্টকর নহে।

* * *

কারখানা বহুল অঞ্চলে বেকার সমস্যা [illegible]

বিদেশী জিনিষ আমদানীর ফলে যে সকল কারখানায় কাজ কমিয়া গিয়াছে, বহু অস্থায়ী কারখানা সাময়িক প্রয়োজনে বড় হইয়াছিল, এখন বন্ধ হইয়াছে—তাহার ফলে বহু লক্ষ লোক বেকার হইয়াছে। এই সকল লোক এক সময়ে কৃষিকার্য্য দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিত। এখন আর তাহারা সে কার্য্যে ফিরিয়া যাইতে চাহে না। কৃষি কার্য্য দ্বারা শস্য উৎপাদন করিতে হইলে নানা প্রকার কষ্ট সহ্য করিতে হয়—সকল কার্য্যের দায়িত্ব নিজের স্কন্ধে গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু কারখানার কাজে যেমন দায়িত্বও নাই, তেমনই পরিশ্রমও অনেক কম। লোক

এই অসন্তুষ্ট জনগণকে যে কোনভাবে বিপথে পরিচালিত করা হয়। ছাত্রদের মধ্যেও রাজনীতি চর্চ্চা প্রবেশ করায় তাহাদের তথাকথিত নেতারা ছাত্রদের দ্বারা নানাপ্রকার আন্দোলন পরিচালনা করিতেছেন। শ্রমিক ধর্ম্মঘটের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের জন্য ছাত্র ধর্ম্মঘট তাই এ যুগে ব্যাপকভাবে দেখা দিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ পর্য্যন্ত অতি সহজে উত্তেজিত হইয়া নানাপ্রকার অন্যায় আন্দোলন দ্বারা দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিতে পশ্চাদপদ হন না।

দেশবন্ধু পার্কে নববর্ষ উৎসব   ফটো—শ্রীপান্না সেন

সে জন্য গ্রামে ফিরিয়া যাইতে চাহে না। বেকার অবস্থায় কারখানা বহুল অঞ্চলে থাকিয়া নানা উপায়ে গণ্ডগোল ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিতেছে।

* * *

চারিদিকের অবস্থা যখন এইরূপ, তখন তাহাদের মধ্যে কাজ করিয়া তাহাদের উত্তেজিত করা কম্যুনিষ্টদের পক্ষে খুবই সহজ কাজ হইয়াছে। সে জন্য শাসকবর্গের চেষ্টায়

এই অবস্থায় গত ২৭শে এপ্রিল কলিকাতায় আর এ অতি শোচনীয় ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে। জেলে এর বিচারাধীন বন্দী প্রায়োপবেশন করায় তাহাদের প্র সহানুভূতি ও সরকারী ব্যবহারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জ্ঞাপন জন্য একদল মহিলা ঐ দিন সরকারী ১৪৪ ধারার অমান্য করিয়া কলিকাতার রাজপথে শোভাযাত্রা বা করিয়াছিল।

হয়। বিক্ষোভ প্রদর্শনকারীরা ঐ সময়ে জনতার উপর বোমা নিক্ষেপ করে ও তাহার ফলে দিনের বেলায় কলিকাতার রাজপথে একসঙ্গে ৭জন নিহত ও ৪জন আহত হয়। নিহতদের মধ্যে ৪জন মহিলা, ১জন পুলিস কনেষ্টবল ও ২জন পুরুষ ছিল। সরকারী বিবরণে জানা যায় যে—অধিকাংশ লোকই বোমা দ্বারা নিহত হইয়াছে—পুলিসের গুলী তাহাদের মৃত্যুর কারণ নহে। এই ঘটনা সম্পর্কে পুলিস বহু লোককে গ্রেপ্তার করিয়াছে। গোলমাল এত বেশী হইয়াছিল যে, কে বা কাহারা বোমা নিক্ষেপ করিয়াছিল, তাহা স্থির করা কঠিন। মহিলার দলের পক্ষে দায়ী করিয়া তাহাদের পদত্যাগ দাবী করিয়াছে, তাহাদের কার্য্য কতটা সঙ্গত, তাহাও বুঝা যায় না। মহিলাদের মৃত্যু অবশ্যই মর্ম্মন্তুদ ঘটনা—কিন্তু কি জন্য তাহারা এইরূপ শোচনীয়ভাবে প্রাণ হারাইল, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখাও বিশেষ প্রয়োজন। শোচনীয় পরিণতির সম্ভাবনা জানিয়াও ঐ সকল মহিলা আইন অমান্য করিবার জন্য রাজপথে বাহির হইয়াছিল। তাহারা বৈধ উপায় ত্যাগ করিয়া যখনই অবৈধ উপায় গ্রহণ করে, তখনই বুঝা যায় যে তাহারা দেশের শৃঙ্খলা রক্ষার পক্ষপাতী নহে। সকল কার্য্যের জন্য মন্ত্রীসভাকে গালি দিলে বা তাহাদের কার্য্যের

দেশবন্ধু পার্কে নববর্ষ উৎসবে পশ্চিম বঙ্গের প্রদেশপাল ডাঃ কাটজু — ফটো— শ্রীপান্না সেন

৪৪ ধারার আদেশ অমান্য করার চেষ্টা অবশ্যই নিন্দনীয়। হিলাদের পিছনে যে গোলমাল-সৃষ্টিকারী পুরুষের দলও ল, সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। এ অবস্থায় দেশের াইন ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য পুলিসের পক্ষে াদুনে গ্যাস ব্যবহার বা গুলী বর্ষণ করা ছাড়া অন্য উপায়ও ল না। পুলিস ঐ সকল স্থানে যে গুলী চালায়, তাহাতে াক মরে না—ইহাও তৎপরদিনের ঘটনায় বুঝা যায়। নিন্দা করিলে দেশকে উন্নতির পথে অগ্রসর করা কোন দিনই সম্ভব হইবে না। মন্ত্রিসভা অন্যায় কাজ করিলে তাহার সমালোচনা করিবার অধিকার সকলেরই আছে। কিন্তু সেই সমালোচনা যেন অবৈধ আকার ধারণ না করে। কলিকাতায় ২৭শে এপ্রিল অনুষ্ঠিত ঘটনা দেশের প্রত্যেক শুভকামীকেই চিন্তান্বিত করিয়া তুলিয়াছে। পুলিসের জুলুম চিরকালই নিন্দনীয় [illegible]

অস্তিত্বের কোন প্রয়োজন নাই। দমদম জেসপ কোম্পানীর কারখানায় বা বসিরহাটের ঘটনা এমন অতর্কিত ভাবে ঘটিয়াছিল যে পুলিসের পক্ষে তখনই কিছু করা সম্ভব হয় নাই। তাহার পর ঐ সম্পর্কে যাহারা ধৃত হইয়াছে, তাহাদের বিবরণ দেখিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। অধিকাংশ বিপথগামী তরুণই ঐ ঘটনার জন্য দায়ী—তাহাদের বুদ্ধি ও পরামর্শদাতার দল অবশ্যই আছে। কলিকাতার ঘটনার জন্য যে মহিলা দল দায়ী, তাহাদের সম্বন্ধেও উপযুক্ত ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন। দেশে এই দলের প্রচার বৃদ্ধি পাইলে

বেহালা কল্যাণ সংঘের শিশু প্রদর্শনী

দেশবাসীকে অরাজকতার মধ্যে বাস করিতে হইবে ও তজ্জনিত সকল অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে। কাজেই অঙ্কুরে উহা বিনষ্ট করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট যত কঠোর ব্যবস্থাই অবলম্বন করুন না কেন, তাহাতে কাহারও বাধা প্রদান করা উচিত নহে। সে জন্য কলিকাতার রাজপথে শৃঙ্খলা ভঙ্গকারীদের দমনের জন্য চেষ্টা ও সে বিষয়ে পুলিসকে সাহায্যদান না করিলে দেশের অসীম দুরবস্থা উপস্থিত হইবে।

ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা—

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট ভারতবর্ষে—ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্থান—দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে বটে, কিন্তু সে স্বাধীনতা—বৃটীশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া স্বাধীনতা বলিয়া কেহই তাহাতে সন্তুষ্ট হন নাই। আমরা চিরদিনই বৃটীশ সাম্রাজ্যের বাহিরে থাকা স্বাধীনতা লাভ করার কথাই চিন্তা করিয়াছি। স্বাধীনতা লাভের পর ভারত শাসনের জন্য যে শাসনতন্ত্র রচিত হইতেছে, তাহাতে ভারতকে এক সার্ব্বভৌম স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত করারই প্রস্তাব করা হইয়াছে। ভারতের বর্ত্তমান প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহরু একথা

না করিয়াই আপোষে আমরা ভারতীয় স্বাধীনতা লাভ করিয়াছি। সেজন্য পণ্ডিত নেহরুও বিশ্বাস করিতেন যে ভারতের পক্ষের কথা ঠিক ভাবে বৃটীশ কর্তৃপক্ষকে জানানো হইলে বর্তমান সমস্যারও সমাধান হইবে। পণ্ডিত নেহরুর প্রস্তাব মত বৃটীশ প্রধান মন্ত্রী সম্প্রতি লণ্ডনে ডোমিনিয়ন (বৃটীশের অধীন দেশ) সমূহের প্রধান মন্ত্রীদের এক সম্মেলন আহ্বান করিয়াছিলেন। তাহাতে বৃটীশ যুক্তরাজ্য, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, ভারত, পাকিস্থান ও সিংহলের প্রধান মন্ত্রীরা সকলেই যোগদান করিয়াছিলেন। ৭দিন সম্মেলনের অধিবেশনের পর সমস্যার সমাধান হইয়াছে। গত ১৪ই

বর্মার প্রধান মন্ত্রী থাকিন নু রেঙ্গুন হইতে দিল্লী যাত্রার পথে কলিকাতায় ফটো—শ্রীপান্না সেন

বৈশাখ বুধবার লণ্ডন হইতে নিম্নলিখিতরূপ ঘোষণা প্রচার করা হইয়াছে—

“ভারত বৃটীশ কমনওয়েলথের অন্তর্গত অন্যান্য দেশগুলিকে জানাইয়া দিয়াছে যে, রচনাধীন নূতন শাসনতন্ত্র অনুযায়ী ভারত আপনাকে স্বাধীন ও সার্ব্বভৌম ও সাধারণতন্ত্ররূপে ঘোষণা করুক—ইহাই ভারতীয় জনসাধারণের অভিপ্রায়। ভারত গভর্ণমেণ্ট এ অভিপ্রায়েও দৃঢ়তার সহিত ঘোষণা করিয়াছেন যে, কমনওয়েলথ অব্ নেশন্সের সদস্যদিগের স্বতঃপ্রবৃত্ত সমবায়ের প্রতীক—তথা তাহার শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিরূপে স্বীকার করিয়া লইতে সম্মত। কমনওয়েলথের অন্তর্গত অন্যান্য দেশের গভর্ণমেণ্টসমূহের সদস্য পদ যে ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, এতদ্বারা তাহার কোনরূপ পরিবর্তন সাধিত হইল না এবং তৎসত্ত্বেও ঘোষণার সর্ত অনুযায়ী কমনওয়েলথের সদস্যরূপে ভারতের অবস্থান তাঁহারা মানিয়া লইলেন।”

বৃটীশ কর্তৃপক্ষ ভারতকে এই যে নূতন অবস্থার

লণ্ডন যাত্রার পথে দমদম বিমান ঘাটিতে অষ্ট্রেলিয়ার প্রধান মন্ত্রী ও নিউজিল্যাণ্ডের প্রধান মন্ত্রী ফটো—শ্রীপান্না সেন

সুবিধা দান করিলেন, ইহা দ্বারা উভয় রাষ্ট্রই ভবিষ্যতে লাভবান হইবে, সন্দেহ নাই। ইংরাজ তাহার বর্তমান অবস্থায় ভারতকে তাহার কমনওয়েলথের সহিত সংযুক্ত রাখিতে চাহে—অথচ ভারত সার্ব্বভৌম স্বাধীন রাষ্ট্র বলিয়া নিজেকে ঘোষণা করিবে। কাজেই এইরূপ প্রস্তাবে সম্মত হওয়া ছাড়া বৃটীশের অন্য উপায় ছিল না। বৃটীশ কমনওয়েলথের অন্যান্য দেশ রাজানুগত্য স্বীকার করিলেও ভবিষ্যতে ভারতকে আর রাজানুগত্য স্বীকার করিতে হইবে না। কাজেই ভারত যে আর বৃটীশের অধীন রহিল না, এ

নেশন্‌স্‌। এখন স্বাধীন ভারতের পক্ষে তাহার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখার প্রয়োজনও আছে। পণ্ডিত নেহরু এই ব্যবস্থায় সম্মত হইয়া দেশবাসীর মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন। নিন্দুকের দল যাহাই কেন বলুন না, স্বাধীন ভারত পণ্ডিত নেহরুর মত তীক্ষ্ণবুদ্ধি প্রধানমন্ত্রী পাইয়া অবশ্যই সে জন্য গর্ব্ব অনুভব করিবে।

তথায় একটি কমিটী গঠিত হয়—কমিটীর সদস্য ছিলেন—(১) পণ্ডিত জহরলাল নেহরু (২) সর্দ্দার বল্লভভাই পেটেল ও (৩) রাষ্ট্রপতি ডক্টর পট্টভি সীতারামিয়া। গত ৫ই এপ্রিল দিল্লীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর সভায় উক্ত কমিটী তাঁহাদের রিপোর্ট দিয়াছেন। রিপোর্টে বলা হইয়াছে—"আমরা যে সকল গুরুত্বপূর্ণ কার্য্যে ব্যাপৃত আছি, সর্ব্ব

শিল্পগুরু শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করিয়া উহার সুষ্ঠু সম্পাদনে যাহাতে আমরা আত্ম-নিয়োগ করিতে পারি, তজ্জন্যই ভাষার ভিত্তিতে নূতন করিয়া প্রদেশ গঠন আপাততঃ কয়েক বৎসরের জন্য স্থগিত রাখা হউক।" আমরা ইহা দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়াছি। মানভূমের বাঙ্গালীদিগকে হিন্দী ভাষাভাষী বলিয়া প্রচার করিবার জন্য বিহার গভর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীরা তথায় যে সকল অনাচার সম্পাদন করিয়াছে, তাহা সর্ব্বজনবিদিত। তাহার প্রতিবাদেই মানভূমের খ্যাতনামা কর্মী শ্রীযুত অতুলচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের নেতৃত্বে ৬ই এপ্রিল হইতে তথায় সত্যাগ্রহ আরম্ভ হইয়াছিল। জামসেদপুর অঞ্চল হইতেও বঙ্গ ভাষা বিতাড়নের চেষ্টা চলিতেছে। আসামেও সে জন্য ব্যাপক আন্দোলন চলিতেছে। আমরা গত বৈশাখ মাসের ভারতবর্ষে ৪২৯ পৃষ্ঠায় এ বিষয়ে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছি। ইহার পরও যদি নেতারা অন্য কাজের চাপের অজুহাতে ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠন কার্য্য বন্ধ রাখেন, তবে দেশবাসী যে নেতাদের উপর আস্থা হারাইবে, তাহাতে

ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠন—

মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশকে ভাঙ্গিয়া অন্ধ্র, তামিল, কর্ণাটক ও কেরল প্রদেশ গঠনের জন্য বহুদিন হইতে দক্ষিণ ভারতে আন্দোলন চলিতেছে—দক্ষিণ ভারতে ৪টি প্রধান ভাষা প্রচলিত—তেলেগু, তামিল, ক্যানারী ও মালায়ালাম্‌। সেই ভাষার ভিত্তিতেই ৪টি নূতন প্রদেশ গঠনের প্রস্তাব হইয়াছে। উত্তর ভারতেও ভাষা হিসাবে প্রদেশের পুনর্গঠন প্রয়োজন—পশ্চিম বাঙ্গলার সন্নিহিত বিহারের বাঙ্গালা ভাষা-ভাষী অঞ্চলগুলিকে—মানভূম, সিংহভূম, হাজারীবাগের কিয়দংশ, সাঁওতালপরগণা ও পূর্ণিয়া জেলার কিয়দংশ—পশ্চিম বাঙ্গালার সহিত একত্র করার আন্দোলনও চলিতেছে। উড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশের মধ্যবর্ত্তী কতকগুলি দেশীয় রাজ্য উড়িয়া ভাষাভাষী—সেগুলি উড়িষ্যার মধ্যে প্রদান করা প্রয়োজন। ময়ূরভঞ্জ, খরসোয়ান ও সেরাইকেলা রাজ্য বঙ্গ ভাষাভাষী অঞ্চলে যুক্ত হওয়ার দাবী করে। আসামের কিয়দংশ বাঙ্গালা ভাষাভাষী, তাহাও পশ্চিমবঙ্গকে

পর্য্যন্ত করিতে হইয়াছে। এই ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠন ব্যাপার লইয়াও কি শেষ পর্য্যন্ত ভারতের সর্ব্বত্র কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষের কার্য্যের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ করিতে বাধ্য হইবে?

পরলোকে নির্ম্মল দেব—

প্রেসিডেন্সী জেনারেল হাসপাতালে দুরারোগ্য ক্যান্সার রোগে মাত্র কয়েক মাস ভুগিয়া সুলেখক নির্ম্মল দেব পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি কোন্নগরের প্রসিদ্ধ দেববংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স মাত্র ৫৬ বৎসর হইয়াছিল। ভারতবর্ষ পত্রিকায়

নির্মল দেব

তাঁহার একাধিক রচনা প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহার রচনাভঙ্গীর মধ্যে একটা স্বকীয় বিশিষ্টের ছাপ ছিল। সরকারী কৃষি-বিভাগে দায়িত্বপূর্ণ উচ্চপদে নিযুক্ত থাকায় তিনি সাহিত্য সেবায় যথেষ্ট সময় ব্যয় করিতে পারিতেন না। তাঁহার একান্ত ইচ্ছা ছিল যে অবসর গ্রহণের পর বাংলা সাহিত্য অনুশীলনেই তিনি আত্ম-নিয়োগ করিবেন। কিন্তু তাঁহার সে ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হইল না। সরকারী কৃষি বিভাগ হইতে প্রকাশিত "কৃষি কথা" নামক পত্রিকাখানির তিনি যোগ্যতার সহিত দীর্ঘকাল সম্পাদনা করিয়াছিলেন।

মৎস্য চাষ শিক্ষার বিদেশ যাত্রা—

শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ ঘোষ নরওয়ে দেশে মৎস্য চাষ সম্বন্ধে শিক্ষালাভের জন্য গত ৯ই মে সস্ত্রীক ভারত ত্যাগ

সস্ত্রীক শ্রীবিভূতিভূষণ ঘোষ

করিয়াছেন। তিনি ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন স্থানের মৎস্য চাষ ব্যবস্থা দেখিয়া আসিবেন।

বিচারকের মন্তব্য—

গত ২৪শে এপ্রিল কলিকাতা শিয়ালদহ ষ্টেশনের নিকট ১০ সের বেআইনি চাউল সহ এক ব্যক্তিকে পুলিস গ্রেপ্তার করে। ৯ দিন হাজতে থাকার পর ২৮শে এপ্রিল কলিকাতার প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত বিজয়েশ মুখার্জ্জীর আদালতে তাহার বিচার হয়। আসামী অভিযোগ স্বীকার করিয়া বলে যে সে ঐ চাউল কলিকাতায় বিক্রয় করিতে আসিয়াছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীর ১ আনা অর্থদণ্ড করেন ও তাহার চাউল তাহাকে ফিরাইয়া দিতে বলেন। তিনি তাঁহার রায়ে বলিয়াছেন—"আমি যতই এই ধরণের মামলার বিচার করিতেছি, ততই আমার মনে হইতেছে যে আমি এমন এক শ্রেণীর দরিদ্র নর-নারীকে দণ্ডিত করিতেছি—যাহারা নাগরিকদের গৃহে যাইয়া সুস্পষ্টরূপে তাহাদের সেবা করিতেছে। কারণ, এ কথা সত্য যে, আমাদের রেশন কার্ডে আমরা যে চাউল পাইয়া থাকি, তাহা আমাদের সারা সপ্তাহের আহারের পক্ষে যথেষ্ট নহে। চাউলের গুণাগুণের কথা বলা বাহুল্য মাত্র।

প.রে। তথাপি প্রকৃত ব্যাপার হইতেছে এই যে, আসামীর ন্যায় লোক না থাকিলে কলিকাতার বহু লোককেই, বিশেষ করিয়া যাহারা ভাত খায়, তাহাদিগকে সপ্তাহে অন্ততঃ দুই দিন ভাত না খাইয়া থাকিতে হইত।" বিচারকের এই উক্তির উপর মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু এই তথ্য জানা সত্ত্বেও এবং চাউল অধিক থাকা সত্ত্বেও কেন যে বেসামরিক সরবরাহ বিভাগ হইতে রেশনের বরাদ্দ চাউলের পরিমাণ বর্দ্ধিত করা হয় না, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। এই ঘটনা হইতে সরকারী ব্যবস্থার ত্রুটি সুস্পষ্ট হইয়াছে।

তেলরায় শশিভূষণ স্মৃতি উৎসব — ফটো—শ্রীনীরদ রায়

রাষ্ট্রপতি ও মানভূম সত্যাগ্রহ—

২১শে এপ্রিল তারিখে রাষ্ট্রপতি ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়া মানভূম সত্যাগ্রহের পরিচালক শ্রীযুত অতুলচন্দ্র ঘোষকে নিম্নলিখিতরূপ পত্র প্রেরণ করেন—"কয়েকটি অভিযোগের প্রতীকারের জন্য মানভূম জেলায় আপনারা জানা হইয়াছে এবং আপনাদিগকে সত্যাগ্রহ প্রত্যাহার করিতে বলার জন্য আমাকে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। প্রধানতঃ যে কারণে আপনারা সত্যাগ্রহ আরম্ভ করিয়াছেন তাহা সমস্ত দ্বিভাষী অঞ্চলেই বর্ত্তমান রহিয়াছে এবং বিষয়টি অনতিবিলম্বেই গণপরিষদের উপদেষ্টা কমিটী ও ওয়ার্কিং কমিটী কর্ত্তৃক বিবেচিত হইবে। সুতরাং আমি আশা করি যে, আপনারা আন্দোলন ত্যাগ করিবেন।"

এই পত্র পাইয়া ২৩শে এপ্রিল হইতে মানভূমে সত্যাগ্রহ বন্ধ রাখা হইয়াছে। পত্রখানি ভুলক্রমে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদক শ্রীঅতুল্য ঘোষের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল এবং পুরুলিয়ায় পৌছিতে সে জন্য বিলম্ব হইয়াছে। মানভূম সমস্যার সমাধান হউক—সকলে ইহাই প্রার্থনা করিতেছে।

ডাঃ শ্রীহীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—

চন্দননগর নিবাসী খ্যাতনামা চিকিৎসক, কারমাইকেল

আছেন। ভারতীয়গণের মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথম করাসী এনাটোমিষ্ট সোসাইটীর সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। তিনি খ্যাতনামা সাংবাদিক 'শ্রীবৃদ্ধ' শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র।

পড়দহে প্রদেশপাল ডাঃ কাটজু

ফটো শ্রীসন্তোষ রায়চৌধুরী

সাবধানতার সহিত কার্য্যে অগ্রসর হইতে হইবে। অভিভাবকগণ গৃহে নিজ নিজ পুত্র-কন্যাদিগকে শান্তি রক্ষা বিষয়ে উপদেশ দান করিলে তাহারা অধ্যাপকগণের উপদেশ মত কাজ করিবে ও দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে। এই সভার পরও বৃহস্পতিবার বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণেই ছাত্রদের সভা হয় ও ছাত্রগণ সেই সভা হইতে দল বাঁধিয়া আইন অমান্য করিতে বাহির হয়। এ অবস্থায় সর্ব্বত্র কঠোরতা অবলম্বিত না হইলে দেশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে, সন্দেহ নাই।

দমদমে আসামের প্রদেশপাল ও প্রধান মন্ত্রী

ফটো—শ্রীপান্না সেন

ছাত্রদের মধ্যে শৃঙ্খলার অভাব—

সর্ব্বত্র ছাত্র সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষতঃ কলিকাতার কলেজ সমূহ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে শৃঙ্খলার বিশেষ অভাব হওয়ায় এ বিষয়ে আলোচনার জন্য গত ১৩ই বৈশাখ মঙ্গলবার সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ মন্দিরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার শ্রীযুত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে শিক্ষাব্রতীদের এক সভা হইয়াছিল। সভায় পরীক্ষার সময় অসাধু উপায় অবলম্বন, শিক্ষক ও গার্ডদের প্রহার, ক্লাস হইতে অনুপস্থিতি ও বহির্গমন প্রভৃতির কথা বিশেষ ভাবে আলোচিত হয়। শতকরা ৯০ জন ছাত্র শান্ত—কিন্তু শতকরা মাত্র ১০ জন অশান্ত ছাত্রের প্ররোচনায় কলিকাতায় ছাত্রদের মধ্যে অশান্তি দিন দিন

ডাঃ শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন—

দিল্লীস্থ পুরাতন সরকারী দলিল-পত্র রক্ষণ বিভাগের পরিচালক ডক্টর শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন সম্প্রতি দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ডাঃ সেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র। তিনি কলিকাতায় ইতিহাস বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। তাঁহার এই সম্মানলাভে বাঙ্গালী মাত্রই আনন্দিত হইবেন। তিনি 'ভারতবর্ষে'র লেখক।

পুরীধামে বাঙ্গালী বিদ্বেষ—

মধ্যে শুনা গিয়াছিল যে উড়িষ্যায় বর্ত্তমান প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুত হরেকৃষ্ণ মহাতাবের চেষ্টায় উড়িষ্যা প্রদেশে বাঙ্গালী

তাঁহাদের অনুরূপ অভিজ্ঞতা লাভ হইয়াছে। পুরীর মন্দিরে, সমুদ্রতীরে, হোটেল প্রভৃতি সর্ব্বত্র বাঙ্গালীদের নানাভাবে নির্য্যাতীত হইতে হইয়াছে। বিষয়টি স্থানীয় পুলিস বা কংগ্রেস-কর্ত্তৃপক্ষকে জানাইয়াও কোন ফল হয় নাই। এ বিষয়ে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী বা পশ্চিম বাঙ্গালার মন্ত্রিসভার কি কোন কর্ত্তব্য নাই? তাঁহারা যদি অভিযোগ সংগ্রহ করিয়া তাহা উড়িষ্যার কর্ত্তৃপক্ষকে জানান, তাহা হইলে অবশ্যই ক্রমে এই বিদ্বেষভাব বিদূরিত হইতে পারে। বাঙ্গালী শত শত বৎসর ধরিয়া পুরীধামে তীর্থ করিতে গিয়াছে—উড়িষ্যাবাসী বাঙ্গালীর সংখ্যাও কম নহে—এ অবস্থায় অন্যায় প্রাদেশিকতা উভয় প্রদেশের পক্ষেই দারুণ ক্ষতিজনক হইবে। উভয় প্রদেশের সৌহার্দ্দ্য উভয় দেশকেই উন্নতির পথে লইয়া যাইবে। বাঙ্গালা-প্রবাসী ওড়িয়া সমিতিরও এ বিষয়ে কর্ত্তব্যে অবহিত হওয়া উচিত।

শ্রীঅরুণকুমার শাহ—

কলিকাতা অন্ধ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ৺লালবিহারী শাহ মহাশয়ের পুত্র শ্রীঅরুণকুমার শাহ সম্প্রতি অন্ধ

অধ্যক্ষ শ্রীঅরুণকুমার শাহ—কলিকাতা অন্ধ বিদ্যালয়, বেহালা

বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ-পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন সম্বন্ধে উচ্চ শিক্ষালাভ করিতে গিয়াছিলেন। ১৯৩১ সালে নিউইয়র্কে বিশ্বসম্মেলনে তিনি ভারতের প্রতিনিধি-রূপে যোগদান করিয়াছেন। সম্প্রতি আমেরিকা হইতে অরুণবাবুকে প্রশংসাপূর্ণ এক মানপত্র প্রদান করা হইয়াছে। অন্ধদের শিক্ষাদানে তাঁহার কৃতিত্বের কথা দেশ কোন দিন বিস্মৃত হইবে না।

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র সম্মানিত—

বাঙ্গালার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথা-শিল্পী কবি ও চিত্র-পরিচালক শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র সম্প্রতি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের (ইউ-এন-ও) কৃষ্টি বিভাগের সদস্য মনোনীত

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

হইয়াছেন। বাঙ্গালী কথা-শিল্পীর এই সম্মান লাভে বাঙ্গালী মাত্রেই গৌরবান্বিত হইবেন। প্রেমেন্দ্রবাবুর দ্বারা বিদেশে বাঙ্গালীর সম্মান বর্দ্ধিত হউক, আমরা ইহা সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করি।

মিউনিসিপাল সম্মিলন—

গত ২৪শে এপ্রিল রবিবার শ্রীরামপুরে (হুগলী)

আলোচিত হইয়াছে। ৭৮টি মিউনিসিপ্যালিটীর মধ্যে ৪২টির প্রতিনিধি সম্মিলনে উপস্থিত ছিলেন। প্রধান মন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় সম্মিলনের উদ্বোধন বক্তৃতায় অনেক অপ্রিয় সত্য কথা বলিয়াছেন। এদেশে মিউনিসিপ্যালিটীর কমিশনার নির্ব্বাচনের সময় যে তোড়জোড় দেখা যায়, নির্ব্বাচনের পর কার্য্য করিবার সময় কমিশনারদের মধ্যে আর সে উৎসাহ দেখা যায় না। অবৈতনিক কার্য্য করিবার যোগ্যতা কাহার অধিক, দেশবাসী নির্ব্বাচনের সময় তাহাও ভাল করিয়া বিবেচনা করেন না। ফলে এদেশে মিউনিসিপ্যালিটীসমূহের কার্য্য একদিকে দুর্নীতিতে পূর্ণ হয় ও অপরদিকে নানা ত্রুটিবিচ্যুতি দৃষ্ট হয়। দুঃখের সহিত বলিতে হয় যে পশ্চিম বাঙ্গালার অধিকসংখ্যক মিউনিসিপ্যালিটীর কার্য্যই ভাল চলিতেছে না। সর্ব্বত্র দলাদলি ও তাহার ফলে স্বার্থপরতা স্থানলাভ করায় কাজ অপেক্ষা অকাজ বেশী হইয়া থাকে। এ অবস্থায় মিউনিসিপাল আইন পরিবর্ত্তন হওয়া প্রয়োজন। মনোনয়ন প্রথা সহসা উঠিয়া যাওয়াও মিউনিসিপালিটীগুলির বর্ত্তমান অসুবিধার অন্যতম কারণ। বর্ত্তমানে স্বাধীন গভর্ণমেণ্টের অধীনে পশ্চিম বাঙ্গালার মিউনিসিপালিটীগুলি যাহাতে প্রকৃত জনকল্যাণকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়, সেজন্য কর্ত্তৃপক্ষের কঠোরতার সহিত ব্যবস্থা করা উচিত। স্বায়ত্ত-শাসনশীল প্রতিষ্ঠান বলিয়া মিউনিসিপালিটীগুলি উপেক্ষার বস্তু নহে—প্রকৃত জনকল্যাণ না হইলে এগুলির অস্তিত্বের কোন প্রয়োজন থাকিতে পারে না।

ভ্রম সংশোধন

বৈশাখ এবং জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা ভারতবর্ষে বহুবর্ণ চিত্রের অপর পৃষ্ঠায় যে "আর্টের দাম কসাই" ও "মীন মোদক" নামক বিশেষ চিত্র দুইটি প্রকাশিত হইয়াছে ভ্রমবশে তাহাতে শিল্পীর নাম দেওয়া হয় নাই। উক্ত চিত্র দুইটি বিখ্যাত চিত্রশিল্পী শ্রীদেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী কর্ত্তৃক অঙ্কিত।...

ভাঃ—সঃ।

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

[illegible]ন ঘোষাল প্রণীত "অপরাধ-বিজ্ঞান" (৮র্থ খণ্ড)—৮৲
শ্রীবলাই প্রামাণিক প্রণীত উপন্যাস "প্রতিষ্ঠা ও বিসর্জ্জন"—২৲
পি, সি, সরকার প্রণীত "মেসমেরিজম্"—৩৲
শ্রীতারাপদ রাহা প্রণীত "ছোটদের প্রিয়"—৷৷০, "ছোটদের [illegible]"—৷৷০
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রণীত "মরণ বিজয়ী বীর"—২৲
শ্রীশশধর দত্ত প্রণীত উপন্যাস "এ যুগের মেয়ে"—২৲, "[illegible] মোহন"—২৲, "মোহন ও মহাদেবী"—২৲, "বন্দী স্বপন"—২৲
শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত রহস্যোপন্যাস "[illegible]"—[illegible]৲
শ্রীঅসিতকুমার হালদার কর্ত্তৃক বাংলা পদ্যে অনূদিত "শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা"—২৲
[illegible] বসু প্রণীত উপন্যাস "চিমনি"—৩৲
শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রণীত "বকুল-পরী"—[illegible]৲
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত "অজানা দ্বীপের রাণী"—৷৷০
সুকুমার দে সরকার প্রণীত "মনটা [illegible] করে"—[illegible]৲
শ্রীবিমলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত "ভারতের অমর প্রতিভা"—২

গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন

আগামী আষাঢ় মাস হইতে "ভারতবর্ষের" সপ্তত্রিংশ বর্ষ আরম্ভ হইবে। গত ৩৬ বৎসর ধরিয়া "ভারতবর্ষ" কি ভাবে বাঙ্গলা সাহিত্যের সেবা করিয়া আসিতেছে, তাহা আমাদের পাঠকগণ অবগত আছেন। আশা করি, সকলে আমাদের সহিত পূর্ব্বের মতই সহযোগিতা করিবেন।

ভারতবর্ষের মূল্য মণিঅর্ডারে বার্ষিক ৭৷৷০, ভি-পিতে ৭৸৵০ যাণ্মাসিক মণিঅর্ডারে ৪৲, ভি-পিতে ৪৷৵০। ভি-পিতে ভারতবর্ষ লওয়া অপেক্ষা **মণিঅর্ডারে মূল্য প্রেরণ করাই সুবিধাজনক।** ভি-পি-র টাকা অনেক সময় বিলম্বে পাওয়া যায়, ফলে পরবর্ত্তী সংখ্যা পাঠাইতেও বিলম্ব হয়। গ্রাহকগণের টাকা ২০শে জ্যৈষ্ঠের মধ্যে না পাওয়া গেলে আষাঢ় সংখ্যা আমরা ভি-পিতে পাঠাইব। পুরাতন ও নূতন সকল গ্রাহকই দয়া করিয়া মণিঅর্ডার কুপনে পূর্ণ ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন। পুরাতন গ্রাহকগণ কুপনে গ্রাহক নম্বর দিবেন। নূতন গ্রাহকগণ "নূতন" কথাটি লিখিয়া দিবেন।

পাকিস্থানের গ্রাহকদের প্রতি আমাদের অনুরোধ তাঁহারা যেন পাকিস্থানের ডাকটিকিট না পাঠান। কারণ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে পাকিস্থানের টিকিট অচল হওয়ায়, তাহা আমরা এখন হইতে ব্যবহার করিতে পারিব না।

কার্য্যাধ্যক্ষ—ভারতবর্ষ

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ